২২০
৮৫৫

জন্মভূমি।

পঞ্চম ভাগ—পঞ্চম বর্ষ।

১৩০১ সালের পৌষ হইতে—১৩০২ সালের অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত।

দ্বাদশ সংখ্যা সম্পূর্ণ।

কলিকাতা,

৩৪।১ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, বঙ্গবাসী ষ্টীম-মেসিন-প্রেসে

শ্রীকেবলরাম চট্টোপাধ্যায় দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১৩০২।

মূল্য ১।০ এক টাকা চারি আনা।

ভাঃ মাঃ ।৵০ ছয় আনা

[illegible]

ক্রমিক সং ২২০
শ্রেণী সং ৫(৬)
কলিকাতা।

সূচীপত্র।

বিষয়	পৃষ্ঠা
অকবর ও জাহাঙ্গীরের হিন্দুপত্নী ...	৭৪৭
অদৃষ্ট	৩২১,৫১৩
অনুবাদে প্রতিবাদ	২৫২,৩০৯
অবসান	২৪৫
অমিতাভ	৭৫৯
আঁখি তুলে	৫৯
আকবর-চরিত্রে কলঙ্ক ...	৬৩৩
আক্ষেপ	৫৯৩
আচার প্রবন্ধ	৬১১
আষাঢ়ে গল্প	৪০১
আসাম-চিন্তা	৬৮০
উত্তর-কাশী	১২৯
উপন্যাস মহে	১৮১,১৯৩
ঋষি	৩৭৬,৪১৩
একটী সঙ্গীত	৪৬৬
এক বর্ষ	২৩৪
এজ্ ইউ লাইক্ ইট	৫৯৫
ঐতিহাসিক বিশৃঙ্খলা	২২৭
কর্ম্মফল	২১৬
কিং লিয়র	৭২৫
কৃত্তিবাস	২১৮
গড় মান্দারণ ও জাহানাবাদের ইতিবৃত্ত	৩৩৮
গড়িয়ার যুদ্ধ	২০
গিরিগঙ্গা	৫৪৯
চিকিৎসা বিধান	৩৫৮
চোর	৪৩২
ঠাকুর-দাদার পত্র	৫৮৭
তত্ত্বিনী	৬৫
তসর-গুটী ও রেসম	১২
তারা	৩৬১
তীরহুতের রাজবংশ-বিবরণ ...	১১৮
তু কাহে বাজাও ত বাঁশী ...	৬৭৪
দুর্গোৎসব	৬৩৬

বিষয়	পৃষ্ঠা
দেহাত্মবাদ খণ্ডন	২৩৫
দ্বিতীয় প্রভাত	৪৮১
নয়নচাঁদের ব্যবসা	৪৪৯
নাটক	৫৩১
নানা সাহেব	১
নামোচ্চারণ	৪০০
নিরাশার স্মৃতি	৬৮৩
নূতন কথা ...	৪৩১,৫৭২,৬২৫
ন্যায়দর্শন ...	৩৬১,৪৩০,৫০৭
পত্র	৩১১
পুরাণ কথা	১৪৫
পূজার গল্প	৬১৬
পেরিক্লিস্	৪১
প্রভাতচিন্তা	৫০২
প্রেম	১৪৯
প্রেমের পরীক্ষা	৩৪১
ফরাস যুবক	৬৮৬
বোধন ব্যবস্থাপত্র	
ভক্তির জয়	৬১৯
ভট্টিকাব্যের গ্রন্থকার	৪৫৭
ভারতবর্ষে রেসম-বাণিজ্য ...	৬৪১
ভৈরবী	৫৭৭
মনশ্চৈতন্যবাদ খণ্ডন	৩৭৬
মহারাষ্ট্র দেশের প্রাচীন বিবরণ ...	৭০
মা	১৮
আচ্ এড্ু এবাউট নথিং ...	১০৪
মাতৃভক্তি	৩৮৫
মান্দু	৭৪৪
মুসলমান রাজধানীতে বর্ণিয়ার ...	৪৩৫
মেসার্ ফর্ মেনার ...	১৬৫
ম্যাক্‌বেথ	৪৮২
রণজিৎ সিংহের দরবার ...	১৩৪
রাজা রামমোহন রায়	৫৭১

বিষয়			পৃষ্ঠা
ব্রাহ্মেশ্বর শিবলিঙ্গ	—	—	৫৫৩
ব্রূপচাঁদ অধিকারী	—	—	৭৭
বঙ্গসাহিত্যে বঙ্কিম	—	—	২৫৭
বড় গল্প নয়	—	—	২১৯
বাঁশী	—	—	২৯৭
বিচিত্র সংগ্রহ	—	—	৩৫১
বিদ্যাপতি মঙ্গল	—	—	৯
শালিবাহন-বংশ	—	—	৩১৩
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা	—	—	৭০১,৭১৩
শ্রীরাধার মান	—	—	১৬৪
শ্রীশ্রী৺ গঙ্গা	—	—	৯
সংশয়	—	—	৭৬
সংসার	—	—	১২০
সমর্পণ	—	—	৭৪৬
সমালোচনা ৬২,১২৮,১৯০,৩৩০,৪৪৫,৫১০,৫৭৪,৬৩৮,৭৬২			
সমাস	—	—	৩০
সরতান	—	—	৩৬২
সিপাহীযুদ্ধে ভুক্ত-ভোগী	—	—	৫৫৭
সুখ ও শান্তি	—	—	১৫৭
স্কুলপাঠ্য	—	—	১৯৫
স্বপ্ন ও জাগরণ	—	—	১৫৮
স্বর্গীয়া শরৎ সুন্দরী	—	—	৯১১
[illegible]	—	—	৬৫৭
হিন্দু ও বৌদ্ধ	—	—	২৩১,৫৫২,৬২৯
হিন্দুত্ব	—	—	৭৯
হিন্দু-রমণীগণের অবস্থা ও শিক্ষা	—	—	৯৮

চিত্র বা ছবির সূচীপত্র।

বিষয়			পৃষ্ঠা
অপূর্ব্বমিলন (নং ১)	—	—	১১৮
অপূর্ব্ব-মিলন (নং ২)	—	—	১৮১
আনন্দ-মিলন	—	—	৫৮
উদ্‌ভ্রান্ত লিয়র	—	—	৭৪১
উন্মাদিনীবেশে লেডী ম্যাক্‌বেথ	—	—	৪৯৮
ক্লডি ও ইজাবেল্	—	—	১৭২
ছদ্মবেশী ভেরেনারাজ এবং ইজাবেল্ ও মেরিয়ানা	—	—	১৭৫
ডাকিনীত্রয়ের সহিত ম্যাক্‌বেথ ও ব্যাঙ্কোর সাক্ষাৎ	—	—	৪৮৩
থেইসার পুনর্জ্জীবন লাভ	—	—	৪৮
দুইটী ভূত	—	—	৪৫৬
ধর্ম্মের মহিমা	—	—	৫১৯
মর্ম্মপীড়িত লিয়র	—	—	৭৩৫
মল্লযুদ্ধ	—	—	৫১৯
ম্যাক্‌বেথ ও ম্যাক্‌ডফের যুদ্ধ	—	—	৫০১
ম্যাক্‌বেথ কর্ত্তৃক রাজহত্যা	—	—	৪৯০
রহস্যে মঙ্গললিপ্সি	—	—	১০৭
রাজকন্যা লাভ	—	—	৪৪
লিয়রের পরিণাম	—	—	৭৪৫
সরতানের ষড়যন্ত্র	—	—	১১২
সিংহী-সংহার	—	—	৬০৭

জন্মভূমি।

৫ম ভাগ। } পৌষ। ১৩০১। { ১ম সংখ্যা।

নানা-সাহেব।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

কানপুর-হত্যাকাণ্ড।

কানপুর হত্যার উত্তপ্ত শোণিতের রাজ-টীকায় অভিশপ্ত ললাট ভূষিত করিয়া, এক-বিংশতি তোপের গর্জ্জনে সম্মানিত হইয়া, নানা-সাহেব পেশোয়ার-সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন। তাঁহার প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও জ্ঞাতি ও অনুচরগণ যে ঘৃণিত বিশ্বাসঘাতকতার অনুষ্ঠান করিল, তন্নিমিত্ত তিনি দুঃখিত বা তাহাদিগের উপর অসন্তুষ্ট হইলেন না। অসন্তুষ্ট হইলেও তাহার কিছু প্রতিবিধান করিতে পারিতেন না। নৃশংস ও দুরন্ত মুসলমান-সৈনিকগণের, বিশেষতঃ অশ্বারোহি-দলের উপর তাঁহার কিছুই ক্ষমতা ছিল না। এমন কি, একদা মুসলমান-সৈনিকেরা প্রকাশ্যে নানা-সাহেবের উপর বিরক্তভাব প্রকাশ করিলে, নানা-সাহেব নগ্নপাদে ও কৃতাঞ্জলিপুটে তাহাদিগের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলেন যে, আর তিনি কখনও তাহাদের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন না। মুসলমানগণেরও প্রতিপত্তি এইরূপে আরও বৃদ্ধি পাইল, তাহারা যথেচ্ছাক্রমে সমুদয় নৃশংস-কার্য্যের অবতারণা করিতে লাগিল। ইংরেজ বন্দিনী-রমণীগণের কি বৃদ্ধা, কি বালিকা, সকলের সতীত্বনাশ; অন্যান্য স্থান হইতে আনীত বন্দী-পুরুষগণের প্রাণনাশ ও লুণ্ঠনব্যাপারে, এই দুর্ব্বৃত্তেরা কখনও পরাঙ্মুখ ছিল না।

এইরূপে অরাজকতা ও অত্যাচার সর্ব্বত্র ব্যাপৃত হইলে, অকর্ম্মণ্য নানা-সাহেব লাম্পট্য ও মদ্যসেবায় রাজকার্য্যের গুরুতর ব্যাপার হইতে অবসর লইলেন। রাজকার্য্যের ভার আজিমুল্লা, তাঁহার ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্রের হস্তে অর্পিত হইল। বলা বাহুল্য যে, এইরূপ অরাজকতা, অত্যাচার ও নৃশংসতা হিন্দু-সিপাহীগণের ঘৃণার্হ হইয়াছিল। একদা নানা-সাহেব এক রাজপুত-সিপাহীকে এক ইংরেজ-বন্দীর প্রাণনাশের আদেশ দিলে, সেই গর্ব্বিত সৈনিক গম্ভীর-স্বরে বলিল,—"আমি রাজপুত, আমি কসাই নহি।" আর এক স্থলে নানা-সাহেবের ভ্রাতা বালা-সাহেব, কতকগুলি উচ্চ-জাতীয় হিন্দু-সিপাহীকে কতকগুলি ইংরেজ-পুরুষের শিরশ্ছেদ করিতে বলিলে, সিপাহীরা সমস্বরে বলিল,—"নিরস্ত্র বন্দীগণের উপর আমরা কখন অসি উত্তোলন করিব না, বন্দীগণের হস্তে

অস্ত্র প্রদান করিলে, যুদ্ধে উহাদিগকে নিপাত করিতে আমরা প্রস্তুত।" হিন্দুরা এইরূপ কার্য্যে ঘৃণা-সহকারে বিরত হইলে, দুর্ব্বৃত্ত মুসলমানেরা তৎক্ষণাৎ তৎসম্পাদনে অগ্রসর হইত।

এক্ষণে দেখা যাউক, ইংরেজ-রমণীগণের প্রতি নানা-সাহেব কিরূপ ব্যবহার করিলেন। প্রায় দুই শত রমণী ও শিশু বন্দী-স্বরূপ আনীত হইলে, নানা-সাহেব তাহাদিগকে বিবিগড় নামক একস্থানে, তাহাদের আবাস নির্দ্ধারিত করিলেন। ইতিপূর্ব্বে তাহাদিগের মধ্যে অতি সুন্দরী কামিনীগণকে মুসলমান-সৈনিকেরা স্বীয় আবাসে লইয়া যায়; সেনাপতি হুইলার সাহেবের সুন্দরী কন্যা ইহাদের মধ্যে একজন। বন্দিনী রমণীগণের তত্ত্বাবধারণের ভার হোসেনি-খাঁনম্ নাম্নী ত্রিংশৎবর্ষীয়া এক নারীর হস্তে অর্পিত হয়। হোসেনি-খাঁনমের অপর এক নাম—বেগম; এই নামেই সে বিখ্যাত। এই নারী নানার হৃদয়েশ্বরী আধ্‌লার এক সহচরী। আধ্‌লা নানা-সাহেবের উপপত্নী। নানা-সাহেবের উপর তাহার প্রভুত্ব অসীম। তাহার সৌন্দর্য্য অতুল ও অনুপম ছিল। সুরাপানে উন্মত্ত নানা-সাহেব রাজকার্য্য সমুদয় ত্যাগ করিয়া, যখন আধ্‌লার হৃদয়ে শান্তি অন্বেষণ করিতেন, তখন তিনি আপনাকে অতি সুখী ও কৃতার্থ জ্ঞানে পুলকিত হইতেন। তাঁহার হৃদয়েশ্বরীর প্রিয়সহচরী বেগমের হস্তে ইংরেজ-রমণীগণের অবস্থা বড় ভাল ছিল না। মুসলমান সৈনিক-গণের হস্তে অত্যাচার ব্যতীত, প্রত্যহ দুই জন বন্দিনীকে নানা-সাহেবের অশ্বশালায় গম-পেষণ করিতে যাইতে হইত।*

সুখে ও স্বচ্ছন্দে জীবন অতিবাহিত করিবার পর, এইরূপ ক্লেশ ও অবমাননা বন্দিনীগণের নিরতিশয় ক্লেশকর হইল। কিন্তু এরূপ অবস্থায় অধিককাল তাহাদিগকে থাকিতে হয় নাই। নানা-সাহেব ইংরেজ-রমণীগণ সম্বন্ধে কি করা হইবে, তদ্বিষয়ে দিল্লীশ্বরের অনুমতিপ্রার্থী হইলে, দয়ার্দ্রচেতা বৃদ্ধ সম্রাট তাহাদিগের প্রতি দয়া ও ভদ্রতার সহিত ব্যবহার করিতে বলিলেন। ইহার পর হইতে বন্দিনীগণের ক্লেশের অনেকাংশে মোচন হইল। তাহারা উত্তম খাদ্য, উত্তম পরিচ্ছদ পাইতে লাগিল, এতদ্ব্যতীত তাহাদিগের পরি-চর্য্যার্থ দাস-দাসীও নিযুক্ত হইল।* কিন্তু এ অবস্থাও অধিককাল তাহাদিগকে ভোগ করিতে হয় নাই। তাহাদিগের উপর অশেষ অত্যাচার হইয়াছিল। সে অত্যাচারের তুলনা নাই।

নানা-সাহেব বিলাস ও আনন্দের গৃহে সুখানুভব করিতে করিতে একদা সহসা চকিত হইলেন। তিনি শুনিলেন যে, তাঁহার বিচিত্র গঠিত রাজ্যের বিরুদ্ধে ইংরেজ প্রতিশোধ-কামনায় সংহার-মূর্ত্তিতে আসিতেছে। ৩০শে জুন বৃটিস-সৈন্যের অগ্রভাগ ৫০০ গোরা এবং ৩০০ শিখ ও ৮টী তোপ, মেজর রেনডের অধীনে কানপুর অভিমুখে প্রেরিত হইল; তাহার সাহায্য নিমিত্ত জলপথে এক বাষ্পীয় পোতে আর এক দল সৈন্য প্রেরিত হইল। এতদ্ব্যতীত মুখ্য সৈন্য-বিভাগ সেনাপতি হ্যাভেলকের অধীনে কানপুর-বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ লইতে পদচালনা করিয়াছিল। যে সমুদায় গ্রাম তাহাদের রণ-কুচের সম্মুখে পতিত হইল, তৎসমুদায় বিনষ্ট হইল; তত্রত্য অধিবাসিগণ কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া বৃক্ষশাখায় লম্ব-মান হইয়া জীবন হারাইল। সিপাহী-যুদ্ধের সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাসকার কে সাহেব স্বীকার করিয়াছেন যে, 'ইংরেজ-সৈন্যের প্রতিশোধ

* Trevelyan's Cawnpore. p. 302.

* Ball's History of the India Mutiny Vol I. p. 32,344.

অতিমাত্র কঠোর হইয়াছিল।* নির্দ্দোষ কৃষক-গণের আবাসে ইংরেজী বস্ত্র বা মুদ্রা যদি কিছু পাওয়া যাইত, অমনি তাহাদিগকে বৃক্ষশাখায় ফাঁসী দেওয়া হইত। এই সমুদায় ব্যাপারে নীল সাহেবের আগ্রহ সর্ব্বাপেক্ষা উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। তিনি একদা দ্বাদশটী কৃষ্ণকায় জীবের প্রাণ রজ্জুতে নিঃশেষিত করিয়া, ইহার কারণস্বরূপ নির্দ্দেশ করিলেন যে, তাহারা তাঁহাদের যাত্রাকালে অন্যায় দিকে মুখ ফিরাইয়াছিল। তাঁহার সম্মুখ সমুদয় গ্রাম ভস্মাবশেষে পরিণত ও তত্রত্য অধিবাসিগণকে বৃক্ষশাখায় লম্বিত করা হইল। তাঁহার এই সমুদয় আচরণে বিস্মিত হইয়া, তাঁহার এক বন্ধু তাঁহাকে বলিলেন,—"এরূপ করিতে থাকিলে সমুদয় গ্রাম জনশূন্য হইবে ও সৈন্যগণের রসদ-সংগ্রহ দুরূহ হইয়া উঠিবে।" এই সমুদায় কঠোর আচরণ কানপুরের হত্যাকাণ্ডের পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল, সুতরাং কানপুর-ব্যাপারের প্রতি-শোধ বলিয়া এরূপ কঠোরতার পোষকতা করা যাইতে পারে না।*

নানা-সাহেব যখন শুনিলেন, কিরূপ মূর্ত্তিতে ইংরেজ কানপুর অভিমুখে আসিতেছে, তখন নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া, তিনি মুসলমান-সৈনিকগণকে তাহাদিগের অত্যাচারের নিমিত্ত তিরস্কারের সুযোগ পাইলেন। কিন্তু তিলার্দ্ধমাত্র কাল নষ্ট করিবার নাই,—ইংরেজ কানপুরে আগতপ্রায়, সুতরাং অরাতির গতিরোধে নানা-সাহেব তাঁহার ভ্রাতা বালা সাহেবের অধীনে বহুসংখ্যক সৈন্য প্রেরণ করিলেন। কানপুর হইতে দশ ক্রোশ দূরবর্ত্তী আনং নামক স্থানে ১৫ই তারিখে ইংরেজ ও বিদ্রোহী-সেনার এক প্রচণ্ড সংগ্রাম হইল। বালা-সাহেবের নিষ্ঠুর প্রকৃতি, তাঁহার স্বাভাবিক সাহস ও বীর্য্যবত্তায় কথঞ্চিৎ আবরক হইয়াছিল, সুতরাং তাঁহার অদম্য সাহস ও বীরত্ব সত্ত্বেও বিদ্রোহী সেনা পরাভূত হইল। বালা-সাহেব আহত হইয়া ভ্রাতৃ সমীপে আনীত হইলে, নানা-সাহেবের উপলব্ধি হইল যে, ইংরেজের বিরুদ্ধে তাঁহার বিচিত্র রাজ্যের রক্ষা এক প্রকার অসম্ভব। সে যাহা হউক, তিনি শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার প্রভুত্ব রক্ষার নিমিত্ত প্রয়াস করিলেন। ইংরেজেরা বিজয়ের সুযোগ লইয়া দ্রুতবেগে কানপুর অভিমুখে আসিতেছে, তন্নিবারণার্থ নানা-সাহেব, কানপুরে আসিবার একমাত্র প্রশস্ত পথ পাণ্ডুনদীর সেতু দৃঢ়বলে রক্ষিত করিলেন; কিন্তু ইংরেজ-সৈন্যের অপ্রতিহত আক্রমণ বিদ্রোহীরা সহ্য করিতে পারিল না। ক্ষণকাল সংগ্রামের পর তাহারা রণে ভঙ্গ দিল। ইংরেজেরা পাণ্ডুনদী উত্তীর্ণ হইয়া কানপুর অভিমুখে যাইতে প্রস্তুত হইলেন।

নানা-সাহেবের সভা এখন ঘোরতর বিশৃঙ্খলতায় পরিণত হইল। কেহ নানা-সাহেবকে পলায়ন, অপরেরা কানপুরের নিমিত্ত আর একবার প্রয়াস করিতে বলিল। মুসলমান-সিপাহীরা—যাহারা ইংরেজহত্যায়, তাহাদের রমণীগণের সতীত্বনাশে ও অপরাপর নিষ্ঠুরতায় আপনাদিগের নাম কলঙ্কিত করিয়াছিল—প্রতিশোধ-গ্রহণাভিলাষী আগতপ্রায় ক্রুদ্ধ অরাতির হস্তে তাহাদের কি দুর্দ্দশা ঘটিবে, তাহা নীল ও রেণডের কানপুর অভিমুখে আগমনকালীন পথে, অতিমাত্র কঠোর আচরণে, বিলক্ষণ বুঝা গেল। যখন এলাহাবাদে ও বারাণসীতে নীল সাহেবের ভয়ঙ্কর ক্রোধ হইতে নির্দ্দোষ ব্যক্তি, এমন কি, বৃদ্ধা-নারী ও বালকেরা পর্য্যন্ত নিস্তার পায় নাই এবং এইরূপ অলৌকিক আচরণে যখন দোষী ও নির্দ্দোষী

* Sepoy War, Vol. II. P. 284.

* Russel's Diary. Vol. II. P. 402.

প্রায় ছয় সহস্র প্রাণীর জীবন-দীপ নির্ব্বাপিত হয়,* তখন ইংরেজ-বিদ্রোহী, ইংরেজহত্যাকারী ও ইংরেজ-ললনাগণের অবমাননাকারী হইয়া, তাহারা আর কি প্রত্যাশা করিতে পারে? এই নিদারুণ আশঙ্কায় দুর্ব্বৃত্তেরা যে নৃশংস ও নির্ম্মম চক্রান্তের অবতারণা করিল, তাহার স্মৃতি এখনও ক্রোধ ও ঘৃণা প্রত্যেক হৃদয়ে জাগরূক করিবে এবং বিদ্যা, বুদ্ধি ও সভ্যতার প্রভাব সত্ত্বেও ইংরেজ ও ভারতীয়গণের মধ্যে আন্তরিক সম্মিলনের নিদারুণ অন্তরায় থাকিবে। জাতীয় বিদ্বেষ প্রজা ও রাজায় মনোমালিন্য ঘটাইবার বিষম প্রবর্ত্তক এই চক্রান্তকারীরা, মনে ইহা স্থান দিয়াছিল যে তাহাদের অসীম পাপের কাহিনী ইংরেজ জানিতে না পারিলে তাহারা এক প্রকার নিস্তার পাইলেও পাইতে পারে। যদি বিবিগড়ে আবদ্ধা নির্দ্দোষা ও নিপীড়িতা অবলাগণকে একেবারে ইহলোক হইতে স্থানান্তরিত করা যায়, তাহা হইলে তাহাদের ঘোরতর অপরাধ বিষয় ইংরেজের অজ্ঞাত থাকিতে পারে। এইরূপ ভয়ঙ্কর যুক্তির পরে ইহা স্থিরীকৃত হইল যে, বিবিগড়ে অবরুদ্ধা বন্দিনীগণকে হত্যা করিতে হইবে। এই চক্রান্তকারিগণ মধ্যে আজিমুল্লা, টীকাসিংহ ও গ্রিণউড নাম্নী এক অর্দ্ধজাতীয়া নারীর নাম বিখ্যাত।

এই লোমহর্ষণ ভয়াবহ ব্যাপার কিরূপে সংশাধিত হইবে, তদ্বিষয়ে চক্রান্তকারীরা সবিশেষ যত্নশীল হইল। ইহা অতি সত্বর ও গোপনে সম্পন্ন করিতে হইবে; কারণ, বাজিরাওয়ের অশেষ গুণবতী কন্যাদ্বয় ও ভার্য্যারা ঘৃণাক্ষরে এরূপ নৃশংসতার অবতারণা জানিতে পারিলে, চক্রান্তকারিগণের উদ্দেশ্যসিদ্ধি এক প্রকার অসম্ভব হইয়া উঠিবে। কানপুর-ঘাটের হত্যাকাণ্ডে কতিপয় নারীর প্রাণনাশে, এই সর্ব্বগুণালঙ্কৃত কামিনীদিগের মহদাচরণের বিষয় তাহারা বিলক্ষণ জ্ঞাত ছিল। অনবধানতায় ও গুলির আঘাতে কানপুর-ঘাটে কতিপয় ইংরেজ-রমণীর প্রাণবিয়োগ হইয়াছিল; কোনরূপে এই বার্ত্তা পেশোয়ার অন্তঃপুরে পৌঁছিলে, বাজিরাওয়ের ভার্য্যা ও কন্যারা যৎপরোনাস্তি ক্ষুভিত ও ক্রোধান্বিত হইয়া, নানা-সাহেবকে এ বিষয়ে অপরাধী জ্ঞানে, তাঁহাকে যথোচিত ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন যে, এরূপ ঘটনা পুনরায় কানপুরে হইলে, তাঁহারা তাহাদের শিশু-সন্তান-সহ প্রাসাদের গবাক্ষ হইতে নিম্নে পতিত হইয়া আত্মহত্যা করিবেন। এই ভদ্র মহিলাগণের এইরূপ আন্তরিক ক্ষোভ ও ক্রোধ কেবল ভর্ৎসনামাত্রে পর্য্যবসিত হয় নাই,—তাঁহারা কিছুকাল জল ও খাদ্য কিছুই গ্রহণ করেন নাই।* এই সমুদায় জ্ঞাত থাকায় চক্রান্তকারীরা, পাছে তাহাদের পাপ-মন্তব্য বাজিরাওয়ের অন্তঃপুরে শ্রুত হয়, এই আশঙ্কায় অতি সত্বর ও গোপনে এই ঘোরতর পাপকার্য্যের অনুষ্ঠানে তৎপর হইল। কিন্তু কে এই ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ডে স্বীয় হস্ত কলঙ্কিত করিবে! এই চক্রান্ত উদ্ভাবনে যদিও চক্রান্তকারীদিগকে কিছুমাত্র ক্লেশ পাইতে হয় নাই, কিন্তু এই চক্রান্ত সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত লোক পাইতে তাহাদিগকে বিশেষ ক্লেশ পাইতে হইয়াছিল। পরিশেষে, বিবিগড়ের তত্ত্বাবধারণে নিযুক্ত হোসেনি-খাঁনমকে, তাহারা হস্তগত করিতে সক্ষম হইল। এই স্ত্রীলোক ১৬ই জুলাই বেলা সার্দ্ধ চারি ঘটিকার সময়, বিবিগড়ের রক্ষকগণকে বলিল, "পেশোয়া কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া আমি তোমাদিগকে আদেশ করিতেছি,—বন্দিনীদিগকে হত্যা কর।" রক্ষকেরা এই আদেশে সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া হোসেনিকে বলিল,—"তুমি আদেশ করিবার কে? আমরা কখন বন্দিনীদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্র-চালনা করিব না।" সিপাহীগণের এই ন্যায্য উত্তরে অবমানিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া হোসেনি তৎক্ষণাৎ সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিল। এদিকে হোসেনির ক্ষমতা ও প্রভুত্ব অবগত থাকায়, রক্ষকেরাও বন্দিনীগণকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। অনতিবিলম্বে হোসেনি দুইটী মুসলমান কসাই সমভিব্যাহারে বিবিগড়ে প্রবিষ্ট হইল। তাহার পর যাহা ঘটিল, তাহার বর্ণনা অতি ক্লেশকর ও দুরূহ। ঘটনার সংক্ষেপ এই যে, কসাই-দ্বয়ের হস্তে বিবিগড়ের বন্দিনীগণের মধ্যে অধিকাংশের প্রাণবায়ু নিঃশেষিত হইল। পরদিবস তাহাদের শব সন্নিহিত এক কূপে নিক্ষেপ করা হইল। রমণী ও শিশুগণের শোণিতে বিবিগড়ের গৃহ পূরিত হইল।

বিবিগড়ের বন্দিনীগণের মধ্যে সকলের এরূপ ভাগ্য ঘটে নাই। বন্দিনীগণ-মধ্যে যুবতীগণকে সিপাহীরা, বিশেষতঃ মুসলমান-অশ্বারোহীরা স্বীয় পাশব বৃত্তি চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত লইয়া যায়, কিন্তু কোন কোন দুর্ব্বৃত্ত তাহাদের নির্ব্বাচিত রমণীগণের উপর প্রকাশ্যে বলপ্রয়োগ করিবার পর রাজপথে উলঙ্গ করিয়া তাহাদের হস্তপদ বন্ধনানন্তর শায়িত করিয়া রাখে। ঐরূপ অবস্থায় গতাসু হইয়া তাহারা পতিত থাকে। ইংরেজেরা কানপুর-প্রবেশ-কালীন তাহা দেখিয়া সাতিশয় সন্তপ্ত হইয়াছিলেন। নানা-সাহেবের ভ্রাতুষ্পুত্র রাও-সাহেবের নিকট একটী ইংরেজ-বালিকা লালিত হইয়াছিল। এইরূপ ঘটনা সমুদায়ে প্রতীয়মান হয় যে, বিবিগড়ে ইংরেজ রমণীগণের মধ্যে সকলে নিহত হয় নাই। নানা-সাহেব এই ঘোরতর হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত ছিলেন না।

* রাজপত্র, ১৮৫৭ খৃঃ অষ্ট, ৬ই ফেব্রুয়ারি।

* Trevelyan's Cawnpore p. 331.

'বাবা সীতারাম সাক্ষ্যে স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছে' মত্রে টমসন স্বীয় পুস্তকে স্বীকার করিয়াছেন,—ইহা সর্ব্ববাদি-সম্মত সকলের মত ও উক্তি যে, আজিমউল্লা এই হত্যাকাণ্ডের প্রধান প্রবর্ত্তক।"*

বিশ্বস্ত সাক্ষ্যসূত্র হইতে ইহা জানা যায় যে, সুবিখ্যাত তান্তিয়াতোপী কানপুরঘাট বা বিবিগড়ের হত্যাকাণ্ডে আদৌ লিপ্ত ছিলেন না। এরূপ ঘৃণিত কার্য্য তাঁহার চরিত্রের নিতান্ত অনুপযোগী। বিবিগড়ের হত্যাকাণ্ডে কে কে প্রবর্ত্তক এবং ইহা কিরূপে সংশাধিত হয়, তাহা জানা অতি দুরূহ। কর্ণেল উইলিয়মস্ যাঁহার হস্তে কানপুর-ব্যাপারের তথ্যানুসন্ধানের ভার অর্পিত হয়, তিনি—লিখিয়াছেন যে, বিবিগড়-হত্যাকাণ্ডের প্রকৃত ঘটনা সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ও সত্য সাক্ষ্য একেবারে পাওয়া যায় না। যে সমুদায় সাক্ষ্য তিনি কানপুর-ব্যাপার সম্বন্ধে সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা লিপিবদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু ১৬ই ও ১৭ই জুলাইয়ের ব্যাপারের প্রকৃত সাক্ষ্য সংগ্রহে তিনি অসমর্থ হইয়াছেন; সুতরাং বিবিগড়-হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে কোনরূপ প্রকৃত ঘটনা পাওয়া এক প্রকার অসম্ভব। তবে প্রকাশিত সাক্ষ্য এবং দেশীয় ও বিদেশীয়গণ, যাঁহারা তৎকালে কানপুরে ছিলেন, তাঁহাদের বর্ণিত ও প্রকাশিত ঘটনা হইতে যতদূর সত্য এবিষয়ে জ্ঞাত হওয়া যায়, তাহা আমরা এই স্থলে সন্নিবেশ করিতে সাধ্যমত প্রয়াস পাইয়াছি।

এরূপ হত্যাকাণ্ড ঘটিবার পর নানা-সাহেব কিরূপে নিশ্চিন্ত থাকিবেন? বিশেষতঃ ইংরেজেরা কানপুরের অতি নিকটবর্ত্তী! এবার তিনি স্বয়ং বিদ্রোহী-সেনানী হইলেন। কানপুরের কিয়দ্দূর দক্ষিণে সেনানী হ্যাভেলক বিদ্রোহী-সেনার সহিত সংগ্রাম করিলেন। এবার

* কানপুর ২১৩ পৃষ্ঠা।

বিদ্রোহীরা প্রতিপদে প্রাণপণে সংগ্রাম করিল। নানা-সাহেব সৈন্যগণের উৎসাহদানে প্রতি বিভাগে যাইতে লাগিলেন এবং যেস্থানে ইংরেজ-সৈন্য দলে দলে অবস্থান করিতেছিল, সেই স্থল লক্ষ্য করিয়া গোলন্দাজগণকে গোলাবর্ষণ করিতে আদেশ দিতেছিলেন। তাঁহার সাহস ও উদ্দীপনা-বাক্যে প্রোৎসাহিত হইয়া বিদ্রোহী-সিপাহীরা অরি-বিভাগে যে প্রচণ্ড আক্রমণ করিল, তাহাতে বহুল ইংরেজ-সৈন্য নিপাতিত হইল। কিন্তু এ সুযোগ বিদ্রোহী-সেনানীদিগের ভীরুতা অকর্ম্মণ্যতায় এবং অরাতির প্রচণ্ড আক্রমণে পরিশেষে তিরোহিত হইল।

নানা-সাহেব বিষণ্ণবদনে রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিলেন এবং কালবিলম্ব না করিয়া কানপুরের বারুদখানা উড়াইয়া দিয়া সেই রজনীযোগেই বিথুরে পলায়ন করিলেন। এইরূপে একচল্লিশ দিন ব্যাপী রাজত্বের অবসান হইল। ১৭ই তারিখে প্রত্যূষে বিজেতারা কানপুরে প্রবেশ করিল; তথায় বিবিগড়ে তাহারা যাহা দেখিল, তাহা বর্ণনাতীত। বৃদ্ধ সৈনিকেরা বালকের ন্যায় রোদন করিয়াছিল। তাহারা সেই শোণিতাপ্লুত স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া ইহার সম্যক্ ও ঘোর প্রতিশোধ লইবে এই প্রতিজ্ঞা করিল।

সপ্তম অধ্যায়।

নানা-সাহেবের পলায়ন।

এদিকে নানা-সাহেব বিথুরে যাইয়া দেখিলেন যে, তাঁহার সহচরগণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতেছে, তাঁহার প্রভাবের হ্রাস হইয়াছে ও অরাতিরা বিথুরে অনতিবিলম্বে আসিবার আয়োজন করিতেছে। এরূপ অবস্থায় বিথুরে অবস্থান অসম্ভব। পেশোয়ার পরিবারবর্গের রক্ষণভার তাঁহার হস্তে নির্ভর করিতেছে। তাঁহাদিগকে কোন নিরাপদ স্থানে লইয়া যাওয়া নিতান্ত আবশ্যক। কিন্তু কি উপায়ে ইংরেজের অজ্ঞাতে ইহাঁদের সহিত পলায়ন করিবেন তদ্বিষয়ে মনোনিবেশ করিয়া, অবশেষে এই চাতুরী উদ্ভাবন করিলেন। তিনি জনসমাজে প্রচার করিলেন যে, গভীর রাত্রে জাহ্নবীর মধ্যভাগে আত্ম-বিসর্জ্জন করিয়া সকল জ্বালা জুড়াইবেন। ইহার এক সঙ্কেতও নির্দ্দেশ করিলেন যে, তাহার নৌকাস্থিত আলোক নির্ব্বাপিত হইলেই তিনি জাহ্নবীজলে নিমগ্ন হইবেন। সেই রাত্রেই তিনি আত্মহত্যা করিবেন। এইরূপ চাতুরীতে সাধারণকে বিস্মিত করিয়া, নানা-সাহেব তাঁহার যাবতীয় মণিরত্নাদি এক বৃহৎ কূপে নিহিত করিলেন। কেবলমাত্র এক বৃহদাকার ক্রিমতীয় চুণি, যদি তিনি কখনও শত্রু কর্ত্তৃক ধৃত হন, তবে গলাধঃকরণ করিয়া আত্মহত্যা করিবেন এই অভিপ্রায়ে সঙ্গে লইলেন। এইরূপ রজনী-মধ্যভাগে নানা-সাহেব এক বৃহৎ নৌকায় তাঁহার পরিবারবর্গকে লইয়া জাহ্নবীর মধ্যভাগে যাইলেন। কিছুক্ষণ পরে তাঁহার নৌকাস্থিত দীপ নির্ব্বাপিত হইলে, নানা-সাহেব প্রাণত্যাগ করিলেন ভাবিয়া তীরস্থ ব্যক্তিরা উচ্চৈঃস্বরে দুঃখ প্রকাশ করিল। কিন্তু নানা-সাহেব অবাধে অপর পারে পৌঁছিয়া নির্ব্বিঘ্নে তাঁহার বিপুল পরিবারমণ্ডলীকে হিমানীমণ্ডিত নেপালে লইয়া যাইতে সক্ষম হন। এইরূপে নানা-সাহেবের অসার ও নিষ্ঠুর রাজত্বের অবসান হয়।

অষ্টম অধ্যায়

প্রতিশোধ।

বিথুর হইতে নানা-সাহেব পলায়ন করিলে পর, নানা-নারায়ণ নামে তাঁহার এক অনুচর হ্যাভেলককে সংবাদ দিলেন যে, বিথুর-প্রাসাদ এখন প্রায় শূন্য, তাঁহারা অবাধে অধিকার করিতে পারেন। ইংরেজের প্রতি অনুরক্তি হেতু এই ব্যক্তি নানা-সাহেব কর্ত্তৃক কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। এক্ষণে নানা-সাহেবের কঠোর শাসন হইতে মুক্ত হইয়া তিনি পুনরায় ইংরেজের শুভানুধ্যায়ী হইলেন। তাঁহার সমাচার মত ১৯শে জুলাই ইংরেজ ও শিখ-সৈন্য বিথুরে প্রেরিত হইল। যে ব্যক্তির শাসন, তাহাদের জাতীয় নারী ও শিশু-সন্তানগণের শোণিতে প্রক্ষালিত হইয়াছে, সেই ব্যক্তির শূন্য প্রাসাদও ইংরেজ-সৈন্যের কিরূপ হৃদয়গ্রাহী হইবে, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। ক্রোধে বিচলিত হইয়া ইংরাজ-সেনানী, সাধারণ সৈনিকগণের অদমনীয় ক্রোধে যোগ দান করায়, বিথুরে যে দৃশ্য পরিলক্ষিত হইয়াছিল, তাহা সংক্ষেপে বর্ণনা করাই শ্রেয়ঃ। বিথুর-প্রাসাদ ও তত্রস্থ শিব-লিঙ্গের মন্দির মুহূর্ত্ত মধ্যে ভস্মাবশেষে পরিণত হইল। নানা-সাহেবের যাবতীয় মহামূল্য পরিচ্ছদ, অলঙ্কার ও নানাবিধ সুন্দর দ্রব্যাদি বিজেতা কর্ত্তৃক বিনষ্ট ও লুণ্ঠিত হইল। শিখগণ সদর্পে বাজিরাওয়ের রাজ-তরবারি অধিকার করিল। ইহার মূল্য প্রায় ৩,০০,০০০ টাকা হইবে। ১৫টী কামান, প্রচুর বারুদ ও রসদাদিও ইংরাজের হস্তগত হইল। এতদ্ব্যতীত কতকগুলি নির্দ্দোষ ব্যক্তিকে তাহাদের জাতীয় ভ্রাতৃগণের ঘোরতর অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ জীবন বিসর্জ্জন করিতে হইয়াছিল। বিথুরের প্রাসাদে কতকগুলি রমণী পরিলক্ষিত হইয়াছিল। ইহারা নানা সাহেবের অতি দূর-আত্মীয়; সুতরাং তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাওয়া হইয়াছিল। ইহাঁদিগকে বন্দী করিয়া ইংরেজ তাঁহাদিগকে জ্ঞাত করিলেন যে, ইংরজের রমণীগণের প্রতি যে সমুদায় দৌরাত্ম্য হইয়াছে, তাহার প্রতিশোধ তাঁহাদের শরীরোপরি লওয়া যাইবে। *

* Ball's History of the Indian Mutiny Vol. 1. 385.

এইরূপে বিথুরে প্রতিশোধ লইয়া ইংরেজ কানপুরের অত্যাচারের প্রতিশোধ লইতে অগ্রসর হইলেন। দুরদৃষ্টবশতঃ এই কঠিন ব্যাপারের ভার নীল সাহেবের হস্তে অর্পিত হইল। অযোধ্যার লক্ষ্ণৌনগরীতে হ্যাভেলকের উপস্থিতি নিতান্ত আবশ্যক হওয়ায় সেই মহানুভব দয়ার্দ্রচেতা সেনানীকে কানপুর পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইল। তাঁহার অনুপস্থিতে নীল সাহেব কানপুরের শাসনভার গ্রহণ করিয়া প্রথমতঃ কানপুর-হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ লইতে মনোনিবেশ করিলেন, তাঁহার উদ্ধত ও হঠ প্রকৃতির পরিচয় পূর্ব্বেই পাওয়া গিয়াছে। এরূপ ভয়ানক সময়ে স্থিরবুদ্ধি ও বিচক্ষণতা নির্দ্দোষ জনগণের নিস্তারের একমাত্র উপায়; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ নীল সাহেবে এই মহোচ্চ গুণগ্রামের কিছুই পরিলক্ষিত হয় নাই। তিনি সাধারণ সৈনিকের ক্রোধের ও প্রতিহিংসার ঘোরতর প্রবর্ত্তক হইলেন। ইহা একেবারে অস্বাভাবিক নহে; বিবিগড়ের লোমহর্ষণ বৃত্তান্ত এখনও যখন কাণে শুনিতে ক্রোধ ও ঘৃণা উৎপাদনে সক্ষম হয়, তখন যাহারা সেই ভয়ানক গৃহাভ্যন্তরে গভীর শোণিত-স্রোত নিরীক্ষণ করিয়াছিল, তাহাদের নিকট একেবারে স্থিরবুদ্ধি ও নিরপেক্ষ-ভাবের প্রত্যাশা করা প্রায় অসম্ভব। তবে যাঁহারা স্বীয় অসাধারণ-বুদ্ধিমত্তা ও প্রগাঢ় রাজশাসন-শক্তিবলে সাধারণ শ্রেণী হইতে অতি উচ্চে স্থাপিত হইয়াছেন, যাঁহাদের নিরপেক্ষ প্রজাপালন কিরীটধারিগণের অনুকরণীয়, তাঁহাদের নিকট এরূপ সময়ে যাহা প্রত্যাশা করা যায়, তাহা কাপ্তেন নীল সাহেবের নিকট প্রত্যাশা করা সম্ভবপর নহে। ১৮৭০ খৃঃ অব্দে জর্ম্মাণ ও ফরাসীগণের ভয়ানক সংগ্রামের পর, যখন পারীনগরী আত্মনিগ্রহে জর্জ্জরিত হয়, তখন "ফ্রান্সের ত্রাণকর্ত্তা" সুবিখ্যাত টিয়র্, বিদ্রোহিগণের প্রতি—যাহারা

তাঁহার প্রাণনাশে বিলক্ষণ প্রয়াস পাইয়াছিল,—যেরূপ সদয় ব্যবহার করেন, নীল সাহেবের নিকট সেরূপ প্রত্যাশা করিতে গেলে, তাঁহাকে অসাধারণ মানবশ্রেণী মধ্যে পরিগণিত করিতে হয়। সে যাহা হউক, নীল সাহেবের প্রতি-হিংসা-বৃত্তি-সাধন-মুখে অধিকাংশ নির্দ্দোষ ব্যক্তির জীবনদীপ নিপার্ব্বিত হইয়া গেল। বিবিগড়ের নরাধম হত্যাকারীরা পূর্ব্বেই পলায়ন করিয়াছিল, তাহাদের ঘোরতর পাপের প্রায়শ্চিত্ত অধিবাসিগণকেই করিতে হইল।

নীল সাহেব কৃষ্ণকায় ব্যক্তিমাত্রকেই বিদ্রোহীর অবতারস্বরূপ অনুমান করিয়া, তাহাদের প্রাণবায়ু ফাঁসি-রজ্জুতে নিঃশেষিত করিতে লাগিলেন। ইহাও তাঁহার মনঃপূত হইল না। ফাঁসি-কাষ্ঠে কৃষ্ণকায়ের শাস্তি কঠোর হইল না এই অনুমানে তিনি কঠোর প্রাণদণ্ডের উপায় উদ্ভাবন করিলেন। কৃষ্ণকায়গণকে প্রথমতঃ বিবিগড়ের শোণিত বলপূর্ব্বক ও নির্দ্দয় কশাঘাতে পরিষ্কার করাইয়া ফাঁসি-কাষ্ঠে লম্বমান ও তৎপরে তাহাদের মৃতদেহ নর্দ্দমায় নিক্ষেপ করা হইত। যদি এবংবিধ অভিনব শাস্তি কানপুর-হত্যাকারিগণের উপর লওয়া হইত, তাহা হইলে পাপের সম্যক্ শাস্তিবিধান করা হইত; কিন্তু কেবল বর্ণদোষ অপরাধে এরূপ শাস্তি, কিরূপ ন্যায়সঙ্গত, আমরা বুঝিতে পারিলাম না। "সিপাহীযুদ্ধ ইতিহাসের" সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক কে সাহেব বলিয়াছিলেন;—"ইহা নিতান্ত ভয়ানক যে, ব্যক্তিগত অপরাধের প্রমাণ না পাইয়াও, স্বেচ্ছাচারে কৃষ্ণকায়গণের বিনাশ, কৌতুকস্বরূপ পরিগণিত হইত।" এদিকে বল্ সাহেব বলিতেছেন যে, "এই ভয়ানক সময়ে আসন্ন-মরণোন্মুখ অধিবাসীরা যেরূপ স্থিরতা ও সাহসের পরিচয় দিয়াছিল, তাহা, যাহারা মহৎ উদ্দেশে প্রাণ বিসর্জ্জন করে তাহাদের উপযুক্ত।" ট্রেভেলিয়ন বলিতেছেন—"এইরূপ প্রতিহিংসার অতি কাহিনী পুরাকালে হোমর রচিত ইউলিসস ও তাঁহার পুত্র টেলিমেকুসের ইথাকা-বাসিগণের উপর অত্যাচার স্মরণ করাইয়া দেয়। এইরূপ প্রতিহিংসায় কত সহস্র প্রাণীর জীবন দীপ নির্ব্বাপিত হয়, তাহার তালিকা নির্ণয় করা দুরূহ; কিন্তু তৎকালীন সংবাদ পত্র মালওয়া গেজেট ও সিন্ধুকসিদ, ইহার এক মোটামুটি সংখ্যানির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহাদের মতে কানপুরে সেই ভয়ানক সময়ে, পুরুষ, রমণী ও শিশু-সন্তান সমেত প্রায় ১০,০০০ ব্যক্তি চির-কালের মত ইহলোক পরিত্যাগ করে। বিজেতারা এই সংখ্যা অতিরিক্ত অনুমান করেন। এ বিষয়ে আর অধিক বাগাড়ম্বর না করিয়া এখন দেখা যাউক, যে ব্যক্তির অন্যায় আচরণে কানপুর শোণিত-স্রোতে প্রক্ষালিত হইল, সেই শঠ ও চতুর নানা-সাহেবের কি হইল। তিনি বিথুর হইতে পলায়ন করিয়া কোনক্রমে তাঁহার পরিবারবর্গকে হিমানি-মণ্ডিত হিমাচলের নিকটে লইয়া যাইতে সক্ষম হন। তাঁহার ঘৃণিত জীবনীর এই স্থলেই অবসান হয়, কিন্তু তাঁহার প্রভাববলে তাঁহার সেনাপতি তান্তিয়াতোপী যে সমুদায় বিস্ময়কর কার্য্যের অবতারণা করেন, তাহা উক্ত সুবিখ্যাত সেনানীর জীবনীর অন্তর্গত।

শ্রীগোপেন্দ্রলাল দে।



বিদ্যাপতি-মঙ্গল।*

পুহপ শয়নময় অরুণ নলিন-যুথি
চম্পক-পঙ্কজ-পাঁতি।
কিংশুক বান্ধুলি পাটল তিলফুল—
মাতল অলিকুলভাতি।
উছল যমুনা কিনারই।
তাপর রাধা মাধব বিহরই।
কো তহি যমুনা— কো পুন মাধব?
কো ফুলশেজ—কো রাই?
ধেই ধেই হাম বুঝই ন পারনু
কো কহু ইহ লমুঝাই।
হরি হরি! চললহুঁ বিদ্যাপতি-পদ
সো লমুঝায়ই পার।
রাই-রসিকবর- ভাব-বিভঙ্গিম
সো সব জানই লার।
সো বিদ্যাপতি মূঢ় হামারি মতি
কিয়ে লমুঝব তছু ভাখী?
পঞ্চানন-বল রাই-কিষণ সোই
তছু মথু অন্তর সাখী।

শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন।

* সচীক বিদ্যাপতি-পদাবলী এ বৎসর বঙ্গবাসীর অন্যতম উপহার গ্রন্থ। টীকার প্রারম্ভে—এই কবিতাটী মঙ্গলাচরণস্বরূপ লিখিত হইয়াছে।

শ্রীশ্রী৺গঙ্গা।

প্রবাহ ও মহিমা।

গঙ্গার বহিঃপ্রবাহ কিন্তু এখন গঙ্গাসাগর পর্য্যন্ত অবিচ্ছেদে নাই। কলিকাতার দক্ষিণ কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত গিয়াই বহিঃপ্রবাহ রুদ্ধ। জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত বর্ত্তমান মজিলপুর প্রভৃতি স্থান এই 'মজা'-গঙ্গার তীরে ও গর্ভে। মজিলপুর নামের মূলেও 'মজা'-গঙ্গার সহিত সম্বন্ধ আছে। গঙ্গার বহিঃপ্রবাহ না থাকিলেও এখনও অনেক শুষ্কক্ষেত্র বা তন্মধ্যস্থ খানিত জল গঙ্গাক্ষেত্র, গঙ্গা ইত্যাদিরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকেন। ঐ সব স্থানেই গঙ্গাযাত্রীকে আনয়ন করা হয়। এ সম্বন্ধে একটী কবিতা আছে, তাহার অর্দ্ধাংশ এই;—

'মজা-গঙ্গাকূলে বিপুলকচুমূলে মৃতবতী
মদীয়াম্বা জম্বূতটনিহিতদেহামৃতমগাৎ।'

গঙ্গার বহু-চিহ্ন বিলুপ্ত, পূর্ব্বতন গঙ্গা-প্রবাহের গর্ভে বড় বড় কচুর ঝাড়, জম্বু আম্র প্রভৃতি বৃক্ষরাজিও স্থানে স্থানে উৎপন্ন হইয়াছে, কিন্তু সে স্থানে মরিলেও গঙ্গামৃত্যু বলিয়া ব্যবহার হয়। এক ধনীর মাতা ঐরূপ স্থলে মরেন; ধনী, এক পণ্ডিত মহাশয়কে গঙ্গামৃতা মাতার শ্রাদ্ধের শ্লোক রচনা করিতে বলিলেন। পণ্ডিত মহাশয়, ধনীর মাতার যে প্রকার গঙ্গামৃত্যু হইয়াছে, তাহা প্রকটিত করিয়া উক্ত কবিতা রচনা করিলেন। কবির মুখে কবিতা যাহাই হউক, ব্যবহার যাহা আছে, তাহা অশাস্ত্রীয় নহে। অন্তঃসলিলবাহিত্ব, ধর্ম্মমীমাংসকগণের স্বীকৃত বস্তু। মহামহোপাধ্যায় রঘুনন্দনের গ্রন্থ হইতে জানা যায়, তাঁহার সময়েও গঙ্গার বহিঃপ্রবাহ গঙ্গাসাগর পর্য্যন্ত অবিচ্ছিন্ন ছিল না। রঘুনন্দন ৪০০ বৎসরের লোক। রাজ-গঞ্জের খাল বা অপর কোন কৃত্রিম খালই গঙ্গার বহিঃপ্রবাহ-বিচ্ছেদের সাক্ষাৎ কারণ। আবার ভাণ্ডারদহের মোহানা (ভাঁড়ার দ'র ম'ন) হইতে সাগর পর্য্যন্ত গঙ্গাপ্রবাহ দেখিতে পাওয়া যায়। ভাণ্ডার-দহের মোহানা, কলিকাতা হইতে বোধ হয় ৪০ ক্রোশের ন্যূন হইবে না।

অন্তঃপ্রবাহ গ্রহণ করিয়া বলিয়াছি, হরিদ্বার হইতে সাগর পর্য্যন্ত গঙ্গার ভৌগোলিক বিস্তৃতি। কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে গঙ্গার ভৌগোলিক বিস্তৃতি হরিদ্বার হইতে গঙ্গাসাগর কেন, আরও উচ্চ স্থান হইতে—বিন্দু-সরোবরের নিকট হইতে। বিন্দু-সরোবর হরিদ্বার হইতে বোধ হয় দুই শত ক্রোশ উত্তর। এই খানেই গঙ্গা শঙ্কর-জটাজূটে এক বৎসর রুদ্ধ ছিলেন; সে সময় জটামধ্য হইতে যে সব জলবিন্দু পতিত

হইয়াছিল, তাহা হইতেই বিন্দুসরোবরের উৎপত্তি। পরে এক বৎসরান্তে এই স্থানেই শিব গঙ্গাকে জটাবন্ধন হইতে মুক্তি দেন; গঙ্গা তখন সপ্তধারায় প্রবাহিত হইলেন। এই সপ্তধারাই ভারতবর্ষে প্রবাহিতা। তন্মধ্যে মধ্য-ধারাই ভাগীরথী গঙ্গা। অপর ছয় ধারার নাম নলিনী, হ্লাদিনী এবং পাবনী; সীতা, চক্ষু এবং সিন্ধু। প্রথমোক্ত তিন ধারা পূর্ব্বাভিমুখী এবং শেষোক্ত তিন ধারা পশ্চিমাভিমুখী। *

আমরা শাস্ত্রে দেখিতেছি, গঙ্গা প্রথমে ত্রিধারায় বিভক্ত হন, একধারা স্বর্গগঙ্গা মন্দা-কিনী, অন্য ধারা পাতালগঙ্গা ভোগবতী, মধ্য-ধারা আবার চার ধারায় বিভক্ত; যথা,—সীতা, অলকনন্দা, বংক্ষু এবং ভদ্রা। ইহার মধ্যে অলকনন্দা মর্ত্ত্যগঙ্গা। অলকনন্দার সপ্তধা ধারা নলিনী, হ্লাদিনী ইত্যাদি। অন্যতম ধারার নাম ভাগীরথী; শাস্ত্রে এবং লোকে তিনিই গঙ্গা, ভাগীরথী, জাহ্নবী ইত্যাদি নামে অভিহিতা।

ভগীরথের আনীতা বলিয়া তাঁহার নাম ভাগীরথী। জাহ্নবী নামের একটী প্রসিদ্ধ ইতিহাস আছে; সেটী এই—

পতিতপাবনী গঙ্গা সগর-সন্তানগণের উদ্ধার-সাধনার্থ মহাবেগে মহাস্রোতে চলিয়াছেন, সম্মুখবর্ত্তী শৈলমালাও বিশীর্ণ হইয়া যাইতেছে; তাঁহার স্পর্শ মাত্র কত শত পাপী পাপমুক্ত হইতে লাগিল; শুভ্রফেন-বিমণ্ডিত-শেখর উত্তাল-তরঙ্গ মহাপ্রবাহ ভীমগর্জ্জনে ছুটিতে ছুটিতে রাজর্ষি জহ্নুর যজ্ঞভূমি প্লাবিত করি-লেন, তপোবলসম্পন্ন জহ্নু যোগপ্রভাবে সেই মহাপ্রবাহ পান করিয়া ফেলিলেন, তখন সেই বিশ্বপ্লাবিনী, জলময়ীমূর্ত্তির চিহ্নও রহিল না। অনন্তর দেবগণের প্রার্থনা অনুসারে জহ্নুমুনি গঙ্গাপ্রবাহকে কর্ণপথ দ্বারা নিষ্কাসিত করিয়া দিলেন। এস্থলে রামায়ণের বর্ণনা বড়ই মনোরম। টীকায় কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম, সংস্কৃতজ্ঞ পাঠকেরা তৃপ্তিলাভ করুন। *

জহ্নুর উদর-নির্গতা বলিয়া তদবধি গঙ্গার নাম হইল জাহ্নবী। তৎপরে কপিল-কোপ-দগ্ধ সগরসন্তানগণের অস্থি গঙ্গাজলে স্পৃষ্ট হইবা-মাত্র তাঁহারা বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন। ভগীরথের সাধনা এতদিনে সফল হইল। দয়াময়ী জননী তদবধি কত পাপীর যে পাপ মোচন করিতে-ছেন, কত পামরকে উদ্ধার করিতেছেন; তাহার সংখ্যা করিতে পারে কে? প্রসঙ্গক্রমে দুইটী উপাখ্যান এ স্থলে উল্লেখ করিতেছি;

* নদীং ভগীরথস্যার্থে তপসোগ্রেণ তোষিতঃ।
ততো বিসর্জ্জয়ামাস সপ্ত স্রোতাংসি গঙ্গয়া॥
স্রোতাংসি ত্রিপথায়ান্তু প্রতাপদ্যন্ত সপ্তধা।
নলিনী হ্লাদিনী চৈব পাবনীচৈব প্রাচ্যগাঃ॥
সীতা চক্ষুশ্চ সিন্ধুশ্চ তিস্রস্তা বৈ প্রতীচ্যগাঃ।
সপ্তমী ত্বনুগা তাসাং দক্ষিণেন ভগীরথম্॥
সপ্ত চৈতাঃ প্লাবয়ন্তি বর্ষন্ত হিমসাহ্বয়ম্ (ভারতম্)॥
* * * *
পাঞ্চালান্ কৌশিকান্ মৎস্যান্ মগধাঙ্গাংস্তথৈব চ।
ব্রহ্মোত্তরাংশ্চ বঙ্গাংশ্চ তাম্রলিপ্তাংস্তথৈব চ।
এতান্ জনপদানার্য্যান্ গঙ্গা ভাবয়তে শুভা॥
মৎস্যপুরাণ, ১২১ অঃ।

* ব্যালোকয়ন্ত তে তত্র গগনাদ্গাঙ্গতাং তদা।
বিমানৈর্নগরাকারৈর্হয়ৈর্গজবরৈস্তদা॥
পারিপ্লবগতাশ্চাপি দেবতাস্তত্র বিষ্ঠিতাঃ।
তদদ্ভুতমিমং লোকে গঙ্গায়াবতরমুত্তমম্॥
দিদৃক্ষবো দেবগণাঃ সমীয়ুরমিতৌজসঃ।
সম্পতদ্ভিঃ সুরগণৈস্তেষাঞ্চাভরণৌজসা।
শতাদিত্যমিবাভাতি গগনং গততোয়দম্॥
শিশুমারোরগগণৈর্মীনৈরপি চ চঞ্চলৈঃ।
বিদ্যোতিরিব বিক্ষিপ্তৈরাকাশমভবৎ তদা॥
পাণ্ডুরৈঃ সলিলোৎপীড়ৈঃ কীর্য্যমাণৈঃ সহস্রধা।
শারদাভ্রৈরিবাকীর্ণং গগনং হংসসংপ্লবৈঃ॥
ক্বচিদ্দ্রুততরং যাতি কুটিলং ক্বচিদায়তম্।
বিনতং ক্বচিদুদ্ভূতং ক্বচিদ্যাতি শনৈঃ শনৈঃ॥
সলিলেনৈব সলিলং ক্বচিদভ্যাহতং পুনঃ।
মুহূরুদ্ধপথং গত্বা পপাত বসুধাং পুনঃ॥
তচ্ছক্রশিরোভ্রষ্টং ভ্রষ্টং ভূমিতলে পুনঃ।
ব্যরোচত তদা তোয়ং নির্ম্মলং গতকল্মষম্॥
তত্রর্ষিগণগন্ধর্ব্বা বসুধাতলবাসিনঃ।
ভবাঙ্গপতিতং তোয়ং পবিত্রমিতি পস্পৃশুঃ॥
আদিকাণ্ড, ৪৩ অঃ।

তন্মধ্যে প্রথমটী স্কন্দপুরাণে বর্ণিত, দ্বিতীয়টী এতদ্দেশের সুপ্রসিদ্ধ প্রবাদ।

১। পূর্ব্বকালে কলিঙ্গ দেশে, বাহীক নামে এক যজ্ঞসূত্রমাত্রধারী লবণবিক্রয়ী ব্রাহ্মণ ছিল। স্নান, সন্ধ্যা, বেদাক্ষরজ্ঞান তাহার কিছুই ছিল না। সেই বাহীকের গৃহে গৃহিণী ছিল, এক বিধবা তন্তুবায়-পত্নী। একদা কলিঙ্গদেশ অত্যন্ত দুর্ভিক্ষপীড়িত হইলে, সেই শূদ্রী, জীবনধারণের উপায় না পাইয়া পতির সহিত সে দেশ হইতে দেশান্তরে গমন করে। ক্ষুধায় কাতর নিঃসহায় বাহীক, পথে দণ্ডকারণ্যের মধ্যে নরমাংসলোলুপ ব্যাঘ্রকর্ত্তৃক নিহত হয়। এক গৃধ্র, তাহার বামপদ লইয়া উড্ডীন হইলে, মাংসাশী অন্য গৃধ্রের সহিত আকাশে তাহার যুদ্ধ হয়। আমিষাভিলাষী গৃধ্রদ্বয় পরস্পর জয়ে উদ্যত থাকিলে, পূর্ব্বোক্ত গৃধ্রের চঞ্চুপুট হইতে বাহীকের বামগুল্ফ নিম্নে গঙ্গাপ্রবাহে পতিত হইল। এ দিকে যে ক্ষণে অরণ্যগত বাহীক-বিপ্র ব্যাঘ্রকর্ত্তৃক নিহত হয়, সেই ক্ষণেই সে পাশপাণি যমকিঙ্করগণ কর্ত্তৃক বদ্ধ হইয়াছিল। বাহীক কশাতাড়িত মর্ম্মভেদক আরাস্ত্র দ্বারা সর্ব্বাংশে ব্যথিত হইয়া মুখ দিয়া রুধির বমন করত, যম-দূতগণ কর্ত্তৃক যমসমীপে নীত হয়।

অনন্তর যমরাজ চিত্রগুপ্তকে জিজ্ঞাসা করি-লেন, 'এই ব্রাহ্মণের ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার করিয়া শীঘ্র বল।' অনন্তর সর্ব্বপ্রাণীর সর্ব্বসময়ের সর্ব্ব-কর্ম্মাভিজ্ঞ বিচিত্রবুদ্ধি চিত্রগুপ্ত, যমুনাভ্রাতা শমন কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া দুর্ব্বৃত্ত দ্বিজ বাহীকের আজন্ম অশুভকর্ম্ম তাঁহার নিকট নিবেদন করিতে লাগিলেন,—পূর্ব্বে ইহার পিতা গর্ভাধানাদি সংস্কার কার্য্য করে নাই; গর্ভপাপশমনহেতু সমস্ত জীবনের সুখকর, জাতকর্ম্মও করে নাই; যে নামকরণ বিধানে বালক সর্ব্বত্র বিখ্যাত হয়, একাদশ দিনে বিধিপূর্ব্বক ইহার সেই নামকরণও করা হয় নাই; ইহার মন্দবুদ্ধি পিতা, বিদেশগমন-নিবারক বিধিপূত নিষ্ক্রামণ-সংস্কারও চতুর্থমাসে শুভ তিথি, শুভ নক্ষত্রাদিতে করে নাই। হে যমরাজ! যে কর্ম্মপ্রভাবে সর্ব্বদা মিষ্ট ভোজন করিতে পাওয়া যায়, সেই অন্নপ্রাশনও ইহার ষষ্ঠমাসে কৃত হয় নাই। যে কর্ম্ম করিলে, কেশ-চয় সুস্নিগ্ধ এবং কুসুমবর্ষী হয়, সেই চূড়াকরণ-সংস্কারও কুলাচারানুসারী বৎসরে করা হয় নাই। কর্ণযুগল যদ্দ্বারা সুশ্রবণ-সম্পাদক এবং সুবর্ণগ্রাহী হয়, সেই কর্ণবেধ কার্য্যও শুভ সময়ে ইহার পিতা করে নাই। হে যম! ব্রহ্মচর্য্যের বৃদ্ধি এবং বেদগ্রহণের হেতুভূত উপনয়ন সংস্কারও অষ্টম বৎসর অতীত হইলে ইহার হইয়াছিল। যে কর্ম্ম করিলে পর পরমাশ্রম গার্হস্থ্যে প্রবিষ্ট হওয়া যায়, সেই সমাবর্ত্তন কার্য্যও ইহার পিতা করে নাই। অনন্তর কুলত্যাগিনী অধ্বচারিণী কোন বৃষলীকে যে কোন প্রকারে এই দ্বিজ বিবাহ করে। এই পরদারাপহারী বৃষলীপতি, পঞ্চম বৎসর হইতে আরম্ভ করিয়া পরস্বাপহারী, দুরাচার এবং দ্যূতক্রীড়াসক্ত হয়। এই দ্বিজ লবণখনির নিকটে থাকিবার সময়, একদা দৃঢ়-দণ্ডপ্রহারে একটী এক বৎসরের গোরুকে মারিয়া ফেলিয়াছিল। এই ব্যক্তি বহুবার মাতাকে পদাঘাত করিয়াছে, পিতার বাক্য-পালন কখন করে নাই। এই কলহপ্রিয় দুর্ম্মতি, (আত্মহত্যার অভিপ্রায়ে) বহু বার বিষভক্ষণ করিয়াছে, পরকে রাজদ্বারে দণ্ডিত করিবে বলিয়া, আপনি আপনার উদর বিদারণ করি-য়াছে এবং ক্রীড়া কলহ মাত্রেও ধুস্তুর করীরাদি উপবিষ সকল বহুবার ভোজন করিয়াছে। হে সূর্য্যপুত্র! এই শিষ্ট-নিন্দিত দুষ্ট পাপিষ্ঠ (আত্ম-ঘাতাদির জন্য স্বেচ্ছাক্রমে) অগ্নিদগ্ধ হইয়াছে, কুক্কুর-ভক্ষিত হইয়াছে, শৃঙ্গিগণ কর্ত্তৃক শৃঙ্গাগ্র-ভাগ দ্বারা বহু স্থলে বিদীর্ণ হইয়াছে, সর্পগণ কর্ত্তৃক অতীব দষ্ট হইয়াছে; কাষ্ঠ, ইষ্টক এবং

লোষ্ট্র দ্বারাও আপনার অনিষ্ট সাধন সদাসর্ব্বদা করিয়াছে। সাধুগণ, সর্ব্বদা যে মস্তকের বহু বার অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, এই দুরাত্মা বারংবার সেই মস্তক কুট্টন করিয়াছে। এই মন্দ ব্রাহ্মণ, গায়ত্রীও জানে নাই; এই দুর্ব্বুদ্ধি, একাকী * ইচ্ছাপূর্ব্বক মৎস্য মাংস ভোজন করিয়াছে। এই ব্যক্তি, নিজের জন্য বহুবার পায়স পাক করিয়াছে। এই মূঢ়, সতত লাক্ষা, লবণ, মাংস, দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, বিষ, লোহ, অস্ত্র, দাসী, গো, অশ্ব, কেশ এবং চর্ম্ম বিক্রয় করিয়াছে। এই দুরাত্মার দেহ শূদ্রান্নপুষ্ট; এ ব্যক্তি, পর্ব্বে এবং দিনে মৈথুন করিত এবং দৈব পৈত্র্য কর্ম্মে পরাঙ্মুখ। এই ব্যক্তি শতাধিক মৃগ পক্ষী বধ করিয়াছে, অকারণ বৃক্ষচ্ছেদন করিয়াছে, ইহার চিত্ত সতত নির্দ্দয়। নিত্য নিজ বন্ধুজনেরও উদ্বেগ উৎপাদন করিত, সর্ব্বদা মিথ্যা কথা, সর্ব্বদা হিংসা ইহার কার্য্য। এ ব্যক্তি, কখন দান করে নাই, পিশুনতা ইহার ধর্ম্ম; এবং শিশ্ন ও উদরই ইহার সার। হে সূর্য্যনন্দন! অধিক কি বলিব, এই ব্যক্তি সাক্ষাৎ পাপমূর্ত্তি; রৌরব, অন্ধতামিস্র, কুম্ভীপাক, অতিরৌরব, কালসূত্র, কৃমিভক্ষ, পূয়শোণিতকর্দ্দম, ঘোরতর অসিপত্রবন, যন্ত্রপীড়, সুদংষ্ট্র, অধোমুখ, পূতিগন্ধ, বিষ্ঠাগর্ত্ত, শ্বভোজন, সূচীভেদ্য, সন্দংশ, লালাভক্ষ এবং ক্ষুরধার, এই সকল প্রত্যেক নরকে এককল্প কাল ইহাকে নিপাতিত করুন। ধর্ম্মরাজ, চিত্রগুপ্ত-মুখে ইহা শ্রবণপূর্ব্বক সেই দুরাচার ব্রাহ্মণকে ভর্ৎসনা করিয়া ভ্রূভঙ্গী দ্বারা কিঙ্করগণকে আদেশ করিলেন। তখন যে স্থানে পাপিগণের আর্ত্তনাদ হইতেছে, কিঙ্করেরা বাহীককে বন্ধন করিয়া, সেই লোমহর্ষণ নরকালয়ে লইয়া গেল। বাহীক অতি তীব্র যাতনা মধ্যে অবস্থিত হইলে, গৃধ্রমুখ হইতে, তৎক্ষণ-পুণ্য-ফল-সম্পাদক নির্ম্মল গঙ্গাজলে, উক্ত দুষ্ট দ্বিজের পাদগুলফ পতিত হয়। তৎকালেই ঘণ্টাবিলম্বিত বহু-দিব্যরমণী-পরিবৃত বিমান, দেবলোক হইতে আসিল। গঙ্গায় অস্থিপতন প্রযুক্ত দ্বিজ বাহীক, দিব্যগন্ধানুলিপ্ত এবং দিব্য-বেশধারী হইয়া দেবযানে আরোহণপূর্ব্বক, অপ্সরোগণের বাজনবাত ভোগ করত স্বর্গভবনে গমন করিল।

২। দরাফখাঁ মুসলমান-বালক, এক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে গোচারণে নিযুক্ত। ব্রাহ্মণের বহুতর গোরু, রাখালও অনেক। রাখালেরা বনে গোরু চরাইতে যায়। দরাফখাঁও গিয়া থাকে। দরাফখাঁর পালের একটা গোরু একদিন হারাইয়া যায়। দরাফখাঁ আপনার গোরুর পাল অপর রাখালের গোরুর পালের সঙ্গে প্রভুর বাড়ীতে পাঠাইয়া দিয়া হারান-গোরু খুঁজিতে আরম্ভ করিল। দিন গেল, সন্ধ্যা গেল, সন্ধ্যার আলোক অপসৃত হইল, দরাফ অনেক খুঁজিয়াও গোরু পাইল না। গোরু না লইয়া প্রভুর বাড়ী যাইতেও সে, সাহসী হইল না। ভীত এবং শ্রান্ত দরাফখাঁ, রাত্রিযাপনের জন্য এক বৃক্ষতল আশ্রয় করিল এবং শীঘ্রই নিদ্রাভিভূত হইল। যখন তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল, তখন শেষ রাত্রি।

"আমি তিন দিন পরেই উদ্ধার হইব, তোমাকে দেখিতেছি ভাই এই গাছে একা থাকিতে হইবে।"

"না, একা থাকিব কেন, কালই এই গাছে আর এক বন্ধুকে লইয়া আসিব।"

"বেশ, বেশ, তা—কোথা হইতে?"

"অমুক ব্রাহ্মণের অমুক রাখালকে আগামী কল্য ষাঁড়ে মারিয়া ফেলিবে, তাহাকেই আমি লইয়া আসিব।"

এ গাছের উপরে দুই ভূতে যে এ সব কথা বলাবলি করিতেছে, দরাফখাঁ তাহা বেশ বুঝিল, কথাগুলিও মনোযোগের সহিত শুনিল।

* দেবতা, পিতৃগণ এবং অতিথিকে না দিয়া।

দরাফখাঁ বালক হইলেও সাহসী। ভূতের উল্লিখিত ব্রাহ্মণ তাহারই প্রভু এবং ভাবি-ভূত রাখালও তাহারই একজন সঙ্গী। দুঃখ, কৌতুক ও বিস্ময়ে তাহার হৃদয় পরিপূর্ণ হইল। কিয়ৎক্ষণ পরেই নৈশ তিমিরের প্রগাঢ়তা দূর হইতে লাগিল, অরুণের উজ্জ্বল আভা পূর্ব্বদিক্ স্পর্শ করিল। দারফখাঁ তখন ধীরে ধীরে উঠিয়া এবং সেই বৃক্ষতলে চিহ্ন রাখিয়া গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল।

গৃহে গিয়া জানিল, তাহার হারান-গোরু বাড়ীতেই আসিয়াছে। প্রভু ব্রাহ্মণও দরাফখাঁর জন্য উদ্বিগ্ন ছিলেন, তাহাকে দেখিয়া তিনি আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

দরাফখাঁ প্রভুকে রাত্রির ঘটনা নিবেদন করিল। সদাশয় প্রভু তাহাতে পরম উদ্বিগ্ন হইয়া ভূত-নির্দ্দিষ্ট রাখালকে সে দিন গোচারণে যাইতে দিলেন না। কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া তাহাকে একটী গৃহে রুদ্ধ করিয়া রাখিলেন।

বেলা দ্বিতীয় প্রহর অতীত; রুদ্ধ রাখালের পালিত দুইটী ভীমকায় বৃষ কি কারণে বিষম ক্রোধে ভীম বিক্রমে অন্তঃপুর-প্রাঙ্গণে প্রবিষ্ট হইয়া পরস্পরের প্রতি ধাবিত হইল। বৃষভদ্বয়ের তর্জ্জন, গর্জ্জন, আস্ফালন, আক্রমণে, শৃঙ্গাঘাত, মুণ্ডাঘাত, জয়-পরাজয়ে সে স্থান অগম্য হইয়া উঠিল। ভীতিগ্রস্ত নরনারীগণ, বালক-বালিকার রক্ষার্থ দ্বাররুদ্ধ গৃহে অবস্থান করিতে লাগিল। ভৃত্যবর্গ এবং স্বয়ং প্রভু সহস্র চেষ্টা করিয়াও বৃষভদ্বয়ের দ্বন্দ্বশান্তি করিতে সক্ষম হইলেন না; বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে লাগিল। রুদ্ধ রাখাল উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া, কাকুতি মিনতি করিয়া বলিতে লাগিল, আমাকে একবার ছাড়িয়া দিন, আমি উহাদিগকে এক ধমকে থামাইয়া দিতেছি। আমি ত কতবার ওরূপ থামাইয়াছি, আজ কেন আমাকে আট্‌কাইয়া রাখিলেন! প্রভু বহুক্ষণ তাহাতে সম্মত হন নাই। পরিশেষে উপায়ান্তর না দেখিয়া প্রভু সেই রাখালকে গৃহ হইতে বাহিরে আনিয়া বলিলেন,—"দেখ, বৃষ দুইটার নিকটে যাইও না, দূর হইতে কোন রকমে থামাইতে পার, থামাও।"

রাখাল সে কথায় উত্তর না করিয়াই চির-অভ্যস্ত সাহস সহকারে, দৌড়িয়া গিয়া বৃষদ্বয়ের নিকটবর্ত্তী হইল। বস্! আর যায় কোথা! নয়তিঃ কেন বাধ্যতে? ক্রোধোন্মত্ত অন্যতর বৃষ সবেগে রাখালের উদর ও নাভিনিম্নে শৃঙ্গাগ্র প্রোথিত করিয়া তাহার প্রাণহরণ করিল। প্রভু অদৃষ্টের কথা ভাবিতে ভাবিতে রাখালের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য উদ্যোগী হইলেন। দরাফখাঁ সবিস্ময়ে সেই বৃক্ষতলে ছুটিল, বৃষদ্বয় ক্ষান্ত হইল, অন্যান্য সকলে বৃষদ্বয়ের কথা ও রাখালের কথা লইয়া আলোচনা করিতে লাগিল। রাখালের যখন মৃত্যু হইল, তখন সন্ধ্যা হয় হয়। দ্রুতগামী দরাফখাঁ বৃক্ষতলে যখন পৌঁছিল, তখনও সন্ধ্যার আলোক আছে। অন্ধকার হইল, দরাফখাঁর হৃদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বৃক্ষ-শাখাগুলি আন্দোলিত হইল, দরাফখাঁ উৎকর্ণ হইয়া রহিল।

"কৈ হে, একা এলে যে, আজ যাহার আসিবার কথা ছিল, সেই বন্ধু কোথা?"

"ভাই হে! সে অপঘাতে মরিল বটে, কিন্তু তাহার উদ্ধার হইয়াছে।"

"কেমন করিয়া?

"যে ষাঁড়টা তাকে মারিয়া ফেলিয়াছে, তাহার শৃঙ্গাগ্রে গঙ্গামৃত্তিকা ছিল। মৃত্যুকালে গঙ্গামৃত্তিকা স্পর্শ হওয়াতেই তাহার সদ্গতি হইয়াছে।"

এই কথোপকথন শুনিয়া মুসলমান-বালক দরাফখাঁর নয়নপথ হইতে যেন একটা ঘোর ঘনান্ধকার সরিয়া গেল, হৃদয়ের যেন একটা

বিষম শক্তিশেল উন্মূলিত হইল। জন্মান্তর-সঞ্চিত-পুণ্য-পুঞ্জশালী জবন-বালক গঙ্গামাহাত্ম্য শ্রবণে পুলকিত হইয়া মনে করিল, "দুই দিনের জন্য, এক মুঠা ভাতের জন্য ঘুরিয়া আর সময় নষ্ট করিব না, যাঁহার এমন দয়া,সেই দয়াময়ী—ভাগীরথীর সেবা করিয়া জীবন সার্থক করিব।" দরাফখাঁ ত্রিবেণীতে আসিয়া গঙ্গারাধনায় নিযুক্ত হইল। কিছুকাল পরে ভক্তবৎসলা ভাগীরথী জবনের প্রতি অনুগ্রহ করিলেন। তখন দরাফ সিদ্ধ-পুরুষ হইলেন। দরাফখাঁর সিদ্ধাবস্থার অনেক অদ্ভুত ইতিহাস প্রচলিত আছে।

"সুরধুনি মুনিকন্যে তারয়েঃ পুণ্যবন্তং
স তরতি নিজপুণ্যৈস্তত্র কিং তে মহত্ত্বম্।
যদি চ গতিবিহীনং তারয়েঃ পাপিনং মাং
তদপি তব মহত্ত্বং তন্মহত্ত্বং মহত্ত্বম্॥"

ইত্যাদি সংস্কৃত পদ্যময় কতিপয় গঙ্গাস্তব এবং—

"হরেঃ কাপি কুঞ্জে তবাঙ্গে সুনীয়া,
"ববৌ দর্দ্দিয়ারজ্ বরীণং চকোবা।"

ইত্যাদি সংস্কৃত ও পারস্য ভাষায় মিশ্রিত গঙ্গাস্তব-পদ্য দরাফখাঁর কৃত বলিয়া প্রসিদ্ধ। ত্রিবেণীর গাজীর কুড়ুল এই দরাফখাঁর স্মৃতি-চিহ্ন, ইহাই জনশ্রুতি। দরাফখাঁ ন্যূনাধিক চারি শত বৎসরের লোক। দৃষ্টান্তস্বরূপে দুইটী উপাখ্যানের উল্লেখ করিলাম।

শাস্ত্র এবং কাল

গঙ্গার কথা যাহাতে নাই, এমন শাস্ত্রই নাই। বেদ, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র, রামায়ণ, মহাভারত এবং আয়ুর্ব্বেদ প্রভৃতি যাবতীয় শাস্ত্রেই গঙ্গার পরিচয় পাওয়া যায়। দিঙ্মাত্র প্রদর্শন করিতেছি;—

(১) "ইমং মে গঙ্গে যমুনে সরস্বতি" ইত্যাদি।
ঋগ্বেদ, ১০ম ম, ৬ষ্ঠ অনু, ৭ম সূ, ৫ম ঋক্।

(২) যমো বৈবস্বতো দেবো যস্তবৈষ হৃদি স্থিতঃ।
তেন চেদবিবাদস্তে মা গঙ্গাং মা কুরুন্ গমঃ॥
মনু, ৮ম অঃ, ৯২।

(৩) শুক্লপক্ষে দিবা ভূমৌ গঙ্গায়ামুত্তরায়ণে।
ধন্যা দেহং বিমুঞ্চন্তি হৃদয়স্থে জনার্দ্দনে॥
স্মৃতি।

(৪) স্নাতুমভ্যাযযৌ তোয়ে জাহ্নব্যা নৃপনন্দন।
মার্কণ্ডেয়পুরাণ।

(৫) যে গচ্ছন্তি স্বতো গঙ্গাংপরাংশ্চ প্রেরয়ন্তি যে।
ইহ তে সর্ব্বভোগানামন্তে জ্ঞানস্য ভাজনম্॥
ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ।

(৬) মাহাত্ম্যং যে চ গঙ্গায়াঃ শৃণ্বন্তি চ পঠন্তি চ।
তেঽপ্যসংখ্যৈর্ম্মহাপাপৈর্মুচ্যন্তে নাত্রসংশয়ঃ।
ভবিষ্যপুরাণ।

(৭) প্রবাহমবধিং কৃত্বা যাবদ্ধস্তচতুষ্টয়ম্।
অত্র নারায়ণঃ স্বামী নান্যঃ স্বামী কদাচন॥
ব্রহ্মপুরাণ।

(৮) গঙ্গায়াং পূজিতায়াস্তু পূজিতাঃ সর্ব্বদেবতাঃ।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন পূজয়েদমরাপগাম্॥
অগ্নিপুরাণ।

(৯) গঙ্গায়াং জ্ঞানতোমৃত্বা মুক্তিমাপ্নোতিমানবঃ।
কূর্ম্মপুরাণ।

(১০) পৌত্রস্তে ত্রিদিবাদ্ গঙ্গাং ভুবমানেষ্যতীতি। তদন্তসা সংস্পৃষ্টেষ্বস্থিভস্মস্বেতে স্বর্গমারোক্ষ্যন্তি। ভগবদ্বিষ্ণুপাদাস্পৃষ্টবিনির্গত-জলস্যৈতাবন্মাহাত্ম্যং যত্র কেবলমভিসন্ধিপূর্ব্বকং স্নানাদ্যুপভোগেষুপকারকম্ অনভিসংহিতমপ্য-পেতপ্রাণস্যাস্থিচর্ম্মস্নায়ুকেশাদ্যুৎসৃষ্টং শরীরজং যদুপতিতং সদ্যঃ শরীরিণং স্বর্গং নয়তি।
বিষ্ণুপুরাণ, ৪র্থ অংশ, ৪র্থ অঃ।

এতদ্ভিন্ন ভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, মৎস্য-পুরাণ এবং স্কন্দপুরাণের প্রসঙ্গ পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। অন্য পুরাণ, উপপুরাণ এবং রামায়ণ আদিকাণ্ড ৪৩শ অধ্যায় ও অযোধ্যাকাণ্ড ৪০শ অধ্যায় প্রভৃতি নানাস্থলে গঙ্গার কথা আছে। মহাভারত বনপর্ব্ব ১০৭ম অধ্যায়ে গঙ্গাবতরণের কথা আছে। তদ্ভিন্ন, আদিপর্ব্ব, শান্তিপর্ব্ব প্রভৃতি নানাস্থলে গঙ্গার মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত আছে।

(১১) "গঙ্গে চ যমুনে চৈব————।"
"গঙ্গাদ্যাঃ সরিতঃ সর্ব্বাঃ————।"
তন্ত্র।

(১২) আসাং নবশতৈর্যুক্তা গঙ্গা পূর্ব্বসমুদ্রগা।
আয়ুর্ব্বেদ—হারীতসংহিতা, সূত্রস্থান।

রামায়ণ এবং স্কন্দপুরাণ প্রভৃতি নানা শাস্ত্রে লিখিত আছে, সাগর গঙ্গাজলে পূরিত। প্রথমে, অশ্বানুসন্ধান-পরায়ণ সগর-সন্তানেরা যে বিশাল ভূভাগ খনন করিয়াছিলেন, গঙ্গাপ্রবাহ তাহাতে পতিত হইয়া পূর্ণ করেন। পরে অগস্ত্য যখন সাগর পান করেন, তাহার পরে সাগরের জল লবণময় হইয়াছে। (রামায়ণ, আদিকাণ্ড ৪৩শ অধ্যায়, ৩৯ শ্লোক ও রামানুজ টীকা দ্রষ্টব্য।)

গঙ্গা পৃথিবীতে যে কতকাল অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহা অবধারণ করিতে যাওয়া এক্ষণে বিড়ম্বনামাত্র। তবে প্রচলিত ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে গঙ্গার অন্তর্দ্ধান-কাল কথিত হইয়াছে।

পশ্চাদ্ ভগীরথানীতা মহীং ভাগীরথী শুভা।
সমাজগাম কলয়া বাণীশাপেন নারদ॥
* * * *
কলেঃ পঞ্চসহস্রঞ্চ বর্ষং স্থিত্বা চ ভারতে।
জগাম তত্র সরিদ্রূপং বিহায় শ্রীহরেঃ পদম্॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, প্রকৃতিখণ্ড, ৭ম অধ্যায়।

ভাবার্থ—পরে ভগীরথ পৃথিবীতে গঙ্গা আনয়ন করেন। গঙ্গা এবং সরস্বতী প্রভৃতি সকলেই কলির পাঁচ হাজার বৎসর গতে পুনরায় বিষ্ণুলোকে গমন করিলেন।

পঞ্জিকায় লিখিত থাকে,—
"কলের্দশ সহস্রাণি বিষ্ণুস্তিষ্ঠতি মেদিনীম্।
তদর্দ্ধং জাহ্নবীতোয়ং————॥"

এক্ষণে কলিগতাব্দ ৫১৯৫ বৎসর। উক্ত প্রমাণ-বলে গঙ্গাস্থিতি আর পাঁচ বৎসর মাত্র এইরূপ ধারণা অনেকেরই হইয়াছে। ফলতঃ কিন্তু গঙ্গার আবির্ভাব-কাল যেমন দুর্নির্ণেয়, অন্তর্দ্ধান-কালও সেইরূপ।

বরাহপুরাণে প্রমাণ আছে,—
"পৃথিবী গঙ্গয়া হীনা ভবিষ্যত্যন্তিমে কলৌ।"

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি এই চারি যুগে এক মহাযুগ বা দৈব যুগ। একাত্তর (৭১) মহাযুগে এক মন্বন্তর। এই মন্বন্তরের শেষ যে কলিযুগ, তাহা অন্তিম কলি। অথবা আরও বহুকাল পরে অর্থাৎ সহস্র মহাযুগে ব্রহ্মার এক দিন। এই ব্রহ্মদিনান্তে যে কলিযুগ, তাহা অন্তিম কলি। এই অন্তিম কলিযুগে পৃথিবী হইতে গঙ্গা অন্তর্হিত হইবেন। এখন সপ্তম মন্বন্তরে অষ্টাবিংশ মহাযুগ যাইতেছে। এই মন্বন্তরের শেষ কলি আসিতে এখনও তেত্রিশ (৩৩) মহাযুগ অবশিষ্ট। আর ব্রহ্মদিনান্তের ত শত শত মহাযুগ অবশিষ্ট আছে। আর পূর্ব্ব বচনে প্রমাণ হইয়াছে,—কলিযুগের পঞ্চসহস্র বৎসর পরে গঙ্গা পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হইবেন। দুই বচনের মিলিত অর্থ হইল,—"অন্তিম কলির পঞ্চসহস্র বৎসর পরে গঙ্গা অন্তর্হিত হইবেন।" নতুবা দুই বচনে বিসংবাদ হয়।

এইরূপ মীমাংসা না করিলে কেবল যে এই পুরাণদ্বয়ের বচনে বিরোধ হয়, তাহা নহে, পরন্তু ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ আপনার কথাও ঠিক রাখিতে পারেন না। এই দেখুন,

শশাপ বাণী তাং পদ্মাং মহাকোপবতী সতী।
বৃক্ষরূপা সরিদ্রূপা ভবিষ্যসি ন সংশয়ঃ॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ, প্রকৃতিখণ্ড, ৬ষ্ঠ অঃ।

সরস্বতী মহাক্রোধে লক্ষ্মীকে শাপ দিলেন, তুমি বৃক্ষরূপা ও নদীরূপা হইবে।

আবার গঙ্গা ও সরস্বতী পরস্পরে পরস্পরকে নদী হইতে শাপ দিলেন।

তৎপরে ভগবান্ নারায়ণ বলিলেন,—

লক্ষ্মীস্ত্বং কলয়া গচ্ছ ধর্ম্মধ্বজগৃহং শুভে।
অযোনি-সম্ভবা ভূমৌ তস্য কন্যা ভবিষ্যসি॥
তত্রৈব দৈবদোষেণ বৃক্ষত্বঞ্চ লভিষ্যসি।
মদংশস্যাসুরস্যৈব চন্দ্রচূড়স্য কামিনী॥
ভূত্বা পশ্চাচ্চ মৎপত্নী ভবিষ্যসি ন সংশয়ঃ।
ত্রৈলোক্যপাবনী নাম্না তুলসীতি চ ভারতে॥
ইত্যাদি।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ, প্রকৃতিখণ্ড, ৬ষ্ঠ অঃ।

লক্ষ্মী! তুমি অযোনিসম্ভবা হইলেও ভূতলে ধর্ম্মধ্বজ রাজার গৃহে তোমাকে যাইতে হইবে, তুমি তাহার কন্যা হইবে। নাম হইবে তোমার তুলসী। সেই জন্মেই তুমি আমার অংশসম্ভূত অসুর শঙ্খচূড়ের পত্নী হইয়া, পরে আমার পত্নী হইবে এবং দৈবদোষে (একাংশে) বৃক্ষরূপা হইবে। ইত্যাদি নানা কথার পর লক্ষ্মী ভগবান্‌কে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

কলয়া তুলসীরূপা ধর্ম্মধ্বজসুতা সতী।
ভূত্বা কদা লভিষ্যামি ত্বৎপাদাম্বুজমচ্যুত॥
বৃক্ষরূপা ভবিষ্যামি তদধিষ্ঠাতৃদেবতা।
মামুদ্ধরিষ্যসি কদা তন্মে ব্রূহি কৃপানিধে॥
ইত্যাদি।

হে অচ্যুত! কিঞ্চিৎ অংশে ধর্ম্মধ্বজ-রাজকন্যা তুলসী হইয়া, পরে কবে আবার আপনার পাদপদ্ম প্রাপ্ত হইব? বৃক্ষরূপা এবং তদধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপা হইলে, কবে আবার আমাকে উদ্ধার করিবেন, হে কৃপানিধে! তাহা আমাকে বলুন। এবং গঙ্গা ও সরস্বতীর মুক্তি কবে হইবে, লক্ষ্মী সে কথাও তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। সেই সব কথার উত্তরে ভগবান্ বলিলেন,—

"কলাংশাংশেন ত্বং গচ্ছ ভারতে কমলোদ্ভবে।
পদ্মাবতী সরিদ্রূপা তুলসী বৃক্ষরূপিণী।
কলেঃ পঞ্চসহস্রে চ গতে বর্ষে চ মোক্ষণম্।
যুষ্মাকং ভবিতা * ভূয়ো মদ্গোহে বা গমিষ্যথ॥

কমলে! তুমি অতি সামান্য অংশে ভারতবর্ষে গিয়া পদ্মাবতী নদী ও তুলসী বৃক্ষ হও। কলির পঞ্চসহস্র বৎসর পরে তোমাদের (গঙ্গা, সরস্বতী এবং তুমি—এই তিন জনের) মুক্তি হইবে, পুনরায় আমার গৃহে আসিবে।

এই সব স্থলে যে কলির পঞ্চসহস্র বৎসরের কথা আছে, তাহাও কল্পশেষে বা মন্বন্তর শেষের যে কলিযুগ, তাহারই পঞ্চসহস্র বৎসর বুঝিতে হইবে।

যে সময়ে গঙ্গা, লক্ষ্মী ও সরস্বতীর অভিশাপ হয়, তাহার আসন্ন পরবর্ত্তী যে কলি, অর্থাৎ অনেকের মতে যাহা বর্ত্তমান কলি, তাহার পঞ্চসহস্র বৎসর এরূপ অর্থ, কোন মতেই নহে। কেন, নহে, তাহার কারণ পূর্ব্বে দেখাইয়াছি।

পরে তুলসী-উপাখ্যানে লিখিত আছে,—

ত্বং প্রিয়া শঙ্খচূড়স্য চৈকমন্বন্তরাবধি।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, প্রকৃতিখণ্ড, ২১শ অঃ।

"হে তুলসি! তুমি এক মন্বন্তরকাল শঙ্খচূড়ের পত্নীত্ব প্রাপ্ত হইয়াছ।"

গোলোকবাসিনী তুলসী গোপী, ধর্ম্মধ্বজ রাজার কন্যা হইলেন। তুলসী গোপী লক্ষ্মীর অংশ বলিয়া, লক্ষ্মীরই শাপভোগ হইতে আরম্ভ হইল। অথবা স্বয়ং তুলসী গোপী এবং লক্ষ্মীর অতি সামান্য অংশে ধর্ম্মধ্বজ-রাজ-দুহিতা তুলসীর জন্ম। বিষ্ণুকে পতিরূপে লাভ করিবার জন্য বহুকাল তপস্যা করিবার পর, তুলসী ব্রহ্মার আদেশে নারায়ণাংশ শাপভ্রষ্ট সুদামা গোপ বিশ্ববিজয়ী অসুর শঙ্খচূড়কে প্রথম বিবাহ

* 'ভবিতা'—পাঠান্তর "সরিতাং" এখানে কেবল সরিৎ শব্দ থাকিলেও ইহার অর্থে নদী ও বৃক্ষ এই দুইই বুঝিতে হইবে। নতুবা লক্ষ্মীর জিজ্ঞাসার সম্পূর্ণ উত্তর হয় না। এমন প্রয়োজনীয় বিষয়ের সম্পূর্ণ উত্তর না পাইলেও লক্ষ্মী সহজে নিবৃত্ত হইতেন না।

করেন। এক মন্বন্তর তাঁহার পত্নী ছিলেন। পরে নারায়ণের অনুগ্রহে দেহত্যাগ করিয়া নারায়ণেরই পত্নী হইলেন, পরিত্যক্ত দেহের কেশসমূহ হইতে তুলসী বৃক্ষের উৎপত্তি হইল। এইরূপে লক্ষ্মী অতিসামান্য অংশে বৃক্ষরূপা হইয়া সরস্বতীর শাপ ভোগ করিতে লাগিলেন।

যখন ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণেই দেখা যাইতেছে, অভিশাপের সময় হইতে লক্ষ্মী এক মন্বন্তর কাল বা তদধিক কাল শাপভোগই করিতেছেন, তখন একটী মাত্র কলিযুগের পাঁচ হাজার বৎসর গতেই তাঁহাদের মুক্তি, এ কথা বলা নিতান্ত অসঙ্গত এবং ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণেরও মত-বিরুদ্ধ। ব্রহ্মবৈবর্ত্তাদি পুরাণের সর্ব্বাংশ পর্য্যালোচনা করিলে ইহা অবগত হওয়া যায় যে, ষষ্ঠ-মন্বন্তরের শেষভাগে বা ষষ্ঠ-মন্বন্তরের শেষ সন্ধি কালে, গঙ্গা সরস্বতীর বিবাদ হয়, তাহার ফল, গঙ্গা, লক্ষ্মী ও সরস্বতীর শাপ। শাপান্ত হয় সকলেরই এক সময়ে, অর্থাৎ সপ্তম মন্বন্তরের অন্তিম কলির পঞ্চসহস্র বৎসরান্তে। পূর্ব্বোক্ত বরাহ-পুরাণ-বচনের তাৎপর্য্যও এইরূপ, ইহা অসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে। সুতরাং গঙ্গা-অন্তর্দ্ধানের এখনও তেত্রিশ মহাযুগ অর্থাৎ বহুকোটি বৎসর বিলম্ব আছে। পঞ্জিকা-কারগণ, শাস্ত্রের মীমাংসা না করিয়া সাধারণ লোককে বড়ই ভ্রমে ফেলিয়াছেন। তাঁহারা বিশেষ বিবেচনা করিয়া নিজ নিজ ভ্রম সংশোধনে চেষ্টা করুন, ইহা আমার সানুনয় অনুরোধ।

তীর্থ-নগরাদি।

ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশীতিথিতে যতদূর পর্য্যন্ত গঙ্গা-জল উঠে, ততটুকু স্থানই গঙ্গাগর্ভ। গর্ভ হইতে দেড় শত হস্ত পর্য্যন্ত গঙ্গাতীর। তীর হইতে দুই ক্রোশ পর্য্যন্ত গঙ্গা-ক্ষেত্র।

"অত্রস্থাস্ত্রিদিবং যান্তি যে মৃতাস্তেঽপুনর্ভবাঃ।"

গঙ্গাক্ষেত্রে যাহাদের বাস, তাহারা স্বর্গে যায়, আর গঙ্গাক্ষেত্রে যাহারা মরে, তাদের পুনর্জ্জন্ম হয় না। গঙ্গাগর্ভ, গঙ্গাতীর ও গঙ্গাক্ষেত্র পরম তীর্থ। আর স্বয়ং গঙ্গা ত তীর্থাদপি তীর্থ মহাতীর্থ। পদ্মপুরাণে লিখিত আছে,—

"তিস্রকোট্যোঽর্দ্ধকোটী চ তীর্থানাংবায়ুরব্রবীৎ।
দিবি ভুব্যন্তরিক্ষে চ তানি তে সন্তি জাহ্নবি॥"

স্বর্গ, আকাশ এবং ভূতলের মধ্যে সাড়ে তিন কোটি তীর্থ আছে বায়ু ইহা বলিয়াছেন। হে জাহ্নবি! সে সকল তীর্থই তোমাতে বর্ত্তমান। এতদ্ভিন্ন হরিদ্বার, কাশী, কালীঘাট প্রভৃতি গঙ্গাসমীপবর্ত্তী নানাতীর্থ এবং গঙ্গা-প্রপাত, প্রয়াগপ্রবাহ, গঙ্গাসরযূসঙ্গম, ত্রিবেণী এবং গঙ্গাসাগর-সঙ্গম প্রভৃতি নানাতীর্থ গঙ্গা-প্রবাহের মধ্যেই সুপরিচিত আছে। পূর্ব্বকালে হস্তিনা, কান্যকুব্জ, প্রতিষ্ঠানপুরী, বারাণসী, মগধরাজধানী পাটলিপুত্র এবং অঙ্গরাজধানী প্রভৃতি নানানগর গঙ্গার কূলে ছিল। এখন হরিদ্বার, ফতেপুর, কনৌজ, কানপুর, এলাহাবাদ, মৃজাপুর, কাশী, পাটনা, মুঙ্গের, ভাগলপুর, মুরশিদাবাদ, কাটোয়া, কালনা, শান্তিপুর, হুগলি, ফরাশডাঙ্গা, কলিকাতা, হাবড়া ইত্যাদি নানানগরের সমাবেশ গঙ্গাতীরে দেখা যায়। গঙ্গাতীরবর্ত্তী দেশসমূহের মধ্যে কাশী, নবদ্বীপ, ভট্টপল্লী, পূর্ব্বস্থলী এবং ত্রিবেণী প্রভৃতি স্থান এখনও পণ্ডিত-সমাজ।

সরযূ, গণ্ডকী, কৌষিকী, যমুনা, সরস্বতী, শোণ, কমলা এবং পদ্মা প্রভৃতি নানা নদ-নদীর সহিত এবং অনেক কৃত্রিম অকৃত্রিম খালের সহিত গঙ্গার যোগ আছে। ভারতব্যাপিনী ভাগীরথী শুধু যে ত্রিলোক পবিত্র করিতেছেন, তাহা নহে, কন্তু লোকের স্বতঃ-পরতঃ প্রাণ-রক্ষণও তিনি করিতেছেন। জলদান, অন্নদান্

এবং অশেষ পাপমোচন এ সকলই গঙ্গার কার্য্য। এমন দয়াময়ী জননী কি আর দেখা যায়! মা! গঙ্গে!

"গঙ্গাগঙ্গেতি যো ব্রূয়াদ্ যোজনানাং শতৈরপি।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি॥"

এমন যে গঙ্গা তিনি শ্রেষ্ঠ, না কাশী; এই প্রশ্নের উত্তরে একটী শ্লোক আছে;—

"যস্যাং শম্ভুর্যা চ শম্ভূত্তমাঙ্গে
শম্ভোরন্যঃ কোঽনয়োর্বেত্তি ভেদম্।
মুক্তিক্ষেত্রং সিদ্ধমেতদ্ দ্বয়ং হি
পঞ্চক্রোশী লক্ষযামা চ গঙ্গা॥"

ভাবার্থ, শম্ভু যাঁহাতে অবস্থিত সেই কাশী, আর যিনি শম্ভুর শিরে অবস্থিত সেই গঙ্গা; এ উভয়ের তারতম্য করা শম্ভু ভিন্ন অপরের কর্ম্ম নহে। তবে ইহা স্থির-সিদ্ধান্তই আছে যে, পঞ্চক্রোশী কাশী এবং লক্ষযোজন গঙ্গা, উভয়েই মুক্তিক্ষেত্র। এই কবিগাথা হৃদয়ে ধরিয়া এক্ষণে বিদায় হই মা!

"সদ্যঃপাতকসংহন্ত্রী সদ্যোদুঃখবিনাশিনী।
সুখদা মোক্ষদা গঙ্গা গঙ্গৈব পরমাগতিঃ॥"

শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন।

মা।

(ঐতিহাসিক ঘটনা।) *

ক্ষণিক-করুণা যাঁর,— এ দেহের অহঙ্কার,
ভাষার প্রথম ভাষ যাঁর মুখ চায়;—
যাঁর স্নিগ্ধ নয়োধনে অস্তিত্ব-বিকাশ মনে,
প্রসূত—পালিত বিশ্ব যাঁর গরিমায়;—
মায়ের স্নেহের সীমা কোথা নিরূপণ,
মা হতে নেহারি সৃষ্টি—জগত এমন!

* "These are facts" :—TARIKH-I TAHIRI. See Sir H. ELLIOT'S Hist of India, Vol I.

কে হেন কেমনে বা বুঝাইতে পারে
মা বিনা, সে মহিমা অপার?
সর্ব্ব-দুঃখ-হর নাম আনন্দ সঞ্চারে
"মা" ব'লে ডাকি মা যতবার।

* * * * *

কঠিন পাঠান-বলে পুনঃপুনঃ রণস্থলে
মোগল-পঙ্কজ-রবি বিজিত যখন,
সের-শা প্রবল অতি হ'ইল দিল্লীর পতি,
লাহোরে না পায় স্থান বাবর-নন্দন;
তবে সিন্ধুদেশ দিয়া পরিত্রাণ পলাইয়া
রাখি' সে গমন-স্মৃতি চির কালিমায়,
নগর—কান্তার করি', গৃহীর সর্ব্বস্ব হরি',
অদৃষ্ট সাগরে সঁপি' পীড়িত প্রজায়।
পরে সিন্ধু-সিংহাসনে যবে বসিলেন
জনক-বিয়োগে—ক্রূরমতি
আরঘান-বংশ-শেষ মিরজা শা-হোসেন,
মরু হ'ল সিন্ধুর বসতি;—
হাহাকার-পূর্ণ দেশ, ক্ষেত্র শূন্যময়,—
কণামাত্র আহারের শস্য না সঞ্চয়—
দুর্ভিক্ষ,—স্মরণে নাম শোণিত শুকায়—
জল স্থল জ্বলে যায় ডরে,
জ্বলিত জঠরানলে আত্মবন্ধু খায়—
পরস্পর না বিচারে নরে।
অবিচ্ছেদ গ্রাসি' দেশ, বিরলে এখন
আপনার অস্থিশেষ করিছে চর্ব্বণ।
পূর্ব্বতট * নগরের শীর্ণ পরিচয়
ভগ্নস্তূপে দু'এক বসতি,—
মগ্ন মনে গণে যেন আপন সময়
লভিতে অন্যের সম গতি!
সুপ্ত যত হাহাকার প্রতিধ্বনি তার
সে শ্মশান-স্থলে মাত্র জাগে যেন আর!
তথা এক গৃহস্থের গাভী অদর্শনে
মিলি' প্রতিবাসিগণ করি' নানা অন্বেষণ
উপনীত নদীতটে গোধন কারণে—
দূরে অস্থি হেরি' বিকীরণ,—
কেহ বলে চিতানল, কেহ বলে নয়,
লক্ষ্য করি' চলে সবে ঘুচা'তে সংশয়।
বনাবৃত সে নিভৃতে হ'য়ে অগ্রসর
নেহারে, বালক চারি
বিকৃত—কৌপীনধারী
নিবিষ্ট রন্ধন-পাত্র ধরি' চুল্লী' পর—
ঝর' নেত্রে বহে বিন্দুবারি;
ভীত অতি অকস্মাৎ জন-সমাগমে
বিপদ বাড়িল দেখি জানিল মরমে।

* Thatta.

নিভৃতে যে ভাবে তারা, দোষী মনে হয়,—
বিশেষতঃ ভীত দরশন!
কহিল গৃহস্থ—"গাভী হরিয়া নিশ্চয়
বধি' হেথা করিছে রন্ধন।"
শুনি' রুষ্ট সেইক্ষণে ধরিয়া বালকগণে
শাসায় সকলে কটুভাষে—
"কোথায় রাখিলি হরি', আন্ গাভী ত্বরা করি';
নহে যা'বি শমন-আবাসে;—
আরে দুষ্টমতিগণ! শিখাইব বিলক্ষণ—
তস্কর-শাসন ভাল জানি;
লুকাইয়া খাবে—আশ প্রাণের নাহিক ত্রাস,—
ধন্য বটে সাহস বাখানি!!"
মলিন বালকগণে—বচন না সরে,
এ উহার মুখ চায় স্তম্ভিত অন্তরে।
উগ্রতর সবে ক্রোধে না শুনি' উত্তর—
"এই চোর ইথে না সন্দেহ,
পীড়নে বিদিত হবে"—প্রহার-তৎপর
বলে—"কোথা গাভী আনি' দেহ।"
তাড়নে বিকল-কায় শোণিত প্রকাশ পায়,
কনিষ্ঠ যে, মূর্চ্ছিত ভূতলে;
বুভুক্ষায় প্রাণ যায়, একিরে জঞ্জাল তায়,
মধ্য দু'টী ভাসে আঁখি-জলে।
সরোদনে জ্যেষ্ঠ—কহে "ক্ষুধায় অন্তর দহে,
নাহি সহে তাহে এ পীড়ন;
কতদিন অনাহার স্মরণ না হয় তার,
প্রহার কি হেতু অকারণ?
গাভী কভু হরি নাই মোরা চারি ভাই,
বিষম পাতকী হায়! মনে ভাবি তাই।"
গৃহস্থ বলিল—"বাক্যে না হয় বিশ্বাস,
ছলা বহু জান অনুমানি;
কি কর রন্ধন—যদি প্রাণে অভিলাষ—
অকপটে কহ সত্যবাণী।"
দু'নয়নে অশ্রুনদী— "সে দুঃখ শুনিবে যদি"—
কহিল বালক যুড়ি কর—
"নানাবিধ উৎপীড়নে বাস ছাড়ি' ফিরি বনে
মাতৃ সনে চারি সহোদর।
দিন যায় অনাহারে, মাতা না সহিতে পারে,
শিশু ভাই কাঁদে উভরায়;
ফল-পাতা বনে নাই, মা'র মুখ পানে চাই
অশ্রুমুখে জননী ভুলায়।
পরে একদিন মুখ চুমি বারবার
কহিল জননী—"শুন আছে প্রতিকার।"
প্রতিকার ভাবি' সবে উৎসুক হৃদয়ে
চাহিলাম মা'র মুখ পানে,
বসিল মা সবাকারে নিজ অঙ্কে ল'য়ে
অশ্রুসিক্ত বিমল বয়ানে।
চুমি মুখ ঘন ঘন আদরে জননী
কহিল—"জীবনে নাথ নাহি যাদুমণি!
অনাহারে হেন মতে রবে কতদিন—
মা হ'য়ে হেরিব কত আর?
নয়ন-জুড়ান মুখ সতত মলিন
সোণা মোর হয়েছে অঙ্গার;—"

* * * * * *

প্লাবিত নয়ন—বাক্যে বলিতে না পারে—
কত অশ্রুসিক্ত মাতা করিল সবারে—
"অতি শ্রান্ত দেহ মম রয় কি না রয়"—
কহিল জননী অবশেষে—
"আমারে মারিয়া তোরা করবে সঞ্চয়
রক্ষা পাবি এ বিষম ক্লেশে।"
পশুর ঘৃণিত হেন কে আছে সন্তান,
ক্ষুধায় আহুতি দিবে জননীর প্রাণ?
কে সম্মত হবে তায়, সে দিন না ক্ষুধা পায়;—
হেন মতে দিনত্রয় যায়।
শিশু ভাই ক্রমে ক্ষীণ, উত্থান-শকতি-হীন,
মুমূর্ষায় আচ্ছন্ন ধরায়।
বুঝি না সহিল প্রাণে, বসিল মা সেইখানে,—
রুদ্ধশ্বাসে সঙ্কল্প মরণ!
মুছায়ে নয়ন-বারি মিলাইয়া ভাই চারি
করে করে করি সমর্পণ!"

* * * * *

ব্যথিত অগ্রজে হেরি'—ভগ্ন কণ্ঠস্বর,
প্রকাশে সজল-আঁখি তৃতীয় সোদর—
"নিমেষের মাত্র চারি ভাই,
আপনি মরিল মাতা মোরা মারি নাই,—
তবে তাঁর খান বন্ধ করি' কয়জনে
ধরেছিনু সে কেবল মায়ের বচনে;—
তখন কে জানে শেষে এত হবে ছাই!
ওই যে অনল-মাঝে পাকপাত্রে জ্বলে
কৃতজ্ঞতা নক্ষয় যা করেছি বিরলে;
কে বা মায়ে মুখে দিবে, ভাবিয়া না পাই!
সংশয় না যায় যদি, হের বিদ্যমান,
অদূরে পতিত হায় প্রত্যক্ষ প্রমাণ।"

* * * *

শিহরিল সর্ব্বজন,— অহো দৃশ্য কি ভীষণ!—
পরিত্যক্ত শোণিতাক্ত যথা অন্ত্রচয়।*
"খাদ্য তরে এ বিজনে বধি' কোন গ্রাম্যজনে
ভয়ে ভুলাইতে এবে অন্যমত কয়,—
সাক্ষাৎ পিশাচ-সুত বালক এ নয়!!"

* Entrails—নাড়ী-ভুঁড়ি।

এতেক বিচারি' সবে ক্রোধে ক্ষিপ্তপ্রায়
প্রহারে বালক চারি, আকুল নয়নে বারি
"মা মা" রবে ধূলায় লুটায়,—
"কোথা মা—রাখ মা আসি' প্রাণ বাহিরায়!"
সহসা টলিল কিবা প্রকৃতির গতি—
কাঁপিল অনন্ত-ফণা বসুধা সংহতি—!
সহসা সে দিক দশে ভাসায়ে বিস্ময়-রসে
ভূপতিত অস্ত্রচয় উগরি' শোণিত,
সচঞ্চল শিরা ভরে আসিয়া কাতরে ধরে
জড়াইয়া প্রহারক-পদ আচম্বিত!
* * * *
অসম্ভব একি হয় প্রত্যক্ষ প্রত্যয়!
চকিতে স্থগিত সবে, জ্ঞান-বুদ্ধি-লয়;—
তন্মধ্যে প্রাচীন এক কহে সম্বোধিয়া—
"কি আশ্চর্য্য অদ্ভুত ঘটন!
বালক-বর্ণন সত্য,—দেখহ বুঝিয়া
মায়ের মহিমা সর্ব্ব জন।
সুতের রোদনে চিত মমতায় বিচলিত
মৃত লোক হ'তে মাতা ফিরে ধরা'পরে,
সন্তান-কল্যাণ আশে ব্যাকুল নীরব-ভাষে
মার্জ্জনা মাগিছে পদে ধরিয়া কাতরে!
সর্ব্ব-হর কাল হারে আবরিতে স্নেহাধারে—
মৃত তবু স্নেহদৃষ্টি অটুট যাঁহার,
মা বিনা পতিত জীবে এত দয়া কার!!"

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ দত্ত।

গড়িয়ার যুদ্ধ

বা

আলীবর্দ্দীখাঁ কর্ত্তৃক বাঙ্গালা অধিকার।

১৬৯৭ খৃষ্টীয় অব্দে সম্রাট আওরঙ্গজেবের পৌত্র সুলতান-আজীমউলশান বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার নাজিম এবং ১৭০১ অব্দে মুরশিদ-কুলি-জাফরখাঁ নামক মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ সন্তান বাঙ্গালার দিবান হইয়া আসেন *। এযাবৎ সুবে-বাঙ্গালার

* দিল্লীর বাদশাহ আকবর-শাহ তাঁহার শাসনাধীন ও অধিকৃত সাম্রাজ্য কয়েকটি সুবেতে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক সুবে এক এক জন নাজিম ও এক এক

রাজধানী ঢাকায় (জহাঙ্গীর-নগরে) ছিল। আরাকাণবাসী (মগ) ও পর্ত্তুগিজ দস্যুদিগের দৌরাত্ম্য নিবারণ জন্য ১৬০৮ খৃঃ অব্দে সেখ-আলাউদ্দিন-ইসলাম-খাঁ রাজমহল হইতে ঢাকা নগরে রাজধানী পরিবর্ত্তিত করেন *। এক্ষণে উহাদের উপদ্রব প্রশমিত হইয়াছে এবং কলিকাতায় ও কাশিমবাজারে ইংরেজ, চন্দননগরে ফরাসি এবং চুচড়ায় ওলন্দাজ বাণিজ্য-কুঠি স্থাপন করিয়াছে †। এই বৈদেশিক বণিক্-দিগের গতিবিধি দর্শন করিয়াই বোধ হয়

জন দিবানের (দেওয়ানের) শাসনাধীন করেন। দিবান রাজস্ব আদায় করিতেন এবং আয়ব্যয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিতেন। নাজিমের প্রতি দেশরক্ষা ও শান্তিরক্ষার ভার ছিল, এবং তাঁহার অধীনে সৈন্য ও শান্তিরক্ষকগণ থাকিত। দিবান কানুনগুদিগের সাহায্যে রাজস্ব সংগ্রহ করিতেন। নাজিম প্রভৃতি সম্রাট-নিযুক্ত রাজকর্ম্মচারীরা রাজকীয় ক্ষমতার অপব্যবহার করিতে না পারেন, এই নিমিত্ত, তাঁহাদের চরিত্র ও রাজকার্য্য-বিষয়ক বিবরণী প্রতিদিন বাদশাহের নিকট প্রেরণ করিবার জন্য স্থানে স্থানে এক এক জন কর্ম্মচারী নিযুক্ত ছিল। এতদ্ব্যতিরেকে এরূপ কঠোর ব্যবস্থাও ছিল যে, এই সকল রাজকর্ম্মচারীর যে কেহ যথা-সম্ভব সম্পত্তির অতিরিক্ত সম্পত্তি উপার্জ্জন করিবেন তাঁহার সেই অতিরিক্ত সম্পত্তিতে সম্রাটের স্বত্ব হইবে। দিবান নাজিমের অধীন ছিলেন না।

* পর্ত্তুগিজ ও মগ দস্যুদিগকে দমন করিবার জন্য সাত শত রণতরি, কতকগুলি বজ্‌রা, অস্ত্রশস্ত্র ও সৈন্য-রক্ষার বন্দোবস্ত ছিল। এই রণতরি প্রভৃতি "নাওরা" নামে অভিহিত হইত। যে সকল ভূ-সম্পত্তি নাওরার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ নির্দ্দিষ্ট ছিল, সেই সকলকে "নাওরা-মহাল" বলা হইত।

† আর্দো পর্ত্তুগিজেরা ভারতবর্ষে বাণিজ্যার্থ আগমন করিয়া উহার কতক স্থান অধিকার করে। ১৪৯৮ খৃঃ অব্দে ভাস্ক-ডি-গামা নামক জনৈক পর্ত্তুগিজ দ্বারা উত্তমাশা-অন্তরীপ হইয়া ভারতবর্ষে আগমনের পথ আবিষ্কার হওয়াতে, পর্ত্তুগিজ জাতি, শতাধিক বৎসর কাল, এতদ্দেশে নির্ব্বিবাদে বাণিজ্য করিয়া আসিতে ছিল। তৎপর দিনেমার জাতি ভারতবর্ষে আগমন পূর্ব্বক পর্ত্তুগিজদিগের বাণিজ্য অনেকাংশে লোপ করিয়া আপনাদের বাণিজ্য বিস্তার করিল। তৎপরে ইংরেজ-বণিকেরা ১৬০০ খৃঃ অব্দে ইংলণ্ডেশ্বরী এলিজাবেথ হইতে উত্তমাশা অন্তরীপের অন্তরে ও মাগেলান

মুরশিদকুলিখাঁ ১৭০৪ খৃঃ অব্দে মুক্‌শদাবাদে স্বীয় বাসস্থান নির্ম্মাণ করিলেন এবং আপনার নামানুসারে উক্ত নগরের নাম মুরশিদাবাদ রাখিলেন *। ১৭০৭ খৃঃ অব্দে সম্রাট্ আওরঙ্গজেবের মৃত্যু হইলে বাহাদুর-শাহ তৎপরে ১৭১২ খৃঃ অব্দে জহান্দারশাহ এবং তৎপর ১৭১৩ খৃঃ অব্দে সুলতান-আজীম-উলশানের পুত্র ফর্‌রুখসিয়র দিল্লীর বাদশাহ হন। ফর্‌রুখশিয়র বাদশাহ হইয়া মুরশিদকুলি-খাঁকে বাঙ্গালা ও উড়িষ্যার নাজিমের পদ প্রদান করেন। এই হইতেই সুবে-বাঙ্গালার (বাঙ্গালা ও উড়িষ্যার) নাজিম ও দিবান এই উভয় পদ এক ব্যক্তির আয়ত্ত হয়। †

প্রণালীর পূর্ব্বদিকস্থ আসিয়া, আফ্রিকা ও আমেরিকায় নির্ব্বিরোধে বাণিজ্য করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইয়া "লণ্ডন-ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানি" নামে এক বণিক-সমিতি গঠন করে। ১৬৯৮ খৃঃ অব্দে "ইংলিশ-ইষ্ট্-ইণ্ডিয়া-কোম্পানি" নামে অপর এক কোম্পানি গঠিত হইয়া ভারতবর্ষে বাণিজ্যার্থ আগমন করে। কিন্তু প্রতিযোগিতা বশতঃ বাণিজ্যের ক্ষতি হয় দেখিয়া, উহার দশ বৎসর পরে, উক্ত উভয় কোম্পানি সম্মিলিত হইল। ফরাসি জাতিও ১৬০৪ খৃঃ অব্দে "ইষ্ট্-ইণ্ডিয়া কোম্পানি" নামে এক বণিক-সমিতি গঠন করিয়া ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করে।

* মুরশিদাবাদ ১৭০৪ খৃঃ অব্দ হইতে ১৭৭২ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত বাঙ্গালার রাজধানী ছিল। ১৭৯৩ খৃঃ অব্দে লর্ড-কর্ণওয়ালিস সদর-নিজামত-আদালত মুরশিদাবাদ হইতে উঠাইয়া কলিকাতায় লইয়া আসিলে এই নগর হতশ্রী হইতে আরম্ভ হয়। ১৮৫৯ খৃঃ অব্দে ইহার দৈর্ঘ্য ৫ মাইল ও পরিসর ২॥ মাইল ছিল। এই সনে কার্নেল-ক্লাইব লিখেন যে,—"মুরশিদাবাদের বিস্তার, লোকসঙ্খ্যা ও ঐশ্বর্য্য লণ্ডন নগরের সমতুল্য হইবে। তবে প্রভেদ এই, মুরশিদাবাদের ন্যায় লণ্ডন নগরে তত অধিক ধনবান্ লোক নাই। যদি মুরশিদাবাদের অধিবাসীরা তত্রত্য য়ুরোপীয়দিগকে সমূলে ধ্বংস করিতে ইচ্ছা করে, তবে কেবল যষ্ঠি ও লোষ্ট্রের সাহায্যেই তাহা করিতে পারে।" মুরশিদাবাদের পূর্ব্ব নাম মক্‌সুদাবাদ বা মক্‌সুশাবাদ। তাহারও পূর্ব্ব নাম কোলারিয়া। তায়েকেন্থলার বলেন আর্দো আকবর-শাহ কর্ত্তৃক এই নগর স্থাপিত হয়।

† যখন এক ব্যক্তিই নাজিম ও দিবান এই

মুরশিদকুলি-জাফরখাঁ * তাঁহার একমাত্র কন্যা জিনৎউন্নিসা-বেগম ওরফে নফিসা-বেগমকে সুজাউদ্দৌলা ওরফে সুজাখাঁর † সহিত পরিণয়সূত্রে বদ্ধ করেন ‡। ১৭২৫ খৃঃ অব্দে মুরশিদকুলি-জাফরখাঁর মৃত্যু হয়। তিনি আপন দৌহিত্র (সুজাখাঁর পুত্র) সরফরাজ-খাঁকে সুবে-বাঙ্গালার সুবেদার মনোনীত করিয়া যান। কিন্তু সুজা-খাঁ পূর্ব্বেই দিল্লী হইতে নিজ নামে সুবেদারি-সনন্দপত্র আনাইয়াছিলেন, সুতরাং শ্বশুরের মৃত্যু হইলে মুরশিদাবাদে যাইয়া মসনদে ** অধিরোহণ করেন।

উভয় পদে নিযুক্ত হন, তখন তাঁহাকে সুবেদার কহে। মুরশিদকুলি-জাফরখাঁ হইতে মীরজাফর পর্য্যন্ত সকলেই সুবে-বাঙ্গালার সুবেদার ছিলেন। ১৭৬৫ খৃষ্টীয় অব্দের ১২ই আগষ্ট তারিখে লর্ড-ক্লাইব বাদশাহ-শাহ-আলম-সানির নিকট হইতে বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকা কর দিতে স্বীকার করিয়া কোম্পানির নামে বাঙ্গালা বিহার ও উড়িষ্যার দিবানি পদ গ্রহণ করেন। সুতরাং মীরজাফরের পুত্র নাজিম-উদ্দৌলা নবাবি পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেও কেবল সুবে-বাঙ্গালার নাজিম নামে পরিচিত হইলেন। এই হইতেই মুরশিদাবাদের সুবেদার-বংশীয়েরা নবাব-নাজিম উপাধি-গ্রস্ত হইয়াছেন।

* মুরশিদকুলিখাঁর পূর্ব্ব নাম বা উপাধি;—মুরশিদকুলি, মোআতিমন-উল-মুল্‌ক্, আলা-উদ্দৌলা, জাফরখাঁ-নাসিরি, নাসিরজঙ্গ।

† খাঁ।—ভারতবর্ষের বাদশাহগণ যে সকল উপাধি বিতরণ দ্বারা বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগকে সম্মানিত করিতেন, তন্মধ্যে "খাঁ" উপাধি সর্ব্বাপেক্ষা সম্মানসূচক ছিল। কিন্তু যখন পাঠানেরা নিজ নিজ নামের শেষে জাতীয় পার্থক্য জ্ঞাপক "খাঁ" শব্দ ব্যবহার করিতে লাগিল, তখন "খাঁ" উপাধি একটু পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক হইয়াছিল। তখন শুধু "খাঁ" উপাধি প্রযুক্ত না হইয়া "আলী-খাঁ" এরূপ উপাধি প্রযুক্ত হইত।

‡ জিনৎ-উন্নিসা বেগমের গর্ভে সুজাখাঁর মির্জা-আলাউদ্দৌলা-সরফরাজখাঁ নামে এক পুত্র এবং দুইটি কন্যা জন্মে। প্রথমা কন্যাকে সৈয়দ-রেজাখাঁ এবং দ্বিতীয়া কন্যা দুর্দ্দনা-বেগমকে মির্জা লতিফউল্লা-মুরশিদকুলিখাঁ বিবাহ করেন। এই মুরশিদকুলি খাঁ ঢাকার ও পরে উড়িষ্যা নায়েব-সুবেদার নিযুক্ত হন।

** মসনদ্।—দরবার গৃহের উৎকৃষ্ট স্থানে ৬ ফুট লম্বা ও ৪ ফুট চৌড়া এক গালিচা বিছান হইত। উহার উপরে ১ ইঞ্চি পুরু এক গদি পাতা থাকিত। গদির

সুজা-খাঁ * বিচার কার্য্যে সর্ব্বতোভাবে পক্ষপাত-হীন ছিলেন। কিন্তু অত্যধিক ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্রতা তাঁহার প্রধান দোষ ছিল। এমন কি এককালে চারি ঘণ্টাও তিনি স্ত্রী-সহবাস ব্যতিরেকে অতিবাহিত করিতে পারিতেন না। এই কারণে তাঁহার সহধর্ম্মিণী জিনৎউন্‌নিসা-বেগম তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্ব হইতেই পুত্র সরফরাজখাঁ সহ পিতৃগৃহে বাস করিতেন।

মুরশিদকুলিখাঁর সুবেদারি সময়ে সুজাখাঁ যখন উড়িষ্যার নায়েব-সুবেদার ছিলেন, তখন মির্জ্জা-মহম্মদ † নামে এক ব্যক্তি তাঁহার দুই পুত্রসহ কর্ম্মপ্রার্থী হইয়া সুজাখাঁর নিকট উপস্থিত হন। পুত্রদ্বয়ের জ্যেষ্ঠের নাম হাজি-আহম্মদ ‡ এবং কনিষ্ঠের নাম মির্জ্জামহম্মদ-আলী। এই মির্জ্জা-মহম্মদ-আলীই উত্তর-কালে আলীবর্দ্দীখাঁ এবং মহাবৎজঙ্গ উপা-ধিতে পরিচিত হন। মির্জ্জা-মহম্মদের পত্নী সুজা-খাঁর আত্মীয়া ছিলেন। মির্জ্জা-মহম্মদ বাদশাহ আওরঙ্গজেবের পুত্র মহম্মদ-আজীম-শাহের অধীনে কর্ম্ম করিতেন। ১৭০৭ খৃঃ অব্দে আজীমশাহের মৃত্যু হইলে কর্ম্মচ্যুতি নিবন্ধন নানা দুর্দ্দশায় পড়িয়া মির্জ্জা-মহম্মদ ১৭১৯ খৃঃ অব্দে সুজা-খাঁর সাহায্যপ্রার্থী হইলেন। সুজা-খাঁ হাজি-আহম্মদ ও মির্জ্জা-মহম্মদ-আলীকে আপনার অধীনে কোন সামান্য কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন *। ইহাঁদের কার্য্যপটুতা দর্শন করিয়া সুজা-খাঁ ইহাঁদিগকে শীঘ্রই কোন উচ্চ-তর কর্ম্ম প্রদান করিলেন। হাজি-আহম্মদ হইতেও মির্জ্জা-মহম্মদ-আলীর কার্য্যতৎপরতা অধিক ছিল। সুজা-খাঁ এই শেষোক্ত ব্যক্তির প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া বাদশাহের অনুমতি ক্রমে "তাঁহাকে মহম্মদ-আলীবর্দ্দী-খাঁ" এই উপাধি দিয়া সম্মানিত করেন। মুরশিদ-কুলিখাঁর মৃত্যুর পর সুজা-খাঁ সুবে-বাঙ্গালার সুবেদার হইলে হাজি-আহম্মদ এবং মির্জ্জা-মহম্মদ-আলী (এক্ষণ হইতে আমরা এই শেষোক্ত ব্যক্তিকে আলীবর্দ্দী-খাঁ নামেই সম্বোধন করিব) তৎসমভিব্যহারে মুরশিদাবাদে আগমন করিলেন। সুজা-খাঁ রাজ-কার্য্য সুনির্ব্বাহার্থ রায়রাঁয়া-আলমচাঁদ, † জগৎশেঠ-ফতেচাঁদ, ‡ আজি-আহম্মদ, আলীবর্দ্দী-খাঁ প্রভৃতি কতিপয় সুবিজ্ঞ ব্যক্তি দ্বারা এক মন্ত্রিসভা গঠন করি-লেন। নবাব * ইহাঁদের পরামর্শ গ্রহণ করিয়াই রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। তিনি বিচার কার্য্য

উপরে নানাবিধ কারুকার্য্যযুক্ত এক আস্তরণ, আস্ত-রণের উপরে পশ্চাৎদিকে মূল্যবান্ বস্ত্রমণ্ডিত একটী তাকিয়া ও দুই পাশে দুই যোড়া ছোট ছোট বালিশ থাকিত। নবাব ঐ তাকিয়ার হেলান দিয়া বসিতেন। ইহাই মস্‌নদ্। মস্‌নদের সম্মুখে কিঞ্চিৎ বামদিকে মখমলের খাপের মধ্যে তরবার এবং কিঞ্চিৎ দক্ষিণ দিকে কাটারি সঙ্গীন প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র স্থাপিত থাকিত। সম্মুখে চারি ভাজ করা একখান কেমব্রিকের রুমাল ও চিঠি খুলিবার জন্য একখান ছুরি এবং মসনদের উপর পানের খিলি পরিপূর্ণ পানদান ও একখান রুমাল থাকিত।

* সুজাখাঁর পূর্ণ নাম বা উপাধি;—নবাব শেস্তাভিমন্-উলমুল্ক, সুজাউদ্দৌলা, সুজাউদ্দীন-মহম্মদ-খাঁ, বাহাদুর, আসদ্‌জঙ্গ। সুজাখাঁ দক্ষিণাবর্ত্তের বর-হামপুর নগরবাসী। ইনি ইরানের (পারস্যের) অন্তর্গত খোরাশান্ প্রদেশেস্থ তুরক্-জাতীয় আক্‌নার বংশীয় ছিলেন।

† মির্জ্জা।—মির্জ্জা শব্দ আদৌ 'মীরজা' লিখিত হইত। ইহার অর্থ মীরের (সৈয়দের) পুত্র। সৈয়দ বংশীয় পিতার ঔরসে ও মোগল বংশীয়া মাতার গর্ভে জাত সন্তান 'মীরজা' আখ্যা প্রাপ্ত হয়। এই মীরজা শব্দে অপভ্রংশ হইয়া মির্জ্জা হইয়াছে। মোগল সন্তানের নামের পূর্ব্বে মির্জ্জা, আকা বা আগা, কিংবা নামের শেষে বেগ শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। এই বেগ শব্দেরই স্ত্রীলিঙ্গ বেগম।

মির্জ্জা মহম্মদের স্ত্রী আফ্‌সার বংশীয়া ছিলেন।

‡ হাজি।—যে মুসলমান মক্কা তীর্থ পর্য্যটন করিয়া আইসে, সেই হাজি বলিয়া উক্ত হয়। 'হজ' শব্দের অর্থ তীর্থযাত্রা।

* লুক-স্কাক্‌টন সাহেব বলেন যে, আলীবর্দ্দী সুজা-খাঁর 'হুকাবরদার' ছিলেন।

† রায়রাঁয়া।—বাদশাহি আমলে যে হিন্দু প্রধান মন্ত্রীর পদ প্রাপ্ত হইতেন, তিনি রায়রাঁয়া উপাধি পাইতেন।

আলমচাঁদের পূর্ণ নাম দিবান-আলমচন্দ্ররায়-রায়-রাঁয়া। ইহাঁরই পুত্র কিরাতচাঁদ (রাজা কীর্ত্তিচন্দ্র) নবাব আলীবর্দ্দীখাঁর দিবান ছিলেন।

‡ জগৎশেঠ।—রাজপুতনার অন্তর্গত যোধপুরের অধ্যস্থ নগর নামক শহরে এই শেঠদিগের আদিম নিবাস। ইহাঁরা শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ী জিনপন্থী রাজপুত মারবারি। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইহাঁদের পূর্ব্বপুরুষ হীরানন্দ সাহু (সাধু) অর্থোপার্জ্জন উদ্দেশ্যে স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া পাটনায় আগমন করেন। হীরানন্দের সাত পুত্র জন্মে। ইহাঁরা সকলেই পিতৃ-ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া ভারতবর্ষের নানা স্থানে মহাজনি কারবার করিতে থাকেন। সর্ব্বজ্যেষ্ঠ মাণিক-চাঁদ ঢাকায় যান। তখন ঢাকা সুবে-বাঙ্গালার রাজ-ধানী ছিল। ১৭০৪ খৃঃ অব্দে মুরশিদকুলিখাঁ মুরশিদা-বাদে রাজধানী পরিবর্ত্তিত করিলে মাণিকচাঁদ মুর-শিদাবাদে আইসেন। সকল কার্য্যেই মাণিকচাঁদ মুরশিদকুলির প্রধান পরামর্শদাতা ছিলেন। নবাব মাণিকচাঁদের সাহায্যেই বাঙ্গালার রাজস্বের নূতন হিসাব প্রস্তুত করেন। মাণিকচাঁদের আয়ত্তে অত্যধিক পরিমাণ মুদ্রা সঞ্চিত থাকাতেই নবাব-মুরশিদকুলিখাঁ মুরশিদাবাদে অনায়াসে টাকশাল স্থাপন করিতে পারিয়াছিলেন। ১৭১৫ খৃঃ অব্দে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানি ঐ টাকশাল উঠাইয়া দেন। মুরশিদকুলিখাঁ মাসিক কিস্তিতে মালগুজারি গ্রহণের নিয়ম করেন। জমি-দারেরা মাণিকচাঁদের নিকট মালগুজারি দাখিল করিতেন; সুবেদার ঐ রাজস্ব হইতে বাদশাহের পেশ্‌-কোশ্ দেড় কোটি টাকা মাণিকচাঁদের দ্বারা হুণ্ডি করিয়া দিল্লীতে পাঠাইয়া দিতেন। ব্যাঙ্ক্-অব্-বেঙ্গল এখন গবর্ণমেণ্টের ও সাধারণের যে সকল প্রয়োজন সম্পন্ন করে, শেঠদিগের মহাজনি কুঠি দ্বারা পূর্ব্বে-কিয়ৎ-পরিমাণে সেই সকল কার্য্য নির্ব্বাহিত হইত।

মুসলমান-রাজত্ব সময়ে এতদ্দেশে শিক্কা, সোনত, ফরক্কাবাদ প্রভৃতি বহুবিধ মুদ্রা প্রচলিত ছিল। এই সকল মুদ্রার ওজন ও খাদ বিভিন্ন হওয়াতে মূল্যের তারতম্য করা কঠিন হইত। শেঠদিগের মহাজনি-কুঠিতে জমিদারেরা যে সকল মুদ্রা দ্বারা মালগুজারি দাখিল করিতেন, শেঠেরা সেই সকল মুদ্রার তারতম্য করিয়া বাট্টা স্থির করিয়া সকল প্রকার মুদ্রাই শিক্কা বা কোন এক নির্দ্দিষ্ট মুদ্রায় পরিণত করিতেন। ঐ বাট্টার মধ্যেই শেঠদিগের নির্দ্দিষ্ট লাভাংশ থাকিত। যখন দিল্লীর ক্ষমতা হ্রাস হইয়া পড়িল এবং সুবে-বাঙ্গা-লার নবাব নামমাত্র বাদশাহের অধীন রহিলেন, সেই সময়ে, শেঠেরা মুদ্রায় যে পরিমাণ খাদ আছে তাহা হইতে কিঞ্চিৎ অধিক স্থির করিয়া অধিক লাভ করিতে লাগিলেন। নবাব ইহা জানিয়াও কিছু বলিতেন না, বরং সময়ে সময়ে শেঠদিগের নিকট হইতে এককালীন বহু টাকা চাহিয়া লইয়া তাদৃশ অন্যায্য লাভের অংশ গ্রহণ করিতেন। ইষ্ট্-ইণ্ডিয়া-কোম্পানির রাজত্বের প্রারম্ভে এই বাট্টার অত্যাচার বড় বাড়িয়াছিল। ১৮৩৫ খৃঃ অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে নাবেক সোনত টাকার সদৃশ কোম্পানির টাকা প্রচলন দ্বারা ঐ সকল অসুবিধা দূর হইতে আরম্ভ হয়।

১৭১৫ খৃঃ অব্দে মুরশিদকুলিখাঁর চেষ্টায় বাদশাহ ফর্‌রুখসিয়রের দরবার হইতে মাণিকচাঁদসাহ 'শেঠ' উপাধি প্রাপ্ত হন। গুজরাত দেশে শেঠ শব্দে বণিক্ ও পোদ্দার বুঝায়। সাধু শব্দের অপভ্রংশ সাহু বা সাউ শব্দও বণিক্ অর্থজ্ঞাপক। এই শেঠবংশে এরূপ প্রবাদ শুনা যায় যে, আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর নবাব-মুরশিদকুলিখাঁর কর্ম্মচ্যুতির সম্ভাবনা হইলে মাণিকচাঁদ অনেক টাকা খরচ করিয়া উক্ত নবাবকে কর্ম্মে বাহাল রাখিয়াছিলেন। মাণিকচাঁদ নিঃসন্তান ছিলেন। তিনি দিল্লীস্থিত মহাজনি-কুঠির অধ্যক্ষ ভ্রাতৃব্য ফতেচাঁদকে দত্তক গ্রহণ করেন। ফতেচাঁদ ইতি পূর্ব্বেই "শেঠ" উপাধি দ্বারা সম্মানিত হইয়াছিলেন। ১৭২২ খৃঃ অব্দে মাণিকচাঁদের মৃত্যু হইলে ফতেচাঁদ বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হইলেন। ১৭২৪ খৃঃ অব্দে ফতেচাঁদ দিল্লীতে গমন করিলে বাদশাহ মহম্মদ-শাহ তাঁহাকে "জগৎ-শেঠ" উপাধি প্রদানে সম্মানিত করেন। এক সময়ে মুরশিদ-কুলিখাঁকে বরতরফ করিয়া ফতেচাঁদকেই সুবেদারি প্রদানের প্রস্তাব হয়। ফতেচাঁদ তাহাতে সম্মত না হইয়া নবাবের অপরাধ ক্ষমা করাইয়া লন। এই উপলক্ষে বাদশাহের দরবার হইতে যে ফরমান বাহির হইয়াছিল, তাহাতে, ফতেচাঁদের অনুরোধে নবাবের দোষ ক্ষালনের বিষয় উল্লেখ করিয়া, বাদশাহ নবাবকে ফতেচাঁদের পরামর্শ লইয়া রাজকার্য্য করিতে আদেশ করেন। অতঃ-পর বাদসাহ যখনই নবাবকে খেলাত দিতেন তখনই জগৎশেঠের জন্যও খেলাত পাঠাইতেন। ১৭৪৪ খৃঃ অব্দে ফতেচাঁদের মৃত্যু হয়। তাঁহার বর্ত্তমানেই তাঁহার দুই পুত্র পরলোক গত হন। তদীয় জ্যেষ্ঠ সহো-দরের পুত্র মহতাবরায় এবং কনিষ্ঠ সহোদরের পুত্র মহারাজ স্বরূপচন্দ্র বর্ত্তমান্ ছিলেন।

* নবাব। আরবি-ভাষায় 'নায়েব' শব্দের বহু-বচনে 'নবাব' পদ হয়। নায়েব শব্দের অর্থ প্রতিনিধি। দিল্লীর বাদশাহের অধীনস্থ সুবে(প্রদেশ)সমূহের নাজিম বা সুবাদারদিগকে সাধারণতঃ নবাব বলা হইত। নাজিমও সুবেদারেরাই বাদশাহের প্রতিনিধি ছিলেন। এই প্রতিনিধিরা যখন বাদশাহের অধীনতা অগ্রাহ্য করিয়া স্বাধীনতা অবলম্বন করিলেন, তখন নবাব শব্দে স্বাধীন রাজা অর্থ বুঝাইতে লাগিল।

বিষয়ে কাহারও পরামর্শ বা অনুরোধ শুনিতেন না। মুরশিদকুলিখাঁ মালগুজারির জন্য যে সকল ভূম্যধিকারীদিগকে কারাবদ্ধ * করিয়া রাখিয়া তাঁহাদিগের প্রতি অশেষ যন্ত্রণা প্রয়োগের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, সুজাখাঁ তাঁহাদিগকে মূল্যবান্ খেলাত † দানে সম্মানিত করিয়া কারামুক্ত করিলেন। মুরশিদকুলিখাঁর কঠোর শাসনেও রাজস্ব অনেক অনাদায় থাকিত, কিন্তু সুজা-খাঁ সদয়ব্যবহার দ্বারা সমস্ত রাজস্ব নিয়মিত রূপে আদায় করিতেন। এইরূপে সুজা-খাঁর সুশাসনে বাঙ্গালার অধিবাসীরা সুখ-স্বচ্ছন্দে বাস করিতে লাগিল। মর্ত্ত্যে স্বর্গলোক বলিয়া বাঙ্গালার যে গৌরব ছিল, মুরশিদ-কুলি-খাঁর অত্যাচারে যে গৌরবের অনেক হানি হইয়াছিল, সুজাখাঁর সময়ে সেই গৌরব পুনঃ স্থাপিত হইল—বাঙ্গালা পুনরায় ধনধান্যে পূর্ণ হইল। *

সুজা-খাঁ আপনার জ্যেষ্ঠপুত্র সরফরাজ-খাঁকে বাঙ্গালার দিবান, দ্বিতীয় পুত্র মহম্মদ-তকি-খাঁকে উড়িষ্যার নায়েব-সুবেদার, জামাতা-মুরশিদকুলিখাঁকে জহাঙ্গীর-নগরের (ঢাকার) নায়েব-সুবেদার, হাজি-আহম্মদের প্রথম পুত্র নবাজিশ-মহম্মদকে মীরবক্সি † তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র সৈয়দ-আহম্মদ-খাঁকে রঙ্গপুরের ফৌজদার এবং তাঁহার তৃতীয় পুত্র জৈনউদ্দিন-আহম্মদ-খাঁকে আকবরনগরের (রাজমহলের) ফৌজদার নিযুক্ত করিলেন। সুবে-আজীমাবাদ * (বিহার প্রদেশে) এযাবৎ স্বতন্ত্র এক জন নাজিম কর্ত্তৃক শাসিত হইতে ছিল। উহার নাজিম ফকিরউদ্দৌলা প্রজা-পীড়ন অপরাধে বাদশাহ মহম্মদ-শাহ কর্ত্তৃক ১৭২৯ খৃঃ অব্দে পদচ্যুত হন। বাদশাহ উক্ত পদে স্বতন্ত্র নাজিম নিযুক্ত না করিয়া বিহার প্রদেশ সুবে-বাঙ্গালার সহিত সংযুক্ত করিয়া সুজাখাঁর শাসনাধীন করেন। এখন হইতে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যা এই তিন প্রদেশ সুবে-বাঙ্গালার অন্তর্গত হয়। অনেক বিবেচনার পর সুজা-খাঁ জিনৎউন্নিসা-বেগমের অভিপ্রায় অনুসারে ও সম্মতিক্রমে আলীবর্দ্দী-খাঁকে মহাবৎজঙ্গ ও বাহাদুর উপাধিতে এবং পাঁচ হাজারি মনসবদার † প্রভৃতি সম্মানে সম্মানিত করিয়া ১৭২৯ খৃঃ অব্দে বিহার প্রদেশের নায়েব-সুবেদার নিযুক্ত করিলেন। *

নবাজিশমহম্মদ সাহামৎজঙ্গ, সৈয়দ-আহম্মদ-সৌলৎজঙ্গ এবং জৈনউদ্দিন-আহম্মদ-শকৎজঙ্গ নামে হাজি-আহম্মদের পুত্রত্রয় যথাক্রমে মহম্মদ-আলীবর্দ্দীখাঁর তিন কন্যা মেহেরুন্নিশা-বেগম ওরফে খাসিটি-বেগম, * * * † এবং আমিনা-বেগমকে বিবাহ করেন। আলীবর্দ্দী-খাঁ যে সময়ে আজীমাবাদের নায়েব-সুবেদারি পদপ্রাপ্ত হন, তাহার কয়েক দিন পূর্ব্বে আমিনা-বেগম মির্জ্জামহম্মদ নামে এক পুত্র প্রসব করেন। এই মির্জ্জামহম্মদই উত্তর-কালে বাদশাহকুলিখাঁ ওরফে সিরাজউদ্দৌলা নামে পরিচিত হন। সিরাজউদ্দৌলার জন্মের সঙ্গে সঙ্গে আলীবর্দ্দীখাঁর আশাতীত পদোন্নতি হয় বলিয়া আলীবর্দ্দী ঐ বালককে অত্যধিক স্নেহ করিতেন। তাঁহার পুত্র-সন্তান জন্মে নাই। তিনি দৌহিত্রকেই পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিলেন, এবং স্বগৃহে রাখিয়া তাঁহার বিদ্যা-শিক্ষার সুবন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।

আলীবর্দ্দী-খাঁ আমীমাবাদের শাসনভার প্রাপ্ত হইয়া তত্রত্য পাঠানদিগকে ‡ নিজ সৈন্য-

---

* জমিদারদিগের কারাবরোধ।—মুসলমান রাজত্ব সময়ে মালগুজারি বাকি পড়িলে ভূম্যধিকারীদিগকে কয়েদ করিবার নিয়ম প্রচলিত ছিল। ইংরেজ-রাজত্বেও ঐ নিয়ম কতক দিন চলিত থাকে। ১৭৯৪ খৃঃ অব্দে কয়েদের নিয়ম রহিত হইয়া নির্দ্দিষ্ট দিনে সূর্য্যাস্ত-সময়মধ্যে রাজস্ব না দিলে জমিদারী বা তালুক নিলামে বিক্রয় হইবার নিয়ম কঠোর রূপে জারি হয়। এই কানুন দ্বারা অনেক বৎসরের মধ্যেই অধিকাংশ জমিদারি ও তালুক হস্তান্তরিত হইল, বাঙ্গালার প্রায় সমুদায় প্রাচীন জমিদার ও তালুকদার সম্পত্তিচ্যুত হইয়া নিঃস্ব অবস্থায় পতিত হইলেন এবং রাজকীয় কর্ম্মচারী ও বণিকেরা জমিদার ও তালুকদার হইলেন। সেই সময়ে "সূর্য্যাস্তের কানুন" দ্বারা যে ভীষণ কাণ্ড হইয়াছিল, তাহাতে প্রাচীন জমিদার ও তালুকদারেরা "সূর্য্যাস্তের কানুন" রহিত হইয়া পুনরায় কারাবরোধের নিয়ম জারি হইলে বড়ই সন্তোষ লাভ করিতেন।

† খেলাত—চীরা (শিরোপা), পটকা (কটিবন্ধ) এবং জামা এই তিনটি পোশাক খেলাতে প্রদত্ত হইত। খেলাত পরিলে শির হইতে পা পর্য্যন্ত আচ্ছাদিত হইত বলিয়া খেলাতের অপর নাম শিরপা। খেলাত ও শিরপায় একটু প্রভেদ ছিল। শিরপায় জামা দ্বিগুণিত বস্ত্রে নির্ম্মিত হইত এবং খেলাতের অঙ্গীয় পোশাকের অতিরিক্ত জুব্বা নামক এক প্রকার মির-জাই দেওয়া হইত। খেলাত মলমল বস্ত্রে নির্ম্মিত হইত। উহাতে সোণা, রূপা ও রেশমের কাজ থাকিত। খেলাত রাজসম্মান বিশেষ ছিল।

* দিল্লীর বাদশাহের শাসিত সাম্রাজ্যের মধ্যে এক মাত্র সুবে বাঙ্গালাই সম্পূর্ণ খালিশার অধীনে ছিল। এই প্রদেশ হইতেই বাদশাহের রাজকোষে অধিক রাজস্ব প্রেরিত হইত। মুসলমান রাজত্ব সময়ে যে ইহার ভাল অবস্থা ছিল মুসলমান ঐতিহাসিকদিগের গ্রন্থ ও নানা দেশীয় ভ্রমণকারীদিগের ভ্রমণ বৃত্তান্ত পাঠে অবগত হওয়া যায়। সিরাজদ্দৌলার সময়েও ইহার আভ্যন্তরিক দুরাবস্থা কিছু ঘটে নাই। ইতিহাস-বেত্তা ইংরেজ অর্মি-সাহেব বলেন যে, "সিরাজদ্দৌলার সুবেদারি সময়ে বাঙ্গালা ধনবত্তায় ও লোক সঙ্খ্যায় পৃথিবীর মধ্যে প্রধান স্থান বলিয়া পরিগণিত হইত। ইহার অধিকাংশ ভূমিই কর্ষিত হইত, প্রধান ব্যক্তি ও বণিকদিগের অতুল ঐশ্বর্য্য ছিল এবং সামান্য কৃষিজীবী ও শিল্পীরাও প্রয়োজনীয় সামগ্রীর প্রাচুর্য্য বশতঃ সুখ-সচ্ছন্দে কালাতিপাত করিত। পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরেজ-বণিকেরা গৃহ-বিচ্ছেদের সাহায্যে স্বকীয় ক্ষমতায় সুবেদার বা নাজিম নিয়োগের প্রবল ইচ্ছা দ্বারা যেরূপ প্রণোদিত হইয়াছিলেন, তাহাতে বাঙ্গালার অবস্থা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত করিয়াছিল। যে সকল নগরী ঐশ্বর্য্যের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল, ছয় বৎসরের মধ্যে তাহার অর্দ্ধেক ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল, ৫০ লক্ষ শ্রমজীবী হয় মৃত্যুমুখে পতিত, না হয় দেশ হইতে তাড়িত হইয়াছিল এবং অধিকাংশ কর্ষিত ভূমি অকর্ষিত অবস্থায় পতিত হইয়াছিল। রাজপুরুষেরা তত নিষ্ঠুর হউন বা না হউন, তাঁহাদের অজ্ঞতা বশতঃই যে এই সকল ভয়ানক ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা নিঃসন্দেহ। তখন সবল ব্যক্তিরা নিঃশঙ্ক হৃদয়ে দুর্ব্বলের রক্তে সিক্ত হইয়া তাহার সর্ব্বনাশ সাধন করিতে কুণ্ঠিত হইত না।" অর্মি-সাহেব ইংরেজ-রাজত্বের প্রারম্ভ সময়ে বাঙ্গালার যে ভয়ানক অবস্থা বর্ণন করিয়াছেন, পরবর্ত্তী সুশাসনে তাহার অনেক সংশোধন হইয়াছে।

† বক্সি।—দিল্লীতে সিপাহ-সালারই প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন; বক্সি তন্নিম্নস্থ সৈন্যাধ্যক্ষ। সুবে-বাঙ্গালায় বক্সিই এই উভয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন।

* আজীমাবাদ।—সম্রাট্ আওরঙ্গজেবের পৌত্র ও সুলতান মুআজ্জমের জ্যেষ্ঠ পুত্র সুলতান আজীম-উল্-শান ১৭০৩ খৃঃ অব্দে পাটনা শহরের নাম আজীমা-বাদ রাখেন। এই হইতেই মুসলমানেরা বিহার-প্রদেশের শাসনকর্ত্তাকে আজীমাবাদের শাসনকর্ত্তা বলিয়া উল্লেখ করিতেন।

† মনসবদার।—বাদশাহ আকবর কর্ত্তৃক এই "মনসবদার" উপাধি বা পদের সৃষ্টি হয়। "দহবাশি" অর্থাৎ দশ জন সৈন্যের অধ্যক্ষ হইতে "দহহজারি" অর্থাৎ দশ সহস্র সৈন্যের অধ্যক্ষ পর্য্যন্ত এই পদের সীমা নির্দ্দিষ্ট ছিল। যে কোন ব্যক্তি এই "মনসব্" পদে ব্রতী হইতেন, তাঁহাকে মনসবের সঙ্খ্যানুযায়ী তত সঙ্খ্যক সৈন্যই যে রাখিতে হইত, তাহার কোন নিয়ম ছিল না। তিনি এত সঙ্খ্যক পর্য্যন্ত সৈন্য রাখিতে পারিবেন ইহা দ্বারা ইহাই বুঝাইত। কেবল সম্রাটের পুত্রেরাই পাঁচ-হাজারির ঊর্দ্ধ সঙ্খ্যা হইতে দশ হাজারি পর্য্যন্ত মনসবদার হইতে পারিতেন। অপরাপর "মনসব্" রাজকর্ম্মচারীরা আপনাপন পদ মর্য্যাদা, কার্য্য-তৎপরতা ও রাজভক্তি অনুসারে প্রাপ্ত হইতেন। সমুদয়ে ৫৬টি মনসব্ পদ নির্দ্দিষ্ট ছিল।

* সুজাখাঁ আপনার পুত্রদ্বয় সরফরাজখাঁ এবং মহম্মদ-তকিখাঁ এই উভয়ের মধ্যে এক জনকে বিহার প্রদেশের নায়েব-সুবেদারের পদে নিযুক্ত করিবেন এরূপ মনস্থ করিয়াছিলেন। কিন্তু জিনাৎ-উন্নিসা-বেগম আপনার গর্ভজাত পুত্র সরফরাজখাঁকে দূরে পাঠাইতে সম্মত হইলেন না; স্বামীর ঔরস-জাত দাসীপুত্র মহম্মদ-তকিখাঁও যে, এই কর্ম্মে নিযুক্ত হন ইহাও তাঁহার ইচ্ছা ছিল না। ঘটনা-চক্রে আলীবর্দ্দীখাঁরই নিয়োগ সর্ব্ব-বাদিসম্মত হইল।

† এই প্রবন্ধকার আলীবর্দ্দীখাঁর মধ্যমা কন্যার নাম অবগত নহেন।

‡ পাঠান।—মুসলমানেরা প্রধানতঃ সৈয়দ, শেখ, মোগল ও পাঠান এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। পাঠানের উৎপত্তি এরূপ বর্ণিত আছে, পেগাম্বর-মহম্মদ-মুস্তফা এক সময়ে দশজন উচ্চ-পদস্থ সেনানীকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে অনুমতি করেন। ইহাঁরা সকলেই রণে

শ্রেণীভুক্ত-করিতে লাগিলেন। সত্বরই তাঁহার ফটক অদম্য-সাহসী ও যুদ্ধনিপুণ সৈন্য দ্বারা পরিপূর্ণ হইল। তিনি ইহাদের সাহায্যে ভোজপুর * বেতিয়া প্রভৃতির বিদ্রোহী জমিদারদিগকে দমন করিলেন। তাঁহার কঠোর শাসনে অশান্তিপদ বিহার-প্রদেশে শান্তি স্থাপিত হওয়াতে একদিকে যেমন সুজাখাঁর প্রীতিবর্দ্ধনে সমর্থ হইয়াছিলেন, অন্য দিকে স্বকীয় ক্ষমতা এবং প্রাধান্যও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তাঁহার অগ্রজ হাজিআহম্মদ রাজানুগ্রহের প্রতি বড় নির্ভর করিতেন না। তিনি জানিতেন, আজি যে সুবেদারের অনুগ্রহে তাঁহাদের এত উন্নতি হইয়াছে, কালি তাঁহারই অসন্তোষ-ভাজন হইলে তাঁহাদের দুর্দ্দশার অবধি থাকিবে না। সুতরাং তিনি সুজা-খাঁ কিংবা তাঁহার স্থলবর্ত্তীদিগের অনুগ্রহ ও নিগ্রহ নিরপেক্ষ ভাবে বিহার-প্রদেশ আলীবর্দ্দী-খাঁর শাসনে স্থিরতর থাকে তজ্জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সুজাখাঁর ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতাই আলীবর্দ্দীর এই উন্নতির কারণ। হাজি-আহম্মদ সুজাখাঁর উপভোগের জন্য স্ত্রীলোক সংগ্রহ করিয়া দিতেন; এমন কি আপনার কন্যাও সুজাখাঁর নিকট প্রেরণ করিতে সঙ্কোচ বোধ করেন নাই। এই বিশেষ কার্য্যের জন্য হাজি-আহম্মদের অনুরোধে সুবেদার আলী-বর্দ্দীখাঁকে বিহার-প্রদেশের শাসন-ভার অর্পণ করেন। কুকর্ম্মীদিগের অন্তঃকরণ নিয়তই নানা আশঙ্কায় অভিভূত থাকে। তাহার শঙ্কা দূর করিবার জন্য অসদুপায় অবলম্বন করিতেও পরাঙ্মুখ হয় না। হাজি-আহম্মদ দিল্লীর দরবারস্থ প্রধান রাজকর্ম্মচারীদিগকে উৎকোচ-দানে বাধ্য করিলেন এবং কৃতজ্ঞতা-পাশবন্ধন ছিন্ন করিয়া সুবে-বাঙ্গালার সুবেদারের অধীনতা অপসারণপূর্ব্বক ১৭৩৬ খৃঃ অব্দে গোপনে বাদশাহ হইতে সুবে-আজীমাবাদের সুবেদারির সনন্দ-পত্র আনাইলেন। কিছুদিন পরে সুজা-খাঁ এই বিষয় জানিতে পারিয়া কৃতঘ্নদিগকে সমুচিত শাস্তি প্রদানের সুযোগ দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু ১৭৩৯ খৃঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হওয়াতে হাজি-আহম্মদ ও আলীবর্দ্দীখাঁ প্রভুর কোপ হইতে ত্রাণ পাইলেন। আলীবর্দ্দীখাঁ উক্ত সনন্দ পাইয়াও তাহা গোপন রাখিয়াছিলেন, অন্ততঃ সুবে-বাঙ্গালা হইতে পৃথক্ ভাবে কখনও বিহার-প্রদেশের শাসন-কার্য্য নির্ব্বাহ করেন নাই।

সুজাখাঁর মৃত্যু হইলে তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র আলাউদ্দৌলা-সরফরাজখাঁ মসনদে অধিরোহণ করিয়া বাঙ্গালা বিহার ও উড়িষ্যা এই তিন প্রদেশ অধিকার করিলেন। উত্তরাধিকারি-সূত্রে সুবে-বাঙ্গালার মসনদ অধিকারের দৃষ্টান্ত এই প্রথম। সরফরাজ খাঁ পরে সনন্দ-পত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বাদশাহ মহম্মদশাহও এরূপ ফর্ম্মানপ্রদানে আপত্তি করেন নাই। ১৭৩৯ খৃঃ অব্দে নাদিরশাহের আক্রমণে * মহম্মদ-শাহের ক্ষমতা অত্যন্ত হ্রাস হইয়া পড়িয়াছিল। বাদশাহ উপঢৌকন ও নিয়মিত রাজস্ব এবং তাঁহার মন্ত্রিগণ উৎকোচ প্রাপ্ত হইলেই রাজ্যের মঙ্গলামঙ্গলের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য না রাখিয়া যে কোন ব্যক্তিকে সুবেদারির ফর্ম্মান প্রদান বিষয়ে অসম্মত ছিলেন না। সুতরাং সরফ-রাজ-খাঁ পূর্ব্বে বাদশাহি-ফর্ম্মান্ গ্রহণ না করিয়া নিয়ম বিরুদ্ধরূপে সুবে-বাঙ্গালার সুবাদার হইলেও মহম্মদ-শাহ তাহাতে আপত্তি করেন নাই।

সরফরাজ-খাঁ মুসলমান-ধর্ম্মোচিত ক্রিয়াদি যত্নের সহিত পালন করিতেন। রাজকার্য্যে তাদৃশ মনোযোগী না হইয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান ও আমোদ-প্রমোদেই সর্ব্বদা রত থাকিতেন। রাজকার্য্য পরিদর্শনের উপযুক্ত বুদ্ধি এবং ক্ষমতাও তাঁহার ছিল না। তাঁহার প্রকৃতি অতি দুর্ব্বল ছিল। তাঁহার পিতা নবাব সুজা-খাঁ যে সকল গণ্যমান্য বুদ্ধিমান্ ও কার্য্যকুশল ব্যক্তি দ্বারা মন্ত্রিসভা গঠন করিয়াছিলেন, সরফরাজ-খাঁ তাঁহাদের পরামর্শ প্রায়ই শুনিতেন না। তিনি হাজি-লুৎফল্লা-খাঁ, মর্দ্দান-আলী-খাঁ, মীরমুরতেজা-খাঁ প্রভৃতি আমীরদিগের পরামর্শ অনুসারেই অধিকাংশ সময় চলিতেন। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে হাজি-আহম্মদ নবাব-সুজাখাঁর নিমিত্ত স্ত্রীলোক সংগ্রহ করিয়া দিতেন। তিনি তজ্জন্য উক্ত আমীরদিগের পরিবারস্থ মহিলা-সংগ্রহের চেষ্টা করিতেও বিমুখ হন নাই। এই কারণে হাজি-আহম্মদের উপর তাঁহাদের অত্যধিক জাতক্রোধ ছিল। এক্ষণ তাঁহারা সুবিধা পাইয়া হাজি-আহম্মদ-কৃত পূর্ব্ব অপমানের প্রতিশোধ লইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা হাজি-আহম্মদের দুশ্চরিত্রতার বিষয় নবাব সরফরাজখাঁর সম্মুখে সর্ব্বদা আলোচনা করিতেন। ইহাতে হাজি-আহম্মদের প্রতি সরফরাজখাঁর অত্যন্ত বিদ্বেষ জন্মিয়াছিল।

সুজাখাঁর সুবেদারি সময়ে হাজি-আহম্মদ কুল্লের (বাঙ্গালা বিহার ও উড়িষ্যার) দিবান ছিলেন; সরফরাজ-খাঁ তৎপদে মীর-মুরতজা-খাঁকে নিযুক্ত করিলেন। হাজির জামাতা আতাউল্লা-খাঁকে * রঙ্গপুরের ফৌজদারি কর্ম্ম হইতে বরতরফ করিয়া নবাব উক্ত

নিহত হইলে তিনি সৈন্যদিগকে সেনা মধ্য হইতে কোন সাহসী ও যুদ্ধ-নিপুণ ব্যক্তিকে সেনাপতি মনোনীত করিতে আদেশ করিলেন। সৈন্যেরা খালিদ-বিন্‌ওলীদের বংশধর এক ব্যক্তিকে সৈন্যাধ্যক্ষ নির্ব্বাচন করিয়া সমরে প্রবৃত্ত হইল। সৈন্যাধ্যক্ষ রণজয়ী হইয়া প্রত্যাগত হইলে মহম্মদ-মুস্তফা তাঁহাকে "ফতেহান্" উপাধি প্রদান দ্বারা সম্মানিত করিলেন। "ফতেহান্" শব্দের অর্থ জয়কারী। কালে "ফতেহান্" শব্দের অপভ্রংশ হইয়া "পঠান" বা "পাঠান" হইয়াছে। পাঠানেরা কালে বহু শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে দুইটিই উল্লেখযোগ্য। ১ম যুসুফ-জই,—ইহারা যুসুফ (জোজেফ্) হইতে উৎপন্ন; এবং ২য় লোদী—ইহারা লোদী (লোট্) হইতে উৎপন্ন। শেষোক্ত শাখাভুক্ত পাঠানের সংখ্যাই অনেক অধিক হইবে। আফগানিস্থান নিবাসী পাঠানদিগকে আফ্‌গান বলা হয়। পাঠান পুরুষের নামের শেষে "খাঁ" শব্দ এবং স্ত্রীলোকের নামের শেষে "খাতুন্" "খাতু" অথবা "বানু" শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। পাঠানেরা "সুন্নী"-সম্প্রদায় ভুক্ত। "শীয়া" ও "সুন্নী"-তে অদ্যাপি বিরোধ চলিতেছে। সুন্নীরা খলিফা আবু-বকর, ওমর, ওস্‌মান এবং আলী এই চারি জনকেই ইমাম (পেগাম্বর-মহম্মদ-মুস্তফার উত্তরাধিকারী) বলিয়া স্বীকার করে; কিন্তু শীয়ারা প্রথমোক্ত তিন জনকে অগ্রাহ্য করিয়া কেবল হজরৎ-আলীকেই (আলী-উন্-মুরতুজাকেই) ইমাম বলিয়া স্বীকার করে। এই মত-পার্থক্য-হেতু শীয়ারা সুন্নীদিগকে "খারজী" এবং সুন্নীরা শীয়াদিগকে "রাফ্‌জী" এই বিদ্বেষ-সূচক নামে অভিহিত করে। ভারতবর্ষীয় মুসলমানদিগের মধ্যে পাঠানেরাই সাধারণতঃ অতিশয় সাহসিক বলিয়া যুদ্ধ বিষয়ে ইহাদের প্রতিপত্তি অধিক। পাঠান জাতীয় রোহিলাদিগের বীর্য্যবত্তার বিষয় কাহারও অবিদিত নাই। কেহ কেহ এরূপও বলেন যে, পার্থিয়ন ক্ষত্রিয়েরা মুসলমান-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া পাঠান বলিয়া পরিচিত হইয়াছে।

*** ভোজপুর বর্ত্তমান্ শাহাবাদ (শাহ-আবাদ) জিলার মধ্যস্থ এক পরগণা। এই পরগণা ১৪৮টি তালুকে বিভক্ত। ইহার পরিমাণ ২,৫৭,২৬০ একার (৪০২ বর্গ মাইল)। ভোজপুর-নিবাসী রাজপুতরাই ভোজপুরী-সিপাহি বলিয়া প্রসিদ্ধ। ডুমরাও, বক্সর, জগদীশপুর প্রভৃতি স্থানে যে পম্পার-বংশীয় উজ্জয়িনীর ক্ষত্রিগণ বহুদিন রাজত্ব করিতেছেন, ইহাঁরা সকলেই ভোজপুরী বলিয়া প্রসিদ্ধ।**

*** নাদির-শাহ ১৭৩৯ খৃঃ অব্দের ৮ই মার্চ্চ তারিখে শাহজহানাবাদে (দিল্লীতে) প্রবেশ করেন, এবং উক্ত অব্দের ৬ই মে তারিখে (কোন মতে ১৪ই এপ্রিল তারিখে) দিল্লী পরিত্যাগ করিয়া যান।**

*** আতাউল্লা-খাঁ হাজি-আহম্মদের দুহিতা রবিয়া-বেগমকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এই রবিয়া-বেগমের তনয়ার সহিতই মির্জ্জা-মহম্মদের (সিরাজ-উদ্দৌলার) সম্বন্ধ সুস্থির হয়; কিন্তু সরফরাজখাঁ আপনার পুত্রের সহিত উক্ত তনয়ার বিবাহের প্রস্তাব করাতে তখন বিবাহ হইতে পারে নাই। উক্ত কুমারী অবিবাহিতাবস্থায় পরলোকগত হইলে ১৭৪৭-৪৮ খৃঃ অব্দে**

পদে আপনার জামাতা হাসন্-মহম্মদ-খাঁকে নিযুক্ত করিবার সঙ্কল্প করিলেন। নবাবের প্রিয়পাত্র আমীরগণ হাজি-আহম্মদকে অতিশয় ঘৃণা করিতেন। নবাব নিজেও বয়ঃপার্থক্য অগ্রাহ্য করিয়া পিতৃ-সদৃশ বৃদ্ধ হাজিকে "কুটনী" "বদ" প্রভৃতি শব্দে গালি বর্ষণ করিতে লজ্জা বোধ করিতেন না। হাজি-আহম্মদ এই সকল বিষয় আরও অতিরঞ্জিত করিয়া পাটনায় আলীবর্দ্দীখাঁকে পত্র লিখিয়া জানাইতে লাগিলেন। হাজি-আহম্মদ ইতিপূর্ব্বেই আলীবর্দ্দীখাঁর নামে সুবে-আজীমাবাদের সুবেদারির-ফর্ম্মন্ গ্রহণ দ্বারা সুবে-বাঙ্গালার নবাবের অধীনতা এড়াইবার পথ কিয়ৎ পরিমাণে পরিষ্কার করিয়া রাখিয়াছিলেন; এক্ষণ তাহা সুপরিষ্কৃত করিবার নিমিত্ত সরফরাজখাঁর কৃত্রিম বন্ধু সাজিয়া নিজামতের ব্যয় লাঘব করা আবশ্যক এরূপ ওজাহাতে সৈন্য-সঙ্খ্যা অনেক পরিমাণে কমাইয়া দিতে পরামর্শ দিলেন। দুর্ভাগ্য-বশতঃ এই পরামর্শ মন্ত্রি-সভার ও নবাবের অনুমোদিত হওয়াতে শীঘ্রই অনেক সৈন্য কর্ম্মচ্যুত হইল। ইতিমধ্যে জৈন-উদ্দীন-আহম্মদখাঁ পাটনা হইতে এবং সৈয়দ-আহম্মদখাঁ রঙ্গপুর হইতে মুরশিদাবাদে আসিয়া পঁহুছিলেন। হাজির এই পুত্রদ্বয়কে কয়েদ করিবার জন্য মনোচরখাঁ সরফরাজখাঁকে পরামর্শ দিলেন। নবাবের নিকট এই পরামর্শ ভাল বোধ হইলেও তাঁহার স্বভাব এতই দুর্ব্বল ছিল যে, তিনি হাজি-আহম্মদকে উহা বলিয়া দিলেন। সরফরাজখাঁ এক দিকে এরূপ মিত্রতা দেখাইয়া পরক্ষণেই হাজিকে অপর কোন সামান্য কারণে অপদস্থ করিতে ত্রুটি করিলেন না। হাজির দৌহিত্রীর (আতাউল্লাখাঁর দুহিতার) সহিত হাজির পৌত্র (জৈনউদ্দীনখাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র) মির্জ্জামহম্মদ ওরফে সিরাজউদ্দৌলার বিবাহের প্রস্তাব সুস্থির হইয়াছিল; সরফরাজখাঁ আপনার পুত্রের সহিত উক্ত কন্যার বিবাহের জন্য জেদ করিতে লাগিলেন। এইরূপে সরফরাজ খাঁ আপনার অবিবেচনায় একদল পরম শত্রু সৃষ্টি করিয়া নিজেই আবার সেই শত্রুদলের পুষ্টি সাধন করিতে লাগিলেন। হাজি-আহম্মদের প্রতিপক্ষের পরামর্শে সরফারজখাঁ সুবে-আজীমাবাদের আয়ব্যয় বিষয়ে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। উক্ত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াই নবাব সুজাখাঁ আজীমাদ রক্ষণাবেক্ষণ জন্য আলীবর্দ্দীখাঁর সঙ্গে যে সকল সৈন্য পাঠাইয়াছিলেন তাহাদিগকে মুরশিদাবাদে তলব করিলেন। সৈন্যেরা আলীবর্দ্দীর প্রতিই আসক্ত ছিল, এজন্য সরফরাজখাঁর আদেশ মান্য করিতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। ইহাতে সরফরাজখাঁ চটিয়া তাহাদের জায়গীর বজেয়াপ্ত করিলেন। সৈন্যেরাও নবাবের আচরণে অতিশয় অসন্তুষ্ট হইল।

আলীবর্দ্দীখাঁ আর অধিকাল আত্মগোপন করা অনুচিত মনে করিয়া বাদশাহের প্রিয়পাত্র এবং আপনার বন্ধু ইশাখ খাঁকে তাঁহার নিজ নামে সুবে-বাঙ্গালার সুবেদারির সনন্দ-পত্র প্রদানের চেষ্টা করিতে অনুরোধ করিলেন। মনোরথ সিদ্ধ হইলে আলীবর্দ্দীখাঁ বাদশাহকে উপঢৌকন স্বরূপ এক কোটি টাকা, সরফরাজখাঁর সমস্ত সম্পত্তি এবং বার্ষিক এক কোটি টাকা রাজস্ব যথাসময়ে প্রদান করিবেন, এরূপ প্রতিশ্রুত হইলেন। ইশাখ খাঁর নামে দিল্লীতে এই মর্ম্মে পত্র পাঠাইয়া আলীবর্দ্দীখাঁ ভোজপুরের জমিদারদিগকে দমনের অছিলায় সৈন্য সঙ্খ্যা বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন এবং সৈন্যদিগকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত রাখিলেন। নাদির-শাহের ইরানে (পারস্যে) প্রত্যাবর্ত্তনের দশ

পাটনায় সিরাজদ্দৌলার কনিষ্ঠ সহোদর একরাম-উদ্দৌলা রবিয়া-বেগমের অপর এক দুহিতা বান্নি-বেগমকে এবং সিরাজদ্দৌলা মির্জ্জা-ফরজখাঁর তনয়াকে বিবাহ করেন।

মাস পরে ও সুজাখাঁর মৃত্যুর তের মাস পরে (১৭৪০ খৃঃ অব্দে) আলীবর্দ্দীখাঁ বাদশাহ মহম্মদশাহ হইতে সুবে-বাঙ্গালার সুবেদারি-পদের সনন্দ-পত্র এবং সরফরাজখাঁর সহিত যুদ্ধ করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হইলেন *। আলীবর্দ্দী জ্যোতিষী গণনা দ্বারা যুদ্ধযাত্রার শুভ দিন স্থির করিয়া মুরশিদাবাদে জগৎশেঠ-ফতেচাঁদকে গোপনে তাহা জানাইলেন।

জগৎশেঠ-ফতেচাঁদ ও রায়রায়া-আলমচাঁদ গুপ্তভাবে আলীবর্দ্দীর সাহায্য করিবেন এরূপ অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। সরফরাজখাঁর প্রতি ফতেচাঁদের অসন্তোষের কারণ এরূপ উক্ত হইয়াছে। ফতেচাঁদের জ্যেষ্ঠপুত্র এক পরমা সুন্দরী রমণীর পাণিগ্রহণ করেন। ঐ রমণীর সৌন্দর্য্যের কথা শুনিয়া তাঁহাকে দেখিবার জন্য সরফরাজখাঁর কৌতূহল জন্মিল। তিনি এই কথা ফতেচাঁদকে জানাইলেন। ফতেচাঁদ অসম্মতি প্রকাশ করিয়া নবাবকে বুঝাইয়া বলিলেন যে, ইহাতে তাঁহার কুলে কলঙ্ক ঘটিবে। দরবারস্থ অপরাপর আমীরগণও নবাবকে এইরূপ অধম সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন; কিন্তু নবাব কাহারও কথা গ্রাহ্য করিলেন না। অবশেষে নিরুপায় হইয়া ফতেচাঁদ পুত্রবধূকে এক দিন সন্ধ্যার সময় নবাব-গৃহে প্রেরণ করিলেন। নবোঢ়া সতীত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া স্বগৃহে প্রত্যাগত হইলেও, ইহাতে ফতেচাঁদের যে কুল-কলঙ্ক হইয়াছিল, তাহা তিনি কোন প্রকারেই বিস্মৃত হইতে পারেন নাই *। ফতেচাঁদের সহিত সরফরাজখাঁর মনান্তরের কারণ-সম্বন্ধে শেঠবংশে অন্যরূপ প্রবাদ শুনা যায়। তাঁহারা বলেন, মুরশিদকুলি-জাফরখাঁ শেঠ-মাণিকচাঁদের নিকট সাত কোটি টাকা জমা রাখেন। উক্ত টাকা পরিশোধ না হইতেই নবাব মুরশিদকুলিখাঁ ও শেঠ-মাণিকচাঁদের মৃত্যু হয়। মুরশিদকুলির দৌহিত্র ও উত্তরাধিকারী স্বরূপে নবাব সরফরাজখাঁ মাণিকচাঁদের দত্তক-পুত্র জগৎশেঠ-ফতেচাঁদের নিকট উক্ত গচ্ছিত সাত কোটি টাকা চাহেন। ফতেচাঁদ নবাবের কাছে টাকা পরিশোধের জন্য কিছু সময় চাহিলেন এবং এই অবসরে আলীবর্দ্দীখাঁর সহিত মিলিত হইয়া সরফরাজ খাঁর পদচ্যুতির উপায় দেখিতে লাগিলেন। বৃদ্ধ আলমচাঁদ সরফরাজখাঁর নির্ব্বুদ্ধিতা দর্শনে মর্ম্মাহত হইয়া তাঁহাকে অনেক সময় সদুপদেশ দিতেন। সরফরাজখাঁর সেই সকল কথা ভাল লাগিত না। উপদেশ গ্রহণ করা দূরে থাকুক, সরফরাজখাঁ আমলচাঁদের উপর এজন্য চটিয়া উঠিতেন। এইরূপে অনাদৃত ও অপমানিত হইয়াই আলমচাঁদ ও ফতেচাঁদ গোপনে আলীবর্দ্দীখাঁর পক্ষাবলম্বন করিলেন।

আলমচাঁদ, ফতেচাঁদ প্রভৃতি মুরশিদাবাদের দরবারস্থ কতিপয় প্রধান ব্যক্তি নবাব সরফরাজখাঁর ব্যবহারে বিরক্ত ও আলীবর্দ্দীর সহায়তা করিতে উদ্যত হইয়াছেন ইহা অবগত হইয়া আলীবর্দ্দী জৈনউদ্দিন্-আহম্মদের উপর সুবে-বিহারের শাসনকর্ত্তৃত্ব অর্পণ পূর্ব্বক ভোজপুর যাত্রার ছলে শুভদিনে ১৭৪০ খৃঃ অব্দে † সৈন্য-

* সায়ের-অল-মুতাক্ষরীনে বাদশাহের এই ক্ষমতা প্রদানের কথা লেখা থাকিলেও ফিরিস্তায় অন্য রূপ লিখিত আছে। উহাতে লিখিত আছে যে, আলীবর্দ্দীখাঁ বাদশাহি-ফর্ম্মান জাল করিয়া সুবে-বাঙ্গালার মসনদ অধিকার করেন। ফিরিস্তার কথাই সত্য বলিয়া বোধ হয়। কারণ যে মহম্মদশাহ আলীবর্দ্দীখাঁকে সরফরাজখাঁর সহিত যুদ্ধ করিবার অনুমতি দিলেন, তিনিই সরফরাজখাঁর হত্যাপরাধে আলীবর্দ্দীকে দণ্ডিত ও সরফরাজখাঁর পুত্রকে সুবে-বাঙ্গালার সুবেদারি প্রদানের জন্য মারহাট্টাদিগকে বাঙ্গালা আক্রমণের অনুমতি দিবেন ইহা সম্ভবপর নহে।

* এরূপ প্রবাদ সিরাজদ্দৌলার সম্বন্ধেও শুনা যায়। সিরাজউদ্দৌলার চরিত্রদোষ অতিরঞ্জনপ্রয়াসী ব্যক্তিরাই বোধ হয় সরফরাজখাঁর দোষ সিরাজউদ্দৌলার স্কন্ধে চাপাইয়াছেন।

† ১১৫২ হিজরি-শালের জেলহজ মাসের শেষভাগে।

সমেত আজীমাবাদ (পাটনা) পরিত্যাগ করিলেন। পাটনার কিয়দ্দূরে বারিস্‌খাঁর ইন্দারার ধারে আসিয়াই তিনি আপনার সমুদায় কর্ম্মচারীকে নিকটে আহ্বান করিলেন। সেনানীরা আগমন করিলে আলীবর্দ্দীখাঁ তাঁহাদিগকে বলিলেন,—"আমি আমার শত্রুর সঙ্গে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে যাইতেছি। আপনারা আমার বহুদিনের সঙ্গী। আপনাদের বীর্য্যবত্তার উপরই আমার জয়লাভ সম্পূর্ণ নির্ভর করে। যদি একমাত্র আমার পক্ষাবলম্বনই আপনাদের অভিপ্রেত হয় এবং আমার অদৃষ্টের অংশী হওয়াই শ্লাঘ্য বিবেচিত হয়, তবে আমি আপনাদিগকে অনুরোধ করিতেছি যে, আপনারা শপথ করিয়া বলুন, আমি জলে বা আগুনে প্রবেশ করি, অথবা আফ্রসিয়ব কি রুস্তমের * সঙ্গেই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হই, আপনারা আমাকে পরিত্যাগ করিবেন না। আপনারা শপথ করিয়া বলুন, আমার মিত্রেরাই আপনাদের মিত্র হইবে, আমার শত্রুরাই আপনাদের শত্রু হইবে এবং আমার অদৃষ্টে যাহাই ঘটুক তৎপ্রতি ভ্রুক্ষেপ না করিয়া আপনারা আমার নিমিত্ত আপনাদের ধনপ্রাণ সমর্পণ করিতে প্রস্তুত হইবেন।" এইরূপে সম্বোধন করিয়া আলীবর্দ্দীখাঁ হিন্দু-মুসলমান সকলকেই শপথ করিতে অনুরোধ করিলেন। আলীবর্দ্দীর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। আলীবর্দ্দীর নিকট হইতে এযাবৎ যে যত উপকার প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা স্মরণপূর্ব্বক হিন্দু সেনাপতিরা ব্রাহ্মণের চরণ ও তুলসীপত্র ধারণ এবং গঙ্গাজল পান করিয়া, মুসলমানেরা কোরান-সরিফ্ স্পর্শ করিয়া একবাক্যে বলিলেন যে, আপনি আমাদিগকে যে স্থানে লইয়া যাইবেন, আমরা সেই স্থানেই আপনার অনুসরণ করিব। এইরূপে আলীবর্দ্দীখাঁ আশ্বস্ত হইয়া সেনাপতিদিগকে প্রকৃত কথা জানাইলেন, তিনি বলিলেন,—"নবাব সরফরাজ্‌খাঁ আমার নিজের, আমার ভ্রাতার এবং আমাদের পরিবারস্থ প্রত্যেকের বহুবিধ অনিষ্টসাধন করিয়াছেন। সেই সকল অনিষ্টের অপনয়ন জন্য আমি আততায়ী সরফরাজখাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছি।" এই অচিন্ত্যনীয় বাক্য শ্রবণ করিয়া অনেকে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছিলেন, কিন্তু যখন শপথ করিয়াছেন তখন আর ভাবিয়া কি হইবে, ইহা মনে করিয়া কেহই কোন আপত্তি করিলেন না। আলীবর্দ্দীখাঁ সসৈন্যে অবিশ্রান্ত চলিয়া শাহবাদ শহরে * আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পর্ব্বতের মধ্য দিয়া গঙ্গার তীরে যাইবার যে একমাত্র পথ ছিল, সেই পথ রোধ করিয়া উক্ত সহরে একটী দুর্গ বিদ্যমান ছিল। আলীবর্দ্দীখাঁ সমীপস্থ পর্ব্বতের অন্তর্দ্দেশে সৈন্যদিগকে লুক্কায়িত রাখিয়া অসীম-সাহসী পাঠান সেনানী মুস্তফাখাঁকে ডাকিয়া বলিলেন,—"আপনি এক শত ঘোড়-সওয়ার লইয়া এই গিরিশঙ্কট উত্তীর্ণ হউন। সরফরাজখাঁ অপর কোনও সেনাপতিকে এই ছাড়পত্র ও হুকুমনামা দিয়াছিলেন। আমি কৌশলক্রমে তাহা হস্তগত করিয়াছি। আপনি এই ছাড়-পত্র লইয়া অগ্রসর হউন। দুর্গদ্বারে উপস্থিত হইয়া ছাড়পত্র দেখাইবেন। তাহা হইলে কেহই আপনাকে শত্রুপক্ষীয় বলিয়া চিনিতে পারিবে না। গিরিশঙ্কট হস্তগত করিয়া নাগরার বাদ্য করিলেই আমরা সকলে অগ্রসর হইব। দুর্গমধ্যে দুই শতের অধিক সৈন্য নাই। ইহারা কোনরূপ

* আফ্রাসিয়ার ইরান-দেশ (পারস্য) জয় করিয়া তথায় রাজত্ব করেন। রুস্তম ইরানের (পারস্যের) অন্তঃপাতী সবোলেস্তান প্রদেশের বিখ্যাত নরপতি ছিলেন। ইহাঁরা উভয়েই অলৌকিক বল বিক্রমের জন্য প্রসিদ্ধ।

* জিলা শাহাবাদ নহে। এই শাহবাদ শহর সম্ভবতঃ তেলিয়াগঢ়ী ও রাজমহলের নিকটস্থ কোন স্থান হইবে।

বিপদ আশঙ্কা করিতেছে না। সুতরাং আপনি সহজেই কার্য্যোদ্ধার করিতে পারিবেন।" মুস্তাফাখাঁ এইরূপে আদিষ্ট হইয়া শতসংখ্যক অশ্বসাদী সমভিব্যাহারে দুর্গদ্বারে উপস্থিত হইয়া লোক দ্বারা হুকুমনামা ও ছাড়পত্র দুর্গমধ্যে প্রেরণ করিলেন। দুর্গদ্বার উন্মুক্ত হইল। মুস্তাফাখাঁ সসৈন্যে দুর্গমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া নাগরার বাদ্য করিলেন। এই সাঙ্কেতিক বাদ্য শুনিয়া আলীবর্দ্দীখাঁর কটকের অগ্রবর্ত্তী সৈন্যেরা ব্যূহ রচনা পূর্ব্বক নিশান উড়াইয়া রণবাদ্যের তালে তালে পদচালনা করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিল। দুর্গরক্ষক সৈনিকেরা ইহাতে ভীত হইয়া দুর্গদ্বার বন্ধ করিয়া দিল এবং আত্মরক্ষার্থ রণবেশে সজ্জিত হইল। মুস্তাফাখাঁ দুর্গরক্ষকদিগকে রণোদ্যত দেখিয়া বলিলেন যে, তোমরা যদি দুর্গরক্ষার্থ অল্পমাত্রও চেষ্টা কর তবে এখনই তোমাদিগকে তরবারির আঘাতে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিব। মুস্তাফাখাঁর বাক্যে দুর্গরক্ষকগণ ভয়বিহ্বলচিত্তে যথাস্থানে চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় নিশ্চেষ্টভাবে দণ্ডায়মান রহিল। মুস্তাফাখাঁ পুনর্ব্বার দ্বার খুলিয়া দিলেন। আলীবর্দ্দীখাঁর অগ্রবর্ত্তী সেনা নির্ব্বিরোধে দুর্গমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দুর্গ অধিকার করিল।

পাটনা হইতে যাত্রা করিবার পূর্ব্বে আলীবর্দ্দীখাঁ জগৎশেঠ-ফতেচাঁদের নিকট যে লিপি প্রেরণ করিয়াছিলেন, সেই লিপি পূর্ব্বের বন্দোবস্ত অনুসারে শাহবাদের দুর্গ অধিকারের দিবস ফতেচাঁদের হস্তে অর্পিত হইল। ফতেচাঁদ আলীবর্দ্দীর মুরশিদাবাদের অভিমুখে যাত্রার তারিখ ধরিয়া গণনা করিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, আলীবর্দ্দীখাঁ এতদিনে সম্ভবতঃ তেলিয়াগঢ়ী * গিরিসঙ্কটের সমীপস্থ হইয়াছেন, আর ৪। ৫ দিবসেই মুরশিদাবাদে পঁহুছিবেন। তিনি পত্রপাঠে যেন বড়ই বিস্মিত ও চকিত হইয়াছেন এইরূপ কৃত্রিম ভাব ধারণ করিয়া তৎক্ষণাৎ নবাবের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং নিজের নামে ও নবাবের নামে আলীবর্দ্দীর নিকট হইতে যে দুই খণ্ড লিপি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহা সরফরাজখাঁর হস্তে প্রদান করিয়া বলিলেন, আমার বোধ হয় এতদিনে আলীবর্দ্দী রাজমহল পর্য্যন্ত আসিয়াছেন। নবাবের নামে যে লিপি প্রেরিত হইয়াছিল, তাহার মর্ম্ম এইরূপ;—"আপনি আমার অগ্রজ হাজি-আহম্মদকে সর্ব্বসমক্ষে অপমানিত এবং আমাদের পরিবারের সম্মান ও সতীত্ব হানি করিবাতে, আপনি আমাদিগকে আর লাঞ্ছিত করিতে না পারেন এই নিমিত্ত, আপনার এই দাস এতদূর আসিতে বাধ্য হইয়াছে। প্রভুভক্তি-প্রদর্শন এবং প্রভুর আদেশ প্রতিপালনই

* তেলিয়াগঢ়ী।—"গঢ়ী" শব্দের অর্থ ছোট গড়। হিন্দি ভাষায় "গড়" শব্দটি "গঢ়" লিখিত হয়। তেলিয়াগঢ়ী রাজমহল পর্ব্বতশ্রেণীর উত্তরাংশে ও গঙ্গানদীর দক্ষিণে অবস্থিত। এই তেলিয়াগঢ়ী গিরিশঙ্কট ও গঙ্গানদী এতদুভয় দিয়া শত্রুসৈন্য গমনাগমন করিতে না পারে, এ নিমিত্তই বোধ হয়, আকবর-শাহের জনৈক সেনাপতি মানসিংহ ১৫৯২ খৃঃ অব্দে বাঙ্গালা ও বিহারের মধ্যস্থল রাজমহলে (আকবরনগরে) রাজধানী স্থাপন করেন। পূর্ব্বে বাঙ্গালা আক্রমণ উদ্দেশ্যে এই তেলিয়াগঢ়ী-গিরিশঙ্কট অতিক্রম করিয়াই আক্রমণকারীরা আগমন করিত; সুতরাং মুসলমানেরা ইহার রক্ষা-বিধানের সুবন্দোবস্ত করিয়াছিল। এক্ষণ এই গিরিশঙ্কটের মধ্য দিয়াই ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-রেলওয়ে-কোম্পানির লুপ-লাইন চলিয়া গিয়াছে। রাজমহল-পর্ব্বত-শ্রেণীতে তেলিয়াগঢ়ী ব্যতিরেকে আরও কতিপয় গিরিশঙ্কট আছে। উহাদের নাম, যথা;—চপরভিটা, মাঝবা, মার্গ, পাঁচবারা (কেন্দুয়া), রাণীবহাল, খাটিয়ারি প্রভৃতি। তেলিয়াগঢ়ী ও সক্রিগলী এই দুইটি গিরিশঙ্কটই বিহার হইতে বাঙ্গালায় প্রবেশের দ্বারা বলিয়া পরিগণিত ছিল; কিন্তু ১৭৪০ খৃঃ অব্দে মারহাট্টা রঘুজী-ভোসলা এই উভয় গিরিসঙ্কট বামে ফেলিয়া দক্ষিণ দিক দিয়া অন্য এক নূতন পথে বাঙ্গালায় প্রবেশ করিয়াছিলেন। তেলিয়াগঢ়ীর পথের উভয় প্রান্ত প্রাচীর দ্বারা আবদ্ধ ছিল। সক্রিগলীর পথ পরিসরে ১০ ফুট ও জঙ্গলময়।

আমার একমাত্র বাসনা। সুতরাং আপনি ভরসা করি যে, আপনি হাজি-আহম্মদকে পরিবার ও অনুচরবর্গসহ এ দাসের নিকট চলিয়া আসিতে অনুমতি দিবেন।" সরফরাজখাঁ পত্রপাঠে চমৎকৃত ও ইতিকর্ত্তব্যবোধশূন্য হইয়া প্রথমতঃ কৃতকগুলি অর্থশূন্য গালি বর্ষণ দ্বারা আপনার হৃদয়ের তাপ দূর করিয়া পরে প্রধান কর্ম্মচারিগণকে দরবারে আহ্বান করিলেন। সকলে দরবারে উপস্থিত হইলে সরফরাজখাঁ হাজি-আহম্মদকে তীব্র ভর্ৎসনা করিলেন ও কঠিন শাস্তি-প্রদানের ভয় দর্শাইলেন। হাজি-আহম্মদ এই বিপদ সময়ে স্বভাবসিদ্ধ মৃদুতা অবলম্বন করিয়া নবাবকে মধুর বিনীতবাক্যে আশ্বস্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি শপথ করিয়া বলিলেন যে, নবাব যদি আমাকে আলীবর্দ্দীর তাম্বুতে যাইতে অনুমতি দেন, তবে আমি আলীবর্দ্দীকে পাটনায় ফিরিয়া যাইতে অবশ্যই প্রবর্ত্তিত করিতে পারিব। হাজি-আহম্মদের এই প্রস্তাব সম্বন্ধে দরবারে অনেকরূপ বাদানুবাদ চলিতে লাগিল। কেহ বা তাঁহাকে মুরশিদাবাদে আবদ্ধ করিয়া রাখিবার পক্ষে, কেহ বা ছাড়িয়া দেওয়ার পক্ষে, মত প্রকাশ করিলেন। অবশেষে মহম্মদ-ঘৌশখাঁ বলিলেন যে,—"এই বৃদ্ধকে আবদ্ধ করিয়া রাখিলে যে কি লাভ হইবে তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না। ভ্রাতা কারারুদ্ধ আছেন বলিয়া আলীবর্দ্দীখাঁ যে স্বকীয় সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিবেন ইহা বোধ হয় না। অতএব হাজি-আহম্মদ এখানেই আবদ্ধ থাকুন, কিংবা আলীবর্দ্দীর কাছেই চলিয়া যাউন, তাহাতে কিছুই আসে যায় না। হাজি-আহম্মদ যদি তাঁহার প্রতিজ্ঞানুযায়ী কার্য্য করেন, তবে ভালই; আর যদি তাহা না করেন, তাহাতে আমাদেরই বা ক্ষতি কি? আমরা যদি আলীবর্দ্দীর সহিত যুদ্ধ করিবার সঙ্কল্প করিয়া এখন হইতেই তাহার উদ্যোগ করি, তাহা হইলে হাজি তাঁহারা ভ্রাতার সঙ্গে যোগই দিউন আর না-ই দিউন, ইহাতে আমি লাভালাভ দেখিতে পাইতেছি না। হাজি-আহম্মদের সহিত কোন সৈন্য নাই। তিনি আলীবর্দ্দীর তাঁবুতে গেলে আলীবর্দ্দীর বলবৃদ্ধি বা বলক্ষয় হইবে না ইহা বলিয়া ঘৌশখাঁ নীরব হইলেন। মহম্মদ ঘৌশখাঁ বীর সজ্জন ও রাজভক্ত ছিলেন এই সকল মহৎ গুণ থাকাতে নবাবাসুজাখাঁ তৎপুত্র সরফরাজখাঁ তাঁহাকে যথেষ্ট আদর সম্মান করিতেন এবং অপর সকলেই শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন। তাঁহার বীরগর্ব্বে গর্ব্বিত অন্তঃকরণ কোনও কাপুরুষোচিত কর্ম্মের সমর্থন করিতে পারিত না। তিনি শত্রুকেও বীরোচিত সদয় ব্যবহার করিতেন। কুচক্রী হাজি আহম্মদকে তিনি অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন। হাজিকে কারারুদ্ধ করিবার প্রস্তাব তাঁহার অনুমোদিত হইল না। কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে যাঁহারা গোপনে আলীবর্দ্দীর পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন, তাঁহারা ত হাজিকে ছাড়িয়া দিতে পূর্ব্ব হইতেই সম্মত ছিলেন; যাঁহারা নবাবের হিত-কামনায় কিংবা হাজির প্রতি বিদ্বেষ বশতঃ তাঁহাকে কারাবদ্ধ করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাঁহারাও ঘৌশখাঁর বাক্যে নিরস্ত হইলেন। সুতরাং দরবারস্থ সকলের অভিমত হওয়াতে সরফরাজখাঁ হাজি-আহম্মদকে আলীবর্দ্দীর নিকট চলিয়া যাইতে অনুমতি দিলেন।

হাজি-আহম্মদ মুরশিদাবাদ হইতে যাত্রা করিয়া পুনঃ পুনঃ পত্র দ্বারা এবং আপনার মুরশিদাবাদস্থ বন্ধুগণ দ্বারা সরফরাজখাঁকে এই বুঝাইতে লাগিলেন যে,—"মহম্মদ-আলীবর্দ্দীখাঁ" পূর্ব্ববৎ এখনও আপনার বিশ্বস্ত ভৃত্য "মধ্যে গণ্য হইতে পারে তদ্বিষয়ে আপনি কোন "সন্দেহ করিবেন না। যে ক্ষমতাশালী ভৃত্য "আপনার আনুগত্য স্বীকার করে এবং আপনার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে, সেই ভৃত্যের "বিরুদ্ধে আপনার অস্ত্রধারণ কর্ত্তব্য নহে। "আপনি প্রাসাদ মধ্যে অটল ভাবে অবস্থিতি "করুন। আলীবর্দ্দী রাজভবনের দ্বারদেশস্থ "মৃত্তিকা চুম্বন করিতে যাইতেছে। সে "তথায় উপস্থিত হইয়া, সে যে এখনও আপনার "কর্ত্তব্যপরায়ণ বিনীত দাস, অভিযোগ জ্ঞাপন ও "রাজভক্তি প্রদর্শন দ্বারা তাহাই সপ্রমাণ "করিবে। ইহাই তাহার একমাত্র লক্ষ্য। যদি "মহাশয় কোন কোন স্বার্থপর লোকের উত্তে"জনায় আপনার এ দাসের উপদেশ অগ্রাহ্য "করিয়া আলীবর্দ্দীর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন, "তাহা হইলে, আমার আশঙ্কা হইতেছে, "আলীবর্দ্দী হতাশ হইয়া নিজের সম্ভ্রম ও "জীবন রক্ষা হেতু, হয়ত এমন কোন কার্য্য "করিবে, যদ্দ্বারা ইহলোকে ও পরলোকে তাহার "অপযশঃ ঘোষিত হইবে।"

হাজি-আহম্মদকে আলীবর্দ্দীর নিকট প্রেরণ করাতে যে বিশেষ কোন ফলোদয় হইবে তাহা কেহই আশা করেন নাই। এক্ষণ রাজধানীর বহির্দ্দেশে যাইয়াই আলীবর্দ্দীর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত, না আলীবর্দ্দীকে রাজধানী পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে দেওয়া হইবে, ইহা লইয়া দরবারে আবার বাগ্‌বিতণ্ডা চলিল। অবশেষে যুদ্ধযাত্রা করাই পরামর্শসিদ্ধ হইল। মর্দ্দান্-আলীখাঁর বিশেষ চেষ্টায় সরফরাজখাঁ যুদ্ধযাত্রাপূর্ব্বক সসৈন্যে মুরশিদাবাদ হইতে বহির্গত হইয়া ৩। ৪ দিবসে **কোমড়া** নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন। ১১৫৩ হিজরি-শালের মহরম মাসের ২২শে তারিখে তাঁহারা এথায় উপস্থিত হন। সরফরাজখাঁ ইতিপূর্ব্বে আলীবর্দ্দীর মনোগতভাব বুঝিবার জন্য হুগলীর ফৌজদার সুজাকুলিখাঁকে ও সন্নং নামক জনৈক খোজাকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইহাঁদের

সহিত নবাবের কোমড়াতে সাক্ষাৎ হয়। মহম্মদ-আলীখাঁ নামে কোনও চিকিৎসক ইহাঁদের সঙ্গে আলীবর্দ্দীর দূত স্বরূপে আগমন করিয়াছিলেন। আলীবর্দ্দী ইহাঁদিগকে যাহা বলিয়া দিয়াছিলেন তাহা এই;—

"যখন কোন সদাশয় নরপতি কাহাকেও "স্বেচ্ছাক্রমে উচ্চ পদ ও সম্মান প্রদান করেন, "তখন হইতেই তাহাকে তিনি আপনার শিষ্য "ও প্রতিপাল্য বলিয়া গণ্য করেন, এবং তাহার "সম্ভ্রম যাহাতে লোকসমাজে অব্যাহত থাকে "তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখেন। সকলেই অবগত আছে, "আপনার পিতা-মাতার কৃপাতেই আমার উন্নতি "লাভ হইয়াছে, নিরস্থ ধূলিকণা সদৃশ এই "অধমকে তাঁহারাই স্বর্গতুল্য উচ্চতায় উত্থিত "করিয়াছেন। আমি আপনাদের নিকট যেরূপ "কৃতজ্ঞ তাহা স্মরণ করিতেও আমার হৃদয় "অভিমানে স্ফীত হয়। আমার প্রভুভক্তি যে "কাহারও অপেক্ষা ন্যূন নহে, ইহা সাধারণের "অবগতির জন্য, আমি আপনার নিকট বিনীত "ভাবে প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনি আমার "দুইটি অনুরোধের একটি রক্ষা করিবেন। প্রথম "অনুরোধ এই যে,—মর্দ্দান্-আলীখাঁ, হাজি-"লুৎফুল্লাখাঁ, মীর-মুরতজাখাঁ এবং মহম্মদ-"ঘৌশখাঁ এই চারি ব্যক্তিকে আপনার নিকট "হইতে দূর করিবেন। আমাদের উন্নতি ইহাঁ-"দের অসহ্য। ইহাঁরা আপনাকে নানা কথা "বলিয়া আমাদের প্রতি আপনার বিদ্বেষ জন্মা-"ইয়া দিয়াছেন; সেই জন্যই বর্ত্তমান গোলযোগ "উপস্থিত হইয়াছে। ইহাঁরা তাড়িত হইলেই "আমি নিরাপদ হইব ও আপনার কাছে যাইয়া "আমার ভক্তি জানাইব। দ্বিতীয় অনুরোধ "এই যে,—যদি আপনি আমার এই প্রার্থনা "পূর্ণ করিতে না পারেন, তবে আপনি রাজ-"ধানীতে চলিয়া যাইবেন এবং তথা হইতেই "উক্ত চারি ব্যক্তিকে যুদ্ধ করিবার আদেশ করি-

"বেন। ইহাঁরা আমার সহিত যুদ্ধ করিয়া যদি "জয়ী হন, তবে ইহাঁরাই আপনার মন্ত্রিত্ব পদে "প্রতিষ্ঠিত থাকিবেন; আর যদি আমি জয়ী "হই, তবে ইহাঁদিগকে দূর করিয়া দিবেন, আমি "আপনার সাক্ষাতে যাইয়া আপনার চরণতলে "আমার মস্তক লুণ্ঠিত করিব। আমার এই "সকল কথা যে সত্য তাহার নিদর্শন স্বরূপ "এই সঙ্গে এক খণ্ড কোরান-সরিফ্ পাঠাইয়া "দিতেছি, আমি ঐ কোরান স্পর্শ করিয়া শপথ "করিয়াছি।" এই বার্ত্তা নবাবের গোচর করিয়া মহম্মদ-আলীখাঁ আলীবর্দ্দীর প্রেরিত কোরাণ নবাবের সমক্ষে রাখিলেন।* বলা বাহুল্য যে, সরফরাজখাঁ যুদ্ধের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলেন না; কিন্তু তখনও সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবার সমুচিত আয়োজন করা হয় নাই। ইতিমধ্যে হাজি-আহম্মদ রাজমহলে যাইয়া আলীবর্দ্দীখাঁর সহিত মিলিত হইলেন। আলীবর্দ্দী ভ্রাতাকে আলিঙ্গন করিয়া আপনার হস্তিপৃষ্ঠে উঠাইয়া লইলেন এবং সরফরাজখাঁর নিকট হাজি-আহম্মদের অঙ্গীকার রক্ষা করিবার জন্য হাতী ফিরাইয়া দিয়া কিয়দ্দূর পশ্চাৎপদ হইলেন, পরে সৈন্যদিগের সঙ্গে মিলিত হইয়া মুরশিদাবাদ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। আলীবর্দ্দী সসৈন্যে অগ্রসর হইতেছে ইহা শুনিয়া সরফরাজখাঁ আরও কিছু দূরে যাইয়া মুরশিদাবাদের ২২ মাইল উত্তরে গড়িয়া* নামক গ্রামে শিবির স্থাপন করিলেন। কিন্তু মহম্মদ-ষৌশখাঁ আরও অগ্রবর্ত্তী হইয়া নদীর পরপারে সুতী নদীতীরে আলীবর্দ্দীর তাঁবুর ৫।৬ ক্রোশ ব্যবধানে ছাউনি করিলেন। কিছুকাল সরফরাজখাঁ ও আলীবর্দ্দীর বিরোধ মীমাংসার প্রস্তাব চলিতে লাগিল। সরফরাজখাঁ আলীবর্দ্দীকে আপনার শিবিরে আসিয়া সাক্ষাৎ করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন এবং তাঁহার প্রতি সদয় ব্যবহার করিবেন এরূপ অঙ্গীকার করিলেন। আলীবর্দ্দী সাক্ষাৎ না করিয়া সরফরাজখাঁকে পুনরায় বলিয়া পাঠাইলেন যে,—"যে সকল ব্যক্তি আমাদের পরিবারের পরম শত্রু এবং যাঁহাদের কার্য্যে আপনার সহিত আমার মনান্তর ঘটিয়াছে, তাঁহাদিগকে যদি আপনি পদচ্যুত করেন, তাহা হইলেই আপনার পিতার নিকট হইতে আমি যে সকল উপকার পাইয়াছি, সেই সকল কৃতজ্ঞহৃদয়ে স্মরণ করিয়া আপনার সম্বন্ধে আমার কোন অসদভিপ্রায় থাকিবে না। যদি আপনি তাঁহাদিগকে পদচ্যুত না করেন, তবে আমার হস্তে সমর্পণ করুন; যদি তাহাও না করেন, তবে অদূরে যে উন্নত ভূমি দেখা যাইতেছে তথায় শিবির স্থাপন করিয়া যুদ্ধ দর্শন করুন। আমি জয়ী হইলে আপনার সমীপে উপস্থিত হইয়া আপনাকে সমুচিত সম্মান করিব, আমি পরাজিত হইলে আপনার যেরূপ অভিরুচি হয় আমার প্রতি সেইরূপ ব্যবহারই করিতে পারিবেন।" এইরূপে উভয় পক্ষে সংবাদ আদান প্রদান চলিতে লাগিল। ইতিমধ্যে জগৎশেঠ-ফতেচাঁদ আলীবর্দ্দীর প্রত্যেক সেনাপতিকেই এই মর্ম্মে "টিপ" (পত্র) পাঠাইতে লাগিলেন যে, যিনি আলীবর্দ্দীকে গিরেফতার করিয়া নবাবের নিকট পাঠাইতে পারিবেন তিনি অনেক টাকা পারিতোষিক পাইবেন। * মুস্তফাখাঁ ও অন্যান্য সেনাপতিরা ফতেচাঁদের সাঙ্কেতিক "টিপ" পাইয়া আলীবর্দ্দীখাঁকে তাহা দেখাইলেন এবং কালবিলম্ব না করিয়া কল্য প্রাতেই যুদ্ধ করা উচিত ইহা বলিলেন। আলীবর্দ্দীরও তাহাই অভিমত হওয়াতে সৈন্যদিগকে বারুদগুলি প্রদানের অনুমতি দিলেন। আলীবর্দ্দী সৈন্যদিগকে তিন ভাগে বিভক্ত করিলেন। নন্দলাল নামক জনৈক হিন্দুর নেতৃত্বে এক ভাগ সৈন্য রাখিয়া তাঁহাকে মহম্মদ-ষৌশ খাঁর সহিত যুদ্ধ করিতে আদেশ করিলেন। আলীবর্দ্দী আপন ধ্বজও নন্দলালের হস্তে দিলেন। অপর দুই ভাগ সৈন্য লইয়া আলীবর্দ্দী নদী পার হইলেন। পার হইয়াই এক ভাগ লইয়া আলীবর্দ্দী স্বয়ং সরফরাজ খাঁর সেনানিবেশের পশ্চাদ্ভাগে চলিলেন, আর এক ভাগ নবাজিস্-মহম্মদ খাঁর অধ্যক্ষতায় নবাব-সেনার সম্মুখবর্ত্তী হইবার জন্য নদীর পার ধরিয়া চলিল। আবদুল্-আলীখাঁ, মুস্তফাখাঁ, শামশেরখাঁ প্রভৃতি পাঠান-সেনানী নবাজিস্-মহম্মদখাঁর আজ্ঞানুবর্ত্তী থাকিলেন। এই তিন ভাগ সেনাই নিবিড় অন্ধকারে প্রচ্ছন্নভাবে গন্তব্যস্থলে চলিল। অতি প্রত্যূষে আলীবর্দ্দীখাঁ বন্দুক ছুড়িয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার সঙ্কেত করিলেন। বন্দুকের শব্দ শুনিয়া নন্দলাল ষৌশখাঁকে এবং নবাজিশ্-মহম্মদ খাঁ নবাব-সরফরাজখাঁকে আক্রমণ করিলেন। তৎকালে সরফরাজখাঁ নমাজ পড়িতেছিলেন, বন্দুকের শব্দ শুনিয়া অমনি হাতীতে উঠিলেন এবং আলীবর্দ্দীখাঁর অভিমুখে ধাবিত হইলেন। এ দিকে আলীবর্দ্দীর পক্ষীয় কতিপয় সৈন্য পশ্চাৎদিক হইতে নবাবের শিবিরে প্রবেশ করিয়া দ্রব্যজাত লুঠ করিতে লাগিল। ইহাদিগকে নিবারণ করিতে যাইয়া নবাবপক্ষীয় মির্জ্জা-জরজখাঁর পুত্র ও কতিপয় সৈন্য নিহত হইল। সরফরাজখাঁ নাগরাখানা অতিক্রম করিয়া অল্প দূরে যাইয়াই বিপক্ষীয় বন্দুকের গুলির আঘাতে পঞ্চত্ব পাইলেন।* নবাবপক্ষীয় রায়রায়া-আলমচাঁদ ও মির্জ্জাজরজ খাঁ† আহত হইয়া মুরশিদাবাদে চলিয়া গেলেন।

* সায়র-অল-মুতাক্ষরিনের ইংরেজি অনুবাদক "নোটা-মেনাস্" বলেন যে, আলীবর্দ্দী প্রকৃতপক্ষে কোরান প্রেরণ করেন নাই; এক খণ্ড ইষ্টক কোরানের আয়তনে কাটিয়া লইয়া তাহা স্বর্ণ-খচিত বস্ত্র দ্বারা মণ্ডিত করিয়া সরফরাজখাঁর নিকট পাঠাইয়াছিলেন। ১৭৪০ খৃঃ অব্দে গড়িয়ার যুদ্ধ ঘটে; ১৭৮৯ খৃঃ অব্দে সায়র-অল-মুতক্ষরিনের ইংরেজি অনুবাদ মুদ্রিত হয়। ৪৯ বৎসর পরেও "নোটা-মেনাসে"র প্রকৃত কথা জানিবার যথেষ্ট সুবিধা ছিল। মূল-গ্রন্থ-প্রণেতা সৈয়দ গোলামহুসেন-খাঁ স্থানে স্থানে আলীবর্দ্দীর দোষ গোপনের যে চেষ্টা করিয়াছেন, ইহা অপরাপর ইতিহাস মিলাইয়া লইলেই স্পষ্ট বুঝা যায়। গোলামহুসেন আলীবর্দ্দির দ্বারা অনেক বিষয়ে উপকৃত ছিলেন।

* গড়িয়া।—সুতীর দক্ষিণে চড়া ভূমিতে গড়িয়া গ্রাম অবস্থিত। পদ্মানদীর গঙ্গা হইতে বহির্গমনের স্থানেই গড়িয়া গ্রাম। সরফরাজখাঁর সহিত আলীবর্দ্দীর ১৭৪০ খৃঃ অব্দের গড়িয়ার যুদ্ধ-বিবরণ কোনও উর্দ্দু কাব্যে বর্ণিত আছে। এই স্থানে ১৭৫৩ খৃঃ অব্দের ২৪শে জুলাই তারিখে নবাব-মীরকাশিমের সহিত ইংরেজ-পক্ষীয় মেজর-আডামসের চারি ঘণ্টাব্যাপী ঘোর যুদ্ধ হয়। ঐ যুদ্ধে ইংরেজের জয় হয়। মীরকাশিম মুঙ্গের অভিমুখে পলাইয়া যান। ইহার পরে বাঙ্গালা প্রদেশের কুত্রাপি এরূপ সম্মুখ সমর হয় নাই।

* সৈয়দ্-গোলামহোসেনখাঁ এই কথা লিখিলেও ইহা সত্য বলিয়া বোধ হয় না। কারণ ফতেচাঁদ পূর্ব্ব হইতেই গোপনে আলীবর্দ্দির পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন। ইহা যদি যথার্থও হয়, তবে সরফরাজখাঁর নিকট আপনার বিশ্বস্ততা সপ্রমাণের জন্য কিংবা আলীবর্দ্দির সেনাপতিরা কতদূর বিশ্বাসী তাহা দেখিবার জন্য আলীবর্দ্দির জানিত মতে এরূপ করিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে সায়র-অল-মুতাক্ষরিনের ইংরেজি-অনুবাদক "নোটা-মেনাস্" লিখিয়াছেন যে, "আমরা নিশ্চয়রূপে জানি এবং সকলেই এ কথা বলিয়া থাকে, আলীবর্দ্দিখাঁ ফতেচাঁদের দ্বারা সরফরাজখাঁর সেনাপতিদিগকে ঐরূপ উৎকোচ দিতে চাহিয়াছিলেন। সরফরাজখাঁর পক্ষীয় জনৈক কর্ম্মচারীর নিকট আমরা শুনিয়াছি, তোপের ভিতর বারুদ না ভরিয়া মাটি ভরিলে চারি হাজার টাকা পাইবেন এই মর্ম্মে এক "টিপ" তাঁহাকে দেওয়া হয়। মুরশিদাবাদের লোকেরা এখনও বলে যে, কতক তোপে প্রকৃত পক্ষেই মাটি ভরা হইয়াছিল। আশ্চর্য্যের কথা এই যে, সৈয়দ-গোলাম-হোসেনখাঁ এতদ্বিষয়ে কোন কথা বলেন নাই।"

† হণ্টার সাহেব "মুরশিদাবাদের ষ্টাটিষ্টিকাল-আকাউণ্ট" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন;—সরফরাজখাঁ হাতীর উপর হইতে সাহসের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে বন্দুকের গুলিতে মৃত্যুমুখে পতিত হইলে এই যুদ্ধের জয়-পরাজয় তৎকালেই স্থিরীকৃত হইয়াছিল।

সরফরাজখাঁ যুদ্ধই করেন নাই যুদ্ধ করিতে চলিয়াছিলেন, এমন সময় হঠাৎ বন্দুকের গুলি লাগিয়া মরিয়া যান। কেবল হণ্টার সাহেব কেন, এমন অনেক সাহেব, মনগড়া কথা লিখিয়া আমাদের দেশের ইতিহাস পূর্ণ করিয়াছেন ও করিতেছেন।

† বাদশাহ-আওরঙ্গজেবের দ্বিতীয় পুত্র মহম্মদ-

নদীর অপর পারে ষৌশখাঁর সহিত যুদ্ধে নন্দলাল নিহত হওয়াতে তাঁহার অধীনস্থ সৈন্যেরা রণ ভঙ্গ দিয়া পলাইয়া গেল। ষৌশখাঁ রণজয়ী হইয়াই দেখিতে পাইলেন যে, যে দিক দিয়া নন্দলালের সৈন্যেরা পলাইয়া যাইতেছে, সেই দিক দিয়া সরফরাজখাঁর মাহুত নবাবের হস্তী মুরশিদাবাদ অভিমুখে ধাবিত করিয়াছে। ষৌশখাঁ নবাবের এই কাপুরুষতায় বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে নবাবকে ফিরাইয়া লইয়া আসিবার জন্য দ্রুত অশ্বারোহণে এক সৈনিক পুরুষকে পাঠাইয়া দিলেন এবং তাঁহাকে স্বকীয় রণজয় সংবাদ নবাবের গোচর করিতে বলিয়া দিলেন। সৈনিক-পুরুষ শীঘ্রই ফিরিয়া আসিয়া নবাবের মৃত্যু সংবাদ ষৌশখাঁকে বলিলেন। হাজি-আহম্মদ ও আলীবর্দ্দীখাঁকে ষৌশখাঁ পূর্ব্বাপর যেরূপ ঘৃণা করিয়া আসিতেছেন, তাহাতে ষৌশখাঁ আলীবর্দ্দী হইতে সদ্ব্যবহার প্রাপ্তির আশা করিতে পারেন না। সুতরাং তিনি জীবনধারণ নিষ্ফল জ্ঞান করিয়া আপন পুত্রদ্বয় মহম্মদ-কুতুব ও মহম্মদ-পীরকে ডাকিয়া বলিলেন,—"যুদ্ধে মৃত্যু ভিন্ন আর গত্যন্তর দেখিতেছি না। সরফরাজ-খাঁর মৃত্যুর "সঙ্গে সঙ্গে আমরাও প্রাণশূন্য হইয়াছি। চল "আমরা এক্ষণ আলীবর্দ্দীর সম্মুখীন হইয়া "জন্য শত্রুশোণিতে হস্ত প্রক্ষালিত করি "করিতে ঐ অদূরস্থ বিপক্ষ-বল ভেদ করি "যাই।" ষৌশখাঁ ও তাঁহার পুত্রদ্বয় বলবিক্রমে আর্য্যাবর্ত্তের ভীমসেন, য়ুরোপের হারকুলিশ ও পারস্যের রুস্তম্ সদৃশ ছিলেন। যুদ্ধকালে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করিতে তাঁহারা জানিতেন না; বরং বীরোচিত মৃত্যুই শ্লাঘ্য মনে করিতেন। সরফরাজখাঁর মৃত্যুসংবাদ ষৌশখাঁর সৈন্যদিগের বিদিত হওয়াতে অনেকেই আর যুদ্ধ করা বৃথা মনে করিয়া পলায়নপর হইয়াছিল। ষৌশখাঁ মৃত্যুকেই আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, সুতরাং যে অল্পসঙ্খ্যক সৈন্য পলায়ন অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়ঃ বলিয়া বোধ হইয়াছিল, কেবল তাহাদিগকে লইয়া তিনি আলীবর্দ্দীর বৃহৎ সৈন্যশ্রেণীর সম্মুখীন হইয়া চলিলেন।

এদিকে আলীবর্দ্দীও তাঁহার সৈন্যসমূহে শৃঙ্খলাবন্ধনে অসমর্থ হইয়া অতিশয় চিন্তিত হইয়াছিলেন। তিনি ষৌশখাঁর অদম্য সাহস ও অলৌকিক বীর্য্যবত্তার বিষয় বিলক্ষণ জানিতেন। তাঁহার স্বপক্ষীয় সেনাপতি নন্দলাল এবং বিপক্ষীয় নবাব-সরফরাজখাঁ যে নিহত হইয়াছেন, তাহাও তিনি শুনিয়াছিলেন কিন্তু ষৌশখাঁকে পরাভূত না করিতে পারিলে সরফরাজখাঁর মৃত্যুতে তাঁহার কোনও ফল হইবে না, ইহা স্থির করিয়া তিনি ব্যূহরচনায় মনোযোগী হইলেন। আলীবর্দ্দীর যে সৈন্যেরা ইতিপূর্ব্বে সরফরাজখাঁর পটমণ্ডপে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহারা সৈন্যাধ্যক্ষদিগের আদেশ অমান্য করিয়া যথাসুখে নানাবিধ বহুমূল্য সামগ্রী অপহরণপূর্ব্বক ইতস্ততঃ চলিয়া যাইতে লাগিল। এদিকে ষৌশখাঁ ক্ষুদ্র সৈন্যদলসহ আলীবর্দ্দীর সৈন্যশ্রেণীর সমীপবর্ত্তী হইয়া

আজীমশাহের গুজরাতের সুবদোরি সময়ে মুস্তফা-কুলিখাঁ তাঁহার দিবান বা প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। মুস্তফা-কুলিখাঁর আকবর-কুলিখাঁ, শাহ-কুলিখাঁ ও মির্জ্জা-মহম্মদ-নাকি নামে তিন পুত্র ছিল। আকবর-কুলিখাঁ ভাগলপুরের শাসনকর্ত্তা ছিলেন, পরে বাঙ্গালায় আসিয়া বাস করেন। তাঁহার পুত্র মির্জ্জা-জরজ্‌খাঁ। ইনি দিল্লীর বাদশাহ-নিয়োগকারী বিখ্যাত সৈয়দ-ভ্রাতৃদ্বয়ের কনিষ্ঠ হোসেনআলীখাঁ ও তৎসম্পর্কীয় ষাইরৎআলীখাঁর সহিত বন্ধুত্ব-সূত্রে বদ্ধ হইয়া তাঁহাদের সঙ্গে কিছু দিন দিল্লীতে অবস্থিতি করেন। সৈয়দ-ভ্রাতৃদ্বয়ের পতনের পর জরজখাঁ বিখ্যাত সেনানী সর্‌-বোলন্দখাঁর সঙ্গে গুজরাত চলিয়া যান। সুজাখাঁর সুবদোরি সময়ে উক্ত মির্জ্জা গুজরাত হইতে মুরশিদাবাদে আইসেন। সুজাখাঁ ইহাঁকে অত্যন্ত সম্মান করিতেন। সিরাজ-উদ্দৌলা (গড়িয়ার যুদ্ধের পরে) এই মির্জ্জা-জরজখাঁরই এক কন্যাকে বিবাহ করেন।

অকস্মাৎ একটি গুলির আঘাতে আহত হইলেন। তিনি তৎপ্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, শীঘ্রগতিতে যাইয়া স্বয়ং আলীবর্দ্দীর সহিত যুদ্ধ করিবার মানসে অশ্বারোহণের জন্য হস্তী হইতে অবতরণ করিতেছিলেন, এমন সময় আরও দুইটি গুলির আঘাতে ভূতলশায়ী হইয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রের যে স্থলে এই অসীম সাহসিক বীর-পুরুষ মৃত্যু-শয্যায় শায়িত হন, সেই স্থল অদ্যাপি "ষৌশখাঁর দরগা" বলিয়া প্রসিদ্ধ। * ষৌশখাঁর পুত্রদ্বয় পিতাকে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে দেখিয়া অশ্ব হইতে ভূমিতে অবতরণপূর্ব্বক অসি ও চর্ম্ম ধারণ করিয়া পাদচারে অরাতিবর্গের সম্মুখীন হইলেন এবং দ্রুত অসি চালনা দ্বারা বহু শত্রুর মুণ্ড নিপাতন করিলেন। চতুর্দ্দিক হইতে গুলি আসিয়া তাঁহাদিগকে আহত করিতে লাগিল। অনতিবিলম্বে তাঁহারা রক্তাক্ত কলেবরে ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া মৃত্যু-শয্যায় শায়িত হইলেন। জ্যেষ্ঠ মহম্মদ-কুতুব অসি ও চর্ম্ম ধারণপূর্ব্বক যুদ্ধক্ষেত্রেই প্রায়োপবিষ্ট হইয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। যে স্থলে কুতুব জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন, সেই স্থলেই তাঁহার দেহ প্রোথিত করা হইয়াছিল। মীর-দিলর আলী সরফরাজখাঁর মৃত্যু সংবাদে জীবনধারণ বৃথা মনে করিয়া কেবল ষোল জন অনুচর সহ অরাতি মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন এবং অনেক বিপক্ষ নাশ করিয়া ক্রমে ক্রমে সকলেই ভূতলশায়ী হইলেন। বস্তুতঃ সরফরাজখাঁর কতিপয় সেনাপতি প্রভুভক্তির আতিশয্যবশতঃ জীবনকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া অলৌকিক সাহসের সহিত যুদ্ধাহবে যেরূপ আপনাদের প্রাণ রূপ হবিঃ আহুতি প্রদান করিয়াছিলেন, ইতিহাসে তাহার দৃষ্টান্ত অতি বিরল। সরফরাজখাঁর অপর এক জন সেনানী মীর-সরফউদ্দিন স্বয়ং আলীবর্দ্দীর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাকে দুইটি শরে বিদ্ধ করিয়া যখন দেখিলেন যুদ্ধে পরাজয় অবশ্যম্ভাবী, তখন যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক মুরশিদাবাদে চলিয়া গেলেন।

এইরূপে আলীবর্দ্দীখাঁ ১৭৪১ খৃঃ অব্দের ২৮শে জানুয়ারি গড়িয়ার যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া তৎক্ষণাৎ জ্যেষ্ঠ সহোদর হাজি-আহম্মদকে

* হণ্টার সাহেব "মুরশিদাবাদের ষ্টাটিষ্টিকাল-আকাউণ্ট" নামক গ্রন্থে একটু ভ্রম করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, আলীবর্দ্দীর জনৈক সেনাপতি ষিয়াসখাঁর যুদ্ধকৌশলেই আলীবর্দ্দী গড়িয়ার যুদ্ধ জয়লাভ করেন * উক্ত সেনাপতি যে স্থলে যুদ্ধ সময়ে নিহত হন, তথায় আলীবর্দ্দি এক দরগা নির্ম্মাণ করেন; সেই দরগা অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। ষিয়াসখাঁ যে আলীবর্দ্দীর পক্ষীয় ছিলেন এ কথা হণ্টার সাহেব কোনও ঊর্দ্দু-কাব্য হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন। উক্ত কাব্য আমাদের হস্তগত হয় নাই, সুতরাং তদ্বিষয়ে কোন কথা বলা যাইতে পারে না। কিন্তু একটি বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক। সরফরাজখাঁর সেনানী মহম্মদ-ষৌশখাঁর সহিত নদীর অপর পারে আলীবর্দ্দীর পক্ষীয় নন্দলালের যে যুদ্ধ হয়, তাহাই প্রকৃত পক্ষে যুদ্ধ বলা যায়। ইহা ছাড়া আলীবর্দ্দীর অপর কোন সেনাপতির যুদ্ধ করা আবশ্যক হয় নাই; কারণ নবাব-সরফরাজ খাঁ আলীবর্দ্দী কর্ত্তৃক অগ্র ও পশ্চাৎ উভয় দিকে অতর্কিত ভাবে আক্রান্ত হইয়া হঠাৎ গুলির আঘাতে নিহত হওয়াতে যুদ্ধের প্রয়োজন প্রায় অভাব হইয়াছিল; পরে ষৌশখাঁও ঐরূপ গুলির আঘাতেই নিহত হন। কাব্যোক্ত আখ্যায়িকা যদি ইতিহাসোক্ত ঘটনার বিরুদ্ধ হয় তবে তাহা প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না। প্রধানতঃ যে বীরপুরুষের বাহুবলে আলীবর্দ্দী যুদ্ধ জয় করিলেন, তাঁহারই নাম মুসলমান ঐতিহাসিকেরা উল্লেখ করিতে বিস্মৃত হইয়াছেন, ইহা সম্ভবপর নহে। প্রকৃত পক্ষে উহা মহম্মদ-ষৌশখাঁরই দরগা। যদি আলীবর্দ্দি উহা নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন, তবে তিনি যে শত্রুরও গুণগ্রহণে সমর্থ ছিলেন, ইহাই বুঝা যায়। আলীবর্দ্দির এরূপ গুণগ্রাহিতা সম্বন্ধে ঐতিহাসিক প্রমাণও পাওয়া যায়। তিনি মির্জ্জা-জরজখাঁর প্রতি যেরূপ সম্মান প্রদর্শন করেন, তাহা এতদ্বিষয়ক একটি প্রমাণ-স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে। শত্রুর প্রতিও সম্মান প্রদর্শন দ্বারা তিনি সাধারণের সহানুভূতি সহজে আকর্ষণ করিতে পারিবেন, বুদ্ধিজীবী আলীবর্দ্দী এজন্যও বা তাদৃশ গুণগ্রাহী হইয়া থাকিবেন।

মুরশিদাবাদে পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহাকে বলিয়া দিলেন যে, আপনি যত শীঘ্র পারেন মুরশিদাবাদে পঁহুছিয়াই যথাস্থানে উপযুক্ত প্রহরী নিযুক্ত করিয়া রাজপ্রাসাদাদি রক্ষা করিবেন, রাজধানীর লোকদিগকে মিষ্টবাক্যে আশ্বস্ত করিবেন এবং কাহারও প্রতি কেহ অত্যাচার না করিতে পারে তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া নগরের শান্তি রক্ষা করিবেন। হাজি-আহম্মদ মুরশিদাবাদে উপস্থিত হইয়াই মহম্মদ-আলীবর্দ্দীখাঁ যে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যা এই তিন সুবের সুবেদার হইয়াছেন তাহা সর্ব্বত্র ঘোষণা করিয়া দিলেন। ইতিপূর্ব্বে সরফরাজখাঁর মৃত্যু সংবাদে নগর মধ্যে যে গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল, উক্ত ঘোষণা প্রচার দ্বারা সেই গোলযোগ অনেকটা থামিয়া গেল।

গড়িয়ার যুদ্ধের দুই দিন পরে (১১৫৩ হিজরি শালের শকর মাসের মধ্যভাগে) আলীবর্দ্দীখাঁ অতিশয় জাকজমকের সহিত মুরশিদাবাদে যাত্রা করিলেন। রাজধানীতে পঁহুছিয়াই তিনি নবাব মুরশিদকুলি-জাফরখাঁর দুহিতা, নবাব-সুজাখাঁর পত্নী এবং নবাব-সরফরাজ খাঁর জননী জিনৎ-উন্নিসা-বেগম ওরফে নফিসা-বেগম যে গৃহে বাস করিতেন, সেই গৃহের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আলীবর্দ্দী দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়াই উদ্দেশে উক্ত বেগম-সাহেবকে প্রণাম করিলেন এবং তাঁহার নিকট স্বাপরাধ ক্ষমাপ্রার্থী হইয়া লোক দ্বারা এই নিবেদন করিয়া পাঠাইলেন,—"ভবিতব্য যাহা ছিল তাহা হইয়াছে। "আপনকার অনুপযুক্ত দাসের এই অকৃতজ্ঞতার "বিষয় এক্ষণ ইতিহাসের অবিনাশী পত্রে লিপি- "বদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু আমি শপথ করিয়া বলি- "তেছি, যাবৎ আমার এই কলঙ্কিত দেহে প্রাণ- "বায়ু থাকিবে, তাবৎ আমি আপনাকে সমুচিত "সম্মান প্রদর্শন করিতে এবং আপনকার অভি- "প্রায়ানুযায়ী কার্য্য করিতে ত্রুটি করিব না। "আমি ভরসা করি যে, আপনি কিছুদিন পরে "দয়াগুণে আপনকার এই অনুতপ্ত দাসের "কুক্রিয়া ও নীচতা বিস্মৃত হইতে সমর্থ হইবেন। "আপনকার আজ্ঞানুবর্ত্তন ও আপনার প্রতি "সম্মান প্রদর্শন, আমার এই উভয়বিধ কার্য্য "কালে, আপনি আমার কৃতাপরাধের প্রায়শ্চিত্ত "স্বরূপ যে গ্রহণ করিবেন, তদ্বিষয়ে আমার অণু- "মাত্রও সন্দেহ নাই।" নফিসা-বেগমকে এই রূপ মনোভাব জানাইয়া আলীবর্দ্দীখাঁ দরবার গৃহে * উপস্থিত হইলেন ও মসনদে উপবেশন করিলেন। তখন রাজকীয় বাদ্য † বাজিতে লাগিল, এবং রাজকর্ম্মচারী, সভাসদ্ ও রাজধানীর সম্ভ্রান্ত লোকেরা নূতন সুবেদারকে যথা রীতি নজর ‡ প্রদান করিলেন। এইরূপে আলী-

* দরবার।—মুসলমান নরপতিদিগের দরবার (রাজসভা) 'দিবান-আম্' এবং 'দিবান-খাশ' এই দ্বিবিধরূপ ছিল। 'দিবান-আম'-এ প্রয়োজন অনুসারে সকলেই যাতায়াত করিতে পারিতেন, কিন্তু 'দিবান-খাশ'-এ একমাত্র আমীরগণ, রাজমন্ত্রিগণ ও অপরাপর উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীরাই যাইতে পারিতেন। নবাব সুজাখাঁর নির্ম্মিত 'চহল-সোতোন' অর্থাৎ চল্লিশ স্তম্ভের রাজ-প্রাসাদের অন্তর্গত 'দিবান-আম'-এ যাইয়া আলীবর্দ্দীখাঁ মসনদে অধিরোহণ করেন।

† রাজকীয় বাদ্য।—নবাবদিগের অভিষেকের সময় ২।৩টি লৌহ নির্ম্মিত বড় নাগরা, ২।৩টি ঢোল, ২।৩টি জেরনাও (সানাই), ২।৩টি করনা, ২।৩টি ঝিঁ (করতাল), একটি বড় করনা এবং ২।৩টি ভাম এই সকল বাদ্যযন্ত্র প্রাসাদের কিংবা দুর্গের বহির্দ্বারস্থিত ত্রিপোলিয়াতে বাদিত হইত।

জিল বাজনা তুর্‌ক জাতি হইতে য়ুরোপীয়েরা গ্রহণ করিয়াছে; কিন্তু তাহারা তুর্‌ক, পারসিক ও ভারতবাসীদের তুল্য মনোজ্ঞরূপে ও সতর্কতার সহিত উহা বাজাইতে পারে না। বড় করনার শব্দ এক মাইল দূরস্থ লোকেরা শুনিতে পাইয়া থাকে। এই রাজকীয় বাদ্যের শব্দ অতি তেজস্বী, কিন্তু দূরস্থ লোকদিগের নিকট সুমধুর বোধ হয়। বাদশাহের আদেশে এক মাত্র সুবেদারই এই প্রকার বাদ্য ব্যবহার করিতে পারিতেন।

‡ নজর।—নজর আরবি শব্দ। ইহার অর্থ দৃষ্টি। ইহার ভাবার্থ উপহার। কোন নিম্ন পদস্থ

বর্দ্দীখাঁ সর্ব্বজন-কর্ত্তৃক সুবে-বাঙ্গালার (বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার) সুবেদার স্বীকৃত হইলেও অনেকেই সে সময়ে বাহ্যতঃ তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিলেন; কারণ, তাঁহাদের অন্তরে সরফরাজখাঁর প্রতি আলীবর্দ্দীর নিদারুণ অকৃ-

ব্যক্তি উচ্চপদস্থ ব্যক্তিকে প্রথম সাক্ষাৎ কালে কিংবা কোনও পর্ব্ব বা উৎসব দিনে যে উপঢৌকন দেয় তাহাকে নজর বলে। এক টাকা হইতে পাঁচ টাকা পর্য্যন্ত, পাঁচ টাকা ও এক মোহর, অথবা এক মোহর হইতে এগার মোহর পর্য্যন্ত নজর দেওয়ার নিয়ম ছিল। বাঙ্গালার সুবেদারকে নজর দেওয়ায় প্রণালী এইরূপ ছিল। ডা'ন হাত বাঁ হাতের উপর হেলান করিয়া, ডান হস্তস্থিত চারি ভাজ করা সাদা রুমালের উপর টাকা বা মোহর রাখিয়া সেলাম না করিয়াই নবাবের কাছে যাইয়া নজর দিতে হইত। নজর গৃহীত হইলে অথবা উহা কেবল স্পর্শ করা হইলে (স্পর্শ করিলেও গ্রহণ করা হইয়াছে বুঝিতে হইবে) নজর-দাতা ২।৩ পা পিছে হটিয়া সেলাম করিতেন। তৎপর নবাবের অনুমতি হইলে অথবা অনুমতি ভিন্নও নজর দাতা নিজ পদমর্য্যাদা অনুসারে দরবারের যথাস্থানে যাইয়া বসিতেন। প্রায় সমান মর্য্যাদাবিশিষ্ট নজরদাতাকে নবাব আলিঙ্গন করিতেন। কাহাকে নজর দানের পূর্ব্বে, কাহাকেও বা পরে, আলিঙ্গনের নিয়ম ছিল। সাধারণ রাজপুরুষেরা মলমলের আঙরাখার (চোগার) আস্তিন হাতের তলায় টানিয়া লইয়া তাহার উপর টাকা বা মোহর রাখিয়া নজর দিতেন। প্রধান রাজপুরুষেরা উভয় হস্তে তরবারি ধারণ করিয়া নবাবকে প্রদান করিতেন; নবাব ঐ তরবারি ডান হাতে লইয়া আপনার কপালে ছোঁয়াইতেন। সামান্য সৈনিক-পুরুষেরাও ঐরূপ তরবারি প্রদান করিতেন; বাদশাহ, শাহজাদা বা সুবেদার দূরে হাতীর উপর থাকিলেও আঙ্গুল কপালে ছোঁয়াইয়া ইসারায় নজর গ্রহণ ব্যক্ত করিতেন। ১১, ২৫, ৫১, ১০১, এবং ১০০১টি মোহর দ্বারাও নজর দেওয়া হইত। ১১ ও ২৫টি মোহরের নজরই হাতে করিয়া দেওয়া হইত, আর সকল থলিয়ায় পুরিয়া দেওয়া হইত। নজর দেওয়া ও লওয়ার অঙ্গভঙ্গি আদব-কায়দা অনেক রকম ছিল। 'নোটা-মেনাস্' বলেন, গবর্ণর হেষ্টিংস এই সকল আদব-কায়দা সম্যক্ অভ্যস্ত করিয়াছিলেন। তিনি নজর স্পর্শ করিতেন। বাঙ্গালা প্রদেশের পাঁচ ব্যক্তি হইতে তিনি নজর লইতেন; এবং কলিকাতা হইতে লক্ষ্ণৌ পর্য্যন্ত স্থান মধ্যে আট ব্যক্তিই তাঁহার সহিত আলিঙ্গন করিতে পারিতেন।

তজ্ঞ ব্যবহারের কথা জাগ্রৎ থাকাতে, নূতন নবাবের প্রতি অতিশয় ঘৃণা জন্মিয়াছিল। আলীবর্দ্দীখাঁ অতঃপর সকলের প্রতি যথাযোগ্য আচরণ দ্বারা প্রকৃতিপুঞ্জের প্রীতিবর্দ্ধনে সমর্থ হইয়াছিলেন। আলীবর্দ্দী সুবে-বাঙ্গালা অধিকার করিয়াই দিল্লীতে এক কোটি টাকা পেশ্‌কোশ্ প্রেরণ করিলেন। বাদশাহ উহা গ্রহণ করিতে অসম্মত হইলেন, অবশেষ প্রধান মন্ত্রী ইশাখাঁ অনেক চেষ্টা করিয়া মহম্মদ-শাহকে উহা গ্রহণ করিতে সম্মত করাইলেন।

আলীবর্দ্দীখাঁর জ্যেষ্ঠ জামাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্র নবাজিস্-মহম্মদখাঁ সরফরাজখাঁর মাতা নফিসা-বেগমকে মাতৃসম্বোধন করিয়া আপনার গৃহে লইয়া গেলেন। নবাজিসের গৃহে নফিসা-বেগমই সর্ব্বোপরি কর্ত্রী হইয়া রহিলেন, এমন কি নবাজিশের পত্নী ঘাশিটি-বেগমও তাঁহাকে সর্ব্বতোভাবে মান্য করিয়া চলিতেন। মুরশিদ-কুলি-জাফরখাঁর যে খাশ-তালুক ছিল, তাহার আয় নফিসা-বেগমই যথাসুখে ব্যয় করিতেন। সদাশয় নবাজিশ তৎপ্রতি লক্ষ্যও করিতেন না। আলীবর্দ্দী ও নবাজিশ নফিসা-বেগমকে এতদূর সম্মান করিতেন যে, ইহাঁরা ভূমিষ্ঠ হইয়া অভিবাদন না করিয়া কখনও তাঁহার নিকটে যাইতেন না এবং নিকটে গেলে অনুমতি ভিন্ন কখনও বসিতেন না। সরফরাজখাঁর মৃত্যুর দিন তদীয় কোনও নীচকুলোদ্ভবা পত্নী এক পুত্রসন্তান প্রসব করেন। নফিসা-বেগম উক্ত শিশুকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিলেন। নবাজিশ-মহম্মদখাঁ শিশুটিকে বড় স্নেহ করিতেন। নিজের সন্তানের সমান যত্নে যাহাতে উহার লালন পালন ও বিদ্যাশিক্ষা হইতে পারে, তিনি এরূপ বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। ঐ শিশু আগা-বাবা নামে পরিচিত হন। আগা-বাবা হীনবংশীয় মাতার গর্ভজাত হইয়াও ঘাশিটি-বেগমের চেষ্টায় সৈয়দ-আহম্মদের এক কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

সরফরাজখাঁ কোনও সম্ভ্রান্তা রমণীর পাণিগ্রহণ করেন নাই। তাঁহার নীচকুলোদ্ভবা পত্নী-দিগের * মধ্যে যাঁহারা পুত্রবতী ছিলেন, নবাব-জিশ-মহম্মদ তাঁহাদের ভরণপোষণের জন্য প্রয়োজনাতীত বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট করিয়া তাঁহা-দিগকে ঢাকায় পাঠাইয়া দিলেন। সরফরাজ-খাঁর পুত্রহীনা স্ত্রীরা মুরশিদাবাদে রহিলেন। আলীবর্দ্দীখাঁ এই রমণীদিগকে অতি যত্নের সহিত রক্ষা করিতেন; কিন্তু তদীয় অগ্রজ হাজি-আহম্মদের দুশ্চরিত্রতায় আলীবর্দ্দীর চেষ্টা কিয়ৎকাল পরে অনেকাংশে বিফল হই-য়াছিল। হাজি-আহম্মদ সরফরাজখাঁর কোন কোন স্ত্রীর সতীত্ব নষ্ট করিয়াছিলেন।

আলীবর্দ্দীখাঁ সরফরাজখাঁর অন্য সকল আত্মীয়-স্বজনের ক্রোধ শান্তি করিতে পারিলেও তাঁহার সহোদরা দুর্দ্দন-বেগমের প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি নিবৃত্তি করিতে পারেন নাই। এই সময়ে সরফরাজখাঁর ভগিনীপতি মুরশিদকুলিখাঁ উড়িষ্যার নায়েব-সুবেদার ছিলেন। পারস্যের 'সফি" নামক রাজবংশজাত মির্জ্জা-বাখরখাঁ মুরশিদকুলিখাঁর কন্যাকে বিবাহ করিয়া কটকেই ছিলেন। ভ্রাতৃশোকে অধীরা হইয়া তেজস্বিনী দুর্দ্দনা বেগম কৃতঘ্ন আলীবর্দ্দীর সমুচিত দণ্ড বিধানের জন্য স্বামীকে অনবরতই উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। উগ্রস্বভাব জামাতা বাখর-আলীও শাশুড়ীর পক্ষসমর্থন করিতে লাগিলেন। মুরশিদকুলিখাঁ পণ্ডিত ও কবি ছিলেন। পত্নী ও জামাতার প্ররোচনে বাধ্য হইয়া অনিচ্ছা সত্ত্বেও আলীবর্দ্দীর বিপক্ষতাচরণের সঙ্কল্প করিলেন। এই উপলক্ষে উড়িষ্যায় যে ভয়ানক কাণ্ড ঘটে, কবিবর-ভারতচন্দ্র রায় তাহার এরূপ বর্ণন করিয়াছেন।—

"সুজাখাঁ নবাবসুত সরফরাজখাঁ।
দেয়ান আলমচন্দ্র রায় রায় রাঁয়া॥
ছিল আলীবর্দ্দিখাঁ নবাব পাটনায়।
আসিয়া করিয়া যুদ্ধ বধিলেক তায়॥
তদবধি আলীবর্দ্দি হইল নবাব।
মহাবদজঙ্গ দিলা পাতসা খেতাব॥
কটকে মুরসীদ কুলি খাঁ নবাব ছিল।
তারে গিয়া আলীবর্দ্দি খেদাইয়া দিল॥
কটকে হইল আলীবর্দ্দির আমল।
ভাইপো সৌলদজঙ্গে দিলেন দখল॥
নবাব সৌলদজঙ্গ রহিলা কটকে।
মুরাদবাখর তারে ফেলিল ফটকে॥
লুটি নিল নারী গারী দিল বেড়ি তোক।
শুনি মহাবদজঙ্গ চলে পেয়ে শোক॥
উত্তরিল কটকে হইয়া ত্বরাপর।
যুদ্ধে হারি পলাইল মুরাদবাখর॥
ভাইপো সৌলদজঙ্গে খালাস করিয়া।
উড়িষ্যা করিল ছার লুটিয়া পুড়িয়া॥"

—অন্নদামঙ্গল, গ্রন্থসূচনা।

আলীবর্দ্দীখাঁ স্বকৃতমতায় সুবে-বাঙ্গালার মস্-নদ্ অধিকার এবং প্রবল শত্রুকুলের দমন করিতে পারিলেও নিয়তিক্রম অতিক্রম করা তাঁহার অসাধ্য ছিল। যে সকল কারণে ও উপায়ে এবং যাঁহাদের আনুকূল্যে নবাব-সুজাখাঁর অন্নে প্রতিপালিত ও যত্নে পরিবর্দ্ধিত আলীবর্দ্দীখাঁ নবাব-সরফরাজখাঁকে ন্যূনাধিক ১৪ মাস সুবে-দারির পর মস্নদ্ চ্যুত করিয়া সুবে-বাঙ্গালা অধিকার করিয়াছিলেন; প্রায় তাদৃশ কারণ ও উপায় সন্নিপাতে এবং তাদৃশ ব্যক্তিদিগেরই সাহায্যে নবাব-আলীবর্দ্দীখাঁর অন্নে প্রতিপালিত ও যত্নে পরিবর্দ্ধিত মীর-জাফরখাঁ নবাব-সিরাজ-উদ্দৌলাকেও ১৪ মাস ১৭ দিন সুবেদারির পর মস্নদ্ চ্যুত করিয়াছিলেন। নিম্নে এতদুভয় ঘটনার সাদৃশ্য আরও বিশদরূপে প্রদর্শিত হইল।—

সরফরাজখাঁর সর্ব্বনাশক ব্যক্তিগণ।	সিরাজউদ্দৌলার সর্ব্বনাশক ব্যক্তিগণ।
আলমচাঁদ-রায়রাঁয়া।	রায়দুর্লভ-রায়রায়া।
জগৎশেঠ-ফতেচাঁদ।	জগৎশেঠমহতাব-রায়।
হাজি-আহম্মদ এবং আলীবর্দ্দীখাঁ প্রভৃতি।	ঘাশিটি-বেগম, এবং মীর-জাফরখাঁ প্রভৃতি।

সুজাখাঁর লাম্পট্য, হাজি-আহম্মদের চক্রান্ত এবং আলমচাঁদ ও জগৎশেঠের অসন্তোষ নিব-ন্ধন প্রচ্ছন্ন ভাবে শত্রুতা যেরূপ অপরিণামদর্শী সরফরাজখাঁর সর্ব্বনাশের হেতু হইয়াছিল, সেই রূপ ঘাশিটি-বেগম, আমিনা-বেগম প্রভৃতির ব্যভিচার, ঘাশিটি-বেগম ও রবিয়া-বেগমের যোগে মীর-জাফরখাঁর চক্রান্ত এবং দুর্লভরাম-সোম ও জগৎশেঠের অসন্তোষ জনিত প্রচ্ছন্নভাবে শত্রুতা অপরিণামদর্শী সিরাজউদ্দৌলার সর্ব্বনাশের হেতু হইয়াছিল। যে ঐহিক ঐশ্বর্য্যের লোভে কৃতঘ্ন আলীবর্দ্দীখাঁ নবাব-সরফরাজখাঁকে নিহত করিয়াছিলেন, সেই কৃতঘ্নতা রূপ মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ নবাব-সিরাজউদ্দৌলার ছিন্ন মস্তকোত্থিত শোণিতে বাঙ্গালাভূমি প্লাবিত করিয়া অচিরেই সেই ঐশ্বর্য্য পর-হস্তগত হইয়াছিল।

শ্রীরসিকলাল ঘোষ।

---

* এস্থলে পত্নী শব্দটি ব্যবহার বোধ হয় সঙ্গত হয় নাই। নিকাই-স্ত্রী বলিলেই সমুচিত হইত। নিকা ও সাদি এই বিবাহার্থ জ্ঞাপক শব্দদ্বয় যাবনিক ভাষায় পরস্পর প্রতি শব্দ রূপে ব্যবহৃত হইলেও বাঙ্গালা দেশে অন্ততঃ অশিক্ষিত লোকদিগের ব্যবহারে নিকা ও সাদির অনেক পার্থক্য লক্ষিত হয়। ইহারা নিকাকে প্রকৃত বিবাহ বলিয়া মনে করে না। নিকাই-স্ত্রীকে ইহারা প্রায় উপপত্নী সদৃশ জ্ঞান করে। অথচ এইরূপ স্ত্রী স্বামীর নিকট হইতে খোরপোষ ও উহার গর্ভজাত সন্তান পিতার ত্যাজ্য সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়। ইহাদের নিকট নিকাই-স্ত্রী রোমান-আইনে কন্‌কিউবিন্ সদৃশ; অর্থাৎ এরূপ স্ত্রী স্বামীর কুলমর্য্যাদার অধিকারিণী নহে। সরফরাজ খাঁর স্ত্রীরা এরূপ ছিল।

বাঙ্গালার অশিক্ষিত লোকদিগের নিকট 'নিকা'-বিবাহ ঘৃণিত হইলেও প্রকৃত পক্ষে নিকাই মুসলমানের মূল বিবাহ; সাদি বিবাহের আমোদ প্রমোদ, বিবাহ নহে। নিকাকে কোথাও বা বরাত কহে। নিকার রাত্রিতে মোহর (কাবিন) স্থিরীকৃত হয় বলিয়া নিকাকে বরাত বলে।

পেরিক্লিস্।

(১)

পেরিক্লিস্ টায়ার নগরের রাজা। গ্রীস্-দেশের দুর্দ্দান্ত অধিপতি এণ্টিওকাস্ গোপনে এক ভীষণ মহাপাপে লিপ্ত হইয়াছিলেন: পেরিক্লিস্ তাহা জানিতেন এবং জানিয়া তাহা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কে না জানে, ক্ষমতা-শালী ব্যক্তির দোষ আলোচনায়ও মহৎ অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে? পেরিক্লিসের ভাগ্যেও তাহাই হইল। এণ্টিওকাস্ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া, টায়ার ও টায়ার-বাসী লোকবৃন্দের সর্ব্বনাশ সাধন করিতে প্রস্তুত হইলেন। তাহা শুনিয়া পেরিক্লিস্ ভীত হইয়া দেশের মঙ্গলের জন্যই স্বেচ্ছায় রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

হেলিকেনাস্, টায়ার-রাজের বিশ্বস্ত ও কার্য্যকুশল মন্ত্রী। পেরিক্লিস্, মন্ত্রীর উপর রাজ্যের ভার দিয়া, অর্ণবপোতে আরোহণপূর্ব্বক টায়ার হইতে প্রস্থান করিলেন। ভাবিলেন,—"যে পর্য্যন্ত না এণ্টিওকাসের ক্রোধের উপশম হয়, সে পর্য্যন্ত দেশে ফিরিব না। এণ্টিও-কাস্ প্রবল, আমি দুর্ব্বল; আমিই তাঁহার শত্রু,—আমি দেশত্যাগী হইলে, এণ্টিও-কাস্ আমার অধিকারের মধ্যে কোন অত্যা-চার করিবে না, বোধ হয়। অতএব এ ক্ষেত্রে আমারই কিছুদিনের জন্য দেশত্যাগী হওয়া প্রশস্ত।"

(২)

পেরিক্লিস, টায়ার নগর পরিত্যাগপূর্ব্বক সর্ব্ব প্রথমে টর্সাস্ প্রদেশে গমন করিলেন। তিনি শুনিয়াছিলেন, ঐ সময়ে টর্সাস প্রদেশ

দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত হইয়া নানা ক্লেশ ভোগ করিতেছে। দেশবাসি-গণকে সাহায্য করিবার নিমিত্ত তিনি যথেষ্ট খাদ্যদ্রব্য সঙ্গে লইলেন।

টর্‌সাস প্রদেশে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, দারুণ কষ্ট,—চারিদিক্ হাহাকারে পূর্ণ। ক্লিয়ন সেই দেশের রাজা। সদাশয় পেরিক্লিস্‌কে এইরূপ খাদ্যসামগ্রী সমেত আসিতে দেখিয়া টর্‌সাস-অধিপতি ক্লিয়নের মনে হইল,—"বুঝি ভগবান্ এতদিনে সদয় হইয়া, এই মহাত্মাকে, এ দুর্ভাগ্য দেশে প্রেরণ করিলেন! স্বপ্নেও এরূপ আশা করি নাই!"

এইরূপে মনে মনে যার-পর-নাই আনন্দিত হইয়া, ক্লিয়ন, পেরিক্লিসের যথোচিত সম্মান-সংবর্দ্ধনা করিলেন। কিন্তু অল্প-দিনের মধ্যেই পেরিক্লিস্ টরসাস প্রদেশও পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। কারণ তাঁহার বিশ্বস্ত মন্ত্রী হেলিকেনাস্ তাঁহাকে পত্র লিখিলেন,—"মহারাজ! টরসাস প্রদেশে অবস্থান করাও আপনার নিরাপদ নহে। আপনি যে এখন ওখানে আছেন, এন্টিওকাস্ তাহার সন্ধান পাইয়াছে। প্রভু! আপনার জীবন-সংশয়, কারণ পাপিষ্ঠ এন্টিওকাস্ গুপ্তচর নিযুক্ত করিয়া আপনার প্রাণ-বধের সঙ্কল্প করিয়াছে; অতএব সাবধান হইবেন।"

পত্রপাঠ করিয়া পেরিক্লিস্ মহা উদ্বিগ্ন হইলেন এবং অনতিবিলম্বে টরসাস পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া পুনরায় জলপথ-ভ্রমণে সঙ্কল্প করিলেন।

করুণ-হৃদয় পেরিক্লিস্ টর্‌সাস ত্যাগ করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার দয়া ও দান টর্‌সাস-বাসীর মনে জাগরূক রহিল। সেই দারুণ দুর্ভিক্ষের দিনে, তাঁহারই অন্নে তাহারা জীবনধারণ করিতেছিল,—আজি বিদায়ের দিনে সমগ্র টর্‌সাস-বাসী মুক্ত অন্তরে পেরিক্লিসের মঙ্গল প্রার্থনা করিতে লাগিল;—বয়োজেষ্ঠ প্রবীণ ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি শুভ-আশীর্ব্বাদে আর কৃতজ্ঞতা জানাইলেন।

পেরিক্লিস্ টর্‌সাস হইতে প্রস্থান করিলেন

---

(৩)

পেরিক্লিস্ জাহাজে করিয়াই জলপথে যা করিয়াছিলেন। কিন্তু অধিক দূর যাইতে-ন যাইতে প্রবল ঝড় উঠিল। সেই ঝটিকায় জাহাজ জলমগ্ন হইল।

জাহাজে যাহারা ছিল, সকলেই প্রাণ হা ইল,—জীবিত রহিলেন কেবল মাত্র পে ক্লিস্। প্রবল তরঙ্গাভিঘাতে তিনি এক অজ্ঞা তট-প্রদেশে নিক্ষিপ্ত হইলেন।—দেহ উলঙ্গ,— অমোঘ-প্রতাপ, উন্মত্ত, ভীষণ তরঙ্গভঙ্গ দেহে বসন পর্য্যন্ত কোথায় ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে

সেই সময় কতকগুলি ধীবর সেই স্থান দি যাইতেছিল। তাহারা পেরিক্লিস্‌কে তদবস্থ দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে বস্ত্র ও খাদ্য প্রদা পূর্ব্বক আপন আপন আলয়ে নিমন্ত্রণ করি পেরিক্লিস্ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমাদের দেশের নাম কি এবং এ দেশের রাজাই কে?" তাহারা উত্তর করিল,—"এদেশের নাম— পেণ্টাপলিস্ এবং রাজার নাম—সিমোনাইড্‌স তিনি অতি সৎ ও মহৎ; তাঁহার সুশাসন প্রজারঞ্জনের জন্য লোকে তাঁহাকে সাধু না অভিহিত করিয়া থাকে।"

সেই ধীবরগণের নিকট হইতে পেরিক্লি শুনিলেন,—রাজা সিমোনাইড্‌সের থেইস নাম্নী এক পরম রূপবতী কন্যা আছে। আগা দিবস তাঁহার বিবাহদিন। সেই উপলক্ষে রা সভা মধ্যে অতি অপূর্ব্ব ক্রীড়া-নিচয় প্রদর্শি হইবে। ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে অনেক রাজা রাজকুমার থেইসার প্রণয়ার্থী হইয়া সেই স ক্রীড়ায় আপন আপন শৌর্য্য প্রকাশ করি সমাগত হইয়াছেন।

এইরূপ শুনিয়া পেরিক্লিস্ মনে মনে বড়ই বিষাদিত হইলেন। তাঁহার বাসনা, তিনিও একবার সেই রাজসভায়—সেই ক্রীড়াক্ষেত্রে যোগদান করেন। কিন্তু হায়, জলমগ্ন হওয়ায় তাঁহার অসি-বর্ম্ম সকলই কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে!

এই সময় অপর এক ধীবর সেইখানে উপস্থিত হইয়া পেরিক্লিস্‌কে অসি ও বর্ম্ম প্রদানপূর্ব্বক কহিল,—"আমি সমুদ্রমধ্যে জাল নিক্ষেপ করিয়া এই অসি ও বর্ম্ম পাইয়াছি।"

পেরিক্লিস্ দেখিলেন, এ অসি বর্ম্ম তাঁহারই বটে। তখন পেরিক্লিস্ অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া বলিতে লাগিলেন,—"হে অদৃষ্ট! তোমাকে ধন্যবাদ! এত কষ্টের পরও আবার আমার অবস্থা-প্রতিকারের উপায় করিয়া দিয়াছ।"

তারপর ধীবরগণকে কহিলেন,—"দেখ, আমার পিতা মৃত্যুর সময় ইহা আমাকে দিয়া গিয়াছিলেন। ইহা আমার বিশেষ প্রিয় বস্তু। তাই যখন যেখানে যাই, এই অসি-বর্ম্ম নিজের সঙ্গে লই। যদিও দুর্ভাগ্যক্রমে সাগরের ভীষণ তরঙ্গভঙ্গে ইহা হারাইয়াছিলাম, কিন্তু সেই সমুদ্র আজি শান্ত হইয়া আমার সেই হারানিধি আবার আমাকে প্রদান করিয়াছে। এজন্য আমি অদৃষ্টকে ধন্যবাদ দিই। আর তোমাদিগকে কি বলিব, আজীবন আমি তোমাদিগের নিকট ঋণী রহিলাম। দেখ, যখন আমি আমার পিতৃদত্ত সেই অসি ও বর্ম্ম পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হইয়াছি, তখন আমার মনে হয়, এই জলমগ্ন হওয়া আমার কোন দুঃখের কারণ হইবে না।"

---

(৪)

পেরিক্লিস্ এইরূপে পিতৃদত্ত অসি ও বর্ম্ম পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া তাহা ধারণ পূর্ব্বক সিমোনাইড্‌সের সভায় গমন করিলেন। সেই রাজসভায় রাজকুমারী থেইসার প্রণয়ার্থী হইয়া বহুসংখ্যক রাজা ও রাজকুমার সমুপস্থিত হইয়াছিলেন। যথাসময়ে রাজন্যবর্গের মধ্যে ক্রীড়া আরম্ভ হইল। সেই কৃত্রিম সমরে পেরিক্লিস্ অসীম বীরত্ব ও অসাধারণ রণ-কৌশল দেখাইলেন। সকলেই মুগ্ধ হইল, পেরিক্লিসের নিকট রাজন্যবর্গ পরাভব স্বীকার করিলেন।

কোন রাজকুমারীর পরিণয়-উৎসবে এইরূপ কৃত্রিম সমর উপস্থিত হইলে, সেই সমরে যে বীর, সকল যোদ্ধাকে পরাস্ত করিয়া আপন ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারেন, তাঁহারই ভাগ্যে রাজকন্যা লাভ হয়। এবং ইহাই রীতি যে, সেই কুমারীও সেই বীরচরণে আত্মোৎসর্গ করিয়া থাকেন। থেইসাকেও এই রীতির অনুবর্ত্তী হইতে হইল। পরাস্ত নৃপতিদিগকে বিদায় করিয়া থেইসা পেরিক্লিসের প্রতি বিশেষ অনুরাগ প্রদর্শন করিলেন। তিনি বরমাল্যে পেরিক্লিসের মস্তক সুশোভিত করিলেন। সেদিন পেরিক্লিসের মত সুখী কে? এবং পেরিক্লিসও প্রথম দর্শনেই সেই মধুর-দর্শনা রাজকুমারীর প্রতি একান্ত অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

সিমোনাইড্‌স্ বুঝিলেন, তাঁহার কন্যা থেইসাও পেরিক্লিসের প্রতি একান্ত অনুরক্ত হইয়াছে। তিনি তাহাতে কিছুমাত্র অসন্তুষ্ট হইলেন না, বরং পেরিক্লিসের মহত্ত্বব্যঞ্জক আকৃতি-প্রকৃতি ও অসাধারণ শৌর্য্য-বীর্য্যে একান্ত মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। বস্তুতঃ পেরিক্লিস্‌ও সর্ব্বগুণে গুণান্বিত ছিলেন। তথাপি পেরিক্লিস্ সিমোনাইড্‌সের নিকট আত্মপরিচয় প্রদান করিলেন না। সেই গ্রীস দেশের অধিপতি এণ্টিওকাসের ভয় তখন পর্য্যন্তও তাঁহার বিদ্যমান। তাই তিনি আত্মগোপন করিয়া সিমোনাইড্‌সকে জানাইয়াছিলেন যে, তিনি টায়ার নগরের এক জন সাধারণ লোক।

রাজকন্যা-লাভ।



কিন্তু এইরূপ পরিচয় পাইলেও পেরিক্লিসের সদ্‌গুণে আকৃষ্ট হইয়া সিমোনাইড্‌স তাঁহাকে আপন কন্যা দান করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইলেন না, বরং এরূপ সৎপাত্রে কন্যা দান করিতে পারিলেন বলিয়া আপনাকে ভাগ্যবান বোধ করিলেন। সিমোনাইড্‌স যথাসময়ে পেরিক্লিসের হস্তে স্নেহময়ী কন্যা থেইসাকে অর্পণ করিলেন।

রতনে রতন মিলিল। পেরিক্লিসের জীবন নাটকে এক অঙ্ক অভিনীত হইল।

---

(৫)

পেরিক্লিসের বিবাহ-কার্য্য সমাধা হইলে শীঘ্রই তিনি সংবাদ পাইলেন যে, তাঁহার শত্রু এণ্টিওকাসের মৃত্যু হইয়াছে। এ সংবাদ শুভ বটে, কিন্তু পেরিক্লিসের অবর্ত্তমানে প্রজাবৃন্দ এক প্রকার অবাধ্য হইয়া উঠিয়াছে এবং শীঘ্রই এক তুমুল রাজ্যবিপ্লব ঘটাইবে, এরূপ আশঙ্কাও করা যায়। পেরিক্লিসের বিশ্বস্ত মন্ত্রী হেলিকেনাস্ এই সংবাদ প্রেরণ করিয়াছেন। তিনি ইহাও লিখিয়াছেন,—"আপনার অবর্ত্তমানে প্রজাবৃন্দ শূন্য সিংহাসনে আমাকেই বসাইতে চায়। কিন্তু প্রভু! আমি এ অধর্ম্ম কার্য্যে বীতস্পৃহ। তাহাদের অভিপ্রায় আপনাকে জানাইলাম; আপনি নির্ব্বিঘ্নে প্রত্যাগমন করিয়া রাজ্যভার গ্রহণ করুন।"

তখন সিমোনাইড্‌স জানিতে পারিলেন, যাঁহাকে জামাতারূপে পাইয়াছেন, তিনি বড় সাধারণ লোক নহেন, তিনি টায়ারের সুবিখ্যাত অধিপতি। সিমোনাইড্‌স আনন্দিত হইলেন। কিন্তু তথাপি তিনি কিছু দুঃখিতও হইলেন;—বুঝি বা পেরিক্লিস্ রাজা না হইয়া পূর্ব্ব পরিচয়

মত তেমনই একজন সাধারণ লোক হইলে ভাল হইত। কেননা, এখন পেরিক্লিস্ ও থেইসা উভয়েই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছে!

থেইসা সে সময়ে গর্ভবতী ছিলেন। সিমোনাইড্‌স সে অবস্থায় কন্যাকে সমুদ্রপথে পাঠাইতে সাহস করিলেন না। পেরিক্লিসেরও তাহাই ইচ্ছা। তিনিও, যে পর্য্যন্ত না থেইসা প্রসূতা হন, সে পর্য্যন্ত তাঁহাকে পিতৃগৃহে থাকিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু থেইসা সে অনুরোধও রক্ষা করিলেন না, স্বামি-সমভিব্যাহারে যাইবার জন্য একান্ত অভিলাষিণী হইলেন। তখন আর কেহ কোন আপত্তি করিল না। সকলেই আশা করিল—স্বামি-সোহাগিনীর প্রসব হইবার পূর্ব্বেই পেরিক্লিস নির্ব্বিঘ্নে টায়ারে পঁহুছিতে পারিবেন।

পেরিক্লিসের জীবন-তরী কিন্তু বিপরীত দিকে ধাবিত হইল!

---

(৬)

পেরিক্লিসের বড়ই দুরদৃষ্ট বলিতে হইবে যে, জলপথে তাঁহার কোন-না-কোন বিঘ্ন ঘটিয়াই আছে। সমুদ্রের সহিত যেন তাঁহার ঘোর শত্রুতা! টায়ার পঁহুছিবার পূর্ব্বে এক তুমুল ঝটিকা উঠিল। থেইসা অত্যন্ত ভীতা হইলেন। সেই ভয়ে প্রবল পীড়া উপস্থিত হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে থেইসার ধাত্রী আসিয়া সংবাদ দিল,—"মহারাজ! রাজ্ঞী এক কন্যা প্রসব করিয়াছেন; এবং প্রসব করিয়া,—হায়! সেই মুহূর্ত্তেই তিনি গতাসু হইয়াছেন! এই আপনার সেই শিশুতনয়া। এখানে এ অবস্থায় কিন্তু ইহাকে আর রাখা যায় না।"

এই মর্ম্মান্তিক সংবাদে পেরিক্লিসের হৃদয়ে যে যন্ত্রণা জ্বলিয়া উঠিল, তাহা তিনিই বুঝিলেন। যখন তাঁহার বাক্য-স্ফুরণের সামর্থ্য হইল, তিনি আবেগভরে কহিয়া উঠিলেন,—"হা বিধাতঃ! যদি এমনই করিয়া কাড়িয়া লইবে, তবে এমন প্রণয়-পুত্তলী কেন বা প্রদান করিলে?"

ধাত্রী বলিল,—"রাজন্! ধৈর্য্য অবলম্বন করুন। রাণী চলিয়া গিয়াছেন বটে, কিন্তু এই শিশুটী তিনি রাখিয়া গিয়াছেন। প্রভু, অন্ততঃ ইহার মুখ চাহিয়াও শোক পরিত্যাগ করুন।"

পেরিক্লিস্ সেই সদ্যোজাত শিশুটীকে আপন বাহুমধ্যে ধারণ করিলেন এবং গভীর দুঃখের সহিত সেই শিশুকে বলিতে লাগিলেন,—"মা আমার! এমন ভীষণ মুহূর্ত্তে বুঝি কখনও কোন শিশু জন্মগ্রহণ করে নাই! আশীর্ব্বাদ করি, তোমার জীবন যেন এমন ভীষণ না হয়! রাজার কুমারী তুমি,—পৃথিবী এমন ভীষণ ও ভয়াবহ আহ্বানে তোমাকে অভ্যর্থনা করিল;—দেখিও মা! তোমার ভাগ্য যেন প্রতিকূল না হয়! পঞ্চভূত একত্রিত হইয়া যতদূর ভয়াবহ হইতে পারে, তোমার জন্মকাল তাহাদিগকে তদপেক্ষাও ভীষণ করিয়া তুলিয়াছে; ভবিষ্যতে যেন মা! তোমার মঙ্গল হয়! পৃথিবীতে আসিবামাত্র আজি যে রত্ন তুমি হারাইলে, সমগ্র জীবনের সম্পূর্ণ সুখেও সে ক্ষতি পূরণ হইবে না মা!"

ঝটিকা তখনও প্রবল-বেগে বহিতেছে। সাগর-বক্ষে জাহাজখানি বিপর্য্যস্ত হইতেছে। রাণীর মৃত-দেহ তখন পর্য্যন্তও সেই জাহাজের উপর। মূর্খ নাবিকগণের বিশ্বাস, জাহাজে মৃতদেহ থাকিতে ঝড়ের অবসান হইবে না।

তাহারা পেরিক্লিস্‌কে একথা জানাইল এবং বলিল,—"এ শব সলিলে নিক্ষিপ্ত হউক, নহিলে ঝটিকা থামিবে না, আমরাও নিরাপদ হইতে পারিব না!"

শোকাতুর রাজা বিষণ্ণ ভাবে উত্তর দিলেন,—"ঝটিকাকে আমি ভয় করি না! আর কেনই বা করিব?—যতদূর অনিষ্ট করিবার সাধ্য ইহার

ছিল, তাহা করিয়াছে! তবে এই শিশু তনয়াটীর জন্য ইচ্ছা হয়, ঝড় নিবৃত্ত হউক।"

নাবিকগণ বলিল,—"তবে আজ্ঞা করুন, আমরা রাণীর দেহ সলিলে নিক্ষেপ করি। দেখুন, প্রবল বাতাস বহিতেছে; ভীষণ তরঙ্গ-ভঙ্গে সাগর ভীষণ হইতেও ভীষণতর হইতেছে;—শবদেহ নিক্ষিপ্ত না হইলে ঝটিকা উপশমিত হইবে না প্রভু!"

পেরিক্লিস্ জানিতেন, এ ভ্রম-বিশ্বাসের মূলে কোন ভিত্তি নাই, ইহা ঘোর কুসংস্কার, তথাপি তিনি বলিলেন,—"তোমরা যাহা বলিতেছ, তবে তাহাই কর। হায় হতভাগ্য রাণী!"

মর্ম্মাহত রাজা তখন প্রিয়তমা পত্নীর মূর্ত্তি একবার জন্মশোধ দেখিতে গেলেন। রাণীর মৃতদেহ অবলোকন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন,—"হায় প্রিয়তমে! কি ভীষণ প্রসব-কালই তোমার উপস্থিত হইয়াছিল! একটুকুও আলোক নাই, অগ্নি নাই;—তাহা থাকিলে যে টুকুও প্রতিকারের সম্ভাবনা ছিল, তাহাও তোমার ভাগ্যে ঘটিল না। প্রাণাধিকে! তুমি কি মন্দ-ভাগিনী! আজি যে তোমার এই শেষ-দশায় তোমাকে যথাবিহিত সংকার করিব, তাহাও করিতে পারিলাম না! অনাবৃত দেহে আজি তোমাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিতে হইল! অহো, যে দেহের উপর সমাধি-স্তম্ভ তুলিয়া আজীবন মনোমধ্যে তোমার স্মৃতি উজ্জ্বল রাখিতাম, আজি তাহা সমুদ্রগর্ভে শম্বুকাদি জলজন্তুর সহিত অবস্থান করিতে চলিল!" শোকাবেগ একটু প্রশমিত হইলে, ধাত্রীকে বলিলেন,—"কাহারও দ্বারা কাগজ-কলম, রত্নালঙ্কার, সুগন্ধ কুসুমাদি আনয়ন কর এবং কাহাকেও সুন্দর-বসনাবৃত সেই সিন্ধুকটী আনিতে পাঠাও। শিশুটীকে উপাধানে শয়ন করাও। তুমিও এই দ্রব্যগুলির জন্য যাও। আমি একবার প্রিয়তমার পার্শ্বে বসিয়া চিরদিনের মত বিদায় গ্রহণ করি।"

ভৃত্যবর্গ পেরিক্লিসের আজ্ঞামত তখনই সিন্ধুক আনয়ন করিলে, পেরিক্লিস্ তন্মধ্যে রাণীর মৃত-দেহ স্থাপন করিলেন এবং সেই দেহের উপর সুগন্ধিপূর্ণ কুসুমাদি নিক্ষেপ করিলেন। দেহের এক পার্শ্বে রত্নালঙ্কারগুলি রাখিয়া দিলেন এবং এক খণ্ড কাগজে রাণীর সবিশেষ পরিচয় লিখিয়া রাখিলেন। ইহাও লিখিলেন,—"যদি কেহ কখন এই সিন্ধুক দেখিতে পান, তবে তিনি যেন রাণীর এই দেহ সমাধিস্থ করেন।"

এইরূপ সকল বন্দোবস্ত করিয়া নিজ হস্তে পেরিক্লিস্ সেই সিন্ধুক সমুদ্রে নিমজ্জিত করিলেন। সোনার প্রতিমা সাগরজলে বিসর্জ্জিত হইল। পেরিক্লিসের বুকের একখানি হাড় খসিল।

অল্পে অল্পে ঝটিকা প্রশমিত হইল। পেরিক্লিস্ নাবিকদিগকে আজ্ঞা করিলেন,—"জাহাজ টর্সাস নগরাভিমুখে লইয়া চল। কারণ, টায়ার পর্য্যন্ত যাইতে হইলে এই শিশুটীর প্রাণ রক্ষা হইবে না। টর্সাসে লইয়া গেলে সযত্নে ইহার লালন পালন হইতে পারিবে।"

পেরিক্লিসের অদৃষ্টচক্র আর একদিকে ঘুরিল।

---

(৭)

সেই ঝটিকাপূর্ণ নিশীথে, থেইসার মৃত-দেহ সাগর-মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইলে, তৎপরদিন অতি প্রত্যূষে ইফিসাস-নিবাসী সেরিমন নামক জনৈক ভদ্রলোক সমুদ্রতটে দণ্ডায়মান ছিলেন। সেরিমন চিকিৎসা-বিদ্যায় কুশলী ছিলেন। তাঁহার ভৃত্যবর্গ একটি সিন্ধুক তাঁহার নিকট উপস্থিত করিল। তাহারা বলিল,—"সমুদ্র-তরঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে ইহা কূলে আসিয়া লাগিয়াছে।" এক জন বলিল,—"যে তরঙ্গে ইহা ভাসিয়া আসিয়াছে, তদপেক্ষা বৃহৎ তরঙ্গ আমি

কখন দেখি নাই।" সেরিমন অনুমতি করিলেন,—"সিন্ধুক আমার গৃহে লইয়া চল।"

যখন সিন্ধুক উন্মুক্ত হইল, তিনি সবিস্ময়ে দেখিলেন, তন্মধ্যে অল্পবয়স্কা এক অনুপমা সুন্দরীর মৃত-দেহ শয়ানা রহিয়াছে এবং মৃত-দেহের পার্শ্বে নানা রত্নালঙ্কার ও সুগন্ধ দ্রব্যাদির সমাবেশ দেখিয়া বুঝিলেন, ইনি কোন সম্ভ্রান্ত রমণী হইবেন। অতঃপর কিছু অনুসন্ধান করিলে তন্মধ্যে একখণ্ড কাগজও দেখিতে পাইলেন। সেই কাগজ খণ্ড পাঠ করিয়া দেখিলেন, ইনি টায়র-রাজ পেরিক্লিসের মহিষী। সেরিমন এরূপ অদ্ভুত ঘটনায় একান্ত বিস্মিত হইলেন এবং দুর্ভাগ্য পেরিক্লিস্ যে এমন রত্ন হারাইয়াছেন, এজন্য দুঃখ প্রকাশপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন,—"হায় পেরিক্লিস্! যদি তুমি জীবিত থাক, তবে না জানি, এই প্রিয়তমার শোকে তোমার হৃদয় কিরূপ বিদীর্ণ হইতেছে!"

সেরিমন থেইসার মুখপানে চাহিয়া নিবিষ্ট চিত্তে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, সে নির্ম্মল প্রশান্ত মুখ-মণ্ডলে ত মৃতের কোন চিহ্নই পরিলক্ষিত হইতেছে না! তখন তাঁহাকে জীবিত ভাবিয়া বলিলেন, "যাহারা তোমাকে মৃতজ্ঞান করিয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়াছিল, তাহারা এত ব্যস্ত না হইয়া একটু বিলম্ব করিলে ভাল হইত। কারণ, তাহারা আপন ভ্রম বুঝিতে পারিত।"

তখন সেরিমন ভৃত্যদিগকে অগ্নি প্রজ্বলিত করিতে আদেশ করিলেন। নানা প্রকার ঔষধ আনয়ন করিলেন এবং অতি কোমল ও মৃদু-মধুর বাদ্যের আয়োজন করিলেন। কারণ, সে রমণী পুনর্জ্জীবিতা হইলে হঠাৎ একান্ত বিস্মিত হইতে পারেন। হৃদয়ের সেই একান্ত বিস্ময় ও চঞ্চলভাব প্রশমিত করিবার জন্য সঙ্গীতের আয়োজন করিয়া রাখিলেন।

এবং যাহারা থেইসার চারিদিক বেষ্টন করিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিতেছিল, সেরিমন তাহাদিগকে বলিলেন,—"আপনারা সকলে এত ঘিরিয়া দাঁড়াইবেন না, রোগীর পক্ষে বাতাসের একান্ত প্রয়োজন। আমার বিশ্বাস, এই রমণী নিশ্চয়ই জীবিতা হইবেন। বোধ হয়, পাঁচ ঘণ্টার অধিক ইনি এরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হন নাই।"

তৎপরে তিনি উত্তেজক ঔষধ সকল ব্যবহার করিয়া দেখিলেন, অল্পে অল্পে রমণীর সংজ্ঞালাভ হইতেছে।

সেরিমন বলিলেন,—"দেখ, কেমন অল্পে অল্পে জীবন-সঞ্চার হইতেছে! দেখ, ইহাঁর পুনর্জ্জীবন লাভ হইল। নিমীলিত আঁখি অল্পে অল্পে উন্মেষিত হইতেছে। এই সুন্দরী কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া নিশ্চয়ই আত্মকাহিনী সবিশেষ আমাদিগকে শুনাইবেন। এবং তাহা শুনিয়া নিশ্চয়ই আমাদিগকে কাঁদিতে হইবে।"*

বস্তুতঃ, থেইসার মৃত্যু হয় নাই। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলেই দারুণ মোহে তিনি সংজ্ঞাশূন্য হইয়াছিলেন। সেই অবস্থা দেখিয়া জাহাজস্থিত লোকেরা মনে করিয়াছিল, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। এক্ষণে সেরিমনের যত্নে ও সেবা-শুশ্রূষায় থেইসার অলীক মৃত্যু দূরীভূত হইল, তাঁহার মোহ অপসারিত হইল। নয়ন উন্মীলন পূর্ব্বক মৃদুস্বরে তিনি বলিলেন,—"আমি কোথায় আসিয়াছি? এ কোন্ দেশ? আমার স্বামী কোথায়?"

অল্পে অল্পে সেরিমন তাঁহাকে সকল কথাই জ্ঞাপন করিলেন এবং যখন বুঝিলেন, থেইসা এখন প্রকৃতিস্থা হইয়াছেন, পেরিক্লিস্-লিখিত সেই কাগজ-খণ্ড ও সিন্ধুক-মধ্যস্থ সেই রত্নালঙ্কারগুলি তাঁহাকে দেখাইলেন। কাগজ-খণ্ড পাঠ করিয়া থেইসা বলিলেন,—"এ আমার

* এই স্থানের চিত্রটী পরপৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

থেইসার পুনর্জ্জীবন লাভ।

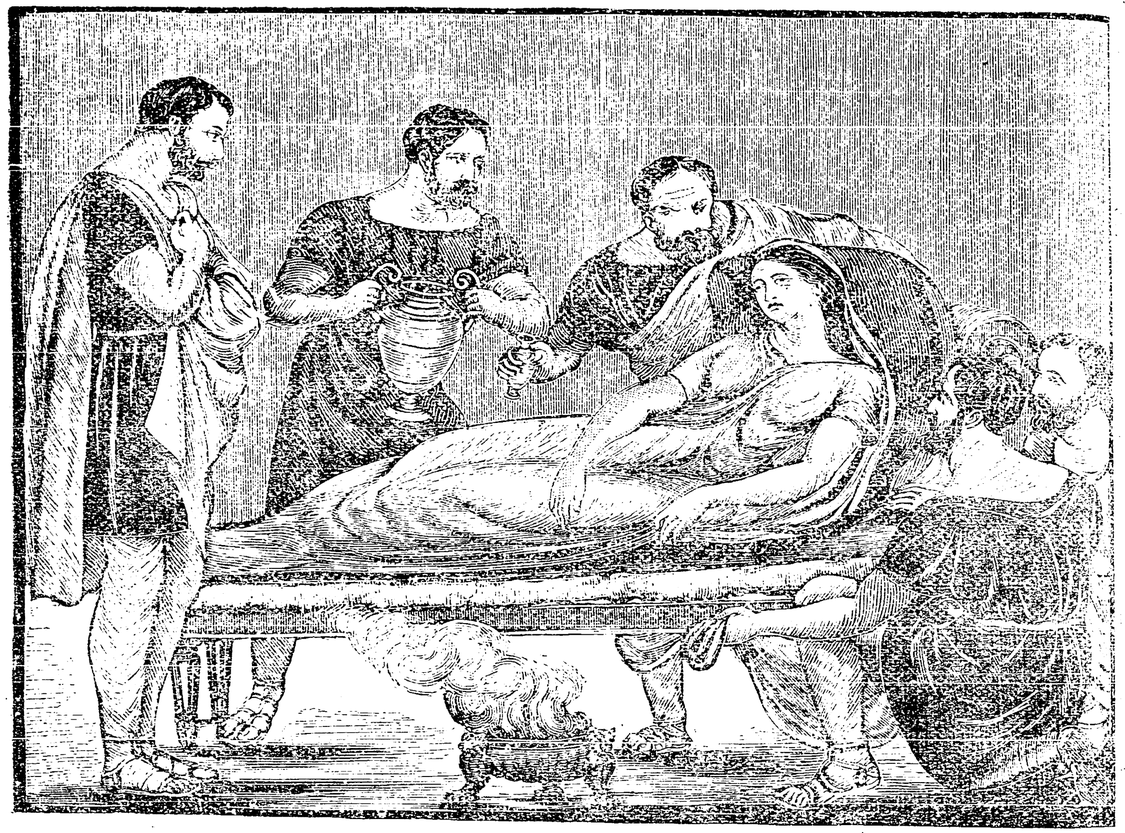

স্বামীর হস্তাক্ষরই বটে। আমার মনে হইতেছে, আমি জাহাজে ছিলাম; কিন্তু সেখানে সন্তান প্রসব করিয়াছিলাম কিনা, ঠিক বলিতে পারি না, মনেও হইতেছে না। কিন্তু যখন আর আমার স্বামীকে দেখিতে পাইব না,—হায়, আমার সুখ-শান্তি সকলই গিয়াছে! এখন আর আমি কি করিব,—যে কয়দিন বাঁচি, ব্রহ্মচারিণী হইয়া কালাতিপাত করিব।"

সদাশয় সেরিমন বলিলেন,—"আপনি যেরূপ বলিতেছেন, যদি সেইরূপ করাই আপনার অভিপ্রেত হয়, তবে এখান হইতে অনতিদূরে ডিয়ানা দেবীর মন্দির আছে,—সেখানে থাকিয়া ব্রহ্মচারিণী-বেশে জীবন অতিবাহিত করিতে পারেন। পিশাচের পাপচক্ষু সেখানে স্থান পাইবে না এবং আরও, যদি ইচ্ছা করেন, তবে আমার এক ভ্রাতুষ্পুত্রীকে আপনার নিকট রাখিয়া দিতে পারি,—সে আপনার সেবা-শুশ্রূষা করিবে।"

থেইসা তাহাতে সম্মত হইলেন, এবং সেরিমনের প্রতি হৃদয়ের প্রগাঢ় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পূর্ব্বক ধন্যবাদ প্রদান করিলেন।

অনন্তর, থেইসা সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হইলে সেরিমন তাঁহাকে ডিয়ানা দেবীর মন্দিরে লইয়া গেলেন। থেইসা সেখানে থাকিয়া পতি-বিরহ-দুঃখে নিতান্ত ম্রিয়মাণা হইয়া ব্রহ্মচারিণীর কর্ত্তব্য পালন করিতে লাগিলেন।

---

(৮)

পেরিক্লিসের কন্যা সমুদ্রে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল; সেইজন্য পেরিক্লিস্ তাহার নামকরণ করিলেন,—মেরিনা। পেরিক্লিস্ কন্যাকে লইয়া টর্সাস নগরে উপস্থিত হইলেন।

পেরিক্লিস্ যখন টায়ার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তখন সর্ব্বপ্রথমে এই টর্সাস নগরে অবস্থিত হইয়াছিলেন। টরসাস তখন দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত। টর্সাসের রাজা ক্লিয়ন ও তাঁহার মহিষী পেরিক্লিসের বদান্যতায় যথেষ্ট উপকৃত ও বাধিত হইয়াছিলেন। পাঠকের সে সব কথা অবশ্য মনে আছে।

পেরিক্লিস্ ভাবিলেন, এই মাতৃহারা শিশু এই টর্সাস নগরে রাজা ও রাণীর নিকট বিশেষ সমাদর পাইতে পারে। কারণ, সেই রাজা ও রাণী সেই দারুণ দুর্ভিক্ষ সময়ে আমার সাহায্য-দান বোধ হয় বিস্মৃত হন নাই।

এইরূপ ভাবিয়া তিনি টর্সাস নগরে উপস্থিত হইয়া টর্সাস-রাজ ক্লিয়নের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং আপনার দুর্ঘটনার কথা আনুপূর্ব্বিক বিবৃত করিলেন। ক্লিয়ন দুঃখ প্রকাশ-পূর্ব্বক বলিলেন, "হায়! আপনার মহিষী যদি জীবিত থাকিতেন, আজি আপনাদের দুই জনকে দেখিয়া নয়ন পরিতৃপ্ত করিতাম!"

পেরিক্লিস্ সদুঃখে কহিলেন,—"কাল সর্ব্বত্রই বিজয়ী; আমরা কি করিতে পারি? দেখুন, সমুদ্রের সেই তরঙ্গ-গর্জ্জন এখনও আমার মনে আছে। যদি তাহারই মত আমিও সেইরূপ ক্রোধোন্মত্ত হইয়া উঠি, তবুও কালের গতি প্রতিরোধ করিতে পারিব না। যাহা ঘটিবার, তাহা অবশ্যই ঘটিবে। এখন আপনার নিকট আমার প্রার্থনা এই, এই শিশুটীকে আপনি রক্ষা করুন। রাজার তনয়া,—ভরসা করি, রাজ-কন্যার ন্যায় শিক্ষালাভে এই শিশু বঞ্চিত থাকিবে না।"

পেরিক্লিস্ তৎপরে ক্লিয়ন-মহিষীকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন,—"রাণি! আপনার হস্তে আমার এই শিশু-সন্তানকে সমর্পণ করিলাম। আপনি অনুগ্রহ করিয়া ইহাকে প্রতিপালন করিলে আমি একান্ত অনুগৃহীত হইব।"

রাণী উত্তর করিলেন,—"আমারও এক কন্যা আছে; আপনি নিশ্চয় জানিবেন, আপনার এই শিশু-কন্যাও আমার সেই কন্যার ন্যায় আমার স্নেহে বঞ্চিত থাকিবে না।"

ক্লিয়নও সেইরূপ অঙ্গীকার পূর্ব্বক বলিলেন,—"রাজন্! আমার রাজত্বে সেই দুর্ভিক্ষ সময়ে আপনি যে উপকার সাধন করিয়াছিলেন, তাহা কেহ কখন ভুলিবে না। তাহা স্মরণ করিয়া আজিও সকলে সরল অন্তরে আপনার মঙ্গল কামনা করিয়া থাকে। কখন যদি আপনার কন্যার প্রতি আমি কর্ত্তব্য-পালনে ত্রুটী করি, আমার প্রজাবৃন্দ আমাকে কর্ত্তব্য-পালনে বাধ্য করিবে এবং প্রজাবৃন্দের কথাতেও যদি আমি মনোযোগী না হই, তবে দেবতা যেন বংশ-পরম্পরাক্রমে আমাকে শাস্তি-প্রদান করেন।"

এইরূপ রাজা ও রাণীর প্রতিজ্ঞা-বাক্য শুনিয়া পেরিক্লিস্ আশ্বস্ত হইলেন এবং কন্যাকে ধাত্রী-সমেত টর্সাস-রাজের নিকট রাখিয়া গেলেন।

মেরিনা শিশু,—পিতৃ-বিরহ আজ কিছু বুঝিল না; কিন্তু ধাত্রী অত্যন্ত ক্রন্দন করিল। পেরিক্লিস্ বলিলেন,—"ধাত্রি! কাঁদিও না। এই শিশুটীকে যত্নে রক্ষা করিও; ভবিষ্যতে ইহা হইতেই তোমার মঙ্গল হইবে।"

---

(৯)

পেরিক্লিস্ নির্ব্বিঘ্নে নিজ রাজ্য টায়ারে উপস্থিত হইলেন, এবং নির্ব্বিবাদে সিংহাসনে আরূঢ় হইলেন। ওদিকে ইফিসাস নগরে, ডিয়ানা দেবীর মন্দিরে তাঁহার দুঃখিনী সহধর্ম্মিণী অবস্থিতি করিতেছেন। পেরিক্লিস্ জানেন, মহিষীর মৃত্যু হইয়াছে। অন্যদিকে টর্সাস-রাজ ক্লিয়ন মেরিনাকে প্রতিপালন করিতেছেন, এবং তাহার মর্য্যাদা ও গৌরব রক্ষা করিয়া তাহাকে বিধিমত শিক্ষা দিতেছেন।

অতি অল্পকাল মধ্যে মেরিনা এরূপ শিক্ষিতা হইয়া উঠিল যে, চতুর্দ্দশ বৎসরের মধ্যে অনেক শিক্ষিত লোককেও অতিক্রম করিল। মেরিনা সঙ্গীত করিত,—মনে হইত, অমরাবতীতে বসিয়া বুঝি কোন দেববালা গান করিতেছে! মেরিনা নৃত্য করিত, দেখিলে মনে হইত, যেন অপ্সরা নৃত্য করিতেছে! শিল্প-কার্য্যে মেরিনার এরূপ অধিকার যে, তাহার সূচি-বিনির্ম্মিত পুষ্প, ফল কিংবা পক্ষী দেখিলে মনে হইত, যেন প্রকৃতির অবিকল প্রতিকৃতি। মেরিনার নির্ম্মিত দুইটী রেশমী ফুল এরূপ অভিন্ন হইত যে, বুঝি প্রকৃতিতেও সেরূপ সাদৃশ্য নাই।

টর্সাস-রাজের এক দুহিতা ছিল। এ সকল বিষয়ে সে মেরিনার সমকক্ষ হইতে পারে নাই। সকলেই মুক্তকণ্ঠে মেরিনার প্রশংসা করিয়া থাকে, এজন্য ক্লিয়ন-মহিষীর হৃদয়ে দারুণ ঈর্ষার অনল জ্বলিয়া উঠিল। এবং যখন তিনি দেখিলেন যে, তাঁহার কন্যা, মেরিনার সমবয়স্কা হইয়া এবং মেরিনার ন্যায় শিক্ষা পাইয়াও মেরিনার সমকক্ষ হইতে পারিল না,—লোকের সমালোচনায় মেরিনাই সর্ব্বোচ্চ স্থল অধিকার করিয়া থাকে, তিনি মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন, মেরিনাকে স্থানান্তরিত করাই কর্ত্তব্য। কিন্তু এ কথা বুঝিলেন না যে, মেরিনা স্থানান্তরিতা হইলেও তাঁহার গুণহীনা কন্যা কিছুতেই সে স্থান অধিকার করিতে পারিবে না।

এই সময়ে মেরিনার সেই ধাত্রীর মৃত্যু হয়। মেরিনা যখন ধাত্রীর শোকে একান্ত কাতর, সেই অবসরে ক্লিয়ন-মহিষী মেরিনাকে নিহত করিবার জন্য এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিল। যে ব্যক্তি এই কার্য্যের ভার লইয়াছিল, তাহার নাম—লিওলাইন। মেরিনা, সকলের এতদূর স্নেহ পাইয়াছিল যে, সেই নরঘাতী পাষণ্ডও সহজে স্বীকৃত হইল না। সে বলিল,—"এই কুমারী রূপে গুণে সুলক্ষণা। এমন ভাল——"

মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া রাজ্ঞী বলিল,—"খুব ভাল, তাহাতে সন্দেহ নাই। সেই জন্যই বলিতেছি, এই পাপ পৃথিবী পরিত্যাগ করাই ইহার শ্রেয়ঃ। এই যে, মেরিনা এই দিকেই আসিতেছে। দেখিতেছি, তাহার ধাত্রীর জন্য কাঁদিতেছে। এখন তুমি বল, আমার আদেশ পালন করিতে পারিবে কিনা?"

রাজ্ঞীর ভয়ে লিওলাইন বলিল,—"আমি স্বীকার করিলাম।"

মেরিনা কতকগুলি পুষ্প লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সেইখানে উপস্থিত হইল এবং বলিতে লাগিল,—"আমি প্রতিদিন ধাত্রীর কবরের উপর পুষ্প বর্ষণ করিব। হায়, কি মন্দভাগিনী আমি,—আমার কেহই নাই! শুনিয়াছি, সমুদ্রবক্ষে দারুণ ঝটিকার সময় আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছি। তৎক্ষণাৎ আমার মাতার মৃত্যু হইয়াছে! আমার মনে হয়, এই জগৎও যেন সেইরূপ একটা প্রবল ঝটিকা, কিন্তু তেমন ক্ষণস্থায়ী না হইয়া ইহা চিরস্থায়ী!—আমার আত্মীয়-স্বজনকে আমার নিকট হইতে দূরে নিক্ষেপ করিয়াছে!"

ক্লিয়ন-মহিষী কপটতাপূর্ব্বক বলিল,—"মেরিনা! কেন কাঁদিতেছ? তোমাকে একা দেখিতেছি কেন? আমার কন্যা তোমার সঙ্গে নাই? দেখ, তোমার ধাত্রীর জন্য আর কাঁদিও না। আমিই এখন তোমার ধাত্রী। এ নিষ্ফল ক্রন্দনে তোমার মুখখানি মলিন হইয়াছে! আর কাঁদিও না। দেখ, এসময় একটু বেড়ান ভাল।—লিওলাইনের সহিত সমুদ্র-তটে একটু বেড়াইয়া আইস। নির্ম্মল বাতাস বহিতেছে, একটু সুস্থ হইতে পারিবে।" ফুলগুলি আমাকে দাও, সমুদ্র-পবনে এগুলি নষ্ট হইয়া যাইবে:—লিওলাইন! মেরিনাকে লইয়া একটু বেড়াইয়া আইস।"

মেরিনা। রাজ্ঞি! আপনার নিকট হইতে

আপনার ভৃত্য চলিয়া গেলে আপনার কষ্ট হইবে, অতএব তাহাতে প্রয়োজন নাই।

কিন্তু দুষ্টা মহিষী এ কথায় পাপ সঙ্কল্প ছাড়িল না। বলিল,—"আমার কোন কষ্ট হইবে না। দেখ, আমি তোমাকে যেমন ভালবাসি, তোমার পিতাকেও তেমনি ভালবাসি; আমি প্রতিদিনই আশা করিয়া থাকি, তোমার পিতা এখানে আসিবেন। কিন্তু যদি তিনি আজ হঠাৎ এখনই আসিয়া পড়েন এবং তোমাকে এমন মলিনা দেখেন, তবে ভাবিবেন, আমরা বুঝি তোমার যত্ন করি নাই। যাও মা! আমি বলিতেছি, একটু বেড়াইয়া আইস, একটু প্রফুল্ল হইবে। এমন রূপ মলিন করিও না। বৃদ্ধ ও যুবা সকলেরই হৃদয় তোমার রূপে আকৃষ্ট।"

মেরিনা এইরূপে প্রবোধিত, কতকটা আদিষ্ট হইয়া বলিল,—"যদিও আমার ইচ্ছা নহে, তথাপি যখন আপনি বলিতেছেন, আমি বেড়াইয়া আসি।"

প্রস্থান সময়ে রাণী বলিয়া দিল,—"লিওলাইন! যাহা বলিয়াছি, তাহা যেন স্মরণ থাকে।"

চণ্ডালীর সে কথার অর্থ কি আর পাঠককে বলিতে হইবে?

---

(১০)

সমুদ্র-তটে মেরিনা ও লিওলাইন ভ্রমণ করিতে লাগিল। মেরিনা জিজ্ঞাসা করিল,—"বাতাস কি পশ্চিম হইতে বহিতেছে?"

লিওলাইন উত্তর করিল,—"দক্ষিণ-পশ্চিম।"

মেরিনা। যখন আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম, শুনিয়াছি, বাতাস তখন উত্তর হইতে বহিয়াছিল।

এইরূপ পাঁচ কথা হইতে বালিকা মেরিনার হৃদয়ে তাহার জন্মবৃত্তান্ত-কাহিনী জাগিয়া উঠিল। মাতার মৃত্যু, পিতার যন্ত্রণা—ধাত্রী-মুখে যেমন শুনিয়াছিল—সকলই তাহার স্মৃতিপথে আসিতে লাগিল। মেরিনা বলিতে লাগিল,—"ধাত্রীর মুখে শুনিয়াছি, আমার পিতা কখন ভীত হইতেন না। যখন প্রবল ঝটিকাঘাতে সাগরবক্ষে জাহাজ নৃত্য করিতেছিল, পিতা কিছুমাত্রও ভীত না হইয়া নাবিকদিগকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন।"

লিওলাইন। কখন্ এরূপ হইয়াছিল?

মেরিনা। যখন আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম। কি প্রবল ঝটিকা! কি ভীষণ তরঙ্গ!

তারপর মেরিনা ধাত্রী-মুখে শ্রুত আদ্যোপান্ত বৃত্তান্ত একে একে বলিতে আরম্ভ করিল। সেই ঝটিকা, ঝটিকা-কালে নাবিকদিগের সেই কার্য্যকলাপ, পিতার সাহস ও শেষ বিপদ;—সকল কথাই বলিতে লাগিল। ধাত্রীর নিকট মেরিনা অনেকবার সেই সকল কথা শুনিয়াছিল। সেই সকল ভাবিয়া ভাবিয়া বালিকার এখন বোধ হইত, যেন সেও সে সময় উপস্থিত ছিল।

এইরূপ কথাবার্ত্তার মাঝে লিওলাইন সহসা মেরিনাকে নিস্তব্ধ করিয়া বলিল,—"তুমি প্রার্থনা করিয়া লও।"

মেরিনা ভীত হইল। অথচ কারণও কিছুই বুঝিতে পারিল না। বলিল,—"তুমি কি বলিতেছ?"

লিওলাইন। যদি তোমার প্রার্থনার আবশ্যক থাকে, তবে অল্পে অল্পে এই বার তাহা সারিয়া লও। অধিক সময় পাইবে না। দেবতারা শীঘ্রই শুনিতে পান। আমার কার্য্য শীঘ্রই আমাকে সম্পন্ন করিতে হইবে।

মেরিনা। তুমি কি তবে আমাকে মারিয়া ফেলিবে? হায়, কি জন্য?

লিওলাইন। রাজ্ঞীর আদেশ!

মেরিনা। কেন তিনি আমায় মারিয়া ফেলিতে আদেশ করিয়াছেন? আমার যতদূর মনে আছে, এ জীবনে আমি তাঁহার কোন অনিষ্ট করি নাই। আমি কখন মন্দ কথা বলি নাই। কেবল তাঁহাকে কেন, কোন প্রাণীর প্রতি কখন মন্দ ব্যবহার করি নাই। আমি সত্য বলিতেছি, কখন একটী কীট-পতঙ্গকে পর্য্যন্তও আহত করি নাই। মনে পড়ে, একবার অসাবধানে একটা কীট পদদলিত করিয়াছিলাম; সে জন্য অনুতাপ করিয়াছিলাম;—কি কারণে আমি রাজ্ঞীর নিকট অপরাধী হইলাম?

লিওলাইন। আমি তর্ক করিতে পারিব না। যাহা করিতে আসিয়াছি, তাহাই করিব।

সেই সময় একদল জলদস্যু সেই স্থান দিয়া যাইতেছিল। লিওলাইন মেরিনাকে হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছে, এমন সময়ে ঐ দস্যু-দল মেরিনার প্রাণরক্ষা করিল এবং মেরিনাকে সেই নরঘাতীর হস্ত হইতে ছিনাইয়া লইয়া তরণীযোগে প্রস্থান করিল।

---

(১১)

দস্যুগণ মেরিনাকে লইয়া মিটেলাইন দেশে উপস্থিত হইল। সেখানে কোন এক ব্যক্তির নিকট মেরিনাকে ক্রীত-দাসীরূপে বিক্রয় করিল।

এইরূপ দুরবস্থায় পতিত হইলেও মেরিনা অতি অল্পকাল মধ্যে আপন সৌন্দর্য্য ও সদ্‌গুণে সমগ্র মিটেলাইন প্রদেশে সুবিখ্যাত হইয়া পড়িল এবং নৃত্য-গীত ও সুকুমার শিল্প-কার্য্যে নানা অর্থ উপার্জ্জন করিয়া আপন প্রভুকে ঐশ্বর্য্যশালী করিয়া তুলিল।

মেরিনার সৌন্দর্য্য ও গুণরাশি এরূপ প্রশংসনীয় হইয়া উঠিল যে, সেই দেশের অধিপতি লাইসিমেকাস্ একদিন স্বয়ং তাহাকে দেখিতে আসিলেন। মেরিনার সহিত কথোপকথনে লাইসিমেকাস্ যার-পর-নাই সুখী হইলেন। মেরিনার সেই রূপ, সেই সুন্দর ভদ্রোচিত ব্যবহার, সেই উচ্চশিক্ষা, সেই নির্ম্মল স্বভাব এবং নারীজনোচিত স্নেহ ও সরলতা দেখিয়া লাইসিমেকাস্ একান্ত মুগ্ধ হইলেন এবং অতি হীন অবস্থা জানিয়াও মনে মনে তাহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে সঙ্কল্প করিলেন। তাঁহার মনে হইল, মেরিনা নিশ্চয়ই নীচ-কুলোদ্ভবা নহে। কিন্তু প্রকৃত পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে মেরিনা কথা কহিত না, কাঁদিতে থাকিত।

---

(১২)

এদিকে ক্লিয়ন-মহিষীর ভয়ে লিওলাইন মিথ্যা করিয়া বলিল,—"মেরিনাকে সমুদ্র-তটে হত্যা করিয়াছি।"

তখন সেই রাক্ষসী ক্লিয়ন-পত্নী প্রচার করিয়া দিল যে, মেরিনার মৃত্যু হইয়াছে। লৌকিকতা রক্ষার্থ সেই পাপিষ্ঠা মেরিনার স্মৃতি-চিহ্ন স্বরূপ এক স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিল।

ইহার অল্পদিন পরে পেরিক্লিস্ তাঁহার বিশ্বস্ত মন্ত্রী হেলিকেনাস সমভিব্যাহারে টর্সাস নগরে উপস্থিত হইলেন। কন্যা কেমন আছে, তাহা দেখিতে এবং তাহাকে লইয়া যাইতে তাঁহার আগমন। আজ কতদিনের পর সে হইবে। সেই সদ্যোজাত শিশুর জন্মের পর আজ কতদিন চলিয়া গিয়াছে।—পেরিক্লিস্ তাঁহার মৃত-পত্নীর সেই শিশু তনয়াটীকে এতদিনে গিয়া দেখিবেন, বড় আশা করিয়া আসিয়াছেন!

কিন্তু তাঁহার হর্ষে বিষাদ হইল। তিনি শুনিলেন, তাঁহার সেই জীবনসর্ব্বস্ব দুহিতা মেরিনা আর ইহজগতে নাই! নগরবাসীরা মেরিনার সমাধি-স্তম্ভ দেখাইল। দুর্ভাগ্য পেরিক্লিস্ একান্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। তাঁহার জীবনের শেষ আশাটুকু—তাঁহার মৃত পত্নীর শেষ স্মৃতিটুকু নিভিয়া গেল।—নিভিল না কেবল শোকানল;—তাহা দ্বিগুণরূপে জ্বলিয়া উঠিল! পেরিক্লিস্ সেখানে আর তিষ্ঠিতে পারিলেন না। ব্যথিত হৃদয়ে টর্সাস নগর পরিত্যাগ করিলেন।

সেই দিন হইতে কি এক দারুণ মোহ তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিল। কথা কহিতেন না, হাসিতেন না,—দেখিলে বোধ হইত, যেন বাহ্যজ্ঞান চিরদিনের জন্য তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে।

শোকাতুর পেরিক্লিস্‌কে লইয়া তদীয় বিশ্বস্ত সচিব জাহাজে আরোহণ করিয়া টর্সাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক টায়ারে প্রস্থান করিলেন।

---

(১৩)

পেরিক্লিস্ টর্সাস হইতে নিজরাজ্য টায়ার নগরে প্রস্থান করিতেছেন। মিটেলাইন এই উভয় প্রদেশের মধ্যবর্ত্তী একটী নগর। মেরিনা এই নগরে অবস্থান করিতেছিল। যখন পেরিক্লিসের জাহাজ মিটেলাইন নগরী অতিক্রম করিতেছিল, সমুদ্র-তট হইতে মিটেলাইন-দেশাধিপতি লাইসিমেকাস তাহা দেখিতে পাইয়া সেই জাহাজ কাহার এবং কেই বা তাহাতে আছে, জানিবার জন্য কৌতূহলী হইলেন। পরে একখানি ক্ষুদ্র নৌকা করিয়া সেই জাহাজের নিকটে পঁহুছিলেন।

পেরিক্লিসের মন্ত্রী হেলিকেনাস লাইসিমেকাসকে যথেষ্ট অভ্যর্থনা করিলেন, এবং বলিলেন,—"এ জাহাজ টায়ার নগর হইতে আসিয়াছিল, এক্ষণে আবার টায়ার নগরে ফিরিয়া চলিয়াছে। টায়ার-রাজ পেরিক্লিস্ ইহার মধ্যে আছেন। প্রিয়তমা পত্নী ও স্নেহময়ী দুহিতার শোকে তিনি একান্ত মুহ্যমান। আজি তিন মাস হইল, তিনি এ পর্য্যন্ত একরূপ আহার করেন নাই, কাহারও সহিত বাক্যালাপও করেন নাই;—নিয়তই ম্রিয়মাণ ও বিষণ্ণ। এই অবস্থায় থাকিয়া যন্ত্রণার আরও বৃদ্ধি করিতেছেন।"

লাইসিমেকাস্ এই শোকগ্রস্ত রাজাকে দেখিতে চাহিলেন, এবং পরে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে দেখিলেন, রাজা এক সময়ে সুপুরুষ ছিলেন বটে। কিন্তু এক্ষণে তাঁহার সে সুকুমার দেহ একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। পরে মিটেলাইন্-অধিপতি উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন,—"মহারাজের জয় হউক! ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন!"

কিন্তু পেরিক্লিস্ কোন উত্তর করিলেন না। তিনি শূন্য হৃদয়ে এরূপ শূন্য দৃষ্টি করিলেন যে, তাহাতে স্পষ্টই বুঝা গেল, তিনি বাহ্যজ্ঞান-শূন্য। অন্য যে কেহ তাঁহাকে সম্ভাষণ করিতেছে, তাহা তিনি বুঝিতেই পারিতেছেন না।

তখন সেই দুর্ভাগ্য পেরিক্লিসের দুঃখে একান্ত ব্যথিত হইয়া লাইসিমেকাস্ ভাবিলেন,—"মধুর-ভাষিণী মেরিনাকে এ সময় পাইলে কিছু উপকার হইতে পারে। সেই স্নেহ-মাখা মধুর কণ্ঠ শুনিলে কাহার্ না হৃদয় দ্রব হইয়া যায়! বোধ হয়, মেরিনা কথাবার্ত্তা কহিলে এই নৃপতির বাক্যস্ফূর্ত্তি হইতে পারে।"

এইরূপ মনে করিয়া হেলিকেনাসের সহিত পরামর্শ পূর্ব্বক তিনি মেরিনাকে আনাইলেন।

লাইসিমেকাস্ মনে মনে বলিলেন, "এ বালিকা কে, জানি না। ইহার গুণের পরিচয় আর কি দিব, যদি ইহার পরিচয় সবিশেষ জানিতে পারিতাম, তবে এতদিনে ইহাকে বিবাহ করিয়া এরূপ পত্নীলাভে আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিতাম।"

অনন্তর মেরিনাকে সম্বোধন-পূর্ব্বক তিনি বলিলেন,—"এই জাহাজ মধ্যে এক সম্ভ্রান্ত নরপতি শোকে মুহ্যমান হইয়া আছেন। কাহারও সহিত কোন কথা নাই, কিছুমাত্র আহার

নাই, দিবানিশি দারুণ মনঃকষ্টে ম্রিয়মাণ। সুন্দরি! তুমি মধুর বচনে এ রোগের প্রতিকার কর। তোমার মধুর বচনে ইহাঁর শোকের সান্ত্বনা হইবে। আমার বিশ্বাস, ইহাঁর আবার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইবে।"

মেরিনা ধীর-বচনে উত্তর করিল,—"মহারাজের অনুমতি আমার শিরোধার্য্য। এই সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির রোগ উপশম করিবার জন্য আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। কিন্তু অনুমতি করুন, আমি এবং আমার সহচরী ভিন্ন যেন আর কেহ জাহাজের ভিতর যাইতে না পারে।" মিটেলাইন্-অধিপতি ও হেলিকেনাস এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

যখন মেরিনা সেই জাহাজ-মধ্যে প্রবেশ করিল, সকলেই তাহার সেই মধুর আকৃতি দেখিয়া বুঝিল, ইহার দ্বারা আমাদিগের কার্য্য-সিদ্ধি হইতে পারে। কিন্তু কেহই জানিল না যে, এই মেরিনা শোকাতুর পেরিক্লিসের সেই নয়নপুত্তলী স্নেহময়ী দুহিতা। এবং মেরিনাও জানিল না, যে ব্যথিত-হৃদয় নৃপতির সান্ত্বনা করিতে সে আসিয়াছে, সে ব্যক্তি অন্য কেহ নয়,—তাহারই শোকে-কাতর তাহার স্নেহময় দুর্ভাগ্য পিতা পেরিক্লিস্!

---

(১৪)

মেরিনা রাজার তনয়া। দৈব-দুর্ব্বিপাকে পরদেশে পরের নিকট ক্রীত-দাসীরূপে নিযুক্তা ও দাসীভাবে পরিচিতা। তাই এতদিন কাহাকেও মুখ ফুটিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করে নাই। কিন্তু আজি পেরিক্লিসের সম্মুখে আত্মপরিচয় প্রদান করিতে বসিল। মেরিনা উচ্চবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া কিরূপ দৈন্যদশায় উপনীত হইয়াছে, একে একে তাহাই বিবৃত করিতে লাগিল। মেরিনার কথায় বোধ হইল, যেন সে পেরিক্লিস্‌কে আপনার পিতা বলি চিনিতে পারিয়াছে; কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নয়। মেরিনা বুঝিয়াছিল, এরূপ দুঃখার্ত্ত ব্যক্তি দুঃখ দূর করিতে হইলে আপনার দুঃখ কাহিনী শুনাইয়া উভয়ের দুঃখের তারতম্য দেখাইতে হয়। মেরিনা এমন মধুর-স্বরে সে কাহিনী বলিতে লাগিল যে, সেই বীণাবিনিন্দি কণ্ঠস্বরে পেরিক্লিসের সেই অবসন্ন হৃদয় অল্পে অল্পে জাগিয়া উঠিল। অল্পে অল্পে তিনি চক্ষু খুলিলেন,—এতদিন বুঝি সে চক্ষু একরূপ নিমীলিতই ছিল। চক্ষু চাহিয়া দেখিলেন অনিন্দ্য সুন্দরী বালিকা-মূর্ত্তি!

মেরিনা তাহার মাতার প্রত্যক্ষ অনুরূপ পেরিক্লিস্ দেখিয়াই বুঝিলেন, তাঁহার প্রিয়তমা মহিষীরও এইরূপ মূর্ত্তি ছিল;

যে পেরিক্লিস্ এতদিন নির্ব্বাক্ অবস্থায় পতিত ছিলেন, আজি তাঁহার বাক্যস্ফুরণ হইল। মনে মনে বলিলেন,—"আমার মহিষী ঠিক এই রূপ ছিলেন। আহা, যদি আমার কন্যা আজি বাঁচিয়া থাকিত, এতদিনে সেও ঠিক এইরূপ হইত। আমার মহিষীর ন্যায় তেমনই সুন্দর তেমনই আকৃতি, তেমনই সব। অধিক কি তেমনই কণ্ঠস্বরও যেন শুনিতেছি!—"প্রকাশ্যে বলিলেন, বৎসে! তুমি কে, কোথায় থাক, তোমার পিতা মাতা কে? এই মাত্র না দুঃখ বলিতেছিলে, দৈবদুর্ব্বিপাকে তুমি এমন শোচনীয় অবস্থায় উপনীত হইয়াছ?—এবং বলিতেছিলে না, তোমার আমার উভয়ের দুর্ঘটনার কথা ব্যক্ত হইলে বোধ হয় সমান হইবে। এ কথা কি সত্য?"

মেরিনা। আমার ত অনুমান এইরূপ।

পেরিক্লিস্। তবে তোমার কাহিনী আমাকে শুনাও। যদি শুনি, আমার দুঃখযন্ত্রণার মত যদি একটুকুও তুমি ভোগ করিয়া থাক, তবে বুঝিব, বীর-পুরুষের ন্যায় তুমি তাহা সহ্য করিয়াছ এবং আমি একটী বালিকার ন্যায় অস্থির-চিত্ত হইয়াছি! তোমাকে দেখিয়া বোধ হইতেছে, যেন তুমি আশার সমাধিস্তম্ভে সহিষ্ণু-প্রতিমারূপে অধিষ্ঠিত হইয়া মৃদু-মধুর হাস্য করিতেছ! বৎসে! কি প্রকারে তুমি এরূপ অবস্থায় উপনীত হইলে? আমি অনুরোধ করিতেছি, তোমার সমস্ত কাহিনী আমাকে শুনাও। আমার কাছে উপবেশন কর মা!

---

(১৫)

তারপর পেরিক্লিস্ যখন শুনিলেন, সেই বালিকার নাম মেরিনা,—তখন তাঁহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। "মেরিনা" ত সাধারণ নাম নহে;—সাগর-বক্ষে জন্মগ্রহণ করিলেই লোকে এইরূপ নামকরণ করিয়া থাকে!

পেরিক্লিসের কন্যাও সাগরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। তিনিও তাহার নামকরণ করিয়াছিলেন,—"মেরিনা"। এক্ষণে তাঁহার বোধ হইল, এই বালিকা নিশ্চয়ই তাঁহাকে উপহাস করিতে আসিয়াছে। তিনি অতি দুঃখের সহিত বলিয়া উঠিলেন,—"হা অদৃষ্ট! নিষ্ঠুর দৈব কি প্রতিকূল!—এই অতি-বড় দুঃখের সময়ও আমাকে লোকের নিকট হাস্যাস্পদ করিবার জন্য তোমাকে পাঠাইয়াছে!"

মেরিনা। মহারাজ! অধৈর্য্য হইবেন না। নচেৎ অনুমতি করুন, আমি নিরস্ত হই।

পেরিক্লিস্। না, আমি চুপ করিয়া থাকিব, তুমি বলিয়া যাও। হায়, তোমার মেরিনা নামে যে আমি কিরূপ চমকিত হইয়াছি, তাহা তুমি কি বুঝিবে?

মেরিনা। আমার নামকরণে যাঁহার অধিকার আছে, তিনিই আমার এই নাম রাখিয়াছেন।—তিনি অন্য কেহ নহেন, আমার পিতা।—আমি রাজার দুহিতা!

পেরিক্লিস্। কি বলিলে? তুমি রাজার দুহিতা? তোমার নাম মেরিনা? কিন্তু সত্য করিয়া বল, তুমি ত কোন মায়াবিনী বা দেবকন্যা নহ? সত্য করিয়া বল, তোমার দেহ কি এমনই রক্তমাংসে গঠিত? কোথায় তুমি জন্মগ্রহণ করিয়াছ? এবং কেনই বা তোমার নাম "মেরিনা" হইল?—বল, সত্য বল।

মেরিনা। আমি সমুদ্রে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম। এইজন্য পিতা নাম রাখিয়াছেন—"মেরিনা"। আমার মাতাও এক রাজার কন্যা। আমি হতভাগিনী,—আমাকে প্রসব করিয়াই আমার মাতা মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। ধাত্রী কাঁদিতে কাঁদিতে কতবার আমাকে সেই সব কথা শুনাইয়াছে। টর্সাস-অধিপতির নিকট আমার পিতা প্রতিপালনের জন্য আমাকে রাখিয়া গিয়াছিলেন। সেখানে আমি খুব যত্নেই ছিলাম। কিন্তু কি অপরাধে জানি না, টর্সাস-রাজপত্নী হঠাৎ একদিন আমাকে লোক দ্বারা হত্যা করিতে সঙ্কল্প করেন। সঙ্কল্প যখন কার্য্যে পরিণত হইবার উপক্রম হইয়াছে, সেই সময়ে একদল জলদস্যু আসিয়া সহসা আমার প্রাণ রক্ষা করে, এবং তাহারাই আমাকে এই মিটেলাইন প্রদেশে আনিয়াছে।—কিন্তু মহারাজ! আপনি কাঁদিতেছেন কেন? আপনি কি মনে করেন, আমি আপনাকে প্রতারণা করিতেছি? আমি সত্যই বলিতেছি, আমি টায়ার-অধিপতি মহারাজ পেরিক্লিসের কন্যা!

বিস্ময় ও কৌতূহলে পেরিক্লিস্ অধীর হইলেন। আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া হৃদয়ের পূর্ণ আবেগে সহসা তিনি অনুচরগণকে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিলেন। অনেক দিনের পর প্রভুর আহ্বান শুনিয়া তাহারা যার-পর-নাই আনন্দিত হইল। অনন্তর পেরিক্লিস্ আপন মন্ত্রীকে কহিলেন,—"অহো! হেলিকেনাস্! এখনই

আমাকে নির্দ্দয়রূপে প্রহার কর! শরীর ভাঙ্গিয়া দাও! নহিলে বুঝি এ উৎকট আনন্দে আমার বুক ভাঙ্গিয়া যায়।—আর তুমি মেরিনা, মা আমার!—তুমি একবার কাছে এস। মা! তুমি সেই সাগরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে,—টর্সাস নগরে তোমার সমাধি-মন্দির দেখিয়াছি,—আজি আবার তোমাকে সেই সমুদ্রেই পাইলাম। হেলিকেনাস্! আজি কি আনন্দ!—নতজানু হইয়া এস, প্রাণ ভরিয়া ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেই! এই আমার জীবনসর্ব্বস্ব দুহিতা—মেরিনা! এই আমার সেই হারানিধি! মন্ত্রী! আমার নূতন পরিচ্ছদ আনিয়া দাও। কে বলিল, টর্সাস নগরে মেরিনার মৃত্যু হইয়াছে? সব মিথ্যা! সব মিথ্যা! পিশাচী টর্সাস-রাজপত্নী এইরূপ প্রচার করিয়াছিল!"

তারপর পেরিক্লিস্ লাইসিমেকাসের প্রতি চাহিলেন। এতক্ষণ পরে তাঁহার দিকে ফিরিলেন। মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ইনি কে?"

মন্ত্রী। ইনি এই মিটেলাইন নগরের অধিপতি। ইহাঁর নাম লাইসিমেকাস্। আপনার দুরবস্থার কথা শুনিয়া আপনার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছেন।

পেরিক্লিস্। মহাশয়কে আমি অভিবাদন করি।—শুন মন্ত্রী! কি মধুর সঙ্গীত হইতেছে!

কিন্তু কৈ, গীত-স্বর ত কোথাও নাই! দৈব-অনুগ্রহ বল কিংবা আনন্দোচ্ছ্বসিত হৃদয়ের অভিব্যক্তি বল, পেরিক্লিস্ যেন অতি ধীর, অতি কোমল, অতি মৃদু, অতি মধুর সঙ্গীত শুনিতে লাগিলেন।

মন্ত্রী। মহারাজ, কোথা সঙ্গীত? আমি ত কিছুই শুনিতে পাইতেছি না!

পেরিক্লিস্। কিছুই শুনিতে পাইলে না? তবে বুঝি, ইহা স্বর্গের কোন দেব-সঙ্গীত! আঃ! আজ আমি ধন্য হইলাম, সহসা আমার কেমন তন্দ্রা আসিতেছে!

লাইসিমেকাস্ অনুমান করিলেন, সঙ্গীত ত কোথাও কিছু নাই, অতএব ইহা আর কি নয়,—অতি আনন্দে পেরিক্লিসের ভাবান্তর ঘটিয়াছে! তিনি হেলিকেনাসকে জনান্তিকে বলিলেন,—"রাজার সহিত এক্ষণে বাদানুবাদে প্রয়োজন নাই।"

অনন্তর পেরিক্লিস্‌কে বলিলেন,—"মহারাজ সত্য বটে, আমিও সুমধুর সঙ্গীত শুনিতেছি।"

পেরিক্লিস্ সেই সময় নিদ্রালস হইয়া লাইসিমেকাস্ তাঁহাকে পালঙ্কোপরি শয়ন করাইলেন। পেরিক্লিস্‌ও অপূর্ব্ব আনন্দ-প্রবাহে অবসন্ন হইয়া শীঘ্রই নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িলেন। মেরিনা নিদ্রিত পিতার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া রহিল।

---

(১৬)

নিদ্রিত পেরিক্লিস্ এক অপূর্ব্ব স্বপ্ন দেখিলেন। দেখিলেন, যেন ইফিসাস্ নগরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ডিয়ানা তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূতা হইলেন। তাঁহার হস্তে রৌপ্য-বিনির্ম্মিত সেই ধনু, তাঁহার সেই উজ্জ্বল বিমল স্বর্গীয় জ্যোতি—দেবী যেন আদেশ করিতেছেন,—"শুন পেরিক্লিস্! ইফিসাস্ নগরে চল। সেখানে আমার মন্দিরে গিয়া আত্মকাহিনী বিবৃত কর। আমার আদেশ পালন কর, তোমার আশাতিরিক্ত শুভফল লাভ হইবে।"

পেরিক্লিসের নিদ্রাভঙ্গ হইল। দেহ অনেক সুস্থ হইল। মনেও এক অপূর্ব্ব ভাবের আবির্ভাব হইল। সকলকে স্বপ্নবৃত্তান্ত বলিলেন। দেবীর আদেশে ইফিসাস্ নগরে যাইতে মনস্থ করিলেন।

এইবার লাইসিমেকাস্ পেরিক্লিস্‌কে জাহাজ হইতে অবতরণ করিতে বিশেষরূপ অনুরোধ করিলেন এবং যথাসময়ে নিজ ভবনে লইয়া গিয়া দুই এক দিন আনন্দ উল্লাসে অহিবাহিত

করিলেন। একে রাজ-অতিথি, তার উপর মেরিনার পিতা বলিয়া লাইসিমেকাস পেরিক্লিস্‌কে একান্ত সম্মান প্রদর্শন করিলেন। পেরিক্লিস্‌ও জানিলেন, মেরিনাকে যে অবধি রাজকন্যা বলিয়া লাইসিমেকাস্ জানিতে পারেন নাই, সে পর্য্যন্তও তিনি মেরিনার প্রতি একান্ত সম্মানের সহিত অনুরাগ প্রদর্শন করিয়াছেন। পেরিক্লিস্ এক্ষণে পরস্পরের প্রতি পরস্পরের মনোভাব বুঝিলেন এবং দুই জনকে পরিণয়-সূত্রে বদ্ধ করিতে তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা হইল। তবে তিনি এই মাত্র বলিলেন,—"এক্ষণে আমরা সকলে ইফিসাস্ নগরে ডিয়ানা দেবীর মন্দিরে যাইব; দেবীদর্শনের পর অন্য কার্য্যে মনোনিবেশ করিব।"

অনন্তর সকলে মিলিয়া ইফিসাস্ নগরে যাত্রা করিলেন। ডিয়ানা দেবীর কৃপায় অনুকূল বায়ুভরে অতি অল্প সময়ের মধ্যে তাঁহারা সকলে নিরাপদে ইফিসাস্ নগরে উপস্থিত হইলেন।

---

(১৭)

পেরিক্লিসের মৃতপ্রায় মহিষীকে যিনি বাঁচাইয়াছিলেন, সেই সদাশয় সেরিমন ঈশ্বরেচ্ছায় আজিও বিদ্যমান আছেন। তবে এখন তাঁহার বৃদ্ধাবস্থা। যখন পেরিক্লিস্ সহচরগণ-সমেত ডিয়ানা দেবীর মন্দিরে উপস্থিত হইলেন, তখন সেরিমনও সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং পেরিক্লিসের মহিষী থেইসাও সেই মন্দিরের দ্বারদেশে দণ্ডায়মান ছিলেন।

অনেক বৎসর অতীত হইয়াছে, মাথার উপর দিয়া অনেক বিপদ-আপদ চলিয়া গিয়াছে, পেরিক্লিসের অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, কিন্তু তথাপি দর্শন মাত্রই পতিব্রতা থেইসা তাঁহার স্বামীকে চিনিতে পারিলেন। এবং যখন পেরিক্লিস্ কথা কহিতে আরম্ভ করিলেন, থেইসা নিতান্ত বিস্ময় ও আনন্দের সহিত সেই কথা শ্রবণ করিতে লাগিলেন। পেরিক্লিস্ দেবীর নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন;—"দেবি ডিয়ানা! আশীর্ব্বাদ করুন! আপনারই আদেশে আমি এখানে আসিয়াছি। আমি টায়ারের অধিপতি পেরিক্লিস্। অত্যাচার-ভয়ে দেশত্যাগ করিয়া বিদেশে ঘুরিয়াছি। পেণ্টাপলিস নগরের রাজকন্যা থেইসাকে বিবাহ করিয়াছি। থেইসা সমুদ্র-বক্ষে প্রসব-কালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তিনি এক কন্যা প্রসব করিয়াছিলেন,—তাহার নাম মেরিনা। টর্সাস নগরে সেই কন্যাকে রাখিয়াছিলাম। টর্সাস-রাজমহিষী মেরিনার চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সে মেরিনাকে হত্যা করিতে সঙ্কল্প করেন। সৌভাগ্যক্রমে মেরিনা মিটেলাইন নগরে আনীত হয়। দৈবক্রমে আমি তাহাকে সেইখানে পাইয়াছি এবং তাহারই নিকট হইতে সকল পরিচয় পাইয়া তাহাকে আপন কন্যা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি।"

পেরিক্লিসের এই প্রার্থনা শুনিয়া থেইসা আনন্দে একান্ত অধীরা হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন;—"তুমিই কি পেরিক্লিস্? তবে তুমি বাঁচিয়া———"

মুখ ফুটিয়া সকল কথা বাহির হইল না; থেইসা হর্ষাবেগে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন।

পেরিক্লিস্। এ কি! এ স্ত্রীলোক কে? মহাশয়গণ! রক্ষা করুন। বুঝি, এ স্ত্রীলোকটীর মৃত্যু হয়।

সেরিমন। মহাশয়, আপনি যাহা বলিলেন, তাহা যদি সত্য হয়, তবে ইনিই আপনার সহধর্ম্মিণী—থেইসা!

পেরিক্লিস্। মহাশয়, না—ইহা হইতে পারে না। আমি এই বাহুদ্বয়ে নিজে তাঁহার মৃত-দেহ সাগরজলে নিমজ্জিত করিয়াছি!

তখন সেরিমন যে অবস্থায় থেইসাকে

আনন্দ-মিলন।

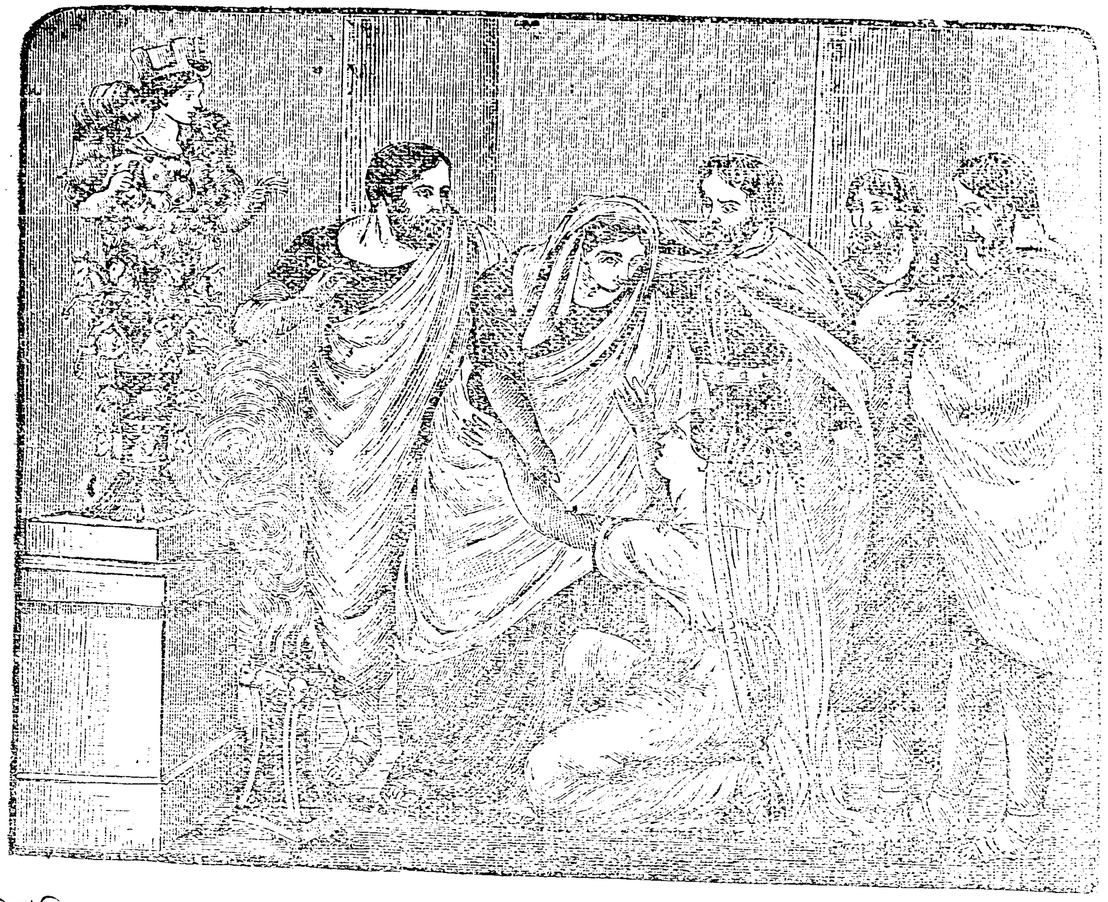

পাইয়াছিলেন এবং তার পর যেরূপে তাঁহার জীবন রক্ষা করেন,—একে একে সকল কথা বিবৃত করিলেন। পরে থেইসা সংজ্ঞা-লাভ করিলে বলিয়া উঠিলেন,—"প্রভু! তুমি কি সেই পেরিক্লিস্ নহ? তেমনই ত তোমাকে দেখিতেছি! ঠিক সেইরূপ কণ্ঠস্বর শুনিতেছি! এই না কি-এক ঝটিকার কথা বলিতেছিলে? আর সেই ঝটিকার সময় না কাহার জন্ম-বিবরণ ও কাহার মৃত্যুর কথা বলিলে?"

পেরিক্লিস্ বিস্ময়-বিমুগ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "এ যে মৃতা থেইসার কণ্ঠস্বর!"

থেইসা। প্রিয়তম! আমি সেই থেইসা!—হর্ষে থেইসার কণ্ঠরোধ হইল। সে আনন্দ অনুভবনীয়, বুঝাইবার নহে।

পেরিক্লিস্ ভক্তিভরে ডিয়ানা দেবীকে প্রণাম করিলেন। থেইসা বলিতে লাগিলেন,—"স্বামিন্! আমি তোমার বিলক্ষণরূপ চিনিতে পারিতেছি। পিতা-মাতার নিকট হ বিদায়কালে আমার পিতা যে অঙ্গু তোমাকে উপহার দিয়াছিলেন, আজিও তো অঙ্গুলিতে সেই অঙ্গুরীয়ক দেখিতেছি!"

পেরিক্লিস্ আর শুনিতে পারিলেন আনন্দে গদ্গদ হইয়া বলিতে লাগিলেন, ঈশ্বর! আজি তোমার অনুগ্রহে আমার ঘটনা কৌতুক বলিয়া মনে হইতেছে!—থেইসা, পতিব্রতা, সতী-সাধ্বী!—এম প্রাণাধিকে! এ বাহুযুগলে তোমায় দ্বিতীয় সমাধিস্থ করি!"

মেরিনা। মায়ের ক্রোড়ে যাইবার আমার অন্তর আনন্দে নৃত্য করিতেছে।

তখন পেরিক্লিস্ থেইসাকে আপন দেখাইয়া দিলেন। বলিলেন,—"প্রিয়তমে! এখানে কে? এই তোমার কন্যা! সেই অঙ্গু সমুদ্র-বক্ষে এই তোমার জীবনের ভাবী হইয়াছিল! সমুদ্রে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল বলিয়া আমি ইহার নাম রাখিয়াছি, মেরিনা!"

তখন মায়ের আনন্দ দেখে কে? সেই ভক্তিভরে নতজানু কন্যা মেরিনাকে ক্রোড়ে টানিয়া লইয়া থেইসা অনির্ব্বচনীয় আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তখন পেরিক্লিস্ আনন্দ-উদ্বেলিত হৃদয়ে ভক্তিপূর্ণ অন্তরে ডিয়ানা দেবীর প্রতি বার বার প্রণাম করিয়া আপনার কৃতজ্ঞতা জানাইলেন, এবং সেই-খানেই পত্নীর সম্মতিক্রমে মিটেলাইন-অধিপতি লাইসিমেকাসের সহিত স্নেহময়ী কন্যা মেরিনার শুভ পরিণয় ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। এই অভূতপূর্ব্ব অপূর্ব্ব আনন্দ মিলনে চারিদিক্ আনন্দিত হইল।

পেরিক্লিস্, তাঁহার মহিষী ও তাঁহার কন্যার জীবনীতে দেখিলাম, সহস্র বিপদ-আপদের মধ্যেও ধর্ম্মের মাহাত্ম্য অক্ষুণ্ণ রহিয়া যথাসময়ে উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ পাইল। ধর্ম্মের জীবনে এত বাধা-বিঘ্ন, এত বিপদ-আপদ—তাহাও বিধির বিধান!—মানুষ বিপদে ধৈর্য্যশীল, দুঃখে অবিচলিত-চিত্ত হইবে, ইহাই এ রহস্যের উদ্দেশ্য। পেরিক্লিসের মন্ত্রীর জীবনে অপূর্ব্ব বিশ্বাস ও প্রভু-ভক্তি দেখিলাম। ইচ্ছা করিলেই যখন শূন্য-সিংহাসনে অধিরূঢ় হইতে পারিতেন, তখন সুদূর প্রবাস হইতে সিংহাসনের যথার্থ অধিকারী রাজা পেরি-ক্লিস্‌কে আহ্বান করিয়া সেই সিংহাসনে বসা-ইয়াছিলেন! থেইসার জীবনদাতা সেরিমনের জীবনে এই শিক্ষা পাইলাম যে, জ্ঞানের সহিত দয়া মিশিয়া দেবতার মঙ্গল-অভিপ্রায়ের ন্যায় মানুষ কি অপূর্ব্ব কার্য্য সমাধা করিতে পারে! কেবল একটা কথা দুঃখের সহিত বলিতে হইল;—সেই পিশাচী টর্সাস-রাজ-মহিষী—যে পাপিষ্ঠা সরলা মেরিনাকে হত্যা করিতে সঙ্কল্প করিয়াছিল—সে আপন প্রজাদিগের হস্তে উপযুক্ত শাস্তি পাইয়াছিল। কারণ, সেই কৃতঘ্ন টর্সাস্‌বাসিগণ যখন মেরিনার যথার্থ বৃত্তান্ত অবগত হইল, তাহারা ক্রোধান্ধ হইয়া টর্সাসের রাজভবনে অগ্নি প্রদান পূর্ব্বক রাজা ও পিশাচী রাজপত্নীকে দগ্ধ করিল। এই শাস্তিতে বুঝি দেবতারাও প্রসন্ন হইলেন। কারণ, টর্সাস-রাজ সমস্ত জানিতে পারিয়াও পাপিষ্ঠা রাণীর দুরভি-সন্ধির কোন প্রতিকার করেন নাই।

সহস্র বিপদের ভিতর দিয়াও ধর্ম্মের জ্যোতি চিরদিন উজ্জ্বল!

শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত।

আঁখি তুলে।

১

আঁখি তুলে একবার যদি গো চাহিতে তুমি,—
শুখাত' না এত ফুল
জীবনে হ'তো না ভুল
বসন্ত কানন মোর হ'তো নাক মরুভূমি।
থাকিতে সমস্ত বেলা
ফুরায়ে যেত' না খেলা
কাঁদিতে হ'তো না বালা সারা এ দিবস-যামী।
আঁখি তুলে একবার যদি গো চাহিতে তুমি।

২

ধরণীর এত কাজ
বিফল হ'তো না আজ
হেলা ফেলা অবহেলা আঁধার সংসার-ভূমি।
দেহেতে থাকিতে প্রাণ
ফুরাত' না মোর গান
জীবন হ'তো না শেষ কাঁদিয়া একেলা ভূমি
আঁখি তুলে একবার যদি গো চাহিতে তুমি।

৩

তোমারে পাইলে বালা
মিটিত সকল জ্বালা
পূরিত সকল আশ জনম যেত না তুমি।
বাঁচিতাম তোরে পেয়ে
গান গেয়ে শুধু চেয়ে
ধরায় অমর হ'য়ে ও বদন চুমি চুমি।
আঁখি তুলে একবার যদি গো চাহিতে তুমি॥

শ্রীচুণিলাল গুপ্ত।

সমাস।

মিলিয়া মিশিয়া একত্র থাকার নাম সমাস। উত্তম, মধ্যম, যেমন পদই হউক না কেন, পদস্থ পাঁচটীর মধ্যে বিভক্তি বা বিভাগের কথা ছাড়িয়া দাও, বিভাগের কথা লুপ্ত হইয়া যাউক্। তৎপরে মিলিয়া মিশিয়া যথাসম্ভব সন্ধি করিয়া বসবাস কর দেখি, কত সুখ পাইবে। বৃথা ব্যস্ত হইয়া সে-সুখ-ভঙ্গ করিও না।

কিন্তু একত্র মিলিয়া থাকিলেও তন্মধ্যে স্ব-স্ব-প্রধানতা দেখাইলেই দ্বন্দ্ব হইবে। যেমন দেবাসুর মিলিয়া সমুদ্র-মন্থন করিলেও তাঁহাদের দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইয়াছিল। তবে প্রণয়ের যে দ্বন্দ্ব, তাহা অসুখের নহে। যেমন জায়াপতি বা দম্পতির, অথবা হর-গৌরীর। অর্থাৎ সংসারে থাক বা অরণ্যে থাক, পাঁচ জনে মিলিলেই কদাচিৎ কোন-না-কোন কারণে দ্বন্দ্ব অপরিহার্য্য হয়, কিন্তু তাই বলিয়া তাহা কি ধর্ত্তব্য? পিতা-পুত্রের কি অন্তরস হয় না? এমন সদ্ভাব-সম্পন্ন যে যুধিষ্ঠির-ভীমার্জ্জুন-নকুল-সহদেব, তাঁহাদের কি দ্বন্দ্ব হয় নাই? অতি নিবিড় হইয়া থাকিলে অরণ্যে শাল-তাল-তমাল হিন্তালের, বা উদ্যানে জাতি-যূথী-মল্লিকা-মালতীর, অথবা সরোবরে হংস-বক-চক্রবাকের, কি রণক্ষেত্রে হস্ত্যশ্ব-রথ-পদাতির দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না কি?

যাহারা নিত্য-বিরোধী, যেমন অশ্ব-মহিষ, অহি-নকুল, শশ-শৃগাল, তাহাদিগের কথা আর বক্তব্য কি? তাহাদিগের যেন অহোরাত্রই দ্বন্দ্ব লাগিয়া আছে। প্রাণিগণের কথা দূরে থাক, শীতোষ্ণ, সুখ-দুঃখ প্রভৃতি যে গুণ-পদার্থ তাহাদের দ্বন্দ্বও যেন বিধিকৃত বলিয়াই বোধ হয়।

পণ্ডিতেরা এই দ্বন্দ্বকে প্রধান বলিয়া থাকেন। কেননা, ইহাতে প্রত্যেক পদের প্রাধান্য সম্পূর্ণরূপে অভিব্যক্ত হয়। সংসারে স্ব-স্ব-প্রধানতারই চিরকাল আদর। তবে যিনি দ্বন্দ্বাতীত, তাঁহার প্রাধান্যেও প্রয়োজন নাই, তিনি এ সংসারেও নহেন। তাঁহার কথা পৃথক্।

আর বহুব্রীহি! বহুব্রীহিকে পণ্ডিতেরা বড়ই জঘন্য বলেন। কেননা, যার ধন তার ধন নয়, এইরূপ বিচারই উহার নিকট পাওয়া যায়। মনে কর, বহুক্ষীরা গাভী। গাভীটীর দুগ্ধ হয়, তাহাও অল্প-স্বল্প নহে, বহুপরিমাণে। কিন্তু তাহাতে তাহার কি? দোহন করিয়া পরেই খায়। বৎসগণ হাম্বারব করিতে থাকেন মাত্র। আমাদের ভারতভূমিই কি তাহা নহে? এমন প্রচুর দুগ্ধ আর কাহার? যখন ইচ্ছা, যতবার ইচ্ছা, দোহন কর, তখনি ভাণ্ডপূর্ণ হইবে। কিন্তু ভাণ্ড পরের হস্তে। দুর্ভাগ্য বৎসগণ হাম্বারব করিতে থাকেন মাত্র। সে রবে গগন ফাটিয়া যায়। তাঁহারা ভাবেন, সে রবের গৌরবেই ইষ্টসিদ্ধি করিয়া লইবেন। কিন্তু তৎক্ষণেই দোহনকারীর মধুর প্রহারে নীরব হইয়া মুখ ফিরাইয়া লন। কিন্তু তাহাও ক্ষণকালের নিমিত্ত। অবিলম্বেই ভাণ্ডধারীর দুগ্ধসিক্ত পদলেহন করিতে থাকেন। ভাণ্ডধারীর বিশেষ অনুগ্রহ থাকিলে ভাণ্ডের গাত্রও কখন কখন লেহন করিতে পান, এইমাত্র।

বহুব্রীহি নামটারই তাৎপর্য্য দেখ।—ব্রীহি অর্থাৎ ধান্য বহু আছে যার। উত্তম কথা। কিন্তু উহাও কি আমাদের ভারতভূমি নহে? ধান্য যথেষ্ট-পরিমাণ আছে, কিন্তু অনাহারে ততোধিক যথেষ্ট-পরিমাণে মরিতে আছে এই ভারতেরই সন্তান। সুতরাং ধান্য কাহার? তোমাদের বলিতে হয়, বল। কিন্তু আমিও তাহাতেই বলি, ভারতভূমি বহুব্রীহি।

তুমি সমুদ্র দেখিয়াছ, তাহাতে তোমার

কি-গুণের আশা করিতে পারি যে তাহা দেখিয়া চিনিতে পারিব ও বলিব, অমুক ব্যক্তি "দৃষ্ট-সমুদ্র"? সমুদ্র সমুদ্রেই আছে, দৃষ্টিও সেই দৃষ্টিতেই তখনি ফিরিয়া আসিয়াছে। বিলাত যাইলেই হয় না ও আকার-প্রকার চলন-বলন পরিবর্ত্তন করিলেই হয় না। বিলাতবাসীর গুণে ও জ্ঞানে অধিকারী হইলে বাহাদুরী বুঝিতে পারি। তাহা অপেক্ষা দেশে থাকিয়া "লম্বকর্ণ" নাম লওয়া বরং ভাল। অন্ততঃ দেশের লোকে কতক চিনিতে পারে। তবে সংসর্গে নানারূপ বিদ্যা বাড়ে এবং কাণমলা খাইয়া কাণও বাড়ে। তাহাতেই যা-কিছু খরচ হয়। কিন্তু এরূপে কৃতবিদ্য হইলেই বা কি হইবে? বিদ্যা প্রকৃত যাহাদের, সেই সুন্দর পুরুষদেরই কাজে লাগে। তোমাদের বিদ্যা পুস্তকেই থাকে, কাহার কাহার মুখেও থাকে। ফলতঃ বহুব্রীহির দুর্দ্দশা ভূয়েরই, তাহাতে সন্দেহ নাই।

তবে ঋষি-বংশ-সম্ভব বলিয়া যদি এখনও পরিচিত হইতে পার, তাহা হইলে বহুব্রীহির এমন যে ব্যধিকরণ ব্যাপার, তাহাতেও সুখ আছে। কিন্তু হায়, কবে তোমরা তেমন হইবে!

নিতান্ত ব্যয়শূন্য হইলে বা খরচপত্রের হাত একেবারে গুটাইলে তাহার অব্যয় বা কৃপণ নাম রটে। তাদৃশ ব্যক্তির যে ভাব, তাহাকেই অব্যয়ীভাব বলে। এমন অব্যয়ীভাব আমাদের কোম্পানির কাগজওয়ালা অনেক কোটীশ্বরে আছে। তাহাদের অধিকাংশ কার্য্যেই ক্লীবত্ব প্রকাশ পায়। এরূপ লোকেরা কর্ত্তাব্যক্তির অন্তে যথাবিধি ও যথাশক্তি দোল-দুর্গোৎসব শ্রাদ্ধ-শান্তি প্রভৃতি নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্ম করে না। তাহাদের চণ্ডীমণ্ডপে নির্ম্মক্ষিক হয়, অর্থাৎ মক্ষিকারও অভাব হয়। কেননা, এক কলিকা তামাক পাইবারও আশা নাই বলিয়া কেহ আর সেদিকে আসে না। ভিক্ষুকদিগের পক্ষে সে বাটীতে নিত্যদুর্ভিক্ষ। ঐরূপ ব্যক্তিগণ আসমুদ্র-ক্ষিতীশ্বর হইলেও আপামর-সাধারণ কেহ তাহাদিগের নিকট কোন প্রত্যাশা রাখে না। এতাদৃশ ব্যক্তিরা যে-ভাবেই চলুক, উপসর্গের যোগ তাহাতে একটা-না-একটা প্রায়ই থাকে। যদিও উহারা তাহাতে দৃক্‌পাতও না করিয়া আত্মস্তুতির উপকথা শুনিতে শুনিতেই আলস্য ত্যাগ করে, অনুক্ষণ অপথে পাদচারণা করিতে করিতেই জাগ্রদ্দশা অতিবাহন করে, কিন্তু আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা প্রত্যেক ব্যক্তি প্রতিপ্রভাতে, সমক্ষে না হউক পরোক্ষে, তদীয় নামোচ্চারণে সতর্ক থাকে, নিতান্ত প্রয়োজন উপস্থিত হইলে অবিঘ্নের নিমিত্ত অনুরূপ কোন একটা শব্দ প্রয়োগপূর্ব্বক অগত্যা কার্য্য নির্ব্বাহ করে। এরূপ ভাব কি তাহাদেরই সুখের, না অন্যেরই সুখের? যথার্থ বলিতে গেলে, এরূপ অব্যয়ীভাব বা বদ্ধমুষ্টিতা কোন অংশে ভাল নহে এবং আমরাও ইহার অনুমোদন করি না।

দ্বিগু আমাদের দেশের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত। দুই গো-মাত্র সম্বল। তা তুমি ত্রিভুবন খুঁজিয়া দেখ, বা চতুর্যুগের কথা আলোচনা করিয়া দেখ, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের ঐরূপ সম্পত্তিই ক্রমাগত দেখিতে পাইবে। পূর্ব্বে পণ্ডিতেরা "পঞ্চগব-ধন" অর্থাৎ পাঁচটী গরু আছে যাহার ইত্যাদি উদাহরণে আত্মপদবিভবের পরিচয় দিয়াছেন। কেহ কেহ সাহস করিয়া "দ্বিখার-ধন" অর্থাৎ দুই খারীপরিমিত ধান্য ধন আছে যাহার, এরূপও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহার বেশি আর নয়। কিন্তু সে কালের ধান্যের মূল্যের কতক অনুমান সে-দিনের জন্মভূমিতে পাইয়াছ ত? আর গরুর মূল্য শুনিবে? সবৎসা দুগ্ধবতী গাভীর মূল্য ত্রিকার্ষাপণী বা তিন কাহন

কড়ি। আমার কথা আরও সুপ্রমাণ করিবার জন্য প্রাচীন কোন বৈয়াকরণ কবির কথা উদ্ধৃত করিতেছি। তিনি অর্থ ও পদপ্রতিপত্তি লাভের নিমিত্ত রাজদ্বারস্থ হইয়া এইরূপে আত্ম-পরিচয় দিতেছেন,—

দ্বন্দ্বো দ্বিগুরহিচাহং
মদ্গোহে নিত্যমব্যয়ীভাবঃ।
তৎ পুরুষ কর্ম্ম ধারয়
যেনাহং স্যাং বহুব্রীহিঃ॥

অর্থাৎ হে পুরুষসিংহ! আমরা দ্বন্দ্ব, কিনা সংসারে পতি-পত্নী দুইটী মাত্র এবং দ্বিগু অর্থাৎ দুইটী গোরু আমাদিগের আছে। গৃহেও সর্ব্বদা অব্যয়ীভাব, ব্যয়-বাহুল্য কিছুমাত্র নাই। অতএব হে নৃপতে, আপনি সেই কর্ম্ম করুন, যাহাতে আমি বহুব্রীহি হই। অর্থাৎ গোধন আছে, কেবল ধান্য-ধনের অভাব। সেই অভাবের যাহাতে পূরণ হয়, তাহার উপায় করুন।

বোধ হয়, ইহা দ্বারা সে-কালের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া গেল। সুতরাং দ্বিগু আমাদের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত।

যে-সময়ের কথা হইতেছে, সে সময়ে তাঁহারা যথাকালে উপনীত হইয়া প্রথমে পাণিনীয় অষ্টাধ্যায়ী পাঠ করিতেন। পরে যথাশক্তি দ্বিবেদ, ত্রিবেদ বা চতুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়া গুরুর আজ্ঞাক্রমে কেহ গৃহস্থ হইতেন, কেহ বা চিরব্রহ্মচর্য্যই ধারণ করিতেন। সপ্তশতী, গীতা-পঞ্চরত্নী প্রভৃতি তাঁহাদের নিত্যপাঠ্য ও পঞ্চযজ্ঞ, ত্রিসবন প্রভৃতি নিত্য অনুষ্ঠেয় ছিল। পঞ্চগবধন হইলেই পঞ্চকপাল বা অষ্টাকপাল হবিঃ প্রভৃতি সাধ্য হোমাঙ্গ যজ্ঞ সমাধান করিতেন। পঞ্চাগ্নিষাজী, পঞ্চাম্রবাপী, পঞ্চতীর্থ ও সপ্তপুরী-পরিব্রাজক হইতে প্রয়াস স্বীকার করিতেন। কেহ দ্ব্যঞ্জল জলমাত্র গ্রহণ, কেহ দ্ব্যহ ত্র্যহাদি উপবাস প্রভৃতি দ্বারা তপঃকাষ্ঠা সম্পাদন করিতেন। তান্ত্রিক ষট্‌কর্ম্মী ও পঞ্চমুণ্ডী প্রভৃতির সাধনেও অনেকে সিদ্ধির পরিচয় প্রদান করিতেন এবং এই সকল হইলেই ত্রিলোকে আর তাঁহাদের কোনরূপ অভাব আছে বলিয়া তাঁহারা অনুভব করিতে পারিতেন না।

হায়, এখন আর সে-দিন নাই। সেই জগৎপাবন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-সম্প্রদায়ের বংশধর অনেকে এক্ষণে অসন্তোষের ও অসংযমের আধার হইয়াছেন এবং সুরাকাঙ্ক্ষা-দহনে অনুদিন দহ্যমান থাকিয়া অন্তর্বিধ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছেন!

শ্রীশারদাপ্রসাদ শর্ম্মা।

সমালোচনা।

উচ্ছ্বাস। শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য ।০ আনা। 'উচ্ছ্বাস' একখানি চটি পদ্য-পুস্তক। 'জনৈক বন্ধুর বিরহে' লেখকের লেখনী হইতে এ 'উচ্ছ্বাস' বাহির হইয়াছে। ইহাতে জনৈক গ্রাজুয়েটের এক খানি 'সার্টিফিকেট' আছে। আমরা কিন্তু এ 'সার্টিফিকেটে' সায় দিতে পারিলাম না। তবে 'উচ্ছ্বাসের' দু' এক স্থানের বর্ণনা মন্দ নয়।

নৈশ-কামিনী কাব্য। শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী দে বিরচিত। পুস্তকের ছাপা, কাগজ অতি পরিপাটী;—চক্‌চক্ ঝক্‌মক্ করিতেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ঐ পর্য্যন্ত;—কবিত্ব কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। তবে গ্রন্থকার এখন নূতন ব্রতধারী, শিক্ষানবীশ; এই যা কথা। আর গ্রন্থের বিষয়টীও ভাল।—মহাভারতান্তর্গত দণ্ডী রাজার সেই শাপভ্রষ্টা 'নৈশকামিনী'র কথা;—সেই দিবসে অশ্বিনী, নিশিতে কামিনী। দে মহাশয়ও তাই নাম দিয়াছেন—"নৈশ-কামিনী"।

পঞ্চস্তোত্র। (মূল ও ভাষা) শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দাস কর্ত্তৃক ভাষান্তরিত এবং কলিকাতা সিকদার-বাগান বান্ধব-পুস্তকালয় সাধারণ পাঠাগার হইতে প্রকাশিত। মূল্য ।০ চারি আনা। এখানি "দারোগার দপ্তরে"র অন্যতম উপহার। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের পঞ্চস্তোত্রের নূতন পরিচয় কি দিব? নিরঞ্জন, অন্নপূর্ণা, হরি, শিব ও যমুনা—এই পঞ্চ দেবতাকে লইয়া পঞ্চস্তোত্র রচিত। হিন্দুকে এই পঞ্চস্তোত্রের মাহাত্ম্য অধিক করিয়া বলিতে হইবে না।

শান্তি-সোপান। কলিকাতা পটলডাঙ্গা পটুয়াটোলালেন-নিবাসী শ্রীযুক্ত গোবিন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত, অনূদিত ও প্রকাশিত এবং উক্ত ঠিকানায় ৯৬ সংখ্যক ভবনে "শান্তি-সমিতি" কার্য্যালয়ে প্রাপ্তব্য। মূল্য ।৵০ ছয় আনা। মূল বজায় রাখিয়া সঙ্কলনকার অতি দক্ষতার সহিত সরল ও সুললিত পদ্যে শান্তি-সোপানের অনুবাদ করিয়াছেন। এ অনুবাদ পাঠ-যোগ্য। স্থানে স্থানে অতি সুন্দর কবিত্ব দেখিলাম। অনুবাদের ভাষা সরল, প্রাঞ্জল ও মনোজ্ঞ। সঙ্কলনকার ভক্ত বলিয়া অনুমান করি। তাঁহার আর একটী সুখ্যাতির কথা এই, তিনি এই "শান্তি-সোপান" গ্রন্থের উপস্বত্ব "শান্তি-সমিতির" হস্তে দরিদ্রদিগের সাহায্যে দান করিয়াছেন। আমরা এরূপ সাধু উদ্দেশ্যের সাফল্য কামনা করি।

পদ্মিনী। "নিরাশ-প্রণয়" ও "বিমাতা বা রাক্ষসী" প্রভৃতি উপন্যাস-বচয়িতা-প্রণীত। কলিকাতা, ২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরীতে প্রাপ্তব্য। মূল্য ১৲ এক টাকা। পদ্মিনী নাম জগদ্বিখ্যাত। রাজস্থানের এই চিত্রটী অতি অপূর্ব্ব। বলা বাহুল্য, আলাউদ্দীনের চিতোর আক্রমণ-ঘটনা লইয়া এই পদ্মিনী উপাখ্যান বিরচিত। রাজপুত-সতী হিন্দুরমণীর সেই পাতিব্রত্য-ধর্ম্ম-রক্ষা ভাবিবার বিষয় বটে। লেখকের রং ফলাইবার গুণে উপাখ্যান খানি হইয়াছে ভাল। ভাষা বেশ সরল। স্থানে স্থানে বর্ণনাও বেশ। বই খানির বাঁধাই বড় পরিপাটী।

গয়ায় পিণ্ডদান পদ্ধতি। "বিবিধ পুরাণাদি শাস্ত্র-গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত। গয়াযাত্রিগণের অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় সম্বলিত। "পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ কবিরত্ন কর্ত্তৃক সংশোধিত। গয়া "সুলভ-যাত্রি-নিবাসের" অধ্যক্ষ ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার পাল কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত। মূল্য ।০ চারি আনা।" গয়া-মাহাত্ম্য, গয়ালীর উৎপত্তি, গয়ায় পিণ্ডদান প্রভৃতি অনেক জ্ঞাতব্য বিষয়। গয়া-যাত্রীদের পক্ষে এ গ্রন্থ খানি এক একবার দেখা ভাল।

মনোরমা। শ্রীকুমারকৃষ্ণ মিত্র প্রণীত। বীণাপাণি কার্য্যালয়, কলিকাতা, ১৫৯ নং আহীরীটোলা ষ্ট্রীটে প্রাপ্তব্য। মূল্য ⁄০ এক আনা। ইহা এক খানি চটি-গল্পের বই। বই খানি মন্দ নয়।

গোয়েন্দা কাহিনী। কলিকাতা, চোরবাগান ইউনিয়ন লাইব্রেরীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র সরকার কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ১৯ নং ফিয়ার লেন কলুটোলা, মোহন প্রেস হইতে শ্রীযুক্ত গোবিন্দপ্রসাদ দে কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ⁄০ দুই আনা। ছোট ছোট ডিটেক্‌টিভের গল্প আজ কাল দেখিতেছি, লোকের বড় প্রীতিকর হইতেছে। সরকার মহাশয়ের "গোয়েন্দা-কাহিনীর" এবারকার গল্প "সাবাস চুরি"! সাবাস চুরির লেখা ভাল।

যোগিনী। শ্রীযুক্ত অতুলানন্দ গুপ্ত প্রণীত। মূল্য ।৵০ আনা। যোগিনী একটী ছোট গল্প। গল্পটী লাগিল বেশ।

নীহার-বিন্দু। (কবিতা পুস্তক) শ্রীযুক্ত নিতাইসুন্দর সরকার প্রণীত। মূল্য ।০ চারি আনা। বই খানি চটি বটে, কিন্তু ইহার স্থানে স্থানে অতি সুন্দর কবিত্ব আছে। অতি কোমল, অতি করুণ, অতি মধুর সুরে 'নীহার-বিন্দু' রচিত। দুই একটী কবিতা এমনই করুণ-রসাত্মক যে, পড়িতে পড়িতে চোকে জল আসে। বই খানির নাম 'নীহার-বিন্দু' না দিয়া 'অশ্রু-বিন্দু' দিলে বোধ করি সঙ্গত হইত। "হিমাচলে শঙ্করাচার্য্যের দেহত্যাগ" শীর্ষক একটী কবিতার কিয়দংশ আমরা উদ্ধৃত করিতেছি, পাঠক দেখিবেন, এই নব-কবি স্বভাব-বর্ণনায় কেমন কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন ;—

"উন্নত ধবল-কায়,
ওই গিরি দেখা যায়,
উচ্চ চূড়া আছে চেয়ে ভেদিয়া গগন ;
পবিত্র জাহ্নবী-বারি,
নির্ঝর রূপেতে ঝরি—
ধৌত করি পাদমূল, করিছে গমন।
সমুখে বিটপিচয়,
শৈল-গুহা তমোময়,
সৌর-কর নাহি পশে তাহার ভিতরে ;
জহ্নুসুতা স-তরঙ্গে,
দুরিত বহিয়ে অঙ্গে,
জীবকুল ত্রাণিবারে ধাইছে সাগরে।
হিমকূট উচ্চ স্তরে,
শ্বেতাভ তুষার ক্ষরে,
বুঝি রে সে নগোপরে, ধ্যানিছে শঙ্কর ;
রজত-বরণ জটা,—
কিবা তার রূপ-ছটা,
ঝরিছে তুহিন রূপে ভূধর-উপর।
প্রশস্ত ললাট-দেশ,
নাহি তাহে দম্ভলেশ,
বাল-ভানু মাখিয়াছে, সুবর্ণ-কিরণ ;
স্থূল দেহ, ভুজ মোটা,
ভালে ত্রিশূলের ফোটা,
গৌর-কান্তি পদ্মনাভ—চিত্তবিনোদন।
ব্যোমকেশ ব্যোমছাড়ি—
যেন রে ভূতলোপরি
হইয়াছে অবতীর্ণ, ধরি নরকায় ;
হেরিলে নয়নদ্বয়,
মানস মোহিত হয়,
শোক-তাপ-দুঃখ দূরে, কোথা চলি যায়।—

ভাষাটা আরও একটু মোলায়েম হইলে লেখক শীঘ্রই কাব্যে যশস্বী হইবেন

সুশিক্ষা। শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত। দ্বিতীয় সংস্করণ। মূল্য ৵০ দুইআনা। ছোট ছোট ছেলেদের পড়িবার যোগ্য বই। বই খানি সচিত্র। ছবিগুলি বড় সুন্দর। সরল গদ্যে ও পদ্যে 'সুশিক্ষা' রচিত। বই খানি স্কুলের ছেলেদের পাঠ্য হইতে পারে।

দেবী না মানবী! (উপন্যাস) শ্রীযুক্ত শ্যামলাল মজুমদার প্রণীত। কলিকাতা ২৩ নং হর ঢোলের লেন হইতে শ্রীযুক্ত রামগোপাল সেন গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ॥০ আনা। লেখক নূতন ব্রতধারী বলিয়া বোধ হয়। চর্চ্চা রাখিলে, কালে ভাল উপন্যাস-কার হইতে পারিবেন। এ গ্রন্থের ভাষা সরল, বর্ণনাও মন্দ নয়।

নীতিশতক বা চাণক্যশ্লোক। শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত। পদ্যে অনুবাদিত এই চাণক্যশ্লোক ক'টী মন্দ নহে। তবে ভাষা আরও একটু সরল হইলে ভাল হইত।

জন্মভূমি।

৫ম ভাগ। } মাঘ। ১৩০১ { ২য় সংখ্যা।

তমাস্বিনী।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

আইবুড়া মেয়েকে বিবাহের কথা বলিলেই সে লজ্জা পায়। বিবাহে যে অসম্মতি তাহা নয়। এক রত্তি মেয়ে বিবাহ করিতে চাহিলে তাহাকে বেহায়া, ঠোঁটকাটা আরও কতগুলি নূতন নাম লাভ করিতে হয়। তাহার মনে যাহা থাকে, দুই চারি জন সমবয়সীকে বলে। আর উপরে বিবাহের কথা শুনিলে হয় রাগিয়া উঠে, নহিলে পালাইয়া যায়।

স্বর্ণময়ীর বিবাহে অনিচ্ছাও সকলে সেই রকম মনে করিত। স্বর্ণ নিজের মন নিজেই ঠিক জানিত না। সে এখন ছেলে মানুষ, যে বয়সে মানুষ নিজের মন স্থির করিয়া জানিতে পারে, তাহার সে বয়স হয় নাই। সে নিজের মনে এই টুকু কেবল ঠিক জানিত যে, বিবাহে তাহার বাস্তবিকই অনিচ্ছা, কপট নয়। কেন এমন অদ্ভুত মনের ভাব তাহা সে নিজেই বলিতে পারিত না। সে কোন কারণ স্থির করিতে পারিত না।

কারণ অবশ্য ছিল। অবিবাহিতা কন্যা বিবাহ করিতে চাহে না এরূপ অসম্ভব কথা বিনা কারণে সম্ভবপর হইতে পারে না। কারণ অবশ্য ছিল, কেবল স্বর্ণ—ছেলে মানুষ—নিজে কিছু স্থির করিতে পারিত না।

সে মনে করিত যে, তাহার জীবন যেরূপে কাটিতেছিল সেইরূপ কাটিলেই সে সুখে থাকিবে। বিবাহ হইলে যে পরিবর্ত্তন ঘটিবে, সেইটা তাহার মনে লাগিত না। মাতাকে ছাড়িতে, বাড়ীর আর সকলকে ছাড়িতে তাহার মন সরিত না। বিবাহ না হওয়াই ত ভাল।

কিন্তু এ কারণ ত সকল বালিকার মনে থাকিতে পারে। স্বর্ণের মনে, তাহার অজ্ঞাতে আরও একটা কারণ ছিল। সেই কারণ ক্রমে বলবৎ হইয়া উঠিতেছিল।

হেমন্তকুমার নামক এক জন স্বজাতীয় যুবক বাড়ীতে যাতায়াত করিত। দূর সম্বন্ধে জ্ঞাতি, চারুবালার মাতুলালয়ের নিকট নিবাস। সেই জন্য বাড়ীর গৃহিণী তাহাকে একটু আদর অপেক্ষা করিতেন। হেমন্তকুমারের পিতৃমাতৃ বিয়োগ হইয়াছিল, বাড়ীতে আর কেহ ছিল না, কেবল এক বৃদ্ধা ঠান্‌দিদি। সেই জন্য হেমন্তকুমারকে সকলে একটু দয়া করিত।

মৃত্যুকালে হেমন্তকুমারের পিতা কিছু কোম্পানির কাগজ রাখিয়া গিয়াছিলেন। শুদ যাহা আসিত, তাহাতে একটা গৃহস্থের খরচ

বেশ সচ্ছলতার সহিত সম্পন্ন হইয়া যাইত। হেমন্তকুমার একা—পরিবারের মধ্যে ঠান্‌দিদি। সুতরাং শুদের টাকাও সমস্ত ব্যয় হইত না।

হেমন্তকুমারের বয়ঃক্রম বিশ বৎসর। সকলে তাহাকে ভাল ছেলে বলিত। আর এক বৎসর হইলেই তাহার অধ্যয়ন সমাপ্ত হয়।

ছেলেটী ভাল দেখিয়া একবার স্বর্ণময়ীর মা মনে করিয়াছিলেন, যে এমন জামাতা হইলে মেয়ের সৌভাগ্য। কিন্তু সে কথা একবার পড়িতেই প্যারীমাধব ও তাঁহার গৃহিণী উড়াইয়া দিয়াছিলেন। প্যারীমাধবের আপত্তি, ছেলেটী বড় মানুষের ঘরের নয়। গৃহস্থ হইলে কি হয়? গৃহিণীর আপত্তি ছেলের বাপ মা নাই। বিবাহের কথা সকলেই ভুলিয়া গিয়াছিল। হেমন্তকুমার বাড়ীর ছেলের মত বাড়ীতে আসিত যাইত এই পর্য্যন্ত।

স্বর্ণময়ীর বাল্য-জীবনে, আগত-প্রায় কৈশোরের পথে, হেমন্তকুমারের ছায়া পতিত হইয়াছিল।

ইহারা দুই জনে এ পর্য্যন্ত আত্ম-মনোভাব বুঝিতে পারে নাই। স্বর্ণময়ী বালিকা, হেমন্তকুমার অধ্যয়নে মগ্ন, একত্রে বাস অথবা সর্ব্বদা দেখা-সাক্ষাৎ ঘটিত না। প্রণয়ের সঞ্চার এমন অবস্থায় হইবার কথা নয়। দুই জনেই জানিত তাহাদের বিবাহ হইবার সম্ভাবনা নাই! অতএব প্রণয়ের কল্পনা পর্য্যন্ত তাহাদের পক্ষে দূষণীয় ও নিষ্ফল।

তাহারাও প্রণয়ের কল্পনা করিত না। স্বর্ণময়ী প্রণয় কি তাহা জানিত না, হেমন্তকুমার মনে করিত এ রকম ভালবাসা প্রেম নয়। দুই জনে ছেলে মানুষের মত কথা কহিত, কখন হেমন্তকুমার অধ্যয়নলব্ধ কোন আশ্চর্য্য কথা স্বর্ণময়ীকে বলিত, বালিকা অবাক্ হইয়া শুনিত। হেমন্তকুমার যখন তাহাদের বাড়ীতে আসিত, তখন সকলের সঙ্গে দেখা করিবে মনে করিয়াই আসিত। কিন্তু যদি কখন স্বর্ণময়ীর সঙ্গে দেখা না হইত তাহা হইলে সে দিন নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যাইত।

ক্রমে দর্শন-লালসা বাড়িতে লাগিল। দেখা না হইলে যেন একটা কিসের অভাব, দেখা হইলে যেন দিনটা ভাল যায়। কথা-বার্ত্তায় কোনই পরিবর্ত্তন হয় নাই। যখন স্বর্ণময়ীর বিবাহের কথা হইতে লাগিল, তখন তাহার মনে একটা অজানিত আশঙ্কার উদয় হইল। কেন ভয়, কিসের ভয়, প্রথমে বুঝিতেই পারে না। তাহার পর বুঝিল যে বিবাহ হইলে হেমন্তকুমারের সহিত আর দেখা হইবে না। সেই ভয়।

মনের মুকুল তখন ক্রমে ক্রমে প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল।

প্রণয়সঞ্চারের বয়সের কিছু নিরূপণ নাই। যে বালক বালিকা আজ বালক বালিকার মত খেলা করিতেছে, কাল তাহারাই পরস্পরের প্রেমে আবদ্ধ হইতে পারে। যুবক ও যুবতী পরস্পরের নিকট থাকিলে সহজেই তাহাদের চিত্ত আকৃষ্ট হয়। বাল্যপ্রণয় আর এক রকম। তাহাতে আসক্তির লেশ মাত্র নাই। এই কারণে যুবক যুবতীর প্রেম অপেক্ষা বালক বালিকার প্রেম দীর্ঘস্থায়ী।

যে সময় স্বর্ণময়ীর বিবাহের সম্বন্ধ হইতেছিল ও সে অন্যান্য বালিকার ন্যায় বিবাহে অনিচ্ছা প্রকাশ করিতেছিল, তখন একদিন বাড়ীর সকলে কোন্নগরে বেড়াইতে গিয়াছিল। কোন্নগরে প্যারীমাধবের শ্বশুরালয়। সেখানে এক রাত্রি থাকিয়া দ্বিতীয় দিবস সকলের কলিকাতায় ফিরিয়া আসিবার কথা।

হেমন্তকুমারের ঠান্‌দিদি কোন্নগরে থাকিতেন, হেমন্তকুমার কলিকাতায় বাসা করিয়া থাকিত। মধ্যে মধ্যে বাড়ী যাইত। এদিন সেও কোন্নগরে গিয়াছিল।

প্যারীমাধবের শ্বশুর বাড়ী এবং হেমন্তকুমারের বাড়ী বড় বেশী দূর নয়। ঠান্‌দিদির সঙ্গে দেখা করিয়া ও তাঁহার প্রস্তুত জলখাবার খাইয়া হেমন্তকুমার প্যারীমাধবের শ্বশুরালয়ে গেল।

সময়টা বৈকাল। হেমন্তকুমার একবার বাড়ীর ভিতর গিয়া আবার বাহিরে আসিল। যাহাকে দেখিবার ইচ্ছা তাহাকে দেখিতে পাইল না। স্বর্ণময়ী কোথায় গিয়াছে, কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিল না; কিন্তু বুঝিতে পারিল সে বাড়ীতে নাই। হয়ত পাড়ায় বেড়াইতে গিয়াছে।

বাড়ীর বাহিরে কিছুদূরে একটী পুষ্করিণী। চারিদিকে প্রকাণ্ড বাগান। নারিকেল, সুপারি, খেজুর, আম, কাঁঠাল, লিচু, জামরুল, সকলই আছে। এক দিকে সারি বাঁধা সুপারি গাছ। অযত্নে চারিদিকে বন হইয়াছে। পুষ্করিণীর নিকটে নানা জাতি ফুলগাছ, গাছের তলায় রাশি রাশি শুষ্ক ফুল পড়িয়া আছে। বাঁধান ঘাট, স্থানে স্থানে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। পুষ্করিণীর নিকটে বাগানের মধ্যে রায়েদের বাড়ীর ছেলে মেয়ে হুড়াহুড়ি করিয়া গাছের ফল পাড়িতেছিল ও লুকাচুরী খেলা করিতেছিল।

পুষ্করিণীর এক ধারে একটা চাঁপা গাছ ছিল। ডাল পালা চারিদিকে ঝুলিয়া অন্ধকার করিয়া রহিয়াছে। ফুলে গাছ ভরিয়া পড়িয়াছে, গাছের তলায় একটা কাঁটাল গাছের আধখানা গুঁড়ি পড়িয়া রহিয়াছে। তাহার উপর একা বসিয়া স্বর্ণময়ী। আর সকলে খেলায় মত্ত, সে কেবল একলাটী চুপ করিয়া বসিয়া, পুষ্করিণীর দিকে চাহিয়া ভাবিতেছিল। তাহার আবার কিসের ভাবনা?

হেমন্তকুমার সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। স্বর্ণময়ী আপনার ভাবনায় মগ্ন ছিল, ফিরিয়া চাহিল না। হেমন্তকুমার আসিয়া নিঃশব্দে তাহার পিছনে দাঁড়াইল। পায়ের কাছে একটা চাঁপা ফুল পড়িয়াছিল, সেইটা তুলিয়া লইল। স্বর্ণময়ী তখনও ফিরিয়া চাহিল না, কিন্তু কে তাহার পিছনে দাঁড়াইয়াছে তাহা বুঝিতে পারিল।

হেমন্তকুমার মৃদুস্বরে ডাকিল, "স্বর্ণ!"

স্বর্ণময়ী কোন উত্তর দিল না, ফিরিয়া হেমন্তকুমারের মুখের দিকে চাহিল।

এতদিন তাহারা দেখা হইলে হাসিয়া কথা কহিত, গাম্ভীর্য্য কেমন তাহা জানিত না। আজ এই পুষ্করিণী তীরে, নিভৃত উপবন মধ্যে, সায়াহ্ন সূর্য্যের সম্মুখে তাহাদের ভাবান্তর উপস্থিত হইল। যে স্বর্ণ বালিকা-স্বভাব-সুলভ চপলতাবশতঃ অনর্গল কথা কহিত, তাহার মুখে কথা ফুটিল না। হাস্য-প্রফুল্ল-মুখ হেমন্তকুমার আজ গম্ভীর হইয়া তাহার পাশে দাঁড়াইয়া রহিল।

স্বর্ণময়ী কথা কহিল না, কেবল একদৃষ্টে হেমন্তকুমারের পানে চাহিয়া রহিল। কতক্ষণ পরে হেমন্তকুমার বলিল, "স্বর্ণ, তোমার বিয়ে হবে?"

অন্য সময় হইলে, আর কেহ হইলে স্বর্ণময়ী রাগ করিত, এখন সে পূর্ব্বের মত নিরুত্তর রহিল। বিস্ফারিত কোমল নয়ন যুগল অশ্রুতে ভরিয়া আসিল।

সেই সজল-নয়ন করুণামূর্ত্তি দেখিয়া হেমন্তকুমারের চক্ষে জল আসিল। তখন, বিনা বাক্যে উভয়ের অধর মিলিত হইল। কুসুম স্পর্শের ন্যায় একটী মাত্র চুম্বন। তাহার পর দুই জনে মুখ ফিরাইল। স্বর্ণময়ীর গণ্ড বহিয়া দুই ফোঁটা অশ্রু পতিত হইল। হেমন্তকুমার চক্ষের জলে কিছু দেখিতে পাইতেছিল না।

সেই ঈষৎ চুম্বন স্পর্শে সমস্ত কথা হইল। স্বর্ণময়ীর জীবনপদ্ম প্রস্ফুটিত হইল। হেমন্তকুমার সেই পদ্মের সূর্য্যস্বরূপ। প্রণয়ের প্রথম

চুম্বন! জীবন যৌবনের প্রথম বিকাশ, আকাঙ্ক্ষার প্রথম উদ্বোধন!

সে চুম্বন সুখের নহে। উভয়ের চক্ষু অশ্রুপূর্ণ, উভয়ের হৃদয়ে অসীম যন্ত্রণা। দুঃখ-জলধি মন্থন করিয়া সেই চুম্বন স্বরূপ অমৃত হলাহল উঠিল। দুই জনে বুঝিতেছিল যে, সেই চুম্বন চির-মিলনের চিহ্ন নহে, চির-বিচ্ছেদের নিদর্শন। শান্তিময় নির্জ্জনতার মধ্যে, শীতল বাপীতটে, মধুর সায়ংকালে উভয়ে সেই চুম্বন দ্বারা প্রণয়ের প্রতিদান ও বিনিময় স্বরূপ পরস্পরকে অনন্ত দুঃখ প্রদান করিল।

স্বর্ণময়ী যখন সেখানে আসিয়া বসিয়াছিল, তখন সে বালিকা। যখন উঠিল, তখন তাহার বাল্যকাল অতীত হইয়াছে। একটী মাত্র চুম্বনে তাহার শৈশব লুপ্ত হইল।

দুইজনে একটু বসিয়া রহিল। স্বর্ণময়ী আগে উঠিল, কহিল, "বাড়ী যাই, সন্ধ্যা হয়ে এলো।"

হেমন্তকুমার কহিল, "আমি তোমার সঙ্গে যাব?"

এত দিন স্বর্ণময়ীর মনে কোন সঙ্কোচ হইত না। আজ সে লজ্জিত হইল, কহিল, "না, আমি একাই যাই। বাগানে ছেলেরা আছে তাদের সঙ্গে যাব।"

হেমন্তকুমার বলিল, "পুকুরের ওধার পর্য্যন্ত যাব?"

স্বর্ণময়ী কোন আপত্তি করিল না, কোন কথাই কহিল না। হেমন্তকুমার তাহার সঙ্গে চলিল। দুই জনের ছায়া অস্তগামী সূর্য্যকিরণে দীর্ঘ হইয়া পুষ্করিণীর জলে পড়িল। স্বর্ণময়ী সেই ছায়া দেখিতে লাগিল। পরে কহিল, "জলে ডুবে মর্‌তে কি কষ্ট হয়?"

হেমন্তকুমার চমকিত হইয়া তাহার হাত ধরিল, কহিল, "সে কি! কেন, স্বর্ণ, অমন কথা কেন?"

তখন স্বর্ণ মুখ তুলিয়া অগাধ প্রেমভরে, অগাধ দুঃখভরে হেমন্তকুমারের মুখের প্রতি চাহিল। কহিল, "কোন্ সুখে বেঁচে থাকা?"

হেমন্তকুমারের স্বর বাষ্পরুদ্ধ হইল, কোমল স্বরে কহিল, "ছি! ও কথা মনে কর্‌তে নেই। আমাদের কপালে যদি দুঃখ থাকে ত দুঃখই ভোগ কর্‌ব। কিন্তু আশা চিরকালই থাক্‌বে।"

হায় বাল্যকাল! হায় কৈশোর! হায় সংসার! স্বর্ণময়ীর মুকুলিত জীবনে, নবীন বসন্তাগমে, মনের প্রথম সাধ—সরোবরের শীতল জলতলে শয়ন!

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

হিন্দুর পরিবার, বাঙ্গালীর পরিবার, বিধবা নহিলে সম্পূর্ণ হয় না। প্যারীমাধবের এত বড় পরিবার যে বিধবাশূন্য হইবে, তিনি এমন কিছু পুণ্য করেন নাই। তাঁহার পরিবারে যে কয়জন বিধবা ছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে এই গ্রন্থে কেবল দুই জনের উল্লেখ আবশ্যক।

প্রথম, পিসি। ইনি প্যারীমাধবের পিসি, এই কারণে বাড়ীশুদ্ধ লোকের পিসি। দাসীরা পর্য্যন্ত সেই সম্বন্ধ ধরিত। তবে তাহারা ও বাড়ীর কতক লোকে পিসিমা বলিয়া ডাকিত, অবশিষ্ট সকলে সংক্ষেপে পিসি বলিত। পিসিমা সেকেলে লোক, বয়স কয় গণ্ডা তাহার ঠিক ছিল না, কিন্তু গঙ্গাস্নানে ও বৈধব্যের আশীর্ব্বাদে এ পর্য্যন্ত বেশ শক্ত সমর্থ ছিলেন।

দ্বিতীয়, শ্যামা। ইনি প্যারীমাধবের ভ্রাতুষ্পুত্রী, ইহাঁকে সকলে নাম ধরিয়া কিংবা সম্পর্ক হিসাবে ডাকিত। ইনি তরুণী, সুন্দরী। যুবতীদের রঙ্গরসের কথায় ইহাঁর যেমন মন, গঙ্গাস্থানে বা ঠাকুর দেবতার কথায় তেমন মন ছিল না। ঠাকুর ঘরের যে টুকু কাজ বিধবা বলিয়া করিতে হয়, সেই টুকু করিতেন, মন থাকিত অন্যদিকে।

পিসিমা কোন কালে সুন্দরী ছিলেন না, হয়ত সেই জন্য সুন্দরীদিগের উপর তাঁহার একটু স্বাভাবিক বিদ্বেষ ছিল। বিবাহের পর তাঁহার দুই তিনটী সন্তান হইয়াছিল। সে গুলিকে এবং স্বামীকে খাইয়া এখন নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়াছিলেন, সুতরাং মমতা নামে যে একটা হৃদয়ের দুর্ব্বলতা, সেটা তাঁহার বড় একটা ছিল না।

শ্যামা বাল্য বিধবা, বিবাহের রাত্রি ব্যতীত কখন স্বামীর মুখাবলোকন করে নাই। সে কথাও তাহার ভাল মনে ছিল না, কারণ বিবাহকালে সে নিতান্ত বালিকা। এখন বয়স পঁচিশ বৎসর। পূর্ণ যৌবন বিফলে বহিয়া যাইতেছিল। শ্যামার সঙ্গে মুক্তকেশীর, চারুবালার বড় ভাব। শ্যামা বয়সে বড় হইলেও সকলের অপেক্ষা অনভিজ্ঞ, ও সেই জন্য অত্যন্ত আগ্রহের সহিত আর সকলের কথা শুনিত। গান করিতে, গোপনীয় কথা বলিতে শ্যামা সকলের সেরা হইয়া উঠিয়াছিল। যে সব গান অতি কদর্য্য, যে সকল গল্প নিতান্ত অশ্রাব্য সেই সকল গান ও গল্প বয়স্যাদিগের নিকট করিত। ইহা ভিন্ন অন্য কিছু আমোদ সে জানিত না। নিন্দা করিতে বাড়ীতে শ্যামার তুল্য পিসিমা ছাড়া আর কেহ ছিল না।

সে কালে আর একালে যে চিরন্তন বিরোধ, তাহা বিধবাদিগের মধ্যে সমধিক প্রবল। সেই নিয়মানুসারে পিসিমা ও শ্যামা পরস্পরের ঘোর বিদ্বেষী, সম্পর্কের কেহই কোন ধার ধারিত না। তবে মুখামুখী বড় একটা কোঁদল বাধিত না। উভয়ের অসাক্ষাতে উভয়ে বিষবাণ নিক্ষেপ করিতেন।

শ্যামা সুন্দরী। শরীরে সৌন্দর্য্য ফুটিয়া, টুটিয়া পড়িতেছিল। সে যখন একা থাকিত, তখন আপনার শরীর আপনি নিরীক্ষণ করিত। মুকুরে আপনার মুখ দেখিত। তাহার সেই কৃষ্ণতার প্রশস্ত নয়ন যুগলের অলস কটাক্ষ, ফুল্ল লোহিত সরস ওষ্ঠাধর কঠোর বৈধব্য জীবনের অনুপযোগী। মুক্তর সহিত শ্যামার বিশেষ প্রণয়। সুবিধা পাইলেই শ্যামা মধ্যাহ্নের সময় পাশের বাড়ীতে যাইত। মুক্ত এবং তাহাতে মিলিয়া উপরে বসিয়া গল্প করিত। মুক্ত কতবার তাহার রূপের সুখ্যাতি করিত, এমন রূপযৌবন বৃথা গেল বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিত। এবং সহানুভূতির চিহ্নস্বরূপ নিজের সুখের কথা শ্যামাকে শুনাইত। শুনিতে শুনিতে শ্যামার শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিত, চক্ষু আর্দ্র হইত, ঘন ঘন নিশ্বাস বহিত। কোন কোন সময় দুই জনে খাটে শুইয়া গল্প করিত। শ্যামা একটী একটী করিয়া সমস্ত কথা মুক্তকে জিজ্ঞাসা করিত। মুক্ত সমস্ত বলিত। শ্যামা বাড়ীতে আসিয়া সেই সব ভাবিত, ও মনে মনে কপালের নিন্দা করিত। কত রাত্রে তাহার চক্ষে নিদ্রা আসিত না, শয্যায় শয়ন করিয়া উন্মীলিত-চক্ষে মনে করিত, আর সকলেই বা এত সুখী কেন, তাহার অদৃষ্টেই বা কোন সুখ নাই কেন? মনে করিত রাত্রে চারিদিকে কত সুখের স্বপ্ন, কত সুখের কথা, কত সোহাগ, কত প্রণয়, কেবল তাহাকেই সমস্ত জীবন এইরূপ করিয়া কাটাইতে হইবে। এইরূপ ভাবিয়া ভাবিয়া শ্যামার মন আরও কঠোর হইয়া উঠিয়াছিল। অন্যের সুখে সে আরও কাতর হইতে লাগিল। অন্যের নিন্দা তাহার পক্ষে আরও প্রিয় বোধ হইতে লাগিল। শৈশবকালে সে লেখা পড়া শিখে নাই, ধর্ম্ম কর্ম্ম লোক মুখে ব্যতীত আর কোথাও শুনে নাই। স্বার্থত্যাগ কাহাকে বলে সে জানিত না। সুতরাং বৈধব্য যে সমাজের পক্ষে মঙ্গলকর ও পবিত্র নিষ্কাম ধর্ম্মাচরণের পথ তাহাও সে জানিত না।

পিসির যৌবনের জ্বালা ছিল না। তিনি বহুকাল সে দায় হইতে উদ্ধার হইয়াছিলেন।

কিন্তু যেমন নিজে কঠোর ঘোর শুদ্ধচারিণী ছিলেন, পরের সে বিষয়ে কিছুমাত্র ত্রুটী তাঁহার তেমনি অসহ্য বোধ হইত! শ্যামার রকম সকম তিনি দু চক্ষের বিষ দেখিতেন। কোন পুরুষ কোন স্ত্রীলোকের সঙ্গে অধিকক্ষণ কথা কহিলে তাঁহার মনে সন্দেহ হইত। তিনি স্নান, পূজা ও রন্ধনকালে কাহাকেও স্পর্শ করিতেন না, কিন্তু তাঁহার মন সর্ব্বক্ষণই সকলকে স্পর্শ করিত। তাঁহার কথায় বোধ হইত যে পৃথিবীতে যে টুকু পুণ্য আছে তাহা তাঁহার শরীরে, আর কোথাও পুণ্য নাই। আর সকলেই পাপাসক্ত, সকলেই কলুষ চিত্ত, সকলেরই মন পাপের দিকে। পিসিমা সেই চিন্তায় ব্যাকুল থাকিতেন। অমুক অমুককে দেখিয়া হাসে, অমুক বেহায়া, অমুকের বউ বিষ খাইয়া মরিল কেন, পিসিমার মুখে কেবল এই কথা। ভাতের হাঁড়িতে কাঠি দিতে এই কথা, গঙ্গাস্নানের পথে অন্য বুড়ীদের সঙ্গে সেই কথা, হরিনামের মালা হাতে সেই কথা।

(ক্রমশঃ)

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

মহারাষ্ট্র দেশের প্রাচীন বিবরণ।

১। দক্ষিণাপথ।

বিন্ধ্যগিরি ভারতবর্ষকে উত্তর দক্ষিণে দুই ভাগে বিভক্ত করিতেছে। বিন্ধ্যাদ্রির উত্তরাংশ আর্য্যাবর্ত্ত ও দক্ষিণাংশ দাক্ষিণাত্য নামে প্রসিদ্ধ। দাক্ষিণাত্যের অপর নাম—দক্ষিণাবর্ত্ত বা দক্ষিণাপথ। দক্ষিণাপথ শব্দের অর্থ—'দক্ষিণদিকের দেশ'। সাধারণ প্রচলিত ভাষায় দাক্ষিণাত্যকে "দক্‌খিণ" বা "দক্‌খণ" বলে। আমাদের রাজপুরুষগণ এই "দক্‌খণ" শব্দকে কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত করিয়া "ডেক্যান" করিয়া লইয়াছেন।

খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রারম্ভে (৪০০ খৃঃ অঃ) চীন-দেশীয় পরিব্রাজক ফাহিয়ান্ ভারতে আসিয়া, বারাণসীর অধিবাসিগণের নিকট শুনিয়াছিলেন যে, দক্ষিণদিকে "তথ্‌সিন্" নামে এক দেশ আছে। বোধ হয়, "দক্ষিণ" এই সংস্কৃত নামই ফাহিয়ানের গ্রন্থে "তথ্‌সিন্" এই অপভ্রষ্ট রূপ প্রাপ্ত হইয়াছে। সুতরাং অনুমান করা অসঙ্গত নহে যে, ফাহিয়ানের সময়ে দাক্ষিণাত্য বা দক্ষিণাপথকে সাধারণতঃ লোকে "দক্ষিণ" বলিত। বলা বাহুল্য, "দক্ষিণ" শব্দ, "দক্ষিণাপথ" শব্দেরই সংক্ষিপ্ত রূপ মাত্র। এই সংস্কৃত "দক্ষিণ" শব্দ হইতেই "দক্‌খিণ", "দক্‌খণ" ও "ডেক্যান" শব্দের উৎপত্তি।

ফাহিয়ানের সময়ে দাক্ষিণাত্য সর্ব্বত্র 'দক্ষিণ' নামে পরিচিত থাকিলেও, প্রাচীনকালে ইহা "দক্ষিণাপথ" নামেই সাধারণের দ্বারা অভিহিত হইত। কারণ, পুরাণাদিতে 'দাক্ষিণাত্য', 'দক্ষিণাবর্ত্ত ও 'দক্ষিণ' শব্দের অপেক্ষা 'দক্ষিণাপথ' শব্দই বহুল ব্যবহৃত হইয়াছে, দৃষ্ট হয়। বর্ত্তমান সময়ের প্রায় দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বেও "দক্ষিণাপথ" নামই বিশেষ প্রচলিত ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। কেননা, পেরিপ্লুস (৭৭ খৃঃ) নামক প্রাচীন ইউনানী গ্রন্থকার এই দেশকে 'দখিনাবদেস' নামে অভিহিত করিয়াছেন। "দখিনাবদেশ" শব্দ খুব সম্ভবতঃ "দক্ষিণাপথ" শব্দের অপভ্রংশ*।

আমরা যে কালের কথা বলিতেছি, সে কালের প্রচলিত দেশী ভাষার (প্রাকৃত ভাষার) নিয়মানুসারে 'দক্ষিণাপথ' শব্দের অপভ্রংশ "দক্‌খিনাবধ" শব্দের উৎপত্তি অসম্ভব নহে। সুতরাং ইহাই সম্ভব যে, দেশী বা প্রাকৃত ভাষার আমলে অর্থাৎ বর্ত্তমান সময়ের প্রায় দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে (খৃষ্টাব্দে-প্রারম্ভের সমসময়ে) "দক্ষিণাপথ" শব্দের পরিবর্ত্তে "দক্‌খিনাবধ" শব্দই সাধারণ্যে বিশেষ প্রচলিত ছিল এবং সেই "দক্‌খিনাবধ" শব্দ পেরিপ্লুসের গ্রন্থে "দখিণাবদেস" এইরূপ রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে।

* দক্ষিণাপ্রদেশ শব্দের নহে ত? জ, স।

২। মহারাষ্ট্র দেশে আর্য্য-উপনিবেশ।

প্রাচীন হিন্দু-ভূগোলবেত্তৃগণ দক্ষিণাপথকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। তাহার ১ম দ্রাবিড়, ২য় কর্ণাটক, ৩য় আন্ধ্র বা তেলিঙ্গণ, ৪র্থ গোণ্ডবন ও ৫ম মহারাষ্ট্র। উত্তরে মান্দ্রাজ, পশ্চিমে বাঙ্গালোর, দক্ষিণে সেতুবন্ধ রামেশ্বর ও পূর্ব্বদিকে বঙ্গোপসাগর (করমণ্ডল উপকূল)—এই চতুঃসীমার মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ দ্রাবিড় নামে খ্যাত। কৃষ্ণানদীর দক্ষিণ এবং পূর্ব্ব ও পশ্চিম ঘাটপর্ব্বতশ্রেণীর ক্রোড়ান্তর্গত ত্রিকোণ ভূমিখণ্ডের নাম কর্ণাটক। আন্ধ্র বা তেলিঙ্গণ প্রদেশের দক্ষিণ-সীমা পালিকট, উত্তর-সীমা উড়িষ্যান্তর্গত শিকাকোল নগর, পশ্চিম-সীমা বিদর ও পূর্ব্ব-সীমা বঙ্গোপসাগর। তেলিঙ্গণ ও মহানদীর মধ্যবর্ত্তী ভূভাগকে গোণ্ডবন বলে। তারপর মহারাষ্ট্র;—ইহার উত্তরে সাতপুড়া (সাতপুরা) নামক পর্ব্বতশ্রেণী ও নর্ম্মদা নদী, পশ্চিমে আরব সাগর, দক্ষিণে গোওয়া এবং পূর্ব্বদিকে গোণ্ডবন ও তেলিঙ্গণ প্রদেশ অবস্থিত। মহারাষ্ট্র দেশের যে চতুঃসীমা স্থূলতঃ কথিত হইল, তদন্তর্গত ভূখণ্ডের অধিকাংশ অতি প্রাচীনকালে দণ্ডকারণ্য নামে পরিচিত ছিল। এই অরণ্যময় প্রদেশে তৎকালে নরমাংস-লোলুপ, ভীষণদর্শন, কৃষ্ণকায় রাক্ষসগণ ও মাতঙ্গ প্রভৃতি অসভ্য ও অনার্য্য জাতিগণ বাস করিত। তৎপরে কোন্ সময়ে আর্য্যাবর্ত্ত হইতে ত্রৈবর্ণিক আর্য্যগণ (অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ) এদেশে আগমন করত বসতি-বিস্তার ও রাজ্য-সংস্থাপন করেন, তাহা নিশ্চয়রূপে নির্দ্ধারণ করা যায় না। দাক্ষিণাত্যের বিবিধ গ্রন্থে এইরূপ জনশ্রুতি লিপিবদ্ধ আছে যে, ভগবান্ রামচন্দ্র রাবণ-বিনাশ পূর্ব্বক অযোধ্যা নগরীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, তথা হইতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ দক্ষিণদেশে গমন পূর্ব্বক দ্রাবিড়াদি দেশে বসতি-বিস্তার ও রাজ্যস্থাপন করেন।

রামায়ণ ও মহাভারতাদি গ্রন্থের বর্ণনানুসারে অবগত হওয়া যায় যে; মহর্ষি অগস্ত্য সর্ব্বপ্রথম বিন্ধ্যগিরি উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক শ্বাপদ-রাক্ষস সঙ্কুল মহারণ্যময় দণ্ডকে প্রবেশ করিয়া তথায় স্বীয় আশ্রম স্থাপন করেন। তৎপরে মহাবীর পরশুরাম সহ্যাদ্রির পশ্চিমাংশ-স্থিত "কঙ্কণ" * নামক প্রদেশে আর্য্য-উপনিবেশ স্থাপনের সুবিধা করিয়া দেন। যাহা হউক, প্রথমতঃ মহর্ষি অগস্ত্য সম্বন্ধে বাল্মীকীয় রামায়ণে যাহা লিখিত আছে, তাহার আবশ্যকীয় অংশ এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি:—

"যিনি মানবদিগের হিতাভিলাষী হইয়া যমতুল্য অসুরদিগকে বলপূর্ব্বক নিগৃহীত করত এই দক্ষিণ দিক্‌কে মনুষ্যগণের বাসযোগ্য করিয়াছেন এবং রাক্ষসগণ যাঁহার প্রভাবে ত্রাসান্বিত হইয়া এই দক্ষিণ দিক্‌কে উপভোগ করে না, অবলোকন করে মাত্র; সেই পুণ্যকর্ম্মা মহর্ষি অগস্ত্যের ঐ আশ্রম। সেই পুণ্যকর্ম্মা অগস্ত্য যে অবধি এই দিকে আগমন করিয়াছেন, নিশাচরেরা সেই অবধি বৈর পরিত্যাগ করিয়া শান্ত-স্বভাব হইয়াছে। এই দক্ষিণদিক্ সেই ভগবান্ অগস্ত্য ঋষির প্রভাবে ক্রূরকর্ম্মা নিশাচরদিগের অধর্ষণীয় ও মানবদিগের বাসযোগ্য হইয়া ত্রিলোক-মধ্যে তদীয় নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছে।" (অরণ্যকাণ্ড ১১শ সর্গ)।

রামায়ণোক্ত ঋষিগণের মধ্যে অনেকেরই আশ্রম, সূর্য্যবংশাবতংস ভগবান্ রামচন্দ্রের বনগমনের পূর্ব্ব হইতে এই দণ্ডকারণ্যে (আধুনিক মহারাষ্ট্র দেশে) ছিল, এরূপ উল্লেখ রামায়ণেই পাওয়া যায়। রামায়ণে ইহাও দেখিতে পাই

* মহারাষ্ট্রীয় উচ্চারণ "কাঁকণ"।

যে, রামচন্দ্রের বহুপূর্ব্বে বিদর্ভ ও সৌরাষ্ট্র দেশে আর্য্য-উপনিবেশ ও আর্য্য-রাজত্ব স্থাপিত হইয়াছিল। মহাত্মা পরশুরামও রামচন্দ্রের পূর্ব্বে দাক্ষিণাত্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। মহাভারতীয় শান্তিপর্ব্ব (৪৯ অঃ) অনুসারে মহাবীর্য্য পরশুরাম একবিংশতি বার (পদ্মপুরাণ-মতে সপ্তবিংশতি বার) পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করত অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া, যজ্ঞের দক্ষিণা স্বরূপে মহর্ষি কশ্যপকে সমগ্র বসুধা দান করেন। কশ্যপ উহা প্রতিগ্রহ করিয়া পরশুরামকে বলিলেন,—"এক্ষণে এই সমস্ত পৃথিবী আমার হইয়াছে; অতএব ইহাতে বাস করা আর তোমার উচিত নহে। তুমি সত্বর দক্ষিণ-সমুদ্র-তীরে গমন কর।" এদিকে সমুদ্র মহাত্মা জামদগ্ন্যের নিমিত্ত পৃথ্বী সীমা পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বীয় উদর-মধ্যে "শূর্পারক" (উত্তর-কঙ্কণের রাজধানী) নামক স্থান নির্ম্মাণ করিয়া রাখিলেন।

পুরাণান্তরে কথিত হইয়াছে যে, "ক্ষত্রিয়-কুল বিনাশপূর্ব্বক বীরহত্যা-পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার নিমিত্ত পরশুরাম গোকর্ণ-তীর্থে (কঙ্কণ-প্রদেশে) যাত্রা করিয়া তথায় সমুদ্র-তটের প্রসারণ দ্বারা 'কেরল' রাজ্য (আধুনিক মালাবার ও কানাড়া) স্থাপন করেন। পরে তিনি আর্য্যাবর্ত্ত হইতে ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়া উক্ত উভয় দেশে স্থাপন করেন।" ইহার পরিকল্পনা ক্রমে ক্রমে সমগ্র দণ্ডকারণ্যে আর্য্যগণের বসতি-বিস্তার হইয়া, উহা বর্ত্তমান মহারাষ্ট্র দেশে পরিণত হইল, তাহা জানিবার কোনও উপায় নাই।

"মহারাষ্ট্র" শব্দের উৎপত্তি কোন্ সময়ে হইল, তাহাও নির্ণয় করা সহজ নহে। রামায়ণ, মহাভারত ও বিষ্ণু-পুরাণাদিতে এই নাম কোথাও পরিদৃষ্ট হয় না। মহাভারতে "মহারাষ্ট্র" নামের পরিবর্ত্তে "দণ্ডক" এবং "কঙ্কণের" পরিবর্ত্তে "অপরান্ত" (উত্তর-কঙ্কণ) ও "গোকর্ণ" (দক্ষিণ-কঙ্কণ) নাম সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হইয়াছে। রামায়ণোক্ত দণ্ডকারণ্য ও মহাভারতীয় দণ্ডক অভিন্ন। কেবল প্রভেদ এই যে, মহাভারতে কোনও স্থলেই ইহাকে অরণ্য বলা হয় নাই। কারণ, সে সময় ইহা আর্য্যগণ দ্বারা অধ্যুষিত হইয়াছিল। এই নিমিত্ত ভীষ্মপর্ব্বে ইহাকে 'দেশ' মধ্যে পরিগণিত করা হইয়াছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণে আমরা "মহারাষ্ট্র" ও তদন্তর্গত "নাসিক", "গোবর্দ্ধনপুর", "বনবাসী" ও "ভরুকচ্ছ" * প্রভৃতি নাম পাইয়াছি। শক্তি-সঙ্গম তন্ত্রে 'মহারাষ্ট্র' ও তদন্তর্গত 'কোলাপুর' নামক একটী ক্ষুদ্র নগর এবং কঙ্কণ প্রদেশের নাম দৃষ্ট হয়। অনুসন্ধান করিলে আরও দুই একটী প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে এরূপ উল্লেখ পাওয়া যাইতে পারে।

৩। মহারাষ্ট্রীয়গণের পরিচয়।

এখন এই সকল পৌরাণিক বিবরণ পরিত্যাগ করিয়া অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের ঐতিহাসিক বিবরণ সংগ্রহে যত্নবান্ হওয়া যাউক। পুণে (পুণা) জেলার অন্তর্গত 'ভাজে' 'বিড়সে' ও 'কার্লে' নামক গ্রামত্রয়ের নিকটস্থিত পর্ব্বতগুহায় কতকগুলি মন্দির ও চৈত্য দৃষ্ট হয়। সেই মন্দির ও চৈত্য-সমূহে যে সকল প্রস্তর-লিপি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহাতে লিখিত আছে যে, উক্ত মন্দির ও চৈত্যসমূহ "মহারঠি" ও "মহাভোজ" জাতি কর্ত্তৃক নির্ম্মিত ও উৎসর্গীকৃত হইয়াছে।† "বেড়সে"র প্রস্তর-লিপি পাঠে জানা যায় যে, "মহাভোজ" জাতির সহিত "মহারঠি" জাতির বিবাহাদি প্রচলিত ছিল। পূর্ব্বোক্ত প্রস্তর-লিপি-সমূহে ইহাঁদের স্ত্রীলোকদিগকে "মহারঠিনী" ও "মহাভোজী" বলা হইয়াছে। ভারতীয় সুবিখ্যাত পুরাতত্ত্ববিদ্ ডাঃ রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর মহোদয় এই প্রস্তর-লিপিগুলি খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে ক্ষোদিত বলিয়া অনুমান করেন।

ঠানা (Tanna) জেলা সুরাটের দক্ষিণে অবস্থিত। ইহার অন্তর্গত 'মুরবাড়' তালুক হইতে (পুণে জেলার অন্তর্গত) "জুন্নর" নামক গ্রামে যাইবার রাস্তায় "নানাঘাট" নামক একটী গিরিসঙ্কট আছে। নানাঘাটের পর্ব্বত-গুহাস্থিত একটী মন্দিরের সম্মুখস্থিত প্রাচীরে কয়েকটী প্রতিমূর্ত্তি ও তাহাদের নাম ক্ষোদিত রহিয়াছে। তন্মধ্যে একটী প্রতিমূর্ত্তির শিরোদেশে "মহারঠি গনকয়িরো" অর্থাৎ মহাবীর মারাঠা (মার্হাট্টা) সেনাপতি বা মারাঠা-জাতীয় বীরপুরুষ—এই কয়টী কথা লিখিত আছে। ডাঃ ভাণ্ডারকর এই প্রস্তর-লিপিকে খৃষ্টাব্দ-প্রচারের সম-সাময়িক বলিয়া মনে করেন।

খৃষ্ট-পূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীতে মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র মহারাজ প্রিয়দর্শী অশোকের (খৃঃ পূঃ ২৭৪—খৃঃ পূঃ ২৩০ অব্দ) রাজ্যকালে পাটনায় বৌদ্ধদিগের যে মহাসভা আহূত হইয়াছিল, তাহাকে বৌদ্ধগণ "তৃতীয় মহাধর্ম্ম-সাঙ্কথ্য" কহে। এই সভায় স্থির হয় যে, ধর্ম্ম-প্রচার করিবার জন্য নানাদেশে প্রবীণ বৌদ্ধদিগকে প্রেরণ করা কর্ত্তব্য। এই প্রস্তাবানুসারে, মহাধর্ম্ম সাঙ্কথ্য সভার অধ্যক্ষ মোগ্‌গলি পুত্তো নামক বৌদ্ধ ঋষির আদেশে (২৭০ খৃঃ পূঃ) "মহারঠ্‌ঠ", "অপরান্ত" ও "বনবাসী" নামক প্রদেশত্রয়ে কয়েক জন বৌদ্ধ-ধর্ম্মপ্রচারক প্রেরিত হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে "মহাধর্ম্মরক্ষিত" নামক জনৈক প্রধান ধর্ম্মবেত্তা 'মহারঠ্‌ঠ' (সংস্কৃত রূপ—'মহারাষ্ট্র') দেশে গমন করিয়া তত্রত্য অধিবাসিগণের মধ্যে এক-লক্ষ সত্তর হাজার জনকে বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ করাইয়াছিলেন; এবং তাহাদিগের ধর্ম্মশিক্ষা প্রদানার্থ দশ সহস্র বৌদ্ধ যাজক নিযুক্ত করেন। "দীপবংসো" ও "মহবংসো" নামক সিংহলীদিগের যে প্রাচীন ও প্রামাণিক ইতিহাস-গ্রন্থ আছে, তাহাতে এই বিবরণ সঙ্কলিত আছে।

অশোকের দ্বিতীয় ও ত্রয়োদশ অনুশাসনে 'পেটেনিক' * ভোজ, আন্ধ্র ও অপরান্ত প্রভৃতি জাতির উল্লেখ আছে। এতদ্ব্যতীত সোপার (শূর্পারক) নামক গ্রামে তাঁহার অষ্টম অনুশাসন-পত্রের একটী ভগ্ন খণ্ড প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। অশোকের অপর এক প্রস্তর-লিপি-পাঠে জানা যায় যে, তিনি "রাষ্টিক", পেটেনিক ও অপরান্ত প্রদেশে ধর্ম্ম-প্রচারার্থে বৌদ্ধ-যাজক প্রেরণ করিয়াছিলেন। রাষ্টিক শব্দের সংস্কৃত রূপ "রাষ্ট্রিক"। এই শব্দে "মহা" পদ যোগ করিলে, মহারাষ্টিক বা "মহারাষ্ট্রিক"—এই জাতি বাচক পদ নিষ্পন্ন হয়।

ডাঃ রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর বলেন

---

* নাশিক বা নাসিক মহারাষ্ট্র-দেশের একটী প্রসিদ্ধ তীর্থ-ক্ষেত্র। গোবর্দ্ধনপুর—নাসিকের নিকটস্থিত একটী পল্লী। বনবাসী—দক্ষিণ মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত একটী নগর। ভরুকচ্ছ—বর্ত্তমান ভরোচ বা বরোচ; অতি প্রাচীন কালেও ইহা বাণিজ্য-ব্যবসায়াদির জন্য বিখ্যাত ছিল।

† Archiological Survey of Western India No. X. গ্রন্থের ভাজে নং ২, বেড়সে নং ১ এবং কার্লে নং ২ ও ১৪ প্রস্তর-লিপির অনুকৃতি দ্রষ্টব্য। পণ্ডিত ভগবান্‌লাল ইন্দ্রজী ও বোম্বাই সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক পণ্ডিত রাজারাম রামকৃষ্ণ ভাগবত মহোদয় এই প্রস্তর-ক্ষোদিত 'মহারঠি' শব্দকে সংস্কৃত 'মহারথী' শব্দের অপভ্রংশ বলিয়া মনে করেন। কিন্তু ডাঃ ভাণ্ডারকর এ মতের যাথার্থ্য স্বীকার করেন না। তিনি "মহারঠি" শব্দকে কেবল মাত্র জাতিবাচক বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। কোনও কোনও প্রস্তর-লিপিতে "মহারঠ্‌ঠি" বা "মহারঠ্‌ঠ" শব্দও দৃষ্ট হয়। বলা বাহুল্য, এই শব্দ গুলি বর্ত্তমান মরাঠা (মার্হাট্টা বা মার্হাট্টি) শব্দেরই প্রাচীনতম-রূপ।

* প্রতিষ্ঠানপুর—মহারাষ্ট্র রাজ্যের প্রাচীন রাজধানী। প্রতিষ্ঠানের দেশীয় উচ্চারণ—"পৈঠন।" পৈঠনের অধিবাসিগণকে পৈঠনক বা পৈঠনিক বলিত। 'পেটেনিক' শব্দ পৈঠনক বা পৈঠনিক শব্দের উচ্চারণ-ভেদ মাত্র। টলেমী প্রতিষ্ঠানকে "বৈঠন" নামে অভিহিত করিয়াছেন।

যে, সহ্যপর্ব্বতের স্থানে স্থানে গুহার মধ্যস্থিত প্রাচীন দেবমন্দির, চৈত্য ও বিহারাদিতে যে সকল প্রস্তর-লিপি, অনুশাসন ও প্রাচীন মুদ্রাদি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহা পাঠে জানা যায় যে, "রঠ্ঠি", "রঠ্ঠ" বা "রাষ্ট্রিক" ও "ভোজ" নামক ক্ষত্রিয়জাতি অতি প্রাচীন কাল হইতে মহারাষ্ট্র দেশে বাস ও ধপত্য করিয়াছেন। ইহাঁরাই পরে স্বীয় সাহস ও পরাক্রম গুণে "মহারঠ্ঠি" "মহারঠ্ঠ" বা "মহারাষ্ট্রিক" ও "মহাভোজ" নামে অভিহিত হইতে লাগিলেন।* এই "মহারঠ্ঠ" মহারাষ্ট্রিক শব্দ আধুনিক মারাঠা (মার্হাট্টা) ও মহারাষ্ট্র শব্দের প্রাচীনতম রূপ।

ডাঃ ভাণ্ডারকর অনুমান করেন যে, উল্লিখিত "রঠ্ঠ" জাতির অন্তর্গত কতকগুলি কুল একত্রিত হইয়া এক একটী "কুড়" (সংস্কৃত রূপ—'কূট') বা "সংহৃষ্ট কুল" হয় এবং তাঁহারা প্রথমতঃ "রঠ্ঠকূড়" (সংস্কৃত রূপ—'রাষ্ট্রকূট') নামে অভিহিত হন। এই রঠ্ঠকূড়-বংশীয় ক্ষত্রিয় মারাঠাগণই কালক্রমে "রাঠোড়" (রঠৌর) নামে পরিচিত হইলেন।

এইখানে ইউরোপীয় সিদ্ধান্তের সহিত ডাঃ ভাণ্ডারকরের বিরোধ ঘটিতেছে। কোনও কোনও ইউরোপীয় পণ্ডিতের মতে, যোধপুরের সুপ্রসিদ্ধ রাঠোড়-বংশীয় রাজপুতগণ দাক্ষিণাত্যে গমন করিয়া (কিন্তু কোন্ সময়ে?) রাজ্য স্থাপন ও আপনাদিগকে "মহারাঠোড়" নামে পরিচিত করেন। এই দাক্ষিণাত্য-বাসী রাঠোড় বা "মহারাঠোড়" হইতেই মারাঠা বা মহারাষ্ট্রীয় জাতির উৎপত্তি। ফল কথা, মারাঠা শব্দকে তাঁহারা রাঠোড় বা মহারাঠোর শব্দের অপভ্রংশ বলিয়া মনে করেন। কিন্তু খৃষ্টের চারি পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে রাঠোড়-বংশীয় রাজপুতগণ মহারাষ্ট্রদেশ জয় করিয়া তথায় বসতি করিয়াছিলেন, এরূপ কোনও প্রমাণ যতদিন না পাওয়া যায়, ততদিন আমরা তাঁহাদের উপরি-উক্ত সিদ্ধান্তে বিশ্বাস ও আস্থা স্থাপন করিতে অসমর্থ। পক্ষান্তরে প্রাচীন প্রস্তর-লিপিসমূহ পর্য্যালোচনা করিলে, ডাঃ ভাণ্ডারকরের মতই অধিকতর সুসঙ্গত ও প্রামাণিক বলিয়া বোধ হয়।

মহারাষ্ট্র-দেশের ইতিহাস-লেখক গ্রাণ্ট ডফ সাহেব তাঁহার "মহারাষ্ট্র ইতিহাসে" এইরূপ একটী আখ্যায়িকা উদ্ধৃত করিয়াছেন যে, খৃষ্টাব্দের প্রায় ১৬ শত বৎসর পূর্ব্বে কোশল-দেশ হইতে কতিপয় ক্ষত্রিয়-পরিবার দাক্ষিণাত্যে আসিয়া বসতি করেন। মহারাজ শালিবাহনের রাজত্বকালে (৭৮ খৃষ্টাব্দে) মহারাষ্ট্রে যে রাজবংশ রাজত্ব করিত, তাহা পূর্ব্বোক্ত কোশলদেশীয় ক্ষত্রিয়গণের বংশসম্ভূত। এই রাজবংশ "আশীর" নামক স্থানে রাজত্ব করিত। শালিবাহন আশীর-পতিকে সবংশে ও সবান্ধবে বিনাশ করিয়া স্বয়ং উক্ত রাজ্য অধিকার করেন। সেই দুঃসময়ে উক্ত রাজ-বংশীয়া জনৈক মহিলা রাজার অপোগণ্ড শিশুকে লইয়া পলায়ন ও সাতপুড়া (সাতপুরা) পর্ব্বতে আশ্রয় গ্রহণ করত প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন। এই শিশুই পরিশেষে চিতোরের রাণাবংশের স্থাপন করেন। এইরূপে মহারাষ্ট্রের রাজবংশ হইতে চিতোর ও উদয়পুর প্রভৃতি প্রদেশের "শিশোদিয়" বংশের উৎপত্তি হয়।

আমরা দেখিয়াছি, খৃষ্টাব্দের অন্যূন তিন

* ডাঃ ভাণ্ডারকর বলেন,—'ভোজ', 'রঠ্ঠ বা রঠ্ঠি" ও 'রাষ্টিক' নামে অভিহিত ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে যাঁহারা উত্তর-মহারাষ্ট্রে বাস করিতেন, তাঁহারাই পরে "মহাভোজ," "মহারঠ্ঠ" ও "মহারাষ্টিক" নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। কিন্তু দক্ষিণ-মহারাষ্ট্রবাসিগণ "রঠ্ঠি" বা "রঠ্ঠ" নামেই চিরকাল অভিহিত হইতেন। দক্ষিণ-মহারাষ্ট্রের অধিবাসী ও নরপতিগণ এখনও "রঠ্ঠ" ও "রঠ্ঠি" নামে আপনাদের পরিচয় দিয়া থাকেন।

শত বৎসর পূর্ব্বাবধি রঠ্ঠ বা মহারঠ্ঠ জাতি মহারাষ্ট্র দেশে বাস ও আধিপত্য করিতেন। এবং ইহাঁদিগের নামানুসারেই এই দেশের নাম "মহারঠ্ঠ" (সংস্কৃত রূপ—মহারাষ্ট্র) হইয়াছে। ইহাঁদের তাৎকালিক অবস্থাদির বিষয় জানিবার কোনও উপায়ই এখন আর নাই। তবে এই পর্য্যন্ত অনুমান হয় যে, তৎকালে মহারাষ্ট্র-দেশ কতিপয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। ইতিপূর্ব্বে "আশীর" রাজ্যের উল্লেখ করিয়াছি। প্রতিষ্ঠান-পুরেও ক্ষুদ্র রাজার রাজধানী ছিল দেখা যায়। খৃষ্টাব্দের প্রায় ২৫০ বৎসর পূর্ব্বে মহারাষ্ট্র দেশে "তগর" নামে একটী অতি সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল। তথায় মিশর-দেশীয় বণিক্‌গণ বাণিজ্যার্থে আগমন করিতেন। তৎকালে এখানে রাজপুত-বংশীয় জনৈক রাজার রাজত্ব ছিল। তিনি অন্যান্য রাজন্যবর্গের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া তগরের রাজাধিরাজ নামে পরিকীর্ত্তিত হইতেন। সম্ভবতঃ তাঁহার শাসন-প্রভাব বহুদূর উত্তর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।*

বিদর্ভ দেশেও এই সময়ে একটী পৃথক্ রাজ্য ছিল। খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর তৃতীয় পাদে, মগধে শুঙ্গ-বংশীয় প্রথম নরপতি পুষ্পমিত্রের শাসনকালে, বিদর্ভ দেশে যজ্ঞসেন নামক জনৈক নরপতি রাজত্ব করিতেন। এই যজ্ঞসেনের সহিত পুষ্পমিত্রের পুত্র অগ্নিমিত্রের যে সংগ্রাম ঘটিয়াছিল, "মলিবিকাগ্নিমিত্র" নামক নাটকে তাহার আংশিক বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই নাটক-বর্ণিত ঘটনাটীকে ঐতিহাসিক বলিয়া গ্রহণ করিতে কোনও দোষ দেখি না। এই নিমিত্ত এস্থলে তাহার সারোদ্ধার করিয়া দিলাম। ঘটনাটী এই ;—

"শুঙ্গ-বংশীয় নরপতি পুষ্পমিত্রের রাজত্ব-কালে তদীয় পুত্র অগ্নিমিত্র বিদিশা (বেটওয়া নদীর তীরবর্ত্তী আধুনিক ভিল্‌সা) প্রদেশ (সম্ভবতঃ পুষ্পমিত্রের প্রতিনিধিরূপে) শাসন করিতেন। অগ্নিমিত্র বিদর্ভরাজ যজ্ঞসেনের পিতৃব্য-কন্যা "মালবিকা"র পাণিগ্রহণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। যজ্ঞসেনের সহিত মালবিকার সহোদর মাধবসেনের বিদর্ভের সিংহাসন লইয়া বিবাদ চলিতেছিল।

"একদা মাধবসেন, তাঁহার মন্ত্রী "সুমতি" ও ভগিনী মালবিকাকে (অগ্নিমিত্র-করে সমর্পণার্থে) সঙ্গে লইয়া গোপনে বিদিশাভিমুখে পলায়ন করিতেছিলেন; এমন সময়ে যজ্ঞসেনের জনৈক সেনানায়ক কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও ধৃত হন। মন্ত্রিপ্রবর সুমতি, প্রভু-ভগিনী মালবিকাকে লইয়া, কোনও কৌশলে পলায়ন করত আত্ম-রক্ষা করিলেন। মাধবসেন একাকী বন্দী রহিলেন।

"মাধবসেন বন্দী হইলে, বিদিশাপতি অগ্নিমিত্র তাঁহাকে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি মাধবসেনকে তাঁহার করে সমর্পণ করিতে যজ্ঞসেনকে আদেশ করিলেন। যজ্ঞসেন তাঁহার আদেশ-পালনে সম্মত হইলেন; কিন্তু বলিলেন যে, "আমার শ্যালক, মৌর্য্য-বংশীয় শেষ-নরপতির মন্ত্রী ছিলেন। পুষ্পমিত্র মৌর্য্যবংশ বিনাশপূর্ব্বক মগধের সিংহাসন অধিকার-করণকালে, আমার শ্যালককে বন্দী করিয়া কারাগারে ফেলিয়া রাখিয়াছেন। আপনি (অগ্নিমিত্র) যদি তাঁহাকে কারামুক্ত করিয়া দেন, তবে আমরা মাধবসেনকে ছাড়িয়া দিতে পারি। আমার শ্যালকের মুক্তি ভিন্ন কিন্তু তাহা সম্ভব নহে।

"এ কথা শুনিয়া অগ্নিমিত্র অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং যজ্ঞসেনের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করিলেন। যুদ্ধে যজ্ঞসেন পরাজিত হইলেন। সংগ্রাম-বিজয়ী অগ্নিমিত্র মাধব-

* Vide Captain James Grant Duff's 'History of the Marathas.' Vol I, *pp 21.*

সেনকে মুক্ত করিয়া, বিদর্ভ-রাজ্য উভয় ভ্রাতাকে তুল্যরূপে বিভাগ করিয়া দিলেন।"

খৃষ্ট-পূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীর তৃতীয় পাদে অর্থাৎ ৭৩ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে শালিবাহনবংশের অভ্যুদয় হয়। শালিবাহন-বংশীয় নরপতিগণ পূর্ব্বকথিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি বিনষ্ট করিয়া স্বয়ং সমগ্র দক্ষিণাপথের সার্ব্বভৌম অধিপতি হইয়াছিলেন। *

শালিবাহন-বংশের ইতিহাস বারান্তরে আলোচ্য।

শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর।

সংশয়।

১

সুজলা সুফলা শ্যামা, মেদিনী সুন্দর!
সুষমার সুবিকাশ,
পূরায় মানব-আশ,
জগৎ-আদর্শ মরি কিবা মনোহর!
পুরুষ-প্রকৃতি-লীলা ঘোষে নিরন্তর!!

২

শশাঙ্কে কলঙ্ক হায়! কীট পুষ্পাধারে!
বিধাতার একি সৃষ্টি,
অজ্ঞ নর অন্ধদৃষ্টি,
বিশ্বযন্ত্র সম তানে বাজাইয়া তারে
'সংশয়' সৃজিলা ধাতা সুন্দর সংসারে!!

৩

দুর্ব্বল ধরার নর না বুঝিয়া ছল
এ 'সংশয়' বিষধরে
হৃদে ধরে সমাদরে,
দারুণ দংশনে তার অন্তর বিকল!
জীবনের গ্রন্থি ছিন্ন, সার আঁখি-জল!!

৪

মাতা-পিতা-স্নেহনীর অঝোরে ঝরিছে!
তাঁহাদের পদরজে,
ভক্তি-ভরে পুত্র মজে,
কোথা হ'তে বিষময় 'সংশয়' পশিছে!
পিতৃ-মাতৃ-পুত্র-প্রেম ভাঙ্গিয়া দিতেছে!!

৫

ভ্রাতৃ-প্রেম-মন্দাকিনী চলিছে লহরে!
পরস্পরে এক প্রাণ,
তুচ্ছ কথা আত্মদান,
বিষম 'সংশয়' আসি' আবেগের ভরে!
ছিঁড়ে দেয় স্নেহ-ডোর জনমের তরে!!

৬

প্রাণ-প্রিয়ে, প্রিয়তমে, জীবন-আঁধার!
পলকের অদর্শন,
শূন্য করে প্রাণ-মন;—
অকস্মাৎ 'সংশয়ে'র আভাস-সঞ্চার!
পরাণের পূর্ণ তৃপ্তি করে ছারখার!!

৭

পতিপ্রেম পৃথিবীর পবিত্র আলয়!
পত্নীর সাধের ধন!
কেবা জানে কি কারণ
দৈত্য দূত 'সংশয়ে'র লইয়া আশ্রয়
'সতীত্ব সোণার নিধি' করে বিনিময়!!

৮

'সংশয়ে'র আবর্ত্তনে জ্যোতির্ব্বেত্তাগণ!
কল্পনার লয়ে সঙ্গ,
করিতেছে নানা রঙ্গ,—
'কোথা সূর্য্য', 'কোথা চন্দ্র গ্রহ তারাগণ'
যন্ত্রের সাহায্যে হায় করে নিরীক্ষণ!!

৯

হারাইয়া জীব জ্ঞান 'সংশয়'-পীড়নে,
উপেক্ষি' সহজ জ্ঞান,
ধর্ম্মের করিছে ভাণ,
কপটতা, গোঁজামিলে জীবন যাপিছে,—
মনুষ্যত্ব, সদাচার হেলায় ত্যেজিছে।

১০

'সংশয়ে'র মহামোহে হইয়া মোহিত!
কেহ ভাবে "ব্রহ্ম নাই;
যা কিছু দেখিতে পাই,
প্রকৃতির ডিম্বমাত্র হয়েছে স্ফুরিত!"
অভিমান, অহংজ্ঞানে উন্মত্ত জগত!!

১১

কোথা নাথ, কোথা তুমি, অগতির গতি,
হৃদে দাও প্রেম-ভক্তি,
স্বধর্ম্ম-পালনে শক্তি,
দুর্জ্জয় 'সংশয়ে' প্রভো, কর পরিত্রাণ,
কোথা তুমি, অন্তর্য্যামি, ভক্ত-ভগবান!!

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ দত্ত।

* এই প্রবন্ধের অধিকাংশ ডাঃ রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর প্রণীত Early History of the Dekkan, Down to the Mohomedan Conquest Section I. II, III, IV. অবলম্বনে রচিত হইল।

রূপচাঁদ অধিকারী।

যেদিন পলাশীর সমরক্ষেত্রে যবনের সৌভাগ্য-লক্ষ্মী ইংরেজের অঙ্কশায়িনী হইলেন, সেইদিন ভারতী-দেবীও বঙ্গভূমি হইতে কিছুদিনের জন্য বিদায় গ্রহণ করিলেন। অর্দ্ধশতাব্দীব্যাপী অরাজকতায় ও তজ্জনিত নানা বিভ্রাটে বাঙ্গালীর কমনীয় বৃত্তিগুলি প্রায়ই উচ্ছিন্ন হইয়া যায়। পলাশীর যুদ্ধের পরবর্ত্তী কিঞ্চিদূন এক শতাব্দী কাল মধ্যে বঙ্গে খ্যাতনামা কবি আবির্ভূত হন নাই। কিন্তু যেমন দিবসের বিহঙ্গ-কলকণ্ঠ-নিঃসৃত-ঐকতান-ভঙ্গ-ভয়ে রজনীতে প্রকৃতি-দেবী অস্ফুট মধুর-সঙ্গীতে জগৎ মাতাইয়া রাখেন, সেইরূপ পলাশীর যুদ্ধের পর রাষ্ট্রবিপ্লবে কবিকুল নীরব হইলে কতকগুলি প্রসিদ্ধ সঙ্গীতকার ও গায়ক বঙ্গীয় প্রাণে কবিতার তান রক্ষা করিয়াছিলেন। রূপ অধিকারী তাঁহাদের অন্যতম ও প্রথম।

রূপ অধিকারী কে,—পাঠকগণের অগ্রে তাহা জানা আবশ্যক। "ঢপ" সঙ্গীত কি, পাঠকগণ তাহা জানেন। কঠিন দুর্ব্বোধ তাল রাগিণী-যুক্ত 'কীর্ত্তন'কে সহজ-তাল-রাগিণী-যুক্ত করিলে কর্ণে কিরূপ অমৃত বর্ষণ করিতে থাকে, তাহা বোধ হয় সকলেই অনুভব করিয়াছেন। রূপ অধিকারী সেই ঢপ-সঙ্গীতের স্রষ্টা। পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন তাঁহার "বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব" নামক গ্রন্থে, যাঁহারা সাহিত্যের উন্নতি বিধান করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে রূপ অধিকারীরও নামোল্লেখ করিয়াছেন। আমরা পাঠকবর্গকে রূপ অধিকারীর সংক্ষিপ্ত জীবনী উপহার দিব।

আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে এতদ্দেশীয় প্রাচীন মহাত্মাগণের জীবন-চরিত পাওয়া সুকঠিন। অনেক স্থলে প্রায় অনুমানের উপরই নির্ভর করিতে হয়। রূপ অধিকারীর জীবনও আজ আমাদের চক্ষে তমসাচ্ছন্ন। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে কোন কথাই জানিবার উপায় নাই। তবে আমি রূপ অধিকারীর ভ্রাতার পৌত্রের নিকট ও এখানকার স্থানীয় ভদ্রলোকের নিকট যাহা শুনিয়াছি, তাহা যে প্রকৃত, তাহার আর সন্দেহ নাই।

জেলা মুরশিদাবাদের অন্তর্গত আলিকপুর নামক গ্রামে রূপের পূর্ব্বপুরুষগণের বাস ছিল। রূপের পিতার নাম প্রাণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। মুরশিদাবাদ-বেলডাঙ্গায় প্রাণকৃষ্ণের মাতুলালয়। প্রাণকৃষ্ণ আলিকপুর পরিত্যাগ করিয়া মাতুলালয়েই বাস করেন। বেলডাঙ্গায় তাঁহার মাতুলের কতকগুলি ঠাকুরের সেবার ভার তাঁহার উপর পড়ে। সেইজন্য প্রাণকৃষ্ণের উপাধি অধিকারী হয়। বেলডাঙ্গাতেই রূপের জন্ম হয়। এখন দেখা যাউক, রূপ কোন্ সময়ে জন্মগ্রহণ করেন। রূপের ভ্রাতা স্বরূপচন্দ্রের পৌত্র শ্রীবল্লভ অধিকারী বলেন,—১২৮৩ সালে নব্বই বৎসর

বয়সে তাঁহার পিতামহীর মৃত্যু হয়। তাঁহার পিতামহী বলিতেন যে, তাঁহার যখন ১৫।১৬ বৎসর বয়স, তখন আশী বৎসর বয়সে রূপ অধিকারীর মৃত্যু হয়। এই হিসাবে আমরা ইংরেজী ১৭২২ সালে ও বাঙ্গালা ১১২৯ সালে রূপের জন্ম হয়, ইহা অবধারণ করিতে পারি। ইহার দ্বারা রূপের জন্ম-বৎসর যে অভ্রান্তরূপে নির্ণীত হইল, এমন নহে। তবে এইরূপ সময়েই যে রূপের জন্ম হয়, সে বিষয়ে আর সন্দেহ থাকিতে পারে না।

রূপের বাল্যশিক্ষা তত উৎকৃষ্ট হয় নাই। তখনকার কালে পাঠশালাতে যেরূপ শিক্ষা হইত, তাঁহারও তাহাই হইয়াছিল। তাহা ছাড়া, তিনি কিছু সংস্কৃত শিক্ষা করিয়াছিলেন। সেকালে ভাগবতের কথকতায় বেশ লাভ ছিল, সম্মানও ছিল। রূপ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া ভাগবতের কথকতা-ব্যবসা করিতে আরম্ভ করেন। কয়েক বৎসর কথকতা করার পর মুরশিদাবাদ জেলার শিমুলিয়া নামক গ্রামে এক সন্ন্যাসীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। এই সন্ন্যাসীর নিকট তিনি প্রকৃষ্ট পদ্ধতিক্রমে সঙ্গীত শিক্ষা করেন। সন্ন্যাসী তাঁহার প্রতিভায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে একটী 'ডুবকী' উপহার দেন। এই সময়েই রূপের জীবন-নাটকের মনোহর অঙ্কের যবনিকা উত্তোলিত হয়। এই সময়েই তিনি ঢপের সৃষ্টি করেন। তাঁহার সঙ্গীতের মোহিনী শক্তি ছিল। যে শুনিত, সেই মুগ্ধ হইয়া যাইত। বেলডাঙ্গার লোকে বলিয়া থাকে, রূপের ডুবকীর মোহিনী শক্তি ছিল। যাহা হউক, তিনি যে একজন উৎকৃষ্ট গায়ক ছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আজিও লোকে বলিয়া থাকে,—

"বাজল্ রূপ অধিকারীর খোল,
মাগীরা সব চরকা তোল।"

রূপের গানে লোকে কেমন মন্ত্রমুগ্ধ হইত, সে সম্বন্ধে অনেক গল্প প্রচলিত আছে। একটা গল্প বলিব। এক সময়ে রূপ কোথাও কীর্ত্তন করিয়া সদলে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন; পথে দস্যুদল কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলেন। রূপ জানিতেন, তাঁহার গানে পাষাণও দ্রবীভূত হয়। দস্যুদিগকে বলিলেন,—"বাপু সকল! তোমরা ত আমাকে মারিবেই, তবে মৃত্যুকালে একবার হরিনাম করিয়া লই।" দস্যুগণ সম্মত হইলে রূপ প্রাণভরে একবার ভগবদ্‌গুণানুকীর্ত্তন করিলেন। দস্যুগণ স্তম্ভিত, মোহিত ও দ্রবীভূত হইল। তাহারা রূপের সর্ব্বস্ব হরণ করিবে কি, তাহাদের নিকট যাহা কিছু ছিল, তাহা তাঁহাকে দিয়া প্রণাম করিল।

ঢপের ব্যবসা দ্বারা তিনি প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করেন। বেলডাঙ্গার তৎকালীন জমিদার জগৎশেঠের পুত্র, তাঁহার গুণে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার বাটী নির্ম্মাণ করাইয়া দেন ও তাঁহাকে অনেক বিঘা জমি ব্রহ্মত্র করিয়া দেন। সেই বাটীর ভগ্নাবশেষ এখনও রহিয়াছে। রূপের তিন পুত্র ছিল, তাঁহাদের বংশাবলী আর কেহ জীবিত নাই। রূপের ভ্রাতার বংশধর এখনও জীবিত। তাঁহার সেই প্রসিদ্ধ ডুবকী, কয়েক বৎসর হইল, গৃহপতনে বিনষ্ট হইয়াছে। আনুমানিক ১৮০২ সালে রূপের মৃত্যু হয়।

রূপ অধিকারীর সংক্ষিপ্ত জীবনী এইরূপ। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বহু অনুসন্ধানেও তাঁহার রচিত একটীও গান সংগ্রহ করিতে পারি নাই। শ্রীবল্লভ অধিকারী মহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক অনেকগুলি পুরাতন পুঁথি আমাদিগকে দেন। আমরা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিয়া তাহাতে রূপ অধিকারীর ভণিতা-যুক্ত পদ দেখিতে পাইলাম না। উক্ত অধিকারী মহাশয় বলেন,—অনেকগুলি পুরাতন কাগজ-পত্র তাঁহার বাটীর স্ত্রীলোকেরা অকিঞ্চিৎকর বিবেচনায় ফেলিয়া দিয়াছে। সেই সঙ্গেই বোধ হয়, রূপ অধিকারীর গীতগুলিও নষ্ট হইয়া গিয়াছে। বেলডাঙ্গার কেহ কেহ দুই একটা গান রূপের বলিয়া পরিচয় দিলেন। কিন্তু সেগুলিও রূপের বলিয়া আমার বিশ্বাস হইল না। যিনি সঙ্গীতে নূতন পদ্ধতি সৃষ্টি করিয়াছিলেন, যাঁহার পদবী অনুসরণ করিয়া 'মধুসূদন' প্রভৃতি ঢপওয়ালা অনেক মধুর গীত রচনা করিয়া গিয়াছেন, তিনি যে নিজে গীত রচনা করেন নাই, ইহা অসম্ভব। রূপকে নিশ্চয়ই নূতন গান রচনা করিতে হইয়াছিল; কেননা, কীর্ত্তনের গান ও ঢপের গান এক নয়। জন্মভূমির বহুসংখ্যক গ্রাহক ও পাঠকবর্গের মধ্যে যদি কেহ রূপ অধিকারীর গান জানেন, তবে অনুগ্রহপূর্ব্বক মুরশিদাবাদ-বেলডাঙ্গায় আমার নিকট প্রেরণ করিলে অথবা কোন সাময়িক পত্রে প্রকাশিত করিলে, বাঙ্গালা সাহিত্যের একটী মহোপকার সাধন করা হয়। সাহিত্যানুরাগী প্রত্যেক ব্যক্তিরই এবিষয়ে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

শ্রীনীলরতন মুখোপাধ্যায়।

হিন্দুত্ব।*

হিন্দুধর্ম্মের অনেক গূঢ়তত্ত্ব আমরা বাবু চন্দ্রনাথ বসু কৃত 'হিন্দুত্ব' নামক পুস্তক হইতে বুঝিতে পারি। এ তত্ত্বগুলি এত সুন্দর করিয়া আর কেহ আমাদের বুঝায় নাই। আমরা এই পুস্তক অবলম্বন করিয়া হিন্দুত্ব সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলিব। হিন্দুর সাধনা-তত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিব।

বিজ্ঞানের চরম-সীমা ধর্ম্ম। এইজন্য হিন্দু 'বিজ্ঞান' অর্থে ব্রহ্মতত্ত্ব-জ্ঞানই বুঝেন। জগৎ-তত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিতে করিতে শেষে ব্রহ্মতত্ত্বেই উপনীত হইতে হয়। প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত বহুত্বপূর্ণ জগতে বৈজ্ঞানিক যখন পূর্ণ একত্ব দেখিতে পান, তখনই তিনি ব্রহ্মতত্ত্বে উপনীত হন। শুধু এই বৈষম্যময় জগতের মূলে একমাত্র শক্তি ও পরমাণু অথবা শুধু একমাত্র শক্তির অথবা পরমাণুর ক্রিয়া দেখিয়া বৈজ্ঞানিকের ক্ষান্ত হইলে চলে না; তাঁহাকে আরও অগ্রসর হইতে হয়। আরও অগ্রসর হইতে পারিলেই তাঁহার ব্রহ্মতত্ত্বের উপলব্ধি হয়। বৈজ্ঞানিক তখন বুঝিতে পারেন—

"একবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানং ভবতি।"

তখনই বৈজ্ঞানিকের পূর্ণ বিজ্ঞান আয়ত্ত হয়; তখন তিনি মহর্ষি গৌতমের ন্যায় 'পরমাণু নিত্য পদার্থ ও জগৎ তাহার কার্য্য' এ কথা বলেন না; অথবা মহর্ষি কণাদের ন্যায় 'পরমাণু ও শক্তি নিত্য এবং জগৎ তাহার কার্য্য' এ কথাও বলেন না। কিংবা ভগবান্ কপিলের ন্যায়, পরমাণু ও শক্তির মূলে নিত্য প্রকৃতি ও পুরুষের নিত্য-লীলায় জগতের সৃষ্টি-লয়-তত্ত্ব বুঝিয়া ক্ষান্ত হন না। তিনি আরও উপরে উঠিয়া "একমেবাদ্বিতীয়ং" এই সত্য উপলব্ধি করেন। "এই চিদানন্দঘন একই সৎ, আর নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল এবং সৃষ্টি ও লয়ের বিষয়ীভূত এই জগৎ অসৎ বা মায়াময়" এই সত্যই ধারণা করেন। আর তখনই তিনি বিজ্ঞানের চরম-সীমায় উপনীত হন।

যখন জ্ঞানের এইরূপ বিরাট বিস্তৃতি হয়, তখন ব্রহ্ম জগৎ, আমি—সব একাকার হইয়া যায়,—ব্রহ্মাণ্ডের ও ভাণ্ডের একই তত্ত্ব উপলব্ধি হয়। তখনই "সোঽহং" জ্ঞান হয়। চন্দ্র বাবু যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, সোঽহংবাদের মূল—ব্রহ্ম ও ব্রহ্মাণ্ডের একত্ববাদ। যাঁহারা দ্বৈতবাদী, সোঽহং-বাদ তাঁহাদের নিকট বড় স্থান পায় না। তাঁহারা ব্রহ্ম

* শ্রীচন্দ্রনাথ বসু প্রণীত। মূল্য ১৷৷০ টাকা। কলিকাতা, ২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী হইতে শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

হইতে ব্রহ্মাণ্ড ভিন্ন দেখেন,—পরমাত্মা ও জীবাত্মা পৃথক্ ইহাই বুঝেন। চন্দ্র বাবু দ্বৈতাদ্বৈত-বাদের মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি অদ্বৈতবাদ সমর্থন করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, "বিকাশবাদ ও সৃষ্টিবাদ উভয় বাদেই সৃষ্টি ও সৃষ্টিকর্ত্তার একত্ব প্রমাণীকৃত হইতেছে।" তিনি বলিয়াছেন যে, "জগৎ যদি জগদীশ্বর হইতে পৃথক্ হয়, তবে জগদীশ্বর আর অসীম হইতে পারে না, সসীম হইয়া পড়েন।" পরে একস্থানে আছে যে, জগতের বৈচিত্র্য বা বিভিন্নতা—প্রকৃত বিভিন্নতা নহে; উহা মনুষ্যের একটী অবস্থা-বিশেষের ফল বা উপলব্ধি মাত্র। অথবা ব্রহ্মাণ্ডের স্থূলত্ব—তাহার ক্ষণস্থায়ী অবস্থামাত্র; প্রকৃত অস্তিত্ব নহে। উহা ব্রহ্মের মায়া হইতে উদ্ভূত বা প্রক্ষিপ্ত হইলেও ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ নহে। যাহা হউক, এস্থলে দ্বৈতাদ্বৈতবাদের কথা উত্থাপন করিয়া আধুনিক তত্ত্ব-বিদ্যায় কূট বাদ-প্রতিবাদের মধ্যে প্রবেশ করিবার প্রয়োজন নাই। তর্ক দ্বারা সত্য-উপলব্ধি হয় না। তাহার সাধন আবশ্যক। সে কথা পরে বলিতেছি।

চন্দ্র বাবু আরও দেখাইয়াছেন যে, দ্বৈতাদ্বৈত—উভয় বাদ হইতেই সোঽহং তত্ত্ব উপলব্ধি হইতে পারে। কেননা, একটু অভিনিবেশ সহকারে দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, দুইটী মতের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নাই। 'জগৎ জগদীশ্বরের রূপ, বিকাশ বা বিবর্ত্ত' এ কথার অর্থও যা, 'জগৎ জগদীশ্বরের সৃষ্টি' এ কথার অর্থও প্রায় তাই। সকল সৃষ্ট পদার্থই সৃষ্টি-কর্ত্তাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে পারে,—"সোঽহং"।

সোঽহং-ভাব যেমন জ্ঞানজ, তেমনি উহা ভক্তি হইতেও উৎপন্ন হইতে পারে। যেমন তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু জগৎ-তত্ত্ব ও ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝিয়া "একমেবাদ্বিতীয়ং" সিদ্ধান্ত করিয়া, 'জগৎ ও জগদীশ্বর এক, অথবা এক সৎ আর জগৎ অসৎ' ভাবিয়া সোঽহং ধারণা করেন, তেমনি ভক্ত অতিমাত্র প্রেমে বা পরানুরক্তিতে উপাস্যের সহিত তন্ময় হইয়া যান। রাধা যেমন তন্ময়-চিত্তে কৃষ্ণকে ভাবিতে ভাবিতে কৃষ্ণত্ব প্রাপ্ত হন,—ভক্ত সেইরূপে 'সোঽহং' ভাবেন। ভক্তির প্রথমাবস্থায় সোঽহং-জ্ঞান হয় না বটে—কেননা, ভক্ত তখন ভাবেন, "চিনি হওয়া ভাল নয় মন চিনি খেতে ভালবাসি"—কিন্তু ভক্তির চরমাবস্থায় সে ভাব থাকে না। জ্ঞান ও ভক্তি উভয়েরই চরম সিদ্ধান্ত—সোঽহং। চন্দ্র বাবু আরও দেখাইয়াছেন যে, অহং-জ্ঞানের বা আত্মাভিমানের লোপ না হইলে সোঽহং-জ্ঞান আইসে না। অথবা সোঽহং-জ্ঞান হইলেই আত্মাভিমানের লোপ হয়। ব্রহ্ম হইতে অহংএর বিশেষত্ব বা পার্থক্য থাকে না। তাহা হইলেই নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়—জীবাত্মা মুক্ত হয়।

এইজন্য আত্মাভিমান বা অহংতত্ত্ব লোপ করিয়া 'সোঽহং' ভাব ধারণা করিয়া ব্রহ্মে লীন বা লয় হইবার আলয় হিন্দুর সাধনা। শুধু সোঽহং-জ্ঞান হইলেই হইল না;—এই জ্ঞানের ফলেই হিন্দুর মুক্তি বা নির্ব্বাণ হয়, আর ব্রহ্মে লয় হইলেই হিন্দুর সাধনার সিদ্ধি হয়—সে সিদ্ধির জন্য বড় বিরাট সাধনা আবশ্যক। চন্দ্র বাবু লয়ের প্রবন্ধে সে কথা বিশদ করিয়া বুঝাইয়াছেন। তাহা পরে দেখাইতেছি।

এই অহং-জ্ঞান হইতে ক্রমে সিদ্ধিলাভ করিলে 'আমি' আর থাকি না। এই অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে এই ক্ষুদ্রতম পৃথিবীর অতি সামান্য বালুকণা-সদৃশ সামান্য কীটাণু-তুল্য যে আমি বিষয়-মোহে জড়াইয়া রহিয়াছি, জীবনের চির-সহচর ত্রিবিধ দুঃখে অভিভূত হইয়া আছি, সামান্য রূপ-রসাদির আকর্ষণে মোহিত হইয়া আছি, সে আমি আর থাকি না। সেই আমি "মোহজাল ছিঁড়িয়া ফেলিয়া

রূপ-রসাদি উড়াইয়া দিয়া, মর্ত্ত্যলোক অকিঞ্চিৎকর বুঝিয়া ত্রিবিধ দুঃখ নিবৃত্তি করিয়া, বাসনা-বীজ ধ্বংস করিয়া, কীটাণুর ক্ষুদ্রত্ব ভুলিয়া অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডে ব্যাপ্ত হইয়া তাহার শক্তি ধরিয়া বলি,—"তিনিই আমি। আমা হইতে সমুদয় উৎপন্ন হইয়াছে, আমিই সমুদয়, আমাতেই সমুদয় আছে এবং আমিই নিত্য ও অক্ষয়। পরমাত্মাতেই আমার আশ্রয়, আমি অক্ষয় অব্যয় ব্রহ্ম। আমি সৃষ্টির পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলাম এবং মহা-প্রলয়ের পরেও বিদ্যমান থাকিব।" কি বিষম পরিণতি! এ পরিণতি যেমন বিরাট, জীবাত্মা ও ব্রহ্মের মধ্যে ব্যবধান যেমন বিরাট, আর সেই ব্যবধান বিনষ্ট করিবার জন্য সাধনাও তেমনি বিরাট হওয়া চাই।

হিন্দুর সেই বিরাট সাধনার ব্যবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা বলিতেছি। কিন্তু সে কথা বলার পূর্ব্বে হিন্দুর জন্মান্তর-বাদের কথা বুঝিতে হইবে। হিন্দু ব্যতীত আর কেহ জন্মান্তর-বাদী নহে। এইজন্য হিন্দুর সকল কথা—তাহার ধর্ম্ম-প্রণালী, তাহার সমাজ-প্রণালী, তাহার জাতি-ভেদ-তত্ত্ব প্রভৃতি কথা আর কেহ বুঝিতে পারে না। হিন্দু ভিন্ন আর কেহ এরূপ পরিষ্কার-রূপে পুনর্জ্জন্ম-তত্ত্ব বুঝিতে পারে নাই। অন্যধর্ম্মাবলম্বীরা—খ্রীষ্টান ইহুদীরা "আমাদের জন্মের সহিত আমাদের আত্মার সৃষ্টি হয়, জন্মের পূর্ব্বে তাহার কোন অস্তিত্ব ছিল না" এই কথাই বলিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে মৃত্যুর পরে শেষ-বিচারের দিন পর্য্যন্ত আত্মা দেহাবশেষের সহিত কবরে থাকিয়া, পরে এ জীবনের কর্ম্মফলে হয় অনন্ত নরক কিংবা অনন্ত স্বর্গ ভোগ করে। ইহাঁদের মতে আত্মার আদি আছে, কিন্তু অন্ত নাই। ইহাঁরা কর্ম্মফল মানেন বটে, কিন্তু কর্ম্মফলে যে জন্মান্তর হয় এবং জন্মান্তর দ্বারা যে আত্মার ক্রমোন্নতি হয়—মায়া বন্ধন যে ক্রমে শিথিল হইয়া অবশেষে আত্মার মুক্তি হয়, একথা স্বীকার করেন না। ইহুদী, খ্রীষ্টান, মুসলমান—সকলেরই এই একই কথা। কেবল হিন্দুধর্ম্ম হইতে প্রক্ষিপ্ত বৌদ্ধ-ধর্ম্মে হিন্দুর ন্যায় জন্মান্তরের কথা কতকটা পাওয়া যায়।

হিন্দু বলেন, সৃষ্টি-মধ্যে ব্রহ্ম মায়াবরণে বহুধা হইয়া অসংখ্য জীবরূপ প্রাপ্ত হন। প্রকৃতির যত আপূরণ বা উন্নতি হইতে থাকে, জৈবশক্তিরও সেই পরিমাণে ক্রমোন্নতি হইতে থাকে। বোধ হয়, প্রথমে উদ্ভিদ হইতে জৈবিক পরিণতি হয়। পরে লক্ষ লক্ষ জন্ম দ্বারা এবং প্রকৃতির পরিণতিফলে ও ক্রমোন্নতির নিয়মে এক জাতি হইতে অন্য উচ্চতর জাতিতে পরিণত হইতে হইতে জীব শেষ-পরিণাম—মানব-জন্ম গ্রহণ করে। মানবজন্ম গ্রহণ করিলে তবে জীবের সাধনার সময় উপস্থিত হয়। মানবের মধ্যেও প্রভেদ বিস্তর। একদিকে শিম্পাঞ্জি-সদৃশ নগ্নদেহ আম-মাংসভুক্ আণ্ডামানবাসী বা রেড্‌ইণ্ডিয়ান, আর অন্যদিকে শুক-নারদ, ঈশা-মুষার ন্যায় জন্মমুক্ত পুরুষ। এই অন্তর দূর করার জন্য বহু সহস্র-বার জীবকে মানব-জন্ম গ্রহণ করিতে হয় এবং প্রতি জন্মে যথা-সম্ভব জন্ম হইতে মরণ পর্য্যন্ত সাধনা করিতে হয়। এক জন্মের সংস্কার ও সাধনা পরজন্মে লইয়া গিয়া জমা দিতে হয়। এইরূপে জন্ম-জন্মান্তরের সাধনাসমষ্টি যখন পূর্ণ হইয়া আসে, তখনই জীব মায়াবরণ-মুক্ত হইয়া বাসনা-বীজ ধ্বংস করিয়া ব্রহ্মে লীন হইবার অধিকারী হয়।

এই জন্মান্তর-বাদের মূলে হিন্দুর কর্ম্মবাদ বা অদৃষ্টবাদ। চন্দ্র বাবু বলিয়াছেন,—"কর্ম্মফল অথবা যাহাকে চলিত-কথায় অদৃষ্ট বলে, তাহা অত্যাজ্য, অনন্তকাল-স্থায়ী বজ্রনিগড় নহে। এক প্রকার কর্ম্মের ফল অন্য প্রকার কর্ম্মের দ্বারা অতিক্রম করা যায়। কর্ম্মদোষে বা পুণ্যাভাবে দুরবস্থা হইলে, সে দুরবস্থা হইতে যে নিষ্কৃতি নাই, তাহা নহে। সৎকর্ম্ম করিয়া পুণ্যসঞ্চয়

করিলে অবশ্যই উত্তম অবস্থা লাভ করা যায়।" এই কর্ম্মফল ক্রমে কর্ম্মের দ্বারা ভাল করা এবং পরিণামে কর্ম্মবন্ধন ছিন্ন করাই হিন্দুর পুরুষার্থ। এই পুরুষকার-বলেই হিন্দুর সাধনা। ধ্রুব এই পূর্ণ পুরুষকারের আদর্শ-দৃষ্টান্ত। তিনি এক জন্মের সাধনাতেই ধ্রুবলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

যাহা বলা হইল, তাহাতে বুঝা যায় যে, হিন্দুর মূল কথাগুলি বেশী নহে। হিন্দু বলেন যে, জগতের মধ্যে একমাত্র নিত্য পদার্থ ব্রহ্ম, তিনিই মূল অস্তিত্ব। জগৎ তাঁহার মায়াময় বিকাশ। জীবাত্মা তাঁহারই মায়া-উপহিত চৈতন্য। মায়ায় অভিভূত জীব মায়ার কর্ত্তৃত্বেই কর্ম্ম করে। এক জন্মের কর্ম্মফল জন্মান্তরেও ভোগ করে। এইরূপে কত লক্ষ জন্ম-গ্রহণ করিয়া পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলে কখন বা উন্নত কখন বা অবনত হইতে থাকে। কিন্তু জীবাত্মার পুরুষকার আছে,—কর্ম্মফল ভাল করিবার জন্য অথবা কর্ম্মবীজ আদৌ নষ্ট করিবার জন্য তাহার চেষ্টা আছে। জন্মজন্ম দুঃখ ভোগ করিয়া সে দুঃখ নিবৃত্তি করার জন্য যখন তাহার ইচ্ছা হয়, তখনই পুরুষকার পূর্ণ মাত্রায় বিকশিত হয়, এই চেষ্টা ও ইচ্ছার জন্যই হিন্দুর সাধনা।

এ সাধনা বড় বিরাট ব্যাপার। এই অনন্তব্যাপ্ত, অনন্তকাল-স্থায়ী পুরুষ আমি এই প্রকৃতির বন্ধনে পড়িয়া ক্ষুদ্র কীটাণু হইয়া গিয়াছি—শেষে প্রকৃতির অনুগ্রহে ক্রমোন্নতির নিয়মবলে সেই কীটাণুক্রম হইতে কত লক্ষ জন্ম ভ্রমণ করিয়া মানব-জন্ম পাইয়াছি। এখন আমার পুরুষত্ব দেখাইবার অবসর হইয়াছে। এখন আমার ক্ষুদ্রত্ব ঘুচাইয়া আত্মসম্প্রসারণ করিতে করিতে, প্রকৃতির বন্ধন ক্রমে শ্লথ করিতে করিতে আবার অনন্তব্যাপ্ত হইয়া পড়িতে হইবে। এইজন্য বিরাট সাধনার প্রয়োজন। চন্দ্র বাবু বলিয়াছেন, "সে বিরাট সাধনায় কত জন্ম, কত শতাব্দী, কত যুগ অতিবাহিত হইয়া যায়, তাহার ঠিকানা নাই। হয় ত কাহারও অদৃষ্টে সৃষ্টিতে আরম্ভ হইয়া সংহারেও সে সাধনার শেষ হয় না। * * * এ জীবনের কত পূর্ব্বে সে সাধনার আরম্ভ হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই; এ জীবনের কত পরে সে সাধনা শেষ হইবে, তাহারও ইয়ত্তা নাই। অনন্ত জন্মের কথা ধর, অনন্ত কালের কথা ধর, অনন্ত পথের কথা ভাব। এ পথের পথিক হইতে হইলে আগাগোড়া এই পথের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া এই পথের ভাবনায় ভোর হইয়া এই পথের কথা সার করিয়া পথ চলিতে হইবে। এ রঙ্গ-তামাসার কাজ নয়, প্রজাপতি-পতঙ্গের মত একবার এপথের এ-পাশে, একবার এপথের ও-পাশে যাইলে চলিবে না। আগাগোড়া এই বিরাট পথের—এই বিরাট উদ্দেশ্যের কথা মনে রাখিয়া এই পথ চলিতে হইবে। জন্মে, অন্নপ্রাশনে, বিদ্যারম্ভে, বিবাহে, বিহারে, শয়নে, পানে, ভোজনে, মরণে—জীবনের প্রত্যেক কাজে এই বিরাট পথের এই বিরাট উদ্দেশ্যের কথা মনে রাখিয়া এই পথ চলিতে হইবে। এত করিলে যদি এই বিরাট পথে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইতে পারা যায়। * * এক হিন্দুধর্ম্ম ভিন্ন আর কোন ধর্ম্মে এমন বিরাট পরিণতির কথাও নাই, এমন বিরাট পথের কথাও নাই, এমন বিরাট সাধনার কথাও নাই।"

চন্দ্র বাবু আর এক স্থলে বলিয়াছেন,—"জড়ত্ব ও ব্রহ্মত্বের মধ্যে যে ব্যবধান, তাহা এক রকম অসীম বলিলেই হয়। সেই অসীম ব্যবধান বিনাশ করিতে যে সময়ের আবশ্যক, তাহাও এক রকম অসীম। যে সংযমে যে আত্মশাসন, যে সাধনা আবশ্যক, তাহাও এক রকম অসীম। যে সময় আবশ্যক, তাহাতে কত

বর্ষ, কত জন্ম, কত যুগ থাকিতে পারে, তাহা কে বলিবে? আর যে সংযম, যে আত্মশাসন, যে সাধনা আবশ্যক, তাহা যে কত কষ্টকর, কত কঠিন, কত কঠোর হইবে, তাহাই বা কে বলিবে?" * * *

চন্দ্র বাবু, এই সাধনার বিরাটত্ব অতি-সুন্দর করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন। এ স্থলে তাহা উদ্ধৃত করিতে গেলে প্রবন্ধ বড় দীর্ঘ হইয়া পড়িবে। আমরা কেবল এই সাধনার প্রণালী সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিব।

সকল লোকের আধ্যাত্মিক অবস্থা বা তাহাদের মানসিক বল সমান নহে। সুতরাং সকলের সাধনাও সমান নহে। সাধনার স্তর আছে; কেননা, মানুষের প্রকৃতির তারতম্য আছে। সাধারণতঃ মানুষের প্রকৃতিকে তিন শ্রেণীতে বিভাগ করিতে পারা যায়,—দৈবী, আসুরী ও রাক্ষসী প্রকৃতি। রাক্ষসী প্রকৃতির লোকের ধর্ম্ম-জ্ঞান আদৌ থাকে না; তাহাদের সাধনা নাই। রাক্ষস-প্রকৃতির ধর্ম্মসাধনাও অতি নিম্নশ্রেণীর। মানুষ দৈব-প্রকৃতি-সম্পন্ন না হইলে, সে সাধনার উপযুক্ত হয় না। সাধনার মূল সূত্র—চিত্ত-সংযম। দৈবী-প্রকৃতির লোক বিনা সে চিত্ত-সংযমে সমর্থ হয় না। পূর্ব্বে বলিয়াছি,—আত্মাই প্রকৃতির সহিত জড়িত হইয়া জীবত্ব প্রাপ্ত হয়। সুতরাং প্রত্যেক জীবে দুইটী পদার্থ আছে,—আত্মা ও প্রকৃতি। প্রকৃতির কার্য্য—বিকাশ ও পরিণতি। আত্মার আশ্রয় ভিন্ন সে পরিণত হইতে পারে না। এইজন্য জীবের প্রথম অবস্থায় প্রকৃতি আত্মাকে অভিভূত করিয়া লয়,—দাসের ন্যায় তাহাকে কার্য্য করায়। প্রকৃতি ও আত্মার এইরূপ সম্বন্ধের প্রথম ফল, "ইচ্ছা, বাসনা বা কার্য্য-শক্তি"। জীব ইচ্ছা বা বাসনার বলে বিকসিত হইতে চাহে—আত্মার স্ফূর্ত্তি করিতে চাহে। এই ইচ্ছা বা বাসনা-শক্তিই উদ্ভিদের জীবনী-শক্তি, জীবের প্রাণশক্তি। এক জন বড় জর্ম্মাণ দার্শনিক বুঝাইয়া দিয়াছেন,—এই ইচ্ছা-শক্তিই জড়ের আকর্ষণ-শক্তি,—যাহা নানারূপ জড়শক্তি রূপে বিকসিত হইয়া থাকে। অতএব এই 'বাসনা'-শক্তিই সমস্ত সংসারকে ধারণ করিয়া আছে,—তাহাই সংসারের বীজ।

মানুষেও সেই শক্তির প্রথম বিকাশ হয়। মন, চিত্তবৃত্তি ও অহং জ্ঞান তাহারই ক্রম-বিকাশ মাত্র। এইজন্য মানুষের প্রথম ইচ্ছা-শক্তির বিকাশ হয়। তখন তাহার সেই ক্ষুদ্র-পরিমিত ইচ্ছাশক্তির সহিত জগতের অনন্ত-ব্যাপ্ত, অনন্তরূপে প্রতিভাত ইচ্ছাশক্তির সংঘর্ষণ উপস্থিত হয়। মানুষ প্রথম জীবন-সংগ্রামে ব্যস্ত হইয়া পরে, কখন বা তাহাতে পরাজিত হয়, কখন বা জয়ী হয়। ক্রমে মানুষের ক্রম-পরিণামে, এই ইচ্ছাশক্তির ফলে, আত্মাতে জ্ঞানের বিকাশ হইলে, মানুষ এই প্রকৃতির ধর্ম্ম ইচ্ছাশক্তিকে অতিক্রম করিয়া আত্মদর্শনে চেষ্টা করে। তখন তাহার মনে সাধনাবীজ উপ্ত হয়, ধর্ম্ম বিকশিত হয়,—মানুষ দৈবপ্রকৃতি সম্পন্ন হইতে চেষ্টা করে। সুতরাং মানুষের ধর্ম্মের মূলসূত্র বাসনা-দমন। প্রকৃতির দাসত্ব দূর করিয়া, ইচ্ছার নিগড় ভঙ্গ করিয়া, তখন মানুষ আত্মার স্বাধীনতা লাভ করিতে চেষ্টা করে। অতএব এই বাসনা-দমন, এই Denial of the will মানুষের ধর্ম্ম,—ইহাই মানুষকে ইতর জীব হইতে প্রভেদ করে। ইহাতেই মানুষের মনুষ্যত্ব, মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব। ভগবান্ মনু "দশকাং ধর্ম্মলক্ষণং" বলিয়া ধৃতি, দয়া, সত্য, অক্রোধ প্রভৃতি যে দশটী ধর্ম্মলক্ষণ উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা এই বাসনা-দমন, এই ইচ্ছারোধ হইতে প্রসূত। ইহা হইতে আমাদের জ্ঞানের স্ফূর্ত্তি, পরিণতি ও আমাদের মুক্তি হয়।

কথাটা আর একদিক হইতে বুঝিতে হইবে। মানুষের বৃত্তি তিনটী,—মন, বুদ্ধি ও

অহঙ্কার। ইন্দ্রিয় তাহার মনের দ্বার। যে ইন্দ্রিয় দ্বারা আমাদের বিষয় বোধ হয়, তাহা জ্ঞানেন্দ্রিয়। যে ইন্দ্রিয় দ্বারা আমাদের কর্ম্ম প্রবৃত্তি চরিতার্থ হয়—তাহা কর্ম্মেন্দ্রিয়। আমরা জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা বিষয় উপলব্ধি করি অর্থাৎ বাহ্য জগৎ বুঝিয়া থাকি। এই বিষয় উপলব্ধি করা আমাদের মনের ধর্ম্ম। আবার এই বিষয়-উপলব্ধি হইতে বুদ্ধিতে আমাদের বিষয়ীর ধারণা হয়—"ইদং" এর সহিত "অহং" ধারণা করি। সেই ধারণার সহিত আমাদের কার্য্যশক্তির স্ফূর্ত্তি হয়। কেননা, বিষয়-বোধ হইতে—"মাত্রাস্পর্শ" হইতে আমাদের শীত-গ্রীষ্ম, সুখ-দুঃখ প্রভৃতির অনুভূতি হয়। সেই অনুভব-ফলে ইচ্ছা-প্রবৃত্তির স্ফুরণে আমাদের সুখজ বিষয়ে রাগ বা অনুরাগ আর দুঃখজ বিষয়ে দ্বেষ জন্মে। "অহং" বা আমাতে এই রাগ-দ্বেষ উপলব্ধি করি। তখন সুখজ বিষয়ে আকর্ষণ হইতে তাহা লাভের জন্য এবং দুঃখজ বিষয়ে বিরাগ বা পরিহার-প্রবৃত্তি হইতে তাহা ত্যাগের জন্য আমাদের বুদ্ধিতে কর্ম্মবৃত্তির স্ফূর্ত্তি হয়।

অতএব আমাদের এই তিন বৃত্তির ফলে জ্ঞান, চিত্ত ও কর্ম্ম বা ইচ্ছা-শক্তির স্ফূর্ত্তি হয়। বাহ্য বিষয়কে ও "আমি"কে উপলব্ধি করে—আমাদের জ্ঞানবৃত্তি। বিষয়-সংস্পর্শে আমাকে রাগ-দ্বেষাদিতে রঞ্জিত করে—আমাদের চিত্তবৃত্তি। আর সেই রঞ্জিত ভাব হইতে দুঃখানুভূতি ত্যাগ ও সুখানুভূতি লাভ করিবার জন্য আমাদিগকে নিযুক্ত করে—আমাদের কর্ম্মবৃত্তি।

এই হইল—বাসনা-বীজ হইতে আমাদের জ্ঞান, চিত্ত ও কর্ম্ম-বৃত্তির প্রথম বিকাশ ও তাহাদের প্রথম ক্রিয়া। পরে ধর্ম্মস্ফূর্ত্তি হইলে বাসনা নিয়মিত করিবার ইচ্ছা বা চেষ্টা জন্মিলে এই জ্ঞান, চিত্ত ও কর্ম্ম-বৃত্তির অন্যরূপ বিকাশ হয়। জ্ঞানে বিষয় ও বিষয়ীর উপলব্ধি হইতে—আমাদের শেষে ইচ্ছা ও কর্ম্ম-বৃত্তির উদ্ভব হয় এইজন্য বিষয় ও বিষয়ী হইতে ভিন্ন অন্য পদার্থের উপলব্ধি করিতে—তাহাই সন্ধান করিতে জ্ঞান নিযুক্ত হয়,—বিষয় ও বিষয়ীকে ত্যাগ করিতে চাহে। চিত্ত সুখ-দুঃখ-অনুভূতির ফলে কর্ম্মে রত হয় বলিয়া চিত্তে অন্যপ্রকার অনুভূতি যাহাতে হয়, তাহার চেষ্টা জন্মে; এবং কর্ম্ম-বৃত্তি হয় একেবারে দমন, না হয় নিয়মিত করিতে ইচ্ছা হয়। কথাগুলি বড় গুরুতর,—ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহা বুঝান সম্ভব নহে; তথাপি একটু বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, আমাদের প্রকৃতি আত্মাতে ইচ্ছা-শক্তির স্ফূর্ত্তি করিয়া—সেই শক্তির বলে ক্রমোন্নত হইতে থাকে। জীবে সেই ইচ্ছা-শক্তির সহিত চৈতন্য-স্ফূর্ত্তি হয়। মানুষে তাহার পূর্ণ বিকাশ হয়। এই চৈতন্যের বিকাশ হইলে মানুষ দেখিতে পায় যে, তাহার ইচ্ছা সর্ব্বত্র নিয়মিত, চারিদিকে সীমাবদ্ধ,—চারিদিকে তাহার সেই শক্তি-পরিচালনের পথে বিঘ্ন-বাধা রহিয়াছে। সেই বিঘ্ন-বাধার সহিত সংগ্রাম করিতে করিতে তাহার বুদ্ধির বিকাশ হয়। জ্ঞানেন্দ্রিয় সেই বুদ্ধি-বিকাশের সাহায্য করে। বুদ্ধিবলে তখন মানুষ সেই বিঘ্ন-বাধার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে অগ্রসর হয়। তখন মানুষ তিনটী বিষয় বুঝিতে চেষ্টা করে,—জগৎ, 'আমি' ও জীবের সহিত আমার 'সম্বন্ধ'। মানুষ তখন জগৎ-তত্ত্ব আলোচনা করে;—দেখে, জগতে কেবল জড় ও শক্তির কার্য্য আছে। মানুষ তাহার তত্ত্বানুসন্ধান করিয়া বিজ্ঞানের উন্নতি করে। আত্মতত্ত্ব আলোচনা করিয়া দর্শন-শাস্ত্রের উন্নতি করে। আর আত্মা ও জগতের সহিত সম্বন্ধ স্থির করিতে গিয়া কখন জগৎকে উড়াইয়া দেয়,—জগৎ মানুষের জ্ঞানের অবস্থাবিশেষ মাত্র

ইহাই উপলব্ধি করে। কখন আত্মাকে উড়াইয়া দিয়া "আমি" জড় ও শক্তির কোন বিশেষ-রূপ সমবায়ের ফল ইহা সিদ্ধান্ত করে।

কখন বা জগৎ ও আপনাকে সসীম বুঝিয়া তাহা হইতে অসীমের উপলব্ধি করে। তখন মানুষের জ্ঞানে ধর্ম্ম-বীজ অঙ্কুরিত হয়,—ঈশ্বর-জ্ঞান ক্রমে বিকশিত হইতে থাকে। মনে যখন প্রথম চৈতন্যবল প্রবিষ্ট হয় তখন মানুষ আপনাকে বাহ্য জগৎ দ্বারা সীমাবদ্ধ দেখে, তখন আপনাকেই সান্ত ও জগতের যত-টুকুর দ্বারা সে সীমাবদ্ধ বুঝিতে পারে, তাহাকেই অনন্ত বলিয়া উপলব্ধি করে—জড় বা জড়শক্তিকে বা তাহাদের কোন বিশেষ বিকাশকে এই অনন্ত জ্ঞানে উপাসনা করে। তাহার পরে জগতের জ্ঞান পরিবর্দ্ধিত হইলে শেষে যখন জগৎকে সান্ত ও সীমাবদ্ধ বলিয়া তাহার উপলব্ধি হয়, তখনই সে ঈশ্বর-জ্ঞানলাভে সমর্থ হয়। তখন তাহার জ্ঞানে আমি, জগৎ ও আমার ও জগতের মধ্যে সম্বন্ধ এবং ঈশ্বর ও তাঁহার সহিত আমার ও জগতের সম্বন্ধ এই পাঁচটী তত্ত্ব বুঝিবার চেষ্টা হয়।

অসম্পূর্ণ জ্ঞানে এই পাঁচটী বিষয়ের কোন একটী বা দুইটী বিষয় ধারণা হয়। এবং ইহার একটী কি দুইটী বিষয়ে জ্ঞান আকৃষ্ট হইলে তাহার পরিণামে কখন জগৎ আমার সম্প্রসারণ বলিয়া বোধ হয়, কখন আমি জগতের জড় ও শক্তির অঙ্গ বলিয়া ধারণা হয়, কখন বা ঈশ্বরই সব—তিনিই আমি বা তিনিই জগৎ এই উপলব্ধি হয়। অথবা জগৎ ও আমার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত সেই ঈশ্বর বা ব্রহ্মে ডুবাইয়া দিয়া লয়তত্ত্বে উপনীত হই।

তত্ত্বানুশীলনের এইরূপ ফল। ইহা ব্যতীত জ্ঞানের আরও উচ্চতর ক্ষমতা আছে। ধর্ম্ম-ভাব ঈশ্বরভাব তাহার মনে এরূপ অনুশীলন ব্যতীত স্বতঃ স্ফূর্ত্তি হইতে পারে। ইংরেজীতে তাহাকে Inspiration বলে। ইহাই ধর্ম্মের মূল-ভিত্তি। কেননা, যুক্তিতে, তত্ত্বানুশীলনে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়—ধর্ম্মতত্ত্ব সহজে উপলব্ধ হয় না। কিন্তু জ্ঞান সাধনার এই পথ। জ্ঞানেই ব্রহ্ম উপলব্ধি হয়—সোঽহং-জ্ঞান প্রতিভাত হয়। আর সেই জ্ঞানে আমাদের সমস্ত বৃত্তি, সমস্ত জীবন নিয়মিত করিতে পারা যায়। কেননা, এই জ্ঞানের ফলে বাসনা দমন হয়,—কর্ম্মবৃত্তি দমন বা নিয়মিত করা যায়,—ধর্ম্মসাধনা-সিদ্ধি হয়।

এই জ্ঞান—সাধনা-ফলে, বা স্বতঃসিদ্ধ-ভাবে উদয় হইলে আমরা একটা আদর্শ ধরিতে পারি; ও সেই আদর্শ ধরিয়া আমাদের সমস্ত জীবন নিয়মিত করিতে পারি। কেননা, জ্ঞানে যদি আমরা নির্গুণ ব্রহ্ম ধারণা করি, তবে আমরা নিজে কর্ম্মত্যাগ করিতে—সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিব। যদি সগুণ—বা "নির্গুণায় গুণাত্মনে" বলিয়া ব্রহ্মকে বুঝি, তবে কর্ম্মবৃত্তির সংযম শিক্ষা করিব। আর যদি ঈশ্বর ভাবে—তাঁহার অবতার-তত্ত্ব ও কর্ম্ম-তত্ত্ব উপলব্ধি করি, তবে সেই আদর্শ ধরিয়া আমরা কর্ম্মবৃত্তিকে নিয়মিত করিব। সুতরাং আমাদের জ্ঞানে ধর্ম্মের যে আদর্শ প্রতিভাত হইবে, আমরা সেই আদর্শ ধরিয়াই সম্মুখে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিব।

ইহাতে একরূপ বুঝা গেল যে, জ্ঞান সাধনার সীমা; সর্ব্বত্র—অর্থাৎ আপনাতে ও বাহ্য জগতে—সর্ব্ব ঘটে ঈশ্বরদর্শন বা ব্রহ্মদর্শন ও ব্রহ্মের আদর্শ ধরিয়া ক্রমে অগ্রসর হইতে হইতে আপনাকেই সেই ব্রহ্মে লয় করণ। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি সন্ন্যাসীদিগের এই সাধনা—এই পথ। ইহা ব্যতীত সাধনার আর দুইটী পথ আছে,—কর্ম্মপথ ও ভক্তিপথ। প্রথমে ভক্তিপথ কি তাহা বলিব। পূর্ব্বে বলিয়াছি, আমাদের কতকগুলি চিত্তবৃত্তি আছে—সুখ-

দায়ক বিষয়ে অনুরাগ ও দুঃখজ বিষয়ে বিরাগ সেই বৃত্তির মূল। এই চিত্তবৃত্তির বশে আমরা সুখ-দুঃখ, শীত-গ্রীষ্ম প্রভৃতি অনুভব করি। পূর্ব্বে বলিয়াছি, সেই অনুভবের ফল দুঃখজ-বিষয়-পরিহার ও সুখজ-বিষয়-লাভের চেষ্টা। প্রকৃতির ইচ্ছাশক্তি আমাদের এই চেষ্টা উত্তেজিত করে। পূর্ব্বে বলিয়াছি, ধর্ম্মের প্রধান সাধনা এই ইচ্ছা-বৃত্তি-দমন; সুতরাং এই ইচ্ছা-বৃত্তি-দমনের জন্য আত্মসুখ-লাভ-ইচ্ছা প্রথমে দমন করা কর্ত্তব্য। এই আত্মসুখ-লাভ-চেষ্টা পরিহার করা মনুষ্য মাত্রেরই উদ্দেশ্য। কেন, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এখানে আরও একটী কথা বলিব। যাঁহারা পরকাল মানিবেন না, কেবল ইহকাল মানেন, তাঁহারা হয়ত সুখ-লাভ-চেষ্টা দমন করা মানুষের কর্ত্তব্য মনে করিবেন না। কেহ হয়ত বলিবেন যে, যখন এই ইচ্ছা-শক্তিই জীবোন্নতির চরম কারণ, এই আত্মসুখ-চেষ্টা—আত্মস্ফূর্ত্তি-চেষ্টাই তাহার মূল-মন্ত্র—তখন ইহা ত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে। কথাটা যে সত্য, তাহা অবশ্যস্বীকার্য্য; কিন্তু জীবোন্নতিই একমাত্র লক্ষ্য বা কর্ত্তব্য বা জগতের নিয়ম বলা যায় না। ঐ ক্রমোন্নতির একটা সীমা আছে। পূর্ব্বে বলিয়াছি, জীব জন্ম-জন্মান্তর উন্নত হইয়া শেষ মানুষজন্ম লাভ করে; ইহাই হিন্দু-শাস্ত্রের স্থির সিদ্ধান্ত। মানুষ এই জীবোন্নতির শেষ সীমা। তাহার পর আর জীবোন্নতি হয় না। তখন মানুষের শক্তি অন্য পথে। তখন সৃষ্টি ছাড়াইয়া মানুষ লয়ের পথে যায়, 'আত্মাকে প্রকৃতি হইতে সরাইয়া লইতে চেষ্টা করে। আত্মাকে স্বাধীন করিতে—ইচ্ছার নিগড় হইতে মুক্ত করিতে চেষ্টা করে।

ইহা ছাড়া আরও এক কথা আছে। মানুষ জ্ঞানলাভ করিলে বুঝিতে পারে যে, তাহার সুখ সীমাবদ্ধ। সুখ দুঃখের সহিত নিত্যসম্বদ্ধ। সুতরাং সে সুখ লাভ করিতে যাইলে, কখন দুঃখের অধিকার অতিক্রম করিতে পারিবে না। সুখলাভের পরিবর্ত্তে দুঃখনিবৃত্তি-চেষ্টাই মানুষের সেই জন্য প্রথম কর্ত্তব্য। ভগবান্ কপিল দেখাইয়াছেন যে, এই প্রকৃতি পরিহার—এই ইচ্ছা-প্রবৃত্তির দমন—এই সুখ-ভোগের বাসনা-ত্যাগই তাহার এক মাত্র উপায়। তাহার জন্য আত্ম-জ্ঞান আবশ্যক। প্রকৃতির গুণ-বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার জন্য কঠোর সাধনা আবশ্যক। সুতরাং আমরা যে দিক্ দিয়াই যাই, আমাদের বাসনা দমন করা—সুখলাভ-কামনা দূর করা—ভোগ লালসা পরিহার করা আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য। এই কথা যেমন অনেক তর্ক ও যুক্তি দ্বারা শেষে আমাদের মনে প্রতিভাত হয়; তেমনি জ্ঞানের স্বাভাবিক স্ব-ধর্ম্ম হইতে—মানুষের মনুষ্যত্ব হইতে—কেবল স্বতঃসিদ্ধভাবে—Inspiration যোগে এ তত্ত্ব আপনা-আপনিই যুক্তি তর্কে তাহা নির্দ্ধারণ করিবার পূর্ব্বেই প্রতিভাত হয়। এবং সেই জন্য ইহা আমাদের মনকে, চিত্তকে, কর্ম্ম-বৃত্তিকে অজ্ঞাতসারে রঞ্জিত করে। আপনা-আপনিই আমাদের মনে ঊর্দ্ধস্রোতোবৃত্তি বা নিরোধশক্তি উৎপন্ন করে—আমাদের আত্মার ধর্ম্মস্ফুরণে সহায়তা করে।

এখন এ সম্বন্ধে আর এক কথা বলিব। প্রকৃতির বশে ইচ্ছা-বৃত্তির বলে অবশ্য আমাদের মনে সুখেচ্ছা জন্মে। কিন্তু সুখ দুঃখ অনুভব করে আত্মা। অবশ্য প্রকৃতির সহিত সম্পর্ক থাকাতেই আত্মার এরূপ অনুভূতি হয়। কিন্তু জীব-আত্মা একেবারে নির্গুণ হইলে—আত্মার কোন অনুভব থাকিলে—প্রকৃতি তাহাকে কখন এরূপে রঞ্জিত করিতে পারিত না। এখন দেখিতে হইবে, সে আত্মার অনুভব কি? অধিক সূচনা না করিয়া একেবারেই বলিতে পারি, 'আনন্দ' অনুভব আত্মার স্বাভাবিক ধর্ম্ম। আত্মা সচ্চিদানন্দ। আত্মার 'চিৎ' বা জ্ঞান অনুভব করা স্বাভাবিক ধর্ম্ম। আবার 'সৎ' বা বিকাশভাব ও সেই হেতু কার্য্য স্বভাব আত্মার স্বাভাবিক ধর্ম্ম। সেইরূপ 'আনন্দ' অনুভব বৃত্তিও আত্মার স্বাভাবিক ধর্ম্ম। জ্ঞান-বৃত্তির বিকাশের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। কর্ম্ম-বৃত্তির কথা পরে বলিব। এখন আনন্দ-বৃত্তির কথা বলা যাউক। 'আনন্দ' নির্ম্মল। তাহার প্রকৃতির সহিত সম্বন্ধ হইতে আত্মাতে জন্মে না। প্রকৃতির সহিত সম্বন্ধের ফলে সেই আনন্দ-বৃত্তি সেই delight বিকৃত হইয়া সুখ-অনুভব-বৃত্তি জন্মে। আর প্রকৃতি সেই বৃত্তিকে বাধা দিলে, তাহার চরিতার্থ করণ পক্ষে অন্তরায় হইলে আমাদের আত্মা দুঃখানুভব করে। সুতরাং যদি আমরা সুখভোগ-বাসনা ত্যাগ করি—ইচ্ছা দমন করি, তাহাতে কেবল আত্মার এই আনন্দ স্বভাবে যে মলিনতা ছিল, তাহাই দূর করিব। যে আনন্দ-সূর্য্য বাসনা মেঘে ঢাকা পড়িয়া সুখানুভব-রূপ অস্পষ্ট তীব্র অলোক পাইতেছিলাম, সেই আবরণ দূর করিয়া দিব মাত্র। এই আনন্দ অনুভবের প্রথম ও গৌণ-ফল সৌন্দর্য্যানুভূতি। এই সৌন্দর্য্যানুভূতি হইতে কাব্য সঙ্গীত চিত্রবিদ্যা প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। ইহাই সুকুমার বিদ্যার জননী, চিত্তানুরঞ্জিনী বৃত্তির মূল। বলিয়াছি—ইহা সৌন্দর্য্যানুভূতির গৌণ ফল, তাহার মুখ্যফল ঈশ্বরে ভক্তি।

আর এক দিক্ দিয়াও আমরা এই ভক্তি-তত্ত্বে উপনীত হইতে পারি। কিন্তু তাহা জ্ঞান-সাপেক্ষ। এ পথে যেমন ঈশ্বরকে পরম সুন্দর দেখিয়া সেই সৌন্দর্য্য-ময়ের সৌন্দর্য্যে তদধিষ্ঠিত জগৎকে দেখিয়া আপনা-হারা হইয়া সেই সৌন্দর্য্যে বিভোর হইয়া যাই, সর্ব্বত্র লীলানন্দ পান করি—অন্য পথে সেরূপে যাওয়া যায় না। বলিয়াছি ত জ্ঞানবলে আমরা সর্ব্বভূতে ঈশ্বর

উপলব্ধি করিতে পারি। সেই উপলব্ধির পূর্ব্বেও আত্মার ধর্ম্মবলে অজ্ঞাতে আমাদের মনে সর্ব্বভূতের উপর সহানুভূতির উদ্রেক হয়। সেই জন্য অতিবড় নাস্তিকও পরহিতব্রত গ্রহণ করিয়া থাকে। বুদ্ধি ও যুক্তিতে আত্মসুখ-সাধন, তাহার নিকট শ্রেষ্ঠ সাধন বলিয়া অনুমিত হইলেও সে অজ্ঞাতসারে আত্মসুখ বিসর্জ্জন দিয়া পরের সুখ অনুসন্ধান করে। বলিয়াছি ত—আত্মসুখ-চেষ্টা প্রকৃতির ধর্ম্ম হইলেও—সেই সুখচেষ্টা আত্মার ধর্ম্ম নহে। সেই জন্য যেখানে আত্মার উন্নতি হইয়াছে—কোন না কোন প্রকারে প্রকৃতির নিগড় কতক পরিমাণে শ্লথ করিতে পারিয়াছে, সে আর আত্মসুখ-চেষ্টায় ব্যস্ত থাকে না। প্রথমে সে জীবে দয়া করিতে শিখে, প্রীতি করিতে শিখে; ভক্তির পাত্রকে ভক্তি করিতে শিখে। সর্ব্বভূতের প্রতি তাহার আকর্ষণ জন্মে, অনুরাগ উৎপন্ন হয়। মৈত্রীভাব তাহার মনে স্বতঃ উদিত হয়। কিন্তু ইহা প্রকৃত ইচ্ছা দমন—বা Denial of the will নহে, ইহা ইচ্ছার সম্প্রসারণ মাত্র। মনে কর, আমি পেটুক, পেটের পীড়া হইয়াছে বলিয়া প্রাণ ভরিয়া খাইতে পাই না, তখন আমি অন্যকে খাওয়াইয়া তৃপ্ত হই। ডাক্তারের পরামর্শে মাতাল মদ খাইতে পায় না—সে অন্যকে—পাঁচ জন বন্ধুবান্ধবকে মদ খাওয়াইয়া সুখী হয়। আমি সেইরূপ আত্ম-সুখভোগ করিতে পাই না—বা ভোগ করার প্রয়োজন মনে করি না, তখন অন্যে যাহাতে সুখ ভোগ করে, তাহার চেষ্টা করিব। তথাপি যদি এই প্রবৃত্তি অধিক সম্প্রসারিত হয়, তাহা হইলে আমরা সাধনার পথে অনেকটা অগ্রসর হইতে পারি। চন্দ্রনাথ বাবু বলিয়াছেন, "দয়া প্রভৃতি হৃদয়ের ভাব গুলি প্রবল হইলে জ্ঞান বা বুদ্ধি একরূপ বিলুপ্ত হয়। অতএব তখন কামনা করিবার অবসর থাকে না। তখন আত্মকর্ত্তৃত্ব জ্ঞান পর্য্যন্ত থাকে না।

কিন্তু দয়া প্রভৃতিকে নিষ্কাম ধর্ম্মের ভিত্তি করা নিরাপদ নহে।"

কিন্তু এই মৈত্রীভাবের সহিত যখন আমরা সর্ব্বভূতে ঈশ্বর দর্শন করি—ঈশ্বরে তন্ময় হইয়া যাই, তখন জীবে ঈশ্বরে ভেদ করিতে পারি না; তখন সেই মৈত্রী-ভাব ভক্তিতে পরিণত হয়। সর্ব্ব-সুন্দরকে সর্ব্বভূতে দর্শন করিয়া আনন্দে বিভোর হইয়া যাই—চিত্ত প্রসন্ন হয়। তখন সর্ব্বভূতে সমদর্শন করি। 'সম লোষ্টাশ্ম কাঞ্চনঃ'; হই। ভক্তির সাধনার চরমাবস্থা লাভ করিতে পারি।

এখন নিষ্কাম কর্ম্ম সাধন সম্বন্ধে দুই এক কথা মাত্র বলিব। পূর্ব্বে বলিয়াছি, কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা আমরা কর্ম্মে নিয়োজিত হই। মন আমাদের কর্ম্মেন্দ্রিয়-বৃত্তির চালক, সুখজ-বিষয়-লাভ ও দুঃখজ-বিষয়-পরিহার-চেষ্টা আমাদিগকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করায়। ইচ্ছা-বৃত্তিই তাহার মূল। যখন এই ইচ্ছা-বৃত্তি-সংযমই আমাদের শ্রেষ্ঠ সাধন, তখন আমাদের কর্ম্মবৃত্তি নিয়মিত করাই প্রধানতঃ কর্ত্তব্য। বলিয়াছি ত এই কর্ম্ম-প্রবৃত্তির মূল স্বার্থ। স্বার্থ-সাধন জন্য আমরা কর্ম্মে নিয়মিত হই। কর্ম্মবৃত্তি একেবারে দমন করা সহজ বা সম্ভব নহে। এই জন্য স্বার্থ-সাধনের পরিবর্ত্তে আমরা পরার্থ-সাধন জন্য প্রথম কর্ম্ম করিব। সেই প্রথম সাধনা। প্রথমে দয়া, প্রীতি, প্রেম, ভক্তি প্রভৃতি বৃত্তি প্রণোদিত হইয়া আমরা এই পরার্থ-সাধনে প্রবৃত্ত হই। পূর্ব্বে বলিয়াছি, ইচ্ছা-নিরোধ মানুষের এক মাত্র ধর্ম্ম। তাহা হইতেই ইতর জীব হইতে মানুষের পার্থক্য হইয়াছে, এই ধর্ম্ম আমাদের মনে অজ্ঞাতসারে কার্য্য করে। কখন কখন অনিয়মিত হইয়া প্রমাদ বশে ভ্রান্ত যুক্তি বা অজ্ঞানবলে আমাদিগকে কেবল স্বার্থ-সাধন করিতে ও সেই জন্যই কেবল কার্য্য করিতে উপদেশ দেয়। কিন্তু অজ্ঞাতসারে ঐ ধর্ম্ম-বৃত্তি আমাদের সে কুপথ—কু-কার্য্য হইতে ফিরাইয়া আনে। কোথা হইতে, আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিবেক আসিয়া আমাদিগকে জোর করিয়া অন্যপথে লইয়া যাইতে চাহে। এই জন্য আমরা নিজ স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়াও প্রীতি, দয়া, মৈত্রী, করুণা প্রভৃতি সদ্‌বৃত্তির বশীভূত হইয়া পরের জন্য কার্য্য করিতে যাই। ইতিপূর্ব্বে এ সম্বন্ধে চন্দ্রবাবুর কথা উদ্ধৃত করিয়াছি। তাঁহার উল্লিখিত আত্ম-সম্প্রসারণের কথা বুঝাইয়াছি।

যাহা হউক, ধর্ম্ম-বলে আমরা এ পথে আরও অগ্রসর হইতে পারি। পূর্ব্বে যে পরার্থ কর্ম্ম করা বলিলাম,—তাহা আত্মার সম্প্রসারণ মাত্র। সে সকল কার্য্যমূলেও স্বার্থ আছে। তবে যেখানে 'কামনা' লুপ্তপ্রায়, সেখানে তাহার ভোগ থাকে না। কেননা, ক্ষুদ্র অথচ গভীর পাত্রের জল, বিস্তীর্ণ পাত্রে রাখিলে তাহার গভীরতা বড় হ্রাস হইয়া যায়। তবে যখন আমরা সর্ব্বভূতে ঈশ্বর দর্শন করি, মৈত্রী, করুণা, দয়া সম্প্রসারিত হইয়া ভক্তিতে পরিণত হয়, তখন জীবের জন্য কর্ম্ম করা আর ঈশ্বরার্থে কর্ম্ম করা আমাদের কাছে সমান হইয়া পড়ে। ঈশ্বরপ্রেমে যখন বিভোর হইয়া—ঈশ্বরে তন্ময় হইয়া যাইতে পারি, তখন 'ভগবান্ সর্ব্বভূতে আছেন' ভাবিয়া সর্ব্বভূতের কার্য্য করিয়া সর্ব্বভূতকে তুষ্ট করিতে গিয়া আমরা ঈশ্বরের কার্য্য করি, ঈশ্বরকেই তুষ্ট করি, এইরূপ ভাবি। চন্দ্রবাবু বলিয়াছেন "প্রেমিকের কার্য্য প্রেম-পাত্রের পরিতোষ, আর কিছু নহে। যে প্রেমিক হইয়াছে, সে ত মরিয়াছে। আত্মহারা হইয়াছে; তাহার সব ভগবান্। ভগবান্‌কে ভাল বাসিয়া কার্য্য নিষ্কাম বই সকাম হয় না।" আরও এক কথা আছে। যখন সর্ব্বভূতে ঈশ্বরদর্শন না হয়, তখন আমাদের হৃদয়ের সদ্‌বৃত্তির পূর্ণ চরিতার্থতা হয় না। হৃদয়ের সদ্ভাব অনেক; ও সদ্ভাবের পাত্রও অনেক। এই অসম্পূর্ণতা ও বিভিন্নমুখতা দূরীকরণ জন্য ঈশ্বর ও ভক্তির প্রয়োজন। সকল সদ্ভাবের পাত্র ঈশ্বরে সমষ্টীকৃত হয়, সকল সদ্ভাববৃত্তি এক ভক্তিতেই পরিণত হয়।

এ স্থলে নিষ্কাম কর্ম্ম সম্বন্ধে আর একটী কথা বলিব। নিষ্কাম কর্ম্মের মূল—সগুণ ঈশ্বর—নির্গুণ ব্রহ্ম নহেন। যিনি ব্রহ্ম সাধন করেন, নির্গুণ ব্রহ্ম আদর্শ করিয়া তাঁহার দিকে অগ্রসর হন—নিষ্কাম কর্ম্ম, তাঁহার সাধনার সহায় হইতে পারে; কিন্তু তাহা তাঁহার সাধনের প্রধান অঙ্গ নহে;—বরং অনেক সময় তাঁহার সাধনের অন্তরায়। ব্রহ্ম কর্ম্মহীন। সুতরাং ব্রহ্মে লীন হইতে হইলে নিষ্কামই হউক, আর সকামই হউক, কোন কর্ম্ম করা তাঁহার চলে না। তাহাকে কর্ম্মত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইতে হয়। এ কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। যাঁহারা সগুণ ঈশ্বরের উপাসনা করেন,—তাঁহাদের পক্ষেই নিষ্কাম কর্ম্ম সম্ভব, তাঁহাদের পক্ষেই ভক্তি সম্ভব। ঈশ্বর স্রষ্টা, বিধাতা; তিনি জগৎ ধারণ করেন, রক্ষা করেন—জীব মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া তাহাকে চালিত করেন। যে ঈশ্বর মানে, সে জগৎ মানে, সে জীব মানে—সে দ্বৈতবাদী। সে ঈশ্বরের অবতার মানে, ঈশ্বরের অবতারের কর্ম্ম মানে, ঈশ্বর অবতীর্ণ হইয়া ধর্ম্ম রক্ষা করেন, অধর্ম্ম নষ্ট করেন, তাহা মানে। সুতরাং সে নিজে নিষ্কাম হইয়া নিঃস্বার্থ ভাবে জগতের বা পরের ধর্ম্ম রক্ষার জন্য অবতারকে আদর্শ করিয়া কর্ম্ম করিতে পারে। ঈশ্বরকে কর্ম্মফল সমর্পণ করিয়া ঈশ্বরার্থে জগতের জন্য লোক-সংগ্রহ-নিমিত্ত কর্ম্ম করিতে পারে। অতএব নিষ্কাম ধর্ম্মের মূলে ঈশ্বরবাদ আছে। কিন্তু সে কথা, এ স্থলে বিশদ করিয়া বুঝান যায় না। পাঠকগণ, চন্দ্রবাবুর নিষ্কাম ধর্ম্ম-প্রবন্ধ পড়িয়া লইবেন। নিষ্কাম ধর্ম্মের তত্ত্ব অতি গূঢ়। ভগবান্ স্বয়ং তাহা গীতায় প্রথম বুঝাইয়াছেন। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে সে ধর্ম্ম স্থান পায় নাই,—বোধ হয় কোন সম্প্রদায় তাহা বুঝেন নাই ও অবলম্বন করেন নাই। নিষ্কাম-ধর্ম্ম-ভিত্তি সরাইয়া লইলে ভক্তিধর্ম্ম-ভিত্তি হীন হয়। সেই জন্য শ্রীচৈতন্যের এমন ধর্ম্ম সম্প্রদায় ভ্রষ্টভঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে,—বৈষ্ণব-ধর্ম্ম হীনপ্রভ হইয়াছে। কিন্তু সে কথাও এখানে বলিবার নহে। এখানে বলিয়া রাখা উচিত যে, এতকাল পরে এই নিষ্কাম ধর্ম্ম-তত্ত্ব কতকটা আধুনিক শ্রেষ্ঠ জর্ম্মাণ পণ্ডিতগণ বুঝিতে পারিয়াছেন। ক্যাণ্ট, ফিক্তে, মপেনহর ও অধুনা পল ডুমেন তাহা বুঝাইতেছেন, ইউরোপের সৌভাগ্য বলিতে হইবে।

আমরা জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি এই ত্রিবিধ সাধনের কথা বলিলাম। এখন জ্ঞান সম্বন্ধে আরও দুই এক কথা বলিতে হইবে। জ্ঞানের চরম সিদ্ধান্ত ব্রহ্ম। জ্ঞানের চরম উদ্দেশ্য—ব্রহ্মে লয়। ব্রহ্মই সব, আমিই ব্রহ্ম, এ জগৎ কিছু নহে কেবল মায়া, 'আমি' জ্ঞানের অধ্যাস মাত্র—কেবল এই কথা পড়িয়া শুনিয়া বা দুই দশবার আলোচনা করিলেই এ সাধনা সিদ্ধ হয়। এই সাধনাই সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন, কষ্ট-সাধ্য। "অব্যক্তা হি গতির্দুঃখম্" ইহা অনেকেই জানেন। সুতরাং ব্রহ্মে লয় সাধনা করিতে হইলে কি প্রয়োজন, তাহা জানিতে হইবে। অতি বড় অদ্বৈতবাদীও জগৎকে একেবারে অসৎ বলেন নাই—ইহাকে তাঁহারা সদসদাত্মক বলিয়াছেন। তাঁহারা জগতের অস্তিত্ব একেবারে অস্বীকার করেন না, জীবের অস্তিত্বও একেবারে অস্বীকার করেন না। তবে জ্ঞান সাধন-অদ্বৈতবাদীদের, ভক্তি ও কর্ম্ম সাধন দ্বৈতবাদীদের। তথাপি জ্ঞান-বাদিগণ জীব ও জগৎ একেবারে উড়াইয়া দিয়া সোঽহং উপলব্ধি করেন না। 'অহং' ও 'ইদং' এই দুই ভাব চির সহচর। জ্ঞানের উপরে না উঠিলে এই

দুই ভাব অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মে লীন হওয়া যায় না।

এই জন্য যোগের প্রয়োজন। "যোগ হিন্দুদের, বিশেষতঃ অদ্বৈতবাদীদের ও জ্ঞানীদের প্রধান সাধনা। যোগ বুঝাইতে হইলে অনেক কথার অবতারণা করিতে হয়। তাহা এ স্থলে সম্ভব নহে। 'যোগ' পাশ্চাত্য পণ্ডিত বুঝেন না। শিক্ষিত বাঙ্গালী বুঝিতেন না। এখন তবু থিয়জফির প্রসাদে অনেকে বুঝিতেছেন। বিলাতেও সিপারি চুয়ানিজম্ তত্ত্ব অনুশীলিত হইয়া তাহার কতকটা আভাস লোকে পাইতেছে। আমি যোগ সম্বন্ধে, আমার যতদূর ক্ষুদ্র বুদ্ধি, তদনুসারে কিছু আভাস দিব।

বিজ্ঞান বাহ্য-জগৎ-তত্ত্ব অনুশীলন করেন। জগতে জানিবার জিনিস দুইটী,—জড় বা পরমাণু শক্তি। বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত আর মানব এবং মনের একটা ধর্ম্ম বা স্বতঃসিদ্ধ ভাবিবার বিষয় এই যে, জড় ছাড়া শক্তি থাকে না—আর শক্তি ছাড়া জড় থাকে না। একটী আর একটীর অঙ্গ। ইহার মধ্যে জড় তত্ত্ব আলোচনা করিয়া জগতে সাতষট্টি প্রকার মূল পদার্থ রসায়ন শাস্ত্র আবিষ্কার করিয়াছে। রাসায়নিক পণ্ডিতগণ সেই মূলপদার্থগুলির ধর্ম্ম আলোচনা করিয়া বলেন যে, এ গুলি সবই এক রূপ মূল পদার্থের বিকাশ মাত্র। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতের বিশ্লেষণ-ক্ষমতা অধিক নাই বলিয়া আজিও তাহা বিশ্লেষিত হয় নাই। এইরূপে শক্তিতত্ত্ব আলোচনা করিতে করিতে বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত জগতে একমাত্র মূলশক্তি বা গতিপ্রণালী আবিষ্কার করিয়াছেন। সুতরাং জগতের মধ্যে বিশ্লেষণ ও অকাট্য-যুক্তি-বলে বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত দুইটী মাত্র মূল পদার্থ পাইয়াছেন—জড়াণু ও শক্তি। তাহার পর বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত এই দুইটীকে একীকরণ করিতে চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহারা জড়াণুকে শক্তিকেন্দ্র মাত্র বলিতে চাহেন। অন্যরূপ যুক্তিবলেও সেই কথা সিদ্ধান্ত করা যায়। এখানে তাহার একটু আভাষ দিব। জড় যে শক্তি ছাড়া থাকে না ও শক্তি যে জড় ছাড়া বিকাশ পাইতে পারে না, বিজ্ঞানের এই ধারণা ভ্রান্তিমূলক। দূরস্থিত সূর্য্যে তারকা ও নীহারিকা হইতে তাপ, তড়িৎ, আলোকও শক্তি অনন্ত স্থান অতিক্রম করিয়া সংক্রামিত হয়। পূর্ব্বোক্ত ধারণা হইতে একরূপ অতি সূক্ষ্ম ইথর নামক জড়ের কল্পনা করিয়া তাহাকেই উক্ত শক্তির পরিচালক সিদ্ধান্ত করা হয়। এই কল্পনা, ভ্রান্তি-মূলক। ইহা প্রমাণ করা যায় যে, শক্তি জড় ছাড়া থাকে, জড় শক্তিরই একরূপ বিকাশ মাত্র। কথাটা বড় নূতন। সুতরাং এস্থলে তাহার আলোচনা সম্ভব নহে।

এই শক্তি ছাড়া উদ্ভিদ্ ও জীব-জগতে আর একরূপ শক্তির বিকাশ দেখা যায়, তাহা জৈব-শক্তি। বিজ্ঞান সে শক্তি আজিও বুঝিতে পারেন নাই। কিন্তু সে শক্তি স্বীকার না করিলেও চলে না। জীব-জগতে এই শক্তি নানারূপে বিকশিত হয়। ইহা প্রাণশক্তি ইচ্ছাশক্তি, চিন্তাশক্তি, মনঃ-শক্তি ও জ্ঞান-শক্তিরূপে নানা প্রকারে বিকাশিত হয়। সকল শক্তিই প্রকৃতিজ। সকলই এক শক্তির বিভিন্ন বিকাশ। তাহা বুঝিতে হইলে প্রকৃতি-তত্ত্ব বুঝিতে হয়।

জড়-জগতে শক্তিসমষ্টি এক। তাহার হ্রাস বৃদ্ধি নাই। আজ একাধারে যে শক্তির বিকাশ হইল—কিছু পরে অন্য আধারেও তাহা বিকশিত হইবে। এই মাত্র কলিকাতায় যে তাড়িত-যন্ত্রে তাড়িত-শক্তির বিকাশ হইল, তৎপর মুহূর্ত্তে আমেরিকায় গিয়া অন্য তাড়িতাধারে বিকশিত হইবে। আজ যে তড়িৎ-শক্তি হারিসন্ রোডে উজ্জ্বল আলোকরূপে ব্যক্ত, এখনই তাহা দিল্লীতে ঐ রূপ আলোকরূপে ব্যক্ত হইতে পারে। এ শক্তির গতিও অতি দ্রুত। বোধ হয় কালধর্ম্মের অধীন নহে। তবে যে জড়ের ভিতর দিয়া তাহা চালিত হয়, তাহার বাধা জন্য উহার পরিমাণ করা যায়।

এইরূপ জীবশক্তির নিয়ম। ইচ্ছা-শক্তি আমাতে আবির্ভূত হইয়া তোমাতে বা অন্য দশ জনে সংক্রামিত হয়। কেহ কেহ বড় অধিক পরিমাণে এই শক্তির আধার, তাঁহারা মহাপুরুষ। সামান্য অঙ্গুলি হেলনে তাঁহারা জগৎকে বশীভূত করিতে পারেন—নিজ ইচ্ছায় চালিত করেন। শ্রীচৈতন্য তাঁহার ধর্ম্মশক্তি কত লোককে অবহেলে সংক্রামিত করিয়াছিলেন। নেপোলিয়ান বোনাপার্টি অবহেলে তাঁহার কার্য্য-শক্তি অন্যতে সংক্রামিত করিতেন। শঙ্করাচার্য্য কত সহজে সমস্ত ভারতে তাঁহার এক জ্ঞান সংক্রামিত করেন।

এইরূপ চিন্তাশক্তিও এক জন হইতে অন্য জনে সংক্রামিত হয়। এক জনের চিন্তা অন্য জনে জানিতে পারে। এই কারণ হইতে thought reading, devination প্রভৃতি কত শক্তির বিকাশ দেখা যায়।

ইহার কারণ কি? পূর্ব্বে বলিয়াছি, এই সব শক্তি এক। যেমন জড়-শক্তি এক-আধার হইতে অন্য আধারে সংক্রামিত হয়, এ শক্তিও সেইরূপ সংক্রামিত হইতে পারে। যেমন অপরিচালক non-conductor পদার্থে তাড়িতের গতি বাধা প্রাপ্ত হয়, তেমনি যে আধারে ঐ সব জীব-শক্তির বিকাশ হয়, তাহা অপরিচালক হইলে এই শক্তি-সংক্রমণ সম্ভব হয় না।

হিন্দু বুঝেন যে, এ জগতে সমষ্টি মনঃ-শক্তি—বিষ্ণু; সমষ্টি কর্ম্মশক্তি—ব্রহ্মা; সমষ্টি জ্ঞানশক্তি বা বুদ্ধিশক্তি—হিরণ্যগর্ভ।

ব্রহ্ম হইতে যখন জগতের বিকাশ হয়, তখন প্রথম ব্রহ্মের বিকাশ হয়—হিরণ্যগর্ভ-রূপে। দ্বিতীয় বিকাশ ব্রহ্মা ও তৃতীয় বিকাশ বিষ্ণু। সুতরাং ব্রহ্মে লীন হইবার পূর্ব্বে আমাদের সাধনার দ্বারা প্রথমে বিষ্ণুতে লীন হইতে হইবে। পরে হিরণ্যগর্ভে লীন হইতে হইবে। যোগের প্রথম সোপান চিত্তবৃত্তি-নিরোধ করিয়া মনস্তত্ত্বে লীন হওয়া। দ্বিতীয় সোপান হিরণ্যগর্ভে বা বুদ্ধিতত্ত্বে ও অহঙ্কার-তত্ত্বে লীন হওয়া। তাহা অতিক্রম করিতে পারিলে তবে ব্রহ্মে লীন হওয়া যায়।

এই জন্য যোগ-সাধনার আনুষঙ্গিক আমাদের কতকগুলি শক্তির স্ফূর্ত্তি হয়। মনস্তত্ত্বে লীন হইলে কে কোথায় কি ভাবনা করে, বুঝিতে পরি। বিরাটে লীন হইলে জগতের কোথায় কিরূপে জড় ও শক্তির ক্রিয়া হইতেছে, তাহা বুঝিতে পারি। হিরণ্যগর্ভে লীন হইয়া সকলের বুদ্ধি আমার বুদ্ধির আয়ত্তাধীন হয়। এই পর্য্যন্ত সবিকল্প সমাধি। ইহার ফল ভগবান্ পতঞ্জলির যোগসূত্রে তৃতীয় অধ্যায়ে উল্লিখিত আছে। শেষ নির্ব্বিকল্প সমাধি অবস্থায় ব্রহ্মে লীন হওয়া যায়।

এই জন্যই বলিতেছিলাম, জ্ঞান-সাধনা অতি বিরাট্ ব্যাপার। এ বিরাট্ ব্যাপার কেবল হিন্দুই বুঝিতেন। ভক্তি ও কর্ম্ম সাধনা অপেক্ষাকৃত সহজ হইলেও সে দুই এক জন্মে সিদ্ধ হয় না। যাহা হউক, 'হিন্দুর' বিরাট সাধনা ব্যাপার বুঝাইতে গিয়া অনেক কথা বলিয়াছি। সুতরাং প্রবন্ধ বড় দীর্ঘ হইয়া পড়িল—অথচ কোন কথাই বুঝান হইল না।

উপসংহারে বলি যে, বাবু চন্দ্রনাথ বসু-কৃত 'হিন্দুত্বে' এই নয় তত্ত্ব বুঝান আছে। তাহা অবলম্বন করিয়া আমরা অনেক কথাই বলিয়াছি। ইহা ছাড়া 'হিন্দুত্বে' হিন্দু ধর্ম্মের অনেক মূল-তত্ত্ব অতি সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী করিয়া বুঝান আছে। ইচ্ছা ছিল, এ প্রবন্ধে তাহার কতক আভাষ দিব। কিন্তু আর স্থান নাই। আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায় যদি হিন্দুত্বের প্রকৃত লক্ষণ বুঝিতে চান, হিন্দুর বিরাট্,

Cosmically constituted মন বুঝিতে চান, তবে তাঁহাদের 'হিন্দুত্ব' পড়িতেই হইবে। ইহার সংক্ষেপ সমালোচনায় কোন ফল নাই। *

শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু।

তসর-গুটী ও রেশম।

বিগত অগ্রহায়ণ ১২শ সংখ্যক জন্মভূমি পত্রিকায় ধীমান্ পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত বাবু ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় গবেষণাপূর্ব্বক "এড়ি রেশমোৎপত্তি বিবরক" চাষ-আদি সম্বন্ধে যে একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি। বিষয়টী বড়ই সারগর্ভ; তাঁহার উপদেশানুসারে সর্ব্বত্র এড়ির চাষ হয়, ইহা সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়। পাঠকগণকে আর একটী লাভকর কৃষিতত্ত্ব জানাইতে ইচ্ছুক হইয়া আমি এই প্রবন্ধের অবতারণা করিলাম।

জাহানাবাদ বদনগঞ্জের নিকটস্থ বা দূরবর্ত্তী জঙ্গলে অর্থাৎ মধ্যরাঢ় ও কলিঙ্গাদি প্রদেশে একপ্রকার তসর-কীট হইতে তসর-গুটী উৎপন্ন হয়, তাহার রেশমে অতি উত্তম বস্ত্রাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে।

যখন ইউরোপে, বিশেষতঃ ফ্রান্সে তসর-গুটী ও তসর-সূতার বিশেষ প্রয়োজন হয়, আর মান্দ্রাজ-গবর্ণমেণ্ট সাধারণের গোচরার্থে রেবিনিউ বোর্ডের প্রতি উহার সবিশেষ বৃত্তান্ত লিখিয়া প্রকাশ করিতে কালেক্টর সাহেবদিগের প্রতি অনুমতি প্রদান করেন, সেই কালে আমাদিগের জাহানাবাদ মহকুমার ভূতপূর্ব্ব ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু সূর্য্যকুমার সেন মহোদয় উহার আমূল বৃত্তান্ত অবগত লিখিতে বলেন, আমি তদনুসারে ১৮৮১ খৃঃ অব্দের জানুয়ারি মাসে উহার আদ্যোপান্ত বিষয় বিখ্যাত সোমপ্রকাশ ও বর্দ্ধমান-সঞ্জীবনী পত্রিকায় যাহা কিছু লিখিয়া প্রকাশ করি তাহা পাঠ করিয়া হুগলীর ভূতপূর্ব্ব কালেক্টর শ্রীযুক্ত মিঃ কর্ণিস সাহেব ও অন্যান্য বিজ্ঞবর সাহেব মহোদয়গণ সন্তুষ্ট হইয়া কেহ বা কেহবা সার্টিফিকেট দান করিয়াছিলেন। এক্ষণে সেই তত্ত্ব সম্বন্ধে পুনর্ব্বার কিছু লিখিতেছি।

১। পরম কারুণিক, পরম-পিতা পরমেশ্বরের বিচিত্র কৌশলে শলভ-জাতীয় প্রজাপতির ন্যায় ষট্‌পদ-বিশিষ্ট কীট হইতে "কার্পাস নেবুর আকারে" তসর নামে একপ্রকার গুটী উৎপত্তি হয়। এই গুটীর আকার গোল বলিয়া গোল শব্দের অপভ্রংশ গুটী নামে ইহা খ্যাত হইয়াছে। এই কীটকৃত পদার্থ হইতে এক প্রকার সূত্র নির্গত হইয়া থাকে। ইহার নাম অর্থাৎ 'ক্ষাই' রেশমের ন্যায় অতি সূক্ষ্ম। অভিধানাদিতে এই কীটোৎপন্ন গুটীর গুটী ব্যতীত অন্য কোন নাম নির্দ্দিষ্ট নাই। কেবল অরণ্যবাসীরা পৃথক্ পৃথক্ সংজ্ঞায় জঙ্গলী ভাষায় নিম্নোক্ত কয়েকটী নাম নির্দ্দেশ করিয়াছে।

২। নাম যথা;—(১) মুদল, (২) [illegible] (৩) বণ্ডই, (৪) আমপেতে, (৫) [illegible] (৬) ধূলে, (৭) মুগ, (৮) টাঁরে, (৯) [illegible] (১০) জড়ুই, (১১) রাসকাটা, (১২) [illegible] এই গুটী সকলের রং স্বভাবতঃ ধূম্র, [illegible] পিঙ্গল, পীত, এই চারি প্রকার।

৩। চাঁইবাসা, মানভূম, হাজারিবাগ, লোহার-ডাগা, কটক-বিভাগ,—বালেশ্বর, [illegible] ময়ূরভঞ্জ, ক্যাঙঝোর প্রভৃতি পর্ব্বতে এবং বর্দ্ধমান-বিভাগ,—মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম

* আলোচ্য বিষয়ে দুই এক স্থলে আমাদের মতভেদ আছে। জ, স।

প্রভৃতির জঙ্গলে শাল, পিয়াল, মৌল, অসন, কুসুম, হরীতকী, বিভীতকী, আমলকী, বদরী প্রভৃতি নানা বৃক্ষ-লতাদিতে, শরৎ, বর্ষা, শিশির, হেমন্ত এই চারি ঋতুতে মনুষ্যের যত্নে ঐ কীট হইতে গুটী গুলির জন্ম হয়। পাট অর্থাৎ রেশম-পোকা পালনের যেরূপ তুঁত চাষ আছে, ইহার সেরূপ চাষ নাই এবং সূতা প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত এ প্রদেশে কারখানা নাই।

৪। উপরের লিখিত ১।২।৩ সংখ্যায় নির্দ্দিষ্ট গুটীর পৃথক্ পৃথক্ বীজ আছে। পরন্তু, প্রথমোক্ত মুদল গুটী সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং সুদৃঢ়। ইহাই বীজ নামে কথিত। জঙ্গল-বাসীরা বিশেষ যত্নের সহিত এই বীজগুটীকেই গৃহে সঞ্চয় করিয়া রাখে।

এই গুটীর অভ্যন্তরে পতঙ্গবৎ যে একটী কীট থাকে, সেই কীট "গুটীর বুঁটীর-দিকে" মুখের লালে ক্ষাই গুলি ক্রমশঃ সরাইয়া এক প্রকার দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া বাহির হয় এবং বাহির হইয়াই বন-বিচরণ করিবার ইচ্ছায় উড্ডীন হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিবার চেষ্টা করে। কিশলয় বন পত্রই ইহাদিগের আহারীয় বস্তু। ইহারা বহির্গত হইবার সময় জানিয়া ঐ সঞ্চিত গুটী হইতে নির্গত হয়। তখন সংগ্রাহক ইহাদিগকে ধরিয়া বনমধ্যে ছাড়িয়া দেয়। জঙ্গলা-ভাষায় ছাড়িয়া দেওয়াকে আড়া বলে। যখন ইহাদিগকে বনে ছাড়িয়া দেয়, তখন ইহাদিগের সজাতীয় বনজ কীটের সহিত সাক্ষাৎ হইলেই সংসর্গ হয়। সেই সংসর্গ হইতেই হউক বা নিয়মকর্ত্তার নিয়ম বশতই হউক, ডিম্বের উৎপত্তি হয়।

৫। তৎকালে ইহাদের উদর কিঞ্চিৎ পুষ্ট হইয়া পুরীষ হইতে "ঠিক রাই-সর্ষপের ন্যায়" এক প্রকার অণ্ড বাহির হইতে থাকে। বৃক্ষের পত্রাদি ভক্ষণ-কালে ইহাদের সেই ডিম্বগুলি বৃক্ষপত্রে সংযুক্ত হইয়া ঐ অণ্ড হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃমি উৎপত্তি হয়। ক্রমে ঐ কৃমি গুলি কোমল-পত্র ভক্ষণ করিয়া হৃষ্ট-পুষ্ট এবং "গুঁয়া-পোকার ন্যায়" কেশর প্রাপ্ত হইলে, ঐ কেশর হইতে অঙ্গের দুই পার্শ্বে যুগ্ম যুগ্ম সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পক্ষ দেখা দেয়। জগদীশ্বরের অদ্ভুত কৌশলে কিছুদিন পরেই ঐ পক্ষদ্বয় ক্রমে ক্রমে বড় এবং লাল, নীল, হরিৎ, পীত এই কয়েকটী রঙ্গে রঞ্জিত হইয়া অপূর্ব্ব-শোভা-বিশিষ্ট হয়। ইহাদের পক্ষের চিত্র-বৈচিত্র্য অতি কমনীয়। পাখা হইলেই ইহারা উড়িতে পারে; এবং ইতস্ততঃ উড়িয়া গিয়া বন-বিচরণ করিতে থাকে। এই রূপে এই কীট হইতে অসংখ্য পতঙ্গ জন্মিয়া বনকে পরিবেষ্টন করে;—কীটে বন পরিপূর্ণ হয়। এই কীটের স্বাভাবিক রং দুই প্রকার;—(১) লোহিত ও (২) পীত।

বনচর বিহঙ্গমেরাই এই কীটের পরম শত্রু। বৃক্ষ-লতাদির শাখা-প্রশাখাকে আশ্রয় করিয়া যখন ইহারা গুটী করিবার আয়োজন করে, সেই সময়ে যাহারা আড়া দেয়, তাহারা ইহাদিগকে পক্ষিজাতির হস্ত হইতে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিবার নিমিত্ত তীর, বাঁশ, ওলেল, অর্থাৎ শর, ধনু এবং বর্ত্তুল লইয়া প্রহরী-স্বরূপে বনের চতুর্দ্দিকে থাকিয়া পক্ষীদিগকে তাড়া দিয়া বন হইতে দূরীকৃত করিয়া দেয়।

৭। কিংবদন্তী,—এই প্রহরীদিগকে তৎকালে একপ্রকার ব্রহ্মচর্য্য-ধর্ম্মাবলম্বন করিতে হয়। এই রক্ষকেরা যে বনে আড়া দেয়, সেই অরণ্য-মধ্যে পর্ণ-কুটীর বাঁধিয়া ২। ৩ মাস কাল থাকে এবং ব্রতপরায়ণ হইয়া (মলমূত্র ত্যাগ করিলেই স্নান, প্রত্যহ অপরাহ্ণে নূতন হাঁড়িতে আতপ-তণ্ডুল পাক, হবিষ্যান্ন-ভোজন এবং তৃণশয্যায় শয়ন করিয়া) শুদ্ধাচারের সহিত, পবিত্রচিত্তে পোকাগুলিকে সংরক্ষণ করিতে থাকে। যে পর্য্যন্ত গুটীগুলি পরিণতি প্রাপ্ত না হয়, সে পর্য্যন্ত স্ত্রী-পুত্রাদির মুখাবলোকন

করে না। প্রবাদ আছে যে, আড়া দিয়া ব্যাঘ্র গমন করিলে, গুটীর উৎপাদিকা শক্তি অধিক হয়, সুতরাং লাভ হইবার আশা জন্মে। ব্যাঘ্র গমন না করিলে রক্ষকদিগের আর সে প্রত্যাশা থাকে না। ফলতঃ এ কথা সত্য কিনা, তা ভগবান্‌ই জানেন।

৮। এই কীটের লালা হইতে "মাকড়সার ন্যায়" এক প্রকার ঊর্ণ বাহির হয়। বস্তুতঃ মাকড়সার সূত্র নিতান্ত অপদার্থ—কোন কাজে লাগে না। ইহাদের সূত্র সেরূপ নহে। জড়-জড়িয়া অর্থাৎ আটাল হয়,—ইহা কাজের জিনিস্। ইহার সূতাতে উত্তমোত্তম বস্ত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই কীট নিজ সূত্র দ্বারা বৃক্ষ-লতাদির ডাল-পালাতে ২ কি ৩ যব পরিমাণে প্রথমতঃ একটী দৃঢ়রূপে বুঁটী নির্ম্মাণ করিয়া মুখস্খলিত সূত্রদ্বারা মণ্ডলাকারে গৃহ রচনার জন্য ক্রমাগত ঘূর্ণিত হইয়া ঐ বুঁটির অগ্রভাগে সূত্র বেষ্টন করিতে করিতে পরিশেষে নিজ সূত্রে বদ্ধ হইয়া ঐ নির্ম্মিত গৃহ মধ্যে রহিয়া যায়। কথায় আছে ;—

"লালেতে রচিয়া করে আপনার ঘর।
আপনি হইল বন্দী তাহার ভিতর॥"

৯। ইহাদের রচিত মণ্ডলাকার সূত্র-নির্ম্মিত গৃহের নামই কোষ বা গুটী। ইহাকেই লোকে গুটী বলে। এইরূপে গুটী-পোকা আপনার বন্ধনে গুটীর অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া তিরোহিত হইলেই যখন গুটীগুলি পরিণতি প্রাপ্ত হয় এবং যখন কোন কোন পোকা গুটীর মুখ কাটিয়া প্রস্থান করিবার চেষ্টা করে, তখন রক্ষকগণ বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা ভাঙ্গিয়া লইয়া উৎপত্তি-শালী গুটীগুলি স্তূপে স্তূপে রাখিয়া এক একটী হাঁড়ীর ভিতর পরিমিত জল এবং তন্মধ্যে গুটী দিয়া হাঁড়িটী চুল্লীর উপর স্থাপন করতঃ, জাল দিয়া অগ্নিতে উত্তপ্ত করিলে তদ্দ্বারা গুটীর আভ্যন্তরীণ পোকাগুলি গরমজলে নষ্ট হইয়া যায়।

১০। এতন্মধ্যে যে গুটীগুলি গরমজলে সিদ্ধ না হয়, সেই গুলি আঁও বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাহা মুদল নামে প্রথম গুটী। এই গুটীর কলেবর অতি কঠিন; এমন কি, বলপূর্ব্বক ইহার টিপিলেও টেপা যায় না এবং টিপিলে সমুচিত হয় না। ডাবা, বগুই গুটীগুলিও অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট এবং টীরে, জাড়ুই নাম গুটীগুলি মধ্যম। গুটীগুলি উৎপন্ন হইবার কালে অধিকাংশ পোকা মুখ কাটিয়া বাহির হইয়া যায়, তন্নিবন্ধন, সেই মুখ-কাটা গুটীগুলি রাসকাটা, আমপেতে, বোড়ড়, ধূলে, বুঁটে বলিয়া আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। এই কাটা গুটীর মধ্যে আমপেতে গুটীগুলি দেখিতে সুশ্রী বলিয়া বনরক্ষকগণ শাখা-প্রশাখাসহ ইহাকে ভগ্ন এক দশ বারটীকে গ্রথিত থোপ বাঁধিয়া বিক্রয় করে। এই গুটীগুলি পরিপক্ক না হইয়া হইতে অকালে ভগ্ন হইয়া গরম জল সিদ্ধ হওয়াতে নরম হয়, এই নিমিত্ত ইহার নাম চোপা। ইহার কলেবর নিতান্ত অপকৃষ্ট টিপিলেই তোবড়া হইয়া যায়। মুখ-কাটা গুটীর ক্ষাই কি সূতা কীটকর্ত্তৃক একেবারে নষ্ট হয় না। গুটী হইতে কীট বাহির হইবার সময় "গুটীর বুঁটির দিকে" মুখের লালে ক্ষাইগুলি কিঞ্চিৎ আর্দ্র করিয়া ক্রমে ক্ষাইটী মুখের টেনে সরাইয়া বাহির হয়, সুতরাং ক্ষাই বজায় থাকে এবং সূতাও পাওয়া যায়। যে গুটীগুলি "বুঁটির বিপরীত দিকে" মূষিক কি অন্য কীট বা পিপীলিকা কর্ত্তৃক কর্ত্তিত হয়, তাহা কোন কাজে লাগে না এবং তাহার সূতাও আদায় হয় না; নষ্ট হইয়া থাকে।

১১। এই সকল গুটী ওজনের দরে বিক্রয় হইবার রীতি নাই। ঠিক, "কপর্দ্দক গণনার ন্যায়" বিক্রয় হয়। যথা ;—ইহার চারিটীতে ১ গণ্ডা; ২০ কুড়ি গণ্ডায় ৴০ এক পণ, ১৬ পণে ১ কাহন ইত্যাদি। যে বৎসর সৃষ্টিকর্ত্তার বিড়ম্বনায় এই সকল গুটীর কম পরিমাণে জন্ম হয়, সেই বৎসর উত্তম গুটীর উচ্চমূল্য প্রতি কাহন ৭৲ টাকা হইতে ১২৲ টাকা, মধ্যমের দর প্রতি কাহন ৫৲ টাকা হইতে ৭৲ টাকা, অধমের দর প্রতি কাহন ৩৲ টাকা হইতে ৫৲ টাকা; আর ঈশ্বরানুগ্রহে যে বৎসর প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়, সেই বৎসর সর্ব্বোৎকৃষ্ট গুটীর দর প্রতি কাহন ৬৲ টাকা হইতে ৯৲ টাকা, মধ্যম গুটীর দর প্রতি কাহন ৫৲ টাকা হইতে ৭৲ টাকা, অধমের দর প্রতি কাহন ২৲ টাকা হইতে ৪৲ টাকা পর্য্যন্ত। জঙ্গলে আবার কাঁচা পাকা এই উভয়বিধ দর আছে; জঙ্গলবাসীদের মধ্যে কেহ কেহ ১৬ পণে ১ কাহন, কেহ বা পাকা ২০ পণে ১ কাহন বলিয়া সেই হিসাবে বিক্রয় করে। বিক্রয়-কালে মহাজনেরা গুটীগুলি প্রথমতঃ ভূতলে সুসজ্জিত করিয়া স্তূপে স্তূপে রাখে। ক্রেতারা সেই স্তূপ ভাঙ্গিয়া চাক অর্থাৎ চাক্তী করিলে, সেই চাক্তী দ্বারা গুটীগুলি নির্ব্বাচিত হইয়া, উত্তম, মধ্যম, অধম এই তিনপ্রকার গুটী (অবয়বের তারতম্য-বিশেষে) মূল্যের হ্রাস বৃদ্ধি অনুসারে বিক্রীত হয়।

১২। চাঁইবাসা, সিংভূম, বরাভূম, ধলভূম, মানভূম, তুংভূম, শিখরভূম, ভট্টভূম প্রভৃতি স্থানের বাণিজ্য-ব্যবসায়িগণ দ্বারা সময়ে এই সকল গুটী চাঁইবাসার অধীন হলুদ-পুকুর নামক হাটে এবং বহড়াগুড়া নামক স্থানে অধিক পরিমাণে ক্রীত-বিক্রীত হইয়া, তথা হইতে আমাদিগের এই বদনগঞ্জ নামক প্রসিদ্ধ পল্লীতে অপর্য্যাপ্ত আমদানি হয়। এখানকার আড়তদার, পাইকের, দালাল, মহাজনেরা লাভের আশায় তাহাদের নিকট ক্রয় করিয়া আমদানি গুটীর প্রায় অর্দ্ধাংশ স্থানীয় কাটনীদিগকে বিক্রয় করিয়া, অপরার্দ্ধ বিক্রয়ের নিমিত্ত স্থানে স্থানে

প্রেরণ করে। ইহার সূতা স্ত্রীলোকদিগের দ্বারা প্রস্তুত এবং সেই সূতাতে বস্ত্রবয়ন-কার্য্য পুরুষদিগের দ্বারা সম্পাদিত হয়। এই বদনগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে বাৎসরিক প্রায় ২০,০০০ বিংশতি সহস্র কাহন তসর-গুটী আমদানি হইয়া থাকে। ইহার প্রতি কাহনের গড় মূল্য ৫৲ টাকার হিসাবে ১,০০,০০০ লক্ষ টাকা। এই লক্ষ টাকা আমদানি গুটীর মধ্যে "শ্যামবাজার, কৃষ্ণগঞ্জ, কুসুই, কয়াপাট, বদনগঞ্জ, বেলড়িহা গ্রামের অধিবাসী কাটনী দ্বারা অন্যূন ৫০ সহস্র টাকার সূতা কাটাই ও প্রস্তুত হইয়া ন্যূনাধিক ২০।২৫ হাজার টাকার সূতা স্থানীয় তন্তুবায় কর্ত্তৃক ক্রীত এবং ঐ সূতাতে নানা রঙ্গের নানা রকম বস্ত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে। পরে ঐ সকল বস্ত্র ও অবশিষ্ট সূতা নানাস্থানে প্রেরিত এবং হাটে, বাজারে এবং কলিকাতা প্রভৃতি নগরে বিক্রীত হয়। এই সূতার স্বাভাবিক রং গোধূম-বর্ণ-সদৃশ। মেদিনীপুর ও তদধীন আনন্দপুর, কেঁশেড়া, প্রভৃতি গ্রামে, জেলা বাঁকুড়া ও তদধীন রাজগ্রাম, সোণামুখী, বিষ্ণুপুর, জয়পুর এবং জেলা বর্দ্ধমান ও তদধীন মানকর, রাণীগঞ্জ প্রভৃতি প্রধান প্রধান স্থানে ঐ তসর-গুটী বহুল পরিমাণে আমদানি রপ্তানী এবং সূতা ও উত্তমোত্তম বস্ত্র প্রস্তুত হয়। বদনগঞ্জ অপেক্ষা ঐ সকল স্থানে মহাজন ও ব্যবসায়ীর সংখ্যা অধিক।

১৩। গুটীগুলি পুনর্ব্বার সিদ্ধ না করিলে সূতা প্রস্তুত হয় না, এইজন্য গুটীগুলিকে এইরূপে সিদ্ধ করিতে হয়, যথা ;—

প্রথমতঃ একটী হাঁড়ীর ভিতর সামান্য পরিমাণে কুটী-খড় কিংবা শুষ্ক-ঘাস বিছাইয়া তদুপরি ২ কি ৩ পণ গুটী ও পরিমিত জল এবং ঐ জলের সহিত গুঁড়া সাজিমাটী কি অন্য-প্রকার ক্ষার মিশ্রিত করিয়া ঐ হাঁড়ীর মুখটী আধার দ্বারা আবরণ করিয়া একটী চুল্লীর উপর

হাঁড়ীটী বসাইয়া অগ্নিসংযোগে কাষ্ঠ দ্বারা অল্পে অল্পে জাল দিতে হয়। এইরূপ ক্রমাগত জাল দিতে দিতে যখন জল মরিয়া গিয়া হাঁড়ীর ভিতর সোঁ সোঁ শব্দ হইতে থাকে, তখন হাঁড়ীটী চুল্লী হইতে নামাইয়া, স্নিগ্ধ স্থানে রাখিতে হয়। জলের সহিত সাজিমাটী বা ক্ষার দিবার তাৎপর্য্য এই যে, পোকার জড়জড়িয়া লালে গুটীর রং যে একটু মলিন থাকে, ক্ষারজলে সিদ্ধ হইলেই তাহার সে মলিনত্ব অপসৃত হওয়ায় গুটীটী চিক্কণ হয়। তৃণ বিছাইবার কারণ এই যে, গুটীগুলি চুঁয়িবার আশঙ্কা থাকে না।

১৪। এইরূপে গুটীগুলি সিদ্ধ হইয়া স্নিগ্ধ ও কোমল হইলে, স্ত্রীলোকেরা প্রথমতঃ নখে করিয়া গুটীর বুঁটীগুলি খসাইয়া উপরের আঁশুয়া সকল উঠাইয়া দেয়। তদনন্তর কাটনী সমানভাবে দুইটী পা মেলিয়া বসিয়া তাহার ক্ষাই বাহির করে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ইহার ক্ষাই অতি সূক্ষ্ম, সুতরাং এক ক্ষাইতে বস্ত্র বয়ন হয় না। বয়ন হইলে বস্ত্র অতি সূক্ষ্ম এবং অপদার্থ হয়। এইজন্য গুটী বিশেষে ৪টী হইতে ৬টী পর্য্যন্ত গুটীর ক্ষাই একত্র সংলগ্ন করিয়া সূত্র-সঙ্কলন যন্ত্র অর্থাৎ বাঁশের একটী ছোট নাটাইয়ের মধ্যে জড়াইয়া, বসিবার বামভাগে "কিঞ্চিৎ অন্তরে" একটী মৃত্তিকা বা ভগ্নপ্রস্তরাধারে গুটীগুলি সারি সারি বসাইয়া, ক্ষাই সকল বাম-জানুর উপর রাখিয়া বাম-হস্তের চেটো অর্থাৎ করতল দ্বারা ক্ষাই গুলি অল্পে অল্পে ঘর্ষণ ও মার্জ্জনা করিয়া, পাক দিবার নিমিত্ত ঐ কর ক্রমাগত চালন করে এবং দক্ষিণ-হস্তের কর পল্লবে নাটাইয়ের বৃন্ত ধরিয়া ও নাটাইয়ের অগ্রভাগ ঐ বাম-পদের উপর ঠেশন দিয়া, তাহারই অবলম্বনে নাটাইটী ঘুরাইবার নিমিত্ত অল্পে অল্পে নাচাইয়া ঐ ক্ষাইগুলিকে ঈষৎ ঈষৎ টান দিলেই ঐ কৌশল দ্বারা সূতাগুলি কুর কুর করিয়া বাহির হয় এবং বাহির হইলেই সঙ্গে সঙ্গেই তাহা নাটাইয়ে গুটাইতে থাকে। এই প্রকারে ক্ষাইগুলি ক্রমশঃ বাহির হইয়া যখন নিঃশেষ হয়, তখন গুটীর গর্ভ হইতে "আমড়াআঁটীর ন্যায়" সিদ্ধ-পক্ক একটী মাংসখণ্ড বাহির হইয়া পড়ে। ঐ মাংসখণ্ড, মৃত গুটীপোকার কলেবর। উহা একপ্রকার মাংসপেশীর ন্যায় বলিয়া অন্ত্যজ-জাতীয়েরা তাহা কাটনীদিগের নিকট প্রতি কপর্দ্দকে এক একটী ক্রয় করিয়া ভক্ষণের নিমিত্ত লইয়া যায়। এক একটী গুটীর ক্ষাই শেষ হইলেই কাটনী আবার তৎপরিবর্ত্তে ঐ ভাবে নূতন গুটী আধারে স্থাপন করিয়া কাটনা কাটিয়া শেষ করে।

১৫। উত্তম ১২টী গুটী কাটিলে সূতার পরিমাণ ১ তোলা, মধ্যম ১৬টীতে ১ তোলা এবং নিকৃষ্ট ২০টিতে ১ তোলা হয়। নাটাইয়ে পরিমিত সূতা গুটান হইলেই তাহা নামাইয়া মোড়ক দিয়া এক একটী ফেটী করে এবং ফেটীগুলি কাটিয়া লইলে সূতাগুলি জাক হয়। প্রাতঃকাল অবধি দিবা ২ প্রহর পর্য্যন্ত এক একজন কাটনীতে ৮ ফেটী পর্য্যন্ত এই সূতা কাটিয়া উঠিতে পারে। ৮ ফেটী কাটিলে তাহার মজুরী ৵০ আনা অর্থাৎ চারি পয়সা মাত্র। অতি উত্তম সূতা টাকায় ৮ তোলা হইতে ১০ তোলা, মধ্যম, টাকায় ১০ তোলা হইতে ১২ তোলা, নিকৃষ্ট সূতা ১২ তোলা হইতে ১৬ তোলা। ইহা তোলা এবং সের উভয়বিধ ওজনে বিক্রয় হয় বলিয়া তদনুসারে ফেটীগুলি গ্রথিত হয়। কাঁচি ৬২ ও পাকি ৮০ তোলায় সের। এই সূতা কাটিবার সময়ে আঁশুর ন্যায় গুটী হইতে যে একপ্রকার গদড় বাহির হয়, তাহাকে লাতা বলে। এই লাতা আবার অন্যান্য স্ত্রীলোকেরা ক্রয় করিয়া টাকুরের দ্বারা পাক দিয়া সূতা প্রস্তুত করতঃ তাঁতিদিগকে বিক্রয় করে। এই সূতাতে কেটিয়া (মোটকা) নামে অতি উত্তম টিকসই বস্ত্র ও বর্হিবাসঃ প্রস্তুত হয়। আহ্নিক-

পূজাদি কার্য্যনির্ব্বাহে এই বস্ত্র পবিত্র বলিয়া অনেকে স্নানান্তে পরিধান করে এবং শীতবস্ত্রেও ব্যবহার করে। গুটী হইতে সূতা প্রস্তুত করিবার আরও একটী উপায় আছে, কিন্তু সেটী সচরাচর হয় না। অলস ও নিষ্কর্ম্মা ব্যক্তিদের মধ্যে যাহাদের মৎস্য ধরিবার একটু বিশেষ আমোদ আছে, কেবল তাহারাই অধ্যবসায়ের সহিত গুটীর সূতাতে ডোর করিবার নিমিত্ত এক একটী গুটী গরম জলে ফেলিয়া ক্ষাই বাহির করত ঐ ক্ষাই চরখিতে গুটাইয়া মৎস্য ধরিবার ডোর প্রস্তুত করে। যদিও, অন্য সূতা অপেক্ষা এই সূতায় ডোর কিছু শক্ত হয়, কিন্তু ঐ সূতায় বস্ত্রবয়ন কার্য্য আদৌ হয় না। এই সূতা বাহির করিতে পরিশ্রম বেশী। প্রাগুক্ত প্রকারে স্ত্রীলোকেরা যে কৌশলে সূতা প্রস্তুত করে, তাহাতে পরিশ্রম অল্প এবং উপায় সহজ।

১৬। কেহ কেহ বলেন, নিজ সূত্র-বন্ধন দ্বারা তসর-কীটের মৃত্যু হয়; কিন্তু তাহা প্রবাদমাত্র: বস্তুতঃ নিজ সূত্র-বন্ধন দ্বারা সহসা ইহাদের মৃত্যু হয় না। কেবল মৃত্যুর হস্ত এড়াইবার নিমিত্ত ইহারা সূত্র গৃহ রচনা করিয়া কিছুদিনের জন্য তন্মধ্যে গুপ্তভাবে বাস করে। যেহেতু উপরে যে মুদল গুটীর বিষয় বর্ণনা করা হইয়াছে, সে গুলি বাস্তবিক আঁশু। বিক্রয়ের নিমিত্ত এখানে আমদানি হয়। আমদানির সময় আমি চাক্ষুষ দেখিয়াছি যে, ঐ গুটীর মুখ সরাইয়া কীট গুলি সজীব অবস্থায় বাহির হয় এবং বাহির হইয়াই পুরীষ ত্যাগ করে। সেই পুরীষে রাইসর্ষপের ন্যায় অণ্ড থাকে। ইহারা অকালে বাহির হয় বলিয়া অধিক দিন জীবিত থাকে না। সূর্য্যের আলোকে মরিয়া যায় এবং কাকাদি পক্ষীতেও নষ্ট করে। সুতরাং এ অবস্থা নিরীক্ষণ করিয়া নির্দ্ধারণ করা গিয়াছে যে, তসর-কীট গুটীর অভ্যন্তরে থাকিয়া আদৌ মরে না।

১৭। এক সময়ে এই গুটীর একজন সংগ্রহকর্ত্তার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল; প্রকৃষ্টরূপ অনুসন্ধান কারণ "ঐ আঁশু গুটীগুলি কি প্রকারে কতদিন পর্য্যন্ত গৃহে স্থায়ী থাকে এবং পোকাগুলি সজীব থাকে কিনা, যদি থাকে ত কোন্ সময়ে বাহির হয়" প্রসঙ্গাধীনে এই কয়েকটী বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন যে, "সূর্য্যের সহিত গুটীপোকার একটু বাদ আছে, তন্নিমিত্ত বসন্ত, গ্রীষ্ম, এই দুই কাল অর্থাৎ ফাল্গুন, চৈত্র, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ এই চারি মাস গুটীপোকা সূর্য্যের মুখ নিরীক্ষণ করে না। যেহেতু ঐ কতিপয় মাসে মার্ত্তণ্ডদেব প্রচণ্ড মূর্ত্তি ধারণ করিয়া প্রখর কিরণ বিস্তার করেন, সুতরাং উত্তাপে কোমলাঙ্গ দাহ হইবে এই ভয়ে গুটীপোকা, ঐকালে গৃহ রচনা করিয়া স্ব-রচিত গৃহগর্ভে থাকিয়া আপন অঙ্গ গোপন করে। যখন সূর্য্যের উত্তাপ কমিয়া যায়,—বর্ষা ঋতুর সমাগম হয় এবং সূর্য্যদেব প্রসন্ন মূর্ত্তি ধারণ করেন, সেই সময় গুটী-কীট সূর্য্যমুখ দর্শন করিবার লালসায় গুটীর মুখ উদ্ঘাটিত করিয়া সূর্য্যের আলোক দর্শনপূর্ব্বক আনন্দের সহিত বর্ষা, শরৎ, শিশির, হেমন্ত এই চারি ঋতুতে (মতান্তরে আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ এই আটটী মাস নির্দ্দেশ আছে) কয়েক মাস সুখস্বচ্ছন্দে বন-বিহরণ করিয়া, পুনরায় ফাল্গুন, চৈত্র, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ এই চারি মাসের নিমিত্ত স্বীয় অঙ্গ গোপন করিবার কারণ গৃহ রচনা করে। এই প্রকারে পোকার উৎপত্তি হইয়া আষাঢ়, শ্রাবণে 'আমপেতে', ভাদ্রে 'মুদল', আশ্বিনে 'মুগা', কার্ত্তিকে 'ডাবা', অগ্রহায়ণে 'বগুই', পৌষ ও মাঘে 'জাডুই' গুটীর সৃষ্টি হয়। যে কয়েক মাস গুটীপোকা স্বগৃহে তিরোহিত হয়, সেই কয়েক মাস ইহাদিগের ক্ষুধা-তৃষ্ণা থাকে না।"

প্রামাণিক ব্যক্তি, এই যে কথা বলিয়াছেন, তাহা বিশ্বাস-যোগ্য। এ স্থলে সৃষ্টিকর্ত্তার নিয়মই ধন্য !! তিনি যে কতপ্রকার জীব-জন্তু, কীট, পতঙ্গাদির সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা কে বলিয়া শেষ করিতে পারে? শ্রীচৈতন্যময়ের এই বিশ্বরচিত ভাণ্ডারে কিছুরই অপ্রতুল নাই।

শ্রীহারাধন দত্ত ভক্তনিধি।

হিন্দু-রমণীগণের অবস্থা ও শিক্ষা।

(প্রথম প্রস্তাব।)

বিশাল পৃথিবীতে বৃথা কিছুই নাই। যাহা কিছু দেখিতে পাই, সকলই গভীর-অর্থযুক্ত। প্রাণী, উদ্ভিদ্, জড়—বিনা উদ্দেশে কিছুই সৃষ্ট হয় নাই। অণীকৃষ্ণ বালুকাকণাও জগতের গুরুতর প্রয়োজন সাধন করে। যে সর্পের বিষম দংশনে প্রাণ-নাশ হয়, তাহারই বিষ দ্বারা প্রাণসঞ্জীবন ঔষধ প্রস্তুত হইয়া থাকে। কেবল ইহাই নহে; সৃষ্ট পদার্থ-সমূহের সামঞ্জস্য ও পরস্পর উপযোগিতাও চমৎকার। মানব-সমাজ সম্বন্ধেও এই কথা। কোন জাতি, কোন জাতীয় নিয়ম বা আচার-পদ্ধতি বৃথা, বিনা কারণে গঠিত বা প্রবর্ত্তিত হয় নাই। তবে মানব উন্নতিশীল জীব। তাহার অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক আচার-ব্যবহার পরিবর্ত্তিত হয়। যে নিয়ম এক সময়ে সমাজের গুরুতর প্রয়োজন সাধন করে, অবস্থা-পরিবর্ত্তনে তাহা অনাবশ্যক বা অনিষ্টকারী হইতে পারে।

সংসারে স্ত্রী-জাতি মঙ্গলময়ী এবং উচ্চতম স্থানের অধিকারিণী। যাঁহারা জীব-প্রবাহ রক্ষার প্রধান সহায়,—যাঁহাদের গর্ভে জীবনের সঞ্চার হয়,—ভাবী-শিশুর বিকাশ হয়,—যাঁহাদের স্নেহপূর্ণ বক্ষ হইতে অসহায় শিশুর পানীয় সুমধুর রস প্রবাহিত হয়,—যাঁহাদের হস্তে শিশুগণের লালন-পালনের ভার সমর্পিত,—যাঁহাদের দ্বারা শিশুগণের প্রাথমিক শিক্ষা সাধিত হয়,—যাঁহাদের স্নেহ ও প্রেম-প্রভাবে সংসার মানবের উপভোগের স্থান হইয়াছে মানবহৃদয় সরস ও শোভাময় হইয়াছে,—তাঁহারা যে সংসারে উচ্চতম স্থানের অধিকারিণী হইবেন, ইহাই স্বাভাবিক।

কোন্ কোন্ উপায় অবলম্বনে নারীজাতি সংসারে আপনাদের নিয়োজিত স্থান অধিকার করিয়া সুখ-স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতে পারেন, মঙ্গল বিস্তার করিতে পারেন, সংসারের সুখ-স্বচ্ছন্দতা পরিবর্দ্ধিত করিতে পারেন, তাহার মীমাংসা করা সহজ ব্যাপার নহে। এ বিষয়ে মতভেদও অনেক দেখা যায়। ভিন্ন ভিন্ন সমাজ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন উপায় অবলম্বিত হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষাই যে নারীজাতির অবস্থার উন্নতি-সাধনের প্রধান উপায়, এ বিষয়ে বড় মতদ্বৈধ নাই। সেই শিক্ষা কি এবং কিরূপে তাহা প্রবর্ত্তিত ও ফলপ্রসূ হইতে পারে, ইহাই বিশেষ বিবেচনার বিষয়। দেশ-ভেদে চতুর্দ্দিকস্থ অবস্থা-ভেদে, সামাজিক আচার-ব্যবহার-ভেদে, শিক্ষা-সম্বন্ধে অনেক তারতম্য হইতে পারে এবং তাহা হওয়াই প্রার্থনীয়। এ প্রস্তাবে হিন্দু-রমণীগণের অবস্থা ও শিক্ষাই আমাদের বিশেষ বিবেচ্য।

যে সময় হইতে এদেশে ইংরেজী শিক্ষার প্রচার হইয়াছে, সেই সময় হইতে এদেশীয় রমণীগণের অবস্থা ও শিক্ষা সম্বন্ধে মধ্যে মধ্যে আন্দোলন হইয়া আসিতেছে। তাঁহাদের শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে,—তাঁহাদের মঙ্গল কামনায় বিশ্ব-বিদ্যালয়ের দ্বার উন্মুক্ত হইয়াছে। তাঁহাদিগকে ইউরোপীয় আদর্শে গৃহাবরোধ-মুক্ত ও স্বাধীন-চিত্ত করিবার চেষ্টাও কোন কোন ইংরেজী-শিক্ষিত ও ইংরেজী-আচার-পক্ষপাতী ব্যক্তিগণের মধ্যে হইতেছে। এ সম্বন্ধে অনেক বক্তৃতা ও প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে, কিন্তু অতি অল্প লোকেই ভারতমহিলাগণের শিক্ষা তাঁহাদের সামাজিক আচার ও কর্ত্তব্যের সহিত সমঞ্জসীভূত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বিলাতী শিক্ষার স্রোত যেরূপ তীব্রবেগে প্রবাহিত, ললনাগণকে বিলাতী আদর্শে উচ্চশিক্ষা দিবার উদ্যোগ যেরূপে তরঙ্গিত, তাহাতে কোনও ব্যক্তির পক্ষে সেরূপ চেষ্টা করা একপ্রকার অসম-সাহসিকতার কার্য্য। এই কারণেই বোধ হয়, সমাজের অগ্রণীগণ প্রকাশ্যরূপে সেরূপ চেষ্টা করিতে বিরত হইয়াছেন।

যে সকল ব্যক্তি এদেশীয় রমণীগণের অবস্থা ও শিক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছেন ও প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাঁহাদের অধিকাংশই ইংরেজী-আচার ও শিক্ষার পক্ষপাতী। তাঁহারা এদেশীয় নারীগণের অবস্থা এরূপ গাঢ় কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত করিয়াছেন যে, তাহা দৃষ্টিমাত্র বিভীষিকা উপস্থিত হয়। বিলাতী সমাজ, বিলাতী শিক্ষা, বিলাতী আচার-পদ্ধতিকে আদর্শস্থানীয় মনে করিয়াই ঐরূপ করা হইয়াছে। বিলাতী ও দেশীয় সমাজের মজ্জাগত পার্থক্য কিছু আছে কিনা—বিলাতী আচার-পদ্ধতির অনুকরণ এদেশের সামাজিক অবস্থার উপযোগী কিনা, বিলাতী সামাজিক রীতি-নীতিতে কোন দোষ আছে কিনা এবং এদেশীয় সামাজিক আচারে কোন গুণ আছে কি না,—এ সমস্ত বিষয়ের আলোচনা ও মীমাংসা করিবার সময় বা প্রবৃত্তি তাঁহাদের ছিল না। জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ সত্যের অপলাপ অনেক স্থলেই ঘটিয়াছে।

উল্লিখিত লেখক ও বক্তাগণ রমণীগণের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিতে গিয়া প্রধানতঃ এদেশীয় পুরুষগণের দোষকীর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, 'এদেশীয় পুরুষেরাই রমণীগণের সর্ব্বপ্রকার অমঙ্গল, ক্লেশ ও অবনতির কারণ।' তাঁহারা যে সকল দোষের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা সমাসতঃ চারি ভাগে বিভক্ত হইতে পারে। যথা;—(১) এদেশীয় পুরুষগণ স্ত্রীজাতির উপর সর্ব্বদা অত্যাচার করিয়া থাকেন ও তাঁহাদিগকে সম্মান করিতে জানেন না; (২) রমণীগণকে কারাগারে বদ্ধ করিয়া রাখেন; (৩) তাঁহাদিকে তাঁহাদের স্বাভাবিক স্বত্বে বঞ্চিত করিয়া থাকেন; এবং (৪) তাঁহাদের উন্নতির পথ রোধ করেন।

এই সকল গাঢ়-রঞ্জিত চিত্র দর্শনে স্বদেশে-বিদেশে অনেকের মনে এদেশের সামাজিক অবস্থা ও পুরুষগণের ব্যবহার সম্বন্ধে একটা বিষম কুসংস্কার জন্মিয়াছে। ঐ সকল বক্তা ও লেখকগণের উদ্দেশ্য মহৎ হইতে পারে, কিন্তু তাঁহাদের মত ও চেষ্টা যে দূরদর্শিতা ও চিন্তাশীলতা-মূলক এবং দেশের প্রকৃত-অবস্থা-পরিজ্ঞাপক, ইহা আমরা বিশ্বাস করিতে অসমর্থ। যাঁহার যাহা ইচ্ছা বলিতে বা করিতে পারেন, কিন্তু প্রত্যেক বাক্য বা কার্য্যের একটা গুরুতর দায়িত্ব আছে। প্রত্যেক বাক্য বা প্রত্যেক কার্য্য সমাজ মধ্যে আপন আপন প্রকৃতি অনুযায়ী শুভ বা অশুভ ফল প্রসব করে। যাহা সত্য ও জ্ঞানমূলক, তাহার ফল শুভ,—যাহা অসত্য ও অজ্ঞানতা-মূলক, তাহার ফল অশুভ,—অনিবার্য্য নিয়মে চিরদিনই হইয়া থাকে। উল্লিখিত বামা-হিতৈষী বক্তা ও লেখকগণের মত এবং কার্য্য যদি সত্য ও জ্ঞানমূলক না হয়, তবে তাহা কখনই শুভাবহ হইবে না। সুতরাং এবিষয়ের আলোচনা একটু বিশেষরূপে করা আবশ্যক।

এদেশীয় মহিলাগণের অবস্থা যে উন্নত, তাঁহাদের উন্নতির অবশেষ আর কিছু নাই,—

আমরা তাহা বলিতেছি না। অভাব ও অসম্পূর্ণতা অনেক আছে। কিন্তু প্রকৃত অভাব কি এবং কোন্ কোন্ উপায় অবলম্বনে সে অভাব বিদূরিত হইয়া রমণীগণের অবস্থা উন্নত হইতে পারে, তাহা এখনও অনেকের জ্ঞান-গোচর হয় নাই। ইহাও এস্থলে বক্তব্য যে, এদেশীয় রমণীগণকে বিলাতী আদর্শে শিক্ষিত ও ভূষিত করিলেই যে উন্নতির পরাকাষ্ঠা সাধিত হইবে, এদেশীয় জন-সাধারণের বা সমাজাগ্রগণ্য ব্যক্তিগণের এরূপ বিশ্বাস নাই। কিন্তু বিশ্বাস নাই বলিয়াই যে, কথাটা ভ্রমসঙ্কুল বা অপ্রামাণিক এরূপ হইতে পারে না;—দেখা আবশ্যক, ইহার মূলে সত্য আছে কিনা, ইহা আমাদের চতুর্দ্দিকস্থ অবস্থার উপযোগী কিনা, এতদ্দ্বারা মঙ্গল বা অমঙ্গলের সম্ভাবনা অধিক কিনা।

উল্লিখিত বামা-হিতৈষী বক্তা ও লেখকগণ নারীগণের অবস্থা সম্বন্ধে পুরুষগণের প্রতি যে সকল দোষারোপ করিয়াছেন, তাহার মূলে সত্য আছে কিনা অথবা তাহা অতিরঞ্জিত, প্রথমে ইহাই দেখা আবশ্যক।

পৃথিবীর সকল দেশে ও সকল যুগেই নর-নারী-সমবেতে সমাজ গঠিত হইয়াছে। তাঁহাদের উভয়ের মিলন ও পরস্পর সহকারিতা ব্যতীত গৃহস্থলী, পরিবার বা সমাজের অস্তিত্ব অসম্ভব। অন্ততঃ একাল পর্য্যন্ত গৃহ ও সমাজপত্তন এই নিয়মেই হইয়া আসিতেছে। প্রত্যেক সমাজেই নানা শ্রেণী আছে। কতকগুলি পরিবার লইয়া, অবস্থাভেদে, এক একটী শ্রেণী গঠিত হয়। প্রত্যেক সমাজে—প্রত্যেক শ্রেণীর অভ্যন্তরে—নর-নারীর অবস্থা পরস্পর উপযোগী, গতানুগতিক এবং সমঞ্জসীভূত, ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম। এই নিয়ম অনুসারে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েরই কতকগুলি পৃথক্ পৃথক্ কার্য্য আছে। সেই সকল কার্য্য উভয়ের পক্ষেই প্রয়োজন এবং তাহা সম্পাদনে উভয়কেই পরস্পরের সহকারিতা করিতে হয়। তাহা সম্পূর্ণরূপে স্বেচ্ছাধীন নহে,—না করিলে চলিবার উপায় নাই, তাহা ব্যতীত পারিবারিক বা সামাজিক জীবন অসম্ভব।

সভ্য বা অর্দ্ধ-সভ্য সমাজে কৃষকের সংখ্যা বহুল পরিমাণে দৃষ্টিগোচর হয়। কৃষক ভূ-কর্ষণ করে, কৃষক-রমণী অন্নপানাদির ব্যবস্থা ও অন্যান্য নানা কার্য্য দ্বারা কৃষকের সহায়তা করে। আমাদের দেশে কৃষিজীবীর সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। কৃষক-রমণীর কত কার্য্য, একবার ভাবিয়া দেখ। রন্ধন, শিশুপালন ও গৃহস্থলীর শতকার্য্য সম্পন্ন করিয়াও অনেক সময়ে কৃষক-পত্নীকে শস্যক্ষেত্রে যাইয়া স্বামীর সহায়তা করিতে হয়। কৃষক ক্ষেত্রে বীজ ছড়াইতেছে, হয় ত কৃষক-পত্নী বীজের ডালা হস্তে লইয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে ছায়ার ন্যায় ঘুরিতেছে। কৃষক-হস্তজাত পণ্যদ্রব্য বিনিময়ের ভার সাধারণতঃ কৃষক-রমণীর হস্তে। ধান হইতে চাউল প্রস্তুত করা অনেক সময়েই রমণীর ভার। ধীবর মৎস্য আহরণ করে, ধীবর-নারী তাহা বিক্রয় করিয়া খাদ্য সংস্থান করে; কখন কখন স্বয়ং মৎস্য-হরণে প্রবৃত্ত হয়। তন্তুবায় বস্ত্রবয়ন করে, তন্তুবায়-রমণী তাহার সূত্র-নির্ম্মাণ, সূত্র-বিস্তার প্রভৃতি কার্য্যের সহকারিণী। পুরুষকেও অনেক সময়ে শিশুপালনাদি কার্য্যের সহকারিতা করিতে হয়। যে শ্রেণীর মানবগণের মধ্যে মানসিক পরিশ্রমের প্রবলতা দেখা যায়, সেখানেও নারীগণ নানা বিষয়ে পুরুষের সহকারিণী এবং অন্যান্য শ্রেণীর রমণী অপেক্ষ অধিকতর বুদ্ধিমতী ও জ্ঞান-সম্পন্না।

অধিকন্তু, রমণীগণের মানসিক গুণরাজি লক্ষিত বা অলক্ষিত ভাবে নিরন্তর সমাজ-মধ্যে অসীম, অপরাজেয় প্রভাব বিস্তার করিতেছে। সংসারে এমন কোন কার্য্যই নাই, যাহা রমণীর মানসিক শক্তি-প্রভাবে অল্প বা অধিক পরিমাণে

নিয়মিত না হয়। রাজ-মহিষীও অনেক সময়ে রাজার বিচার-কার্য্যের সহায়তা করেন—রাজার নিরপেক্ষ কঠোর দণ্ডাজ্ঞাকে দয়া-রঞ্জিত করিয়া দেন। সচিব-পত্নীর প্রতিভা-বলে কখন কখন গুরুতর রাজনৈতিক ব্যাপার নিয়মিত হইয়া থাকে। রমণী-হৃদয়-বিকসিত মনোহর গুণরাজি মানব-হৃদয়কে সরস, সদয় ও শোভাযুক্ত করে, তাহাকে কঠোর নিষ্ঠুরতাচরণ হইতে অনেক সময়ে বিরত রাখে,—বিপদকালে সহানুভূতিক সহায়তায় নিরাশ ও ভগ্ন-হৃদয়কে সবল করে। যদি রমণী-হৃদয়ের ক্রিয়া সংসার মধ্যে কিয়ৎকালের জন্যও অন্তর্হিত হয়, তবে অচিরাৎ সংসার নৃশংসাচারে পরিপূর্ণ হয়,—আর আমাদের বাসোপযুক্ত থাকে না। "গৃহিণী ব্যতীত গৃহ হয় না"—এই সাধারণ বাক্য গভীর-অর্থ-সংযুক্ত। নর-নারীর পরস্পর অবস্থানুগত্য ও সহকারিতা বিধাতার অমোঘ নিয়ম। তাহা পরিহার করিয়া কোন সমাজই অস্তিত্ববান্ থাকিতে পারে না। সাধারণ নিয়ম এই। সকল দেশেই ইহার ক্রিয়া দৃষ্টিগোচর হয়।

এক্ষণে উল্লিখিত বামা-হিতৈষিগণের আরোপিত প্রথম দোষের বিষয় বিবেচিত হইতে পারে। জিজ্ঞাস্য এই,—এদেশীয় মানবগণ কি বস্তুতই নারীগণকে উৎপীড়িত করেন ও তাঁহাদিগকে সম্মান করিতে জানেন না? যদি তাহা হয়, তবে এদেশে সমাজরক্ষা কিরূপে হয়? 'পীড়ন' ও 'সম্মান' শব্দ অবশ্যই আমাদের ধর্ম্ম-বিশ্বাস, নৈতিক জ্ঞান ও সামাজিক অবস্থা অনুসারে বুঝিতে হইবে। কারণ ধর্ম্ম, নীতি ও সামাজিক আচারের ইতর-বিশেষে উক্ত শব্দ দ্বয়ের অর্থের প্রভেদ হইতে পারে। হিন্দুরা গুরুজনের পদধূলি মস্তকে লইয়া সম্মান প্রদর্শন করেন। এ প্রথা বিলাতে নাই। সেখানকার লোকে ইহাকে অসভ্যতার ফল মনে করিতে পারেন। হিন্দু-রীতি অনুসারে স্বামী স্ত্রীর গুরু। স্ত্রী স্বামীকে প্রণাম করিয়া থাকেন। বিলাতী চক্ষে ইহা অসভ্যতা বা নারী-অবমাননার পরিচায়ক হইতে পারে।

ইচ্ছা করিয়া কোন-জাতীয় পুরুষগণ সেই জাতীয় স্ত্রীগণকে উৎপীড়িত ও দুরবস্থা-সম্পন্ন করিয়া রাখিতে পারে, ইহা বিশ্বাস করা সুকঠিন। এরূপ ইচ্ছাই অস্বাভাবিক। নর-নারীর পরস্পরের ভাগ্য স্বাভাবিক নিয়মে এরূপ জড়িত যে, কোন-জাতীয় পুরুষ-সাধারণের পক্ষে ঐরূপ ইচ্ছা ও ক্রিয়া কোন মতেই সম্ভবপর নহে। অনেক দেশেই স্ত্রী ও পুরুষের সংখ্যা প্রায় সমান। রমণীর সহায়তা ব্যতীত কোন দেশেই মানবগণ সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে না। সকল-দেশীয় মানবের মধ্যেই তাহাদের অবস্থানুযায়ী ন্যায় বোধ বিদ্যমান আছে। সকল দেশের লোকের মধ্যেই দয়া, স্নেহ, প্রেম প্রভৃতি মানসিক শক্তির বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায় এবং নর-নারীর মধ্যে ঐ সকল বৃত্তির অপ্রতিহত বিনিময়ও হইয়া থাকে। এমন কি, পশুগণের মধ্যেও পুং-জাতি স্ত্রী-জাতির অনুরক্ত ও তাহাদিগকে উৎপীড়িত করে না। এরূপ অবস্থায়, এমন কোন সমাজের অস্তিত্ব কি সম্ভবপর হইতে পারে, যেখানে ঐ বিপরীত-ভাব লক্ষিত হইবে?—যেখানে মানবগণ স্বাভাবিক নিয়মের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান?—যেখানে পুরুষগণ (লোকসমষ্টির অর্দ্ধেক) রমণীগণকে—লোক সমষ্টির অপরার্দ্ধকে) চিরদিন পীড়ন ও অসম্মান করিয়া থাকে?—যে দেশে পুরুষগণ পশুগণ অপেক্ষাও হীন ও নৃশংস? অবস্থাভেদে, দুই চারি জন পুরুষ আপনার সহচরী বা অন্য নারীকে উৎপীড়িত ও ঘৃণা করিতে পারে; বা দুই চারি জন রমণী আপনার স্বামী বা অন্য পুরুষকে পীড়ন বা ঘৃণা করিতে পারে;—কিন্তু সহানুভূতি, সহকারিতা ও প্রেম-বিনিময়ই যে স্বাভাবিক নিয়ম,

তাহা অন্ধ ব্যতীত, বোধ হয়, আর কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। ইহাই পরিবার ও সমাজ গঠনের মূলীভূত কারণ। যদি তাহাই হয়, তবে কে রমণীকে চির-উপেক্ষিত, চির-দুরবস্থাপন্নিত করিয়া রাখিতে পারে?

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, প্রত্যেক সমাজেই স্ত্রী ও পুং-জাতির অবস্থা পরস্পর উপযোগী, গতানুগতিক ও সমঞ্জসীভূত, তাহা না হইলে সমাজরক্ষা অসম্ভব। কারণ-বিশেষের আবির্ভাবে এই নিয়মের কথঞ্চিৎ ব্যতিক্রম হইতে পারে ইহা স্বীকার্য্য, কিন্তু তাহা কখন স্থায়ী হইতে পারে না। যে সকল অসভ্য-জাতি কেবল মৃগয়া বা পশুপালন দ্বারা জীবনধারণ করে, যাহাদের নিশ্চিত ও স্থায়ী বাসগৃহ নাই, তাহাদের রমণীগণ পুরুষগণের কার্য্যের সহায়তা না করিয়া, খাদ্য প্রস্তুত না করিয়া, প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী প্রস্তুত না করিয়া যদি কেবল জ্ঞানালোচনায় প্রবৃত্ত হয়,—যদি কেবল মনোবিজ্ঞান, জ্যোতিষ, প্রত্নতত্ত্ব প্রভৃতির আলোচনায় দিবানিশি অতিবাহিত করে, তবে ঐ জাতির অবস্থা কি ভয়াবহ হইয়া উঠে? কৃষক-রমণী কৃষি-কার্য্যের সহায়তা না করিয়া, গৃহ-কার্য্য পরিচালন না করিয়া যদি কেবল সাহিত্য ও সমাজ-বিজ্ঞানের আলোচনায় দিনযাপন করেন, তবে কৃষকের পক্ষে কৃষিকার্য্য করা সুকঠিন হইয়া উঠে এবং তাহা হইলে অচিরকাল মধ্যে শস্যাভাবে সমাজ-মধ্যে বিষম বিপ্লব উপস্থিত হয়। মধ্যবিত্ত ভদ্রসমাজে—যেখানে মানসিক পরিশ্রমের প্রবলতা অধিক—যদি রমণীগণ গৃহরক্ষণ, শিশুপালন, রন্ধনাদি আবশ্যক-কার্য্য বর্জ্জন করিয়া, কেবল পুস্তকপাঠ, কবিতা-রচনা, সঙ্গীত, স্বেচ্ছা-ভ্রমণ ইত্যাদি কার্য্যে সময়াতিপাত করেন, তাহা হইলে অনাতবিলম্বেই অধিকাংশ ভদ্রলোকের গৃহ ক্লেশপূর্ণ ও শ্মশানবৎ হইয়া উঠে। এরূপ অবস্থার যে, নর-নারী উভয়ের অবস্থাই বিলোপনীয় হইয়া উঠে—সংসার অশান্তিময় হয়—আত্মরক্ষা অসম্ভব হইয়া উঠে, বোধ হয়, তাহা বলাই অনাবশ্যক। কিন্তু বিধাতার নিয়মে কোন সমাজ মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষের অবস্থা পরস্পর বিরোধিভাব ধারণ করিয়া দীর্ঘস্থায়ী হইতে পারে না; পরন্তু সকল দেশে ও সকল সমাজেই তাহাদের অবস্থার পরস্পর উপযোগিতা ও ও গতানুগতিকতা লক্ষিত হয়। এদেশে কি এই স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রম দৃষ্টিগোচর হয়? অন্যান্য দেশে মানবগণ যেরূপ শারীরিক ও মানসিক শক্তি-সম্পন্ন, এদেশেও সেইরূপ; অন্যান্য দেশের ন্যায় এদেশেও নর-নারী-সমবেত পরিবার ও সমাজ গঠিত হইয়াছে। সুতরাং বিশেষ কারণের অস্তিত্ব-ব্যতীত ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, অন্যান্য দেশের ন্যায় এদেশেও স্ত্রী ও পুরুষের অবস্থা পরস্পর উপযোগী। সে কারণ কোথায়?

আমরা এতক্ষণ যুক্তির অনুসরণ করিতেছিলাম। আমাদের সমাজ-মধ্যে দৃষ্টি-পাত করিলে কি দেখিতে পাই? বাস্তবিকই কি এদেশীয় ব্যক্তিগণ ললনাগণকে পীড়ন ও অসম্মান করিয়া থাকেন? আমরা সমাজ-মধ্যে ইহার কোনও প্রমাণ প্রাপ্ত হই না। এক বাঙ্গলা দেশে ছয় কোটী লোকের বাস। ইহার অর্দ্ধেক, অর্থাৎ তিন কোটী স্ত্রীলোক। এই বিপুল রমণী-সমাজ যে পুরুষ-পীড়িত ও তাঁহাদের দ্বারা অসম্মানিত, তাহার কোন চিহ্নই দেখা যায় না। অন্যান্য দেশের ন্যায় এদেশেও প্রত্যেক-জাতীয় রমণীগণ প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে, সামাজিক নিয়ম ও জ্ঞানানুযায়ী কর্ত্তব্য পালন করেন, সাংসারিক কার্য্য সম্পাদন করেন, পুরুষগণের সহকারিতা করেন; পুরুষেরাও আপনাদের জ্ঞান, অবস্থা ও শক্তি অনুসারে রমণীগণের রক্ষণ, পোষণ ও তাঁহাদের

অন্যান্য অভাব মোচন করিয়া থাকেন। "রমণীগণ পুরুষগণের ক্রীড়া-বস্তু"—ইহা অর্ব্বাচীনের কথা।

হিন্দু-জাতি রমণীগণকে সম্মান করিতে জানে না, ইহা কল্পনা করিলেও ঘৃণা ও লজ্জায় অধোবদন হইতে হয়। যেদেশে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়া রমণী-হৃদয়-বিকসিত মনোহর গুণ-রাজির পক্ষপাতী ও পূজক হইয়াছিলেন,—যিনি রমণী-সম্মানকারিগণের আদর্শ-স্থল,—যেদেশীয় শাস্ত্রে রমণীগণ "পূজনীয়া ও গৃহোজ্জ্বলকারিণী" বলিয়া উক্ত হইয়াছেন,—যেদেশীয় শাস্ত্রে "যে গৃহে নারীগণ পূজিতা, সেই গৃহে দেবগণ প্রীত" এই অনুজ্ঞা বিধিবদ্ধ হইয়াছে,—যেদেশীয় উপাসকগণ অন্য কোন সম্বোধনে পরিতৃপ্ত না হইয়া অবশেষে বিশ্বপতিকে "মাতা" সম্বোধনে হৃদয়ের প্রেমাবেগ পরিতৃপ্ত করিয়াছেন,—যেদেশের নৃশংস ডাকাইতগণও স্ত্রীজাতির অঙ্গে আঘাত করিতে কুণ্ঠিত,—সেই দেশীয় মানবগণ রমণীদিগকে সম্মান করিতে জানেন না ইহা সত্য-অপলাপকারীর কথা। এ কথার কোন মূল্য নাই।

এদেশীয় আচার্য্যগণ বাহ্য-চাকচিক্যে চির-উদাসীন। তাঁহারা আধ্যাত্মিক ভাবের দিকেই অধিক প্রবণ ছিলেন। সুতরাং বেশ-ভূষা ও গৃহাভ্যন্তরীণ নাট্য-ক্রিয়ার দিকে হিন্দু-জাতির দৃষ্টি ক্ষীণ। আমাদের ভাষা, ভূষা, আচার ও সাংসারিক কার্য্য-প্রণালী বিলাতী আদর্শে প্রবর্ত্তিত নহে, এজন্য অনেক সময় তাহা বিলাতী-রীতির অনুমোদিত হয় না। আমাদের জ্ঞান ও নৈতিক বিকাশ বিভিন্ন অবস্থায় উদ্ভূত হইয়াছে। কিন্তু হিন্দু-হৃদয় যে ভাব-গভীরতাময়, ইহা কে অস্বীকার করিতে পারে? রমণী-সম্মান, রমণী-মাহাত্ম্য এই দেশেই উচ্চতম সীমায় উপনীত হইয়াছে। যে শক্তি ধন-ধান্য-দায়িনী, সংসার-শ্রীবর্দ্ধিনী, তাহা লক্ষ্মীরূপে,—যে শক্তি বিপদ্ নাশিনী, শত্রু-দলনী, কাল-ভয়-নিবারিণী, তাহা কালীরূপে,—যে শক্তি জ্ঞান-প্রসবিনী, জ্ঞানদায়িনী, তাহা সরস্বতীরূপে—যে শক্তি সর্ব্ব-ভূতম বিশ্ব-প্রসবিনী, বিশ্বজননী, তাহাই আদ্যাশক্তি ভগবতীরূপে এদেশে পূজিত। ইহা অপেক্ষা রমণীগৌরব ও রমণী-মাহাত্ম্যের উচ্চতা ও প্রবলতা আর কোথায় দৃষ্টিগোচর হয়?

ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে, আমরা জননী, পিতামহী, মাতামহী, পিতৃষসা, মাতৃষসা, পিতৃব্য-পত্নী, ভ্রাতৃজায়া, ভগিনী, সহধর্ম্মিণী প্রভৃতিকে বিলাতী আদর্শে সম্মান করি না এবং তাহা করিতে চাহি না। এদেশে যেরূপে হিন্দু-বিধবা রাক্ষতা ও পালিতা, এরূপ আর কোথায় দেখিতে পাওয়া যায়? আমরা যদি নিজ জননী, ভগিনী প্রভৃতিকে সম্মান করিতে পারিব, তবে অন্যের জননী, ভগিনী প্রভৃতিকে সম্মান করিতে পারিব না ইহা নিতান্তই অস্বাভাবিক। যদি সে সম্মানের লাঘব কুত্রাপি হইয়া থাকে, তবে তাহা ধারাবাহিক মুসলমান ও ইংরেজ-শাসনের ফলস্বরূপ;—হিন্দুনীতির অসম্পূর্ণতা বশতঃ নহে।

"মাতৃবৎ পরদারেষু"—অপরের স্ত্রীকে মাতৃ-নির্ব্বিশেষে দেখিবে, ইহাই হিন্দুনীতির অনুশাসন। ইহা অপেক্ষা উচ্চতর নৈতিক আদর্শ আর কোথায় দেখা যায়? ইহা শাস্ত্র-গর্ভনিহিত অজ্ঞাত অদৃশ্য বিষয় নহে; শিশুকালে বালকদিগকে এই মহামন্ত্র শিক্ষা দেওয়া হয়। ইহা কেবল কথা নহে, ইহার অভ্যন্তরে জীবন্ত নৈতিক-শক্তি নিহিত আছে, যাহা এখনও হিন্দু-সমাজের বক্ষে প্রভাব বিস্তার করিতেছে। ইহার ফলও গৌরবময়। বিলাতী সভ্যতম সমাজের সহিত তুলনা কর, দেখিবে, নরনারী-সংসৃষ্ট নৈতিক-শিথিলতা সেখানে যেরূপ ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছে, এখানে সেরূপ নহে।

হিন্দু-ললনাগণের সতীত্ব সেই সকল বিলাস-রঞ্জিত সুসভ্য সমাজেরও আদর্শস্থল হইতে পারে। ইহা যদি হিন্দু-জাতির রমণী-সম্মানের পরিচায়ক না হয়, তবে রমণী-সম্মান কি, তাহা আমরা বুঝি না।

মুসলমান ও ইংরেজ-শাসনের প্রভাবে, বিশেষতঃ ইংরেজী-শিক্ষা-প্রভাবে যে, আমাদের ধর্ম্ম-ভাব ও শাস্ত্রানুমোদিত নৈতিক-জ্ঞান শিথিল হইতেছে, তাহা অনেকেই অনুভব করিতেছেন। তাহার অবশ্যম্ভাবী বিষময় ফল দেখিয়া সহৃদয় দেশ-হিতৈষিগণ দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিতেছেন। বিলাতী আদর্শে বিলাসস্রোত ক্রমে ক্রমে প্রবলতর বেগ-ধারণ করিতেছে, তাহার আনুসঙ্গিক কদাচার বাড়িতেছে। সুতরাং যে আদর্শে উল্লিখিত বামাহিতৈষী বক্তা ও লেখকগণ হিন্দুগণকে রমণী-সম্মান-বর্জ্জিত বলিয়াছেন, সেই আদর্শেই হিন্দু-রমণী-গণের সর্ব্বনাশের সূত্রপাত হইতেছে—তাঁহাদের প্রকৃত সম্ভ্রম, প্রকৃত গৌরব কলঙ্কিত হইবার উপক্রম হইয়াছে! রমণীগণের বিলাস-প্রমত্ততা, স্বেচ্ছাচারিতা, পরপুরুষের সহিত অবাধ বন্ধুতা ও অবাধ ভ্রমণ; পরস্পর হস্ত দ্বারা পৃষ্ঠদেশ আচ্ছাদিত করিয়া স্ত্রীপুরুষের প্রকাশ্য-ভ্রমণ, শকট হইতে উত্তরণ-সময়ে রমণীগণের পদ-ধারণ করিয়া সাহায্য-দান ইত্যাদি যদি কেবলমাত্র রমণী-সম্মানের পরিচায়ক হয়, তবে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার্য্য যে, সেরূপে সম্মান প্রদর্শন করার রীতি আমাদের সমাজে নাই। আমরা অপরাধী।

শ্রীবিষ্ণুচন্দ্র মৈত্র।

মাচ্ এ্যাড এ্যাবাউট্ নথিং।

(১)

মেসিনা-নগরের অধিপতি লিওনেটোর হীরো-নাম্নী এক কন্যা ও বিয়াট্রিস-নাম্নী এক ভ্রাতুষ্পুত্রী ছিল। হীরো ও বিয়াট্রিস পরস্পর একান্ত প্রীতিভরে রাজ-ভবনে অবস্থান করিত।

বিয়াট্রিস কিছু চঞ্চলা, হীরো কিছু গম্ভীর প্রকৃতি। বিয়াট্রিস সদা-সর্ব্বদা ক্রীড়া-কৌতুক ও হাস্য-পরিহাসে হীরোকে নিতান্ত প্রফুল্ল করিয়া তুলিত। পৃথিবীর যত কিছু ঘটনা, লঘু-প্রকৃতি বিয়াট্রিসের হৃদয়ে আনন্দ উৎপাদন করিত।

যে সময়ের এই ঘটনা বর্ণিত হইতেছে, সেই সময়, কতিপয় বীর-যুবক কোন যুদ্ধে জয় লাভ করিয়া যথেষ্ট সম্মান ও প্রতিপত্তি উপার্জ্জন পূর্ব্বক মেসিনা-নগর অতিক্রম করিতেছিলেন। তাঁহারা, মেসিনার অধিপতি লিওনেটোর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। এই সৈনিকগণের মধ্যে এ্যারাগন দেশের রাজপুত্র ডন্ পেড্রো এবং তাঁহার বন্ধু ফ্লরেন্স-দেশীয় লর্ড ক্লডিও উপস্থিত ছিলেন। আর প্যাডুয়া নগরের লর্ড বেনিডিক তাঁহাদিগের সমভিব্যাহারে ছিলেন। বেনিডিক হাস্য, কৌতুক ও রসিকতায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন।

এই সভ্রান্ত ব্যক্তিগণ বিদেশীয় হইলেও মেসিনা-রাজের নিকট অপরিচিত ছিলেন না। কারণ, ইতিপূর্ব্বে তাঁহারা মেসিনা-নগরে আসিয়াছিলেন। লিওনেটো আপন কন্যা ও ভ্রাতুষ্পুত্রীর সহিত তাঁহাদের পরিচয় করিয়া দিলেন।

গৃহে প্রবেশ মাত্র বেনিডিক, লিওনেটো ও এ্যারাগন-রাজপুত্রের সহিত হাস্য-কৌতুক আরম্ভ করিয়া দিলেন। বিয়াট্রিসও যথেষ্ট

বাচাল-প্রকৃতি ছিল; আগন্তুকের বাগ্মিতায় নিজে পরাজিত হইতে ইচ্ছা না করিয়া বেনি-ডিকের কথায় বাধা দিয়া বলিল, "মহাশয়! যখন কেহই আপনার কথা শুনিতেছেন না, তখন আপনা-আপনি এ মিথ্যা বকিয়া মরেন কেন?"

বেনিডিকও ছাড়িবার পাত্র নহেন, বিয়াট্রিসের এ প্রকার নারী-প্রকৃতির অনুচিত বাক্যে কিছু অসন্তুষ্ট হইলেন। তাহার পর তাঁহার মনে হইল যে, গত বারে যখন তিনি মেসিনা-রাজ-ভবনে উপস্থিত ছিলেন, তখন বিয়াট্রিস কেবল তাঁহাকে লইয়া হাস্য-পরিহাস করিত। আর ইহাও প্রায় দেখা গিয়া থাকে, যাহারা হাস্য-রসে রসিক, তাহারা অন্যের হাস্য-রসে তেমন সন্তুষ্ট হয় না। বেনিডিক ও বিয়া-ট্রিসের পক্ষেও তাহাই হইল। যখনই বিয়াট্রিস ও বেনিডিক পরস্পর পরস্পরের সাক্ষাৎ পাইত, উভয়েই উভয়ের কৌতুকাবহ কথোপকথনে অসন্তুষ্ট হইত এবং সে হাস্য-পরিহাস উপ-লক্ষে প্রায় এক ক্ষুদ্র "কুরুক্ষেত্র-ব্যাপার" হইয়া দাঁড়াইত। অধিকন্তু উভয়ের নিকট উভয়ের বিদায় কালেও উভয়ের মনের অসন্তুষ্ট ভাবটুকু প্রকাশ পাইত। কথোপকথনের মাঝখানে আজি যখন বিয়াট্রিস সহসা বেনিডিককে বলিল, "যখন কেহ তোমার কথা শুনিতেছে না, তখন মিছামিছি বকিয়া মর কেন?" তখন বেনিডিক এইরূপ ভাণ করিলেন, বিয়াট্রিস যে সেখানে উপস্থিত আছে, তাহা যেন তিনি জানিতেন না, বলিলেন, "একি! ঘৃণাকারিণী দেবী! আজও তুমি জীবিত আছ?"

মহা দ্বন্দ্ব বাধিয়া গেল। পরস্পরের প্রতি পরস্পরের বাক্যবাণ ছুটিতে লাগিল। বিয়াট্রিস জানিত, গত যুদ্ধে বেনিডিক যথেষ্ট সাহসিকতার পরিচয় দিয়াছেন। তথাপি বলিল, "যুদ্ধে তুমি যত লোক নিহত করিয়াছ, আমি রমণী হইলেও সে সমস্তই ধ্বংস করিতে পারিতাম।"

আবার যখন দেখিল, এ্যারাগন-রাজপুত্র বেনিডিকের কথাবার্ত্তায় বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন, তখন বলিয়া উঠিল, "ওহো! কি লজ্জা! দেখিতেছি, তুমি এই রাজকুমারের মিথ্যা তোষামোদকারী একটী ভাঁড়!"

বিয়াট্রিস এ পর্য্যন্ত যত কথা বলিয়াছে, তন্মধ্যে এই শেষ কথাটী বেনিডিকের মনে দারুণ আঘাত করিল। বিয়াট্রিস যখন বলিয়াছে, "যুদ্ধে যত লোক নিহত করিয়াছ, সে সকলই আমি একা ধ্বংস করিতে পারি"—বেনিডিক সে কথা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনেন নাই। আনেন নাই তাহার কারণ, তিনি আপনার বল বুঝিতেন। কিন্তু বিয়াট্রিসের এই শেষ বাক্যে তাঁহার অন্তরে দারুণ আঘাত লাগিল। যাহারা নিতান্তই কৌতুকামোদী ও হাস্যরস-রসিক হইয়া থাকে, তাহাদের ভাঁড়ামির অখ্যাতির বিষয়ে সর্ব্বদাই ভয় করিতে হয়। ভয় করিবার কারণ এই, অনেক সময় দেখা যায়, নীরস রসিকতা ভাঁড়া-মির নামান্তর মাত্র। বিয়াট্রিসের মুখে এইরূপ অপবাদের কথা শুনিয়া বেনিডিক তাহাকে মনে মনে অত্যন্ত ঘৃণা করিলেন। শান্ত-স্বভাব হীরো নিস্তব্ধ ভাবে এই সকল দেখিতেছিলেন। তাঁহার সমস্ত দেহে যৌবন-সুলভ সৌন্দর্য্যরাশি বিকশিত হইয়াছিল। এ্যারাগন-রাজপুত্রের সুহৃৎ ক্লডিও নিবিষ্ট মনে হীরোর সেই সৌন্দর্য্য-রাশি উপভোগ করিতেছিলেন। রাজপুত্র প্রথমা-বধি বেনিডিক ও বিয়াট্রিসের কৌতুকালাপ মনোযোগ পূর্ব্বক শুনিতেছিলেন। তিনি লিওনেটোর কর্ণে মৃদুস্বরে কহিলেন, "দেখি-তেছি, এই সুন্দরী বিয়াট্রিস বিলক্ষণ চতুরা এবং রসিকাও বটেন; বেনিডিকও তদ্রূপ। বোধ হয়, উভয়ে পরিণীত হইলে মন্দ হয় না।"

লিওনেটো। যদি ইহারা পরস্পরে বিবাহিত হয়, তবে এইরূপ হাস্য-পরিহাসে, দেখিবেন, সপ্তাহ মধ্যে ইহারা উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে!

যদিও লিওনেটো বুঝিলেন, ইহাদের পরস্পরের বিবাহ বড় সুবিধার হইবে না, কিন্তু রাজকুমারের ইচ্ছা, উভয়কে পতিপত্নী সূত্রে বদ্ধ করেন এবং সে সঙ্কল্প তিনি পরিত্যাগও করিলেন না।

---

(২)

যখন এ্যারাগন-রাজপুত্র, তাঁহার বন্ধু ক্লডিওর সহিত মেসিনা-রাজভবন হইতে প্রত্যাগত হইলেন, তিনি জানিতে পারিলেন, বিয়াট্রিসের সহিত বেনিডিকের বিবাহ দেওয়ার কল্পনা ব্যতীত অন্য এক ঘটনা ঘটিয়াছে। তিনি স্বীয় বন্ধু ক্লডিওর মুখে মেসিনা-রাজতনয়া হীরোর রূপলাবণ্যের যথেষ্ট প্রশংসা শুনিতে পাইলেন এবং তাহাতে বন্ধুর হৃদয়ের ভাবও বুঝিতে পারিলেন। বুঝিতে পারিয়া তিনি কিছুমাত্র অসন্তুষ্ট হইলেন না,—বরং জিজ্ঞাসা করিলেন, "বন্ধু! সত্যই কি তুমি হীরোকে ভাল বাসিয়াছ?"

ক্লডিও। গতবারে মেসিনা-নগরে আসিয়াছিলাম ও এই সুন্দরীকে দেখিয়াছিলাম বটে; কিন্তু তখন আমি যুদ্ধোন্মুখী বীর-সৈনিক। সেই সৈনিক চক্ষেই হীরোর প্রতি চাহিয়াছিলাম। তখন ভালবাসিবার অবসর ছিল না। কিন্তু এখন সংগ্রাম মিটিয়াছে, চারিদিকে শান্তি বিরাজ করিতেছে। তখন যুদ্ধচিন্তায় যে স্থান পূর্ণ ছিল, আজি হৃদয়ের সে স্থান শূন্য; তাই সৌন্দর্য্যময়ী হীরোর প্রতিমা অবসর বুঝিয়া এই শূন্য-হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

রাজপুত্র সকলই বুঝিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ লিওনেটোর নিকট এই সম্বন্ধে প্রস্তাব করিলেন। লিওনেটো এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং হীরোও তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন না। ক্লডিও বস্তুতঃ সর্ব্বগুণান্বিত ছিলেন। পরে সকলের সম্মতিক্রমে বিবাহের দিন ধার্য্য হইল।

বিবাহের জন্য যে দিন ধার্য্য হইল, তাহার অতি অল্পমাত্রই বাকী। কিন্তু সেই অল্প দিন ক্লডিওর পক্ষে অনেক বৎসরের ন্যায় প্রতীয়মান হইল। যুবকেরা যখন কোন বিষয় শেষ করিবার জন্য একেবারে উৎসাহিত হইয়া উঠে, অল্পমাত্র বিলম্বেও তাহারা ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পারে না; কিন্তু এ্যারাগন-রাজপুত্র, প্রিয় বন্ধুর এই কল্পিত সুদীর্ঘ সময় কোন বাস্তব আনন্দকর ঘটনার সহিত মিশ্রিত করিয়া অতি অল্পমুহূর্ত্তে পরিণত করিবার জন্য এক নূতন উপায় উদ্ভাবন করিলেন। সকলে মিলিয়া পরামর্শ দ্বারা ঠিক করিলেন যে, এই বেনিডিক ও বিয়াট্রিস যাহাতে পরস্পরের প্রণয়াকাঙ্ক্ষী হয়, সেইরূপ কোন কৌশল অবলম্বন করিতে হইবে। ক্লডিও অত্যন্ত আনন্দ সহকারে এই মতে মত দিলেন। মেসিনা-রাজ স্বয়ং এ কার্য্যে সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইলেন। এমন কি, বিয়াট্রিসের ভগিনী হীরো পর্য্যন্ত এ কার্য্যে যোগদান করিলেন এবং বলিলেন, "ভগিনী এমন সুযোগ্য পতি লাভ করিবেন, আমি অবশ্যই তাঁহার হৃদয়ে সে অনুরাগ জন্মাইয়া দিতে চেষ্টা করিব।"

---

(৩)

এ্যারাগন-রাজপুত্র বেনিডিক ও বিয়াট্রিসকে লইয়া যে কৌতুক করিবেন, তাহার উপায় নির্দ্ধারিত হইল। ক্লডিও এবং অন্যান্য ব্যক্তি বেনিডিককে বুঝাইতে চেষ্টা করিবে যে, বিয়াট্রিস যথার্থই যেন তাহার প্রতি অনুরাগিণী এবং মেসিনা-রাজকুমারী হীরো স্বীয় ভগিনী বিয়াট্রিসকে বিশ্বাস করাইবেন, যেন বেনিডিক যথার্থ তাহার প্রণয়-প্রার্থী।

সর্ব্বপ্রথমে বেনিডিককে লইয়া পালা আরম্ভ হইল। মেসিনা-রাজ লিওনেটো, এ্যারাগন-

রহস্যে সংকল্প সিদ্ধি।



রাজপুত্র ও তদীয় সুহৃৎ ক্লডিও পূর্ব্ব পরামর্শমত বেনিডিকের উপর আপনাদিগের কৌশল প্রয়োগ করিলেন।

একদিন ঘটনাক্রমে এক কুঞ্জমধ্যে বসিয়া বেনিডিক নিবিষ্ট মনে পুস্তক অধ্যয়ন করিতেছিলেন, সেই অবসরে এ্যারাগন-রাজপুত্র প্রভৃতি সেই কুঞ্জের অতি নিকটবর্ত্তী বৃক্ষান্তরালে লুকাইয়া দাঁড়াইলেন। এত নিকটে দাঁড়াইলেন যে, বেনিডিক তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইলেন না বটে, কিন্তু তাঁহাদিগের সমস্ত কথা-বার্ত্তা সুস্পষ্ট শুনিতে পাইলেন।

প্রথমটা নানারূপ অপ্রাসঙ্গিক কথা চলিতে লাগিল। এ্যারাগন-রাজকুমার মেসিনা-রাজকে সম্বোধন করিয়া কথা পাড়িলেন। এমন ভাবে কথা পাড়িলেন, যেন, পূর্ব্ব হইতে তাহার সূচনা হইয়াছিল। বলিলেন, "তারপর মহাশয়, সে দিন না আপনি বলিতেছিলেন, আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রী বিয়াট্রিস বেনিডিকের প্রতি অনুরাগিণী হইয়াছেন? আমার কিন্তু কখন মনে হয় না, সে রমণী কাহারও প্রণয়াকাঙ্ক্ষিণী হইবে।"

লিওনেটো। সত্যই রাজকুমার! আমারও ঐরূপ বিশ্বাস ছিল। ইহা নিতান্তই আশ্চর্য্যের বিষয় বটে। কারণ এ দিকে দেখিতে পাই, বাহিরের ব্যবহারে বিয়াট্রিস বেনিডিককে যথেষ্ট অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া থাকে। কিন্তু——

ক্লডিও-ও সেই কথাটা আরও ঘোরাল করিয়া বলিলেন,—"বলিতে কি, ব্যাপার এমনই

দাঁড়াইয়াছে যে, হীরোর নিকট শুনিয়াছি, বেনিডিকের ভালবাসা না পাইলে বিয়াট্রিস নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিবেন!"

এ কথায় লিওনেটো এবং ক্লডিও একবাক্য হইয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন, "ব্যাপার নিতান্তই গুরুতর! বেনিডিকের মনে এ অনুরাগ জন্মাইয়া দেওয়া সহজ নয়। কারণ, তিনি সকল সুন্দরীর বিরুদ্ধেই—বিশেষ বিয়াট্রিসের বিরুদ্ধে লাগিয়াই আছেন।"

এ্যারাগন-রাজপুত্র এরূপ ভাব দেখাইলেন, যেন তিনি বিয়াট্রিসের দুঃখে নিতান্তই কাতর এবং নিতান্তই বিষণ্ণ; বলিলেন, "তাই ত! তবে এ ব্যাপার বেনিডিককে জানান উচিত।"

ক্লডিও। তাহাতে কি ফল? বেনিডিক এ কথা শুনিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিবেন এবং হয়ত বিয়াট্রিসের হৃদয়ে আরও দুঃখ দিবেন।

রাজপুত্র। যদি তাই হয়, তবে বেনিডিকের প্রাণদণ্ড করা উচিত। বিয়াট্রিস রূপে গুণে সকল রকমেই সুন্দরী। হায়, অরসিক বেনিডিকের প্রতি তাঁহার এ ভালবাসা কেন হইল?

এই কথা বলিয়া রাজকুমার ইঙ্গিত করিলেন, সহকারিগণ চলিয়া গেলেন। রাজকুমার বুঝিলেন, এতক্ষণ তাঁহারা যাহা বলিলেন, বেনিডিক তাহা সমস্তই শুনিয়াছেন এবং এখন তিনি সেই সকল কথা লইয়া মনের মধ্যে দারুণ আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছেন।

রাজকুমার প্রস্থান করিলেন। বেনিডিক আকাশ-পাতাল ভাবিতে বসিলেন।

---

(৪)

বেনিডিক অত্যন্ত মনোযোগ-সহকারে কথাগুলি শ্রবণ করিয়াছিলেন। বিয়াট্রিস যে তাঁহাকে ভালবাসে, ইহা মনে করিয়া তিনি আপনা-আপনি বলিতে লাগিলেন, "ইহাও কি সম্ভব? বিয়াট্রিস আমারই প্রতি অনুরাগিণী?" এইরূপ ভাবিয়া আপনা-আপনি বিচার করিতে বসিলেন;—"এ্যারাগন-রাজপুত্র প্রভৃতি যেরূপ বলিতেছিলেন, তাহা কোনরূপ প্রতারণা হইতে পারে না। কেননা, তাঁহারা বেশ অকপটভাবেই এ কথার আলোচনা করিতেছিলেন। হীরোর নিকট হইতে তাঁহারা এ কথা শুনিয়াছেন এবং তাঁহারা যে বিয়াট্রিসের জন্য কিছু উদ্বিগ্ন ও চিন্তিত, তাহাও বুঝা গেল। বিয়াট্রিস আমাকে ভালবাসেন? তবে এ প্রেমের প্রতিদানও আবশ্যক। বিবাহ করিব, এমন কথা আমার মনেও কখন উদয় হয় নাই। মনে মনে এক রকম সঙ্কল্প ছিল যে, এইরূপ অবিবাহিত অবস্থায় জীবনটা কাটাইয়া দিব; ভ্রমেও একবার মনে করি নাই যে, আমাকে আবার বিবাহ করিতে হইবে। রাজপুত্র প্রভৃতি বলিতেছিলেন, বিয়াট্রিস রূপবতী এবং গুণবতীও বটেন, বস্তুতঃ তাহাতে সন্দেহও নাই। সকল কার্য্যেই বিয়াট্রিসের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাই। কিন্তু আমার প্রতি তাঁহার অনুরাগ,—ইহাতে কিন্তু তেমন সুবুদ্ধির পরিচয় পাইলাম না। তাই বা কেন? ইহা এমনই বা কি দোষের কার্য্য হইয়াছে?"

বেনিডিক যখন এইরূপ চিন্তায় নিমগ্ন, বিয়াট্রিস সেই সময় সেখানে আসিতেছিলেন। তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "আজ দেখিতেছি, বিয়াট্রিস যথার্থই সুন্দরী বটে। অনুরাগের কিছু চিহ্নও যেন দেখিতেছি।"

অনন্তর বিয়াট্রিস তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া নারী-স্বভাব-অনুচিত কিছু পরুষকণ্ঠে কহিলেন, "আমার অনিচ্ছাসত্ত্বেও তোমার ভোজনার্থ তোমায় ডাকিতে আসিয়াছি।"

বেনিডিক এখন আর সে বেনিডিক নাই। যে ভাবে উত্তর দিলেন, বিয়াট্রিসকে তেমন মধুর সম্ভাষণ তিনি কখন করেন নাই। বলিলেন, "সুন্দরি! এজন্য তুমি কেন এত ক্লেশ স্বীকার করিলে? আমি তোমাকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি।"

কিন্তু বিয়াট্রিস তাহাতে কর্ণপাতও করিলেন না। বরং স্বাভাবিক মিঠে-কড়া রকমের দুই চারি কথা শুনাইয়া চলিয়া গেলেন।

বিয়াট্রিসের সেইরূপ পরুষ-বাক্য বেনিডিক বরাবরই শুনিয়া আসিতেছেন। আজি কিন্তু তাঁহার মনে হইল, এই কঠোরতার মধ্যে বেশ একটুখানি কমনীয়তা প্রচ্ছন্নভাবে আছে। তাই মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "যদি আমি বিয়াট্রিসের প্রেমের প্রতিদান না দিই, তবে নিশ্চয়ই আমি অতি নিষ্ঠুর। যদি আমি তাঁহাকে ভাল না বাসি, তবে নিশ্চয়ই আমি নরাধম। এখন একবার পরীক্ষা করিয়া দেখি, বিয়াট্রিসের প্রকৃত মনের ভাব কি।"

ধূর্ত্ত বেনিডিক এইরূপ কৌশলে প্রেম-জালে আবদ্ধ হইলেন।

---

(৫)

এইবার বিয়াট্রিসের পালা। হীরো সে ভার লইয়াছিলেন। তিনি দুই জন সহচরীকে আহ্বান করিয়া সেই কার্য্যে সহায়তা করিতে বলিলেন। এক জনকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "সখি, তুমি একবার বৈঠকখানায় যাও। সেখানে দেখিবে, আমার ভগিনী বিয়াট্রিস এ্যারাগন-রাজকুমার ও ক্লডিওর সহিত বাক্যালাপ করিতেছেন। তুমি চুপি চুপি তাঁহার কাণে কাণে বলিয়া আইস, আমরা উদ্যানে ভ্রমণ করিতেছি আর যে কিছু আলোচনা করিতেছি, সে সকলই বিয়াট্রিসকে উপলক্ষ করিয়া। এবং আরও বলিও, বিয়াট্রিস যেন তরুপল্লবাচ্ছাদিত সেই কুঞ্জকানন মধ্যে দাঁড়াইয়া চুপি চুপি আমাদের কথাবার্ত্তা শ্রবণ করে। তাহা হইলে আমরা যে তাহারই বিষয়ে কথোপকথন করিতেছি, তাহা উপলব্ধি হইবে।"

ইতিমধ্যে এই কুঞ্জমধ্যে বসিয়া বেনিডিক, এ্যারাগন-রাজপুত্র প্রভৃতির সেই কথাবার্ত্তা শুনিয়াছিলেন! হীরোর সহচরী সমস্ত শুনিয়া কহিল, "তুমি আর সমস্ত ঠিক কর, আমি এখনই বিয়াট্রিসকে বলিয়া আসিতেছি এবং তিনি যে এখনই সেখানে ছুটিবেন, তাহা আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি।"

অনন্তর হীরো অন্য সখী সমভিব্যাহারে কথিত উদ্যানমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং কহিলেন, "দেখ সখি, যখন বিয়াট্রিস এই কুঞ্জমধ্যে আসিবে, তোমার আমার এই পথটীর ধারে বেড়াইতে থাকিব এবং বিয়াট্রিসকে এরূপ বুঝিতে দিব, যেন আমরা তাহাকে দেখিতে পাই নাই। বেড়াইতে বেড়াইতে আমরা বেনিডিক সম্বন্ধে নানা কথার আলোচনা করিব এবং যখনই আমি তাঁহার নাম উল্লেখ করিব, তুমি তাঁহার প্রশংসা করিবে।—এমন প্রশংসা করিবে যে, মানুষ কখন তত প্রত্যাশা করিতে পারে না। আমি সর্ব্বপ্রথমেই তোমার সহিত এইরূপ কথা পাড়িব যে, বেনিডিক যেন আমার ভগিনী বিয়াট্রিসের প্রতি অনুরাগী হইয়াছেন।—(মৃদুস্বরে) ঐ দেখ, আমাদের কথাবার্ত্তা শুনিবার জন্য বিয়াট্রিস কত মৃদু মৃদু আপনাকে লুকাইয়া অতি সাবধানে ঐ কুঞ্জমধ্যে আসিতেছে। তবে এস, আমরাও এইবারে আরম্ভ করি।"

---

(৬)

আরম্ভটা এইরূপ হইল।—

হীরো ইতিপূর্ব্বে যেন তাঁহার সখীর সহিত বেনিডিক ও বিয়াট্রিসের প্রণয়-সম্বন্ধে কথোপকথন করিতেছিলেন। এক্ষণে বলিলেন, "না সখি, আমি ইহাতে বিশ্বাস করিতে পারি না। বিয়াট্রিস বড় গর্ব্বিতা; আর পার্ব্ব-

ভীরু পক্ষীর ন্যায় তাহার অন্তর প্রণয়-সম্বন্ধে বড়ই লজ্জাশীল।"

সখী। কিন্তু তুমি কি ঠিক জান, বেনিডিক বিয়াট্রিসকে যথার্থই ভাল বাসেন?

হীরো। এ্যারাগন-রাজপুত্র এইরূপ বলিয়াছেন এবং আমার প্রিয়তম লর্ড ক্লডিওর মুখেও এইরূপ শুনিয়াছি। আর তাঁহারা বিয়াট্রিসকে এ সম্বন্ধে জানাইবার জন্য আমাকে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিয়াছেন। কিন্তু আমি আবার তাঁহাদিগকে বলিয়া দিয়াছি যে, যদি তোমরা বেনিডিকের যথার্থ সুহৃৎ হও এবং যথার্থই যদি তাঁহার প্রতি তোমাদের স্নেহ থাকে, তবে এ কথা কখন বিয়াট্রিসের কর্ণগোচর করিও না।

সখী। মিছা নহে। বিয়াট্রিসকে না জানানই ভাল। কি জানি, হয়ত বেনিডিকের এই প্রণয়-প্রসঙ্গ লইয়া তিনি কতই ব্যঙ্গ ও কৌতুক করিবেন।

হীরো। আমার ভগিনীর স্বভাব এমনই যে, অতি ভগবান্ ও গুণবান্ পুরুষের কথা শুনিলেও তিনি তাহার নিন্দা করিয়া থাকেন।

সখী। এ প্রকার স্বভাব নিশ্চয়ই প্রশংসার কথা নহে।

হীরো। তা ঠিক। কিন্তু আমার ভগিনীকে এ কথা বলিতে কে সাহস করিবে? আমি যদি বলিতে যাই, আমার কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিবেন।

সখী। আমার বোধ হয়, তুমি ভুল বুঝিতেছ! বিয়াট্রিস কি এতই বুদ্ধিহীনা যে, বেনিডিকের মত এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পাত্রকে পরিত্যাগ করিবেন?

হীরো। বেনিডিকের যথেষ্ট সুখ্যাতির বিষয় আছে। এই ইটালীর মধ্যে আমার প্রিয়তম ক্লডিও ব্যতীত বেনিডিক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ।

এইরূপ কথার পর তাঁহাদের পরস্পরের একটু ইঙ্গিত-ইসারা, একটু আঁচা-আঁচি হইল এবং সেই প্রসঙ্গ অন্যদিকে পরিবর্ত্তিত হইল।

সখী বলিল, "আচ্ছা তোমার বিবাহ হইবে কবে?"

হীরো। প্রিয়তম ক্লডিওর সহিত কল্য আমার বিবাহের দিন স্থির আছে। চল দেখি, একবার নূতন পরিচ্ছদগুলি দেখিয়া আসি। কল্য কোন্ পরিচ্ছদ পরিধান করিব, তাহা তুমি নির্ব্বাচন করিবে।

হীরো সখী সমভিব্যাহারে প্রস্থান করিলেন।

---

(৭)

বিয়াট্রিস সেই কুঞ্জান্তরালে দাঁড়াইয়া এই কথাগুলি শুনিতেছিলেন। স্থির, নিশ্চল, পাষাণ-প্রতিমাবৎ দাঁড়াইয়া শুনিতেছিলেন। নিশ্বাস পড়িতেছিল কিনা, সন্দেহ। সখী সমভিব্যাহারে হীরো যখন চলিয়া গেলেন, আবেগভরে বিয়াট্রিস বলিয়া উঠিলেন, "কি শুনিলাম! কর্ণকুহরে যেন কে আগুন জ্বালিয়া দিল! ইহা কি সত্য! তবে ঘৃণা, বিদ্রূপ, সকলই বিদায় হও! আমি কুমারী,—কুমারীর যে অভিমান, তাহাও দূর হউক। বেনিডিক! প্রিয়তম বেনিডিক! ভালবাস, ভালবাস, আরও ভালবাস! আমিও আমার এ দুরন্ত হৃদয়, তোমারই চরণে বিকাইব। তোমার প্রেমশান্তিজলে এ দুরন্ত হৃদয় শান্ত হইবে। আমিও তোমায় ভাল বাসিব।"

এইরূপে বেনিডিক ও বিয়াট্রিসের হৃদয়ে পরস্পরের মধ্যে প্রেম জন্মিল। অন্ধকার আকাশ উজ্জ্বল করিয়া প্রেম-পূর্ণচন্দ্র উদয় হইল।

সুচতুর এ্যারাগন-রাজপুত্রের কৌশলে বেনিডিক ও বিয়াট্রিস্ পরস্পরের অজ্ঞাতসারে প্রতারিত হইয়া এবং মিথ্যা বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া পরস্পরের প্রেমাকাঙ্ক্ষী হইয়া

উঠিলেন। ঘটনাটী বড় সুখের হইত এবং এমন দুইটী অনৈক্য হৃদয়ের মিলন দেখিবার জিনিস হইত বটে; কিন্তু দৈব-বিড়ম্বনায় ঘটনা ঘটিল অন্যরূপ। হীরোর ভাগ্য-গগনে বড় একখণ্ড ঘন মেঘ উঠিল। যেদিন হীরোর বিবাহ উৎসবের আনন্দ-কোলাহলে গৃহ পরিপূর্ণ হইবে, সেই দিন হীরো ও তাঁহার পিতা লিওনেটোর হৃদয়ে দারুণ আঘাত লাগিল। পবিত্র প্রণয়-মন্দিরে পিশাচের অধিষ্ঠান হইল। ক্রমেই সে সকল কথা আলোচিত হইতেছে।

---

(৮)

এ্যারাগন-রাজপুত্রের এক বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ছিল। তাহার নাম ডন্ জন্। এই ব্যক্তি এই সময়ে মেসিনা-নগরে উপস্থিত ছিল। লোকটা নিতান্তই শান্তিহীন এবং এরূপ খলপ্রকৃতি ছিল যে, সর্ব্বদাই পরের মন্দ করিবার মতলব আঁটিত। এ্যারাগন-রাজপুত্র তাহার ভাই বটেন, কিন্তু তাঁহার প্রতি তাহার বিজাতীয় ঘৃণা ছিল এবং ভাইয়ের বন্ধু বলিয়া লর্ড ক্লডিওকেও সে ঘৃণা করিত। জন্ সঙ্কল্প করিল, "ক্লডিওর সহিত হীরোর এই যে বিবাহ-সংঘটন হইতেছে, ইহা হইতে দিব না। দেখিতেছি, আমার ভ্রাতা এই উদ্যোগের মধ্যে হৃদয় ঢালিয়া দিয়াছেন। অতএব কোনও মতে এ কার্য্যে বিঘ্ন উৎপাদন করিতে পারিলে তাঁহার উদ্দেশ্য পণ্ড হইবে।"

খল এইরূপেই আনন্দ লাভ করিয়া থাকে।

এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া পাপিষ্ঠ জন্ বোরাকিও নামক এক ভীষণ খলের সাহায্য লইল এবং তাহাকে প্রভূত পুরস্কারের লোভে আকৃষ্ট করিয়া আপন অভীষ্ট-সিদ্ধির জন্য উৎসাহিত করিতে লাগিল। জনের নিযুক্ত এই বোরাকিও হীরোর এক সহচরীর প্রতি অনুরক্ত ছিল। জন্ তাহা জানিত। জন্ তাহাকে এইরূপ শিখাইয়া দিল, "দেখ, তুমি তোমার প্রণয়িনীকে এইরূপ স্বীকার করাইয়া লইবে যে, সে যেন রাত্রিকালে, হীরো নিদ্রিতা হইলে, হীরোর পরিচ্ছদে আবৃতা হইয়া হীরোর শয়নকক্ষের গবাক্ষদ্বারে দাঁড়াইয়া তোমার সহিত কথা কহে, এবং সেই সময়ে আমি ক্লডিওকে দেখাইয়া দিব, তাহার বড় সাধের হীরো পরপুরুষের প্রতি কেমন প্রণয়াসক্ত! হীরোর পরিচ্ছদে আবৃতা থাকিলে তোমার প্রণয়িনীকে ক্লডিও সহসা চিনিতে পারিবে না।"

পাপিষ্ঠ বোরাকিও ডন্ জনের এই পাপ-প্রস্তাবে সম্মত হইল। খলের ষড়যন্ত্রে নরকের আগুন জ্বলিয়া উঠিল।

---

(৯)

এইরূপ স্থির করিয়া পাপিষ্ঠ জন্, এ্যারাগন-রাজপুত্র ও ক্লডিওর নিকট গমন করিয়া হীরোর প্রসঙ্গ উত্থাপন করিল। বলিল, "তোমাদের পছন্দকে বলিহারী যাই! নিশীথে, বাতায়ন-পথে দাঁড়াইয়া পরপুরুষের সহিত প্রণয়ালাপ কুল-কুমারীর পবিত্রতার চিহ্ন বটে!"

তখন সন্ধ্যা। সেই সন্ধ্যার পর রাত্রি। সেই রাত্রি-প্রভাতেই বিবাহ।

ক্লডিওর মন চঞ্চল হইল। রাজপুত্র ও ক্লডিও সত্যাসত্যের প্রমাণ চাহিলেন। জন্ প্রত্যক্ষ ঘটনা দেখাইয়া দিতে স্বীকার করিল। ক্লডিও বলিলেন, "জন্ যাহা বলিতেছে, যদি তাহা সত্য হয়, আমি কখনই বিবাহ করিব না। কল্য সভায় দাঁড়াইয়া, বিবাহ-উৎসবে তাহার যে মুখমণ্ডল উৎফুল্ল দেখিতাম, নিন্দার ঘনকালিমায় তাহা ঢাকিয়া দিব।"

রাজপুত্র। আর এই বিবাহ ব্যাপারে আমি যেমন তোমার সহায়তা করিয়াছি,—তাহার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ ঘৃণা ও অপমানে সেই কলঙ্কিনীর মস্তক অবনত করিতে আমিও তেমনই সহায়তা করিব!

সয়তানের ষড়যন্ত্র।



তার পর সেই রাত্রে যখন সকলে হীরোর গৃহ-সন্নিকটে দাঁড়াইল, দেখিল, কে এক ব্যক্তি হীরোর গৃহের বাতায়ন-তলে দাঁড়াইয়া আছে, আর হীরো বাতায়নে মুখ বাড়াইয়া তাহার সহিত কথোপকথন করিতেছে।

বস্তুতঃ, সে সকলই খলস্বভাব জনের কাজ এবং এ রমণী যে হীরো নহেন,—হীরোর বসনাবৃতা হীরোর এক সহচরী, পাঠক তাহা বুঝিয়াছেন। বুঝিয়াছেন, এ সকলই সেই খলের পূর্ব্ব অনুষ্ঠান। কিন্তু রাজপুত্র বা ক্লডিও ত আসল ব্যাপার কিছুই বুঝিলেন না!

এইরূপ না বুঝিয়া, ক্লডিওর অন্তরে ক্রোধ-বহ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। রাজকুমারী হীরোর প্রতি তাঁহার যে বিশ্বাস ও স্নেহ ছিল, তাহা ঘোর ঘৃণায় পরিণত হইল। তিনি মনে মনে দৃঢ় সঙ্কল্প করিলেন,—"বিবাহকালে ধর্ম্ম-মন্দিরে দশের মাঝে কাল এ কথা প্রকাশ করিয়া দিব।"

রাজপুত্রও তাহাতে পূর্ণ সম্মতি দিলেন। বলিলেন, "কল্য যাহার বিবাহ হইবে, আজি নিশীথে গবাক্ষপথে দাঁড়াইয়া পর-পুরুষের সহিত তাহার আলাপ! কিসে যে এই দুষ্টার সমুচিত শাস্তি হয়, বলিতে পারি না।"

অমৃতে গরল মিশিল।

---

(১০)

পরদিন বিবাহ-সভায় যখন সকল লোক সমবেত হইয়াছে এবং হীরো ও মেসিনা-রাজ পুরোহিতের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন,—যখন পুরোহিত মঙ্গলবিধির উদ্যোগ করিতেছেন, সেই সময় কোপপ্রজ্বলিত-হৃদয়ে, অতি ক্ষুব্ধভাবে ক্লডিও মনের ভাব ব্যক্ত করিলেন। রাজকন্যা হীরো যে ঘোর অবিশ্বাসিনী ও কলঙ্কিনী, দশের মাঝে অতি কঠোর ও পরুষ-ভাষায় তাহা ব্যক্ত করিলেন। সভাস্থ লোকবৃন্দ শুনিয়া অবাক্ হইল। হীরো সেই কথা শুনিয়া অতি ধীরে ধীরে বলিল, "আমি আশা করি, আমার প্রিয়-তম ক্লডিওর মস্তিষ্ক বিকৃত হয় নাই। তিনি যাহা বলিতেছেন, ইহা অপেক্ষা ভয়ানক কথা আর কি হইতে পারে?"

মেসিনা-রাজ লিওনেটোও অধিকতর চমৎ-কৃত হইয়া এ্যারাগন-রাজপুত্রকে বলিলেন, "রাজকুমার! আপনি নীরব রহিয়াছেন কেন?"

রাজপুত্র। আমি আর কি বলিব? ঘৃণায়, লজ্জায়, অপমানে আমি মাথা তুলিতে পারি-তেছি না। এমনই একটা অধম রমণীর সহিত আমার প্রিয় বন্ধুর বিবাহকার্য্যে আমি ব্রতী হইয়াছিলাম! মহাশয়, অধিক কি বলিব? গত রাত্রে আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি, আপনার কন্যা বাতায়ন-পথে দাঁড়াইয়া পর-পুরুষের সহিত অবৈধরূপে প্রণয়ালাপ করিতেছেন!

বেনিডিক এ সকল কথা শুনিয়া বিস্মিত হইতেছিলেন। বলিলেন, "পরিণয়ের ত এ রীতি নহে।"

হীরো এই কলঙ্কের কথায় দারুণ মর্ম্মাহত হইলেন। বলিলেন, "হা ঈশ্বর! ইহাও কি সম্ভব?——"

তখন সেই ব্যথিতা রাজকুমারী মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। বোধ হইল, বুঝি তাঁহার প্রাণ দেহ ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

এ্যারাগন-রাজপুত্র ও ক্লডিও সেই অবস্থায় সেই সভা হইতে প্রস্থান করিলেন। হীরো আর উঠিল কি না, তাহা দেখিবার জন্য এক-টুকুও অপেক্ষা করিলেন না। ব্যথিত-হৃদয় রাজা লিওনেটোর সে মর্ম্মান্তিক কষ্টে তাঁহারা একবার ভ্রূক্ষেপও করিলেন না। দারুণ ক্রোধ, ঘৃণা ও অভিমান তাঁহাদের হৃদয়কে পাষাণবৎ এমনই কঠিন করিয়া তুলিয়াছিল!

---

(১১)

বেনিডিক ও বিয়াট্রিস উভয়ে মূর্চ্ছিতা হীরোর শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। বেনিডিক জিজ্ঞাসিলেন, "হীরো এখন কেমন আছেন?"

বিয়াট্রিস ভগিনীকে বড় ভাল বাসিত। বিষণ্ণবদনে উত্তর করিল, "আর কেমন আছেন! বুঝি, চৈতন্য আর ফিরিবে না।"

ভগিনীর সচ্চরিত্রতা ও সৎপ্রকৃতিতে বিয়া-ট্রিসের সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল। সেই ভগিনীর প্রতি এই প্রকারের অপবাদ বিয়াট্রিসের বিশ্বাস হইল না। কিন্তু লিওনেটোর বিশ্বাস, যে কলঙ্ক রটিয়াছে তাহা মিথ্যা নহে। তিনি কন্যাকে সেইরূপ মৃতের ন্যায় অবস্থান করিতে দেখিয়া অত্যন্ত বিলাপ করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু দারুণ লোক-লজ্জায় মনে মনে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, "আমার কন্যার দেহে আর যেন চৈতন্য ফিরিয়া না আসে! আর যেন হতভাগিনীর নয়ন-উন্মীলন না হয়।"

কিন্তু সেই বৃদ্ধ পুরোহিত বড়ই বুদ্ধিমান। মানবচরিত্রের অপূর্ব্ব রহস্য উদ্ঘাটন করিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। যখন সেই নির্দ্দোষ রাজকুমারীর প্রতি এরূপ দুরপনেয় কলঙ্ক আরোপিত হইল, তিনি একান্ত মনে কুমারীর মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। দেখিলেন, লাজময়ীর মুখমণ্ডলে সহস্র সহস্রবার লজ্জার রক্তিম আভা বিদ্যুদ্বৎ চমকিতেছে। পরক্ষণেই দেখিলেন, স্বর্গের পবিত্র জ্যোতি সেই মুখমণ্ডলে দীপ্তি পাইতেছে। তিনি হীরোর চক্ষের প্রতি চাহিলেন, দেখিলেন, সে আঁখি-যুগল হইতে কি-এক অপূর্ব্ব তেজ বহির্গত হই-তেছে। স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে, রাজ-কুমারীর প্রতি যে কলঙ্কের আরোপ, তাহা

সম্পূর্ণ মিথ্যা। পুরোহিত সেই শোকার্ত্ত পিতাকে বলিলেন, "আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস, আপনার কন্যা নিরপরাধ। যদি একথা মিথ্যা হয়, তবে আমাকে নির্ব্বোধ, মূর্খ ও অবিবেচক বলিয়া জানিবেন। আমার শাস্ত্রজ্ঞান, বিদ্যা, বুদ্ধি, মানবচরিত্রে অভিজ্ঞতা—সকলই মিথ্যা বলিয়া জানিবেন। আমার এই বৃদ্ধ বয়স, আমার এই খ্যাতি ও গৌরব, আমার এই ধর্ম্ম-যাজকতা—এ সকলই মিথ্যা বলিয়া জানিবেন"। যখন হীরোর মূর্চ্ছা ভাঙ্গিল, পুরোহিত স্নেহ-ভরে জিজ্ঞাসিলেন, "বৎসে! তোমার নামের সহিত যে ব্যক্তির কথা একত্র উচ্চারিত হইয়াছে, সে ব্যক্তি কে? তাহার নাম কি?"

হীরো। যাঁহারা এই কলঙ্ক রটাইলেন, তাঁহারাই জানেন, আমি কিছুই জানি না।

পরে পিতাকে কহিলেন, "পিতঃ! গত রাত্রে তেমন অসময়ে কোন ব্যক্তির সহিত আমি কথা কহিয়াছি, ইহা যদি সত্য হয়, তবে আমাকে ঘৃণা করুন, দূর করিয়া দিন, কিংবা মৃত্যুর তুল্য কোন যন্ত্রণা প্রদান করিয়া ইহার সমুচিত দণ্ডবিধান করুন।"

পুরোহিত বলিলেন, "রাজকুমার ও ক্লডিও নিশ্চয়ই ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। রাজন্! আমি আপনাকে একটী পরামর্শ দিই। এইরূপ প্রচার করিয়া দিন, যেন আপনার কন্যার মৃত্যু হইয়াছে। সেই দারুণ কলঙ্কের কথা শুনিয়া হীরো যেরূপ মূর্চ্ছাগত হইয়াছিল, তাহাতে অকস্মাৎ মৃত্যু হইয়াছে, ইহাতে কেহ অবিশ্বাস করিবে না। এবং আপনিও শোক-বসন পরিধান করুন;—কন্যার মৃত্যুতে বিধিমত সকল অনুষ্ঠান করিয়া তাহার কবর ভূমির উপর স্মৃতি-স্তম্ভ স্থাপন করুন।"

লিওনেটো। ইহাতে কি হইবে?

পুরোহিত। এই মৃত্যু-সংবাদে লোকে হীরোর কলঙ্কের কথা ক্রমে ভুলিয়া যাইবে এবং তাহার প্রতি দয়াপরবশ হইবে। ইহাতে কিছু মঙ্গল হইবে। কিন্তু আমি যতটা আশা করি, ইহা দ্বারা ততটা না হইতেও পারে। তবে যখন ক্লডিও শুনিবে যে, তাহার মুখে সেই নিদারুণ কলঙ্কের কথা শুনিয়া হীরোর মৃত্যু হইয়াছে, তখন ক্লডিওর হৃদয়ে হীরোর প্রতিমূর্ত্তি ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিবে। তখন অল্পে অল্পে দয়ার সহিত শোক মিশিয়া কুমারীর জন্য ক্লডিও কাঁদিতে থাকিবে। এবং যদি যথার্থই তাহার হৃদয়ে প্রণয় সংস্থাপিত হইয়া থাকে, তবে নিশ্চয়ই মনে করিবে,—'সত্য হইলেও হায়,কেন এ কলঙ্কের ডালি বালিকার মাথায় দিলাম; কেন আমি রাজকুমারীর জীবনহন্তা হইলাম!'

বেনিডিক মেসিনারাজকে বলিলেন, "মহাশয়! পুরোহিত যেরূপ বলিতেছেন, এ পরামর্শ মন্দ নহে এবং আপনি জানেন, রাজকুমার ও ক্লডিও উভয়েই আমার বন্ধু; উভয়কেই আমি যথেষ্ট স্নেহ করি, তথাপি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, এ সকল কথা তাঁহাদিগের কর্ণগোচর করিব না।"

লিওনেটো। আমি আর কি বলিব,—এই অভাবনীয় দুর্ঘটনায় আমি মর্ম্মাহত ও হতবুদ্ধি হইয়াছি। কন্যার কলঙ্ক দূর করিতে যদি অল্পমাত্রও কিছু আশা থাকে, তবে আমি তাহাই অবলম্বন করিব।

অতঃপর পুরোহিত মেসিনারাজ ও রাজকুমারীকে সান্ত্বনা করিতে স্থানান্তরে লইয়া গেলেন।

বেনিডিক ও বিয়াট্রিস সেখানে রহিলেন। তখন আর কেহ তথায় নাই। তাঁহারা পরস্পর প্রণয় আলাপে নিবিষ্ট হইলেন। এই ঘটনা ঘটাইবার জন্যই আত্মীয় স্বজনের কতই আগ্রহ, কতই আড়ম্বর এবং কতই কৌশল বিস্তার। সেই মিলন, সেই প্রণয়ালাপ, সেই সকলই ঘটিল, কিন্তু হায়, আজি তাহারা কোথায়? এই কৌতুকের মূলে যে আনন্দের

উৎস প্রবাহিত হইতেছিল, সে উৎস আজ নীরব, নিস্তব্ধ ও নির্জ্জীব। তাহাদের হৃদয়ে আজি দুঃখ ও শোকের ঘন মেঘ বিরাজিত!

---

(১২)

বেনিডিক বিয়াট্রিসকে কহিলেন, "সুন্দরি! সমস্ত ক্ষণই ত কাঁদিলে,—আরও কি কাঁদিবে?"

বিয়াট্রিস। কি জানি, কান্না ত থামে না।

বেনিডিক। বস্তুতঃ আমার বিশ্বাস, তোমার ভগিনী গুণবতী হীরো সম্পূর্ণ নিষ্পাপ।

বিয়াট্রিস। হায়, ভগিনীর এ কলঙ্ক দূর করিতে পারে, পৃথিবীতে এমন যদি কেহ থাকে, আমি বুঝি তার কেনা হইয়া থাকি!

বেনিডিক। তুমি বোধ হয় জান প্রিয়তমে, আমি তোমায় যেমন ভালবাসি, এ পৃথিবীতে তেমন ভাল আর কাহাকেও বাসি না। কিন্তু তুমি এই যে অসীম স্নেহের পরিচয় দেখাইয়া আত্মবিসর্জ্জন পর্য্যন্ত করিতে উদ্যত হইলে, ইহা কি সত্য?

বিয়াট্রিস বেনিডিকের মনোভাব বুঝিলেন। কিন্তু কিছু রাখিয়া ঢাকিয়া আত্মভাব প্রকাশ করিলেন,—"আমিও বলিতেছি, এ ভূমণ্ডলে তোমায় বেশী ভালবাসি। কিন্তু সহসা আমায় বিশ্বাস করিও না। অথচ যাহা বলিতেছি, তাহাও কিছু মিথ্যা নয়। দেখ, আমি এখন কিছুই স্বীকার বা অস্বীকার করিতেছি না। আমি ভগিনীর অবস্থা স্মরণ করিয়া বড় কষ্ট পাইতেছি।

বেনিডিক। আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, তুমি আমায় ভালবাসিয়াছ, আমিও তোমায় ভালবাসিয়াছি। এখন তুমি যাহা বলিবে, আমি তাহাই করিতে প্রস্তুত।

বিয়াট্রিস। তবে—তবে সেই নিষ্ঠুর ক্লডিওকে হত্যা কর!

বেনিডিক। সমগ্র পৃথিবীর জন্যও তাহা পারি না!

ক্লডিওর প্রতি বেনিডিকের যথার্থই স্নেহ ছিল এবং বেনিডিকের বিশ্বাস, হীরোর প্রতি সন্দেহ করিয়া ক্লডিও ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, এবং সেই ভ্রম অন্য কর্ত্তৃক সংঘটিত হইয়াছে। বিয়াট্রিসের কথায় বেনিডিক বলিলেন, "সমগ্র পৃথিবীর জন্যও আমি প্রিয়তম বন্ধু ক্লডিওর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিব না।"

বিয়াট্রিস। ক্লডিও দুরাত্মা,—সে আমার ভগিনীর চরিত্রে অযথা দোষারোপ করিয়াছে। সর্ব্ব-সমক্ষে তাঁহাকে ঘৃণিত, লাঞ্ছিত ও অপমানিত করিয়াছে। হায়, আমি যদি পুরুষ হইয়া জন্মিতাম!

বেনিডিক। শুন বিয়াট্রিস!—

বিয়াট্রিস শুনিল না।

বেনিডিক পুনর্ব্বার অনুরোধ করিলেন, বিয়াট্রিস তথাপি শুনিল না। বরং বলিতে লাগিল, "বেনিডিক, এখনই ইহার প্রতিবিধান কর। গবাক্ষ-পথে দাঁড়াইয়া নিশীথে অন্য পুরুষের সহিত আলাপ ইহা সত্য হইলেও,—হায় ভগিনি! মিথ্যা অপবাদে তুমি এ দারুণ মনস্তাপ ভোগ করিতেছ! ক্লডিওর প্রতিশোধ লইবার জন্য হায়, আমি কেন পুরুষ হই নাই! অহো! আমার এই মনোভাব বুঝিয়া সেই পাপিষ্ঠ ক্লডিওকে সমুচিত শাস্তি প্রদান করিতে পারে, এমন সুহৃৎ যদি আমার কেহ থাকিত! কিন্তু হায়, শিষ্টাচার ও শীলতায় বীরত্ব ও সাহস অন্তর্হিত হইয়া যায়! ইচ্ছা করিলেই ত আমি পুরুষ হইতে পারি না। তবে আর কি করিব? কাঁদিয়াই এ অবলা-জীবন সমাপ্ত করি।"

বেনিডিক। বিয়াট্রিস থাম। আমি তোমায় ভালবাসি, এই হস্ত-প্রসারণ পূর্ব্বক শপথ করিতেছি,—আমি তোমায় ভালবাসি!

বিয়াট্রিস। তোমার এই হস্ত আমার

প্রতি তোমার প্রেমের সাক্ষ্য স্বরূপ গ্রহণ না করিয়া অন্য দিকে প্রেরণ কর।

বেনিডিক। তুমি কি মনে কর বিয়াট্রিস, ক্লডিও কর্ত্তৃক হীরোর প্রতি এই অত্যাচার সাধিত হইয়াছে?

বিয়াট্রিস। তাহা নিশ্চয়। আমার আপন অস্তিত্বে যেমন বিশ্বাস, ক্লডিও কর্ত্তৃক এই কার্য্য সাধিত হইয়াছে, ইহাতেও আমার তেমনই বিশ্বাস।

বেনিডিক। যথেষ্ট হইয়াছে। প্রাণাধিকে! আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম, ক্লডিওকে এবিষয়ে সমুচিত শিক্ষা দিব। তোমার একটী মাত্র প্রেম-চুম্বন গ্রহণ পূর্ব্বক আমি এখনই তোমার নিকট বিদায় লইতেছি। ক্লডিওর নিকট হইতে এ বিষয়ের পরিষ্কার উত্তর গ্রহণ করিতে তাহাকে বাধ্য করিব। তোমায় মিথ্যা বলিতেছি না। আমার বাক্য যেমন শুনিতেছ, আমাকে এমনই বিশ্বাস করিও। এখন যাও, তোমার ভগিনীকে সান্ত্বনা কর।

---

(১৩)

যখন বিয়াট্রিস-বেনিডিকের এইরূপ কথোপ-কথন হইতেছিল, তখন বৃদ্ধ রাজা লিওনেটো, এরাগন-রাজপুত্র ও ক্লডিওকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিয়া বলিতেছিলেন, "কেন তোমরা আমার কন্যার প্রতি অযথা দোষারোপ করিয়া তাহার মৃত্যুর কারণ হইলে? তোমরা কেন এমন ভীষণ কার্য্য করিলে?"

রাজপুত্র ও ক্লডিও বলিলেন, "মহাশয়, আপনার সহিত বিবাদ করা আমাদের ইচ্ছা নহে। আমাদিগের সহিত বিবাদ করিবেন না।"

সেই সময় বেনিডিকও সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং হীরোর প্রতি কলঙ্ক আরোপের প্রতিশোধ লইবার জন্য ক্লডিওকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিলেন। ক্লডিও এবং এ্যারাগন-রাজপুত্র বুঝিলেন, "বেনিডিকের এরূপ ভাবান্তর ঘটিবার আর কোন কারণ নাই,—বিয়াট্রিস ইহার মূলে আছে।" কিন্তু তাহা হইলেও ক্লডিও সে আহ্বানে পরাঙ্মুখ ছিলেন না। কিন্তু সেই সময় ঈশ্বরের বিধান ও ধর্ম্মের মহিমা অন্যরূপে প্রকাশিত হইল। তাহাতে হীরোর সেই দুরপনেয় কলঙ্ক বিদূরিত হইল এবং সকল দিক মঙ্গল আলোকে আলোকিত হইল।

---

(১৪)

বেনিডিক ও ক্লডিওর মধ্যে যখন এইরূপ দ্বন্দ্বযুদ্ধের উপক্রম হইতেছিল, সেই সময় একজন বিচারক, সেই পাপিষ্ঠ ডন্ জনের নিযুক্ত সেই বোরাকিওকে বন্দী করিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। সেই নীচাশয় হতভাগ্য যখন তাহার দুষ্ট কার্য্য-সিদ্ধির কথা তাহার বন্ধুগণের নিকট প্রকাশ করিতেছিল এবং বলিতেছিল, ডন্‌জন তদীয় ভ্রাতা এ্যারা-গন-রাজপুত্র ডন্ পেড্রোর প্রতি হিংসা-পরবশ হইয়া তাহার বন্ধু ক্লডিওর সুখের পথে কাঁটা দিবার জন্য নিরপরাধ রাজকুমারী হীরোর চরিত্রে কলঙ্ক আরোপ করিতে কেমন কৃতকার্য্য হইয়াছেন,—যখন সেই সব পাপ-কথা বলিতে-ছিল, বিচারক অলক্ষ্যে তাহা আনুপূর্ব্বিক শুনিয়াছিলেন।

বোরাকিও সর্ব্ব সমক্ষে সকল কথাই স্বীকার করিল। এতক্ষণে রাজপুত্র ও ক্লডিওর চৈতন্য হইল। বোরাকিও বলিতে লাগিল, "ডন্ জনের পরামর্শে এই অতি গর্হিত কার্য্যে আমি নিমুক্ত হইয়াছিলাম। সেই পরাক্ষ-পথে যাহাকে দাঁড় করাইয়া কথা কহিয়া-ছিলাম, সে রাজকুমারী হীরো নহেন, তাঁহার সহচরী মারগারেট। রাজকুমারীর পরিচ্ছদে

আবৃত থাকায় আপনারা চিনিতে পারেন নাই যে, প্রকৃত সে রমণী কে?"

সেই কথা শুনিয়াই রাজপুত্র ও ক্লডিওর মনে হীরোর নির্দ্দোষিতা উপলব্ধি হইতে-ছিল। আবার সেই সময় সকল প্রকাশ হইয়া পড়িল দেখিয়া পাপিষ্ঠ ডন্ জন ভ্রাতার ভয়ে সে নগর ছাড়িয়া পলায়ন করিল। তাহাতে সকল দিক আরও পরিষ্কাররূপ বুঝা গেল এবং হীরো যে সম্পূর্ণ নিরপরাধ ও নিষ্পাপ, তাহা সকলেরই বিশ্বাস হইল। তখন ক্লডিওর অন্তরে দারুণ অনুতাপ-অনল জ্বলিয়া উঠিল;—"হায়! আমি তাঁহার চরিত্রে সন্দিহান হইয়া কলঙ্ক আরোপ করিয়াছি; আমি নিষ্ঠুর বাক্য বলিয়া তাঁহার প্রাণ বিনাশ করিয়াছি!" ভাবিতে ভাবিতে ক্লডিও মর্ম্মান্তিক কষ্টে অস্থির হইয়া পড়িলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে অতীতের অনেক কথা তাঁহার স্মৃতি মাঝে জাগিয়া উঠিল। সেই প্রথম প্রণয় দিবসে হীরোর প্রেমময়ী মূর্ত্তি যেমন দেখিয়াছিলেন, আজিও যেন সেই মূর্ত্তিতে হীরো তাঁহার চক্ষের সম্মুখে আবির্ভূতা হইতেছেন।"

এ্যারাগন-রাজপুত্রও যার-পর-নাই ব্যথিত হইলেন। অতঃপর ক্লডিওকে বলিলেন, "যখন তুমি বোরাকিওর নিকট সকল শুনিতেছিলে, তখন তোমার হৃদয়ে কি জ্বালা উপস্থিত হইল বল দেখি;—অন্তরে যেন লৌহ-শলাকা বিদ্ধ হইল!—না?"

ক্লডিও। বোরাকিও যখন সকল কথা বলিতেছিল, আমার মনে হইতেছিল, বুঝি আমি হাতে করিয়া কালকূট সেবন করিয়াছি!

তারপর অনুতপ্ত ক্লডিও বৃদ্ধ রাজা লিওনে-টোর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন এবং গদ্গদ কণ্ঠে কহিলেন, "রাজন্! আমি নিতান্ত অবিবেচকের ন্যায় গুরুতর অপরাধ করিয়াছি! এক্ষণে আপনি তাহার সমুচিত শাস্তি বিধান করুন। আমি আপনার সরলা কন্যার প্রতি যে অতি-বড় নিষ্ঠুর পিশাচের আচরণ করিয়াছি, তাহা স্মরণ করিয়া বোধ হয় আজীবন সেই শাস্তি অনায়াসে ভোগ করিব। ইহার বাড়া শাস্তি আমার আর কি হইতে পারে!"

লিওনেটো এক শাস্তির ব্যবস্থা করিলেন। তিনি বলিলেন, "হীরোর অনুরূপা আমার আর এক কুমারী কন্যা আছে। তাহাকেই তোমায় বিবাহ করিতে হইবে।"

ক্লডিও এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন, এবং বলিলেন, "মহাশয় যেরূপ বলিতেছেন, তাহাতে আমি কোন আপত্তি করিব না। সেই কুমারী আমার সম্পূর্ণ অপরিচিতা; এমন অবস্থায় তিনি যদি অতি কুৎসিত, গুণহীনা হন, তবুও আমি তাঁহাকে বিবাহ করিব। বলা বাহুল্য, এ্যারাগন-রাজপুত্রও মেসিনা-রাজের নিকট যথোচিত ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু তাহা হইলেও হীরোর জন্য তাঁহাদের—বিশেষতঃ ক্লডিওর অন্তর অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে লাগিল। হীরোর কবরের উপর যে স্মৃতি-স্তম্ভ ছিল, ক্লডিও সে দিন সারানিশি সেইখানে বসিয়া অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন।

---

(১৫)

পরদিন প্রভাতে এ্যারাগন-রাজপুত্র ক্লডি-ওকে সমভিব্যাহারে লইয়া ধর্ম্ম-মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। সেখানে মেসিনারাজ লিওনেটো, বিয়াট্রিস, বেনেডিক, পুরোহিত প্রভৃতি সকলে উপস্থিত ছিলেন।

লিওনেটো ক্লডিওর হস্তে কুমারীকে সমর্পণ করিলেন। কুমারীর মুখখানি তখন ছদ্মবেশে আবৃত ছিল। ক্লডিও চিনিতে পারিলেন না। ক্লডিও বলিলেন, "এই পুরোহিত আমাদিগের সম্মুখে রহিয়াছেন। তোমার হস্ত আমার হস্তের উপরে দাও। যদি তুমি আমাকে আত্ম-প্রাণ

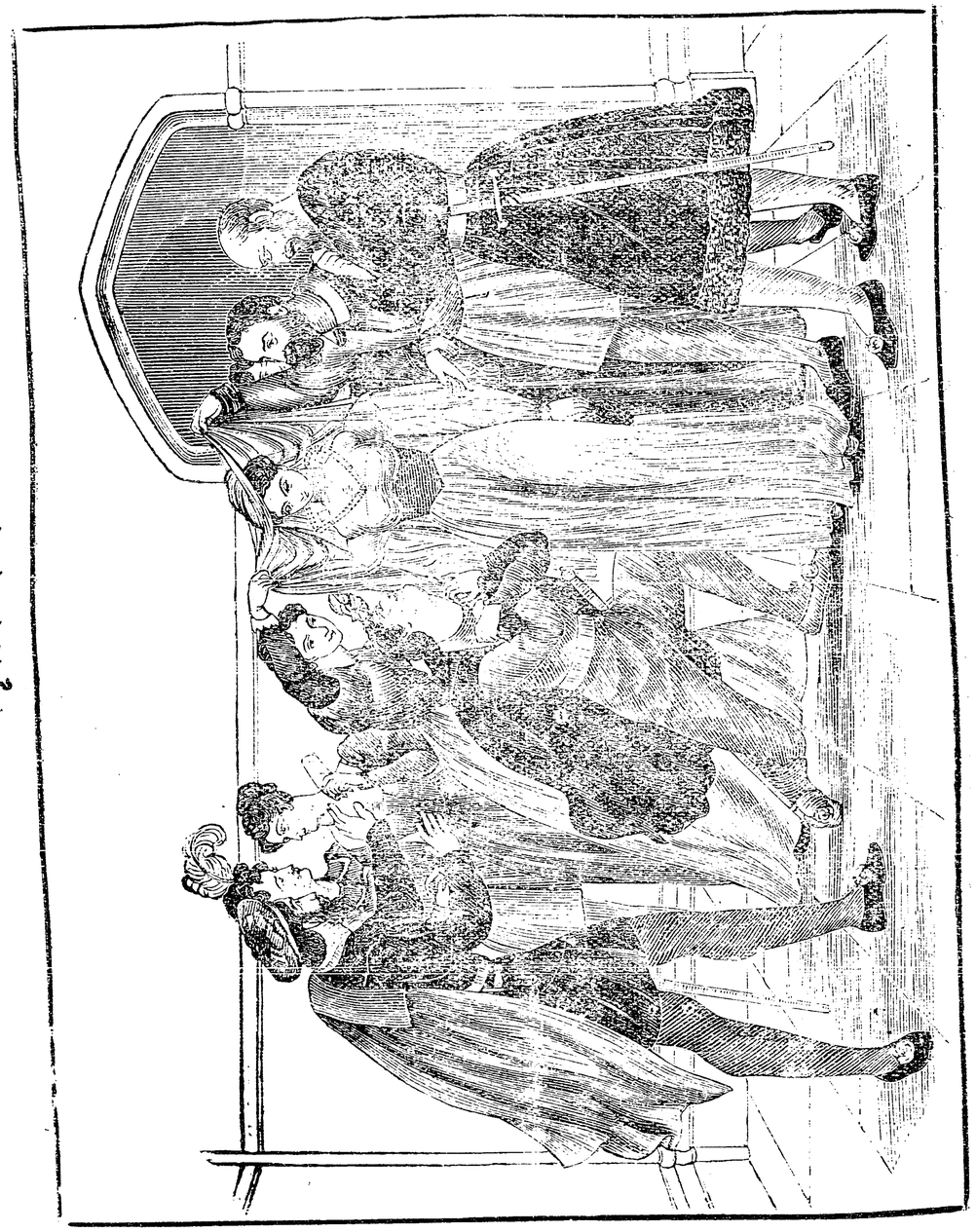

অপূর্ব্ব-মিলন।

সমর্পণ কর, তবে আমি অঙ্গীকার করিতেছি, আমি তোমাকে সানন্দে গ্রহণ করিব।"

তখন সেই অবগুণ্ঠনাবৃতা কুমারী বলিলেন, "যখন আমি বাঁচিয়া ছিলাম, তখনও আমি তোমার পত্নী ছিলাম।"

তারপর ধীরে ধীরে সে অবগুণ্ঠন অপসৃত হইল।—একি! কুমারী অন্য কেহ নহেন,—স্বয়ং হীরো! কিন্তু ক্লডিও তাহা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না।

সকলেই শুনিয়াছিল, হীরোর মৃত্যু হইয়াছে,—তবে এ আবার কি প্রহেলিকা! ক্লডিও নিজের চক্ষুতে অবিশ্বাস করিলেন। রাজপুত্রও সেইরূপ বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, "ইহাঁকে ত হীরো বলিয়া মনে হইতেছে! তবে ইনি কি সেই পূর্ব্বের হীরো নহেন?"

লিওনেটো। কুমার, আমার সেই হীরোই বটে। কিন্তু যতদিন কলঙ্ক জীবিত ছিল, ততদিন হীরোর মৃত্যু হইয়াছিল; এখন কলঙ্ক ঘুচিয়াছে, তাই হীরোও পুনর্জ্জীবন লাভ করিয়াছে।

এ অভাবনীয় অপূর্ব্ব মিলনে ক্লডিও ও এ্যারাগন-রাজপুত্রের আনন্দের আর অবধি রহিল না। বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইলে এ রহস্য-ব্যাপার সমস্ত বুঝাইয়া দিতে পুরোহিত অঙ্গীকার করিলেন। এবং যখন ক্লডিও ও হীরোর যথারীতি বিবাহ-কার্য্য সম্পন্ন হইতেছিল, সেই সময় বেনিডিক মেসিনা-রাজের নিকট বিয়াট্রিসকে প্রার্থনা করিলেন।

বিয়াট্রিস কিছু ইতস্তত করিল। কিন্তু বেনিডিক সম্পূর্ণ-বিশ্বাসের সহিত বলিতে লাগিল, "প্রিয়তমে, তুমি যে আমায় ভাল বাস, সে কথা আমি হীরোর নিকট স্পষ্টই শুনিয়াছি।"

তখন আবার সেই সব কথা উঠিল। সেই কুঞ্জান্তরালে দাঁড়াইয়া বেনিডিক ও বিয়াট্রিস-সংক্রান্ত সকল কথা তখন প্রকাশিত হইল। তখন বেনিডিক ও বিয়াট্রিস উভয়েই বুঝিলেন, পরের কৌশলে বিড়ম্বিত হইয়া এবং পরস্পর পরস্পরকে ভুল করিয়া ভাল বাসিয়াছেন। কিন্তু সেই ভুল করিয়া ভাল বাসিয়াও উভয়ের মধ্যে অকপট প্রণয় সংস্থাপিত হইয়াছে। সে প্রণয় সহজে বিচ্ছিন্ন হইবার নহে। যখন বেনিডিক বিবাহে একান্ত স্থিরসংকল্প হইলেন, তিনি বলিলেন, "এই বিবাহের প্রতি সমগ্র পৃথিবীও যদি অনাস্থা প্রদর্শন করে, তথাপি আমি তাহা গ্রাহ্য করিব না।"

কিন্তু স্বাভাবিক কৌতুক বশতঃ বলিলেন, "কি জান বিয়াট্রিস, হীরোর মুখে শুনিয়াছিলাম, আমাকে তুমি একান্ত ভাল বাস, এবং আমাকে পাইবার জন্য নাকি তুমি নিতান্ত পাগলিনী হইয়াছিলে, তাই কি করি, দয়া করিয়া তোমায় ভাল বাসিয়াছি!"

বিয়াট্রিসও হটিবার মেয়ে নন। তিনিও বলিলেন, "আমিও শুনিয়াছিলাম, আমার জন্য তুমি নাকি একেবারে মরিতে বসিয়াছিলে,—কি করি, অনেক অনুরোধে পড়িয়া তোমার প্রাণরক্ষার জন্যই তোমায় গ্রহণ করিতেছি।"

এইরূপে রহস্যপ্রিয়, হাস্য-রস-রসিক, সেই পরস্পরের প্রতি চির বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন যুবক-যুবতী দাম্পত্য-মিলনে মিলিত হইলেন।

ক্লডিও ও হীরোর শুভ পরিণয় ক্রিয়া যথা সময়ে হইলে, রাজ-পুরোহিত সকল রহস্য প্রকাশ করিলেন। সকলেই হাসি-মুখে মনের সুখে এই আনন্দ উপভোগ করিল।

কাহিনী শেষ করিবার আর একটা কথা আছে। সেই পাপাত্মা ডন জন্ অবিলম্বে ধৃত হইয়াছিল এবং তাহার চক্ষের সম্মুখে এই শুভ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল। তাহার পক্ষে ইহা নিতান্ত অল্প শাস্তি হয় নাই।

শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত।

সংসার।

(১)

বিশাল গঙ্গাবক্ষে ভীষণ তরঙ্গ উঠিয়াছে। তরঙ্গে তরঙ্গে ফেনরাশি ছুটিতেছে। প্রবলবেগে বাতাস বহিতেছে। গঙ্গাবক্ষ ভয়ানক আলোড়িত হইতেছে।

অন্ধকার রাত্রি, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। ঘোর কৃষ্ণবর্ণ মেঘরাশির ভীষণ ছায়া, সেই প্রবল বাত্যান্দোলিত গঙ্গাবক্ষ আরও ভীষণ করিয়া তুলিতেছে।

একখানি ক্ষুদ্র তরণী। সেই ভীষণ দুর্য্যোগে, ভীষণ গঙ্গাবক্ষে একটীমাত্র আরোহী এই ক্ষুদ্র তরণী লইয়া ভাসিতেছিল। নৌকার পাল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে, দাঁড় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, দু'এক স্থানের কাষ্ঠও সরিয়া পড়িয়াছে। নৌকা তরঙ্গে তরঙ্গে উঠিতেছে, পড়িতেছে, আবার ভাসিয়া যাইতেছে। ভাসিয়া ভাসিয়া কোন আবর্ত্তের মাঝে ঘুরিতেছে, আবার অনেক দূর সরিয়া পড়িতেছে। আরোহী ঊর্দ্ধনেত্র হইয়া, আকাশ পানে কি দেখিতেছে!

আকাশ অন্ধকার! চারিদিকের তরঙ্গ আসিয়া নৌকা ঘিরিল। একটা অত্যুচ্চ তরঙ্গ আসিয়া নৌকার উপর পড়িল, তার পর আর একটা, তার পর আর একটা! নৌকা হেলিয়া পড়িল। আরোহী একবার চারিদিক চাহিল,—সীমা নাই—কূল নাই—শেষ নাই! এ ভীষণ দুর্য্যোগে গঙ্গা কূল-সীমা-বিবর্জ্জিতা!

নৌকা ডুবিল। ধূ ধূ ধূ হু-হু-হু করিয়া বাতাস বহিতেছে, ফেনরাশি মাথায় লইয়া তরঙ্গ ছুটিয়াছে। আরোহী কোথায়?

মুহূর্ত্তের জন্য একবার ভাসিয়া উঠিল। হৃদয়ের অন্তঃস্তল হইতে একবার কাহাকে ডাকিল, হস্ত বদ্ধাঞ্জলি হইল। আকাশ অন্ধকার, বাতাসে ও তরঙ্গে ভীষণ রব!

কেহ দেখিল না, কেহ শুনিল না!

গভীর অন্ধকার। আকাশ মেঘপূর্ণ। গঙ্গা তরঙ্গালোড়িতা। কোথাও কিছু নাই!

হায়, সংসার-সমুদ্রে প্রতিনিয়ত এমন কত আরোহী কালের কোলে অঙ্গ ঢালিয়া দিতেছে, কে তাহার তত্ত্ব লয়!

---

(২)

সেই ভীষণ দুর্য্যোগে, সেই ভীষণ অন্ধকারে, সেই ভয়ানক গঙ্গাকূলে, একজন নির্নিমেষ লোচনে আকাশপানে চাহিয়া বসিয়াছিল। চক্ষে অশ্রু নাই, মুখে কথা নাই, হৃদয়েও ভাষা নাই! তাহার ক্রোড়দেশে একটী মায়াপুত্তলি,—শিশুকন্যা। সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

নির্ম্মল প্রভাত। নির্ম্মল আকাশে রবির স্নিগ্ধ কিরণ। মৃদুল বাতাস। মধুর বিহগ সঙ্গীত। গঙ্গার জল স্বচ্ছ, স্থির, তরঙ্গ-ভ্রূকুটী বিহীন।

সে ভীষণ অন্ধকার কৈ? সে ভীষণ জলোচ্ছ্বাস কৈ? সে ভীষণ তরঙ্গ কৈ? সে ঊর্দ্ধনেত্র, বদ্ধাঞ্জলি নৌকারোহী কৈ?

কোথাও নাই!

সেই ভীষণ দুর্য্যোগে, সেই গভীর অন্ধকারে, সেই ভয়ানক গঙ্গাকূলে, মায়ার পুত্তলি, ঘুমন্ত শিশুকন্যা ক্রোড়ে লইয়া ঊর্দ্ধনেত্রা হইয়া যাহাকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছ, এখন একবার তাহার বুকের ভিতর দেখ!

---

(৩)

আকাশ পরিষ্কার হইল। গঙ্গাবক্ষে তেমনই তরঙ্গ ছুটিয়াছে। দুঃখিনী গঙ্গাপানে চাহিয়া রহিল; কিছুই দেখিল না। চক্ষের পলক

পড়িতেছে না, নিশ্বাস বুঝি বহিতেছে না, শোণিতও বুঝি চলিতেছে না,—সব স্থির!

নিশীথ কাল। বাতাসের বেগ কিছু কমিল। গঙ্গাবক্ষ কিছু স্থির হইল। মেঘমুক্ত নীলাকাশে চন্দ্র উঠিল। চন্দ্র কিরণে চারিদিক উজ্জ্বল হইল। যুবতী গঙ্গাপানে চাহিয়া আছেন। কোথাও কিছুই ত নাই! সেই শুভ্র নীলাকাশ তলে, বাত্যান্দোলিত গঙ্গাবক্ষে,—কোথাও কিছুই ত নাই! একখানি ভগ্ন কাষ্ঠখণ্ড, একটী দাঁড়, একটী দেহ? কোথাও কিছুই ত নাই! তবু সে বিষাদ-প্রতিমার অনিমেষ-আঁখি সেই দিকে চাহিয়া আছে!

প্রাণের সকল যন্ত্র ভাঙ্গিয়া দিয়া, যুবতীর অন্তস্তল ভেদ করিয়া একটা গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস পড়িল!

শিশু কন্যাটীকে বুকের ভিতর লইয়া, দুঃখিনী উঠিলেন। শতগ্রন্থিময় মলিন বস্ত্র খণ্ডে কুসুম-সুকুমার দেহ ঢাকিয়া, আলুলায়িত কুন্তলা, সে মলিনমূর্ত্তি কৌমুদী-বিধৌত গঙ্গা-সৈকতে ঘুরিতে লাগিলেন। যাহা খুঁজিতে লাগিলেন, তাহা পাইলেন না। তবু চলিতেছেন। তটস্থিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গাছগুলি চরণের গতিরোধ করিতেছে, কণ্টক বৃক্ষের সংঘর্ষণে চরণ হইতে শোণিত নির্গত হইতেছে,—কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নাই। হায়! কোথাও কিছুই ত নাই!

সেই শুভ্র নীলাকাশতলে, সেই চন্দ্র-বিধৌত গঙ্গা-সৈকতে, শোক-সন্তপ্ত হৃদয়া, মলিন-বসনা, রক্ত-প্লাবিত চরণা, দুঃখিনী ঘুরিতে লাগিলেন। ঘুরিতে ঘুরিতে এক একবার আবার গঙ্গার চারিদিকে চাহিয়া দেখেন। চন্দ্র কিরণোজ্জ্বল অগাধ জলরাশি তরঙ্গে তরঙ্গে উচ্ছলিত হইয়া উঠিতেছে। হায়! কোথাও কিছুই ত নাই!

প্রভাত হইল। গঙ্গাবক্ষ স্থির, অচঞ্চল, ভ্রূকুটী-হীন! কে বলিবে, এই সংসার-গঙ্গাগর্ভে, চিরদিনের জন্য কি ডুবিয়া গিয়াছে! হায়! কোথাও কিছুই ত নাই।

দুঃখিনী বিধবা গৃহে ফিরিলেন। তাঁহার হৃদয়ের সর্ব্বস্ব, গঙ্গাগর্ভে চিরনিদ্রিত! সেই নিদ্রিতের পার্শ্বে আপনার হৃদয় রাখিয়া সেই ম্লান-ছায়া গৃহে ফিরিলেন! বুকের ভিতর সেই মায়া-পুত্তলি শিশু কন্যা।

মাতাকে গৃহাভিমুখী দেখিয়া আধস্বরে কন্যা জিজ্ঞাসিল, "মা, বাবা কৈ?"

মায়ের মুখে ত কথা নাই। শিশু আবার জিজ্ঞাসা করিল, "মা, বাবা কৈ?"

জননী অঙ্গুলি সঙ্কেতে গঙ্গাপানে দেখাইয়া দিলেন। বালিকা সেদিকে চাহিল। সেদিকে কিছু দেখিতে না পাইয়া চারিদিক চাহিল,—হায়! কোথাও কিছুই ত নাই! কি মনে করিয়া মায়ের বুকে মুখ লুকাইয়া সে কাঁদিতে লাগিল। অবোধ শিশু জানে না, গঙ্গাগর্ভে তাহার পিতা চির-নিদ্রিত!

---

(৪)

বেশী বৃষ্টি হয় নাই, কিন্তু বড় ঝড় হইয়া গিয়াছে। ঝড়ে বড় বড় গাছ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। ছোট বড় কত বাড়ী পড়িয়া গিয়াছে। বৃক্ষ এক প্রকার শূন্যপত্র হইয়াছে। পথ ঘাট, বৃক্ষপত্রও নানা প্রকার তৃণ গুল্মে ভরিয়া গিয়াছে। ধনীর প্রাসাদ ভাঙ্গিয়াছে, ভিখারীর জীর্ণ কুটীরও পড়িয়াছে।

এই সকল দেখিতে দেখিতে দুঃখিনী বিধবার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল; অতি দ্রুতপদে তিনি চলিতে লাগিলেন। ক্ষুদ্র গৃহখানির মধ্যে, পীড়িত অষ্টম বৎসরের পুত্রটী ঘুমাইয়া আছে।

একস্থানে কতকগুলি সারি সারি নারিকেল ও আম্রবৃক্ষ। তাহারই মাঝখানে একখানি ছোট গৃহ ছিল। গৃহের পশ্চাতে সুন্দর মাঠ।

অন্তর্হিতা হইলেন, দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে আত্মীয়-স্বজন-বিরহিত হইয়া স্বামী-স্ত্রী উদরান্ন সংস্থানের জন্য বিদেশবাসী হইলেন। বিধাতার অমোঘ অভিশাপে পতি-পুত্র তাঁহাকে ফেলিয়া গেল।

স্বামী বর্ত্তমানে তিনি যে ভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন, তাহা কেবল অনুভবনীয়, বুঝাইবার নহে। অনেক দুঃখ কষ্টের মধ্যেও স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের মুখ চাহিয়া সকল দুঃখ ভুলিতেন। সারাদিন কঠিন পরিশ্রমের পর দুই মুঠা অন্ন জুটিত। এমন দিনও গিয়াছে, যে দিন তাহাও মিলে নাই;—তাহাও সহ্য হইত! কিন্তু তিন বৎসরের শিশু-কন্যাটী একটুকু খাদ্য অভাবে, মাতৃস্তনে দুগ্ধের অভাবে জলপূর্ণ মৃৎভাণ্ড হইতে জল পান করিতেছে,—এমন দিনও গিয়াছে,—তাহা আর সহ্য হইত না! বালকের ন্যায় স্বামীর চোকে জল পড়িত। আকুল প্রাণে কাঁদিতে কাঁদিতে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া ডাকিতেন,—"প্রভু, অনাথনাথ, কোথায় তুমি?" আর তখন স্ত্রী করিতেন কি? স্নেহময়ী মা যেমন সন্তানের চক্ষে জলধারা দেখিয়া, ব্যথিত-প্রাণে বস্ত্রাঞ্চলে তাহা মুছাইয়া দেন, স্ত্রীও তেমনি শতগ্রন্থিময় বস্ত্রাঞ্চলে স্বামীর চক্ষু মুছাইয়া সান্ত্বনার কথা বলিতেন। বলিতে বলিতে সে ডাগর নয়ন দুটী জলে ভরিয়া যাইত। তখন উভয়ের চক্ষে জল। তখন উভয়ে উভয়ের গলা জড়াজড়ি করিয়া প্রাণ ভরিয়া বড় কাঁদিত! স্ত্রীর চক্ষে জল, দুঃখের জন্য নহে, স্বামীর চক্ষে জল দেখিয়া! যখন দু জনার চক্ষু-জলে দু জনার বক্ষ ভাসিতে থাকিত, অবোধ শিশুটী দুই খানি ক্ষুদ্র হস্তে পিতামাতার চক্ষু চাপিয়া ধরিত, আর অশ্রু বহিতে দিবে না!

তেমন করিয়া কান্নাতে যে সুখ, আমি তেমন সুখ আর কিছুতে জানি না। যে দুঃখে এমন কান্না আসে, সে সুখ। গৌরী তাহা বুঝিত। বুঝিত, তাই বড় দুঃখেও সে কাতর হইত না। গৌরী মনে মনে বলিত, "সংসারে এমন কি দুঃখ কষ্ট আছে, যাহা স্বামীর মুখ চাহিয়া সহ্য করিতে না পারি? স্বামীর চক্ষে যদি কখন জল দেখিয়াছি, কে ল তাহাই সহ্য করিতে পারি নাই।"

স্বামীর মৃত্যু হইতেই গৌরীকে সম্পূর্ণরূপে পরদারস্থ হইতে হইয়াছিল। ভিক্ষাবৃত্তিই অবলম্বন ছিল। সাধ্বীর মনে সেজন্য এতটুকুও দুঃখ ছিল না!—"হায়, তবু যদি স্বামী জীবিত থাকিতেন! না হয় ভিক্ষা করিয়াই তাঁহাকে খাওয়াইতাম। অনাহারে তিনি চলিয়া গেলেন! দুঃখিনীর জীবন-সর্ব্বস্ব! তুমি এক দিনও আমাকে কুটীরের বাহির হইতে দাও নাই, আজ আমি সারাদিন ভিক্ষা করিয়া জীবন রক্ষা করি। তাহাতেও দুঃখ নাই, কিন্তু অনাহারে তোমার প্রাণত্যাগ হইল। আমি বাঁচিয়া রহিলাম! হায়, দেশে দেশে ভিক্ষা করিয়াও তোমায় যদি রাখিতে পারিতাম!"—

এইরূপ নানা চিন্তায় দুঃখিনীর দিন কাটিত। সেই ভগ্ন ও জীর্ণ কুটীরে এই ভাবেই তিনি বাস করিতেন।

---

(৭)

আমি বলিয়াছি, যেখানে সারি সারি কতকগুলি আম্রবৃক্ষ নানাবিধ পক্ষীর কুলায় লইয়া দাঁড়াইয়া আছে, তাহারই নিকট গৌরীর সেই জীর্ণ কুটীর। যে প্রকার চিন্তায় তাঁহার দিন রাত্রি অতিবাহিত হইত, তাহাও কতক বলিয়াছি।

প্রাতে শয্যা হইতে উঠিয়া, দুইখানি অর্দ্ধখণ্ড শতগ্রন্থিময় মলিন বস্ত্রে সেই সুন্দর তনু আবৃত করিয়া, গৌরী ভিক্ষায় বহির্গত হইতেন। বস্ত্রখণ্ডে সমস্ত দেহটা ঢাকিত না, অল্প-প্রসারতায় তাহা কুলাইয়া উঠিত না। দুঃখিনী সে বিশ্ববিজয়ী রূপ ঢাকিবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা পাইত, কিন্তু পাপ-চক্ষুর কুটিল-দৃষ্টি হইতে অতুল লাবণ্যরাশি লুকাইতে পারিত না।

একদিন—অহো, সেদিন কি সর্ব্বনাশের,—একদিন—যে রক্ষক, সেই ভক্ষক হইল! সেই জমিদার,—যে খেয়ালবশে একদিন এই দুঃখিনীকে আশ্রয় দিয়াছিল, সেই পাপিষ্ঠ—একদিন রাত্রে মদ্যপানে উন্মত্ত হইয়া দুঃখিনীর কুটীরাভিমুখে ধাবিত হইল।

রাত্রি ঘোর অন্ধকার। কোলের মানুষ দৃষ্টিগোচর হয় না।

বিশাল গঙ্গাবক্ষে ভীষণ তরঙ্গ উঠিয়াছে। তরঙ্গে তরঙ্গে ফেনরাশি ছুটিয়াছে। প্রবল-বেগে বাতাস বহিতেছে। গঙ্গাবক্ষ ভয়ানক আলোড়িত হইতেছে। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। ঘোর কৃষ্ণবর্ণ মেঘরাশির ভীষণ ছায়া সেই প্রবল-বাত্যান্দোলিত গঙ্গাবক্ষ আরও ভীষণ করিয়া তুলিয়াছে। ঘন ঘন বজ্রাঘাত হইতেছে। ধরা-বক্ষে যেন পিশাচ-যুদ্ধ হইতে লাগিল!

সেই একদিন, আর এই এক দিন। এমনই দিনে, এমনই ভাবে, ঘোর সংসার-বাত্যায় দুঃখিনীর জীবন-সর্ব্বস্ব পতি-পুত্র ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে,—আর আজি হায়, তাহার তদপেক্ষাও অমূল্য রত্ন নষ্ট হইবার উপক্রম হইল!

পিশাচ, সতীর সম্মুখীন হইল। সতী আত্মরক্ষার জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন। শেষ নিরুপায় হইয়া অগতির গতি মৃত্যুকে স্মরণ করিলেন।

উদ্যানের পাদদেশ বিধৌত করিয়া ভাগীরথী তর তর বেগে ছুটিয়াছে। ঝড়, বৃষ্টি, তুফানে বেগবতী স্রোতস্বতী ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। গৌরী সংসার-দরিয়ায় স্থান না পাইয়া এই বিশাল জাহ্নবী-জীবনে আশ্রয় লইতে চলিলেন। কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই,—দ্রুতপদে গন্তব্যস্থানে উপনীত হইলেন। পিশাচের করাল-গ্রাস হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য গৌরী কম্পিতকণ্ঠে গঙ্গাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "মা ব্রহ্মময়ি! তোর কোলে এ অভাগীকে স্থান দে!"

সেই দারুণ দুর্য্যোগে ঘোর ঝড়-বৃষ্টি-বজ্রাঘাতের সুরের সহিত সুর মিলাইয়া সেই সতী সাধ্বী সহিষ্ণুতা-প্রতিমা জাহ্নবী-জীবনে আত্ম-সমর্পণ করিলেন। অভাগিনী মরিয়া জুড়াইল। আর এদিকে হায়, সেই জীর্ণ পর্ণকুটীরে দুঃখিনী গৌরীর সেই কচি মেয়েটীও ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া চির-নিদ্রিত হইল! সব ফুরাইল।

ইহারই নাম সংসার!

শ্রীবিপনবিহারী রক্ষিত।

স্কুল-পাঠ্য।

(১)

স্কুল-পাঠ্য পুস্তক নির্ব্বাচনের জন্য বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধীন এক সভা আছে, সভার নাম 'টেক্‌ষ্ট্‌-বুক-কমিটি।' অনেক সুশিক্ষিত হিন্দু-সন্তানও এ সভার সভ্য। কিন্তু দুঃখের বিষয়,—উপযুক্ত পুস্তক নির্ব্বাচন এ সভা হইতে অতি অল্পই হইয়া থাকে। হয় ধর্ম্মবিরুদ্ধ, না হয় অশুদ্ধ, না হয় আর কোন গুরুতর দোষাক্রান্ত পুস্তকই প্রায় নির্ব্বাচিত হয়। নির্ব্বাচনের মূল যদি গন্ধতৈল স্পর্শ না করিত, অনুরোধ উপরোধ প্রভৃতি অমোঘ অস্ত্রের অব্যর্থ সন্ধানে শীর্ণ-বিশীর্ণ না হইত, তাহা হইলে, সৎপুস্তক নির্ব্বাচনে নিরাশ হইতাম না।

যতই দিন যাইতেছে, যতই নির্ব্বাচনের পর নির্ব্বাচন দেখিতেছি, নৈরাশ্য ততই বাড়িতেছে। সভ্যগণ! অনুনয় করিয়া বলি, ন্যায়-দর্শী হউন; অনুগত-প্রতিপালনের অনেক পথ

আছে, লক্ষ লক্ষ বালকের সর্ব্বনাশ করিয়া অনুগত-প্রতিপালন ধর্ম্মনীতি বা সমাজনীতি কিছুরই অনুমোদিত নহে।

দৃষ্টান্তস্থলে অদ্য একখানি পুস্তকের উল্লেখ করিতেছি, একবার লক্ষ্য করুন, কর্ত্তব্য-পালনের পবিত্র মূর্ত্তি ধ্যান করুন, আর আপনারা কি করিতেছেন তাহা দেখুন :—

কথা-লহরী। (টেক্‌ষ্ট্‌-বুক কমিটি কর্ত্তৃক মধ্য ইংরাজী ও মধ্য বাঙ্গালা স্কুলের পঞ্চম শ্রেণীর পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট) বঙ্গবাসী কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক শ্রীচন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।

সঙ্কলয়িতা বিদ্যাবিনোদ মহাশয়! টেক্‌ষ্ট্‌-বুক কমিটির সভ্যগণের সঙ্গে আপনিও আপনার ভাষা-জ্ঞানের পরিচয় গ্রহণ করুন।

১। কথা-লহরী দ্বিতীয় সংস্করণ (হায়! প্রথমের পর, আবার দ্বিতীয়! সাধে কি বলি, নির্ব্বাচনে নৈরাশ্য!) ১৯পৃঃ ২ পং—"তাঁহাদের পৈতৃক ধন দুই জনে সমান অংশে বিভাগ করিয়া লন" এই স্থলে "তাঁহাদের" পদটী থাকাতে প্রকৃতার্থবোধে ব্যাঘাত ঘটিতেছে। "তাঁহাদের" শব্দে যাঁহাকে যাঁহাকে বুঝা যাইতেছে, "দুই জনে" শব্দ তাঁহাদিগকে না বুঝাইয়া স্বতন্ত্র ব্যক্তির বাচক হইতেছে; নতুবা "তাঁহাদের" পদটী নিরর্থক হয়। ফলে কিন্তু "পৈতৃক ধন দুই জনে সমান অংশে বিভাগ করিয়া লন" ইহাই উপরি-উক্ত সন্দর্ভের অর্থ। এইরূপ অসঙ্গতার্থ-প্রতিপাদক অথবা নিরর্থক পদ-বিন্যাস বালকগণের ভাষা-ব্যুৎপত্তি-পক্ষে মহা অন্তরায়।

২। ২২ পৃঃ ২৩ পং হইতে 'দুইটী ছাত্র' 'ছাত্রগণ'—বাঙ্গালা ভাষায় দ্বিবচন না থাকিলেও সংস্কৃত 'গণ' শব্দ বা 'বহু' শব্দ দ্বিবচন বা দ্বিত্ব-সংখ্যাবিশিষ্টের বোধক নহে। বাঙ্গালা-বিভক্তি-যুক্ত 'ছাত্রেরা' এই পদ, ছাত্রদ্বয় এবং ছাত্রগণের বাচক। দুই জন ছাত্রকে যেমন বহু ছাত্র বলা যায় না, তদ্রূপ ছাত্রগণও বলা যায় না। গণ শব্দ প্রয়োগে যাঁহার গোলযোগ, তিনিই কিন্তু বঙ্গবাসী কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক! আর যে পুস্তকে সেই গোলযোগ, সেই পুস্তক অসংখ্য ছাত্রের ভাষা-শিক্ষার সহায় বলিয়া টেক্‌ষ্ট্‌-বুক কমিটি কর্ত্তৃক অবধারিত!

৩। ২২ পৃঃ ৬।৭ পং—"যে ছাত্র প্রত্যহ ডানি-পা ধুইত" ২৩ পৃঃ ৬ পং—"সে গুরুর যে পা ধোয়াইত"। 'ধুইত' 'ধোয়াইত' ইত্যাদি পদ এক অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে। বস্তুতঃ কিন্তু ঐ সব পদ একার্থক নহে, অর্থের ভেদ প্রচুর, অর্থভেদে গ্রন্থ-সঙ্গতিও হয় না; কোন পদ নিজন্ত ধাতু হইতে, আর কোনটী অণিজন্ত ধাতু হইতে উৎপন্ন। যাহা হউক, সকল স্কুলের শিক্ষকেরা অবশ্য এরূপ অদ্ভুত নহেন, সেই ভরসা।

৪। ২৬ পৃঃ ৯ পং—"ইন্দুপ্রভ উত্তর করিলেন, আমার চতুর্দ্দিকে নানারূপ বৃক্ষ চিরদিন অকাতরে ফল-ফুল দ্বারা লোকের উপকার করিতেছে, নিজের অবস্থার দিকে একবারও লক্ষ্য করিতেছে না, আর আমি যদি অল্পকাল মাত্র লোকের উপকার করিয়া স্বর্গে যাই তবে আমার কল্পবৃক্ষ হওয়ারই বা কি ফল হইল?" 'হওয়ারই বা' এখানে 'ই বা' অসঙ্গত। যদি এই জাতীয় আর কোন বাক্যের সমাপ্তি পূর্ব্বে হইত, তাহা হইলে 'ই বা' যোগ হইতে পারিত। সমুচ্চয় না থাকিলে ওরূপ স্থলে 'বা' শব্দ প্রয়োগ হয় না। দেখ, "রামের কি হইল? শ্যামেরই বা কি হইল?"—প্রয়োগ সাধু; কিন্তু "রামের কি হইল?"—এ অংশ বা এই জাতীয় অন্য কোন অংশ না থাকিলে বা তাহার অর্থ না বুঝাইলে "শ্যামেরই বা কি হইল?"—এ প্রকার প্রয়োগ অসঙ্গত।

৫। 'বণিক পুত্রের কথা' প্রবন্ধে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের সমর্থন আছে, হিন্দু-মুসলমানের দেশে প্রকারান্তরেও অন্য ধর্ম্মের সমর্থন হওয়া ভাল নহে। এ বিষয়ে টেক্‌ষ্ট্‌-বুক কমিটির বিশেষ আলোচনা করা উচিত ছিল।

৬। ৩২ পৃঃ ৩ পং—"বন্ধু মনে করিলেন", ১১ পং—"বন্ধু জিজ্ঞাসা করিল" আবার ৬পং—"তখন তিনি পরম সমাদরে তাহার খাওয়ার উদ্‌যোগ করিয়া বলিল"। বাঃ! অদ্ভুত বাঙ্গালা! যিনি 'মনে করিলেন', সেইই 'জিজ্ঞাসা করিল', আবার 'তিনিই বলিল',—এমন ভাষা শিক্ষা যে পুস্তকে না হয়, তাহাতে কি টেক্‌ষ্ট্‌-বুক্ কমিটির দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়!

আমাদের দেশে একটী প্রচলিত কথা আছে, —"ঠাকুর মশাই! বিচিলি নিবি?" নিরক্ষর কৃষিজীবীরা অজ্ঞতা বশতঃ সম্মান-সূচক পদের সহিত অসম্মান-সূচক পদ মিলিত করিয়া ঐরূপ একটা একটা কথা কখন কখন বলে; ভদ্র-সন্তানেরাও তাহাই শিখিবে! যা হউক, বিদ্যা-বিনোদ মহাশয় যদি আপনার ভাষা ভদ্র-সন্তানদিগকে শিখাইতে পারেন ত একদিকে বাহাদুরি বটে!

৭। ৩৪ পৃঃ ৩ পং—"বাড়ী যাইতেছিল" ৯ পং—"তাহাদের পাশে দীননাথ নামে একটী বালক বসিয়া তাহাদের তর্ক শুনিতেছিল" যাহারা যাইতেছিল (ও তর্ক করিতেছিল) দীননাথ তাহাদের পাশে বসিয়া তর্ক শুনিল কিরূপে?' দীননাথ বুঝি সিদ্ধ ছিল, বসিলেও গমনের ব্যাঘাত হইত না! এইরূপ বসিবার কথা বালকগণকে না বুঝাইয়া বিদ্যাবিনোদ নিজে বুঝিলেই ভাল হয়।

৮। ৫৮ পৃঃ ১৫ পং—"সেই চারাটী ক্রমে বড় হইয়া এই গাছটী কিরূপ হইয়াছে দেখিতেই পাইতেছ"। এস্থলে 'সেই চারাটী' ইহার সহিত 'এই গাছটী'র কিরূপ সম্বন্ধ? সমগ্র পদের পরস্পর সম্বন্ধ থাকিল কিনা দেখিয়া লেখা উচিত। দুটা পদের যোড়া-তাড়া যাহাতে ভাল রূপে নাই, তাহাই হইল পাঠ্য-পুস্তক! বলি, বটতলার পুঁথিও ত অনেক আছে।

৯। ৬০ পৃঃ ৫ পং—"তাহার প্রতি মুখ করিতে লাগিলেন"। এখানে 'তাহার প্রতি' নহে 'তাহাকে' হওয়া উচিত। এই সব বিদ্যার পরিচয় পাইয়া আমি ভাবিতেছি, এ হেন বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের প্রতি কবে দেখিব; ওহো-হো! দেখ্‌ছ বিদ্যাবিনোদের বোধনাশক্তি; আমিও 'বিদ্যাবিনোদ মহাশয়কে' না বলিয়া 'বিদ্যা-বিনোদ মহাশয়ের প্রতি' বলিয়া ফেলিয়াছি।

১০। ৬১ পৃঃ ৪ পং—"সমস্ত শরীর মানুষের মত কিন্তু স্বর্ণ-নির্ম্মিত, কেবল মুখ শূকরের।" এখানে 'কিন্তু' স্থলে 'অথচ' আর 'কেবল' স্থলে 'কিন্তু' হইলে ভাষা ভাল হয়। 'কিন্তু' শব্দ অপকর্ষাংশেই অধিক প্রযুক্ত; সুতরাং 'স্বর্ণ-নির্ম্মিত' বলিতে 'কিন্তু' করিতে হয় না; 'কিন্তু' করার স্থান হইল 'মুখ শূকরের' এইখানে। আর, শরীর যখন মানুষের মত, মুখও তখন শূকরের 'মত' বলাই উচিত।

কত আর দেখাইব? এখনও অনেক আছে।

এই পুস্তকের গুণের মধ্যে গল্পগুলি ইংরাজীর অনুবাদ নহে। শুধু এই এক গুণের খাতিরে অথবা যোগাড়-যন্ত্রাদির খাতিরে এইরূপ অশুদ্ধ ও ধর্ম্মবিরুদ্ধ পুস্তক পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়া টেক্‌ষ্ট্‌-বুক কমিটি বালকগণের অশেষ অপকার সাধন করিয়াছেন।

বিদ্যাবিনোদ মহাশয়কেও বলি, পাঠ্য-পুস্তক-সঙ্কলন যদি আপনাকে করিতেই হয় ত ভাল পণ্ডিতের সম্পূর্ণ সাহায্য লইবেন, এরূপে নিরীহ বালকদের সর্ব্বনাশ সাধন করিবেন না।

স্কুলপাঠ্য পুস্তকে এমন বিদ্যাবিনোদ অনেক আছেন। ক্রমে দেখাইতে চেষ্টা করিব।

শ্রীদুর্গাচরণ কাব্যতীর্থ।

সমালোচনা।

মান। (গীতিনাট্য) শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ বসু কর্ত্তৃক গ্রথিত। কলিকাতার এমারেল্ড থিয়েটারে অভিনীত। মূল্য চারি আনা। বৈষ্ণবের সর্ব্বস্ব ধন শ্রীরাধা-কৃষ্ণের যুগল-মিলন গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়। প্রাচীন মহাজন-পদাবলীর সমাবেশে ও সমজদার সংগ্রহকারের মুন্সিয়ানায় 'মানে' মণিকাঞ্চন যোগ হইয়াছে! বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দ দাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবির অমৃতময়ী কবিতায় 'মানের' পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে মণি-মাণিক্য জ্বলিতেছে। 'মান' মনস্বী মূর্খ—সকলেরই দেখিবার জিনিস: ভক্তের ত কথাই নাই। বিশেষ ইহার অভিনয় অতুলনীয়। এরূপ প্রাচীন পদাবলীর আলোচনায় রঙ্গ-সাহিত্য ও বঙ্গ সমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে। বসুজ মহাশয় ও এমারেল্ড থিয়েটার কোম্পানীর এই সাধু অনুষ্ঠানে আমরা ধন্যবাদ দিতেছি।

মায়া-লীলা। (আধ্যাত্মিক উপাখ্যান) শ্রীযুক্ত রামদয়াল সেন গুপ্ত প্রণীত। গ্রন্থের নামটী যেমন রহস্যময়, গ্রন্থখানিও তেমনই রহস্যময়। শাস্ত্রের অনেক গূঢ় কথা—বিশেষ মায়াবাদের আংশিক আলোচনাই গ্রন্থকারের লক্ষ্য। উদ্দেশ্য যে খুব সাধু, সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি? তবে এ সকল অতি গুরুতর ও গভীর বিষয় লইয়া ঠিক উপাখ্যান প্রণয়ন হয় না, হইতে পারেও না। গুপ্ত মহাশয় ভাবুক ও চিন্তাশীল, সে পরিচয় পাইয়াছি। তাঁহার 'সিদ্ধেশ্বর' চিত্রে ও 'মায়া' চরিত্রে মোহান্ধ জীবের অনেক শিক্ষা আছে। গ্রন্থের শেষাংশটুকু বড়ই করুণাত্মক—বড়ই মর্ম্মস্পর্শী; পড়িতে পড়িতে আমরা চোখের জল ফেলিয়াছি। গ্রন্থের পূর্ব্বভাগ—জয়গোবিন্দের অংশটুকু বেশ স্বাভাবিক ভাবে চিত্রিত হইয়াছে। 'ছায়ার' সহিত তাহার পরিণয় স্বভাব-সঙ্গত হইয়াছে। লেখক বর্ণনায় বেশ নিপুণ; বিশেষ স্বভাবের শোভা বর্ণনায় তিনি সিদ্ধহস্ত। তবে গ্রন্থখানিতে নাটক অপেক্ষা আখ্যায়িকার অংশই অধিক; অনেক স্থলে লেখক নিজেই কথক হইয়াছেন। কোথাও বা দুই ছত্র লিখিবার স্থলে দুই পৃষ্ঠা স্থান অধিকার করিয়াছেন। মন্তব্য ও মনস্তত্ত্বের ভাগটাও কিছু জাঁকল। তবে বিষয় বিবেচনায়, দুই এক স্থলে তাহা মার্জ্জনীয়। এ সকল ত্রুটী সত্ত্বেও কিন্তু গ্রন্থখানি মোটের উপর ভাল হইয়াছে। যে সুরে এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব-সংসার বাঁধা, "মায়া-লীলা"র লেখক যে কিছুক্ষণের জন্যও সেই সুরে আপন হৃৎযন্ত্র মিলাইয়া একটু মিষ্ট কান্নার সুরে আলাপ করিতে পারিয়াছেন, তাহা বড় কম কথা নহে। আজিকার দিনে সকলের এমন সৌভাগ্য হয় না।

কৃষিক্ষেত্র। প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড। শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র দে প্রণীত। কলিকাতা, ২৮নং দর্জ্জিপাড়া ষ্ট্রীটে গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্তব্য। মূল্য এক টাকা। গ্রন্থকার ভূমিকায় লিখিতেছেন, "আমরা স্বয়ং স্বহস্তে কৃষিকার্য্য করিয়া ও ইয়ুরোপীয় কৃষি-বিদ্যার আলোচনা করিয়া যে যে বিষয় এ দেশীয় কৃষিকার্য্যে বিশেষ প্রয়োজন ও জ্ঞাতব্য মনে করিয়াছি, তাহাই ইহাতে সন্নিবিষ্ট করিয়াছি।" প্রবোধ বাবু নিজে "হাতে কলমে" অনেক রকম চাষের কাজ করিয়াছেন; সুতরাং এ বিষয়ে তাঁহার অভিজ্ঞতা অধিক। যাঁহারা কৃষি-বিদ্যার অনুশীলনে সচেষ্ট, তাঁহারা এ গ্রন্থ পাঠে বিশিষ্ট জ্ঞান লাভ করিবেন। আলোচ্য বিষয়গুলি বেশ সরল ভাষায় লিখিত। সুতরাং লেখকের শ্রম সার্থক হইয়াছে।

জন্মভূমি।

৫ম ভাগ। } ফাল্গুন। ১৩০১। { ৩য় সংখ্যা।

উত্তর-কাশী।

ভারতবর্ষে বারাণসী হিন্দুর প্রধান তীর্থ। কতদিন এই তীর্থের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, কেহ বলিতে পারে না। পুরাণ অবলম্বন করিলে বলিতে হয়, মানব-সৃষ্টির পূর্ব্ব হইতেই ইহা বর্ত্তমান। যুগান্তর কাল হইতে পৃথিবীর বক্ষ দিয়া বহু পরিবর্ত্তন চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু কাশীর মহিমা এ হিন্দুর দেশে অটল অচলের ন্যায় স্থির এবং প্রভাত-সূর্য্যের কিরণ-প্রদীপ্ত তুষার-মণ্ডিত গিরিশৃঙ্গের ন্যায় সমুজ্জ্বল। এখনও সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিত, ভক্ত ও সাধক প্রতিদিন অরুণোদয়ের সঙ্গে পুত-সলিলা ভাগীরথীর জলে অবগাহনপূর্ব্বক যুক্ত-করে এবং একান্ত-চিত্তে বিশ্বেশ্বরের চরণ-বন্দনা করেন। আবার সন্ধ্যাকালে যখন ধরাতল ধীরে ধীরে অন্ধকারে আবৃত হয়, পশ্চিম আকাশের লোহিত রাগ মলিন হইয়া যায় এবং জাহ্নবীর শান্ত বক্ষে সান্ধ্য-তারকার ম্লান-জ্যোতি ফুটিয়া উঠে, তখন শঙ্খ, ঘণ্টা ও দামামা-ধ্বনিতে সমস্ত কাশী জাগ্রৎ হইয়া উঠে, ধূপ-ধুনা এবং পুষ্পরাজীর সুগন্ধে মন্দির-প্রাঙ্গণ পরিপূর্ণ হয় এবং সহস্র সহস্র ভক্তের সুবিমল ভক্তির ও প্রীতির কুসুমাঞ্জলি দেবদেব বিশ্বেশ্বরের মহিমা-দীপ্ত অভয় চরণোদ্দেশে বর্ষিত হয়, তখন বোধ হয়, কোন ভক্তের একবারও মনে হয় না যে, আর একটী দ্বিতীয় কাশী এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের এক প্রান্তে হিমালয়ের সুগভীর প্রশান্ত ক্রোড়ে লুক্কায়িত আছে এবং সেখানেও বিশ্বেশ্বর এক প্রকাণ্ড পাষাণ-মন্দিরে স্বমহিমায় জাগ্রৎ-ভাবে অবস্থান করিতেছেন।

এই কাশীর নাম উত্তর-কাশী। স্বনাম-প্রসিদ্ধ কাশীর সহিত স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য ইহার নাম উত্তর-কাশী, কি কাশীর বহু উত্তরে উত্তরাখণ্ডে অবস্থিত বলিয়া উত্তর-কাশী, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায় না। কাহার গৌরব অধিক, তাহাও নির্দ্দেশ করা কঠিন। তবে ইহা নিশ্চয় যে, বিশ্বেশ্বরের প্রিয় পীঠস্থান বলিয়া যদি কাশীর গৌরব হয়, ভগবতী অন্নপূর্ণার লীলাক্ষেত্র অথবা অন্নক্ষেত্র বলিয়া যদি কাশী সম্মানিত হইতে পারে, তবে উত্তর-কাশীও আপনার গৌরব এবং সম্মান রক্ষা করিবার উপযুক্ত। উত্তর-কাশী জননী প্রকৃতির স্বহস্ত-নির্ম্মিত চারু উপবন, শান্তি ও পবিত্রতার স্নিগ্ধ নিকুঞ্জ, হিমালয়ের কোন্ অজ্ঞাত অংশে কৈলাসধাম সংগুপ্ত রহিয়াছে কে বলিবে?—কিন্তু কৈলাস-

নাথের সেই আনন্দ-নিকেতন হইতে উত্তর-কাশী কোন অংশে ন্যূন নহে।

আমাদের দেশের অতি অল্প লোকই এই কাশীর নাম অবগত আছেন; কারণ, পুরাণ ইতিহাস প্রভৃতি গ্রন্থে এই কাশীর উল্লেখ নাই বলিলেই চলে, তাহার পর ভারতবর্ষের এক প্রান্তে অতি দুর্গম প্রদেশে এই তীর্থের অবস্থান, সুতরাং নিতান্ত অল্প-সংখ্যক লোকের এই পুণ্য-ভূমিতে উপস্থিত হইবার সৌভাগ্য ঘটে। যে সকল গৃহী বিশেষ কষ্ট স্বীকার করিয়া ভারতবর্ষের অধিকাংশ তীর্থই দর্শন করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রায় সকলকে এখানে আসিবার আশা ত্যাগ করিতে হয়। হিমাচলের পাদদেশে গড়োয়াল রাজ্য অবস্থিত; তাহার রাজধানী শ্রীনগর হইতে, পাঁচ দিন, সুদীর্ঘ বিপদ-সঙ্কুল বন্ধুর পার্ব্বত্য পথ অতিক্রমপূর্ব্বক অক্লান্তভাবে পর্ব্বত হইতে পর্ব্বতান্তরে আরোহণ ও অধিরোহণ করিয়া অবশেষে উত্তর-কাশীতে উপস্থিত হওয়া যায়। না দেখিলে এই পথের ভীষণতা হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। পর্ব্বতের উপর দিয়াও সর্ব্বত্র পথ নাই; কোন স্থানে বৃক্ষ অবলম্বন করিয়া উপত্যকার এক অংশ হইতে নিম্নতম অংশে অধিরোহণ করিতে হয়, কোথাও পার্ব্বত্য যষ্টির সহায়তায় গভীর অধিত্যকা হইতে উচ্চতরস্থানে উঠিতে হয়, কিঞ্চিন্মাত্র অসতর্ক হইলেই ঘোরতর অন্ধকারাচ্ছন্ন গিরি-গহ্বরে কোন অতলস্পর্শে পড়িয়া জীবন্তে সমাহিত হইবার সম্ভাবনা। অতএব গৃহী দূরের কথা, অনেক সংসার-বিরাগী সন্ন্যাসীও সেখানে উপস্থিত হইতে অসমর্থ। শুদ্ধ বৈরাগ্য অবলম্বন করিলেই সেখানে যাওয়া যায় না; প্রাণের একান্ত আগ্রহের সঙ্গে দুই খানি সুদৃঢ় পদ, একটী সবল দেহ এবং উপযুক্ত আহার-সামগ্রী সঙ্গে লইয়া এই মহাতীর্থ দর্শনের কঠোর ব্রত গ্রহণ করিতে হয়। এইজন্যই বদরী-নারায়ণ ও কেদারনাথ-দর্শনার্থী সাধু-সন্ন্যাসিগণের অনেকেই গঙ্গোত্রীর পথে আসিতে ভীত ও চিন্তিত হইয়া থাকেন।

উত্তর-কাশী হিমালয়ের নিভৃত-বক্ষে ভাগীরথী-তীরে অবস্থিত। এখানে আসিবার পূর্ব্বে মনে হয়, বুঝি বারাণসীর আর একটী অভিনব দৃশ্যপট এখানে উন্মুক্ত হইবে। সেই পাষাণ-সোপান-বদ্ধ ভাগীরথী-তীর ও তরণী-শোভিত তটিনী-বক্ষ, সহস্র সহস্র নরনারী-সঙ্কুল বায়ু-প্রবাহ-হীন প্রস্তর-গৃহ, আবর্জ্জনা-দূষিত, পণ্য-বীথিকা-পূর্ণ সঙ্কীর্ণ রাজপথ এবং বৃষভাবরুদ্ধ সঙ্কীর্ণতর দুর্গন্ধময় শাখাপথ-সমূহ সেইরূপই ইতস্ততঃ প্রসারিত রহিয়াছে;—বুঝি এখানেও কাঁসর-ঘণ্টা-মুখরিত অসংখ্য দেবালয় ও দেব-প্রতিমা, সাধু ও অসাধু, মুমুক্ষু ও অর্থলিপ্সু, সাধ্বী ও পতিতার তেমনি বিচিত্র সম্মিলন।

কিন্তু এখানে উপস্থিত হইলে, তাহার কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। একটী সুন্দর, অপাপ-বিদ্ধ পুণ্যতীর্থ স্নিগ্ধতা ও প্রসন্নতায় পরিপূর্ণ হইয়া নয়ন-সমক্ষে উদ্ভাসিত হয়। চতুর্দ্দিকে সমুন্নত গিরিশৃঙ্গ, মধ্যে অনতি-বিস্তীর্ণ সমতল ক্ষেত্রে উত্তর-কাশী প্রতিষ্ঠিত; সেই পবিত্র পীঠতল প্রক্ষালনপূর্ব্বক প্রসন্ন-সলিলা কলনাদিনী ভাগীরথীর পুণ্য-প্রবাহ অসংখ্য উপলখণ্ডে প্রতিহত হইয়া দ্রুত প্রবাহিত হইতেছে। চির-তুষার-মণ্ডিত শুভ্র গিরিশৃঙ্গগুলি যেন মস্তকে শ্বেত-শিরস্ত্রাণ পরিধানপূর্ব্বক শ্যামল তরুরাজিতে মধ্যদেশ আবৃত করিয়া কোন মহাপুরুষের অলঙ্ঘ্য ইঙ্গিত অনুসারে এক স্মরণাতীত যুগ হইতে বিশ্বস্ত প্রহরীর ন্যায় এই দেবভূমিকে রক্ষা করিতেছে। নিদাঘের খর-রৌদ্রোদ্ভাসিত উজ্জ্বল মধ্যাহ্ন এবং শীতের তুষার-সমাচ্ছন্ন-কুজ্ঝটিকাময়ী হিমযামিনী—সর্ব্বকালই এক মধুর প্রশান্তিতে এই পুণ্যভূমি পরিব্যাপ্ত থাকে।

উত্তর-কাশী নগর নহে। নাগরিক জীবনের ঐশ্বর্য্য, কর্ম্মময় ভাব, আশা-নিরাশা ও সাফল্য-নিষ্ফলতার সংঘর্ষণে উৎপন্ন ঘোর আন্দোলন, আর্ত্ত ও পীড়িতের হৃদয়-ভেদী ক্ষুব্ধ ক্রন্দনোচ্ছ্বাস, পুরুষকারের বিজয় গর্ব্ব, জেতার দম্ভ এবং আভিজাত্যের অভিমান এখানে দেখিতে পাওয়া যায় না। সংসারে ক্ষুধিত-তৃষিত-কোলাহল, কঠিন পর্ব্বতাবরণ ভেদ করিয়া এই শান্তিধামে প্রবেশ করিতে সক্ষম নহে; নীচতার ধূলি এবং হিংসা-দ্বেষ ও ক্রোধ-লোভের জ্বালাময় বায়ুপ্রবাহ এই পবিত্র তীর্থ কলঙ্কিত করে নাই; বিলাস-প্রিয়তা এবং পার্থিব লালসার এখানে সম্পূর্ণ অভাব। এখানে উপস্থিত হইলে শুধু বহু প্রাচীন, নিষ্কলঙ্ক, মঙ্গল-কিরণানুরঞ্জিত শান্ত আর্য্য-জীবনের একটী সুকোমল পবিত্র স্মৃতি হৃদয়ে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে।

অধিবাসীর সংখ্যা এখানে নিতান্ত অল্প,—একশত ঘরের কিছু অধিক হইবে। নর নারী সকলের প্রকৃতিই অতি মহৎ এবং সরল; ইহাদের মধ্যে অবরোধ-প্রথা প্রচলিত নাই, অতিথির প্রতি ইহাদের অসাধারণ যত্ন ও অনুরাগ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের সম্বল অতি সামান্য;—কিঞ্চিৎ অনুর্ব্বর ভূমিখণ্ড এবং অল্পসংখ্যক গবাদি পশু। কিন্তু বিশ্বেশ্বরের কৃপায় নির্ভর করিয়া ইহারা নিশ্চিন্তভাবে দিনপাত করে। এমন পরিশ্রমী, সহজ-সন্তুষ্ট, শান্তিপ্রিয় জাতি বর্ত্তমান কালে অতি বিরল। পরিশ্রম-বলে ইহারা এই কঠিন পার্ব্বত্য-মৃত্তিকাতে আবশ্যকীয় শস্যাদি উৎপাদন করে এবং তাহাতেই তাহাদের জীবিকা নির্ব্বাহ হয়।

এই অধিবাসিবর্গ সকলেই ব্রাহ্মণ; ইহাদের চরিত্র নিষ্কলঙ্ক, প্রকৃতি শান্ত এবং ব্যবহার অতি মধুর। অধিকাংশ লোকই দেবভাষার সহিত সুপরিচিত এবং ইহারা গৌরবর্ণ। মধ্যাহ্নে যাঁহারা হলচালন করেন, প্রভাত ও সন্ধ্যাকালে তাঁহারাই স্থির-গম্ভীর স্বরে বেদমন্ত্র উচ্চারণ ও মহিম্নঃস্তব পাঠ করিয়া থাকেন। দেববালার ন্যায় সুন্দরী, সুকেশা, আরক্তগণ্ডা, সুলোচনা বালিকাগণ আদিম আর্য্য-কন্যার অনুরূপ এখনও গো-দোহন করে এবং কোমল-হৃদয়া স্নেহময়ী রমণীগণ পরম উৎসাহের সহিত সহধর্ম্মিণীর ন্যায় প্রত্যেক কার্য্যে স্ব স্ব স্বামীর সহায়তা করেন। প্রাচীন কালের এই সকল মোহন-সদৃশ্য নয়ন-সমক্ষে বিমুক্ত দেখিয়া শুধু বিস্ময়-বিমুগ্ধ-নেত্রে চাহিয়া থাকিতে হয়। মনে হয়, ইহা কি ঊনবিংশ শতাব্দী এবং পাশ্চাত্য-সভ্যতা-প্লাবিত ইংরেজের শাসিত ভারতবর্ষ? অথবা বহুশত বৎসর পূর্ব্বের বৈদিক যুগের এক সুমধুর, প্রীতি-প্রফুল্ল দৃশ্য, সরস্বতী ও দৃশদ্বতীর তটভূমি হইতে সঞ্চয় করিয়া কোন ঐন্দ্রজালিক, তাহার মোহিনী-মায়ার আশ্চর্য্য প্রভাবে, হিমাচলের এই গোপন অন্তরালে সংগুপ্ত রাখিয়াছে এবং বর্ত্তমান শতাব্দীর সুসভ্য পরিব্রাজকের কুতূহল-দৃষ্টির সম্মুখে একটী অমল সুন্দর বিভ্রম অতীতের একটী ছায়াসুপ্ত মায়াপুরীর রচনা করিতেছে।

এখানে ইষ্টকনির্ম্মিত অট্টালিকা কিংবা পাষাণময় গৃহ একখানিও নাই। গৃহগুলি সমস্তই দরিদ্রের পর্ণকুটীর,—যেন আদিকালের সেই সকল শান্ত এবং সুপরিচ্ছন্ন তপোবন! চতুর্দ্দিকে দুই চারিটী অনুচ্চ দেবমন্দির; মধ্যে জাহ্নবী-কূলে একটী বহু-পুরাতন, দৃঢ়কায়, সমুন্নত পাষাণ-মন্দির, কালের সহিত সংগ্রাম করিয়া এবং শত ঝড় ও ঝঞ্ঝাবাত তুচ্ছজ্ঞান করিয়া একটী ক্ষুদ্র গিরিশৃঙ্গের ন্যায় এই পর্ব্বতোপত্যকায় দণ্ডায়মান রহিয়াছে,—অভ্যন্তরে বিশ্বেশ্বরের পাষাণমূর্ত্তি। এই মন্দির ও অভ্যন্তরস্থ প্রতিমা নিরীক্ষণ করিলে একবার কাশীর সেই মন্দির ও তাহার দেবতার কথা

মনে হয়। কে শ্রেষ্ঠ এবং অধিক প্রাচীন, বলা যায় না। কাশীর সেই মন্দিরে সান্ধ্য-আরতির সময়ে অগণ্য ভক্তবৃন্দের ভক্তির উচ্ছ্বাস, বাদ্যোদ্যমের তুমুল কলরব, যাজ্ঞিক ও পুরোহিতবর্গের মন্ত্রোচ্চারণ-শব্দ সমস্ত একত্রিত হইয়া যে মিশ্রিত ধ্বনি উৎপাদন করে, তাহা শুনিলে মনে হয়, বিশ্বেশ্বর নিখিলের ভক্তি ও প্রীতি আকর্ষণ পূর্ব্বক, রাজেন্দ্রের ন্যায়, তাঁহার মহা-সিংহাসনে বিরাজ করিতেছেন; অনুভব হয়, কুবের তাঁহার ধনাধ্যক্ষ, মৃত্যু তাঁহার কিঙ্কর, মাতা অন্নপূর্ণা তাঁহার অঙ্কলক্ষ্মী;—তিনি প্রার্থীকে ধন দিতেছেন, সুখ দিতেছেন, স্বাস্থ্য দিতেছেন; ভীত ব্যক্তি তাঁহার নিকট অভয় প্রাপ্ত হইতেছে, অশান্ত-হৃদয় শান্তিধারা লাভ করিয়া পূর্ণপ্রাণে প্রস্থান করিতেছে ও সকলে "জয় বিশ্বেশ্বর" বলিয়া প্রাণ খুলিয়া তাঁহার অভিবাদন করিতেছে। সেই জয়নাদ, সেই প্রীতি এবং ভক্তির বিমল উচ্ছ্বাস সমগ্র ভারতবর্ষে বিকীর্ণ হয় এবং কাশ্মীর হইতে কুমারী পর্য্যন্ত সমগ্র ভারতের ভক্তগণ অধিক আশ্বস্ত-হৃদয়ে, অধিক আগ্রহ সহকারে এই দেবাদিদেবের চরণমূলে আপনাদিগের কাতর-প্রার্থনা নিবেদন করিবার জন্য বারাণসীধামে উপস্থিত হয়।

কিন্তু উত্তর-কাশীর বিশ্বেশ্বর ভিখারী। তাঁহার দর্শকসংখ্যাও নিতান্ত অল্প; স্থানীয় অধিবাসি-বৃন্দ ভিন্ন আর যাহারা তাঁহার দর্শন-কামনায় এই পবিত্র পীঠতলে সমাগত হয়, তাহারা ভিখারী সন্ন্যাসী মাত্র। তাঁহার পূজার জন্য সুবর্ণনির্ম্মিত বিল্বপত্র তাহারা কোথায় পাইবে? সুবর্ণ-কলসে তাঁহার মন্দির-চূড়া বিমণ্ডিত করিবার অর্থ তাহাদের কাহারও নাই; কিন্তু সেই অল্পসংখ্যক ভক্তের অকৃত্রিম ভক্তি তাঁহার পাষাণ-মন্দির পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে এবং সেই ভক্তিই যেন দেব-চরণ হইতে সুপবিত্র সুধৌত-বেশে প্রত্যাবর্ত্তন-পূর্ব্বক তদীয় ভক্তের হৃদয়ে বল, সাহস এবং মনুষ্যত্বের সঞ্চার করিতেছে। অর্থগৌরবে কাশীর বিশ্বেশ্বর শ্রেষ্ঠ সন্দেহ নাই, কিন্তু উত্তর-কাশীর বিশ্বেশ্বরের দরিদ্র ভক্ত-বৃন্দকে ভক্তিতে কে পরাস্ত করিবে?

মন্দিরে কোন প্রকার কারু-কার্য্য নাই। মন্দিরটী কত কালের, তাহাও নিরূপণ করা অসম্ভব। হিন্দুধর্ম্মের প্রথম অভ্যুত্থানকালে এই মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল, এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নহে। কাশীর উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেক প্রবাদ, অনেক বচন, অনেক প্রকার উক্তি আছে; বিশ্বেশ্বরের মন্দির ও তাঁহার অবস্থান সম্বন্ধেও নানা অলৌকিক আখ্যায়িকার অভাব নাই। কিন্তু উত্তর-কাশীর উৎপত্তি, এই বিশ্বেশ্বর-মন্দির ও দেবতার অবস্থিতি সম্বন্ধে কোন কাহিনী শুনিতে পাওয়া যায় না। যে সকল ভক্ত-অধিবাসী ও পাণ্ডার হস্তে এই মন্দিরের ভার ন্যস্ত আছে, তাহারা মন্দিরের গৌরব-বৃদ্ধির জন্য এ পর্য্যন্ত স্বকপোল-কল্পিত কোন গল্পের সৃষ্টি করে নাই। ইতিহাস তাহাদের নিকট মূক, পুরাণের সহিতও তাহাদের অধিক পরিচয় নাই, পরিস্ফুট সত্যের ন্যায় এই মন্দির ও তাহার দেবতা তাহাদের সম্মুখে বর্ত্তমান; যাঁহার ইচ্ছামাত্রেই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি ও লয় অবশ্যম্ভাবী, সেই ইচ্ছাময়ের আবির্ভাব ও অবস্থান সম্বন্ধে কোন প্রকার প্রশ্ন-কৌতূহল তাহাদের মনে স্থান প্রাপ্ত হয় না।

শুনিতে পাওয়া যায়, বিশ্বেশ্বরের মন্দির ভিন্ন উত্তর-কাশীতে আরও কতকগুলি বৃহৎ মন্দির ছিল এবং কাশীর ন্যায় পাষাণবদ্ধ ঘাটের অভাব ছিল না; কিন্তু সে সমস্তই ভাগীরথীর কুক্ষিগত হইয়াছে। মন্দিরের পূজকগণের অবস্থা অতি হীন, কিন্তু তাঁহারা নির্লোভ,—যাত্রিগণের নিকট তাঁহারা কিছুই প্রার্থনা করেন না, যাত্রিগণ

স্বেচ্ছাক্রমে যাহা দান করে, তাঁহারা তাহাতেই সন্তুষ্ট। এখানে পাণ্ডাদিগের কোন প্রকার উপদ্রব নাই। প্রায় অধিকাংশ তীর্থেই দেখা যায়, পাণ্ডাগণ দু-পাঁচটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিগ্রহ স্থাপনা-পূর্ব্বক তাঁহাদের পূজা-অর্চ্চনার জন্য যাত্রীদিগের অর্থের উপর আধিপত্য বিস্তার করে, এখানে সেরূপ কোন উপসর্গ দেখা যায় না। এখানে দুই চারিটী অন্য দেবতার মন্দির থাকিলেও সেই সকল দেবতার পূজা অতি সংক্ষিপ্ত উপায়ে সম্পন্ন হইয়া থাকে। পূজার প্রধান উপকরণ ভক্তি ও প্রীতি, বিল্বপত্র, পুষ্প, চন্দন; মন এবং বন হইতেই তাহা সংগৃহীত হয়, অর্থব্যয় অবশ্য প্রয়োজনীয় নহে।

এখানে দুই একখানি দোকান আছে, তাহাতে আটা, ডাইল, লবণ এবং লঙ্কা ভিন্ন অন্য কিছু পাওয়া যায় না। ছাগলের পৃষ্ঠে বোঝাই দিয়া দূরবর্ত্তী স্থান হইতে ইহারা পণ্যদ্রব্য সংগ্রহ করে, কিন্তু শীতকালে অত্যন্ত শীতে ও বরফপাতে ইহাদের ব্যবসায় সম্পূর্ণ বন্ধ থাকে।

বৈশাখ মাসই এখানে আসিবার প্রশস্ত সময়। বর্ষাকালে এ পথে পর্য্যটন করা অসম্ভব; তখন গলিত তুষার-ধারায় পার্ব্বত্য অধিত্যকা সর্ব্বত্রই জলাকীর্ণ হইয়া যায়, প্রস্রবণসমূহ হইতে প্রবল ধারায় জলরাশি নিঃসৃত হইতে থাকে, কঠিন পর্ব্বতগাত্র পিচ্ছিল হওয়াতে তাহা অত্যন্ত দুরারোহ হইয়া উঠে। তাহার পরই দুরন্ত শীতকাল এই গিরিরাজ্য আক্রমণ করে; তুষার-রাশিতে সমস্ত প্রদেশ আচ্ছন্ন হইয়া যায় এবং তদ্দেশীয় অধিবাসিগণকে কুটীরের মধ্যে দিবারাত্রি অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া অতি কষ্টে দিনপাত করিতে হয়।

কিন্তু বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে এই পার্ব্বত্য-প্রদেশের শোভা অতি মনোহর। এই সময়েও এখানে শীত অতি প্রবল, কিন্তু তাহা অসহ্য নহে; বৈশাখ জ্যৈষ্ঠই এখানকার বসন্তকাল। বৃক্ষে বৃক্ষে বিবিধ পার্ব্বত্য কুসুমস্তবক বিকসিত হইয়া উঠে, পার্ব্বত্য-লতাপুঞ্জে বিচিত্র বর্ণের পুষ্পরাশি প্রস্ফুটিত হইয়া সুরভিধারা ঢালিয়া দেয় এবং পর্ব্বত-অন্তরাল হইতে প্রদীপ্ত সূর্য্যের শুভ্র কিরণ এই সমতল ক্ষেত্রে পতিত হইয়া ভাগীরথীজলে, প্রস্রবণ-সলিলে এবং পুষ্পদলে অনুপম সৌন্দর্য্য ফুটাইয়া তুলে; মনে হয় কঠিন-গিরিশৃঙ্গ হইতে ঊর্দ্ধে উন্মুক্ত, নীল, আলোকব্যাপ্ত আকাশ পর্য্যন্ত বিশ্বেশ্বরের বিপুল মহিমায় উদ্ভাসিত।

উত্তর-কাশীর বিশ্বেশ্বর-মন্দিরে একটী সান্ধ্য-আরতির বর্ণনা দ্বারা আমরা এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রায় অবসান-কাল। সূর্য্য অনেকক্ষণ অস্ত গিয়াছেন, অন্ধকার গাঢ় হইয়া আসিয়াছে। পার্ব্বত্য-কৃষক-কুটীরে ধীরে ধীরে সান্ধ্যদীপ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল; বিশ্বেশ্বর-মন্দিরের অদূরে নদীতীরে বৃক্ষশ্রেণী, অনেক-গুলি সাধু-সন্ন্যাসী ও অবধূত সেই শালবৃক্ষতলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, সন্ধ্যাসমাগম দেখিয়া তাহারা অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত করিয়া সান্ধ্য-উপাসনা আরম্ভ করিল।

ক্রমে বিশ্বেশ্বর-মন্দিরে শঙ্খ, ঘণ্টা ও কাঁসর বাজিয়া উঠিল। নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় সেই গভীর শব্দ দূর হইতে দূরান্তরে পর্ব্বতের শিখরে শিখরে ধ্বনিত হইতে লাগিল। ভক্তবৃন্দ ধীরে ধীরে মন্দির-প্রাঙ্গণে সমবেত হইলেন। স্ত্রী-পুরুষ অনেককেই সেখানে সম্মিলিত দেখা গেল; সমবেত নরনারীর সংখ্যা প্রায় পঞ্চাশৎ, সেই ক্ষুদ্র মন্দির-প্রাঙ্গণ তাহাতেই পরিপূর্ণ-প্রায়।

পূজা শেষ হইলে দেবতার আরতি হইল। ত্রয়োদশ কি চতুর্দ্দশ বয়ঃস্থ একটী অজাত-শ্মশ্রু বালক ধূপাধার হস্তে লইয়া আরতি আরম্ভ করিল। বালকের আকৃতি এবং প্রকৃতি অতি

সুন্দর। মুখমণ্ডল প্রশান্ত, চক্ষু উজ্জ্বল, কার্য্যে দৃঢ়তা এবং নিষ্ঠা প্রতিফলিত। এত অল্প বয়সে এমন গাম্ভীর্য্য ও ধীরতা শুধু সেই জাতির মধ্যেই সম্ভব, যাহাদের জীবনের চরম উদ্দেশ্য-শিক্ষা এবং সংযম।

ধূপ-দীপ-হস্তে উপাসনা করিতে করিতে বালক যে পবিত্র সামগাথা গান করিয়াছিল, সেই গানের এবং গায়কের কণ্ঠস্বরের মাধুর্য্য দর্শকবৃন্দের শ্রবণপথে সুধা সিঞ্চন করিতেছিল। সামগান সাধারণতই মধুর এবং গম্ভীর, কিন্তু বালকের কোমল-কণ্ঠে কোমলতা প্রাপ্ত হইয়া তাহা আশ্চর্য্য সুললিত হইয়াছিল; তাহা অনির্ব্বচনীয়, শুধু অনুভবের যোগ্য। যাহারা সেই দেব-সঙ্গীত বুঝিতে পারিল, তাহাদের চক্ষুঃপ্রান্ত আর্দ্র হইয়া উঠিল; যাহারা বুঝিতে পারিল না, তাহারা ছল ছল নেত্রে মুগ্ধ-দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। সেই অমর-গাথা প্রাচীন ঋষি-হৃদয়ের সেই অপার্থিব ভক্তি-ইতিহাস শুনিতে শুনিতে পৃথিবীর কথা ভুলিয়া যাইতে হয় এবং অনন্ত সুন্দরের দিব্য প্রসন্নতায় বক্ষ ভরিয়া উঠে।

আরতি শেষ হইলে, সকলে অবনত-মস্তকে, ভক্তিপূর্ণ-হৃদয়ে বিশ্বেশ্বরের চরণে প্রণাম করিয়া ধীরে ধীরে গৃহে প্রত্যাগমন করিল। অধিক রাত্রে চন্দ্র মধ্যাকাশে আসিলে, তাঁহার বিমল-কিরণ-ধারায় ভাগীরথী-জল, নদীতীরস্থ বৃক্ষ-রাজী, সুবৃহৎ মন্দির এবং প্রত্যেক ক্ষুদ্র পর্ণ-কুটীর স্নাত হইতে লাগিল। এই সময়ে নদী-তীরে প্রস্তর-খণ্ডে উপবেশন করিলে দেখা যায়, বৃক্ষরাজীর ঘুমন্ত ছায়া প্রবাহিণীর নির্ম্মল উজলে ভাসমান রহিয়াছে; কখন বা মৃদু নৈশ বায়ু-হিল্লোলে একটী শুষ্ক পত্র নদীবক্ষে পড়িয়া স্রোতে ভাসিয়া চলিতেছে; নদীতীরস্থ বিভিন্ন বর্ণের উপলখণ্ড-বিক্ষিপ্ত চন্দ্ররশ্মি ভাগীরথী-তীরকে মন্দাকিনীর মরকত-দীপ্ত উপকূল বলিয়া বিভ্রম উৎপাদন করিতেছে এবং বিবিধ পুষ্পের সুরভি বায়ু স্রোতে ভাসিয়া এই ক্ষুদ্র নিভৃত উপত্যকাটীকে আচ্ছন্ন করিয়াছে; বোধ হয়, ঐ সুদূর চন্দ্রলোক হইতে চন্দ্রালোকের সঙ্গে এই মৃদুগন্ধ ভাসিয়া আসিতেছে, যেন বিশ্বেশ্বরের পূজার জন্য ইহা প্রকৃতি-হস্ত-প্রেরিত অপার্থিব প্রীতি-উপহার। ক্রমে রাত্রি যত অধিক হয়, চতুর্দ্দিক্ ততই স্তব্ধ এবং গম্ভীর-ভাব ধারণ করে, পর্ব্বত-শ্রেণীকেও নিদ্রিতের ন্যায় বোধ হয়,—শুধু সেই শুভ্র জ্যোৎস্নালোকে হিমাচলের সেই স্নেহালিঙ্গন-পাশে, উন্মুক্ত, প্রশান্ত নীলাম্বরতলে একটী উন্নত মন্দির, বৃক্ষলতা-সমাচ্ছন্ন একটী গিরি-তরঙ্গিণী, নীহার-সিক্ত পুষ্পবন এবং কতকগুলি ক্ষুদ্র পর্ণকুটীর ও অনুচ্চ দেবালয়, একখানি সুচারু দৃশ্য-পটের ন্যায়, বিস্তীর্ণ থাকে। নিদ্রালস-নেত্রে তাহার দিকে চাহিলে মনে হয়, একি স্বপ্নদৃশ্য,—না, সত্য সত্যই প্রকৃতিদেবীর সযত্ন অঙ্কিত চিত্রকৌশল!!

শ্রীজলধর সেন।

রণজিৎসিংহের দরবার।

রণজিৎসিংহ ভারতবর্ষে শেষ স্বাধীন রাজা। ভারতে মুসলমান-গৌরব-সূর্য্যের উন্নতির সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ হইতে অস্তগমনের পর দুই শতাব্দী ব্যবধানে দুইজনমাত্র স্বাধীন রাজা দিক্‌পালের ন্যায় প্রচণ্ডতেজে এই সাগরাম্বর বিস্তীর্ণ ভারতের এক এক দিক্ শাসনপূর্ব্বক ইহলোক হইতে অপসৃত হইয়াছেন; অপ্রসিদ্ধ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া অন্যের অজ্ঞাতসারে নিতান্ত সাধারণভাবে বর্দ্ধিত হইয়া তাঁহারা যে অসাধারণ কার্য্য

সম্পাদন করিয়াছেন, তাহাতে প্রবল পরাক্রান্ত অতুল ক্ষমতার অধিপতি ভারতের সম্রাট্ সবিস্ময়ে সেই ঐন্দ্রজালিক মহাপুরুষদ্বয়ের দিকে চাহিয়াছিলেন। ইহাঁদের একজন মহারাষ্ট্রীয় শিবজী, অন্যজন পঞ্জাব-কেশরী রণজিৎসিংহ। অসভ্য ক্ষুদ্র মহারাষ্ট্র সামন্ত-বর্গকে একত্র করিয়া, অশিক্ষিত মহারাষ্ট্র সৈন্যগণকে সুশিক্ষিত করিয়া, কিরূপে শিবজী মহারাষ্ট্রীয়গণকে একটী বীরজাতিতে পরিণত করেন, তাহাদের সাহায্যে কিরূপে তিনি দাক্ষিণাত্যে একটী বিশাল রাজ্য সংস্থাপন করেন এবং সেই পর্ব্বত-মূষিকগণ অবশেষে কিরূপে সোণার মোগল-সাম্রাজ্য ধ্বংস করিয়া ফেলে, ভারতের ইতিহাসে তাহা বিবৃত রহিয়াছে। সম্রাট্ আরঙ্গেবের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, জটিল কূটনীতি, সূক্ষ্ম বহুদর্শিতা, একান্ত অধ্যবসায়, অনন্ত অর্থ-গৌরব এবং প্রভূত সেনাবল, কিছুতেই সে পতন হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিতে পারে নাই। কিন্তু মহারাষ্ট্রের আশা-ভরসা শিবজীর সঙ্গে সঙ্গেই নির্ম্মূল হইয়া গেল, মহারাষ্ট্রীয় জাতির কর্ম্মময় জীবনের তীব্র স্রোত মধ্যপথে অবরুদ্ধ হইয়া গেল।

মোগল-সাম্রাজ্যের পতনের সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চনদের উর্ব্বর সমতলক্ষেত্রে শিখজাতির অভ্যুত্থান হইল। গুরু গোবিন্দ সিংহ—ধর্ম্মপ্রাণ, নিরীহ, নম্র-প্রকৃতি শিখগণকে মহাতেজস্বী, নির্ভীক, প্রতিশোধগ্রহণক্ষম, বীর্য্যবান্, যোদ্ধ-জাতিতে পরিণত করিলেন—এই দীর্ঘ সাধনার ফল মহারাজা রণজিৎসিংহ। সেই যুদ্ধ-কুশল দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ধূর্ত্ত নরপতি শতদ্রু হইতে কান্দাহার পর্য্যন্ত সুবিস্তীর্ণ ভূভাগ বীরদর্পে শাসন করিয়াছিলেন; ইংরেজগণ দূর হইতে সম্মানের সহিত সশঙ্কভাবে পঞ্চনদের সেই একচক্ষু অধিপতির দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেন এবং দুর্দ্দান্ত আফগান এই বিষম শত্রুকে দ্বার-দেশে সমুপস্থিত দেখিয়া উৎকণ্ঠিতচিত্তে সতর্কতার সহিত কালাতিপাত করিত। কিন্তু এই ঐন্দ্রজালিক পুরুষ চিরজীবী নহেন, তাঁহার জীবনের সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চনদের পতন হইল, গুর্জ্জনবালার রাজপ্রাসাদে বৃটীশ পতাকা উড্ডীন হইল। তাঁহার অগণ্য অনুচরবর্গ ও তাঁহার বংশধরগণ তাঁহার সম্পত্তি, গৌরব, স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে পারিল না, শুধু সেই প্রাতঃস্মরণীয় বীরের নাম ইতিহাসের পৃষ্ঠায় চিরদিনের জন্য অক্ষয় অক্ষরে লিখিত রহিল।

রণজিৎসিংহ অসাধারণ পুরুষ ছিলেন, সন্দেহ নাই; কিন্তু একজনের চেষ্টা-যত্নে ও পরিশ্রমে কোন মহৎ কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে না,—বিশেষতঃ রাজ্য-সংস্থাপন। অতএব রণজিৎসিংহকে উত্তমরূপ জানিতে হইলে, তাঁহার পাত্র, মিত্র ও সভাসদ্‌বর্গের বিবরণও অবগত হওয়া অবশ্য প্রয়োজনীয়। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা তাঁহার প্রধান প্রধান সহযোগী ও সহকারিগণের সম্বন্ধে কতকগুলি জ্ঞাতব্য বিষয়ের অবতারণা করিব।

রণজিৎসিংহের অনেক কুসংস্কার ছিল। তিনি ধার্ম্মিক ছিলেন না। গুরু নানকের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম-মতে তাঁহার কোন আস্থা ছিল না। তিনি সময় এবং সুবিধার দাস ছিলেন। যে সকল নীতি জাঠদিগের সুশাসনে তাঁহার সহায়তা করিত, তিনি তাহাই অধিক আদরের সহিত গ্রহণ করিতেন এবং ধর্ম্মানুরাগশূন্য হইয়াও তিনি শিখ-পুরোহিত ও ধর্ম্মযাজক-বর্গের মধ্যে স্বীয় সম্মান অব্যাহত রাখিবার জন্য সময়ে সময়ে তাহাদিগকে প্রচুর অর্থ ও মূল্যবান্ দ্রব্যাদি দান করিতেন। কয়েকজন প্রধান মহান্ত, বাবা এবং ভাই তাঁহার দরবারে অতি উচ্চস্থান লাভ করিয়াছিলেন; কিন্তু শিখ-ধর্ম্মে ইহাঁরা যে বিশেষ সুপণ্ডিত ছিলেন, তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। বর্ত্তমান কালের

অর্দ্ধ-শিক্ষিত নানকের ধর্ম্মরহস্যে অনভিজ্ঞ শিখ-পুরোহিতবর্গ অপেক্ষা তাঁহাদের ধর্ম্মজ্ঞান কোন অংশে বিকাশ প্রাপ্ত হয় নাই। কিন্তু ধর্ম্মের বাহ্যাড়ম্বরে তাঁহাদের ত্রুটী ছিল না, রণজিতেরও তাহাতে অসন্তোষ ছিল না। মুসলমান-ধর্ম্ম বিধ্বংস করাই এ শিখদিগের ধর্ম্মের প্রধান উদ্দেশ্য হইয়াছিল; এমন কি, মুসলমানকে সম্ভাষণ করা, তাহাদের সংসর্গে বাস করা এবং মুসলমান নরপতির সহিত যে কোন মর্ম্মে সন্ধি-স্থাপন করা ব্যবস্থা-বহির্ভূত কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইত; কিন্তু মহারাজের অনেক সভাসদ্ ও সহযোগী মুসলমান-ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। ব্রাহ্মণগণের প্রতিও গুরু গোবিন্দ সিংহের বিশেষ বিদ্বেষ ছিল, কারণ গোবিন্দ সিংহ জাতিভেদ-প্রথা উন্মূলিত করিবার পক্ষপাতী ছিলেন এবং তিনি ব্রাহ্মণ্য-প্রাধান্য অস্বীকার করিতেন বলিয়া ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে জাতিচ্যুত বলিয়া মনে করিতেন। এই কারণে গোবিন্দ সিংহ তৎপ্রণীত ব্যবস্থাশাস্ত্রে ব্রাহ্মণদিগকে রাজকর্ম্মে নিয়োগ করিতে স্পষ্টতঃ নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু রণজিৎসিংহ এই নিষেধ-বাক্যে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন; তাঁহার দরবারে উচ্চপদস্থ-ব্রাহ্মণ-কর্ম্মচারীর সংখ্যা নিতান্ত অল্প ছিল না, বিশেষতঃ জমাদার খুসহাল সিংহ, রাজা তেজসিংহ, রাজা সাহেব দয়াল, রাজা রালিয়া রাম, দেওয়ান অযোধ্যা-প্রসাদ, পণ্ডিত শঙ্করনাথ প্রভৃতি ব্রাহ্মণ সভাসদ্‌বর্গের প্রতি রাজ্যের অনেক গুরু-ভার ন্যস্ত ছিল। কোন কোন ইংরেজ রাজনীতিক পণ্ডিতের বিশ্বাস,—মহত্ত্ব, সহৃদয়তা এবং অপক্ষপাতের বশবর্ত্তী হইয়া, রণজিৎসিংহ যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব শিখ-গুরুদিগের অনুদার নিষেধ-বিধি অবহেলা করিতেন, এমন নহে, স্বার্থপরতা এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষার বশীভূত হইয়াই তিনি এরূপ করিতেন। যাঁহাদের সহায়তা-গ্রহণে তাঁহার কিঞ্চিন্মাত্রও উপকার-লাভের সম্ভাবনা ছিল, তাঁহারা যে ধর্ম্মাবলম্বীই হউন, রণজিৎসিংহ অসঙ্কুচিত-চিত্তে তাঁহাদের সহিত সম্মিলিত হইতেন। রণজিৎসিংহের বিশ্বাস ছিল, রাজ্য-শাসন এবং পার্থিব অন্যান্য কার্য্য সম্বন্ধে সুমন্ত্রণা দিতে ভারতে ব্রাহ্মণ অপেক্ষা উপযুক্ত জাতি নাই এবং তরবারি ধারণ পূর্ব্বক নির্ভীক-চিত্তে বীরের ন্যায় যুদ্ধ করিতে, রাজ্য-শাসনে ও সৈন্য-পরিচালনে মুসলমানই অগ্রগণ্য। এই কারণে তিনি হিন্দু ও মুসলমান কর্ম্মচারিবর্গকে সমান স্নেহ, যত্ন ও আদর করিতেন।

ফকির আজিজউদ্দিন।

মহারাজ রণজিৎসিংহের দরবারে ফকির আজিজউদ্দিন নামক মুসলমান কর্ম্মচারীর ক্ষমতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ছিল। এই ব্যক্তি রণজিৎসিংহের পররাষ্ট্র-সচিব ছিলেন। তাঁহার বাল্য-জীবন ও ক্রমোন্নতি সম্বন্ধে স্থূল স্থূল বিবরণ, এখানে উদ্ধৃত করিতেছি।

বোখারার কোন সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারে ফকির আজিজউদ্দীনের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা গোলাম মহাইউদ্দীন একজন অতি বিচক্ষণ চিকিৎসক ছিলেন। গোলাম মহাইউদ্দীন চিকিৎসা-শাস্ত্রে পারদর্শী করিবার অভিপ্রায়ে ফকিরকে লাহোরের প্রধান চিকিৎসকের শিক্ষাধীনে রক্ষা করেন। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে রণজিৎসিংহের একজন পারিবারিক চিকিৎসকের প্রয়োজন হয়। এই সময় ফকিরের শিক্ষাকার্য্য শেষ হইয়াছিল; তাঁহার শিক্ষক, তাঁহার প্রতি এতই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে, ফকিরই তৎকর্ত্তৃক মহারাজের গৃহ-চিকিৎসকরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন।

ইহার কিছুদিন পরেই মহারাজ কোন সঙ্কটজনক পীড়ায় আক্রান্ত হন। সেই সময় যুবক চিকিৎসক মহারাজের চিকিৎসায় এমন

যত্ন ও নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন যে, অতি অল্পকাল মধ্যেই মহারাজ নীরোগ হইয়া উঠিলেন এবং ফকিরের প্রতি মহারাজের কৃপাদৃষ্টি আকর্ষিত হইল। কৃতজ্ঞতা স্বরূপ মহারাজ রণজিৎসিংহ ফকিরকে কয়েকখানি গ্রাম পুরস্কার প্রদান করিলেন এবং ফকির তাঁহার নিজের চিকিৎসক পদে নিযুক্ত হইলেন। ক্রমে রণজিতের বৈষয়িক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ফকিরের অবস্থারও উন্নতি সংঘটিত হইল। শীঘ্রই ফকির আজিজ-উদ্দীন রণজিতের অধিকার মধ্যে একজন প্রধান ব্যক্তি হইয়া উঠিলেন। ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে রাজ্যের সীমা লইয়া ইংরেজরাজের সহিত রণজিতের যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠে; কিন্তু ফকিরের বিশেষ চেষ্টায় এই যুদ্ধ সংঘটিত হয় নাই। এ পর্য্যন্ত ফকির মহারাজের চিকিৎসক রূপেই পরিগণিত ছিলেন, এই ঘটনার পর রণজিৎ তাঁহাকে বিশ্বস্ত অমাত্য বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন এবং অনেক সময় তাঁহার পরামর্শেই অনেক কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে লাগিলেন। ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের সহিত মহারাজের কোন বৈষয়িক সংঘটন উপস্থিত হইলেই মহারাজ, ফকিরের পরামর্শানুসারে কার্য্য করিতেন। ইংরেজের সহিত রণজিৎসিংহের যে কখন অসদ্ভাব হয় নাই, ফকিরের সুপরামর্শই তাহার প্রধান কারণ। অবশেষে ফকিরের উপর রণজিতের বিশ্বাস এমন গভীর হইয়াছিল যে, তাঁহার হস্তেই রাজধানী-রক্ষার ভার সমর্পণ করিয়া মহারাজ সসৈন্যে দূরদেশে যুদ্ধযাত্রা করিতেন। সময়ে সময়ে ফকির আজিজউদ্দীনের হস্তে সৈন্যভারও সমর্পিত হইত এবং যুদ্ধ-ক্ষেত্রেও তিনি নিজের সম্মান-রক্ষায় অসমর্থ ছিলেন না। যখনই কোন বৈদেশিক রাজার নিকট দূত প্রেরণ করিবার প্রয়োজন হইত, ফকির আজিজউদ্দীনই তাহাতে নির্ব্বাচিত হইতেন। এইরূপে ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে লর্ড উইলিয়ম বেঙ্কর নিকট এবং ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে আমীর দোস্ত মহম্মদের রাজসভায় ফকির আজিজউদ্দীন লাহোরের রাজদূত রূপে প্রেরিত হন। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে গমক নামক স্থানে ভারতের রাজপ্রতিনিধির সহিত এবং ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে ফিরোজপুরে লর্ড অক্‌লাণ্ডের সহিত মহারাজ রণজিৎসিংহের সাক্ষাৎ হয়—সে সময়ে মহারাজ একমাত্র ফকির আজিজ-উদ্দীনের মন্ত্রণা অনুসারেই কার্য্য করিয়াছিলেন। এই সময় ফকিরের যশ এবং ক্ষমতা পঞ্চনদে পূর্ণমাত্রায় প্রকাশিত হয়।

আজিজউদ্দীন ফকিরের স্বভাব অতি কোমল এবং ব্যবহার অতি মধুর ছিল। অনেকে তাঁহার সৌভাগ্যে ঈর্ষা প্রকাশ করিত সন্দেহ নাই, কিন্তু কেহই তাঁহার শত্রু ছিল না। ধর্ম্ম সম্বন্ধে উদারতা, তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান গুণ ছিল এবং এই জন্যই তিনি সর্ব্বসাধারণের অনুরাগ আকর্ষণে সক্ষম হইয়াছিলেন। তিনি সুফি সম্প্রদায়-ভুক্ত মুসলমান ছিলেন, এই জন্য গোঁড়া মুসলমানেরা তাঁহাকে কাফেরের শ্রেণীভুক্ত বলিয়া মনে করিতেন; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে প্রাচ্য ভূখণ্ডে যত মুসলমান কবি ও দার্শনিক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের অধিকাংশই সুফি-মতাবলম্বী। ফকির আজিজউদ্দীন কোরাণের নীরস এবং কঠোর নীতিবাদের পক্ষপাতী ছিলেন না। সকল ধর্ম্মই তাঁহার নিকট সমান ছিল; এ সম্বন্ধে তিনি একটী সুন্দর মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। একদা রণজিৎসিংহ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হিন্দু এবং মুসলমান, এই উভয়ের কোন্ ধর্ম্মের তিনি অধিক পক্ষপাতী? এই প্রশ্ন শুনিয়া তিনি মৃদু-হাস্যে উত্তর দিয়াছিলেন,—"মহারাজ, আমি এক সুবিস্তীর্ণ নদীর মধ্যস্থলে ভাসমান রহিয়াছি, উভয় তটের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছি বটে, কিন্তু

তাহাদের কোন পার্থক্যই অনুভব করিতে পারিতেছি না।"

ফকির আজিজউদ্দিন যেমন সুবক্তা ছিলেন, তেমনি সুলেখক বলিয়া তাঁহার প্রসিদ্ধি ছিল। রণজিৎসিংহের রাজ্য-সংক্রান্ত অনেক কাগজ পত্রে ফকিরের রাজনীতিক জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি বিবিধ বিদ্যায় সুপণ্ডিত এবং বিদ্যানুরাগী ছিলেন। পারস্য ও আরব্য ভাষা শিক্ষার জন্য তিনি লাহোরে এক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন; তাহার সমস্ত ব্যয়ভার তিনি নিজস্কন্ধে বহন করিতেন।

আজিজউদ্দিনের যথেষ্ট কবিত্বশক্তি ছিল। পারস্য ভাষায় তাঁহার লিখিত অনেক কবিতা আছে। প্রেমের চপলতা, বিরহের বেদনা ও ছল ছল ভাব, মিলনের আনন্দোচ্ছ্বাস এবং বিমল মাধুরী বর্ণনায় তাঁহার কল্পনা নিয়োজিত হইত না, তাঁহার কবিতা গভীর আধ্যাত্মিকতা এবং তত্ত্বজ্ঞানে পরিপূর্ণ, সুফি-সম্প্রদায়ের বিশেষত্ব-ব্যঞ্জক দার্শনিক ভাব তাঁহার কবিতায় পরিস্ফুট থাকিত, তাঁহার ভাষা ও ছন্দ অত্যন্ত সরল ও সুন্দর।

যে সকল বৈদেশিক লাহোর-দরবারে উপস্থিত হইতেন, ফকির আজিজউদ্দীনের ব্যবহার তাঁহাদের সকলকেই মুগ্ধ করিত। ব্যারণ চার্লস-হুগেল নামক একজন ইয়ুরোপীয় পর্য্যটক ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে পঞ্চনদ পরিভ্রমণ করেন; ফকিরের সুন্দর ব্যবহারে এবং পাণ্ডিত্যে তিনি বিশেষ আনন্দ-লাভ করিয়াছিলেন। ব্যারণ হুগেলের সহিত মহারাজ রণজিৎসিংহের আলাপের সময়, আজিজউদ্দীনই দ্বিভাষীর কার্য্য করিয়াছিলেন। মহারাজ ইউরোপীয় অতিথির গুণে এতই মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, মাসিক ছয় সহস্র টাকা বেতনে তাঁহাকে কর্ম্মচারিরূপে নিযুক্ত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

১৮৩২ খৃষ্টাব্দে ফিরোজপুরের বিরাট্ দরবারে লর্ড এলেনব্বারের সহিত সাক্ষাতের জন্য ফকির আজিজউদ্দীন প্রেরিত হইয়াছিলেন; এখানে রাজপ্রতিনিধি তাঁহার কার্য্যদক্ষতা ও সততায় মুগ্ধ হইয়া, তাঁহাকে "উভয় রাজ্যের বন্ধুত্বের পরিরক্ষক" এই নামে সম্মানিত করেন এবং স্বর্ণ-নির্ম্মিত ঘড়ী ও চেন উপহার প্রদান করেন।

প্রথম শিখ-যুদ্ধের অনতিপূর্ব্বেই ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ফকির আজিজ-উদ্দীনের মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালেও তিনি, শিখ-সৈন্যগণ যাহাতে শতদ্রু পার না হয়, সেজন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। পঞ্জাবে তিনি ফকিরসাহেব নামে প্রসিদ্ধ।

ইমামউদ্দীন ও নুরউদ্দীন।

ইমামউদ্দীন ও নুরউদ্দীন আজিজউদ্দীনের সহোদর ভ্রাতা; জ্যেষ্ঠের ন্যায় ক্ষমতাপন্ন না হইলেও ইহাঁরা রণজিৎসিংহের দরবারে পদস্থ ব্যক্তি ছিলেন। পঞ্জাবের সর্ব্বসাধারণেই নুর-উদ্দীনকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিত। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে রাজা লালসিংহ বিদ্রোহাচরণ অপরাধে নিহত হইলে, তিনি নাবালক মহারাজ দলীপসিংহের পক্ষে রাজ্যশাসনের জন্য অন্যতম অমাত্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। নুরউদ্দীনকে সকলে আলিকাসাহেব নামে অভিহিত করিত। রণ-জিৎসিংহের রাজত্বের অধিকাংশ কাল এবং তাঁহার মৃত্যুর পর কিছুদিন পর্য্যন্তও গোবিন্দ-গড় দুর্গের শাসনভার ইমামউদ্দীনের হস্তে সমর্পিত ছিল।

নবাব সরফরাজ খাঁ ও জুলফকার খাঁ।

যৎকালে রণজিৎসিংহ মুলতানের দুর্গ অবরোধ করেন, সেই সময়ে মজঃফর খাঁ মুলতান দুর্গের অধিপতি ছিলেন। এই দুর্গ জয় করিতে রণজিৎসিংহকে যেরূপ কষ্ট ভোগ করিতে হয়, জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত তিনি তাহা ভুলিতে পারেন নাই; যখন কিছুতেই দুর্গ রক্ষিত হইল

না, তখন সেই সাহসী বৃদ্ধ দুর্গস্বামী তাঁহার পাঁচ পুত্র ও বহুসংখ্যক আত্মীয়বর্গে পরিবৃত হইয়া রণজিতের সৈন্যশ্রেণীর মধ্যে অবতরণ করেন এবং তাঁহার অনেক সৈন্য নিহত করিয়া বীরের ন্যায় মৃত্যুর শান্তিময় ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন। মুলতান জয়ের পর রণজিৎ সেই পাঠান-বীরের হতাবশিষ্ট পুত্রদ্বয় নবাব সর-ফরাজ খাঁ ও জুলফকার খাঁকে বিশেষ সম্মান-সহকারে গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহাদের লাহোরে বাস করিবার বন্দোবস্ত করিয়া দেন এবং তাঁহাদের জন্য উপযুক্ত বৃত্তি নির্দ্ধারণ করেন।

খোদাযার খাঁ।

খোদাযার খাঁ, তিওয়ানা নামক গিরি-প্রদেশের সর্দার। রণজিৎসিংহ এই প্রদেশ হস্তগত করিয়া, এই তিওয়ানা সর্দারকে তাঁহার সভাসদ-পদে বরণ করেন। খোদাযার খাঁর সহিত তাঁহার ভ্রাতৃগণও রণজিতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সর্দারের অধীনে পঞ্চাশটী তিওয়ানা অশ্ব ছিল; এই সকল অশ্ব এবং তাহাদের উপযুক্ত আরোহিগণ পঞ্চনদের গৌরব স্বরূপ।

জমাদার খুসহাল সিংহ।

রণজিৎসিংহের হিন্দু সহযোগিগণের মধ্যে জমাদার খুসহাল সিংহের নাম সর্ব্ব প্রথমে উল্লেখযোগ্য। তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন; মীরটে তাঁহার পিতার সামান্য দোকান ছিল; তাঁহার পিতার ইচ্ছা ছিল, তিনি পুত্রকে পৈতৃক ব্যবসায়ে সুপণ্ডিত করিয়া তুলিবেন; কিন্তু বালক খুসহাল সিংহের প্রকৃতি দোকানদারের ন্যায় ছিল না এবং এই কার্য্যে জীবন-যাপন তিনি গৌরবজনক বলিয়া বিবেচনা করিতেন না। শিশুকাল হইতেই তিনি নিরুদ্যম ভাবে শান্ত জীবন বহনের ঘোর বিদ্বেষী ছিলেন; সপ্তদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে তিনি পিতার শান্তিময় গৃহ পরি-ত্যাগ পূর্ব্বক সৌভাগ্য-সঞ্চয়ের জন্য লাহোরে উপস্থিত হন এবং 'ধস্কল সিংহওয়ালা' নামক নব সংগঠিত সেনাদলে মাসিক পাঁচ টাকা বেতনে পদাতিকের কর্ম্ম গ্রহণ করেন। ক্রমে মহারাজের অন্তঃপুর-রক্ষকগণের সহিত তাঁহার বন্ধুতা স্থাপিত হয় এবং তাহাদের সহায়তায় মহারাজের অন্যতম দেহ-রক্ষকের পদ লাভ করেন; এই সময়েই তাঁহার সৌভাগ্যের সূত্র-পাত হয়। তাঁহার সমুন্নত দেহ, সৌম্য মূর্ত্তি, কর্ত্তব্য কার্য্যে প্রবল অনুরাগ ও সতর্কতা রণজিৎসিংহের প্রসন্ন দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। কথিত আছে, একদিন রাত্রে রণজিৎসিংহ ছদ্মবেশে রাজপুরীর বহির্দ্দেশে গমন করেন, প্রাসাদে পুনঃপ্রবেশকালে খুসহাল সিংহ সিংহদ্বারে প্রহরী ছিলেন, তিনি ছদ্মবেশী মহারাজকে পুরপ্রবেশে বাধা দিয়া প্রভাত পর্য্যন্ত তাঁহাকে সেখানে অপেক্ষা করিতে বাধ্য করেন। এই প্রকার কর্ত্তব্যানুরাগের জন্য প্রীত হইয়া রণজিৎসিংহ তাঁহাকে স্বকীয় দেহরক্ষকের পদ প্রদান করেন। ইহার পর ক্রমে তাঁহার পদোন্নতি হয়; অবশেষে ১৮১১ খৃষ্টাব্দে তিনি 'জমাদার' এই পদবী লাভ করেন এবং দেউড়ীওয়ালার পদে নিযুক্ত হন। এই পদ বিশেষ গৌরবময় এবং দায়িত্বপূর্ণ ছিল। কারণ রাজপরিবারস্থ সর্ব্ব প্রকার ক্রিয়া-কাণ্ড ও উৎসবের ভার 'দেউড়িওয়ালা'র হস্তেই ন্যস্ত ছিল, এতদ্ভিন্ন তাঁহাকে দরবারের সমস্ত কার্য্য পরিদর্শন করিতে হইত। প্রাত্যহিক প্রকাশ্য দরবারে সভাসদ্‌বর্গ এবং সর্ব্ব সাধারণের অবাধ গমনের অধিকার ছিল বটে, কিন্তু অসময়ে বা গুপ্তভাবে মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইলে, যিনি যেরূপ সম্ভ্রান্ত এবং উচ্চপদস্থ ব্যক্তিই হউন, জমাদার খুসহাল সিংহের সম্মতি ব্যতীত কাহারও রাজসন্নিধানে সমুপস্থিত হইবার সম্ভাবনা ছিল না।

লাহোরে উপস্থিত হইবার পাঁচ বৎসর পরে তিনি শিখধর্ম্মে দীক্ষিত হন এবং ক্ষমতা-লাভের সঙ্গে সঙ্গে অল্প দিনেই অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়া উঠেন। বাল্যকাল হইতে তিনি কখন নীতি-শিক্ষা প্রাপ্ত হন নাই, অথচ উৎকোচ-গ্রহণের বিশেষ সুবিধা ছিল, হস্তে প্রচুর ক্ষমতারও অভাব ছিল না, সুতরাং তিনি যে অল্পদিনেই ধনবান্ হইয়া উঠিবেন, তাহার আর কথা কি? পরিণত-বয়সে তিনি বহুদিন সৈন্যবিভাগে কার্য্য করেন এবং অবশেষে ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে যুবরাজ সের সিংহের অধীনে কাশ্মীরের শাসনকর্ত্তারূপে নিযুক্ত হন; তাঁহার কঠোর শাসনে প্রজাবর্গ অত্যন্ত উৎপীড়িত হইয়াছিল। সৈন্য-বিভাগে কিংবা রাজ্য-শাসনকার্য্যে তাঁহার বিশেষ নৈপুণ্যের কোন পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। তিনি বাল্য-জীবনে অতি সুপুরুষ বলিয়া খ্যাত ছিলেন, কিন্তু তাঁহার শেষ জীবনে তাঁহার যে চিত্র রচিত হয়, তাহা দেখিলে তাঁহার সেই বাল্য-খ্যাতিতে সকলের বিশেষ সন্দেহ উপস্থিত হয়। রণজিৎসিংহের চক্ষে তিনি অনিন্দ্য-সুন্দর পুরুষ ছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু বলা বাহুল্য, তাঁহার চক্ষু নির্দ্দোষ ছিল না।

তেজ সিংহ।

তেজ সিংহ খুসহাল সিংহের ভ্রাতুষ্পুত্র; তিনিও তাঁহার ভাগ্যবান্ পিতৃব্যের পন্থা অবলম্বন করেন এবং সৌভাগ্যক্রমে সফল-মনোরথ হন। মহারাজ রণজিৎসিংহের অনুগ্রহে অবশেষে তিনি রাজোপাধি লাভ করেন। ইংরেজদিগের বিরুদ্ধে শিখবাহিনীর প্রথম অভিযানে তিনি প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু তিনি ভীরুতা ও বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগে অভিযুক্ত হন। কেহ কেহ বলেন, এই সময়ে শিখদিগের দুর্দ্দমনীয়তা এবং অসংযতভাব যে পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছিল, তাহাতে তেজ সিংহকে কিছুমাত্র অপরাধী করা যায় না। তবে তাঁহার দুর্ব্বলতা স্বীকার করিতে হয়।

হরি সিং নালওয়া।

যে সকল যুদ্ধকুশল সাহসী সর্দ্দারের প্রতি রণজিৎসিংহ বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে হরি সিং নালওয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। মহারাজ রণজিৎসিংহের ন্যায় তাঁহারও জন্মস্থান গুর্জ্জনওয়ালায়। হরি সিং শুধু যে সাহসী যোদ্ধা ছিলেন, এরূপ নহে; তিনি মহারাজের সেনাপতিবর্গের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিচক্ষণ ছিলেন এবং সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিপদ্-সঙ্কুল স্থানে দুর্জ্জয় শত্রুর বিরুদ্ধেই প্রেরিত হইতেন। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে মুলতান-বিজয়ে তিনিই প্রধান সহায় ছিলেন এবং পরবর্ত্তী বৎসরে কাশ্মীর আক্রমণের জন্য যে সমস্ত সৈন্যদল প্রেরিত হয়, তিনি তাহার একাংশের অধিনায়ক ছিলেন। কাশ্মীর-জয়ের পর হরি সিং কাশ্মীরের শাসনকর্ত্তারূপে নিযুক্ত হন। কিন্তু সৈন্যপরিচালনের ন্যায় রাজ্যশাসনে তাঁহার ক্ষমতা ছিল না; সুতরাং অতি অল্পকালের মধ্যেই তিনি সাধারণের অপ্রিয় হইয়া উঠেন এবং সেইজন্য রণজিৎসিংহ তাঁহাকে পঞ্জাবে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে অনুমতি করেন। পঞ্জাবে প্রত্যাগমন করার পর তিনি পঞ্জাবের সীমান্ত প্রদেশে হাজরার শাসনকর্ত্তৃপদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। অনন্তর তিনি পেশোয়ারের শাসন কর্ত্তার পদ লাভ করেন। কিন্তু ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে একটী যুদ্ধ উপলক্ষে আফগানগণ কর্ত্তৃক নিহত হন।

আতর সিং সিন্ধন ওয়ালিয়া।

আতর সিং সিন্ধন ওয়ালিয়া হরি সিং নালওয়ার প্রায় সমকক্ষ যোদ্ধা ছিলেন। কি বলে কি সাহসে তিনি পঞ্চনদ প্রদেশে খালসা

সৈন্যের আদর্শ বলিয়া বিবেচিত হইতেন। তিনি অতি সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং মহারাজ রণজিৎসিংহের সহিত জ্ঞাতিত্বসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। সিন্ধন ওয়ালিয়াগণ বংশপরম্পরায় অত্যন্ত তেজস্বী। মহারাজ রণজিৎসিংহের মৃত্যুর পূর্ব্ব হইতে পর পর্য্যন্ত যে ঘোর অশান্তি, রাষ্ট্রবিপ্লব ও অরাজকতা ক্রমে ক্রমে ভীষণভাবে সমগ্রদেশে বিস্তৃত হইয়া পড়ে, তিনজন বীরপুরুষ সেই বিষম বিভ্রাটের মধ্যে স্ব স্ব প্রাধান্য রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন এবং অবশেষে তাঁহাদের হস্তেই দেশের শুভাশুভ নির্ভর করিতেছিল। সেই তিনজন—আতর সিংহ, তাঁহার ভ্রাতা লেনা সিংহ এবং তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র অজিত সিংহ। দুঃখের বিষয় এই, তিনজন বীরের প্রাণের বিনিময়ে এবং পঞ্জাবের স্বাধীনতা দ্বারা পঞ্চনদ প্রদেশের শান্তি ক্রীত হইয়াছিল।

রাজা গোলাপ সিংহ, রাজা ধ্যান সিংহ ও রাজা সুচেত সিংহ।

রাজা গোপাল সিংহ, ধ্যান সিংহ এবং সুচেত সিংহ তিনজনই কোন এক নগণ্য রাজপুত বংশে জন্মগ্রহণ করেন; কিন্তু শুদ্ধমাত্র অসীম অধ্যবসায় ও কার্য্যদক্ষতাগুণে রাজ্য মধ্যে প্রবল প্রতাপান্বিত হইয়া উঠেন। মহারাজ রণজিৎসিংহের রাজত্বকালে ইহাঁদের মধ্যম ভ্রাতা ধ্যান সিংহই অধিক ক্ষমতাপন্ন হইয়াছিলেন। জমাদার খুসহাল সিংহের পর রাজা ধ্যান সিংহ "দেউড়িওয়ালা" পদে নিযুক্ত হন এবং কয়েক বৎসর একাদিক্রমে তিনিই মহারাজ রণজিৎসিংহের প্রধান মন্ত্রীর কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। এই সময় ইনিই মহারাজ ও প্রজাবর্গের মধ্যে মধ্যস্থ বলিয়া বিবেচিত হইতেন এবং রাজস্ব ও পররাষ্ট্র-বিভাগ ব্যতীত রাজ্যের সমস্ত কার্য্যই ইহাঁর আয়ত্তাধীন ছিল। উক্ত উভয় বিভাগের ভার যথাক্রমে রাজা দীননাথ এবং ফকির আজিজ-উদ্দীনের হস্তে ন্যস্ত ছিল।

ধ্যান সিংহের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গোলাপ সিংহ সৈন্য-পরিচালনা-কার্য্যেই অনেকদিন নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু মহারাজের পরলোক-গমনের পর এবং ধ্যান সিংহ নিহত হইলে লাহোরে তাঁহার প্রাধান্য সম্যক্ প্রকারে স্থাপিত হয়। কিন্তু তিনি স্বদেশ অপেক্ষা আপনাকেই অধিক করিয়া জানিতেন এবং স্বদেশের স্বার্থ অপেক্ষা আপনার স্বার্থ ভাল বুঝিতেন। সুতরাং প্রথম শিখযুদ্ধের পর তাঁহার অকৃত্রিম বন্ধুতা ও তৎকৃত উপকার স্মরণ করিয়া তদানীন্তন রাজ-প্রতিনিধি কাশ্মীররাজ্য তাঁহাকে কৃতজ্ঞতার সহিত উপহার প্রদান করেন। রাজা ধ্যান সিংহ ও গোলাপ সিংহ অপেক্ষা অধিক নিষ্ঠুর-প্রকৃতি-সম্পন্ন ব্যক্তির কথা পঞ্জাবের ইতিহাসে নিতান্ত দুর্লভ। তাঁহাদের চরিত্রগত কঠোরতা, বিশ্বাসঘাতকতা, হিংসা ও বিদ্বেষ তাঁহাদের দুর্জ্জয় দুরাকাঙ্ক্ষার অনুরূপ। পঞ্জাবের অত্যন্ত দুর্ভাগ্য যে, তাঁহারা নিতান্ত সামান্য অবস্থা হইতে রাজ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদলাভ করিয়াছিলেন। বোধ হয়, বিধাতার এইরূপই অভিপ্রায় ছিল।

ইহাঁদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুচেত সিংহের ন্যায় সুপুরুষ, তৎকালে শিখ সৈন্যমণ্ডলীতে দ্বিতীয় ছিল না। রাজ-দরবারেও তাঁহার বিলক্ষণ প্রতিপত্তি ছিল, কিন্তু তিনি তাঁহার অগ্রজদ্বয়ের ন্যায় ক্ষমতাপন্ন ছিলেন না। লাহোরের রাজনীতিক ক্ষেত্রে তাঁহার আসন অনেক পশ্চাতে ছিল। তাঁহার প্রতিভার ক্ষীণ-শিখা অধিক দূর আলোকিত করিতে পারে নাই এবং তাহাতে প্রায় কেহই দগ্ধ হয় নাই।

রাজা হীরা সিংহ।

রাজা হীরা সিংহ, রাজা ধ্যান সিংহের পুত্র। পরিণত-বয়স্ক না হইলেও তিনি অত্যন্ত প্রতিভাশালী ছিলেন; ধ্যানসিংহের পর তিনিই

প্রধান মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত হন, কিন্তু প্রথম শিখ-যুদ্ধে পিতার ন্যায় তিনিও নিহত হন।

রাজা দীননাথ।

আমরা ইতিপূর্ব্বে রাজা দীননাথের নাম উল্লেখ করিয়াছি। মহারাজ রণজিৎসিংহের শেষ জীবনে তাঁহার রাজচ্ছত্রচ্ছায়ায় যে সকল ব্যক্তি প্রসিদ্ধি লাভ করেন, তন্মধ্যে রাজা দীননাথ সিংহ সর্ব্বপ্রধান। তৎকালে তিনি ভারতবর্ষে এতদ্দেশীয়ের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন। যে বিপ্লব-বহ্নির প্রচণ্ড দাহনে তাঁহার প্রিয়তম সুহৃৎ এবং হিতৈষী পৃষ্ঠপোষকগণ একে একে দগ্ধ হইয়াছিলেন, তাঁহার সৌভাগ্যক্রমে সেই অগ্নি তাঁহাকে স্পর্শ করিতেও পারে নাই; অরাজকতা এবং রাজ-পরিবর্ত্তন তাঁহার কিছুমাত্র অপকার করিতে সক্ষম হয় নাই। রক্ত-স্রোত ও হত্যা-কাণ্ডের মধ্যে তিনি নিষ্কলঙ্ক-ভাবে অবস্থিত ছিলেন, তাঁহার একটী কেশমাত্রও কেহ স্পর্শ করে নাই। যখন প্রত্যেক ব্যক্তির ধন-সম্পত্তি বিধ্বস্ত ও শত্রুকবলিত হইতেছিল, তখন তাঁহার সৌভাগ্যশ্রী প্রতি মুহূর্ত্তেই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছিল। রাজা দীননাথ সিংহের ভবিষ্যৎ-দৃষ্টি ও দূর-দর্শন-ক্ষমতা এত অধিক ছিল যে, অন্যের চক্ষে রাজনীতিক গগন সম্পূর্ণ নির্ম্মল এবং মেঘমুক্ত বোধ হইলেও তিনি অদূরবর্ত্তী জলদচ্ছটার চিহ্নসন্দোহ নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ ছিলেন এবং তদনুসারে সাবধানতা অবলম্বন করিতেন। এরূপ অবস্থায় তিনি বিপন্নিমগ্ন বন্ধুকে পরিত্যাগ করিতে কিংবা যাহাদের পতন অনিবার্য্য এরূপ সম্প্রদায়ের সংস্রব হইতে দূরে থাকিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইতেন না। দেশহিতে তাঁহার মতি ছিল, কিন্তু "আত্মানং সততং রক্ষেৎ"—এই মন্ত্রের উপাসক ছিলেন। তাঁহার নিজের স্বার্থ দেশের স্বার্থ অপেক্ষা অধিক আদরণীয় ছিল। তিনি ইংরেজদিগকে ঘৃণা করিতেন। কোন ইংরেজলেখক বলেন, ইংরেজ তাঁহার দেশের শত্রু মনে করিয়াই যে, তিনি তাঁহাদিগকে ঘৃণা করিতেন, তাহা নহে; ঘৃণার কারণ, ইংরেজগণ তাঁহার অপেক্ষা প্রবল।

যতক্ষণ পর্য্যন্ত নিজের কোন প্রকার বিপৎপাতের সম্ভাবনা না থাকিত, রাজা দীননাথ ততক্ষণ পর্য্যন্ত বিপন্ন বন্ধুকে সাধ্যানুসারে সাহায্য করিতেন। তিনি যথেষ্ট বলবান্ ছিলেন; নৈতিক বলও যে তাঁহার ছিল না, এরূপ নহে; কিন্তু তিনি নিজের বিপদ অপেক্ষা সম্পত্তি ও ক্ষমতার বিপদের জন্যই অধিক চিন্তিত ছিলেন; এই জন্যই তিনি বিপন্নের পক্ষ ত্যাগ করিতেন। তিনি অসাধারণ পরিশ্রমী ছিলেন, স্থানীয় সমস্ত বিষয় নখদর্পণে দেখিতে পাইতেন। তিনি তাঁহার সমস্ত ক্ষমতা স্বহস্তে পরিচালনা করিবার জন্য সর্ব্বদা চেষ্টা করিতেন, এইজন্য অনেক সময় অনেক বিষয়ে অসুবিধা হইত এবং সেইজন্য দেশের উন্নতিও সময়ে সময়ে প্রতিহত হইয়া যাইত। সাংসারিক লোকের তিনি আদর্শ-স্বরূপ ছিলেন। তিনি সকলের সহিত সদ্ব্যবহার করিতেন এবং তাঁহার উপদেশ বিশেষ হিতকারী ছিল। তিনি সুশিক্ষিত ছিলেন। রাজদরবারে সমুপস্থিত বৈদেশিক রাজ-দূতগণের সহিত তিনি অতি তেজের সহিত স্পষ্টভাবে আলাপ করিতেন।

১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে রাজা দীননাথ রাজস্ব-সচিবের পদে নিযুক্ত হন। রাজস্ব বিষয়ে তাঁহার অসাধারণ দক্ষতা ছিল। তিনি মহারাজ রণজিৎসিংহের বিশ্বস্ত অমাত্য ছিলেন এবং তাঁহার পরামর্শ ব্যতীত রণজিৎসিংহ কোন গুরুতর কার্য্যে হস্তার্পণ করিতেন না।

রণজিৎসিংহের মৃত্যুর পরও পঞ্জাবে তাঁহার ক্ষমতা অপ্রতিহত ছিল। লাহোরে বৃটিশ অধিকার বিস্তৃত হইলে তিনি মন্ত্রী-সভার সভ্য

নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং এই পদেও তাঁহার যথেষ্ট ক্ষমতা লক্ষিত হইয়াছিল। রাজস্ব বিভাগে দীর্ঘকাল কার্য্য করাতে তাঁহার অজস্র অর্থ উপার্জ্জনের বিশেষ সুবিধা ছিল, কিন্তু তিনি অন্যান্য কর্ম্মচারিবর্গের ন্যায় অর্থগৃধ্নু ছিলেন না। লাহোরের ইংরেজ রেসিডেণ্টও তাঁহা দ্বারা যথেষ্ট উপকৃত হইয়াছিলেন। রাজা দীননাথ সিংহ ব্যতীত লাহোর রাজ-দরবারে এমন এক ব্যক্তিও ছিলেন না, যিনি দরবার সম্বন্ধীয় জটিল হিসাব পরিষ্কার করিতে পারিতেন। লাহোর জয়ের পর রাজস্ব ও জায়গীর সংক্রান্ত অনেক বিষয়ে ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট রাজা দীননাথের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে শিখবিপ্লবের সময় অনেক রাজা দীননাথকে বিদ্রোহী বলিয়া অভিযুক্ত করেন। কেহ কেহ এরূপও বলিয়াছিলেন যে, যদি রাজা দীননাথ সুবৃহৎ অট্টালিকা এবং অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি না হইতেন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই বিদ্রোহীদলের সহিত সম্মিলিত হইতেন। যাহা হউক, এই অপবাদ শত্রুগণের রটিত ও সম্পূর্ণ অমূলক।

ভাই রামসিংহ, ভাই গোবিন্দরাম ও ভাই গুরুমুখ সিংহ।

ভাই রাম সিং ও গোবিন্দ সিংহ লাহোরস্থ-জনৈক সুবিখ্যাত শিখ সাধুর পৌত্র; অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে তিনি সমগ্র শিখজাতির শ্রদ্ধা ও ভক্তি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। রণজিৎসিংহ তাঁহাকে এরূপ সম্মান করিতেন যে, তাঁহার পৌত্রদ্বয়ের যথেষ্ট বৃত্তি-নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক লাহোর দরবারে তাঁহাদিগকে স্থানদান করিয়াছিলেন। সাধু জীবন যাপন করিলেও রাজ্য মধ্যে রাম সিংহের বিশেষ প্রভাব ছিল এবং যুদ্ধ উপলক্ষে কোথাও বস্ত্রাবাস স্থাপিত হইলে, মহারাজের বাস-গৃহের অব্যবহিত পরেই রাম সিংহের গৃহ নির্দ্দিষ্ট হইত। মহারাজ তাঁহাদের প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করিতেন। ভাই গুরুমুখ সিংহ শান্ত সিংহের পুত্র; শান্ত সিংহ অমৃতসরের দরবার-সাহেব নামক মন্দিরের অধ্যক্ষ ছিলেন। বিখ্যাত শিখগুরুগণের ন্যায় তিনি অস্ত্রশস্ত্রে ভূষিত থাকিতেন এবং স্বদেশের ও স্বধর্ম্মের জন্য প্রশান্তচিত্তে যুদ্ধ-ক্ষেত্রে অবতরণ করিতেন; কিন্তু যুদ্ধ-কোলাহল নিবৃত্ত হইলেই তিনি পুনর্ব্বার ধর্ম্ম জীবনের মধুর প্রশান্তির মধ্যে নিমগ্ন হইতেন। শান্ত সিংহ তাঁহার পুত্রকে লাহোর-দরবারে প্রেরণ করিয়াছিলেন। গুরুমুখ সিংহও রণজিৎসিংহের যথেষ্ট প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ভাই রাম সিংহকে কোনক্রমে অতিক্রম করিতে পারেন নাই।

সর্দ্দার লেনাসিংহ।

সর্দ্দার লেনাসিংহ সরদার দেশাসিংহের পুত্র। পিতা পুত্র উভয়েই রাজ্য মধ্যে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। লেনাসিংহ সাধারণতঃ "হাসমদ্দৌলা" অর্থাৎ "রাজ্যের অসি স্বরূপ" এই নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি যে, একজন প্রসিদ্ধ বীর পুরুষ ছিলেন, তাহা নহে; সুদক্ষ শিল্পী বলিয়াও তাঁহার গৌরব ছিল। তিনি অনেক সুন্দর সুন্দর কামান প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তাঁহার কৌশল-নির্ম্মিত একটী ঘটিকাযন্ত্রে, ঘণ্টা, দিন, মাস এবং অমাবস্যা ও পূর্ণিমা নিরূপিত হইত। তিনি গণিত শাস্ত্র ও জ্যোতির্ব্বিদ্যার অতিশয় পক্ষপাতী ছিলেন এবং কয়েকটী বিভিন্ন ভাষায় তাঁহার ব্যুৎপত্তি ছিল। শাসনকার্য্যে তিনি সর্ব্বসাধারণের অনুরাগলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন।

লেনাসিংহ কোন দীন দরিদ্রের প্রতি অত্যাচার করেন নাই। তাঁহার শাসনে সকলেই শান্তি উপভোগ করিয়াছিল, তিনি ন্যায়-

বিচারক ছিলেন। তাঁহার ন্যায় উচ্চমনা, ন্যায়বান্ ও রাজনীতিজ্ঞ লাহোর-দরবারে আর একজনও ছিল না; শঠতা, ষড়যন্ত্র এবং বিবিধ প্রকার দুষ্কার্য্যের মধ্যে তিনি সম্পূর্ণ নিষ্কলঙ্ক-ভাবে অবস্থান করিতেন। লোলুপ পরস্বাপহারী অমাত্যবর্গের পাপ-মন্ত্রণা সর্দ্দার লেনাসিংহকে স্পর্শ করিতেও সমর্থ হইত না।

১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে বিশাল শিখ-বাহিনী, লেনাসিংহের ন্যায় কর্ত্তব্যনিষ্ঠ সক্ষম রাজ-পুরুষের শাসনাধীন থাকিলে এবং তিনি অরাজক পঞ্জাব রাজ্যের কর্ণধার হইলে, বোধ হয়, সেই সুবৃহৎ, ধন-ধান্য-গৌরব-পরিপূর্ণ রাজতরণী রণজিৎসিংহের মৃত্যুর অতি অল্পকাল পরেই বিপ্লব-সাগরে নিমজ্জিত হইত না। কিন্তু ভবিতব্যতা কে খণ্ডন করিবে? স্বদেশের বিপদে লেনাসিংহ বিচলিত হন নাই, তিনি শান্তিপ্রিয় ছিলেন, রাজ্যের সংস্রব ত্যাগ করিলে সর্দ্দার ছত্রসিংহ ও সেরসিংহ পঞ্জাবের সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব লাভ করেন। কিন্তু তাঁহারা নিজ নিজ ক্ষমতা বুঝিতেন না, উদ্দাম শিখ সৈন্যগণকে প্রশমিত করা দূরের কথা, তাঁহারা সেই ধূমায়মান বহ্নি প্রজ্বলিত করিলেন। দেখিতে দেখিতে সুন্দর শিখরাজ্য তাহার অনন্ত ঐশ্বর্য্য ও বিপুল বাহুবলের সহিত দগ্ধ হইয়া গেল। পঞ্জাবকেশরী এক-চক্ষু মহারাজের নাম শুধু স্মৃতিচিহ্ন হইয়া ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অঙ্কিত রহিল।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।



প্রেম।

(১)

কেন তারে ভালবাসি বলিব কেমনে!
কেন সে চাতক ছুটে
সুদূর শূন্যেতে উঠে,
'জলদে—জলদে' করে জলন্ত গগনে?
কোথা মেঘ, কোথা বারি
বিন্দুমাত্র নাহি হেরি,
তৃষ্ণায় আকুল প্রাণ,
তবু ত করে না পান—
তবু ত সে অন্য বারি না হেরে নয়নে!
কেন তারে ভালবাসি বলিব কেমনে!

(২)

কেন সে অনল-পাশে
পুলকে পতঙ্গ আসে?
ফিরালে নাহিক ফিরে
চারি দিকে ঘুরে ঘুরে
ঝাঁপ দিয়া পড়ে শেষে জলন্ত আগুনে।
কেন তারে ভালবাসি বলিব কেমনে!

(৩)

শুনিয়া ব্যাধের বাঁশী
কেন রে আনন্দে ভাসি
কেন বন-মৃগ আসি গহন কাননে—
পলালে পলাতে পারে
তবু ত পলাতে নারে—
দাঁড়াইয়া ত্যজে প্রাণ নিষাদের বাণে?
কেন তারে ভালবাসি বলিব কেমনে!

(৪)

কেন পান্থ মরুমাঝে
হেরিয়া মোহন সাজে,
সুশীতল সরোবর শ্যাম উপবনে
ধায় বেগে বারি আশে—
নহে দূর এই যে সে!—
যত যায় নাহি পায়
তৃষ্ণায় পরাণ যায়—
চৌদিকে বালুকা-সিন্ধু ঝলসে কিরণে!
সে যে মরু মায়া-ছবি,
তারে কি প্রাণান্তে পারি?
তবু মন নাহি মানে
ধায় সেই বারি পানে,—
অবশেষে প্রাণে মরে পড়িয়া বিজনে!
কেন তারে ভাল বাসি বলিব কেমনে!

(৫)

সে যে চাতকের বারি—
হুতাশন পতঙ্গেরি
বন-মৃগ-বেণু-স্বর
পান্থ-মরু-সরোবর,
সে যে কি—কি গুণ তার কিছু ত জানিনে!—
কেন তারে ভালবাসি বলিব কেমনে!

শ্রীগোপালকৃষ্ণ ঘোষ।

পুরাণ-কথা।

সূচনা।

আজ অনেক দিনের কথা,—আমি একবার কার্য্যোপলক্ষে ফরক্কাবাদে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। ফরক্কাবাদে বাঙ্গালীর সংখ্যা বড় কম, সেইজন্য সেখানে কোন নূতন বাঙ্গালী যাইলে, তাহার বড় আদর। ফরক্কাবাদের প্রবাসী বাঙ্গালীরা আমাকেও যথেষ্ট আদর করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে হরিবাবু নামে একটী বাঙ্গালীর সহিত আমার কিছু বিশেষ সৌহার্দ্দ হয়। হরিবাবু একজন উচ্চপদস্থ রাজ-কর্ম্মচারী, কিন্তু তাঁহার অমায়িক সরলভাব যে দেখিত, সে-ই ভুলিত। হরিবাবুর অকৃত্রিম যত্ন ও অকপট ব্যবহারে আমিও তাঁহার একান্ত পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছিলাম। হরিবাবুর বাড়ী যাওয়া আমার একটা নিত্যকর্ম্মের মধ্যে হইয়া পড়িয়াছিল। ক্রমে হরিবাবু আমার অনেক কথা জানিলেন, আমিও তাঁহার অনেক কথা জানিলাম; কিন্তু সে সব কথা জানিয়াও আমাদের মধ্যে পরস্পরের প্রণয় কখনও হ্রাস হইবার কারণ দেখি নাই। যাহা হউক, বাবু কিন্তু তাঁহার পরিবারের কথা জিজ্ঞাসা করিলে বড়ই সংগোপন করিতেন। আমি অনেক চেষ্টা করিয়াও ইহার কোন সন্তোষ-জনক উত্তর বাহির করিতে পারি নাই। ক্রমে আমার কার্য্য-সমাধা হইলে, ফরক্কাবাদ পরিত্যাগের সময় হইল। সেই সময় আর একবার হরিবাবুকে তাঁহার পরিবার সম্বন্ধে কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। উত্তরে হরিবাবু বলিয়াছিলেন,—"সময় হইলে বলিব।" সে সময় কত-দিনে হইবে, জানিতে পারি নাই। ফরক্কাবাদ পরিত্যাগের পর হরিবাবুর সঙ্গে দু'একখানা চিঠিপত্র চলিয়াছিল; কিন্তু যেরূপ ভাবে লেখা-লেখি হইত, তাহাতে আমি (বোধ হয় হরি-বাবুও) বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে, আমরা পরস্পরকে ভুলিতে আরম্ভ করিয়াছি। ক্রমে চিঠি-লেখা একবারে বন্ধ হইল। তার পর হঠাৎ একদিন হরিবাবুর জীবনের নিম্নলিখিত ইতিহাসটী পাইলাম। সাধারণের নিকট প্রকাশ করিতে হরিবাবুর কোন মানা ছিল না; প্রত্যুত হরিবাবুর তাহাতে উপকার হইতে পারে, এই ভাবিয়া হরিবাবুর জীবনের ইতিহাস সাধারণ্যে প্রকাশ করিলাম।

(১)

সে আজ অনেক দিনের পুরাণ-কথা; কিন্তু অনেক দিনের কথা হইলে—পুরাণ হইলেও সে কথা আমার কাছে আজও নূতন, কালও নূতন,—চিরকালই নূতন। সে কথা মনে পড়িলে

যেন বর্ত্তমান অতিক্রম করিয়া, সুদূর অতীতে আসিয়া উপস্থিত হই। সেখানে সময়ের দৃঢ় নিষ্পেষণে স্মৃতির উজ্জ্বল রেখা মলিন করিতে পারে নাই,—বর্ত্তমানের তীব্র জ্যোতিঃ সেখানে ছায়াময় করিতে পারে নাই,—ঘটনাবলীর বৈচিত্র্য জীবনের সে প্রদেশকে বিপর্য্যস্ত করিতে পারে নাই। আজি সেই দিনের কথা তোমায় বলিতে বসিয়াছি। তুমি অনেকবার উৎসুক-ভাবে জানিতে চাহিয়াছিলে, তাই আজ বলিবার আকাঙ্ক্ষা;—ইচ্ছা হয় পড়িও।

তখন ভাবিতাম, এমনই দিনই কাটিবে। পিতামাতার স্নেহের কোলে মুখ লুকাইয়া, পৃথিবীর দুঃখ-শোক-তাপকে অবজ্ঞা করিতাম। অদৃষ্টের ভ্রুকুটি তখনও দেখিতে পাই নাই, ভবিষ্যতের গাঢ় অন্ধকারের ছায়া তখনও স্পর্শ করে নাই। লেখা পড়াই ছিল—জীবনের কাজ; বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশংসাপত্রই ছিল—জীবনের উচ্চ-লক্ষ্য! এই লইয়াই সময় কাটিত, এই লইয়াই জীবন কাটাইতাম।

তখন বুঝিতে পারি নাই যে, জীবনের সমীকরণেও অজ্ঞাত-রাশি আছে; সে অজ্ঞাত-রাশি না মিলিলে জীবনের ষোল আনা পূরে না। সে অজ্ঞাতরাশি অজ্ঞাত বলিয়াই অদৃষ্ট। তাহাকে জানিতে পারি নাই বলিয়াই দেখিয়াও চিনিতে পারি নাই। যখন জানিতে পারিয়াছিলাম, তখন দেখিতে পাই নাই। তখন আকাশ-পাতাল তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিলাম,—কৈ, তাহাকে আর পাইলাম না, অদৃষ্ট আর ফিরিল না!

তখন আমি বড় ছেলে-মানুষ। তখন আমরা দুজনে ছেলে-খেলা করিতে বড় ভালবাসিতাম। আমাদের দুজনে গলায়-গলায় ভাব; কত আগড়ম-বাগড়ম বকিতাম, আমাদের গল্প ফুরাইত না, আমাদের কথার শেষ ছিল না। দুজনে কত খেলাঘরের ঘর ভাঙ্গিতাম, কত গড়িতাম;—তোমাদের বালাখানা নির্ম্মাণেও তোমরা সে সুখ পাও না। কত ছুটাছুটি, দৌড়াদৌড়ি করিতাম, কত লুকোচুরি খেলিতাম। সে সব অনেক কথা। সে বড়-মানুষের মেয়ে আর আমি বড় গরিবের ছেলে, আমাদের দুজনে এত ভাব! ছি! ছি! লোকের চোখে সহিত না। তাই শৈলের বাপ-মা, জ্যেঠা-খুড়া, মাসী-পিসী, আত্মীয়-কুটুম্ব শৈলকে আমার সঙ্গে বেড়াইতে মানা করিতেন। সমাজে মর্য্যাদা সম্বন্ধে আমার পিতার সঙ্গে শৈলবালার পিতার আকাশ-পাতাল প্রভেদ, সেইজন্য যেন আমার পিতামাতাও শৈলকে আমায় খেলিতে ডাকিতে আসিতে দেখিলে কিছু সঙ্কুচিত হইতেন। সেইজন্য দু-একদিন আমিও মুখ-খাইয়া শৈলের সঙ্গে বেড়াইতে যাই নাই। কিন্তু সে যখন-কার, তখনি; সে মুখ-খাওয়া মনে থাকিত না। শৈশব, সমাজের নিয়ম বোঝে না; দারিদ্র্যকে অপরাধ বলিয়া মনে করে না; তাই সন্দেশ খাইয়াও শৈলবালা বুঝিতে পারিত না,—আমাতে তাহাতে পার্থক্য আছে; তাই মুড়ি খাইতেও না পাইয়া বুঝিতে পারিতাম না যে, ধনি-কন্যা শৈলবালার উপর অভিমান বা রাগ করা আমার শোভা পায় না। হায় সমাজ!—একবার যদি অন্ধ শৈশবের অভিমানের দিকে চাহিয়া দেখিতে!

তা হউক, আমাদের বাড়ী আসা-যাওয়া শৈলের কমিল না। কার্পেট ছাড়িয়া, শৈল আমাদের বাড়ী ভিজা-মাটীতে বসিতে ভালবাসিত। পাঁচ-তরকারি-ভাত ছাড়িয়া আমাদের নুন-ভাত তাহার ভাল লাগিত। আর আমার আহারের সময়—ছি ছি!—সে আমার সঙ্গে এক পাতে বসিয়া খাইত। একদিন শৈলদের বাড়ীর প্রসাদ-প্রার্থী খোসামুদে এক বামুন শৈলকে বলিয়াছিল যে, তাহার প্রবৃত্তি বড় নীচ, সে ছোট-লোকের (গরিবের!) ছেলের সঙ্গে বেড়ায়। তাহাতে সেই ছোট মেয়েটী—শৈল উত্তর দিয়াছিল,—"তবুও শৈল বড়লোকের আঁস্তাকুড় ঝাঁট দেয় না।"

---

(২)

আমি শৈলকে লইয়া বড় ব্যতিব্যস্তে পড়িলাম। এখন আমি ইস্কুলে ভর্ত্তি হইয়াছি। মাসে মাসে বাবাকে মাহিনা গণিতে হয়, আর সেই সঙ্গে বাবা যত্ন করিয়া পড়িতে বলেন, মিথ্যা কথা বলিব না,—বাবার মাহিনা দিবার সময়, কাতরতা দেখিয়া আমার একটু একটু পড়িতে ইচ্ছা করে। তা পড়িব কি, শৈলের জ্বালায় আমার আর পড়া হয় না। আমি একদিন একটী নূতন গল্প পড়িয়া সেই গল্প শৈলকে শুনাইয়াছিলাম, সেই অবধি শৈল আমার নিকট রোজ গল্প শুনিতে চায়, আমি রোজ গল্প কোথায় পাইব? কিন্তু গল্প না বলিতে পারিলে, আমার বই বন্ধ করিয়া দেয়, আমার পেন্সিল কাড়িয়া লয়, আমার খাতা লুকাইয়া রাখে, আমার চোখ টিপিয়া ধরে; তা এমন করিয়া কি লেখা-পড়া হয়? যতক্ষণ শৈল সাম্নে থাকে, ততক্ষণ ত সে পড়িতে দেয় না। আর তাহার অসাক্ষাতে?—কথাটা তোমার কাছে লুকাইব না, শৈলের ছায়া আমার উপর আরও অত্যাচার করে। জ্যামিতির চিত্র আঁকিতে গিয়া শৈলের মুখ আঁকিয়া ফেলি; 'বারি বিজ্ঞানের' চাপ কেন্দ্রের ভিতর দিয়া শৈলের মুখ দেখা দেয়। বাহিরে চোখের সাম্নে শৈল, আর মনের ভিতরেও সেই শৈল। এত শৈলের মধ্য দিয়া কি লেখা-পড়া হয়? সুতরাং বাবার উত্তেজনা সত্ত্বেও, আমার আন্তরিক ইচ্ছা সত্ত্বেও আমার লেখা-পড়াটা "হ-য-ব-র-ল" হইয়া গেল। বাবা বলিলেন,—"ছেলেটা আজন্ম গণ্ডমূর্খ হইয়া থাকিবে।" মা বলিলেন,—"তা হউক, মূর্খ হয় হউক, ছেলে আমার বেঁচে থাক। এখন উপযুক্ত হইতে চলিল, বিবাহ দিয়ে বৌ ঘরে আনিতে পারিলে হয়।" ফল হইল—আমার লেখা-পড়ার "ইতি"।

তা লেখা-পড়ার সঙ্গে সম্বন্ধ ঘুচিলেও শৈলের সঙ্গে আমার ভাবটা বাড়িয়া চলিতেছিল। একসঙ্গে বেড়ান, একসঙ্গে গল্প করা, একসঙ্গে মালা গাঁথা, কত ঝগড়া করা, কত বকাবকি করা, কত অভিমান করা, কত লুকোচুরি খেলা, কত তাস খেলা,—কিছুই ত কমিল না। এদিকে দরিদ্র বলিয়া অল্প বয়সেই আমার বুদ্ধির বিকাশ হইয়াছিল, তাই শৈলে ও আমায় সামাজিক পার্থক্য অনুভব করিতে পারিয়া কখন কখন সঙ্কুচিত হইতাম। তাই কখন কখন ইচ্ছা করিয়া শৈলের সঙ্গে বেড়াইতে যাইতাম না। কিন্তু তা হইলেও শৈল যে আমায় ছাড়িত না। "এসো-না, বেড়াতে যাই" বলিয়া হাত ধরিয়া টানিলে আমার আর প্রতিরোধ করিতে শক্তি থাকিত না। তার পর সেই ছোট বালিকা শৈলের হাতের গাঁথা-মালা পরার সুখ,—সে সুখ তুমি কি বুঝিবে, আর আমি কি বুঝাইব? তখন মনে করিতাম,—"হায়! আমি যদি ধনি-সন্তান হইতাম, তবে বুঝি প্রতিদিন এমনই করিয়া শৈলের হাতের মালা পরিতাম!" ছাই ধন! তখন দরিদ্র হইয়াও যে হাতের মালা পরিয়া জীবন সার্থক করিয়াছিলাম, আজ লক্ষপতি হইয়াও সে মালা-পরার সাধ মিটিল না।

আমি, আমার ও শৈলের অবস্থাগত পার্থক্য বুঝিতে পারিয়াছিলাম বটে, কিন্তু শৈল যে তাহা অনুভব করিতে পারিয়াছে, সে কথা ঘুণাক্ষরেও বুঝিতে পারি নাই। তাহা হইলে কি শৈল তেমনি চঞ্চল, তেমনি বালিকা আর আমার কাছে তেমনি সুন্দরী থাকিত? কেহ বকিলে কি তেমনি করিয়া ছুটিয়া আমার কাছে

নালিশ করিতে আসিত, তেমনি করিয়া কাণে-কাণে কথা বলিত, তেমনি করিয়া হাত ধরিয়া টানাটানি করিত, তেমনি করিয়া আমার খাবার কাড়িয়া খাইত? তাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, শৈল আমাদের দারিদ্র্য বুঝিতে পারে নাই। আমি একদিন বুঝাইতে গিয়াছিলাম, শৈল আমার কথা কাণে করে নাই।

এইবার দেখিতেছি, তুমি আমার শৈলকে দেখিতে বড় পীড়াপীড়ি করিবে। কিন্তু কি দেখাইব?—শৈল যে চাক্ষুস দেখিবার, বুঝাইবার নয়। কবির কল্পনা, চিত্রকরের তুলিকা শৈলের বর্ণনা করিতে অক্ষম। তোমায় না হয় চিত্রকরের চিত্রে স্থির সৌদামিনী দেখাইলাম, কিন্তু সে বালিকা-স্বভাব, সে চঞ্চলতা, সে আলো-ছায়ার, সে হাসি-কান্নার সংমিশ্রণ কোথায়? যদি তাই না দেখাইতে, না বুঝাইতে পারিলাম, তবে শৈলকে কি বুঝিবে? আর যদি "তন্বী-শ্যামা-শিখরি-দশনা" বলিয়া শৈলকে তোমার কাছে হাজির করি, তাহা হইলেও শৈলকে দেখাইতে পারিলাম না। শৈল এখনও ততদূর যায় নাই। তবে যদি কখন কোন অনিন্দ্য-সুন্দরী বালিকাকে দেখিয়া "সৃষ্টি-রাদ্যেব ধাতুঃ" বলিয়া মনে হইয়া থাকে, তবে শৈলকে কতক বুঝিতে পারিবে।

(৩)

তুমি ভাবিতেছ, এইবার বুঝি শৈলের বিবাহের পালা;—বড়-মানুষের মেয়ে, হঠাৎ সম্বন্ধ ঠিক হইয়া গেল; শৈল বিবাহে কোন আপত্তি করিল না, সে বিবাহ করিয়া স্বামি-সোহাগিনী হইয়া সুখী হইল, আর আমি তাহাকে সুখী দেখিয়া সংসার পরিত্যাগ করিয়া, বিদেশে চাকরী করিতে পলাইলাম!—বিধাতার কিন্তু ভবিতব্য অন্যরূপ। শৈলের বিবাহের সম্বন্ধ না হইয়া, বিবাহের সম্বন্ধ হইল আমার। আর আপত্তি করিলাম না আমি। শৈলকে যে আমার বিবাহ করিতে সাধ যাইত না, তাহা নহে। তবে জানিতাম, শৈলকে বিবাহ করিবার আশা আমার দুরাশা। আরও জানিতাম, আমারও বিবাহ হইতেছে—পিতামাতার নির্ব্বন্ধে ও ধন-লোভে। তাই আমার আপত্তি টিকিল না। তবে তিন দিন উপবাস করিয়া, ঘরে দরজা দিয়া থাকিয়া, বাড়া ছাড়িয়া যাইবার ভয় দেখাইয়া, একটা বিকট আপত্তি করি নাই। আর সে আপত্তি করিলে যে কি হইত, বলিতে পারি না। তবে তেমন আপত্তি কেন করি নাই জান?—বিধাতার ভবিতব্য বলিয়া। তুমি না হয় আমায় অরসিক, অপ্রণয়ী, অপ্রেমিক বলিও।

বাবা বড় ধনলোভে একটা কাল-পেঁচীর সঙ্গে আমার বিবাহের সম্বন্ধ করিলেন। আমার ভাবি-স্ত্রী অতুল-সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী। সম্পর্কীয়ের মধ্যে কেবল মাতা বর্ত্তমান। হউক কাল-পেঁচী, দরিদ্র-পিতা অত বিষয়ের লোভ ছাড়িতে পারিলেন না। আর আমার অনিচ্ছা —তাতে কি আসে যায়? অত বিষয়—তবুও আমার অনিচ্ছা? প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ,—আমাদের দুই হাত এক হইয়া গেল।

আমার বিবাহে শৈলদের নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। ভাবিয়াছিলাম, শৈল যদি আমায় যথার্থ ভালবাসে, তবে এ বিবাহে তাহার আপত্তি হইবে;—তাহার ম্লানমুখ দেখিয়া, তাহার চোখে জল দেখিয়া, না হয়, যাহা হয় একখানা করিব। কিন্তু কৈ,—শৈল ত কাঁদিল না; আর আর লোকের মত তাহারও মুখে হাসি দেখিলাম,—বরং কিছু বেশী। বৌ দেখিয়া অনেকে মুখ ফিরাইয়াছিল। কিন্তু শৈল তাহার বিপরীত; নূতন বৌকে আদর করিয়া তুলিয়া, "স্বামি-সোহাগিনী হও" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছিল। কিন্তু সেই সময়ে—ঠিক

সেই সময়ে কে বুঝি শৈলের চোখে জল দেখিয়া বলিয়া উঠিয়াছিল,—"শৈল! তুই কাঁদ্‌চিস্ নাকি?" শৈল ছুটিয়া পলাইল, আমার ভাগ্যে শৈলের চোখে জল দেখা ঘটিয়া উঠিল না। হায় শৈল! যদি দু-দিন আগে অমনি এক ফোঁটা চোখের জল দেখিতাম—অমনি একটা মুখের কথা শুনিতাম! তার পর যে ক'দিন নূতন বৌ আমাদের বাড়ী ছিল, সে ক'দিন শৈল আর আমাদের বাড়ীর দিক মাড়ায়ও নাই।

যেখানে বিধাতা বাহিরে রূপে বঞ্চিত করিয়াছেন, সেখানে অন্তরে গুণও দেন নাই। অন্যান্য স্থানে দেন আর নাই দেন, আমার কপালক্রমে তিনি আমার পরিবারকে রূপও দেন নাই, গুণও দেন নাই; তার উপর বাল্য-কাল হইতে ভোগ-বিলাসের ক্রোড়ে বর্দ্ধিত হইয়া আমার পরিবারের ভোগবিলাসের সাধ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল, আমাদের গরিবের ঘরে সেই সব আর কর্কশ উদ্ধত স্বভাব "লোণায়-সোহাগা"!

আর শৈল! বিনীত নম্র সুন্দরী শৈল! কাহার সঙ্গে কাহার তুলনা? কেন শৈল তোমায় দেখিয়াছিলাম? তুমি দেবী বলিয়াই আমার আশার অতীত। হায়, তবে কেন দেখা দিলে?

এদিকে আমার স্ত্রীর অতুল ধনসম্পত্তি পাইয়াও আমার পিতা সুখী হইতে পারিলেন না। মুখরা স্ত্রীর মুখের দোষে সংসারে অ-রনিবনাও হইতে লাগিল। পিতা বুঝিলেন,—"শুধু ধনে সুখ নাই।" আমি বুঝিলাম,—"অদৃষ্ট ছাড়া গতি নাই।"

আজকাল শৈল আর তেমন নির্ভীক-চিত্তে আমার কাছে আসে না। আমি অনেকবার লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি, শৈল আমার কাছে আসিতে আসিতে, আমাকে দেখিয়াই ফিরিয়াছে। সে এখন আমার কাছে আসিবার সময় এক পা এগোয়, দু পা পেছোয়। যেন 'বলি বলি' করিয়া সব কথা বলিতে পারে না। তা হউক, শৈলের সেই মনের ভিতরের গোলমাল টুকু সুন্দর মুখে কেমন সুন্দর প্রতিভাত হয়!

শৈল আর আমায় সঙ্গে করিয়া বেড়াইতে লইয়া যায় না বটে, কিন্তু যে সব জায়গায় আগে আমরা দুজনে যাইতে ভালবাসিতাম, সেখানে শৈল একা যাইয়া বসিয়া থাকে। শৈল এখন আপনার মনে মালা গাঁথে, আপনার মনে কাহাকে মালা পরায় কে জানে? একদিন আমি এমনি শৈলের মালা-গাঁথা দেখিয়াছিলাম। অনেকক্ষণ পিছনে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া মালা-গাঁথা দেখিয়া, মালা অর্পণ করিবার সময়ে বিহ্বল হইয়া শৈলের সাম্‌নে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম। শৈলের হাতের মালা হাতে রহিয়া গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে দুটী চোখের জলে শৈলের মুখ ভাসিয়া গেল। আমি পুরুষ, কিন্তু চক্ষের জল অনেক চেষ্টা করিয়া চক্ষে রাখিতে পারিলাম না। আমরা কেহ কোন কথা কহি নাই। শৈল মালা ফেলিয়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে চলিয়া গেল, আমি নিষেধ করিলাম না। আমরা উভয়েই বুঝিয়াছিলাম, এমন স্থলে উভয়ের দেখা করা অন্যায়।

তোমার যাহা ইচ্ছা হয় মনে করিও, আমি বিবাহিত হইয়াও শৈলকে ভাল বাসিতাম, আর শৈল অবিবাহিত হইয়াও বুঝি—সাহস করিয়া বলিতে পারি না—আমায় ভালবাসিত।

(৪)

আমার ত বিবাহ হইয়া গেল, শৈলের কি বিবাহ হইবে না? হইবে বৈ কি? অমন রূপ-গুণসম্পন্না পাত্রীর বিবাহের ভাবনা? অনেক পাত্র আসিল, তাহাদেরই মধ্যে বাছিয়া

বাছিয়া একজনের সঙ্গে শৈলের বিবাহ হইয়া গেল।

আজ শৈলের শ্বশুরবাড়ী হইতে লইতে আসিয়াছে। শৈল শ্বশুরবাড়ী যাইবার আগে একবার আমাদের বাড়ী আসিল। সকলের সঙ্গে কথা কহিয়া বিদায় লইয়া আমার ঘরে আসিল। শৈল অনেক দিন এমন নির্ভীক-চিত্তে আমার ঘরে আসে নাই। আমি সেই সময় কাহাকে একখানা চিঠি লিখিতেছিলাম; চিঠি লিখিতে ভাল লাগে নাই, তাই অন্যমনে চিঠির কাগজের কোণে দশ-বিশটা "শৈল" "শৈলবালা" লিখিয়াছিলাম। শৈলকে আসিতে দেখিয়া অপ্রতিভ হইয়া সে কাগজখানা লুকাইতে গেলাম। কিন্তু আমায় গোপন করিতে দেখিয়া শৈল প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিল,—"ও কাগজখানা কি?"

একবার, দুইবার, তিনবার "কিছু নয়" বলিয়া ফেলিয়া দিতে গেলাম, তখন শৈল নিজে আসিয়া আমার হাত হইতে সে কাগজখানা কাড়িয়া লইল। সেই কাগজখানা পড়িতে পড়িতে, ঠিক সেই সময়ে, শৈলকে যাহা দেখিয়াছিলাম, তেমন আর কখন দেখিলাম না। একবার দেখিলাম,—শৈল বালিকা, আমার গলা ধরিয়া বেড়াইতে চায়; আমার জন্য শৈলের মন বড় কাঁদে। আমি আগে আগে অভিমান করিলে শৈল যেমন আকুলি-বিকুলি করিয়া আমার চিবুক ধরিয়া মুখ ফিরাইত, আজ শৈল তেমনি করিয়া আকুলি-বিকুলি করিতেছিল। শৈলের দৃষ্টি বড় করুণাব্যঞ্জক, শৈলের অন্তর বড় আত্মোৎসর্গ-পরায়ণ। তার পরেই দেখিলাম, সে শৈল আর নাই। শৈল ধীর, গম্ভীর। পৃথিবীর ঝঞ্ঝাবাতে শৈলের মন নড়ে-চড়ে না। শৈল অপরিচিতের ন্যায় আমার সঙ্গে কথা কহিতে লাগিল। শৈল বলিল,—"আপনি আমার নাম কেন লিখিতেছিলেন?"

ও হরি! আমি শৈলের কাছে "আপনি"! বড় দুঃখে, বড় কষ্টে আমার মুখ দিয়া বাহির হইল,—"আপনার নাম কি, আমি জানি না; তবে শৈলকে শৈলবালা বলিয়া অভিধানিক যে শব্দ আছে, তাহাই আমি লিখিতেছিলাম। সে শব্দ আপনার নাম হইলে হইতে পারে। কিন্তু যদি তাই হয়, তাহা হইলেও কোন অভিধানিক কথা আপনার নিজস্ব সম্পত্তি হইতে পারে না;—শৈল বা শৈলবালা লিখিতে আমি দোষ ভাবি না।"

শৈল আমায় "আপনি" বলিয়া ডাকিল, আমি "শৈলকে চিনি না", "জানি না" বলিয়া জবাব দিলাম। আজ আমাদের কথার মুখবন্ধেই এই।

তখন শৈল বলিল,—"আপনি দোষ ভাবুন বা না-ভাবুন, আমি দোষ ভাবি। 'শৈলবালা' কথা লিখিতে দোষ নাই বটে, কিন্তু সুন্দরী, পরস্ত্রী শৈলবালাকে ভাবিয়া 'শৈলবালা' লিখিতে দোষ আছে।"

আজ শৈল শুধু স্বভাবসুন্দরী নয়; যে সুন্দরী জন্মিয়া আপনাকে সুন্দরী বলিয়া জানে, সেই সুন্দরী। তার উপর আজ শ্বশুরবাড়ী যাইবার সাজে সুসজ্জিতা। আজ সে গর্ব্বিতা সুন্দরীর দিকে চাহিয়া চাহিয়া আমি চক্ষু ফিরাইতে অক্ষম হইতেছিলাম।

আমি শৈলের উত্তরে হারিয়াছিলাম, তবুও যেন না বুঝিতে পারিয়া বলিলাম,—"আপনি যাহা বলেন, তাহাই যদি স্বীকার করিয়া লই, তবুও কি দোষ—বুঝিতে পারি না।"

এইবার সেই রূপগর্ব্বিতা প্রমত্তা সৌন্দর্য্যময়ী শৈল উত্তর দিল,—"দোষ কামনায়, দোষ নিজের সর্ব্বনাশে, দোষ আমার সর্ব্বনাশে। আমার সর্ব্বনাশ করিবার আপনার কি অধিকার আছে, জানি না।"

আমি। বুঝিলাম—কামনায় দোষ, বুঝিলাম

—নিজের সর্ব্বনাশে দোষ; কিন্তু কেমন করিয়া আপনার সর্ব্বনাশ করিতেছি, জানি না। আপনি সর্ব্বনাশ না করিতে দিলে, আমার কি সাধ্য, আপনার সর্ব্বনাশ করি?

শৈল। কি বুঝাইব আপনাকে?—পুরুষ আপনি, আপনি কি শৈলকে এতদিনেও বুঝিতে পারেন নাই? যদি আপনার কামনায় পাতক থাকে, তবে শৈলের কামনায় মহাপাতক আছে। আপনার কামনায় যে আমার কামনা হয়, তাহা বলিতে হইবে কি?

আমি। আপনাকে মহাপাতকের ভাগী করিতে চাহি না। কি করিলে আপনি সুখী হন?

শৈল। আর যদি জন্মের মত দেখা না পাই, তবে হয়ত মনকে কথঞ্চিৎ নিবৃত্ত করিতে পারিব।

আমি। তাহাই হইবে। কাল হইতে আর আমার দেখা পাইবেন না।

নিষ্ঠুর শৈল! কি করিলে? আপনার দুর্দ্দমনীয়-বেগবিশিষ্ট-বৃত্তি-নিরোধে অক্ষম হইয়া কেমন করিয়া অপরের প্রাণকে বলি দিলে? হায় শৈল! এখনও বুঝিতে পার নাই, কাছেই থাক, আর দূরেই থাক, বৃত্তি-নিরোধ করিতে পারিলেই বাঁচিতে পারিবে। নহিলে, শত যোজন দূরে থাকিলেও পর-পুরুষের ছায়া তোমার অনুসরণ করিবে!

এইবার আর একবার শৈলের দিকে চাহিয়া দেখ, আবার সে বালিকা;—আবার সে আমার জন্য কাঁদে, আবার আমার দিকে চাহিয়া শৈলের চক্ষে জল আসে, আবার শৈল আমায় লইয়া বেড়াইতে যাইতে চায়।

আর দেখিতে পারিলাম না। "সুখে থাক" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া শৈলকে একা ঘরে রাখিয়া বাহির হইলাম। সেই সময়ে যদি আমার আর শৈলের চোখের দিকে চাহিয়া দেখিতে!

পরদিনেই আমাদের বাড়ীর সকলে আমার বিদেশ যাওয়ার কথা শুনিল।

---

(৫)

আমার স্ত্রীর নাম সুন্দরী। কিসের জন্য তাহার নাম সুন্দরী হইয়াছিল, আমি অনেক ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব দেখিয়া ও তাহা ঠিক করিতে পারি নাই। তা, যাহা হউক, যখন লোকে তাহাকে সুন্দরী বলিয়া ডাকিত, তখন আমিও তাহাকে সুন্দরী বলিয়া ডাকিতে বাধ্য হইলাম।

সুন্দরী স্বভাবগুণে আমার অপ্রিয় হইয়াছিল। আমি যে সুন্দরীকে দেখিতে পারিতাম না, একথা সুন্দরী বুঝিতে পারিত; আর তাহা ছাড়া আমি যে শৈলের পক্ষপাতী ছিলাম, একথাও সুন্দরী জানিতে পারিয়াছিল। সেইজন্য আমাকে শৈলের কথা লইয়া তামাসা-বিদ্রূপ করিয়া রাগাইতে ভালবাসিত।

দু-দিন পরে আমার বিদেশ যাওয়ার কথা শুনিয়া সুন্দরী আমায় ডাকিয়া বলিল,—"ওগো! আর শুনেছ?—ও বাড়ীর হরিশ নাকি দেশত্যাগী হ'য়েছে।"

আমি বলিলাম,—"তাহাতে তোমার-আমার কি আসে-যায়? কথাটা আমাকে জানাইবার বিশেষ দরকার ছিল না। আর যদি তোমার বলিবার বিশেষ দরকার থাকে, তবে না হয়, খবরের কাগজওয়ালাদের কাছে বলিয়া পাঠাইও।"

সুন্দরী। দরকার না থাকিলে বলিতাম না। হরিশের দেশত্যাগে তোমার-আমার কিছু আসে যায় না জানি; কিন্তু যদি বলি যে, হরিশ একটা মেয়ে-মানুষের কথায় দেশ ছাড়িয়া গেল,—যদি বলি, হরিশ একটা আস্ত বাঁদর,—তবে বোধ হয়, আমার কথা শুনিবে।

হরিশের দেশত্যাগের ভিতর যে এত কথা

ছিল, তাহা আমি গোড়ায় জানিতে পারি নাই। সুন্দরী যে কোন রকমে আমার ও শৈলের কথোপকথন শুনিতে পাইয়াছে, তাহাও জানিতাম না। যাহা হউক, কথাটা বড় বুকে বিধিল। আমি নিরুত্তর রহিলাম। তখন আমায় নিরুত্তর দেখিয়া সুন্দরী আবার বলিতে লাগিল,—"হরিশ যায় যাক্, কিন্তু সে যেন নিজের পয়সায় যায়! পরের তহবিল ভাঙ্গিয়া বিদেশ-বেড়ান কোন্ দেশী কথা?"

আমার নিজের পয়সা ছিল না, একথা তোমায় আগে বলিয়াছি। তা ছাড়া, এখনও উপায় করিতে শিখি নাই। সুন্দরীর পয়সায় আমি বিদেশ যাইবার কল্পনা করিয়াছিলাম। এখন এই মর্ম্মান্তিক বিদ্রূপ শুনিয়া, তাহার পয়সায় বিদেশ যাওয়ার আশা ত ছাড়িয়া দিলাম, অধিকন্তু স্ত্রীর পয়সার উপর ঘৃণা হইল। সেই সময়ে তোমার মতন পুরুষসিংহ হইলে, স্ত্রীর গায় হাত উঠিত কিনা, জানি না; কিন্তু আমি হাত উঠাই নাই। হাত উঠাই নাই দুই কারণে। প্রথম,—স্ত্রী বলিয়া; দ্বিতীয়,—আমি শৈলের কথায় সুন্দরীকে ছাড়িয়া যাইতে বসিয়াছি, তাই সুন্দরীর রাগ করিবার কারণ ছিল বলিয়া।

এখনও আমি নিরুত্তর,—মনের রাগ মনেই ছিল। কিন্তু সুন্দরীর কথা এখনও থামিল না। সুন্দরী বুঝিতে পারিতেছিল যে, কথাগুলা আমার মর্ম্মান্তিক হইতেছে, সেইজন্য সে যেন আরও কিছু রাগিয়া বলিতে লাগিল,—"ভাল, হরিশই না হয় বিদেশে গেল, কিন্তু হরিশের স্ত্রীর জন্য রামচরণ আফিং খাইয়া মরে কেন, পুরুষদের কথা পুরুষেরাই জানে? কিন্তু আমি বলি, হরিশের চেয়ে রামচরণ আরও একটা মস্ত বাঁদর।"

তোমার দিব্য বলিতেছি, এ রহস্য আমি বুঝিতে পারি নাই। প্রথমে মনে করিয়াছিলাম, সুন্দরী বুঝি ইঙ্গিতে আমাকে আফিং খাইয়া মরিতে বলিতেছে; আবার ভাবিলাম, শৈলের স্বামী বুঝি অহিফেন খাইয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। কিছুই ঠিক করিতে না পারিয়া সুন্দরীর মুখের পানে চাহিলাম।

এবার সুন্দরী আর গোপন না করিয়া বলিল,—"বুঝিতে পার নাই?—শৈলের স্বামী তোমার জন্য আফিং খাইয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। আজ বিধবা শৈল তোমার অনুরাগিণী।"

'আজ শৈল বিধবা!' সেই এক কথায় মনে কত আকুল-তরঙ্গ উৎক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তোমায় বলিতে পারি না। বিধবা শৈল কাল হয়ত বাপের বাড়ী আসিবে। তার পর শৈল আমায় দেখিলে কি দুটা কথা কহিবে না? নাই কহুক, শৈলকে কি একবার দেখিতে পাইব না? হায় শৈল! কেন বলিয়াছিলে, আমার কামনায় তোমার কামনা? কাল তুমি পরস্ত্রী অস্পর্শনীয়া ছিলে, তাই বুঝি তোমার কথায় দেশত্যাগের সঙ্কল্প করিয়াছিলাম। আজ তুমি স্বাধীনা, আজ আমি তোমার আশা ছাড়িতে পারি কৈ? আজ শৈললাভ বুঝি আমার সাধ্যায়ত্ত। দুর্দ্দমনীয় ইন্দ্রিয়বৃত্তির নিরোধে অক্ষম হইয়া দেশত্যাগের সঙ্কল্প ছাড়িলাম। তুমি না হয় আমায় অধার্ম্মিক বলিও, কিন্তু একবার আমার অবস্থা ভাবিয়া দেখ দেখি! একদিকে শৈল—অতৃপ্তরূপ লালসা আর একদিকে সংসার-বিরাগের অবজ্ঞার জলন্ত প্রতিমূর্ত্তি সুন্দরী; একবার যৌবনের তুলাদণ্ডে ওজন করিয়া দেখ দেখি, কোন্ দিকে ভারি হয়?

সে ওজন না হয় পরে করিও। আপাততঃ আমার দেশ ছাড়িয়া যাওয়া হইল না বুঝিতে পারিলে?

---

(৬)

শৈলের স্বামীর হঠাৎ আত্মহত্যা সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা রটাইল। এত অতুল বিষয়, এমন সুন্দরী স্ত্রী যাহার, তাহার জীবনে অসাধ—এ রহস্য জানিতে সকলেই ব্যাকুল। কিন্তু কেহই প্রকৃত কথা জানিল না। তাই যাহার যাহা মনে আসিল, সে তাহাই বলিল। উহারই মধ্যে শৈলকে জড়াইয়া যাহারা গুজব রটাইল, তাহাদেরই কথা সকলের আগে বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হইল। পৃথিবীতে পাপের কলুষিত চিত্র, ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, লোকে আগে দেখিতে চায়। যাহারা শৈলকে লইয়া স্বামীর মৃত্যুর কারণ অনুমান করিল, তাহাদের মধ্যে আমার সহধর্ম্মিণী একজন—প্রথম। বুঝি ইহারই মধ্যে তাহার আমাকে কিছু বেশী জ্বালাইবার বাসনা ছিল। বুঝি নিজের স্বামীর জন্য আর একজনের স্বামী মরিতে চায়—এই লইয়া সুন্দরীর কিছু অহঙ্কার প্রকাশ করা উদ্দেশ্য ছিল!

শৈলের স্বামীর মৃত্যুর কারণ, আমিও ঠিক জানিতাম না। শৈলের সঙ্গে দেখা হইলে, একথা একবার জিজ্ঞাসা করিব মনে করিয়াছিলাম; কিন্তু যখন শৈলের সঙ্গে দেখা হইল, শৈল আমায় অন্য কথা কহিতে অবসর না দিয়াই প্রথমে বলিল,—"আপনি আপনার কথা রাখেন নাই কেন? আমি হয় ত আর আপনাকে বিশ্বাস করিতে পারিব না।" আমায় উত্তর দিতে আম্‌তা আম্‌তা করিতে হইয়াছিল, তাই দেখিয়া শৈল আমার কথা না শুনিয়া চলিয়া গেল। তার পর অন্য কথা আর কি জিজ্ঞাসা করিব?

শৈল আমায় অবিশ্বাস করে, করুক; কিন্তু তাহাকে দেখিবার আশা, তাহার সঙ্গে কথা কহিবার আশা ছাড়িয়া যাইতে পারিব না। এর পর আবার যখন শৈলের সঙ্গে দেখা হইল, শৈল মুখ ফিরিয়া চাহিল না; আমি ডাকিলে কথা কহিল না।

শৈলকে ভাবিয়া ভাবিয়া ক্রমে মনে রূপের আগুন জ্বালিলাম। সর্ব্বদাই অন্যমনস্ক থাকিতাম। এক কথায় আর এক কথা জবাব দিতাম, এক কাজ করিতে আর এক কাজ করিতাম। তার পর কেহ বুঝাইয়া দিলে নিজে লজ্জিত হইতাম। আমার যে কি-একটা হইয়াছে, কাহারও বুঝিতে বাকী রহিল না। সুন্দরীর অনুগ্রহে সেই কি-একটা কিম্ভূত-কিমাকার রূপ ধারণ করিল। ক্রমে এতদূর গড়াইল যে, আত্মীয়-কুটুম্বেরা আমায় দেখিতে আসিতে লাগিল। বাড়ার ভাগ, ডাক্তার-কবিরাজের ব্যবস্থা হইল। পিতামাতার আগ্রহে আমায় একটু "মধ্যম-নারায়ণ তৈল" মাখিতে, একটু নাইট্রো মিউরিয়াটিক এসিড রোজ খাইতে ও একদিন একটু "ক্যাষ্টর অয়েলে"রও জোলাপ লইতে হইয়াছিল।

কিন্তু যাহার জন্য এত, সেই শৈল আমার নাম শুনিলে, আমার গন্ধ পাইলে পলাইত। আমি ইদানী শৈলের রূপে এতদূর আকৃষ্ট হইয়াছিলাম যে, যেখানে শৈল থাকিত, যেদিকে শৈল যাইত, সেখানে সেইদিকে আমার গতিবিধি চলা-ফিরা বেশী হইয়াছিল। কিন্তু হায়, অনেক চেষ্টায় শৈলের দেখা মিলিত না, অনেক কষ্টেও শৈলকে কথা কওয়াইতে পারিতাম না। আমি রামকে ডাকিতে শৈলকে ডাকিতাম। দিনের মধ্যে মনে মনে শৈলকে আঁকিয়া বিশবার তাহাকে চক্ষের সম্মুখে আনিতাম, কত রকমে সাজাইতাম, কিছুতেই মনের তৃপ্তি হইত না। কাহারও পায়ের শব্দ পাইলে, অতি সন্তর্পণে উঁকি মারিয়া দেখিতাম, শৈল আমায় লুকাইয়া দেখিতে আসিয়াছে কিনা। এক কথায় তুমি যদি মনে কর যে,

আমি শৈলের জন্য পাগল হইয়াছিলাম, তবে তোমার অনুমান মিথ্যা বলিব না।

দু'বছর আগে কথায় কথায় শৈলের উপর অভিমান করিতাম, কিন্তু প্রাণের প্রাণ, হৃদয়ের হৃদয় শৈলের জন্য উৎসর্গ করিয়াও শৈলকে পাইলাম না। তুমি যদি কখনও অতি-বড় নিরাশায় পাগলপ্রায় হইয়া থাক, তবে কথঞ্চিৎ আমার দুঃখ বুঝিবে। আমি মহাপাপী, তাহা জানি। কিন্তু যখন যেমনটী ঘটিয়াছিল, অবিকল তোমাকে বলিয়া যাইতেছি।

---

(৭)

'দাঁড়াও—একবার দাঁড়াও,—একবার দেখি! আর তোমার পথে আসিব না—আর এ জনমে দেখিতে চাহিব না,—একবার—একবার দেখি!'

বড় করুণ, বড় তীব্র মর্ম্মভেদী স্বরে, কাতরতা জড়িত স্বরে, শৈলের একদিন দেখা পাইলে বলিয়াছিলাম; নিষ্ঠুর শৈল ফিরিয়াও চাহিল না। এত ঘৃণায়, এত অবজ্ঞায়ও আমার ভালবাসা ঘৃণায় পরিণত হয় নাই। কেমন মনে হইত, শৈল আমায় ভালবাসে,—শৈল আমার।

এই সময় মনে হইত,—"আমার যদি ভাবিয়া ভাবিয়া সঙ্কট পীড়া হয়, আর তাই শুনিয়া শৈল একবার দেখিতে আসে, তবে, আর কিছু না হউক, শৈলকে সম্মুখে দেখিয়াও সুখে মরিতে পারি। সে আশা পূরিল না, সে সাধ মিটিল না। ভবিতব্যে ফলিল বিপরীত। সঙ্কট পীড়া আমার না হইয়া হইল শৈলের। আমার দেখিতে যাইতে বড় ইচ্ছা হইয়াছিল, কিন্তু সাহস করিয়া যাইতে পারি নাই।

শৈলের ভ্রাতা বিধবা ভগিনীর জন্য ভাল করিয়া চিকিৎসা-পত্র করান নাই, তবুও শৈল মরিল না, অল্পে অল্পে সেই সঙ্কট-পীড়া হইতে আরোগ্যলাভ করিল। কিন্তু সে পীড়া শৈলের শরীরে নিদর্শন রাখিয়া গেল; শৈলের সে রূপ আর ফিরিল না। শৈল পীড়ার সময় অনেক দিন অজ্ঞান ছিল, অনেক প্রলাপ বলিয়াছিল। সেই প্রলাপের সঙ্গে আমার নামও নাকি ছিল। শৈল ভাল হইলে, সেই সব কথা লইয়া অনেক কথা উঠিল।

শৈল ভাল হইলে সুন্দরী একদিন স্নান করিয়া, গলায় হরিনামের মালা দিয়া, সর্ব্বাঙ্গে তিলক কাটিয়া, তাহার উপর নামাবলী গায়ে দিয়া, হাতে হরিনামের ঝুলি লইয়া আমার কাছে আসিয়া বসিল। তার পর আমায় ডাকিয়া বলিল,—"ওগো! তোমায় আমায় যা ভাব, তাহা ত আমাদের উভয়ের কাহারই অবিদিত নাই। অনেক দিন এমনি করিয়া গিয়াছে, বুঝি বাকী দিন কয়টাও এমনি করিয়া যাইবে। আর কেন? আমি তীর্থপর্য্যটন করিয়া আসি।"

তীর্থ-পর্য্যটনের সে বেশ দেখিয়া আমার হাসি আসিয়াছিল; আর অন্ততঃ দিন কতকও সুন্দরীর বাক্য-বাণ হইতে পরিত্রাণ পাইব মনে ভাবিয়া একটু আহ্লাদিতও হইয়াছিলাম। তাই বলিলাম,—"তা বেশ, আমার আপত্তি নাই। ভাল সঙ্গ পাইলেই যাইতে পার।"

"আপত্তি নাই" কথাটা সুন্দরীর গায়ে বড় বাজিয়াছিল। লোকাচার ভাবিয়া অন্ততঃ একবারের তরেও সুন্দরীকে আমার নিষেধ করা উচিত ছিল। অন্ততঃ "এখন থাক, দুদিন পরে না হয় আমার সঙ্গে যেও" এ কথাটাও আমি সুন্দরীকে বলি নাই। সুন্দরী অন্তরে জ্বলিয়া গেল। যে কথাটা বলিতে আসিয়াছিল, শতগুণ তীব্র করিয়া তাই বলিতে লাগিল।

সুন্দরী বলিল,—"না হয় তীর্থে গেলাম, কিন্তু যদি মনে পাপ থাকে?"

আমি। মরিলেও সে পাপের খণ্ডন নাই।

সুন্দরী। সে ত ভগবানের কাছে। ইহলোকে সে পাপের শাস্তি কি?

আমি। ইহলোকে পাপ না প্রকাশ পাইলে লোকের কাছে তাহার শাস্তি নাই; কিন্তু অন্তরে বিলক্ষণ শাস্তি ছিল। সে এত যে, তুষানলে দগ্ধ হওয়াও বুঝি তাহাপেক্ষা ভাল। আর প্রকাশ পাইলে পাপের শাস্তির জন্য সমাজ আছে, ধর্ম্মাধিকরণ আছে।

সুন্দরী। প্রকাশ পাইলে কি শাস্তি?

সুন্দরী কি ভাবিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছিল, আমি বুঝিতে পারি নাই। তবে তাহার কথার ভাবে বোধ হইতেছিল যে, তাহার কোন গূঢ় উদ্দেশ্য আছে। সে উদ্দেশ্য আমি বুঝিতে পারি নাই বলিয়াই রাগ হইতেছিল; তাই বলিলাম,—"যদি ধর্ম্মাধিকরণে না যায়, তবে সে পাপের শাস্তি তোমার মত স্ত্রীর হইলে, মাথা মুড়াইয়া ঘোল ঢালিয়া দেশের বাহির করিয়া দেওয়া।"

সুন্দরী। উপযুক্ত বিধান। এ কথা আমি কাল যাইয়া, শৈলকে ও শৈলের ভাজকে বলিয়া আসিব।

আমি খেই পাইলাম। বিধবা শৈল বুঝি আমার জন্য কি করিয়াছে, তাই লইয়া সুন্দরী একটা গণ্ডগোল বাধাইবার চেষ্টায় আছে। যা হউক, যা বলিয়াছি, তার আর উপায় নাই। আমি মরমে মরিয়া গেলাম।

বিধবা রূপহীনা শৈলকে এখন আর কেহ গ্রাহ্য করে না। তাই পরদিন সুন্দরী শৈলদের বাড়ী গিয়া শৈলকে ও তাহার ভাজকে বলিয়া আসিল,—"ওগো! শৈল যাঁহাকে ব্যামোর সময় প্রলাপেও শতবার দেখিয়াছিল, শৈল যাঁহাকে চোখের আড়াল করিতে পারে না, তিনি শৈলের পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ মাথা মুড়াইয়া ঘোল ঢালিয়া দেশত্যাগী হইতে বলিয়াছেন। আমি বলি, তাহার আগে উল্টা-গাধায় চড়াইয়া একবার গ্রামটা প্রদক্ষিণ করাইলে ভাল হয়।"

---

(৮)

কিছুদিন পরে এই পত্র পাইলাম;—

"প্রণয়াস্পদেষু—

"যে আগুন এতদিন নীরবে বুকে পোষণ করিয়াছিলাম, যে আগুনে জ্বলিয়া-পুড়িয়া খাক্ হইয়াছি, সেই আগুন আজ নিবাইব সঙ্কল্প করিয়াছি। সঙ্গে সঙ্গে ভগবানের সৃষ্ট একটী প্রাণি-হত্যা হইবে; কিন্তু যে প্রাণী দংশন করিতে পারে, পরে নিজে জ্বালায় অস্থির হয়, সে প্রাণির প্রাণে প্রয়োজন নাই।

"পরকালে ইহারও অধিক না জানি আরও কত যাতনা ভোগ করিতে হইবে। তাই কতক ভাবিয়া, আর প্রাণ দিলে প্রাণ ফিরিয়া পাইব না, সেই মায়ায়, এতদিন আত্মহত্যা করি নাই। আজ কিন্তু আমার উভয় মায়াই গিয়াছে। যে কলঙ্কের ডালি মাথায় করিয়া বসিয়া আছি, তাহার যন্ত্রণা পরকালের শত যন্ত্রণা অপেক্ষাও বুঝি অধিক। আর এতদিন প্রাণের মায়া করিতাম—শুধু তোমাকে দেখিবার সাধে। সে সাধও মিটিয়াছে;—তুমি তোমার স্ত্রীকে দিয়া মাথা মুড়াইয়া ঘোল ঢালিয়া দেশত্যাগী হইবার ব্যবস্থা দিয়া পাঠাইয়াছ। তবে আর কেন? আমার জীবনে আর কি সাধ?

"তোমার জীবনের সুখের পথে, তোমার স্ত্রীর জীবনের সুখের পথে আমি কাঁটা ছিলাম। আমি কিন্তু সে কাঁটা তোমার পায়ে ফুটিতে দিই নাই। অবিবাহিতা শৈল হাসিয়া তোমার স্ত্রীকে বরণ করিয়া তুলিয়াছে; বিবাহিত শৈল তোমার সঙ্গে স্বেচ্ছায় কথা কয় নাই; বিধবা শৈল তোমার দিকে ফিরিয়াও চায় নাই। কিন্তু তবুও অবিবাহিতা, বিবাহিতা, বিধবা শৈলের হৃদয় তোমারই ছিল। শৈল ধনিকন্যা হইয়াও দরিদ্রের অর্চ্চনা করিত। তোমারই মন্ত্রে মুগ্ধ হইয়া শৈল অট্টালিকা ছাড়িয়া শৈশবে কুটীর-

বাসিনী হইয়াছিল। তোমারই দিকে চাহিয়া শৈল আপনার স্বামীকে ভুলিয়াছিল,—তোমাকে দেখিতে পাইবে বলিয়াই শৈল শুধু এতদিন বাঁচিয়াছিল।

"শৈল কুলটা। যে গৃহস্থের বৌ হইয়া পর-পুরুষের কামনা করে, সে কুলটা নয় ত কি? কিন্তু সে দোষ কাহার?—কামনার কামনার উৎপত্তি, কামনায় কামনার বৃদ্ধি। তুমি কামনা না করিয়া রোজ রোজ "দূর ছাই" করিয়া তাড়াইয়া দিলে, তুমি আমার ধর্ম্মপথে লওয়াইলে ত কুলটা শৈল তোমায় ভাইয়ের মত ভালবাসিত! ঘরে আগুন লাগিলে, যে তাহাতে ঘৃতাহুতি দেয়, সেই অধিক পাপী, না—যাহার দোষে ঘরে আগুন লাগে, সেই অধিক পাপী?

"শৈল মহাপাতকিনী, শৈল স্বামিঘাতিনী। শৈলের হৃদয় তোমার ছিল বলিয়া শৈল স্বামীকে হৃদয় দান করিতে পারে নাই; সেই দুঃখে শৈলের স্বামী মরিয়াছে। কিন্তু শৈলকে মহাপাপী জানিয়াও তুমি ভালবাসিতে। মহাপাপীকে মহাপাপী না হইলে ভালবাসিতে পারে না।

"আজিকার দিনে তোমায় মহাপাপী বলিতে মন চায় না। কিন্তু বিধবা শৈলকে কুপথে লইয়া যাইতে তোমার বড় যত্ন ছিল। বিধবা শৈলের তিরস্কারে যদি তোমার সুমতি হয়, তাই এত কথা বলিলাম। আর আজও তোমায় ভালবাসি বলিয়া এত কথা বলিলাম। কিন্তু আজিকার ভালবাসা আর প্রতিদান চায় না।

"শেষ কথা,—ভালবাসি বলিয়া জীয়ন্তে মরিয়াছিলাম। ভালবাসি বলিয়া মরিয়াও সুখী হইতে পারিব না। যে ভালবাসিতে জানে, তার মরণেও সুখ নাই। তবে তোমার সুখ কামনা করিয়া মরিব। রূপবতী শৈল ভালবাসিতে শিখিয়াছিল, রূপহীন শৈল মরিতে শিখাইবে।

"কাল আর আমায় খুঁজিও না, কাল আর আমার দেখা পাইবে না।"

নীচে কোন স্বাক্ষর নাই। অনেক করিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিলাম,—একটি অক্ষরও মুছে নাই, এক জায়গায়ও এক ফোঁটা চোখের জলের দাগ নাই। নিষ্ঠুর শৈল যে এমন করিয়া চিঠি লিখিতে পারে, আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই। সুন্দরীর বাক্যবাণও যে, এত তীব্র নহে।

চিঠি পাইয়াই মনে করিলাম, বুঝি এতক্ষণ শৈল আর নাই। তবু যদি এখন যাইয়া কোন মতে একটা প্রাণিহত্যা নিবারণ করিতে পারি, ভাবিয়া, তাড়াতাড়ি শৈলদের বাড়ীর দিকে গেলাম। সেখানে কোন উচ্চ-বাচ্য শুনিতে পাইলাম না। পৃথিবী যেমন চলিতেছিল, তেমনি সেখানেও চলিতেছে। ঝি-মাগীকে দেখিয়া শৈলের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম, সে কোন উত্তর দিল না।

তার পর হইতে শৈলকে আর দেখিতে পাই নাই। শৈল কোথায় গেল, তাহার কি হইল, আর জানিতে পারিলাম না।

সেই অবধি আট-আনা জীবন লইয়া সংসারে ঘুরিতেছি, জীবনের সমীকরণ আর সমাধান হইল না। তুমি আমায় ফরক্কাবাদে দেখিয়াছিলে, রাম আমায় আলিগড়ে দেখিয়াছে, শ্যাম আমায় মজঃফরপুরে দেখিয়াছে, কালী আমায় লাহোরে দেখিয়াছে,—কিন্তু হায়! শৈলের চক্ষু আমায় কোথাও দেখে নাই। দেখিলে কি চারি চক্ষু মিলিত না? আমার সরকারী কাজ উপলক্ষ মাত্র, শৈলের সন্ধান আমার মুখ্য কাজ। আজও শৈলকে দেখিতে পাইলে একবার তেমনি করিয়া, ছেলেবেলার মতন করিয়া দেখি। আমার বিশ্বাস—শৈল কোথায় লুকাইয়া আছে, কে তাহাকে লুকাইয়া রাখিয়াছে।

শৈল-বিহীন জীবনে জগতে আর তেমন

শৃঙ্খলা দেখিতে পাই না। এমন একদিন ছিল, যখন জগতের সর্ব্বত্র তিন আর দুই-এ পাঁচ দেখিতাম। সে দিন গিয়াছে। এখন তিন আর দুই-এ কোথাও দেখি সাত, কোথাও সতর, কোথাও বা মূলে হাবাং। কোথাও দুধে চিনি, কোথাও শাকে বালি। এখন আর আমার এ "শাকে-বালি" জীবন লইয়া কি করিব? যিনি জীবন দিয়া জীবনে সুখ দেন নাই, তাঁহাকে ফিরাইয়া দিব নাকি?

আবার বলি, আমি মহাপাপী। নিজে মজিয়াছি, অপরকেও মজাইয়াছি। সংসারে আমার মত নরকের-আগুন বুকে লইয়া যাহারা বাঁচিয়া আছে, বা বাঁচিয়া মরিয়া আছে, তাহাদের জন্য পরলোকে কি শান্তি আছে, জানি না।

* * * *

হরিবাবু তাঁহার আট-আনা জীবনের কাহিনী এইখানেই শেষ করিয়াছেন। পড়িতে পড়িতে হরিবাবুর দুঃখে দুঃখিত হইয়া তাঁহার জীবনের ভ্রম-প্রমাদের, তাঁহার স্বভাবের দোষ-গুণের বিচার করিবার অবসর হয় নাই। সে বিচার সহৃদয় পাঠকবর্গের হস্তে রহিল। আপাততঃ আমি হরিবাবুর বাকী আট-আনা জীবনের অনেক সন্ধান করিয়াছিলাম; সন্ধান পাই নাই। তবে যদি কোন পাঠক মহাশয় সন্ধান পান, অনুগ্রহ করিয়া নিম্ন স্বাক্ষরকারীকে জানাইবেন।

শ্রীনারায়ণচন্দ্র সেন।

সুখ ও শান্তি।

সুখ।

অদৃশ্য অচল কোথা উন্নত-শেখর
বেষ্টিত তারকাজালে। অম্বর ভেদিয়া
আকাঙ্ক্ষার মেঘরাশি অলক্ষ্যে উঠিয়া
সঙ্গীতে গাঁথিছে তা'র ভিত্তি-পরিসর।
যুগ-যুগান্তর ধরি' শত নারী-নর,
আশামুগ্ধ, ঊর্দ্ধ-আঁখি, দুঃখদীর্ণ-হিয়া,
সেই তীর্থপানে ধায়; পড়িছে লুটিয়া
অর্দ্ধমাত্র পথে কেহ, কাঁদিছে অপর;—
উচ্চ আর্ত্তনাদরাশি উঠে চারি পাশে!
কে দেখা'বে পথ, হায়? বিশ্ব-ভ্রিয়মাণ
আশ্রয়-উদ্দেশ্য-হারা এ ভব-প্রবাসে;—
জন্ম তা'র অশ্রুজলে হ'ল অবসান।
হে আরাধ্য! আশীর্ব্বাদ কর এ মহীরে,
জন্মান্তে প্রশান্তি যেন পায় সে অচিরে।

শান্তি।

কোন্ কল্পতরুমূলে মায়া-উপবনে,
যুগান্ত-জাহ্নবী-তটে, নীলাম্বর ছায়
দেখা তুমি দিবে, সখি? নিবাইবে হায়,
জ্বলন্ত অন্তর জ্বালা শান্তি-বরিষণে?
তৃষার্ত্ত অতিথি আমি মর্ত্ত্যের ভবনে
সারা এ জনম ভরি' খুঁজিনু তোমায়;—
না মিলিল নীরকণা; কুরঙ্গের প্রায়
ফিরিনু বিফলে শুধু আশার-ছলনে।
ভাবি তাই কোথা তুমি রেখেছ রচিয়া
সেই সুপ্ত গুপ্ত নীড়খানি; প্রীতিভরে
সন্তপ্ত প্রেমিকে তব কোথা শোয়াইয়া
বীজনিবে নিশিদিন বসিয়া শিয়রে;—
অপূর্ব্ব গুঞ্জন-গানে নিদ্রা স্বনাইয়া
দিবে দু'টি আঁখি-পাতা ঢাকি' অকাতরে!

শ্রীনিত্যকৃষ্ণ বসু।

স্বপ্ন ও জাগরণ।

একবার হৃদয়ে এস, আমি প্রাণ ভরিয়া তোমাকে দেখি। তুমি কেমন, তোমার স্বরূপ কি, তাহা বুঝিলাম না; তোমায় কখন পাইব কিনা, তাহা জানি না; তোমায় পাওয়া যায় কিনা, তাহাও জানি না;—তবু সাধ, তুমি হৃদয়ে এস, আমি প্রাণ ভরিয়া তোমায় দেখি! এ হৃদয় বড় অশান্ত, বাত্যান্দোলিত ক্ষুব্ধ সমুদ্র-বৎ নিতান্ত অস্থির; এ উদ্বেলিত, তরঙ্গায়িত, আন্দোলিত হৃদয়ে তুমি একবার—এক মুহূর্ত্তের জন্য অধিষ্ঠিত হও, দরিয়ার এ তুমুল তুফান মুহূর্ত্তের জন্য ক্ষান্ত হউক, আমি সেই অবসরে একবার প্রাণ ভরিয়া তোমায় দেখিয়া লই!

তোমায় কেবল দেখিতে সাধ, অন্য সাধ মিটিবে না জানিয়া সে আশা করি নাই। এ চর্ম্মচক্ষে তোমায় দেখিতে পাইব না; অন্তরের চক্ষু তুমিই ফুটাইয়া দাও, সেই দিব্যচক্ষে তোমায় দেখিয়া কৃতার্থ হই। তোমায় দেখিতে হয়, কি হৃদয়ে রাখিয়া প্রাণ জুড়াইতে হয়, তাহা ভাল করিয়া বুঝি নাই। কিন্তু মনে হয়, তোমায় দেখা যায়; তোমায় দেখিতে দেখিতে চিত্ত তোমাতে ভরিয়া উঠে; তখন তোমাতে ডুবিয়া আত্মহারা হই। তখন এই চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ-তারা-ভরা, এই বৃক্ষবল্লরী-ফুল-পত্র-সুশোভিতা, এই অগণ্য-জীবজন্তু-সঙ্কুলা, অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে লাবণ্যময়ী এই পৃথিবী ভুলিয়া যাই! তখন জননীর অযাচিত স্নেহ, ভ্রাতা-ভগিনীর অপার্থিব ভালবাসা, প্রেমময়ী প্রিয়তমার নির্ম্মল প্রেম-সুধা—সকলই বিস্মৃত হই! তখন পৃথিবীর যশ, হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা, প্রাণের উন্মাদ আবেগ—সকলই ভুলিয়া যাই! তখন বাহিরের চক্ষু অন্ধ, বাহিরের কর্ণ বধির,—বাহিরের যদি কিছু চেতনা থাকে, তবে তাহাও বিলুপ্ত! তেমনই অবস্থায় সুখ কি দুঃখ, আশা কি ভয়, আবেগ কি উচ্ছ্বাস,—কিছুই বুঝি না; কেবল প্রাণের অতি নিভৃত প্রদেশে বিমল আনন্দ উপভোগ করি! সেই আনন্দে মাতোয়ারা হইয়া, যখন আবার এই পৃথিবী পানে চাহিয়া দেখি,—দেখি, যেন পৃথিবী আরও সুন্দরী, আরও শোভাময়ী, আরও হাস্যময়ী!

আজি আর পৃথিবীর সে হাসিমুখ দেখিতে পাই না। স্বপ্নে যেন সকলই ফুরাইয়া গিয়াছে! যেখানে কত শোভা, কত সৌন্দর্য্য, কত অনন্ত ভাবরাশি দেখিয়াছি, দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি,—আজি আর সে সকল দেখিতে পাই না! কোথায় গেল, কেন গেল, গেল ত আবার কবে আসিবে, তাহাই ভাবি; ভাবি কিন্তু ভাবিতে ভাবিতেই দিন ফুরাইল, যাহা যেমন দেখিয়াছি, তাহা আর দেখা হইল না!

যখন দেখিয়াছিলাম, তখন কি সে জীবনের ঊষাকাল? কিন্তু সে ঊষা কি নির্ম্মল, কি প্রশান্ত, কি শান্তিপূর্ণ! তখন উদার হৃদয়ে কি বিশ্বব্যাপী মহাপ্রেম, হিংসাশূন্য সরল নয়নে কি প্রীতি-পবিত্রতা, চিন্তাহীন নির্ম্মল ললাটে কি প্রতিভা-কিরণ, ভক্তিপূর্ণ সরল প্রাণে কি প্রগাঢ় বিশ্বাস বর্ত্তমান ছিল! কাহিনী শুনিতাম;—কত দেবলোক, কত ইন্দ্র-সভা, মন্দাকিনী-তটে কত পারিজাত-তরু, কত অমরাপুরী, কত দেববালা, কত গান, কত হাসি, কত ফুল;—সকলই সুন্দর, সকলই মধুর, সকলই অপূর্ব্ব! একে একে মিলাইয়া দেখিতাম;—দেখিতাম, আমাদের এ ধরাও অপূর্ব্ব ও অলৌকিক শোভায় শোভাময়ী! পরিস্ফুট বসন্ত-পূর্ণিমা-নিশীথে সুনির্ম্মল পূর্ণচন্দ্র, গভীর অমানিশায় অগণ্য অসংখ্য তারকার শ্রেণী, সতীর ললাটে সিন্দূর-বিন্দুর ন্যায় নির্ম্মল ঊষার ললাটে বালার্ক-কিরণ,—এ সকলই সুন্দর! সুনীল আকাশতলে সুনীল সফেন মহাকায় মহাসমুদ্র, তটপ্রদেশে তুষার-মণ্ডিত গগনস্পর্শী মহাকায় পর্ব্বতশ্রেণী, পর্ব্বতের পদপ্রান্তে পাদপ-সঙ্কুল গহন বন,—এ সকলই সুন্দর! স্তবকাভিনম্র অশোক-তরু, সহকার-আশ্রয়িণী মারুত-দোদুল্যমানা নব-কুসুমিতা মাধবী-বল্লরী, কল্লোলিনী স্রোতস্বতী, কুমুদ-কহ্লার-পরিব্যাপ্ত সরোবর, বিহগ-সঙ্গীতমুখরিত কুসুমকুঞ্জ,—এ সকলই সুন্দর! অগণ্য-প্রাসাদ-পরিপূর্ণ নগর, অসংখ্য জীবজন্তুর মধুর নিনাদে পরিপূর্ণ দেশ-প্রদেশ, অগণ্য অসংখ্য লোকের একত্র বিরাট সম্মিলন,—এ সকলই সুন্দর! শত শত সাম্রাজ্য, সাম্রাজ্যে শত শত শাসনপ্রণালী, শাসনে বিচার, বিচারে ন্যায়,—রাজার প্রজা-বাৎসল্য, প্রজার রাজভক্তি, শিল্পবাণিজ্যে দেশ উন্নত, দেশ-হিতৈষিতায় মানুষ আত্মত্যাগী, ধর্ম্মে বিজ্ঞানে সাহিত্যে কাব্যে মানুষ অনুরক্ত,—এ সকলই সুন্দর! সর্ব্বত্রই প্রেম, প্রেমে প্রতিদান, প্রতিদানে আত্মবিসর্জ্জন; সর্ব্বত্রই সখ্য ও প্রীতি, ভক্তি ও দয়া, ধর্ম্ম ও দান;—এ সকলই সুন্দর! এই এমনই সৌন্দর্য্যের হাটে থাকিয়া কিছুই কুৎসিত দেখিতাম না। চক্ষু যাহা দেখিত, তাহাই সুন্দর; হৃদয় যাহা পাইত, তাহাই সুন্দর; একটা সৌন্দর্য্যের নেশায় মাতোয়ারা ছিলাম। বাহ্য-জগতে অন্তরের প্রতিকৃতি দেখিতাম। যদি হাসিতে হাসিতে চাহিতাম, দেখিতাম, সমগ্র জগতে সেই হাসির ধারা প্রবাহিত হইয়াছে,—পর্ব্বতে পর্ব্বতে, নদীর তরঙ্গে তরঙ্গে, সেই হাসির লহরী ছুটিয়াছে! যদি কাঁদিতাম,—অশ্রুপূর্ণ নয়নে দেখিতাম, সর্ব্বত্রই বিষাদের চিহ্ন দেদীপ্যমান! তখন অন্তরে বাহিরে কি একটা মহাযোগ ছিল! আজি সে যোগ ভঙ্গ হইয়াছে; তাই সে হাস্যময়ী, করুণাময়ী, শোভাময়ী পৃথিবী আমি আর দেখিতে পাই না! তাই এ মৃন্ময় আধারে সে চিন্ময়ী মূর্ত্তি আর দেখিতে পাই না!

অন্তর্জ্জগত ও বাহ্য-জগতের মাঝে একটা সেতু ছিল, তাহা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, তাই উভয়ে আজ এত পৃথক হইয়া পড়িয়াছি! পার্থক্য এতদূর বাড়িয়াছে যে, উভয়ে যেন উভয়ের একান্ত অপরিচিত হইয়া দাঁড়াইয়াছি! সেই সূর্য্য, সেই চন্দ্র, সেই বৃক্ষ, সেই লতা, সেই গিরি, সেই নদী, সেই হাসি, সেই গান,—সেই সবই, কিন্তু সেই অন্তর আর নাই; যে চক্ষে সে সকলই সুন্দর দেখিতাম, সে চক্ষু আর নাই; যে সৌন্দর্য্যে আত্মহারা হইতাম, সে সৌন্দর্য্য-বোধ আর নাই!

বিশ্বাস চলিয়া গিয়াছে; সারল্য অন্তর্হিত হইয়াছে; ভক্তি বিশুষ্ক হইয়াছে;—সেতু ভাঙ্গিয়াছে!

দরিয়ায় আজি তুমুল-তুফান! হু-হু-হু-হু বাতাস বহিতেছে;—হৃদয় আলোড়িত, উৎক্ষিপ্ত, উন্মথিত করিয়া তরঙ্গ ছুটিয়াছে!

প্রাণ আজি ভক্তিশূন্য, বিশ্বাসহীন!

এমন দুরবস্থায় আজি যাহা দেখিতেছি, তাহাই কুৎসিত! অন্তর কাঁদিয়া উঠিতেছে, করুণাময়ী সে প্রকৃতি আজি কৈ? সে জড়-প্রকৃতি, অনায়াসে হাস্য করিতেছে! ভক্তি, প্রীতি, শান্তি—সকলই গিয়াছে; অনাবৃত-দেহে কঠিন নির্ম্মম নিষ্ঠুর সংসারে সংগ্রাম করিতেছি!

সেদিনের কথা আজি মনে পড়িতেছে। এই পৃথিবীকে তখন কত মমতাময়ী দেখিয়াছি! প্রতি রজনী জ্যোৎস্নাময়ী, প্রতি পাদপে পুষ্প, প্রতি নরমস্তিষ্কে প্রতিভা-কণা, প্রতি রমণী-হৃদয়ে নির্ম্মল প্রেম,—এমনই সর্ব্বত্র দেখিয়াছি। প্রতি হৃদয়ে দয়া, প্রেম, ভক্তি ও বিশ্বাস, প্রতি আঁখিতে প্রীতি ও করুণা, প্রতি মানবে ধর্ম্ম ও আত্ম-বিসর্জ্জন,—এমনই সর্ব্বত্র বিশ্বাস করিয়াছি। আজি সে সকল কোথায় অদৃশ্য হইল?

সেই যে জ্ঞানতৃষ্ণা—সমগ্র পৃথিবী বেষ্টন

করিয়া, আকাশ-পাতাল অতিক্রম করিতে প্রয়াস পাইত; সেই যে বিশ্বাস—এ ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ হৃদয়-পিঞ্জরে সেই অনন্ত মহাপুরুষকেও আবদ্ধ করিতে পারিত; সেই যে বাসনা—ধর্ম্মাত্মা উশীনরের ন্যায় পরোপকার-ব্রতে আত্মবিসর্জ্জন করিত; সেই যে আকাঙ্ক্ষা—আত্ম-পরিবারের ক্ষুদ্র গণ্ডীতে পূর্ণ না করিয়া, উদার-প্রেমে সমগ্র জগৎ আপনার করিত; সেই যে আশা—গভীর উদ্দীপনায় তেজোহীনা মাতৃ-ভাষা পূর্ণ করিয়া, সুসভ্য জগৎ স্তম্ভিত করিত;—সে আশা, সে সাধ, সে বাসনা, সে বিশ্বাস—আজি কোথায় অন্তর্হিত হইল?

সে দিন গিয়াছে। সে আশা, ভরসা, উল্লাস—সে সকলের দিন গিয়াছে। তখন শিক্ষার অবস্থামাত্র, এখন কার্য্যক্ষেত্রে নামিয়াছি!

তখন স্বপ্ন, এখন জাগরণ!

কিন্তু এমন নিরাভরণে জাগিতে হইল কেন? অর্দ্ধপথে আসিতে-না-আসিতে দস্যুর ন্যায় হৃদয়ের সকল আবরণ কাড়িয়া লইয়া, সংসার আপনার পথে ডাকিয়া লইল! কণ্টক-শূন্য বৃন্তচ্যুত কুসুমের উপর দাঁড়াইয়া, সৌন্দর্য্যের হাটে কি অপূর্ব্ব শোভা দেখিতেছিলাম,—আজি সহসা অনাবৃত সংসারক্ষেত্রে নামিতে হইয়াছে!

কাব্য-চক্ষু মুদ্রিত হইল। বাহিরের এই চর্ম্মচক্ষে দেখিলাম, সংসার অন্যরূপ! চারিদিক্ হইতে শত অভাবের কোলাহল শুনিলাম, কাব্যের তন্ত্রাটুকু নিমেষে টুটিয়া গেল!

নয়নে অশ্রু বহিল না, কেবল বিস্ময়ে সংসার-পানে তাকাইয়া ভাবিলাম,—"সেই স্বপ্ন, ইহাই জাগরণ! হায়, সেই স্বপ্ন সত্য হইয়া, এই জাগরণ মিথ্যা হইল না কেন?"

শত অভাবের কোলাহল শুনিয়া, সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলাম। কে জানিত, এ জীবনব্যাপী-সংগ্রামে চিরদিনই পরাজিত হইতে হইবে? কে জানিত, সংসার-সমুদ্র এত ভয়ঙ্কর তরঙ্গ-তুফান উঠিতে পারে? ডুবিতেছি—ডুবিতেছি—অনবরত ডুবিতেছি, মাথা তুলিয়া উঠিতে পারিতেছি না! এতটুকু দয়া-মায়া কোথাও নাই, এতটুকু বিচারও কোথাও নাই! সারাটা জীবনব্যাপী কঠিন সংগ্রাম! সংগ্রামে জয়-পরাজয় উভয়ই বিধি, কিন্তু এ পোড়া অদৃষ্টে সর্ব্বত্রই পরাজয়!

সংগ্রামের উদ্দেশ্য কি? কেবল অভাব-মোচন। কিন্তু কোন অভাব দূর হইল না, সংগ্রামে ক্ষত-বিক্ষত, নিষ্পেষিত ও মৃতপ্রায় হইতেছি! স্বার্থান্ধ সংসারে এতটুকু সমবেদনা নাই, এতটুকু উৎসাহ নাই, এতটুকু স্নেহ নাই! ধর্ম্ম কৈ?—বিচার কৈ?—ন্যায় কৈ? এ সংগ্রাম যদি এত কঠিন, তবে সে প্রাণপণ শক্তি-সামর্থ্য পাইলাম না কেন? নর-হৃদয়ে সে দয়া-ধর্ম্ম কিছুই নাই, নারী-হৃদয়ে সে স্নেহ-করুণা কিছুই নাই, পৃথিবীর বুকে সে আশা-উৎসাহ কিছুই নাই!

মহাপাপী আমি,—মনের এই অবস্থায় মনে হয়, কে বলে এ পৃথিবী দেবতার লীলা-ভূমি? দেবতা! দেবতা—মূর্খের ভরসা, কর্ত্তব্য—অর্থহীন অসার বাক্য মাত্র, ধর্ম্ম—প্রতারণার প্রতিবাক্য! স্বার্থ—দেবতা, আত্মসুখ—কর্ত্তব্য, পরপীড়ন—ধর্ম্ম! এখানে গুণের আদর নাই, ধর্ম্মের পূজা নাই, প্রেমের প্রতিদান নাই,—আছে রসনাগত ঈশ্বরে ভক্তি, মানবে প্রীতি!

তুমি গৃহ-ত্যাগী বনবাসী টাইমন! আজি তোমার কথা স্মৃতি মাঝে জাগিতেছে! স্বপ্নের মোহে, তুমি মনুষ্য-হৃদয় দেবতার মন্দির ভাবিয়াছিলে, স্বপ্নের অবসানে তাহা পিশাচের আবাস জানিয়া লোকালয় ত্যাগ করিয়াছিলে! আমি কেবল লোকালয় নহে, এ পৃথিবী ত্যাগ করিয়া লুকাইতে চাই!

বিশ্বাস গিয়াছে, ধর্ম্ম-জ্ঞান তিরোহিত হইয়াছে, ভক্তি হারাইয়াছি; শান্তি—জীবনের আধার, প্রাণের প্রধান অবলম্বন,—তাহাও গিয়াছে! অভাব দূর করিতে আসিয়া, যাহার অভাব ছিল না, তাহাও হারাইলাম! ভক্তি, প্রীতি, শান্তি—সকলই গেল, রহিল কি? রাখিলাম কি?

তবে মরি না কেন? কি সুখে বাঁচিয়া থাকিব? সুখ! সে ত মিথ্যা কল্পনা! বাঁচিয়া থাকিয়া করিলাম কি, করিতেছি কি এবং করিব কি? এই যে জীবন-ধারণ, ইহাই কি মৃত্যু নহে? তবে প্রকৃত মরণে সুখ আছে, জ্বালা জুড়াইবে!

পৃথিবীর আলো দেখিতে পারি না, অন্যের সুখ অসহ্য, সর্ব্বত্রই অবিচার,—মনের এখন এই চিন্তা, এই অবস্থা! কিছুতেই আর তৃপ্তি নাই, আসক্তি নাই, মায়া নাই! কোন রকমে দিন কয়টা ফুরাইলেই যেন বাঁচি! প্রতি মুহূর্ত্তেই সেই শেষ মুহূর্ত্তের প্রতীক্ষা করিতেছি!

হায় মানব-জীবন! কয়টা দিনের সমষ্টি মাত্রেই তুমি গঠিত?

কবির অপূর্ব্ব-সৃষ্টি, ভাবময়ী তুমি শকুন্তলা! সেই মালিনী-নদী-তীরে, সেই আশ্রমদ্বারে দুষ্মন্তময়ী হইয়া আপনায় আপনি ডুবিয়া গিয়াছ, ক্রোধোন্মত্ত দুর্ব্বাসার অভিশাপ তোমার কর্ণে প্রবেশ করিল না! সেই বজ্র-গম্ভীর স্বরে বুঝি ব্রহ্মাণ্ডও বিদীর্ণ হইয়া গেল, আর তুমি তখনও অন্তরের অন্তরে বিলীন হইয়া প্রিয়-চিন্তায় আত্মহারা!—তোমার সেই মূর্ত্তি আজিও আমার অন্তরে জাগিতেছে! কিন্তু আর তেমন 'নিতুই নব' উল্লাসে তোমার সে 'নিতুই নব' সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে প্লাই না! মন্দভাগিনী দেস্‌দিমনা! মনে পড়ে, সেই প্রথম দিন যখন তোমার কাহিনী পড়িয়াছিলাম, কি ভীষণ দুঃখে অভিভূত হইয়াছিলাম! বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল, কাঁদিতেও পারিলাম না! আজিও তোমার অদৃষ্টের কথা ভুলি নাই; কিন্তু জীবন-সংগ্রামে পড়িয়া আর তোমাদের কথা ভাবিবার বড় অবসর পাই না! উন্মত্ত লিয়র! দুর্ভাগ্য হ্যামলেট্! মহাপাপী ম্যাক্-বেথ! এ জীবনের উপর তোমরা একদিন কি রহস্য অভিনয়ই করিয়াছ! হায়, আজি সে হৃদয় আর আমার নাই! জয়দেবের সেই "ললিতলবঙ্গলতা," শেলির সেই করুণ গীতি,—কিন্তু কেন আর সে সকল স্মরণ করি? সেই দর্শন শাস্ত্র, পড়িতে পড়িতে মনে হইত,—

"How charming is divine philosophy!
Not harsh and crabbed, as dull fools suppose;
But musical as is Apollo's lute,
And a perpetual feast of nectared sweets,
Where no crude surfeit reigns."——

পড়িতে পড়িতে মনে হইত, সত্যের যতই সন্ধান পাইব, আরও ছুটিব, কিন্তু সত্য একেবারে করতলগত করা হইবে না। বালকে যেমন পক্ষী লইয়া ক্রীড়া করে,—কখন ছাড়িয়া দেয়, ছাড়িয়া দিয়া আবার ধরিতে যায়, সেই ধরিবার চেষ্টাতেই তাহার কত আনন্দ, কত উৎসাহ!—আমিও তেমনি ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য-পালনের ভিতর দিয়া তাঁহাকে ধরিব,—একেবারে ধরিব না, ধরা দিলেও ধরিতে চাহিব না, কেবল পিছু পিছু ছুটিয়া জন্ম জন্ম তাঁহাকে ধরিতে থাকিব! —সেই আকাঙ্ক্ষা, সরল প্রাণের সেই সরল বিশ্বাস—হায়! সকলই আজ গিয়াছে!

কিন্তু এতটা হাহাকারের কারণ কি? সত্যই যদি সেই অবস্থা স্বপ্ন হয় এবং এই জাগরণের অবস্থাতেই এমন কঠিন সংগ্রামে, এমন জীবন-ব্যাপী সংগ্রামে লিপ্ত হইতে হয়, তাহাতে

ক্ষতি কি? মানস-চক্ষের উপর একটা সুন্দর আবরণ ছিল, তাহাতেই সকল সুন্দর দেখিতাম। সে মোহ-আবরণ ঘুচিয়াছে; এখন পদার্থের স্বরূপ নির্ণয় করিতেছি। যদি বুঝিলাম, পূর্ব্বে যাহা দেখিয়াছি বা ভাবিয়াছি, তাহা ভুল, তাহাতেই বা ক্ষতি কি? পূর্ব্বে যাহা অবলম্বন করিয়াছিলাম, তাহা প্রকৃত অবলম্বন নহে; মনুষ্য হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া এই সংগ্রামকেই অবলম্বন করিতে হইবে।

সংগ্রাম অবলম্ব্য হউক, ইহাতে তৃপ্তি কৈ? সকলেই সংগ্রামের মধ্যে, অথচ সকলেই কৃতী নহে; এবং সকলেই সেজন্য এমন দুর্দ্দশাগ্রস্ত নহে! যে বিশ্বাস হারাইয়াছে, দুর্দ্দশা তাহারই!

আমি বিশ্বাস হারাইয়াছি, তাই এ হাহাকার! ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে চূর্ণীকৃত হইয়াছি, অভাবের প্রবল তরঙ্গে ভাসিয়া গিয়াছি, দুঃখ-যন্ত্রণায় ব্যথিত হইয়াছি, কিন্তু তবু যদি বিশ্বাস রাখিতে পারিতাম! হাহাকার করিয়াছি, কাঁদিয়াছি, মৃত্যু আকাঙ্ক্ষা করিয়াছি,—হায়, তবু যদি বিশ্বাস রাখিতে পারিতাম! কত ঘুরিয়াছি, তৃপ্তি পাইতে কত না করিয়াছি, অবশেষে বুঝিলাম, ভগবানে বিশ্বাস ব্যতীত তৃপ্তি নাই! হায় কেন হারাইলাম! কেন ভুলিলাম!

কিরূপে বিশ্বাস হারাইলাম, বলিতে পারি না। একদিনে যায় নাই। দিনে দিনে, অতি অল্পে অল্পে এ অপার্থিব রত্ন হারাইয়াছি। জগতের সর্ব্ব পদার্থে যাঁহাকে বিদ্যমান দেখিতাম, জগতের সর্ব্বত্রই যাঁহার মঙ্গল-হস্ত প্রকাশিত দেখিতাম,—একদিনে তাঁহার প্রতি বিশ্বাস হারাই নাই, একদিনে তাঁহাকে এ মন্দির হইতে স্থানচ্যুত করি নাই! হায় এ শূন্য মন্দিরে আর কি সে দেবতা পাইব না?

যদি বিশ্বাস না হারাইতাম, এই হাহাকার, এই মর্ম্ম-কাতরতা কিছুই থাকিত না!

"—For man's well-being, Faith is properly the one thing needful; how, with it, Martyrs, otherwise weak, can cheerfully endure the shame and the cross; and without it, worldlings puke up their sick existence, by suicide, in the midst of luxury. The loss of religious Belief is the loss of everything."

বিশ্বাস গিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে ভক্তি গিয়াছে। যাঁহার প্রতি বিশ্বাস রহিল না, তাঁহার প্রতি ভক্তি থাকিবে কেন? ভক্তি-শূন্য হইয়াই জগতের সর্ব্বত্র অবিচার দেখিলাম। অশান্তিতে প্রাণ পূর্ণ হইল।

সুখ কৈ?

বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে সুখ নাই। আপনার হৃদয়ে সুখ নাই, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সুখ কোথায় পাইবে? সুখের জন্য লালায়িত হইলাম, এই প্রাণান্তপণ কঠিন সংগ্রামে সুখই লক্ষ্য,—হায়, সুখ ত মিলিল না!—

"সুখ শুধু পাওয়া যায় সুখ না চাহিলে,
প্রেম দিলে প্রেমে পূরে প্রাণ;
দিবানিশি আপনার ক্রন্দন গাহিলে,
ক্রন্দনের নাহি অবসান!"

তাই কি সুখ মিলিল না?

কিন্তু এ সুখের মূলে কি? আত্ম-প্রতিষ্ঠা।

"I asked myself: What is this that, ever since earliest years, thou hast been fretting and funning, and lamenting and self tormenting, on account of? Say it in a word: is it not because thou art not Happy? Because the Thou (sweet gentleman) is not sufficiently honoured, nourished, soft-bedded, and lovingly cared for? Foolish Soul! What Act of Lagislature was there that thou shouldst be Happy? what if thou were born and predistined not to be Happy, but to be unhappy! Art thou nothing other than a Vulture, then, that fliest through the Universe seeking after somewhat to eat; and shricking dolefully because carrion enough is not given thee?"

কেনই বা এ সংগ্রাম, কেনই বা এ হাহাকার?—সুখের জন্য। কৈ, তেমন সম্মান পাইলাম না, তেমন খ্যাতি-প্রতিপত্তি হইল না, তেমন বিলাস-বৈভব হইল না;—সুখ কৈ? হায় নির্ব্বোধ! ইহা বুঝি না যে, আমি কেন সুখী হইব? বিধাতার এমন কি বিধান আছে যে, আমি সুখী হইবই হইব! যদি সুখী না হইয়া, চিরদুঃখী ও চির-অসুখী হইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়া থাকি এবং যদি সেই ভাবে থাকিবার জন্যই এ পৃথিবীতে আসিয়া থাকি? সুখ মিলিল না বলিয়া এতই অশান্তি ভোগ করিব কেন? শকুনি, গৃধিনি, উদরের চেষ্টায় মাংসলোলুপ হইয়া ঊর্দ্ধে উড়িতে থাকে, আহার্য্য না পাইলে বিকট চীৎকারে দিক্ পূর্ণ করে;—আমিও কি তাই?

এই সুখ মনুষ্যের লক্ষ্য নহে। ধর্ম্ম হইতে যে সুখ, সেই সুখই লক্ষ্য। সংসারের তুচ্ছ সুখ ত্যাগ করিয়া, সেই মহান্ সুখের জন্য লালায়িত হইতে হইবে। সেই সুখের কথা বলিবার জন্য, কত প্রচারক, কত দার্শনিক, কত ভক্ত, কত কবির অভ্যুদয় হইয়াছে! যুগে যুগে সেই সুখের আস্বাদ চলিয়া আসিয়াছে, যুগ-যুগান্তরেও সেই সুখের আকাঙ্ক্ষা চলিতে থাকিবে!

তবে এ সংগ্রাম কিসের?

হায়, সোণার হৃদয় ভাঙ্গিয়া, মৃৎ-ভাণ্ডের আশায় হাহাকার করিতেছি! সে ধন্বন্তরি-সুধা ত্যাগ করিয়া, তুচ্ছ সুখের আকাঙ্ক্ষায় অতৃপ্তির ক্লেশ ভোগ করিতেছি!

এ বিশ্বাসহীন, ভক্তিশূন্য, অশান্ত-হৃদয়ে আবার তুমি এস। এ শূন্য-মন্দিরে আবার তুমি অধিষ্ঠিত হও।

তখন স্বপ্নের অবস্থায় ছিলাম, না জানিয়াও তোমায় জানিয়াছিলাম; আজি এ জাগ্রৎ অবস্থায়, জীবনের এ কঠিন সমস্যায়, তোমায় বুঝিতেছি, তোমার অতুল মহিমা হৃদয়ঙ্গম করিতেছি। এস তুমি ব্রহ্মাণ্ডপতি! অনন্ত অসীম হইয়াও, সান্ত ও সসীম এই ক্ষুদ্র হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হও! আবার তোমায় বিশ্বাস করি, তোমাকে বিশ্বাস করিয়া তোমায় ভক্তি করি। তুমিই সুখ ও সৌন্দর্য্য, তোমাতে ভক্তি করিয়া সর্ব্বজীবে প্রীতি করি। সেই প্রীতিনেত্রে দেখিব আবার সেই শোভা, সেই সৌন্দর্য্য! তখন স্বপ্ন-আবরণে আচ্ছাদিত থাকিয়া যাহা দেখিয়াছি, এই জাগ্রৎ অবস্থায় তদধিক শোভা-সৌন্দর্য্য দেখিব। দেখিতে দেখিতে প্রাণের আশা মিটিবে, হৃদয়ে শান্তি পাইব।

তোমাতে ভক্তি, সর্ব্বজীবে প্রীতি, হৃদয়ে শান্তি,—সে তিনের কি অপূর্ব্ব যোগ! গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী—ত্রিধারা সংমিশ্রণে যেমন পবিত্র প্রয়াগ; তেমনি ভক্তি, প্রীতি ও শান্তি—তিন মিলিয়া আমার হৃদয় পবিত্র হইবে; এই পবিত্র হৃদয়ে, পরম পবিত্র তোমাকে দেখিয়া আমি কৃতার্থ হইব।

ঝটিকা থামাইয়া দাও। দরিয়ার এ মহা তুফান শান্ত হউক!

শ্রীবিপিনবিহারী রক্ষিত।

শ্রীরাধার মান।

(সখীর উক্তি)

না পূরল শ্যামক প্রেম-পিয়াসা
বিতল মধু যামিনী
বিনু কান্ত অভিমানী
কিশোরী রাধিকা বিরহ কাতরা
হৃদয়-অম্বরে ঝাঁপল নিরাশা,
না পূরল শ্যামক প্রেম-পিয়াসা। ১

বিফল সকল সাধ সরস বেশ
বিফল রচল ললিত কুসুম কেশ
বিফল নীল চিরা চন্দন সুবাসা
বিফল রসরাজ সঙ্গ-রস-আশা,
না পূরল শ্যামক প্রেম-পিয়াসা। ২

ঝুঠে ঝুঠে বিসরল গেহ ধরম কাজ
ঝুঠে ঝুঠে বিসরল গুরুগঞ্জন লাজ
ঝুঠে ঝুঠে ছুটল কুঞ্জকানন-গহনে
ঝুঠে ঝুঠে ফুটল কুশ-অঙ্কুর চরণে
ঝুঠে ঝুঠে পিউ-পিউ পাপিয়া ফুকারল
ঝুঠে ঝুঠে গুন্ গুন্ ভঁওরা বাতাওল
শুধ সাঁচ ভেল কল-কোকিল "কু"রব দারুণ ভাষা,
না পূরল শ্যামক প্রেম-পিয়াসা। ৩

বৃথা কুসুমমালা দোলাওল রে কুঞ্জতলে
বৃথা শেষ বিছাওল রে কোমল কমল-দলে
বৃথা ব্রজবালা-দল বহুল রে বাসিত হেমঝারি
বৃথা বিনাওল বনমালা রে মুনি-মন-হারী
বৃথা ভেল বিচিত্র বকুল ব্যজন সুরভি বাসা,
না পূরল শ্যামক প্রেম-পিয়াসা। ৪

নট নবনীরস গোরস কি কটরা
নট বিফল রসাল-ফল মধুর বটোরা
নট সখীগণ নিধুবন বিহারিণী সাজ
নট কণ্ঠস্বর বিগড়ল মুরলী আওয়াজ
নট বংশীবট টুটল নিপট সুন্দর শোহা
নট নাগর বিনু বিকট বিষাদিত বনগেহা
চাঁদিনী ঝারা
জনু আঁধিয়ারা
বন-বন ফিরত ছিপি ছিপি বিরহ উছাসা,
না পূরল শ্যামক প্রেম-পিয়াসা। ৫

বপু বাত বিধুত বেতসা
ভেল চঞ্চল চারু চেতসা
বেড়ল হৃদয়-বারিদে বদন-শারদ-ইন্দু
ঝরহু চপলা-চকিত-লোচনে জীবনবিন্দু
মানসকাননে ঘনশ্যাম ঘনিত হুতাশা,
না পূরল শ্যামক প্রেম-পিয়াসা। ৬

বসন্ত-ঝটিকা জনু রোষে তোড়ল ফুল দল মাল
দূরে দূরে ফেলল মানিনী কবরী কুসুম-জাল
লম্বিত-বেণীব্যাল শীরষি গরাসা
অবিরত বহত হলাহল জীবন নাশা,
না পূরল শ্যামক প্রেম-পিয়াসা। ৭

পীন ভুনো মন্দর কুচ বৈঠল হৃদি চাপি
অসম্হার ভারে জীয়া উঠত কাঁপি কাঁপি
মদন দাবানল দহত মেদুর মৃদু দেহ
ভুজ অঙ্গে বিখল ভুজঙ্গ-কাল করল গেহ
একেলা কামিনী কোমলা কেইসে সম্হারে
ক্ষণে অচেতন ক্ষণে হরি চরণ সোঁয়ারে
ক্ষণ বিসরণ উন্মাদন ক্ষণ কাতর হাঁসা,
না পূরল শ্যামক প্রেম-পিয়াসা। ৮

শ্রী——বাঁট।



মেসার্ ফর্ মেসার্।

(১)

ভিয়েনা নগরে এক রাজা ছিলেন। তিনি অত্যন্ত শান্ত-স্বভাব ও কোমল-প্রকৃতি-বশতঃ প্রজাবর্গকে প্রায়ই কোন কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত করিতেন না। সেইজন্য তাহারাও সময়ে সময়ে রাজনীতি অবজ্ঞাপূর্ব্বক যথেচ্ছ কার্য্যে সাহসী হইত। সেই দেশের দণ্ডবিধি শাস্ত্রে এমন আজ্ঞা প্রচলিত ছিল যে, যে-কেহ আপনার ভার্য্যা ব্যতীত অপরিণীতা কোন কুমারী কিংবা অন্যের পরিণীতা ভার্য্যা, কিংবা অন্য কোন রমণীতে আসক্ত হইবে,—সেই ব্যভিচারী ব্যক্তির প্রাণদণ্ড হইবে। কিন্তু এ বিধি অনেক-কাল উপেক্ষিত থাকায়, অনেকেই সে রাজবিধি অবহেলা করিত। রাজা নিতান্ত নিরীহ-প্রকৃতি,—এ সকল দেখিয়াও, দণ্ডবিধি শাস্ত্রের সে কঠোর নীতির পরিচালনা করিতেন না।

ক্রমে অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিল। পরিণয়-সংস্কারের পবিত্র-প্রথা তিরোহিত হইতে লাগিল; যাহার যাহাকে মনে ধরিত, সেই তাহাকে লইয়া থাকিত। নগরবাসী ব্যক্তিগণ রাজদ্বারে অভিযোগের পর অভিযোগ আনয়ন করিতে লাগিল,—"মহারাজ! আমাদিগের কন্যাগণকে কৌশলে ভুলাইয়া, দুষ্টব্যক্তিগণ তাহাদিগকে কুলের বাহির করিয়াছে।"

প্রজাদিগকে এইরূপ দুর্নীতি-পরায়ণ দেখিয়া রাজা নিতান্ত ব্যথিত হইলেন। মনে মনে ভাবিলেন, "এতদিন যথেষ্ট প্রশ্রয় দিয়া আসিয়াছি, আজি যদি সহসা কঠোর দণ্ডবিধির কঠোর আইন প্রচলন করি, তবে আমাতে এ হঠাৎ পরিবর্ত্তন দেখিয়া প্রজারা আমাকে নিষ্ঠুর ভাবিতে পারে। অতএব, আমি কিছু-দিন স্থানান্তরে চলিয়া যাই; এ রাজ্যভার আর কাহারও হস্তে সমর্পণ করিব, সেই ব্যক্তি এই দুর্ব্বিনীত দুষ্টাচারদিগকে শাস্তি দিবার জন্য সেই কঠোর নীতির প্রচলন করিবে, তাহা হইলে আমাতে কোন কলঙ্ক স্পর্শিবে না।"

সেই নগরে এঞ্জিলো নামক এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি অতি সাধুচরিত্র ও বিশিষ্ট ন্যায়পরায়ণ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। রাজা, আপন রাজ্যভার সমর্পণ করিবার জন্য এই ব্যক্তিকেই মনোনীত করিলেন। অনন্তর মন্ত্রীর অভিমত জিজ্ঞাসা করিলেন। মন্ত্রী এস্কেলাসও রাজার মস্তে মত দিয়া বলিলেন,—"মহারাজ, সুন্দর বিবেচনা করিয়াছেন। যদি আমাদের এ ভিয়েনা নগরে এ মহা সম্মান-লাভের উপযুক্ত পাত্র কেহ থাকে, তবে লর্ড এঞ্জিলোকেই দেখিতে পাই।"

তখন রাজা, লর্ড এঞ্জিলোকে আপন প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া, পোলাণ্ড ভ্রমণের কথা রাষ্ট্রপূর্ব্বক, ভিয়েনা হইতে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু বস্তুতঃ প্রবাস পর্য্যটন রাজার অভিমত ছিল না। সাধুচরিত্র এঞ্জিলো কিরূপে রাজ-কার্য্য নির্ব্বাহ করেন, তাহা দেখিবার জন্য তিনি সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিয়া ভিয়েনা নগরেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

(২)

নূতন রাজ-প্রতিনিধির পদ প্রাপ্ত হইয়া, লর্ড এঞ্জিলো যে দিবস বিচার-আসনে অধিষ্ঠিত হইলেন, সেই দিবসই ক্লডিওনামক এক সম্ভ্রান্ত যুবক কোন উচ্চবংশীয় এক অনূঢ়া কুমারীকে তাহার পিতৃ-ভবন হইতে ভুলাইয়া ব্যভিচার-দোষে কলঙ্কিত করে। এইরূপ ব্যভিচার অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া, ক্লডিও রাজদ্বারে নীত হইলেন, এবং লর্ড এঞ্জিলোর আদেশ-ক্রমে কারাগারে রুদ্ধ হইলেন। পরে সেই

বহুদিন-উপেক্ষিত প্রাচীন আইন অনুসারে, ক্লডিওর প্রাণদণ্ডের আদেশ হইল।

ক্লডিও যাহাতে এ দারুণ দণ্ড হইতে অব্যাহতি পান, অনেকেই সে চেষ্টা করিলেন। অধিক কি, রাজমন্ত্রী এস্‌কেলাস্‌ও হতভাগ্য ক্লডিওর পক্ষ অবলম্বন করিয়া লর্ড এঞ্জিলোকে বলিলেন,—"এই যুবকটীর যাহাতে প্রাণদণ্ড না হয়, এমন বিধান করুন। ইহাঁর পিতা অতি মহাশয় ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহারই কথা স্মরণ করিয়া ইহাঁকে ক্ষমা করিতে আমি প্রার্থনা করিতেছি।"

এঞ্জিলো। আমি আপনার কথা রক্ষা করিতে পারিলাম না। দণ্ডনীতি-শাস্ত্র কেবল ভয় প্রদর্শনের জন্য নহে, উহার যথাবিধি প্রচলন হওয়া চাই, নহিলে লোকে কিছুদিন পরে আর ভয় করিবে না। ক্লডিওর প্রাণদণ্ড অবশ্যই ঘটিবে।

লুসিও নামক এক যুবক ক্লডিওর বন্ধু ছিলেন। লুসিও কারাগারে যাইয়া বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। ক্লডিও তাঁহাকে বলিলেন,—"লুসিও, আমার একটী উপকার তোমায় করিতে হইবে। চিরকুমারীগণের যে আশ্রম আছে, তাহা তুমি জান; আমার ভগিনী ইজাবেল্ অদ্য সেখানে গিয়াছেন, এবং শুনিয়াছি, সত্বরই তিনি চির-কুমারী-ব্রত অবলম্বন করিবেন। আমার এই বিপদের কথা তাঁহাকে জানাইবে। ইজাবেল্ স্বয়ং আমার প্রাণরক্ষার জন্য লর্ড এঞ্জিলোকে অনুরোধ করিবেন। আমার বিশ্বাস হয়, ইহাতে কার্য্যসিদ্ধি হইবে। কারণ, আমার ভগিনী অতি মধুর বাক্য-কৌশলে লোকের মন দ্রব করিতে পারেন; আরও সেই মলিন মুখখানি হইতে বিষাদপূর্ণ অনুরোধ শুনিলে সহজেই মনুষ্যের মনে দয়ার সঞ্চার হইয়া থাকে।"

লুসিও তৎক্ষণাৎ ইজাবেলের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য সেই চিরকুমারীগণের আশ্রমে প্রস্থান করিলেন।

---

(৩)

ক্লডিওর ভগিনী ইজাবেল্ সেই দিবস কুমারী-আশ্রমে প্রবেশ করিয়াছিলেন, কিন্তু তখন পর্য্যন্তও কুমারী-ব্রত অবলম্বন করেন নাই। ইজাবেল্ সেই আশ্রমের ব্রতধারিণী এক কুমারীর নিকট বসিয়া, কুমারী-ব্রতের নিয়মাদি জানিতেছিলেন; সেই সময় শুনিলেন, বাহিরে কে যেন বলিতেছে,—"এই আশ্রমের মঙ্গল হউক!"

ইজাবেল্। কে কথা কহিতেছে?

ব্রত-ধারিণী কুমারী। পুরুষের কণ্ঠস্বর বোধ হইতেছে। সুশীলে ইজাবেল্! তুমি যাইয়া জানিয়া এস, এ ব্যক্তির প্রয়োজন কি? তুমি এখনও যাইতে পার, এবং পুরুষের সহিত কথা কহিতে পার, আমি পারি না। তুমিও যখন ব্রত অবলম্বন করিবে, তখন তোমারও এ অধিকার থাকিবে না। আবশ্যক হইলে, আমাদের কর্ত্রীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া অবগুণ্ঠনে মুখ আবৃত করিয়া কথা কহিতে হইবে। কিন্তু যদি মুখ দেখাও, ত কথা কহিতে পারিবে না; আর যদি কথা কও, ত মুখ দেখাইতে পারিবে না।

ইজাবেল্। আপনাদিগের ইহার অধিক কি আর কিছু অধিকার নাই?

কুমারী। কেন, ইহাই কি যথেষ্ট নহে?

ইজাবেল্। যথেষ্ট বটে; আমি আর অধিক অধিকার ইচ্ছা করি না; বরং আমার ইচ্ছা, ইহা অপেক্ষাও নিয়ম কঠিন হউক।

বাহিরে পুনর্ব্বার সেই স্বর-ধ্বনিত হইল,—"এই আশ্রমের মঙ্গল হউক।"

কুমারী। পুনর্ব্বার সেই ব্যক্তি ডাকিতেছে। ইজাবেল্! তুমি উত্তর দাও।

তখন ইজাবেল্ গৃহ হইতে বাহির হইয়া আগন্তুকের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি কে? কি নিমিত্ত এখানে আসিয়াছেন?"

লুসিও সম্মান-অভ্যর্থনা করিয়া বলিলেন,—"কুমারি! আপনার এই গোলাপ-নিন্দিত রক্তিম মুখমণ্ডলে বুঝিতেছি, আপনি কুমারী। এই আশ্রমে হতভাগ্য ক্লডিওর নবাগতা ভগিনী ইজাবেলের সহিত আমায় দেখা করাইয়া দিতে পারেন কি?"

ইজাবেল্। হতভাগ্য ক্লডিও কেন এরূপ বলিলেন, আমাকে বলুন,—আমিই তাঁহার ভগিনী ইজাবেল্।

লুসিও। সুশীলে! তোমার ভ্রাতা আজি কারাগারে আবদ্ধ, আমা দ্বারা তোমাকে মঙ্গল-আশীর্ব্বাদ জানাইয়া এ সংবাদ পাঠাইয়াছেন।

ইজাবেল্। কি সর্ব্বনাশ! কেন, কি অপরাধে তিনি কারাগারে?

লুসিও। তিনি এক কুল-কুমারীকে হরণ করিয়া, ব্যভিচার অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া, কারাবদ্ধ হইয়াছেন।

ইজাবেল্। আমার বোধ হইতেছে, সে কুমারী আমার সহোদরা সদৃশী জুলিয়েট!

জুলিয়েট ইজাবেলের ভগিনী নহেন; তবে পরস্পরে যখন একত্রে বিদ্যাশিক্ষা করিতেন, উভয়ের প্রতি উভয়ের স্নেহ-মমতা থাকা প্রযুক্ত, সেই অবধি 'ভগিনী' সম্বোধন করিতেন। ইজাবেল্ জানিতেন, জুলিয়েট তাঁহার ভ্রাতা ক্লডিওর অনুরাগিণী।

লুসিও। তোমার অনুমান সত্য; সে কুমারীর নাম জুলিয়েট বটে।

ইজাবেল্। তবে ত ভালই হইয়াছে। আমার ভ্রাতা কেন তাঁহাকে বিবাহ করুন না? সকল গোলযোগ মিটিয়া যাইবে।

লুসিও। ক্লডিও আনন্দের সহিত এ বিবাহ করিতে পারিতেন, কিন্তু লর্ড এঞ্জিলোর আদেশে ক্লডিওর প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইয়াছে! এখন তোমারই উপর তাঁহার জীবন নির্ভর করিতেছে। যদি তুমি এঞ্জিলোর নিকট যাইয়া, মধুর বচনে, কাতর-প্রার্থনায় তাঁহাকে আর্দ্র করিতে পার, তবেই তোমার ভ্রাতা এ কঠোর দণ্ডাজ্ঞা হইতে রক্ষা পাইতে পারেন। এই কথা বলিবার জন্যই আমি তোমার নিকট আসিয়াছি।

ইজাবেল্। আমার এমন কি সাধ্য আছে যে, আমি লর্ড এঞ্জিলোর মন আর্দ্র করিতে পারি? হায়! আমি কি ভ্রাতাকে রক্ষা করিতে পারিব?

লুসিও। সন্দেহ করিও না,—এই সন্দেহ বড় অনিষ্টের মূল! দেখ, সাহসে ভর করিয়া যে কার্য্যে শুভফল পাইতে পারি, 'পারিব কি না' এইরূপ সন্দেহ করিয়া, তাহাতে আমরা সফলকাম হইতে পারি না। যাও, এঞ্জিলোর নিকট যাইয়া, ভ্রাতার প্রাণরক্ষার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা কর। পবিত্র-প্রতিমা কুমারীরা যখন নতজানু হইয়া, কাতর প্রার্থনা জানাইতে থাকে, মানুষ তখন দেবতার ন্যায় মুক্তহস্তে প্রার্থনা পূর্ণ করেন।

ইজাবেল্। দেখি, কতদূর করিতে পারি। এই আশ্রমের কর্ত্রীকে এ বিষয় জানাইতে হইবে, পরে লর্ড এঞ্জিলোর নিকট যাইব। আপনি আমার ভ্রাতাকে বলিবেন, অদ্য রাত্রেই আমি তাঁহাকে সংবাদ পাঠাইব।

লুসিও প্রস্থান করিলেন।

---

(৪)

ইজাবেল্ শীঘ্রই রাজভবনে উপস্থিত হইলেন এবং লর্ড এঞ্জিলোর সম্মুখীন হইয়া, নত-

জানুতে অভিবাদনপূর্ব্বক বলিলেন,—"ধর্ম্মাবতার! এ অধিনী কিছু প্রার্থনা করিতে আসিয়াছে। যদি অনুমতি হয়, তবে নিবেদন করে।"

এঞ্জিলো। তোমার প্রার্থনা কি, তাহা বল।

ইজাবেল্ তখন কাতর-বচনে ভ্রাতার জীবন ভিক্ষা করিলেন।

এঞ্জিলো। কুমারি! তাহা হইতে পারে না। তোমার ভ্রাতার প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছে, আর উপায় নাই।

ইজাবেল্। এ বিধি ন্যায্য হইলেও বড় কঠোর! ভ্রাতাকে তবে আর পাইব না!—ঈশ্বর আপনাকে কুশলে রাখুন!

ইজাবেল্ প্রস্থানোদ্যত হইলেন।

কিন্তু লুসিও ইজাবেলের সঙ্গে সঙ্গে রাজ-ভবনে গিয়াছিলেন; ইজাবেল্‌কে এইরূপে ফিরিতে দেখিয়া নিভৃতে বলিলেন,—"একি! এখনই প্রস্থান করিতেছ? যাও—আবার যাও, কাতরতার সহিত প্রার্থনা কর, নতজানু হইয়া,—চাই কি চরণে ধরিয়াও ভ্রাতার জীবন-ভিক্ষা কর! এই কি তোমার প্রার্থনা করিবার রীতি? মানুষ যে, একটী অতি ক্ষুদ্র বিষয়ের প্রার্থী হইলেও, এতদপেক্ষা অধিক আগ্রহ দেখাইয়া থাকে!"

তখন ইজাবেল্ আবার ফিরিলেন, পুনরায় নতজানু হইয়া, ভ্রাতার জীবনের জন্য বিশিষ্টরূপ প্রার্থনা করিলেন।

এঞ্জিলো। যাহা আদেশ হইয়াছে, তাহা হইবেই, আর প্রার্থনায় ফল নাই।

ইজাবেল্। কোন উপায় নাই? কেন থাকিবে না? আমি যদি একটী কথা বলি, তাহা কি আর ফিরাইয়া লইতে পারি না? ধর্ম্মাবতার! প্রভো! ভাবিয়া দেখুন, দয়ার অধিক ধর্ম্ম নাই। রাজার মুকুট, অসীম শৌর্য্য-বীর্য্য, মহা-মহোৎসব—দয়ার সমতুল্য কিছুই নহে। দয়া করিয়া আমার প্রার্থনা পূর্ণ করুন।

এঞ্জিলো। কেন তুমি বৃথা কষ্ট পাও, গৃহে ফিরিয়া যাও।

ইজাবেল্ তবু ছাড়িলেন না, পুনঃপুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। বলিলেন,—"আমার ভ্রাতা যদি আজি আপনার পদে অধিষ্ঠিত থাকিতেন, আর আপনি যদি তাঁহারই ন্যায় স্খলিতপদ হইয়া এইরূপে অভিযুক্ত হইতেন, তিনি কখনই আপনার ন্যায় দয়াশূন্য হইতেন না। হায়! ঈশ্বর যদি আমাকে আপনার ক্ষমতা দিয়া, আপনাকে ইজাবেল্ করিতেন, তাহা হইলে কি আপনি এইরূপে প্রত্যাখ্যাত হইতেন? কখনই না। বিচারক ও বন্দী, উভয়ের মনোভাব আপনাকে বুঝাইয়া দিয়া দেখাইতাম যে, বন্দীর প্রতি বিচারকের মন কিরূপ হওয়া উচিত!"

এঞ্জিলো। কুমারি! বৃথা এত কাতরতা দেখাইতেছ! দেখ আমি কি করিতে পারি? আমি তোমার ভ্রাতার দণ্ডদাতা নহি, এই দেশের আইনই তাহার দণ্ডদাতা! যদি এই অপরাধী ব্যক্তি তোমার ভ্রাতা না হইয়া, আমার কোন পরমাত্মীয় হইত, তাহা হইলেও তাহাকে এইদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইত। সে আমার ভ্রাতা, অধিক কি শোণিত-তুল্য পুত্র হইলেও তাহাকে অব্যাহতি দিতে পারিতাম না। অতএব কল্যই তোমার ভ্রাতার প্রাণদণ্ড অবশ্যম্ভাবী।

ইজাবেল্। কল্যই হইবে? রক্ষা করুন, রক্ষা করুন! হায়! এখনও যে তিনি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হন নাই! প্রভো! আমরা যে পোড়া উদরের জন্য পক্ষীগুলি বিনাশ করি, তাহারও একটা সময় অসময় আছে! আর আপনি সহসা এই একটা মানুষের প্রাণদণ্ডের আদেশ দিতেছেন? ধর্ম্মবতার! ভাবিয়া দেখুন, আমার

ভ্রাতার ন্যায় এমন অপরাধ কত ব্যক্তিই করিয়াছে, কিন্তু কাহারও এ পর্য্যন্ত প্রাণদণ্ড হয় নাই! আপনিই প্রথম এই কঠোর বিধির পরিচালনা করিতেছেন, আর আমার দুর্ভাগ্য ভ্রাতাই সর্ব্বপ্রথম এ বিধিবশে নিষ্পেষিত হইতেছেন! একবার আপনি অন্তরের সহিত বিচার করিয়া দেখুন, ভ্রাতা আমার যে অপরাধে আজি অভিযুক্ত, আপনার অন্তরেও সেইরূপ অপরাধ আছে কি না? যদি সেখানেও তেমনি অপরাধ দেখিতে পান, তবে—তবে যেন প্রভো! এ কঠোর দণ্ডের উল্লেখ আর না করেন!"

ইজাবেলের এই শেষ কথাগুলি এঞ্জিলোর মর্ম্ম স্পর্শ করিল। পূর্ব্ব হইতে কুমারীর সেই অনুপম রূপ-মাধুরী এঞ্জিলোর হৃদয়ে একটা তুমুল-তুফান তুলিয়াছিল। ধর্ম্মাবতারের হৃদয় সেই রূপ-সুধা পানে পরিতৃপ্ত হইবার জন্য অস্থির হইয়া উঠিল! যে অপরাধের জন্য হতভাগ্য ক্লডিওর আজি প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছে, অন্তরের অন্তরে লর্ড এঞ্জিলোও আজি সেই অপরাধে অপরাধী! কিন্তু আপনার সহিত সংগ্রামে পরাজয় অবশ্যম্ভাবী বোধে লর্ড এঞ্জিলো প্রলোভনকে পরিত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া, আসন পরিত্যাগ করিলেন। ইজাবেল্ তবুও ছাড়িলেন না, বলিলেন,—"ধর্ম্মাবতার! আমি আপনাকে প্রচুর পুরস্কার দিব, আমার প্রার্থনা পূর্ণ করুন।"

পুরস্কারের কথা শুনিয়া, এঞ্জিলো কিছু ক্রোধ-বিস্ময়ভরে বলিয়া উঠিলেন,—"কি, তুমি আমাকে উৎকোচের প্রলোভন দেখাইতেছ?"

ইজাবেল্। না,—আমি সে উৎকোচের কথা বলিতেছি না। আমি আপনাকে এমন পদার্থ উপহার দিব যে, স্বর্গের দেবতাগণও আপনার সহিত তাহা উপভোগ করিবেন। তুচ্ছ স্বর্ণ-রৌপ্যের উপহার লইয়া আপনি কি করিবেন? দেখুন, আমার এই জীবন, চির কৌমার্য্যে উৎসর্গ করিয়াছি; সংসার-আসক্তি-হীনা কুমারীর পবিত্র হৃদয়ের মঙ্গল-প্রার্থনা অপার্থিব ও অমূল্য বস্তু! আমি আপনাকে সেই অমূল্য বস্তু উপহার দিবার কথা বলিতেছিলাম।

এঞ্জিলো। ভাল, তুমি অদ্য প্রস্থান কর, কল্য আসিও দেখা যাইবে, কি করিতে পারি।

কিয়ৎক্ষণের জন্য যে ভ্রাতার জীবন-রক্ষা হইল, তাহাতে ইজাবেল্ অত্যন্ত সন্তুষ্টা হইলেন। এঞ্জিলো যে পুনর্ব্বার তাঁহার বিষয়ে বিবেচনা করিবেন, তাহাতে আরও অধিক আনন্দিত হইলেন। তখন আশ্বাসিত হইয়া, ইজাবেল্ রাজভবন পরিত্যাগ করিলেন, এবং বলিয়া গেলেন,—"জগদীশ্বর আপনার মঙ্গল করুন, আপনার সকল আপদ-বিপদ দূর করুন!"

এঞ্জিলো মনে মনে বলিলেন, "তাই হউক! তোমার এ রূপ-জ্যোতি হইতে যেন রক্ষা পাই! তোমার চিন্তা হইতে যেন নিস্তার পাই!"

---

(৫)

ধীরে ধীরে ধীরে সাধুচরিত্র এঞ্জিলোর হৃদয়ে একটু খানি কাল মেঘের সঞ্চার হইল! কুমারী ইজাবেলের রূপ-জ্যোতি তাঁহার হৃদয়-ভরিয়া উঠিল! এঞ্জিলো সেই মেঘের ছায়ায়, সেই রূপ-বহ্নিতে পুড়িবার জন্য পতঙ্গবৎ আত্ম-হারা হইলেন!

আবার শঙ্কা আসিল! কে বলে দুষ্প্রবৃত্তির পথে হৃদয় বড় কঠিন?

এঞ্জিলো ভাবিলেন,—"একি! কেন আমার এমন হইল? আবার তাহাকে দেখিতে, সেই চাঁদ-মুখখানি দেখিতে, তাহার সুধাপূর্ণ কথাগুলি শুনিতে, আমার কেন এ লালসা জন্মিতেছে? আমি কি তবে তাহার প্রতি অনুরক্ত হইলাম? একি স্বপ্ন দেখিতেছি

হায়! কুমারীর পুণ্য-মন্দির ভাঙ্গিয়া, আমার অপবিত্র বাসনার পরিতৃপ্তি করিতে সাধ! শত শত বার বনিতার হাব-ভাব ও লীলা-মাধুরী দেখিয়াছি, হৃদয়ে কখন এতটুকুও তরঙ্গ উঠে নাই! আর আজি এই ধর্ম্মশীলা, নির্ম্মল-হৃদয়া কুমারীর দর্শনে হৃদয় এত চঞ্চল হইয়া উঠিল! এই কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে প্রণয়োন্মত্ত কাহাকেও দেখিয়াছি ত, উপেক্ষার সহিত হাস্য করিয়াছি। আর এইক্ষণে আমার একি চিত্তবিকার জন্মিল?"

রাত্রি আর কাটিতে চায় না! হৃদয়ের এমনই বিষম অবস্থায় অতি কষ্টে এঞ্জিলো রাত্রি অতিবাহিত করিলেন। সে কষ্টের অবস্থা বুঝি কারাগারে-আবদ্ধ ক্লডিওকেও ভোগ করিতে হয় নাই।

পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে, ভিয়েনা-রাজ নগর পরিত্যাগ করেন নাই, ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া সন্ন্যাসীর সাজে সেই নগরেই অবস্থান করিতেছিলেন। সেই রাত্রে তিনি সন্ন্যাসীর বেশে কারাগারে উপস্থিত হইয়া, ক্লডিওকে নানা প্রকার তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ দিয়া তাহাকে সান্ত্বনা করিতেছিলেন। তাহাতে হতভাগা ক্লডিও কিছু শান্তিলাভ করিতেছিল। কিন্তু এঞ্জিলোর পার্শ্বে কেহ ছিল না, পাপের যন্ত্রণায় এঞ্জিলো নিতান্ত অস্থির। হৃদয়ের সে অবস্থা কেবল বুঝিবার, বুঝাইবার নহে। এঞ্জিলো কখন ভাবিলেন—"সেই রূপ! মরি মরি! সকল ভুলিয়া সেই রূপের পূজা করি! কুমারী কি আমার হইবে না?" এইরূপ, কখন সাধ হইল, "ভুলাইয়া সেই পুণ্যমূর্ত্তি দেবী-প্রতিমাকে আপনার করিয়া লই"; আবার কখন অনুতাপে প্রাণ জ্বলিয়া উঠিল;—"হায়! একি করিতেছি!" কিন্তু শেষে দুর্জ্জয় বাসনারই জয় হইল! তিনি পূর্ব্বে ইজাবেলের মুখে পুরস্কারের কথা শুনিয়া চকিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই কুমারীকে সুপথ-গামিনী করিবার জন্যই নিজে এমন পুরস্কারের লোভ দেখাইতে স্থির-সঙ্কল্প করিলেন যে, হয়ত তাহা অস্বীকার করা কুমারী ইজাবেলের পক্ষে এক প্রকার অসাধ্য হইয়া উঠিবে। তিনি মনে মনে ভাবিলেন, "কুমারী যদি আমার হয়, তাহা হইলে তাহার ভ্রাতার জীবন রক্ষা করিব। এই লোভ কি সে পরিত্যাগ করিতে পারিবে?"

পাপ-সঙ্কল্পে রাত্রি শেষ হইল।

---

(৬)

পরদিন প্রাতে ইজাবেল্ রাজভবনে উপস্থিত হইলে লর্ড এঞ্জিলো তাঁহাকে গোপনে সাক্ষাতের অভিলাষ জানাইলেন। ইজাবেল্ কথামত নিভৃতে দেখা করিলেন তখন সুযোগ বুঝিয়া এঞ্জিলো মনোভাব ব্যক্ত করিলেন। বলিলেন, "সুন্দরি! যদি তুমি তোমার এই রূপ ও যৌবন আমাকে বিকাইতে পার, তবেই তোমার ভ্রাতার জীবন রক্ষা করিতে পারি। দেখ, জুলিয়েট যেমন তোমার ভ্রাতা ক্লডিওর আনুগত্য স্বীকার করিয়াছে, আমার একান্ত অভিলাষ, তুমিও আমার নিকট সেইরূপ কর। কারণ, ইজাবেল্! আমি তোমায় বড় ভালবাসি"

কথা শুনিয়া ইজাবেলের মাথা ঘুরিয়া গেল। বিচারকের এরূপ নীচ-প্রস্তাবে তিনি মরমে মরিয়া গেলেন। কিন্তু কোনরূপ উদ্ধতভাব প্রকাশ না করিয়া, ধীরে ধীরে বলিলেন, "আমার ভ্রাতা জুলিয়েটকে এইরূপ ভালবাসিতেন, অথচ এইরূপ ভালবাসার জন্যই আপনি তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ করিয়াছেন!"

এঞ্জিলো। তা হউক; এখন ত আর তোমার ভ্রাতাকে এ আদেশ পালন করিতে হইতেছে না। দেখ, গভীর নিশীথে জুলিয়েট যেমন আত্মগোপন করিয়া পিতৃ-ভবন পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রতি রজনী ক্লডিওর সহিত যাপন করিতেন, তুমিও যদি সেইরূপ আমার সহিত ব্যবহার করিতে সম্মত হও, তবে তোমার ভ্রাতার প্রাণ রক্ষা হইবে।

এবার আর ইজাবেল্ আত্মসংযম করিতে পারিলেন না। তাঁহার অন্তরে যুগপৎ ক্রোধ, ক্ষোভ ও বিস্ময়ের আবির্ভাব হইল। যে অপরাধের জন্য তাঁহার ভ্রাতা আজি প্রাণ-দণ্ডে দণ্ডিত হইতে বসিয়াছেন,—কি আশ্চর্য্য! বিচারপতিও ধর্ম্মতঃ সেই অপরাধে অপরাধী! ইজাবেল্ স্পষ্টই বলিলেন,—"দেখুন, আপনার এ ঘৃণিত প্রস্তাব অতীব লজ্জাকর। যদি আমার ভ্রাতার পরিবর্ত্তে এ মৃত্যু-দণ্ড আমার হইত, শত বেত্রাঘাতও অমূল্য পদার্থের ন্যায় হৃদয়ে ধারণ করিতাম! কিন্তু আপনার এই অতি ঘৃণিত প্রস্তাবে সম্মত হওয়া অপেক্ষা চির-অভীপ্সিত সুখ-শয্যার ন্যায় মৃত্যু-শয্যা আমি শ্রেয়ঃ জ্ঞান করি!—না, আমার বোধ হইতেছে, ইহা আপনার অন্তরের কথা নয়। অন্ততঃ, আমার এরূপ বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হইতেছে না। আমার মনে হয়, বুঝি বা আপনি আমাকে পরীক্ষা করিতেছেন!

কিন্তু এঞ্জিলো শপথপূর্ব্বক উত্তর করিলেন, "সুন্দরি! আমি যাহা বলিয়াছি, তাহা আমার আন্তরিক কথা জানিও!"

এইরূপ যথার্থ শপথ করিতে দেখিয়া ইজাবেল্ অত্যন্ত কুপিত হইলেন; বলিলেন, "আপনাকে আর ধর্ম্মের শপথ করিয়া এ পিশাচবাসনা জানাইতে হইবে না। ধর্ম্মাবতার এঞ্জিলো! এখনও বলিতেছি, সাবধান হউন! নহিলে এ কথা লোক-সমাজে প্রচার করিয়া দিব। আমার ভ্রাতাকে এখনই ক্ষমা-পত্র লিখিয়া দিন্; নহিলে জগৎ-সমক্ষে জানাইব, ভিয়েনা-রাজপ্রতিনিধি এঞ্জিলো কি প্রকৃতির লোক!"

এঞ্জিলো। ইজাবেল্! কে তোমার কথায় বিশ্বাস করিবে? আমার অকলঙ্ক-চরিত্র, আমার জীবনের পবিত্রতা এবং ন্যায়পরতা সর্ব্বজনবিদিত; তুমি আমার চরিত্রের বিরুদ্ধে কিছু বলিলে কেহ তাহা বিশ্বাস করিবে না এবং বিশ্বাস করিলেও তাহা মুখ ফুটিয়া প্রকাশ করিতে সাহসী হইবে না। যদি ভাইকে বাঁচাইতে চাও, যাহা বলিলাম, তাহাতে সম্মত হও। নহিলে কল্যই তাহার মৃত্যু অনিবার্য্য! আর আমার সম্বন্ধে তুমি যাহা বলিতে চাও, তাহাই বলিয়া বেড়াইও,—তোমার সত্য অপেক্ষা আমার মিথ্যার গৌরব অধিক জানিও। আমার মিথ্যাই জয়লাভ করিবে। দেখ, বরং আজ তুমি এ বিষয় ভাল করিয়া বিবেচনা কর। যদি আমার প্রস্তাব সঙ্গত বোধ কর ত কল্য তাহা বলিও।

ইজাবেল্ সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

---

(৭)

"হায়, কাহাকে এ কথা জানাইব, কে-ই বা বিশ্বাস করিবে?" এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে ইজাবেল্, যেখানে তাঁহার ভ্রাতা কারারুদ্ধ ছিলেন, সেইখানে উপস্থিত হইলেন।

ইজাবেল্ দেখিলেন, তাঁহার ভ্রাতা এক সন্ন্যাসীর সহিত ধর্ম্মসম্বন্ধে কথোপকথন করিতেছেন। যেমন আর কেহ জানিত না, তেমনই ইজাবেল্ও জানিতেন না যে, সেই সন্ন্যাসী ছদ্মবেশী স্বয়ং ভিয়েনার অধিপতি। ভিয়েনারাজ সেই সন্ন্যাসীর বেশে জুলিয়েটের সহিতও সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন এবং তাহাকে তাহার অপরাধও বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। হতভাগিনী জুলিয়েট দুঃখে ও অনুতাপে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে তখন সকল কথাই ব্যক্ত করিল; এবং বলিল,—"সকল দোষ

ক্লডিও ও ইজাবেল্।

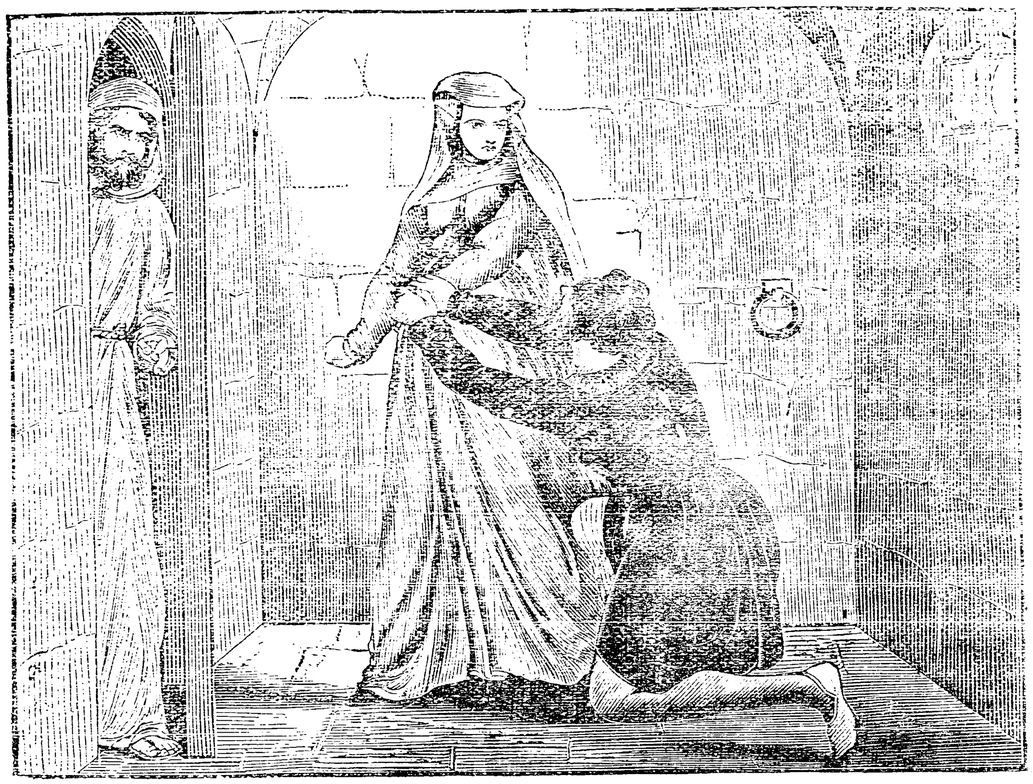

আমার, আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক ক্লডিওর অসৎ-প্রার্থনায় সম্মত হইয়াছিলাম।"

যখন ইজাবেল্ সেই কারাগৃহে প্রবেশ করিলেন, বলিলেন, "এস্থান শান্তিপূর্ণ হউক!"

ভিয়েনারাজ। কে তুমি? এখানে আসিতে পার।

ইজাবেল্। ক্লডিওর সহিত আমার সাক্ষাতের প্রয়োজন; দুই একটী কথা আছে।

তখন ছদ্মবেশী ভিয়েনারাজ সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু আগন্তুকের সহিত বন্দীর কথা শুনিবার জন্য কৌতূহলী হইয়া কারাগারের রক্ষককে বলিয়া এক স্থানে লুক্কায়িত রহিলেন। রাজা লুকাইয়া সকল কথা শুনিতে লাগিলেন।

ক্লডিও বলিতেছেন, "ভগিনি! সংবাদ কি?"

ইজাবেল্। (বিষণ্ণভাবে) আর সংবাদ কি! উপায় আর কিছুই নাই। হায়, কাল তোমায় মৃত্যুর জন্যই প্রস্তুত হইতে হইবে।

ক্লডিও। কোন উপায় নাই?

ইজাবেল্। একমাত্র উপায় আছে। কিন্তু সে উপায় অবলম্বন করিলে তোমার বাঁচিতে সাধ হইবে না!

ক্লডিও। (সাগ্রহে) ভগিনি! সে উপায় কি, আমাকে বল।

ইজাবেল্। তোমাকে বলিতে কি,—কিন্তু ক্লডিও, আমার ভয় হয়, পাছে তুচ্ছ জীবনের মায়ায়,—ধর্ম্ম-কর্ম্ম, মান-সম্ভ্রম সকলেই জলাঞ্জলি দিতে তোমার প্রবৃত্তি হয়! মরিতে তোমার সাহস আছে? মৃত্যুভয়ে ক্ষুদ্র কীটাণুও যেমন যন্ত্রণা পায়, অতি মহাবীর পরাক্রান্ত মনুষ্যও সেইরূপ যন্ত্রণা পাইয়া থাকে।

ক্লডিও। ভগিনি, তুমি আমায় এরূপ লজ্জা দিতেছ কেন? কুসুম-কোমলা তুমি,—তুমি কি মনে কর, হৃদয়ের এই দৃঢ়তা তোমার নিকট আমায় শিখিতে হইবে? যদি আমায় মরিতে হয়, নিশ্চয় জানিও, নব-পরিণীতা নায়িকা-বোধে মৃত্যুকে অনায়াসে আলিঙ্গন করিব!

ইজাবেল্। আমার ভ্রাতার উপযুক্ত কথা বটে। তোমার মুখে এ কথা শুনিয়া আজি মনে হইতেছে, আমার পিতার সমাধি-স্তম্ভ হইতে যেন এ কথার প্রতিধ্বনি হইল! ক্লডিও! তোমার প্রাণদণ্ড অনিবার্য্য। দেখ, নীচাশয় বিচারপতি এঞ্জিলোর ইচ্ছা,—সে কথা বলিতেও সঙ্কোচ হয়,—আমি তাহার পাপ-ইচ্ছা পূর্ণ করি; তাহা হইলে সে পাপিষ্ঠ তোমায় মুক্তি দেয়। উঃ! কি পাপ-অভিসন্ধি! কি ভয়ানক কপটতা! দেখ, সেই পাপিষ্ঠ যদি তোমার প্রাণবিনিময়ে আমার প্রাণ লইবার আদেশ করিত, তুচ্ছ তৃণবৎ অকাতরে তাহা দিতে পারিতাম; কিন্তু প্রাণ থাকিতে আমার ধর্ম্ম দিতে পারি না।

ক্লডিও। ভগিনি! তোমার মঙ্গল হউক।

ইজাবেল্। তবে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও।

ক্লডিও। মৃত্যু?—মৃত্যু বড় ভয়ঙ্কর!

ইজাবেল্। কিন্তু ঘৃণিত ও কলঙ্কিত জীবন আরও ভয়ঙ্কর!

ক্লডিওর মনে কিন্তু এ কথা স্থান পাইল না। মৃত্যুর চিন্তা ও জীবনের মায়ায় ক্লডিও চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "স্নেহময়ী ভগিনি! ইজাবেল্! দোহাই তোমার, এ যাত্রা আমার প্রাণ রক্ষা কর! দেখ, ভাইয়ের জীবন রক্ষা করিতে যদি তোমার ধর্ম্ম বিসর্জ্জনও করিতে হয়, তাহাতেও তোমার পাপ নাই, বরং পুণ্য আছে!

ইজাবেল্। হতভাগ্য! কাপুরুষ! বাঁচিতে এত সাধ! ভগিনীকে পাপে ডুবাইয়া নিজে বাঁচিতে ইচ্ছা কর? ছি! ছি! এমন ঘৃণিত অভিলাষ কেমনে জানাইলে? আমি জানিতাম, আমার ধর্ম্ম ও সম্মান রক্ষা করিতে তোমার একটী মস্তক কেন, বিংশতি মস্তক থাকিলেও যদি তাহা মসানে প্রদান করিতে হইত, তুমি তাহাই করিতে;—তথাপি ভগিনীকে কখন কলঙ্কিনী হইতে দিতে না!

ক্লডিও শুন ভগিনি! আমার এখনও কথা আছে।

কিন্তু সে কথা হইতে-না-হইতে অন্তরাল হইতে ভিয়েনারাজ বহির্গত হইলেন। বলিলেন, "ক্লডিও, তোমাদিগের কথাবার্ত্তা আমি সকলই শুনিয়াছি। এঞ্জিলোকে আমি বিশেষরূপ চিনি। তোমার ভগিনীর প্রতি তাঁহার কোন অসদভিপ্রায় ছিল না। কেবল তোমার ভগিনীর সতীত্ব পরীক্ষা করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। তোমার ভগিনী যথার্থই সতী এবং এঞ্জিলোর প্রস্তাবে সম্মতি না দিয়া যথার্থই সতীত্বের গৌরব রক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু ক্লডিও, তোমায় যে তিনি ক্ষমা করেন, এমন সম্ভাবনা দেখি না। অতএব তুমি জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা কর এবং মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও।

ক্লডিও। ভগিনি! তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি, আমায় ক্ষমা কর। তোমার কথায় আমার মোহ অপসারিত হইয়াছে। জীবনে আর আমার কোন মায়া-মমতা নাই, মৃত্যু হইলেই এখন বাঁচি।

এইরূপে লজ্জায় ও দুঃখে অভিভূত হইয়া ক্লডিও কারাগৃহের অন্য কক্ষে প্রস্থান করিলেন।

---

(৭)

ছদ্মবেশী নরপতি ইজাবেল্‌কে একাকিনী পাইয়া তাঁহার সতীত্ব-রক্ষণে প্রাণপণ যত্নের প্রশংসা করিয়া বলিলেন,—"ভগবান্ তোমাকে যেমন অলোকসামান্য রূপ দিয়াছেন, তোমার

প্রকৃতিও তেমনই মধুর করিয়াছেন। যথার্থই তুমি রমণীরত্ন।"

ইজাবেল্। ওঃ! ভিয়েনারাজ এই এঞ্জিলোকে সৎপ্রকৃতি ও সাধুচরিত্র জানিয়া কি প্রতারিতই হইয়াছেন! যদি কখন রাজা পুনর্ব্বার দেশে ফিরিয়া আসেন এবং যদি আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কিছু বলিতে পারি, তবে এঞ্জিলোর এই শাসন-প্রণালীর বিস্তারিত কাহিনী তাঁহাকে শুনাইব।

ইজাবেল্ জানিতেন না যে, তিনি যাঁহার সহিত কথা কহিতেছেন, তিনিই স্বয়ং ভিয়েনারাজ এবং ইজাবেল্ যে কথা রাজার প্রত্যাগমনে বলিবেন বলিয়া কৃতসঙ্কল্প হইতেছিলেন, তাহা এক্ষণে সেই রাজারই সম্মুখে প্রকাশিত হইল।

রাজা। রাজার সহিত তোমার দেখা হইতে পারে এবং তুমিও সকল কথা তাঁহাকে বলিতে পার, কিছুই অসম্ভব নহে;—কিন্তু ব্যাপার যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে এঞ্জিলোর বিরুদ্ধে তোমার কোন প্রমাণ না টিকিতে পারে, অতএব আমার একটী পরামর্শ শুন। আমি বিশ্বাস করি, সেই পরামর্শমত কাজ করিলে তুমি এক দুঃখিনী, অত্যাচার-পীড়িতা রমণীর কষ্ট দূর করিতে পার। নিষ্ঠুর দণ্ড হইতে আপন ভ্রাতাকেও উদ্ধার করিতে পার। তোমার নিজের চরিত্রেও কোন কলঙ্ক স্পর্শ করিবে না এবং ভিয়েনারাজ যদি কখন ফিরিয়া আসেন, তবে তিনিও তোমার এই ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইতে পারিবেন।

ইজাবেল্। আপনার পরামর্শমত কাজ করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু তাহাতে কোন অধর্ম্মের সংস্রব থাকিলে আমা দ্বারা তাহা হইবে না।

রাজা। ধর্ম্মই প্রকৃত বলশালী। যাহার চিত্তে ধর্ম্ম বিরাজ করেন, সে নির্ভীক ও প্রভূত সাহসী। আমার বোধ হয়, তুমি মেরিয়ানার কথা শুনিয়া থাকিবে। ফ্রেডারিক নামে এক প্রসিদ্ধ যোদ্ধা ছিলেন। তিনি সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়াছেন। মেরিয়ানা তাঁহারই ভগিনী।

ইজাবেল্। আমি তাঁহার কথা শুনিয়াছি। লোকে তাঁহার অনেক সুখ্যাতিও করিয়া থাকে।

রাজা। সেই মেরিয়ানা রাজ-প্রতিনিধি এঞ্জিলোর পরিণীতা ভার্য্যা। ফ্রেডারিক যে জাহাজে জলনিমগ্ন হন, সেই জাহাজে মেরিয়ানার বিবাহের যৌতুকের ধনসম্পত্তি ছিল। এঞ্জিলো সেই ধনসম্পত্তি লাভে বঞ্চিত হইলেন। তাহাতে সেই দুঃখিনী রমণীর সমূহ কষ্ট হইল। কারণ, তেমন যে সুবিখ্যাত যোদ্ধা ও উন্নতচরিত্র ফ্রেডারিক, তাঁহার মৃত্যু হইল, আবার ধন-সম্পত্তি-নাশের সঙ্গে সঙ্গে নিজেও স্বামীর স্নেহসুখে বঞ্চিত হইলেন। এঞ্জিলো বাহিরেই কেবল সাধুতার ভাণ করিয়া থাকে; সে অনায়াসে সেই সুশীলা রমণীর বিরুদ্ধে কোন কলঙ্ক রটাইয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল। অথচ, লোককে বুঝিতে দিল না যে, প্রকৃত কারণ কি? সে কারণ অবশ্য আর কিছুই নহে, ধন-সম্পত্তি-লাভে নিরাশ হইয়া, এঞ্জিলো পত্নীকে পরিত্যাগ করিল; আর দুঃখিনী মেরিয়ানা নয়ন-জলে ভাসিতে লাগিল। হতভাগ্য এঞ্জিলো এতটুকুও সান্ত্বনা করিয়া দুঃখিনী পত্নীর এক বিন্দু অশ্রুও মুছাইল না। কিন্তু স্বামীর এরূপ নিষ্ঠুর আচরণে মেরিয়ানার প্রণয়-স্রোত যদি মন্দীভূত হইত, তাহা হইলেও বিশেষ নিন্দার হইত না। কিন্তু বাধা-বিপত্তি পাইয়াও স্রোতস্বতী যেমন উদ্যমবেগেই প্রবাহিত হয়, মেরিয়ানার ভালবাসাও প্রথম-মিলনের ন্যায় নিষ্ঠুরস্বামীর প্রতি অধিকতর বৃদ্ধি পাইয়াছে। তারপর তোমায় এখন যাহা করিতে হইবে, তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি শুন। তুমি লর্ড এঞ্জিলোর নিকট যাও,

ছদ্মবেশী ভিয়েনারাজ এবং ইজাবেল্ ও মেরিয়ানা।

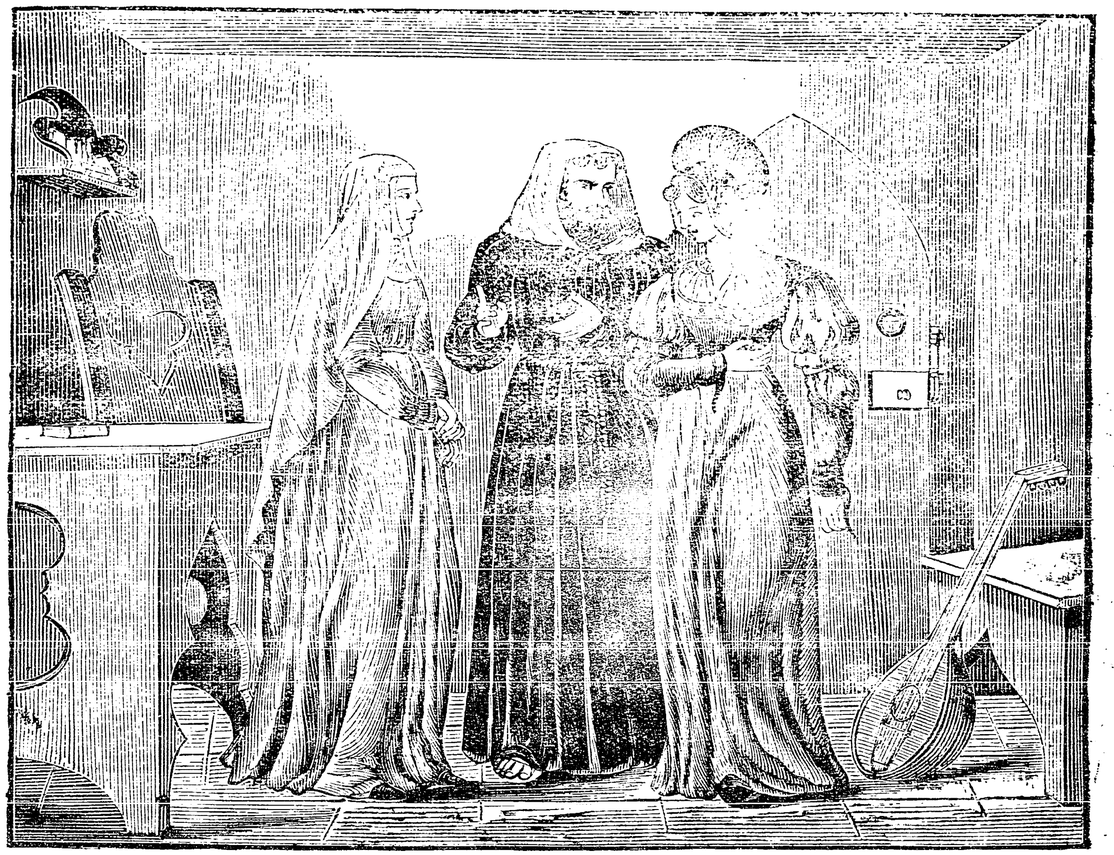

এবং তোমার ভ্রাতাকে বাঁচাইবার জন্য তাহার ঘৃণিত প্রস্তাবে মৌখিক সম্মতি প্রকাশ কর। তাহা হইলে তোমার ভ্রাতার প্রাণরক্ষা হইবে এবং তাহার পর নিশীথে, অন্ধকারে, তোমার পরিবর্ত্তে মেরিয়ানা এঞ্জিলোর নিকট উপস্থিত হইবে। সে অন্ধকারে এঞ্জিলো মেরিয়ানাকে নিশ্চয়ই চিনিতে পারিবে না। কল্যাণি! ইহাতে সঙ্কুচিত হইও না। এঞ্জিলো তাহার স্বামী। স্বামী স্ত্রীর এবংবিধ সম্মিলনে কোন পাপ নাই।

ইজাবেল্ সন্তুষ্ট হইয়া সম্মতি প্রকাশ করিলেন এবং পরামর্শমত কার্য্যানুষ্ঠানের জন্য প্রস্থান করিলেন।

এদিকে ভিয়েনারাজ, মেরিয়ানাকে এই সকল ব্যাপার জ্ঞাপন করিবার জন্য তাঁহার নিকট প্রস্থান করিলেন।

রাজা সেইরূপ ছদ্মবেশে ইতিপূর্ব্বে মেরিয়ানার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন এবং নানারূপ ধর্ম্মোপদেশে তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়াছিলেন। মেরিয়ানাও তাঁহাকে পবিত্রচেতা, সাধুপুরুষ জানিয়া আপনার দুঃখকাহিনী আদ্যোপান্ত বলিয়াছিলেন। আজিও আবার মেরিয়ানা তাঁহারই পরামর্শমত চলিতে ইচ্ছা করিলেন।

---

(৯)

ইজাবেল্ নির্দ্ধারিত সময়ে মেরিয়ানার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। ছদ্মবেশী ভিয়েনারাজও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কুমারি, এঞ্জিলোর সংবাদ কি?"

ইজাবেল্ কিরূপে এঞ্জিলোর সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিবেন স্থির করিয়াছেন, এখন তাহা বলিলেন। "বলিলেন, এঞ্জিলোর একটী সুন্দর

বাগান আছে। বাগানের চারিদিক্ ইষ্টক-প্রাচীরে ঘেরা; মধ্যস্থলে প্রবেশদ্বার। বাগানের পশ্চিমদিকে দ্রাক্ষাক্ষেত্র; সেই খানেই একটা বড় ফটক। এঞ্জিলো দুইটী চাবি আমাকে দিয়াছেন। এই বড় চাবিটী দ্বারা দ্রাক্ষাক্ষেত্রের ফটক খোলা যাইবে এবং এই ছোট চাবিটীতে উদ্যানের কপাট উদ্ঘাটিত হইবে। আমি বলিয়া আসিয়াছি, অদ্য নিশীথে সেই বাগান-বাটীতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিব এবং তিনিও আমার ভ্রাতাকে মুক্তি দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। আমি সেই স্থানটী বিলক্ষণরূপে চিনিয়া আসিয়াছি এবং অতি চুপি চুপি, অতি সতর্কতার সহিত এঞ্জিলো দুইবার আমাকে বিলক্ষণরূপে সেই পথ চিনাইয়া দিয়াছেন।

রাজা। তোমাদের মধ্যে আর কিছু সঙ্কেত আছে?

ইজাবেল্। আর কিছুই নাই; তবে অধিক রাত্রে সেখানে যাইবার কথা আছে। আর আমি তাঁহাকে বলিয়া আসিছি, অধিকক্ষণ আমি তাঁহার নিকট থাকিতে পারিব না। কেননা, আমার সঙ্গে একজন পরিচারিকা থাকিবে; সে জানে, আমি গোপনে ভ্রাতার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছি।

ছদ্মবেশী ভিয়েনারাজ ইজাবেলের বুদ্ধির প্রশংসা করিলেন। ইজাবেল্ মেরিয়ানাকে বলিলেন, "এঞ্জিলোর সহিত অধিক কথা কহিও না; কেবল বিদায়কালে এইমাত্র বলিয়া আসিবে, আমার ভ্রাতার কথা যেন স্মরণ থাকে।"

---

(১০)

সেই রাত্রে ইজাবেল্ মেরিয়ানাকে সঙ্গে লইয়া লর্ড এঞ্জিলো-কথিত নির্দ্দিষ্টস্থানে পঁহুছিয়া দিলেন। ইজাবেল্ মনে মনে আনন্দিত হইলেন যে, এইরূপ কৌশলে যেমন আপনার ভ্রাতা ক্লডিওর জীবনরক্ষা হইল, তেমনই নিজের চরিত্রও অক্ষুণ্ণ রহিল। কিন্তু ক্লডিও যে বস্তুতই মুক্তি পাইবে, সে বিষয়ে ভিয়েনারাজের কিছু সন্দেহ ছিল। তিনি সেই রাত্রেই কারাগারে প্রবেশ করিলেন। রাজা সে সময়ে সেখানে উপস্থিত না হইলে বুঝিবা ততক্ষণে ক্লডিওর শিরশ্ছেদ হইত। কারণ, রাজা সেখানে গমন করিয়াই শুনিলেন যে, নিষ্ঠুর এঞ্জিলো ক্লডিওর শিরশ্ছেদের জন্য আদেশ পাঠাইয়াছেন এবং আদেশ এরূপ আছে যে, সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে যেন সেই ছিন্নমস্তক তৎসমীপে প্রেরিত হয়। কিন্তু রাজা ক্লডিওর শাস্তি স্থগিত রাখাইয়া কারাধ্যক্ষকে বলিলেন, সেইদিন প্রাতে বন্দিশালায় যে লোকের মৃত্যু হইয়াছে, তাহাই ক্লডিওর মস্তক বলিয়া রাজপ্রতিনিধি-সমীপে প্রেরিত হউক।

কিন্তু কারাধ্যক্ষ সে কথা মানিতে পারিল না। মানিবে কিরূপে? কারাধ্যক্ষ ত জানে না যে, সে ছদ্মবেশী সাধুপুরুষ স্বয়ং ভিয়েনারাজ। তখন রাজা স্বনামাঙ্কিত এক পত্র দেখাইয়া কারাধ্যক্ষকে কহিলেন,—"ইহাতে কি লেখা আছে, পাঠ করিয়া দেখ। লেখা চিনিতে পার কি?

তখন কারাধ্যক্ষ বুঝিল, রাজারই হস্তাক্ষর। রাজাদেশ পাঠ করিয়া বুঝিল, সন্ন্যাসী অবশ্যই রাজার কোন বিশ্বস্ত ব্যক্তি। সুতরাং আর কোন আপত্তি না করিয়া ক্লডিওর শিরশ্ছেদের পরিবর্ত্তে কোন মৃত ব্যক্তির মস্তক লর্ড এঞ্জিলোর নিকট প্রেরণ করিল।

ছদ্মবেশী রাজা আরও এক কাজ করিলেন। তিনি লর্ড এঞ্জিলোকে এই মর্ম্মে একখানি পত্র লিখিলেন;—"কোন ঘটনাবশতঃ প্রবাস-পর্য্যটন আমার হইল না। আমি আগামী কল্য ভিয়েনানগরে উপস্থিত হইব। আপনি সেই সময় নগরদ্বারে উপস্থিত থাকিয়া আপনার কার্য্যভার আমাকে বুঝাইয়া দিবেন। আর সমস্ত প্রজাবৃন্দের অবগতির জন্য ইহাও প্রচার করিয়া দিবেন যে, কোন প্রকার অবিচার বা অত্যাচারে যদি কাহারও কোন ক্ষতি হইয়া থাকে, তাহারা যেন সেই সময় আমার নিকটে আবেদন করে।"

---

(১১)

সেই দিন অতি প্রত্যূষে ইজাবেল্ বন্দিগৃহে উপস্থিত হইলেন। ছদ্মবেশী রাজাও সেখানে তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। ইজাবেল্ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার ভ্রাতার সংবাদ কি? তিনি বন্দিগৃহ হইতে মুক্ত হইয়াছেন কি না?"

রাজা। এঞ্জিলো তোমার ভ্রাতাকে চিরদিনের জন্য ইহজগৎ হইতে বিদায় করিয়াছেন! তাঁহার ছিন্ন-মস্তক লর্ড এঞ্জিলোর নিকট প্রেরিত হইয়াছে।

তখন ইজাবেল্ উন্মত্তের ন্যায় চীৎকার করিয়া উঠিলেন,—"হা হতভাগ্য ক্লডিও! হা দুঃখিনী ইজাবেল্! জগতে বিচার কৈ? নিষ্ঠুর এঞ্জিলো, তোমার মনে এই ছিল?"

রাজা অনেক সান্ত্বনা দিয়া, ইজাবেলের শোক কিছু প্রশমিত করিয়া বলিলেন,—"শুনিয়াছি, আজি প্রাতে ভিয়েনারাজ স্বদেশে প্রত্যাগমন করিবেন। যদি এঞ্জিলোর অবিচারের জন্য রাজার সম্মুখীন হইতে চাও, তবে এই সময়।—সকল কথা তোমার বিরুদ্ধে যাইলেও তুমি ভীত হইও না।"

তখন কিরূপে রাজার নিকট আবেদন করিতে হইবে, সে সম্বন্ধে সবিশেষ উপদেশ দিয়া ছদ্মবেশী ভিয়েনারাজ মেরিয়ানার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তাঁহাকেও সবিশেষ বুঝাইয়া রাখিলেন। বলা বাহুল্য, উভয়কেই এমন ভাবে বুঝাইলেন যে, যাহাতে আসল কথাও ব্যক্ত হইবে না, অথচ উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হইবে।

---

(১২)

যথাসময়ে ভিয়েনারাজ সন্ন্যাসীর বেশ পরিত্যাগ করিয়া রাজবেশে সুসজ্জিত হইলেন এবং সমাগত জনতার মধ্য দিয়া স্বীয় রাজধানীতে প্রবেশ করিলেন। পুরদ্বারেই তিনি লর্ড এঞ্জিলোকে দেখিতে পাইলেন। লর্ড এঞ্জিলোও যথারীতি আপনার কার্য্যভার ভিয়েনারাজকে বুঝাইয়া দিলেন। তারপর, শোকার্ত্ত ইজাবেল্ বিচারপ্রার্থিনী হইয়া রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং অতি করুণস্বরে বলিলেন, "মহারাজ! এই দুঃখিনীর এক আবেদন আছে। আমার নাম ইজাবেল্। ক্লডিও নামক আমার এক সহোদর কোন কুল-কুমারীর সহিত ব্যভিচার অপরাধে লর্ড এঞ্জিলো-কর্ত্তৃক প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। ভ্রাতার প্রাণরক্ষার্থে আমি লর্ড এঞ্জিলোর নিকট কত-না করিয়াছি!—আমি নতজানু হইয়া কত প্রার্থনা করিয়াছি; কতবার তিনি আমাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, তথাপি আমি কতবার অনুনয়-বিনয় করিয়াছি। সে সকল অনেক কথা। আপনাকে সকল বলা নিষ্প্রয়োজন। একটা কথা কেবল আপনাকে নিবেদন করিব। অত্যন্ত দুঃখ, লজ্জা ও সঙ্কোচের সহিত সে কথা বলিতে হইতেছে। না বলিলেও নয়, বলিয়া বলিতেছি। মহারাজ! অবধান করুন!—স্বয়ং বিচারপতি এঞ্জিলো আমার কুমারী-ধর্ম্মের বিনিময়ে আমার ভ্রাতার জীবনদান করিতে চাহিয়াছিলেন। এ কথায় প্রথমে আমি স্তম্ভিত হইয়াছিলাম। কিন্তু শেষে ভ্রাতৃস্নেহের নিকট আমার ধর্ম্ম ও মনের বল পরাজিত হইল এবং তাঁহার আদেশমত কার্য্য আমি করিলাম। ধর্ম্ম বিসর্জ্জন করিলাম, কিন্তু হায়, মহারাজ! তবুও লর্ড

এঞ্জিলো আপন প্রতিজ্ঞা রাখিলেন না। গত রাত্রে আমার ভ্রাতার শিরশ্ছেদ হইয়াছে।"

ব্যাপারটা নিতান্ত অবিশ্বাসযোগ্য, রাজা এইরূপ ভাব করিলেন। এঞ্জিলো বলিলেন, "দণ্ডবিধি-শাস্ত্রের বিধানমত ইহার ভ্রাতা শাস্তি পাইয়াছে; সেই শোকে এই রমণী পাগলের ন্যায় প্রলাপ বকিতেছে।"

তখন আর একজন আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মেরিয়ানাও বিচারপ্রার্থিনী হইয়া বলিলেন,—"মহারাজ! স্বর্গ হইতে যেমন আলোকরশ্মি আসিয়া থাকে, ধার্ম্মিকের বাক্যে যেমন সত্য নিঃসৃত হয়, সত্য-বচনে যেমন ধর্ম্মের গৌরব ও মর্য্যাদা রক্ষিত হইয়া থাকে,—সেইরূপ আমিও এই এঞ্জিলোর পরিণীতা ভার্য্যা। ইজাবেল্ যাহা বলিলেন, তাহা মিথ্যা। কারণ, গত রাত্রে আমি আমার স্বামীর সহিত উদ্যান-গৃহে রাত্রি যাপন করিয়াছি। যাহা বলিতেছি, এ কথা অতি সত্য। যদি সত্য বলিয়া থাকি, তবে আমি এখনই উঠিব, নহিলে যেন প্রস্তর-মূর্ত্তির মত এইখানে বসিয়া থাকি।"

রাজা তাঁহার ছদ্মবেশকালে আপনাকে লডোউইক নামে পরিচিত করিয়াছিলেন। ইজাবেল্ এবং মেরিয়ানা উভয়েই বলিলেন, "সন্ন্যাসী লডোউইক আমাদিগের এ সকল কথা জানেন।"

রাজাও বুঝিলেন, এইরূপ বাক্-বিতণ্ডার ভিতর হইতেই ইজাবেলের নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের বিকাশ হইবে। অতএব সেই পন্থারই অনুসরণ করা প্রশস্ত। কিন্তু এঞ্জিলো বুঝিলেন, অন্যরূপ। তিনি ভাবিলেন এবং ভাবিয়া সন্তুষ্টও হইলেন যে, এই দুই রমণী যখন সম্পূর্ণ বিপরীত কথা বলিতেছে, তখন তাঁহার দোষ কিছুতেই প্রমাণিত হইবে না। তাই বলিলেন, "মহারাজ! এই দুই রমণীর কথাবার্ত্তা শুনিলেন! দেখুন, এতক্ষণ হাস্য-সংবরণ করিতে পারি নাই। কিন্তু সহিষ্ণুতার সীমা আছে। মহারাজ! আমার বিশ্বাস হইতেছে, এই দুই রমণীর অন্তরালে কোন দুষ্ট লোক বর্ত্তমান আছে। সেই সন্ন্যাসীই বোধ হয়, এই সব অনর্থের মূল এবং সেই ব্যক্তিই আমাকে জনসমাজে অপদস্থ করিবার জন্য ইহাদিগকে এইরূপ কুমন্ত্রণায় উত্তেজিত করিয়াছে। আমায় অনুমতি করুন, আমি ইহার সবিশেষ অনুসন্ধান করি।"

রাজা। আমি অন্তরের সহিত বলিতেছি, এই দুষ্ট ব্যক্তিকে ধরিতে পারিলে আপনার ইচ্ছামত, আপনিই তাহাকে যথেচ্ছা শাস্তি দিবেন। আর মন্ত্রী এস্‌কেলাস্, তুমিও লর্ড এঞ্জিলোর সহিত থাকিয়া এ বিষয়ের সত্যাসত্য-নির্দ্ধারণে যত্নবান্ হও।

লর্ড এঞ্জিলোর বিশ্বাস সেই দুষ্ট সন্ন্যাসীই এই দুই রমণীকে বৃথা অভিযোগে উত্তেজিত করিয়াছে; কাজেই তাহাকে বিচার-স্থানে আনয়নের জন্য লোক প্রেরিত হইল। ছদ্ম-বেশী রাজা বলিলেন, "সে এইখানে উপস্থিত হইলে তোমাদিগের বিবেচনামত কঠিন দণ্ড দিও। আমি কিছুক্ষণের জন্য এখান হইতে যাইব। কিন্তু লর্ড এঞ্জিলো, যে পর্য্যন্ত না এ বিষয়ের একটা স্থির মীমাংসা হয়, সে পর্য্যন্ত আপনি অনুগ্রহ করিয়া এই খানেই থাকিবেন।

---

(১৩)

রাজা আবার সেই সন্ন্যাসীর পরিচ্ছদে সেই 'লডোউইক' সাজিলেন। সেই বেশেই লর্ড এঞ্জিলো ও এস্‌কেলাসের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার ছদ্মবেশ এরূপ অদ্ভুত যে,—সমবেত দর্শকগণ ত দূরের কথা, স্বয়ং লর্ড এঞ্জিলো ও মন্ত্রী এস্‌কেলাস্‌ও তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না। ভিয়েনারাজ বেশও যেমন পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন, কণ্ঠস্বরও সেইরূপ সম্পূর্ণ

পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন। মন্ত্রী এস্‌কেলাস্ লর্ড এঞ্জিলোর চরিত্রে বিশেষ শ্রদ্ধাবান্; সুতরাং এঞ্জিলোর বিরুদ্ধে সেই অভিযোগ তাঁহার একবারেই বিশ্বাস হইল না। মন্ত্রী এস্‌কেলাস্ সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি লর্ড এঞ্জিলোর বিরুদ্ধে এই দুই রমণীকে উত্তেজিত করিয়াছিলে?"

সন্ন্যাসী। আপনাদিগের রাজা কোথায়? আমার যাহা বলিবার, তাঁহাকেই বলিব।

মন্ত্রী। আমাদিগকেই রাজা বলিয়া জান; —রাজশক্তি এখন আমাদিগেরই মধ্যে।

তখন সেই সন্ন্যাসী রাজার বিস্তর নিন্দাবাদ আরম্ভ করিলেন। বলিলেন, "এ বিচার ভাল বটে। যাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ, তাহারই হস্তে বিচারের ভার! এই ভিয়েনা পর্য্যটন-কালে অনেক প্রকার দেখিলাম! দেখিলাম, চারিদিকেই বিশৃঙ্খলা। রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া থাকা রাজার কোন ক্রমেই উচিত হয় নাই।"

রাজমন্ত্রী রাজার এইরূপ নিন্দাবাদ শুনিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং সন্ন্যাসীকে কারা-গারে অবরুদ্ধ রাখিবার জন্য আদেশ করিলেন।

তখন সহসা রাজা সেই সন্ন্যাসীর বেশ পরিত্যাগ করিয়া নিজ মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইলেন! লর্ড এঞ্জিলো, মন্ত্রী এস্‌কেলাস্ এবং উপস্থিত দর্শকবৃন্দ—সকলেই হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল। সকলে সবিস্ময়ে দেখিল,—সন্ন্যাসী স্বয়ং ভিয়েনারাজ!

রাজা সর্ব্বপ্রথমে ইজাবেল্‌কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ইজাবেল্! যাহাকে সন্ন্যাসী বলিয়া জানিয়াছিলে, সে-ই আমি। কিন্তু এই বেশ পরিবর্ত্তনের সঙ্গে আমার মনের কোন পরিবর্ত্তন হইল না, জানিবে। আমা দ্বারা তোমার এখনও যে কার্য্য হইতে পারে, বল, তাহা করিতে প্রস্তুত আছি।

ইজাবেল্। মহারাজ! আমায় ক্ষমা করুন। এ দাসী আপনাকে চিনিতে না পারিয়া অনেক প্রকারে আপনাকে কষ্ট দিয়াছে।

রাজা। আমিই বরং তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। কারণ, আমি সকল জানিয়া-শুনিয়াও তোমার ভ্রাতার জীবন রক্ষা করিতে পারি নাই।

তখনও রাজা বলিলেন না যে, ইজাবেলের সহোদর ক্লডিও বস্তুতঃ বাঁচিয়া আছে। কারণ, তখনও পর্য্যন্ত তাঁহার সাধ, ইজাবেলের মহত্ত্ব পরীক্ষা করেন।

নিমেষ মধ্যে এঞ্জিলো সকলই বুঝিলেন। বুঝিলেন, স্বয়ং ভিয়েনারাজ প্রচ্ছন্ন বেশে থাকিয়া তাঁহার কার্য্যাবলী সমস্তই দেখিয়াছেন। সকল কথা স্মরণ করিয়া এঞ্জিলো মরমে মরিয়া গেলেন। বলিলেন, "মহারাজ! অন্তর্য্যামী পুরুষের ন্যায় আপনি আমার অতি গোপনীয় কার্য্য সকল দেখিয়াছেন! দোষ ঢাকিতে আর চেষ্টা করিব না। আমি নিজ মুখেই সকল কথা স্বীকার করিতেছি। প্রভো! আমায় আর লজ্জা দিবেন না;—এই দণ্ডেই আমার প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়া কর্ত্তব্য পালন করুন।"

রাজা। হাঁ, তাহাই হইবে। তোমার দোষ সকলই ব্যক্ত; লুকাইবার আর কিছুই নাই। ক্লডিও যেরূপে যেখানে দণ্ডিত হইয়াছে, তোমাকেও সেইখানে সেইরূপে শাস্তি পাইতে হইবে এবং মেরিয়ানা তোমার সকল বিষয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হইয়া তোমা হইতে উৎকৃষ্ট পাত্রে পুনর্ব্বার পরিণীতা হউন।

মেরিয়ানা। মহারাজ, রক্ষা করুন। আমার আর উৎকৃষ্ট পতির আবশ্যক নাই;—আমি এই নতজানু হইয়া করযোড়ে আমার

স্বামীর জীবন ভিক্ষা করিতেছি! ভগিনী ইজাবেল্! তুমিও আমার হইয়া মহারাজের কৃপা-প্রার্থনা কর! দেখ যতদিন বাঁচিব, তোমার নিকট কেনা হইয়া থাকিব!

রাজা। মেরিয়ানা! তুমি এ কি বলিতেছ? ইজাবেল্ যদি এঞ্জিলোর জীবনের জন্য প্রার্থনা করেন, তবে ক্লডিওর প্রেতাত্মা আসিয়া ইহাঁকে ভয়-চকিত করিয়া এখনই এখান হইতে অন্তর্হিত করিবে!

তবুও মেরিয়ানা বলিতে লাগিলেন;—"ইজাবেল্! ভগিনি! আমার কথা রাখ! আমারই পার্শ্বে নতজানু হইয়া করযোড়ে রাজার প্রতি চাও; তোমায় কিছু বলিতে হইবে না; যাহা বলিবার, আমি বলিতেছি। দেখ, পাপই অনেক সময় লোককে সাধু করিয়া তুলে; কারণ, পাপাচার ব্যক্তি আন্তরিক অনুতাপ করিলে শেষে উন্নত-চরিত্র হইয়া থাকে। আমার স্বামীরও সেইরূপ হইতে পারে। ইজাবেল্! আমার কথা রাখ; একটীবার মহারাজের——"

ভিয়েনারাজ সে কথায় বাধা দিয়া কহিলেন, "ক্লডিওর হত্যাপরাধে অবশ্যই এঞ্জিলোর প্রাণদণ্ড হইবে!"

এইবার ইজাবেল্ নতজানু হইয়া করযোড়ে বলিলেন, "মহারাজ! এই ব্যক্তির অপরাধ ক্ষমা করুন! মনে করুন, আমার ভ্রাতা বাঁচিয়া আছেন; লর্ড এঞ্জিলো যে পর্য্যন্ত আমাকে দেখেন নাই, সে পর্য্যন্ত যথার্থই ন্যায্য বিচার করিয়াছেন। অন্ততঃ এই জন্যই ইহাঁকে অব্যাহতি দিন। আমার ভ্রাতা যথার্থই দোষ করিয়াছিলেন এবং সেই জন্যই তিনি উপযুক্ত শাস্তি পাইয়াছেন! আপনি ইহাঁকে ক্ষমা করুন!"

শত্রুর প্রতিও ইজাবেলের এইরূপ দয়া দেখিয়া রাজা যার-পর-নাই সন্তুষ্ট হইলেন। এঞ্জিলোর পক্ষে ইহা অপেক্ষা আর অধিক শাস্তি কি হইতে পারে?

এইরূপে এঞ্জিলোর জীবন রক্ষা হইলে রাজা জনৈক অনুচরকে অনুমতি করিলেন, "বন্দি-গৃহ হইতে ক্লডিওকে এখানে লইয়া আইস।"

ক্লডিও তখন পর্য্যন্তও জানিতেন না যে, তিনি অব্যাহতি পাইয়াছেন কিনা। কেবল কারাধ্যক্ষই তাহা বুঝিয়াছিল। ক্লডিও সেখানে উপস্থিত হইলে রাজা বলিলেন, "ইজাবেল্! এই তোমার ভ্রাতাকে লও। দেখ তোমারই জন্য তোমার ভ্রাতাকে আমি ক্ষমা করিলাম।" চারিদিকে আনন্দের রোল পড়িয়া গেল।

এইবার ভিয়েনারাজ ইজাবেল্‌কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "সুন্দরি! চমৎকৃত হইতেছ? আমাকে কি দিয়া হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জানাইবে ভাবিতেছ? তা দেখ, আমি তোমার নিকট হইতে অন্য কৃতজ্ঞতার প্রত্যাশা করি না,—বল, তুমি আমার হইবে?"

ইজাবেল্ মৌনে সম্মতি প্রকাশ করিলেন।

এতক্ষণে এঞ্জিলো বুঝিলেন, তিনি নিরাপদ। তখন রাজা বলিলেন, "এঞ্জিলো, মেরিয়ানা তোমার বিবাহিতা স্ত্রী। এই পুণ্যচরিত্রা সাধ্বীকে পত্নী বলিয়া গ্রহণ কর। ইহাঁরই গুণে তোমাকে ক্ষমা করিয়াছি। এই অমূল্য রত্ন কখন পদদলিত করিও না।"

এঞ্জিলো দুইদিনের রাজ-ক্ষমতা পাইয়া হৃদয় হইতে দয়া ও কারুণ্য বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন, আজি দয়া ও করুণার অসীম মহিমা বুঝিলেন। তারপর রাজা ক্লডিওকে আজ্ঞা করিলেন, "তুমি জুলিয়েটকে বিবাহ কর।"

ইজাবেলের গুণে ও সচ্চরিত্রতায় রাজা এতদূর মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তাঁহাকে পাইবার জন্য তাঁহার একান্ত অভিলাষ জন্মিল। ইজাবেল্ তখন পর্য্যন্তও কুমারীব্রত অবলম্বন করেন

অপূর্ব্ব-মিলন।



নাই,—সুতরাং বিবাহে তাঁহার স্বাধীনতা ছিল। রাজা ছদ্মবেশে কত শ্রম স্বীকার করিয়াছিলেন এবং কিরূপ অপূর্ব্ব সহৃদয়তায় সকল দিকে মঙ্গল করিলেন, তাহা স্মরণ করিয়া ইজাবেল্ রাজাকে আত্ম-সমর্পণ করিলেন।

ইজাবেল্ ভিয়েনা-রাজ-মহিষী হইয়া আপনার চরিত্র-গুণে ভিয়েনার যাবতীয় নারী-জীবনে পুণ্য ও পবিত্রতার প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং সেই সময় হইতে জুলিয়েটের ন্যায় আর কোন রমণী পাপ-মোহে পতিতা হইলেন না। এইরূপে উদারচরিত ভিয়েনারাজ, গুণবতী ভার্য্যা লইয়া পরমসুখে বাস করিতে লাগিলেন।

দয়ারই জয় হইল।

শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত।

উপন্যাস নহে।

পাঠক! ইহা উপন্যাস নহে, সুতরাং উপন্যাসের চাতুরী ও মাধুরী ইহাতে পাইবেন না। ইহা একটী সত্য ঘটনা। তবে সত্য ঘটনা হইলেও ইহাতে কিছু বৈচিত্র্য আছে। সেইটুকু মনে করিয়া পাঠ করিলেই, পাঠক! গল্পটী অনায়াসে শেষ করিতে পারিবেন।

এই ক্ষুদ্র ঘটনার মূল-ক্ষেত্র একটী ক্ষুদ্র পল্লীগ্রাম। তখন কার্ত্তিক মাস। শ্যামা-পূজা ও ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার উৎসব অতীত হইয়াছে। চাকরী-উপজীবী যুবকগণের মধ্যে প্রবাস-স্থানে প্রস্থান করিতে আর কেহই অবশিষ্ট নাই। গ্রাম নিস্তব্ধ হইয়া উৎসব-উদ্যমের অবসান-

কালীন বিশ্রামসুখ উপভোগ করিতেছে; দীর্ঘ-কাল অনধ্যায়ের পর ছাত্রেরা আবার পুস্তক খুলিয়া, পাতা উল্টাইতে আরম্ভ করিয়াছে। এইরূপ সময়ে একদিন মধ্যাহ্নকালে অমুক গ্রামে একজন নবীন ব্রহ্মচারী আসিয়া সেই গ্রামের বিখ্যাত ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের চণ্ডীমণ্ডপে দর্শন দিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় অনেকের ঠাকুর বলিয়া, সাধারণ্যে ঠাকুর বলিয়া বিখ্যাত এবং আমরাও ঠাকুর বলিয়াই এ প্রবন্ধে তাঁহার উল্লেখ করিব।

আগন্তুক ব্রহ্মচারী নবীন-বয়স্ক, অল্প গোঁফের রেখা দেখা দিয়াছে মাত্র; পরিধানে গেরুয়া-বস্ত্র, পায়ে খড়ম, এক হস্তে করঙ্গ, অন্য হস্তে পুঁটুলি, কক্ষতলে কম্বল-জড়ানো একখানি মৃগচর্ম্ম। ব্রহ্মচারী দেখিয়া সকলে অধিকতর যত্ন ও ভক্তি-সহকারে বসিতে বলিল। ব্রহ্মচারী কক্ষের কম্বলখানি বিছাইয়া, তদুপরি মৃগচর্ম্ম-খানি পাতিয়া উপবেশন করিলেন। কতদূর হইতে আসা হইতেছে জিজ্ঞাসিলে, কহিলেন, —"অদ্য নবদ্বীপ হইতে আসা হইতেছে।" "কখন্ বাহির হইয়াছিলেন?" উত্তর হইল,— "ভোরে।" নবদ্বীপ হইতে ভোরে বাহির হইয়া, এখানে পৌঁছিতে এত বিলম্ব কেন, সকলের মনে এ সংশয় হইতে না হইতে ব্রহ্মচারী আপ-নিই বলিতে লাগিলেন,—"গ্রামের মধ্য দিয়া চলিতে আমার ভাল লাগে না, যথাসম্ভব গঙ্গার ধারে ধারে বরাবর আসিতেছি।" সকলে বেলা হইবার কারণ বুঝিলেন। আহারাদির কথা জিজ্ঞাসিয়া জানা গেল, বাটীর মধ্যেই আহার হইবে। তাহাই হইল। ঠাকুর বাটীতে ছিলেন না, অদূরবর্ত্তী কোন শিষ্যালয়ে গিয়াছিলেন। বাটীতে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র অমুক বিদ্যাবিনোদ ছিলেন। এ প্রবন্ধে আমরা তাঁহাকে বিদ্যা-বিনোদ নামেই উল্লেখ করিব। উক্ত বিদ্যা-বিনোদ দ্বারা অতিথি-সৎকারের কোন ত্রুটি হইল না। বরং তাঁহার যত্নে ব্রহ্মচারী কয়েক দিন সেইখানেই থাকিলেন। কয়েক দিনে কথা-প্রসঙ্গে ব্রহ্মচারীর পরিচয় অনেকদূর জানা গেল। ব্রহ্মচারীর নাম—অন্নদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়; নৈকষ্য-কুলীন-সন্তান, বাড়ী চুঁচুড়া, মাতুলালয় কলিকাতা-আহীরীটোলায়। পিতা মহেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় যোধপুর-রাজসংসারে একজন প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। ঐ সময়ে চিতোরে তাঁহার জন্ম হয়। এ নিমিত্ত উর্দ্দু ও হিন্দী মাতৃভাষার ন্যায় তাঁহার আয়ত্ত। ইংরেজীতে তিনি বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। মাতার মৃত্যুর পর তাঁহার পিতা দেশে আসিয়া পুনর্ব্বার বিবাহ করিয়াছেন। তদবধি তিনি দেশেই আছেন। এ পক্ষেও তাঁহার কয়েকটী সন্তান হইয়াছে। নূতন ব্রহ্মচারী বা অন্নদাপ্রসাদ বাল্যাবধি অতি দুর্দ্দান্ত-স্বভাব বলিয়া বিমাতা তাঁহাকে দেখিতে পারেন না। বিশেষতঃ সৎ-সম্পর্কের দোষ আছে। তার উপর পিতা স্ত্রৈণ, এজন্য পিতার সঙ্গে বিবাদ-বিসংবাদও হইয়া গিয়াছে। ক্রমে গুরুশাসন-লঙ্ঘনের সঙ্গে যৌবন-ধর্ম্মের যোগ হইল। অবস্থা ভাল ছিল। কুলীনে কন্যা সমর্পণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার মাতামহ নিজ পুত্রদ্বয়ের সহিত কন্যাকেও বাটীর ও বিষয়-সম্পত্তির তৃতীয়াংশ রীতিমত দিয়া গিয়াছিলেন। কলিকাতা-স্থিত ঐ মাতুলালয়ে মাতামহ-দত্ত বাটীতে থাকিয়া অসৎ-সংসর্গে উচ্ছৃঙ্খলতা চরমসীমা প্রাপ্ত হইল। যাহা কিছু ঐশ্বর্য্য-সম্পত্তি ছিল, তাহা, বাটীখানি পর্য্যন্ত, অপার ব্যসনার্ণবে বিলুপ্ত হইয়া গেল। সর্ব্বস্বান্ত হইয়া ব্রহ্মচারী জী একদিন আত্মহত্যার উদ্যম করিয়াছিলেন, উদ্যম সফল হয় নাই। তৎপরে দেশত্যাগ করিয়া কয়েক বৎসর উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে নিষ্পাপ-চরিত্রে নিরবলম্বনে ভ্রমণ করিতেছেন। কিছুদিন হইতে মধ্য-ভারতে নর্ম্মদাখণ্ডেই স্থায়ী হইয়া আছেন। সম্প্রতি

এদেশে আসিবার প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করিয়াও বিদ্যাবিনোদ অনেক কথা জানিতে পারিলেন। ব্রহ্মচারী কহিলেন,—"সংসারত্যাগী সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রকৃত ভাল লোক আমি দেখিতে পাই না। কাশীধামে অমুক অমুক স্বামী জীকে দেখিয়াছি। আমাদের মত সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারীর সঙ্গে তাঁহারা দেখা করিতেই চান না; কেননা, তাহাতে সম্মান বা অর্থলাভের প্রত্যাশা নাই। অথচ রাজা-মহারাজগণের সহিত সাক্ষাতে তাঁহারা কতই উৎসুক, কতই আগ্রহশীল! তাঁহাদের অধিকাংশই ত্যাগী হইয়াও ভোগী। কেহ স্বয়ং অর্থগ্রহণে বিতৃষ্ণা দেখাইয়া শিষ্য দ্বারা তাহা সংগ্রহ করেন। এইরূপে সংগৃহীত অর্থ কেহ কেহ দেশস্থ স্ত্রী-পুত্রাদির নিমিত্তও পাঠাইয়া থাকেন। যিনি তাহা না করেন, তিনি দশজন চেলা বা শিষ্যকে উহা ভোগ করিতে দিয়াও নিজের মাহাত্ম্য ও ঐশ্বর্য্য-প্রদর্শন-জনিত সুখে মত্ত থাকেন। ফলতঃ আকাঙ্ক্ষা ও আসক্তির হাত তাঁহারা এড়াইতে পারেন নাই। কিছুদিন সহবাস করিলেই অনেক যশস্বীর যশের ভাস্বর আবরণ উন্মুক্ত হইয়া যায় ও তখন পরম-যত্নে আবৃত নিভৃত-নিকেতন হইতে অন্ধকাররাশি দেখা দেয়। তদপেক্ষা গৃহী-লোকদিগের মধ্যে অনেক স্থানে যথার্থ নিষ্ঠাবান্ ধার্ম্মিক সাধুলোক এখনও দেখা যায়। আমি নানা সম্প্রদায়ে শৈব, বৈষ্ণব, সাধু-সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারীর সঙ্গে বাস করিয়া বড়ই অসুখ বোধ করিয়াছি। নর্ম্মদাখণ্ড এ সম্বন্ধে অনেকটা ভাল, কাশীধামের ন্যায় ভৈরবীর উৎপাত তথায় একবারেই নাই। সেখানে ব্রহ্মচারীদিগের প্রখর শাসনে কেহ বড় একটা অগ্রসর হয় না। মহাশয়! দেশের অবস্থা এখন নানা প্রকারেই শোচনীয়। তত্ত্ব সম্বন্ধে কোন জিজ্ঞাসার রীতিমত সদুত্তর কোথাও পাই না, অন্ততঃ যাহা পাই, তাহাতে তৃপ্তি হয় না। তান্ত্রিক এখনও যাহা কিছু ভাল লোক আছে, তাহা বাঙ্গালী-তেই আছে। তন্মধ্যে আপনার জ্যেষ্ঠতাত মহাশয়কে একজন প্রধান লোক বলিয়া বিশ্বস্ত-সূত্রে আমার শোনা আছে। কি শাস্ত্রজ্ঞানে, কি সাধনামার্গে তাঁহার তুল্যকক্ষ আজিকালি কাহাকেই শুনিতে পাই না। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকারই এ যাত্রার প্রয়োজন ছিল। তাহা এ যাত্রায় ঘটিল না দেখিতেছি।" বিদ্যানোদ কহিলেন,—"আপনি আর দুই পাঁচ দিন অপেক্ষা করুন, নিশ্চয় সাক্ষাৎ হইবে।" তাহাই হইল। ঠাকুর বাটী আসিলেন, ব্রহ্মচারীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ও আলাপ হইল। আলাপে তিনি বড় তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলেন না। কেনন', অবস্থার অনুরূপ তাহার ব্যবহার নহে। ব্রহ্মচারী বড়ই বাক্যবাগীশ, স্বভাবও কিছু চঞ্চল, কিছু উদ্ধতও বটে। শিষ্টতা অতি কম, পরনিন্দায় বড় প্রবৃত্তি। এ সকল দোষ কিন্তু পরিচিত অনেকেই দোষ বলিয়া ধরিল না, অথবা পরিচয় ও প্রণয়ের চক্ষে এইরূপ সামঞ্জস্য করিয়া লইল যে, ব্রহ্মচারীর বয়স যেমন অল্প, অবস্থাও খুব ভাল ছিল; সে অবস্থায় প্রশ্রয় ও স্বাধীনতাও যথেষ্ট পাইয়া তাহাতে অভ্যস্ত হইয়াছিল। তারপর এখন ত উহার অসামাজিক অবস্থা; এ অবস্থায় সাধারণের সহিত উহার খাতিরেরই বা প্রয়োজন কি? অতএব উহার এরূপ স্বভাব হওয়া বিচিত্র নহে। কেহ কেহ এইরূপ বুঝিয়া ঠাকুরকেও ঐরূপ বুঝাইয়া দিল। সে যাহা হউক, লোক-বশীকরণপক্ষে ব্রহ্মচারীর বাক্‌শক্তির মহিমা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। ব্রহ্মচারী যখন তাহার সাম্প্রতিক বাসস্থান নর্ম্মদাখণ্ডের কথা কহিত,—বিন্ধ্যাচল ভেদ করিয়া নর্ম্মদার সেই খরস্রোতে প্রধাবন, সেই অমৃততুল্য জলে স্নান-পান, তীরে বহুদূরব্যাপী অরণ্যে অযত্ন-সুলভ কন্দমূলের অপূর্ব্ব আস্বাদ, তট হইতেই

ক্রমোন্নত উত্তুঙ্গ শৈলশ্রেণীর দুরারোহ কঠোর অবয়ব, কঠোরতাতেও সেই সজ্জাত-কঠিনাবয়বে অপূর্ব্ব শোভা-সৌকুমার্য্যের সমাবেশ, তত্রত্য ব্রহ্মচারীদিগের তপশ্চর্য্যা, নর্ম্মদার অশ্রান্ত "হর হর" ধ্বনির সহিত সুসম্মিলিত তাঁহাদিগের স্বাধ্যায়ধ্বনি, সায়ংকালীন সমস্বরোচ্চারিত তাঁহাদিগের স্তোত্রপাঠ-শব্দ, এই সকল বর্ণনা করিত,—অনুরক্ত বিরক্ত সকলকেই তখন তাহা শুনিয়া মুগ্ধ হইতে হইত। যখন ব্রহ্মচারী উপযুক্ত শ্রোতার নিকট সাবধানে মধ্যভারত ও রাজপুতানা প্রদেশে তদ্দেশীয় রাজগণের ও ইংরেজরাজের অবলম্বিত রাজনীতির রহস্য ও পরস্পারের চাতুর্য্যময় ব্যবহার সকল ব্যক্ত করিত,—সুচতুর ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট কিরূপ তাহাদিগকে আপন রেসিডেণ্টের মুষ্টিমধ্যগত বলিয়া সর্ব্বত্র প্রচার করেন, অথচ প্রকৃতপক্ষে তাহারা কিরূপ শক্তিশালী ও অধৃষ্য, সন্ন্যাসী-বেশী ইংরেজের গুপ্তচর কতরূপে সেই রাজাদিগের নিকট বিচরণ করিতেছে, অথচ উক্ত রাজগণ ঐ সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়কে কেমন অবিশ্বস্ত ও কঠোর-নেত্রে নিরীক্ষণ করেন, প্রমাণ উদাহরণ সহ যখন তাহা কীর্ত্তন করিত, —বিচক্ষণ ব্যক্তিমাত্রই তাহা শুনিতে অদম্য উৎসাহশীল হইয়া উঠিতেন। যখন ব্রহ্মচারী তাহার জন্মস্থান চিতোরের গল্প আরম্ভ করিত, —বলিষ্ঠ সর্দ্দার ও রাজ-পরিবারস্থ বালকগণের সহিত অশ্বারোহণে ভ্রমণ, ধাবন ও ক্রীড়াকুর্দ্দনের কথা বলিত,—রাজান্তঃপুরের আচার-ব্যবহার-প্রণালীর বিচিত্রতা বিবৃত করিত,—চিতোরের অজেয় শৈল-দুর্গের ও তৎসঙ্গে বীরকেশরী প্রতাপসিংহের অদ্ভুত স্বদেশ-প্রেমিকতা ও সাহসিকতা এবং তন্নিবন্ধন দিল্লীশ্বরের সহিত জীবনব্যাপী সংগ্রামে অলৌকিক কষ্টসহিষ্ণুতা ও বিস্ময়কর বীরত্বকাহিনী কীর্ত্তন করিত,—কোন্ ভীরু ও দুর্ব্বল তাহা শুনিতে শুনিতে আপন ভীরুতা ও দুর্ব্বলতা ভুলিয়া মুহূর্ত্তের নিমিত্ত বীরজীবনে উজ্জীবিত না হইত! শেষে আত্মচরিত কীর্ত্তন করিতে করিতে যখন নিজ জননীর আকস্মিক কলেরার জীবনান্ত ও তৎপূর্ব্বক্ষণে এই শিশুকে বক্ষে ধরিয়া, তাহার পিতার হস্তে তাহাকে সযত্নে রক্ষার নিমিত্ত সনির্ব্বন্ধ প্রার্থনা করিয়া তাঁহার কথাশেষাবস্থায় উপস্থিতি বর্ণন করিত, কে তখন সমবেদনায় সমাকুল না হইয়া থাকিতে পারিত? ফলতঃ এই বাক্‌শক্তিতেই ব্রহ্মচারীর জয় হইয়াছিল। সে বৃত্তান্ত গল্প-সমাপ্তিতে পাঠক আপনিই বুঝিতে পারিবেন।

ব্রহ্মচারীর অভিপ্রায় ক্রমে প্রকাশিত হইল। ঠাকুরের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিতে তাহার অভিলাষ। ব্রহ্মচারীর এই এক গুণ ছিল যে, সে ঠিক্ ধরিতে পারিত; শ্রেষ্ঠ গুরুই সে নির্ব্বাচন করিয়াছিল। আর তাহার সে গুণ না থাকিলেও আমাদের ঠাকুর বড় অধিকক্ষণ কাহারও অপরিচিত থাকিতেন না। তাঁহার বিলম্বিত শ্বেতশ্মশ্রুভার, প্রসন্ন-গম্ভীর মূর্ত্তি, স্নিগ্ধোজ্জ্বল দৃষ্টি, তপ্তকাঞ্চনাভ বর্ণ মুহূর্ত্ত-মধ্যে সকলকে তাঁহার প্রভাবের পরিচয় দিয়া দিত। সে যাহা হউক, ঠাকুর কিন্তু দীক্ষিত করিতে সম্মত হইলেন না। তখন তাঁহার কন্যা ও ভ্রাতুষ্পুত্র ব্রহ্মচারীর পক্ষ হইতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। এবারে ব্রহ্মচারীর ইষ্টসিদ্ধি হইল।

কিছুকাল পরে, পদ্মাপারে নাটোর-নিবাসী কোন সম্পন্ন শিষ্যের আলয়ে ঠাকুরের যাইবার প্রয়োজন হইল। ঐ শিষ্য দশমহাবিদ্যার এক একখানি প্রতিমা নির্ম্মাণপূর্ব্বক পর্ব্বে পর্ব্বে মহাবিদ্যার অর্চ্চনা এবং অভীষ্টদেব দ্বারাই ঐ অর্চ্চনা-সমাধানের মানস করিয়া, তাঁহার আগমনের নিমিত্ত সংবাদ লিখিয়াছিলেন। তদনুসারে ঠাকুর যথাসময়ে শিষ্যালয়ে উপনীত হইলেন। ভৃত্য, পাচকব্রাহ্মণ ও নিজ কন্যা ব্যতীত এই নূতন দীক্ষিত ব্রহ্মচারীও ঠাকুরের সঙ্গে গিয়াছিল। ক্রমে মহাসমারোহে সঙ্কল্পিত পূজা আরম্ভ হইল। ব্রহ্মচারী পূজা-কার্য্যেও ঠাকুরের যথেষ্ট সহকারিতা ও পরিচর্য্যা করিয়াছিল। প্রত্যেক মহাবিদ্যার পূজার পূর্ব্বে ঠাকুর ঐ ঐ দেবতার বীজোদ্ধার, আবরণ-শক্ত্যাদি, ধ্যান, স্তব, কবচ, হৃদয়, রহস্য, উপনিষৎ, শতনাম, সহস্রনাম ও কূট-নামাবলী যেমন যেমন উপদেশ দিয়া দিতেন, কার্য্যকালে ব্রহ্মচারীও সেইরূপ তন্ত্র-ধারকতা করিত, প্রয়োজন মত পূজা পদ্ধতিও লিখিত। যত্নপূর্ব্বক পূজার প্রাপ্ত ও প্রাপ্তব্য টাকা-কড়ির জমা-খরচ রাখিত। অবসর-কালে উপসনাঙ্গীভূত নানা কথা ঠাকুরের নিকট উত্থাপন করিত, ঠাকুর ঐ সকল প্রশ্নের সবিস্তর উত্তর করিতে করিতে শিষ্যের অনুসন্ধান ও অনুশীলন-প্রবৃত্তি দেখিয়া সন্তোষ লাভ করিতেন। কয়েক পূজার পর ঠাকুরের শারীরিক অস্বাস্থ্য উপস্থিত হওয়ায় তিনি তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রকে আসিতে সংবাদ লিখিলেন। সংবাদ পাইয়া বিদ্যাবিনোদ নাটোরে উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া শুনিলেন, ঠাকুরের বড়ই অসুখ হইয়াছিল। সেই অসুখের সময় ব্রহ্মচারী যেরূপ তাঁহার সেবা-শুশ্রূষা করিয়াছে, তিনি তেমন পারেন কিনা সন্দেহ। কয়েক দিন সমস্ত রাত্রি জাগিয়া ঘড়ি ধরিয়া ঔষধ খাওয়াইয়াছে। তদ্ভিন্ন, বাবুদের সহিত পরামর্শ, ডাক্তারদের সহ তর্ক-বিতর্ক, পথ্য-প্রস্তুতের আয়োজন, এই সকল কার্য্যে দিবা রাত্রি তাহার অবসর ছিল না। বিদ্যাবিনোদ শুনিয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন। একদিন তিনি ঐ কথা তুলিয়া ব্রহ্মচারীর প্রশংসা করিতেছেন, ব্রহ্মচারী সে কথা চাপা দিয়া কহিল, "আসুন দাদা! আমার একটু কাজ করিয়া দিন্। এই দেখুন, কেমন চণ্ডী আনাইয়াছি। এখানি বড় দরকারি না?"

বিদ্যা। হাঁ, বিশেষ দরকারি। চণ্ডী, গীতা এ সকল মন্ত্রাত্মক বস্তু। আগে ব্রাহ্মণের উহা নিত্য-পাঠ্য ছিল।

ব্রহ্ম। উহা আমাকে এক-একটু করিয়া বলিয়া দিতে হইবে। ঠাকুরের কাছে দুই এক দিন বলিয়া লইয়াছিলাম, কিন্তু উচ্চারণে হ্রস্বদীর্ঘ আমার বেশ ঠিক্ হয় না, বড় লজ্জা করে। প্রথম থেকে ইংরেজী পড়িলে সংস্কৃত উচ্চারণে ঐরূপ গোল হয়।

বিদ্যা। ঠিক বলিয়াছ। অনেক স্কুল-কলেজের ছেলের আমি ঐ দোষ দেখিয়াছি।

ব্রহ্ম। আমি পড়িয়া যাইব, আপনি বেশ করিয়া ধরিয়া দিবেন,—যেখানে অশুদ্ধ হয়। অশুদ্ধ উচ্চারণ শুনিলে হিন্দুস্থানী সন্ন্যাসীরা বড় হাসে। ভাল কথা, সন্ন্যাসীদের সঙ্গে তর্ক করা যায়, এমন কি আছে? আমার সঙ্গে তর্কে কেহ পারে না। আমি একদিক্-না-একদিক্ ধরিয়া উহাদিগকে ঠকাইয়া দিই। কিন্তু তর্কের একটা আগাগোড়া, একটা মোটা কথা জানিয়া রাখা চাই। তাহার উপায় কিছু হয় কি না?

বিদ্যা। উপায় কতক হয় বৈ কি। সন্ন্যাসীদের সঙ্গে তর্ক বিতর্ক করিতে হইলে একটু বেদান্ত জানার প্রয়োজন। তা, তোমার বেশ তর্কশক্তি আছে, একটু পড়িতে পারিলে ভালই হয়।

ব্রহ্ম। আর দাদা, বেদান্ত-দর্শন নিয়া আর এ বয়সে বিদ্যা করা যায়? সে এক গাড়ি!

বিদ্যা। না, না, বেদান্তদর্শন পড়িতে হইবে না। অতিক্ষুদ্র একখানি পুস্তক আছে, তার নাম বেদান্তসার। সেখানি আমি পড়াইয়া দিব। তাহাতেই তোমার আপাততঃ কাজ চলিবে ও তাহাতেই তোমার অধিকার ও আগ্রহ হইবে।

তখন তুমি পঞ্চদশী খানা পড়িতে পারিলে আর ভাবনা কি?

ব্রহ্ম। আঃ, তাহা হইলে ত আমি তর্কের রাজা হই, হিন্দুস্থান জয় করি। আপনি বেদান্ত-সার আনিতে লিখিয়া দিন। দেখুন, বিবাহ-বিভ্রাট্ দেখিবেন?

বিদ্যা। বিবাহ-বিভ্রাট্ কোথা পাইব?

ব্রহ্ম। চাই? বলুন না। আমি এখনি আনাইতে পারি। অমৃতকে নিখিলে এখনি পাঠাইয়া দিবে। চিরকালটা তাহার সঙ্গে একত্র বেড়াইয়াছি। একত্র থিয়েটার করিয়াছি। এক-বার একসঙ্গে নেপাল পলাইয়াছিলাম। এখন সে ষ্টার-থিয়েটারের ম্যানেজার। লোকটা ফার্স লিখিতে বড় মজবুত।

বিদ্যা। তার আর কথা! নাটকে গিরিশ-ঘোষ, আর প্রহসনে অমৃত বোস্। আমি বিবাহ-বিভ্রাটের অভিনয় দেখিয়াছি, আর নবজীবনে কোন শ্রেষ্ঠ সমালোচকের সমালোচনাও দেখিয়াছি। সে বই অপূর্ব্ব বটে। তা অমৃত বাবু তোমার যদি বাল্যবন্ধু হন, একখানা চিঠী লেখ না।

তখনি চিঠী লেখা হইল। ব্রহ্মচারীর কোন কার্য্যে আলস্য ছিল না। লোকটা কথাবার্ত্তায় যেমন দ্রুত-ভাষী, কার্য্যেও তেমনি ক্ষিপ্রকারী।

ঠাকুরের অসুস্থ অবস্থায় বিদ্যাবিনোদ কয়েক পূজা সম্পন্ন করিলেন। এই কয়েক দিনে ঠাকুরও সুস্থ হইলেন। তখন তিনি তাঁহার কন্যাকে লইয়া বিদ্যাবিনোদকে কলিকাতা হইয়া বাটী যাইতে আদেশ করিলেন। ব্রহ্মচারীও তাহার স্বদেশ কলিকাতা হইয়া নর্ম্মদা-খণ্ডে যাইবার মানস প্রকাশ করিয়াছিল, তাহাকেও বিদ্যাবিনোদের সঙ্গে কলিকাতা যাইতে অনুমতি করিলেন। এইরূপে ১০ই মাঘ ইহাঁদের কলিকাতা আশা ঘটিল।

কলিকাতা আসিবার সময় ঠাকুর, পূজার প্রাপ্ত নগদ ৩০০৲ টাকার তিন কেতা নোট গাঁথাইয়া বিদ্যাবিনোদের সঙ্গে দিয়াছিলেন। সঙ্গে একটা বিলাতি তোরঙ্গে ভাল ভাল রেশমি কাপড় ও ঐ নোট তিনখানি, নগদ ৫০৲ টাকা ও কয়েকখানি সোণার গহনা রাখা হইয়াছিল। উহার চাবি ঠাকুরের কন্যা স্বয়ং রাখিতেন। প্রয়োজনমতে কখন বা ব্রহ্মচারীকে ঐ তোরঙ্গ খুলিতে চাবি দিতেন। কার্য্য-সমাধান হইলে ব্রহ্মচারী তোরঙ্গ বন্ধ করিয়া চাবি ফিরাইয়া দিত। একদিন তিনি তোরঙ্গ হইতে ১ জোড়া আলোয়ান বাহির করিয়া বলিলেন, "ভাই! তুমি কলিকাতায় আসিয়াছ, খড়ম ছাড়, জুতা কিনিয়া দিতেছি, পায়ে দাও; আর যখন বাহির হইবে, এই আলোয়ান গায়ে দিয়া বাহির হইও।" ব্রহ্মচারী অসম্মতি প্রকাশ করিলে তিনি কহিলেন, "দোষ কি? তুমি ত ভাই হও, ভাইকে লোকে যেমন ঐ সব সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য জিনিষ কিনিয়া দিয়া থাকে, আমিও তোমায় সেইভাবে সেই সব জিনিষ কিনিয়া দিতেছি। আর বাবাও তোমায় বিবাহ করিয়া গৃহী হইতে আজ্ঞা করিয়াছেন। তুমি কেন আমাদের কথায় ও-সব বেশ না ছাড়িবে?" ব্রহ্মচারী ইহাঁর কথা সব শুনিতে ইচ্ছা করিল না, সব শুনিলও না, খড়ম কিছুতেই ছাড়িল না, আলোয়ান মধ্যে মধ্যে ব্যবহার করিতে লাগিল।

কলিকাতা আসিয়া বেদান্তসার কেনা হইল, কিন্তু পড়া আর হইল না। এখন ব্রহ্মচারীর মন অন্য পাঠে নিবিষ্ট হইয়াছিল। আমরা ক্রমে সেই বিবরণ প্রকাশ করিব এবং এখন হইতে ব্রহ্মচারী না বলিয়া ইহার নিজ-কথিত অন্নদাপ্রসাদ নামেই ইহাকে আমরা উল্লেখ করিব।

একদিন (১৫ই মাঘ) মধ্যাহ্ন সময়ে অন্নদার মুখ বড়ই ম্লান বোধ হইল, নিত্য-

কার্য্যেও যেন তাহার ঔদাস্য জন্মিয়াছে। সকালে উঠিয়াই স্নানে গিয়াছিল, ১১টার সময় বাসায় আসিল। আহ্নিক পূজাও তাহার শীঘ্র শীঘ্র সারা হইল। জল খাইতে বসিলে জল বই আর কিছুই খাইল না। জিজ্ঞাসা করিলে বলে, "ক্ষুধা নাই।" চক্ষু দীনভাব ধারণ করিয়াছে, অথচ কারণ জিজ্ঞাসিলে শুষ্ক হাসি হাসিয়া বলে, "না, দুঃখ কিছুই নাই।" ঠাকুরের কন্যা অনেক বিবেচনা করিলেন। ভাবিলেন, নিমতলার ঘাটে স্নান করিতে যাইতেছি, বলিয়া গিয়াছিল, তা সেখানে দাহাদি দেখিয়া শুনিয়া কি মনে এরূপ নির্ব্বেদ-বৈরাগ্য হইয়াছে? অথবা উহার দুঃখের অভাব কি? নিকটেই আপন-বাড়ী, অথচ সে বাড়ী পরের হইয়াছে, চতুর্দ্দিকে আত্মীয় বন্ধু কত রহিয়াছে, অথচ হীনাবস্থার নিমিত্ত কাহারও সহিত দেখা করিবার যো নাই। চিরপরিচিত ও বাল্য-কৈশোর-ক্রীড়া-কৌতুকের স্থানে সেই ক্রীড়া-সহচরদিগের বিচরণ-স্থানে অপরিচিত অনভ্যস্ত দীনবেশে লুক্কায়িতের ন্যায় থাকিয়া কালযাপন করা কতই কষ্টকর! অন্নদা ত একদিন বলিয়াছিল, আমি দূর হইতে আপনাদিগকে বাড়ী দেখাইব, কাছে যাইতে পারিব না। এই সকল ভাবিয়া, তিনি অধিকতর দুঃখার্দ্রই হইলেন, তাহাকে আর কিছুই বলিতে পারিলেন না। অন্নদা স্ফূর্ত্তিকে টানিয়া আনিয়া সকলকে সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। আহারান্তে কহিল, "দিদি, তোরঙ্গের চাবিটা দেন ত, দাদা কাপড়গুলো এলো-মেলো করিয়া ফেলিয়া গিয়াছেন, গুছাইয়া রাখি।" তৎপূর্ব্বদিনে বিদ্যাবিনোদ শ্রীরামপুরে তাঁহার ছেলে-পিলেগুলিকে দেখিতে গিয়াছিলেন ও যাইবার সময় ব্যস্ততায় কাপড়-গুলি বস্তুতই তুলিয়া রাখিয়া যান নাই। শ্রীমতী আহারান্তে শয়ন করিয়াছেন, অন্নদা অগ্রসর হইলে, তাহার হস্তে চাবিটী দিলেন। অন্নদা তোরঙ্গ খুলিয়া কাপড় গুছাইয়া তাহাতে রাখিয়া তোরঙ্গ বন্ধ করিয়া চাবি পুনর্ব্বার তাঁহার হস্তে দিয়া আসিল। পরে দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া, কহিতে লাগিল, "আমার আত্মীয় হরি নামে একটী ছেলে, খিদিরপুরে তাদের বাড়ী, হ'রের মার জ্বর-বিকারের সংবাদ পাইয়াছি, তাঁকে একবার দেখিতে যাব, মনটা কিছু অস্থির আছে।" শ্রীমতী কহিলেন, "যাবে, যাও, মনটা বড় অস্থির হইয়াছে, দেখিয়া এসগে, রাত্রি করিও না।" অন্নদা কহিল, "আসিব বৈ কি, তবে খিদিরপুর অনেকটুকু, আসিতে রাত্রি হইবে, আপনি কোন চিন্তা করিবেন না।" বলিয়া ঘর হইতে বাহির হইল। শ্রীমতী বলিলেন, "রাত্রিতে সেখানে থাকিও না, দেখিয়া চলিয়া আসিবে, অবশ্য অবশ্য আসিও।" এইরূপ কথা কয়েকটীর উত্তরে অন্নদা দুই চারিটী হুঁ মাত্র দিয়া দ্রুতপদে হন্‌হন্ করিয়া চলিয়া গেল। বাহিরে বাবুরা তখনি আপিসে যাইবেন, তাঁহারা একটু অপেক্ষা করিতে বলিলেও অপেক্ষা করিল না।

অন্নদা যে-গেল সেই-গেল, আর ফিরে না। বিদ্যাবিনোদ শ্রীরামপুর হইতে বেলা ৩ টার সময় আসিয়া শুনিলেন, অন্নদা তৎপূর্ব্বেই বেলা ২ টার সময় খিদিরপুরে তাহার আত্মীয় হ'রের মাকে দেখিতে গিয়াছে। কিন্তু তৎপর দিনও অন্নদা আসে না। সকলেই তর্ক-বিতর্ক আরম্ভ করিলেন। অন্নদার আত্মীয়া নিশ্চয়ই মুমূর্ষু, না হয় মারা পড়িয়াছে, এইরূপই সিদ্ধান্ত হইল। কিন্তু এ সিদ্ধান্ত অধিক ক্ষণ স্থায়ী হইল না। ক্ষণকাল পরে তোরঙ্গ খুলিবার প্রয়োজন হইলে খুলিয়া দেখা হইল ৩০০৲ টাকার নোট তিনখানি যে উপরেই থাকিত, তাহা নাই, অলঙ্কারের মধ্যে হার-ছড়াটীও নাই, আর আলোয়ান ত অন্নদা গায়ে দিয়াই

বাহির হইয়াছে। কি সর্ব্বনাশ! তবে কি তার চুরি! না, এমন হবে না। সংশয়াকুল-চিত্তে দশবার তোরঙ্গের কাপড়-চোপড় নামাইয়া তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া দেখা হইল। ঐ ঐ জিনিষ নাই। তবে অন্নদার এ চুরিই নিশ্চয়; কিন্তু বিশ্বাস যে হয় না। কি সর্ব্বনাশ, এমন কাজ সে করিতে পারিবে? কিন্তু হার পর্য্যন্ত নাই, চুরি বৈ কি! যাহা হউক, নোটের নম্বর আনাইবার জন্য সেই রাত্রেই নাটোরে টেলিগ্রাম করা হইল, কিন্তু তাহাও অতি চুপে-চুপে! কি জানি, এখনি যদি অন্নদা খড়ম পায়ে দিয়া খট্‌খট্ করিয়া আসিয়া বলে, "আমার উপর সন্দেহ? আমি আপদের মন পরীক্ষা করিতেছিলাম, ইহাতেই এতদূর?" যাহা হউক, সে রাত্রি বিতর্কে বিস্ময়ে সন্দেহেই গেল। পরদিন জোড়াসাঁকো পুলিশের ইন্‌স্পেক্টরকে যাইয়া সকল কথা বলাতে তিনি বলিলেন, "মহাশয়! সে টাকা পাইবার আর আশা নাই, আপনারা তাহার কথা যেরূপ বর্ণনা করিলেন, সে-রকম লেখা-পড়া জানা ধূর্ত্ত ছেলে নোট ভাঙ্গাইতে আর বাকি রাখে নাই। ১০৲ টাকা করিয়া ত্রিশ খানা নোট লইয়া সে নিশ্চিন্ত হইয়াছে। তাহার আর উপায় হইবে না। তবে নোটের নম্বর লইয়া কল্য করেন্‌সি আপিসে যাইয়া সন্ধান করিবেন, কিরূপে ভাঙ্গাইয়াছে। আমি আপনাদের সঙ্গে পুলিশের লোক দিব।"

থানা হইতে আসিয়া অন্নদার বর্ণিতানুরূপ তাহার পরিচিত স্থান সকল সন্ধান করা গেল। অ্যাড্‌মিনিষ্ট্রেটর জেনেরল আপিসের নিরঞ্জন-বাবুকে পিস্‌তুতো ভাই বলিয়া গল্প করিত। তাঁহার নিকট যাইয়া জানা গেল, কোন-পুরুষেও তাহার সহিত তাঁহার সম্পর্ক নাই। তবে পরিচয় আছে, তাহাও অল্পদিনের। পূজার ছুটীতে তিনি যখন তারাপুরে যান, তখন অন্নদার সহিত তথায় তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। তৎপরে তাঁহার কলিকাতার বাটীতে আসিয়াও সে কিছুদিন ছিল, এই পর্য্যন্ত।

ষ্টার থিয়েটরের ম্যানেজার বাবু অমৃতলাল বসুর নিকট যাইয়া বিদ্যাবিনোদ জিজ্ঞাসিলেন, "আপনার বাল্যবন্ধু অন্নদাচরণ মুখোপাধ্যায় নামে কেহ আছে কি?" তিনি অনেক চিন্তা করিয়া বলিলেন, "আমি ত স্মরণ করিতে পারিলাম না; বৃত্তান্ত কি, আপনারা সবিস্তর বলুন।" বিদ্যাবিনোদ কহিলেন, "আপনার বিবাহ-বিভ্রাট পুস্তক চাহিয়া পাঠানতে আপনি ঐখানি ও তাজ্জবব্যাপার পর্য্যন্ত ঐ নামে নাটোরে উপহার পাঠাইয়াছিলেন, কিছুই স্মরণ হয় না বলিবে চলিবে কেন?" তখন অমৃতবাবু বলিলেন, "হাঁ স্মরণ হইল, বিবাহ-বিভ্রাট পাঠাইবার নিমিত্ত লেখা হইয়াছিল এবং তাহাতে 'মাইডিয়ার অমৃতবাবু' বলিয়া সম্বোধন করিয়া শেষে সাটে দস্তখত করা হইয়াছিল। সেই অবধিই আমার সন্দেহ। মাইডিয়ারের মধ্যে আমার অমনতর কেহ নাই এবং ঐ দস্তখত বা লেখাও আমার পরিচিত নহে। আপনারা বলিতেছেন, আপনারা বিবাহ-বিভ্রাট পাইয়াছেন, তাজ্জব-ব্যাপার পর্য্যন্ত পাইয়াছেন! এ বড় তাজ্জব-ব্যাপার বটে। কিন্তু দেখুন, বিবাহ-বিভ্রাটের বর্ত্তমান এডিশন আমি গুরুদাস বাবুকে দিয়াছি, নিজের প্রয়োজন হইলেও তাহা আমাকে তাঁহার নিকট চাহিয়া আনিতে হয়। আমার উহা উপহার পাঠাইবার সম্ভাবনা কি?" যাহা হউক, শেষে তিনি অন্নদার বৃত্তান্ত সবিস্তর শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। কহিলেন, "এখন যে বৎসর-বৎসর হাজার-হাজার ছেলে পাশ হইয়া বাহির হইতেছে, আর চাকরি না পাইয়া তাহারা নানাবৃত্তি অবলম্বনের নিমিত্ত লালায়িত হইয়া বেড়াইতেছে। তাহাদের মধ্যে যাহারা একটু চরিত্রহীন, তাহারা উদরের জ্বালায়

জ্ঞানহীন হইয়া সহজেই বদ্‌মায়েস হইয়া পড়ে; ঐ সকল শিক্ষিত বদ্‌মায়েসের হাত হইতে আত্মরক্ষা করা বড়ই কঠিন ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইল! ইহাদের জন্য সতর্ক না হইলে গবর্ণমেণ্টকে ব্যতিব্যস্ত হইতে হইবে দেখিতেছি।" এই বলিয়া তাঁহার নিজের সম্বন্ধে ঐরূপ প্রবঞ্চনার দুই একটী গল্প বলিয়া উপস্থিত সকলকে বিস্ময়ান্বিত করিলেন।

তথা হইতে আহীরীটোলা নিমুগোসাঁই-লেনস্থ তাহার মাতুলালয়ের সন্ধানে যাওয়া হইল। কিন্তু সেখানেও ফল পূর্ব্ববৎ। ঐ লেনের বাসেন্দা দুই একটী বিশিষ্ট লোক বলিলেন, "মহাশয়, আপনারা ভদ্রলোক, বড়ই প্রবঞ্চিত হইয়াছেন; এ লেনের মধ্যে সে নামের ও সে অবস্থার লোক বা তাহার কথিতানুরূপ বাড়ী নাই।" বলিয়া তাঁহারাও ঐরূপ দুই একটী ঘটনার উল্লেখ করিয়া বৃথা অনুসন্ধানে ক্ষান্ত হইতে বলিলেন। অগত্যা ইহাঁদিগকে অনুসন্ধানে ক্ষান্ত হইয়া হতাশচিত্তে বাসায় ফিরিতে হইল।

কিন্তু স্বয়ং অনুসন্ধানে ক্ষান্ত হইলে কি হয়, মন যে ক্ষান্ত হইতে চায় না, দুশ্চিন্তাও ক্ষান্ত হয় না। সর্ব্বদাই এই চিন্তা নানারূপে উঠিতে লাগিল যে, মানুষ কি এতদূর বিশ্বাস-ঘাতক হয়? যে বিশ্বাস ভঙ্গ করিলেও তাহা বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না, সে কেমনে বিশ্বাস-ঘাতকতা করে! কিন্তু হয় ত তাহার আন্তরিক এতদূর ইচ্ছা ছিলনা। নিতান্ত অরক্ষিত অবস্থা দেখিয়া ও সম্পূর্ণ সুযোগ পাইয়া হঠাৎ পাপের ও প্রলোভনের উত্তেজনায় এরূপ করিয়া বসিয়াছে। তাই সে-দিন তার মুখ অত ম্লান হইয়াছিল, অত অন্যমনস্কতা হইয়াছিল। হঠাৎ অতদূর পাপের তাড়না সহ্য করা কি সামান্য ব্যাপার? কিন্তু তাহাই বা কিরূপে বিশ্বাস হয়? তাহা হইলে এখানকার বাড়ীর কথা, আত্মীয় বন্ধুর কথা, সব মিথ্যা হইবে কেন? আবার দেখ, নগদ টাকাগুলি লয় নাই! শব্দ হইবে বলিয়াই যেন বোধ হয়। কিন্তু গহনাগুলি সব লয় নাই কেন? পুঁটলি হইবে বলিয়া? পুঁটলি হইলেই বা দেখিবার কে আছে? যে-বাসায় ছিল, বাসার বাবুদিগের সকলেরই যে বিশ্বাস জন্মাইয়া মোহিত করিয়া রাখিয়াছিল! কে সন্দেহ করিত যে, তাহার প্রতি সতর্কদৃষ্টি হইবে? আর গায়ে আলোয়ান জড়ানো, লইবার ত কোন অসুবিধা ছিল না। কি আশ্চর্য্য, এ রহস্য যে কিছুই বুঝা যায় না! আর, হ'রের মাকে দেখিতে যাইতেছি, ইহার অর্থ কি? অন্য সহস্র নাম থাকিতে "হ'রের মা" নাম কল্পনায় তাৎপর্য্য কি? ইহারা বোকা, বলিয়া হ'রের মা, হ'রের মা করিয়া বেড়াক্ ইহাই অভিপ্রায় না, কি? এ রহস্যও মন্দ নয়! যাহা হউক, অজ্ঞাত-কুলশীল ব্যক্তিকে এরূপ অতি বিশ্বাস করা বড়ই অবৈধ হইয়াছিল। অতি বিশ্বাস কেমন, মন্ত্রোপদেশ পর্য্যন্ত করান হইয়াছে। হায় হায়, যাহাতে পাপ-পুণ্যের সমভাগিতা জন্মে, এমন দীক্ষাব্যাপারে কেহ যেন অনুরোধ আবদার কাহার উপর না করে! কিন্তু জুয়াচুরির জন্য শিষ্য-সাজা ইহা কেহ কখন কি অনুমানেও আনিতে পারিয়াছেন? আর শিষ্যকে প্রাণ দিয়া বিশ্বাসই বা কোন্ গুরু না করেন? বরং পুত্রও কদাচিৎ বিগড়াইতে পারে, শিষ্য কখনই বিগড়ায় না, ইহাই ত সাধারণের ধারণা। এমন পবিত্র সম্পর্কেও দুরাত্মা কলঙ্কপঙ্ক নিক্ষেপ করিয়া সাধারণের অনাবিল চিত্তক্ষেত্রে সন্দেহ-কণ্টকের অদৃশ্য-বীজ বপন করিয়া দিল! দুর্ব্বৃত্তের আদ্যোপান্ত সমস্তই জুয়াচুরি! এ জুয়াচোরের শিক্ষা পাওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। সকলেরই পরামর্শ যে, নোটের নম্বর পাইলেই লালিশ-রুজু করা

হউক। বিদ্যাবিনোদ সেই মতেই সম্মতি দিলেন।

নোট গুলির নম্বর পঁহুছিলে পেপার-করেন্সি আপিসে সন্ধান করিয়া জানা গেল, উহার এক খানি নোট অমৃতকুমার বসু নামক মাণিকতলা ষ্ট্রীটের এক বাবু ভাঙ্গাইয়াছে। রায় অন্নদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় নামক ব্যক্তি অমৃতকুমারকে ঐ নোট দিয়া টাকা লইয়াছে। বুঝা গেল, এই অন্নদাপ্রসাদই প্রয়োজনবশে বড়লোক সাজিয়া রায় উপাধি লইয়াছেন। অমৃতকুমারের আড্ডাও মাণিকতলায় না হইয়া অমুক নম্বর গরাণহাটা, শুঁড়ি-দোকানের উপর এক বেশ্যালয়ে হইল। এতক্ষণে ঠিক পাওয়া গেল যে, এই অমৃতকুমারই ষ্টারের ম্যানেজার অমৃত বাবু হইয়া নাটোরে বিবাহ-বিভ্রাটাদি পুস্তক পাঠাইয়াছিলেন। কি আশ্চর্য্য, মানুষ যে কল্পনা করে, তাহাও কতকটা সত্যের আভাস লইয়া। নহিলে বুঝি কল্পনাই হয় না। দেখুন, কতকাংশে নিরঞ্জন বাবুকে পাওয়া গেল, কোন অংশে অমৃত বাবুও মিলিল। আরও যে পরে কতদূর কি পাওয়া যায়, তাহার ঠিক কি?

অমৃতকুমারকে পাওয়া গেল বটে, কিন্তু সে অন্নদার কথা বা তাহার নোট-ভাঙ্গানর কথা কিছুই কহে না, সবই উড়াইয়া দিতে চাহে। তখন পুনর্ব্বার ইন্‌স্পেক্টর বাবুকে বলিয়া পুলিশ সঙ্গে করিয়া আনায় তাহার মুখ অনেক সোজা হইল। বলিল, "ইতিপূর্ব্বে অন্নদার সঙ্গে কখনও পরিচয় ছিল না, এই প্রথম মাত্র। তা ভদ্রলোক দেখিয়া নোট রাখিয়া টাকা দিয়াছি, আমার দোষ কি? তার পর সে কোথায় গিয়াছে, কিরূপে জানিব?"

(ক্রমশঃ)

শ্রীশা—

সমালোচনা।

হাসি ও খেলা। 'জ্ঞান-মুকুল' প্রভৃতি প্রণেতা শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সরকার কর্ত্তৃক প্রণীত। কলিকাতা, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য ৷৵০ দশ আনা। ছোট ছোট ছেলেদের পড়িবার যোগ্য বই। বইখানির আকার প্রকার, ছাপা বাঁধা অতি পরিপাটী। যেমন কাগজ, তেমনই কালি, তেমনই অক্ষর, তেমনই ছবিগুলি;—চক্‌ চক্‌ ঝক্‌ ঝক্‌ করিতেছে। বইখানি হাতে পড়িলে হঠাৎ বিলাতী বই বলিয়া ভ্রম হয়। লেখা বেশ সরল, প্রাঞ্জল ও মনোজ্ঞ। ছোট ছোট ছেলেরা যাহাতে আমোদের সহিত শিক্ষা পায়, লেখক সে বিষয়ে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিয়াছেন। মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি, তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। এ শ্রেণীর গ্রন্থের বহুল প্রচারে আমরা সুখী হইব।

অনুশীলন। নূতন মাসিক পত্র ও সমালোচন। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয় ইহার তত্ত্বাবধায়ক। বিদ্যানিধি মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে 'অনুশীলন' বেশ দক্ষতার সহিত সম্পাদিত হইতেছে। অনেক নূতন লেখক নবানুরাগে, নূতন উৎসাহে, ইহাতে প্রবন্ধাদি লিখিতেছেন। 'অনুশীলনে' অনেক বিষয়েরই অনুশীলন হইয়া থাকে। বিদ্যানিধি মহাশয়, নিজে আমাদের দেশীয় রঙ্গভূমির এক দীর্ঘ ইতিবৃত্ত লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার বিস্তর অনুসন্ধান, গবেষণা ও তীক্ষ্ণদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। প্রবন্ধটী সম্পূর্ণ হইলে বাঙ্গালায় একটী নূতন জিনিষ হইবে। অনুশীলনে বেশ নিরপেক্ষ ও নির্ভীকভাবে গ্রন্থাদির সমালোচনা হইয়া থাকে। সমালোচক এজন্য আমাদের ধন্যবাদের পাত্র। কলিকাতা, ৭৭।১ নং মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট হইতে শ্রীযুক্ত গোবিন্দপ্রসাদ দে কর্ত্তৃক 'অনুশীলন' প্রকাশ হয়। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সহরে ১৵০ ও মফঃস্বলে ১।০ মাত্র। ইহার ক্রমোন্নতি দেখিলে আমরা সুখী হইব।

গুরু ও সাধন-তত্ত্ব। শ্রীযুক্ত কালীনাথ দত্ত প্রণীত। কলিকাতা, ২০১ নং কর্ণওয়ালিস্‌ষ্ট্রীটে শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট প্রাপ্তব্য। মূল্য ৷৷০ আনা। কালীনাথ বাবু একজন সুপণ্ডিত ও চিন্তাশীল ব্যক্তি। উপস্থিত গ্রন্থে তিনি যে বিষয়ের অনুশীলন করিয়াছেন, তাহা অতি গুরুতর ও গভীর রহস্যময়। গুরু আনুগত্য-ধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা যে কিরূপ, তাহা হিন্দুই জানেন। দত্তজ মহাশয় অতি দক্ষতার সহিত সেই গুরু-আনুগত্য ধর্ম্ম বুঝাইয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুর মায়াবাদও বুঝাইতে চেষ্টা পাইয়াছেন। ইহাতে প্রধানতঃ দুইটী প্রবন্ধ সন্নিবেশিত হইয়াছে। প্রথম,—গুরু-আনুগত্য-ধর্ম্ম; দ্বিতীয়,—বৈষ্ণব-তত্ত্ব। প্রথমটী, লেখক কোন সভায় পাঠ করেন; দ্বিতীয়টী ইতিপূর্ব্বে "নবজীবন" নামক মাসিকপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। 'বৈষ্ণব-তত্ত্বের' সুখ্যাতি লেখক অনেক পূর্ব্বেই পাইয়াছেন। নবজীবনে যখন এই বৈষ্ণব তত্ত্ব প্রকাশিত হয়, আমরা বিশেষ আগ্রহের সহিত উহা পাঠ করি। এখন সেই প্রবন্ধ পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে দেখিয়া আমরা বড় সুখী হইলাম। দত্তজ মহাশয়ের ধর্ম্ম-বিশ্বাস ও তাহাব বিচার-প্রণালীর সকল স্থলে আমরা একমত হইতে পারি নাই। একমত হইতে না পারি, কিন্তু একথা অম্লান-বদনে বলিতে পারি, ধর্ম্ম-পিপাসু ব্যক্তিগণ কালীনাথ বাবুর এই গ্রন্থ পড়িয়া অনেক শিক্ষা পাইবেন। তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, সূক্ষ্মদর্শিতা ও ধর্ম্মানুশীলন বুঝিবার জিনিষ।

দেব-নির্ব্বাসন বা গয়াসুর বধ। (পৌরাণিক ইতিবৃত্ত-মূলক দৃশ্যকাব্য) শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল রায় মিত্র প্রণীত ও শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র বসু কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ডাকমাশুলাদি ব্যয় ৵০ দুই আনা। কলিকাতা, ২৪।১ নং রাজাস্‌লেনে গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্তব্য। পৌরাণিক বিষয় অবলম্বনে, অমিত্রাক্ষর ছন্দে বইখানি লিখিত। স্থানে স্থানে কবিত্ব আছে।

বীণাপাণি। মাসিক পত্রিকা; কলিকাতা, ১৫৯ নং আহেরীটোলা ষ্ট্রীট হইতে শ্রীযুক্ত কুমারকৃষ্ণ মিত্র কর্ত্তৃক প্রকাশিত। বার্ষিক মূল্য ৸০ আনা। 'বীণাপাণি'র দ্বিতীয় বৎসর আরম্ভ হইয়াছে। অনেক নূতন লেখক ইহাতে লিখিয়া থাকেন। মধ্যে মধ্যে লেখা ভাল। ভাষার বিশুদ্ধতা রক্ষায় 'বীণাপাণি'র একটু খরদৃষ্টি থাকা প্রয়োজন।

প্রবাসের অস্ফুট-স্মৃতি। জনৈক আসাম-প্রবাসী প্রণীত। শিলং সাহিত্য-সভা হইতে প্রকাশিত। বাঙ্গালায় সুখপাঠ্য ভ্রমণ-বৃত্তান্তের বড় অভাব। যাহা দুই একখানি আছে, তাহাও আবার স্বকপোল-কল্পিত মনোবিজ্ঞানের বাড়াবাড়িতে পড়িতে ধৈর্য্যচ্যুতি হয়। "প্রবাসের অস্ফুট-স্মৃতি" সে শ্রেণীর গ্রন্থ নহে। ইহার ভাষা বেশ সরল ও মর্ম্মস্পর্শিনী; ভাব বেশ স্বাভাবিক ও মনোজ্ঞ; বর্ণনাও বেশ হৃদয়গ্রাহিণী ও সুললিত। লেখক লিপি-কুশল। তাঁহার লিখন-ভঙ্গিমায় আলোচ্য বিষয়গুলি ফুটিয়াছে ভাল। ইহাতে আসাম ও মণিপুর অঞ্চলের অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। আজিকার দিনের অনেক "সুপ্রসিদ্ধ" ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ববিদেরও তাহা দেখিবার জিনিষ। প্রবন্ধগুলি ইতিপূর্ব্বে কোন কোন সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। এরূপ সংগ্রহে সাহিত্যের উপকার আছে।

বাজে উপাখ্যান-গল্প না পড়িয়া এরূপ বাস্তব ঘটনা পাঠে লাভ আছে। লেখক, ঠিক উপন্যাসের ভাষায় ইতিবৃত্তগুলির আলোচনা ক'রিয়াছেন; সুতরাং পাঠকের পক্ষে এ গ্রন্থ উপাদেয় হইবে। গ্রন্থের ছবিগুলি সুন্দর; ছাপা ও কাগজ পরিপাটী। বইখানির নাম "প্রবাসের অস্ফুট-স্মৃতি" না দিয়া 'প্রবাসের উজ্জ্বল আলেখ্য' দিলেও, বোধ করি, অসঙ্গত হইত না।

ফৌজদারি আইন সংগ্রহ শ্রীযুক্ত বিজয়কেশব মিত্র প্রণীত। মূল্য ৪৲ টাকা। কলিকাতা, ৫৭ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট মিঃ, ডি, ই, ক্রানেনবার্গ সাহেব এবং ৩১।১ নং হরি-ঘোষের ষ্ট্রীট, শ্রীপ্রমথনাথ ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মফস্বলের ফৌজদারি আদালতের অধিকাংশ কার্য্য ইংরেজি-ভাষানভিজ্ঞ মোক্তারগণ দ্বারা নির্ব্বাহিত হয়। কার্য্যের সৌকর্য্যার্থ গভর্ণমেণ্ট, ইংরাজি ভাষায় আইন লিপিবদ্ধ হইলেও তাহা দেশীয় ভাষায় ভাষান্তরিত করিয়া প্রচারিত করেন। এইরূপে ফৌজদারি কার্য্যবিধির আইন প্রচারিত আছে। কিন্তু টীকা-টিপ্পনি নজির সারকুলার সম্বলিত উক্ত আইন পুস্তকের কোন উৎকৃষ্ট সংস্করণ এপর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। ব্যবহারোপজীবীদিগের মধ্যে ইহা একটী বিশেষ অভাব ছিল। বিজয় বাবু সমালোচ্য পুস্তক প্রণয়ন করিয়া সে অভাব মোচন করিলেন। ইহাতে মোক্তার সম্প্রদায়ের বিশেষ উপকার দর্শিবার সম্ভাবনা। শুধু মোক্তার কেন, পুলিশ কর্ম্মচারীরাও (ইনিস্‌পেকটার প্রভৃতি) ফৌজদারী আইন জানিতে বাধ্য। অনেক সম্ভ্রান্ত ভদ্রবংশীয়েরা অনারারি মাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হইয়াছেন। ইংরাজি আইনের কূট ভাষা ইহাঁদের অনেকেরই বোধায়ত্ত নহে। ঐ সকল শ্রেণীর লোকের পক্ষে বিজয় বাবুর ফৌজদারী আইন বিশেষ উপকারক হইবে।

ফৌজদারি আইনের বিধানগুলি বিশদরূপে বুঝিবার জন্য অনেক টীকা ও নজিরের মর্ম্ম যথাস্থানে প্রদত্ত হইয়াছে। প্রয়োজন মতে হাইকোর্টের সারকুলার এবং রাজকীয় গেজেটে প্রকাশিত জ্ঞাপন পত্রের মর্ম্ম এবং হাইকোর্টের সুপ্রসিদ্ধ বিচারক মহোদয়গণের মতামত সরল ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে; ধারার নিম্নে সন্নিবেশিত হইয়াছে। অধিকন্তু প্রত্যেক ধারার পারিভাষিক শব্দগুলির পার্শ্বে তাহার ইংরেজী প্রতিশব্দগুলি লিখিত হইয়াছে। উদ্ধৃত নজিরগুলি ও আইনের প্রধান বিষয়গুলি পুস্তকের কোন্ স্থানে আছে তাহা অনায়াসে ও সহজে অবগত হইবার জন্য শেষভাগে যথারীতি বর্ণানুক্রমিক একটী সুবিস্তৃত নির্ঘণ্টপত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে। ফলতঃ পুস্তকখানিকে আইনব্যবসায়ী ও অন্যান্য ব্যক্তিদিগের ব্যবহারোপযোগী করিবার জন্য বিজয় বাবু শ্রম বা আয়াস স্বীকার করিতে ত্রুটি করেন নাই।

পরিশিষ্টে বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট ও ভারতীয় গভর্ণমেণ্ট প্রণীত কতকগুলি ফৌজদারি বিষয়ক প্রয়োজনীয় ও সাধারণের জ্ঞাতব্য আইন (আবকারি আইন, অস্ত্র বিষয়ক আইন, আপিংএর আইন ইত্যাদি) টীকা নজির প্রভৃতির সহিত প্রকাশিত হইয়াছে।

আইনজ্ঞ বলিয়া বিজয় বাবুর সুখ্যাতি আছে। মোক্তারী পরীক্ষা সোপান, আইন পরীক্ষার গাইড, সাক্ষ্য-বিষয়ক আইন প্রভৃতি প্রণয়ন করিয়া বিজয় বাবু বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। তাঁহার ফৌজদারি আইন সাধারণ্যে প্রচারিত হইয়া তাঁহার যশঃ আরও বৃদ্ধি করিবে।

জন্মভূমি।

৫ম ভাগ। } চৈত্র। ১৩০১। { ৪র্থ সংখ্যা।

উপন্যাস নহে।

(২)

বাস্তবিক বেচারা অতি নিরীহ, অতি পবিত্র স্থানেই তাহার অধিষ্ঠান; সে কিরূপে ও-সকল সংবাদ রাখিবে? কিরূপেই বা ইহাঁদিগকে জানাইবে? কিন্তু মফস্বলের পুলিশ হইলে তাহাকে জানাইতে বাধ্য হইতে হইত। কলিকাতার পুলিশ অনেকটা শান্তমূর্ত্তি।

সে যাহা হউক, সে জানাইলেও ইহাঁরা তথায় কোন নিপুণ লোক লাগাইয়া জানিতে পারিলেন যে, অন্নদা ঐ অমৃতের পুণ্যাশ্রমেই তিন দিন ছিল। ঐ তিন দিন দিবারাত্রি ঐ বাটীর দ্বার বন্ধ ছিল ও অভ্যন্তরে বিলক্ষণ আনন্দ-কোলাহল চলিয়াছিল। তৎপরে সহসা নীরব নিরানন্দ হইয়াছে। ঐ বাটীস্থিত অমৃতের রক্ষিতা বেশ্যাটীকে কাশী দেখাইতে সঙ্গে লইয়া ও তাহার যুবতী কন্যাকে নিজ বিলাস-সঙ্গিনী করিয়া অন্নদা কাশী প্রস্থান করিয়াছে। ইহার অধিক আর কিছু জানা গেল না।

ইন্‌স্পেক্টর বাবুকে এই সকল জানাইলে তিনি কহিলেন, "উত্তম হইয়াছে, আর বিলম্ব করিয়া কাজ নাই, কল্যই প্রেসিডেন্সি মাজিষ্ট্রেট কোর্টে নালিশ রুজু করা হউক ও গ্রেপ্তারি ওয়ারাণ্ট কাশী পাঠান হউক।"

পরদিন সেই চেষ্টাই হইল। কিন্তু কোর্ট বলিলেন, "তথায় আসামীকে নিশান-দিহি করিতে পারে, বাদীর পক্ষের এমন লোক যাউক, আর আসামী গ্রেপ্তার হইলে যে কন্‌ষ্টেবল দুই জন আসামীকে লইয়া কলিকাতা পঁহুছিয়া দিবে, উহাদের যাতায়াতের ও আসামীর আসিবার রাহাখর চাদি বাবত ৪০৲ টাকা বাদী দাখিল করে, নতুবা ওয়ারাণ্ট কাশী যাইবে না।"

ইহারই নাম গোদের উপর বিষ-ফোড়া যাহা হউক, কোর্টের আদেশ যথাবিধি অনুষ্ঠিত হইল। নিশান-দিহীর জন্য জ্যোতিশ্চন্দ্র সিংহকে কাশী পাঠান গেল। কাশীতে নাটোরের শিষ্যদিগের যে বাটী আছে, সে বাটীর তত্ত্বাবধায়ককেও এই সংবাদ দিয়া তদ্বিরের জন্য লেখা হইল।

সকলই হইল, কিন্তু কাশীও ত কলিকাতার মত ঘন-বসতি-পূর্ণ, জনাকীর্ণ, সমৃদ্ধ সহর; সেখানে ধূর্ত্তকে আয়ত্ত করা বড়ই দুষ্কর। জ্যোতিশ্চন্দ্র সিংহ কয়েক দিন সন্ধান করিয়া লিখিলেন, "অমুক অমুক স্থান, অমুক অমুক

দেবালয়, অমুক অমুক হাট, ঘাট ও মঠ অন্বেষণ করিয়াছি, সন্ধান পাই নাই। পরিশ্রমের ত্রুটি করিব না। তবে যে সিবিড় সহর, পরিশ্রমের ফল শীঘ্র পাওয়ার পক্ষে সন্দেহ।

"আপনাদিগের নাটোরের শিষ্যদিগের বাটীতে গিয়া কথিত-মত ব্যক্তির দেখা পাইলাম না, দেখা পাইলেও সেখানে আমার থাকা হইত না। আমার খাওয়া-দাওয়া সব আমার সুবিধা মত সময়ে সম্পন্ন হওয়া চাই। পরের বাটীতে থাকিয়া তাহা হয় না। আর পুলিশ কোন কাজের নহে, অথচ কথায় কথায় ঘুষ। বহু কষ্টে যদি ওয়ারেণ্ট বাহির করিয়াছি, কিন্তু সর্ব্বদা ঘুরিতে ফিরিতে উত্তেজনা করিলেই বলে, 'ওয়ারাণ্টের আসামী ২।১০ বৎসরে গ্রেপ্তার হইবে, তাড়াতাড়ি করিলে চলিবে কেন?' গতিক দেখিয়া আমি প্রসিদ্ধ বটুক-পাঁড়ের দলের আশ্রয় লইয়াছি।"

কাশীর বাটীর তত্ত্বাবধায়ক লিখিলেন, "মহাশয়! আপনার প্রেরিত সিংহ মহাশয় একদিন দেখা না পাইয়াই ফিরিয়া গিয়াছেন। আর তাঁহার খবরই নাই। আমি আসামীকে চিনি না, কিন্তু কয়েকটী লোকের উপর সন্দেহ হয়। সিংহ মহাশয় আসিলে দু'জনে মিলিয়া সন্ধান পূর্ব্বক বোধ হয় ধূর্ত্ত শৃগালকে ধরিতে পারিতাম।"

বিদ্যাবিনোদ তাঁহার জ্যেষ্ঠতাতকে এই নালিশের সংবাদ যে লিখিয়াছিলেন, তাহার উত্তর এইরূপ পাইলেন, "আমাদের যেমন কর্ম্ম, তেমনি ফল হইয়াছে। এই জন্যই দীক্ষার পূর্ব্বে সংবৎসর কাল সহবাসে গুরু-শিষ্যের পরস্পর পরীক্ষা-বিধান শাস্ত্রের শাসন। তোমরা জান, এ দীক্ষাব্যাপারে আমার আন্তরিক ইচ্ছা একবারেই ছিল না। নিতান্ত তোমাদের জেদেই এ অবৈধ কার্য্য ঘটিয়াছে। যাহা হউক, নালিশ করিয়া ভাল হয় নাই। কপটতা-বুদ্ধিতে শিষ্য সাজিলেও শিষ্য। আর, টাকা পাইবার প্রত্যাশা যদি করিয়া থাক, আমার তাহা সম্ভবপর বলিয়াই বোধ হয় না। যাহা হউক, সংসার যে এতদূর কপটতাময়, তাহা আমার বিশ্বাস ছিল না।"

বিদ্যাবিনোদ পত্র পাইয়া বিষণ্ণ হইলেন। বিষাদ কতকটা দূর করিবার অভিপ্রায়ে একটু বেড়াইতে ইচ্ছা হইল। অন্যত্র না গিয়া বঙ্গবাসী আপিসে উপস্থিত হইলেন। ব্রজরাজ বাবুর সহিত কথায় কথায় উপস্থিত ঘটনার কথা উপস্থিত হইল। তিনি বৃত্তান্ত শুনিয়া অবাক্ হইলেন। মুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া কহিলেন, "এ লোকটা জুয়াচুরির একটা নূতনতর পন্থা আবিষ্কার করিয়াছে বটে। ধরা পড়িলে সংবাদ দিবেন, লোকটাকে দেখিতে হইবে।"

কৃষ্ণ বাবুর ঘরে গিয়া দেখা-সাক্ষাৎ হইল। কুশল-জিজ্ঞাসার পরই এই অকুশল ঘটনার কথা উঠিল। কৃষ্ণবাবু আদ্যন্ত শুনিয়া কহিলেন, "নালিশ করিয়া ভাল হয় নাই। আপনি আপনার জ্যেঠা মহাশয়ের ৫০০৲ টাকা নষ্ট করিলে, তিনি কি আপনার নামে ঐরূপে নালিশ করিতেন?" বিদ্যাবিনোদ কহিলেন, "সে ত শিষ্য নহে। বেশ, ভূষা, অবস্থা সমস্ত ভাঁড়াইয়া জাল শিষ্য সাজিয়াছিল। জুয়া-চোরের জুয়াচুরির দণ্ড দেওয়ায় দোষ কি?" কৃষ্ণবাবু বলিলেন, "শিষ্য শাসনার্হই আছে, গুরুর ত গুরুত্ব থাকা চাই। আর আপনারাই বা অমন গুরুর উপর অন্যায় উপরোধ আবদার করিয়াছিলেন কি বলিয়া? আপনাদেরই এ সমস্ত দোষ।"

বিদ্যাবিনোদের বিষাদ দূর হইল বটে, চিত্ত-বিনোদও যথেষ্ট হইল! অধিকতর ম্লান-ভাবে বিনা তর্ক-বিতর্কে তিনি গাত্রোত্থান করিয়া বাসায় ফিরিয়া আসিলেন। বাসায় আসিয়া দো-তলার প্রশস্ত ছাদের উপর শূন্যমনে

পাদচারণ করিতে লাগিলেন। তথায় বসন্ত-বায়ু মন্দ মন্দ সঞ্চরণ করিতেছিল। ছাদে ছাদে প্রফুল্ল-মুখ বালকদল ঘুড়ি উড়াইতে উড়াইতে সরল মনের অকৃত্রিম আনন্দহিল্লোল প্রকাশ করিতেছিল। তখন সূর্য্যদেব নিজ কিরণরাশি সংহার করিয়া ক্ষীণ শান্ত জ্যোতি কোনরূপে রক্ষা করিতে করিতে অন্তর্দ্ধান করিতেছিলেন। থাকিয়া থাকিয়া পক্ষিকুলের ত্বরিত ও আকুলিত প্রধাবন চকিতের জন্য দৃষ্টির বিষয় হইতেছিল। কিন্তু বিদ্যাবিনোদের ইহা কিছুই লক্ষ্য হইতেছিল না। তিনি বাহিরে যেমন চতুর্দ্দিকে বেড়িয়া অনন্ত অট্টালিকা-সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া আছেন, অন্তরেও তেমনি অপার চিন্তা-সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়াছিলেন। তাঁহার দুর্ভাবনার সহিত সান্ধ্যতিমির ক্ষণে ক্ষণে গাঢ় হইয়া আসিতে লাগিল। সায়ংসন্ধ্যার কাল তাঁহার চক্ষুর উপর দিয়া অজ্ঞাতসারে অতিবাহিত হইয়া গেল। বিদ্যাবিনোদ যখন প্রকৃতিস্থ হইলেন, তখন দেখিতে পাইলেন, আকাশে চন্দ্রের শান্ত-স্নিগ্ধ জ্যোতি প্রসারিত হইয়াছে। এত-ক্ষণে তাঁহার অন্তঃকরণের চিন্তাভার যেন একটু লঘু বোধ হইল।

বস্তুতই চিন্তা-লাঘবের কারণ উপস্থিত হইয়াছিল। বিদ্যাবিনোদ নীচে আসিয়া দেখিলেন, অমৃত-কুমারের আড্ডায় লক্ষ্য রাখিতে যাঁহাকে বলা হইয়াছিল; সেই কৌশলী লোকটী একখানি ডাকের চিঠী হাতে করিয়া হাসিতে হাসিতে অগ্রসর হইলেন ও চিঠীখানি দিয়া বলিলেন, "এই লউন, আমাদের কার্য্যসিদ্ধি হইয়াছে।" বিদ্যাবিনোদ ব্যস্ত হইয়া, চিঠী পড়িয়া দেখিলেন, উহা অন্নদার সঙ্গিনী কিরণশশী দাসী কাশী হইতে কলি-কাতায় অমৃতকুমার বসুকে লিখিয়াছে ও উত্তর পাইবার জন্য তাহাতে নিজের ঠিকানাও লিখিয়া দিয়াছে।

পত্র পাইয়া তিনি পরম সন্তোষ লাভ করিলেন। একেই ত নালিশ অযুক্তিযুক্ত বলিয়া মনঃক্ষোভ সংবরণ করিতে পারিতে-ছিলেন না। তারপর, যাহা করিয়া ফেলিয়াছেন, তাহাতেও যদি অকৃতকার্য্য হন, তাহা হইলে ত মনস্তাপের পরিসীমা থাকিবে না। এমত অবস্থায় এরূপ উপায় হস্তগত হইলে কি সাধারণ আনন্দ হয়? বিদ্যাবিনোদ সাগ্রহে জিজ্ঞাসিলেন, "মহাশয়! এ চিঠী পাইলেন কিরূপে?"

পত্রদাতা কহিতে লাগিলেন, "আমি যে ঐ স্থানে যাতায়াত করি, ইহা অমৃতকুমারের বেশ হৃদয়ঙ্গম করাইয়াছিলাম। তৎপরে তাহাদের সংবাদ না পাইয়া যে বড়ই উৎকণ্ঠিত আছি, এই ভাব প্রকাশ পাইতেছিল, তাহাতেও তাহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। একদা সেই প্রসঙ্গে, 'আপনি তাহাদের সংবাদ লইতেছেন না কেন', এ বিষয়ে পুনঃপুনঃ উত্তেজনা করায় লোকটা উত্তর করিল, 'আর ভাই! হতভাগীদের যে হাতের লেখা, পড়িতেই পারি না, চিঠী লিখিব কিরূপে?' আমি বলি-লাম, 'আ রাম! বাঙ্গালা লেখাইত, নাগরীও নয়, পারসীও নয়? আপনি চিঠী লিখুন, আমি ঠিকানা পড়িয়া দিতেছি।' অমৃতকুমার বাক্স হইতে চিঠী খুলিয়া দিলেন। আমি পড়িতে পারিয়াও যেন পড়িতে পারি নাই এইরূপ ভাব ব্যক্ত করিয়া, 'তাই ত মহাশয়! লেখাটা বড়ই খারাপ দেখিতেছি, আমি ও-বাড়ীর বাবুদের নিকট পড়াইয়া আনি' বলিয়াই গাত্রোত্থান করিলাম। অমৃত বলিল, না-না মশাই, তা হবে না, তা হবে না। আমি 'কোন চিন্তা নাই, কোন চিন্তা নাই' বলিতে বলিতে দ্রুতপদে বাহির হইয়া পড়িলাম। যে-বাহির হইলাম, সে-বাহির হইলাম, এক-বারে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে ছুটিতে বাসায় আসিয়া পঁহুছিতেছি।"

ঈশ্বরেচ্ছায় এই অচিন্তিতরূপ উপায় প্রাপ্ত হইয়া তাহার প্রয়োগে আর ক্ষণকালও বিলম্ব করা হইল না। সেই রাত্রিতেই কাশীতে টেলিগ্রাম করা হইল। পরদিন টেলিগ্রাফে উত্তর পাওয়া গেল, "আসামী স-দলবলে ধরা পড়িয়াছে। পত্র আসিতে আর একদিন দেরি হইল। পত্রের বিবরণ এইরূপ ;—

আসামী সঙ্গিনী-যুগলকে লইয়া রাম-নগরে মেলা দেখিতে গিয়াছিল। মুন্সিজী হেড্‌কনষ্টবল ও ছয় জন কন্‌ষ্টেবলকে যথা-স্থানে বসাইয়া রাখিয়া ভদ্রবেশে প্রহ্লাদ-ঘাটে পাণ্ডার বাটীতে তাহার অপেক্ষা করিতে ছিলেন। আসামী নৌকা হইতে উঠিলেই তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, আপনার নাম 'অন্নদা বাবু?'

উত্তর। হাঁ।

মুন্সী। আপনি কলিকাতার অমুক স্থানে অমুক নম্বর বাটীতে ছিলেন?

উত্তর। না কখনই না।

মুন্সী। আপনি তথা হইতে অমুক অমুক জিনিষ চুরি করিয়া কাশী আসিয়াছেন?

আসামী শুষ্কমুখে কিন্তু নির্দ্দোষ সম্ভ্রান্ত লোকের ভাণে তেরিয়া হইয়া উঠিলে, মুন্সীজী নিজ মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। তাঁহার 'শালে চোট্টা বদ্‌মাস্' প্রভৃতি উৎকট মিষ্ট বুলি শুনিতে শুনিতে ছয় জন কন্‌ষ্টেবল উপস্থিত হইল। ওয়ারাণ্ট দেখাইয়া নিশান-দিহি মতে আসামী গ্রেপ্তার করা হইল। সঙ্গিনী-যুগলের মধ্যে করুণ কোলাহল পড়িয়া গেল। হার, আলোয়ান তাহাদের নিকট হইতে লওয়া হইল। উপস্থিত মত জিনিষ-পত্রও লইতে ছাড়া হইল না। বাকি দুই কেতা নোটের কথা জিজ্ঞাসা করায় কহিল, "তাহা, জোড়াসাঁকো জি, সি, মল্লিক কোম্পানির দোকানে ভাঙ্গাইয়া পোষাকাদি কিনিয়াছি, টাকা সব খরচ হইয়া গিয়াছে।" বস্তুতও আসামীর পকেটে একটী মাত্র টাকা ছিল। পাণ্ডার পুত্র আসিয়া অনুরোধ করিতে লাগিল, "মহাশয়! বাবুকে আপনাদের খালাশ করিয়া দিতে হইবে। বাবুজী বড় উত্তম লোক, কি জানি, কি পাকে পড়িয়া এমন ঘটনা হইয়াছে! আপনারা একটু মনোযোগ করিলেই বাবু খালাশ পাইতে পারিবেন," ইত্যাদি।

পত্র পাইয়া জি, সি, মল্লিক কোম্পানির দোকানে যাওয়া হইল। তাঁহাদিগের খাতা-পত্র দেখিয়া জানা গেল, হারানো নোট দুই কেতা সেখানেই ভাঙ্গাইয়া পোষাকাদি কিনিয়াছে। পোষাকও সামান্য নহে, সাকল্যে ১২৬৲ টাকার। সাটিন জ্যাকেট ১টা ১৪৲, ১টা ৫৸৹ ; ওয়েষ্ট কোট ৫৷৷৹ ; চেষ্ট ফিল্‌ড কোট ১৯৲ ; অ্যাঙ্গলার কোট ১টা ৫৷৷ ; ১টা ১৪৲ ; পেণ্ট লেন ৫।৹ ; রেশমি রুমাল ৩৲ ; ছড়ি ৩৲ ; বিনামা ৬৲ টাকা। এইরূপ এইরূপ মূল্যের উক্তরূপ প্রয়োজনীয় সকল জিনিষই লইয়াছে। তথায় নিজের নাম 'রায় চারুশশী মুর্খার্জ্জি' বলিয়াছিল ও এলাহাবাদের ইঞ্জিনিয়র বলিয়া পরিচয় দিয়াছিল। নীচে গাড়িতে বেশ্যা ২টীকে রাখিয়া এবং তাহাদিগকে 'পরিবার' বলিয়া পরিচয় দিয়া জিনিষ-পত্র শীঘ্র দিবার জন্য তাগাদা করিয়াছিল। 'পায়ে খড়ম কেন,' জিজ্ঞাসিলে বলিয়াছিল, 'মাসে ৬০০৲ টাকা মাত্র মাহিনা পাই। তাহাতে কুলায় কিরূপে? পরিবার বড় খামখেয়ালী ও সৌখীন, সবই খরচ করিয়া ফেলে। এজন্য আমি সামান্য-বেশে যে-সে অবস্থায় থাকি। আপিসের সময় আপিসের পোষাক ব্যবহার করি মাত্র।"

পাঠক! অন্নদার পরিচয় বোধ হয় অনেকটা পাইলেন। সঙ্গিনী কিরণশশী, তাই নিজেও বুঝি চারুশশী হইয়াছিল! লোকটা আমোদ-প্রিয় বটে! পোষাকগুলিও দস্তুরমত লইয়াছিল। বোধ হয় কোন সম্পন্ন লোকেরই কুলাঙ্গার হইবে। খরচের হাতটা দেখুন, ১০।১২ দিনেই রিক্তহস্ত হইয়াছে! পরের ধন হইলেও তখন ত নিজের হইয়াছে, এরূপ মুক্তহস্ততা কোথা হইতে আসে? লোকটা ত বুদ্ধিমান্, আগামী কল্য কিরূপে চলিবে, কিছু ভাবে নাই কি? ভাবিয়াছিল বৈ কি? তাহার বাক্‌শক্তির মহিমা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এখানেও তাহার পরিচয় পাওয়া গেল। নহিলে অমনতর অপরাধীর প্রতি পাণ্ডারা এরূপ পক্ষপাতী ও সমবেদনা-বিশিষ্ট হইবে কেন? তাহাদিগকেই প্রবঞ্চনা পূর্ব্বক কিছু হস্তগত করিয়া সহসা সেখান হইতে অন্তর্দ্ধান করিত আর কি?

কিন্তু এরূপে দেশে-দেশে পলাইয়া, স্থানে-স্থানে আত্ম-গোপন করিয়া, আত্মাকে লুপ্ত করিয়া, আত্মাকে চরম নিগৃহীত করিয়া সুখ কি? যতটুকু বিদ্যাবুদ্ধি লেখা-পড়া জ্ঞান তাহার ছিল, তাহাতে ত সৎপথে থাকিয়া সে জীবন-ব্যাপী একরূপ একটা স্থায়ী সুখ লাভ করিতে পারিত! আর বিদ্যাবুদ্ধি কি মানুষকে এক-বারে এমনতর পথে লইয়া যাইতে পারে? অবশ্য পারে দেখিতেছি, এ বিষধর-সাপের মাথাতেই মণি হইয়াছে! কিন্তু ইহার মূলে স্বভাবেরই কারণতা আমাদের বুদ্ধিতে আইসে। সে স্বভাব হয়ত সংসর্গ-দোষেই প্রভাবশালী হইয়া থাকিবে।

যাউক, এখন কথা শেষ করি। বিচারের দিন কোট পেণ্টুলেন পরণে, বুট্ পায়ে, অন্নদা অধোমুখে সেই লোকারণ্যময় এজলাসে আসিয়া দাঁড়াইল। হাকিমের জিজ্ঞাসানুসারে সকল দোষই সে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিল; কিন্তু সেই তেজে, সেই অভ্যস্ত ইংরাজিতেই উত্তর। বিচারে ৬মাস জেলের হুকুম হইল।

১০ই মাঘ কলিকাতায় আসিয়াছিল, ১০ই ফাল্গুন এইরূপে তাহার লীলা সাঙ্গ হইল। ৫ মাসের ব্রহ্মচারিবেশ মুহূর্ত্ত মধ্যে ছাড়িয়া, মুহূর্ত্ত মধ্যে যেমন কোট-পেণ্ট লান-বুট পরিয়াছিল, ঐগুলি ছাড়িয়া আবার মুহূর্ত্ত মধ্যে তেমনি অম্লানমুখে কয়েদীর জাঙ্গিয়া পরিধান করিল। তাহার ধৈর্য্য ও নির্ব্বিকারতার প্রশংসা আছে।

যে জন্য নালিশ, সে ফল কিছুই ফলিল না। নোটের টাকার কোন উপায়ই হইল না। হার ও আলোয়ান যেমন পাওয়া গেল, মকর্দ্দমায় তেমনি ১৫০৲ টাকার অধিক খরচ হইয়া গেল। এ রাজ্যে মোকর্দ্দমা করিয়া জিনিষ উদ্ধার করিতে গেলে ফল ঐরূপই হয়। পোষাক আদি যাহা পাওয়া গেল, তাহা ন-গণ্য। হরি হরি! চোরাই মাল মিলাইয়া লইতে তন্মধ্যে চণ্ডী ও বেদান্তসার-খানি পাওয়া গেল! ইহাও তাহার জুয়াচুরির এক উপকরণ হইত! ব্রহ্মচারি-বেশও ত উহার ঐরূপ কার্য্যে লাগিয়াছিল। বিধাতঃ! সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মনুষ্য জীবনকে কি তুমি এমন করিয়া ঘৃণিত ও ব্যর্থ করিতে পার!

অপরাধীর দণ্ড হইল বটে, কিন্তু প্রকৃত পরিচয় পাওয়া গেল না। না গেলেও সে ভদ্র-সন্তান, নিশ্চিতই। ভাল না হইলে অতদূর মন্দ হয় না। অতিউচ্চই ভাঙ্গিয়া একবারে ভূতলশায়ী হয়। কিন্তু ভদ্রসন্তানের এরূপ দুর্ম্মতি ও দুর্গতি কতবড় দুঃখের বিষয়! দুঃখ বই আমরা আর কি করিব? বিদ্যা-বিনোদ এখনও দুঃখ করিয়া বলেন, "সে যদি জানাইত যে, আমি হঠাৎ দুর্ব্বুদ্ধিতে পড়িয়া এই কুকার্য্য করিয়াছি, আমি কোন পরামর্শই শুনিতাম না, কখনই নালিশ করিতাম না। সে বিশ্বাস ভঙ্গ করিলেও আমাদের স্নেহের ভঙ্গ হইত না। কিন্তু ভগবানের ইচ্ছা অন্যরূপ, তাই এতদূর ঘটিল!

শ্রীশা——

তীরহুতের রাজবংশ-বিবরণ।

কথিত আছে, ভগবান্ বৈবস্বত মনুর ইক্ষাকু নামে এক পুত্র জন্মে। এই ইক্ষাকুই সূর্য্য-বংশীয় প্রথম রাজা ছিলেন। তাঁহার একশত-পুত্র মধ্যে বিকুক্ষি, নিমি ও দণ্ড নামে তিন পুত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। তদীয় শকুনি-প্রমুখ পঞ্চাশৎ পুত্র উত্তরাপথে (হিন্দুস্থানে) এবং অপরেরা দক্ষিণাপথে রাজা হন। কোন কোন মতে ইক্ষাকুর পুত্র কুক্ষি, কুক্ষির পুত্র বিকুক্ষি; এই বিকুক্ষির বংশেই রামচন্দ্রাদি সূর্য্যবংশীয় নরপতিগণ জন্মপরিগ্রহ করেন। নিমি মিথিলাধিপতি জনক-বংশের আদি-পুরুষ ছিলেন। ভবিষ্যপুরাণে লিখিত আছে;—

"নিমেঃ পুত্রস্ত তত্রৈব মিথির্নাম মহান্ স্মৃতঃ।
প্রথমং ভুজবলৈর্যেন তৈরহুতস্ত পার্শ্বতঃ॥
নির্ম্মিতং স্বীয়নাম্না চ মিথিলাপুরমুত্তমম্।
পুরীজননসামর্থ্যাজ্জনকঃ স চ কীর্ত্তিতঃ॥"

নিমির পুত্র মিথি; এই মিথি তীরহুতের এক-দেশে এক নগরী নির্ম্মাণ করেন, এই হেতু উক্ত নগরী তাঁহার নাম-অনুসারে মিথিলাপুর নামে কথিত হয়; পুরীজনন-সামর্থ্য-বশতঃ মিথিই জনক নামে কীর্ত্তিত হন। মিথিল, জনক, বৈদেহ এই তিনটী মিথিরই নামান্তর। বিষ্ণু-পুরাণে লিখিত আছে যে, মৃতদেহ হইতে জন্ম হয় বলিয়া উহাঁর নাম জনক, উহাঁর পিতা বিদেহ (দেহরহিত) হন বলিয়া তাঁহার নাম বৈদেহ এবং মন্থন দ্বারা জন্ম হয় বলিয়া, উহাঁর আর একটী নাম মিথি হইয়াছে। উর্দ্দূভাষায় লিখিত আইন-তীরহুত গ্রন্থে লিখিত আছে যে, প্রজাপালনে পিতৃসদৃশ ছিলেন, এই নিমিত্ত এই রাজবংশ জনক নামে উক্ত হইয়াছে। বাল্মীকি-রামায়ণে নিমির পুত্র মিথি, মিথির পুত্র জনক, এরূপ উক্ত হইয়াছে। যথা,—

"নিমিঃ পরমধর্ম্মাত্মা সর্ব্বসত্ত্ববতাং বরঃ।
তস্ত পুত্রো মিথির্নাম জনকো মিথিপুত্রকঃ॥"

জনকের নামানুসারে তৎপরবর্ত্তী মিথিলাধিপতিগণ বংশ-পরম্পরায় সকলেই জনক আখ্যা প্রাপ্ত হন। অযোধ্যাধিপতি দশরথ-তনয় রামচন্দ্র যে জনক-দুহিতা সীতাদেবীর পাণি-গ্রহণ করেন, সেই জনক রাজা হ্রস্বরোমার জ্যেষ্ঠপুত্র রাজর্ষি সীরধ্বজ। ইহাঁরই যজ্ঞভূমি হইতে সীতাদেবীর উদ্ভব হয়, এই নিমিত্ত ঐ চত্বর সীতামঢ়ী নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। হ্রস্ব-রোমার কনিষ্ঠপুত্র কুশধ্বজ, সাঙ্কাশ্য নগরের অধিপতি ছিলেন। কুশধ্বজের দুহিতা মাণ্ডবীকে দশরথ-তনয় ভরত এবং শ্রুতকীর্ত্তিকে শত্রুঘ্ন পরিণয় করেন। সীরধ্বজের অন্যতমা তনয়া ঊর্ম্মিলা লক্ষ্মণের সহধর্ম্মিণী হন। মিথিলাপুর এক্ষণ জনকপুর * নামে অভিহিত হইয়াছে।

* জনকপুর মুজঃফপুর জিলার অন্তর্গত সীতামঢ়ীর প্রায় ১৩। ১৪ ক্রোশ উত্তর-পূর্ব্বে অবস্থিত। ইহা অধুনা নেপালরাজ্যভুক্ত নেপাল-তরায়ের মধ্যগত। উই-লিয়ম্ বোল্টস্-সাহেব ১৭৭২ খৃষ্টীয় অব্দে বাঙ্গালা ও উহার অন্তর্নিবিষ্ট প্রদেশ-সমূহের যে মানচিত্র মুদ্রিত করেন, তাহাতে জনকপুর-গ্রাম মঘবান্-মোরঙ্গ-রাজ্যের অন্তর্ব্বর্ত্তী দৃষ্ট হয়। জনকপুরের দেবোত্তর-সম্পত্তি সম্বন্ধে তত্রত্য রামচন্দ্রজীর মন্দিরের মোহান্ত মহাশয়ের নিকট দুই খণ্ড দান-পত্র আছে। প্রথম খণ্ড মঘবান্পুরের রাজা মাণিকসেনের প্রদত্ত। উহা ১৭৮৪ সংবতে (১৭২৮ খৃঃঅব্দে) লিখিত। গোরখা-সৈন্য মঘবান্পুরের রাজাকে দূরীকৃত করিয়া তাঁহার রাজ্য আত্মসাৎ করিলে, গোরখা-রাজ গীর্ব্বাণবিক্রমশাহা মাণিকসেনের দান স্বীকার করিয়া ১৮৬৭ সংবতে (১৮১২ খৃঃ অব্দে) অপর এক খণ্ড দান-পত্র বা তাম্র-শাসন মোহান্তজীকে প্রদান করেন। ইহাতে বোধ হয় যে, ১৮১২ খৃঃ অব্দের পূর্ব্বে এবং ১৮০৪ খৃঃ অব্দের পরে কোন সময়ে মঘবান্পুর-রাজ্য গোরখা-সৈন্য কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়। গোরাখা রাজ পৃথ্বীনারায়ণসাহার পুত্র সিংহপ্রতাপসাহা, তাঁহার পুত্র রণবাহাদুর সাহা; এই রণবাহাদুরের ঔরসে কোনও বিধবা ব্রাহ্মণীর গর্ভে গীর্ব্বাণবিক্রমের জন্ম হয়।

ন্যায়দর্শন-প্রণেতা মহর্ষি গোতম এই জনক-বংশের পুরোহিত ছিলেন। তিনি মিথিলাবাসী। তাঁহার সময় হইতেই মিথিলায় বিশেষভাবে ন্যায়-শাস্ত্রের চর্চ্চা চলিয়া আসিতেছে। নবদ্বীপের মুখোজ্জ্বলকারী সুপ্রসিদ্ধ বাসুদেব সার্ব্বভৌম মিথিলা হইতেই অধ্যয়ন শেষ করিয়া নবদ্বীপে ন্যায়-শাস্ত্রের চৌপাড়ী স্থাপন করেন। প্রখ্যাতনামা রঘুনাথ শিরোমণি (কাণাভট্ট শিরোমণি), স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য ও চৈতন্যদেব দারভাঙ্গার আটক্রোশ দূরবর্ত্তী সর্ষপ-গ্রাম-নিবাসী ন্যায় শাস্ত্রবিশারদ পক্ষধরমিশ্রের ছাত্র ছিলেন। মহর্ষি গোতম মিথিলার যে স্থানে তপশ্চারণে প্রবৃত্ত ছিলেন, সেই স্থান অদ্যাপি গোতমাশ্রম নামে উক্ত হয়। গোতমাশ্রম অধুনা ভরোরা পরগণার মধ্যগত ব্রহ্মপুর মৌজায় অবস্থিত। গোতম-পত্নী প্রাতঃস্মরণীয়া যশস্বিনী অহল্যা * স্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্তার্থ অন্যের অদৃশ্যা হইয়া প্রস্তরবৎ নিশ্চলভাবে যে স্থানে নিরাহারে বায়ুভক্ষণপূর্ব্বক যোগাসনে ভস্মোপরি বহুদিন অবস্থিতি করিয়াছিলেন এবং পরম কারুণিক শ্রীরামচন্দ্র মহর্ষি বিশ্বামিত্রের সমভিব্যাহারে রাজর্ষি জনকের যজ্ঞদর্শনার্থ জনকপুরে গমন-কালে কৃপাপরবশ হইয়া যে স্থানে দর্শন প্রদান পূর্ব্বক অনুতপ্তা-তাপসী অহল্যার শাপ মোচন করেন, সেই স্থান এক্ষণ অহল্যাস্থান নামে পরিচিত। উহা জরৈল পরগণার অন্তর্গত অহীআরী মৌজার মধ্যে অবস্থিত। যে সময়ে রামচন্দ্র শিবধনু ভঙ্গ করিয়া জানকীকে বিবাহ করেন, সেই সময়ে অহল্যা-গর্ভজাত মহর্ষি গোতমপুত্র শতানন্দ জনক সীরধ্বজের পুরোহিত ছিলেন।

"তৈরহুতস্ত পার্শ্বতঃ" ভবিষ্য-পুরাণের এই বাক্য দ্বারা আভাস পাওয়া যাইতেছে যে, মিথিলা নামে খ্যাত হইবার পূর্ব্বেও এই রাজ্য তীরহুত নামে বিশ্রুত ছিল। তীরভুক্তি শব্দের অপভ্রংশ দ্বারা তীরহুত হইয়াছে। তীরভুক্তি দ্বারা নদীকূলান্তর্গত অথবা নদীকূল দ্বারা পরি-বেষ্টিত রাজ্য বুঝায়। পশ্চিমে গণ্ডকী (শাল-গ্রামী) নদী, পূর্ব্বে কৌশিকী নদী এবং দক্ষিণে গঙ্গা নদী; এই তিন স্রোতস্বতীর মধ্যগত উত্তরে হিমালয় পর্ব্বত বা হৈমবত বন পর্য্যন্ত বিস্তৃত যে রাজ্য, তাহারই নাম তীরভুক্তি বা তীরহুত। শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে তীরভুক্তি রাজ্যের সীমা এরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে,—

"গণ্ডকীতীরমারভ্য চম্পারণ্যান্তকং শিবে।
বিদেহভূঃ সমাখ্যাতা তীরভুক্ত্যাভিধঃ স তু॥"

হিন্দিভাষায় লিখিত "চিত্তৌড়-গঢ়" নামক পুস্তক পাঠে জানা যায় যে, বাপা-রাবলের বংশধর রাজা-রাবল-সমরসিংহ-গোহিলোত আপনার শ্যালক দিল্লীর সম্রাট্ পৃথ্বীরাজ-চৌহানের সাহায্যার্থ ১১৯৩ খৃঃ অব্দে কগ্‌গর নদীর তীরে শাহাবুদ্দীন গোরীর সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া, জ্যেষ্ঠপুত্র কল্যাণরাও-সহ নিহত হইলে, তদীয় অপর এক পুত্র পলায়নপূর্ব্বক নৈপালে (নেপালে) যাইয়া রাজ্যস্থাপন ও বংশবিস্তার করেন। জনৈক নেপালীর লিখিত, নেপালের পুরাবৃত্ত পাঠে জানা যায় যে, পৃথ্বীনারায়ণ অযোধ্যাধিপতি রামচন্দ্রের বংশপ্রসূত ও মেবাড়ের মহারাণার বংশীয়। ১৭৭১ খৃঃ-অব্দে পৃথ্বীনারায়ণ পরলোকগত হন। তাঁহার অভ্যু-দয়ের পূর্ব্বে মধ্যভাগে মেবার-জাতীয় রাজা জয়প্রকাশ-মল্লের শাসিত কাঠমাণ্ডো বা প্রকৃত নেপাল-রাজ্য, পশ্চিমভাগে গোরখ-গ্রাম বা গোরাখারাজ্য, পশ্চিমো-ত্তরে জনৈক ক্ষত্রিয় রাজার শাসিত পাল্পা বা তানসিন-রাজ্য এবং পূর্ব্বভাগে ভাগতক-গ্রাম বা সূর্য্যবংশীয় রণজিৎমল্লের রাজ্য; এই চারিটী রাজ্যে বর্ত্তমান নেপাল বিভক্ত ছিল। গোরখ-গ্রাম পৃথ্বীনারায়ণের স্বরাজ্য ছিল। ইহাতে বোধ হয় যে, রাজা রাবল-সমরসিংহের যে পুত্র ১১৯৩ খৃঃ অব্দে শাহাবুদ্দীন কর্ত্তৃক কগ্‌গর নদীর তীরে পরাস্ত হইয়া নেপালে আগমন পূর্ব্বক গোরখ-গ্রামে রাজ্য-স্থাপন করেন, তাঁহারই বংশীয়েরা পাঁচশত বৎসরের উর্দ্ধকাল গোরখ-গ্রামে রাজত্ব করেন এবং তাঁহারই বংশোদ্ভূত পৃথ্বীনারায়ণ খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে অমিততেজা গোরখা-সৈন্যের সাহায্যে নেপালের বিভিন্ন রাজ্যগুলিকে স্বাধিকৃত করিয়া, বর্ত্তমান নেপাল-রাজ্য স্থাপন করেন।

*"দিবোদাসশ্চ রাজর্ষিরহল্যা চ যশস্বিনী।
শরদ্বতশ্চ দায়াদমহল্যা সমসূয়ত॥"

অর্থাৎ,—বিদেহ বা তীরভুক্তি দেশ গণ্ডকী-নদীর তীর হইতে আরম্ভ করিয়া চম্পারণ্যের * শেষ সীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণেও উক্ত হইয়াছে,—

"কৌশিকীন্তু সমারভ্য গণ্ডকীমধিগম্য বৈ।
যোজনানি চতুর্ব্বিংশদ্ব্যায়ামঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥
গঙ্গাপ্রবাহমারভ্য যাবদ্ধৈমবতং বনম্।
বিস্তারঃ ষোড়শ প্রোক্তো দেশস্য কুলনন্দন।
মিথিলা নাম নগরী তত্রাস্তে লোকবিশ্রুতা।"

অর্থাৎ,—মিথিলার দৈর্ঘ্য কৌশিক নদী হইতে গণ্ডকী নদী পর্য্যন্ত চতুর্ব্বিংশতি যোজন এবং বিস্তার গঙ্গানদী হইতে হৈমবত-বন পর্য্যন্ত ষোড়শ যোজন। † এ স্থলে একটী সমস্যা উপস্থিত হইতেছে। বাল্মীকি-রামায়ণে বিশালপুরী বা বিশালপুত্র নামক যে সমৃদ্ধিশালী রাজ্যের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, সেই রাজ্যের অস্তিত্ব কোথায় গেল? বিশালপুত্র-রাজ্য যে মুসলমানদিগের সরকার হাজিপুর, তাহা হাজিপুরের বিবরণে প্রদর্শিত হইবে। বৃহদ্বিষ্ণু-পুরাণে তীরহুতের যে সীমা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে বিশালপুত্র বা সরকার হাজিপুরও তীরহুতের অন্তর্গত বলিয়া গণ্য হইয়াছে। "তৈরহুতস্য পার্শ্বতঃ" ভবিষ্য-পুরাণের এই বাক্য দ্বারা এরূপ আভাসও পাওয়া যাইতেছে যে, মিথিলা তীরহুতের একদেশে অবস্থিত অথবা মিথিলা তীরহুতেরই অন্তর্গত ছিল। সুতরাং বাল্মীকি-রামায়ণ, ভবিষ্যপুরাণ, বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণ ও শক্তি-সঙ্গমতন্ত্রের একবাক্যতা-রক্ষার্থ এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না যে, মিথিলা ও বিশালপুত্র এই উভয় রাজ্যই তীরহুতের অন্তর্গত ছিল, পরে বিশাল-রাজবংশ বিলুপ্ত হইলে বিশালপুত্র মিথিলেশ্বরের রাজ্যভুক্ত হয়।

নিমি হইতে ৫৭ পুরুষ পরে (কোন মতে ৫৫ পুরুষ পরে) মহারাজ কৃতি জন্ম-পরিগ্রহ

* চম্পারণ্য।—এই চম্পারণ্য, বর্ত্তমান চম্পারণ জিলা নহে। এই অরণ্য কৌশিকী নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। ভাগলপুরের নিকটস্থ চম্প নৃপতি কর্ত্তৃক স্থাপিত, চম্পা-নগরী অঙ্গরাজ কর্ণের রাজধানী ছিল। সম্ভবতঃ চম্প নৃপতির নামানুসারে এই অরণ্যের নামও চম্পারণ্য হইয়াছে।

† তীরহুতের দৈর্ঘ্য (পূর্ব্ব পশ্চিমে) ২৪ যোজন বা কিঞ্চিদধিক ১৯২ মাইল এবং বিস্তার (উত্তর দক্ষিণে) ১৬ যোজন বা ১২৮ মাইল। এইট্‌কিন্সন-সাহেবের বাঙ্গালা-আসাম প্রভৃতি প্রদেশের সন্ধি-পত্রাদি সংগৃহীত পুস্তকে বাঙ্গালার যে মানচিত্র প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে, পূর্ব্ব ও পশ্চিমে মুজঃফরপুরের লমসুত্রে চম্পারণ জিলাস্থিত গণ্ডকী নদী হইতে ভাগলপুর জিলাস্থিত কৌশিকী নদী পর্য্যন্ত ১৬০ মাইল এবং উত্তর ও দক্ষিণে নেপাল-তরায়স্থিত জনকপুরের লমসুত্রে গঙ্গাভীর হইতে উত্তরে শোণ-কৌশিকী-তীর পর্য্যন্ত ১২৮ মাইল। বর্ত্তমান সময়ে জনকপুর হইতে উত্তরাভিমুখে ৮।৯ মাইল যাইলেই হৈমবত বনের মধ্যে প্রবিষ্ট হওয়া যায়। কিন্তু জনকবংশের প্রাদুর্ভাব সময়ে উত্তরে কতদূর পর্য্যন্ত আবাদ ছিল, এক্ষণে তাহার স্থিরীকরণ সম্ভবপর নহে। নদীর গতি-পরিবর্ত্তন দ্বারা ও এতদিন পরে মিথিলার সীমা নির্দ্দেশ কষ্টসাধ্য হইয়াছে। আরও একটী কথা বলা এ স্থলে আবশ্যক হইতেছে। আমরা সচরাচর ৮ যবোদরে এক অঙ্গুল, ২৪ অঙ্গুলে এক হস্ত, ৮,০০০ হাতে এক ক্রোশ এবং ৪ ক্রোশে এক যোজন; ঈদৃশ ক্রম অনুসারেই স্থানের পরিমাণ নির্দ্দেশ করি। কিন্তু বিশেষ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র ক্রোশের পরিমাণ তুল্য নহে। প্রত্যুত স্থানভেদে গৌক্রোশ ডালভাঙ্গা ক্রোশ প্রভৃতি অনেক প্রকার ক্রোশই প্রচলিত আছে। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ-সমূহে যে ক্রোশ বা যোজনের উল্লেখ আছে, তাহার পরিমাণ কি সর্ব্বত্রই একরূপ, না গ্রন্থকারগণ আপনাদের জন্ম-স্থান-প্রচলিত ক্রোশের উল্লেখ করিয়াছেন? তদনুসন্ধান অতি দুরূহ ব্যাপার। জনকপুরে অবস্থিতি সময়ে এই প্রস্তাব-লেখক অতি অল্প সময়ের জন্য একজন হিন্দুস্থানী সংস্কৃতজ্ঞ পরিব্রাজকের সহিত আলাপ করিয়া অবগত হন যে, সংস্কৃতগ্রন্থে (বিশেষতঃ পুরাণাদিতে) যে ক্রোশের উল্লেখ আছে, তাহা গৌক্রোশ। একটি গোরু শব্দ করিলে, যতদূর উহার শব্দ পঁহুছে, ততদূরই এক গৌক্রোশের পরিমাণ। উহা এক মাইলের প্রায় সমতুল্য হইবে। এই প্রস্তাব-লেখক এই পর্য্যন্ত কোন গ্রন্থে গৌক্রোশের উল্লেখ না পাইলেও কোন কোন পুরাণ ও তন্ত্রোক্ত স্থান-পরিমাণ স্থির করিতে যাইয়া গৌক্রোশ ধরিয়াই তদ্বিষয়ের সন্তোষজনক মীমাংসায় উপনীত হইতে পারিয়াছেন। এই বিষয়টী যথাকালে স্বতন্ত্র ভাবে আলোচিত হইবে।

করেন। এই কৃতিতেই জনকবংশের অবসান হয়। মৈথিল-ভূপালগণ আত্মতত্ত্বে পণ্ডিত ছিলেন, এই নিমিত্ত তাঁহারা "রাজর্ষি" নামে উক্ত হইতেন। আইন-তীরহুতের গ্রন্থকার বলেন যে, "জনক" শব্দের অপভ্রংশ হইয়া "জঙ্গ" শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে।

জনক-বংশের অবসান হইলে ১১৪৬ সংবতে (১০৮৯ খৃঃ অব্দে) নান্যদেব নামে কোনও পম্বারক্ষত্রিয় * তীরহুতে আসিয়া রাজত্ব করেন। সীতামঢ়ী মহকুমার মধ্যগত নানপুর পরগণাস্থিত মৌজে নানপুরে ইহাঁর রাজধানী ছিল। উক্ত স্থান নান্যদেব আবাদ করেন বলিয়া মৌজা ও পরগণার নাম নানপুর হইয়াছে। নেপাল-তরায়ের † মধ্যগত দোস্তিয়া পরগণায় সিমরুণগড় এই নান্যদেবেরই নির্ম্মিত। উক্ত দুর্গে নিম্নলিখিত প্রস্তরলিপি দৃষ্ট হয়;—

"নন্দেন্দুবিন্দুবিধুসম্মিতশাকবর্ষে ১০১৯
তৎশ্রাবণে সিত দলে মুনি সিদ্ধি তিথ্যাম্।
স্বাতীশনৈশ্চরদিনে করিবৈরিলগ্নে
শ্রীনান্যদেবনৃপতির্বিদধীত বাস্তম্॥"

নান্যদেব-নৃপতি ১০১১ শকাব্দে (১০৮৯ খৃঃ অব্দে) তীরহুতে আগমন করেন। তৎপরে ১০১৯ শকাব্দের শ্রাবণ মাসে শুক্লা ৭মী তিথিতে স্বাতি-নক্ষত্রাশ্রিত শনিবারে, সিংহ লগ্নে, সিমরুণগড় নির্ম্মাণ করেন। এইরূপ প্রবাদ শুনা যায় যে, নান্যদেব রাজ্যলাভের পূর্ব্বে কোনও সর্পের ফণায় নিম্নলিখিত শ্লোক দেখিতে পাইয়াছিলেন;—

"রামো বেত্তি নলো বেত্তি বেত্তি রাজা পুরূরবাঃ।
অর্লকস্য ধনং প্রাপ্য নান্যো রাজা ভবিষ্যতি॥"

এই শ্লোকে "নান্যো রাজা ভবিষ্যতি" এই বাক্য দ্ব্যর্থ-ঘটিত। এতদ্দ্বারা "অন্য কেহ রাজা হইবেন না," এরূপ বুঝাইতে পারে, কিংবা "নান্য নামে এক ব্যক্তি রাজা হইবেন" এরূপও বুঝাইতে পারে। যাহা হউক, নান্যদেবই রাজা হইলেন, কিন্তু অলর্কের ধন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন কিনা তাহা অমীমাংসিত থাকিল। ছয় জন রাজার রাজত্বের পরই, এই নৃপতিবংশ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। নিম্নে ইহাঁদের নাম ও সময় প্রদত্ত হইল;—

(১) নান্যদেব (নানবদেব), খৃঃ ১০৮৯ হইতে ১১২৫ অব্দ, ৩৬ বৎসর। (২) গঙ্গাদেব, খৃঃ ১১২৫ হইতে ১১৩৯ অব্দ, ১৪ বৎসর। (৩) নরসিংহদেব, খৃঃ ১১৩৯ হইতে ১১৯১ অব্দ, ৫২ বৎসর। (৪) রামসিংহদেব, খৃঃ ১১৯১ হইতে ১২৮৩ অব্দ, ৯২ বৎসর। (৫)

* পম্বার ক্ষত্রিয়।—কথিত আছে, আবু পর্ব্বতে ঋষিগণ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র ও ইন্দ্রের সাহায্যে যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা ক্ষত্রিয়োৎপাদনে মনোযোগী হন। (১) ইন্দ্র নিজ শক্তিতে এক পুত্তলিকা নির্ম্মাণ করিয়া, যজ্ঞকুণ্ডে নিক্ষেপ করিলে, মার্‌মার্ শব্দ করিয়া এক পুরুষ যজ্ঞকুণ্ড হইতে উৎপন্ন হন। এই পুরুষ প্রমার (পম্বার) নামে অভিহিত হন। পম্বার-বংশীয় আদি-রাজাদিগের রাজধানী উজ্জয়িনী ও ধার-নগরী। (২) ব্রহ্মা বেদ ও খড়্গের সাহায্যে এক চুলুক জল হইতে এক পুরুষ উৎপন্ন করেন। সেই পুরুষ চালুক্য (সোলঙ্কী) নামে পরিচিত হন। অনহলপুরে তাঁহার রাজধানী। (৩) রুদ্র গঙ্গাজল হইতে তৃতীয় ক্ষত্রিয় উৎপন্ন করেন। ইনি কুরূপ ও ধনুর্দ্ধারী ছিলেন, এজন্য ইহাঁর নাম পরিহার হয়। পর্ব্বত ও বনদেশের রক্ষার্থ ইনি নিযুক্ত হন। (৪) সর্ব্বশেষে বিষ্ণু চারি ভুজ বিশিষ্ট এক পুরুষ উৎপন্ন করেন। ইনি চতুর্ভুজ (চহুমান বা চৌহান) আখ্যা প্রাপ্ত হন। অকাবতী (গড়মণ্ডল) নগরী ইহাঁর রাজধানী। এই পুরুষ চতুষ্টয় অগ্নিকুলোদ্ভূত ক্ষত্রিয়গণের আদি-পুরুষ।

† মিথিলায় কোন কোন শব্দের "ল" স্থানে "র" লিখিত হয়। "তূল" কে "তূরর", "কলা" কে "কেরা", "তাল" কে "তার" ইত্যাদি রূপ উচ্চারণের প্রথা আছে। এই নিয়মের অধীন হইয়া, "তল" শব্দটীকে তাহারা "তর" বলে। তল বা তলা শব্দের অর্থ অধোভাগ। "অধোভাগে" এরূপ অর্থ বুঝাইতে আমরা বলিতাম, "তলায়" উহারা বলে "তরায়"। সুতরাং নেপালের অধোভাগে নেপালের অধিকৃত দেশকে নেপাল-তরায় কহে। "তল" শব্দে কাননও বুঝায়। নেপাল-তরায়ের অধিকাংশ স্থানই কাননময়। এই অর্থেই বা নেপাল-তরায় নামকরণ হইয়া থাকিবে উক্ত কাননই হৈমবতবন নামে প্রসিদ্ধ।

শক্তিসিংহদেব, খৃঃ ১২৮৩ হইতে ১২৯৫ অব্দ, ১২ বৎসর। (৬) হরিসিংহদেব, খৃঃ ১২৯৫ হইতে ১৩২৪ অব্দ, ২৯ বৎসর।

এই রাজবংশ ১০১১ শক হইতে ১২৪৫ শক পর্য্যন্ত, অথবা ১০৮৯ খৃঃ অব্দ হইতে ১৩১৪ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত সমুদয়ে ২৩৫ বৎসর রাজত্ব করেন।

শমসুদ্দীন-অল্‌তিমশের সাম্রাজ্যকালে বাঙ্গালার সুবেদার সুলতান্-গয়াসুদ্দীন তীরহুতের নরপতি নরসিংহদেবকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া তাঁহাকে কর দিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। তিরহুত রাজ্যের উপর মুসলমান্‌দিগের এই প্রথম আক্রমণ। কোন্ বৎসরে মহারাজ নরসিংহদেব উক্ত সুবেদারকে কর দিতে বাধ্য হন, তাহা জানা যায় নাই; তবে ইহা নিশ্চিত যে, গয়াসুদ্দীন ১২১২ হইতে ১২২৭ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত বাঙ্গালার সুবেদার ছিলেন, ইঁহারই কোন সময়ে তিনি তীরহুত জয় করেন।

জলালুদ্দীন-ফীরোজ-খিলজীর ভ্রাতুষ্পুত্র আলাউদ্দীন ১২৯৫ খৃঃ অব্দে দিল্লীর বাদশাহ হইলে, তাহার কিছুদিন পরেই বাদশাহের অসন্তোষ-ভাজন হইবার আশঙ্কায় সুলতান্ নসীরুদ্দীন-বাখরা-খাঁ গৌড়ের আধিপত্য পরিত্যাগ করিলেন। আলাউদ্দীন গৌড়-রাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া ১২৯৯ খৃঃ অব্দে সুলতান্-নসীরুদ্দীনকে গৌড়ের এবং বাহাদুর খাঁকে সুবর্ণগ্রামের সুবেদার নিযুক্ত করিলেন। আলাউদ্দীনের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র কুতুবুদ্দীন-মুবারকশাহ ১৩১৬ খৃঃ অব্দে দিল্লীর সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। দিল্লীর বাদশাহের ক্ষমতা হ্রাস হইয়াছে দেখিয়া বাঙ্গালার পূর্ব্বাঞ্চলের সুবেদার বাহাদুর খাঁ স্বাতন্ত্র্য-প্রয়াসী হইয়া স্বাধীন রাজচিহ্ন শ্বেত-পতাকা ধারণ ও ঢাকাতে আপনার নাম মুদ্রাঙ্কণ করিতে লাগিলেন; এদিকে প্রজাদিগকেও অশেষ প্রকারে উৎপীড়িত করিলেন। ১৩২১ খৃঃ অব্দে মুবারকশাহ কোনও হিন্দু-গোলামের হস্তে নিহত হন। তৎপর গয়াসুদ্দীন-তুগলক দিল্লীর সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া ১৩২৪ খৃঃ অব্দে বাহাদুর খাঁর দণ্ডবিধানের নিমিত্ত বহু সৈন্য সমভিব্যাহারে সুবর্ণগ্রাম অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সম্রাট্ বঙ্গাধিপ বাহাদুর-খাঁকে শাসিত ও পদচ্যুত করিয়া দিল্লীতে প্রত্যাগত হইবার সময় তীরহুতরাজ্য আক্রমণ পূর্ব্বক অধিকার করিলেন। সে সময়ে মহারাজ হরিসিংহদেব তীরহুতের রাজতক্তে উপবিষ্ট ছিলেন। "ফেরিস্তা" নামক পুরাবৃত্তে ইনি "রায়-তীরহুত" নামে উক্ত হইয়াছেন। হরিসিংহদেবের পরাজয় সম্বন্ধে পঞ্জীগ্রন্থে এরূপ লিখিত হইয়াছে;—

"বাণাব্ধিযুগ্মশশিসম্মিতশাকবর্ষে
পৌষস্য শুক্ল নবমী রবিসূনুবারে।
ত্যক্ত্বা সুপট্টনপুরীং হরিসিংহদেবো
দুর্দ্দৈবদেশিতপথোত্থগিরিং বিবেশ॥"

অর্থাৎ,—১২৪৫ শকাব্দে পৌষমাসে শুক্লা নবমী তিথিতে শনিবারে হরিসিংহদেব সুপট্টনপুরী (পাটনা নগরী) পরিত্যাগ করিয়া পর্ব্বতে চলিয়া গেলেন। ১২৪৫ শক (১৩২৪ খৃঃ অব্দ) হইতেই তীরহুত-রাজ্য মুসলমানদিগের অধিকৃত হইল। গয়াসুদ্দীন তীরহুতের জঙ্গল কাটিয়া হরিসিংহ দেবের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন; তীরহুত-রাজও ধৃত হইয়া বন্দী হইলেন; অবশেষে সম্রাট্ তীরহুত এক স্বতন্ত্র সুবে'তে পরিণত করিয়া আহমদ খাঁকে তত্রত্য শাসনকর্ত্তা নিয়োগ পূর্ব্বক দিল্লীতে প্রতিগমন করিলেন। গয়াসুদ্দীন-তুগলক হরিসিংহ দেবের অনুসন্ধানের জন্য তীরহুতের যে যে স্থানের জঙ্গল কাটিয়াছিলেন, সেই সেই স্থলের এক অংশ ক্রমে ক্রমে লোকালয়ে পরিণত হইল। আইন-তীরহুতকার বলেন যে, (কাষ্ঠ) ভাঙ্গিয়া নগর পত্তন হইয়াছিল, এই হেতু ঐ জনপদ দারভাঙ্গা নামে প্রসিদ্ধ হয়।* ইহার পর ২৪ বৎসর কাল তীরহুতে কোন রাজা রাজত্ব করেন নাই।

হরিসিংহ দেবের সভাপণ্ডিত কামেশ্বর-ঝা নামক জনৈক মৈথিল-ব্রাহ্মণ দিল্লীশ্বর ফকরুদ্দীন-মহম্মদ-তুগলক হইতে তাঁহার মৃত্যুর দুই বৎসর পূর্ব্বে ১৩৪৮ খৃঃ অব্দে সরকার-তীরহুতের বন্দোবস্ত লইয়া আপনার মধ্যম পুত্র ভবসিংহ দেবকে উক্ত রাজ্য প্রদান করিলেন। মহারাজ ভবসিংহ দেব ১৩৫৮ খৃঃ অব্দ হইতে ১৩৮৫ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত ৩৭ বৎসর রাজ্য শাসন করিয়া কলেবর পরিত্যাগ করেন। ইঁহারই সময়ে ১৩৫৩ খৃঃ অব্দে গৌড়াধিপ মলিক-হাজি-ইলায়স্-সামসুদ্দীন্ ভাঙ্গড় † হাজিপুরে রাজধানী নির্ম্মাণ করেন। ভবসিংহের পত্নীদ্বয় সহমৃতা হন। তাঁহার দুই স্ত্রীর গর্ভজাত দেবসিংহ ও হরিসিংহ দেব নামে দুই পুত্র মধ্যে জ্যেষ্ঠ দেবসিংহ রাজ্য লাভ করেন। মহারাজ দেবসিংহ ১৩৫৮ খৃঃ অব্দ হইতে ১৪৪৬ অব্দ পর্য্যন্ত ৬১ বৎসর রাজত্ব করিয়া স্বর্গারোহণ করেন। পরগণা বাটীর অন্তর্গত সকুরি গ্রামে তাঁহার খানিত এক দীর্ঘিকা অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। শিবসিংহ ও পদ্মসিংহ নামে তদীয় দুই তনয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠ শিবসিংহ রাজ্য প্রাপ্ত হন। পরিহারপুর-জব্দী পরগণার মধ্যগত লহরা-রাজা গ্রামে মহারাজ শিবসিংহের রাজধানী ছিল। লহরা গ্রামে তিনটী বৃহৎ দীর্ঘিকা আছে। উহাদের একটীর নাম "ঘোড়দৌড়।" শিবসিংহের আদেশে এক ব্যক্তি জলপূর্ণ কলসীর নীচে ছিদ্র করিয়া সেই কলসী লইয়া ঘোড়া দৌড়িয়া চলিয়া যায়: যে স্থানে যাইয়া কলসীর জল নিঃশেষ হইল, যাত্রার স্থল হইতে সেই স্থান পর্য্যন্ত দীর্ঘীর খাত নির্দ্দিষ্ট হইল। উক্ত দীর্ঘী দুই মাইল দীর্ঘ। রাজবাটী উহার ধারেই ছিল। এখন প্রায় ১৩ বিঘা জঙ্গলভূমি ও কতকগুলি স্তূপাকার ইষ্টক রাজবাটীর চিহ্ন-স্বরূপ বর্ত্তমান রহিয়াছে। লহরা-রাজা গ্রামে রাজপ্রাসাদ ও দুর্গ সত্ত্বেও শিবসিংহ সুগওনা-রাজ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। সুগওনা-গ্রামে এক্ষণও তদীয় জ্ঞাতির বংশধরেরা বাস করিতেছেন। মধুবনীর ৭ মাইল দক্ষিণে পণ্ডৌল গ্রামে এক বৃহৎ দীর্ঘিকা আছে; উহাও শিবসিংহের আজ্ঞায় খনিত হইয়াছে বলিয়া প্রসিদ্ধ। তীরহুতের পূর্ব্বাংশের অনেক দীর্ঘিকাই শিবসিংহের কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। শিবসিংহ খৃঃ ১৪৪৬ অব্দ হইতে ১৪৪৯ অব্দ পর্য্যন্ত ৩ বৎসর ৯ মাস কাল রাজ্য ভোগ করিয়া পরলোক গমন করেন। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর মহারাণী লক্ষ্মী ও মহারাণী বিশ্বাস নাম্নী তদীয় দুই মহিষী যথাক্রমে খৃঃ ১৪৪৯ অব্দ হইতে ১৪৬০ অব্দ পর্য্যন্ত ১১ বৎসর এবং ১৪৬০ অব্দ হইতে ১৪৭২ অব্দ পর্য্যন্ত ১২ বৎসর রাজত্ব করেন। কোন কোন পঞ্জী গ্রন্থে পূর্ব্বে বিশ্বাস মহাদেবীর এবং তৎপরে লক্ষ্মী-মহাদেবীর রাজ্যকাল স্থিরীকৃত হইয়াছে। লক্ষ্মী-মহাদেবী

* মৈথিলী ভাষায় হ্রস্ব "ই" ও "উ"-কারের উচ্চারণ প্রায়ই হয় না; "অ"-কারের উচ্চারণ কখনও বাঙ্গালার রীতি অনুসারে "অ", এবং কখনও বা সংস্কৃতের প্রণালী অনুসারে হ্রস্ব "আ" হয়। এই নিমিত্ত "দারভাঙ্গা" শব্দে উ-কারের উচ্চারণ লোপ পাইয়া "দারভাঙ্গা" হইয়াছে। আবার "অ"-কারের উচ্চারণ হ্রস্ব আ-কারের ন্যায় হওয়াতে "দারভাঙ্গা" এক্ষণ "দরভঙ্গা" লিখিত হইলেও উচ্চারণ "দারভাঙ্গা" শব্দের বাঙ্গালা উচ্চারণের সদৃশই হইয়া থাকে। অ-কারের উচ্চারণ হ্রস্ব আকারের ন্যায় হয় বলিয়া, হিন্দুস্থানীরা "পাটনা" না লিখিয়া "পটনা" লেখে, বাঙ্গালা না লিখিয়া "বঙ্গাল্লা" লেখে; কিন্তু উচ্চারণ প্রায় আমাদের মতই করে।

† হাজি-ইলায়স্ বড় সিদ্ধিখোড় ছিলেন, এজন্য সকলে তাঁহাকে ভাঙ্গড় বলিত। তাঁহার বিষয় বিস্তারিত রূপে অতঃপর "হাজিপুরের বিবরণ" নামক প্রবন্ধে প্রকাশিত হইবে।

দেবর পদ্মসিংহকে কৃত্রিম পুত্র গ্রহণ করেন। পদ্ম-সিংহের রাজ্যপ্রাপ্তি বিষয়ে পঞ্জীকারদিগের মতভেদ দৃষ্ট হয়। গ্রিয়ার্সন্ সাহেব খৃঃ ১৪৪৯ অব্দ হইতে ১৪৫১ অব্দ পর্য্যন্ত পদ্মসিংহের রাজ্যাধিকার স্থির করিয়াছেন। বিশ্বাস মহাদেবীর মৃত্যুর পর হরিসিংহের পুত্র দর্পনারায়ণ খৃঃ ১৪৭৮ অব্দ পর্য্যন্ত ৬ বৎসর কাল রাজত্ব করেন। তৎপর তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র হৃদয়নারায়ণ ১৫১৩ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত ৩৫ বৎসর রাজতক্তে উপবিষ্ট ছিলেন। হৃদয়নারায়ণের মৃত্যুর পর তদীয় সোদর হরিনারায়ণ ১৫২৭ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত ১৪ বৎসর নিরাপদে রাজ্য ভোগ করিয়া গৌড়াধিপ নসরৎশাহ কর্ত্তৃক নিহত হন। নসরৎশাহের তীরহুত-আক্রমণের কারণ নিম্নে বিবৃত হইল।

ইতিপূর্ব্বে বিহার-প্রদেশ জৌনপুরের সুলতানের কর্ত্তৃত্বাধীন হয়। ৯০৫ হিজরি শালে (১৪৯৯ খৃঃ অব্দে) দিল্লীর সম্রাট্ আলাউদ্দীন-সিকন্দরশাহ বিহার প্রদেশ জয় করিয়া বাঙ্গালা অধিকার-মানসে অগ্রসর হইলেন। এই সংবাদ জ্ঞাত হইয়া গৌড়াধিপ আলাউদ্দীন-হুসেনশাহের পুত্র দানিয়াল বাঢ় নগরে যাইয়া সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। উভয় পক্ষে সন্ধি স্থাপিত হইল। বিহার তীরহুত সরকার শারণ প্রভৃতি সম্রাটের অধিকৃত রাজ্যগুলি তাঁহারই অধিকারে থাকিবে, সম্রাট্ বাঙ্গালা অধিকার করিতে পারিবেন না এবং কোন পক্ষই কোন পক্ষের শত্রুর সহায়তা করিতে পারিবেন না, সন্ধিপত্র দ্বারা এরূপ স্বীকৃত হইল। ১৫২০ খৃঃ অব্দে হুসেন-শাহের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র নসরৎশাহ গৌড়ের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। বাবর-বাদশাহের ভারতবর্ষ আক্রমণের সুযোগে গৌড়রাজ্যচ্যুত জিলাগুলি পুনরায় স্বাধিকৃত করিবার অভিলাষে নসরৎশাহ পিতৃকৃত সন্ধির নিয়ম ভঙ্গ করিয়া তীরহুত আক্রমণ করিলেন এবং মহারাজ হরিনারায়ণকে বধ করিয়া আপনার জামাতা আলাউদ্দীনকে তত্রত্য শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিলেন!

হরিনারায়ণের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র রূপনারায়ণ ১৫২৭ খৃঃ অব্দ হইতে ১৫৪২ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত ১৫ বৎসর রাজ্য শাসন করেন এবং রূপনারায়ণের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র কংসনারায়ণ রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন, এরূপ কথিত আছে। কংসনারায়ণ ১৫৪৮ খৃঃ অব্দে পরলোক গমন করেন। কিন্তু পুরাবৃত্তে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, তৎকালে আলাউদ্দীনই তীরহুতের সুবেদার ছিলেন। যাহা হউক, ১৫২৭ খৃঃ অব্দের পর এই বংশের যে কেহ রাজা বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়া থাকুন, তিনি নামমাত্রেই রাজা ছিলেন। নিম্নে ইহাঁদিগের বংশাবালী প্রদত্ত হইল;—

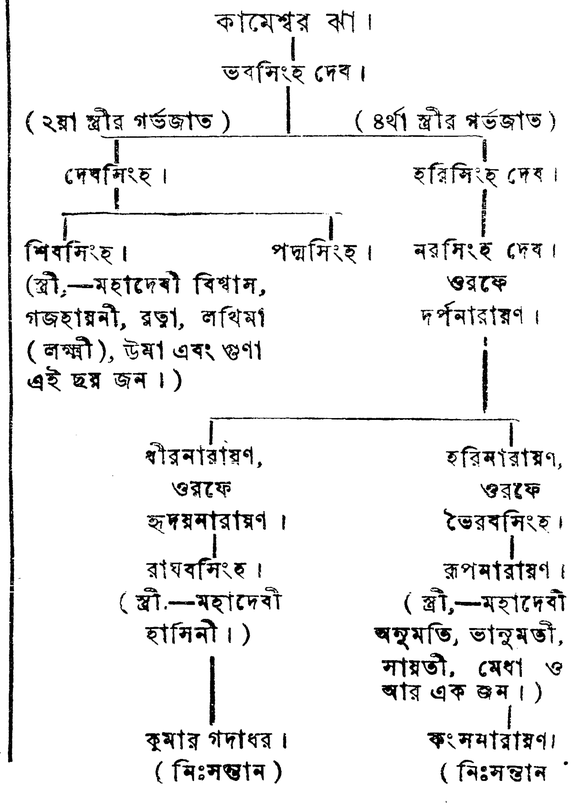

খৃষ্টীয় ১৩৪৮ অব্দ হইতে ১৫৪৮ অব্দ পর্য্যন্ত দুই শত বৎসর কামেশ্বর-ঝার বংশধরগণের রাজত্বকাল। তৎপরেই এই বংশ একরূপ লোপ পায়। গ্রিয়ার্সন্-সাহেব লিখিয়াছেন যে, সুগাওনা এবং চপাহীর মহারাণীদ্বয়ের মৃত্যু হইলে এই রাজবংশের চিহ্নও আর থাকিবে না।

মৈথিল-কবি বিদ্যাপতি-ঠাকুর-কৃত রাধা-কৃষ্ণ-বিষয়ক কোন কোন ভজনে এই রাজবংশের কিছু কিছু সংবাদ পাওয়া যায়। কোন কোন ভজনের ভণিতায় (১) রাজা শিবসিংহ, (২) লখিমা-ঠাকুরাণী, (৩) রূপনারায়ণ, (৪) মোদাবতীদেবী, (৫) প্রাণবতীদেবী এবং (৬) রাঘবসিংহ এই কয়জনের উল্লেখ আছে। ভজনের এতদ্বিষয়ক ভণিতাংশ গুলি নিম্নে উদ্ধৃত হইল;—

(১) "রাজা শিবসিংহ রূপ-নারায়ণ
লিখিমা দই প্রতি ভানে॥"

(২) "রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ
সকল কলারস জানে॥"

(৩) "ভনহিঁ বিদ্যাপতি সুনহ মধুর-পতি
রাজা চরিত অপারে।
রাজা শিবসিংহ রূপ নারায়ণ
প্রাণবতী কণ্ঠহারে॥"

(৪) "ভনহিঁ বিদ্যাপতি সুনু পরনান।
বুঝু নৃপ রাঘব নব পচোবান॥"

(৫) "বিদ্যাপতি কবি গাওল সজনী
রস বুঝায় রসবন্ত।
রাজা শিবসিংহ মন দয় সজনী
মোদবতী দেই কন্ত॥"

এক্ষণ বিদ্যাপতি কর্ত্তৃক উল্লিখিত এই ছয় জনের পরিচয় ও তাঁহাদের জীবিতকাল লইয়া গ্রিয়ার্সন ও বিম্‌স্-সাহেব কিছু গোলযোগে পড়িয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, রূপনারায়ণ শিবসিংহের পুত্রের নাম; কেহ বা বলেন, হরিনারায়ণের পুত্র রূপনারায়ণের কথাই বিদ্যাপতি উল্লেখ করিয়াছেন। শেষোক্ত রূপনারায়ণের নাম উক্ত হইয়া থাকিলেও যে, একেবারে অসঙ্গত হয়, তাহা বোধ হয় না; কারণ ১৩৭৫ হইতে ১৪৭৫ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত এক শত বৎসর বিদ্যাপতি ঠাকুর জীবিত ছিলেন, কেহ কেহ এরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।* বিদ্যাপতি হয়ত রূপনারায়ণকে তাঁহার বাল্যাবস্থায় দেখিয়া থাকিবেন। কিন্তু শিবসিংহের নামের সঙ্গে "রূপনারায়ণ" যুক্ত থাকাতেই গোলযোগ হইতেছে। এস্থলে "রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ" এই বাক্যের "রাজা-শিবসিংহ নারায়ণ (বিষ্ণু) রূপ (স্বরূপ বা তুল্য) ছিলেন" এরূপ ব্যাখ্যা করিলেই সব দিক্ রক্ষা পায়। পণ্ডিত বিদ্যাপতি-ঠাকুর (ইহাঁকে বিদ্যানাথ-ঠাকুরও বলে) ১৩৭৫ হইতে ১৪৭৫ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত এক শত বৎসরকাল জীবিত থাকিলে, তিনি ভবসিংহদেবের সময় হইতে হৃদয়নারায়ণের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিলেন, দেখা যাইতেছে।

কামেশ্বর-ঝার বংশের পর কোন্ বংশ তীরহুতের রাজা হন, তদ্বিষয়ে পঞ্জীগ্রন্থ-সমূহে মতভেদ দৃষ্ট হয়। কোন মতে কংসনারায়ণের কায়স্থ-কর্ম্মচারীরাই কিয়দ্দিন রাজ্য শাসন করেন, তৎপরেই মহেশঠাকুর রাজ্যলাভ করেন; কোন মত এই যে, কংসনারায়ণের পর মজলিস্ খাঁ নামক কোনও মৈথিল-ব্রাহ্মণের উপর তিন বৎসরকাল রাজ্যভার ছিল, তৎপর নিম্ন-লিখিত পাঁচজন বিহোর-রাজপুত যথাক্রমে রাজত্ব করেন;—

* বাঙ্গালা ১২৯১ শালের ১৫ই ফাল্গুনের "অনুসন্ধান" নামক পাক্ষিক পত্রে প্রকাশিত মল্লিখিত "কবি বিদ্যাপতি ঠাকুর" নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

(১) বীরবল নারায়ণ,
ওরফে রূপনারায়ণ,—রাজত্বকাল ৭ মাস।
(২) উন্মাদসিংহ, ,, ১১ মাস।
(৩) খড়্গসিংহ, ,, ৩ বৎসর ২মাস।
(৪) কোশেশ্বরসিংহ ,, ৫ বৎসর।
(৫) মন্মথসিংহ, ,, ৭ দিন।

সমুদয়ে ৯ বৎসর ৮ মাস ৭ দিন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, কংসনারায়ণের ১৫৪৮ খৃঃ অব্দে মৃত্যু হইলে মজলিস্ খাঁ তিন বৎসর এবং বিহৌর-রাজপুতগণ অনধিক দশ বৎসর কাল তীরহুতরাজ্য শাসন করিলে পর ১৫৬১ খৃঃ অব্দের পরে ক্রমে ক্রমে মহেশ ঠাকুরের বংশীয়গণ তীরহুত-সকারের জমিদার হন।

দুবে-ঠাকুরের পৌত্র ও চাঁদ-ঠাকুরের পুত্র মহেশ-ঠাকুর* মধ্য-ভারতবর্ষের অন্তর্গত জব্বলপুরের নিকটবর্ত্তী কোন স্থান হইতে খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম-ভাগে তীরহুতে আসিয়া দারভাঙ্গা জিলার অন্তঃপাতী গোপালপুর পরগণার মধ্যগত বিহৌর (ভোর) গ্রামে বসতি করেন। মহেশ-ঠাকুর খণ্ডবালা কুলোদ্ভব শ্রোত্রিয়† ব্রাহ্মণ। ইনি প্রথমতঃ তীরহুতরাজ ভবসিংহ দেবের বংশধর নৃপতিগণের পৌরোহিত্যে নিযুক্ত হন। সংস্কৃত ন্যায়-দর্শনে অতি প্রধান পণ্ডিত ছিলেন বলিয়া নানা দেশের বিদ্যার্থিগণ তাঁহার নিকট ন্যায়শাস্ত্র শিক্ষা করিতে আসিতেন। রঘুনন্দন রায় নামক জনৈক মৈথিল ব্রাহ্মণ মহেশঠাকুরের চৌপাড়ীতে পাঠ করিতেন। দারভাঙ্গা জিলার অন্তঃপাতী গৌড় পরগণার মধ্যগত রামপুর গ্রামে রঘুনন্দনের নিবাস ছিল। অবুল-ফতহ্-জলালুদ্দীন-মুহম্মদ-অকবর-বাদশাহ সেই সময়ে দিল্লীর সম্রাট্ ছিলেন। অকবরশাহ শাস্ত্রালোচনা শুনিতে বড় ভালবাসিতেন। এই নিমিত্ত তাঁহার দরবারে সময়ে সময়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের শাস্ত্রীয় বিতণ্ডা অনুষ্ঠিত হইত। রঘুনন্দন কোনও মোল্লার সহায়তায় বাদশাহের দরবারে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। দরবারস্থ পণ্ডিতদিগের সহিত শাস্ত্র-বিষয়ক তর্কযুদ্ধে তিনি জয়লাভ করিলেন। ইহাতে অকবরশাহ সন্তুষ্ট হইয়া ৯৬৫ ফসলী-শালের ২১এ চৈত্র তারিখে (১৫৫৮ খৃঃ অব্দে) রঘুনন্দনকে পণ্ডিত খেতাব ও তীরহুতের অন্তর্গত হাতী পরগণার * জমিদারি প্রদান করিলেন। রঘুনন্দন পণ্ডিত ছিলেন। তিনি পণ্ডিত বলিয়া গণনীয় হইবার জন্যই দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়াছিলেন; সম্পত্তিতে তাঁহার কোন প্রয়োজন ছিল না। সুতরাং গুরুদক্ষিণা স্বরূপ জমিদারি মহেশ ঠাকুরকে প্রদানার্থ বাদশাহের দান গ্রহণ পূর্ব্বক স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়াই রঘুনন্দন গুরুকে অভীষ্ট দক্ষিণা প্রদান করিলেন। মহেশ ঠাকুরেরও ধনলোভ ছিল না। তিনি দান গ্রহণ করিয়াও অন্য কোন অছিলায় রঘুনন্দকে হাতী পরগণা ফিরাইয়া দিলেন। গুরু প্রত্যর্পণ করিলেও শিষ্য তাহা গ্রহণ করিলেন না। ইতিমধ্যে ১৫৫৮ খৃঃ অব্দে রামচন্দ্র, গোপাল, উচিত, পরমানন্দ ও শুভঙ্কর এই পাঁচ পুত্র বর্ত্তমান রাখিয়া মহেশঠাকুর স্বর্গারোহণ করিলেন। পিতার মৃত্যুর পর গোপাল ঠাকুর অকবর-শাহের দরবারে গমন পূর্ব্বক বাদশাহের প্রদত্ত সম্পত্তিতে মহেশ-ঠাকুরের স্বত্ব সাব্যস্ত করিয়া মহেশঠাকুরের নামে উহার বন্দোবস্ত লইলেন। গোপালঠাকুর আসিবার সময়ে ১৫৮৫ খৃষ্টাব্দে কাশীধামে কলেবর পরিত্যাগ করেন। গোপালঠাকুরের সময়েই ১৫৮২ খৃঃ অব্দে রজা তোড়লমল্ল "আশল-জমা-তুমারি-রকৃবা" নামক প্রসিদ্ধ রাজস্বের বন্দোবস্ত করেন। সম্ভবতঃ এই সময়েই বাদশাহের সরকার হইতে দারভাঙ্গায় এক জন ফৌজদার নিযুক্ত করা হয়। মহীনাথ ঠাকুরের সময়ে মির্জ্জাখাঁ নামে এক ব্যক্তি দারভাঙ্গার ফৌজদার ছিলেন। এই মির্জ্জা খাঁ এবং গোরক্ষপুরের ফৌজদার ইল্লাহ-বর্দ্দী-খাঁ ১০৭৫ হিজরি-শালের প্রারম্ভে (১৬৬৪ খৃঃ অব্দের শেষ ভাগে) মোরঙ্গ-রাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-যাত্রা করেন। ঐ যুদ্ধেই মির্জ্জাখাঁর মৃত্যু হয়। নিম্নে গোপাল ঠাকুরের ত্যক্তসম্পত্তির উত্তরাধিকারীদিগের নাম ও সময় যথাক্রমে প্রদত্ত হইল;—

(১) মহেশ ঠাকুর ... ... ১৫৫৮ খৃঃ অব্দে মৃত্যু হয়।
(২) গোপাল ঠাকুর,—(১মের ২য় পুত্র) ... ... ১৫৮৫ ,, ,,
(৩) পরমানন্দ ঠাকুর,—(১মের ৪র্থ পুত্র) ... ... ,, ,,
(৪) শুভঙ্কর ঠাকুর,—(১মের ৫ম পুত্র) ... ... ১৬০৭ ,, ,,
(৫) পুরুষোত্তম ঠাকুর,—(৩র্থের জ্যেষ্ঠ পুত্র) ... ১৬৪২ ,, ,,

* পান্নার মহারাজ হিন্দুপতির প্রধান মন্ত্রী বেণী-সিংহ হাজরির বর্ত্তমান বংশধর ঠাকুর জগমোহন সিংহ জব্বলপুর জিলার অন্তঃপাতী বিজয়রঘোড় নামক নগরে বাস করেন। এই বংশ এবং মৈথিল মহেশঠাকুরের বংশ এক কি না তাহার অনুসন্ধান আবশ্যক।

† শ্রোত্রিয়।—(১) জন্মনা ব্রাহ্মণো জ্ঞেয়ঃ সংস্কারৈর্দ্বিজ উচ্যতে। বিদ্যাভ্যাসী ভবেদ্বিপ্রঃ শ্রোত্রিয়স্ত্রিভিরেব হি॥ (২) একাং শাখাং সকল্পাং বা ষড়ঙ্গবিদধীত্য চ। ষট্‌কর্ম্মনিরতো বিপ্রঃ শ্রোত্রিয়ো নাম ধর্ম্মবিৎ॥

* ফসলী-শাল।—অধুনা ইংরেজ-রাজত্বে যেরূপ খৃষ্টীয় অব্দের প্রচলন হইয়াছে, সেইরূপ মুসলমান-রাজত্ব সময়ে ভারতবর্ষে হিজরি শালেরই অধিক প্রচলন ছিল। হিজরি-শাল চান্দ্রবৎসর ও ইহার মাসগুলি চান্দ্রমাস। কোনও জ্যোতিষিক প্রণালী অনুসারে এই চান্দ্রমাসগুলি গঠিত নহে। অমাবস্যার পর চন্দ্র প্রথম দেখা যাইলেই সেই দিন মাসারম্ভ হইতে মাসের প্রথম দিন গণনা হইয়া থাকে। সুতরাং আকাশের নৈসর্গিক অবস্থার উপর মাসের স্থায়িত্ব নির্ভর করে এবং অনভিদূরস্থ দুই স্থানে কোনও মাসের শেষ বা প্রারম্ভ তারিখের ব্যতিক্রম লক্ষিত হয়। এই অসুবিধা নিবারণের নিমিত্ত অকবরশাহ স্বদীয় দিল্লীর সিংহাসনে অধিরোহণের তারিখ ৯৬৩ হিজরি-শালের রবি-উস্-সানি মাসের ২রা (১৫৫৬ খৃঃ অব্দের ১৪ ফেব্রুয়ারি) হইতে হিজরি চান্দ্র-বৎসরকে সৌর-বৎসরে পরিণত করেন। এই সৌর-মানে পরিবর্ত্তন দ্বারা বাঙ্গালায় অধুনা প্রচলিত, বাঙ্গালা-শাল এবং সুবে-বিহার বারাণসী ও মধ্য প্রদেশে ফসলী শালের প্রচলন হইয়াছে। এক সময়ে প্রচলিত হইলেও বাঙ্গালা-শাল ও ফসলী-শালের যে প্রভেদ লক্ষিত হয়, তাহার কারণ এই যে, ৯৬৩ ফসলী শাল ১৫৫৬ খৃঃ অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে শেষ হয়, সুতরাং উহার আরম্ভ ১৫৫৫ খৃঃঅব্দের সেপ্টেম্বর মাস হইতে গণনা করিতে হইবে; কিন্তু বাঙ্গালা ৯৬৩ শাল ১৫৫৬ খৃঃ অব্দের এপ্রিল মাসে আরম্ভ হইয়া, ১৫৫৭ খৃঃ অব্দের এপ্রিল মাসে শেষ হয়। বাঙ্গালা-শাল ১লা বৈশাখ হইতে ও ফসলী-শাল ১লা-আশ্বিন, (কু-আর) হইতে আরম্ভ হয়। অকবরশাহ কর্ত্তৃক বর্ত্তমান বাঙ্গালা-শালের প্রচলনের পূর্ব্বে বাঙ্গালায় সাধারণ কার্য্যে কোন্ অব্দ চলিত ছিল, তাহা জানা যাইতেছে না। জ্যোতিষিক গণনায় শকাব্দের পূর্ব্বেও ব্যবহার ছিল এরূপও আছে। ঢাকা জিলার অন্তঃপাতী শ্রীনগর থানার মধ্যগত তাজপুর ও রসুনিয়া গ্রামে বহুদিন পূর্ব্বের কতকগুলি দলিল দেখিতে দেখিতে এই প্রস্তাব-লেখক লক্ষ্য করিলেন যে, দলিল গুলিতে "হিজরি-শাল" ও "পরগণাতি-সন" এই উভয়ই দেওয়া হইয়াছে। উহাতে ৫০৪ পরগণাতি-সন হইতে ৫৭৯ পরগণাতি সন পর্য্যন্ত দৃষ্ট হইল। পরবর্ত্তী দলিল গুলিতে বাঙ্গালা ও হিজরি-শাল দেওয়া হইয়াছে। যতদূর দেখা গেল, পরগণাতি-সন সৌর-বৎসর ও ১লা বৈশাখ হইতে ইহার আরম্ভ। ৫০৪ পরগণাতি সনে ১১১৩ হিজরি, ১৬২৮ শকাব্দ ও ১৭০৫ খৃঃ অব্দ। ৫৭৯ পরগণাতি-সনে বাঙ্গালা ১১৮৭ শাল বা ১৭৮০ খৃঃ অব্দ। ইহাতে বোধ হইতেছে, ৬০৮ বাঙ্গালা শালে অথবা ১২০১ খৃঃ অব্দে পরগণাতি সনের প্রারম্ভ হইয়াছিল। ১৫৫৬ খৃঃ অব্দের (৯৬৩ হিজরি শালের) পূর্ব্বে বাঙ্গালা শালের বর্ত্তমানতাই ছিল না, সুতরাং বাঙ্গালা-শাল প্রচলিত হইবার ৩৫৫ বৎসর পূর্ব্ব হইতে পরগণাতি-সন প্রচলিত ছিল, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। এই পরগণাতি-সন বাঙ্গালার অন্যত্রও প্রচলিত ছিল কি না, তদনুসন্ধান আবশ্যক হইতেছে।

* হাতী পরগণার ক্ষেত্রফল ৭২,৪৪৭ একার ও বার্ষিক সদর মালগুজারি ১১,৭৮৮৲ টাকা। এই পরগণার মধ্যস্থ ভবারা গ্রামে মহেশ-ঠাকুরের বংশধরেরা বাস করিতেন। পরে রাজা প্রতাপ-সিংহ দারভাঙ্গা নগরে ভদ্রাসন নির্ম্মাণ করেন। ভবারা গ্রামে অকবর-বাদশাহের সময়ে বাঙ্গালার সুবেদার আলাউদ্দীনের নির্ম্মিত এক মশজিদ বর্ত্তমান আছে।

(৬) সুন্দর ঠাকুর,—(৪র্থের ৬ষ্ঠ পুত্র) ... ... ১৬৬২ খৃঃ অব্দে মৃত্যু হয়।
(৭) মহীনাথ ঠাকুর,—(৬ষ্ঠের জ্যেষ্ঠ পুত্র) ... ১৬৮৪ ,, ,,
(৮) নৃপতি ঠাকুর,—(৬ষ্ঠের কনিষ্ঠ পুত্র) ... ১৭০০ ,, ,,
(৯) রাজা রঘুসিংহ,—(৮মের ২য় পুত্র) ... ... ১৭৩৬ ,, ,,
(১০) ,, বিষ্ণুসিংহ,—(৯মের জ্যেষ্ঠ পুত্র) ... ১৭৪০ ,, ,,
(১১) ,, নরেন্দ্রসিংহ,—(৯মের কনিষ্ঠ পুত্র) ... ১৭৬০ ,, ,,
(১২) ,, প্রতাপসিংহ,—(১১শের কৃত্রিম-পুত্র এবং একনাথ ঠাকুরের ঔরস-পুত্র। ৪র্থের ২য় পুত্র নারায়ণ ঠাকুর, তৎ-পুত্র লাল ঠাকুর, তৎপুত্র গুণানন্দ ঠাকুর এবং তৎপুত্র একনাথ ঠাকুর।) ... ১৭৭৬ ,, ,,
(১৩) রাজা মধুসিংহ,—(একনাথ ঠাকুরের ২য় পুত্র) ... ১৮০৮ ,, ,,
(১৪) মহারাজ ছত্রসিংহ,—(১৩শের ২য় পুত্র) ... ১৮৩৯ ,, ,,
(১৫) মহারাজ রুদ্রসিংহ বাহাদুর,—(১৪শের জ্যেষ্ঠ পুত্র) ১৮৫০ ,, ,,
(১৬) মহারাজ মহেশ্বরসিংহ বাহাদুর,—(১৫শের জ্যেষ্ঠ পুত্র) ১৮৬০, ২০শে অক্টোবর
(১৭) মহারাজ লক্ষ্মীশ্বরসিংহ বাহাদুর,—(১৬শের জ্যেষ্ঠ পুত্র) ১৮৫৮, ২৫শে মে জন্ম হয়।

গোপাল ঠাকুর হইতে রাজা বিষ্ণুসিংহ পর্য্যন্ত সকলেরই মধুবনীর অর্দ্ধ মাইল দক্ষিণস্থ হাতী পরগণার মধ্যবর্ত্তী ভবারা (ভওআরা) গ্রামে ভদ্রাসন ছিল। রাজা নরেন্দ্র সিংহ ১৭৬২ খৃঃ অব্দে দারভাঙ্গায় প্রাসাদ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক বাস করেন। তদবধি এই বংশীয়গণ দারভাঙ্গাতেই বাস করিতেছেন। রাজারঘু সিংহ ভবারাতে এক দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। উক্ত দুর্গের ইষ্টক-নির্ম্মিত প্রাচীরের ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি দৃষ্ট হয়। নৃপতি ঠাকুর পর্য্যন্ত ইহাঁরা "ঠাকুর" উপাধিতেই পরিচিত ছিলেন; কিন্তু তৎপুত্র রাজা রঘু সিংহই সর্ব্ব প্রথমে ব্রাহ্মণ্য-জ্ঞাপক "ঠাকুর" উপাধি পরিবর্ত্তে ঐশ্বর্য্য-জ্ঞাপক ক্ষত্রিয়োপাধি "সিংহ" নামে আখ্যাত হন। ইহাঁরই সময়ে সুবে-বাঙ্গালার সুবেদার আলী-বর্দ্দিখাঁ-মহবৎজঙ্গ রঘুসিংহের "রাজা" উপাধি স্বীকার করেন।

রাজা রঘুসিংহ আলীবর্দ্দী-খাঁকে বহুবিধ উপহার প্রদান করিয়া বার্ষিক এক লক্ষ টাকা মালগুজারি নবাব-সরকারে প্রদান করিবেন এরূপ অঙ্গীকারে সরকার-তীরহুতের মোকর্‌রি পাট্টা প্রাপ্ত হন। বাদশাহ বা সুবেদার কোন কোন কারণে জমিদারদিগকে বরতরফ করিতে পারিতেন। কিন্তু মোকর্‌ররিদারকে জমিদারি-চ্যুত করিবার অধিকার বাদশাহের বা সুবে-দারের ছিল না। মোকর্‌ররিদার নির্দ্দিষ্ট মাস্তুজারি রাজকোষে প্রদান করিয়া চিরস্থায়ী রূপে পুত্র-পৌত্রাদি ক্রমে জমিদারি ভোগ-দখল করিতে অধিকারী ছিলেন। নবাবের দিবান রাজা ধরণীধরের সাহায্যেই রঘুসিংহ সরকার-তীরহুতের মোকর্‌ররি-বন্দোবস্ত করিতে সমর্থ হন; এই নিমিত্ত উক্ত দিবানকে রঘু-সিংহ পঞ্চাশ হাজার টাকা বার্ষিক নজরানা স্বরূপ প্রদান করিতেন।

মধুবনীর দশ মাইল পূর্ব্বদিকে বাসুদেবপুর নামে এক গ্রাম আছে। উহা ভোর পরগণার মধ্যস্থিত। ঐ গ্রামের নাম প্রথমে শঙ্করপুর ছিল। তৎপরে শঙ্করপুর গন্ধবার এবং তাহারও

পরে বাসুদেবপুর নাম হয়। মহারাজ ছত্র-সিংহ মহারাণী ছত্রপতিকে যৌতক স্বরূপ শঙ্করপুর গ্রাম প্রদান করেন। মহারাণী তাঁহার কনিষ্ঠপুত্র বাসুদেব সিংহকে উক্ত গ্রাম প্রদান করেন। এই বাসুদেব-সিংহের নামানু-সারেই শঙ্করপুর-গন্ধবার গ্রাম বাসুদেবপুর নামে খ্যাত হইয়াছে। পূর্ব্বে গন্ধ ও ভোর নামে দুই ভ্রাতা ছিলেন। গন্ধ শঙ্করপুরে বাস করিতেন। এই নিমিত্ত ঐ গ্রাম শঙ্করপুর-গন্ধবার (গন্ধোয়ার) নামে প্রসিদ্ধ হয়। ভোর চক্‌মণি পরগণার মধ্যগত সিজিয়া গ্রামে বাস করিতেন। ইহাঁরা অতি পরাক্রমশালী জমি-দার ছিলেন। তিলজুগা নদীর পূর্ব্বপারে গন্ধের এবং করাই নদীর দক্ষিণে ভোরের জমিদারী বিস্তৃত ছিল। রাজা রঘুসিংহ সরকার-তীরহুতের মোকর্‌ররিদার নিযুক্ত হইলে গন্ধ ও ভোরের জমিদারি রঘুসিংহের এলাকা-ভুক্ত হয়। তীরহুত-রাজ (রঘুসিংহ কি তাঁহার পরবর্ত্তী কেহ হইবেন) গন্ধ ও ভোরকে হত্যা পূর্ব্বক তাঁহাদের জমিদারি স্বাধিকৃত করিবার নিমিত্ত দুই জন বিদেশী লোককে নিযুক্ত করিলেন। গন্ধ ও ভোর ইহাদের হস্তে নিহত হইলেন। গন্ধের হত্যাকারী ও তাহার বংশীয়েরা "গন্ধসারিয়া" নামে এবং ভোরের হত্যাকারী ও তাঁহার বংশীয়েরা "ভোরসারিয়া" (ভোরজীৎ) নামে প্রসিদ্ধ হইল।

রাজা রঘুসিংহের সহিত একনাথ ঠাকুরের কোন বিষয়ে মতান্তর ঘটাতে, একনাথ নবাব আলীবর্দ্দী-খাঁকে যাইয়া বলিলেন, রাজা রঘুসিংহ সরকার-তীরহুতের মোকর্‌ররি-বন্দোবস্ত গ্রহণ করিয়া নবাব-সরকারে কেবল এক লক্ষ টাকা মালগুজারি দিতেছেন; কিন্তু এতদ্দ্বারা তিনি অনেক মুনফা করিতেছেন। একনাথ ঠাকুর প্রকৃত কথাই বলিয়াছিলেন। কারণ ১৬৮৫ খৃঃ অব্দে, আবুল-মুজফ্‌ফর মুহীউদ্দীন-ঔরঙ্গ-জেব-আলমগীর-বাদশাহের সাম্রাজ্য কালে, রাজস্বের যে দ্বিতীয় বন্দোবস্ত হয়, তাহাতে দেখা যায়, সরকার-তীরহুতের মালগুজারি ৭,৬৯, ২৮৭৲ টাকা নির্দ্ধারিত ছিল। সেই সরকার এক লক্ষ টাকা মালগুজারি প্রদানের করারে মোকর্‌ররি বন্দোবস্ত পাইয়া রঘুসিংহ যে অত্যধিক লভ্য করিতেছিলেন, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ কি? নবাব আলীবর্দ্দী-খাঁ এই সংবাদ শুনিয়া অবিলম্বে সসৈন্যে তীরহুত যাত্রা করিলেন। রঘুসিংহ পূর্ব্বেই পলাইয়া আত্ম-রক্ষা করিয়াছিলেন, সুতরাং রঘুসিংহের সম্পত্তি ও পরিবারবর্গ নবাবের হস্তগত হইল। রঘু-সিংহের পরিবারবর্গকে নবাব পাটনায় লইয়া গেলেন। নবাবের অনুরোধে রঘুসিংহ কয়েক দিন পরে নাবাবের কাছে হাজির হইলেন। আলীবর্দ্দী মোকর্‌ররি স্বত্ব রহিত করিয়া কেবল জমিদারী-স্বত্বে রঘুসিংহকে সরকার-তীরহুত ফিরাইয়া দিলেন। লাভাংশ স্বরূপ নবাব যথোপযুক্ত নানকার-জমিন্ * ও সদুই নামক রশুন রঘুসিংহকে প্রদান করিলেন। অর্থী প্রত্যর্থীর সদ্বিচার, প্রজার দুঃখমোচন ও রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধিসাধন করিবেন বলিয়া রঘুসিংহ নবাবের নিকট অঙ্গীকার করিলেন। রঘুসিংহ আপন অঙ্গীকার যথাসাধ্য প্রতিপালন করিয়াছিলেন।

১৭৫৪ খৃঃ অব্দে নবাব আলীবর্দ্দী খাঁ রাজা নরেন্দ্রসিংহকে দস্তরাৎ নামক রশুম (কমিশন) প্রদানের ব্যবস্থা করেন। সম্ভবতঃ এই দস্তরাৎ রশুম প্রদানের পরে সুবে-বিহারের নায়েব-নাজীম রাজা-রামনারায়ণ রাজা-নরেন্দ্র-সিংহ হইতে মালগুজারি ওয়াশিলের জন্য ভিখারী-মহতা নামক আমীনকে সসৈন্যে প্রেরণ

* নামকার-জমিন্।—জমিদারের গ্রাসাচ্ছাদ-নার্থ যে জমি নির্দ্দিষ্ট থাকিত, তাহাই নানকার। এই জমির মালগুজারি দিতে হইত না। "নান" শব্দের অর্থ রুটি।

করেন। গোপালপুর পরগণার মধ্যগত কন্দর্পী-ঘাটে (গন্ধর্ব্বীঘাটে) ভিখারী-মহতার সঙ্গে নরেন্দ্রসিংহ যুদ্ধ করিয়া জয়ী হন। রাজা জয়োল্লাসে ব্রাহ্মণ, মোহান্ত ও ফকীরদিগকে হাজার বিঘা জমি ব্রহ্মোত্তর শিবোত্তর ও ফকীরান্ স্বরূপ প্রদান করেন।

রাজা নরেন্দ্রসিংহের পুত্র না হওয়াতে তিনি একনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠপুত্র প্রতাপ সিংহকে কৃত্রিম পুত্র গ্রহণ করেন। শুভঙ্কর ঠাকুরের দ্বিতীয় পুত্র নারায়ণ ঠাকুর, নারায়ণের পুত্র লাল ঠাকুর, লাল ঠাকুরের পুত্র গুণানন্দ ঠাকুর, গুণানন্দ ঠাকুরের পুত্র একনাথ ঠাকুর। এই একনাথের প্রতাপসিংহ ও মধুসিংহ নামে দুই পুত্র জন্মে। ইহাঁদের উভয়েই রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন।

মধুবনীর ১৪ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রতাপগঞ্জ ও শ্রীগঞ্জনামে দুইটী বাজার আছে। রাজা প্রতাপ সিংহের নামানুসারে প্রতাপগঞ্জ এবং রাজা মধুসিংহের শ্যালিকা শ্রীদেবীর নামানুসারে শ্রীগঞ্জ বাজারের নাম হইয়াছে। রাজবংশের অনেকেরই অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যু হওয়াতে প্রতাপ সিংহ শঙ্কিত হইয়া শিবপ্রসাদ গিরি নামক সুরনাম গ্রামস্থ কোনও মোহান্তের নিকট এতৎপ্রতিকারপ্রার্থী হইলেন। মোহান্তজী ঝঞ্ঝারপুর গ্রামে যাইয়া আপনার মস্তকের এক গুচ্ছ কেশ দগ্ধ করিয়া বলিলেন, এই গ্রামে যে বাস করিবে, তাহারই পুত্র জন্মিবে। প্রতাপ সিংহ তদনুসারে ঝঞ্ঝারপুরে বাটী নির্ম্মাণের আদেশ করিলেন। দুর্ভাগ্য বশতঃ অট্টালিকা নির্ম্মাণ সমাধা হইবার পূর্ব্বেই প্রতাপ সিংহের মৃত্যু হয়। যাহা হউক প্রতাপ সিংহের পরবর্ত্তী রাজারা পুত্রকামনায় ঝঞ্ঝারপুরস্থ বাটীতে যাইয়া বাস করিতে লাগিলেন; এই নিমিত্ত অতঃপর ঝঞ্ঝারপুর এই বংশীয়দিগের জন্মস্থান রূপে পরিণত হইয়াছে। ঝঞ্ঝারপুর গ্রাম কোনও রজপুতের তালুকভুক্ত ছিল; পরে মহারাজ ছত্রসিংহ সেই রজপুত হইতে উহা ক্রয় করিয়া লন।

১৭৭৬ খৃঃ অব্দে দিল্লীর বাদশাহ সুল্‌তান্-আলীগৌহর-শাহ-আলম রাজা মধুসিংহকে পূর্ণিয়া জিলার অন্তঃপাতী ধরমপুর পরগণা* প্রদান করেন।

সুবে-বিহারে† চারিবার রাজস্বের বন্দোবস্ত হয়। (১ম) ১৫৮২ খৃঃ অব্দে অকবর-বাদসাহের সময়ে রাজা তোড়ল-মল্ল কর্ত্তৃক; (২য়) ১৬৮৫ খৃঃ অব্দে ঔরঙ্গজেব-বাদশাহের সময়ে; (৩য়) ১৭৫০ খৃঃ আলীবর্দ্দীখাঁ-মহবৎজঙ্গের সবেদারী ও মহারাজ জানকীরাম সোমের আমলদারির সময়ে এবং (৪র্থ) ১৭৬৫খৃঃ অব্দে ইংলণ্ডীয় ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানির দিবানির সময়ে‡ মহম্মদ-রেজাখাঁ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হয়।

* ধরমপুর পরগণার ক্ষেত্রফল ৭,৫৬,৫৩৫ একার অথবা ১,১৮২ বর্গ মাইল হইবে। এই পরগণা ৪৫৩টী তালুকে বিভক্ত। ইহার বার্ষিক মালগুজারি ২,৩১,৪৩১, টাকা।

† মুসলমান-রাজত্বকালে সুবে-বিহার গঙ্গার উত্তরবর্ত্তী তীরহুত, হাজিপুর, শারণ ও চম্পারণ নামক চারি সরকারে এবং গঙ্গার দক্ষিণবর্ত্তী বিহার, মুঙ্গের ও রোহতস্ নামক তিন সরকারে (সমুদয়ে সাত সরকারে) বিভক্ত ছিল। তন্মধ্যে সরকার-রোহতস্, সহশ্রম্ (সহশরম্) এবং ভোজপুর (শাহাবাদ) নামক দুই বিভাগে বিভক্ত হইয়া দুই স্বতন্ত্র সরকারে পরিণত হইয়াছিল। কতিপয় মৌজার (গ্রামের) সমষ্টিতে এক তালুক, কতিপয় তালুকের সমষ্টিতে এক পরগণা, কতিপয় পরগণার সমষ্টিতে এক সরকার এবং কতিপয় সরকারের সমষ্টিতে এক সুবে নির্দ্দিষ্ট হইত। পূর্ব্বতন সরকারই বর্ত্তমানে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন দ্বারা জিলায় পরিণত হইয়াছে। গঙ্গার দক্ষিণবর্ত্তী সরকার বিহারের মধ্যগত আজীমাবাদ (পাটনা) নগরে সুবেদার বাস করিতেন, এই নিমিত্ত উক্ত সরকারের নাম অনুসারে সমুদায় সুবের নাম সুবে-বিহার হইয়াছে।

‡ অবুল মুজফ্‌ফর জলালুদ্দীন-সুলতান-আলীগৌহর-শাহআলম্ বাদশাহ ১৭৬৫ খৃঃ অব্দের ১২ই আগষ্ট তারিখের স্বাক্ষরিত ফরমান্ (সনন্দ-পত্র) দ্বারা মহামান্য ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানিকে ২৬ লক্ষ টাকা রাজস্ব বাদশাহের সরকারে প্রদানের অঙ্গীকারে

এই চারিবারে তীরহুতের মালগুজারি যেরূপ নির্দ্ধারিত হয়, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

সরকার-তীরহুতের বন্দোবস্তের সময়।	পরগণার সংখ্যা।	ভূমির পরিমাণ ফল। (১ রাজকীয় বিঘা ৩৬০০ বর্গ এল)	মালগুজারি (সিক্কা টাকা)	বাদজায়গীর, মালিকানা, নামকার, মসুকুরাৎ, সেবন্দী	খরচা বাদ বন্দোবস্তি জমা। (সিক্কা টাকা)	তীরহুতের যে রাজার সময়ে বন্দোবস্ত হয়।
(১) ১৫৮২ অব্দ, (অকবর শাহ)	৭৪	২, ৬৬, ৪৬৪ রাজকীয় বিঘা	১০,২১,৯৮৬			গোপাল ঠাকুর
(২) ১৬৮৫ অব্দ, (ঔরঙ্গজেব)	১০২	———	৭,৬১,২৮৭			নৃপতি ঠাকুর
(৩) ১৭৫০ অব্দ, (আলীবর্দ্দী খাঁ)	৯৩	২, ৬৬, ৪৬৪ রাজকীয় বিঘা	৮,২০,০৪২			রাজা নরেন্দ্র সিংহ।
(৪) ১৭৬৫ অব্দ, (ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানী)	৯৩	৫,০৩৩ বর্গ মাইল।*	৮,২০০৪২	৫,৭৪,৮৩০	২,৪৫,২১২	রাজা প্রতাপ সিংহ (রাজা মধুসিংহ)

১১৭৩ ফসলী শালে অথবা ১৭৬৫—৬৬ খৃঃ অব্দে মহামান্য ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির পক্ষ হইতে মহম্মদ-রেজাখাঁ যে বন্দোবস্ত করেন, তাহাতে দেখা যায়, সমুদয়ে চারি নামে হিসাব প্রস্তুত হইয়া সরকার-তীরহুতের মালগুজারি (খরচা বাদ) ২,৪৫,২১২ টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। নিম্নলিখিত হিসাব অনুসারে উক্ত মাস্তুজারি স্থিরীকৃত হয়;—

১ নং। হাভিলী দারভাঙ্গা প্রভৃতি ৮৪ পরগণা।—ব্রাহ্মণ-জাতীয় রাজা মধুসিংহ ও কতিপয় ক্ষুদ্র জমিদারের সঙ্গে বন্দোবস্ত হয়। আসল জমা ৫,৫৪,০৫২ টাকার মধ্যে ন্যূন করিয়া মোট বন্দবস্তি জমা ২,০০,২২৯

২ নং। বিচোর প্রভৃতি তিন পরগণা। ১১৭৩ ফসলী শালে মহম্মদ-রেজা-খাঁর জায়গীর। মোট বন্দোবস্তি মোকররি জমা ১,৪২,০৭০৲

বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যা এই তিন সুবার দিবান নিযুক্ত করেন। ইতিপূর্ব্বেই নবাব আলীবর্দ্দীখাঁ কটক প্রদেশ মরহাট্টাদিগকে অর্পণ করিয়া বালেশ্বরের নিম্নস্থ সোণামুখী (বুড়াবলঙ্গ) নদী মোগল ও মরহাট্টা রাজ্যের সীমা স্থির করেন। ১৮০৩ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত ঐ সীমাই স্থিরতর ছিল। ঐ সময়ে মারহাট্টাদিগের সহিত দ্বিতীয়বার যুদ্ধে জয়ী হইয়া ইংরেজেরা সমস্ত উড়িষ্যা প্রদেশই স্বরাজ্যভুক্ত করেন।

* তীরহুত জিলার ভূমির পরিমাণ ফল (হাজিপুর লইয়া) বর্ত্তমান সময়ে এরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে;—
(১) মুজঃফরপুর জিলা ৩,০০৩ বর্গমাইল।
(২) দারভাঙ্গা জিলা ৩,৩৩৫ বর্গমাইল।
মোট ৬,৩৩৮ বর্গমাইল।

মুসলমান শাসন সময়ে হাজিপুর স্বতন্ত্র সরকার ছিল। বর্ত্তমান তাজপুর মহকুমার অনেক ভূমি পূর্ব্বতন হাজিপুর সরকারের অন্তর্গত ছিল। এতদ্ভিন্ন পার্শ্ববর্ত্তী জিলাগুলির সঙ্গে কোন কোন পরগণা আগত থারিজ হইয়া পরিমাণ ফলে বর্ত্তমান সময়ে ন্যূনাধিক্য দৃষ্ট হয়

৩নং। নগরবাসী ও নৈপুর নামক দুই পরগণা। মহেন্দ্র-নারায়ণের জায়গীর। মোট বন্দোবস্তি মোকর্‌ররি জমা ৬৫,১১২৲*

৪ নং। মরবা (মরোয়া) নামক পরগণা।—দমন সিংহের বন্দোবস্তি। আসল জমা ৫৮,৮০৮৲ মধ্যে ন্যূন করিয়া ৪৪,৯৮৩৲

৯৩টী পরগণা বিশিষ্ট সমুদয় তীরহুত-সরকারের আসল জমা ৮,২০,০৪২৲ মধ্যে ১১৭৩ সাল পর্য্যন্ত জায়গীর বাদ ২,৫৪,৫৭৪৲

মালিকানা প্রভৃতি খরচা ৩০,১৯০৲

নানকার, মস্কুরাৎ ও সেবন্দী বাবদ তহশীল খরচা ২,৯০,০৬৬৲

মোট ৫,৭৪,৮৩০৲

ফসলী ১১৭৩ সালে (১৭৬৫—৬৬ খৃঃ অব্দে) সমস্ত সরকার-তীরহুতের মহম্মদ-রেজা খাঁর বন্দোবস্ত অনুসারে জায়গীর, মস্কুরাৎ, সেবন্দী প্রভৃতি খরচা বাদ খালসা, মহাল ও সায়র সম্বন্ধী মোট বন্দোবস্তি জমা ২,৪৫,২১২৲

১৭৬৫-৬৬ খৃঃ অব্দের বন্দোবস্ত রাজা প্রতাপসিংহের রাজত্বকালে নিষ্পন্ন হয়। সম্ভবতঃ মধুসিংহই অগ্রজের পক্ষে কার্য্য-নির্ব্বাহ করিতেন, এ নিমিত্ত রাজা প্রতাপ-সিংহের বর্ত্তমানেও তৎকালের বন্দোবস্তি কাগজে রাজা মধুসিংহেরই নামোল্লেখ দৃষ্ট হয়। যাহা হউক মধুসিংহ বড় কঠিন সময়ে পতিত হইয়াছিলেন। মুসলমান সুবেদারকে কোনরূপ প্রবোধ দিয়া সমস্ত তীরহুতের সর্ব্ব-প্রকার কর্ত্তৃত্ব করিবার সুবিধা ইংরেজ-রাজত্বে ক্রমে ক্রমে রহিত হইতে চলিল। ইংরেজ কেবল জমিদারের উপর নহে, প্রজার উপরও সর্ব্বপ্রকার কর্ত্তৃত্ব করিতে সচেষ্ট হইলেন। সুতরাং যাহাতে জমিদারের ক্ষমতা হ্রাস হয়, অলক্ষিতভাবে তাহারই উপায় দেখিতে লাগিলেন। জমিদারেরা ইহা বুঝিতে পারিয়া আত্ম-রক্ষার্থ প্রস্তুত হইলেন। সে সময়ে মহ-ম্মদ-রেজাখাঁ, মহারাজ-সীতাবরায়, মহারাজ-দুর্লভরামসোম প্রভৃতি কতিপয় অভিজ্ঞ রাজস্ব-সচিব সুবে-বাঙ্গালার রাজস্ব-পরিদর্শন কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। ইংরেজেরা এতদ্দেশীয় রাজস্ব-বিষয়ক কার্য্যাদি সর্ব্বতোভাবে পরিজ্ঞাত হইলেই ইহাঁদের কর্ত্তৃত্ব অনেকাংশে লাঘব হইবে, এরূপ বিবেচনা করিয়া ইহারা ইংরেজ-দিগকে সকল বিষয় পরিজ্ঞাত করিতে কুণ্ঠিত ছিলেন। সুতরাং একদিকে জমিদারদিগের ও অপরদিকে এতাদৃশ এতদ্দেশীয় প্রধান রাজ-কর্ম্মচারীদিগের কার্য্যতৎপরতায় ইংরেজ-রাজ-পুরুষেরা যথোপযুক্তরূপে রাজ্য-শাসন করিতে বা আপনাদিগের দুর্দ্দমপ্রতাপ সর্ব্ববিধ প্রজার অনুভূত করিতে পারিতেছেন না দেখিয়া উত্ত্যক্ত হইতে লাগিলেন। যে সকল ইংরেজ, কালেক্টরের কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন, প্রধানতঃ তাঁহাদিগের অজ্ঞতা দ্বারাই কৌন্সিলের সদস্য-সাহেবদিগের কার্য্যতৎপরতার অনেক ব্যাঘাত হইতে লাগিল। বাদশাহ কিংবা সুবেদারের ফরমান্ অনুসারে জমিদারদিগের যে অধিকার আছে, প্রথমতঃ তাহারই অনুসন্ধানের ব্যবস্থা হইল; এবং বাদশাহের আমলে সুবেদারের জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে ফরমান্-কথিত অধিকার অতিক্রম করিয়া বা স্থানীয় প্রথানু-সারে জমিদারেরা যে আধিপত্য করিতেন, সেই আধিপত্যের খর্ব্বতা সংসাধনের চেষ্টা হইতে লাগিল। নবাব-আলিবর্দ্দীখাঁ রাজা রঘুসিংহকে সরকার-তীরহুতের করসংগ্রহার্থ যে দস্তুরাৎ প্রদানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, যে দস্তুরাৎ-প্রাপ্তি বিষয়ে নবাব-কাশীম-আলীখাঁও রাজা প্রতাপসিংহকে সম্মতি প্রদান করিয়াছিলেন, ১৭৭১ খৃঃ অব্দে বান্সিটার্ট-সাহেব রাজাকে বার্ষিক বার হাজার টাকা বৃত্তি প্রদান করিয়া সেই দস্তুরাৎ বাজেয়াপ্ত করিলেন। নিয়মিত রাজস্ব-প্রদানে অসমর্থতা প্রযুক্তই গবর্ণমেণ্ট দস্তুরাৎ বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন, এই হেতু দর্শাইয়া, রাজা মধুসিংহ দস্তুরাৎ আদায়ের অধিকার পুনঃপ্রাপ্তির নিমিত্ত আবেদন করি-লেন। সুপ্রীম-কৌন্সিল এই আবেদন প্রাপ্ত হইয়া এতদ্বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে আদেশ করিলেন। মধুসিংহ দস্তুরাতের সনন্দপত্র উপস্থিত করিতে আজ্ঞপ্ত হইলে তিনি তাহা দাখিল না করিয়া কেবল এই কথা জানাইলেন যে, বহুদিন হইতেই আমি এই দস্তুরাৎ পাইয়া আসিতেছি, কানুনগুর সেরেস্তা তল্লাস করিলেই তাহা জানা যাইবে। ইহা বলিয়া মধুসিংহ বাজেয়াপ্তির সময় হইতে আবেদনের তারিখ পর্য্যন্ত যত টাকা দস্তুরাৎ ওয়াশিল হওয়া উচিত ছিল, তাহার এক হিসাব দাখিল করিলেন। সুপ্রীম-কৌন্সিল ১৭৭৮ খৃঃ অব্দে দস্তুরাৎ আদায়ের অধিকার মধুসিংহকে পুনঃপ্রদান করিয়া বাজেয়াপ্তি সময়ের জন্য সমুদয়ে ১,৯৩,০০০ টাকা প্রদানের আজ্ঞা দিলেন। মধুসিংহ ঐ বৎসরেই উক্ত টাকা পাটনার খাজনা-খানা হইতে গ্রহণ করিলেন।

ইহার পর ১৭৭৮ খৃঃ অব্দের মে মাসে তীরহুত জিলার কালেক্টর মধুসিংহকে মাসিক এক হাজার টাকা বৃত্তি-প্রদানানন্তর দস্তুরাৎ পুনরায় বাজেয়াপ্ত করিবার প্রস্তাব করিলেন। তৎপর-বর্ত্তী নবেম্বর মাসেই কালেক্টর সাহেব পুনরায় রিপোর্ট করিলেন যে, যে জন্য মধুসিংহকে দস্তুরাৎ দেওয়া হইতেছে; তাহার কিছুই তিনি প্রতিপালন করিতেছেন না, বরং অবি-চারের প্রশ্রয় দান, লোকের কষ্টবৃদ্ধি এবং রাইয়তদিগকে তাড়াইয়া দিয়া তীরহুত জনশূন্য করিতেছেন। ১৭৭১ হইতে ১৭৭৮ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত সাত বৎসর কাল গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং প্রজার নিকট হইতে যে দস্তুরাৎ সংগ্রহ করেন, তাহাতে দেখা যায়, প্রতি বৎসর ১২,৯০০ টাকা হইতে ১৪,৫০০ টাকা সংগৃহীত হইয়াছিল। জহন-শোর-সাহেব* পাটনায় যাইয়া এই দস্তুরাৎ আদায়ের হিসাব রাজা মধুসিংহের নিকট চাহিয়া পাঠান। তদনুসারে মধুসিংহ ১১৮৭ ফসলী শালের (১৭৭৯-৮০ খৃঃ অব্দের) দস্তুরাৎ রশুম আদায়ের নিম্নলিখিত হিসাব প্রদান করেন;—

(১)	সদরী	৪,৬২০৲
(২)	এক আনী	১৪,১৫২৲
(৩)	পরগণাতী	৪,০০০৲
(৪)	দস্তুর মোহরের	৭৫০৲
(৫)	দস্তুর মোকদ্দমা	৪,১৬৮৲
(৬)	মালিকানা	১০,০৬৬৲
(৭)	দস্তুর তফকাও	১,৫০৭৲
(৮)	মোকর্‌ররি	৫,০৫৯৲
(৯)	সরফ	৪,২৯৪৲

মোট ভগ্নাংশবাদে ৪৮,৬২৮৲ টাকা †

---

* নগরবাসী পরগণা এক্ষণ কোন্ জিলার অন্তর্গত, তাহা জানা যায় নাই। নৈপুর পরগণা এক্ষণ মুঙ্গের জিলার অন্তর্গত। ইহার ক্ষেত্রফল ৪৮,৭৫২ একার অথবা ৭৬-১৭ বর্গ মাইল এবং মালগুজারি ২৮,০৪০৲ টাকা। নৈপুর ১৯৬টী তালুকে বিভক্ত।

† তীরহুত জিলায় মরবা নামে দুইটী পরগণা আছে। মরবাকালা ও মরবা-খুর্দ্দ। মরবাকালা ১২১টী তালুকে বিভক্ত। ইহার ক্ষেত্রফল ৪১,৫২৭ একার ও মালগুজারি ৫,৮৮৫৲ টাকা। মরবাখুর্দ্দ ১৭৩টী তালুকে বিভক্ত। ইহার ক্ষেত্রফল ৪৫,২৫৩ একার ও মালগুজারি ১৫,০৬৮ টাকা। সুতরাং এত-দুভয়ের ক্ষেত্রফল ৮৭,০৮০ একার এবং মালগুজারি ২০,৯৫৩ টাকা। এই উভয় পরগণাই মুজঃফপুর জিলার অন্তর্গত।

* জহন্-শোর।—ইনি পরে সার-জহন্-শোর এবং লর্ড টেইন্‌মাউথ নামে পরিচিত হইয়া ভারতবর্ষের গবর্ণর-জেনেরল হন। খৃঃ ১৭৯৩ অব্দ হইতে ১৭৯৮ অব্দ পর্য্যন্ত ইনি গবর্ণর জেনেরল ছিলেন।

† দরখাস্তের সমষ্টি ৪৮,৬১৬ টাকা হয়। সুতরাং ৰায় টাকার তফাৎ হইতেছে।

মুসলমান-গবর্ণমেণ্টের স্বার্থ সংরক্ষণ ও নিয়মিতরূপে রাজস্ব প্রদান করিলেই তীরহুতরাজ মালগুজারদিগের নিকট হইতে এই দস্তরাৎ ওয়াশিল করিতে পারিবেন, জহন্-শোর-সাহেব ফরমানে এরূপ স্পষ্ট উল্লেখ দেখিতে পাইলেন। সুতরাং তৎকালে তিনি কালেক্টরের ইচ্ছা সত্ত্বেও দস্তরাৎ সম্পূর্ণ বাজেয়াপ্ত বিষয়ে সম্মত হইতে পারেন নাই। তিনি এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিলেন যে, রাজা মধুসিংহকে তাঁহার মালিকী-জমিনের বন্দোবস্ত ও দস্তরাৎ আদায়ের ক্ষমতা দেওয়া হউক, রাজা মধুসিংহের অধীনস্থ তালুকদারদিগের তালুক সেই সেই তালুকদারের সঙ্গে বন্দোবস্ত করা হউক এবং সেই সকল তালুকের দস্তরাৎ গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং আদায় করিয়া জমা রাখুন। জহন-শোর ১৭৮৯ খৃঃ অব্দের ১৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে এই মন্তব্য প্রকাশ করেন।

১৭৭৮ খৃঃ অব্দের শেষভাগে কিংবা ১৭৭৯ খৃঃ অব্দের প্রারম্ভে রাজা মধুসিংহ মালগুজারি প্রদানে অসমর্থতা বশতঃ কারারুদ্ধ হন। অবিলম্বেই কারামুক্ত হইয়া বার্ষিক ২,৯৫, ১৮১ টাকা মালগুজারি প্রদানের সর্ত্তে পুনরায় সরকার-তীরহুতের জমিদারী বন্দোবস্ত করিলেন। কিন্তু কিস্তি অনুসারে খাজানা দিতে পারিলেন না। তীরহুতের কালেক্টর ১৭৮৯ অব্দের অক্টোবর মাসে মধুসিংহকে জমিদারি-চ্যুত করিবার প্রস্তাব করিলেন। ইহারই এক মাস পূর্ব্বে লর্ড-কর্ণোয়ালিসের আদেশে দশশালা-বন্দোবস্তের জন্য জমিদারদিগকে আপন আপন তালুকের মৌজাবারি- জমাবন্দি-কাগজ কালেক্টর-সাহেবের নিকট দাখিল করিবার নিমিত্ত নোটিশ দেওয়া হয়। মধুসিংহ দশশালা-বন্দোবস্তের জন্য কোন প্রস্তাব না করিয়া গবর্ণর-জেনেরল লর্ড-কর্ণোয়ালিসের নিকট এই মর্ম্মে আবেদন করিলেন,—"আমার প্রতি যে সকল অবিচার করা হইতেছে, তাহাতে আমি একেবারে হতাশ হইয়াছি। সরকার-তীরহুতের মোকর্ররি-পাট্টা বলবৎ করিয়া আমাকে পূর্ব্ববৎ মালিকানা ও দস্তরাৎ প্রদানের অনুমতি হইলেই আমি অনুগৃহীত হইব।" এই আবেদনের তাৎপর্য্য এই যে, মালিকানা ও দস্তরাৎ সম্বন্ধে কোন মীমাংসা না হইলে মধুসিংহ ১৭৯০ অব্দে দশশালা-বন্দোবস্ত করিতে সম্মত নহেন। কালেক্টার সাহেব ফৈজুদ্দীন ও বরকতুল্লাখাঁ নামক দুই ব্যক্তির সহিত সরকার-তীরহুতের বন্দোবস্ত করিলেন। ইহার কিছুদিন পরেই গবর্ণমেণ্ট মধুসিংহকে মালিকানা ও দস্তরাৎ প্রত্যর্পণের আদেশ করিলেন। ১৭৯১ খৃঃ অব্দে ফৈজুদ্দীন জমিদারি ইস্তাফা দিলেন এবং বরকতুল্লাখাঁর মৃত্যু হওয়াতে তাঁহার উত্তরাধিকারীরা বন্দোবস্ত গ্রহণে অসম্মত হইলেন; সুতরাং কালেক্টর সাহেব পুনরায় রাজা মধুসিংহকেই সরকার-তীরহুতের জমিদারি বন্দোবস্ত লইতে অনুরোধ করিলেন। মধুসিংহ অনুরুদ্ধ হইয়াও বন্দোবস্ত গ্রহণ করিলেন না; তিনি কালেক্টরকে বলিলেন যে, আলাপুর ও সরকার তীরহুতের মোকর্ররি-স্বত্বচ্যুত হইয়া আমি বড় কষ্টে পড়িয়াছি। কালেক্টার বাথার্ষ্ট-সাহেব রাজা মধুসিংহের প্রতি বড় অসন্তুষ্ট ছিলেন। তিনি সুযোগ পাইলেই গবর্ণমেণ্টকে জানাইতেন যে, সরকার-তীরহুতের ন্যায় বৃহৎ জমিদারির শাসন সংরক্ষণের সামর্থ্য দূরে থাকুক, মধুসিংহ ক্ষুদ্র একটী জমিদারির রক্ষণাবেক্ষণেও সম্পূর্ণ অযোগ্য। যাহা হউক ১৭৯২ খৃঃ অব্দে রাজা মধুসিংহের নানকার-জমিন্, দস্তরাৎ ও মালিকানা বাজেয়াপ্ত করিয়া গবর্ণমেণ্ট রাজা নরেন্দ্রসিংহের বিধবা পত্নীকে দশটী গ্রাম এবং রাজা মধুসিংহকে দুইটী গ্রাম ও মাসিক এক হাজার টাকা বৃত্তি ভরণপোষণার্থ প্রদান করিলেন।

১৭৯৩ হইতে ১৮০০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত সরকার-তীরহুত অংশ করিয়া বহুতর ঠিকাদারকে বন্দোবস্ত দেওয়া হয়। তৎপর কালেক্টর সাহেব মালিকানা ও দস্তরাৎ ছাড়া মোট ১,৬৮,৫০৬৲ টাকা বার্ষিক মালগুজারি গ্রহণের সর্ত্তে রাজা মধুসিংহকে বন্দোবস্ত প্রদানের প্রস্তাব করিলেন। রেবিনিউ-বোর্ড এই প্রস্তাবে সম্মত ছিলেন, কিন্তু মধুসিংহ অসম্মত হইলেন। তিনি বলিলেন যে, আমার মোকর্ররি-লভ্য ৬,১৭৪৲ টাকা বাদে ১,৭৮,২২৭৲ টাকায় আমি বন্দোবস্ত করিতে পারি। রেবেনিউ-বোর্ড ইহাতে অসম্মত হইলে সরকার-তীরহুত পুনরায় ঠিকাদারি পত্তন করা হইল। অবশেষে মধুসিংহ আরও দশ হাজার টাকা অধিক দিতে সম্মত হইয়া বার্ষিক ১,৫৮,২২৭৲টাকা মালগুজারিতে সরকার-তীরহুতের বন্দোবস্ত লইলেন। এই হইতেই মহেশ-ঠাকুরের বংশে তীরহুতের জমিদারী স্থিরতর হইয়াছে। *

রাজা মধুসিংহ ১৮০৮ খৃঃ অব্দে পরলোক গমন করেন। কৃষ্ণসিংহ, ছত্রসিংহ, কিরাতসিংহ, গোবিন্দসিংহ ও রমাপতিসিংহ নামে রাজা মধুসিংহের পাঁচ পুত্র মধ্যে রাজকুমার বাবু কৃষ্ণসিংহ নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হন। সুতরাং ছত্রসিংহ জমিদারী প্রাপ্ত হইলেন। সুল্‌তান্-আলীগৌহর-শাহ-আলম বাদশাহ ছত্রসিংহকে "মহারাজ" খেতাব প্রদান করেন। মহারাজ ছত্রসিংহ বার্দ্ধক্য-প্রযুক্ত ১৮৩৯ খৃঃ অব্দে জ্যেষ্ঠপুত্র রুদ্রসিংহকে সমস্ত জমিদারী ও স্বকীয় "মহারাজ" খেতাব এবং কনিষ্ঠ পুত্রকে ভরণ-পোষণার্থ পরগণা জরাইলের স্বাধিকৃত গ্রাম গুলি, চারিটী বাটী, দুইটী হাতী এবং বাস্তবাটীর কিয়দংশ প্রদান করিয়া বিষয়ের সংশ্রব পরিত্যাগ করিলেন। তদীয় ভ্রাতা কিরাতসিংহ জবদী পরগণা, গোবিন্দসিংহ পরগণা পাহাড়পুর-রাঘব এবং রামপতিসিংহ পরগণা পচহী ভরণ-পোষণার্থ প্রাপ্ত হইলেন। এই কিরাতসিংহের বংশধরেরা মধুবনীর বাবু বলিয়া প্রসিদ্ধ। সংসার-পরিত্যাগের কিয়দ্দিন পরেই ছত্রসিংহ স্বর্গারোহণ করেন। বাসুদেবসিংহ কুলাচার অবজ্ঞা-পূর্ব্বক উত্তরাধিকারিত্ব বিষয়ে "হিন্দু-আইনের" আশ্রয় লইয়া জমিদারীর অর্দ্ধেক দাওয়া করিলেন। জিলার জজ রাট্রে-সাহেব এই মোকদ্দমার বিচার করেন। তিনি কুলাচার বলবৎ করিয়া রুদ্রসিংহকেই সমস্ত জমিদারীর অধিকারী সাব্যস্ত করিলেন। জজ-সাহেবের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল হইলে, হাইকোর্টও রাট্রে-সাহেবের রায় বহাল রাখিলেন। এই মোকদ্দমা দ্বারা ইহা স্থির হইল যে, কুলাচার অনুসারে জ্যেষ্ঠপুত্রই জমিদারী প্রাপ্ত হইবেন; অপর পুত্রেরা ভরণ-পোষণার্থ যথোপযুক্ত তালুক পাইবেন, ঐ তালুক তাঁহারা পুত্রপৌত্রাদি ক্রমে ভোগ করিতে পারিবেন; কিন্তু পুত্র-সন্তানের অভাব হইলেই তালুক রাজাতে ফিরিয়া আসিবে। ১৮৪০ খৃঃ অব্দের ১২ই অক্টোবর তারিখের এক পরোয়ানাতে গবর্ণর-জেনেরল লর্ড-অক্‌লাণ্ড রুদ্রসিংহকে "মহারাজ-বাহাদুর" বলিয়া সম্বোধন করেন। এই হইতেই তিনি

* ১৭৯৩ খৃঃ অব্দের দশশালা বা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দ্বারা জমিদার ও তালুকদারগণ তহশিলি খাজনার উপর শতকরা দশ টাকা তহশিলি-খরচা এবং সমুদায় অনাবাদি ও পতিত ভূমির উপস্বত্ব প্রাপ্ত হন। ইহা সাধারণ নিয়ম। কিন্তু বিশেষ বিশেষ অবস্থায় ইহার ব্যতিক্রমও হইয়াছিল। তীরহুতের রাজা মধুসিংহ কোন নির্দ্দিষ্ট ঠিকা মালগুজারি প্রদানের করারে তীরহুতের বন্দোবস্ত গ্রহণ করেন। কিন্তু উত্তর-বিহারের কিস্তিওয়ারি জরিপের (ক্যাডেষ্ট্রীল-সার্ভের) অনুচিত সমর্থনকারী সুবে-বাঙ্গালার ভূতপূর্ব্ব অস্থায়ী ছোট লাট বাহাদুর এ, পি, ম্যাক্‌ডোন্যাল্ড সাহেব তাঁহার ১৮৯৩ খৃঃ অব্দের ২০এ সেপ্টেম্বর তারিখের মিনিটে মালগুজারি স্থিরের সাধারণ নিয়ম উল্লেখ করিয়া দারভাঙ্গা জিলার আয় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ের আয়ের তুলনায় একণ শতগুণ বৃদ্ধি হইয়াছে; এই অসার কথা বলিয়া ইতিহাসানভিজ্ঞ এবং তদ্দেশের অবস্থা-বিষয়ে অজ্ঞ কতিপয় লোককে বিমোহিত করিয়াছিলেন।

মহারাজ বাহাদুর উপাধিতে আখ্যাত হন। মহারাজ রুদ্রসিংহ বাহাদুর ১৮৫০ খৃঃ অব্দে ইহলোকে পরিত্যাগ করেন। মহেশ্বর, গুণেশ্বর, সুরেশ্বর এবং গোপেশ্বর নামক রুদ্রসিংহের চারি পুত্র মধ্যে জ্যেষ্ঠ মহেশ্বর-সিংহই জমিদারী ও মহারাজ-বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হন। মহারাজ-মহেশ্বরসিংহ-বাহাদুর ১৮৬০ খৃঃ অব্দের ২০এ অক্টোবর তারিখে ঝঞ্ঝারপুরস্থ বাটীতে অবস্থিতি সময়ে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তদীয় পুত্রদ্বয় লক্ষ্মীশ্বর ও রামেশ্বর সে সময়ে অপ্রাপ্ত-বয়স্ক ছিলেন, সুতরাং জমিদারী কোর্ট-অব্-ওয়ার্ডসের তত্ত্বাবধানের অধীন হয়। সে সময়ে জমিদারীর আয় ১৬ লক্ষ টাকা থাকিলেও ৭০ লক্ষ টাকা ঋণ ছিল।

দারভাঙ্গার মহারাজের জমিদারী এক্ষণে তীরহুত, মুঙ্গের, পূর্ণিয়া ও ভাগলপুর এই চারি জিলায় বিস্তৃত রহিয়াছে। তীরহুত জিলায় অধিকাংশ ভূসম্পত্তি জরাইল, হাতী এবং আলাপুর পরগণাতে; ভাগলপুর জিলায় বচৌর, তীরহুত ও নারাদিগর পরগণাতে; পূর্ণিয়া জিলায় ধরমপুর পরগণাতে এবং মুঙ্গের জিলায় হাবিলি-খরকপুর পরগণাতে অবস্থিত। কোর্ট-অব্-ওয়ার্ডসের শাসন-সংরক্ষণে জমিদারীর বার্ষিক তহশিল ২০,২৪,১৯০৲ টাকার মধ্যে মালগুজারি ৪,৯৫,৯৮০৲ টাকা বাদে অবশিষ্ট ১৫,৯৫,৯৮০৲ টাকা আয় নির্দ্ধারিত এবং ৭০ লক্ষ টাকা ঋণ পরিশোধিত হইয়াছে। মহারাজ-লক্ষ্মীশ্বরসিংহ-বাহাদুর ১৮৫৮ খৃঃ অব্দের ২৫এ মে তারিখে জন্ম পরিগ্রহ করেন। সুতরাং পিতৃ-বিয়োগকালে তিনি দুই বৎসর বয়ঃক্রম অতিক্রম করিয়াছিলেন। এই মহারাজের সমসাময়িক ঘটনা লিপিবদ্ধ করিবার সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই।

শ্রীরসিকলাল ঘোষ।

কর্ম্মফল।

সিন্দূর ঢালিয়ে দিয়ে,
দূর সাগরের কোলে,
রবি ডুবে যায়।
সীমন্তে চাঁদের ফোঁটা,
অসিত-বসনা সন্ধ্যা,
নামে পায় পায়॥
গগন-কুন্তলে জলে
ছোট ছোট খড় বড়,
কত মতি-মণি।
ঘুম পাড়ানিয়া গান
শ্যামাননে ধীরে ভাসে,
স্বপন-সঙ্গিনী॥
সাগরের সিক্ত বাতে
অঞ্চল ঈষৎ দুলি',
বেলা-ভূমে লোটে।
সে অঞ্চল-বিতাড়নে
সে সমীর-পরশনে,
কত ফুল ফোটে॥

তরঙ্গ তরঙ্গ পরে
কত ঘাত-প্রতিঘাত,
কি ভীম গর্জ্জন।
ঊর্ম্মি-মুখে ফেনরাশি,
উচ্চে উঠি ভেঙ্গে পড়ে,
কি শব্দ ভীষণ॥
শেষ নাই, সীমা নাই,
কূল নাই, কেহ নাই,
ধূ ধূ করে সব।
দিগন্তে সাগরচর,
ক্বচিৎ বিহগ কোথা
করে ক্ষীণ রব॥

কোথাও বাড়ব-অগ্নি,
ঝক্‌ঝকি জ্বলি 'উঠি'
আলো করে জল।
মগ্ন গিরি আশে পাশে
কোথাও ধ্বনিছে দূরে
আবর্ত্ত প্রবল॥
আবার নিমেষ পরে
চাহি' পুন দেখ ফিরি',
কই কিছু নাই।
শুধু ঊর্ম্মি-গরজন
তিমি-নক্র-জল-খেলা-
রব—ঠাঁই ঠাঁই॥

এমনি সে সন্ধ্যাকালে
দূর সিন্ধুকোল হ'তে
ভেসে আসে তরি একখানি।
জীর্ণ উপাদানে গড়া,
অতি জীর্ণ দশা তার
ডোবে—ডোবে—আশঙ্কা এমনি॥
ঊর্ম্মির তাড়নে তরি
কভু উঠি', কভু পড়ি'
লক্ষ্যহারা ভেসে চ'লে যায়।
ভগ্নপ্রাণ কর্ণধার
একাকী দাঁড়ায়ে তায়,
ঊর্ম্মিতানে সারি গান গায়॥

"বুক-ভরা সাধ লে'য়ে
শোণিতের বিনিময়ে
আশায় বাঁধিতেছিনু সুখের বাসর।
অসময়ে সাধি' বাদ,
বিধি কৈলি পরমাদ
বাসরে করিলি মোর দুখের সাগর॥

"কে বলে রে বিধি তোর করুণার প্রাণ।
মঙ্গলের তরে তোর সংসার-বিধান॥
বল্ যদি তাই হবে, পথে পথে কেন তবে
কতদিন কত কেঁদে করেছি ভ্রমণ।
একটী সান্ত্বনা-বাণী শুনিনি কখন্॥
বল্ যদি তাই হবে, আজনম কেন তবে
ঝড়ের উপরে ঝড় সহিতেছি বুকে।
রত্ন-আশে ছুটে গিয়ে শুধুই কঙ্কর ল'য়ে,
ফিরিতেছি দিশাহারা জ্বালাদগ্ধ মুখে॥
বল্ যদি তাই হবে, কেঁদে কেঁদে কেন তবে,
আঁখি মোর অন্ধপ্রায় হইবে এমন?
এই কি অপক্ষপাতে কর্ত্তব্য-পালন?

"কারো দ্বারে হস্তি-হয়, সহস্র প্রহরী রয়,
কিঙ্কর কিঙ্করী নিত্য সেবে শতজন;
অর্থের উপরে অর্থ হয় বরষিত নিত্য
ধরিলে ধূলার মুষ্টি রতন-কাঞ্চন;
কেহ বা কাঙ্গাল কেন, "অদ্য-ভক্ষ্য-ধনুর্গুণ"
অতিমাত্র জীর্ণ ভগ্ন কুটীর সম্বল।
ভিক্ষায় না জুটে অন্ন, সদা দুঃখে-অবসন্ন,
সহস্র জ্বলন বুকে জ্বলিছে কেবল॥

"ওর ছেলে মেয়েগুলি
কেন কুসুমের কলি
আমার বাছারা কেন কঙ্কাল-পঞ্জর?
দেবভোগ্য ওরা পায়,
নিত্য শতবার খায়,
আমার বাছারা কেন ক্ষুধায় কাতর?
ওর প্রাণ-প্রগয়িনী,
কেন ফুল্ল সরোজিনী,
আমার প্রতিমা কেন ব্যাধি-বিমলিনা?
ছুঁইতে গলিয়া পড়ে,
বল্ নাই তিল্ নড়ে
জীবন্ সহিছে গেল রোগের যাতনা!

"আশা-পূরণের পথে
কেন পুষ্প-আস্তরণ
দিস্ বিধি ওর বেলা যতনে পাতি

একটু না পুরে আশা,
একটু না পূরে সাধ,
রক্ত উঠে' মরি আমি সহস্র যুঝিয়া।
একটু সোহাগ-স্নেহ
একটু মনের সুখ
কেন আমি এ জীবনে পাবো না কখন;
শুধু ব্যথা—শুধু জ্বালা,
শুধু বুক-ভাঙ্গা দুখ
দিস্ বিধি প্রাণঘাতী দারুণ বেদন॥
আশ্রয় বলিয়া আশে
যে শাখা ধরিতে ছুটি
তাই বিধি, কেন বল্, দিছিস্ ভাঙ্গিয়া?
"ওরা কেন হাসে-খেলে
আমি কেন মরি জ্ব'লে
সহস্র অশনিকুণ্ড সংসারে পড়িয়া?"
"কর্ম্মফল"—ভীমরবে হ'ল দৈববাণী।
গর্জ্জিয়া উঠিল সিন্ধু—ডুবিল তরণী।

শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যায়।

কৃত্তিবাস।

বৈষ্ণবদিগের সঙ্গে সঙ্গে বৈষ্ণব-ধর্ম্মোপদেষ্টাগণ বাঙ্গালা ভাষার কম উপকার-সাধন করেন নাই। বৈষ্ণবধর্ম্মকে লৌকিক আকার প্রদান করিবার জন্য শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব যে প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়া গিয়াছেন, তাহারই ফল-স্বরূপ অভিনয়, লৌকিক ভাষা ও সঙ্গীত দ্বারা পুরাণ-ব্যাখ্যার নীতি প্রচলিত হইয়াছে। ইহার নাম হইল "কথকতা"। পুরাণের মূলপাঠের সঙ্গে সঙ্গে কথিত ভাষা দ্বারা তাহার মর্ম্ম প্রকাশ হইত বলিয়াই পুরাণের এই ব্যাখ্যাকে "কথকতা" বলা হইত। এইরূপে "কথকতা" দ্বারা শাস্ত্রচর্চ্চা সকলেরই পক্ষে অভূতপূর্ব্ব শিক্ষাপ্রদ হওয়াতে শাস্ত্রোপদেশের অভূতপূর্ব্ব সহজ ও স্বাভাবিক পদ্ধতি আবিষ্কৃত হইল। সুতরাং বৈষ্ণবেরা বাঙ্গালা ভাষাতে এক যুগান্তর উপস্থিত করিলেন। কথকদিগের ব্যবহৃত শব্দ দ্বারা বাঙ্গালা ভাষা মূল সংস্কৃত শব্দে প্লাবিত হইতে লাগিল। ইংরেজী সাহিত্যের Classical ageএর প্রাচীন যুগে যেমন গ্রীক্ ও লাটিন শব্দের বহুল প্রবেশ হইয়াছিল, বাঙ্গালা সাহিত্যেও এক্ষণে সেইরূপ হইল। সংস্কৃতের সঙ্গে বাঙ্গালা ভাষার সম্বন্ধ ক্রমেই ঘনীভূত হইতে লাগিল। সংস্কৃতের সংমিশ্রণে বাঙ্গালা ভাষা আশ্চর্য্যরূপে পরিপুষ্ট, পরিমার্জ্জিত ও সৌষ্ঠবসম্পন্ন হইয়া উঠিল। বৈষ্ণব পুরাণের সঙ্গে 'কথকতা' অন্যান্য সকল পুরাণেই অবলম্বনীয় হইল; সুতরাং ভাষাতে এই অভিনব শক্তির প্রভাবে নূতন সাহিত্যের অতি বিস্তৃত ভিত্তি সংস্থাপিত হইতে লাগিল; ভাষাতে বিশাল সাহিত্যের বিশাল-ছায়া আসিয়া পড়িল।

এই নব-যুগে ভাষা যখন সাহিত্যে স্ফুটোন্মুখ, তখন মহাত্মা কৃত্তিবাস ভ্রমররূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। তিনি কথকদিগের মুখ হইতে পুরাণের মধু পান করিয়া পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। তিনিই প্রথম ঝঙ্কার করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের নবোন্মেষ জ্ঞাপন করিলেন। কৃত্তিবাস বাঙ্গালা ভাষায় পৌরাণিক সাহিত্যের জন্মদাতা। সংস্কৃত ভাষার আদিকাব্য—পৌরাণিক সাহিত্যের মুকুটমণি অমর আদি-কবির অমৃতময় হৃদয় নিষ্যন্দ 'রামায়ণ' বোধ হয় এই সময়ে "কথকতার" প্রধান উপজীব্য হইয়া উঠিয়াছিল। কারণ প্রাঞ্জল সঙ্গীতানুযায়ী ছন্দোবন্ধ ও বাক্যবিন্যাস উন্নত সরস সাধুনীতি, অলৌকিক জীবন্ত সৌন্দর্য্য ও চরিত্র সৃষ্টি,—স্বাভাবিক ও হৃদয়গ্রাহী কবিত্ব দ্বারা 'রামায়ণ' অপেক্ষা অধিক প্রভাব প্রখ্যাপিত করা অন্য কোন পুরাণেরই পক্ষে সম্ভব নহে।

কৃত্তিবাস আপনার জীবন্ত সহৃদয়তা, বিশাল-কল্পনা ও বিপুলশক্তির বলে 'রামায়ণকে' এরূপভাবে নিজস্ব করিয়া লইয়াছিলেন যে, মূর্ত্যন্তরে যেন মূল 'রামায়ণই' আনিয়া তাহাতে আবির্ভূত হইল। কৃত্তিবাস কবিতার হৃদয় মধ্যে প্রবেশ করিয়া বাল্মীকির প্রতিভা দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। সংস্কৃত ভাষার যে আবর্ত্তে বাল্মীকির মহাকাব্য ও পুরাণ গঠিত হইয়াছিল, বাঙ্গালা ভাষার পুরাণচর্চ্চা দ্বারা সেই আবর্ত্তের অনুরূপ আবর্ত্ত উৎপাদিত হইল এবং 'রামায়ণ' মহাকাব্যের এই নূতন আবর্ত্তনে নূতন রূপ পরিগ্রহ করিয়া প্রকাশিত হইল। সুতরাং কৃত্তিবাসের 'রামায়ণ' বাল্মীকি রামায়ণেরই আবর্ত্ত-বিকাশ এবং কৃত্তিবাসের প্রতিভাও বাল্মীকি-প্রতিভারই আবর্ত্ত-বিকাশ। এই জন্যই বাল্মীকি রামায়ণের মূল উপাখ্যান এই আবর্ত্ত-বিকাশে কৃত্তিবাসী রামায়ণে পরিণত হইয়াছে; এবং বোধ হয়, এই জন্যই সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ হইয়াও তিনি কেবল কথকের মুখে শুনিয়াই বাল্মীকির মত অবিকল কবিত্ব মাধুর্য্য সৌন্দর্য্যপূর্ণ মহাকাব্য রচনা করিতে পারিয়াছিলেন। কাশীরাম দাসের দৃষ্টান্ত ব্যতীত সাহিত্য-জগতে এরূপ গৌণভাবে সাহিত্যের এরূপ পূর্ণ বিরাট্ অনুকৃতি এক কল্পনাতীত ব্যাপার।

কৃত্তিবাসের রামায়ণকে বাল্মীকি রামায়ণের আবর্ত্ত-বিকাশ বলিয়াছি, কিন্তু তাহাই ইহার পক্ষে প্রচুর নহে। সংস্কৃত সাহিত্যে যে মৃদু-শক্তির ক্রিয়া চলিতেছিল, তাহারই দ্বারা মূল রামায়ণের বাঙ্গালা ভাষায় যে সার্ব্বলৌকিক সরস ও প্রাঞ্জল আবর্ত্ত-বিকাশ, তাহাই কৃত্তিবাসের রামায়ণ। সমীরণ যেমন দুর্লভ পুষ্পের মনোহর গন্ধে পরিপূরিত হইয়া সর্ব্বত্র সঞ্চারিত হয় এবং সেই গন্ধ বিতরণপূর্ব্বক সকলকে আমোদিত করে, কৃত্তিবাসের রামায়ণও মূল রামায়ণের সৌন্দর্য্য বহন করিয়া বাঙ্গালীর আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাকে সেই সৌন্দর্য্যের আস্বাদ দিয়া রামায়ণকে বাঙ্গালা সাহিত্যে চির প্রতিষ্ঠিত ও বাঙ্গালীর গৃহে চির প্রচলিত রাখিয়াছেন। অতএব কৃত্তিবাসের প্রতিভা, অনুকরণশীল হইয়াও স্বাধীন কারণ অনুকরণের অনুকার্য্যের উপর এতদূর কৃতকার্য্য হওয়া অনুকরণকে অপূর্ব্বত্বের গৌরব প্রদান করে। এরূপ দূর অনুকরণে অপূর্ব্বত্বের এরূপ পূর্ণ আবৃত্তি কৃত্তিবাসের পূর্ব্বে আর সাহিত্যে দৃষ্ট হয় নাই। 'কথকতার' অনুকরণে গীতিরীতিতে নিজ কাব্যের রচনা করিয়া কৃত্তিবাস বাঙ্গালাভাষায় পাঁচালী সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছেন। 'কথকতার' ন্যায় কথা ও সঙ্গীতে বাদ্যযন্ত্রযোগে এই সাহিত্য দ্বারা পৌরাণিক সাহিত্যের প্রচার 'কথকতার' অপেক্ষাও অধিক চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। এইরূপে কৃত্তিবাসের পাঁচালী সাহিত্য কথকতার সংস্কৃত পদ্ধতির বাঙ্গালা প্রতিরূপ মাত্র।—তবে বাঙ্গালা ভাষায় হৃদয়ভাবের বিশেষ বিস্তার দ্বারা গীত বাদ্যের প্রকরণ তাহাতে অধিক পরিমাণে মিশ্রিত হইয়াছে।

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

বড় গল্প নয়।

(১)

নারায়ণপুরে এক ঘর বড় জমিদারের বাস। জমিদারের নাম—প্রতাপনারায়ণ রায়। প্রতাপনারায়ণের প্রতাপ অতি প্রবল। তাঁহার নাম-ডাকে বাঘে-বলদে এক ঘাটে জল খায়। প্রতাপনারায়ণের প্রকৃত জাতি বা বংশ-বিবরণ নির্ণয় করা কঠিন। 'রায়' উপাধিতে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য প্রভৃতি অনেক

জাতি বুঝায়। প্রতাপনারায়ণ, সমাজে আপনাকে কায়স্থকুল-তিলক বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন বটে, কিন্তু গ্রামের দুষ্ট লোকে তাঁহার জাতি লইয়া কাণাকাণি করে। পয়সার জোরে কেহ তাঁহার জাতি মারিতে বা তাঁহাকে একঘরে করিতে না পারিলেও, প্রকৃত ভদ্র-লোকে তাঁহাকে লইয়া পানাহার করেন না, কিংবা কোন ঘরণা-ঘরে এ অবধি তাঁহার কোন আদান-প্রদানও হয় নাই।

প্রতাপনারায়ণের কিন্তু ইহাতে বিশেষ কিছু অসুবিধা ঘটে নাই,—যেহেতু তিনি এক-পুরুষে 'নগ্‌দা' বড়-লোক। দুনিয়াকে তিনি দৃক্‌পাতও করেন না। তা' না করুন,—তাহাতে পৃথিবীর কিছু যাইতেছে-আসিতেছে না,—মোদ্দা কথা, নারায়ণপুরের ভদ্র গৃহস্থ-পরিবারের বাস করা একরূপ দায় হইয়া উঠিয়াছে। এমন অর্থ-লোলুপ, পরশ্রী-কাতর, দারুণ দুষ্‌মন আর ওটিকতক থাকিলেই এইখানে "নরক গুল্‌জার" হইত। সৌভাগ্য-বশতঃ, নারায়ণপুরের ভদ্রলোক মাত্রেই রায় মহাশয়ের উপর হাড়ে হাড়ে চটা। স্বার্থের খাতিরে, রায় মহাশয় না পারেন, এমন কাজই নাই; সুতরাং প্রায় সকলকেই অল্প-বিস্তর ক্ষতি স্বীকার করিয়াও, রায় মহাশয়ের সহিত মৌখিক সৌহার্দ্দ স্থাপন করিতে হইত।

এই জমিদার-রূপী জীবটীর বিশেষ 'টাঁশ্‌'টা—পরের জমি-জমার উপর। কাহারও একটু ভাল বাগান-বাগিচা বা দু'কাঠা জমি-জিরাৎ দেখিলেই তাঁহার চক্ষু টাটায়। ছলে বলে কৌশলে—যেরূপে হউক, সে টুকুর দখলি কার হইতে না পারিলে তাঁহার আর স্বস্তি নাই। ইহাতে জাল-জালিয়াতি, ঘুস, মিথ্যা-সাক্ষ্য, প্রলোভন, ভয় প্রদর্শন—যত রকম উপায় থাকিতে পারে, তাহা করিতে তিনি কিছুতেই পশ্চাৎপদ নহেন। কূটবুদ্ধি উদ্ভাবনে তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা। যে কাজটা দশ বৎসর পরে সমাধা হইবে, রায় মহাশয় দশ বৎসর পূর্ব্ব হইতে তাহার "আট-ঘাট" বাঁধিয়া রাখেন, হরেক রকমের "ফন্দি" উদ্ভাবন করিতে থাকেন। ঠিক্ যেন ব'ড়ের চাল। যে কিস্তীতে 'মাৎ' করিতে হইবে, তোখড় খেলোয়াড় রায় মহাশয়, ঠিক্ সেই ক'টী ঘুঁটীর উপর সঘন দৃষ্টি রাখেন। ভাল 'চার' দিলেই, তখনই হউক আর দু'দণ্ড পরেই হউক, মাছ আসিবেই। ধৈর্য্যশীল তোখড় লোক ভিন্ন সংসার-পুকুরে মাছ ধরা যে-সে 'আনাড়ী'র কাজ নয়। রায় মহাশয় ইহা বুঝিতেন। বুঝিতেন যে, যাহার বুকের রক্ত চুষিয়া খাইতে হইবে, কি যাহার দেহ হইতে এক বুরুল মাংস কাটিয়া লইতে হইবে, তার দুটো কড়া কথা কি মাথা-মুড় খোঁড়ার প্রতি ভ্রূক্ষেপও না করিয়া নিষ্পন্দ, নিশ্চল, নির্ব্বাক্ পাষাণ-মূর্ত্তির মত স্থির থাকিতে হইবে। এই 'চাণক্য-নীতিই' তাঁহার মূল-মন্ত্র। তাঁর অনুচর পার্শ্বচরগণকেও তিনি সর্ব্বদাই এই নীতি শিক্ষা দেন। অনুচর-পার্শ্বচরগণ দুরদৃষ্টক্রমে, গুরুর নীতির এই গভীরত্ব সব সময়ে তলাইয়া বুঝিয়া উঠিতে পারিত না। জমিদার-রূপী প্রতাপটী এমনই অদ্ভুত ধাতুতে গঠিত।

(২)

এই গ্রামে এক-ঘর মধ্যবিৎ ব্রাহ্মণ বাস করেন। ব্রাহ্মণের নাম—রামরূপ ঘোষাল। ঘোষাল মহাশয়ের কিছু জমি আছে। জমি-গুলি নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর। রায় মহাশয়ের অনেক দিন হইতে এই জমিগুলির উপর টাঁক আছে। তলে তলে তিনি অনেক 'অন্দি-ফন্দি'ও জোগাড় করিয়া রাখিয়াছেন,—একটু কিছু 'অছিলা' পাইলেই আত্মসাৎ করেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু সুবিধা ঘটিয়া উঠিতেছে না। প্রথমে অর্থ-প্রলোভন,—দশ টাকার জায়গায় বিশ

টাকা দর দিয়া খরিদের চেষ্টা;—তাহাতে কিছু হইবে না বুঝিয়া, খামকা নিজের ও ঘোষালের দুই মাতব্বর প্রজার মধ্যে বিবাদ বাধাইয়া দিয়া একটা মোকদ্দমা খাড়া করিলেন। কিছুদিন ধরিয়া উভয় পক্ষে কিছু অর্থের শ্রাদ্ধ হইল। শেষে ঘোষাল মহাশয়ের প্রজা জয়লাভ করিল। সাধারণ্যে—আদালতে প্রকাশ পাইল যে, রায় মহাশয়ই সকল অনর্থের মূল। তাঁহারই শিক্ষা-মত এই মিথ্যা মাম্‌লা উপস্থিত হইয়াছিল। আদালত-শুদ্ধ সকলেই রায় মহাশয়কে "ছিঃছিঃ" করিতে লাগিল। প্রজাকে এই বিপদ্-জাল হইতে উদ্ধার করিতে ঘোষাল মহাশয়েরও অনেক টাকা খরচ হইল। ব্রাহ্মণ, দুর্দ্দান্ত জমিদারকে উদ্দেশ করিয়া, আদালতে—সর্ব্বসমক্ষেই কহিলেন,—"রায় মহাশয়! খামকা এ রকম ক'রে এক জনকে 'হায়রান্' করেন কেন? সোজা কথায় ব'ল্লেই ত হত,—'ঘোষাল! তোমার অমুক জমিটা আমায় ছেড়ে দাও।' মিথ্যা মিথ্যা একটা লোককে মজাইতে যান কেন? পরকাল আছে,—মরিতে হইবে, এ কথাটা যেন মনে থাকে।"

এইরূপ কিছু মিঠে-কড়া রকমের দুই চারি কথা শুনাইয়া, ব্রাহ্মণ আপন গ্রহ আপনি আনয়ন করিলেন। এই হইতেই ঘোষাল মহাশয়ের উপর জমিদারের বিষদৃষ্টি পড়িল। কিসে ব্রাহ্মণকে উদ্বাস্ত করিয়া 'ভিটে-মাটী-চাটী' করিবে, কিসে ঘোষালকে ধন-প্রাণে মজাইয়া, তাঁহার যথা-সর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করিবে, নিষ্ঠুর রায় জমিদারের এখন তাহাই ধ্যান-জ্ঞান হইল।

(৩)

এই ঘটনার কিছুদিন পরেই, আর একটা মুসলমান প্রজার সহিত চক্রান্ত করিয়া, প্রতাপ-নারায়ণ আর এক চাল চালিল। ঘোষাল ব্রাহ্মণের প্রতি এবারকার অভিযোগ বড় গুরুতর। তিনি নাকি তাঁহার লোক-জন লইয়া রাতারাতি একটা জায়গা দখল করিবার উদ্দেশে, অমুক মুসলমানের ঘর জ্বালাইয়া দিয়াছেন, আর আপন দখল-স্বত্ব প্রমাণের জন্য, সেই রাত্রেই এক ঘর খাড়া করিয়াছেন। সাক্ষী-সাবুদ, দলিল-দস্তাবেজ—কোন বিষয়ের কোন ত্রুটীই প্রতাপনারায়ণ রাখিল না। দেখিতে দেখিতে মোকদ্দমা সঙ্গীন হইয়া উঠিল। প্রতাপ, এবার অর্থের বিষয়ে মুক্তহস্ত হইয়াছে। জেলার কৌন্সলী উকিল হইতে আরম্ভ করিয়া ক্ষুদ্র মোক্তারটী পর্য্যন্ত হস্তগত করিয়াছে। কাহাকেও নিযুক্ত করিয়াছে, কাহাকেও বায়না-পত্র দিয়া রাখিয়াছে।

ঘোষাল ঠাকুর অকূল পাথারে পড়িলেন, চারিদিক অন্ধকার দেখিলেন। প্রতাপ, ধন-কুবের, অর্থের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তাহাকে আঁটিয়া উঠিতে পারিবেন না, ইহা বুঝিলেন। বুঝিলেন যে, এখন একমাত্র ধর্ম্মই তাঁহার সম্বল। অন্তরে দুর্গানাম জপ করিয়া, ব্রাহ্মণ আকাশ-পানে চাহিয়া কহিলেন,—"মা সর্ব্বমঙ্গলে! কূল দিস্ মা!"

যথাকালে মোকদ্দমা উঠিল। আদালত লোকে লোকারণ্য। বাদী—সেই মুসলমান প্রজা, প্রতিবাদী—ঘোষাল ব্রাহ্মণ। মুসলমান প্রজা নাম মাত্র বাদী,—সর্ব্বেসর্ব্বা হইতেছে দুর্দ্দান্ত প্রতাপনারায়ণ। প্রতাপনারায়ণ যেরূপ কলকাটী নড়িতেছে, বাদী সেই রূপই করিতেছে। কিন্তু ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়ে। মাম্‌লার ভাব-গতিক দেখিয়া, আর প্রতাপ-নারায়ণ জীবটীর সুনামের পরিচয় পাইয়া, জজ-সাহেব পূর্ব্ব হইতেই বিশেষ সন্দিগ্ধ হইয়াছিলেন। প্রতিবাদীর পক্ষে উকিল-কৌন্সলী জন-প্রাণী নাই দেখিয়া, বিচারক বাহাদুরের পূর্ব্ব সন্দেহ আরও প্রবল হইল। তিনি যতদূর

পারিলেন, আইনের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া, অতি ধীরভাবে, বিচক্ষণতার সহিত বিচার-কার্য্য করিতে লাগিলেন। মোকদ্দমা একাধিক্রমে সাতদিন চলিল। ধর্ম্মের কেমন মহিমা! শেষে সেই অশিক্ষিত আনাড়ী বাদী মুসলমান, সামান্য একটা জেরার ফেরে মামলাটা একেবারে মাটী করিল! প্রতিবাদী এককালে অব্যাহতি পাইল। ধর্ম্মের কলে উল্‌টা চাপ পড়িল;—মিথ্যা মোকদ্দমা আনয়ন জন্য, বাদী মুসলমানের সশ্রম এক বৎসর কারাদণ্ড হইল।

---

(৪)

অর্থনাশ, মনস্তাপ, অপমান, নির্য্যাতনে ক্রূর-প্রকৃতি প্রতাপনারায়ণের প্রকৃতি আরও ভীষণ—ভয়াবহ হইয়া উঠিল। পাষণ্ড, এই বার ব্রাহ্মণ রামরূপের প্রাণ লইতে সঙ্কল্প করিল।

রামরূপ অতি নিষ্ঠাপরায়ণ, ধার্ম্মিক। জমিদার কর্ত্তৃক বার বার এইরূপ নির্য্যাতন ভোগ করিয়া, ব্রাহ্মণ এক একবার গ্রাম পরিত্যাগ করিতে সঙ্কল্প করেন। কিন্তু মমতা বশতঃ তাহা পারিয়া উঠিতেছেন না।

প্রতাপের চর চারিদিকে। এক দিন ওরিমধ্যে-একটু ভদ্র চর, রামরূপকে হিতৈষী বন্ধুর ন্যায় উপদেশ দিল,—"ঘোষাল মহাশয়! এ আপনার কিরূপ বুদ্ধি! কুমীরের সহিত বিবাদ করিয়া জলে বাস করা শোভা পায় না। আপনার যদি ভালর ইচ্ছা থাকে, তবে জমিদার-বাবুর শরণাপন্ন হউন। বার বার যে, সকল মোকদ্দমায় জয়লাভ করিবেন, এমন কিছু কথা নাই।"

ব্রাহ্মণ একটী নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন,—"তুমি যাহা বলিতেছ, কথা যথার্থ বটে। কিন্তু ভাই বল দেখি, সাধ্য সত্ত্বে, কে আপন বিষয় পরকে দেয়? ক্ষেতের ধান, পুকুরের মাছ, বাগানের ফল মূল—আমার এ সোণার বিষয়,—আজ সাত পুরুষ ভোগ করিয়া আসিতেছি,—হঠাৎ ছাড়িতে মমতা হয় না কি? আর ঐ মামলা-মোকদ্দমার কথা যাহা বলিলে, তাহা আমিও বুঝি। আইনের চক্ষে ধূলি দেওয়া বড় বেশী কথা নয়, ইহাও বুঝি! কিন্তু ভাই, উপরে একজন আইন-ওয়ালা আছে, তার চক্ষে ধূলি দেওয়া ত কারও সাধ্যায়ত্ত নয়। আমার সেই আইন-ওয়ালাই ভরসা।"

ব্রাহ্মণ মধ্যে মধ্যে মনকে এইরূপে প্রবোধ দেন।

এদিকে মুসলমান-প্রজার কারাদণ্ড হওয়া অবধি প্রতাপ একদিনের জন্যও সুস্থির নহে। অর্থনাশ, মনস্তাপ ত আছেই,—তার উপর জগৎ যুড়িয়া তাহার একটা মস্ত কলঙ্ক রটিল। বেকার বওয়াটে বালক-দল, নাম-ভাড়াইয়া জমিদারের নামে নানা কুৎসিত রচনা গাহিয়া বেড়াইতে লাগিল। সেই সব পয়ার-গানে রায় জমিদারের বংশাবলীতেও টান পড়িল। ছাপার আখরে, কখন বা হস্তাক্ষরে সেই সব পয়ার যত্র তত্র বিরাজ করিতে লাগিল।

পাড়ার অনাহূত-সমিতি অমনি যেখানে সেখানে বৈঠক বানাইয়া, অথচ ভিতরে ভিতরে একটু মজা দেখিয়া, সেই সকল পয়ার-গানের প্রতিবাদে তৎপর হইলেন;—"তাই ত, এ বড় অন্যায় কথা,—এর প্রতিকার হওয়া উচিত" ইত্যাকার ভূমিকা ফাঁদিয়া, তাঁহারা জমিদার-প্রভুর অনুগ্রহ-লাভের সুযোগ খুঁজিতে লাগিলেন এবং সাধ্যমতে আপন আপন 'সতীত্বের' পরিচয় দিতে লাগিলেন। অর্থাৎ তাঁরা যে এর মধ্যে নন, সেই কথা প্রতিপন্ন করিতে যত্নবান হইলেন।

এ যত-কিছু অনর্থ, যত-কিছু বেয়াদবি—এ সকলেরই মূল—রামরূপ ঘোষাল, প্রতাপ-নারায়ণ এইরূপ বুঝিল। বুঝিল যে, সেই বিটলে বামন হইতেই তার ইজ্জতের উপরেও

টান পড়িয়াছে। পাপিষ্ঠ, সেই নিরীহ রামরূপের উপর দিয়াই সকল রাগ তুলিতে সঙ্কল্প করিল।

---

(৫)

আজ কয়দিন অবধি প্রতাপের জন কত চর, রামরূপের আশে-পাশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ব্রাহ্মণ কোথায় যায়, কি করে—তন্ন তন্ন করিয়া তাহার অনুসন্ধান লইতেছে। আর মামলা-মোকদ্দমায় জেরবার না করিয়া—ততদিনও ধৈর্য্য না থাকায়, পাপিষ্ঠ প্রতাপ, ব্রাহ্মণকে 'গুম-খুন' করিয়া ইহ-জগৎ হইতে অন্তর্হিত করিতে সঙ্কল্প করিল।

রামরূপ নিজেই আপনার জমি-জমা দেখিতেন, আদায়-উসুলও নিজে করিতেন। কেবল-মাত্র একটী কৈবর্ত্ত মুহুরি ছিল। মুহুরিটীও মধ্যে মধ্যে মনিবের সহিত খাজনা-পত্র আদায় করিতে যাইত। নারায়ণপুর হইতে তিন মাইল পথ ব্যবধানে গোপালপুর নামে একটী পল্লী আছে। তথায়, কয়েক ঘর মাত্র কৃষিজীবী প্রজা বাস করিয়া থাকে। নারায়ণপুর হইতে গোপালপুর যাতায়াত করিতে স্বতন্ত্র পথ নাই,—একটা বড় মাঠ পার হইয়া যাইতে হয়।

ঘোষাল ব্রাহ্মণ আজ অপরাহ্নে সেই মুহুরিটীকে লইয়া, গোপালপুরে কিছু খাজনা সাধিতে গিয়াছেন। প্রতাপের চর এ সন্ধান রাখিয়াছে। খাজনা-পত্র আদায়-উসুল করিয়া, উভয়ে বাড়ী ফিরিতে যে রাত্রি হইবে, চর এ খবরও লইয়াছে। সুযোগ বুঝিয়া, আজ সে পিশাচ-প্রভুকে সংবাদ দিল। চর—মুসলমান।

তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। অন্ধকার রাত্রি—কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশী। পাপিষ্ঠ প্রতাপ একাকী এক প্রকোষ্ঠে বসিয়া, কি ভাবিতেছে; এমন সময় সেই চর আসিয়া চুপি-চুপি সংবাদ দিল,—"হুজুর! কম্ম শেষ করতে হয় আজ করুন। এমন সুবিধা আর ঘট্‌বে না।"

পাপিষ্ঠ প্রতাপের দুর্দ্দমনীয় প্রতিহিংসা-বৃত্তি হু হু জ্বলিয়া উঠিল। পিশাচ, ব্রাহ্মণকে স্বহস্তে বধ করিবে, সঙ্কল্প করিল এবং অনুচরকেও সেইরূপ কহিল। দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিয়া কহিল,—"বেটার বুকের রক্ত চুষে খাব, তবে আমার নাম প্রতাপ রায়! তবে আমি কট্‌কী কায়েত!" চর বিনীত ভাবে উত্তর করিল,—"হুজুর! এ নফরের বিবেচনায় আপনার নিজের আর সে কাজটা ক'রে কাজ নেই। হুজুরের অনুমতি পেলে আমরাই সে কাজটা সাবাড় করি।"

প্রতাপ কি ভাবিল। বসিয়া ছিল, অস্থির-চিত্তে উঠিয়া দাঁড়াইল। স্থির-প্রতিজ্ঞা-ব্যঞ্জক মুষ্টি আরও দৃঢ় করিয়া, রুদ্ধস্বরে কহিল,—"ভাল, তাই হোক। কিন্তু দেখিস্, যেন শিকার হাত-ছাড়া না হয়। তা' হ'লে তোদের ধড়ে প্রাণ থাক্‌বে না।" চর কহিল,—"খোদার কিরে! হুজুর! জান্ থাক্‌তে শিকার ছাড়বো না।"

চরের নাম রহিমুদ্দীন। রহিমুদ্দীন আবার কহিল,—"হুজুর! এখন আর বেশী কথা ক'বার সময় নেই। বকাউল্লা, নূরজান, করিম-বক্স—তিন জনকে নিয়ে এখনি আমি চল্লুম। যখন হুজুরের মেহেরবানী পেয়েছি, তখন এখনি সে দু'বেটারই মুণ্ড হাজির কচ্চি।"

প্রতাপ কহিল,—"দেখিস্, খুব সাবধান! যেন পশু-পক্ষীতেও টের না পায়।"

পিশাচ-চর একটু বিকট হাসি হাসিয়া কহিল,—"হুজুরের কৃপায় ও কাম ক'রে ক'রে আমরা পোক্ত হ'য়েচি, সেজন্য ভাব্‌বেন না। তবে আমাদের জলপানিটা———"

প্রতাপ কহিল,—"আচ্ছা, যা ব'লেছি, তার ডবল পাবি। এখন যা—কাজ শেষ ক'রে আয়।"

নরঘাতী অনুচর, পিশাচ-প্রভুকে একটা সেলাম ঠুকিয়া, দ্রুত-পদে প্রস্থান করিল। পাপিষ্ঠ প্রতাপও বিকটোল্লাসে একটা চীৎকার করিল।

---

(৬)

এদিকে রামরূপও তাঁহার মুহুরির, খাজনা-পত্র সাধিতে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইল। একজন প্রজা ঘোষাল মহাশয়কে কহিল,—"বাবা ঠাকুর! আজ এ রাত্রে আর আপনাদের বাড়ী গিয়ে কাজ নেই। আমার এখানে 'পাক-শাক' ক'রে আজ রাত্রি কাটান, কাল ভোরের সময় এখান থেকে রওনা হ'বেন।" ঘোষাল মহাশয় কহিলেন,—"না, রাত আর কতই হ'য়েছে! বাড়ী পৌঁছিতে নয় চার দণ্ড হোক! আমার বাড়ীতে কেউ নেই,—আমাকে যেতেই হ'বে। জানই ত, প্রতাপনারাণের সঙ্গে মনান্তর করা, আর কুমীরের সঙ্গে বিবাদ ক'রে জলে বাস করা, এক কথা। কি জান, মুহুরীটী অবধি সঙ্গে এসেছে, বাড়ীতে আর কেউ নেই। গুণধর জমিদারের কল্যাণে কখন কি হয়, তা ত বলা যায় না।"

প্রজা—"তা বটে। তবে আসুন, প্রাতঃ-প্রণাম হই।"

ঘোষাল মহাশয় শ্রীদুর্গানাম স্মরণ করিয়া যাত্রা করিলেন। মুহুরীটী আলো ধরিয়া অগ্রে অগ্রে চলিল। তাহার এক হাতে একটা লণ্ঠন, আর এক হাতে মসী-শোভিত একটী দপ্তর। চতুর্দ্দশীর অন্ধকারে জগৎ আচ্ছন্ন। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া বড়জোর দুই দণ্ড রাত্রি হইয়াছে, এরি মধ্যে ঘোর অন্ধকার। সম্মুখে পশ্চাতে, বামে দক্ষিণে, ঊর্দ্ধে নিম্নে সর্ব্বত্রই অন্ধকার। সেই ঘোর অন্ধকারের মধ্যে মুহুরির হাতে একটী মাত্র ক্ষীণালোক। পল্লীটীর আঁকা-বাঁকা পথ অতিক্রম করিয়া ব্রাহ্মণ মুহুরির সহিত মাঠে পৌঁছিলেন। মাঠে পৌঁছিয়াই উভয়ের হৃদয় একবার কাঁপিয়া উঠিল।

মনে মনে ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করিয়া ব্রাহ্মণ, মুহুরির সহিত জমি-জমার কথা জুড়িয়া দিলেন। কথা-বার্ত্তায় কিছু পথ নিরুদ্বেগে অতিক্রম করিলেন।

মুহুরির সহিত মাঠের মধ্যস্থানে আসিয়াছেন, এমন সময়ে মুহুরি তাহার সেই হস্তস্থিত ক্ষীণা-লোকে অস্পষ্টভাবে দেখিতে পাইল, এক স্থানে কয় জন যমাকৃতি পুরুষ লগুড়-হস্তে দাঁড়াইয়া পরস্পর কি বলাবলি করিতেছে। এ দৃশ্য দেখিয়া তাহার প্রাণ উড়িয়া গেল। ভয়ে তাহার পা আর উঠিল না,—ভয়বিহ্বলচিত্তে প্রভুর পানে চাহিয়া রহিল।

ব্রাহ্মণ-ঘোষালও স্তম্ভিতভাবে ইঙ্গিত করিলেন,—"কি?"

মুহুরি কোন উত্তর করিতে না পারিয়া অতি কষ্টে অঙ্গুলি সঙ্কেত দ্বারা সেই ভয়াবহ দৃশ্য দেখাইল। ব্রাহ্মণ সে দৃশ্য দেখিয়া, একটু সাহস বৃদ্ধির জন্য একবার গলা সাড়া দিলেন। কম্পিত-কণ্ঠে কহিলেন,—"কে তোমরা?"

ব্রাহ্মণের মুখে সকল কথা ফুটিতে-না-ফুটিতে সেই নরহন্তা নারকী-চতুষ্টয় চকিতের ন্যায় তথায় আবির্ভূত হইয়া ভীমবেগে, উভয়ের মস্তকে লগুড় প্রহার করিল। "মাগো" বলিয়া মুহুরি ধরাশায়ী হইল। তাহার হস্তস্থিত ক্ষীণালোকও নির্ব্বাণ হইল। "কে রে চণ্ডাল" বলিয়া ব্রাহ্মণও ভূপতিত হইলেন। অমনি উপর্য্যুপরি সেই আহত ব্যক্তিদ্বয়ের উপর প্রহার-বৃষ্টি হইতে লাগিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে উভয়েরই প্রাণবায়ু বহির্গত হইল।

নরঘাতী পিশাচগণ কার্য্যোদ্ধার করিয়া দেখিতে দেখিতে চক্ষের নিমিষে কোথায় অন্তর্হিত হইল।

---

(৭)

সেই কাল-রাত্রি প্রভাত হইবামাত্র নারা-য়ণপুরে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। গোপালপুরের মাঠে দুই ব্যক্তি খুন হইয়াছে, মুহূর্ত্তের মধ্যে এ সংবাদ চারিদিকে রাষ্ট্র হইল। মুহূর্ত্ত-মধ্যে আরও প্রকাশ পাইল যে, সে আহত ব্যক্তিদ্বয়—রামরূপ ঘোষাল ও তাঁহার মুহুরি।

ঘোষাল-পরিবারের মধ্যে হাহাকার পড়িয়া গেল। পথে, ঘাটে সর্ব্বত্রই "লাল-পাগ্‌ড়ী" দেখা দিল। দারোগা, জমাদার ও কন্‌ষ্টেবল প্রভৃতি লোক জন চারিদিকে বিরাজ করিতে লাগিল, চারিদিকে 'সুরথাল' বসিয়া গেল। কত নির্দ্দোষ ব্যক্তিকে অযথা 'হায়রান্' হইতে হইল। পুলিশ, যাহাকে 'সোবে' করিতেছে, তাহাকেই ধরিতেছে, বাঁধিতেছে, প্রহার করিতেছে। চারিদিকে এজাহারের ধূম পড়িয়া গেল।

এক দিন, দুই দিন, তিন দিন গেল। খুনীর উদ্দেশ পাওয়া যাইতেছে না। শেষে খোদ মাজিষ্টর সাহেব আসিলেন, অনেক তদ্বির-তাগাদা করিলেন। কিছুতেই কিছু হইল না। চারিদিকে পুলিসের চর, (ডিটেক্‌টিভ) নিযুক্ত হইল। ডিটেক্‌টিভ-বাবুর দল বহুরূপী সাজিয়া নানা ছাঁদে—নানা ফাঁদে বেড়াইতে লাগিলেন। খোদ-কোম্পানী হইতে খুনে ধরিয়া দিবার পুরস্কার বিজ্ঞাপিত হইল। কত লোকে কত রকম-কি কাণাঘুসি করিতে লাগিল;—"তাই ত, এতদিন নয় ততদিন নয়—হঠাৎ রামরূপ ঘোষাল ও তার মুহুরীকে খুন কর্‌তে গেল কে? উঁহু! এ ঐ দারুণ দুঁদে প্রতাপ রায়ের কর্ম্ম!" প্রায় সকলেরই মনে এই ধারণা জন্মিল। কিন্তু মুখ ফুটিয়া কেহ কোন কথা প্রকাশ করিতে পারিল না। পাপিষ্ঠ প্রতাপও সেই খুনের দিন হইতে কেমন-এক-রকম হইয়া গেল। কাহারও সম্মুখে বড়-একটা বাহির হয় না, কাহারও সহিত ভাল করিয়া কথা কয় না, চোকো-চোকি দেখা হ'লেই চোখ নামায়। দু'একটা কথা কহিতে গেলেও মুখের জড়তা প্রকাশ পায়। থাকিয়া থাকিয়া, চমকিয়া উঠে। পাপিষ্ঠ শিরঃপীড়ার অছিলা করিয়া, একেবারে শয্যাশায়ী হইল। অন্তঃপুরে স্নান, অন্তঃপুরে আহার, অন্তঃপুরেই সব।

পুলিশের মনেও সন্দেহ জন্মিল,—প্রতাপ রায় হইতেই এই নরহত্যা সংঘটিত হইয়াছে। কিন্তু কোনরূপ প্রমাণাভাবে, তাঁহারা কিছুই করিয়া উঠিতে পারিলেন না।

---

(৮)

ঘোর মানসিক বিকারে দেখিতে দেখিতে পাপিষ্ঠ প্রতাপ শয্যাশায়ী হইল। চিকিৎসক আসিল, রীতিমত চিকিৎসাও চলিতে লাগিল, কিন্তু ফলে কিছুই হইল না। পাপিষ্ঠ রহিয়া রহিয়া চমকিয়া উঠে, ও বিকলকণ্ঠে চীৎকার করিতে থাকে। শেষ ঘোর উন্মাদ হইয়া উঠিল। চিকিৎসক, রোগ অতি সংঘাতিক বুঝিয়া, বিদায় গ্রহণ করিল।

মহাপাপীর চক্ষে নিদ্রা নাই,—সে দিন রাত প্রলাপ বকে ও মাথামুড় খুঁড়িতে থাকে। সে প্রলাপের মর্ম্ম এই—"ঐ ধরিতে আসিল, ঐ বাঁধিতে আসিল, ঐ মারিতে আসিল! ওরে, আমায় ছেড়ে দে! দোহাই তোদের, আমায় খুন্ করিস্‌নে! উঃ! নরহত্যা!—ভীষণ নর-হত্যা! রামরূপ ঘোষাল! আমি আর তোমার জমি লইব না! আর তোমায় বিপদে ফেলিতে চেষ্টা করিব না! আমায় ক্ষমা কর!"

দিনের পর দিন গেল, মাস গেল, এক ঋতুর পর আর এক ঋতু যায়-যায়, পাপিষ্ঠ প্রতাপের দারুণ ব্যাধির আর উপশম নাই,—রোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

চিকিৎসকের পরামর্শে রোগীকে স্থানান্তরিত করা হইল। সহস্র সহস্র মুদ্রা ব্যয় হইতে লাগিল; সকল রকম চিকিৎসা চলিল,—মহাপাপীর এ যাত্রা আর পরিত্রাণ নাই।

---

(৯)

পশ্চিমাঞ্চলে, একটী স্বাস্থকর স্থানে প্রতাপ আনীত হইয়াছে। পাপিষ্ঠের আত্মীয়-স্বজন সকলেই সঙ্গে আছে। একটী প্রকাণ্ড বাড়ী ভাড়া লওয়া হইয়াছে।

এখানে আসিয়া পাপিষ্ঠের মস্তিষ্ক আরও বিকৃত ভাব প্রাপ্ত হইল। নিদ্রা ত হতভাগ্যকে এককালে ত্যাগ করিয়াছে। যদি বা অতি অল্পক্ষণ একটুমাত্র তন্দ্রা আসে, তখনই আবার সেইরূপ প্রলাপ বকিতে থাকে। অধিকন্তু সেই তন্দ্রাবস্থায় বিছানা হইতে উঠিয়া, ঘর 'হাচা-বাচা' করিয়া বেড়ায়। যেন কোন অভীপ্সিত বস্তুর অনুসন্ধান করিতে থাকে,—তাহা আর মিলে না। এইরূপ তন্দ্রাবস্থায়—যখন আর সকলে গভীর নিদ্রায় অভিভূত,—পাপিষ্ঠ একদিন সকলের অজ্ঞাতে শয্যা হইতে উঠিয়া, মশারির সমস্ত দড়ীগুলি ছিঁড়িল। সেইরূপ অর্দ্ধ-জাগ্রৎ—অর্দ্ধ-নিদ্রিত অবস্থায় সেই দড়ীগুলি উত্তমরূপে পাকাইয়া দৃঢ় করিল। মনে মনে কি ভাবিয়া, একটা ফাঁসি তৈয়ার করিল। পরে বিকট হাস্যের সহিত, একটা বড় চৌকির উপর উঠিয়া সেই ফাঁস, গৃহস্থিত একটা হুকে সংলগ্ন করিল। সেদিন অমাবস্যা,—ঘুট-ঘুটে অন্ধকার। সে ঘুট-ঘুটে অন্ধকারে কোলের মানুষ চেনা যায় না। বাহিরের অন্ধকার এরূপ ঘন, আর পাপিষ্ঠ প্রতাপের ভিতরের অন্ধকারও তদ্রূপ ভয়াবহ। সুরে সুর মিলিল।

পাপিষ্ঠ যেন তখন সহস্র-কর্ণে শুনিতে পাইল,—"আত্মহত্যা"! সেই সূচীভেদ্য গভীর অন্ধকারে চারিদিক্ ভেদ করিয়া পাপিষ্ঠের কর্ণে বাজিতেছে,—"আত্মহত্যা"! সম্মুখে পশ্চাতে, বামে দক্ষিণে, ঊর্দ্ধে নিম্নে সর্ব্বত্রই যেন ধ্বনিত হইতেছে—"আত্মহত্যা"! যেন কোন বিকট-দর্শন ভীষণ ভয়াবহ-মূর্ত্তি—এক হস্তে রজ্জু, অন্য হস্তে তীক্ষ্ণ তরবারী ধারণ করিয়া কহিতেছে,,—"আয় আয় মহাপাপী, আমার কাছে আয়! নরহন্তা নারকীর প্রায়শ্চিত্ত এ পৃথিবীতে নাই। ঐ দেখ্, মহানরক তোর্ সম্মুখে! আয় আয় পাপী, তোয় আমায় আলিঙ্গন করি!"

হোঃহোঃ বিকট-হাস্যে সেই নৈশ-প্রকৃতির নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া মহাপাপী প্রতাপ সেই লম্বমান রজ্জু-ফাঁসিতে গলদেশ অর্পণ করিল। ঠিক সেই সময়ে যেন রামরূপ ঘোষালের প্রেতাত্মা তাহার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া কহিল,—"প্রতাপ, আত্মহত্যাই তোর্ মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত! আশীর্ব্বাদ করি, নরকেও যেন তোর্ স্থান না হয়!"

পাপিষ্ঠ প্রতাপও বিকটোল্লাসে, রজ্জুতে ঝুলিয়া পড়িয়া পাদদেশস্থ কাষ্ঠাসন দূরে নিক্ষেপ করিল। পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইল!

পরদিন প্রভাত-কিরণের সহিত সকলে সবিস্ময়ে দেখিল, দারুণ মানসিক-বিকারে আত্মহত্যা করিয়া পাপিষ্ঠ প্রতাপ ইহলোক হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে!

আজিকার দিনে এই দুর্ভাগ্য বঙ্গদেশে এরূপ প্রতাপ বিরল নয়,—প্রতাপের কাহিনী বড় গল্প নয়।

শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত।

ঐতিহাসিক বিশৃঙ্খলা।

মাইনর ও ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট পাঠ্য-পুস্তক— ভারতবর্ষের ইতিহাস। উহার প্রশ্নোত্তর লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়া, ঐ সকল ইতিহাসের মধ্যে পরস্পর অনৈক্য দেখিতে পাইতেছি। এই উপলক্ষে আট জন ঐতিহাসিককে আটখানি চিঠি লিখিয়াছিলাম; তন্মধ্যে বাবু তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণচন্দ্র রায়, যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় ও ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী এম, এ মহাশয়গণ পত্রোত্তর দেওয়ায় বাধিত হইয়াছি। পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন, বাবু নীলমণি মুখোপাধ্যায় ন্যায়ালঙ্কার এম, এ, বি, এল, বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত সি, এস, বাবু ঈশানচন্দ্র ঘোষ এম, এ, বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত—ইহাঁরা উত্তর প্রদান করেন নাই। তবে ঈশানচন্দ্র বাবু উত্তর দিতে চাহিয়াছিলেন ও চৈতন্যের তিরোভাব-বিষয়ে তাঁহার ভ্রান্তির কথা মুখে স্বীকার করিয়াছেন।

আমার লিখিত পত্রের উত্তর-প্রাপ্তি-বিষয়ে আমার অনুমান অলীক হইয়াছে। আমি যাঁহাদের নিকট উত্তর পাইবার জন্য আশান্বিত ছিলাম, তাঁহারা আমাকে হতাশ করিয়া দিয়াছেন। সুবিরেরা আমাকে উত্তর দিলেন, আর অপেক্ষাকৃত কর্ম্মঠেরা বেশ নীরবে থাকিলেন। তাই বলি, পত্রোত্তর-সম্বন্ধে আমার সিদ্ধান্ত অমূলক হইল।

সে কথা যাউক। কিন্তু ইতিহাসের মধ্যে পরস্পর অনৈক্য-মূলক ঘটনা থাকা বড়ই দোষাবহ। বিশেষতঃ স্কুলপাঠ্য-পুস্তকে এরূপ অনৈক্য থাকিলে, সরলমতি বালক, কোন্‌টী অভ্যাস করিবে, স্থির করিতে পারে না। ইহাতে শুধু কেবল ছাত্রদের অনুপকার বা অসুবিধাই কেন বলি, বয়ঃস্থগণেরও পক্ষে ইহা কষ্টকর। কেননা, ঐতিহাসিক ভ্রমের পরিণাম, বড়ই বিষম।

ইতিহাসগুলি যত্নপূর্ব্বক পাঠ করিয়া, যে সমস্ত ভ্রম আমাদের দৃষ্টিগোচর হইয়াছে, তাহা ক্রমে ক্রমে লিখিত হইতেছে।

প্রথমেই শ্রীশ্রী৺ জগন্নাথ দেবের মন্দির-সম্বন্ধে ইতিহাসগুলির মতামত আলোচিত হইতেছে।

পাঠক মহাশয়গণের পক্ষে এই প্রবন্ধ, বোধ-সুলভ ও বিচার-সুগম করিবার কারণ, প্রত্যেক বিষয় স্বতন্ত্র প্রকরণে বিভক্ত করিয়া দিয়া, তাহার বিভিন্নতা (ক) (খ) ইত্যাদি-রূপে লিখিত হইল।

১। তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের ইতিহাস হইতে অগ্রে উদ্ধৃত করিতেছি; তৎপরে পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন, রমেশচন্দ্র বাবু, অক্ষয়-কুমার দত্ত ও ইঞ্জিনিয়ার বাবু বরদাপ্রসাদ বসুর তৎ-সম্পর্কে মতামত প্রকটিত হইতেছে। পাঠক মহাশয়েরা সমস্ত বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

(ক) "১১০৯ খৃষ্টাব্দে জগন্নাথ দেবের বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মাণ হয়,"—তারিণীচরণ বাবুর ইতিহাস, ৩১ পৃষ্ঠা।

(খ) "১১৯৭ খৃষ্টাব্দে জগন্নাথ দেবের বর্ত্তমান মন্দির প্রস্তুত হয়।"—রামগতি ন্যায়রত্ন-প্রণীত ইতিহাস, ২৯ পৃষ্ঠা।

(গ) "১১৯৭ খৃষ্টাব্দে জগন্নাথ দেবের বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মিত হয়।"—বাবু রমেশচন্দ্র দত্তপ্রণীত ইতিহাস, ১৫১ পৃষ্ঠা।

(ঘ) "সুপ্রসিদ্ধ জগন্নাথদেবের মন্দির ১১৯৮ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয়।"—অক্ষয়কুমার দত্ত-প্রণীত ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়; ২য়ভাগ, উপক্রমণিকা, ১৭৮ পৃষ্ঠা।

(ঙ) "তিনি (অনঙ্গপাল) জগন্নাথের

বর্ত্তমান মন্দির ১১৯৮ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মাণ করেন।"—তীর্থদর্শন, ৫ম অংশ, ৪ পৃষ্ঠা।*

এক জগন্নাথ দেবের মন্দির লইয়া, পাঁচ পুস্তকে তিন প্রকার মত দৃষ্ট হইতেছে। ন্যায়-রত্ন মহাশয় ও রমেশচন্দ্র বাবুর মতের ঐক্য আছে, আর উপাসক-সম্প্রদায় ও তীর্থদর্শনেও সাম্যদৃষ্ট হইতেছে। তারিণী বাবু তাঁহার মত ভ্রমাত্মক বলিয়া, স্বীকার করিয়াছেন; তিনি চিঠি দ্বারা আমাদিগকে জানাইয়াছেন, উহা ১১৯৭ খৃষ্টাব্দে হইবে।

এখানে একটু রহস্য আছে। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের ভাষার সহিত তারিণী বাবুর ও রমেশ বাবুর ভাষার কেমন অপূর্ব্ব মিলন! কেবল অমিল এই, একজন লিখিয়াছেন, 'নির্ম্মাণ'; আর একজন লিখিয়াছেন, 'নির্ম্মিত'। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের ভাষা—'প্রস্তুত।'

২। অঙ্গরাজ্য গণপতি রাজগণের হস্তে কোন্ সময়ে ছিল, এ বিষয়েও তারিণীচরণ বাবু ও কৃষ্ণচন্দ্র বাবুর মত, নিতান্তই বিপরীত।

(ক) "ত্রয়োদশ শতাব্দীতে (অঙ্গ) গণপতি রাজাদের চরম-প্রাদুর্ভাব হইয়া উঠে।"—তারিণী বাবুর পুস্তক ৩১ পৃষ্ঠা।

(খ) "১৩৭২ খৃষ্টাব্দে যখন এ রাজ্য (অঙ্গ) গণপতিবংশের অধীন ছিল, মুসলমানেরা উহা আক্রমণ করে।"—কৃষ্ণচন্দ্র বাবুর পুস্তক ১১পৃষ্ঠা।

১৩৭২ খৃষ্টাব্দে চতুর্দ্দশ শতাব্দী। সুতরাং কৃষ্ণচন্দ্র বাবুর মতে অঙ্গরাজ্যের স্বাধীনত্ব-বিলোপ, চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে ঘটিয়াছিল; আর তারিণীচরণ বাবুর মতানুসারে উহা ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সংঘটিত হয়। উভয় মতে অল্প-দিনের প্রভেদ নয়। এক শতাব্দীর ব্যবধান।

৩। মুসলমানগণ কর্ত্তৃক দেবগিরি আক্রমণেও কেমন গোলযোগ দেখুন;—

(ক) "১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে দেবগিরি, মুসলমান কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়।"—তারিণী বাবুর পুস্তক, ৩১ পৃষ্ঠা।

(খ) "দেবগিরি * * ১৩১২ খৃষ্টাব্দে মুসলমানদের হস্তগত হয়।"—কৃষ্ণচন্দ্র বাবুর পুস্তক, ১২ পৃষ্ঠা।

এখানে একেবারে ২৬৪ দুই শত চৌষট্টি বৎসরের প্রভেদ!

৪। মোগল সম্রাট্‌গণ কর্ত্তৃক উৎকল-বিজয় সম্বন্ধেও মতের অনৈক্য দৃষ্ট হয়। যথা,—

(ক) "১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে উড়িষ্যা, মোগল-সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হইয়া আসে।"—তারিণী বাবুর পুস্তক ৩১ পৃষ্ঠা।

(খ) "১৫৭৮ খৃষ্টাব্দে উড়িষ্যা, মোগল-সম্রাজ্যভুক্ত হয়।"—কৃষ্ণচন্দ্র বাবুর পুস্তক, ১২ পৃষ্ঠা।

এখানেও বর্ষদ্বয়ের প্রভেদ।

৫। ফিরোকশাহ-সম্বন্ধেও মত-দ্বৈধ রহিয়াছে। যথা—

(ক) ফেরোক্‌সের বাহাদুরের পৌত্র। এ বিষয়ে কৃষ্ণচন্দ্র বাবুতে ও রজনীকান্ত বাবুতে কোনরূপ মত-বিভিন্নতা নাই সত্য বটে, কিন্তু রজনীকান্ত বাবু স্পষ্টই দেখাইয়া দিয়াছেন ফেরোক্‌সের বাহাদুরের দ্বিতীয় তনয়, আজিমওস্‌মানের পুত্র। আর রায় মহাশয় বলেন বাহাদুরের দ্বিতীয় পুত্রের তনয়। এখানে শেষোক্ত ঐতিহাসিক, কেন বাহাদুরের দ্বিতীয় সন্তানের নামোল্লেখে বিরত, জানিতে উৎসুক রহিলাম।

বাহাদুর শাহ।

জাহাঙ্গীরশাহ — আজিমওস্‌মান্

ফেরোকসের

রজনীকান্ত বাবুর ইতিহাস, ১৮৩ পৃষ্ঠা।

(খ) "ফেরোক্‌সের (বাহাদুরের দ্বিতীয় পুত্রের তনয়)"—কৃষ্ণচন্দ্র বাবুর ইতিহাস ২২ পৃষ্ঠা।

৬। মোগল-সম্রাট্‌গণের সংখ্যায় কেমন বৈষম্য অবলোকিত হয়, একবার তাহা দেখিতে হইতেছে। যথা—

(ক) মোগল সম্রাট, ১৩ জন।—কৃষ্ণচন্দ্র বাবুর ইতিহাস ২২ পৃষ্ঠা।

(খ) রমেশচন্দ্র বাবুর মতে ১৪ জন। ১৯৭ পৃষ্ঠা।

(গ) রজনীকান্ত বাবুর মতে ১৫ জন। ১৮৩ পৃষ্ঠা।

(ঘ) ঈশানচন্দ্র বাবুর মতে ১৭ জন। ২০০ পৃষ্ঠা।

৭। এক পুস্তকে মহম্মদ শাহের নির্দ্দেশ সুস্পষ্ট আছে; অন্য পুস্তকে তিনি অনুল্লিখিত। ইহার কারণ কি? উক্ত বিবাদীয় মত এই:—

(ক) "মহম্মদশাহ (বাহাদুরের তৃতীয় পুত্র)"।—কৃষ্ণচন্দ্র বাবুর ইতিহাস ২২ পৃষ্ঠা।

(খ) রজনীকান্ত বাবুর পুস্তকে উহার কোন উল্লেখ নাই।

৮। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত কনোজের সিংহাসনে কোন্ ভূপালকুল, সমারূঢ় ছিলেন, তদ্বিষয়ে কিরূপ ঐক্য দেখুন!

(ক) "৪৭০ খৃষ্টাব্দ হইতে সাত শত বৎসর ইহা (কান্যকুব্জ) রাঠোর বংশের রাজ্য ছিল।—কৃষ্ণচন্দ্র বাবুর ইতিহাস ২৮ পৃষ্ঠা।

(খ) "৬১০ খৃষ্টাব্দে প্রসিদ্ধ-নামা শিলাদিত্য সম্রাট্ হইয়া ৪০ বৎসর রাজত্ব করেন; কান্যকুব্জ ইহাঁর রাজধানী।

* * * *

"আনুমান ৭০০—৭৩০ বৎসর পর্য্যন্ত যশোবর্ম্মণ কান্যকুব্জ-সম্রাট্ ছিলেন।" * * *

"জয়চন্দ্র খৃষ্টের দ্বাদশ শতাব্দীতে কান্যকুব্জাধিপতি ছিলেন।"—রমেশচন্দ্র বাবুর ইতিহাস, ৩১,৭৮,৯২ পৃষ্ঠা।

এ বিষয়ে কৃষ্ণচন্দ্র বাবু বোধ করি, টড্ সাহেবের লিপির উপর নির্ভর করিয়া, মত ঘোষণা করিয়া থাকিবেন। টড্ সাহেব, রাঠোর-বিষয়ে এইরূপ বলেন;—

"এই প্রসিদ্ধ কুলের উৎপত্তি-সম্বন্ধে নানা প্রবাদ প্রচলিত আছে। ইহাঁরা রামচন্দ্রের পুত্র কুশ হইতে উৎপন্ন, এইরূপ প্রমাণ করিয়া থাকেন। যদি এই মতই সত্য হয়, তবে ইহাঁরা প্রসিদ্ধ সূর্য্যবংশোদ্ভব। কিন্তু ভট্ট কবিগণ কর্ত্তৃক এই মত সমর্থিত হয় না; তাঁহারা বলেন, রাঠোরগণ মহর্ষি কশ্যপের বংশোৎপন্ন কোন মুনির ঔরসে এক দৈত্যকুমারীর গর্ভজাত। মহারাজ হিরণ্যকশিপুর বংশধরগণও এই জন্য দৈত্যকুল বলিয়া প্রসিদ্ধ।

"চন্দ্রবংশোদ্ভব কুশ হইতে যে ইহাঁরা উৎপন্ন, তাহাও বড় বিস্ময়জনক; কিন্তু কেহ কেহ এই মত প্রমাণিত করিয়া থাকেন।

"আমরা দেখিতে পাই, পঞ্চম শতাব্দীতে রাঠোরগণ গাধিপুর বা কনোজের সিংহাসনে সমারূঢ় ছিলেন। এরূপ প্রবাদ আছে, এই সময়ের পূর্ব্বে, রাঠোরগণ সূর্য্যবংশীয় কোশলগণের সহিত স্বীয় কুলের সমন্বয় সাধন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা সম্পূর্ণরূপে ঐতিহাসিক তত্ত্ব বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।

"খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী হইতে রাঠোরগণের ইতিহাস, পৌরাণিক কুজ্ঝটিকা-জালে সমাচ্ছন্ন নহে; আমরা দেখিতে পাই, ইহাঁরা ভারতবর্ষের সার্ব্বভৌম ক্ষমতা-লাভের জন্য দিল্লীর তুয়ার ও চৌহানদের এবং আনাহলবারার বালক রায়দিগের সহিত ঘোরতর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছেন।

রাঠোরগণের এই বৃথা আধিপত্য-স্পৃহাতেই তাহাদিগকে সমূলে নষ্ট করিয়াছে। পরস্পর

* প্রসিদ্ধ ইঞ্জিনিয়ার বাবু বরদাপ্রসাদ বসু, তীর্থদর্শনের রচয়িতা।

গৃহ-বিবাদে বলক্ষয় হওয়াতে প্রসিদ্ধ চৌহান-বীর পৃথ্বীরাজ সমরক্ষেত্রে শয়ন করিলেন। এই মহাবীরের অন্তর্দ্ধানেই ভারতের পশ্চিমোত্তর প্রদেশ, মুসলমানের কবলিত হইল। কনোজেরও সেই দশা ঘটিল। কনোজ-রাজ জয়চাঁদ শেষে জাহ্নবী-সলিলে ডুবিয়া মরেন। তৎপুত্র শিবজী তখন কনোজ নগর পরিত্যাগ করিয়া, মরুস্থলীতে আসিয়া নূতন রাজ-পাট স্থাপন করিলেন।

"মারবারের রাজকুলের আদি-পুরুষ এই শিবজী। ইনি পুরীহরগণের ভগ্নাবশিষ্ট মুন্দর-নগরে রাজাসন স্থাপন করিলেন। ইহাঁর বংশধর পরবর্ত্তী কালে বিপুল-বল-বিক্রম-শালী হইয়া উঠিল। দিল্লীর মোগল সম্রাটেরা এই রাঠোর-কুলের "লাখ তরওয়ারের নিকট অনেক অংশে ঋণী।" *

রাঠোর-কুলের ২৪টী শাখা। তন্মধ্যে যে ১৯টী প্রধান, তাহা এই,—

১। ধন্দুল। ২ ভদৈল। ৩ চাকিত। ৪ দুহ-রিয়া। ৫ খোক্র। ৬ বাড্ডুয়া। ৭ চজীর। ৮ রামদেব। ৯ কাব্রিয়। ১০ হাতুন্দিয়। ১১ মানবৎ। ১২ সুন্দু। ১৩ কটেক। ১৪ মুহোনি। ১৫ গোপদেব। ১৬ আহেম। ১৭ জেসিঙ্গ। ১৮ মুরমিয়া। ১৯ ডটেসিয়াজোরা।

কৃষ্ণচন্দ্র বাবুর মতে ৪৭০+৭০০=১১৭০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাঠোরবংশ, কান্যকুব্জে রাজত্ব করেন।

রমেশচন্দ্র বাবুর মতের সার সংগ্রহ এই,—

(ক) ৬১০+৪০=৬৫০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত শীলা-দিত্যের কনোজে রাজত্ব ছিল।

(খ) ৬৫০+৫০=৭০০ খৃষ্টাব্দে কে কনো-জের রাজা ছিলেন, তাহা রমেশ বাবুর গ্রন্থে অনুল্লিখিত। তবে কি বুঝিতে হইবে, তৎকালে কান্যকুব্জ-সিংহাসন শূন্য ছিল? *

(গ) তৎপরে ৭০০ হইতে ৭৩০ পর্য্যন্ত যশোবর্ম্মণ কনোজাধিপ থাকেন। †

(ঘ) ৭৩০ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ অষ্টম শতাব্দীর প্রসঙ্গ করিতে দত্তজ মহাশয় নীরব। ‡

(ঙ) তৎপরে তিনি লিখিয়াছেন, দ্বাদশ শতাব্দীতে জয়চন্দ্র, কান্যকুব্জ-রাজ হন।

এই সকল গোলযোগ! এত অসম্পূর্ণতা! রায় মহাশয়ের উক্তির সহিত দত্তজ মহাশয়ের মতের সামঞ্জস্য মূলতঃ আছে যদি ধরিয়া লওয়া যায়, তবে ইহা স্বীকার্য্য হইয়া উঠে যে, শীলা-দিত্য, যশোবর্ম্মণ ও জয়চন্দ্র, ইহাঁরা রাঠোর-বংশীয়। কেননা, কৃষ্ণচন্দ্র বাবুর মতে পঞ্চম

* Tod's Rajasthan. Vol. I. pp 86-87.

* এবিষয়ে এরূপ মতান্তর রহিয়াছে,—হর্ষরাজের সচিব রণসিংহ ধর্ম্মাদিত্য ৬৪৯ বা ৬৫০ খৃষ্টাব্দ হইতে ৬৭৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কান্যকুব্জেশ্বর থাকেন।

তদনন্তর জয়াদিত্য তথায় প্রভুত্ব-স্থাপনের প্রয়াসী হন। ইনি ৬৭৯ হইতে ৭০০ বা ৭০১ পর্য্যন্ত কনোজে রাজদণ্ড পরিচালন করেন।

† এখানেও দত্ত মহাশয়ের মত নির্ব্বিবাদ নয়। ১২৯৪ সালের ভাদ্র আশ্বিন সংখ্যক ভারতীতে শ্রীমান্ বাবু কৈলাসচন্দ্র সিংহ, এক প্রস্তাব লেখেন। তাহাতে এইরূপ দৃষ্ট হয়,—

(ক) সিন্ধুদেশ আক্রমণকারী রণমল্লদেব ৭০১ খৃষ্টাব্দে কনোজের রাজপাটে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

(খ) সুরচাঁদ, ৭১৬ খৃষ্টাব্দে কান্যকুব্জাধিপতে স্থাপিত থাকেন। তাঁহাকে কৈলাসচন্দ্র বাবু মহম্মদ বিন কাশিমের সমকালিক বলিয়াছেন।

(গ) তদনন্তর ৭৩১ খৃষ্টাব্দে যশোবর্ম্ম, কনোজের রাজপাট অধিকার করেন। দত্তজের মতে যশোবর্ম্মণ, এ মতে যশোবর্ম্ম। নামের একটু অমিল হইতেছে। কাশ্মীরাধিপ ললিতাদিত্য কর্ত্তৃক ইনি পরাভূত হন।

‡ তৎপরে দ্বাদশ শতাব্দীতে (১১৯৪ খৃষ্টাব্দে) জয়-চন্দ্রের রাজ্যত্যাগের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কালের তালিকা এইরূপ,—

৭৫৮ খৃঃ শ্রীদেবশক্তি দেব। ৭৮১ খৃঃ শ্রীবৎসরাজ দেব। ৮০৬ খৃঃ শ্রীনাগভট্ট দেব। ৮৩১ খৃঃ শ্রীরামভদ্র দেব। ৮৫৬ খৃঃ শ্রীভোজদেব। ৮৭৯ খৃঃ মহেন্দ্রপাল দেব। ৯০৯ খৃঃ শ্রীভোজদেব। ৯৩৯—৯৭৬ খৃঃ শ্রীবিনায়ক দেব। ১০৫১ খৃঃ শ্রীচন্দ্রদেব। ১০৯৮ খৃঃ শ্রীমদনপাল। ১০১৯ খৃঃ শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র। ১১৬৯ খৃঃ শ্রীবিজয় চন্দ্র। ১১৯৬ খৃঃ জয়চন্দ্র।

হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত কনোজ, রাঠোর-গণের আয়ত্তাধীন ছিল।

৯। এক মতে কৈকোবাদ নাসিরের পৌত্র। অপর মতে বোলবনের পৌত্র। যথা—

(ক) "কৈকোবাদ নাসিরের পৌত্র।" কৃষ্ণ-চন্দ্র বাবুর ইতিহাস ১৭ পৃষ্ঠা।

(খ) বোলবন।
|
বখরা খাঁ।
|
কৈকোবাদ।

রজনী বাবুর ইতিহাস, ১৭৬—১৭৭ পৃষ্ঠা।

বলি, এক জনের কি দুই পিতামহ হইবে?

১০। (ক) "ফিরোজ (গিয়াসের দৌহিত্র)" কৃষ্ণচন্দ্র বাবুর ইতিহাস ১৮ পৃষ্ঠা।

(খ) গেয়াসউদ্দীনতগলক।
|
ফিরোজ।

রজনী বাবুর ইতিহাস, ১৭৮ পৃষ্ঠা।

এক মতে ফিরোজ দৌহিত্র, অন্যমতে পৌত্র।

১১। "(ক) আবুবেকর (ফেরোজের পুত্র)" কৃষ্ণচন্দ্র বাবুর ইতিহাস ১৯ পৃষ্ঠা।

(খ) ফেরোজতগলক।
|
আবুবেকর।

রজনীকান্ত, ১৭৮ পৃষ্ঠা।

এ রহস্য মন্দ নয়!

১২। "দর্শনশাস্ত্রে গৌতম, কপিল, পত-ঞ্জলি, জৈমিনি ও কণাদ"—কৃষ্ণচন্দ্রের ইতিহাস।

এখানে বেদব্যাস স্থান পাইলেন না কেন?

ভীমপালের বংশের পরিচয় জানিবার উপায় নাই।

১৩। রুকনুদ্দীন, রেজিয়া বেগম, ইহারা আল্‌তামাশের কোন্ পুত্র বা কন্যা অর্থাৎ কে কাহার অগ্রজ বা অনুজ, এ সকল কথা কিছু স্পষ্ট করিয়া লিখিত হয় নাই।

১৪। আর একটী ঘটনা এই,—

(ক) "আকবর স্বয়ং জয়পুর-রাজ বিহারী মল্লের এবং যোধপুর-রাজ-(রাজের?) দুহিতা যোধা-বাইয়ের পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং যোধা-বাইয়ের গর্ভজাত নিজপুত্র জাহাঙ্গীরের সহিত রাজা ভগবান্ সিংহের কন্যার বিবাহ দেন।"—কৃষ্ণচন্দ্র বাবুর ইতিহাস, ২৬ পৃষ্ঠা।

(খ) "জয়পুর-রাজ-পরিবারের আর এক কন্যার সহিত স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহ দেন।" —রজনী বাবুর ইতিহাস ১২১ পৃষ্ঠা।

এই দুইটী লেখা একত্র করিলে বোঝা যায়, ভগবান্‌সিংহ জয়পুরের রাজা; কেননা, সেলিম বা জাহাঙ্গীর আকবরের জ্যেষ্ঠ-পুত্র। যোধাবায়ের পিতার নামের কোন উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। ভগবান্ সিংহের পরিচয়ও অসম্পূর্ণ।

১৫। ব্যাকরণে পাণিনি, দুর্গাসিংহ ও বোপদেব ইহাঁদের নাম উল্লিখিত হইয়াছে, অথচ সুপদ্ম-ব্যাকরণকার পদ্মনাভ দত্ত প্রভৃতির নামোল্লেখ নাই। ইহার কারণ কি? এতদ্ভিন্ন 'দুর্গাসিংহ' ভুল শব্দ; নামটী দুর্গসিংহ বা দৌর্গসিংহ হইবে। জ্যোতিষ ও গণিত গ্রন্থকারগণের মধ্যে বরাহমিহিরের নামোল্লেখ করা উচিত ছিল।

১৬। কুতবউদ্দিন্ কোন্ অব্দে রাজ্যাধিকারী হন, কত বৎসর রাজত্ব করেন, তৎসম্বন্ধে তারিণীচরণ বাবুর গ্রন্থে কিছুমাত্র লিখিত হয় নাই। আরাম ও বেহ্রাম-সম্বন্ধেও গ্রন্থকার, ঐরূপ নীরব।

রজনীকান্ত বাবুর পুস্তকের সহিত ক্ষীরোদ-চন্দ্র বাবুর পুস্তকের অনৈক্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। এ স্থলে তাহাও উল্লিখিত হইল।

১৭। গোবিন্দ শিখদিগের দশম গুরু। তিনি গোবিন্দ নামে তেমন খ্যাত নহেন; গুরু-গোবিন্দ বলিলেই তাঁহাকে চেনা যায়। সেই গুরু-গোবিন্দের পর যিনি শিখদিগের

গুরুত্বে বৃত হন, তাঁহার নাম ও কার্য্যে কি গোলযোগ দেখুন ;—

(ক) "গুরু-গোবিন্দের মৃত্যুর পর বন্ধু গুরুর পদে অভিষিক্ত হন।"—রজনীকান্ত বাবুর ইতিহাস ১৫৮ পৃষ্ঠা।

(খ) "বান্দা নামক এক বৈরাগী।"

—ক্ষীরোদচন্দ্র বাবুর ইতিহাস ১১ পৃষ্ঠা।*

১৮। ঈশানচন্দ্র বাবু চৈতন্যের আবির্ভাব-সময় লইয়া কিছু গোলযোগ করিয়াছেন। তাঁহার মত এই—"চৈতন্যদেব ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। * * * ১৫২৯ খৃঃ তিরোধান হন।"—ঈশানচন্দ্র বাবুর ইতিহাস ১২৬পৃষ্ঠা।

শকাব্দ ও খৃষ্টাব্দের মধ্যে ৭৮ বৎসর ব্যবধান। শ্রীচৈতন্যের জন্মশক ১৪০৭, অন্তর্দ্ধান ১৪৫৫ শক। অর্থাৎ ক্রমান্বয়ে ১৪৮৫—১৫৩৩ খৃষ্টাব্দ।

মানাস্পদ রাজনারায়ণ এবং পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়ও এই মতাবলম্বী। ইহার প্রমাণও দৃষ্ট হয়,—

(ক) "চৌদ্দশত সাত শকে জন্মের প্রমাণ।
চৌদ্দশত পঞ্চান্ন হইল তিরোধান।"

—চৈতন্য চরিতামৃত আদিখণ্ড।

(খ) ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে চৈতন্যের জন্ম। ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার তিরোধান।—রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের বাঙ্গালা ইতিহাসের ৩৬ পৃষ্ঠার টীকা।

বিদেশীয় ইতিহাস-লেখকগণ অনেক সময়ে খাঁটী কল্পনা দ্বারা ঐতিহাসিক প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের কল্পনার গতি অসাধারণ। নিম্নে তাহার একটী বৃত্তান্ত উদ্ধৃত হইতেছে। ঈশানচন্দ্র বাবু, হণ্টার সাহেব কৃত ইংরাজী ইতিহাসের অনুবাদক। সুতরাং হণ্টার সাহেবের যে মত, ঈশান বাবুরও সেই মত। আমাদের দেশে চৈতন্যের জীবনী সম্বন্ধে সংস্কৃতে ও বাঙ্গালায় এত পুস্তক থাকিতেও কেবল কল্পনাবলে মহামতি হণ্টার সাহেব নিরীহ ধর্ম্ম-প্রচারক চৈতন্যকে ছয় বৎসর পূর্ব্বে হত্যা করিয়াছেন। ইহা কি বাস্তবিক বিদেশীয় অনুসন্ধানের আশ্চর্য্য ফল নহে ?

১৯। সংস্কৃত-কালেজের উপস্থিত অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত নীলমণি মুখোপাধ্যায় ন্যায়ালঙ্কার এম, এ, বি, এল্ প্রণীত ইতিহাসে অপর কতকগুলি বিষয়ের অনৈক্য দেখিতে পাওয়া যায়। নিম্নে তৎসমস্ত প্রকটিত হইল।

লাহোর-রাজ জয়পাল অনঙ্গপালের পুত্র ; ইহাই চিরপ্রসিদ্ধ ; কিন্তু নীলমণি বাবু লিখিয়াছেন—"আনন্দপালের পুত্র দ্বিতীয় জয়পাল সর্ব্বতোভাবে পরাজিত হইলেন।"—৩৬ পৃষ্ঠা।

এই মত যদি সত্য হয়, তবে ঐতিহাসিক তত্ত্ব নূতন উদ্ঘাটিত হইল বলিয়া আহ্লাদিত হইবার কথা।

২০। নীলমণি বাবুর লিখিত নিম্নলিখিত অংশ অস্পষ্ট। যথা,—"তাঁহার পুত্র রুকুণ-উদ্দীন ফিরোজ-রাজ তক্তে বসিলেন।"

২১। ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি কর্ত্তৃক বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানীর সনন্দ গ্রহণের কথাও সকল পুস্তকের সমান নয়। ক্লাইব, যৎকালে দ্বিতীয় বার ভারতে আগমন করেন, তখনই এই কার্য্য সমাহিত হয়।

(ক) বাবু কৃষ্ণচন্দ্র রায়, রজনীকান্ত গুপ্ত, পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন, ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী—ইহাঁরা সকলেই একবাক্যে লিখিয়াছেন, ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ১২ই আগষ্টে ঐ কার্য্য নিষ্পাদিত হইয়াছিল।

(খ) নীলমণি ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের অভিপ্রায়, তদ্বিষয়ে এইরূপ লিখিত হইয়াছে যে, ১৭৫৬ হইতে ১৭৭০ খৃষ্টাব্দের অন্তরালে কোন এক অনির্দ্দিষ্টকালে ঐ ঘটনা ঘটে।

(গ) রমেশচন্দ্র বাবু লিখিয়াছেন—১৭৬৫ খৃষ্টাব্দের মে মাসের অব্যবহিত পরবর্ত্তী কালে ঐ ঘটনার সূত্রপাত।

(ঘ) ঈশানচন্দ্র বাবুর পুস্তকে ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দ উল্লিখিত। মাস বা তারিখের সন্দর্ভ কিছুমাত্রও উহাতে নাই।

ইহা অধিক কালের বৃত্তান্ত নয়, অথচ ইহাতেও চারি প্রকার মত অবলোকিত হইতেছে!

২২। ভিন্ন ভিন্ন ঘটনার কিরূপ অসামঞ্জস্য, পাঠক, নিম্নের তালিকায় নেত্রপাত করিলেই ধারণা করিয়া লইতে পারিবেন,—

সম্রাটের নাম।	যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়ের পুস্তক।	রামগতি ন্যায়রত্নের পুস্তক	রমেশচন্দ্র দত্তের পুস্তক	ঈশানচন্দ্র ঘোষের পুস্তক	ক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরীর পুস্তক।	নীলমণি মুখোপাধ্যায়ের পুস্তক।	রজনীকান্ত গুপ্তের পুস্তক
আরাম	০	০	১২১০ খৃঃ	০	০	০	১২১০ খৃঃ
আল্‌তামস্	১২২১ খৃঃ	১২১০ খৃঃ	১২১১—১২৩৫	১২১১—১২৩৬	১২১০ খৃঃ	১২৩৫ খৃঃ	১২১১—১২৩৬
রুকণউদ্দীন	১২৩৬ খৃঃ	১২৩৫ খৃঃ	১২৩৫—১২৩৬	০	১২৩০ খৃঃ	০	১২৩৬ খৃঃ
বেহরাম	০	০	১২৩৯—১২৪৬	০	•	০	১২৩৯—১২৪১
মসায়ুদ	০	০	১২৪১—১২৪৬	০	০	০	১২৪১—১২৪৬
নাসিরউদ্দীন	১২৬৪ খৃঃ	১২৪৬ খৃঃ	১২৪৬—১২৬৬	০	০	১২৪৬ খৃঃ	১২৪৬—১২৬৬
বুলবন	১২৬৬ খৃঃ	১২৮৫ খৃঃ	১২৬৬—১২৮৬	১২৬৫—১২৮৭	১২৬৬ খৃঃ	০	১২৬৬—১২৮৬
কৈকোবাদ	১২৮৬ খৃঃ	১২৮৯ খৃঃ	১২৮৬—১২৮৮	০	০	০	১২৮৬—১২৮৮

বাবু কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের পুস্তকে ইহাঁদের রাজ্যাব্দ কিছুমাত্রও লিখিত নাই।

পূর্ব্ব-লিখিত বিবরণী দ্বারা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, গ্রন্থকারদিগের মধ্যে পরস্পর বিশেষ অনৈক্য। আল্‌তামস্‌কে দুই জন ইতিহাস লেখক দুই বার মারিয়াছেন। ১৮৩৫ খৃঃ আল্‌তামসের মৃত্যু হয়, নীলমণি বাবুর এই মত। ঈশান বাবুর মতে ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ মৃত হন। এ বড় বিষম সমস্যা! নাসির-উদ্দীন এক বার মরিয়া আবার বাঁচিয়াছেন! পুনরায় তনুত্যাগ করেন! কি বিচিত্র ব্যাপার! অস্পষ্টতা যে বিলক্ষণই!

ইতিহাস-সম্বন্ধে বৎসরের অনৈক্য ভিন্ন আরও বিস্তর প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে নামের বিশৃঙ্খলা অন্যতম। বাবু ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরীর পুস্তকে 'ইলতামস' বলিয়া যে সম্রাটের নামোল্লেখ করিয়াছেন, অপরাপর পুস্তকে তাহার নাম আলতামস। ইহার মধ্যে কোন্‌টী প্রকৃত নাম? বাবু যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় ও রামগতি ন্যায়রত্নের পুস্তকে যাঁহার নাম নাজিরউদ্দীন, রমেশচন্দ্র বাবু প্রভৃতি তাঁহাকে নাসিরউদ্দীন নামে উল্লেখ করিয়াছেন। এরূপ দন্ত্য 'স' স্থানে বর্গীয় 'জ' হইবার কারণ কি আমরা বুঝি না।

* এবিষয় ক্ষীরোদ চন্দ্র বাবুর মত বরং গ্রহণীয়। কেননা, তিনি আমার পত্রের উত্তরে ১৮৯৪ খৃঃ ১৪ই আগষ্টে অন্যান্য কথার সঙ্গে লিখিয়াছেন ;—

"বন্ধু বাঙ্গালা শব্দ—হিন্দি নহে।
'তুহি নানক্কর কর্ত্তার, নানক বান্দা তেরা॥
ইহা শিখভজন। নানকের বন্দী বলিয়া তাঁহার নাম বন্দা হইয়াছিল। শিখেরা বান্দা বলিয়া উচ্চারণ করে।"

"বন্ধু" সংস্কৃত শব্দও বটে। গুরুমুখী ভাষায় সঙ্গে সংস্কৃত সম্বন্ধ কি বিবেচ্য নয়?

ইতিহাস-লেখকের সামান্য অনবধানবশতঃ ভ্রম হইতে পারে, কিন্তু ইতিহাসের ভ্রম বড় বিপজ্জনক।

আধুনিক ঐতিহাসিকেরা, নূতন নূতন মত চালাইতে যাইয়া নানা প্রমাদ ঘটাইয়া বসিয়াছেন। হিন্দু-রাজত্ব-কাল-বর্ণনে, কেহ কেহ প্রিন্সেপ, হর্‌নলি, হণ্টারের মত গ্রহণ করিয়াছেন, কেহ কেহ বা ডাক্তার রাজেন্দ্রলালের মতানুবর্ত্তী হইয়াছেন। ইহাতে নানাকারণে নানা বিড়ম্বনা উপস্থিত। মহম্মদীয় রাজত্বে কেহ কেহ ফেরিস্তা, কেহ আলবেরুনী, কেহ এলফিন্‌ষ্টোন্, কেহ ইলিয়ট ইত্যাদি অবলম্বন করিয়াছেন, এইরূপে নানা মুনির নানামত ঘটিয়াছে।

ইতিহাস-লেখকের কর্ত্তব্য অতি গুরুতর। ইতিহাসের কথা সুমীমাংসিত হইয়া লিখিত না হইলে তাহাতে ছাত্রগণের অসুবিধা। বিশেষতঃ ক্ষুদ্রকায় বাঙ্গালা ইতিহাসাবলীর মধ্যে এরূপ বিস্তর অনৈক্য থাকা বড়ই দুঃখের বিষয়। মুসলমান রাজত্ব কালেরই অনেক অনৈক্যপূর্ণ মত দৃষ্ট হইতেছে। মুসলমান রাজ্যের বিশ্বাসযোগ্য উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট ইতিহাস রহিয়াছে, সুতরাং এ বিষয়ে এত গোলযোগ থাকিবার কোন কারণ দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। যদিও কোন কোন স্থলে মতভেদ হইতে পারে, তাহা হইলেও তৎ তৎস্থান যে যে ইতিহাসের মতে লিখিত হইবে, তাহার নামোল্লেখ করিয়া দেওয়া উচিত।

আমরা বহু পরিশ্রম করিয়া ছাত্রগণের, কেবল ছাত্রগণের কেন, ইতিহাস-পাঠকবর্গের অসুবিধা ও সন্দেহ-নিবারণার্থ উল্লিখিত অনৈক্যগুলি প্রদর্শন করিলাম। আশা করি, বঙ্গীয় ইতিহাসতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ ইহার সুমীমাংসায় অগ্রসর হইবেন।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি।

এক বর্ষ।

(১)

গেল এক বর্ষ! হায় জীবন-যাত্রার
আর এক পদ যাত্রী অগ্রসর হ'ল;
নূতন প্রভাত-সহ নূতন আশার
উজ্জ্বল আলোক তার মুখেতে পড়িল।

(২)

এই যে আশার আলো সোণার বরণ,
কত মায়া-রশ্মি-রজ্জু জড়িত ইহাতে;
কতই কোমলে দৃঢ় এই সে বন্ধন,
বাঁধিল জীবনে যাহা আবার অজ্ঞাতে!

(৩)

পশ্চাতে ফিরিয়া দেখ গত পদক্ষেপ
নিবিড় আঁধার মাঝে গেছে মিশাইয়া!
সহজে পড়েনা মনে, স্মৃতির বিদ্যুৎ,
যদি না চমকে অন্ধ আঁখি ঝলসিয়া।

(৪)

কাজ নাই সে বিজলী জ্বালিয়া আবার
নিবিড় আঁধার পুনঃ করি অনুভূত,
কাজ নাই পথভ্রম—ভ্রমে নিপতন—
নিপতনে অনুতাপ করি উদ্দীপিত।

(৫)

চমকিলে সে বিদ্যুৎ কত কুদর্শন
কুস্বপন সম মনে উঠিবে জাগিয়া!
দেখিবে, কতই সুখ সুবর্ণমুকুল
ফুটিতে ফুটিতে তাপে গিয়াছে ঝরিয়া!

(৬)

দেখিবে কতই শুভ-শান্তির প্রদীপ
জ্বলিতে কি না জ্বলিতে রশ্মি ছড়াইয়া,
অমনি দুর্দ্দৈব-ঝড় কোথা হ'তে আসি'
একেবারে সে প্রদীপ দিল নিবাইয়া!

(৭)

সহ সেই সুকোমল আলোক-অঙ্কুর
স্নেহ বর্ষি সব হায় গিয়াছে ঘুচিয়া;
হাসিবে না আর কভু, আসিবে না কভু,
গাঢ় অন্ধকার তথা রহিবে জাগিয়া!

(৮)

তবু কা'রে জ্বালে কিম্বা উঠিবে অন্তর,
সোণার প্রতিমা যার ডুবিয়াছে জলে!
কিম্বা সে সোণার চাঁদ চির-অস্তাচলে
গেছে রে লাঞ্ছাস্ত করে লাগায়ে অনলে!

(৯)

কাজ নাই সেই দৃশ্যে, ঝ'রেছে তা সহ
কতই অশ্রুর ধারা শ্রাবণ-ধারায়!
কাজ কি ঢালিয়ে তায় প্রবল প্রবাহ
ভাসাইয়ে ভগ্ন-হিয়া-তটে পুনরায়।

(১০)

এস তুমি যাত্রিবর, আজি এ প্রভাতে—
নবীন প্রভাতে, মতি নবীন উৎসাহে,
ভুলি ভূত ক্লান্তি-দুখ, নিদ্রা-অন্তে যেন
ধরিয়া দ্বিগুণ বল পুন দৃপ্ত দেহে।

(১১)

সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা রোপি' হৃদয়-ভূমিতে
আশায় উৎফুল্লমুখে হও অগ্রসর,
তুচ্ছ বাধা বিঘ্ন সবে তৃণ হেন মানি
ফেল উপাড়িয়া, করি আপনা-নির্ভর।

(১২)

অবশ্য করম-তরু শতমুখ ধরি
ফলে ফুলে হবে তব পুষ্পিত ফলিত,
ধর ব্রত, অনাসক্তে ভুঞ্জ ফলরাশি,
দয়াময় ফলদাতা জেনো সুনিশ্চিত।

(১৩)

রহিবে না দিন, ভাই, বসি তর তরে,
কর্ত্তব্যের পথে দ্রুত হও অগ্রসর;
কর্ম্মক্ষেত্র এ ভারত, তাহে ধন্য তুমি
শিক্ষা দীক্ষা ধর্ম্ম শাস্ত্রে অধিকারী নর।

শ্রী—

দেহাত্ম-বাদ খণ্ডন।

আত্মা কি পদার্থ?—এই প্রশ্নের মীমাংসার নিমিত্ত জগতের চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই অতি পুরাকাল হইতে বহু তর্ক-বিতর্ক করিয়া আসিতেছেন। এই অসীম বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যৎসামান্য স্থানের ও অনাদি অনন্ত মহাকাল মধ্যে যৎকিঞ্চিৎ সময়ের ঘটনা-মালা ভৌতিক শরীরের সাহায্যে বিলোকন করিয়া কেহ কেহ মনে ভাবেন, "আমার এই আদি, এই অন্ত; আমি ইহার পূর্ব্বে কোথায়ও ছিলাম না ও ইহার পরে কোথায়ও থাকিব না, অকস্মাৎ আবির্ভূত হইয়া অকারণে কিঞ্চিৎ দুঃখভোগ করিয়া লীলা-সংবরণ করিলাম।" কেহ কেহ বা জগতের ক্ষণভঙ্গুরত্ব বিলোকন করিয়া মনে ভাবেন, "এই মুহূর্ত্তের জন্য আমি বিদ্যমান আছি, ইহার পরমুহূর্ত্তে আমি বর্ত্তমান থাকিব না, জগতের প্রত্যেক বস্তুরই প্রথম ক্ষণে উদয় ও দ্বিতীয় ক্ষণে বিলয় হইতেছে।" এইরূপে বহু লোক বহু-প্রকার তর্ক করিয়া আসিতেছেন।

আত্মা কি? এই কৌতূহল-নিরসনের নিমিত্ত মনীষিগণ যুগ-যুগান্ত হইতে জগতের প্রত্যেক জড়বস্তু তন্ন তন্ন করিয়া বিচার করিলেন, কিন্তু আত্মার সম্বন্ধে সুচারু সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিলেন না; কখন বা জগতের সমস্ত জড়বস্তু পরিত্যাগ করিয়া সমাধিমগ্ন হইলেন; কিন্তু তাহাতেও আত্মার সম্যক্ সন্ধান পাইলেন না। কেহ কেহ ভাবিলেন, "জগতে কেবল জড়পদার্থই বিদ্যমান আছে, চৈতন্য জড়পদার্থেরই ক্রিয়া-বিশেষ, জড়াতিরিক্ত চৈতন্য-পদার্থ নাই।" কেহ কেহ বা ভাবিলেন, "কেবল চৈতন্য-পদার্থই বিদ্যমান আছে, ঘট-পটাদি-চৈতন্যেরই

আকারবিশেষ, চৈতন্যাতিরিক্ত জড়পদার্থ নাই।" কেহ কেহ বা ভাবিলেন, "চৈতন্যের উপাদান জড়পদার্থ হইতে পারে না এবং জড়বস্তুও চৈতন্যের আকারবিশেষ হইতে পারে না, জগতে জড় ও চৈতন্য উভয় পদার্থেরই অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে; এই জড় ও চৈতন্যের সংযোগেই জীব-জগতের উৎপত্তি হইতেছে।" কেহ কেহ বা ভাবিলেন, "জড়-পদার্থও বিদ্যমান নাই, চৈতন্য-পদার্থও বিদ্যমান নাই; জগৎ শূন্য, সংসার অলীক।" দার্শনিকদিগকে এইরূপ নিয়ত চিন্তা-তরঙ্গে ভাসমান দেখিয়া ভগবান্ বলিয়াছেন:—

আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেন-
মাশ্চর্য্যবদ্বদতি তথৈব চান্যঃ।
আশ্চর্য্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি
শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ॥

অর্থাৎ—কেহ কেহ এই জীবাত্মাকে বিস্ময়ের সহিত অবলোকন করেন, কেহ কেহ বিস্ময়ের সহিত বর্ণনা করেন, কেহ কেহ বিস্ময়ের সহিত শ্রবণ করেন এবং কেহ কেহ শ্রবণ করিয়াও বুঝিতে পারেন না।

আত্মা কি? এই প্রশ্নের এ পর্য্যন্ত যে সকল উত্তর প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহার মধ্যে কয়েকটী উত্তর নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে;—

অতি প্রাকৃত লোকেরা "আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ" (আত্মা পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করে) ইত্যাদি শ্রুতির প্রামাণ্য গ্রহণপূর্ব্বক ও পুত্রের প্রতি নিরতিশয় স্নেহ দর্শন করিয়া এবং পুত্র পুষ্ট হইলে আমিই পুষ্ট হইলাম, পুত্র নষ্ট হইলে আমিই নষ্ট হইলাম, ইত্যাদি অনুভব করত বলিয়া থাকেন, 'পুত্রই আত্মা'।

কোন চার্ব্বাক, "স বা এষঃ পুরুষোঽন্নরসময়ঃ" (এই অন্নরসময় শরীরই আত্মা) ইত্যাদি শ্রুতির প্রামাণ্য গ্রহণপূর্ব্বক ও প্রদীপ্ত গৃহ হইতে পুত্রকে পরিত্যাগ করিয়াও নিজের বহির্নিষ্ক্রমণ দর্শনপূর্ব্বক এবং আমি স্থূল, আমি কৃশ, ইত্যাদি অনুভব করত বলিয়াছেন, 'এই স্থূল শরীরই আত্মা'।

অপর চার্ব্বাক "তে অপ্রাণাঃ প্রজাপতিং সমেত্য ব্রূয়ুঃ" (প্রাণ বহির্গত হইলে সেই ইন্দ্রিয়গণ প্রজাপতির নিকট যাইয়া বলিবে) ইত্যাদি শ্রুতি অবলম্বনপূর্ব্বক ও ইন্দ্রিয়ের অভাবে শরীরের চলনাভাব বশতঃ এবং আমি অন্ধ, আমি বধির, ইত্যাদি অনুভব করত বলিয়াছেন, 'ইন্দ্রিয়-সমুদয়ই আত্মা'।

অপর চার্ব্বাক, "অন্যোঽন্তর আত্মা প্রাণময়ঃ" (এই প্রাণই আত্মা) ইত্যাদি শ্রুতি অবলম্বন পূর্ব্বক ও প্রাণের অভাবে ইন্দ্রিয়দিগের চলনের অসামর্থ্য বশতঃ এবং আমি ক্ষুধিত, আমি পিপাসার্ত্ত, ইত্যাদি অনুভব করত বলিয়াছেন, 'প্রাণই আত্মা'।

অন্য চার্ব্বাক, "আন্যোঽন্তর আত্মা মনোময়ঃ" (মনই আত্মা) ইত্যাদি শ্রুতি অবলম্বন পূর্ব্বক ও মন সুপ্ত হইলে প্রাণাদির অভাব বশতঃ এবং আমি সংকল্প করিতেছি, আমি বিকল্প করিতেছি ইত্যাদি অনুভব করত বলিয়াছেন, 'মনই আত্মা'।

যোগাচারী বৌদ্ধেরা, "অন্যোঽন্তর আত্মা বিজ্ঞানময়ঃ" ইত্যাদি শ্রুতি অবলম্বন পূর্ব্বক ও জ্ঞানের অভাবে সমস্ত বাহ্য-জগতের অভাব বশতঃ এবং এই মুহূর্ত্তে আমি এখানে আছি, পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে ছিলাম না, ইত্যাদি অনুভব করিয়া বলিয়াছেন, 'ক্ষণ বিজ্ঞানই আত্মা'।

মাধ্যমিক বৌদ্ধেরা "অসদেবেদমগ্র আসীৎ" (এই পরিদৃশ্যমান জগৎ প্রথমে ছিল না) ইত্যাদি শ্রুতি অবলম্বন পূর্ব্বক ও সুষুপ্তি অবস্থায় সকল বিষয়েরই অভাব বশতঃ এবং স্বপ্নাবস্থায় যে সকল বস্তু অনুভূত হয় উত্থিত হইলে তাহার কিছুই দেখা যায় না,

ইত্যাদি অনুভব করিয়া বলিয়াছেন, 'শূন্যই আত্মা'।

বেদান্তীরা, "প্রত্যগস্থূলোঽচক্ষুরপ্রাণোঽমনা অকর্ত্তা চৈতন্যং চিন্মাত্রং সৎ" (সর্ব্ববস্তু ব্যাপক অস্থূল অচক্ষু অপ্রাণ অকর্ত্তা চিন্মাত্র চৈতন্য আত্মা) ইত্যাদি শ্রুতি অবলম্বন পূর্ব্বক ও জগৎ অবিদ্যা-প্রপঞ্চ মাত্র অবলোকন করিয়া এবং অহংব্রহ্ম ইত্যাদি বিদ্বদ্গণের অনুভব দর্শন করিয়া বলিয়াছেন, 'নিত্য বিজ্ঞানই আত্মা'।

সাঙ্খ্যেরা, "অসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষ" (এই নির্লেপ নিষ্ক্রিয় পুরুষই আত্মা) ইত্যাদি শ্রুতি অবলম্বন পূর্ব্বক ও সুখ-দুঃখাদি শরীরেরই গুণ দেখিয়া এবং আমি এই শরীর হইতে ভিন্ন, ইত্যাদি অনুভব করিয়া বলিয়াছেন, 'নিস্পৃহ ত্রিগুণ-বিবর্জ্জিত পুরুষই আত্মা'।

নৈয়ায়িক, অকাট্য যুক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক উদ্ধৃত মতসমূহের খণ্ডন করিয়াছেন। আত্মার স্বরূপ-বিষয়ক যে সকল প্রবল শ্রুতি আছে, তাহার সমক্ষে উল্লিখিত দুর্ব্বল শ্রুতি, সমূহের প্রামাণ্য কিছুতেই গ্রহণ করা যাইতে পারে না, বস্তুতঃ এই সকল শ্রুতি পুত্রাদির স্তুতিবিষয়ক মাত্র। বর্ত্তমান প্রবন্ধে নৈয়ায়িকের যুক্তি অবলম্বন পূর্ব্বক আমরা দেহাত্ম বাদের ভ্রম প্রদর্শন করিব।

কেহ কেহ বলেন, চৈতন্যাশ্রয় শরীরই আত্মা, শরীরই অহঙ্কারের আস্পদ, আমি গৌর আমি স্থূল ইত্যাদি প্রত্যয় শরীরেই আরোপিত হইয়া থাকে। এরূপ কথা যাঁহারা বলেন, তাঁহারা নিতান্ত ভ্রান্ত; কেননা, চৈতন্য যদি শরীরের গুণ হইত, তাহা হইলে শরীরের কারণ করচরণাদি ও তদবয়বাদিতেও চৈতন্য থাকিত। যে সকল কারণ লইয়া কোন কার্য্য উৎপন্ন হয়, সেই সকল কারণের গুণ ঐ কার্য্যে সংক্রামিত হইয়া থাকে; যেমন মৃত্তিকার গুণ গন্ধ, ঐ মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন ঘটেও বিদ্যমান থাকে। এইরূপে কার্য্যে যে সকল গুণ দৃষ্ট হইয়া থাকে, কারণে ঐ সকল গুণ অবশ্যই বিদ্যমান ছিল! যদি বল, কর চরণাদিতে চৈতন্য বিদ্যমান আছে। তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য এই—হস্ত, পদ, মস্তক, কর্ণ ইত্যাদি বহু অবয়বের বহু চৈতন্যের ঐকমত্য কিরূপে? বহুচেতন পদার্থের এক মত কিছুতেই সম্ভব হয় না, আমার বেদনায় অপরের বেদনা উপস্থিত হয় না এবং অপরের বেদনায় আমার বেদনা উপস্থিত হয় না। হস্ত দ্বারা কোন বস্তু স্পর্শ করিলে, ঐ স্পর্শজ্ঞান হস্তেরই হইবে এবং পদ দ্বারা সেই বস্তু স্পর্শ করিলে ঐ স্পর্শজ্ঞান পদেরই হইবে, একের জ্ঞান অন্যের হইবে না। আমি হস্ত দ্বারা যে বস্তু স্পর্শ করিলাম, আবার পদ দ্বারা সেই বস্তুই স্পর্শ করিলাম এবং উভয় অঙ্গ দ্বারা স্পৃষ্ট বস্তু, একই বস্তু বলিয়া জানিলাম। এরূপ ঐকমত্য হস্ত ও পদের হইতে পারে না; কেননা, পদ কিরূপে জানিবে যে, হস্ত ঐ বস্তু স্পর্শ করিয়াছিল?

আর হস্ত দ্বারা অনুভূত বস্তুর, হস্তচ্ছেদ হইলে, স্মরণ হইতে পারে না। যে, যে বস্তু অনুভব করে, সে, সেই বস্তু স্মরণ করিতে পারে, কিন্তু যে যাহা অনুভব করে নাই, সে তাহা কিরূপে স্মরণ করিবে? হস্ত যে বস্তু অনুভব করিয়াছিল, হস্তের অভাবে সে বস্তুকে স্মরণ করিবে?

যদি বল, শরীরের কারণে সূক্ষ্ম-মাত্রায় জ্ঞান আছে ও শরীরে স্ফুটজ্ঞান আছে; অতএব ঐকমত্যের অনুপপত্তি হইবে না; তাহাও বলিতে পার না। কেননা, তাহা হইলে স্মরণ অতীন্দ্রিয় হইয়া পড়ে। পরমাণু অতীন্দ্রিয় পদার্থ, সুতরাং তাহার গুণ চৈতন্যাদিও অতীন্দ্রিয় হইবে। অতীন্দ্রিয় বস্তুর অনুভব হয় না, সুতরাং জ্ঞানাদির অনুভব হইবে না।

পুনশ্চ শরীরের মূল কারণ পরমাণুতে যদি চৈতন্য থাকিত, তাহা হইলে ঐ পরমাণু দ্বারা নির্ম্মিত ঘটাদিতেও চৈতন্য থাকিত; কিন্তু ঘটাদিতে চৈতন্যের উপলব্ধি হয় না; অতএব পরমাণুতে চৈতন্য ছিল না। যদি বল, ঘটাদিতেও সূক্ষ্মমাত্রায় চৈতন্য আছে, তাহা হইলে উত্তর এই যে, ঐ ঘটাদির চৈতন্য কোন প্রমাণ দ্বারাই উপলব্ধ হয় না; সর্ব্ব প্রমাণের অগোচর বস্তু স্বীকার করিলে 'শশবিষাণ' 'গগনকুসুম' ইত্যাদিরও অস্তিত্ব অঙ্গীকার করিতে হইবে। অতএব নানা অবয়বে নানা চৈতন্য কল্পনা করা অপেক্ষা, চৈতন্যাধার এক দ্রব্যান্তর (আত্মা) কল্পনা করাই উচিত।

কেহ কেহ বলেন, যদিও ভূত সকল অচেতন, তথাপি তাহারা মিলিত হইয়া দেহরূপে পরিণত হইলে তাহাতে চৈতন্য জন্মে; গুড় তণ্ডুল প্রভৃতি দ্রব্য প্রত্যেকে মাদক নহে, কিন্তু ঐ সকল দ্রব্য দ্বারা সুরা প্রস্তুত হইলে তাহাতে মাদকতা জন্মে; সেইরূপ এই দেহ অচেতন ভূত-সমূহ হইতে উৎপন্ন হইলেও তাহাতে চৈতন্যের উৎপত্তি অসম্ভাবিত নহে। এরূপ বাদীর নিকট জিজ্ঞাস্য এই—বাল্যের বিলোকিত পদার্থের যৌবন কালে স্মরণের উপপত্তি কিরূপে হইয়া থাকে? প্রতিদিন দেহ ভিন্ন ভিন্ন হইতেছে, দেহের পরিমাণ প্রতিমুহূর্ত্তেই পরিবর্ত্তিত হইতেছে এবং ঐ পরিমাণের ভেদ দ্বারা দ্রব্যের ভেদ হইতেছে; কেননা, আশ্রয়ের নাশ না হইলে পরিমাণের নাশ হয় না। বাল্য-শরীরের পরিমাণের নাশ হইয়াছে দেখিয়া ঐ পরিমাণের আশ্রয় বাল্য-শরীরেরও নাশ হইয়াছে, বলিতে হইবে। অতএব বাল্য-শরীর যে বস্তু দর্শন করিয়াছিল, যৌবন-শরীর সেই বস্তু কিরূপে স্মরণ করিবে? যে দর্শন করিয়াছিল, তাহার নাশ হইয়াছে; অপর কে ঐ দৃষ্ট বস্তু স্মরণ করিবে? যদি বল কারণ যে বস্তু অনুভব করিয়াছিল, কার্য্য সেই বস্তু স্মরণ করুক; অর্থাৎ পূর্ব্ব-শরীরোৎপন্ন সংস্কার সকল পরবর্ত্তি-শরীরে সংক্রামিত হউক; এ কথাও বলিতে পার না, কেননা, তাহা হইলে মাতা কর্ত্তৃক অনুভূত বস্তুর—গর্ভস্থ কর্ত্তৃক স্মরণ হইত; মাতা যে সকল বস্তু দর্শন করিয়াছিলেন, মাতার শরীর হইতে উৎপন্ন সন্তান সেই সকল বস্তু কেন স্মরণ করিতে পারে না?

দেহ চেতন হইলে বালকের প্রথম প্রবৃত্তি অসম্ভব হইয়া পড়ে, ইচ্ছা ব্যতীত প্রবৃত্তি উৎপন্ন হয় না। 'এই বস্তু আমার প্রিয়, এই বস্তু আমার অপ্রিয়' ইত্যাদি জ্ঞান ব্যতীত ইচ্ছা জন্মে না; এ জন্মে তাহার ইষ্টানিষ্টের কোন জ্ঞান হয় নাই, তবে তাহার ইচ্ছা কেন জন্মিল? জন্মান্তরানুভূত ইষ্ট ও অনিষ্ট—জ্ঞানের স্মরণ করুক, এ কথাও বলিতে পারে না; কেননা, জন্মান্তরীয় শরীর ভস্মসাৎ হইয়াছে। দেহাতিরিক্ত চেতনবাদিমতে জন্মান্তরানুভূত ইষ্ট ও অনিষ্ট—স্মরণ হয় বলিয়া প্রবৃত্তি জন্মিতেছে।

দেহাতিরিক্ত আত্মা স্বীকার না করিলে শরীরনাশ হইলে তৎকৃত হিংসাদি ফলের অনুপভোগ হইয়া পড়ে এবং কৃতহানি ও অকৃতাভ্যাগম দোষ হয়। এই শরীর দ্বারা আমি যে পাপ বা পুণ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলাম, এই শরীরনাশ হইলে তাহার ফলোপভোগ কে করিবে? সুতরাং কৃতহানি দোষ ঘটিল। আর পূর্ব্বজন্মে কোনও পাপ করি নাই, কিন্তু শরীর ধারণ করিয়াই দুঃখ অনুভব করিতেছি; ইহাতে অকৃতাভ্যাগম দোষ ঘটিল।

যদি "আমি গৌর আমি স্থূল" ইত্যাদি অনুভবই দেহাত্মবাদের প্রমাণ হইল, তাহা হইলে "আমার শরীর" "আমার চক্ষু" ইত্যাদি অনুভবই বা দেহাতিরিক্ত আত্মার প্রমাণ কেন না হইবে? আর শ্রুতিও "আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু" (আত্মাকে রথী বলিয়া জানিও, দেহকে রথ বলিয়া জানিও) ইত্যাদি শ্লোকে দেহাতিরিক্ত আত্মার বিষয় কীর্ত্তন করিয়াছেন।

কেহ কেহ বলেন, 'প্রাণই আত্মা'। তাহা হইতে পারে না; কেননা, তাহা হইলে স্মরণাদির অসম্ভব হইয়া পড়ে; যেহেতু প্রাণবায়ুর প্রতিমুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তন হইতেছে, সুতরাং অনুভবিতার অভাবে স্মরণ কে করিবে? প্রাণাতিরিক্ত আত্মার বিষয় প্রশ্নোপনিষদে লিখিত আছেঃ—

আত্মন এষ প্রাণো জায়তে।
যথৈষা পুরুষে ছায়ৈতস্মিন্ এতদাততম্।
মনোকৃতেন আয়ত্যস্মিন্ শরীরে॥

আত্মা হইতেই এই প্রাণ জন্মিয়াছে; যেমন পুরুষের ছায়া উৎপন্ন হয়, সেইরূপ আত্মাতেই প্রাণ বিস্তৃত রহিয়াছে। মনের সংকল্প মাত্রেই প্রাণ এই শরীরে আগমন করিয়াছে।

বস্তুতঃ এই দেহ আত্মা নহে, নির্ব্বোধ জীব-মোহান্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া ভৌতিক-দেহেই আত্ম-বুদ্ধি করিয়া থাকে। আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী যখন আত্মা হইতে পৃথক-রূপে অবস্থান করিতেছে, তখন কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি এই পঞ্চভূতাত্মক কলেবরকে আত্মা বলিয়া ভাবনা করিবে? যখন পঞ্চভূতাত্মক ভোগ দ্বারা পঞ্চভূতময় শরীরই আপ্যায়িত হইতেছে, তখন ইহাতে জীবের গর্ব্ব নিরর্থক। দেহ যখন আত্মা হইতে ভিন্ন, তখন ইহাতে জীবের আত্ম-বুদ্ধি কেবল সংসারে আবদ্ধ হইবার জন্য।

শ্রীসতীশচন্দ্র আচার্য্য বিদ্যাভূষণ।

হিন্দু ও বৌদ্ধ।

হিন্দু-ধর্ম্মের সহিত বৌদ্ধধর্ম্মের প্রগাঢ় সম্বন্ধ। হিন্দু, বৌদ্ধকে ঘৃণা করিলেও, বৌদ্ধ হিন্দুর প্রতি বিদ্বেষী হইলেও এ সম্বন্ধ বিলুপ্ত হয় নাই, হইবার নহে। শাহ জিহানকে কারারুদ্ধ করিয়া ঔরঙ্গজেব ভারত-সাম্রাজ্য অধিকার করিলেও শাহ জিহান এবং ঔরঙ্গজেবের প্রকৃত সম্বন্ধ বিধ্বস্ত হয় নাই।

হিন্দুধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্মের সম্বন্ধ, বিলুপ্ত না হইলেও—অধুনা অনেকাংশে অপরিজ্ঞাত।

হিন্দু মনে করেন, খৃষ্টান, মুসলমানের ন্যায়, বৌদ্ধও এক সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র সম্প্রদায়। বৌদ্ধও ভাবেন, হিন্দু সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র সম্প্রদায়। এই প্রকার সম্বন্ধ-অপরিজ্ঞান অনেক সামাজিক সুখের ব্যাঘাতক। সামাজিক সুখাভিলাষিগণের পক্ষে এই সম্বন্ধ অপরিজ্ঞান থাকা ভাল নহে। সম্বন্ধ-পরিচয় হওয়া উচিত। কিন্তু পরিচয়ের উপায় কি?

যাহাকে নিঃসম্বন্ধ বলিয়া জানি, শত্রু বলিয়া জানি, পরিচয় বলিলেই তাহার সঙ্গে পরিচয় হয় না, সম্বন্ধ আছে বা এই সম্বন্ধ আছে বলিলেও সম্বন্ধ-পরিচয় হয় না। সম্বন্ধ-সত্তা প্রমাণ করিতে হয়।

বাল্মীকির আশ্রম-সমীপে শ্রীরামচন্দ্র যখন অজ্ঞাত-সম্বন্ধ লব-কুশকে দেখিলেন, তদীয় তাৎকালিক মনোভাব অঙ্কন করিয়া মহাকবি ভবভূতি ইঙ্গিতে দেখাইয়াছেন, সম্বন্ধ খুঁজিতে হইলে, জানিতে হইলে, কোন্ কোন্ বিষয় লক্ষ্য করিতে হয়। সেই প্রস্তাবে তাঁহারই একটী শ্লোকার্দ্ধ,—

'অপি জনকসুতায়াস্তচ্চ তুল্যানুরূপং
স্ফুটমিহ শিশুযুগ্মে নৈপুণেনেয়মস্তি॥'

অর্থাৎ এই বালকদ্বয়ে জানকীর অনেক সাদৃশ্য

আছে, একটু নিপুণতার সহিত দেখিলেই বুঝা যায়।

সম্বন্ধসত্তার প্রথম প্রমাণ সর্ব্বত্রই এই। এই সাদৃশ্যজ্ঞানরূপ প্রমাণ জড়-চেতন-নির্ব্বিশেষে বিশেষ উপযোগী।

অতএব বৌদ্ধধর্ম্ম ও হিন্দুধর্ম্মে কোন্ কোন্ অংশে সাদৃশ্য আছে, তৎসমস্ত প্রদর্শন করাই সম্বন্ধ-পরিচয়ের প্রকৃষ্ট উপায়।

সেই উপায়ই অবলম্বন করিতেছি। দেবতত্ত্ব ও পুরাণপ্রসঙ্গ লইয়া সাদৃশ্য-প্রদর্শন বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

ইতিপূর্ব্বে যে আমরা 'বৌদ্ধধর্ম্ম' 'হিন্দুধর্ম্ম' নাম ব্যবহার করিয়াছি, উভয়সম্প্রদায়ের ধর্ম্মশাস্ত্র, দর্শন এবং ধর্ম্মমত এই ত্রিবিধ অর্থ তাহাতে বুঝিতে হইবে।

বৌদ্ধগণের ধর্ম্মশাস্ত্র তিন প্রকার,—সূত্র, বিনয় এবং অভিধর্ম্ম। সূত্র গ্রন্থ নয়খানি, প্রজ্ঞাপারমিতা, কারণ্ডব্যূহ, সদ্ধর্ম্মপুণ্ডরীক, লঙ্কাবতার, দশভূমীশ্বর, সমাধিরাজ, ললিতবিস্তর, সুবর্ণ-প্রভাস এবং তথাগতগুহ্যক। কারণ্ডব্যূহের নামান্তর গণ্ডব্যূহ।

এ প্রবন্ধে কারণ্ডব্যূহই অবলম্বন।

মহাবোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর, নিখিল পাপী তাপীর উদ্ধার-সাধনে ব্যাপৃত হইয়া, অবীচি নরকে গমন করিলেন। তাঁহার গমন মাত্রে অবীচী নরকের নরকভাব দূর হইল, পাপিগণের পাপযন্ত্রণা আর রহিল না, অবীচি নরক সর্ব্বসুখ-ভূমি হইল।

"অথ তে যমপালপুরুষা অসি-মুষল-ভিন্দিপাল-তোমর-গদা-চক্র-ত্রিশূলাদীনপ্যসংগৃহ্য সর্ব্বকাবীচি-পরিষ্কারং গৃহীত্বা যেন স যমো ধর্ম্মরাজস্তেনোপসংক্রান্তাঃ, উপসংক্রম্য যমং ধর্ম্মরাজমেতদবোচন্। যৎ খলু দেবো জানীয়াৎ প্রথমং, সা চায়াকং কর্ম্মভূমির্নিরবশেষং পরিক্ষীণা অভিরমণীয়-সংবৃত্তা সর্ব্বসুখসমর্পিতা।

যমো ধর্ম্মরাজস্তানুবাচ—কিং কারণং যুষ্মাকমপি কর্ম্মভূমিঃ পরিক্ষীণা?

যমপালপুরুষা ঊচুঃ—অপি চ যৎ খলু দেবো জানীয়াৎ প্রথমং, তস্মিন্নবীচিমহানরকেঽশুভনিমিত্তং প্রাদুর্ভূতম্। সর্ব্বং প্রশান্তং শীতীভাবমুপগতম্। কামরূপী চ তত্র পুরুষঃ প্রবিষ্টো জটামুকুটধরো দিব্যালঙ্কার-ভূষিত-শরীরঃ পরমমৈত্র-মানসঃ সুবর্ণবিম্বমিব দৃশ্যতে। স চ তাদৃশঃ পুরুষস্তত্র প্রবিষ্টঃ। তস্য চ প্রবিষ্টমাত্রাচ্ছকট-বক্র-মাত্রাণি পদ্মানি প্রাদুর্ভূতানি। সা চ কুণ্ডী বিস্ফুটিতা। তস্মিন্নেবাগ্নিখদায়াং মধোঃ পুষ্করিণী প্রাদুর্ভূতা।

অথ স যমো ধর্ম্মরাজশ্চিন্তামাপেদে। কস্য পুনর্দেবস্যায়ং প্রভাবঃ? অথ মহেশ্বরস্য মহর্দ্ধিকস্য? অথবা নারায়ণস্য পঞ্চমহাসমুদ্র-নমস্কৃতস্য? অথবান্যেষাং মহর্দ্ধিক-দেবঃপুত্রাণামপি বরপ্রদানেনেদৃশং ফলবিশেষং সংবৃত্তম্? ত ইহ ভূমাবনুপ্রাপ্তাঃ? অথবা রাক্ষস উৎপন্নঃ, এষ মহারাবণপ্রতিদ্বন্দ্বী?"

১মনির্ব্যূহ ২য় প্রকরণ।

ভাবার্থ,—

অনন্তর নরক-রক্ষক যমকিঙ্করগণ, খড়্গাদি অস্ত্র-শস্ত্র এবং সকল নরকোপকরণ বস্তু লইয়া ধর্ম্মরাজ যমের নিকট গিয়া নিবেদন করিল, "প্রভু! অবগত হউন, আমাদের কর্ম্মস্থল (অবীচি নরক) নিঃশেষে বিনষ্ট হইয়াছে, সে স্থান এক্ষণে অতি রমণীয় এবং সর্ব্বসুখাকর হইয়াছে।" ধর্ম্মরাজ যম তাহাদিগকে বলিলেন, "কারণ কি? তোমাদের কর্ম্মস্থলও বিনষ্ট হইল!"

যম কিঙ্করগণ বলিল, "প্রভু, অবগত হউন, অবীচি নরকে অশুভ নিমিত্ত প্রাদুর্ভূত হইল, সকল স্থলই শান্ত এবং শীতল হইল। তখন এক কামরূপী-পুরুষ তথায় প্রবেশ করিলেন। সেই পুরুষ সুবর্ণবিম্বের ন্যায় উজ্জ্বলবর্ণ, জটামুকুটধারী, দিব্য ভূষণে ভূষিত এবং পরম মৈত্রী-সম্পন্ন। তাঁহার প্রবেশ মাত্রেই শকট-চক্র প্রমাণ বৃহৎ বৃহৎ পদ্ম তথায় প্রাদুর্ভূত হইল, সেই পাপি-পাকস্থালী ভাঙ্গিয়া গেল; অগ্নিকুণ্ড মধুময় পুষ্করিণীরূপে পরিণত হইল।"

তখন ধর্ম্মরাজ ভাবিলেন, "কোন্ দেবতার এই প্রভাব? মহৈশ্বর্য্য-সম্পন্ন মহেশ্বরের না পঞ্চ-মহাসমুদ্র-নমস্কৃত নারায়ণের? কিংবা অন্য কোন দেবপুত্রের বর-প্রভাবে এই প্রকার ক্ষমতাবিশেষ হইয়াছে; তাঁহারাই কি নরক ভূমিতে প্রবেশ করিয়াছেন? অথবা মহাবল রাবণের সদৃশ কোন রাক্ষস উৎপন্ন হইয়াছে?—"

ধর্ম্মরাজ যম, মহেশ্বর এবং নারায়ণের অস্তিত্ব বৌদ্ধ-শাস্ত্রের স্বীকৃত। মহেশ্বর এবং নারায়ণের প্রাধান্যও এই শাস্ত্রে অবগত হওয়া যাইতেছে। সুতরাং এই অংশে হিন্দু-বিশ্বাস ও বৌদ্ধ-বিশ্বাস তুল্য। তবে বৌদ্ধেরা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর হইতেও অবলোকিতেশ্বরের প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছেন। সেই সব অংশে বৈলক্ষণ্য ত আছেই, সে অংশ-প্রদর্শন আমাদের উদ্দেশ্য নহে। রাবণ রাক্ষস এবং যমেরও পরাজেতা, এ বিশ্বাসের নিদর্শনও যমের চিন্তা হইতে পাওয়া যাইতেছে।

২। "যদা সর্ব্বদেবা নাগা যক্ষা গন্ধর্ব্বা রাক্ষসা অসুরা মারুতা গরুড়াঃ কিন্নরা মহোরগা মনুষ্যাঃ সন্নিপতিতা অভুবন্।"

১ম নির্ব্যূহ, ৫ম প্রকরণ।

অর্থাৎ

সকল দেবতা, নাগ, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস, অসুর, বায়ু, গরুড় জাতীয় পক্ষী, কিন্নর, মহাসর্প এবং মনুষ্যগণ সম্মিলিত হইলেন" এ অংশ দ্বারা দেবতা, অসুর, যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর প্রভৃতি পুরাণোক্ত জীবের অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে।

৩। "অথাচার্য্যাবলোকিতেশ্বরঃ—প্রবিশতি—যত্র স রাজা বলিরসুরেন্দ্রো বদ্ধঃ।——"

"অথ বলিরসুরেন্দ্রঃ—সাশ্রুদুর্দ্দিনবদনো গদ্গদকণ্ঠো বাষ্পপরিপূর্ণ উচ্ছ্বসন্ অবলোকিতেশ্বরং বোধিসত্ত্বং মহাসত্ত্বমেতদবোচৎ।——"

"ত্রীণি বারাণি একচ্ছত্রাং পৃথিবীং কৃতবান্। তত্র ময়া পাত্রভূতেষ্বিদং দানং দাতুমারব্ধম্। এতৎ পৌর্ব্বিকং পাপং প্রতিদেশয়ামি ক্ষত্রিয়-ভার্য্যাণাং গুর্ব্বিণীনাং যাবদ্ধৃদয়ং স্ফুটয়িত্বা কুমার-কুমারিকা জীবিতা ব্যপরোপিতাঃ। ততস্তে চ মহাক্ষত্রিয়াঃ সর্ব্বে ময়া হড়নিগড়-বন্ধনৈর্বদ্ধা নীত্বা তাম্রগুহায়ামনেকানি ক্ষত্রিয়-শতসহস্রাণি পঞ্চবন্ধনবদ্ধানি কৃত্বা স্থাপিতানি পঞ্চ-পাণ্ডব-প্রভৃতীনি তস্যামেব যক্ষ-গুহায়ামুপযমানি কীলকানি শৃঙ্খলা-সমাযুক্তানি তেষাং ক্ষত্রিয়াণাং হস্তপাদানি বদ্ধা স্থাপিতানি। তদা মে সর্ব্বদ্বারাণি জ্ঞাতীকৃতানি। প্রথমং দ্বারং কাষ্ঠময়ং, দ্বিতীয়ং দ্বারং খদিরময়ং, তৃতীয়ং দ্বারময়োময়ং, চতুর্থং দ্বারং তাম্রময়ং পঞ্চমং দ্বারং রূপ্যময়ং, ষষ্ঠং দ্বারং সুবর্ণময়ং, সপ্তমং দ্বারং রত্নময়ম্। এতানি সপ্ত দ্বারাণি। একৈকদ্বারে পঞ্চ পঞ্চ শতানি কপাটানি যন্ত্র-সমাযুক্তানি। তস্মিন্ সুবর্ণময়ে দ্বারে সপ্ত পর্ব্বতান্যুপর্য্যুপরি স্থাপিতানি; একৈকস্মিন্ দ্বারে একৈকপর্ব্বতানি উপর্য্যুপরি স্থাপিতানি। ততোঽহং পশ্চাদ্দশরথ-পুত্রমন্বেষয়ামি। ক্বচিদ্দিবসে মক্ষিকা-রূপেণ, ক্বচিদ্দিবসে ভ্রমর-রূপেণ, ক্বচিদ্দিবসে বরাহ-রূপেণ, ক্বচিদ্দিবসে মানুষরূপেণ রূপং কৃত্বা দিনে দিনে মৃগপক্ষ্যাদি নানা-জন্তু-রূপেণ। ন চ সংমুখং তং সমনুপশ্যামি। তদা মে নু বিচিন্তয়িত্বা যজ্ঞঃ প্রারব্ধঃ।

তদাত্র মে দশরথপুত্রেণাবতারপ্রেক্ষিণা গত্বা তেন দ্বারস্থাপিতাঃ সপ্তপর্ব্বতা উৎপাটিতাঃ, উৎপাটয়িত্বা লঘুনীবান্যপ্রদেশে চ্ছোরয়িত্বা

উচ্চৈঃশব্দেন তেষাং ক্ষত্রিয়াণামারোচয়তি স্ম। যুধিষ্ঠির-নকুল-সহদেব-ভীমসেনার্জ্জুন-কৌরবাদিভিঃ। অন্যে রাজানঃ শব্দমনুশ্রুতং শ্রুত্বা রসমাশ্বাস্য স্বস্থকায়া ব্যবস্থিতাঃ। স চ তানেবমাহ—জীবন্তো যুষ্মাকমথবা মৃতাঃ? তে কথয়ন্তি—জীবামো ভগবন্! তেন মহাবীর্য্যেণ পুরুষেণ সর্ব্বাণি তানি দ্বারাণি ভগ্নানি। যাবৎ তাম্রগুহায়াং পশ্যতি, সর্ব্বে তে রাজানো বন্ধন-বদ্ধা দৃষ্ট্বা চ নারায়ণং সর্ব্বে তে পরস্পরং বিচিন্তয়ন্তি। অথ বলিরসুরেন্দ্রো মৃতঃ কাল-গতঃ অথবা পুনরপি মরণকালোঽস্মাকং ভূতঃ?

অথ তে কথয়ন্তি বরমস্মাকং সংগ্রামভূমৌ মরণং ন তু বন্ধন-বদ্ধানাং মরণম্। যদা বন্ধন-বদ্ধাঃ কালং কুর্য্যাম তদা ক্ষত্রিয়ধর্ম্মমস্মাকং বিনশ্যতি। যদা সংগ্রামভূমৌ কালং কুর্য্যাম তদা স্বর্গোপগা বয়ং ভবেম।

অথ তে রাজানঃ সর্ব্বে স্বকং স্বকং গৃহং গতাঃ। তদা রথযোগ্যান্যশ্বানি স্বকস্বকানি সজ্জীকৃতানি, যদা তে রথং সজ্জীকুর্ব্বন্তি মহা-র্হাণি শস্ত্রাণি, তদা দশরথ-পুত্রেণ বামনকরূপ-মভিনির্ম্মায়, মৃগাজিনেনোত্তর্য্য বেণুদণ্ডমুপগৃহ্য, পীঠিকামুপগৃহ্য সম্প্রস্থিতো মৎসকাশম্। দ্বার-মাগতঃ দ্বারপালৈরনুবুদ্ধঃ। মা প্রবিশ বামনক! ব্রাহ্মণ ইতি।

স কথয়তি—দূরাদেবাহমাগতঃ।

অথ স দ্বারপালস্তমেতদবোচৎ—ব্রাহ্মণ! কতমস্যা ভূমেস্ত্বমাগতঃ?

স তমাহ—চন্দ্র দ্বীপাৎ রাজর্ষিমহমাগতঃ।

অথ স দ্বারপালপুরুষো গত্বা বলিমারো-চয়তি—দেব আগতস্তে বামনকো ব্রাহ্মণঃ। অথ স বলিস্তমেতদবোচৎ কীদৃশং বস্তু যাচতে?

অথ স দ্বারপালস্তমেতদবোচৎ। দেব! ন তমনুজানামি।

অথ স বলিস্তমেতদবোচৎ—গচ্ছন্তু ভবন্ত আনীয়তাং ব্রাহ্মণঃ। স তৈর্দ্বারপাল-পুরুষৈ-রাহূয়োক্তঃ। প্রবিশ মহাব্রাহ্মণ! স প্রবিষ্টঃ, রত্নপীঠমনুপ্রদত্তম্। শুক্রস্তত্রৈব ব্যবস্থিতঃ। স চ তস্যোপাধ্যায় ইতি খ্যায়তে। স তং বলিমেতদবোচৎ—এষ কাল-পুরুষোঽবপ্রবিষ্টঃ, অবশ্যং তে বিঘাতো ভবিষ্যতি। বলিস্তমেত-দবোচৎ—কথং জানাসি ভগবন্? শুক্র উবাচ—জানাম্যহং তস্য নিমিত্তানি চিহ্নানি চ দৃষ্ট্বা।

বলিরাহ—কিমুপায়ং বয়ং কুর্য্যাম? অথ নারায়ণেন বিচিন্ত্য অবশ্যং দানস্য বিপ্রতিসারঃ ভবিষ্যতি। তেন মে সরস্বতী মুখে ন্যস্তা। তদা স কথয়তি—আগচ্ছ ব্রাহ্মণ! কীদৃশ-মভিপ্রায়ো ভবতঃ? স প্রবিশ্যৈতদবোচৎ—দ্বিপদভূমী যাচয়ামি। বলিরুবাচ—যদি ত্বং ব্রাহ্মণ! দ্বিপদং যাচসে? ময়া ত্রীণি পদানি তেঽনুপ্রদত্তানি, স প্রতিগ্রহং তস্যোপগৃহ্য স্বস্তিমনুবদ্যানুগৃহীতং তেন তিলপানীয়-সুবর্ণ-সহিতম্। ততস্তেন বামনকরূপঃ স্তর্কীপিতম্।

অথ শুক্রো বলিমেতদবোচৎ রাজন্! কথিতং ময়া কালপুরুষ এষ প্রবিষ্টঃ। ন চ ত্বয়া প্রমাণং কৃতং বচনম্। তস্যৈতৎ কর্ম্মফল-মনুভব। তেনাত্মানং মহাপ্রমাণীকৃতম্। তস্য চন্দ্রাদিত্যৌ স্কন্ধৌ ব্যবস্থিতৌ। গৃহীত্বাসৌ নিগড়-চক্র-ধনু-স্তোমর-ভিন্দিপালান্‌সন্নহ্য।

অথ বলিরসুরেন্দ্রোঽধোমুখং প্রপতিতঃ, স্মৃতিভ্রষ্ট-ধরধরায়মাণঃ স্থিতঃ। কিং কৃতং অহমস্তেন ময়া বিষং ভক্ষিতম্। দ্বিপদানি পরি-পূরিতানি, তৃতীয়ং পদং ন সংবিদ্যতে। তদা স কথয়তি—তৃতীয়স্য পদং ন সংবিদ্যতে যন্মম প্রতিগ্রহং যাচিতং, কীদৃশং পাপং করোম্যহম্?

অথ নারায়ণস্তমেতদবোচৎ—যত্রাহং স্থাপ-য়ামি তত্র ত্বয়া স্থাতব্যম্।

অথ স বলিরসুরেন্দ্রস্তমেতদবোচৎ—যাদৃশং ত্বয়াজ্ঞপ্তং তাদৃশং করোম্যহম্।

সত্যং করুষে?

স কথয়তি। সত্যং সত্যং করোম্যহম্।

তেন সত্যপাশৈর্বদ্ধঃ। সা চ যজ্ঞভূমি-র্বিনাশিতা। ২য় নির্ব্বাহ ১১শ প্রকরণ।

ভাবার্থ,—

"যেখানে অসুর-রাজ বলি বন্দী হইয়া অবস্থিত ছিলেন, আর্য্য অবলোকিতেশ্বর, তথায় প্রবেশ করিলেন। শিষ্টাচারের পর, অসুরেন্দ্র বলি অশ্রুরুদ্ধ-কণ্ঠে ও দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করত বলিতে লাগিলেন, আমি তিনবার সমগ্র পৃথিবী জয় করিয়াছিলাম। প্রধান প্রধান শত সহস্র ক্ষত্রিয়গণকে, এমন কি পঞ্চ পাণ্ডব প্রভৃতি পর্য্যন্তকে পঞ্চবন্ধন-বদ্ধ করিয়া ও তাহাদের কর চরণ দত্ত-শৃঙ্খলা কালকে বাঁধিয়া তাম্র গুহাতে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলাম। মদীয় পুরীর সপ্ত দ্বার ছিল, প্রত্যেক দ্বারই শত্রুগণের মোহ-জনক। প্রথম দ্বার সামান্য কাষ্ঠময়, দ্বিতীয় দ্বার খদির-কাষ্ঠময়, তৃতীয় দ্বার লৌহময়, চতুর্থ দ্বার তাম্রময়, পঞ্চম দ্বার রজতময়, ষষ্ঠ দ্বার স্বর্ণময় এবং সপ্তম দ্বার রত্নময়। প্রত্যেক দ্বারেই পঞ্চপঞ্চাশৎ যন্ত্রযুক্ত কবাট ছিল। স্বর্ণ দ্বারে সপ্ত পর্ব্বত উপর্য্যুপরি ভাবে স্থাপিত ছিল, আর অন্য দ্বারে দুইটী করিয়া পর্ব্বত সেইরূপ ভাবে স্থাপিত ছিল। পুরীরক্ষার এই প্রকার ব্যবস্থা ছিল। সকল দিকে সুব্যবস্থা হইলে, যুদ্ধ করিবার জন্য দশরথ-নন্দন রামের * অনেক অন্বেষণ করিয়াছিলাম; এমন কি, মক্ষিকা ভ্রমরাদি বিবিধ প্রাণীর রূপ ধারণ করিয়াও অন্বেষণ করিয়াছিলাম, কিন্তু দেখা পাই নাই। তখন রাম নাই ভাবিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া গর্ভবতী ক্ষত্রিয়-কামিনীগণের গর্ভ-বিদারণ প্রভৃতি পাপ-শান্তির জন্য যজ্ঞ আরম্ভ করি। যজ্ঞের প্রধান অঙ্গ থাকে সৎপাত্রে দান। আমি যখন যজ্ঞানু-ষ্ঠানে ব্যাপৃত, তখন অবতাররূপে বিখ্যাত দশরথ-নন্দন উপস্থিত হইয়া দ্বারদেশে স্থাপিত পর্ব্বত-নিচয় উৎপাটন করিলেন এবং অতি সামান্য বস্তুর ন্যায় স্থানান্তরে ছুড়িয়া ফেলিলেন। অনন্তর তিনি উচ্চৈঃস্বরে বন্দী ক্ষত্রিয়দিগকে লক্ষ্য করিয়া শব্দ করিলেন। যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, কৌরবগণ এবং অন্য ক্ষত্রিয়গণ সেই শব্দ শুনিয়া সুস্থচিত্ত হইলেন। শ্রীরাম বলিলেন, হে ক্ষত্রিয়গণ! তোমরা জীবিত না মৃত? রাজগণ বলিলেন, হে ভগবন্! আমরা জীবিত আছি। তখন সেই মহাবীর্য্য পুরুষ সকল দ্বার ভগ্ন করিয়া তাম্রগুহায় দৃষ্টি-পাত করিলেন ও দেখিলেন, সকল রাজারাই বন্ধন-দশা প্রাপ্ত। রাজগণ নারায়ণ শ্রীরামকে দেখিয়া পরস্পর চিন্তা করিতে লাগিলেন, অসুরেন্দ্র বলি কি মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়াছে? অথবা আমাদের মৃত্যু-সময় উপস্থিত? যাহা হউক, ভালই হইয়াছে, বন্ধন-মুক্তি হইলে রণ-স্থলে মরিতে পাইব, বন্ধনাবস্থায় মৃত্যু হইলে ক্ষত্রিয় জন্ম বিনষ্ট হইবে। রণস্থলে মরিলে স্বর্গে যাইতে পারিব। অনন্তর তাঁহারা শ্রীরামের অনুগ্রহে বন্ধন মুক্ত হইয়া নিরুপদ্রবে স্ব স্ব গৃহে গমন করিলেন। গৃহে গিয়া রাজারা যুদ্ধোপযোগী রথাদির সজ্জা করিতে লাগিলেন। এদিকে দশরথ-নন্দন বামন-মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া মৃগচর্ম্ম বেণুদণ্ড প্রভৃতি ব্রহ্মচর্য্য-জ্ঞাপক চিহ্ন ধারণ-পুরঃসর আমার নিকটে আসিতে যাত্রা করিলেন। দ্বারে উপস্থিত হইলে দ্বার-পালেরা পথরোধ করিয়া বলিল, বামন! ব্রাহ্মণ! প্রবেশ করিও না।

বামন বলিলেন, আমি দূর হইতে আসিতেছি।

দ্বারপাল। কত দূর হইতে আসিতেছ?

বামন। রাজর্ষি বলির উদ্দেশে চন্দ্রদ্বীপ হইতে আসিতেছি।

* ইহার অর্থ, "যিনি রামরূপে অবতীর্ণ হন, সেই নারায়ণের" এইরূপ হইতে পারে। অথবা, বৌদ্ধ মতে শ্রীরাম নিজ মায়াবলে স্বরাজ্য এবং আপনাকে অসুররাজ বলির অগোচর করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাই উপরে ঐ প্রকার লিখিত হইয়াছে।

দ্বারপাল আমার নিকট গিয়া বলিল, দেব! এক বামন ব্রাহ্মণ আপনার উদ্দেশে আসিয়াছে।

আমি বলিলাম, কি চাহে?

দ্বারপাল। তা আমি জানি না।

আমি। যাও, সেই ব্রাহ্মণকে লইয়া আইস।

দ্বারপালেরা তাঁহাকে প্রবেশ করিতে বলিল, বামন আসিলে আমি তাঁহাকে বসিতে রত্নপীঠ দিলাম। মদীয় উপাধ্যায় শুক্রাচার্য্য তথায় ছিলেন, তিনি বলিলেন, ইনি কালপুরুষ, অবশ্যই তোমার বিঘ্ন হইবে।

আমি। ভগবন্! জানিলেন কিরূপে?

শুক্র। নিমিত্ত এবং চিহ্ন দেখিয়া জানিয়াছি।

আমি। কি উপায় করা যায়?

অনন্তর বামনরূপী নারায়ণ এই সব কথা শুনিয়া ভাবিলেন, দানের ব্যাঘাত অবশ্যই হইবে। তখন তিনি আমার মুখে সরস্বতীকে নিযুক্ত করিলেন, আমি (যন্ত্র-চালিতের ন্যায়) বলিতে লাগিলাম, এস ব্রাহ্মণ! তোমার অভিপ্রায় কি?

বামন বলিলেন, আমি দ্বিপদ-পরিমিত ভূমি প্রার্থনা করি।

আমি বলিলাম, আমি তোমাকে দ্বিপাদ কেন ত্রিপাদ ভূমি দিব।

বামন 'স্বস্তি' বলিয়া আমার নিকট তিল জল সুবর্ণ দক্ষিণা-সহ ত্রিপদ ভূমি প্রতিগ্রহ করিলেন। প্রতিগ্রহ করিয়াই তিনি বামন রূপ অন্তর্হিত করিলেন।

শুক্র বলিলেন, আমি ত বলিয়াছিলাম, কালপুরুষ এই প্রবিষ্ট হইয়াছেন, আমার কথা মান নাই, তাহার ফলভোগ কর।

বামন, স্বীয় দেহ অতি বর্দ্ধিত করিলেন, চন্দ্র সূর্য্য তাঁহার স্কন্ধদেশে থাকিল। তখন তিনি চক্রাদি অস্ত্র গ্রহণ করিয়া সজ্জিত হইলেন। তখন আমি স্মৃতিহীন ও কম্পিত-কলেবর হইয়া অধোমুখে পতিত হইলাম। ক্ষণপরেই ভাবিলাম, কি কুকর্ম্ম করিলাম, আমি স্বহস্তে বিষ ভক্ষণ করিলাম! দ্বিপদে সমগ্র রাজ্য পূর্ণ হইল, তৃতীয় পদের ভূমি ত নাই। তখন আমি তাঁহাকে স্পষ্টই বলিলাম, তৃতীয় পদের স্থান ত নাই, এ পাপে আমি করি কি? নারায়ণ (বামন) বলিলেন, আমি যেখানে তোমাকে রাখিব, সেইখানে থাকিতে হইবে।

আমি। যা আজ্ঞা হয়, তাই করিব।

নারায়ণ। সত্য করিতেছ?

আমি। সত্য সত্য করিতেছি।

আমি সত্যপাশে বদ্ধ হইলাম, যজ্ঞভূমি বিনাশিত হইল। (আমি এই স্থানে স্থাপিত হইলাম।)"

'শ্রীরাম নারায়ণের অবতার, বামনদেবও নারায়ণাবতার, বামনদেব যজ্ঞকারী অসুরেন্দ্র বলির নিকট ত্রিপাদভূমি দান প্রাপ্ত হইয়া, বিরাট্‌রূপে দ্বিপাদে বলির সমগ্র রাজ্য অধিকার করেন, অবশিষ্ট একপাদ ভূমি দানে অসামর্থ্য প্রযুক্ত বলিকে পাতালে বন্দী থাকিতে হয়। শুক্রাচার্য্য বলির পুরোহিত, তিনি বামনকে ত্রিপাদ ভূমি দান করিতে বলিকে নিষেধ করিয়াছেন, বলি তাহা শুনেন নাই।' এ বিষয়ে বৌদ্ধ ও হিন্দুর তুল্য বিশ্বাস। তবে, বৌদ্ধশাস্ত্র পঞ্চ-পাণ্ডব ও বলিরাজ্যের সমকাল-বর্ত্তিত্ব ও বামনাবতারের শ্রীরামাবতার-পরবর্ত্তিত্ব প্রভৃতি কতিপয় বিষয়ে অসমঞ্জস উক্তি আছে। তাহা থাকুক এবং এই সব প্রসঙ্গ লইয়া বুদ্ধগণের ও বৌদ্ধধর্ম্মের স্তুতিগীতি ও থাকুক, কিন্তু অনেক বিষয়ে হিন্দু ও বৌদ্ধের বিশ্বাস-সাম্য প্রমাণিত হইতেছে।

শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন।

অবসান।

"I slept, and dreamt that life
was Beauty,
I woke, and found that life
was Duty."

এ হৃদয়-মন্দিরে যে সোণার প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিয়া, সযত্নে বিস্মৃতিগর্ভে বিসর্জ্জন দিয়াছিলাম, আজি ধীরে ধীরে অতি সন্তর্পণে বিসর্জ্জিতা প্রতিমার সেই অস্ফুট স্মৃতি হৃদয়ে জাগিয়া উঠিয়াছে! এত দিনের পর কেন এমন হইল,—যাহা ভুলিয়াছিলাম, তাহা কেন মনে পড়িল, তাহাই ভাবিতেছি! এ ভাঙ্গা বুক জোড়া দিয়া, একপ্রকার নিশ্চিন্ত-ভাবে জীবনের অবশিষ্ট দিন কয়টা অতিবাহিত করিতেছিলাম; বৃন্তচ্যুত ফুল গুলি তুলিয়া, দাবদগ্ধ শুষ্কতরু সাজাইয়া রাখিয়াছিলাম; বিগ্রহশূন্য আঁধার মন্দিরে দুঃখ ও অশান্তি লইয়াও, একপ্রকার আপনাকে ভুলাইয়া রাখিয়াছিলাম;—আজি কেন তুমি দেখা দিলে? সুষুপ্ত গঙ্গা-বক্ষে কেন আজি চঞ্চল লহরী তুলিলে? এ শুষ্ক-প্রায় ব্রণমুখে কেন এ খরস্রোত শোণিত প্রবাহিত করিলে? "এ মরা গঙ্গায় কেন আজি চাঁদের আলো" দেখাইয়া দিলে?

বন্ধুগণ! তোমরা বিদায় দাও। জীবনের পশ্চাতে বড় একটা ভুল করিয়াছিলাম। বড় কষ্টে, অতি যত্নে, বহুদিনে সেই ভুল ভুলিয়াছিলাম। সন্ধ্যার ম্লান ছায়াটুকু ধীরে ধীরে যেমন অস্তমিত রবির এই শেষ লাবণ্যটুকু মুছিয়া ফেলিতেছে, তেমনি সেই ছায়া রাত্রি-দিন এ হৃদয়ের উপর ধীরে ধীরে বিস্তার লাভ করিয়া, আমার আশা উৎসাহ, সুখ শান্তি, সকলই বিলুপ্ত করিয়াছে! তবু প্রাণে বাঁচিয়া ছিলাম! তবু সংসারের এ মহাসংগ্রামে এক-প্রকার মিলিয়া-মিশিয়া ছিলাম! তবু তোমাদের আনন্দ-উল্লাসে, তোমাদের ক্রীড়া-কৌতুকে, আপনাকে মিশাইয়া, আপনার পথে কোনমতে চলিতেছিলাম! আজি এ হৃদয় বড় ভারাক্রান্ত, বড় অবসন্ন, বড় স্ফূর্ত্তি-বিহীন! এই শ্যামদূর্ব্বাদল-আবৃত সুবিস্তৃত ভূমিখণ্ডের উপর আমি শয়ন করি; যদি পার, তবে এই সুনীল আকাশ-তলে, এই শান্ত সন্ধ্যায়, এই দূর্ব্বা-শয্যায় শয়ন করিয়া ঘুমাইয়া পড়ি! তোমরা ঐ কল্পনাদিনী উচ্ছ্বসিতা স্রোতস্বতীর তটে বসিয়া, মধুর সান্ধ্য-জলকল্লোলের সহিত আনন্দ-উদ্বেলিত হৃদয়-কল্লোল মিশাইয়া বিমল-শান্তি উপভোগ করিতে থাক। অর্দ্ধ-নিদ্রা, অর্দ্ধ-জাগরণে, হয় ত তোমাদের সে মোহন সঙ্গীত আমি শুনিতে পাইব। যখন গৃহে ফিরিবে, আমায় ডাকিও!

খরস্রোত প্রবাহিণীর বুকের উপর দিয়া, নির্ম্মল চন্দ্রালোকে, যেমন তরী ভাসিয়া যায়, জীবনের অতীত ভ্রান্তির উপর সুদৃঢ় আবরণ বিস্তার করিয়া, তেমনি কেন ভাসিতে পারি না? অসীম অগাধ জলরাশি, উচ্ছ্বসিত—উদ্বেলিত—তরঙ্গায়িত, তরঙ্গে তরঙ্গে জলরাশি অবিরাম ছুটিয়াছে; তটপ্রদেশ বিধৌত করিয়া চন্দ্র-কিরণে তরঙ্গে তরঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে! তেমন জ্যোৎস্নাময় নীরব নিশীথে, তেমন চন্দ্র-কিরণোজ্জ্বল গঙ্গা-বক্ষে ভাসমান তরীর ন্যায় এ সুখ-দুঃখ-সমাকুল মানব-জীবনও যদি ভাসিতে পারিত! সংসার-সমুদ্রের তরঙ্গ-ভঙ্গে নিষ্পেষিত হইয়া, ঘোর আবর্ত্ত-মাঝে পড়িয়া যদি চূর্ণ-বিচূর্ণ না হইত! মধুর-কণ্ঠ বিহগ যেমন নির্ম্মল উষায় নির্ম্মল সঙ্গীতে কুসুম-কুঞ্জ পূর্ণ করিয়া, আকাশে উঠিতে থাকে; মধুর কণ্ঠ হইতে মধুর সঙ্গীত-ধারা প্রবাহিত হইয়া যেমন আকাশ প্লাবিত করে,—তেমনি এ প্রাণ যদি অপূর্ব্ব বীণা-ঝঙ্কারে, অপূর্ব্ব রাগিণী

তুলিয়া, শান্ত-হৃদয়ের অপূর্ব্ব সঙ্গীত গাহিতে পারিত! আকাশে ঘনমেঘ উঠিয়া, হৃদয়ের উপর মলিন ছায়াপাতে এ জীবন যদি অন্ধকারে না ঢাকিয়া ফেলিত! বীণা এমন ছিন্নতন্ত্রী হইয়া না পড়িয়া থাকিত!—তবে বুঝি এ জীবন এমন হাহাকারপূর্ণ হইত না!

রাত্রি দিন কি তুমি আমার অন্তরে দারুণ দুঃস্বপ্নের ন্যায় জাগিয়া থাকিবে? ভুলিতে কি পারিব না? তুমি কি আমার পূর্ব্ব-জীবনের অভিশাপ? এ জীবনেও কি সে অভিশাপ-মোচন হইবে না? আমার অদৃষ্টের মত, ছায়ার ন্যায়, সর্ব্বসময়ে কি আমার অনুসরণ করিবে? আমার আর রাখিয়াছ কি? দেবতা-বাঞ্ছিত এই সুন্দর সংসার, আমার পক্ষে দাবদগ্ধ অরণ্যের তুল্য হইয়াছে; এই চন্দ্রমা-শালিনী মধু-যামিনী, ঘনতামসময়ী নিবিড় নিশীথিনী হইয়াছে;—হৃদয়ে প্রীতি-প্রফুল্লতা কৈ? আনন্দে উৎসাহ, উৎসাহে প্রণয়ের পূর্ণাহুতি, সে সকল আর নাই। আশার সমাধি হইয়াছে! এ কর্ম্মক্ষেত্রে হায়! পলাতক ভীরু ও একান্ত দুর্ব্বল আমি!

তুমিই ত সকলই কাড়িয়া লইয়াছ। আমার ছিল না কি? আমার হৃদয়ে যে রত্ন আমি পাইয়াছিলাম, মনুষ্য-জীবনে তাহা নিতান্তই অমূল্য। সংসারে আমি একান্ত কাঙাল, হৃদয়ে আমি রাজা। আমার বিশ্বগ্রাসিনী জ্ঞান-তৃষ্ণা, অসীমা আশা, অদম্য উৎসাহ, প্রাণপণ পরিশ্রম, সর্ব্বজীবে প্রীতি, সর্ব্বত্র—সর্ব্ব-পদার্থে সেই বিশ্বরূপ সন্দর্শন,—হায়! হৃদয়-কানন বিবিধ কুসুমে সাজান ছিল! সে সাজান-বাগান আজ লণ্ড-ভণ্ড হইয়াছে, সে সাধা-বীণা আজ ছিন্নতার হইয়াছে, সে পূর্ণিমার চাঁদ আজি রাহুগ্রস্ত হইয়াছে!

মনুষ্য-জীবনের এই প্রহেলিকা আমি বুঝিলাম না,—একজনের উপর জীবনের এতখানি নির্ভর কেন? একজনের হাসি-মুখ দেখিলে এই বিশ্ব সমুজ্জ্বল দেখিতে পাই; সেই মুখখানি দেখিতে দেখিতে মনে হয়, সমগ্র জগতের সমগ্র সৌন্দর্য্য-সমষ্টি যেন তাহাতে প্রকাশিত! সেই রূপের মন্দিরে যে অপূর্ব্ব ক্ষুদ্র হৃদয়টুকু, তাহাতে কত না প্রেম! এ ভিখারী-প্রাণের সে প্রেমের অধিকারী হইতে কত না প্রয়াস! সে দেবতার চরণে এ আত্মবিসর্জ্জন করিতে কত না উল্লাস! সে যে ত্রিদিবের শোভা, মন্দার কুসুম; ধন্বন্তরির সঞ্জীবনী-সুধা; তাহা পাইবার জন্য জগতে এমন কি দুঃখ কষ্ট আছে, যাহা না অনায়াসে বহন করিতে পারি? তাহা পাইবার জন্য, জগতে এমন কি অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা আছে, যাহা না প্রফুল্ল অন্তরে বিসর্জ্জন করিতে পারি? তাহা পাইবার জন্য, জগতে এমন কি স্নেহ-বন্ধন আছে, যাহা না ছিন্ন করিতে পারি?

আশা উন্মাদিনী! নহিলে তোমায় পাইবার জন্য ছুটিব কেন? তোমারই জন্য এ হৃদয় তৃষিত, প্রাণ ব্যাকুলিত, এ দুর্লভ মনুষ্য-জীবনও বিড়ম্বিত!

নির্ম্মল সরোবরে পরিপূর্ণ শতদল তুমি ফুটিয়াছিলে। লাবণ্যে মাধুর্য্যে সৌরভে দিক্ আলো, তটপ্রান্তে দাঁড়াইয়া তোমার সৌরভে মাধুর্য্যে লাবণ্যে আমি আত্ম-হারা! নিমেষের মধ্যে হৃদয়ের একটা আবরণ সহসা কে তুলিয়া লইল। সহসা কিসের অভাব বুঝিলাম!

বুঝিলাম, তুমিই এ হৃদয়ে একটা তরঙ্গ তুলিয়াছ। তোমায় কি পাইব না? এ বিশ্ব-সংসার বুকে করিলেও তবু স্থান অপূর্ণ থাকে; তোমার চিন্তাতে কিন্তু বুক ভরিয়া উঠে, আর এতটুকু স্থান অপূর্ণ থাকে না। এই যে হৃদয়—এই ক্ষুদ্র দেহ-পিঞ্জরে এই যে সুগভীর রহস্যময় হৃদয়, মুহূর্ত্তে এ হৃদয় অনন্ত এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পর্য্যটনে সমর্থ! এই হৃদয় আজি তোমারই

আসন! আমার বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তোমাতেই নিমগ্ন হইয়াছে! তবে এস তুমি! আমার স্বর্গ, মর্ত্ত্য, ইহলোক, পরলোক, সুখ-শান্তি সকলই তোমাতে নিমজ্জিত হউক! এ হৃদয় আমি তোমার চরণ-তলে রাখিয়া, তোমার উপাসক হই! তুমি এ কাতর জনের, এ তৃষিত হৃদয়ের প্রতি ফিরিয়া না চাও—চাহিও না; ঐ হাসি-মুখখানিতে কেবল সকরুণ আঁখি দু'টী আমার পানে ফিরাইয়া রাখ; এ জীবন যৌবন তোমায় দিয়া আমি কৃতার্থ হই! যে কিছু কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়া, এ মনুষ্য-জন্ম সার্থক করিব, সে কীর্ত্তি-কুসুমে মুকুট গাঁথিয়া তোমারই চরণ-তলে রাখিব!—তার পর দেবি! যদি সে সাধ হয়, সে মুকুট ঐ অরুণ-উদয়-শিখরে স্থান দিও, নহিলে কনক-চরণপর্শে তাহা পবিত্র করিও! তাহাতেই আমার সুখ!

এই বাসনা পূর্ণ করিতেও যদি না চাও, তবে তুমি চলিয়া যাও! পার, নিবিড় মেঘের ঘন কালিমা ঢালিয়া আমার সকল দিক্ অন্ধকার করিয়া চলিয়া যাও! তবু তোমায় ভাবিব! যে নয়নে তোমায় দেখিয়াছি, সে নয়ন আমার এ দেহে নাই! পার, শাণিত কৃপাণে এ চক্ষু চির-অন্ধ করিয়া দাও! অন্তরের অন্তরে তোমায় দেখিয়াছি, তোমার মূর্ত্তি এ হৃদয় ভরিয়া গিয়াছে! আমি তোমারই মূর্ত্তি লইয়া, মূর্ত্তির উপাসনা করিব। পার, এ নিখিল ভুবন তিমিরাবৃত করিয়া দাও, তোমারই মূর্ত্তি তবু আমার অন্তরে চির-সমুজ্জ্বল রহিবে!

তোমার ভালবাসা পাইয়া ধন্য হইলাম। তুমি হয়ত সহস্র প্রকারে আপনাকে বুঝাইতে পার; তোমার আশা, আকাঙ্ক্ষা, বাসনা,—সকলই তুমি সাজাইয়া-গুছাইয়া বলিতে পার, কিন্তু আমি নির্ব্বাপিত! বুঝিতে বা বুঝাইতে আমার সাহস নাই, বল নাই, ভাষা নাই! এস তবে এই কোলাহলময়ী পৃথিবীর বুকে দুই জনে হাতে হাত রাখিয়া, নয়নে নয়নে এ চির-তৃষ্ণাতুর আঁখি রাখিয়া চাহিয়া থাকি!

এই যে স্পর্শ,—ইহার সমতুল্য এ জগতে কি আছে? পারিজাত, ইন্দ্রের প্রমোদ-কানন শোভা করে, পারিজাতস্পর্শে এমন কি মোহ আছে? বেলা-মল্লিকা, গোলাপ, সকলের স্পর্শ হইতেও এই স্পর্শ অতি কোমল, অতি মধুর, অতি স্নিগ্ধ! এই কঠিন মর্ত্ত্যে কঠিন সংগ্রামে ক্ষত বিক্ষত-দেহে যখন ফিরিব, এই সুধা স্পর্শে সে তাপিত দেহ আবার শীতল করিও!

আর এই যে সমুদ্র-মন্থনের অপূর্ব্ব রত্ন! পৃথিবীর ভাষায় এমন কি শব্দ আছে যে, সে কথা প্রকাশ করিতে পারি! শত সহস্র তান-লয়বদ্ধ সঙ্গীতবৎ বচন-পরম্পরায় হৃদয়ের একটী কথার অতি অল্পতম অংশও বুঝান যায় না, কিন্তু একটুকু চুম্বনে সমগ্র হৃদয় প্রকাশিত! কে বলে মদিরা সর্ব্বশরীরে উন্মত্ততা আনিয়া দেয়? এমন সঞ্জীবনী-সুধা এ মর-জগতে আর কোথায় মিলে? দুটী প্রাণের একান্ত অভিলাষ মূর্ত্তিমান্ হইয়া "অধর-সঙ্গমে" আসিয়া মিশিতেছে! সেই ক্ষণিক মিলনে উভয়ের কি ভাবের অভিনয়! সেই মুহূর্ত্তের মধ্যে কি আত্ম-বিনিময়!

স্বপ্নেও এত আশা ছিল না। এত ফুল, এত গন্ধ, এত আলো, এত শোভা, সকলই অজানিত! তুমিই সকলই জানাইয়া দিলে, এ নিদ্রিত হৃদয়ে তুমিই এ সীমা-হীন ভালবাসা জাগাইয়া তুলিলে!

তবে তুমি দাঁড়াও—আমি নয়ন ভরিয়া, নয়নের এ তৃষ্ণা দূর করি! দিন দিন করিয়া কত বর্ষ চলিয়া গেল, আজিও তোমায় দেখিয়া উঠিতে পারিলাম না। বুঝি বিধাতা সে সামর্থ্যও দেন নাই! তাহাতেই তাঁহার আনন্দ! নহিলে নয়ন ভরিয়া দেখিবার সাধ দিয়া, নয়নকে চির-অতৃপ্ত সৃজন করিলেন কেন?

তাই ভাবি, তুমি মূর্ত্তিমতী কেন হইলে! দেবতার ন্যায় ভক্ত-হৃদয়ে কেবল আরাধ্যা হইলে না কেন? তাহা হইলে, এ বাসনা-পঙ্কিল-অতৃপ্ত-নয়নে তোমায় চিরদিন দেখিতে চাহিতাম না!

চিরদিন! হায় সে স্বপ্ন ভাঙ্গিয়াছে!

কি শান্ত সন্ধ্যা! বন্ধুগণ কি প্রফুল্ল অন্তরে, কি সুমধুর সঙ্গীতে এই সন্ধ্যার সুরে সুর মিলাইয়াছে! আমি দূর্ব্বা-শয্যায় পড়িয়া অতীত কাহিনী স্মৃতিমাঝে জাগাইয়া, জলিয়া মরিতেছি! বন্ধুগণ! আমার জীবনের এই পরিচ্ছেদ শুনিয়া তোমরা কেহ দুঃখিত হও, কেহ উপহাস কর। আমি জানি, জীবনের এই কঠিন সমস্যায় পড়িয়া, আমার সকলই গিয়াছে! বেলা না ফুরাইতে আমার খেলা সাঙ্গ হইয়াছে! ভরা বাজারে আমার এ দোকান-পাট গুটাইতে হইয়াছে!

ভালবাসা কি পাপ? আমি এইমাত্র জানি, ধর্ম্ম ভিন্ন প্রেম জন্মিতে পারে না। চিত্ত নির্ম্মল না হইলে ধর্ম্মও তিষ্ঠিতে পারে না। নির্ম্মল-চিত্তে, কাহাকেও ভালবাসিয়া,তাহার সৌন্দর্য্যের উপাসক হওয়া, আমি পাপ বোধ করি না। রূপের মোহ বলিতে হয় বল, কিন্তু রূপে মুগ্ধ নয় কে? রূপে মুগ্ধ হওয়ার নামই যে একটা লালসা, সে কথা মিথ্যা।

প্রেমই এই বিশ্বের মেরুদণ্ড। হৃদয় যে হৃদয়ান্তরে মিশিতে চাহে—তাহার মূলে প্রেম। প্রেম-ডোরেই স্বর্গ-মর্ত্ত্য একাকার! প্রেমের আকর্ষণেই পরস্পর পরস্পরকে ক্রোড়ে টানিতেছে! এ সংসারে প্রেমেরই জয়!

আর রূপ! আমি তোমায় চিনিলাম না। আশৈশব আমি রূপের ভিখারী, রূপের উপাসক। রূপের জন্য আমি দেখিতে পাই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড পাগল। রূপের চন্দ্র গগনে উঠিয়া স্নিগ্ধ-কিরণে ত্রিভুবন জুড়াইতেছে; মানবের চিত্তচকোর তৃষিত হৃদয়ে ঊর্দ্ধে ছুটিয়াছে, রূপ-সুধা-পানে বিভোর হইয়া, জ্যোৎস্না-আবরণ ভেদ করিয়া, রূপের পূর্ণমূর্ত্তি দেখিতে ব্যাকুল! এ সাধ কি কখন মিটিবে?

এ মর-জগতে, নিমেষের জন্য এক একটী শুভক্ষণ দেখা যায়। সেই শুভক্ষণে একটানা জীবন-স্রোতে কি একটা তুমুল-তুফান বহিয়া যায়। কখন বা কি অপূর্ব্ব সৌরভে এ হৃদয় বড় মধুময় করিয়া দেয়!

এ জীবনে তেমনি মুহূর্ত্ত একবার পাইয়াছিলাম। সহসা যেন যুগান্তর হইয়া গেল! এ নয়ন-যুগলে কি অপূর্ব্ব আবরণ পড়িল, যাহা দেখিলাম, তাহাই ভাল লাগিল। হৃদয়ে একটা আনন্দের উৎস ফুটিয়া উঠিল। তেমনি অবস্থায় সম্মুখে দেখিলাম—তুমি! রূপের কাঙ্গাল আমি, চির-ক্ষুধাতুর এ নয়ন মেলিয়া তোমার পানে চাহিলাম! মনে হইল, আমার হৃদয়ের চির-অভীপ্সিত রূপের কল্পনা, মূর্ত্তিমতী হইয়া, তোমারই আকারে আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে! প্রেম-অঞ্জলি লইয়া, তোমারই চরণে উৎসর্গ করিলাম!

তখন বুঝি নাই, এ জগতে সব প্রেম—প্রেম নহে। তখন বুঝি নাই, তেমন রূপের মন্দিরে পিশাচের অধিষ্ঠান হইতে পারে তখন বিশ্বাস করি নাই, বুকের ভিতর প্রতারণা লইয়া আসিয়াছিলে!

আজ তুমি পশ্চাৎ ফিরিয়াছ। শত আহ্বানেও আজ তোমার একটী কথা শুনিতে পাই না। ভুল করিয়াই কি আসিয়াছিলে? ভুল করিয়াই কি ভালবাসিয়াছিলে? কি নিদারুণ ভুল! মনুষ্যের জীবন কি বালক-বালিকার ক্রীড়া-পুত্তলি? প্রাণ লইয়া কৌতুক! একবার ফিরিয়া চাহিয়া দেখ, এ জীবন কি প্রচণ্ড মরু-ভূমি করিয়া দিয়াছ!

চলিয়া যাইবে যাও। এ হৃদয় হইতে

তোমার স্মৃতি মুছিয়া দাও। খণ্ড খণ্ড করিয়া তোমার মূর্ত্তি তুমিই এ হৃদয় হইতে কাটিয়া লও; নচেৎ এ চির-সমুজ্জ্বল চিত্রপটে নিবিড় কালিমা ঢালিয়া দাও! রাক্ষসী তুমি, হৃদয়-হীনা তুমি, কেন আমার সর্ব্বনাশ করিলে?

ধীরে ধীরে ধীরে! রাজি জ্যোৎস্নাময়ী! চারিদিকে শান্তি বিরাজিত! এ অশান্ত হৃদয়-কল্লোলে, যামিনীর এ স্নিগ্ধ শান্তিটুকু নষ্ট করিব না।

আমি আজিও তোমার সুখের প্রার্থী। আজিও তোমার মঙ্গল প্রার্থনা করি। তুমি ভালবাসিতে, আমি আজিও তাহা বিশ্বাস করি। সেই প্রথম প্রণয়, প্রণয়ের সেই উন্মাদ-আবেগ, সেই বিশৃঙ্খল উচ্ছ্বাস, প্রাণের সেই পবিত্র বাসনা, নগ্ন-হৃদয়ের সেই শতসহস্র আকাঙ্ক্ষা—সে সকলই সত্য ও পবিত্র। কেন প্রেমময়ি! তোমায় আমায় এক হইয়া, এক-বৃন্তে দুইটী কুসুমের ন্যায় এ সংসার-উদ্যানে ফুটিতে পাইলাম না? এ জীবন তেমন মধুময় হইয়া, কেন এ হাহাকারে পূর্ণ হইল?

আমি বুঝিতে পারি না, তুমি হৃদয়ে কি বাসনা লইয়া আসিয়া, আমার এ হৃদয়ে তাহা পাইলে না! তুমি কি মনে করিয়াছ, পুরুষের হৃদয় এতই ক্ষুদ্র—এতই সীমাবদ্ধ যে, দুই দিনে তাহার আদি-অন্ত সকলই বুঝিতে পারা যায়? তুমি কি মনে করিয়াছ, আমি আপনা হইতে তোমার শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া, তোমারই বন্দী হইয়াছি, আমায় লইয়া তুমি এখন বাসনামত যে কোন খেলা খেলিতে পার? তাহা মনে করিও না। এ হৃদয়েও মহা-অগ্নি জ্বলিতেছে! এই অগ্নি প্রেমের আকারে, কুসুমহারের ন্যায় তোমার কণ্ঠে পরাইয়াছিলাম! তুমি ত তাহা বুঝ নাই!

কিন্তু তোমার ভাগ্যে সুখ মিলিবে না। সংসারে কি স্বর্গে—যত-সুখ, যত-সুধা, যত-তৃপ্তি থাকুক,—তুমি সকলের অধিকারী হইয়াও কিছুতেই সুখী হইতে পারিবে না। আমি অভিশাপ দিতেছি না। সুখের ধারণা তোমার অন্যরূপ।

কিন্তু সে সকল কথায় আর কাজ নাই! সে অতীত দিনের উপর যবনিকাপাত কর।

এখন আমি করিব কি? এ ভগ্ন হৃদয় সংসারের কোন্ কাজে লাগাইতে পারিব?

তাই ভাবিতেছিলাম, সংসারে এই এক অপূর্ব্ব প্রহেলিকা,—এক জনের উপর কতখানি নির্ভর! যে গেল, কেবল সেই গেল না, সঙ্গে সঙ্গে এ হৃদয়টা চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিয়া গেল! নহিলে বসুরত্ন-পরিপূর্ণা এ সোণার পৃথিবী খানি আমার চক্ষে কাঙ্গালিনীর ন্যায় প্রতীয়মান কেন হইবে? এ লক্ষ্মীর ভাণ্ডার কেন আজি শূন্য হইবে?

কি নির্ব্বোধ আমি! এইরূপ কাতর-বিলাস, করুণ-উচ্ছ্বাস, নিষ্ফল মর্ম্ম-কাতরতা লইয়া জীবনটা একেবারে ধ্বংস করিব? তাহা হইবে না। ভাল বাসিয়াছিলাম, আর ভাল বাসিতে পাইব না, আপনার বলিবার অধিকার আর পাইব না,—কিন্তু তাই বলিয়া কি এ হৃদয় জীয়ন্তে সমাধি করিব? তাহা হইবে না।

তবু বলি, ভুলিয়া যাওয়া বড় কঠিন! কেন প্রাণাধিকে, আজি তোমায় ভুলিতে হইবে?

"কি জানি কি ঘুম-ঘোরে,
কি চোখে দেখেছি তোরে,
এ জনমে বুঝি ওরে ভুলিব না আর!
তবুও ভুলিতে হ'বে,
কি ল'য়ে পরাণ র'বে,
কাঁদিয়া চাঁদের পানে চাহি বারে বার!"

আমার বন্ধুগণ আমার এ প্রেমের কাহিনী শুনিয়া উপহাস করেন, দুর্ব্বলতা বলিয়া উপেক্ষা করেন! হায় ভাই, প্রাণ ভরিয়া ভাল বাসিয়া, যে দেবী প্রতিমা হৃদয়-মন্দিরে স্থান দিয়াছি;

এ হৃদয় উৎপাটিত, মন্দির চূর্ণীকৃত না হইলে সে প্রতিমা কি ভুলিবার? স্বহস্তে নিজ বক্ষে শাণিত-কৃপাণ বিদ্ধ করিয়া, বুকের হাড় বাহির করা কি অতি সহজ?

হায় তবু ভুলিতে হইবে! ভুলিতে কি পারিব না?

"কে বলে যায় না ভোলা! মরণের দ্বার খোলা,
সকলেরি আছে সমাপন,
নিবে যায় দাবানল, শুকায় সমুদ্র-জল,
থেমে যায় ঝটিকার রণ।"

তবে কি মরিলেই এ জ্বালা জুড়াইবে?

তুমি অনন্ত সৌন্দর্য্যময়ী প্রাণময়ী প্রকৃতি! তোমার এই নির্দ্দয় ব্যবহার প্রাণে বড় আঘাত দিয়াছে! যখন নিতান্ত দুঃখ ও অশান্তির অনলে এ হৃদয় দাহন হইতেছে, তুমি অনায়াসে আপন গৌরবে হাস্যময়ী হইয়া, বিরাজ করিতেছ! কে বলে তোমার প্রাণ আছে? যদি তোমার এ জড়দেহে প্রাণ থাকিত, তবে ঐ অনতিদূরে অত্যুচ্চ প্রাসাদের শেষ প্রকোষ্ঠে বসিয়া যে রাক্ষসী মায়া-সঙ্গীতে পার্শ্বস্থিত ব্যক্তির হৃদয় মোহিত করিতেছে,—উহারও হৃদয় থাকিত!

ঐ প্রাসাদ আমি স্বর্গ বলিয়া জানিতাম। তোমাকে স্বর্গের দেবী বলিয়া বুঝিতাম। মনে করিতাম,—

"জীবনের চিরকীর্ত্তি করিয়া অর্জ্জন
তোমারে করিব তার অধিষ্ঠাত্রী দেবী!"

কিন্তু তোমার পিতার আদেশে তুমি সকল দিয়াও আবার কাড়িয়া লইলে! একবারও ফিরিয়া চাহিলে না, একবারও ভাবিলে না, এ হতভাগ্যের কি দুর্দ্দশা করিলে; একবারও দেখিলে না; যাহা লইয়া গেলে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে এ হৃদয়-মূলও শিথিল করিয়া দিয়া গেলে! প্রেম পদদলিত হইল, অন্যের শাসনে সাগরাভিমুখী নদীর স্রোত পর্ব্বত-গহ্বরে ফিরিয়া গেল!

কে বলে রমণী ভাল বাসিতে পারে? ভালবাসা তাহারা ক্রীড়া মনে করে। বালক-বালিকা খেলাঘরে বসিয়া পুত্তলিকা লইয়া যেমন কখন আদর করে, কখন সোহাগভরে তাহার মুখ-চুম্বন করে, আবার তখনি যেমন এক আছাড় দিয়া পুত্তলিকার মাটীর দেহ মাটীতে মিলাইয়া দেয়, রমণীও তেমনি প্রাণ লইয়া খেলা করে। কতটুকু তাহাদের হৃদয়? কতটুকু প্রেমের ধারণা করিতে তাহারা সক্ষম! পুরুষের এ বিশাল হৃদয়ে কি মহা-প্রেম জাগিতেছে, রমণীর সংকীর্ণ বুদ্ধি তাহার ধারণা করিবে—ইহাও কি সম্ভব?

কতবার জ্যোৎস্নাময় নিশীথে ঐ প্রাসাদতলে দাঁড়াইয়া প্রেমোন্মত্ত রোমিওর ন্যায় মনে মনে ভাবিয়াছি,—

"This is the East and you are the Sun!"

মনে মনে ভাবিয়াছি, প্রাণে যতখানি সাধ, যদি ততটুকু সাধ্য থাকিত! তবে বুঝি তোমায় পাইতাম! তোমায় পাইলে হয়ত এ জগৎ অন্যরূপ হইত!

যদি প্রভূত ধনের অধিকারী হইতাম! তবে বুঝি অর্থের আকর্ষণে পড়িয়াও তোমার বরমাল্য এ কণ্ঠে অর্পিত হইত! সকল দিক্ অর্থের অর্গলে আবদ্ধ;—অর্থে হৃদয়ের বিনিময় চলিতেছে, অর্থে ক্ষুব্ধ হৃদয় শান্ত হইতেছে, অর্থে চরিত্রের পবিত্রতা রক্ষিত হইতেছে, অর্থের জন্য লোকে লোকে বড় ভিড়, বড় ঠেশা ঠেশি! এ দুর্দ্দিনে কোথায় যাইব! *

বন্ধুদিগের কণ্ঠনিঃসৃত কি সুমধুর সঙ্গীত

* "Every door is barr'd with gold, and opens but to golden keys:
* * * *
But the jingling of the guineas helps the hurt that Honour feels,
And the nations do but murmur, snarling at each other's heels."
——Locksley Hall.

উঠিতেছে! তাহাদের হৃদয়, মেঘশূন্য এই নির্ম্মল আকাশের ন্যায়, কেমন শান্ত ও নির্ম্মল! কি অনিন্দিত গর্ব্বভরে উন্নতি-প্রাসাদে তাহারা পদক্ষেপ করিতেছে! কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নাই, অবিরাম উন্নতির পথে ধাবিত হইতেছে! সৃষ্টি-রহস্যে নিমগ্ন হইয়া, কেহ জগতের বুকের নিভৃত কথাগুলি বাহির করিতেছে; কেহ সৃষ্টির মুখের আবরণ খুলিয়া, তন্ন-তন্ন করিয়া জগৎ-সৌন্দর্য্য-বিশ্লেষণে নিযুক্ত; কেহ তেজস্বিনী উদ্দীপনায় জগৎ কম্পিত করিতেছে; কেহ লোক-হিতব্রতে জীবন উৎসর্গ করিতেছে; কেহ ধর্ম্মের অনুশীলনে ত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখাইতেছে;—সর্ব্বত্রই কর্ম্ম। যেখানে চিন্তা, সেখানে কেবল চিন্তা নাই, চিন্তার সহিত কর্ম্মও জড়িত রহিয়াছে; সর্ব্বত্রই একটা জীবন্ত জাগ্রৎ-জীবনের পরিচয়!

অন্য উপাদানে কেবল কি এই হতভাগ্য-জীবন গঠিত হইয়াছে? ঐ আকাশের পশ্চিম প্রান্তে ঘন কাল মেঘ উঠিয়াছে; ঐ ঘনমেঘে এখনই চারিদিক্ বিস্তৃত হইবে। হে দেবতা! ঐ মেঘের বুকে কি বজ্র নাই? নিদারুণ বজ্র এই বুকের উপর চাপাইয়া দাও, আমি মহা-শান্তি অনুভব করি!

শান্তি! আমার আর আছে কি? সুখ বল, স্বাস্থ্য বল, আশা বল, উৎসাহ বল, কিছুই নাই। প্রেম-শূন্য, শান্তি-শূন্য, যশোহীন, গুণহীন—আমি কি বল? চারিদিকে চাহিয়া দেখি, সকলেরি সকল আছে, আমার কিছুই নাই! সবাই হাসে, আমি কাঁদি; সবাই বলে জীবন সুখের, আমি বলি জীবন দুঃখের; সবাই সুখে বাঁচিতে চাহে, আমি দুঃখে মরিতে চাহি; কি জানি কি ভিন্ন উপাদানে এ জীবন গঠিত হইয়াছে! *

* "Alas! I have nor hope nor health,
Nor peace within nor calm around;
Nor that content, surpassing wealth,
The sa[illegible]in meditation found,
And walked with inward glory crowned
Nor fame nor power nor love nor leisure.
Others I see whom these surround—
Smiling they live, and call life pleasure;—
To me that cup has been dealt in another measure."
—Shelley.

কিন্তু এমন নিষ্ফল জীবন-ভার বড় বিড়ম্বনা! তবে যাই, কর্ম্ম-ক্ষেত্রে ছুটিয়া যাই! কর্ম্মের মধ্যে আত্ম-বিসর্জ্জন করিয়া, সকল জ্বালা জুড়াই! কর্ম্ম ভিন্ন সুখের সম্ভাবনা নাই! সর্ব্বত্যাগী না হইলে, কর্ম্মে সুখ নাই! কর্ম্মে ফলাসক্তি না থাকাই ত্যাগ, আসক্তি-বিসর্জ্জনের নামই ত্যাগ।

ঐ প্রাসাদের নিকট আর আসিব না! আর এ অলস-চিন্তা লইয়া, আপনার সর্ব্বনাশ করিব না। তুমি ভাল থাক, সুখী হও, কায়-মনোবাক্যে সেই আশীর্ব্বাদ করি। আমি নিজেই অশান্তি, তোমার সুখের পথে এ অশান্তির ছায়া আর কখন পড়িবে না। কিন্তু যদি জন্মান্তর থাকে?—জন্মান্তরে আমার অবিশ্বাস নাই। জন্মান্তরেও কি তোমায় পাইব না! জীবন অনন্ত, কালও অনন্ত; ঘূর্ণায়মান কালচক্রে ঘুরিতে ঘুরিতে কোন জীবনে, কোন মুহূর্ত্তে কি তোমায় পাইব না?

আবার কেন? হৃদয়-বিদ্ধ কণ্টক উৎপাটিত করিতে বসিয়া, আবার এ অভিলাষ কেন? এতটুকুও তোমার ছায়া রাখিব না। যদি যথার্থই তোমায় ভালবাসিয়া থাকি, যথার্থই আজি তোমায় ভুলিব।

বাল্যে অনেক সুখের কল্পনা করিতাম। শৈশবের ক্রীড়া-ভূমি হইতে সুদূর ভবিষ্যতের রঙ্গভূমির অনেক ছায়া কল্পনা করিয়া লইতাম। এই সময় আসিয়াছে। সেই কল্পনারাশি আজি হইতেই প্রত্যক্ষ করিব। ধীরে ধীরে ধীরে এই জগৎ উন্নতির উচ্চশিখরে উঠিতেছে,

সঙ্গে সঙ্গে মানবের আত্মাও অবিরাম ছুটিয়াছে। লোকের পর লোকের উচ্ছেদ হইতেছে, কিন্তু জগৎ অবিরাম ছুটিয়াছে। জগতের ধ্বংস নাই। অপ্রতিহত-গতি, অবিনাশী জগতের এই ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানবের মহা-আকাঙ্ক্ষা চলিয়া আসিতেছে, জ্ঞানের ক্রমবিকাশ হইতেছে; * অনন্ত অসীম জ্ঞানে, একদিন অসীম সৃষ্টির অন্তরাল, নরচক্ষে উদ্ঘাটিত হইবে!

জীবন-মধ্যাহ্নে একটা ঝটিকা উঠিয়াছিল। সে ঝটিকা আজি প্রশমিত। প্রভাতের সেই শুভ্র-সুনীল আকাশ, সেই নূতন রবি, বিহগ-সঙ্গীতে সেই সংযত সুর-তান-লয়-সম্বন্ধ উন্মত্ততা,—সে সকল আজি অতীতে মিশাইলেও মানসচক্ষে সমুজ্জ্বল! সেই অতীতে আর এই বর্ত্তমানে মিশাইয়া, মাঝখানের একটা ভ্রান্তি ভুলিয়া যাই।

বন্ধুগণ! এস গৃহে ফিরি। ঘনমেঘে আকাশ ছাইয়াছে। কে জানে কি তুমুল ঝটিকা উঠিবে! কে জানে ঐ মেঘের বুকে কি বজ্র লুকাইয়া আছে! ঝটিকা উঠুক, বৃক্ষবল্লরী সমেত ঐ প্রাসাদ ভূমিসাৎ হউক, বজ্রনিপাতে প্রাসাদ খণ্ড খণ্ড হউক, উহারই সহিত সকল স্মৃতির অবসান হউক!

নিদ্রায় জীবনের সৌন্দর্য্য-স্বপ্ন দেখিয়াছি। জাগরণে জীবনের কঠোর কর্ত্তব্য ব্রত বুঝিতেছি। স্বপ্নের অবসান হউক, কর্ত্তব্য-ব্রতে আত্মোৎসর্গ করি।

এ উন্মত্ত উচ্ছৃঙ্খল প্রলাপের অবসান হউক, কর্ম্ম-ক্ষেত্রে জীবনের প্রকৃত আস্বাদ অনুভব করি।

শ্রীবিপিনবিহারী রক্ষিত।

* Yet I doubt not thro' the ages one increasing purpose runs,
And the thooughts of men are widen'd with the process of the suns."
—Tennyson.

অনুবাদে প্রতিবাদ।

কোন একখানি ক্ষুদ্র পত্রিকায়, পণ্ডিত-প্রবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের কৃত সংহিতানুবাদের বা উক্ত তর্করত্ন-কর্ত্তৃক অনুবাদিত সংহিতার বঙ্গানুবাদের দোষ প্রদর্শিত হইতেছে। প্রথমতঃ মনে করিয়াছিলাম, সাধারণের ভ্রমাপনোদনের জন্য তর্করত্ন মহাশয় প্রদর্শিত দোষের প্রতিবাদ করিবেন; কিন্তু তিনি তাহা করিলেন না। বোধ করি, তিনি ভাবিয়াছেন, "দর্দ্দুরা যত্র বক্তারস্তত্র মৌনং হি শোভনম্"। কিন্তু এখন কাল অন্যরূপ, প্রকৃত পাণ্ডিত্য দেশ হইতে ধীরে ধীরে চলিয়া যাইতেছে। সংস্কৃত শাস্ত্র সম্বন্ধে "পরপ্রত্যয়নীয়বুদ্ধি" লোকের সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে। এ সময়ে কোন্ অর্থে দোষ আছে এবং কোন্ অর্থে দোষ নাই, তাহা বুঝিবার সামর্থ্য অনেকেরই নাই, অথচ পাণ্ডিত্যাভিমান আছে। সেই পণ্ডিতাভিমানী অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের অজ্ঞান-বিজৃম্ভিত ব্যাখ্যায় পাছে সাধারণে ভ্রান্ত হয়, এই শঙ্কায় অগত্যা আমরাই প্রকৃত কথা বলিতে আরম্ভ করিলাম। আমি ঠিক বলিতেছি কিনা, তর্করত্ন মহাশয় যেন একবার তাহা বিবেচনা করেন। প্রথম দেখিতে হইবে, অনুবাদ কাহাকে বলে; এ সম্বন্ধে নৈয়ায়িকগুরু রঘুনাথ শিরোমণি-(কাণা ভট্ট শিরোমণি)-সম্মত এবং তদীয় গ্রন্থের প্রসিদ্ধ টীকাকার জগদীশ তর্কালঙ্কার মহাশয়ের লিখিত লক্ষণ এই;—

"প্রাগভিপ্রেতস্যার্থস্য শব্দান্তরেণাভিধানমনুবাদঃ।"

অর্থাৎ (আপনার বা অপরের) পূর্ব্বাভিপ্রেত অর্থের অন্য শব্দ দ্বারা প্রকাশ অনুবাদপদবাচ্য। এই অনুবাদ-লক্ষণের উপর সকলকে লক্ষ্য রাখিতে অনুরোধ করি।

অনুবাদের দ্বিতীয় লক্ষণ,—

"প্রাগুক্তস্যার্থস্য শব্দান্তরেণাভিধানমনুবাদঃ।"

অর্থাৎ পূর্ব্বকথিত বিষয়ের অন্য শব্দ দ্বারা যে প্রকাশ, তাহা অনুবাদ।

১। দানমধ্যয়নং বাপি যজনঞ্চেতি বৈ বিশঃ।
শূদ্রস্য বার্ত্তা শুশ্রূষা দ্বিজানাং কারুকর্ম্ম চ॥

অত্রিসংহিতা ১ পৃষ্ঠা।

চতুর্ব্বর্ণের ধর্ম্ম এবং জীবিকা-নির্দ্দেশ-প্রসঙ্গে এই বচনটী লিখিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের বিষয় পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে; এই বচনে বৈশ্য ও শূদ্রের বিষয় কীর্ত্তিত হইতেছে। এ বচনের আপাততঃ প্রতীয়মান অর্থ—দান, অধ্যয়ন এবং যজন বৈশ্যের, আর শূদ্রের বৃত্তি দ্বিজশুশ্রূষা এবং কারুকর্ম্ম। এরূপ অর্থে ন্যূনতা হয়। বৈশ্যের বৃত্তি-নির্দ্দেশ থাকে না এবং শূদ্রের ধর্ম্মনির্দ্দেশ থাকে না।

"দানমধ্যয়নং বাপি যজনঞ্চেতি বৈ বিশঃ।
বাণিজ্যং পাশুপাল্যঞ্চ কৃষিশ্চৈবোপজীবিকা।
শূদ্রস্য বার্ত্তা শুশ্রূষা দ্বিজানাং কারুকর্ম্ম চ॥"

এই পাঠ কল্পিত না হইলেও, ইহার আপাততঃ প্রতীয়মান অর্থ—দান, অধ্যয়ন, যজন বৈশ্যের (ধর্ম্ম?), বাণিজ্য, পশুপালন এবং কৃষি (বৈশ্যের) উপ-জীবিকা। শূদ্রের বৃত্তি দ্বিজ-শুশ্রূষা এবং কারুকর্ম্ম। এ অর্থেও শূদ্রের ধর্ম্ম-নির্দ্দেশ না থাকায় ন্যূনতা থাকে। অতএব শেষোক্ত পাঠেও বার্ত্তা শব্দের যোজনা "দ্বিজানাং শুশ্রূষা" এই অংশের পরে করিতে হয়। তাহা হইলে দ্বিজশুশ্রূষা শূদ্রের ধর্ম্ম এবং কারুকর্ম্ম শূদ্রের বৃত্তি, এইরূপ অর্থ হইতে পারে। সুতরাং বার্ত্তা-পদকে স্থানচ্যুত করিতেই হইবে। এখন দেখা যাক—'শুশ্রূষা দ্বিজানাং' এই দুই পদের পর বার্ত্তা-পদকে না বসাইয়া "শূদ্রস্য" এই পদের পূর্ব্বে বসাইলে তর্করত্ন মহাশয়ের প্রদর্শিত পাঠের অর্থ তর্করত্ন মহাশয়ের অনুবাদে প্রকাশ পাইয়াছে কি না?

"পশূনাং পালনাদ্দেবি করণাৎ কৃষিকর্ম্মণঃ।
বর্ত্তনাদ্ধারণাচ্চৈব বার্ত্তা সা এব গীয়তে॥"

এই দেবীপুরাণ-বচন এবং মেদিনী প্রভৃতি অভিধান অনুসারে বার্ত্তা শব্দের অর্থ কৃষি-বাণিজ্যাদি। সুতরাং—

"দানমধ্যয়নং বাপি যজনঞ্চেতি বৈ বিশঃ—
বার্ত্তা; শূদ্রস্য শুশ্রূষা————————॥"

ইত্যাদিরূপে বচনের অন্বয় হইলে, "দান, অধ্যয়ন এবং যজন, বৈশ্যের ধর্ম্ম এবং বার্ত্তা অর্থাৎ কৃষি-বাণিজ্যাদি জীবিকা" এরূপ অনুবাদ সুসঙ্গত। তর্করত্ন মহাশয় সংগৃহীত পুস্তকাবলীতে যে পাঠ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তদনুসারেই তাঁহার ব্যাখ্যা করা কর্ত্তব্য। পাঠ কল্পনা করিয়া তাহার অনুবাদ করা কর্ত্তব্য নহে। তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের প্রকাশিত পুস্তকের পাঠ এবং তর্করত্ন মহাশয়ের প্রদর্শিত পাঠ একরূপ। বার্ত্তা শব্দের অর্থজ্ঞান থাকিলে দোষ-দর্শী আলোচক বাবুকে কষ্ট পাইতে হইত না। ঋষির অভিপ্রায়াভিজ্ঞানে তর্করত্ন মহাশয়ের ক্ষমতা যে অসীম, আলোচক-নির্দ্দিষ্ট পাঠ হইতেই তাহা আমরা উপলব্ধি করিয়াছি।

২। এই প্রকার ভুলে তর্করত্ন মহাশয়কে যাঁহারা দোষী করেন, নিশ্চয় তাঁহাদের মধ্যেই কেহ শ্বশুরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'মহাশয়! আপনার কি বিবাহ হইয়াছে?'

৩। ইষ্টাপূর্ত্তৌদ্বিজাতীনাং সামান্যোধর্ম্মসাধনৌ।
অধিকারী ভবেচ্ছূদ্রঃ পূর্ত্তে ধর্ম্মে ন বৈদিকে॥"

এই বচনানুবাদের আলোচনায় আলোচক লিখিয়াছেন,—

"এই অনুবাদ ঠিক হইয়াছে কি না, জানিতে হইলে প্রথমে দেখিতে হয়, "পূর্ত্ত কার্য্য" কি? এবং তাহার মধ্যে বৈদিক কার্য্য আছে কি না? মহর্ষি অত্রি একটু পূর্ব্বেই বলিয়াছেন,—

"বাপীকূপতড়াগাদি দেবতায়তনানি চ।
অন্নপ্রদানমারামাঃ পূর্ত্তমিত্যভিধীয়তে॥"

ইহার অর্থ,—"বাপী (সরোবর), কূপ, তড়াগাদির খনন, দেবতার গৃহ নির্ম্মাণ, অন্নদান ও উপবননির্ম্মাণকে পূর্ত্ত বলে।"

ইহার মধ্যে বৈদিক কার্য্য একটাও নাই!" ইত্যাদি।

এই বাক্যগুলি শাস্ত্রাভিজ্ঞগণের হাস্যরসোদ্দীপক। সমগ্র পূর্ত্তকার্য্যেই বৈদিক হোম আছে, কোন কোন পূর্ত্তকার্য্যে কর্ম্মান্তরেও বেদমন্ত্র ব্যবহৃত আছে। এইজন্য রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য লিখিয়াছেন,—

"এতেন গোরবতারণানুমন্ত্রণয়োর্বৈদিকমন্ত্রস্য যজমানকর্ত্তৃকপাঠে শূদ্রস্য তত্রানধিকারাৎ তদ্বতি যাগেঽপি তস্যানধিকার ইতিদ্বৈতনির্ণয়োঽতিনিরস্তম্।——হোমস্তু ব্রাহ্মণদ্বারা করণীয়ঃ।"

বিশেষ বিবরণ জলাশয়োৎসর্গাদি তত্ত্বে দ্রষ্টব্য।

খবরের কাগজের বাবু পূর্ত্তকার্য্যের বড় সুন্দর অর্থ বুঝিয়াছেন। হা দুর্দ্দৈব! ইহাদের উপরেও আমায় বাক্য-বিন্যাস করিতে হইল!

তর্করত্ন মহাশয়ের অনুবাদের মর্ম্ম এই যে, পূর্ত্তকার্য্যে শূদ্রের অধিকার আছে। কিন্তু পূর্ত্তকর্ম্মের অন্তর্গত হোমাদিরূপ যে বৈদিক কর্ম্ম তাহাতে সাক্ষাৎ অধিকার নাই; কিন্তু সে সব কর্ম্ম ব্রাহ্মণ দ্বারা করাইবে।

"ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন জাতির ইষ্ট ও পূর্ত্ত কার্য্যের দ্বারা ধর্ম্ম উপার্জ্জনে সমান অধিকার—শূদ্রের পূর্ত্ত কার্য্যে সম্পূর্ণ অধিকার, কিন্তু ইষ্ট কার্য্যের মধ্যে বৈদিক কর্ম্মে তাহার অধিকার নাই।

"এইরূপ অর্থ না করিলে "সামান্যো" পদটীর সার্থকতা থাকে না।"

আলোচকের প্রদর্শিত এই অনুবাদটী অতি মনোহর! পূর্ত্তকার্য্যে শূদ্রের সম্পূর্ণ অধিকার, কিন্তু ইষ্টকার্য্যের মধ্যে বৈদিক কার্য্যে তাহার অধিকার নাই। 'কিন্তু'র কি বাহার! বলি বাপুহে! ইষ্টকার্য্যে শূদ্রের অধিকার কোন্ শাস্ত্র দ্বারা বিহিত হইল? বলিতেছ, পূর্ত্তকার্য্যে অধিকার, আর 'কিন্তু' করিতেছ, ইষ্টকার্য্যে; এমন সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে না পারিলে আর বাহাদুরী কি! বাবু বুঝি "সামান্যো" পদের অর্থে অসামান্য জ্ঞান লাভ করিয়াছেন; নতুবা "সামান্যো" পদটীর সার্থকতা থাকে না" এ অদ্ভুত যুক্তি কোথা হইতে বাহির হইল? যাহা হউক, এ স্থলে তর্করত্ন মহাশয় রত্নাকরের ব্যাখ্যা অপেক্ষাও উত্তম ব্যাখ্যা করিয়াছেন। রত্নাকরের ব্যাখ্যাতেও উক্ত বচনে "দ্বিজাতীনাং" এই পদের এবং "পূর্ত্তে" এই পদের সার্থকতা থাকে না। যাঁহারা প্রকৃত স্মার্ত্ত পণ্ডিত, তাঁহারা তর্করত্ন মহাশয়কৃত অনুবাদের শ্রেষ্ঠতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

তর্করত্ন মহাশয় সংহিতার ভাষ্য বা টীকা করিবার উপযুক্ত। কুল্লুকভট্ট প্রভৃতি অপেক্ষা তর্করত্ন মহাশয় কোন অংশেই ন্যূন নহেন। এই অনুবাদেও স্থানে স্থানে এমন অপূর্ব্ব পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন, যাহা দেখিলে প্রকৃত পণ্ডিতগণকে বিস্মিত ও আনন্দিত হইতে হয়। খবরের কাগজের আলোচক বাবু! গরুড়ের বিক্রম কেঁচোতে কি জানিতে পারে?

৪। পিতা পুত্রস্য জাতস্য পশ্যেচ্চেৎ জীবতো মুখম্।
ঋণমস্মিন্ সন্নয়তি অমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি।
জাতমাত্রেণ পুত্রেণ পিতৃণামনৃণী পিতা॥
ইত্যাদি।

স্মার্ত্ত গ্রন্থে "পশ্যেচ্চেৎ জীবতো মুখং" এই পাঠ আছে। 'পশ্যেচ্চ' এবং 'পশ্যেচ্চেৎ' এই দুই অংশের অর্থ এক প্রকার করা উচিত যদ্যর্থে চকারেরও প্রয়োগ হইতে পারে এবং বিধিলিঙের অর্থও সম্ভাবনা হইতে পারে। বিশেষতঃ—এইরূপ অর্থ না করিয়া, "জীবিত জাত (মাত্র?) পুত্রের মুখ দর্শন করিবেন" এইরূপ বিধ্যর্থ করিলে, উৎপত্তি-বিধিতে ফল-শ্রুতির অভাবপ্রযুক্ত জীবিতজাতমাত্র পুত্রের মুখ দর্শন না করিলে প্রত্যবায়াপত্তি।

যৎতৎপদের অধ্যাহার করিয়া এই বিধি-বাক্যেও ফলশ্রুতি খটাইলে আলোচকের অনুবাদও ভিত্তিশূন্য হইয়া পড়ে। আর যদি যৎ-তৎ-শব্দেরই অধ্যাহার করিতে হয়, তবে "যদি" অধ্যাহারও ত করা যায়। সংস্কৃত ভাষায় এতটুকু জ্ঞান না থাকিলে, তাহা লইয়া নাড়া-চাড়া করা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। তর্করত্ন মহাশয়ের অনুবাদ পড়িলে বুঝা যায়, প্রথম শ্লোকে পুত্রমুখদর্শনের প্রশংসা, দ্বিতীয় শ্লোকে পুত্রজন্মেরই প্রশংসা। স্বর্গলাভরূপ ফল-কথন দ্বারা পুত্রমুখদর্শনের প্রশংসা আর নরকত্রাণরূপ ফল-কথন দ্বারা পুত্রজন্মেরও প্রশংসা আছে। ইহাতে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্লোকে যে কি অসামঞ্জস্য হইল, তাহা অদ্ভুত-প্রতিভাশালী আলোচকেরই বুদ্ধিগম্য। 'ঋণমস্মিন্ সন্নয়তি' এই অংশের তাৎপর্য্য "ঋণ হইতে মুক্ত হন" এইরূপই বটে। অনুবাদ যে তাৎপর্য্য লইয়া করা যায়, তাহা অনুবাদের লক্ষণেই বলা হইয়াছে। নতুবা পিতার মৃত্যুর পরে যে পুত্র ভূমিষ্ঠ হয়, তাহাতে ত পিতৃঋণ সংক্রামিত হইতে পারে না; সে কি পিতৃ-ঋণী হয় না? আলোচক বাবু! অত্রিবচনের ভাব এই নাকি? কিন্তু শ্রুতিতে উক্ত আছে, জন্মিলেই পিতৃঋণ হয়। জাতমাত্র পুত্রের মুখদর্শন, পিতা না করিলেও পিতৃঋণ হইতে অব্যাহতি হয় না।

৫। "সুবর্চ্চসং" অর্থে তেজস্করই। "শোভনং বর্চ্চো যতঃ" সমাসবাক্য এইরূপ, নতুবা তেজাল ব্রাহ্মী এ কথা বলিবার কোনরূপ প্রয়োজন নাই। ব্রাহ্মী তেজালই হউক আর অতেজালই হউক; পাপ নাশকতা তাহার আছেই। তেজস্কর বলিলে 'ব্রহ্মতেজোবর্দ্ধক' এইরূপ অর্থ পাওয়া যাইতে পারে।

সমাস করিবার ক্ষমতা যাহার নাই, সেই বৈয়াকরণ-খসূচি ব্যক্তিও পাণ্ডিত্য-প্রকাশে অভিলাষী!

৬। অনুবাদের লক্ষণ পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে, সুতরাং তৎসম্বন্ধে সম্পাদকের যাহা মন্তব্য, তাহা নিরাকৃত হইয়াছে। বিশেষ বক্তব্য এই—

"সপিণ্ডানান্তু সর্ব্বেষাং গোত্রজঃ সাপ্তপৌরুষঃ।
পিণ্ডাশ্চোদকদানঞ্চ শাবাশৌচং তথানুগম্॥"
"চতুর্থে দশরাত্রং স্যাৎ ষড়হঃ পঞ্চমে তথা।
ষষ্ঠে চৈব ত্রিরাত্রং স্যাৎ সপ্তমে দ্ব্যহমেব বা॥"

প্রথম শ্লোকের সংস্কৃতান্বয় এই,—সর্ব্বেষাং গোত্রজঃ সাপ্তপৌরুষঃ (সপিণ্ডঃ)। তেষাং সপিণ্ডানাং পিণ্ডাশ্চ উদকদানঞ্চ। ইত্যাদি। যে পাঠ তর্করত্ন মহাশয় সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন এবং মূলে সন্নিবেশিত করিয়াছেন, সেই পাঠেরই অনুবাদ তাঁহার কর্ত্তব্য, পাঠ-কল্পনায় তাঁহার অধিকার নাই। তর্করত্ন মহাশয়ের ধৃত পাঠ এবং তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের প্রকাশিত পাঠ একরূপ।

উপরি উক্ত দ্বিতীয় শ্লোকে যে অশৌচ-ব্যবস্থা আছে, তাহা অস্মদ্দেশের অপরিগৃহীত। আলোচক বাবুর প্রদর্শিত পাঠানুসারেও অশৌচ-ব্যবস্থা চলে না। সুতরাং মহাধার্ম্মিক আলোচক বা সম্পাদকের ধর্ম্মনাশ-শঙ্কা যে স্মৃতি শাস্ত্র এবং দেশ-ব্যবহার উভয় অনভিজ্ঞতার ফল, তাহা আমরা স্পষ্ট দেখিতেছি। সুতরাং "যষ্ঠে চৈব ত্রিরাত্রং স্যাৎ সপ্তমে পুরুষে দ্ব্যহম্" এই পাঠ শুদ্ধ অথবা সম্পাদক-ধৃত (কল্পিত কি না ভগবান্ জানেন) "যষ্ঠে চতুরহাচ্ছুদ্ধিঃ সপ্তমে পুরুষে ত্র্যহং" এই পাঠ শুদ্ধ, তাহা নিশ্চয় করা যায় না।

পরাশরের বচনের পাঠ দেখিয়া এক্ষেত্রে অত্রি-বচনের পাঠ-মীমাংসা হইতে পারে না। এককালে একদেশে এক প্রকার লোকের জন্য পরাশরের ব্যবস্থা হইতে পারে, অন্য কালে অন্য দেশে অন্যপ্রকার লোকের জন্য অত্রির ব্যবস্থা হইতে পারে। তাহাতে ব্যবস্থা-ভেদ হওয়া বিচিত্র নহে। অশৌচের ব্যবস্থা যে ঐরূপ দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে নানাবিধ, তাহা স্মৃতিশস্ত্রাভিজ্ঞ মাত্রেই অবগত আছেন। অতএব এই লেখক মহাশয়ের এ সম্বন্ধে যে বাগাড়ম্বর, তাহা ভ্রমতরঙ্গেরই লীলামাত্র।

তার পর লেপের কথা। সপিণ্ড মাত্রেই পিণ্ডসম্বন্ধী নহেন, কিন্তু লেপসম্বন্ধীও আছেন। সুতরাং সপিণ্ড হইলেই পিণ্ড-সম্বন্ধ থাকে এরূপ বিধি হইতে পারে না। স্মার্ত্তধৃত বচনে স্পষ্টই কথিত আছে,—

"লেপভাজশ্চতুর্থাদ্যাঃ পিত্রাদ্যাঃ পিণ্ডভাগিনঃ।
পিণ্ডদঃ সপ্তমস্তেষাং সাপিণ্ড্যং সাপ্তপৌরুষম্॥"

চতুর্থ, পঞ্চম এবং ষষ্ঠ পুরুষ লেপভোজী; পিতা, পিতামহ এবং প্রপিতামহ পিণ্ডভোজী; আর স্বয়ং দাতা; এই প্রকার সাত পুরুষে সপিণ্ডতা হইয়া থাকে।

সপিণ্ডমাত্রেই পিণ্ডভোজী, এ কথা বলিলে, এই সব বচনের সহিত বিরোধ হয়। সুতরাং অত্রি-সংহিতার বচনস্থ 'পিণ্ডাঃ' এই পদেরই লাক্ষণিক অর্থ 'পিণ্ড' এবং 'লেপ'। অথবা 'পিণ্ডাশ্চ' চকারই লেপ-অর্থের বোধক;—ইহা স্মার্ত্ত মাত্রেরই স্বীকার্য্য। এইরূপ বচনার্থ-প্রতিপাদন, স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যও করিয়াছেন। সুতরাং বচনের প্রকৃত মর্ম্ম তর্করত্ন মহাশয়ের অনুবাদে প্রকাশ পাইয়াছে। এ অনুবাদ তর্করত্ন মহাশয়ের পাণ্ডিত্যেরই পরিচায়ক।

আহা! পত্রিকাচালক মহাশয়ের যদি কিঞ্চিৎ লেপ থাকিত, একেবারে ধোয়া-মোছা

না হইতেন, তাহা হইলে লেপের মর্ম্ম বুঝিতে তাঁহার গোল হইত না।

৭। বায়ুভক্ষো দিবা তিষ্ঠেদ্ রাত্রিকৈর্বাপ্সু সূর্য্যদৃক্।
জপ্ত্বা সহস্রং গায়ত্র্যাঃ শুদ্ধির্ব্রহ্মবধাদৃতে॥
অজ্ঞানকৃত ব্রহ্মবধেও দ্বাদশবার্ষিক ব্রত প্রায়শ্চিত্ত।
পাপে গুরুণি গুরুণি স্বল্পান্যল্পে চ তদ্বিদঃ।
প্রায়শ্চিত্তানি মৈত্রেয় জগুঃ স্বায়ম্ভুবাদয়ঃ॥
বিষ্ণুপুরাণ।

অর্থাৎ গুরুপাপে গুরুপ্রায়শ্চিত্ত এবং লঘুপাপে লঘুপ্রায়শ্চিত্ত বিহিত।

ব্রহ্মবধ, তৎসজাতীয় বা তদপেক্ষা প্রবল পাপ ব্যতীতও অনেক গুরু পাপ আছে, যাহার প্রায়শ্চিত্ত নবমবার্ষিক ব্রত ইত্যাদি। একদিন কষ্টভোগ ও সহস্র-গায়ত্রী-জপ, সে সব পাপের প্রায়শ্চিত্ত নহে। অতএব ব্রহ্মবধ শব্দের লাক্ষণিক অর্থ স্বীকার করিয়া অনেক পাপের সংগ্রহ করিতে হইবে।

ঐরূপে গায়ত্রী-জপ বড় জোর এক চান্দ্রায়ণেরই সমান হউক। তাহাতে যে সব পাপ নাশ হয়, তাহাড়া সকল পাপই ব্রহ্মবধ শব্দের অর্থ।

তর্করত্ন মহাশয়ের অনুবাদে বুঝা যায়, ঐরূপ গায়ত্রী-জপে ক্লেশাধিক্য। ক্লেশাধিক্য হইলে, প্রায়শ্চিত্তেরও গুরুত্ব হয়। সুতরাং অপর অনুবাদে ব্রহ্মবধ শব্দকে যত পাপের বোধক বলিতে হইবে, তর্করত্ন মহাশয়ের তত হইবে না। প্রায়শ্চিত্ত গুরু হইলেই বেশী পাপ নষ্ট হইবে কিনা।

যাজ্ঞবল্ক্য-বচনের অন্যবিধ অর্থ করা সহজ নহে। কেননা, তাহাতে—"রাত্রিং নীত্বাপ্সু সূর্য্যদৃক্" এইরূপ পদ আছে; 'নীত্বা' পদ আনন্তার্য্যের বোধক। কাজেই টীকা অন্যবিধ। সেই টীকা অন্যবিধ বলিয়া এ বচনের অনুবাদও যে ঠিক তাহাই করিতে হইবে, এমন কি নিয়ম আছে? আর তর্করত্ন মহাশয় যাজ্ঞবল্ক্যের অনুবাদে স্থানে স্থানে মিতাক্ষরাকেও দূষিয়াছেন।

বলি আলোচক মহাশয়! আমার কথাগুলি বুঝিতে পারিতেছেন ত?

৮। 'উপস্পৃশ্য' আচমন অর্থ করিলে, নদীমাহাত্ম্য অধিক প্রকাশ হয়।

৯। 'সুজনস্য পূজা' ঘটিত বচনটী সমগ্র পড়িলে শিষ্টের পালনই যে বচনের মর্ম্ম, তাহা বুঝা যায়।

১০। আলোচক মহাশয়, 'স্তোকাৎ' এই পদের অর্থ করিয়াছেন, 'যাহার যাহা থাকে' তবে 'স্তোকং পচতি'র অর্থ কি 'যাহার যাহা থাকে পচতি'? অতএব তর্করত্ন মহাশয় বচনের মর্ম্ম লইয়া যে অনুবাদ করিয়াছেন, তাহাই প্রকৃষ্ট।

"তেষাং নিষেকাদিশ্মশানান্তো মন্ত্রবৎ ক্রিয়াসমূহঃ"। বিষ্ণুসংহিতা।

তর্করত্ন মহাশয় শ্মশানান্ত শব্দের অনুবাদ করিয়াছেন, শ্রাদ্ধাদি পর্য্যন্ত। আলোচক মহাশয় তাহাতেই খড়্গহস্ত হইয়াছেন, তিনি বলেন, শ্রাদ্ধ পর্য্যন্ত নহে, 'অন্ত্যেষ্টি পর্য্যন্ত'; কিন্তু তিনি ভাবিয়াছেন কি বিষ্ণুসূত্রে ঐ অংশটুকু বলা হইল কেন?

যদি দ্বিজাতির কর্ম্মে মন্ত্র পাঠ কর্ত্তব্য, এবং প্রতিপাদনই বিষ্ণুসূত্রের প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে, শ্রাদ্ধ তর্পণ বাদ কেন? শ্রাদ্ধ তর্পণে কি দ্বিজাতি মন্ত্র পড়িবেন? এই সব ভাবিয়া তর্করত্ন মহাশয় শ্মশান শব্দ মরণ-পর-কর্ত্তব্য যাবৎ কার্য্যেরই উপলক্ষণ স্থির করিয়া প্রকৃত অনুবাদ করিয়াছেন।

মনুসংহিতায় শ্মশান শব্দ ও শ্রাদ্ধাদি;—কুল্লুক ও মেধাতিথির অন্ত্যেষ্টি পদও শ্রাদ্ধাদির বোধক; নতুবা বল দেখি বাপু, মনু—'নিষেকাদিঃ শ্মশানান্তঃ' এতদূর বলিলেন কেন? কেবল 'নিষেকঃ' অথবা 'শ্মশানং' বলিলেই ত হইত। সুতরাং বলিতেই হইবে, মনুও এই বচন দ্বারা প্রকারান্তরে দ্বিজাতির নিষেকাদি কর্ম্মমাত্রেই যে মন্ত্রপাঠ বিহিত তাহা জ্ঞাপন করিয়াছেন। এখন বুঝিলে ত আলোচক মহাশয়, তর্করত্ন কত বিচার করিয়া অনুবাদ করেন! বিছার ওঝা তোমরা বাবু, কেউটের কাছে কেন?*

শ্রীদ্বারকেশ তর্কভূষণ।

* স্থানাভাব বশতঃ অবশিষ্ট প্রবন্ধ এবারে প্রকাশিত হইল না, যথান্তরে প্রকাশ্য। জ, স।

জন্মভূমি।

৫ম ভাগ। } বৈশাখ। ১৩০২। { ৫ম সংখ্যা।

বঙ্গসাহিত্যে বঙ্কিম।*

১।

বিশীর্ণা স্রোতস্বতী ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতেছিল। তেমন উন্মাদ আবেগ, উচ্ছৃঙ্খল তরঙ্গভঙ্গ, কূলপ্লাবী-চাঞ্চল্য,—কিছুই দৃষ্ট হইত না। বৃন্তচ্যুত, বিশুষ্ক পুষ্প যেমন নিঃশব্দে ভূপতিত হয়, স্রোতস্বতীর গতি তেমনই শব্দহীন, প্রাণহীন,—অথচ কেবল আকর্ষণের বলে গতিমাত্রে অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হইতেছিল। পথিক তৃষিত-প্রাণে স্রোতস্বতী-পানে ছুটিতেছে,—তৃষা মিটিতেছে না,—আকুল-প্রাণে ফিরিয়া আসিতেছে। পিপাসা যত বাড়িতেছে, প্রাণে ব্যাকুলতা ততই উদ্রিক্ত হইতেছে।

এমনই সময়, সহসা সেই বিশীর্ণ হৃদয়া স্রোতস্বতী পূর্ণতোয়া হইয়া, স্ফীত-হৃদয়ে অপূর্ব্ব-গৌরবে কূল ভাসাইয়া প্রবাহিতা হইল। বিশুষ্ক সাহারা "সুজলা সুফলা মলয়জ-শীতলা" ভূমিতে পরিণত হইল। শুষ্ক তরু মুঞ্জরিল। কুসুমিত তরুশাখে মধুরকণ্ঠ-বিহগ মধুর তান ধরিল। প্রীতিপূর্ণ হৃদয়ে এইবার সেই তৃষার্ত্ত পথিক-কুল নদীতটে বসিল;—প্রাণ জুড়াইল, হৃদয় শান্ত হইল।

সেই এক দিন গিয়াছে, আর আজিও এক দিন চলিয়াছে। সেই কাঙ্গালিনী বঙ্গ-ভাষা আজি নানা রত্ন-সুশোভনা। মরকত-মণি-মাণিক্যে ভিখারিণীর ভাণ্ডার আজি পূর্ণ। ভিখারিণী তখন বঙ্গবাসীর প্রাণের আকাঙ্ক্ষা বুঝিতে পারে নাই এবং বুঝিতে পারিলেও, তাহা পূরণ করিতে সমর্থ হয় নাই। হৃদয়ে সে অপরিতৃপ্ত আশা লইয়া বঙ্গবাসী সে সময় যাহা পাইয়াছে, তাহাই গ্রহণ করিয়াছে। ভাল মন্দ বিচার করে নাই; বুঝি, বিচার করিবার সামর্থ্যও ছিল না; কিন্তু বুঝিত, প্রাণের অভাব ইহাতে মিটিতেছে না। তৃষা বাড়িত, আকাঙ্ক্ষা মিটিত না। সেই দুর্দ্দিনে, আমাদের পরম সৌভাগ্যবলে, কাহার নবীনা প্রতিভা অজস্রধারে সুধা বর্ষণ করিল! সে 'ভাব-মন্দাকিনী' পানে বাঙ্গালী ধন্য হইল, দুঃখিনী বঙ্গভাষা নবজীবন লাভ করিল।

সেই সব কথা আজি মনে পড়ে। মনে

* কলিকাতা, "চৈতন্য লাইব্রেরী" কর্ত্তৃক জ্ঞাপিত "বাঙ্গালা সাহিত্যে বঙ্কিম বাবুর স্থান", ও [illegible] ইউনিয়ন ক্লবের" বিজ্ঞাপিত "ওপন্যাসি[illegible]" ইতি শীর্ষক দুইটী প্রবন্ধ লিখিয়া আমি [illegible] লাইব্রেরী হইতে দুইটী পদক পুরস্কার প[illegible] উপস্থিত প্রবন্ধ সেই দুই প্রবন্ধের সার-সংকলন। [illegible] সংকলনে স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত [illegible]।

পড়ে, যখন পাদরী সাহেব-সম্প্রদায় সর্ব্বপ্রথম এ দেশে বাঙ্গালা ভাষায় পুস্তক মুদ্রিত করিয়া প্রচারিত করেন। তার পর, একে একে বাঙ্গালার অনেকগুলি সুসন্তান ভাষার উন্নতি-কল্পে ব্রতী হন। মৃত-মহাত্মা রামমোহন রায়, কিছু-কাল পরে হইলেও, সর্ব্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য। তাঁহার সময় হইতে আজি পর্য্যন্ত বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রধানতঃ চারিটী স্তর দেখিতে পাই। প্রথম স্তর,—ভাষা গ্রাম্যদোষ-দুষ্ট ও অস্পষ্ট এবং ভাব নিতান্ত অপরিস্ফুট ও ম্লান। দ্বিতীয় স্তর,—সংস্কৃতের একাধিপত্য,—সুতরাং অনেক স্থলে নিরর্থক শব্দাড়ম্বর ও তজ্জন্য ভাব-জটিলতা। তৃতীয় স্তরেই বাঙ্গালীর সৌভাগ্যরবি অল্পে অল্পে দেখা দিল। এ স্তরের প্রধান নেতা,—মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্ত। সাহিত্যের স্রোত একটু ফিরিল। কিন্তু তবুও বঙ্গবাসীর আশা মিটিল না।

এই সময়ে আর একজন মহারথী দেখা দিলেন। "বঙ্গসাহিত্যে ৺ প্যারিচাঁদ মিত্র ওরফে টেকচাঁদ ঠাকুরের স্থান অতি উচ্চে।" * তিনিই প্রথম পথ দেখাইলেন, কেবলমাত্র খাঁটী বাঙ্গালা লিখিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের পরিপুষ্টি করা যাইতে পারে। কিন্তু তবুও সাহিত্য-সূর্য্য মেঘমুক্ত হইল না। ভাষা অনেকাংশে সরল, তরল ও ঢলঢল হইল বটে, কিন্তু তাহাতে প্রাণ রহিল না,—নদীতে তরঙ্গ উঠিল না।

এই সময়ে প্রকৃতির অন্তরালে নব্যবঙ্গের নেতা, প্রতিভার পূর্ণ অধিকারী, প্রকৃত সাহিত্য-গুরু জন্মগ্রহণ করিলেন;—যাঁহার অন্যতমী কথা আলোচনা করিয়া আজি আমি আপনাকে ধন্যজ্ঞান করিব।

পূর্ব্বাবধি এমনই একটা রহস্য জগতের বুকে লুকান' আছে, যাহা ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়। ধর্ম্মে বা সমাজে অথবা সাহিত্যে যখনই কোন বিশেষ অভাব পড়িয়াছে, বিধাতার আশীর্ব্বাদে, কোন মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া অপূর্ব্ব সাধনা বলে সে অভাব পূর্ণ করিয়া চলিয়া যান এবং মানব-হৃদয়ে প্রবল আধিপত্য স্থাপন করিয়া এই মরজগতে অমরত্ব লাভ করেন।

বর্ত্তমানের বিষয় আলোচনা করিতে গিয়া আজ অতীতের অনেক স্মৃতি জাগিতেছে। বঙ্গভাষার যখন সব থাকিয়াও যেন-কিছু নাই,—যখন ভাষা, শব্দ-সম্পদে সৌভাগ্যশালী হইলেও একরূপ অচেতন বা প্রাণহীন, তখন অতি নিভৃতে, বীণাপাণির পদতলে বসিয়া, "সাহিত্য-ক্ষেত্রের কর্ম্মবীর" অপূর্ব্ব সাধনায় জীবন উৎসর্গ করিতেছিলেন। সুপ্ত-সিংহ সহসা জাগিয়া উঠিল। ধন ধান্যে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পূর্ণ হইল।

বঙ্কিমচন্দ্র যথার্থই 'কর্ম্মযোগী'। তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা, এ যুগে, আর কোথাও দেখি না। মনের কথা খুলিয়া বলিলে বোধ হয় কতকটা গোঁড়ামী প্রকাশ পাইবে,—তথাপি অম্লান-বদনে বলিতে পারি, সমগ্র বাঙ্গালা ভাষা এক দিকে, আর একা বঙ্কিমচন্দ্র এক দিকে! কারণ, সমগ্র বাঙ্গালী নর-নারীর হৃদয়ের উপর তিনি প্রবল আধিপত্য স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। এ যুগে, এ সৌভাগ্য, আর কাহারও অদৃষ্টে ঘটে নাই। বঙ্কিম বলিতে বাঙ্গালার একমাত্র বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে বুঝায়। সত্যই বাঙ্গালীর মধ্যে বঙ্কিম একজন মাত্র। দুঃখের কথা কি কম, ঔপন্যাসিক দলের মধ্যে বঙ্কিমকে প্রথম আসন দিয়া, ঠিক দ্বিতীয় আসনে বসাইবার আর কাহাকেও দেখি না! মুখে কেহ স্বীকার করুন আর নাই করুন,—কোন-না-কোন

* এ কথা স্বয়ং বঙ্কিম বাবুই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

প্রকারে এ যুগে বঙ্কিমের শিষ্য নয় কে? যিনি বঙ্কিমকে গালি পাড়েন, তিনিও সেই বঙ্কিমী-ঢঙে "সাদার পিঠে কালি" দিয়া থাকেন! তাই বলিতেছিলাম, যতদিন বঙ্গভাষা, ততদিন বঙ্কিম; যতদিন বাঙ্গালী, ততদিন বঙ্কিম! কবি রবীন্দ্রনাথের সহিত আমিও একবাক্যে বলি,—"তিনি ভগীরথের ন্যায় সাধনা করিয়া, বঙ্গ-সাহিত্যে ভাবমন্দাকিনীর অবতারণ করিয়াছেন এবং সেই পুণ্যস্রোত-স্পর্শে জড়ত্বশাপ মোচন করিয়া, আমাদের প্রাচীন ভস্মরাশিকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছেন, ইহা কেবল সাময়িক মত নহে, এ কথা কোন বিশেষ তর্ক বা রুচির উপর নির্ভর করিতেছে না, ইহা একটি ঐতিহাসিক সত্য"।*

বস্তুতঃ, ভগীরথের ন্যায় অপূর্ব্ব সাধনা-বলে, বঙ্কিম নব-জলধারা ঢালিয়া সেই ক্ষীণ-হৃদয়া, রুদ্ধ স্রোতস্বতীকে সাগরের সহিত মিলিত করিয়া দিয়াছেন। "আলালী" ও "সাগরী" ভাষারূপ জমির উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া, তিনি সাহিত্যের চতুর্থ স্তর অক্ষয় ও অজেয় করিয়া গিয়াছেন। তবে দুঃখ এই, মহারথী অর্জ্জুনের-শরাঘাতে-বিদীর্ণা ভোগবতীর ন্যায় বঙ্কিমের বিরহে নেতৃহীন বঙ্গ-সাহিত্য আজি শতধারে বুক ভাসাইতেছে। কারণ, তাহার সকল সাধ আজিও মিটে নাই।

২।

সাহিত্যের অবস্থা তখন কিরূপ ছিল তাহা আমরা সংক্ষেপে, উপরে একরূপ বলিয়া আসিয়াছি। ফল কথা, প্রথম তিন স্তরের ভাষা যেরূপ হউক, ভাবের একান্ত অভাব ছিল। এ কথা বোধ হয়, সর্ব্ববাদিসম্মত। ভাবহীন ভাষা যতই আড়ম্বরপূর্ণ হউক, প্রকৃত চিন্তা-শীল ব্যক্তির নিকট তাহার কোন মূল্য নাই। দীর্ঘ-সন্ধি-সমাসযুক্ত বাক্যচ্ছটা ও বর্ণনা-ঘটা দেখিতে, শুনিতে এবং স্থল-বিশেষে পড়িতেও মন্দ নয় বটে, কিন্তু তাহা "কাণের ভিতর দিয়া মরমে" প্রবেশ করে না; সে কথা বুকে বিদ্ধ হয় না। ছোট ছোট ভাবময়ী কথা কিন্তু মর্ম্মস্তল স্পর্শ করে। এই জন্যই গীতি-কবিতার এত আদর। এই জন্যই বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবি কাব্য-জগতে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। প্রতিভাবান্ বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্যের ভাষা সেই গীতি-কবিতার ছাঁচে ঢালা। বঙ্কিমের প্রাণময়ী, মর্ম্মস্পর্শিনী ভাষা পড়িতে পড়িতে আমার এক এক বার মনে হয়, যেন গদ্যে কোন গীতি-কবিতা পড়িতেছি। স্থানান্তরে আমি একথা সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা পাইব। কিন্তু বঙ্কিমের পূর্ব্বে, বাঙ্গালা সাহিত্য, এ রসের কাঙ্গাল ছিল। হয় কতকগুলা আভিধানিক 'কটমট' শব্দ,—অনুস্বার-বিসর্গহীন সংস্কৃত, কেবল অক্ষরগুলা বাঙ্গালা,—নয় ঘোর গ্রাম্যদোষ-দুষ্ট সমাপিকা-অসমাপিকা ক্রিয়ার ছড়া-ছড়ি, অধিকন্তু 'এবং' 'ও' 'অপিচ' প্রভৃতির বাড়াবাড়িতে সুকুমার সাহিত্যের স্থান পূর্ণ করিত। দৃষ্টান্ত উদ্ধারের আবশ্যক নাই,—এ কথা বোধ হয় ভাষাবিৎ ব্যক্তি মাত্রেরই অনুমোদিত।

সোজা কথায় বলিতে গেলে এই বলিতে হয়, ভাবের অভাব ছিল বলিয়াই ভাষায়ও তখন জীবনী-শক্তি ছিল না। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষা খুব মিষ্ট বটে, কিন্তু তাহাতেও প্রাণের অভাব দেখিতে পাই। অমন মধুময়ী ভাষাও যেন কেমন বিনাইয়া-বিনাইয়া, শ্রোতৃ-বৃন্দের মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া রচিত বলিয়া মনে হয়। স্বয়ং বিদ্যাসাগর মহাশয়

* শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-লিখিত "বঙ্কিমচন্দ্র"। —সাধনা।

সম্বন্ধে যখন আমাদের এই মত, তখন অন্য পরে কা কথা। আসল কথা, ভাবযুক্ত মর্ম্মকথা ভাষার পক্ষে যত কার্য্যকরী, ফেনাইয়া বা ফাঁপাইয়া অবাস্তব শব্দাবলীর সংযোজনে, ভাষার পরিপুষ্টি ত দূরের কথা, প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা সাহিত্য-ভাণ্ডারের আবর্জ্জনা মাত্র। একটি ক্ষুদ্র যূথিকা পুষ্প যে সুগন্ধি দান করিবে, রাশীকৃত করবীর সাধ্য কি যে, তাহার স্থান অধিকার করে?

সাহিত্যের এইরূপ সমালোচনা করিতে করিতে তদানীন্তন সমাজের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। কারণ, সাহিত্যের উন্নতি-অবনতির পক্ষে সমাজও কতকটা দায়ী। সমাজের শিক্ষা, দীক্ষা, ও রুচি-প্রবৃত্তির সহিত সাধারণ সাহিত্য-সেবীর ঘনিষ্ট সম্বন্ধ। তখনকার সমাজের সাধারণ শিক্ষা খুবই কম ছিল। মোটামুটী বৈষয়িক কাজ-চালাইবার উপযোগী শিক্ষাই তখন একরূপ পর্য্যাপ্ত ছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। অবশ্য, "পড়ুয়া পণ্ডিত" ও শাস্ত্র-ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদিগের কথা আমরা এখানে উল্লেখ করিতেছি না। ইংরাজী-ঢঙে তখন দেশ মাতোয়ারা। "নিমচাঁদ"রূপী বহু শিক্ষিত-পুঙ্গব তখন বঙ্গ-সমাজে বিরাজ করিতেছেন। সুতরাং সমাজে তখন গলদ ঢের। সে সব সমাজ-কালিমা দেখাইবার সাধ আমাদের নাই। তবে এখানে কেবলমাত্র তদানীন্তন সমাজের রুচির বিষয়ে কিছু উল্লেখ করিব।

সরস রসিকতা, অবশ্য সর্ব্বদেশে, প্রায় সর্ব্ব সময়েই প্রশংসনীয়। কিন্তু এই রসিকতার নামে ঘোর অরসিকতা বা নীরসতা তখনকার দুর্ভাগ্য বঙ্গসমাজের একচেটিয়া ছিল। ভাঁড়ামী, ফাজ্‌লামী, গ্রাম্য-ইয়ারকি ও অশ্লীল ভাষায় গালাগালিকে তখনকার অনেক লোকে 'রসিকতা' বলিয়া জানিত। অল্পদর্শী লেখকগণও তাই 'বাহবা' পাইবার লোভে, কেতাবে এবং কাব্যে সেই পূতিগন্ধময় পাপআবর্জ্জনা সংগৃহীত করিতেন। লিপিকুশল লেখক না হয় সে-গুলা একটু গুছাইয়া লিখিতেন। কিন্তু ভাঁড় যতই 'তুখড়' হউক, চিরদিনই সে ভাঁড়;—রঙ্গদর্শক বুদ্ধিমন্ত পাঠকের নিকট সে কখনই শ্রদ্ধার আসন পাইবে না। অবশ্য, এ সব খুচরা কবি ও লেখকদের জন্য তখনকার সমাজও কতকটা দায়ী। এই জন্যই বলিতেছিলাম, সমাজের সহিত সাহিত্যের খুব ঘনিষ্ট সম্বন্ধ।

কারণ, "জাতীয়-সাহিত্য জাতীয়-জীবনের প্রতিরূপ। কবির হৃদয় প্রশস্ত দর্পণ তুল্য; যে কালে জাতীয়-জীবনের যে ভাব,—জাতির যাহা রীতি-নীতি প্রণালী-পদ্ধতি—সেই কালের কবির কাব্যে তাহার ছায়াপাত দৃষ্ট হয়।—সেক্ষপীয়র যে নাটকে স্বভাবের প্রতিবিম্ব গ্রহণের উল্লেখ করিয়াছেন, সে এই মর্ম্মের কথা। এ হিসাবে কবি সম-সাময়িক কালের নিপুণ ঐতিহাসিক। কত সহস্র বৎসর বৈদিক-যুগ অতীত হইয়াছে;—সে বৈদিক ঋষি, বৈদিক যাগ, বৈদিক জীবন, বৈদিক আচার ব্যবহারের চিহ্নমাত্র নাই;—কিন্তু বেদের সূক্তে তৎসমুদয়ের কেমন সুস্পষ্ট ইতিহাস অঙ্কিত রহিয়াছে"। *

কথাটী অতি সত্য। কিন্তু এ কথাটীর সহিত আমি আর একটু যোগ করিতে চাই। সেটুকু এই, প্রকৃত প্রতিভাবান কবি বর্ত্তমানকে ভবিষ্যতের কেন্দ্রীভূত করিয়া তাঁহার সাধের আলেখ্যখানি অঙ্কিত করেন। অর্থাৎ জীবনের উচ্চ আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়া কবি এক নূতন জগতের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। সে জগৎ পুণ্য-পবিত্রতাময়, সুখশান্তিপূর্ণ এবং দৈহিক

* শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত-লিখিত "প্রাচীন সাহিত্যালোচনা"।——সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা।

ও আধ্যাত্মিক মঙ্গলকর। কবির কল্পনা-প্রসূতা মানস-দুহিতা এই পৃথিবী তাঁহার ভবিষ্য বংশধরগণ উপভোগ করেন। কেবলমাত্র বর্ত্তমান সমাজ তাঁহার লক্ষ্যস্থল হইতে পারে না।—অত সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে তাঁহার সেই উদার কল্পনা ও বিশ্বজনীন প্রেম আবদ্ধ থাকিতে পারে কি? তাই তিনি আবশ্যক বোধে বর্ত্তমানকে ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হন;—যুগ যুগ ধরিয়া যাহার বিমল-রশ্মি নিখিল সংসার উপভোগ করিতে থাকে। তাই উচ্চশ্রেণীর কবির সেই অপূর্ব্ব আলেখ্য দর্শনে বর্ত্তমান সমাজের যেমন হিত হয়, সময় বিশেষে তেমনই অহিতও সংঘটিত হইয়া থাকে। এ অহিত সত্ত্বেও কবি জগতের পূজ্য, সমগ্র নরনারীর পরম প্রীতির পাত্র। কারণ প্রকৃত কবিই বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের পথ-প্রদর্শক। দার্শনিক বা ঐতিহাসিকের গভীর গবেষণায়ও যে তত্ত্ব প্রকটিত না হয়,—মাহেন্দ্র-যোগ-সংঘটনে, কবির ক্ষণমাত্র চিন্তায়ও সে রহস্য উদ্ঘাটিত হইতে পারে।—প্রকৃত কবির তুল্য বন্ধু আর কে আছে?

বলা বাহুল্য, বঙ্কিমচন্দ্রকে উপলক্ষ্য করিয়াই আমরা ঐ সকল কথা বলিয়া আসিয়াছি। কারণ, আদর্শ-মূলক উপন্যাসেই (idealistic novels) বঙ্কিম সিদ্ধহস্ত।—সমাজ যেমন আছে, ঠিক তেমন নহে,—কিন্তু সমাজ যেমন হইতে পারে বা হওয়া উচিত, সেইরূপ আদর্শ লইয়া তিনি তাঁহার উপন্যাসের 'ছক' প্রস্তুত করিয়াছেন এবং সেই ছক সম্মুখে রাখিয়া এক একটী চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন। কারণ, "কবির সৃষ্টি জগৎ হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া আমি মনে করি না। জগতের বুকে যে কথা লুকাইয়া আছে, হৃদয়ের ভাষায় তাহা পরিব্যক্ত করিয়া কবি আপনার জগৎ সৃষ্টি করেন। সৌন্দর্য্যই জগতের প্রাণ, সৌন্দর্য্য কাব্যেরও প্রাণ। সুতরাং কবির প্রধান কাজ সৌন্দর্য্য সৃষ্টি"। *

কবির আদর্শ বিচিত্র রামধনুর ন্যায়;—কত বর্ণ, কত শোভা, কত সৌন্দর্য্য! রামধনু যেমন আকাশের গায়ে অবস্থিত, কবির আদর্শও তেমনই তদ্বিরচিত কাব্যে নিহিত। তুমি যতই অগ্রসর হইবে, রামধনুও ততই পিছাইয়া যাইবে;—আবার তুমি যেমন পশ্চাৎ হটিয়া আসিবে, রামধনুও তেমনই মনোহর মূর্ত্তিতে তোমার সম্মুখে প্রকটিত হইতে থাকিবে। কবির আদর্শও এইরূপ। তুমি আমি সে আদর্শে উপনীত হইতে পারিতেছি না বলিয়া কি কবি সে আদর্শকে খাটো করিবেন? সংসার সৌন্দর্য্যময়। কবি এই সৌন্দর্য্যের হাটে আপনা হারাইয়া, তাঁহার সাধের আলেখ্যখানি লইয়া বসেন;—তুমি দেখ আর নাই দেখ, তিনি এই আলেখ্যখানি আঁকিয়াই সুখী। প্রকৃত কবি ভিন্ন সৌন্দর্য্যের ধ্যান আর কে করিতে পারে? তাই "সারদামঙ্গলের" কবি এক দিন হৃদয়ের পূর্ণ আবেগে গাহিয়াছিলেন,—

"তুমি লক্ষ্মী সরস্বতী আমি ব্রহ্মাণ্ডের পতি,
হোক্ গে এ বসুমতী যার খুসী তার"!

বঙ্কিমচন্দ্রের সৌন্দর্য্যসৃষ্টি তদ্বিরচিত প্রায় সকল উপন্যাসেই অল্প-বিস্তর দেখিতে পাই। বিশেষতঃ, তাঁহার "কপালকুণ্ডলা" ও "চন্দ্রশেখরের" কিয়দংশ এ বিষয়ে অতুল্য। যথাস্থানে আমরা সে সকল কথার আলোচনা করিব।

বঙ্কিমের পূর্ব্বে বঙ্গ-সাহিত্য ও বঙ্গ-সমাজের যেরূপ অবস্থা, তাহা আমরা অতি সংক্ষেপে দুই চারি কথায় বলিয়াছি। কিন্তু সৌভাগ্যবশে, সময়গুণে, তখন শ্রীমধুসূদন জীমূতমন্দ্রে "মেঘনাদের" ভেরী বাজাইয়াছেন। রঙ্গলালও ওজস্বিনী ভাষায় "স্বাধীনতা হীনতায়

* লেখক-প্রণীত 'দুলালী' নাম্নী উপন্যাসের উৎসর্গ-পত্র।

কে বাঁচিতে চায় রে" বলিয়া বীণায় ঝঙ্কার দিতেছেন। ইহা ব্যতীত ভূদেব "ঐতিহাসিক উপন্যাস" ও পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন "বাঙ্গালা সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব" বিরচিয়াছেন;—কালী-প্রসন্ন সিংহ "হুতমে" বাহবা লইতেছেন;—রামনারায়ণের "নব নাটক" ও "রুক্মিণী হরণ" এবং দীনবন্ধুর "নীলদর্পণ" ও "লীলাবতী" তখন একে একে দেখা দিতেছে। কিন্তু ইহার আগে 'গুপ্ত-কবি'—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত—বঙ্কিমের গুরু দেখা দিয়াছেন। কিছু পরেই প্যারিচাঁদ মিত্র শুভক্ষণে সরল ও সরস ভাষায় "আলালের ঘরের দুলাল" বিরচিলেন। দেশ মধ্যে একটা মহা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। একদিকে সংস্কৃত-পক্ষপাতীগণ ক্ষেপিয়া উঠিলেন; অন্যদিকে নব্য-তন্ত্রের পাঠকবৃন্দ সাগ্রহে "আলালী ভাষা" পড়িতে লাগিলেন! কিন্তু আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি এবং এখনও বলিতেছি, উভয় দলই প্রতারিত হইলেন। কিছুদিনের মধ্যে সে "আলালী" ভাষার উপরও কালের যবনিকা পাত হইল।

৩।

এইবার জননী-জন্মভূমির প্রিয়পুত্র বঙ্কিম-চন্দ্র দেখা দিলেন। মেঘমুক্ত সূর্য্য চারিদিক উদ্ভাসিত করিয়া প্রকাশিত হইল। চারিদিকে আনন্দের রোল পড়িয়া গেল।

এইবার প্রকৃত গদ্য-সাহিত্যের সৃষ্টি হইল। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা-নৈপুণ্য, অপূর্ব্বত্ব, উদ্ভাবনী শক্তি ও জাতীয় ভাব এইবার গদ্য-সাহিত্যে প্রবেশ লাভ করিল। ইহার উপরও প্রতিভার একটী উচ্চ নিদর্শন প্রকটিত হইল,—যাহা আমাদের বঙ্কিমের সম্পূর্ণ নিজস্ব ধন। রসজ্ঞ বঙ্কিম সর্ব্বপ্রথমে বঙ্গসাহিত্যে "নির্ম্মল শুভ্র সংযত হাস্য" আনয়ন করেন!—"তিনিই প্রথম দেখাইয়া দেন যে, কেবল প্রহসনের সীমার মধ্যে হাস্যরস বদ্ধ নহে; উজ্জ্বল শুভ্র হাস্য সকল বিষয়কেই আলোকিত করিয়া তুলিতে পারে। তিনিই প্রথম দৃষ্টান্তের দ্বারা প্রমাণ করাইয়া দেন যে, এই হাস্য-জ্যোতির সংস্পর্শে কোন বিষয়ের গভীরতার গৌরব হ্রাস হয় না, কেবল তাহার সৌন্দর্য্য ও রমণীয়তার বৃদ্ধি হয়, তাহার সর্ব্বাংশের প্রাণ এবং গতি যেন সুস্পষ্টরূপে দীপ্যমান হইয়া উঠে। যে বঙ্কিম বঙ্গ-সাহিত্যের গভীরতা হইতে অশ্রুর উৎস উন্মুক্ত করিয়াছেন, সেই বঙ্কিম আনন্দের উদয়-শিখর হইতে নবজাগ্রত বঙ্গ-সাহিত্যের উপর হাস্যের আলোক বিকীর্ণ করিয়া দিয়াছেন।"* কবি রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিম বাবুর এই "শুভ্র-সংযত" হাস্যকে "ব্রাহ্মণোচিত শুচিতা"র সহিত তুলনা করিয়াছেন। ভালই করিয়াছেন। শুধু হাস্যরস বলিয়া কেন, সকল রসেই বঙ্কিমচন্দ্রের এই "ব্রাহ্মণোচিত শুচিতা" পরিলক্ষিত হয়।

লোকবিশ্রুত "দুর্গেশনন্দিনী" উপন্যাসই বঙ্কিমের সর্ব্বপ্রথম পুস্তক। এই গ্রন্থে তাঁহার প্রতিভার সর্ব্বাঙ্গীন স্ফুর্ত্তি প্রকাশ না পাইলেও, স্বাধীন চিন্তা ও জাতীয়ভাব বঙ্গ-সাহিত্যে এই প্রথম প্রবেশ লাভ করিল। সিংহ-শিশু সাহিত্যকাননে আবির্ভূত হইবামাত্র ফেরুপাল তারস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। দলাদলি-প্রিয় বাঙ্গালী বঙ্কিমকে লইয়া নানারূপ কুৎসিত হাস্য-পরিহাস আরম্ভ করিয়া দিল। প্রথমতঃ তাঁহার ভাষা লইয়া পণ্ডিত-মহলে মস্ত 'ঘোঁট' হইতে লাগিল। "শব-পোড়ান" ও "মড়াদাহ"রূপ ভাষা বঙ্কিম প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, অতএব বাঙ্গালা সাহিত্য মাটী হইল,—এইরূপ ধুয়া ধরিয়া কোন কোন পণ্ডিত আপন বিজ্ঞতার পরিচয় দিতে লাগিলেন। নির্ভীক বঙ্কিম কিছুতেই বিচলিত হইলেন না। স্থিরলক্ষ্যে আপন গন্তব্য-পথে চলিতে লাগিলেন।

* শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-লিখিত "বঙ্কিমচন্দ্র"।—সাধনা।

প্রতিভার আলোক সকলে সহিতে পারে না। যখনই যে সমাজে কোন প্রতিভাবান্ মনস্বী ব্যক্তির আবির্ভাব হয়, তখনই সেই সমাজের জন-সাধারণের মধ্যে প্রথমতঃ একটা তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ এই লোকটা আমাদের চেয়ে কিসে বড়, তাহার বাদানুবাদ হয়। অন্যকে ছোট করিতে পারিলেই যেন তাহারা বড় হইল। কিন্তু কালের তুল্য বিশিষ্ট সমালোচক আর কেহ নাই। কাল, কিছুদিন পরে সেই জন-সাধারণের চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দেয়, কি গুণে সেই প্রতিভাবান্ ব্যক্তি সকলের বড়। তখন সেই জন-সাধারণ, যে মুখে বিষ-বহ্নি উদ্গীরণ করিত, সেই মুখে অমৃতময় স্তুতিবাদের লহরী লইয়া সেই মহাপুরুষের পাদপদ্মে পুষ্প-চন্দন অর্পণ করে। বঙ্কিম, নিজ জীবনেই এই স্তুতিনিন্দার চরম-সীমায় উন্নীত হইয়াছিলেন। কিন্তু শেষে সত্যের জয়ই বিঘোষিত হইল। প্রতিভা পূর্ণরূপে আপন আধিপত্য স্থাপন করিল।

বাঙ্গালীর গৌরবের ধন "বঙ্গদর্শন" প্রকাশিত হইল।

৪।

এইবার নদীতে কূলপ্লাবী তরঙ্গ উঠিল। স্রোতস্বতী কুলুকুলু রবে সাগরাভিমুখে ছুটিল।

সাহিত্য-কাননে মধুর বসন্তের সমাগম হইল। নানাজাতীয় নয়ন-তৃপ্তিকর, অতি মনোহর, মধুগন্ধময় ফুলদল বিকশিত হইতে লাগিল। মৃদুমন্দ-মলয় মারুত-হিল্লোলে, কোকিলের কুহুতানে, ভ্রমরগুঞ্জনে, পাদতল-বিধৌত তটিনীর গানে প্রকৃতি অতি অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে চাঁদের হাসি, চকোর চকোরীর সেই চন্দ্র-সুধাপান, ভাবুকের সেই আত্মবিস্মৃতি—সকলই মনোহর। কর্ম্মযোগী বঙ্কিম এইবার সত্য সত্যই বঙ্গ-সাহিত্যে যুগান্তর উপস্থিত করিলেন।

'বঙ্গদর্শন' বাঙ্গালীর গৌরব, জাতীয় সাহিত্যের একমাত্র 'কোহিনূর'। যতদিন বাঙ্গালা ভাষা, ততদিন বঙ্গদর্শন।

মহারথী বঙ্কিম 'দুর্গনন্দিনী' প্রকাশ করিয়াও কিছুদিন যবনিকার অন্তরালে ছিলেন। ঠিক কাল পূর্ণ হইলে ঋতুরাজ সদলবলে সাহিত্য-কাননে দেখা দিলেন। বন আলোকিত হইল। শুষ্ক তরু মুঞ্জরিল। বসন্তের আবির্ভাবে জীব-জগতের জড়ত্ব ঘুচিল।

কত ভাব, কত চিন্তা, কত উদ্যম, কত আশা, কত আলো লইয়া বঙ্গদর্শন জড়প্রায় বাঙ্গালীর দ্বারে দ্বারে ফিরিল। এইক্ষণ হইতে প্রকৃত প্রস্তাবে বাঙ্গালীর জ্ঞানচক্ষু ফুটিল। ধর্ম্ম ও নীতিবেত্তা 'পুলপিটে' দাঁড়াইয়া গগন-ভেদী বক্তৃতা দিয়াও যাহা করিতে পারেন নাই, এক বঙ্গদর্শন তাহা সমাধা করিল। বাঙ্গালীর দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব ও কাব্য-সাহিত্য এইবার আপন পথ পাইল। নির্ভীকতা, তেজস্বিতা, সুদূরদর্শিতা ও সত্যবাদিতার গুণে বঙ্গদর্শন অতি অল্পকালের মধ্যেই শিক্ষিত বাঙ্গালীর চিত্ত আকর্ষণ করিল।

ইতিপূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষাকে সকলেই—বিশেষতঃ বিদ্বজ্জন-সমাজ বিশেষ ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। বঙ্কিম বাবু গভীর দুঃখে সে সকল কথা বঙ্গদর্শনের পত্র-সূচনায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,—"ইংরাজিপ্রিয় কৃতবিদ্যগণের প্রায় স্থির জ্ঞান আছে যে, তাঁহাদের পাঠের যোগ্য কিছুই বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত হইতে পারে না। তাঁহাদের বিবেচনায় বাঙ্গালা ভাষার লেখক মাত্রেই হয়ত বিদ্যাবুদ্ধি-হীন, লিপি-কুশলতা শূন্য; হয়ত ইংরাজী গ্রন্থের অনুবাদক। তাঁহাদের বিশ্বাস যে, যাহা কিছু বাঙ্গালা ভাষায় লিপিবদ্ধ হয়, তাহা হয়ত

অপাঠ্য, নয়ত কোন ইংরাজী গ্রন্থের ছায়া মাত্র; ইংরাজীতে যাহা আছে, তাহা আর বাঙ্গালায় পড়িয়া আত্মাবমাননার প্রয়োজন কি?"

সর্ব্বপ্রকারে সাফল্য লাভ করিয়া, জীবনের শেষ দশায়ও তিনি এক স্থলে অতি বিনীতভাবে বলিয়াছেন, "যেমন কুলি মজুর পথ খুলিয়া দিলে, অগম্য কানন বা কান্তার মধ্যে সেনাপতি সেনা লইয়া প্রবেশ করিতে পারেন, আমি সেইরূপ সাহিত্য-সেনাপতিদিগের জন্য সাহিত্যের সকল প্রদেশের পথ খুলিয়া দিবার চেষ্টা করিতাম।" * বাঙ্গালার একখানি প্রকৃত ইতিহাস লিখিবার সাধ তাঁহার বরাবর ছিল। কয়েকটী ঐতিহাসিক প্রবন্ধ তিনি লিখিয়াও ছিলেন। কিন্তু আশানুযায়ী তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন নাই। তাই তিনি গভীর দুঃখে ঐ কয়েকটী কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কে বলে, বঙ্কিম বাবু অহঙ্কারী ছিলেন? সর্ব্ববিষয়েই শক্তিমন্ত হইয়াও তবে তিনি কেন এত বিনয়ের পরিচয় দিবেন?—"বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে আমার সেই মজুরগিরীর ফল এই কয়েকটী প্রবন্ধ। বলিতে পারিনা যে, ইহার দর বেশী। দর বেশী হউক বা কম হউক, ইহা পরিত্যাগ করিতে পারি না। যে দরিদ্র, সে সোনারূপা জুটাইতে পারিল না বলিয়া কি বনফুল দিয়া মাতৃপদে অঞ্জলি দিবে না? বাঙ্গালাতে বাঙ্গালার ইতিহাস যে যাহা লিখুক না কেন,—সে মাতৃপদে পুষ্পাঞ্জলি। কিন্তু কৈ, আমি ত কুলি-মজুরের কাজ করিয়াছি,—এ পথে সেনা লইয়া কোন সেনাপতির আগমন-বার্ত্তা ত শুনিলাম না!"

স্বদেশভক্ত, মায়ের সুসন্তান, বিনীত বঙ্কিমের এই উক্তি ঐতিহাসিকদিগের ভাবিবার বিষয়।

* বিবিধ প্রবন্ধ, দ্বিতীয় ভাগ, ১৮৯২।

কিন্তু তথাপি, তাঁহার বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার, বঙ্গদেশের কৃষক, ভারত-কলঙ্ক ও বাঙ্গালার কলঙ্ক প্রভৃতি ঐতিহাসিক প্রবন্ধ গভীর চিন্তাশীলতার পরিচায়ক।

বঙ্গদর্শনের সৃষ্টি হইতেই বাঙ্গালী ভাবিতে শিখিল। তাহার চক্ষের ঠুলি খুলিল; দেখিল, চারিদিক অপূর্ব্ব আলোকে আলোকিত। কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা, মনস্বী যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষের দর্শন, পণ্ডিত রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের নানাবিষয়ক চিন্তা, সূক্ষ্মদর্শী ভাবুক ও চিন্তাশীল অক্ষয়চন্দ্র সরকারের অক্ষয়ভাষা ও "গ্রাবু" "দশমহাবিদ্যা" প্রভৃতি প্রবন্ধ, ডাক্তার রামদাস সেনের প্রত্নতত্ত্ব, বাবু প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের "বাল্মীকি ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত" দীনবন্ধুর সরস রসিকতা প্রভৃতির সাহায্যে বঙ্কিম অজেয় বলবিক্রমে সাহিত্য রাজ্য-সংস্থাপিত করিলেন এবং অতি অল্পদিনের মধ্যেই স্বয়ং সেই রাজ্যের অধিপতি হইয়া দেশীয় বিদেশীয় সকল শ্রেণীর লোককে চমৎকৃত করিলেন। তিনি আত্মবলে, লেখক হইয়াও সমালোচকের পদে আসীন হইলেন। সমালোচনায়ও তিনি অপূর্ব্বশক্তিমত্তার পরিচয় দেন। তিনি এক হস্তে পুষ্পমাল্য ও অন্য হস্তে সম্মার্জ্জনী লইয়া সমালোচকের আসন গ্রহণ করিলেন।

প্রকৃত প্রতিভার নিকট সকলকেই অবনতমস্তক হইতে হয়। নিম্নশ্রেণীর অপকৃষ্ট লেখকসম্প্রদায় ব্যাঘ্রতাড়িত মেষপালের ন্যায় কে কোথায় উধাও হইয়া গেল। বঙ্গসাহিত্যেও তাই তখন তেমন কণ্টক-আবর্জ্জনা প্রবেশলাভ করিতে পারিত না। কচিৎ-কদাচিৎ যে দুই একখানা অসার গ্রন্থ প্রকাশ হইত, তাহাও শেষে 'অগ্নি পরীক্ষার' ভয়ে দূর হইতে নমস্কার করিয়া প্রস্থান করিত।

ন্যায়ের কঠোর দণ্ড এই এক দিকে যেমন,

অন্যদিকে আবার গুণীন গ্রন্থকার, গুণের পুরস্কারও ততোধিক প্রীতিভরে পাইতেন। বঙ্কিম বাবু তাঁহার কোন সাহিত্য-বন্ধুকে এই কথা বলিয়াছিলেন, "বাঙ্গালার এই শিশুকাল, সমালোচনায়ও আমি খুব কঠোর বটে;—কিন্তু যেখানে, প্রতিভা বা অপূর্ব্বতার একটুকুমাত্রও গন্ধ পাই,—সেখানে আমি লেখককে কোল দিই। তবে যাহাদের কস্মিনকালে কিছু হইবে না,—সুতরাং এ পথও যাহাদের নয় বুঝিতে পারি, তাহাদিগকে অকারণ প্রশ্রয় দিই কেন?"

বস্তুতঃ, এই সত্য ও ন্যায়ের মর্য্যাদা-জ্ঞান এবং গুণগ্রাহিতা যদি তাঁহাতে না থাকিত, তবে বঙ্গসাহিত্যের অবস্থা আজি কি হইত বলা যায় না। এবং বঙ্গদর্শনও সাহিত্য-ভাণ্ডারে এত রত্ন রাখিয়া যাইতে পারিত কি না, সন্দেহ-স্থল। কারণ, সমালোচনার উৎকৃষ্টতা বঙ্গদর্শনের একটী বিশিষ্ট গৌরব। সুদক্ষ সমালোচক না হইলে, লেখক তাঁহার নিকট মাথা নোঙাইবে কেন? আজিকার দিনে সাহিত্যের ভিতর যে এত কণ্টক-আবর্জ্জনা জন্মিয়াছে ও জন্মিতেছে, তাহার প্রধান কারণ প্রকৃত সমালোচকের অভাব, বঙ্কিমের ন্যায় শক্তিশালী সমালোচকের অভাব। সমালোচকরূপ দক্ষ মালীর অভাবে বঙ্গদর্শনের সেই "সাজান বাগান" শুকাইয়া যাইতেছে কেহ কাহাকে মানে না,—সম্ভ্রম-ভয়-সঙ্কোচের চক্ষে কেহ কাহাকে দেখেও না। তাই সুকুমার সাহিত্য-কাননে আগাছা-কুগাছা-কণ্টক-আবর্জ্জনার এত বাড়াবাড়ি হইয়াছে যে, অনেক কষ্ট করিয়া, অনেক বেগ পাইয়া, পায়ে কাঁটা ফোটার যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারিলে, তবে এক আধটী ভাল ফুল তুলিতে পারা যায়।

বঙ্কিম বাবুর সহিত এই প্রবন্ধ লেখকের এক দিন এই সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হয়। তিনি বিশেষ করিয়া বলিলেন, "যদি সাহিত্যের যথার্থ উপকার করিতে চাও, তবে প্রকৃত সমালোচনা করিতে সুরু কর;—ইহাতে তোমার ঐ * * * মাসিক পত্রিকাও বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে।"

সমালোচনার গুরুত্ব সম্বন্ধে বঙ্কিম বাবুর নিজের মত এইরূপ।

"উত্তর-চরিতের" সমালোচনার পূর্ব্বে বিস্তৃত সমালোচনা কিরূপে করিতে হয়, বাঙ্গালী তাহা জানিত না;—বঙ্গদর্শনই প্রথম সেই পথ দেখাইল। বঙ্কিমের এই সমালোচনাশক্তি, বঙ্কিমের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার অন্যতম নিদর্শন।

বঙ্কিমের কি তদানীন্তন সাহিত্য-সহচরগণ, কি ইদানীন্তন উদীয়মান লেখক-সম্প্রদায়—সকলেই বঙ্কিমের আলোকে অল্প-বিস্তর আলোকিত। আজিকার দিনে সাহিত্যে এই যে আধ্যাত্মিকতার প্রাদুর্ভাব, তাহার মূলও সেই বঙ্গদর্শন। বঙ্গদর্শনই প্রথমে আর্য্যশাস্ত্রের অন্তর্মুখ ও বহির্মুখ, বিচার-বিশ্লেষণ করেন। এত গবেষণা, প্রবন্ধের এত বৈচিত্র্য ও অপূর্ব্বত্ব, এবং সর্ব্ববিষয়ে এত উদ্ভাবনী শক্তি, এখনকার দিনে আর কোন মাসিক পত্রে দেখিতে পাই না। তখন, এক বঙ্কিমই যে 'একা-এক-শ' ছিলেন। এক দিকে তাঁহার যেমন প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও চিন্তাশীলতা, অন্য দিকে আবার তেমনই স্বাভাবিক ও সরস রঙ্গরস, হাস্য কৌতুক বিদ্রূপ। আবার তাহা প্রকাশের ভাষাই বা কিরূপ!—সরল, প্রাঞ্জল ও মর্ম্মস্পর্শিনী। তা কি বিজ্ঞান, কি দর্শন; কি ইতিহাস, কি প্রত্নতত্ত্ব; কি ধর্ম্ম, কি সাহিত্য; কি সমালোচনা, কি উপন্যাস,—সে 'ভাবমন্দাকিনী', মর্ম্মস্পর্শিনী, লীলাময়ী ভাষার ও সে সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার কি আর তুলনা আছে? আবার যখন সেই ক্ষিপ্ত "কমলাকান্ত" অতি মিষ্ট, অতি কোমল, অতি করুণ ও ঈষৎ

কান্নার সুরে বাঁশরী বাজাইয়া বাঙ্গালী নর-নারীকে এক দিন উদ্‌ভ্রান্ত করিয়াছিল এবং যে গানের সুরে সুর মিলাইয়া বাবু চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় এক মাত্র "উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম" লিখিয়া ধন্য হইয়াছেন,—বঙ্কিমের সে ভাষার তুলনা কোথায়?

প্রথম চারি বৎসর অতি দক্ষতার সহিত "বঙ্গদর্শনের" সম্পাদন কার্য্য করিয়া, বঙ্কিম বঙ্গবাসীর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। অতঃপর সঞ্জীব বাবু বঙ্গদর্শনের সম্পাদক হন। বঙ্কিম বাবু তখনও ইহাতে নিয়মিতরূপে লিখিতে লাগিলেন। তাঁহার অনেক উপন্যাস, ছোট গল্প ও প্রবন্ধাবলী ইহাতে প্রকাশিত হয়। এই সময়ে বাবু চন্দ্রনাথ বসু, পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, বাবু চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, কবি নবীন-চন্দ্র সেন, বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত প্রভৃতি অনেক উদীয়মান লেখক বঙ্গদর্শনে লিখিতে আরম্ভ করিলেন,—যাঁহাদের যশঃসৌরভে আজ বঙ্গ-দেশ আমোদিত।

কিন্তু ক্রমেই বঙ্গদর্শন হীনপ্রভ হইয়া পড়িতেছে দেখিয়া, সঞ্জীব বাবুও কাগজ বন্ধ করিয়া দিলেন।

দূরদর্শী বঙ্কিম কিন্তু সাহিত্যের গতি বুঝিয়া, দিন থাকিতে খুব সম্মানের সহিত বঙ্গদর্শনের সম্পাদকীয় দায়িত্ব পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। "বঙ্গদর্শনের বিদায় গ্রহণ" উপলক্ষে তিনি যে কয়েকটী কথা বলিয়াছিলেন, তাহাও কত মূল্যবান্! তিনি বলিয়াছিলেন,—"যখন বঙ্গদর্শন প্রকাশআরম্ভ হয়, তখন সাধারণের পাঠযোগ্য অথচ উত্তম সাময়িক-পত্রের অভাব ছিল। এক্ষণে তাদৃশ সাময়িক পত্রের অভাব নাই। *** আমার অপেক্ষা দক্ষতর ব্যক্তিগণ এই ভার গ্রহণ করিয়াছেন দেখিয়া, আমি অত্যন্ত আহ্লাদিত এবং বঙ্গদর্শনের জন্য আমি যে শ্রম স্বীকার করিয়াছিলাম, তাহা সার্থক বিবেচনা করি। *** যখন আমি এই বঙ্গদর্শনের ভার গ্রহণ করি, তখন এমত সঙ্কল্প করি নাই যে, যতদিন বাঁচিব, এই বঙ্গদর্শনে আবদ্ধ থাকিব। ব্রতবিশেষ গ্রহণ করিয়া কেহই চিরদিন তাহাতে আবদ্ধ থাকিতে পারে না। *** আমি একদিনের তরেও ব্যক্তিবিশেষের আদর ও উৎসাহের কামনা করি নাই, কিন্তু সাধারণ পাঠকের এই উৎসাহ ও যত্ন না দেখিলে আমি এতদিন বঙ্গদর্শন রাখিতাম কি না সন্দেহ। যে সকল সহযোগী বঙ্গদর্শনকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন, তাঁহা-দিগকে আমার শত শত ধন্যবাদ। ইহাতেও আমার একটু স্পর্দ্ধার কথা আছে! উচ্চ-শ্রেণীর দেশী সংবাদপত্র মাত্রই বঙ্গদর্শনের অনুকূল ছিলেন; অধিকতর স্পর্দ্ধার কথা এই যে, নিম্নশ্রেণীর সংবাদপত্র মাত্রেই ইহার প্রতি-কূলতা করিয়াছিলেন। ** চারি বৎসর হইল, বঙ্গদর্শনের পত্রসূচনায় বঙ্গদর্শনকে কালস্রোতে জলবুদ্‌বুদ্‌ বলিয়াছিলাম। আজি সেই জল-বুদ্‌বুদ্‌ জলে মিশাইল।"

কথাগুলি স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত করিয়া রাখিবার যোগ্য।

এইবার প্রতিভার গতি আর এক পথে ছুটিল। সাহিত্য, সমাজ, দেশ তাহাতে যে উচ্চশিক্ষা লাভ করিল, যথাস্থানে আমরা সে সকল কথার আলোচনা করিব।

৫।

সাধারণের অপরিচিত, অতি দুর্গম, বিদ্বজ্জন-সমাজ-ঘৃণ্য নূতন একটি পথে আসিয়া প্রতিভাবান্ বঙ্কিম আত্ম-প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিলেন। বিশিষ্ট ক্ষমতা সত্ত্বেও তিনি তদা-নীন্তন হুজুগে মাতিলেন না। যশঃ, সম্ভ্রম ও নামের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া, সবটা মন-প্রাণ এক করিয়া, তিনি বাঙ্গালা-সাহিত্যের সেবায় ব্রতী হইলেন! যদিও তিনি তরুণ বয়সে "Indian Field" নামক কাগজে "Rajmohan's Wife" নামে একখানি ইংরাজী উপন্যাসের কিয়দংশ মাত্র লিখিয়াছিলেন, কিন্তু অবিলম্বে আপন ভ্রম বুঝিতে পারিয়া অতি উচ্চলক্ষ্যে জীবন উৎসর্গ করিলেন।—হৃদয়ের সমস্ত অনুরাগ ও প্রেম দিয়া তিনি বাঙ্গালা-সাহিত্যের সেবায় নিযুক্ত হইলেন। অথচ ইংরাজীতে তিনি কিরূপ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া-ছিলেন, তাহা মনস্বী হেষ্টির সহিত তাঁহার তর্কযুদ্ধে বিলক্ষণ উপলব্ধি হয়। হেষ্টি স্পষ্টা-ক্ষরে এ কথা লিখিয়াছিলেন, "এতদিনে আমি একজন প্রকৃত পণ্ডিতকে প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে পাই-লাম।" বঙ্কিমের অনেক বিশিষ্ট শিষ্যও তখন বিস্ময়ের সহিত বলিয়াছিলেন, "বঙ্কিম বাবুর বাঙ্গালা লেখা অধিক মিষ্ট, কি ইংরাজী লেখা অধিক মিষ্ট?" বল দেখি, চিরদিন ইংরাজী লেখার চর্চ্চা রাখিলে বঙ্কিম কত বড় ইংরাজী-লেখক হইতে পারিতেন?

কিন্তু প্রতিভা ত শুধু নামের কাঙ্গাল নয়,—প্রতিভা কাজ চায়;—পৃথিবীতে কিছু নূতন জিনিস দিবার আশা রাখে।

বঙ্কিমচন্দ্রের সেই প্রতিভার ফল,—তদ্বিরচিত অতি অপূর্ব্ব ও অত্যুৎকৃষ্ট গ্রন্থাবলী। বিশেষ উপন্যাসে বঙ্কিমের অসাধারণ অধিকার। বিশ্ব-বিশ্রুত বঙ্কিমের উপন্যাসাবলীর নূতন পরিচয় আর কি দিব? আমার বোধ হয়, বঙ্কিমের ঠিক সমালোচনার দিন এখনও আসে নাই। তবে আমরা যাহা কিছু বলিয়াছি ও বলিব, তাহা কতকটা ভক্তির অভিব্যক্তি মাত্র। কবির ভাষায় বলি,—

"তোমারি চরণ, করিয়ে স্মরণ,
চ'লেছি তোমারি পথে।
তোমারি ভাবেতে দেখিব তোমারে
ধরি এই মনোরথে॥"

'দুর্গেনন্দিনীর' পূর্ব্বে বাল্যকালে বঙ্কিম "ললিতা" ও "মানস" নামে দুইটী পদ্যময় গল্প লিখেন এবং পঠদ্দশার একটী পুরস্কার-প্রবন্ধও লিখিয়াছিলেন। কিন্তু "দুর্গেশনন্দিনী"কেই আমরা বঙ্কিমের সর্ব্বপ্রথম উপন্যাস বলিয়া গণ্য করিব। অবশ্য ভূদেব বাবুর "ঐতিহাসিক উপন্যাস" ও টেকচাঁদ ঠাকুরের "আলালের ঘরের দুলাল" তৎপূর্ব্বে বিরচিত কিন্তু নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিলে "দুর্গেশনন্দিনী" হইতেই বাঙ্গালায় প্রকৃত উপন্যাসের সৃষ্টি হয়। ইহাতে বঙ্কিমের প্রতিভার সর্ব্বাঙ্গীন স্ফূর্ত্তি না হইলেও, গদ্য-সাহিত্যে স্বাধীন চিন্তা, রচনা-নৈপুণ্যও জাতীয়ভাব এই প্রথম প্রবেশ করিল। সূক্ষ্মদর্শী বঙ্কিম বুঝিলেন, সরস গল্প গুছাইয়া বলিতে পারিলে সহজেই লোক আকৃষ্ট হয়। তাই তিনি তাঁহার সেই সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা উপ-ন্যাসে নিয়োজিত করিলেন। বঙ্কিমের উপন্যাস কিরূপ মনোজ্ঞ, সমগ্র বাঙ্গালা দেশ এবং কোন কোন পাশ্চাত্য প্রদেশও তাহার সাক্ষী। জর্জ্জ ইলিয়টের গভীর-ভাব ও লিপি-কুশলতা, ভিক্টর হিউগোর সূক্ষ্মদৃষ্টি ও মানবচরিত্রে অভিজ্ঞতা, ডিকেন্সের সরস ও মর্ম্মস্পর্শী রসিকতা এবং স্কটের বৈচিত্র্যময় প্লট—এই চারি জনের কিছু কিছু বঙ্কিমের মধ্যে দেখিতে পাই, অথবা এই চারিজনের কিছু কিছু লইয়াই আমাদের বঙ্কিমচন্দ্র। সুতরাং উপন্যাস-জগতে তিনি রাজ রাজেশ্বর।

বঙ্কিমের এই উপন্যাসের ভাষার সহিত আমাদের দেশের 'কথকতা'র তুলনা করিতে পারি। কথক যেমন মধুর কীর্ত্তনাঙ্গে অল্পেই শ্রোতাকে মোহিত করেন,—বঙ্কিমের ভাষাও সেইরূপ সমজদার ও অসমজদার সকল শ্রেণীর পাঠককে শীঘ্রই আকৃষ্ট করিতে পারে। তাঁহার ভাষায় বুঝি কিছু মাদকতা আছে, যাহা পাঠে পাঠককে তন্ময় হইতে

হয়! আবার যখন সেই ক্ষিপ্ত 'কমলাকান্ত' অতি মিষ্ট, অতি কোমল, অতি করুণ ও ঈষৎ কান্নার সুরে বাঁশরী বাজাইতে থাকে,—বল দেখি, তখন কোন্ বাঙ্গালী নর-নারী ক্ষণকালের জন্য না আত্মহারা হয়? তাই বলিতেছিলাম, ভাষাকে লইয়া ক্রীড়া-পুত্তলের মত—যখন যেমন ইচ্ছা—ব্যবহার করিতে এক বঙ্কিম ভিন্ন আর কেহ সমর্থ হন নাই।

একবার যেন শুনিয়াছিলাম, কোন এক খানি পার্শীগ্রন্থে একটী গল্প আছে, এক লেখকের ভাষার উপর প্রবল আধিপত্য জন্মিয়াছিল। ভাষা যেন লেখকের কিঙ্করী-বিশেষ ছিল। সেই লেখক আত্ম-জীবনবৃত্তে লিখিতেছেন, "আমি যখন লিখিতে বসি, তখন আমার চারিদিকে অপ্সরানিন্দিত নারীমূর্ত্তি বিবিধ কারুকার্য্য-খচিত নয়ন-তৃপ্তিকর মনোহর বসন-ভূষণ পরিয়া মধুর নৃত্য করিতে থাকে এবং সাগ্রহে, উপযাচকভাবে বলে, 'আমাকে গ্রহণ কর,—আমাকে গ্রহণ কর।' ভাষা তখন আমার আজ্ঞাকারিণী কিঙ্করী হয়।"

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের ভাষা সম্বন্ধেও আমি এই কথা বলিতে পারি। যাঁহাদের ধারণা, সরল ও মধুর ভাষায় ভাবের গাম্ভীর্য্য নষ্ট হয়,—অধিকন্তু শব্দ-সম্পদের অভাবে ভাষার ভাণ্ডার শূন্য হইয়া পড়ে, তাঁহাদিগকে বঙ্কিমের উপন্যাসাবলী একটু বিশেষ মনোযোগের সহিত পড়িতে অনুরোধ করি। হেলায়-তাচ্ছিল্যে পড়িলে হইবে না,—একটু শ্রদ্ধার সহিত পড়িতে অনুরোধ করি। কারণ, হাসি-মস্করার সহিত অবজ্ঞাভাবে বই পড়িলে,—অন্য পরে কা কথা,—স্বয়ং বেদব্যাসও হারি মানেন! অতএব, বঙ্কিমের উপর যাঁহাদের "নিষ্কাম রাগ" আছে, করযোড়ে তাঁহাদের প্রতি নিবেদন, এই প্রবন্ধ-পাঠের পূর্ব্বে, বঙ্কিমের যে কোন-এক খানি বই, ভাল করিয়া পড়িবেন। তাহা হইলে, বঙ্কিমের সহিত এই প্রবন্ধ-লেখককেও আর 'জাহান্নমে' যাইতে হইবে না। কারণ, এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে যে, সকল-কথার আলোচনা করিতে পারি, এমন সময়ও নাই এবং শক্তিও নাই।

৬।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের মানসিক উন্নতি ও প্রতিভার গতি কখন কোন্ পথে গিয়াছে, তাহা ভাবিবার বিষয়। প্রতিভার এই ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে বঙ্কিমের জীবন বড় বৈচিত্র্যময়। অবশ্য, সাধারণতঃ, তাঁহার উপন্যাসে তিনটি স্তর দেখিতে পাই। "দুর্গেশনন্দিনী", "মৃণালিনী," "কপালকুণ্ডলা" "রজনী" এবং "চন্দ্রশেখরের" কিয়দংশের ভিত্তি সুকুমার কাব্যের উপর স্থাপিত।—নায়ক-নায়িকার প্রেমই ইহার মূলাধার। তারপর বঙ্কিমের দৃষ্টি—হিন্দুর সংসারে ও সমাজে প্রবিষ্ট হইল! তাহার ফল তদ্বিরচিত—"বিষবৃক্ষ," "কৃষ্ণকান্তের উইল" ও "দেবী চৌধুরাণীর" কিয়দংশ। অতঃপর মনের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বঙ্কিমের স্বদেশপ্রীতি ও স্বধর্ম্মভক্তি ফুটিয়া উঠিল।—তাহার ফল—'আনন্দমঠ", "দেবী চৌধুরাণী'র কিয়দংশ ও "সীতারাম"—এবং আর এক অংশে নূতন সংস্করণ "রাজসিংহ"। কিন্তু এই তিন স্তরেরই প্রথম ও প্রধান উপাদান—প্রেম। মানবহৃদয়ের অতি কোমল, অতি সুন্দর, অতি স্বাভাবিক ভাবটি অবলম্বন করিয়া তিনি বিবিধ প্রকারে, অতি সূক্ষ্মভাবে প্রেমের বৈচিত্র্য নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিয়াছেন।

কিন্তু এখানে একটি বিশেষ ভাবিবার বিষয় আছে। উপরে যে ভাবে আমরা বঙ্কিমের উপন্যাসের শ্রেণী বিভাগ করিলাম, তাহা কিন্তু ঠিক পর-পর লেখা নয়। নিম্নলিখিত সময়ে বঙ্কিম নিম্নলিখিত উপন্যাসগুলি প্রণয়ন করেন;—

১৮৬১ খৃঃ অঃ—দুর্গেশনন্দিনী।
২৮৬৭ খৃঃ অঃ—কপালকুণ্ডলা।
১৮৭০ খৃঃ অঃ—মৃণালিনী।

১৮৭২ খৃঃ অঃ—১২৭২ সালে বঙ্গদর্শনের আবির্ভাব হয়। বঙ্গদর্শনে বঙ্কিম বাবুর বাকী উপন্যাসগুলি, কোনখানি সম্পূর্ণরূপে কোনখানি অসম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়। কেবল মাত্র "সীতারাম" খানি "প্রচারে" এবং "দেবী চৌধুরাণী" খানি স্বতন্ত্র পুস্তকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। ১২৭৯ হইতে আরম্ভ করিয়া ১২৮৮ সাল পর্য্যন্ত বঙ্গদর্শনে বিষবৃক্ষ, ইন্দিরা, রাধারাণী, যুগলাঙ্গুরীয়, রজনী, চন্দ্রশেখর, কৃষ্ণকান্তের উইল, রাজসিংহ, আনন্দমঠ প্রকাশিত হয়। অতঃপর, যথাসময়ে উপন্যাসগুলি স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইতে লাগিল।

এখন বুঝিয়া দেখুন, যে হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের শ্রেণী-বিভাগ আমরা করিয়াছি, তাহাতে আর উল্লিখিত হিসাবে বঙ্কিমের মানসিক উন্নতি ও প্রতিভার গতি ঠিক খাপ খায় না! ইহার উপরও আবার বঙ্কিমের বিবিধ প্রবন্ধ, ঐতিহাসিক গবেষণা, গভীর ধর্ম্মতত্ত্ব ও গীতার সমস্যা-ব্যাখ্যা এবং লোকরহস্য, বিজ্ঞানরহস্য, কমলাকান্তের দপ্তর প্রভৃতি আছে। তবেই বুঝিয়া দেখুন, একটা লোকের প্রতিভার গতি কখন্ কোন্ পথে ছুটিয়াছে, ঠিক নির্ণয় করিবার যো নাই। কিন্তু ইহাতেই বঙ্কিমের অধিক কৃতিত্ব ও বিশেষত্ব প্রমাণিত হয়।

আমার বোধ হয়, বঙ্কিমের প্রতিভা ও মনের ক্রমবিকাশ ঠিক পর্ব্বতের সহিত তুলনীয়। পর্ব্বত যেমন আঁকা-বাঁকা, সূক্ষ্ম-স্থূল-বন্ধুর ও বিশৃঙ্খলতায় অলৌকিক সৌন্দর্য্যশালী, বঙ্কিমের প্রতিভাও সেইরূপ শৃঙ্খলাহীন, কিন্তু অসীম শক্তিশালিনী ও লাবণ্যময়ী। পর্ব্বত সুন্দর কেন?—না, তাহা বৈচিত্র্যময়!—এই প্রস্তর, ঐ গহ্বর, এখানে গুল্ম, ওখানে প্রস্রবণ, এই আলো, ঐ ছায়া,—আবার ঐ গগনভেদী শিখর,—প্রকৃতির সে অপূর্ব্ব-দৃশ্য অতি বিশৃঙ্খল হইয়াও সুন্দর, অতুলনীয় সুন্দর!—বিশৃঙ্খল বলিয়াই সুন্দর, অথবা পর্ব্বতের এই বিশৃঙ্খলতাই পর্ব্বতের সৌন্দর্য্য। বাহিরের এই সৌন্দর্য্য ব্যতীত আবার বুকে কত আশা, কত প্রেম!—পর্ব্বত কত জীব-জন্তুর আশ্রয়-স্থল, কত সাধু সন্ন্যাসীর সমাধি-মন্দির;—কত রত্নের আকর!—জীবনদায়িনী তরঙ্গিনী কুলু কুলু রবে পর্ব্বতের পাদতল বিধৌত করিয়া প্রবাহিতা;—পর্ব্বতের ভিতর-বাহির সুন্দর।

বঙ্কিমের প্রতিভা সম্বন্ধেও আমি এই কথা বলিতে পারি। তাঁহার প্রতিভার কোন শৃঙ্খলা ছিল না। অথবা এই বিশৃঙ্খলতাই তাঁহার প্রতিভাকে সর্ব্বতোমুখী করিয়াছে। বিশৃঙ্খল বলিয়াই তাঁহার প্রতিভা এত শক্তিশালিনী ও সৌন্দর্য্যময়ী। এই দেখি, বঙ্কিম গীতার ব্যাখ্যা লইয়া মস্তক আলোড়িত করিতেছেন, আবার পরক্ষণেই দেখি, একটি চুট্‌কি গল্প বা 'চোস্ত' রসিকতার অবতারণা করিলেন। আবার হয়ত পরক্ষণেই দেখিতে পাইলাম, অতি গম্ভীর ভাবে গুরুপদে আসীন হইয়া 'ধর্ম্মতত্ত্বের' অনুশীলনবাদ (Culture) বুঝাইতে বসিয়াছেন, অথবা কোন ঐতিহাসিক-তত্ত্ব-উদ্ঘাটনে নিযুক্ত আছেন! গীতার বা ধর্ম্মতত্ত্বের বিশ্লেষণ-ব্যাখ্যা পড়িয়া যে মুহূর্ত্তে আকাশ-পাতাল ভাবিয়াছি, পর মুহূর্ত্তেই তাঁর প্রতিভার আর এক মূর্ত্তি দেখিয়া অবাক্ হইয়াছি। তাই বলিতেছিলাম, প্রতিভার এই এলো-মেলো বিশৃঙ্খল-ভাব খুব বড় কবি ভিন্ন,—বঙ্কিমের ন্যায় কবি ভিন্ন আর কোথাও দেখিতে পাইবে না।

বঙ্কিমের উপন্যাসাবলী ও অন্যান্য গ্রন্থের আলোচনার পূর্ব্বে বঙ্কিমকে একটু ভাল করিয়া চিনিতে হইবে। কারণ, তাঁহাকে না চিনিলে তাঁহার গ্রন্থগুলি, বিশেষ উপন্যাসাবলী চেনাও

কঠিন হইবে। তাই আমরা একটু অধিক বিস্তৃত ভাবে, এতক্ষণ বঙ্কিম সম্বন্ধে নানা কথার আলোচনা করিলাম। যদি এ আলোচনা সার্থক হইয়া থাকে, তবে বঙ্কিমের উপন্যাসাবলী ও অন্যান্য গ্রন্থ বুঝিতে, বোধ হয়, আমাদের অধিক কষ্ট হইবে না।

৭।

বাবু শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় "সাধনা"য় "বঙ্কিম-প্রসঙ্গ" শীর্ষক যে একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহার এক স্থল আমরা এখানে উদ্ধৃত করিলাম। বঙ্কিম বাবু কথাপ্রসঙ্গে নিজেই বলিতেছেন,—

"আমার জীবনে অনেক ভ্রম-প্রমাদ আছে, তা বলা বড় কঠিন, কাজেই জীবনী হইল না। সে সব বলিতে পারিলে অনেক কাজ হয়। আমার জীবন অবিশ্রান্ত সংগ্রামের জীবন। একজনের প্রভাব আমার জীবনে বড় বেশী রকমের—আমার পরিবারের। আমার জীবনী লিখিতে হইলে তাঁহারও লিখিতে হয়। তিনি না থাকিলে আমি কি হইতাম, বলিতে পারি না। আমার যত ভ্রম-প্রমাদ তিনি জানেন আর আমি জানি। আমার জীবনের কতক বড় শিক্ষাপ্রদ, সকল বলিলে লোকে ভাবিবে, কি যে কি এক রকমের অদ্ভুত লোক ছিল। আগে আমি নাস্তিক ছিলাম। তাহা হইতে হিন্দুধর্ম্মে আমার মতি-গতি আশ্চর্য্য রকমের। কেমন করিয়া তাহা হইল জানিলে লোকে আশ্চর্য্য হইবে। আমি আপন চেষ্টায় যা কিছু শিখেছি। কুসংসর্গটা ছেলে বেলায় বড় বেশী হ'য়েছিল। বাপ থাকৃতেন বিদেশে, মা সেকেলের উপর আর একটু বেশী, কাজেই তাঁর কাছে কিছু শিক্ষা হয় নি। নীতিশিক্ষা কখন হয় নি। আমি যে লোকের ঘরে সিঁদ দিতে কেন শিখিনি বলা যায় না।"

এমন অকপট ও উদার-প্রকৃতি না হইলে কি প্রকৃত কবি হইতে পারে? এমন সাফ্ সত্য কথা বলিতে পারে, আজকার দিনে কয়টা লোক? বঙ্কিম কথায় যেমন, কাব্যেও সেইরূপ সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন। যেখানে যেমন কথাটী প্রাণে উপলব্ধি করিয়াছেন,—দেশ, কাল, পাত্র—কোন দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বস্তুতঃ, সত্যবাদিতা, নির্ভীকতা ও তেজস্বিতা-গুণে বঙ্কিমের উপন্যাসাবলী এত প্রবলরূপে পাঠকের হৃদয়ের উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়াছে।

বঙ্কিমের উপন্যাসাবলীর তিনটা ভাগ করিলেও, সকল গ্রন্থেই তাঁহার নিজের একটা 'ধাত' দেখিতে পাই। সেই টুকুই তাঁহার বিশেষত্ব, সেইটুকুই বঙ্কিমের নিজস্ব ধন। আজি পর্য্যন্ত কোন লেখক তাহার অনুকরণে সমর্থ হন নাই। সেই নিজস্ব ধন,—অতি গভীর ও গম্ভীর বিষয়ের সহিত তাঁহার সেই "নির্ম্মল, শুভ্র, সংযত হাস্য।" এমন সুরসিকতা আর কাহার লেখায় দেখিতে পাও? এক গাদা লেখার সহিত যদি বঙ্কিমের দুই চারিটীও 'বুক্‌নি' থাকে, বুদ্ধিমান পাঠক তাহা অনায়াসে টানিয়া বাহির করিতে পারেন।

আদর্শ-চরিত্র-সৃজনে বঙ্কিম অদ্বিতীয়। এ বিষয়ে অনেক বিশিষ্ট পাশ্চাত্য ঔপন্যাসিকও তাঁহার নিকট হারি মানেন। বঙ্কিম হিন্দু কবি; পূর্ব্বজন্মে ও পরকালে তাঁহার বিশ্বাস আছে,—তাই তিনি সীতা-সাবিত্রীর দেশের হিন্দু-রমণীকে সীতা-সাবিত্রীর মত করিতে চান।—সংসারের খুটী নাটী লইয়া চরিত্র বিশ্লেষণে তাঁহাকে বড় বেগ পাইতে হয় না। এই সম্বন্ধে গত শ্রাবণ মাসের "নব্য-ভারতে" একটী সুন্দর প্রবন্ধ প্রকাশ হইয়াছিল। লেখক বলিতেছেন, "এইজন্যই দেখা যায়, হিন্দু কবি প্রায়ই আদর্শ-চরিত্র সৃষ্টি করেন। পূর্ব্বকার রামায়ণ মহাভারত হইতে আধুনিক উপন্যাস পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই হিন্দু-কবির চেষ্টা, আদর্শ চরিত্র সৃষ্টি। অদৃষ্ট ও পুরুষকারের সহিত যুদ্ধে পুরুষকারের জয় ঘোষণা করাই হিন্দু-কবির প্রধান উদ্দেশ্য। * * * কিন্তু ইউরোপীয় কবিগণ কাব্যে বা উপন্যাসে প্রায়ই এরূপ আদর্শ-চরিত্র সৃষ্টির চেষ্টা করেন নাই। * * * পূর্ব্বকার কথা যাউক, আমাদের দেশের চন্দ্রশেখর, প্রতাপ, সত্যানন্দ, সূর্য্যমুখী, লবঙ্গলতা, প্রফুল্ল ও শ্রীর মত আদর্শ-চরিত্র-চিত্রও বিলাতী নবেলে পাওয়া যায় না।" * লেখক এ কথা সপ্রমাণ করিবার জন্য মনস্বী রাস্কিনের "Queen's Garden" শীর্ষক প্রবন্ধের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, অন্য পরে কা কথা,—"বিলাতী কবি সেক্সপিয়র বা স্কট্ কেহই বড় আদর্শ নর-চরিত্র সৃষ্টি করেন নাই, কয়টী বিলাতী আদর্শ নারী-চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন মাত্র।" লেখক আর এক স্থানে বলিয়াছেন, "এই বিশেষত্বের প্রথম কারণ, (প্রথম কেন, প্রধান এবং একমাত্র কারণ বলিলেও দোষ হয় কি?) হিন্দুর ধর্ম্মভাব। * * * বাঙ্গালার প্রধান কবি, তাঁহার অতুল্য প্রতিভাবলে তাঁহার উপন্যাসে এই বিশেষত্ব রক্ষা করিয়াছেন। * * * শুধু বাঙ্গালায় কেন, যখন জগতের সাহিত্য মধ্যে এই উপন্যাসগুলি প্রচার হইবে, (আশা করা যায়, সেদিন আসিতে বড় অধিক বিলম্ব নাই) তখন উল্লিখিত বিশেষত্ব জন্যই এই সকল উপন্যাস সমস্ত জগৎ মধ্যে বিশেষ আদৃত হইবে এবং সে গুলি জগতের উপন্যাস মধ্যে অতি শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিবে।"

দেবেন্দ্রবিজয় বাবুর যে কথা, আমাদেরও সেই কথা। বস্তুতঃ বঙ্কিমের উপন্যাসগুলি

* শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রবিজয় বসু-লিখিত "বাঙ্গালা উপন্যাসের বিশেষত্ব"। নব্যভারত, বাদশখণ্ড; ৪র্থ সংখ্যা।

আমরা এতদূর সম্মানের চক্ষে দেখি। তাঁহার লক্ষ্য বড় উচ্চ, বড় মহান্।—সমগ্র জগৎ যাহার আদর্শ লইয়া চলিতে পারে, প্রতিভাবান্ বঙ্কিম সেইরূপ সার্ব্বজনীন আদর্শ-চরিত্র সৃষ্টি করিয়া, নর-জগতে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন।

বঙ্কিমের উপন্যাসের স্ত্রীচরিত্র যে এত উচ্চ আদর্শে অঙ্কিত, তাহার প্রধান কারণ, নারী-জাতিকে তিনি বিশেষ সম্মানের চক্ষে দেখিতেন। তিনি নিজেও বলিতেন, "এ দেশের স্ত্রীরাই মানুষ"। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত অক্ষয়-চন্দ্র সরকার মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি, 'বঙ্কিম বাবুর উপন্যাসের আধখানা তাঁহার স্ত্রী"। অর্থাৎ গুণবতী সতী-সাধ্বী সহধর্ম্মিণীর গুণাবলীর আদর্শে তাঁহার অধিকাংশ স্ত্রীচরিত্র প্রস্ফুটিত। শ্রীশ বাবুর "বঙ্কিম-প্রসঙ্গের" সেই ছত্রটিও এখানে পুনরায় উল্লেখ করিতে পারি,—"একজনের প্রভাব আমার জীবনে বড় বেশী রকমের—আমার পরিবারের"। বস্তুতঃ, নারীজাতির প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা না থাকিলে বঙ্কিম বাবু উপন্যাসে কখনই এমন অক্ষয়কীর্ত্তি স্থাপন করিতে পারিতেন না। ইউরোপের এমন একদিন গিয়াছে, যখন Knight গণ Chivalric Spirit এ নারীজাতির প্রতি বিশিষ্ট সম্মান দেখাইতেন। স্ত্রীজাতির প্রতি আমাদের বঙ্কিমের শ্রদ্ধা ও সম্মান, বোধ হয়, তাহা অপেক্ষাও অধিক।

স্ত্রীচরিত্রে তাঁহার প্রধান বিশেষত্ব এই যে, সকল শ্রেণীর স্ত্রীলোককেই তিনি তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে পারিতেন। যখন দেবী আঁকিয়াছেন, তখনও যেমন গুণপনার পরিচয় দিয়াছেন, যখন দানবী আঁকিয়াছেন, তখনও সেইরূপ সূক্ষ্ম-দর্শিতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। তাঁহার ভ্রমর, সূর্য্যমুখী, লবঙ্গলতা, প্রফুল্ল, শ্রী, জয়ন্তী, শান্তি, কপালকুণ্ডলা প্রভৃতি স্ত্রী-চরিত্র অতি অপূর্ব্ব সৃষ্টি—এমন সৃষ্টি কেবল প্রকৃতির

বিশাল বুকে ও কবির মানসপটেই শোভা পায়। আবার যখন দানবী হীরা, রোহিণী ও জেব-উন্নিসা—এবং আর এক অংশে কলঙ্কিনী শৈবলিনীকে আঁকিয়াছেন, তখনও সেইরূপ অসাধারণ শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়াছেন। জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত দেখাইতে এমন 'ওস্তাদী' হাত আর কোথাও দেখি না। "মানব জীবনের কঠোর সমস্যা বিশ্লেষণকেই" বঙ্কিম বাবু উপন্যাস বলিতেন। আমার প্রিয়-সুহৃৎ, সূক্ষ্মদর্শী ও সুলেখক শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসন্ন রায় চৌধুরী মহাশয় বঙ্কিম বাবুর উপন্যাসাবলীর সমালোচনা ও বিশ্লেষণ-ব্যাখ্যায় অতি দক্ষতার সহিত এই কথা প্রমাণ করিতেছেন।* মানবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৃত্তি যে প্রেম, সেই অহেতুক অপার্থিব বস্তু লইয়া বঙ্কিম সেই "মানব জীবনের মহা সমস্যা" 'ছকে' আঁকিতেন। এই ছকে তাঁর প্রতাপ, চন্দ্রশেখর, নগেন্দ্রনাথ, গোবিন্দলাল, অমরনাথ প্রভৃতি অঙ্কিত। প্রেমে কেহ নিজে পুড়িয়াছেন, কেহ আর এক জনকে পোড়াইয়াছেন।

গল্পের 'প্লট' উদ্ভাবনে বঙ্কিমের তেমন কৃতিত্ব ছিল না; কিন্তু সামান্য ঘটনা লইয়া তিনি যে ছবি আঁকিতে পারিয়াছেন, কি পাশ্চাত্য কবি আর কি অন্য বঙ্গীয় কবি বা ঔপন্যাসিক, কেহই তাহাতে সমর্থ নহেন। অবশ্য, বঙ্কিমের সকল গল্প Original না হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে কিছু-আসে যায় না। মহাকবি সেক্সপিয়রও অন্য গ্রন্থ হইতে গল্পের সারভাগ সঙ্কলন করিয়া নাটকাদি লিখিয়া দিয়াছেন। আর আমাদের 'ভারতের কালিদাস' যে অপূর্ব্ব "অভিজ্ঞান শকুন্তল" গ্রন্থ লিখিয়া জগতের পূজ্য হইয়া আছেন, তাহার মূলও ত সেই মহাভারত অথবা মতান্তরে "পদ্মপুরাণ।"†

আর এই সেদিন মনস্বী শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়, বাঙ্গালার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার-পাঠ্য মহাকবি ভারতচন্দ্রের "বিদ্যাসুন্দরের" গল্পে Origin কোথায়, স্পষ্টাক্ষরে দেখাইয়া দিয়াছেন।* তাই বলিয়াই কি সেই জগদ্বিখ্যাত কবিকুলের গৌরবহানি ও কবিত্ব "নকড়া-ছকড়া" হইয়া গেল? সেক্সপিয়র বা কালিদাস এবং ভারতচন্দ্র বা বঙ্কিমচন্দ্র যেমন সর্ব্বত্রই পূজিত হইতেছেন, চিরদিনই সেইরূপ পূজা পাইবেন। আসল কথা হইতেছে প্রতিভা, আর সেই প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী কি না?

সাহস করিয়া বলিতে পারি, হাঁ, বঙ্কিমের প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী।

৮।

এখন আমরা দেখাইতে চাই, এক উপন্যাসের মধ্যেই আমাদের বঙ্কিম—কবি, দার্শনিক, নীতিবেত্তা, ঐতিহাসিক, নাটককার ও সমালোচক। এখন সংক্ষেপে আমরা এই কথাটী প্রমাণ করিতে চেষ্টা পাইব।

কবি বঙ্কিমের কবিত্ব;—আনন্দমঠের সেই "বন্দে মাতরং" গানটী পাঠ করুন;—

"বন্দে মাতরং।
সুজলাং, সুফলাং, মলয়জশীতলাং,
শস্যশ্যামলাং, মাতরং।
শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনীং
ফুল্ল কুসুমিত-দ্রুমদল শোভিনীং
সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীং
সুখদাং বরদাং মাতরং।
সপ্তকোটি কণ্ঠ-কলকলনিনাদ করালে
দ্বিসপ্তকোটি ভুজৈর্ধৃতখর-করবালে
কে বলে মা তুমি অবলে!
বহুবলধারিণীং নমামি তারিণীং
রিপুদলবারিণীং মাতরং।

তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম্ম
তুমি হৃদি তুমি মর্ম্ম
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।
বাহুতে তুমি মা শক্তি
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি
তোমারই প্রতিমা গড়ি
মন্দিরে মন্দিরে।
ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী
কমলা কমল-দল-বিহারিণী
বাণী বিদ্যাদায়িনী
নমামি ত্বাং।
নমামি কমলাং অমলাং অতুলাং
সুজলাং সুফলাং মাতরং
বন্দে মাতরং
শ্যামলাং সরলাং সুস্মিতাং ভূষিতাং
ধরণীং ভরণীং মাতরং।"

এমন গান আজিকার দিনে আর কোন্ কবি গাহিতে পারেন? বঙ্কিমের কবিত্ব বুঝিলে?

পাঠক! 'চন্দ্রশেখরে' প্রতাপ-শৈবলিনীর সেই "অগাধ জলে সাঁতার" দৃশ্যটী মনে করুন;—

"দুইজনে সাঁতারিয়া, অনেক দূর গেল। কি মনোহর দৃশ্য! কি সুখের সাঁতার! এই অনন্ত দেশব্যাপিনী, বিশাল-হৃদয়া, ক্ষুদ্র বীচিমালিনী, নীলিমাময়ী তটিনীর বক্ষে, চন্দ্রকর সাগরমধ্যে ভাসিতে ভাসিতে, সেই ঊর্দ্ধস্থ অনন্ত নীল-সাগরে দৃষ্টি পড়িল। তখন প্রতাপ মনে করিল, কেনই বা মনুষ্যঅদৃষ্টে ঐ সমুদ্রে সাঁতার নাই? কেনই বা মানুষে ঐ মেঘের তরঙ্গ ভাঙ্গিতে পারে না? কি পুণ্য করিলে ঐ সমুদ্রে সন্তরণকারী জীব হইতে পারি? সাঁতার? কি ছার ক্ষুদ্র পার্থিব নদীতে সাঁতার? জন্মিয়া অবধি এই দুরন্ত কাল-সমুদ্রে সাঁতার দিতেছি। তরঙ্গ ঠেলিয়া তরঙ্গের উপর ফেলিতেছি,—তৃণবৎ তরঙ্গে তরঙ্গে বেড়াইতেছি—আবার সাঁতার কি?

"প্রতাপ ডাকিল, "শৈবলিনী—শৈ"

"শৈবলিনী চমকিয়া উঠিল—হৃদয় কম্পিত হইল। বাল্যকালে প্রতাপ তাহাকে "শৈ" বা "সই" বলিয়া ডাকিত। আবার সেই প্রিয় সম্বোধন করিল, কতকাল পরে! বৎসরে কি কালের মাপ! ভাবে ও অভাবে কালের মাপ। শৈবলিনী যত বৎসর সেই শব্দ শুনে নাই, শৈবলিনীর সেই এক মন্বন্তর। এখন শুনিয়া শৈবলিনী সেই অনন্ত জলরাশি মধ্যে চক্ষু মুদিল। মনে মনে চন্দ্র তারাকে সাক্ষী করিল। চক্ষু মুদিয়া বলিল, "প্রতাপ! আজিও এ মরা-গঙ্গায় চাঁদের আলো কেন?"

কবিত্ব কাহাকে বলে, দেখিলে? আ মরি মরি! কি সুর রে!

আরও শুনিবে? তবে শুন। প্রতাপ বলিতেছে, "শপথ কর,—আমাকে স্পর্শ করিয়া শপথ কর—আমার মরণ বাঁচন শুভাশুভের তুমি দায়ী——

"শৈ। তোমার শপথ—তুমি বা বলিবে, ইহজন্মে তাহাই আমার স্থির।"

* * * * * *

"শৈবলিনী শপথ করিতে পারিল না। বলিল—"এ সংসারে আমার মত দুঃখী কে আছে, প্রতাপ?

"প্র। আমি!

"শৈ। তোমার ঐশ্বর্য্য আছে,—বল আছে—কীর্ত্তি আছে—বন্ধু আছে—ভরসা আছে,—রূপসী আছে—আমার কি আছে প্রতাপ?

"প্র। কিছু না—আইস তবে দুইজনে ডুবি।"

বঙ্কিমের কবিত্বশক্তির বিচারে বোধ হয় আর উদ্ধৃত করা নিষ্প্রয়োজন।

---

* বঙ্কিমচন্দ্র, ১ম ও ২য় ভাগ।

† শ্রীযুক্ত বিহারিলাল সরকার-লিখিত "অভিজ্ঞান শকুন্তল ও পদ্মপুরাণ"—জন্মভূমি, ১ম বর্ষ।

* সাহিত্য, চতুর্থ বৎসর, ১৩০০।

এইবার দার্শনিক বঙ্কিমের একটু পরিচয় লউন ;—

'বন্ধু-কন্যা,' ভ্রমরের জীবনরক্ষার্থ নিশাকর ভাবিতেছেন, "আমি কি নৃশংস! একজন স্ত্রীলোকের সর্ব্বনাশ করিবার জন্য কত কৌশল করিতেছি! অথবা নৃশংসতাই বা কি? দুষ্টের দমন অবশ্যই কর্ত্তব্য। * * কিন্তু আমার মন ইহাতে প্রসন্ন নয়। রোহিণী পাপীয়সী, পাপের দণ্ড দিব; পাপ-স্রোতের রোধ করিব; ইহাতে অপ্রসাদই বা কেন? বলিতে পারি না, বোধ হয়, সোজা পথে গেলে এত ভাবিতাম না।* * * আর পাপ পুণ্যের দণ্ড পুরস্কার দিবার আমি কে? আমার পাপ পুণ্যের যিনি দণ্ড পুরস্কার করিবেন, রোহিণীরও তিনি বিচারকর্ত্তা। বলিতে পারি না, হয়ত তিনিই আমাকে এই কার্য্যে নিয়োজিত করিয়াছেন। কি জানি,

"ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন
যথা নিযুক্তোস্মি তথা করোমি।" *

বোধ করি, পৃথিবীর আবহমান কাল হইতে এই তত্ত্বের রহস্য উদ্ঘাটনে দার্শনিকগণ মস্তক আলোড়িত করিতেছেন।

নীতিবেত্তা বঙ্কিমের একটু পরিচয় গ্রহণ করুন ;—

রমানন্দস্বামী চন্দ্রশেখরকে উপদেশ দিতেছেন ;—

"শুন, বৎস চন্দ্রশেখর! যে সকল বিদ্যা উপার্জ্জন করিলে, সাবধানে প্রয়োগ করিও। আর কদাপি সন্তাপকে হৃদয়ে স্থান দিও না। কেন না, দুঃখ বলিয়া একটা স্বতন্ত্র পদার্থ নাই। সুখ দুঃখ তুল্য বা বিজ্ঞের কাছে একই। যদি প্রভেদ কর, তবে যাহারা পুণ্যাত্মা বা সুখী বলিয়া খ্যাত, তাহাদের চিরদুঃখী বলিতে হয়।"

যে ধর্ম্মাত্মা চন্দ্রশেখর 'আত্মশোণিততুল্য' গ্রন্থাদি দাহ করিয়া গুরুপদে শরণ লইয়াছেন, সেই গুরু তাঁহাকে এই উপদেশ দিতেছেন। ধর্ম্মবেত্তা 'পুলপিটে' দাঁড়াইয়াও হৃদয়ে এ ভাব দিতে পারেন না, কবি বঙ্কিম রং ফলাইয়া তাহা কাব্যচিত্রে অতি উজ্জ্বলরূপে পাঠকের চক্ষের সম্মুখে ধরিয়াছেন।

ঐতিহাসিক বঙ্কিম তাঁহার নূতনসংস্করণ "রাজসিংহে" ভারতের ইতিহাসের একটী সুন্দর ছবি আঁকিয়াছেন। অসঙ্কোচে বলিতে পারি, এই 'রাজসিংহ'ই বঙ্গসাহিত্যের একমাত্র প্রকৃত ঐতিহাসিক উপন্যাস।

নাটককার বঙ্কিম 'সীতারাম'-চিত্রে ও 'পশুপতি'-চরিত্রে অতি সুন্দররূপে নাটকের ক্রমবিকাশ দেখাইয়াছেন।

সমালোচক বঙ্কিম "কপালকুণ্ডলা"য় অদৃষ্টবাদের কেমন সুন্দর সমালোচনা করিয়াছেন, দেখিবেন।

কবিত্বে, দর্শনে, নীতিউপদেশে, ইতিহাসে, নাটকে ও সমালোচনায় বঙ্কিম কিরূপ শক্তিমন্ত, পাঠক সে পরিচয় আরও পাইবেন।

বঙ্কিম আত্মজীবনে ঝুঝিয়াছিলেন এবং কাব্যেও বিধিমতে বুঝাইয়া গিয়াছেন, "সুখ আত্মপ্রতিষ্ঠায় নহে—আত্ম-বিসর্জ্জনে।"

'জয়ন্তী'র মুখে পাঠক ইহার সম্যক্ পরিচয় গ্রহণ করিতে পারেন।

আর একজন চিন্তাশীল ভাবুক এই কথাটা স্থানান্তরে বড় মর্ম্মস্পর্শিনী ভাষায় লিখিয়াছেন ;—"বাল্মীকিকে স্বর্গযাত্রার জন্য অনুরোধ করিলে বাল্মীকি বারিধারাপ্লুত নয়নে ব্রহ্মার চরণে লুণ্ঠিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, দেবাদিদেব! আমি অতি পাপিষ্ঠ, আমি অতি নরাধম, আমি আপনার কথা রাখিতে পারিলাম না। আমি যে সকল পাপ করিয়াছি, আজিও ত তাহার প্রায়শ্চিত্ত হয় নাই, প্রভু! আমি পাপপঙ্কে মগ্ন, স্বর্গে যাইয়া কি করিব, দয়াময়! আমি মানুষের যে অপকার করিয়াছি, সব

* কৃষ্ণকান্তের উইল।

মানুষকে সম্যক সুখী করিতে না পারিলে আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত কেমন করিয়া হইবে, দীননাথ! এখনও মানুষের অভিমান আছে। এখনও আমি ব্রাহ্মণ, আমি ক্ষত্রিয়, আমি পণ্ডিত, আমি মূর্খ, আমি ধনী, আমি দরিদ্র, বলিয়া অভিমান আছে। ইহাতে মানুষ সুখী হইল কই, ব্রহ্মন্! যখন এই অভিমান যাইবে, তখন সমস্ত পৃথিবী শুদ্ধ স্বর্গে যাইবে। তখন আপনার কথা রাখিব, দয়াময়! আমায় এবার ক্ষমা করুন, দয়াল প্রভু—" *

এমনই "পরের মঙ্গল-মন্দিরে আপনার প্রাণের প্রাণ বলি" দিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই না বাল্মীকি আদিকবি—মহাকবি?—"রামায়ণের" ন্যায় মহাকাব্যের কবি? এমন পরার্থপরতা ছিল বলিয়াই না তিনি মনুষ্যদেহেই সেই "শঙ্খচক্রধারী মুরারি"র বিরাটমূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন?

অতি বড় উচ্চ আদর্শ—"পরের মঙ্গল-মন্দিরে প্রাণের প্রাণ বলি" দিতে মহাকবি বঙ্কিম জগতকে ইঙ্গিত করিতেছেন। তদ্বিরচিত প্রায় সকল উপন্যাস হইতেই একথা সপ্রমাণ করা যায়। কিন্তু উপস্থিত ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সম্যক্ প্রকারে তাহা প্রমাণ করা একরূপ অসম্ভব এবং বোধ করি, বিশেষ আবশ্যকও নাই। পাঠককে বঙ্কিমের উপন্যাসাবলী একটু নিবিষ্টচিত্তে পাঠ করিয়া এ বিষয় অনুভব করিতে হইবে।

এইবার আমরা তাঁহার উপন্যাসাবলী ও অন্যান্য গ্রন্থগুলির অতি সংক্ষিপ্ত সমালোচনা করিয়া দেখাইব, বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার স্থান কোথায়?

৯।

বঙ্কিমের উপন্যাসের প্রধান একটী বিশেষত্ব এই যে, প্রায় সকল গুলিতেই এক একটী মহাপুরুষের চরিত্র—গুরুর চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। তাঁহার সর্ব্বপ্রথম উপন্যাস—'দুর্গেশনন্দিনী' হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্ব শেষ উপন্যাস—'সীতারাম' পর্য্যন্ত এই গুরুর আলোকে উজ্জ্বলীকৃত। গুরু, ইহ-পরকালের একমাত্র সহায়, সংসার-গহনে পথ-প্রদর্শক। হিন্দুর গুরুবাদে বঙ্কিমের আন্তরিক আস্থা ছিল। জাতীয় সাহিত্যে—বিশেষ কাব্য-উপন্যাসে এ জিনিসটী সম্পূর্ণ নূতন।

অদৃষ্টবাদেও বঙ্কিমের বিশ্বাস ছিল। 'কপালকুণ্ডলার' ভবানী পাদপদ্মে বিল্বপত্রদান তাহার অন্যতম নিদর্শন। কাব্যাংশে কপালকুণ্ডলা বঙ্কিমের এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি, এবং এই কপালকুণ্ডলাই কাব্যাংশে তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস। কারণ, ইহা বিশেষ কোন একটা উদ্দেশ্য লইয়া লিখিত নহে। কাব্যের যাহা চরম লক্ষ্য—নিরবচ্ছিন্ন বিমল সৌন্দর্য্য সন্দর্শন, তাহা এই প্রকৃতি-পালিতা, স্বভাবসুন্দরীর আদর্শ-চরিত্রে প্রস্ফুটিত। সেই ভীষণ সাগর-উপকূলে, নবকুমারের সমক্ষে সর্ব্বপ্রথমে আমরা এই মোহিনীমূর্ত্তি দেখিতে পাই। অতি কোমল, অতি স্নিগ্ধ, অতি মধুর স্বরে কপালকুণ্ডলা নবকুমারকে কহিল, "পথিক, পথ ভুলিয়াছ?"

কোথায় এই স্বর, আর কোথায় সেই দুরন্ত কাপালিকের বজ্রকঠোর ধ্বনি! কিন্তু সেই কঠোরতার মধ্যেও, স্বভাবের কেমন কমনীয়তা দেখ।

পাঠক, কুলীনপত্নী শ্যামাসুন্দরীর সহিত কপালকুণ্ডলার কথোপকথন একটু শুনুন ;—

"শ্যামাসুন্দরী। ভাল, আমার সাধটী পুরাও। একবার আমাদের গৃহস্থের মেয়েদের মত সাজ। কত দিন যোগিনী থাকিবে?"

"মৃন্ময়ী। যখন এই ব্রাহ্মণ সন্তানের সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই, তখন ত আমি যোগিনীই ছিলাম।

* শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রণীত "বাল্মীকির জয়।"

"শ্যা। এখন আর থাকিতে পারিবে না।

"মৃ। কেন থাকিব না।

"শ্যা। কেন? দেখিবি? তোর যোগ ভাঙ্গিব। পরশপাতর কাহাকে বলে জান?

"মৃ। না।

* * * * *

মৃণ্ময়ী কিছুতেই গৃহস্থের মেয়েদের মত হইতে চাহে না।

* * *

"শ্যা। বল দেখি, ফুলটী ফুটিলে কি সুখ?

"মৃ। লোকের দেখে সুখ; ফুলের কি?"

* * * *

সমালোচক বঙ্কিম এই অবসরে একটু সমালোচনা করিয়া লইলেন;—"ফুলের ফুটিয়াই সুখ। পুষ্পরস, পুষ্পগন্ধ বিতরণই তাহার সুখ। আদান প্রদানই পৃথিবীর সুখের মূল, দ্বিতীয় মূল নাই।"

* * * *

"শ্যা। আচ্ছা—তাই যদি না হইল;—তবে শুনি দেখি তোমার সুখ কি?"

"মৃ। (কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া) বলিতে পারি না। বোধ করি, সমুদ্রতীরে সেই বনে বনে বেড়াইতে পারিলে আমার সুখ জন্মে।"

দেখিলে পাঠক, প্রকৃতি-পালিতা কপালকুণ্ডলার প্রকৃতি! প্রকৃতির মুক্তপ্রাঙ্গণে যে বর্দ্ধিত, তাহাকে কি গৃহস্থের মেয়ের মত ঘরে রাখিতে পার? বন-বিহঙ্গিনী বনে থাকিয়াই সুখী;—তাহাকে সুবর্ণ-পিঞ্জরে পুরিয়া রাজভোগে রাখিলেও কি, সে সুখী হইতে পারে?

পুনশ্চ,—

"শ্যা। এখন ফিরিয়া যাইবার উপায়?

"মৃ। উপায় নাই।

"শ্যা। তবে করিবে কি?

"মৃ। অধিকারী কহিতেন, "যথা নিযুক্তোস্মি তথা করোমি"। যাহা বিধাতা করাইবেন তাহাই করিব। যাহা কপালে আছে তাহাই ঘটিবে।

"শ্যা। কেন, কপালে আর কি আছে? কপালে সুখ আছে—তুমি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেল কেন?"

এইবার মৃণ্ময়ী ভবানী পাদপদ্মে সেই 'ত্রিপত্র' অর্পণের কথা বলিল। মা তাহা গ্রহণ করেন নাই, তাহাও বলিল। তাই মৃণ্ময়ী কহিল, "কপালে কি আছে জানি না।"

"মৃণ্ময়ী নীরব হইলেন। শ্যামাসুন্দরী শিহরিয়া উঠিলেন।"

দেখিলেন পাঠক, কবির কৌশল?

এই অপূর্ব্ব বিয়োগান্ত কাব্যেরও আবার Sequel স্বরূপ—"মৃণ্ময়ী" বাহির হয়! সে মৃণ্ময়ী আবার পুনর্জ্জীবিতা হইয়া সুখে ঘরকন্না করিতে লাগিল! পোড়া কপাল আর কি! তাই পাঠক ও লেখকের রুচি-প্রবৃত্তি ও বিবেচনা-শক্তি দেখিয়া সহজেই উপলব্ধি হয়, "কপালকুণ্ডলা" এদেশের অতিঅল্প লোকেই বুঝিয়াছে। 'কপালকুণ্ডলা' যে একখানি করুণ-রসাত্মক tragedy, তাহা ত ভবানী পাদপদ্মে বিল্বপত্র দান হইতেই সহজে বোধগম্য হয়।

কিন্তু বঙ্কিমবাবু নিজে তাঁহার "কৃষ্ণকান্তের উইল"কে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলিতেন। এক হিসাবে কথাটা খাঁটীও বটে। কারণ, "কৃষ্ণকান্তের উইলের' মুন্সিয়ানা ও ভাব-প্রবণতা অতি পরিপাটী। বোধ হয়, বঙ্কিম বাবুর আর কোন গ্রন্থ এত সতর্কতার সহিত লিখিত নয়। ঘটনা অতি সামান্য; কিন্তু সেই সামান্য ঘটনা হইতে কবি যে কি সুন্দর ও অনির্ব্বচনীয় চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা কেবল অনুভবনীয়, বুঝাইবার নহে। একদিকে যেমন চরিত্রসৃষ্টি, অপর দিকে আবার তেমনই নীতি উপদেশ।

মূল চরিত্র ইহাতে তিনটি,—গোবিন্দলাল ভ্রমর ও রোহিণী। প্রেমই ইহার প্রতিপাদ্য বিষয়। একদিকে দাম্পত্য প্রেম—অতি মধুর ও পবিত্র; অন্যদিকে রূপজমোহে উন্মত্ততা!—দেবচরিত্র গোবিন্দলাল পাপিষ্ঠা রোহিণীর জন্য সোণার সংসার ছারখার করিল। পতিপ্রাণা, সতীসাধ্বী, ভালবাসার মূর্ত্তিমতী প্রতিমা সোণার ভ্রমরের অকাল মৃত্যুর কারণ হইল। অভিমানিনী—পতিপ্রেমে অভিমানিনী—ধর্ম্ম-বলে অভিমানিনী ভ্রমর মরিয়া জুড়াইল।

আমরা এক স্থলমাত্র উদ্ধৃত করিয়া ভ্রমর চরিত্রের একটু আভাস দিব।

কৃষ্ণকান্ত রায়ের পরলোকপ্রাপ্তি হইয়াছে,—দেবতার মন্দিরে পাপ প্রবেশ করিয়াছে,—ভ্রমরের কপাল পুড়িয়াছে,—এমন সময় গোবিন্দলালের মাতা কাশীবাসের ইচ্ছা করিলেন। অধঃপতিত গোবিন্দলালও এখন তাই চায়। গোবিন্দলালও মাতার সঙ্গে যাইবে। ভ্রমর স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিল। পোড়া কপাল আরও পুড়িতে চলিল—পাপ রোহিণী তাহার সুখের পথে কাঁটা দিয়াছে।

গোবিন্দলাল বলিল, "আমি চলিলাম।

"ভ্রমর। কবে আসিবে?

"গো। আসিব না।

"ভ্র। কেন? আমি তোমার স্ত্রী, শিষ্যা, আশ্রিতা, প্রতিপালিতা,—তোমার দাসানুদাসী,—তোমার কথার ভিখারী,—আসিবে না কেন?

"গো। ইচ্ছা নাই।

"ভ্র। ধর্ম্ম নাই কি?

"গো। বুঝি আমার তাও নাই।

"বড় কষ্টে ভ্রমর চক্ষের জল রোধ করিল। হুকুমে চক্ষের জল ফিরিল,—ভ্রমর যোড়হাত করিয়া অবিকম্পিত কণ্ঠে বলিতে লাগিল,—"তবে যাও—পার, আসিও না। বিনাপরাধে আমাকে ত্যাগ করিতে চাও কর।—কিন্তু মনে রাখিও, উপরে দেবতা আছেন। মনে রাখিও, একদিন আমার জন্য তোমাকে কাঁদিতে হইবে। মনে রাখিও—একদিন তুমি খুঁজিবে, এ পৃথিবীতে অকৃত্রিম আন্তরিক স্নেহ কোথায়? একদিন তুমি বলিবে—আবার দেখিব ভ্রমর কোথায়? দেবতা সাক্ষী,—যদি আমি সতী হই, যদি কায়মনোবাক্যে তোমার প্রতি আমার ভক্তি থাকে, তবে তোমায় আমায় আবার সাক্ষাৎ হইবে। আমি সেই আশায় প্রাণ রাখিব। এখন যাও, বলিতে ইচ্ছা হয়, বল যে আর আসিবে না। কিন্তু আমি বলিতেছি,—আবার আসিবে—আবার ভ্রমর বলিয়া ডাকিবে—আবার আমার জন্য কাঁদিবে। যদি এ কথা নিষ্ফল হয়, তবে জানিও—দেবতা মিথ্যা, ধর্ম্ম মিথ্যা, ভ্রমর অসতী। তুমি যাও, আমার দুঃখ নাই। তুমি আমারই—রোহিণীর নও।"

বড় শক্ত কথা। একদিকে স্বামীর প্রতি গভীর ভক্তি ও ভালবাসা, অন্যদিকে দারুণ ধর্ম্মের অভিমান,—কতকটা কর্ত্তব্যেরও দায় বটে।—ভ্রমর কি আদর্শ হিন্দু-রমণী?

আর একস্থান দেখ;—ভ্রমর অন্তিম-শয্যায় শায়িতা; পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে স্বামীকে দেখিবার জন্য ভগিনীর নিকট কত আক্ষেপ-অনুতাপ করিতেছিল। * * * এখন সেই ভ্রমর আপন করতলের নিকট স্বামীর চরণ পাইয়া সেই চরণ যুগল স্পর্শ করিয়া, পদরেণু লইয়া মাথায় দিল। বলিল, "আজ আমার সকল অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া আশীর্ব্বাদ করিও, জন্মান্তরে যেন সুখী হই।"

ভ্রমর কি আদর্শ হিন্দু-রমণী?

দুর্জ্জয় অভিমানে, ভ্রমর ইহার কিছুদিন পূর্ব্বে স্বামীকে পত্র লিখিতে 'সেবিকা' পাঠ লিখে নাই। স্বামীর সকল অবস্থাতেই স্ত্রী সেবিকা;—হিন্দুর মেয়ে ভ্রমর তথাপি 'সেবিকা' পাঠ লিখিল না;—ভ্রমর কি আদর্শ হিন্দুরমণী?

পরম শ্রদ্ধাস্পদ ও প্রসিদ্ধ সমালোচক শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসুজ মহাশয় "অনন্ত-মুহূর্ত্ত" * নামক একটী অতি অপূর্ব্ব প্রবন্ধে ভ্রমর চরিত্রের সৌন্দর্য্য উপলক্ষ করিয়া একটী অতি অপূর্ব্ব সমালোচনা করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে এরূপ সমালোচনা আর কেহ করেন নাই। কিন্তু "দুইটী হিন্দু-পত্নী" † শীর্ষক প্রবন্ধে ভ্রমরকে তিনি আদর্শ হিন্দু-রমণী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ঠিক 'আদর্শ' কথাটা লেখা না থাকুক, উদ্দেশ্যটা তাই বটে যে, সূর্য্যমুখীর ন্যায় ভ্রমরও আদর্শ হিন্দু-রমণী। বসুজ মহাশয়ের লেখার আমি একজন পরম ভক্ত হইলেও, উপস্থিত বিষয়ে তাঁহার সহিত এক-মত হইতে পারিলাম না। ভ্রমর যে 'সেবিকা' পাঠ লিখিল না এবং মৃত্যুকালেও স্বামীকে বলিল, "আশীর্ব্বাদ করিও জন্মান্তরে যেন সুখী হই"—ইহাতে তাহাকে 'আদর্শ হিন্দু-রমণী' বলিব কিরূপে?

তবে মহামতি বেকন বলেন যে, সতী স্ত্রীর একটা দুর্জ্জয় অভিমান থাকা খুব স্বাভাবিক;—সে অভিমান ঠিক অভিমান নহে, সতীত্বের আত্মমর্য্যাদা-জ্ঞান।

হউক 'সতীত্বের আত্মমর্য্যাদার জ্ঞান'—হিন্দু স্ত্রীর আদর্শ, ভ্রমর কিছুতেই হইতে পারে না, পারিবেও না। এটী খাঁটী ইউরোপীয় ভাব। সীতা-সাবিত্রীর দেশের হিন্দু রমণীর এ অভিমান না থাকাই বাঞ্ছনীয়।

আদর্শ হিন্দু-রমণীর কথা,—"আশীর্ব্বাদ কর যেন জন্মান্তরে তোমাকে স্বামী পাই"—অথবা "তোমার মত স্বামী পাই!" "জন্মান্তরে যেন সুখী হই"—হিন্দু-রমণী কখন এমন কথা বলিতে পারে না।

তবে বঙ্কিম বাবু যে উদ্দেশ্যে ভ্রমর-চিত্র আঁকিয়াছিলেন, তাহা সম্যক্ সিদ্ধ হইয়াছে, এ কথা অম্লানবদনে বলিতে পারি। অর্থাৎ স্ত্রী সহস্রগুণে গুণবতী হইলেও, এক অভিমানের বিষে,—বিশেষ, সে বিষের প্রভাব স্বামীকেও অবধি সহিতে হইলে সকলই পণ্ড হয়, সোণার সংসার ছারখার যায়। ভ্রমর যদি একটু নরম হইয়া স্বামীকে সুপথে আনিতে চেষ্টা করিত, তবে বুঝি সকল দিকই বজায় থাকিত। কিন্তু কবির ত তাহা দেখান' উদ্দেশ্য নয়,—ধন্বন্তরির সুধাভাণ্ডে একটুখানিও বিষ থাকিলে যে কি হয়,—ভ্রমরের দুর্জ্জয় অভিমানে কবি তাহাই দেখাইয়াছেন। ভ্রমর হিন্দু-রমণী—অর্থাৎ আদর্শ হিন্দু-রমণী নহে।

'কৃষ্ণকান্ত উইলের' নূতন সংস্করণে বঙ্কিম বাবু গোবিন্দলালকে বাঁচাইয়াছেন। ভালই করিয়াছেন! পাপীকে একেবারে না মারিয়া অনুতাপানলে দগ্ধ করিয়া রহিয়া রহিয়া মারাই যুক্তিযুক্ত।

মানবচরিত্রের অভিজ্ঞতায় বঙ্কিম মহা-পণ্ডিত। অন্তর্দৃষ্টি তাঁহার এত অধিক যে, তাঁহার যে কোন উপন্যাসের কি ক্ষুদ্র, কি বৃহৎ—সকল চরিত্রেই তাহা উজ্জ্বলরূপে প্রস্ফুটিত। আমাদের বোধ হয়, এ বিষয়ে 'কৃষ্ণকান্তের উইল'ই তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস।

"বিষবৃক্ষে"ও বঙ্কিমের কম গুণপনার পরিচয় প্রকাশ পায় নাই। সেই সতী-প্রতিমা সূর্য্যমুখী ও সাধুচরিত্র নগেন্দ্রনাথ চিরদিন বাঙ্গালী পাঠকের অন্তরে জাগরূক থাকিবে। 'বিধবা-বিবাহ' রূপ বিষ যে, পবিত্র হিন্দু-সমাজে স্থান পাইতে পারে না, সেই কুসুম-কোমল কমনীয় 'কুন্দ' চরিত্রে তাহা প্রকটিত। হিন্দু-বিধবার দুঃখে কিরূপে কাঁদিতে ও কাঁদাইতে হয়, তাহা "মুখ ফুটিল" পরিচ্ছেদে কবি বড় মিঠা-হাতে দেখাইয়াছেন। আর, ও-বিষ যে এ দেশের নয়, তাহাও বিধিমতে বুঝাইয়াছেন।

আর সেই আদর্শ হিন্দু-পত্নী সূর্য্যমুখীর পতি-প্রেম?—সূর্য্যমুখী কমলমণিকে পত্র

* ত্রিধারা। † ত্রিধারা।

লিখিতেছেন,—"আশীর্ব্বাদ করি, স্বামীকে লইয়া তুমি সুখী হও। আরও আশীর্ব্বাদ করি, যেদিন তুমি স্বামীর সুখে বঞ্চিত হইবে, সেইদিন যেন তোমার আয়ুঃশেষ হয়। আমায় এ আশীর্ব্বাদ কেহ করে নাই।"

অ-হ-হ! কি প্রাণঘাতী লিপি! উপরি-লিখিত ঐ ক'য়টীমাত্র কথায় যেন বুকের অস্থিপঞ্জর ভাঙ্গিয়া যায়! সূর্য্যমুখী যথার্থই আদর্শ হিন্দুরমণী! তবে যে তিনি দু'দিনের জন্য স্বামীকে ফেলিয়া পলাইয়াছিলেন,—সেটা অভিমান বশে নয়, ভ্রমরের মত অভিমানিনী বলিয়াও নয়,—সেটা কেবল নারী-হৃদয়ের স্বাভাবিক দৌর্ব্বল্য মাত্র।

আর সেই হতভাগ্য নগেন্দ্রনাথ—যখন নেশার ঘোর কাটিল, রূপের মোহ ঘুচিল, জ্ঞান-চক্ষু ফুটিল, সূর্য্যমুখীর মৃত্যুসংবাদে নগেন্দ্রনাথ উন্মত্তপ্রায় হইলেন। মর্ম্মন্তুদ ভেদ করিয়া কহিলেন,—* * * "আমি সূর্য্যমুখীর বধকারী—কে এমন পিতৃঘ্ন, মাতৃঘ্ন, পুত্রঘ্ন আছে যে, আমার অপেক্ষা গুরুতর পাপী? সূর্য্যমুখী কি কেবল আমার স্ত্রী? সূর্য্যমুখী আমার সব। সম্বন্ধে স্ত্রী, সৌহার্দ্দে ভ্রাতা, যত্নে ভগিনী, আপ্যায়িত করিতে কুটুম্বিনী, স্নেহে মাতা, ভক্তিতে কন্যা, প্রমোদে বন্ধু, পরামর্শে শিক্ষক, পরিচর্য্যায় দাসী। আমার সূর্য্যমুখী—কাহার এমন ছিল? * * * আমার দর্শনে আলোক, শ্রবণে সঙ্গীত, নিশ্বাসে বায়ু, স্পর্শে জগৎ!—আমার বর্ত্তমানের সুখ, অতীতের স্মৃতি, ভবিষ্যতের আশা, পরলোকের পুণ্য! আমি শূকর, রত্ন চিনিব কেন?"

কি মর্ম্মান্তিক উক্তি! কি মর্ম্মভেদী অনুতাপ! এমন অনুতাপ করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই না নগেন্দ্রনাথ সূর্য্যমুখীকে পুনঃপ্রাপ্ত হন? আর সেই অবসরে অভাগিনী কুন্দ—সেই কাব্য-কাননের প্রেম-পারাজিত কুন্দ—সেই "না—না" রবে ফুটি-ফুটি-ফোটে-না কুন্দ—সেই কবির মানসকন্যা কুন্দ মরিয়া জুড়াইল!

পিশাচিনী হীরা ও পাপিষ্ঠ দেবেন্দ্রনাথের প্রায়শ্চিত্তও যথোপযুক্ত হইয়াছিল। পাপীকে পুড়াইতে, তাহার হৃদয়ের অস্থিপঞ্জর থাকু করিতে বঙ্কিমের ন্যায় কবি ভিন্ন আর কাহার দ্বারা সম্ভব?

নিছক সৌন্দর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি—বঙ্কিম বাবুর কপালকুণ্ডলা ও কুন্দ। প্রকৃতিপালিতা কপাল-কুণ্ডলাকে নির্নিমেষ নয়নে দেখিলে হঠাৎ যেন মনে হয়, সেই ভীষণ দ্বীপ মাঝে স্বভাবসুন্দরী, সরলা মিরন্দা মূর্ত্তি দেখিতেছি! আর কুন্দনন্দিনীর বিরলে সেই "না" পড়িয়া লিয়রের সেই 'কডিলিয়া'র কথা মনে পড়ে! শেক্সপীয়রের আইভান্‌হো-রেবেকার সহিত জগৎসিংহ-আয়েসারও কতকটা সাদৃশ্য আছে। কিন্তু তাহাতেও আমাদের সাহিত্যগুরু, উপন্যাসের সৃষ্টিকর্ত্তা বঙ্কিমের কৃতিত্বের কিছু হানি হয় নাই, হইবেও না। এ কথা আমরা শেক্সপীয়রের Originality সম্বন্ধে একবার বলিয়া আসিয়াছি।

দুর্গেশনন্দিনী ও কপালকুণ্ডলা বঙ্কিমের প্রথম অবস্থার লেখা; তাই এই দুই উপন্যাসের ভাষা তেমন মনোজ্ঞ নহে এবং কোন কোন স্থলে লিপি-কুশলতার অভাবও পরিলক্ষিত হয়।

মৃণালিনীতে এ ত্রুটী প্রায়ই নাই। উপন্যাসে গানের প্রচলন বঙ্কিম বাবুই প্রথম "মৃণালিনী"তে করেন। ভিখারিণী গিরিজায়ার সেই গানগুলি অতি কোমল, মধুর ও কবিত্বপূর্ণ।

মৃণালিনী একটী হিন্দুপত্নী। তবে সূর্য্য-মুখীর ন্যায় অত উচ্চশ্রেণীর নহে।—"আমি গুছাইয়া সকল কথা বলিতে পারি নাই, কি বলিতে কি বলিলাম," মৃণালিনীর এই উক্তিটী বড় সুন্দর।

মনোরমার চিত্রটী বড় মনোহর। দুরাকাঙ্ক্ষা-পরায়ণ পশুপতির পার্শ্বে এই পবিত্র

পুষ্পটী বড় সুন্দর ফুটিয়াছে। স্বদেশ-ভক্ত বঙ্কিম, চিরদিনই স্বদেশপ্রীতির পরিচয় দিতেন। যে হিসাবে বঙ্গদর্শনে "ভারত-কলঙ্ক", প্রচারে "বাঙ্গালার কলঙ্ক" প্রবন্ধ প্রকটিত হয়,—এবং যে মহান্ উদ্দেশ্যে তিনি সন্তান-ধর্ম্মের নেতা—সত্যানন্দের মুখে "প্রাণ অপেক্ষা ভক্তি বড়" প্রচার করিয়াছেন, সেই কারণেই পশুপতি-চরিত্রের অবতারণা। "কেবলমাত্র সপ্তদশ অশ্বারোহী কর্ত্তৃক বঙ্গদেশ বিজিত হইয়াছিল স্বদেশভক্ত কবি স্বদেশের এ অখ্যাতি সহিতে না পারিয়া বিশ্বাস-ঘাতক, প্রভুদ্রোহী, দুর্ম্মতি-পরায়ণ পশুপতি-চরিত্রের সৃষ্টি করিলেন।" * আমরাও কৃতার্থ হইলাম।

আদর্শ হিন্দু-রমণীর গুটিকত কথা এখানে উদ্ধৃত করিয়া আমরা দেখাইতে চাই যে, বঙ্কিম কি গুণে আমাদের এতদূর পূজনীয় হইয়াছেন!—

"নয়নতারা। দিদি, কাল রাত্রে কোথায় শুইয়াছিলি?

"প্রফুল্ল। ভাই, কেহ তীর্থ করিলে সে কথা আপনমুখে বলে না।"

আর এক স্থান দেখ;—

"নিশা। শ্রীকৃষ্ণই আমার স্বামী। যিনি সম্পূর্ণ আমাতে অধিকারী, তিনিই আমার স্বামী।"

প্রফুল্ল দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "বলিতে পারি না।—কখন স্বামী দেখ নাই; তাই বলিতেছ,—স্বামী দেখিলে কখন শ্রীকৃষ্ণে মন উঠিত না।"

অন্যত্র—

"গৃহধর্ম্মই স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম; রাজত্ব স্ত্রী-জাতির ধর্ম্ম নয়। কঠিন ধর্ম্মও এই সংসার ধর্ম্ম। ইহার অপেক্ষা কোন যোগও কঠিন নয়। দেখ, এই এতগুলি নিরক্ষর, স্বার্থপর, অনভিজ্ঞ লোক লইয়া আমাদের নিত্য ব্যবহার করিতে হয়। ইহাদের কাহারও কোন কষ্ট না হয়, সেই ব্যবস্থা করিতে হইবে। এর চেয়ে কোন্ সন্ন্যাস কঠিন? এর চেয়ে কোন্ পুণ্য বড় পুণ্য? আমি এই সন্ন্যাস করিব।*

আর এক স্থান দেখ;—

শান্তির স্বামী জীবানন্দ সন্তান ধর্ম্মের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াছেন; শান্তিও কত কষ্টে তাঁহার দেখা পাইয়াছে;—কিন্তু যখন সেই সন্তান-ধর্ম্মের নেতা, গুরু সত্যানন্দ জীবানন্দের জীবনের উপর অনেক আশা করিয়া তাঁহাকে বাঁচাইতে চাহিলেন এবং শান্তিকে সে জন্য অনুরোধও করিলেন,—শান্তি অম্লান-বদনে উত্তর দিল,—"আমার ধর্ম্মে আমার যে দিন ইচ্ছা জলাঞ্জলি দিতে পারি,—আমার স্বামীর ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিব? মহারাজ! তোমার কথায় আমার স্বামী মরিতে হয় মরিবেন, আমি বারণ করিব না।" †

আরও দেখিবে? শ্রী সীতারামকে উত্তেজিত করিতেছে,—"হিন্দুকে হিন্দু না রাখিলে আর কে রাখিবে?" ‡

হিন্দু-স্ত্রীর আদর্শ যত উচ্চ হইতে পারে, বঙ্কিম, প্রায় তাঁহার সকল গ্রন্থেই তাহা দেখাইয়াছেন। আবার পুরুষ চরিত্রের মহত্ত্ব দেখিলেও অবাক্ হইতে হয়। রমানন্দ স্বামী প্রতাপকে বলিতেছেন,—"শুন বৎস! আমি তোমার অন্তঃকরণ বুঝিয়াছি। ব্রহ্মাণ্ড জয় তোমার এই ইন্দ্রিয়-জয়ের তুল্য নহে—তুমি শৈবলিনীকে ভাল বাসিতে?"

"সুপ্ত সিংহ যেন জাগিয়া উঠিল। সেই শবাকার প্রতাপ, বলিষ্ঠ, চঞ্চল, উন্মত্তবৎ হুহুঙ্কার করিয়া উঠিল—বলিল,—"কি বুঝিবে তুমি সন্ন্যাসী! এ জগতে মনুষ্য কে আছে যে, আমার এ ভালবাসা বুঝিবে? কে বুঝিবে, আজি এই ষোড়শ বৎসর আমি শৈবলিনীকে কত ভালবাসিয়াছি! পাপচিত্তে আমি তাহার প্রতি অনুরক্ত নহি,—আমার এ ভালবাসার নাম জীবন বিসর্জ্জনের আকাঙ্ক্ষা।"

এরূপ জিতেন্দ্রিয়, সংযমী, পরার্থপর, দেব-চরিত্র, হিন্দু-কবি ভিন্ন আর কে আঁকিতে পারে? তাই সমালোচক ও সহৃদয় বঙ্কিম শেষ বলিতেছেন,—"তবে যাও প্রতাপ অনন্ত-ধামে। * * * লক্ষ শৈবলিনী পদপ্রান্তে পাইলেও, ভালবাসিতে চাহিবে না।"

পাপিষ্ঠা শৈবলিনী চরিত্রের সহিত লর্ড টেনিসনের "গুইনিবার" চরিত্রের কিছু সাদৃশ্য আছে। কিন্তু সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণ চন্দ্রশেখরের অসীম-সহিষ্ণুতা ও পরার্থপরতা, শৈবলিনীর প্রতি সেই গভীর প্রচ্ছন্ন প্রেম, কাব্য-সাহিত্যে অতি বিরল। চন্দ্রশেখর বঙ্কিমের "সোণার গাছে মুক্তার ফল" বিশেষ। এমন অপূর্ব্ব গ্রন্থখানি কেন যে তিনি সৈয়দ মুতক্ষরীণের ঝুটা ইতিহাসের ছাঁচে ঢালিতে গিয়াছিলেন, বুঝিতে পারি না।

এখানে প্রতাপ সম্বন্ধে বিশেষ একটা কথা বলিবার আছে। এক দিক হইতে দেখিলে প্রতাপের পরার্থপরতা অতীব প্রশংসনীয়, সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রতাপ কি কর্ত্তব্যপরায়ণ? হিন্দু কবি প্রতাপকে আদর্শ চরিত্রের ছকে আঁকিয়া কেন তাহাকে ঘোর কর্ত্তব্যভ্রষ্ট—এবং এক হিসাবে ধর্ম্মভ্রষ্টও বলিতে পারি,—করিলেন কেন? প্রতাপ বিবাহ করিল কেন? যে স্ত্রীর সহিত হিন্দুর জীবনমরণ সম্বন্ধ; যে জন্য স্ত্রী হিন্দুর সহ-ধর্ম্মিণী; যাহাকে লইয়া হিন্দুর অধ্যাত্ম-জীবন সম্পূর্ণ হয়,—সেই স্ত্রীকে, সেই রূপসীকে ত প্রতাপ একবারও ভাবিল না। যখন কেবল মাত্র শৈবলিনীর মঙ্গলের জন্য এবং চন্দ্রশেখরের সুখের পথ নিষ্কণ্টক করিবার উদ্দেশ্যে প্রতাপ যুদ্ধক্ষেত্রে মরিতে গেল, তখনও, সেই শেষ মুহূর্ত্তেও ত একবার ভুলিয়াও স্ত্রীর কথা মনে করিল না!—পরের স্ত্রীর মঙ্গলের জন্য প্রতাপ আপন চিতা হাতে করিয়া সাজাইল; কিন্তু তার ঘরের স্ত্রীর দশা যে কি হইবে, তাহা একবারও ভাবিল না।—এ হিসাবে কি প্রতাপ কর্ত্তব্যহীন ও ধর্ম্মভ্রষ্ট নহে?

কবি. অবশ্য প্রতাপের গৃহজীবনের কিছুই উল্লেখ করেন নাই; নাই করুন,—যখন রূপসীর কথা একবার উঠিয়াছে,—রূপসীকে প্রতাপ বিবাহ করিয়াছে, তখন কবি, রূপসী সম্বন্ধে কিছু না বলিলে সঙ্গতি রক্ষা হইবে কেন? ভাল, প্রতাপই যাক্,—অমন যে সর্ব্বদর্শী, সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ রমানন্দ স্বামী,—তিনিও ত প্রতাপকে শেষ আশীর্ব্বাদের সময় রূপসীর কথা একবার উল্লেখও করিলেন না! শৈবলিনীকে ভুলিবার জন্য যদি রূপসীকে বিবাহ করা প্রতাপের একমাত্র কারণ হয়, তাহা হইলে ত প্রতাপ অতি স্বার্থপরলোক! হিন্দুর পক্ষে ত স্ত্রী আর একটা "হেলাফেলার" জিনিস নয় যে, খেয়ালবশে স্বামী যাহা ইচ্ছা করিতে পারিবে? কেন, প্রতাপ রূপসীকে বিবাহ করিয়াছিল? হাঁ, এমন বুঝিতাম, সাংসারিক কোন গুরুতর প্রতিবন্ধকতার জন্য,—কিংবা মহাগুরু পিতৃ-মাতৃ-আজ্ঞা পালনের জন্য প্রতাপ অনিচ্ছা-সত্ত্বেও, রূপসীকে বিবাহ করিয়াছে, তাহা হইলে নয় এক কথা ছিল। সে সব কারণ ত কিছুই দেখিতে পাই না। কবি ইচ্ছা করিলেই বোধ হয় প্রতাপ-জীবনের এই কলঙ্ক-কালিমা অপনোদন করিতে পারিতেন। প্রতাপের যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে যাইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে, কবি যদি এমনই একটু কৌশল করিয়া আমাদিগকে বুঝাইতেন যে, রূপসী আর ইহজগতে নাই,—তাহা হইলে 'বন্ধন'হীন প্রতাপের ইচ্ছামৃত্যুতে আমরা কোন কথাই কহিতাম না। কবি, সেদিকেও এক-

* শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসন্ন রায় চৌধুরী প্রণীত "বঙ্কিমচন্দ্র" ২য় ভাগ।

* দেবী চৌধুরাণী। † আনন্দমঠ। ‡ সীতারাম।

কালে নীরব। এমন সকল দিকে নীরব থাকিলে আদর্শ-চরিত্রে দোষ পড়ে না কি?

তুমি বলিবে, পাঠক বা সমালোচক ত এ কথা ভাবিয়া লইতে পারেন;—কবি সকল কৈফিয়ৎ দিবেন কেন?—হাঁ, একটু কৈফিয়ৎ দিবার কারণ আছে বৈ কি। প্রতাপ যে হিন্দু-চরিত্র, আর কবিও যে হিন্দু-কবি; তাই, যাহার সহিত "জীবন-মরণ" সম্বন্ধ; হাড়ে হাড়ে, রক্তে রক্তে, আত্মায় আত্মায় মিশিয়া, পিতৃলোকের পিণ্ড প্রয়োজনের জন্য যাহা হইতে "আত্মজ" লাভ করিয়া পুরুষ কৃতার্থ হয়, সেই স্ত্রী, সেই সহধর্ম্মিণীর শুভাশুভ চিন্তার বিষয়ে, কবি এক মুহূর্ত্তের জন্যও প্রতাপের মনে এতটুকু তরঙ্গ তুলিলেন না!—মনে-জ্ঞানে ইহা বুঝিয়াও যদি কবির এ ত্রুটীর কথা না বলি, তাহা হইলে যে সত্যের অপলাপ করা হয়!

এ ত্রুটী সত্ত্বেও, আমরা কাব্যাংশে 'চন্দ্রশেখর"কে বঙ্কিমের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলি।

হিন্দুকবির হস্তে পুণ্যবান ক্ষমাশীল, ধর্ম্মাত্মা চন্দ্রশেখরের কি মধুর চরিত্র প্রস্ফুটিত হইয়াছে! মনে-জ্ঞানে সমস্ত জানিয়াও স্বামীর কর্ত্তব্য—স্ত্রীর প্রতি হিন্দু স্বামীর কর্ত্তব্য তিনি ক্ষণকালও বিস্মৃত হন নাই। গুরু রমানন্দ স্বামীর উপদেশমত তিনি বিধিমতে শৈবলিনীকে পরীক্ষা করিয়া গৃহে লইলেন।

কিন্তু এই চন্দ্রশেখর অপেক্ষাও এক অতি উচ্চশ্রেণীর, অতি অপূর্ব্ব ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের চরিত্র আমরা আর একজন হিন্দু-কবির গ্রন্থে দেখিতে পাই। মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি, সেরূপ উচ্চশ্রেণীর সম্পূর্ণ আদর্শ-চরিত্র এপর্য্যন্ত আর কেহ বাঙ্গালায় অঙ্কিত করেন নাই। বঙ্কিমপ্রসঙ্গে আজ অতি সংক্ষেপে, আমরা সেই চরিত্রটীর একটু আলোচনা করিব।

রাধাশ্যাম ভাগবতভূষণ কমলিনীর স্বামী। কমলিনী ধনীর কন্যা। রূপ, যৌবন, বিলাসিতা—সকলই তাহার বিদ্যমান। কমলিনীর যখন বিবাহ হয়, তখন তাহার বয়স আট বৎসর মাত্র। স্বামী কিন্তু স্ত্রীর হিসাবে কিছু অধিক বয়স্ক,—তিনি এই দ্বিতীয়বার দার-পরিগ্রহ করিলেন। রাধাশ্যাম—পণ্ডিত, শাস্ত্রজ্ঞ, উন্নত-হৃদয় ও ধর্ম্মাত্মা। বুঝি ইহাতেও ঠিক তাঁহাকে বুঝা গেল না;—রাধাশ্যাম সংসারে থাকিয়াও যোগি-বিশেষ। প্রকৃত যোগজীবন লাভের ফল—যে সর্ব্বভূতে পরমাত্মা দেবের সত্তা সন্দর্শন,—তত্ত্বদর্শী রাধাশ্যাম সেই মহা-মহিমময় ধর্ম্ম-জীবন লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত কমলিনীর বিবাহ;—যেন ক্ষীণ-প্রাণা, অতি কোমলা মাধবীলতা অত্যুন্নত গগনস্পর্শী মহামহীরুহকে বেষ্টন করিল।

কমলিনী পিতামাতার একমাত্র কন্যা; কাজেই পিতামাতার বড় আদরের ধন। কন্যা পিত্রালয়েই থাকিল। পিতা একজন ডেপুটী; কিন্তু ডেপুটী হইলেও প্রভূত ধন সঞ্চয় করিয়াছিলেন। সুন্দর সুরম্য অট্টালিকা, বিবিধ বিলাস দ্রব্যে গৃহ সজ্জিত, দাস দাসীতে গৃহ পূর্ণ;—কিছুরই অভাব ছিল না। আধুনিক "উচ্চ ধর্ম্মাবলম্বী উন্নত দলের" ন্যায় কমলিনীর পিতার আহার, বিহার, ব্যবহার,—সকলই। তবে কন্যাকে যে বালিকা বয়সে বিবাহ দিয়াছিলেন, সে স্ব-ইচ্ছায় নহে,—পিতা তখন জীবিত ছিলেন,—পিতার ইচ্ছাতেই সে বিবাহ হয়। পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে পুত্র ডেপুটী-বাবু কিছু করিয়া উঠিতে পারিলেন না,—কাজেই পিতার মান-রক্ষার্থ কন্যাকে সেকেলে আধবুড়ো একটা ব্রাহ্মণপণ্ডিতের করে সমর্পণ করিলেন। কিন্তু এজন্য তিনি মনে মনে বড় অসন্তুষ্ট ছিলেন। যখন তাঁহার পিতার পরলোক প্রাপ্তি হইল, তিনি নিষ্কণ্টকে, আপন ইচ্ছামত চলিতে লাগিলেন। বাধা দিবে কে?

ক্রমে কমলিনী বড় হইল। ডেপুটী-পিতা কন্যাকে 'লেখাপড়া' শিক্ষা দিতে লাগিলেন। কন্যার স্বতন্ত্র পাঠাগার হইল। চেয়ার টেবিলে গৃহ পূর্ণ।—ইজিচেয়ার, সোফা, খাট, টানাপাখা, বরফজল, বোতলে কি লালরংয়ের ঔষধ—কত দ্রব্যই সে গৃহ মধ্যে বিরাজিত! কমলিনীর বেশ ভূষারই বা পারিপাট্য কি! প্রহরের পর প্রহর অতিবাহিত হয়, কমলিনীও প্রতি প্রহরে নূতন নূতন পরিচ্ছদ পরিধান করিতে থাকেন। কমলিনী শেলি পড়েন, সেক্ষপিয়র পড়েন, বায়রণ পড়েন, কবিতা লিখেন, গান গাহেন, হারমনিয়ম বাজান,—আরও কত-কি করেন! তা ছাড়া তাঁর বন্ধুবান্ধবগণকে চিঠী-লেখ আছে, মাথার অসুখ আছে, হিষ্টিরিয়াও আছে। তাঁহার প্রধান শিক্ষক—শ্রীমান নগেন্দ্রনাথ, বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন উচ্চ উপাধিধারী যুবা পুরুষ। তিনি সুপুরুষ, সদালাপী এবং 'উন্নতদলের' একজন 'পাণ্ডা' বিশেষ।

কমলিনী তখন অবশ্যই যৌবনে পদার্পণ করিয়াছেন। যুবতীর রূপরাশি উছলিয়া পড়িতেছিল।

কমলিনীর শিক্ষক একজন নন,—অনেক। সাহিত্য, বিজ্ঞান ও সঙ্গীতের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র শিক্ষক। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তা ছাড়া তাঁর বন্ধু-বান্ধবও অনেক।

পাঠক বুঝিয়া লইবেন, কমলিনীর চরিত্র মলিন হইয়াছিল। কলঙ্কিনী ধর্ম্ম, কর্ম্ম, ইহ-কাল, পরকাল, স্বামী, সংসার—সকলই ভুলিয়া প্রতিক্ষণে নূতন নূতন নরকের সৃষ্টি করিত। কবি ইচ্ছা করিয়াই কমলিনী-চরিত্র এইরূপ অঙ্কিত করিয়াছেন।

কেন বল দেখি?—একখানি সম্পূর্ণ ও সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর আলেখ্য আঁকিবেন বলিয়া। চিত্র অঙ্কিত করিতে যেমন আলোক ও ছায়ার প্রয়োজন, চরিত্রের সঙ্গতিরক্ষার জন্য সেইরূপ আলোক ও ছায়া—দুয়েরই প্রয়োজন। যেমন কুসুমে কীট, চন্দ্রে কলঙ্ক, অমৃতে গরল, জীবনের পশ্চাতে মৃত্যু,—তেমনই ধর্ম্মের পার্শ্বে পাপ। পাশা-পাশি দুইটী বিপরীত প্রকৃতি না রাখিলে জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত হইবে কেন? সাপের মাথায়ও মণি থাকে,—কমলিনীর স্বামী হইলেন তাই রাধাশ্যাম ভাগবত-ভূষণ! এটা কবির কৌশল মাত্র। অবিকল নরকের 'ফটো' না তুলিতে পারিলে নরকের প্রতি লোকের ঘৃণা হইবে কেন? মানুষের যে ধর্ম্মজ্ঞান, তাহাও ত অনেক সময় অধর্ম্মকে দেখিয়া!—"মডেল ভগিনী"র কবির প্রতিভা, দুর্ভাগ্য বাঙ্গালা দেশ আজিও ভাল করিয়া বুঝিল না।

রাধাশ্যাম কবির অতি অপূর্ব্ব সৃষ্টি। যে সৃষ্টির ধ্যানে পাঠককে ক্ষণকালের জন্য জগৎ হইতে জগদন্তরে লইয়া যায়;—সংসারের এই অনিত্যতা, এই মিথ্যা মায়া, জীবনের এই ক্ষুদ্র সুখ-দুঃখ—সকলই ক্ষণকালের জন্য বিস্মৃত হইতে হয়, কবির রাধাশ্যাম সেই সৌন্দর্য্য-পূর্ণ মহামাধুর্য্যময় সৃষ্টি। তিনি এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে প্রকাণ্ড একটা মায়ার খেলা জানিয়া সম্পূর্ণরূপে ইহার প্রতি অনাসক্ত। লোকে তাঁহাকে চিনিত না, বরং পাগল বলিয়া উপহাস করিত।

পাপীয়সী কমলিনীর পাপের আর ইয়ত্তা ছিল না; অন্তর্দর্শী রাধাশ্যাম সে সকলই জানিতেন;—তবুও তিনি এক নিমিষের তরে বিচলিত হইতেন না। তিনি পূর্ব্বেও যেমন অচল, অটল ও নির্ব্বিকার, পাপিষ্ঠা পত্নীর সহস্র প্রকার অত্যাচার-উৎপীড়ন সহ্য করিয়াও সেইরূপ অচল, অটল ও নির্ব্বিকার। তাঁহার কাছে কমলিনীও যে বস্তু, পথের কুকুরীটীও সেই বস্তু।

ব্রাহ্মণের উচ্চ নীচ ভেদজ্ঞান নাই। রাজা প্রজা, ধনী দরিদ্র, সুন্দর কুৎসিত—তাঁহার কাছে

সকলেই সমান। ব্রাহ্মণের এ জ্ঞান, পুথিগত বা কণ্ঠস্থ নহে, জীবনের প্রত্যেক কার্য্যে তিনি এই মহাতত্ত্বের নিদর্শন দেখাইয়াছেন। কেবল শাস্ত্রচর্চ্চা, শাস্ত্রপাঠ, ভগবানের নাম গান—এই করিয়াই ব্রাহ্মণ দিন অতিবাহিত করেন। রেল গাড়ীতে চড়িয়া ব্রাহ্মণ দেশ-পর্য্যটনে বাহির হইয়াছেন, তখনও মধুর-তানে ভগবানের নাম-গানে মত্ত। চারিদিক মাতাইয়া ব্রাহ্মণ গাহিতেছেন;—

"পশ্যামি দেবাংস্তব দেবদেহে সর্ব্বাংস্তথা
ভূত বিশেষসংঘান।
ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থ মৃষীংশ্চ সর্ব্বানুর-
গাংশ্চ দিব্যান্॥
অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং পশ্যামি ত্বাং
সর্ব্বতো নন্তরূপম্।
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং পশ্যামি
বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ॥"

গান গাহিতে গাহিতে ব্রাহ্মণ বাহ্যজ্ঞানহীন, সংজ্ঞাহীন হইলেন। সেই দেবগান সুধাকণ্ঠে আবার চলিতে লাগিল,—

"কালোহস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো লোকান্
সমাহর্ত্তুমিহপ্রবৃত্তঃ।
ঋতেহপিত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্ব্বেযেহবস্থিতাঃ
প্রত্যনীকেষু যোধাঃ॥
তস্মাৎ ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব জিত্বা শত্রূন্
ভুঙ্ক্ষ্বরাজ্যং সমৃদ্ধম্।
ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্ব্বমেব নিমিত্তমাত্রং
ভব সব্যসাচিন্॥"

সে গীত যে শুনিল, সেই ধন্য হইল। সেই গাড়ীতে অন্যান্য লোকের মধ্যে কমলিনীর শিক্ষক নগেন্দ্রনাথ ও কৈলাসচন্দ্র নামক আর এক যুবক ছিলেন। উভয়েই কলঙ্কিনী কমলিনীর অনুগ্রহের পাত্র। অন্তর্দর্শী ব্রাহ্মণ তাহা বুঝিলেন। তাই কথা প্রসঙ্গে সদানন্দ ব্রাহ্মণ আবার হাসি মুখে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে বাবুর চক্ষের উপর চক্ষু রাখিয়া একটু গম্ভীর ভাবে বলিলেন, ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন,—

"কিমত্রহেয়ং—কনকঞ্চ কান্তা
কা শৃঙ্খলা প্রাণভৃতাং হি?—নারী।
ত্যাজ্যং সুখং কি?—রমণী প্রসঙ্গঃ
দ্বারং কি মাহো নরকস্য?—নারী।
সম্মোহয়ত্যেব সুরেব কা?—স্ত্রী
বিজ্ঞান্মহাবিজ্ঞতমোস্তি কো বা?—
নার্য্যা পিশাচ্যা ন চ বঞ্চিতো যঃ॥

কিছু বুঝিলেন কি? ধন এবং স্ত্রী মুক্তি-প্রার্থী ব্যক্তির পক্ষে ত্যাগের যোগ্য। রমণীই জীবের দুশ্ছেদ্য বন্ধন। রমণী প্রসঙ্গে যে সুখ, তাহা পরিত্যাগের যোগ্য। নারীই নরকের দ্বার। স্ত্রীই সুরার ন্যায় মনুষ্যকে উন্মত্ত করে। যাহাকে পিশাচ-রূপিণী রমণী বঞ্চনা করিতে পারে নাই, তিনিই বিজ্ঞ হইতে বিজ্ঞতম।"

চুম্বক যেমন লৌহকে আকর্ষণ করে, সাধক-শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের উপদেশে কৈলাস তেমনই মুগ্ধ হইল। এবার কৈলাস ব্রাহ্মণের পদপ্রান্তে পড়িল। ইতিপূর্ব্বে এই উদ্ধত যুবক ব্রাহ্মণকে রীতিমত প্রহার করিয়াছিল। কিন্তু কৈলাসের প্রতি ব্রাহ্মণের একটু ক্রোধ নাই, বরং ব্রাহ্মণের সেই শান্ত-মূর্ত্তি, সেই সরল উচ্চ হাস্য দেখিয়া কৈলাস অধিকতর মুগ্ধ হইল। কিছু আশ্চর্য্য ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "আমি আপনার প্রতি এত অত্যাচার করিলাম, আপনি রাগ করিলেন না কেন?"

আবার সেই নির্ব্বিকার হাসি। ব্রাহ্মণ উচ্চ হাসি হাসিলেন। বলিলেন, "মারিলেই কি লাগে? শিশু সন্তানের দুই একটী দাঁত উঠিতেছে,—শিশু মায়ের আঙ্গুল কামড়াইয়া ধরিল। মা হয়ত যাতনায় উহু উহু করিতেছেন। তথাচ মায়ের ইচ্ছা, ছেলে যেন আর একবার তাঁহাকে কামড়াইয়া দেয়! তাই বলি, মারিলেই কি লাগে? আর লাগিলেই কি রাগ করিতে হয়? আপনার আঙ্গুল সরু, হাতের বলও কম,—আপনি আজ যে ধাক্কা আমায় দিয়াছিলেন, তাহা ত যৎসামান্য;—বিশেষ আপনার মূর্ত্তি দেখিয়া প্রথমেই ঐরূপ কোন না-কোন রকম প্রহার আমি আশাও করিয়াছিলাম। সুতরাং আপনার প্রহারে কিছুমাত্র বিচলিত হই নাই—ভ্রূক্ষেপও করি নাই—বরং আমোদ হইল। আমি যখন টোলে পড়িতাম, তখন আমার স্বর্গীয় গুরুদেব আদর করিয়া, আমার পিঠে এক একদিন চাপড় মারিতেন; সে চাপড়ে বোধ হয় আপনি মূর্চ্ছা যান। সে চাপড়ে আমারও শরীর এক একদিন টলিত। কিন্তু তাহাতে যে কি অনির্ব্বচনীয় আনন্দ হইত, তাহা আমি এক মুখে বর্ণন করিতে পারি না। ইচ্ছা হইত, প্রতিদিনই তাঁহার নিকট গিয়া সেইরূপ চাপড় খাই—কৈ, তখন রাগ ত হইত না। উপরন্তু সে প্রহারে আনন্দই হইত।"

ব্রাহ্মণ জীবনটীকে এমন যোগময় করিয়া তুলিয়াছিলেন। বাহ্যবিলাসিতার মধ্যে হাসিটা খুবই প্রবল ছিল। সে সরল, সুন্দর, অনির্ব্বচনীয় হাসিতে ব্রাহ্মণের পুণ্যময় পবিত্রহৃদয়খানি বড় সুন্দর খুলিত। তাঁহার কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নাই। পাপের প্রতি ঘৃণা নাই, পুণ্যের প্রতি আসক্তিও নাই। কর্ত্তব্যও নাই, কার্য্যও নাই, কিছুই নাই। অথচ বাহ্যচক্ষে দেখিলে সকলই আছে।—তাঁহার এক রাজা শিষ্য ছিলেন। সেই রাজা-শিষ্য একবার বড় অনুনয় বিনয় করিয়া তাঁহাকে এক যোড়া মূল্যবান্ শাল দেন। সেই শাল লইয়া ব্রাহ্মণ এক মহা বিপদে পড়েন। একদিন ব্রাহ্মণ শত শত কাঙ্গালী ভোজন করাইতেছেন; স্বহস্তে রন্ধন করিয়া নিজে পরিবেশনাদি করিতেছেন,—এমন সময় শাল লইয়া মহা বিভ্রাট

বাধিয়া গেল। ব্রাহ্মণ রাজদ্বারে চোর বলিয়া ধৃত হইলেন। তিনি তখনও নির্ব্বিকার, তখনও আনন্দ-চিত্ত। তাঁহার সঙ্গে অনেক কাঙ্গালীরও কয়েদ হয়। এই কাঙ্গালী দলে স্ত্রীলোকও ছিল। বিচারক আদেশ করিলেন, "স্ত্রী-পুরুষ সকলকেই বেত্রদণ্ড ব্যবস্থা হইল।" এইবার সেই সংসারনির্লিপ্ত ব্রাহ্মণের হৃদয় একটু বিচলিত হইল।—নিজের জন্য সে হৃদয় বিচলিত নয়,—নির্দ্দোষ ভিক্ষুক-দল—বিশেষ অবলাকুল কি করিয়া এই জল্লাদের হস্তে বেত্রাঘাত সহ্য করিবে, তাই ভাবিয়া বিচলিত হইলেন। ভক্তের চিত্ত-বিক্ষেপে গুরুর আসন টলিল। গুরু একজন উলঙ্গ সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসী আসিয়া সহাস্য বদনে বলিলেন, "মন্দভাগ্য! তুমি মিছা শোকে অভিভূত হইতেছ! তোমার হন্তা কে, যে, আমি রক্ষক হইব? * * * ঈশ্বরই একমাত্র গতি! দ্বাদশবর্ষ কাল, তোমার কৃতকর্ম্মফলের ভোগ আছে। সাবধান!—"

* * * * * *

মুহূর্ত্ত মধ্যে ধর্ম্মাধিকরণে এক অপূর্ব্ব অভিনয় হইয়া গেল। "জল্লাদ বেত উঠাইয়া মারিতে উদ্যত হইল। ব্রাহ্মণ বলিয়া উঠিলেন, এক বার হরি হরি বল!—হরি হরি বল!

"হঠাৎ জল্লাদ পড়িয়া গেল। হস্তস্থিত বেত গাছটি ঠিক্‌রাইয়া বহু দূরে নিক্ষিপ্ত হইল! তাহার হাতের গাঁটে এবং কাঁকালে কে অলক্ষ্যে বিষম প্রহার করিয়া বিদ্যুতের ন্যায় কোথায় লুকাইল। ব্রাহ্মণ ভগবান্‌কে ডাকিতে লাগিলেন;—

"নমস্তে পুণ্ডরীকাক্ষ! নমস্তে পুরুষোত্তম!
নমস্তে সর্ব্বলোকাত্মন্! নমস্তে তিগ্মচক্রিণে॥
নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥"

ভক্তের এ কাতর-আহ্বান ভগবানের চরণে

পঁহুছিল। ভিক্ষুক নরনারীগণের সহিত ব্রাহ্মণ অব্যাহতি পাইলেন।

রাধাশ্যামের এ চিত্র অতি অপূর্ব্ব। এমন মহামহিম ধর্ম্মাত্মার পার্শ্বে, কবি কলঙ্কিনী কমলিনীকে আঁকিয়া "নব্যবঙ্গের ইতিহাস" সম্পূর্ণ করিয়াছেন। দুঃখ এই, বাঙ্গালী যথাভাবে এ ইতিহাস বুঝে নাই।

ব্রাহ্মণের আর একদিনের একটী মাত্র কাহিনী উল্লেখ করিব। কৈলাসের অন্তিমকাল উপস্থিত; হতভাগ্য কৈলাস, গুরু রাধাশ্যামের উরুদেশে মাথা রাখিয়া অর্দ্ধস্ফুটস্বরে "হরি বোল হরি বোল" করিতেছে। স্থান—কলিকাতার নিমতলার শ্মশান-ঘাট।

এমন সময় হঠাৎ তথায় এক প্রেতমূর্ত্তি পিশাচিনী অতি দীনভাবে আসিয়া বিকট চীৎকার করিয়া মূর্চ্ছিতা হইল। "ব্রাহ্মণ দেখিলেন, একটী স্ত্রীলোক মূর্চ্ছিত হইয়াছে। মুখে জল দেওয়ায় কিছুক্ষণ পরে তাহার চেতনা হইল।"

পাঠক, এ হতভাগিনী কে বল দেখি? এ সেই পাপিষ্ঠা কমলিনী। পাপের প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইয়াছে। পাপীয়সীর ভিতরে-বাহিরে নরকের আগুন জলিয়াছে। তাই আজ তাহার এই দশা। কমলিনী বলিল, "আপনি আমার স্বামী, আমি আপনার স্ত্রী। আমি পাপীয়সী কলঙ্কিনী। আমাকে ছুইবেন না।* * * আমার মৃত্যু নিকট,—আপনি আমায় ক্ষমা করুন। আমি কল্য স্বপ্ন দেখিয়াছি, আপনি ক্ষমা না করিলে, আমার আর পরিত্রাণের উপায় নাই।

"ব্রাহ্মণ। আমি ক্ষমা করিলে যদি তোমার পরিত্রাণ হয়, তবে এখনি ক্ষমা করিলাম।"

আবার বলি, হিন্দুকবি ভিন্ন, এমন ক্ষমাশীল, উন্নত চরিত্র ও নির্ব্বিকার পুরুষ আর কে আঁকিতে পারে? রাধাশ্যাম অতি উচ্চ অঙ্গের আদর্শ হিন্দুচরিত্র। যোগবলে ব্রাহ্মণের চিত্ত এমনই শান্ত, এমনই স্থির। আত্মজ্ঞানে হৃদয় এমনই উদ্বেগশূন্য, এমনই তরঙ্গহীন। তিনি যেন নিয়তই আত্মাতে অবস্থিতি করিতেছেন। ইন্দ্রিয়ের কার্য্য ইন্দ্রিয়ে করিতেছে, তিনি আপনাতে আপনি অবস্থান করিতেছেন। সংসার তাঁহাকে অভিভূত করিতে পারিবে কেন?

সাধারণ লোকে 'মডেলভগিনী'র হাসিমস্করাগুলাই পাঠ করে; এ চরিত্রের রহস্য উন্মোচন করিয়া দেখিবার ক্ষমতা তাহাদের নাই। নহিলে এ সামগ্রী আজিকার "শিক্ষিত" দলেই বা উপেক্ষিত হইবে কেন! আমরা রুচিরোগ-গ্রস্ত হইয়া অনেক যথার্থ ভাল জিনিসকেও দেখিতে জানি না। তাই 'মডেল ভগিনী' প্রণেতার প্রকৃত প্রতিভা আজিও লোকে বুঝিল না। দেখিয়াছি, অনেক শিক্ষিতাভিমানী "মডেলভগিনী"র নাম মুখে আনিতেও সঙ্কুচিত হন। সেই দুঃখে কিছু অপ্রাসঙ্গিক হইলেও, "মডেলভগিনী"র একটু সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিলাম। বিশেষ, আমি যে কার্য্যে ব্রতী, লোকের মুখের পানে না চাহিয়া, যথাসত্য প্রকাশ করিতে আমি ধর্ম্মতঃ বাধ্য। এই উজ্জ্বল ব্রাহ্মণ-চিত্র যে গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে, সহস্র দোষ থাকিলেও, সে গ্রন্থের লেখক জন-সাধারণের শ্রদ্ধার পাত্র। এই রাধাশ্যামের চরিত্রে অপূর্ব্ব কবিত্ব, অপূর্ব্ব দর্শন-তত্ত্ব ও অপূর্ব্ব লিপি-কুশলতার পরিচয় আছে। পাপের পার্শ্বে পুণ্যের জ্যোতি ফুটিয়াছে! নরকের পার্শ্বে স্বর্গের ছবি চিত্রিত হইয়াছে!—আর আমরা "মডেলভগিনী"র নামে শিহরিয়া উঠি!

দেখ, এ সংসারে বাস করিতে হইলে আমাদের প্রয়োজন হয় না, এমন জিনিসই নাই;—পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আবশ্যক হইলে নরকেরও 'ফটো' লইতে হয়। কবি নিজেই বলিতেছেন,—"আর না! বিদায় দিউন।

নরকে নামিবার আর শক্তি নাই। এ নরক অনন্ত দিক্ শূন্য; সীমাশূন্য। গ্রন্থকারই দুর্গন্ধে দিশাহারা,—পাঠক! তাঁহার সঙ্গে যাইবেন কেমন করিয়া? * * যোড়হাতে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করুন—হিন্দু-সমাজ যেন চিরদিনই হিন্দু-সমাজই থাকে,—ম্লেচ্ছস্রোত যেন ফিরিয়া যায় এবং সেই সঙ্গে যেন অধমের এই অধম গ্রন্থ লোপ পায়।

"কলিযুগের এ লঙ্কাকাণ্ডে রাবণ মরিল না,—রামচন্দ্রই নিহত হইলেন। রাম নিষ্প্রভ, নতশির; রাবণ দ্বাদশ সূর্য্যের ন্যায় দেদীপ্যমান, স্ফীতবক্ষ। গৃহলক্ষ্মী সীতা বহিষ্কৃতা; শূন্য সিংহাসনে অসতী অলক্ষ্মী সমাদৃতা। গঙ্গাজল উপেক্ষিত, কূপজল সম্মানিত। জ্ঞান, পাণ্ডিত্য, বিদ্যা বিদূরিত; বিলাসিতা বাহাড়ম্বর, মূর্খতার একাধিপত্য। শাস্ত্র পদদলিত, অশাস্ত্রে শিরোদেশ সুশোভিত।

"এ সব ভাবিলে অন্তরে কেবল আঁধার দেখিতে হয়। চিন্তাশীলের চক্ষু জলভারে পূর্ণ হয়। হৃদয়বানের বুক ফাটিয়া যায়।"

বুক ফাটিয়াছিল বলিয়াই না কবির হাত হইতে নব্য-বঙ্গের এই নিখুঁৎ ফটো বাহির হইয়াছে?

গ্রন্থে লেখকের নাম নাই। তজ্জন্য পাঠকসমাজে অনেক সময়ে বড় গোল হয়। স্তুতিনিন্দা হয়ত আর একজনকে ভোগ করিতে হয়। বঙ্কিম-প্রসঙ্গে 'মডেলভগিনী'র সমালোচনা করিতে যখন আমি সাহসী হইয়াছি, তখন লেখকের নাম প্রকাশ করিতেই বা সাহসী না হইব কেন? আমি যতদূর জানি, তাহাতে আমার বিশ্বাস, শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুজ মহাশয় এই 'মডেলভগিনী'র লেখক। 'মডেলভগিনী'র ভাষা, ভাব, আখ্যায়িকা, বর্ণনা—সকলই অতি মনোজ্ঞ। বিশেষ, এ গল্প সম্পূর্ণ Original ও Oriental,—কোন পাশ্চাত্য গ্রন্থের ছায়া ইহাতে নাই।

'মডেলভগিনী'তে অনেক বিষয়েরই বর্ণনা আছে। বর্ণনাতে যোগেন্দ্র বাবু সিদ্ধহস্ত। এমন বর্ণনাশক্তি বাঙ্গালায় আর কাহারও নাই। একথা স্বয়ং বঙ্কিমবাবুও একদিন এই প্রবন্ধলেখককে বলিয়াছিলেন। গদ্যে যেমন বাবু যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু, পদ্যে তেমনই আর একজনকে দেখিতে পাই। ৺ রাজকৃষ্ণ রায়কে আমি এখানে উদ্দেশ করিতেছি। বস্তুতঃ, বাবু যোগেন্দ্রচন্দ্রের গদ্যে বর্ণনা ও কবি রাজকৃষ্ণের পদ্যে বর্ণনা-শক্তি আধুনিক বাঙ্গালায় অতুল্য।

চন্দ্রশেখরের কথা বলিতে বলিতে রাধা-শ্যামকে লইয়া আমরা অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছি। চন্দ্রশেখর অবশ্য বঙ্কিমের অতি অপূর্ব্ব সৃষ্টি;—কিন্তু আর এক অংশে, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত হিসাবে, ধর্ম্মাত্মা ও সংযমীর হিসাবে, লোক-শিক্ষক ও জীবনের পথপ্রদর্শক হিসাবে রাধাশ্যাম চন্দ্রশেখর অপেক্ষা অনেক বড়;—'চন্দ্রশেখরের' কবি অপেক্ষা 'রাধাশ্যামের' কবির আদর্শ অনেক উচ্চ। ইহাতে বঙ্কিমকে ছোট করিলাম, এমন যেন কেহ না ভাবেন। কারণ, বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র, আর যোগেন্দ্রচন্দ্রের উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র—দুইজনে দুইপথে গিয়াছেন। বিষয় বুঝিয়া ত গুণাগুণ বিচার করিতে হইবে। সেই বিষয়টা কার কত বড়, আর কে কিভাবে তাহা বুঝিয়াছেন ভাবুকসমাজে তাহার একটু পরিচয় দিলাম মাত্র। অপরাধ গ্রহণ করিবেন না।

প্রাণের সহিত ভালবাসা এক দিকে, আর একদিকে কঠোর কর্ত্তব্যজ্ঞান,—বঙ্কিম তাঁহার সকল উপন্যাসেই এই ভাবটী পরিস্ফুট করিয়াছেন। মাত্র "রজনী" হইতে একটী দৃষ্টান্ত দিব;—

"লবঙ্গলতা। তোমাকে স্নেহ করিলে আমি ধর্ম্মে পতিত হইব।

"আমি। (অমরনাথ) না, আমি সে স্নেহের ভিখারী নহি। তোমার এই সমুদ্রতুল্য হৃদয়ে কি আমার জন্য একটুকুও স্থান নাই?

"লবঙ্গ। না—যে আমার স্বামী না হইয়া একবার আমার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী হইয়াছিল, তিনি স্বয়ং মহাদেব হইলেও তাঁহার জন্য আমার হৃদয়ে এতটুকু স্থান নাই। লোকে পাখী পুষিলে যে স্নেহ করে, ইহলোকে তোমার প্রতি আমার সে স্নেহও কখন হইবে না।"

এমন কঠোর কর্ত্তব্য জ্ঞানের শিক্ষা তাঁহার প্রতি পুস্তকেই পাওয়া যায়। অন্তঃপ্রকৃতিতে তুমুল সংগ্রাম প্রদর্শনই তাঁহার প্রধান লক্ষ্য;—শেষে ধর্ম্মের জয় ও অধর্ম্মের ক্ষয় দেখাইতেন। আর পাপীকে যে কিরূপে পোড়াইতেন, তাহা শৈবলিনী-চিত্রে ও পশুপতি-চরিত্রে সম্যক প্রতিফলিত হইয়াছে। কিন্তু এই পাপীর জন্যও তাঁহার প্রাণ কাঁদিত। একস্থানে তিনি স্পষ্টই লিখিয়াছেন;—"দেবতার মেঘ কণ্টকক্ষেত্র দেখিয়া বৃষ্টি সংবরণ করে না।" *

নারীজাতির উপর তাঁহার কিরূপ শ্রদ্ধা, তাহা 'কৃষ্ণকান্তের উইল' হইতে তাঁহার নিজের কথাই উদ্ধৃত করিতেছি;—

"রমণী ক্ষমাময়ী, দয়াময়ী, স্নেহময়ী; রমণী ঈশ্বরের কীর্ত্তির চরমোৎকর্ষ, দেবতার ছায়া; পুরুষ দেবতার সৃষ্টিমাত্র। স্ত্রী আলোক, পুরুষ ছায়া; আলো কি ছায়া ত্যাগ করিতে পারিত?"

বর্ণনায়ও আমাদের বঙ্কিম সিদ্ধহস্ত—"আহার নাই—তবু শরীর লাবণ্যময়; বেশ ভূষা নাই, তবু সে সৌন্দর্য্য সম্পূর্ণ অভিব্যক্ত। যেমন মেঘ মধ্যে বিদ্যুৎ, যেমন মনোমধ্যে প্রতিভা, যেমন জগতের শব্দ মধ্যে সঙ্গীত, যেমন মরণের ভিতর সুখ, তেমনি সে রূপরাশিতে অনির্ব্বচনীয় কি ছিল!" †

বঙ্কিম নিজে একজন আস্থাবান্ হিন্দু ছিলেন বটে, কিন্তু কাব্যে বা উপন্যাসে কখনও কোনরূপ গোঁড়ামী দেখান নাই।

বঙ্কিমের ভাষার তুলনা আর আমি কি দিব?—সমগ্র বাঙ্গালা দেশ তাহার সাক্ষী। বঙ্কিমের ভাষা যেমন "সরলে শোভাময়ী", তেমনই প্রাণময়ী ও মর্ম্মস্পর্শিনী। ইংরাজীতে যাহাকে 'life' বলে, বঙ্কিমের ভাষায় সেইরূপ একটা 'life' দেখিতে পাই। কখন বীণার ঝঙ্কার, কখন পাখোয়াজের গুরুগম্ভীর রব, কখন বা দূর্জ্জটির ডম্বুরের ধ্বনি,—আ মরি মরি! সে ভাষার কি আর তুলনা আছে? যখন যেমনটী হইতে পারে, হওয়া উচিত, বা হওয়া স্বাভাবিক, ঠিক যেন প্রাণের তারে সুর মিলিয়া যথাক্রমে সা, রি, গা, মা রূপে কাণের কাছে বাজিতে থাকে! যেন কৃষ্ণের মুরলীরবে যমুনার জল—কল কল ছল ছল করিয়া—নাচিয়া নাচিয়া ভাবতরঙ্গে লহরীলীলা তুলিতে থাকে! যে কোন স্থান উদ্ধৃত করিয়া ইহা প্রতিপন্ন করা যায়;—

"কমলাকান্ত অন্তরের অন্তরে সন্ন্যাসী—তাহার জন্য এত বন্ধন কেন? এ দেহ পচিয়া উঠিল, ছাইভস্ম মনের বাঁধনগুলা পচে না কেন? ঘর পুড়িয়া গেল—আগুন নেবে না কেন? পুকুর শুকাইয়া আসিল—এ পঙ্কে পঙ্কজ ফুটে কেন? ঝড় থামিয়াছে—দরিয়ায় তুফান কেন? ফুল শুকাইয়াছে—এখনও গন্ধ কেন? সুখ গিয়াছে—আশা কেন? স্মৃতি কেন? যত্ন কেন? প্রাণ গিয়াছে—পিণ্ডদান কেন? * * * বাঁশী ফাটিয়াছে—আবার ঋ, গ, ম, কেন? প্রাণ গিয়াছে, ভাই, আর নিশ্বাস কেন? সুখ গিয়াছে, ভাই, আর কান্না কেন?

"তবু কাঁদি। জন্মিবামাত্র কাঁদিয়াছিলাম, কাঁদিয়া মরিব। এখন কাঁদিব, লিখিব না।"*

* কৃষ্ণকান্তের উইল। † আনন্দমঠ। * কমলাকান্তের দপ্তর।

এমন প্রাণময়ী, মর্ম্মস্পর্শিনী করুণ ভাষা ও গানের সুর বাঙ্গালীর সাহিত্য-ভাণ্ডারে যিনি দিয়াছেন, তিনিই ধন্য। আজ তাঁহার প্রসঙ্গ আলোচনা করিয়া আমিও ধন্য হইলাম।

আদর্শমূলক উপন্যাসে (idealistic novels) কবি যেমন সুকৃতি অর্জ্জন করিতে পারেন, সত্যমূলক উপন্যাসে (realistic novels) কিংবা স্থূল ঘটনা মূলক গল্পে (tales) কবির সেরূপ উচ্চপদ পাইবার আশা নাই। তবে যেখানে আদর্শ বা পরাকৃতই প্রকৃত, অথবা 'প্রকৃতই' আদর্শ বা পরাকৃত, সেখানকার কথা স্বতন্ত্র। * সেখানে স্থূলের অনুকরণে মূল, কি মূলের অনুকরণে স্থূল, নির্ণয় করিবার যো নাই। তবে এ কথা অসঙ্কোচে বলিতে পারি, ইতিহাস অপেক্ষা প্রকৃত কাব্যগ্রন্থ মানুষের অধিক উপকারী। ইউরোপীয়দিগের মত, হিন্দুর ধারাবাহিক ইতিহাস নাই, তাহাতে যে বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে, এমন নহে;—কিন্তু হিন্দুর হৃদয়ের ইতিহাস—রামায়ণ মহাভারত যদি না থাকিত, তাহা হইলে যে, কি ক্ষতি হইত, তাহা হিন্দুই বুঝিত।

সৌভাগ্যবশতঃ, আমাদের বঙ্কিমচন্দ্র আদর্শমূলক উপন্যাসের প্রবর্ত্তক, গুরু ও শিক্ষাদাতা।

তার পর, বঙ্কিমের উদার প্রেমের একটুখানি পরিচয় দিতেছি। মনোরমার চিত্রে পাঠক সে পরিচয় গ্রহণ করুন।

এই মনোরমার চিত্রটী বড় মনোহর। কবি, প্রণয়ের গতি বুঝাইয়া বলিতেছেন, "পাপাসক্তকেও ভালবাসিতে হইবে। প্রণয়ের পাত্রাপাত্র নাই। সকলকেই ভাল বাসিবে। প্রণয় জন্মিলেই তাহাকে যত্নে স্থান দিবে, কেননা প্রণয় অমূল্য। ভাই, যে ভাল, তাকে কেনা ভালবাসে? কিন্তু যে মন্দ, তাকে যে আপন ভুলিয়া ভালবাসে, আমি তাকে বড় ভালবাসি।"

বিশুদ্ধ প্রেমের ধর্ম্মই এই। সংসারে এ প্রেম একান্ত দুর্লভ। এ প্রেমের কণামাত্রও সংসারে থাকিলে অনেক আগুন নিবিয়া যাইত!

হিন্দু-স্ত্রীর পতি-ভক্তির পরিচয় ইতিপূর্ব্বে পাঠক কিছু পাইয়াছেন, এখন আর একটু গ্রহণ করুন;—

"শ্রী। স্ত্রীলোকের পুণ্য একমাত্র স্বামি-সেবা। যখন তাই ছাড়িয়া আসিয়াছি, তখন আবার আমার পুণ্য কি আছে?

"জয়ন্তী। স্বামীর একজন স্বামী আছেন।

"শ্রী। তিনি স্বামীর স্বামী—আমার নন। আমার স্বামীই আমার স্বামী—আর কেহ নহে।

"জয়ন্তী। যিনি তোমার স্বামীর স্বামী, তিনি তোমারও স্বামী,—কেননা তিনি সকলের স্বামী।

"শ্রী। আমি ঈশ্বরও জানি না, স্বামীই জানি।

"জয়ন্তী। জানিবে? জানিলে এত দুঃখ থাকিবে না।

"শ্রী। না। স্বামী ছাড়িয়া আমি ঈশ্বরও চাহি না। আমার স্বামীকে আমি ত্যাগ করিয়াছি বলিয়া আমার যে দুঃখ, আর ঈশ্বর পাইলে আমার যে সুখ, ইহার মধ্যে আমার স্বামী-বিরহ-দুঃখই আমি ভাল বাসি।

"জয়ন্তী। যদি এত ভালবাসিয়াছিলে—তবে ত্যাগ করিলে কেন?

"শ্রী। আমার কোষ্ঠীর ফল শুনিলে না? কোষ্ঠীর ফল শুনিয়াছিলাম।

"জয়ন্তী। এত ভাল বাসিয়াছিলে কিসে?

"শ্রী তখন সংক্ষেপে আপনার পূর্ব্ব বিবরণ সকল বলিল। শুনিয়া জয়ন্তীর চক্ষু একটু ছল ছল করিল। জয়ন্তী বলিল,—

* শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার-লিখিত 'উত্তট-কথা'। —নবজীবন, ২য় ও ৩য় বর্ষ।

"তোমার সঙ্গে তাঁর ত দেখা সাক্ষাৎ নাই বলিলেও হয়,—এত ভাল বাসিলে কিসে!

"শ্রী। তুমি ঈশ্বর ভালবাস,—কয়দিন ঈশ্বরের সঙ্গে তোমার দেখা-সাক্ষাৎ হইয়াছে?

"জয়ন্তী। আমি ঈশ্বরকে রাত্রি দিন মনে মনে ভাবি।

"শ্রী। যে দিন বালিকা বয়সে তিনি আমায় ত্যাগ করিয়াছিলেন, সেদিন হইতে আমিও তাঁহাকে রাত্রিদিন ভাবিয়াছিলাম।

"জয়ন্তী শুনিয়া রোমাঞ্চিত কলেবর হইয়া উঠিল। শ্রী বলিতে লাগিল, "যদি একত্রে ঘর-সংসার করিতাম, তাহা হইলে বুঝি এমনটা ঘটিত না। মানুষ মাত্রেরই দোষগুণ আছে। তাঁরও দোষ থাকিতে পারে। না থাকিলেও আমার দোষে আমি তাঁর দোষ দেখিতাম। কখন না কখন, কথান্তর, মনভার, অকুশল ঘটিত। তাহা হইলে এ আগুন জ্বলিত না। কেবল মনে মনে দেবতা গড়িয়া তাঁকে আমি এত বৎসর পূজা করিয়াছি। চন্দন ঘষিয়া, দেয়ালে লেপন করিয়া মনে করিয়াছি, তাঁর অঙ্গে মাখাইলাম। বাগানে বাগানে ফুল চুরি করিয়া তুলিয়া, দিন-ভোর কাজকর্ম্ম ফেলিয়া, অনেক পরিশ্রমে মনের মত মালা গাঁথিয়া ফুলময় গাছের ডালে ঝুলাইয়া মনে করিয়াছি, তাঁর গলায় দিলাম। অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া, ভাল খাবার সামগ্রী কিনিয়া পরিপাটী করিয়া রন্ধন করিয়া, নদীর জলে ভাসাইয়া দিয়া মনে করিয়াছি, তাঁকে খাইতে দিলাম। ঠাকুর প্রণাম করিতে গিয়া, কখন মনে হয় নাই যে ঠাকুর প্রণাম করিতেছি,—মাথার কাছে তাঁরই পাদপদ্ম দেখিয়াছি। তারপর জয়ন্তী—তাঁকে ছাড়িয়া আসিয়াছি। তিনি ডাকিলেন, তবু ছাড়িয়া আসিয়াছি।

"শ্রী আর কথা কহিতে পারিল না। মুখে অঞ্চল চাপিয়া, প্রাণ ভরিয়া কাঁদিল।"

স্বদেশভক্ত বঙ্কিম সীতারাম চরিত্রে নাটকের বেশ একটী ক্রমবিকাশ দেখাইয়াছেন। কিন্তু সাধুর অধঃপতনে বড় কষ্ট হয়। সীতারামের অধঃপতনে—তাঁহার নৈতিক আধ্যাত্মিক অধঃপতনে আমরা কষ্ট অনুভব করিয়াছি। সীতারাম ত ঠিক ঐতিহাসিক উপন্যাস নহে,—কবি ইচ্ছা করিলেই ত ইহাকে অন্য ছাঁচে ঢালিতে পারিতেন। আর যদি মুসলমানের জয় দেখানই তাঁহার উদ্দেশ্য হয়, তাহারও ত স্বতন্ত্র পথ ছিল। সীতারামকে স্বর্গ হইতে নরকে ফেলিয়া, reactionএর চূড়ান্ত অভিনয় করাইয়া শেষে কবি কেন যে তাহাকে অল্পে অল্পে ছাড়িলেন, বুঝিতে পারিলাম না। সীতারামের পাপ কি সাধারণ?—যখন সেই মতিচ্ছন্ন, লক্ষ্মীস্বরূপিনী জয়ন্তীকে প্রকাশ্য দরবারে মঞ্চের উপর দাঁড় করাইয়া চাণ্ডালকে অনুমতি করিল, "কাপড় কাড়িয়া নিয়া বেত লাগা।"

আর জয়ন্তী?—"জয়ন্তী তখন, অপরিম্লান মুখে, জন সমারোহকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, রাজাজ্ঞায় এই মঞ্চের উপর বিবস্ত্র হইব। তোমাদের মধ্যে যে সতীপুত্র হইবে, সেই আপনার মাতাকে স্মরণ করিয়া ক্ষণকাল জন্য এখন চক্ষু আবৃত করুক। * * *"

বল দেখি, এখানে আর কি ভাষা বসিতে পারে? "তোমাদের মধ্যে যে "সতী-পুত্র" হইবে,"—ঐ এক "সতী-পুত্র" কথাটার মূল্য এখানে কত বল দেখি? যে কথায় হৃদ্-তন্ত্রীতে আঘাত পড়িবে, সেই না কথা? এখানে এই "সতী-পুত্র" ছাড়া আর এমন কোন কথা আছে কি, যাহা এমনই ভাবে খাপ্ খাইতে পারে?

এমন ওজন করিয়া কথা বসাইতে সকলে বড় পারে না। একটীমাত্র কথায় হৃদয় কেমন ব্যক্ত হইয়াছে! এই একটীমাত্র কথাতে কি গুরু-গম্ভীর গর্জ্জন শুনিলাম!

পাঠক, আর এক স্থানে, পরিস্ফুট চন্দ্রালোকে, সুবিশাল গঙ্গাবক্ষে দূরাগত মধুর সঙ্গীতবৎ, আমাদের বঙ্কিমের উচ্ছ্বসিত ভাষার একটু মধুর ঝঙ্কার শুনুন;—

"* * * তবু শ্রীকে মনে করা সীতারামের উচিত ছিল। কিন্তু সে বিষয়ে সীতারামের বড় দোষ ছিল না। নিত্য যাহার রাশি রাশি টাকা আসিতে থাকে, সে কবে-কোথায় সিকিটা কি আধলিটা হারাইয়াছে, তাহা মনে করে না। যাহার এক দিকে গঙ্গা, অন্যদিকে যমুনা, তাহার কবে-কোথাকার বালির-মধ্যে-শুকান সরস্বতীর কথা বড় মনে পড়ে না। যার এক দিকে চিত্রা, অন্যদিকে রোহিণী, তার কবে-কোথাকার নিবান-বাতির আলোর কথা কেন মনে পড়িবে? নন্দা সুখ, রমা সম্পদ, শ্রী বিপদ। যাহার এক দিকে সুখ, অন্যদিকে সম্পদ, তার বিপদের কথা কেন মনে পড়িবে? যার একদিকে নন্দা, এক দিকে রমা, তার কবে-কার শ্রীর কথা কেন মনে পড়িবে?

"তবু শ্রীর কথা মনে করা উচিত ছিল। কিন্তু এমন অনেক কর্ত্তব্য আছে, যাহা তোমায় আমায় করি না,—অথচ সে জন্য অনুতপ্তও হই না।"

এইরূপ অনেক স্থানে আছে। তাই এক স্থানে বলিয়া আসিয়াছি, বঙ্কিমের লেখা পড়িতে পড়িতে আমার এক একবার মনে হয়, যেন গদ্যে কোন গীতি-কবিতা পড়িতেছি! আর তাই সে লেখা "কাণের ভিতর দিয়া মরমে" প্রবেশ করিতেছে! কূলপ্লাবিনী সৌন্দর্য্য-স্রোতস্বতীর সহিত 'ভাব-মন্দাকিনী' মিলিত; বঙ্কিমের ভাষা জলদেবী স্বরূপা হইয়া, তদুপরি আনন্দে কেলি করিতেছেন। বঙ্গবাসী সে অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া মোহিত।

কিন্তু সীতারামের প্রায়শ্চিত্ত কবি বিশেষ কিছু দেখাইলেন না। বলিবে, সীতারামের রাজ্যনাশ হইল। কিন্তু রাজ্য ত নাশ হইয়াই ছিল;—সীতারামের মনোরাজ্যের ভিতর কি হইল? শেষ কি না—সেই মন্দভাগ্য প্রাণ লইয়া কোথায় পলাইল! কেন, প্রাণটাই কি এত বড়? সীতারাম মরিল না কেন? আর যদি প্রাণ লইয়া বাঁচিয়াই রহিল, তবে কবি তাহার যথোচিত প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিলেন না কেন?

সীতারামের পত্নী 'রমা'র চরিত্রের সাহত সেক্সপিয়রের "উইন্‌টারস্ টেলের" 'হারমিয়নি'র চরিত্রের কিছু সাদৃশ্য দেখিতে পাই।

আনন্দমঠে বঙ্কিমের স্বদেশভক্তির পরিচয় পাই বটে, কিন্তু ইহাতে সত্যানন্দ, জীবানন্দ, ভবানন্দ, প্রভৃতি যে সকল মহাপুরুষের চরিত্র আছে, কবি সে সকল চরিত্রের পূর্ব্ব পরিচয় আমাদিগকে কিছু দেন নাই। অর্থাৎ কি উপায়ে ঐরূপ মহান্ চরিত্র লাভ হইতে পারে, তাহা কিছুই বলেন নাই।—নিজের হাতে না গড়িয়া একেবারে কয়েকটী আদর্শমূলক চরিত্র আমাদের সম্মুখে ছাড়িয়া দিয়াছেন। আমার বোধ হয়, এরূপ না করিয়া কবি যদি ঐরূপ চরিত্র কি উপায়ে লাভ হয়, তাহা দেখাইতেন, তবে লোকশিক্ষার পক্ষে উহা বস্তুতই কার্য্যকর হইত। আনন্দমঠের এই ভক্তিবাদ, কালে কবির 'অনুশীলন' বাদ—Culture-এ পরিণত হইয়াছিল।

সমালোচক বঙ্কিমের আর একটু পরিচয় গ্রহণ করুন।—"ঈশ্বর অনন্ত জানি। কিন্তু অনন্তকে ক্ষুদ্র হৃদয়পিঞ্জরে পুরিতে পারি না। সান্তকে পারি। তাই অনন্ত জগদীশ্বর, হিন্দুর হৃদয়পিঞ্জরে সান্ত শ্রীকৃষ্ণ। স্বামী আরও পরিষ্কাররূপে সান্ত। এই জন্য প্রেম পবিত্র হইলে স্বামী, ঈশ্বরে আরোহণের প্রথম সোপান। তাই হিন্দুর মেয়ের পতিই দেবতা, অন্য সব সমাজ হিন্দুসমাজের কাছে, এ অংশে নিকৃষ্ট। ঈশ্বর ভক্তির প্রথম সোপান পতিভক্তি।*

* দেবী চৌধুরাণী।

অন্যত্র,—

—"স্ত্রীবিসর্জ্জন মাত্রই ক্লেশকর—মর্ম্মভেদী। যে কেহ আপন স্ত্রীকে বিসর্জ্জন করে, তাহারই হৃদয়োদ্ভেদ হয়। যে বাল্যকালের ক্রীড়ার সঙ্গিনী, কৈশোরে জীবন সুখের প্রথম শিক্ষাদাত্রী, যৌবনে যে সংসার সৌন্দর্য্যের প্রতিমা, বার্দ্ধক্যে যে জীবনাবলম্বন—ভাল বাসুক বা না বাসুক, কে সে স্ত্রীকে ত্যাগ করিতে পারে? গৃহে যে দাসী, শয়নে যে অপ্সরা, বিপদে যে বন্ধু, রোগে যে বৈদ্য, কার্য্যে যে মন্ত্রী, ব্যসনে যে সখী, বিদ্যায় যে শিষ্য, ধর্ম্মে যে গুরু,—ভাল বাসুক বা না বাসুক, কে সে স্ত্রীকে সহজে বিসর্জ্জন করিতে পারে? আশ্রমে যে আরাম, প্রবাসে যে চিন্তা, স্বাস্থ্যে যে সুখ, রোগে যে ঔষধ, অর্জ্জনে যে লক্ষ্মী, ব্যয়ে যে যশঃ,—বিপদে যে বুদ্ধি, সম্পদে যে শোভা,—ভাল বাসুক বা না বাসুক, কে সে স্ত্রীকে সহজে বিসর্জ্জন করিতে পারে? আর যে ভালবাসে? পত্নী-বিসর্জ্জন তাহার পক্ষে কি ভয়ানক দুর্ঘটনা! আবার যে রামের মত ভালবাসে,—তাহার কি কষ্ট, কি জীবনসর্ব্বস্ব ধ্বংসাধিক যন্ত্রণা!"*

ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম ও ব্রাহ্মণের প্রতি বঙ্কিমের কিরূপ ভক্তি দেখুন;—

"হিন্দুধর্ম্মে ব্রাহ্মণগণ সকলের পূজ্য। তাঁহারা যে বর্ণশ্রেষ্ঠ এবং আপামর সাধারণের বিশেষ ভক্তির পাত্র, তাহার প্রধান কারণ এই যে, ব্রাহ্মণেরাই ভারতবর্ষের সামাজিক শিক্ষক ছিলেন। তাঁহারা ধর্ম্মবেত্তা, তাঁহারাই বিজ্ঞানবেত্তা, তাঁহারাই পুরাণবেত্তা, তাঁহারাই দার্শনিক, তাঁহারাই সাহিত্যপ্রণেতা, তাঁহারাই কবি। তাই অনন্ত জ্ঞানী হিন্দুধর্ম্মের উপদেশকগণ তাঁহাদিগকে লোকের অশেষ ভক্তির পাত্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। সমাজ ব্রাহ্মণকে এত ভক্তি করিত বলিয়াই, ভারতবর্ষ অল্পকালে এত উন্নত হইয়াছিল। সমাজ শিক্ষাদাতাদিগের সম্পূর্ণ বশবর্ত্তী হইয়াছিল বলিয়াই সহজে উন্নতিলাভ করিয়াছিল।

"দেখ, বিধি বিধান ব্যবস্থা সকলই ব্রাহ্মণের হাতে ছিল। নিজহস্তে সে শক্তি থাকিতেও তাঁহারা আপনাদের উপজীবিকা সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করিয়াছেন;—তাঁহারা রাজ্যের অধিকারী হইবেন না, বাণিজ্যের অধিকারী হইবেন না, কৃষিকার্য্যের পর্য্যন্ত অধিকারী নহেন। এক ভিন্ন কোন প্রকার উপজীবিকার অধিকারী নহেন। যে একটী উপজীবিকা ব্রাহ্মণেরা বাছিয়া বাছিয়া আপনাদিগের জন্য রাখিলেন, সেটি কি? যাহার পর দুঃখের উপজীবিকা আর নাই; যাহার পর দারিদ্র্য আর কিছুতেই নাই—ভিক্ষা। এমন নিঃস্বার্থ উন্নতচিত্ত মনুষ্যশ্রেণী ভূমণ্ডলে আর কোথাও জন্মগ্রহণ করেন নাই। তাঁহারা বাহাদুরীর জন্য বা পুণ্য সঞ্চয়ের জন্য বাছিয়া বাছিয়া ভিক্ষা বৃত্তিটি উপজীবিকা বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে, ঐশ্বর্য্য সম্পদে মন গেলে জ্ঞানোপার্জ্জনের বিঘ্ন ঘটে, সমাজের শিক্ষাদানে বিঘ্ন ঘটে, এক মন এক ধ্যান হইয়া লোক শিক্ষা দিবেন বলিয়াই, সর্ব্বত্যাগী হইয়াছিলেন। যথার্থ নিষ্কামধর্ম্ম যাহাদের হাড়ে হাড়ে প্রবেশ করিয়াছে, তাহারাই পরহিতব্রত সঙ্কল্প করিয়া এরূপ সর্ব্বত্যাগী হইতে পারে। তাঁহারা যে আপনাদিগের প্রতি লোকের অচলা ভক্তি আকৃষ্ট করিয়াছিলেন, তাহাও স্বার্থের জন্য নহে। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে, সমাজে শিক্ষকদিগের উপর ভক্তি ভিন্ন উন্নতি নাই, সেজন্য ব্রাহ্মণ ভক্তি প্রচার করিয়াছিলেন এই সকল করিয়া তাঁহারা যে সমাজ ও সভ্যতার সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহা আজিও জগতে অতুল্য, ইউরোপ আজিও তাহা আদর্শস্বরূপ গ্রহণ করিতে পারে। ইউরোপে আজিও যুদ্ধটা সামাজিক প্রয়োজন মধ্যে। কেবল ব্রাহ্মণেরাই এই ভয়ঙ্কর দুঃখ—সকল দুঃখের উপর শ্রেষ্ঠ দুঃখ—সকল সামাজিক উৎপাতের উপর বড় উৎপাত—সমাজ হইতে উঠাইয়া দিতে পারিয়াছিলেন। সমাজ ব্রাহ্মণ্য নীতি অবলম্বন করিলে যুদ্ধের আর প্রয়োজন থাকে না। তাঁহাদের কীর্ত্তি অক্ষয়। পৃথিবীতে যত জাতি উৎপন্ন হইয়াছে, প্রাচীন ভারতের ব্রাহ্মণদিগের মত প্রতিভাশালী, ক্ষমতাশালী, জ্ঞানী ও ধার্ম্মিক কোন জাতিই নহে। প্রাচীন এথেন্স বা রোম, মধ্যকালের ইতালী, আধুনিক জর্ম্মণি বা ইংলণ্ডবাসী—কেহই তেমন প্রতিভাশালী বা ক্ষমতাশালী ছিলেন না। রোমক ধর্ম্মসমাজ, বৌদ্ধ ভিক্ষু বা অপর কোন সম্প্রদায়ের লোক তেমন জ্ঞানী বা ধার্ম্মিক ছিলেন না।" *

বঙ্কিমের এই "অনুশীলনের" ন্যায় উৎকৃষ্ট গ্রন্থ বাঙ্গালায় আর নাই। অনুশীলনের পত্রে পত্রে—ছত্রে ছত্রে মণিমাণিক্য জ্বলিতেছে।

'কৃষ্ণচরিত্রে' বঙ্কিম যথেষ্ট পাণ্ডিত্য ও গবেষণার পরিচয় দিয়াছেন বটে, কিন্তু ঐ গ্রন্থের সকল স্থলে আমরা একমত হইতে পারি নাই। কারণ শ্রীকৃষ্ণকে আমরা ভগবান বলিয়াই জানি। যিনি ভগবান, তাঁহার সম্বন্ধে কোন সমালোচনা চলে না।

তাঁহার শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ব্যাখ্যা ও সমালোচন সম্বন্ধেও আমাদের এই কথা।

বঙ্কিমের এই ধর্ম্মমত সম্বন্ধে আমার অন্যতম সাহিত্য-বন্ধু, চিন্তাশীল, শ্রীযুক্ত ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় "সাহিত্যমঙ্গল" নামে একখানি অতি সুন্দর গ্রন্থ লিখিয়াছেন। বঙ্কিম-ভক্তগণকে সেই গ্রন্থখানি পড়িতে অনুরোধ করি।

বঙ্কিমের হাস্যরসের সহিত বাঙ্গালার আর একজন প্রতিভাশালী ব্যক্তির তুলনা করিতে পারি। "ভারত উদ্ধারের" কবি ও সুবিখ্যাত "পঞ্চানন্দ"-সম্পাদক শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সরস রসিকতা বাঙ্গালীর এক গৌরবের জিনিস। যে হাসির মূলে অশ্রু, অথবা যে হাস্যরস উপভোগ করিতে করিতে কাঁদিয়া ফেলিতে হয়, সে হাস্যরসের অবতারণা করা বড় কম ক্ষমতার কথা নহে। ইন্দ্রনাথ বাবু তাঁহার 'ভারত উদ্ধারে' এবং 'কল্পতরু' ও 'ক্ষুদিরামে' ইহার বিশিষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। আর 'পঞ্চানন্দ' বা 'পাঁচু ঠাকুরে' ত কথাই নাই।

ভারত উদ্ধার বা 'ভবিষ্য ইতিহাসের এক পৃষ্ঠায়,' কবি সর্ব্বত্রই হাসাইতে হাসাইতে মধ্যে মধ্যে কেমন কাঁদাইয়াছেন, তাহা দেখুন। কাল-স্রোতের সহিত নদীস্রোতের তুলনা করিয়া কবি বলিতেছেন,—

—"কে বলে নদীর স্রোত কাল স্রোত সম?
ভাসাইয়া জবাফুল গঙ্গার সলিলে—
একটী একটী করি বহুতর ফুল,—
সারি সারি ভেসে যেতে দেখেছি বাহার
তীরে দাঁড়াইয়া, শেষে বহুক্ষণ পরে,
সাঁতারিয়া সবগুলি এনেছি ধরিয়া।
কিন্তু রে কালের স্রোতে পারিজাত জিনি
অমূল্য কুসুম কত ভাসিয়া গিয়াছে,
দেখিছি নয়নে, হায়! পারিনি ফিরাতে।"

বল দেখি, এই কয়ছত্র পড়িলেই অতীতের স্মৃতি বুকের ভিতর জাগিয়া উঠে কি না, আর সঙ্গে সঙ্গে জোরে একটা নিশ্বাস পড়ে কি না?

'ক্ষুদিরাম' নব্যবঙ্গের একটী সুন্দর ছক। ক্ষুদিরাম ইংরেজী পড়িয়া 'উন্নত দলভুক্ত' হইয়াছেন, জাতি ভেদ মানেন না, আচার ব্যবহারের ধার ধারেন না;—কিন্তু তাঁর মা "পদ্মজেলেনী," আজিও সেই পদ্মজেলেনীই আছেন। ক্ষুদিরাম কলিকাতায় কত-কি কীর্ত্তি করিয়া বেড়ান,—অসভ্যা, অশিক্ষিতা, মাছ-বেচুনী মার কথা কি তাঁর মনে পড়ে? দুঃখিনী পদ্ম কিন্তু

উত্তরচরিতের সমালোচনা।

* ধর্ম্মতত্ত্ব—অনুশীলন।

তার সেই ছত্রিশবন্ধনের সার বন্ধন, সেই আঁতের বস্তু, সেই নাড়ীছেঁড়া-ধনকে দিন রাত্রি ভাবিয়া থাকে। ক্ষুদিরাম বিদেশে গেল, সঙ্গে সঙ্গে পদ্মরও "ক্ষুধা তৃষ্ণা বুঝি বিদেশে গিয়াছিল। দুই দিন পদ্ম মাছ বেচিতে গেল না।

"পদ্ম কি ইহাতেই ক্ষান্ত! ডাক-হরকরা যখনই গ্রামে আইসে, পদ্ম তাহার সঙ্গে দেখা না করিয়া ছাড়ে না। পত্রের প্রত্যাশা পদ্মর ছিল না; পদ্ম জানিত যে, বড়লোকের এবং ভদ্রলোকেরই পত্র আইসে। তা, নাই বা আসিল পত্র, পত্রবাহক ত আইসে,—সে ত ক্ষুদিরামকে দেখিতে পায়, তাহার কুশল ত বলিতে পারিবে। তাই পদ্ম সেই পত্রবাহকের সহিত দেখা করে, পুত্রের কুশল জিজ্ঞাসা করে, কখন বা তিরস্কৃত হয়, কখন পত্রবাহক তাহার পরিতোষের জন্য বলে, 'ভাল আছে',—তাহাতেই পদ্ম স্বর্গ পায়।

"এ দৃশ্য আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি!—দূর কর ছাই! দেখ ত কমলিনী,—আমার চোখে বুঝি কি পড়িল।"

ওরে তোমার চোখে কেন, ব্রাহ্মণ!—এই কয় ছত্র উদ্ধৃত করিতে যে, আমিও চোখে জল রাখিতে পারিলাম না।

কবির কৌশলটা দেখিলে?—ইহারই নাম না লিপি-কুশলতা? গালগল্প ও হাস্যকৌতুকের মধ্যেও যিনি এমন মর্ম্মান্তিকরূপে কাঁদাইতে পারেন, তাঁহার শক্তি বড় সাধারণ শক্তি নয়।

বঙ্কিমের "বিবিধ প্রবন্ধ"ও অতি উচ্চশ্রেণীর সন্দর্ভ পুস্তক। ইহাতে তাঁহার নানা বিষয়ক চিন্তা ও পাণ্ডিত্য পূর্ণ প্রবন্ধ আছে। "রামধন পোদ"টী বাঙ্গালীর দেখিবার জিনিস।

কিন্তু এখানে আর একজন মহারথীর নাম উল্লেখ না করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিতে পারিতেছি না। বঙ্গ-সাহিত্যে মনস্বী শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়ের স্থান অতি উচ্চে। উপস্থিত, তিনি ভাষার একরূপ "কর্ণধার" বিশেষ। কালীপ্রসন্ন বাবু চিন্তাশীল, ভাবুক, সুপণ্ডিত ও একজন প্রধান ভাষাবিৎ। ভাষার উন্নতিকল্পে তিনি অনেক করিয়াছেন ও অনেক করিতেছেন। একদিকে যেমন বঙ্কিমের "বঙ্গ-দর্শন," অন্যদিকে তেমনই ঘোষজ মহাশয়ের "বান্ধব"। সেই সাহিত্য-বান্ধব, সুপ্রসিদ্ধ বান্ধব-সম্পাদক শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় গভীর গবেষণা পূর্ব্বক বহু প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, এবং বাঙ্গালা সাহিত্য-ভাণ্ডারে প্রচুর শব্দ-সম্পদ ও ভাবাবতারণা করিয়াছেন। তদ্বিরচিত "নিভৃতচিন্তা", "প্রভাতচিন্তা" ও "শ্রান্তিবিনোদ" প্রভৃতি সন্দর্ভ-পুস্তক অতি অপূর্ব্ব। মূল সংস্কৃত বজায় রাখিয়া এবং ব্যাকরণের প্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিয়া তিনি সাহিত্যের সেবা করিতেছেন;—সুতরাং তিনি বঙ্গ-সাহিত্যের অন্যতম নেতা ও সুহৃদ্;—বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার স্থান কোথায় সহৃদয় পাঠক সে বিচার করিবেন।

৺ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের "সামাজিক প্রবন্ধ" "পারিবারিক প্রবন্ধ" ও "আচার প্রবন্ধ", শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসুর "হিন্দুত্ব" এবং শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের নানা বিষয়ক প্রবন্ধ এবং "নবজীবন" বাঙ্গালীর গৌরবের ধন।

"সাম্য" বঙ্কিমের প্রথম অবস্থার লেখা; ইদানীং তাঁহার সে মত পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। তাই তিনি আর তাহা পুনর্মুদ্রিত করেন নাই মত পরিবর্ত্তনে তিনি অপমান বোধ করিতেন না। "কৃষ্ণ-চরিত্রের" নূতন সংস্করণের ভূমিকায় তিনি অকুণ্ঠিত ভাবে তাহা লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার এক "কবিতা পুস্তক" বাদে আর সকল গ্রন্থ এত উৎকৃষ্ট ও উচ্চশ্রেণীর যে, বঙ্কিম ভিন্ন ঠিক-ওরূপ আর কেহ লিখিতে পারেন না। কিন্তু ঐ 'কবিতাপুস্তকে'ও "আকাঙ্ক্ষা" শীর্ষক যে কবিতাটী আছে, তাহা

অতি সুন্দর। অবশ্য "ইন্দিরা", "যুগলাঙ্গুরীয়" ও "রাধারাণী" প্রভৃতি ছোট গল্পগুলির কথা এখানে তুলনীয় নহে।

বঙ্কিমের আবির্ভাবের পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী বঙ্গসাহিত্যের অবস্থা তুলনা করিয়া কবি রবীন্দ্রনাথ সত্যই বলিয়াছেন, 'দার্জ্জিলিং হইতে যাঁহারা কাঞ্চনজঙ্ঘার শিখরমালা দেখিয়াছেন, তাঁহারা জানেন সেই অভ্রভেদী শৈলসম্রাটের উদয় রবিরশ্মিসমুজ্জ্বল তুষারমুকুটিত মস্তক চতুর্দ্দিকের নিস্তব্ধ গিরিপারিষদ্‌বর্গের কত ঊর্দ্ধে সমুত্থিত রহিয়াছে।"

বঙ্গ-সাহিত্যে বঙ্কিমের স্থান কোথায়, সহৃদয় পাঠকই এখন সে বিচার করুন।

আর কেবলমাত্র উপন্যাসের দিক হইতে দেখিলে এ কথা আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি,—কি ভাব, কি ভাষা, কি বর্ণনা, কি চরিত্র গঠন, কি রচনা-নৈপুণ্য, কি লিপি-কুশলতা, কি উদ্ভাবনী শক্তি, কি সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি এবং কি ঘটনা-সামঞ্জস্য,—সকল বিষয়েই,—আমাদের বঙ্কিম উপন্যাস-জগতে রাজরাজেশ্বর। বঙ্কিমের এই শূন্য সিংহাসনে আবার কবে কাহার অধিষ্ঠান হইবে, তাহা ভগবানই জানেন।

১০।

এইবার বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-ধর্ম্ম ও গ্রন্থ-সমূহের ফলাফল সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিয়া আমরা বিদায় গ্রহণ করিব।

সাহিত্য ধর্ম্মে বঙ্কিমের আন্তরিক অনুরাগ ছিল। প্রাণের পিপাসায় তিনি সাহিত্যধর্ম্মের সেবা করিতেন। তাহাতে কৃত্রিমতা ও কপটতার লেশমাত্রও ছিল না। তিনি যখনই কিছু সত্য, সুন্দর ও সার বুঝিতেন,—মুক্তকণ্ঠে নির্ভীক-চিত্তে তাহা পরিব্যক্ত করিতেন। সাধারণ-মতকে পদতলে রাখিয়া সর্ব্ব সময়েই তিনি সকলের এক সোপান উচ্চে অবস্থিতি করিতেন। স্তুতি-নিন্দা তাঁহাকে টলাইতে পারিত না। তাঁহার কথাই ছিল এই, 'পাবলিক-মতের উপর কখন আত্মনির্ভর করিতে নাই।' কতবার তিনি কথা-প্রসঙ্গে এই প্রবন্ধ-লেখককে উপদেশ দিয়াছেন,—"যদি এ জগতে কিছু করিতে চাও, তবে কিছুতেই পাবলিকের পানে তাকাইও না। পাবলিকের পানে তাকাইলে পাবলিককেও সন্তুষ্ট করিতে পারিবে না, জগতেরও কিছু করিতে পারিবে না।"

কেহ কেহ বলেন, "কবির জীবনে আবার বিশেষ কার্য্য কি? কবি হৃদয়ে প্রতিভা অবশ্য আছে বটে, কিন্তু তাহাতে প্রেমের অভাব। প্রতিভা নিষ্ক্রিয়, প্রেম কার্য্যশীল।" কিন্তু কথাটা কি ঠিক? প্রতিভা ও প্রেম কি স্বতন্ত্র বস্তু? আর স্বতন্ত্র বস্তু হইলেও কি দু'য়ে খুব ঘনিষ্ট সম্বন্ধ নাই?* বিরুদ্ধবাদী বলিলেন, "প্রতিভা বড়-জোর কাগজে-কলমে একটা কোন-কিছুর স্বাভাবিক চিত্র আঁকিতে পারেন, প্রেম কিন্তু তাহাতে সন্তুষ্ট নহে,—সে সেই কোন-কিছুর একটা কাজ না করিয়া নিরস্ত হয় না। কথাটা abstract form-এ না বলিয়া একটা concrete form-এ বুঝা ভাল।

মনে কর, কোন এক অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে;—প্রতিভাবান্ কবি বড়-জোর তখন সেই দুর্ভিক্ষের একখানি নিখুঁৎ 'ফটো' তুলিয়া জন-সাধারণের চক্ষে ধরিলেন। কিন্তু প্রকৃত প্রেমিক তাহাতে স্থির থাকিতে পারিলেন না,—তিনি প্রাণের টানে তখনই সেই দুর্ভিক্ষ স্থলে উপস্থিত হইয়া, আপন অবস্থানুযায়ী সেই বুভুক্ষু নর-নারীগণকে এক এক মুষ্টি অন্নদান করিয়া যথার্থ মনুষ্যোচিত কার্য্য করিলেন। বিরুদ্ধবাদী বোধ হয়, এই-

* লেখক-প্রণীত "প্রতিভা ও প্রেম"।—নব্যভারত, ১০ম খণ্ড।

বার বড়-গলা করিয়া বলিতে পারিবেন,—"এখন এই দু'য়ের মধ্যে প্রকৃত কাজ করিল কে?"

আমার মনে হইতেছে, ঠিক এই কথা লইয়া একদিন আমার সহিত একজন প্রতিভাবান্ কবির কথোপকথন হয়। অ শ্য, আমরা দুই জনেই এক-মতাবলম্বী ছিলাম। কবি-ভ্রাতা বলিলেন, "দুর্ভিক্ষ উপলক্ষে প্রেমিকের প্রেমাশ্রু ও কার্য্যতৎপরতা যে অতীব প্রশংসনীয়, তাহার আর কথা কি? কিন্তু প্রকৃত প্রতিভাবান্ কবিও যদি সেই সময়োচিত একটী অতি স্বাভাবিক-চিত্র তাঁহার কোমল কবিত্ব-তুলিকায় অঙ্কিত করিতে পারেন, তাহাও বড় কম প্রশংসার কথা নহে। কারণ, প্রেমিকের প্রেমাশ্রু বা কার্য্যতৎপরতা তাঁহার ব্যক্তিগত নিজস্ব ধন; কিন্তু প্রতিভাবান্ কবির অশ্রু তাঁহার একার সম্পত্তি নহে,—সমগ্র দেশ, সমগ্র সমাজ, সমগ্র পৃথিবী সেই অশ্রুর দাবী করিতে পারে। কারণ, দেশস্থ যাবতীয় নর-নারীর উত্তপ্ত অশ্রু লইয়া সেই চিত্রখানি অঙ্কিত।"

কথাটার বিশ্লেষণ-ব্যাখ্যার প্রয়োজন দেখি না। তবে এ কথা অসঙ্কোচে বলিতে পারি, সেই প্রেমিকের প্রেমাশ্রু ও কার্য্যতৎপরতার পরিতৃপ্তি তাঁহার আত্ম-জীবনেই সমাহিত হইতে পারে—বড়-জোর তাঁহার বংশপরম্পরা ঐ কীর্ত্তির মন্দিরে আরোহণ করিতে পারেন;—কিন্তু প্রতিভাবান্ কবির সেই মর্ম্মোদ্ঘাটিত, সদ্য-অশ্রুবিকশিত দুর্ভিক্ষের চিত্রখানি সভ্য মনুষ্য-সমাজ যুগ যুগ ধরিয়া নির্নিমেষ নয়নে দেখিতে থাকিবে!

অতএব প্রতিভাও যে নিষ্ক্রিয় নহে, তাহা আমরা সংক্ষেপে একরূপ প্রতিপন্ন করিলাম।

"যে খাটে সেও যেমন কাজ করে, আর যে ভাবে, সেও একরূপে কাজ করে"—এই সোজা কথাটা, দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের দেশের শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের মধ্যেও কেহ কেহ স্বীকার করিতে নারাজ।

কোন কোন সামাজিকের মুখে সময়ে সময়ে শুনিতে পাই, বঙ্কিমকর্ত্তৃক দেশের কোন উপকার হওয়া দূরে থাক,—ঘোর অনিষ্ট হইয়াছে। হিঁদুর ছেলে-মেয়েরা নাকি তৎ-প্রণীত উপন্যাসাবলীর নায়ক-নায়িকার চিত্র দেখিয়া আচারভ্রষ্ট ও কলুষিত-চরিত্র হইতেছে। তা ছাড়া, ধর্ম্ম ও সমাজ-সম্বন্ধীয় কথার আলোচনা করিয়া বঙ্কিম হিন্দুর মর্ম্মে আঘাত দিয়াছেন।—তবে আর তিনি দেশের কাজ করিলেন কি?—তাঁকে লইয়া তোমরা অত হৈ চৈ কর কেন?"

কথাটা বিজ্ঞের মুখে বলিতে ও শুনিতে বেশ। কিন্তু এ শ্রেণীর সামাজিক বা সাহিত্য-সেবিগণ কি বঙ্কিমকে একটু সরল দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন? প্রতিভার কার্য্য কি, কবির আদর্শ কি, তাহা কি তাঁহারা কিছু ভাবিয়া দেখিয়াছেন? পূর্ব্বেই আমরা এক স্থলে কবির আদর্শের সহিত রামধনুর তুলনা করিয়াছি, এবং ইহাও বলিয়াছি, কেবলমাত্র বর্ত্তমান লইয়া কবি জন্মগ্রহণ করেন না,—সুদূর-ভবিষ্যতের প্রতিও তাঁহার লক্ষ্য থাকে, এবং সেই লক্ষ্য সাধনোদ্দেশ্যে, ইহজীবনে তিনি অশ্রান্ত শ্রম ও কঠোর কষ্ট-সহিষ্ণুতার পরিচয় প্রদান করেন।

অতএব সব দিক্ না দেখিয়া, খামকা যাঁহারা বঙ্কিমের প্রতি দোষারোপ করেন, তাঁহাদিগকে আমরা ভ্রান্ত বলিয়াই বিবেচনা করি। তোমার হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতার জন্য, কি তোমার সমাজের নৈতিক দুর্ব্বলতার জন্য, অথবা প্রকৃত শিক্ষার অভাবে তে মার ছেলে-মেয়ে উৎসন্ন যাইতেছে বলিয়া কবি ত তাঁহার আদর্শকে খাটো করিতে পারেন না। জীবনে যে উচ্চ আদর্শ লইয়া তিনি ধরাবক্ষে বিচরণ

করেন,—ধর্ম্মে বা সমাজে অথবা সাহিত্যে,—যখনই তিনি তাহার কোনরূপ ব্যতিক্রম দেখিতে পান, তখনই অমনি সিংহবিক্রমে, কাহাকেও দৃক্‌পাত না করিয়া সেই প্রতিভাবান পুরুষসিংহ আত্ম-প্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ রাখেন। মহামহিমময়ী, মহা তেজস্বিনী এই প্রতিভার নাম যদি অহঙ্কার হয়, তবে এ অহঙ্কারকে পূজা করিতেও আমরা প্রস্তুত। মহামনস্বী কার্লাইল এই প্রতিভা-পূজার ব্যবস্থা দিয়াছেন। তাঁহার "Hero-Worship" নামক অপূর্ব্বগ্রন্থে "বীর-কবির" পূজার বিধি আছে। প্রকৃত প্রস্তাবে, প্রকৃত প্রতিভাবান্ কবিও একজন মহা বীরপুরুষ।

তবে বলিবে, বঙ্কিম আর 'হাতে কলমে" দেশের কি করিয়া গিয়াছেন? উত্তরে আমরা বলি, একজন ফিলসফার সারাটা জীবন ঘরে দ্বার দিয়া বসিয়া থাকিয়া, দর্শন-তত্ত্বের একটা কূটমীমাংসা স্থির করিয়া একরূপ ভাবিতে ভাবিতেই মরিয়া গেল,—আর একজন পাহাড়ী-কুলি বিপুল-পরিশ্রমে পাহাড় কাটিয়া রেলপথ বসাইল;—এই দু'য়ের মধ্যেই বা কে 'হাতে কলমে" অধিক কাজ করিল,—ভাল তুমিই বল?

তাই বলিতেছিলাম, 'কর্ম্মযোগী-বঙ্কিম' সারাটা জীবন উৎকট পরিশ্রমে সাহিত্য-ধর্ম্মের সেবা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সেই ঐকান্তিক গবেষণা ও আজীবন অনুশীলনের ফল—সুকুমার সাহিত্যের সহিত ধর্ম্মের অপূর্ব্ব সমন্বয়। যেন হরি-হর মিলন। ইতিপূর্ব্বে, আর কাহারও দ্বারা সাহিত্যের এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্তর প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। তিনি 'প্রচারে' স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া গিয়াছেন,—"বিশ্বেশ্বরের এই বিশ্বসৃষ্টির অপেক্ষা বিস্ময়কর ব্যাপার কোন্ সাহিত্যে কথিত হইয়াছে? একটী তৃণে বা একটী মাছির পাখায় যত আশ্চর্য্য কৌশল আছে, কোন্ উপন্যাস-লেখকের লেখায় তত কৌশল আছে?"

বস্তুতঃ, বঙ্কিমের এই সাহিত্য-সেবা, তাঁহার মহামহিমময় ধর্ম্ম-জীবনের প্রথম ও প্রধান অনুষ্ঠান। আমাদের সৌভাগ্যবশতঃ, তদ্বিরচিত গ্রন্থাবলীও এই মহালোকে আলোকিত।*

শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত।

বাঁশী।

আবার বাজিল বাঁশী শুন লো স্বজনি!
কাঁপিল তমাল-তল,
চঞ্চল যমুনা-জল,
ছাইল আকাশতল,—স্বরশিরোমণি।
নীরব গোকুল কেন,—গোকুল-রমণী?
শাখী শাখে নাহি আর ডাকে বিহঙ্গম,
হারালো চেতনা কি লো স্থাবর জঙ্গম?

দেখ চেয়ে পদ্মবনে মরাল মরালী,—
প্রেম-পুলকিত-চিতে,
প্রিয়মুখে সমর্পিতে,
ভেঙ্গেছিল পদ্মনালে হ'য়ে কতূহলী,
অমনি রয়েছে শুনি' মোহনমুরলী!
মনে মনে কি অপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার,
প্রেম আছে প্রিয় কাছে যত্ন নাহি আর!

দেখ সখি, স্থির-মনে দেখ শতদলে!
পরিমল পরীক্ষণ—
মধুপানে মত্ত মন
চঞ্চলতা নিবারণ হ'য়েছে কি ছলে।
নারিছে উড়িতে ভৃঙ্গ বসিতে কমলে!

* জন্মভূমির লক্ষ্য এবং এই প্রবন্ধের লক্ষ্য দুই বিভিন্ন দিকে অবস্থিত হইলেও, কেমন এক অপূর্ব্বভাবে সম্বদ্ধ, তাহা চিন্তাশীল পাঠক লক্ষ্য করিবেন। জ, ন।

নাহি মুখে গুন্ গুন্ মধুর গুঞ্জন,
চিত্রের পুত্তলি অলি নয়ন-রঞ্জন!

না নড়ে গাছের পাতা নাহি দোলে লতা,
সুন্দর স্বপন ছায়,
অলসে অবশ-কায়,
কি যেন শুনিছে দূর-স্বরগের কথা!
আছে কি চেতনা জড়ে চিত-অধিগতা?
মন্দ মন্দ গন্ধবহ আনন্দ উচ্ছ্বাস,
কুসুম-কেশর-স্পর্শ এত কি আয়াস?

এই যে নাচিতেছিল ময়ূর ময়ূরী,
চঞ্চুপুটে কেকা-বুলি,
পুচ্ছ গুচ্ছ উচ্চে তুলি,
কঙ্কণ-কোমল-তালে অতি ধীরি ধীরি।
চন্দ্রালোকে চন্দ্রাবলী মরি কি মাধুরী!
সহসা কি হলো সখী চিত্তের বিকার,
নীরব নিশ্চল দোঁহে এ কি চমৎকার!

কে শিখালে শ্যামে সই বাজাতে এ বাঁশী?
কাতরে ব'লেছি তায়,
কটাক্ষে যেন না চায়,
রাধা রাধা সাধা কেন রাধা তব দাসী।
সেই সে পরায় গলে কলঙ্কের ফাঁসি!
কত আছে ব্রজাঙ্গনা কত আছে নাম,
দুর্নাম রটায় কেন শ্যাম গুণধাম?

সে আমার আমি তার জানে তার মন।
জীবে সংযোজিত মায়া,
কায়া-সঙ্গে যেন ছায়া,
দেখাবার নয় সখি হৃদয়-দর্পণ!
কি মূর্ত্তি চিত্রিত তায়,—কি নাম তর্পণ!
ক্ষণে জন্মি জলধনু আকাশে মিশায়,
পাষাণে অঙ্কিত অঙ্কে কলঙ্ক কোথায়?

স্বার্থশূন্য আত্মদান সেই ভালবাসা।
পরার্থপরতা কই,
তবে কেন কাঁদি সই,
লোকলাজভয় তবু কেন এত আশা?
ক্ষণেক দর্শনে কেন মেটে না পিপাসা?
মানস-চকোরে চাঁদ-সুধার প্রয়াস,
নয়নে নয়ন হ'লে ঘটে সর্ব্বনাশ!

সরমে মরমে মরি যদি কেহ হাসে।
কাণে কাণে কথা কয়,
কতই ভাবনা হয়,
দুরু দুরু করে হিয়া মরি লো তরাসে।
পিঞ্জরের পাখী আমি সুখের নিবাসে।
যার লাগি সহি সদা গুরুর গঞ্জন,
তার কি উচিত সখি কলঙ্ক-রটন?

দৈবযোগে এক দিন পেয়ে নিরজনে,
ধ'রে দুটী রাঙ্গা পায়,
কত কি বলিনু তায়,
কত যে কাঁদিনু আমি,—নাহি পড়ে মনে।
গলে কি অয়স্ কভু অশ্রু-বরিষণে?
নিতান্ত কুটিল কালা কঠিন-হৃদয়,
কে বলে মমতাহীন জনে রসময়?—

অপাঙ্গে ঈষদ চাহি উত্তরিল হাসি,
"নর কিংবা নারী জাতি,
আন্দোলন দিবারাতি,
যে করিবে আমাদের ভালবাসা-বাসি।
সত্য সত্য বাক্য মোর হে রাধা রূপসি!
আমাদের মত হবে না হবে খণ্ডন।
চন্দ্রের কলঙ্ক সতি অঙ্গের ভূষণ!"

চতুরের চতুরালী ভেবে দেখ সই!
এ গোকুলে কুলে থাকি,
কলঙ্ক কিরূপে ঢাকি,
কুলবালা লজ্জাহীনা কিরূপে বা হই?
ধর্ম্ম জানে মর্ম্মকথা যে অসুখে রই।
দাবানলে পোড়ে বন দেখে সর্ব্বজন,
সঙ্গোপনে মনে মনে পোড়ে পোড়া মন!

শঙ্কবহ সমীরণে ডাকি মনে মনে।
সকাতরে বলি তায়,
দুঃখিনীরে রাখ পায়,
প্রাণরূপ তুমি,—জীবদেহ-নিকেতনে,
এ প্রাণের কথা গুলি কহ তার কাণে।
সঞ্চালন মুরলীর মধুর নিস্বন—
না করিয়া কর দেব লজ্জা নিবারণ!

কখন বা ভাবি মনে ভাবিব না আর,
নির্ম্মল রসের কূপ,
সে-কালার কাল রূপ,
অভাগিনী রাধিকার যন্ত্রণা-আধার।
প্রাণে বাঁচা পাপ প্রাণ তুমিত আমার!
যমুনার কাল জল, কোকিল, তমাল,
সুনীল গগনতল ঘটায় জঞ্জাল!

বিকশিত শতদল পূর্ণ শশধর,
নিরখিলে মুদি আঁখি,
মনে কত চিত্র আঁকি,
মনেরে লুকাতে যাই হৃদয়-ভিতর;
কালরূপে পরিপূর্ণ হৃদয়ের স্তর!
কালার বিষম কালি মোছা নাহি যায়,
সে অঙ্ক কলঙ্ক-মাখা কঙ্কালের গায়।

আবার বাজিল বাঁশী রাধা রাধা রবে।
কলঙ্কে কি এত সুখ,
কি ক'রে দেখাব মুখ,
কলঙ্কিনী রাধিকার কি দশাই হবে?
পারহাসে ননদিনী কত কথা কবে!
হাসিবে হাসাবে লোকে জানিত সে যদি,
দিত কি সাঁতার,—ভাবি শ্যামরূপ নদী?

কে জানিত আগে সই অকূল পাথার!
সে-সময় ছেলে-বেলা,
ভ্রূভঙ্গ তরঙ্গ খেলা,—
নিরধি ভাবিনু হব অনায়াসে পার।
মনের আবেগে দিনু আনন্দে সাঁতার!
মোহের আবর্ত্তে প'ড়ে চারিদিকে চাই,
নদী নয় মহাসিন্ধু, কোন কূল নাই!!

যত যাই মাঝে তত প্রবল তুফান।
ক্রমশঃ গভীর জল,
ক্রমশই হত বল,
ডুবিনু অতল তলে হারাইনু জ্ঞান।
অনন্ত সে,—অন্ত তার কোথা পরিমাণ
ডুবিলাম সত্য সখি না পেলাম তল;
অনুমানি সেই স্থল হবে সুশীতল!

কি করিব কোথা যাব বল সহচরি।
কি উপায়ে ভোলে মন,
শ্যাম মন্ত্র উপাসন,
কিসে হিয়া হয় বশ, পাসরি শ্রীহরি?
কোথা গেলে শ্রুতিপথে না পশে বাঁশরী?
ইচ্ছা হয় খাই বিষ জলে দিই ঝাঁপ,
শ্যাম ভোলে রাধা, যায় রাধার সন্তাপ!

অথবা লো রাধিকার বুঝিবার ভুল।
অন্তরে রাখাল-রাজ,
করে সতত বিরাজ,
প্রাণে বাজে বাঁশী, হিয়া কদম্বের মূল;
চঞ্চল যমুনা-চিতে, আশা বুঝি কূল!
প্রাণ বলে কৃষ্ণ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ বলে রাই
রাধা রাধা রাধা শুনি সততই তাই!!

শ্রীশিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

স্বর্গীয়া শরৎসুন্দরী। *

"শত শত কবি-কল্পিত আদর্শে চরিত্রগঠনের যত সাহায্য না করে, একজন মহাত্মার জীবনীতে তদপেক্ষা বিস্তর ফললাভ হয়।" স্বর্গীয়া

* "প্রাতঃস্মরণীয়া ৺ মহারাণী শরৎসুন্দরীর জীবন-চরিত।"—শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র লাহিড়ী কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। কলিকাতা, ২৬ নং স্কটস্ লেন, হইতে সান্যাল এণ্ড কোম্পানির দ্বারা প্রকাশিত।

শরৎসুন্দরী এইরূপ মহাত্মার অন্যতম;—"আর্য্য-ললনার আদর্শচরিত্রের বহুলাংশ" ইহাঁর চরিত্রে দেখিতে পাওয়া যায়,—আর্য্য-নীতিধর্ম্মের অনুবর্ত্তিনী অন্তঃপুরচারিণী হিন্দু-রমণীর পক্ষে তিনি প্রকৃতই 'প্রাতঃস্মরণীয়া'। "শরৎসুন্দরী, পাঁচ বৎসর সাত মাস বয়সে পতিকুলে আসিয়া, বার বৎসর সাত মাস বয়সে বিধবা হইয়াছিলেন। তাহার পর চব্বিশ বৎসর দশ মাস কাল জীবিতা ছিলেন। তিনি বাল্যে পতিকুলে আসিয়া, আপনার কর্ত্তব্য সকল অতি সাবধানে নির্ব্বাহ করিয়া, পতি-দেবতার পারলৌকিক আত্মার সহিত—বিশ্ব-কারণ পরমেশ্বরে বিলীন হইয়াছেন।"—এই প্রাতঃস্মরণীয়া হিন্দুললনার পবিত্র জীবনী সঙ্কলন করিয়া গিরীশ বাবু একাধারে স্বজাতিপ্রেম, স্বদেশানুরাগ ও সতীত্বের সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন। এখন তৎসঙ্কলিত জীবনী হইতে স্বর্গীয়া মহারাণীর কর্ত্তব্য-সাধনের দুই এক অংশ আমরা এ স্থলে আলোচনা করিব।

সঙ্কলিত গ্রন্থ পাঁচ অধ্যায়ে বিভক্ত। মহারাণীর (১) বাল্যজীবন ও শিশুশিক্ষা-প্রণালী; (২) বিবাহ, গৃহিণীত্ব ও বিদ্যাশিক্ষা; (৩) অকালবৈধব্য; (৪) বৈধব্যান্তে চরিত্র-বিকাশ এবং (৫) স্বকর্ত্তৃত্ব ও কলেবর-ত্যাগ। যথাক্রমে, ঐ পাঁচ অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে। এই সমস্ত প্রসঙ্গালোচনার পূর্ব্বে জীবনী-লেখক লাহিড়ী মহাশয় 'মহাত্মা'-গণের স্বরূপ বর্ণনে চেষ্টা করিয়াছেন এবং প্রকৃতি-ভেদে, তাঁহাদিগকে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। শরৎসুন্দরী ইহাঁদিগের মধ্যে কোন্ শ্রেণীর অন্তর্গত—বুঝিবার নিমিত্ত, জীবনী-লেখকের নির্ব্বাচিত শ্রেণীবিভাগ নিম্নে সংক্ষেপে উদ্ধৃত হইল। তাঁহার মতে—

১। এক শ্রেণীর মহাত্মা জগৎকে আপনা হইতে অভিন্ন দেখেন। তাঁহারা ব্যক্তরূপা-প্রকৃতি-জড়িত অব্যক্তরূপ পুরুষের আরাধনা করেন এবং আপনার উৎকর্ষের সঙ্গে জগতের উন্নতি-পক্ষেও ক্ষিপ্রহস্ত থাকেন। * * * চৈতন্য, খ্রীষ্ট, মহম্মদ এবং অনেক শাস্ত্র-প্রণেতা ঋষি এই জাতীয় মহাত্মা ছিলেন।

২। দ্বিতীয় শ্রেণীর মহাত্মারা আদর্শ মহাত্মার গুণের পক্ষপাতী। স্বয়ং মহাত্মা না হইলেও, সংশিক্ষক। তাঁহারা কেবল ব্যক্তরূপা প্রকৃতির সেবক,—অব্যক্তরূপে চিত্ত সমাধান করিতে পারেন না। নীতি, দর্শন ও বিজ্ঞান-বেত্তা এবং উচ্চ শ্রেণীর কবিরা এই শ্রেণীর মধ্যে গণনীয়।

৩। তৃতীয় শ্রেণীর মহাত্মাগণ, কেবল আত্মোৎকর্ষ ব্যতীত, সমাজ বা লোক-শিক্ষার্থ অগ্রসর নহেন। ইহাঁদিগের মধ্যে—

(ক) কেহ কেহ সমাজ হইতে চির বিদায় লইয়া, ঘোর অরণ্যে বাস করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের কার্য্য লোক-লোচনের বহির্ভূত।

(খ) কেহ বা গৃহে থাকিয়াই স্বকর্ত্তব্য পালন করেন। তাঁহারা সমাজের মধ্যে থাকিয়াও, এরূপে আত্মগোপন করেন যে, তাঁহাদের হৃদয়ের ভাব অন্যে বুঝিতে পারে না। সেই প্রাণের প্রাণ বিশ্বের বীজে একীভূত হইবার জন্য তাঁহাদের জীবন-নদী অন্তঃসলিলায় বহমানা।

এই শ্রেণীর মহাত্মারা ব্যক্তরূপা প্রকৃতিতে অব্যক্তরূপ জগদীশ্বরকে, স্ফটিকে রক্তপুষ্পের আভা-সম্পাতের ন্যায়, দর্শন করেন।—আপনার ছায়া সর্ব্বভূতে দেখেন, জগৎকে ভাল বাসেন, কিন্তু তাহাতে লিপ্ত হইতে কিংবা জগতে আত্মপ্রকাশে অনিচ্ছুক।

৪। চতুর্থ শ্রেণীর মহাত্মারা স্বদেশ-প্রেমিক বীর। তাঁহারা আপনার দেহ, স্বজাতির জন্য, স্বদেশের জন্য, উৎসর্গ করিয়া থাকেন। প্রকৃতির মূলতত্ত্বে লক্ষ্য রাখিয়া, তাঁহারা

সংসারকে সুসংযত করিতে যত্নশীল;—লক্ষ্য সাধনে, স্বজাতির হিতের জন্য, আপনার অস্তিত্ব ভুলিয়া জীবন উৎসর্গ করিতেও কুণ্ঠিত নহেন।

অতঃপর, স্বর্গীয়া মহারাণী কোন্ শ্রেণীর অন্তর্গত—বুঝিতে বাকী থাকে না; তথাপি, জীবন-চরিত-কার স্বয়ং নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তিনি তৃতীয় (খ) শ্রেণীতে সন্নিবিষ্ট হইবার যোগ্যা। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ-কথিত নিষ্কাম কর্ম্মের লক্ষণ উল্লিখিত তৃতীয় শ্রেণীর মহাত্মাগণের মধ্যে জলন্তভাবে প্রকাশমান; সেইজন্য বলি, বঙ্কিম বাবুর গঠিত শ্রী, জয়ন্তী বা প্রফুল্লমুখী অপেক্ষা স্বভাব-দুহিতা শরৎসুন্দরীর পবিত্র জীবনী লোক-সাধারণের চরিত্র-গঠন পক্ষে অধিকতর সুফলদায়ক, আর যিনি সেই জীবনের স্তর ভেদ করিয়া, লোক-লোচনের সমক্ষে ধারণ করিয়াছেন, তিনি সাধারণের ধন্যবাদের পাত্র।

বঙ্কিম বাবুর চিত্রিত চরিত্রগুলির মধ্যে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, স্বদেশ প্রেমিকতার সুন্দর ভাব সংজড়িত; সেই প্রেমময় বীরত্বে অনুপ্রাণিত ও তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য, তদ্রচিত আদর্শ-রমণীগণকে পুরুষ-সুলভ যুদ্ধ-বিদ্যা শিক্ষা করিতে এবং প্রয়োজনমত স্বয়ং বিগ্রহ-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইয়াছে। মানব-হৃদয়ের এই গুণগ্রাম উপরিলিখিত চতুর্থ শ্রেণীর মহাত্মাগণের বিষয়ীভূত। শরৎসুন্দরীর হৃদয়ে এই গুণের অসদ্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু তাঁহার পতি-দেবতা রাজা ৺যোগেন্দ্রনারায়ণ কর্ত্তৃক সেই অপূর্ণতাটুকু বিনষ্ট হইয়াছিল। যোগেন্দ্রনারায়ণের "হৃদয় প্রদীপ্ত তেজে,—দুর্দ্দম উৎসাহে পরিপূর্ণ; তিনি নীলকর-বিদ্রোহ-প্রশমনে আপনার সমস্ত সম্পত্তি, সমস্ত অর্থ, এমন কি প্রাণ পর্য্যন্ত দিবেন বলিয়া" প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন,—মৃত্যু-শয্যায় পড়িয়াও বলিয়াছিলেন, "আমি ব্রাহ্মণের সন্তান—দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া দিনপাত করিব, তথাপি পৈতৃক সম্পত্তির একবিন্দু ভূমি থাকিতে, আমার দেহে জীবন থাকিতে, এই মহৎ ব্রত ত্যাগ করিব না। ইংরেজাধিকারের অনেক পূর্ব্ব হইতে আমার পুরুষানুক্রমিক স্বত্বভোগের পৈতৃক সম্পত্তি, পৈতৃক বাস্তুভূমি। আমি সেই বাস্তুভূমিতে জন্মিয়া এই সমস্ত নিরীহ প্রজার প্রদত্ত রক্তের অংশে পরম সুখে পালিত হইয়াছি। প্রজারা আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম ভ্রাতা। পবিত্র জন্মভূমিতে, সেই পবিত্র বাস্তুতে, যে বিদেশীয়েরা বাণিজ্যের ছলে প্রবেশ করিয়া, অমানুষিক অত্যাচার করিতেছে, তাহাদিগেরই সহিত বন্ধুভাবে সন্ধি করিব? আমার এ ছার জীবনে ধিক্! এমন কলঙ্কিত জীবন আমি এক নিমিষের জন্যও চাহি না।" ইহজীবনে তাঁহার সঙ্কল্পভঙ্গ হয় নাই;—অন্যবিধ নানারূপ অত্যাহিতের সঙ্গে নীলকর-অত্যাচার-জনিত নিদারুণ মানসিক দুশ্চিন্তার বেগে অচিরেই তাঁহার আয়ুঃশেষ হইল বটে, কিন্তু তিনি স্বদেশ-প্রেমরূপ পবিত্র "ধর্ম্মবলে জয়লাভ করিয়াছিলেন। চন্দ্রকলা প্রভৃতি স্থানের নীলকুঠী কয়েকটী অতি অল্প-দিনের মধ্যেই জনশূন্য হইয়াছিল,—নীলকর-দিগের গুদামরূপ কারাগারে কৃষকদিগের আর্ত্তনাদ বন্ধ হইয়াছিল—প্রাণপণ চেষ্টাবলে তিনি নীলকরদিগের 'নিজ্‌জোত' নামক বিস্তর ভূমি আপনার করায়ত্ত করিয়া পূর্ব্বাধিকারী প্রজাকে দান করিয়াছিলেন। ফলতঃ, তাঁহার অসাধারণ দৃঢ়তা, অবিচলিত কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, নির্ভীক স্বদেশ প্রেমিকতা এবং প্রকৃত আত্ম-ত্যাগ-সমন্বিত মহত্ত্বজনক প্রজা-বাৎসল্য, এই হতভাগ্য নির্জ্জীব দেশে অনেকেরই শিক্ষণীয়।" —হিন্দুমতে, স্ত্রীপুরুষ একাঙ্গ; যোগেন্দ্রনারায়ণ-শরৎসুন্দরীর শুভপরিণয়ে মণি-কাঞ্চন সংযোগ হইয়াছিল, উভয়ের একীভূত জীবন কবি-

কল্পিত পূর্ণ মনুষ্যত্বের জীবন্ত লীলা প্রদর্শন করিয়াছিল।

দুঃখের বিষয়, যোগেন্দ্রনারায়ণ ও শরৎ-সুন্দরীর ঐহিক সম্মিলন অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই। 'যৌবনের প্রথম উদ্যমে, অতৃপ্তজীবনে একুশ বৎসর এগার মাস মাত্র বয়সে, যোগেন্দ্র-নারায়ণ ইহধাম পরিত্যাগ করেন;' আর স্বর্গীয়া শরৎসুন্দরী তখন অস্ফুট-কুসুম-কলিকা দাম্পত্যসুখানভিজ্ঞা ত্রয়োদশ-বর্ষীয়া বালিকা, বাল্য-যৌবনের সন্ধিস্থলে অলক্ষিত ভাবে উপনীতা—সেই 'যৌবনসন্ধিকালে' অনন্ত দুঃখ-সাগরে ভাসমানা বিয়োগ-বিধুরা বাল-বিধবা। ভগবানের এই বিচিত্র লীলা ভাবিয়া বিস্মিত হইতে হয়, সংসার-সুখের নশ্বরতা চিন্তা করিয়া ভ্রান্তিময়ী মায়ার পেষণে অশ্রু সংবরণ করিয়া থাকিতে পারা যায় না। আজিকার দিনে, যে বয়সে বিবাহ মাত্র সংঘটিত হয় না, 'বি-বা-হ' নাম শুনিয়া পাত্র-পাত্রী ও অভিভাবকগণ বিস্ময়-বিকলিত-চিত্তে শিহরিয়া উঠেন, সেই বয়সে অতুল সম্পত্তির অধিকারিণী বালিকা বিধবা। 'শিক্ষিত' সম্প্রদায়ের সদ্বিবেচনায় সেই বালিকা সদ্‌জ্ঞানবিরহিতা, পতির পতিত্ব উপলব্ধি করিতে একেবারে অশক্তা,—যুক্তি-তর্কের আনুকূল্যে পূর্ণ ষোড়শবর্ষ বয়সে পুনরায় বিবাহিতা হইবার উপযুক্তা। কিন্তু, আশ্চর্য্যের বিষয়, এই অলোক-সামান্যা বাল-বিধবা সেই বয়সেই "পতি-দেবতা, কিরূপ প্রেম ও ভক্তির পাত্র, তাহা উত্তমরূপে বুঝিয়াছিলেন। পতি বিদ্যমানে কোন দিন তাঁহার নিকট প্রগল্‌ভতা, কিংবা চপলতা প্রকাশ করেন নাই। যোগেন্দ্রনারায়ণকে তিনি, বাস্তবিকই, সাক্ষাৎ দেবতার ন্যায় ভক্তি করিতেন। দাম্পত্য-সুখের অতৃপ্তি এবং অকালবৈধব্যে, তাঁহার হৃদয়ে পতিভক্তি, ব্রহ্মচর্য্য এবং অকাম-ধর্ম্ম দৃঢ়রূপে আশ্রয় করিয়াছিল। তিনি, সধবা কিংবা বিধবা, কোন অবস্থাতেই পতিদেবতার কোন দোষ দেখিতে পান নাই, অথচ পদে পদে আপনার নগণ্য দোষও দেখিতে পাইতেন।" বর্ত্তমান প্রথানুসারে বিধবার পক্ষে বামহস্তে কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্রখণ্ড বদ্ধ করিলেই, বিগতজীবন স্বামীর উদ্দেশে যথেষ্ট সম্মান ও শোক প্রকাশ করা হইত, কিন্তু "যোগেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যুর পর, শরৎসুন্দরী যে, মস্তক মুণ্ডন করিয়া, তৈল-সংস্কারাদি ত্যাগ করিলেন, মৃত্যু পর্য্যন্ত তাহাই পালন করিয়াছিলেন। পণ্ডিতদিগের নিকট বিধবার কর্ত্তব্যগুলি একে একে বুঝিয়া লইয়া সেই ত্রয়োদশবর্ষ বয়সে ভূমিশয্যায় শয়ন, তৈল-সংস্কারাদি বর্জ্জন এবং ব্রত উপবাসাদি ঘোরতর ব্রহ্মচর্য্য আরম্ভ করিলেন।" এই অবস্থায়, কার্য্যসূত্রে, কোন দিন রাজসাহীর কালেক্টর-পত্নী রাজান্তঃপুরে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া, তাঁহার মুণ্ডিত মস্তক, মোটা বস্ত্র পরিধান, ও রুক্ষ কেশ দেখিয়া, মনঃকষ্টের আবেগে কথা-প্রসঙ্গে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—"রাণি! আমাদের দেশে তোমার মত বালিকা-বয়সে কাহারও বিবাহই হয় না, অথচ তুমি এই বয়সে এরূপ কঠোর ব্রত কেন করিতেছ?—আমি জানি, তোমাদের শাস্ত্রেও বালবিধবার পুনরায় বিবাহের বিধান আছে; অতএব, তুমি পুনরায় বিবাহ করিলেও ক্ষতি নাই।" বালিকা শরৎ-সুন্দরী এই কথা শুনিয়া নতমুখে কেবল অনর্গল অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন। হিন্দু বিধবার প্রকৃতিতত্ত্বানভিজ্ঞা সাহেব-বনিতা তদ্দর্শনে নিতান্ত অপ্রতিভ হইয়া নানারূপ বিনতির সহিত পুনঃপুনঃ ক্ষমা প্রার্থনা পূর্ব্বক বিদায় গ্রহণ করিলেন।" শরৎ সুন্দরীর চিত্ত কিছুতেই আশ্বস্ত হইল না; * * * তিনি সেই দিন হইতে তিন দিবস অনাহারে রোদন করিয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন।" বলা বাহুল্য, এই ঘটনা তাঁহার প্রকৃতিরই পরিচায়ক, পুরুষ-প্রবর্ত্তিত সমাজ-শাসনের নিদর্শন নহে।

কুসুম-কোমল কিশোর বয়সে ঐরূপ কঠোর কর্ত্তব্য পালন করা বাস্তবিকই কি অসাধ্য ও অসম্ভব ব্যাপার?—বোধ হয়, তাহা নহে। শিক্ষা, সংসর্গ ও অভ্যাসগুণে সকলই সহজ হইয়া পড়ে; নতুবা, রাজবনিতা, ধনীর দুহিতা, শরৎসুন্দরীর পক্ষে উল্লিখিত প্রথা অনুসরণ করা কখনই সম্ভব হইত না। জন্মান্তরবাদী হিন্দু ভিন্ন প্রাক্তনফল কেহ স্বীকার করেন না; কিন্তু, যে কারণেই হউক, 'সহজাত মূলপ্রকৃতি' শিশুর বাক্যস্ফূরণের সঙ্গেই বুঝিতে পারা যায় এবং বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সেই প্রকৃতিজাত কার্য্যপরম্পরা প্রত্যক্ষ হইয়া পড়ে। সমালোচ্য গ্রন্থে এই মূলতত্ত্ব সবিস্তারে আলোচিত হইয়াছে, এ স্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। শিক্ষাগুণে ঐ প্রকৃতি-নিয়ন্ত্রিত সদাচারোন্মুখী হইয়া থাকে; এই জন্য শিশু-প্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাহাকে সৎশিক্ষা দেওয়া পিতা-মাতা ও অভিভাবগণের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য,—তন্মধ্যে "আবার জননীরূপিণী গৃহলক্ষ্মীদিগের দায়িত্ব গুরুতর বুঝিয়া বড়ই সাবধান হইতে হয়।" সৌভাগ্যক্রমে, শরৎসুন্দরীর জীবনে এই উভয়-বিধ ঘটনাই সম্পূর্ণ অনুকূল ছিল;—"তাঁহার মূলপ্রকৃতির অঙ্কুরেই অব্যক্ত মহত্ত্ব ছিল। ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, দয়া, লজ্জা, ক্ষমা, পরদুঃখ-কাতরতা প্রভৃতি সদ্‌গুণ আত্মপ্রতিভার ক্ষীণ-জ্যোতিতে মিশিয়া তাঁহার বালিকা-স্বভাবেই বিরাজ করিত। তিনি বাল্যকালে যেমন হৃষ্টপুষ্ট ও সুস্থ ছিলেন, প্রকৃতিও সেইরূপ শুদ্ধ ও শান্ত ছিল। তাঁহার দেহে সেই বয়সেই স্ত্রীজন-সুলভ লজ্জার সঞ্চার হইয়াছিল। যে বয়সে অন্য বালিকারা উলঙ্গাবস্থায় থাকে, শরৎসুন্দরী সেই বয়সে আপন হাতে কাপড় পরিতে গিয়াছিলেন; বহির্বাটীতে আসিতে লজ্জা বোধ করিতেন। তাঁহার শিশু-চরিত্রে এরূপ গুণ-সমাবেশের প্রধান কারণ,—তাঁহার পূজনীয়া জননী। জননী দ্রবময়ী, অতি সুশীলা এবং গুণবতী মহিলা ছিলেন। প্রাচীন বয়স পর্য্যন্ত তাঁহাকে কেহ অবগুণ্ঠন মোচন করিতে দেখে নাই। তিনি আজীবন সংসারের কোন কর্ত্তৃত্বে যাইতেন না,—অন্যের অধীনা হইয়া অন্তঃপুরের নিভৃত কক্ষে জীবন অতি-বাহিত করিয়াছিলেন। শরৎসুন্দরী, সেই গর্ভে জন্মিয়া, সেই দেবীমূর্ত্তি সম্মুখে দেখিয়া, সেই সুশীলা জননীর সৎকার্য্যের সহচরী হইয়াই, বাল্যকালে এইরূপ চরিত্র লাভ করিয়াছিলেন। * * * বাল্য-খেলাতেও তাঁহার ধর্ম্মনিষ্ঠার অনুষ্ঠান ছিল,—খেলাচ্ছলে তিনি দেব-পূজা, জপ ও ব্রতানুষ্ঠান করিতেন। ইহার পর বাড়ীতে কোন ব্রত-নিয়ম অথবা দেবার্চ্চনাদির উৎসব হইলে, তাঁহার খেলায় মন থাকিত না। তিনি, মাতার সঙ্গে প্রবীণার ন্যায়, ব্রতপূজাদির দ্রব্য-জাত আয়োজনে প্রবৃত্তা হইতেন। অন্যের দৃষ্টান্তে শুদ্ধাচারে ও পবিত্রদেহে থাকিয়া, অতি দক্ষতার সহিত, ঐ সকল কার্য্য করিতেন। শিব-রাত্রি এবং জন্মাষ্টমী প্রভৃতির উপবাসের জন্য বিনীতভাবে পিতামাতার নিকট আগ্রহ প্রকাশ করিতেন, কিন্তু পঞ্চম-বর্ষীয়া বালিকাকে কেহই উপবাসের বিধি দিতেন না; তখন অন্যে তাঁহার শান্তির লাবণ্যময় মুখের মালিন্য দেখিতে পাইত। কিন্তু হৃদয়ে বিশেষ কষ্ট হইলেও, কদাচ পিতা-মাতার নিকট ধৃষ্টতা বা অবাধ্যতা প্রকাশ করিতেন না,—হৃদয়ের ইচ্ছা হৃদয়েই দমন করিতেন।"

একদিকে জননীর অন্তঃপুরের ঐ সমস্ত বিধি-ব্যবস্থা, অপরদিকে "পিতার বিস্তৃত অতিথি-শালা তাঁহার সুশিক্ষার সাহায্য করিয়াছিল। সেই বাল্যজীবনেই পিতার অতিথিশালা দেখিয়া সংসারকে পরম-পিতার একটী অতিথি-শালা বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বদাই অতিথি-দিগকে স্বচক্ষে ভোজ্য-বিতরণ

দেখিতেন এবং সেই অতিথিশালা-প্রবাসী নানা শ্রেণীর লোকের নিকট নানা কথা শুনিয়া, মনুষ্য-জীবনের চরম বিভীষিকা ভাবিয়া, দরিদ্রের ও ব্যাধিগ্রস্তের দুঃখ এবং সহিষ্ণুতা দেখিয়া, বালিকা শরৎসুন্দরী সময়ে সময়ে আত্মহারা হইতেন ও সততই, আপনার সাধ্যমত, তাহাদিগের দুঃখমোচনের চেষ্টা করিতেন। ফলতঃ, সংসারীর এই সকল দুর্গতি দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ে আত্মদুঃখে বিস্মৃতি, ত্যাগ, ক্ষমা ও পরদুঃখকাতরতা প্রভৃতি গুণের উন্নতি লাভ করিয়াছিল।"

সমালোচ্য গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে শরৎসুন্দরীর বাল্যজীবনের সংশিক্ষা-লাভের ঐরূপ শত শত সুন্দর উপকরণ সজ্জিত। কোন্‌টী ছাড়িয়া কোন্‌টী লইয়া আমাদিগের এই ক্ষুদ্র আলোচনার অধীন করিব, ভাবিয়া উঠা সুকঠিন। তবে আমরা যে কয়েকটী প্রসঙ্গ উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতেই স্পষ্ট বুঝা যাইবে, শরৎসুন্দরী ভবিষ্য-জীবনের উপযোগী চরিত্রগঠনের জন্য বাল্যে, শিক্ষার উপকরণের অপ্রতুল ছিল না। বঙ্গদেশে স্ত্রী-শিক্ষা নিতান্ত বিরল বলিয়া অধুনাতন 'শিক্ষিত' সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ অভিযোগ ও ক্ষোভ দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু উল্লিখিত-রূপ নীতিশিক্ষা অপেক্ষা হিন্দুললনার পক্ষে অন্য কি সুশিক্ষা হইতে পারে, আমরা বুঝিতে অক্ষম। নৈতিক উন্নতির সঙ্গে সাংসারিক সুসারের জন্য ও সদ্‌গ্রন্থপাঠ দ্বারা চিত্তবৃত্তি-পরিমার্জ্জনের নিমিত্ত, অক্ষর-শিক্ষারও প্রয়োজন ঘটিয়া থাকে। শরৎসুন্দরীর জীবনে সে প্রয়োজনও সুসিদ্ধ হইয়াছিল। শিক্ষানবিশ অবস্থায় কলিকাতায় অবস্থান কালে, শরৎসুন্দরীর স্বহস্ত-লিখিত পত্রাভাবে, যুবক যোগেন্দ্রনারায়ণের হৃদয় আশ্বস্ত হইত না। প্রিয়তমা ভার্য্যার এই অভাব উপলব্ধি করিয়া "যোগেন্দ্রনারায়ণ বিদ্যালয়ের ছুটী উপলক্ষে বাটী আসিয়া শরৎসুন্দরীকে লেখা পড়া শিক্ষা দিতে লাগিলেন এবং পুনর্ব্বার কলিকাতা যাত্রাকালে জনৈক বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীর প্রতি তাঁহার বিদ্যাশিক্ষার ভারার্পণ করিয়া গেলেন। অতি অল্পদিনের মধ্যে শরৎসুন্দরী কর্ত্তৃক যোগেন্দ্রনারায়ণের অভিলাষ পূর্ণ হইল। বালিকা স্বয়ং যোগেন্দ্রনারায়ণকে পত্র লিখিতে আরম্ভ করিলেন। দৈনিক অল্প অল্প শিক্ষায় দুই বৎসরের মধ্যে শরৎসুন্দরী ভাল ভাল পুস্তক পড়িতে ও বুঝিতে পারিতেন। তাঁহার হস্তাক্ষর ছাপার মত হইয়াছিল।" এই শিক্ষা পতি বর্ত্তমানে তাঁহার মনস্তুষ্টি সাধন করিতে পারিয়াছিল এবং কালক্রমে, স্ব-কর্তৃত্ব সময়ে বিষয়কার্য্য-পরিচালনা পক্ষেও বিশেষ সহায় হইয়াছিল। "আহারান্তে বসিয়া, নানা স্থানের সমাগত তাঁহার নামায় সমস্ত পত্র তিনি স্বয়ং পাঠ করিতেন। এইরূপ অভ্যাসের জন্য অতি অল্পশিক্ষিত হইতে সুশিক্ষিতদিগের অসম্পূর্ণ কদর্য্য অক্ষরও অবাধে পড়িতে পারিতেন এবং তাহার ভাব উদ্ধারে কৃতকার্য্য হইতেন। ইহা ভিন্ন, দৈনিক আয়-ব্যয়ের হিসাব দেখিবার পর, সাময়িক সংবাদ-পত্র ও ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করিতেন; পুরোহিতদিগের নিকট ব্যাখ্যা সহ সংস্কৃত গ্রন্থের অর্থ শুনিতে শুনিতে সংস্কৃত ভাষাতেও তাঁহার প্রবেশিকা-শক্তি জন্মিয়াছিল,—বিশেষ মনোযোগের সহিত তিনি সংস্কৃত পুস্তকও পড়িতেন।" লক্ষ্যভ্রষ্ট ইংরাজি শিক্ষা না ঘটিলেও এবং দর্শন-বিজ্ঞান-কাব্যোপন্যাসের রসাস্বাদন না করিলেও, সাংসারিক ও পারত্রিক মঙ্গলানুকূল শিক্ষা বিষয়ে তাঁহার জীবনে কোনরূপ অসদ্ভাব ঘটে নাই।

সভ্য-জগতে এবং এতদ্দেশীয় অধুনাতন শিক্ষিত সমাজে যাহা কিছু অরুচি ও অপ্রীতিকর বোধ হয়, যাহা সভ্যতা ও উন্নতির প্রতিকূল দেখা যায়, দুর্ভাগ্য কি সৌভাগ্যবশে

বলিতে পারি না, শরৎসুন্দরীর জীবনে তৎসমস্তই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান। বালবিধবার পুনর্ব্বিবাহ না ঘটাতে সাহেব-গৃহিণীকে আমরা আক্ষেপ করিতে শুনিয়াছি। শরৎসুন্দরীর শিক্ষার যে চিত্র আমরা উপরে উদ্ধৃত করিলাম, বর্ত্তমান রুচির বাজারে তাহা শিক্ষা বলিয়াই গৃহীত হইতে পারে না। তার পর, তাঁহার বিবাহের কথা। আজি কালি বিবাহ-বিভ্রাটের গতিকে ত্রয়োদশ-বর্ষীয়া বালিকার বিবাহও, 'সমাজে'-বাল্য-বিবাহ বলিয়া ঘৃণিত ও উপেক্ষিত হইতেছে, স্বর্গীয় কেশবচন্দ্রকে ঐরূপ বয়ঃস্থা বালিকা-কন্যার বিবাহ দেওয়ার নিমিত্ত অশেষ নিগ্রহ সহ্য করিতে হইয়াছে, আর এই প্রাতঃস্মরণীয়া রমণীর বিবাহ ঘটিয়াছিল, পাঁচ বৎসর সাতমাস বয়সে! বিবাহের পর সাত বৎসর মাত্র তিনি সধবা ছিলেন, স্বামীর মৃত্যু সময়েও তিনি সম্পূর্ণ বালিকা। এ অবস্থায় যোগেন্দ্রনারায়ণ ও শরৎসুন্দরীর পরস্পর পতি-পত্নী-সম্বন্ধ-বোধ ও সানুরাগ সহানুভূতির উদ্রেক কি সম্ভব?—সম্ভব! শরৎসুন্দরীর জীবনেই তাহা দৃঢ়রূপে প্রমাণিত।

শিশু বয়সে বিবাহিতা হইয়াও, "তিনি অল্পদিন মাত্র পিতৃভবনে ছিলেন। * * * পিত্রালয়ে থাকিলে বালিকার স্বেচ্ছাচার প্রবল হইয়া নৈতিক উন্নতির ব্যাঘাত হইতে পারে, এই আশঙ্কায় যোগেন্দ্রনারায়ণ তাঁহাকে পিতৃভবনে না পাঠাইয়া সঙ্গেই রাখিয়াছিলেন এবং জননী অভাবে, এক বিধবা মাতুলানীকে শরৎসুন্দরীর অভিভাবিকা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এই বিধবা, ধর্ম্মনিষ্ঠা ও সুশীলা ছিলেন এবং শরৎসুন্দরীকে আপনার কন্যার ন্যায় স্নেহ করিতেন; বালিকাও তাঁহাকে অসাধারণ ভক্তি করিতেন। * * * যোগেন্দ্রনারায়ণের আদরে, ক্রমে ক্রমে, বালিকা যেন এক নূতন জগতে উপস্থিত হইলেন। বালিকার হৃদয় ধীরে ধীরে যোগেন্দ্রনারায়ণের বশবর্ত্তী হইয়া উঠিল। তখন, বিবাহের কথা মনে উদয় হওয়ায়, যোগেন্দ্রনারায়ণের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ বুঝিয়া লইলেন, তদ্ভিন্ন তাঁহার অভিভাবিকা, প্রসঙ্গে প্রসঙ্গে, যোগেন্দ্রনারায়ণের সঙ্গে তাঁহার সম্বন্ধ এবং তাঁহার প্রতি বালিকার কর্ত্তব্যগুলি যাহা বুঝাইতেন, বালিকা তাহা আপনার হৃদয়ে অতি গোপনে রক্ষা করিতেন। সীতা-সাবিত্রী-চরিত্র, অতি আগ্রহের সহিত শুনিতেন, আর চিত্তকে সেই পবিত্রতায় লইতে চেষ্টা করিতেন। স্বামীর ভালবাসা লাভ করিবার জন্য বালিকার হৃদয় সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকিত। তিনি যোগেন্দ্রনারায়ণের প্রয়োজনীয় সামগ্রীগুলি অতি পরিপাটীরূপে প্রস্তুত রাখিতেন,—কোন কার্য্যে প্রায় দাসদাসীর সাহায্য লইতেন না; অথচ, কোন প্রকারে প্রগল্‌ভতা বা নির্লজ্জতাও প্রকাশ পাইত না। ইহাতে যোগেন্দ্রনারায়ণও আস্তে আস্তে সেই বালিকার বশবর্ত্তী হইয়া উঠিলেন।" ইহাপেক্ষা বাল্যদাম্পত্যের সুখকর চিত্র আর কি হইতে পারে?

পতিবিয়োগান্তে সাধ্বী শরৎসুন্দরী কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত কোন কোন কার্য্যের পরিচয় পূর্ব্বেই দেওয়া গিয়াছে। এখন আর কয়েকটীর উল্লেখ করিয়া সংসারী অবস্থায় তাঁহার ব্রহ্মচর্য্য ও নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠানের পরিচয় দিব।—(১) "বিধবার কর্ত্তব্য একাদশী, শ্রবণা দ্বাদশী, জন্মাষ্টমী, আশ্বিন ও চৈত্র মাসের মহাষ্টমী, রামনবমী প্রভৃতি নিত্য নৈমিত্তিক উপবাসাদি ভিন্ন, আর্য্যধর্ম্মানুমোদিত যত প্রকার ব্রত আছে, একে একে শরৎসুন্দরী তাহা গ্রহণ করিলেন এবং তদুদ্দিষ্ট উপবাসাদি যথানিয়মে পালন করিতে লাগিলেন। তদ্ভিন্ন ব্রতাদির মিষ্টান্ন সামগ্রী আদি স্বহস্তে প্রস্তুত করিতেন। (২) অবিরাম জ্বরে একদা নিতান্ত কাতরা ও পিপাসায় মূর্চ্ছাপন্না হইয়াও, অর্থলোলুপ ব্রাহ্মণবিশেষের

ব্যবস্থাসত্ত্বেও একাদশীতে জল পান করেন নাই, বরং ঐ ব্যবস্থাদাতা ব্রাহ্মণগণের প্রতি আজীবন কাল অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিতেন। (৩) বৃন্দাবনে পদব্রজে চতুরশীতি ক্রোশ পর্য্যটন করিয়াছিলেন; ভাদ্রমাসের প্রখর মেঘান্ত রৌদ্রের মধ্যে গমন করিতে বিশেষ কষ্ট পাইলেও, একমুহূর্ত্তের জন্যও পাল্কীতে আরোহণ করেন নাই। (৪) পতিদেবতার আসন্নকালে শুশ্রূষা করিতে না পারার জন্য চিরজীবন ক্ষোভ ও অনুতাপ প্রকাশ করিতেন;—পিতার আসন্নকালে একান্তমনে তাঁহার চরণোপান্তে বসিয়া স্বহস্তে তাঁহার সেবা করিয়াছিলেন। (৫) তিনি দেহকে একটা পদার্থ বলিয়াই জানিতেন না। বিধবা হইয়া অবধি তিনি আপন দেহকে মৃতপ্রায় বোধ করিতেন এবং সেই অকিঞ্চিৎকর দেহ কেবল ধর্ম্মকার্য্যে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। ক্ষুধাতুরকে আহার দিলেই নিজে পরিতোষ লাভ করিতেন,—প্রার্থীর অভাব পূর্ণ করিলেই আপনার প্রভূত শান্তি অনুভব করিতেন,—পীড়িতের পীড়াশান্তি করিলেই আপনাকে সুস্থদেহা বিবেচনা করিতেন। (৬) ব্রতোপবাসে তাঁহার অধিক দিন গত হইত; মাসের মধ্যে যে অল্পদিন আহার করিতেন, তাহাও সামান্য হবিষ্যান্ন। (৭) তিনি ঘোরতর পাপাত্মাকেও নিন্দা করিতেন না,—কাহারও নিন্দা শুনিলে বক্তাকে সবিনয়ে নিষেধ করিতেন। (৮) তাঁহার মতের বিরুদ্ধে অতি সামান্য লোক বক্তা হইলেও প্রতিবাদ করিয়া তাহার মনে ব্যথা দিতেন না। (৯) মহারাণী গুরুতর অপরাধীর বিরুদ্ধেও ফৌজদারী করিতে অনুমতি দিতেন না। (১০) ব্রতাঙ্গ উপবাস ও নিয়মাদি স্বয়ং করা ভিন্ন অন্যকে প্রতিনিধি দিতেন না। তিনি জানিতেন যে, ব্রতাঙ্গ উপবাসের এবং সংযত আহারের চিত্তসংযম ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহই প্রধান উদ্দেশ্য। যদি ব্রত দ্বারা শরীরের অসৎপ্রবৃত্তি সকল দমন এবং সৎপ্রবৃত্তি সকল উন্নত না হইল, তবে ব্রত করার ফল কি ?"—মহাতপস্বিনী মহারাণীর প্রত্যেক কার্য্যে এইরূপ অনন্যসাধারণ কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও ব্রহ্মচর্য্যের ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়; সমালোচ্য গ্রন্থেও তাহার বিস্তর উল্লেখ আছে। সকল কথার পুনরাবৃত্তি এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের সীমাবহির্ভূত। তবে তাঁহার আসক্তি-বিবর্জ্জিত আর কয়েকটী কার্য্যের উল্লেখ করিব।

আত্মীয় কুটুম্বাদি-বধ-জনিত মহাপাপের মধ্যেও শ্রীভগবান্, মহাবাহু ধনঞ্জয়কে অনার্য্যজনোচিত অকীর্ত্তিকর মোহ পরিত্যাগ করিয়া, কর্ত্তব্য-সাধনে প্রণোদিত করিয়াছিলেন। শরৎসুন্দরীর "অমানুষী ক্ষমাশীলতা এবং ত্যাগস্বীকারের ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত থাকিলেও", আত্মস্বত্ব-রক্ষা রূপ কর্ত্তব্য-পালনে তাঁহাকে পরাঙ্মুখ দেখা যায় না। বিষয়-ভার স্বকর্ত্তৃত্বে গ্রহণ করার পর তিনি তৎপূর্ব্বসূচিত ভূসম্পত্তি-ঘটিত বিবাদ সকল যতদূর সাধ্য সহজে মীমাংসা করিলেন। পরন্তু, যাহা নিতান্ত ক্ষতিকর, অথচ প্রতিপক্ষীয়েরা স্বার্থত্যাগে অসম্মত ছিলেন, তাহার ন্যায্য স্বত্ব উদ্ধারের জন্য তিনি দেওয়ানী মোকদ্দমা করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই। তবে "তাঁহার অকপট সার্ব্বজনীন উদারতায় নিতান্ত শত্রুও নতশিরে বাধ্য হইতে লাগিল,—শত্রুতা দূরের কথা, অল্পদিনের মধ্যে সকল অংশীই তাঁহার বশতাপন্ন হইলেন।"—প্রকৃত দরিদ্রের অযাচিত ভাবে দুঃখ-মোচন করা তাঁহার চরিত্রের বিশেষত্ব ছিল; এইরূপ ও অন্যবিধ সহস্র সৎকার্য্যোপলক্ষে তিনি রাশি রাশি ধন বিতরণ করিতেন, অথচ "বিধবা হইবার দিন হইতে, রজত-কাঞ্চন, মণিমুক্তা, কিংবা টাকা-মোহর কখন স্পর্শ করেন নাই। তিনি প্রত্যহ বিস্তর বিচিত্র বস্ত্র, শাল, বনাত বিতরণ করিতেন, কিন্তু আপনি একখানি মোটা

কাপড়েই শীত-গ্রীষ্ম সমভাবে অতিবাহিত করিতেন,—পৌষ মাঘ মাসের দুরন্ত শীতেও পরিধেয় বস্ত্রের অঞ্চল ব্যতীত অপর গাত্রবস্ত্র ব্যবহার করিতেন না। বহুমূল্য আসনাদি দেব কার্য্যে উৎসর্গ করিতেন, অথচ স্বয়ং মৃত্তিকাসনে উপবেশন করিতেন,—ক্রিয়াকলাপাদি উপলক্ষে অবশ্য ব্যবহার্য্য আসনের কার্য্য কুশাসনই সম্পন্ন করিত। আবার এতাদৃশ বিষয়নিঃস্পৃহা স্বত্বেও রাজপ্রসাদ স্বরূপ 'মহারাণী'-উপাধি অবনত মস্তকে গ্রহণ করিয়াছিলেন।" এইরূপ একদিকে অনুষ্ঠান, অপর দিকে অনাসক্তি, তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যে প্রতীয়মান হয়। সংস্কৃত-শাস্ত্রের উন্নতি এবং তদুপলক্ষে পণ্ডিতবর্গকে দান, স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণগণকে অর্থ-সাহায্য, বিনা সুদে ঋণদান এবং তাহা পরিশোধে অসমর্থ ব্যক্তিকে ক্ষমা, অসমর্থ লোকের চিকিৎসা-ব্যয়, তীর্থগমন ও তীর্থবাসের ব্যয়, বিদ্যালয় এবং চতুষ্পাঠীতে পাঠের ব্যয় ও পরীক্ষার ফী, বিদ্যালয়-গৃহনির্ম্মাণ, জলাশয়-নির্ম্মাণ, পথ-প্রস্তুতকরণ, বিদ্যালয় ও চতুষ্পাঠী এবং সাধারণ পুস্তকালয় সংস্থাপন, দেবালয়-নির্ম্মাণ ও অন্নসত্রের উন্নতি-সাধন, পুস্তক-মুদ্রণ কার্য্যে উপযুক্ত গ্রন্থকারকে প্রচুর অর্থানুকূল্য, চিকিৎসানুসঙ্গতির জন্য ডাক্তার ও কবিরাজ নিয়োগ প্রভৃতি নানা কার্য্যে মহারাণীর দান, দয়া ও সুকীর্ত্তি অদ্যাবধি ঘোষিত হইতেছে।

শরৎসুন্দরীর চরিত্রের যে সকল অঙ্গ উপরে আলোচনা করা গিয়াছে, তাহাতে তিনি যে, "হিন্দু-সন্তানের চক্ষে পবিত্রা আর্য্যনারী-কুলের আদর্শ-স্বরূপা" বলিয়া পূজিতা হইবেন, তৎপক্ষে সন্দেহের কারণ দেখা যায় না। কথিত আছে, "অন্য ধর্ম্মাবলম্বিগণও একবাক্যে তাঁহাকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন।"* মহারাণী-উপাধি প্রদানেই খৃষ্টীয় গভর্ণমেণ্টের পক্ষে তাঁহার চরিত্রে সম্পত্তি-শাসন-প্রণালীতে এবং নিঃস্বার্থ দান-ধর্ম্মে সন্তুষ্ট হওয়ার প্রকৃষ্ট পরিচয়। তার পর, অধুনাতন সংস্কারপ্রিয় নব্য সম্প্রদায়ের কথা। "সাম্য-স্বাধীনতা-মৈত্রী"—এই সম্প্রদায়ের মূলমন্ত্র; মহারাণীর চরিত্রে এই ত্রিবিধ গুণের কিরূপ ছায়া দেখিতে পাওয়া যায়, এখন একবার সমালোচ্য গ্রন্থে তাহারই অনুসন্ধান করা যাউক। দান, আতিথ্য, পীড়িতের চিকিৎসা, দরিদ্রের সাধ্যমত অভাবমোচন, পর-দুঃখ-কাতরতা প্রভৃতি যে সমস্ত গুণের উল্লেখ পূর্ব্বে করা গিয়াছে, সার্ব্বজনীন 'মৈত্রী'র তাহা অপেক্ষা সুন্দর লক্ষণ আর কি হইতে পারে? 'স্বাধীনতা' সম্বন্ধে জীবনী-লেখক লাহিড়ী মহাশয় রীতিমত পূর্ব্বাভাষ স্থির করিয়া শরৎসুন্দরীর চরিত্রে তাহা আরোপ করিয়াছেন। লিখিয়াছেন,—"জীবমাত্রেরই ব্যক্তিগত স্বাধীনতা আছে বলিয়া জীব-জগতের এত উন্নতি। পক্ষান্তরে আবার, পরস্পরের ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় যতদূর সাধ্য আঘাত না করিয়া, স্ব স্ব কর্ত্তব্য-পরিচালনা করাই জীবের অপার মহত্ত্ব। জীবকুলে মনুষ্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং স্বাধীন হইয়াও পরোক্ষে সর্ব্বপ্রকারে সমাজের অধীন। যে ব্যক্তি আপনার স্বাধীন ইচ্ছার বেগে অকারণে অন্যের স্বাধীনতায় আঘাত করে, সে মনুষ্য হইয়াও পশুর অধম। অতএব মনুষ্য মাত্রেরই স্ব স্ব স্বাধীনতা-পরিচালনার একটী আপেক্ষিক সীমা নির্দ্দিষ্ট আছে। তাহা বুঝিয়া, সমাজ কিংবা কাহারও ব্যক্তি-গত আপেক্ষিক স্বাধীনতায় আঘাত না পায়, এরূপ ভাবে, সুপথে স্বাধীনতা-চালনা করিতে সকলেই অধিকারী। পরস্পরের স্বাধীন ইচ্ছার সীমারক্ষার জন্যই মনুষ্যদিগের মধ্যে সমাজ এবং রাজশক্তির প্রয়োজন। *** অতএব সংসারে থাকিয়াও যিনি স্বার্থের জন্য কোন

* বঙ্গবাসী। ১২৯০ বঙ্গাব্দ, ১৬ বৈশাখ।

কার্য্যেই অন্যের হৃদয়ে আঘাত না করেন—অন্যের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ না করেন,—তিনিই প্রকৃত মহাত্মা। জ্ঞানী সংসারীরা প্রস্তাবিত সীমার মধ্যে থাকিয়া পরস্পর-বিরোধী জ্ঞানযোগ এবং কর্ম্মযোগের সামঞ্জস্য-সম্পাদন পূর্ব্বক জীবন্মুক্ত হইয়া থাকেন। * * * শরৎ-সুন্দরী, সংসারে থাকিয়াও, অন্যের মনে ব্যথা না দিয়া, অন্যের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ না করিয়া, সংসারের সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন।" সমস্ত সম্পত্তির সর্ব্বময়ী কর্ত্রী হইয়াও তিনি প্রধান প্রধান কর্ম্মচারিবর্গের পরামর্শ ব্যতীত কোন কর্ম্ম করিতেন না; কোন কার্য্যে একটা স্থির কল্পনা করিলেও, কর্ম্মচারিগণ সঙ্গত আপত্তি করিলে সঙ্কল্প-ভঙ্গ করিতেন; এমন কি দানাদি সম্বন্ধেও কর্ম্মচারিগণের সহিত মতভেদ ঘটিলে মিষ্ট কথায় তাহাদিগকে আপন মতে আনিতে চেষ্টা করিতেন এবং তাহাতে কৃতকার্য্য না হইলে, গোপনে আপনার তহবিল হইতে টাকা দিতেন, তথাপি কর্ম্মচারিগণের মনে ব্যথা দিয়া আপন মত প্রবল রাখিতেন না। একদা মহারাণী মাতৃদর্শন-পিপাসু হইয়া পিত্রালয়ে যাইবার জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু তথাকার অনাবৃত বাটীতে যাওয়া অবৈধ এবং পুঁঠিয়ার রাজসংসারের সম্মান-বিরুদ্ধ,—অধিকন্তু এরূপ আগ্রহ স্বেচ্ছাচার-প্রণোদিত,—জনৈক কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক এইরূপ আপত্তি উত্থাপিত হইলে শরৎসুন্দরী স্বীয় অভিলাষ প্রত্যাখ্যান করিলেন। স্বেচ্ছাচার-প্রশমন পূর্ব্বক পদমর্য্যাদানুসারে প্রত্যেকের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার লক্ষণ ঐরূপ মহারাণীর অনেক কার্য্যেই দেখিতে পাওয়া যায়।

অতঃপর 'সাম্য।' বর্ত্তমানকালে সাম্যের লক্ষণ কি, আমরা তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। তবে আমাদিগের দৃষ্টিতে এবং সমালোচ্য গ্রন্থকারের মতে, মহারাণীর যে সকল কার্য্যে সাম্যভাব লক্ষিত হয়, এ স্থলে তাহারই কয়েকটীর উল্লেখ করা যাইতেছে। (১) "অতি হীন-জাতীয় হইলেও, তিনি কাহাকেও আপনার উচ্ছিষ্ট দিতেন না। তিনি শরীরিমাত্রের দেহেই পরমাত্মা স্বরূপ ঈশ্বরাধিষ্ঠান বিশ্বাস করিতেন। (২) আশ্রিতা দরিদ্র ব্রাহ্মণ বিধবাদিগের সঙ্গে একত্র ভোজন করিতেন; সকলের জন্য উত্তমোত্তম আহারীয় দ্রব্যের আয়োজন হইত, অথচ তিনি প্রাণ-ধারণোপযোগী অতি সামান্য হবিষ্যান্ন আহার করিতেন; সে ভোজনেও তাঁহার কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান কি আসন ছিল না,—আহারের জন্য সকলে উপবেশন করিলে, তিনি হাতে একখান কদলীপত্র লইয়া তাহার এক পার্শ্বে দরিদ্রার মত উপবেশন করিয়া, সংযতভাবে ভোজন করিতেন। (৩) শয়নেও তাঁহার নির্দ্দিষ্ট স্থান ছিল না; অন্যান্য অনাথাগণ শয়ন করিলে তিনি তাহাদের মধ্যে এক পার্শ্বে অতি সামান্যভাবে কুশাসন কিংবা কম্বলে ভূমিশয্যায় শয়ন করিতেন। সেই রাজান্তঃপুর মধ্যে সকলেই সমান অধিকারিণী, যেন তাঁহার কোনই স্বাতন্ত্র্য নাই। (৪) একদা কোন কার্য্যোপলক্ষ্যে অন্তঃপুরে অনেক মহিলার সমাগম হয়। তন্মধ্যে একটী প্রাচীনা দ্বিতল হইতে অবতরণের সিঁড়ির বিপরীত প্রান্তে শয়ানা ছিলেন। শেষ রাত্রিতে তাঁহার উদরে বিকার জন্মায়, তিনি সিঁড়ির অভিমুখে যাইতে যাইতে বেগধারণে অসমর্থা হইয়া, পথে মলত্যাগ করিতে করিতে নিম্নে মলত্যাগ স্থল পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন, কিন্তু শেষে লজ্জায় ম্রিয়মাণা হইয়া, আপনার শয্যায় আসিয়া শয়ন করেন। প্রভাতে অনেকে সেই ব্যাধিগ্রস্তা প্রাচীনাকে নানারূপ ভর্ৎসনা করিতে লাগিল এবং নানারূপ সুমিষ্ট অনুরোধ সত্ত্বেও, দাসীরা পর্য্যন্ত সেই মল পরিষ্কার করিতে সম্মত হইল না। নির্ব্বিকারহৃদয়া মহারাণী তখন স্বহস্তে ঝাঁটা লইয়া, পথের সমস্ত মল পরিষ্কার করিয়া, অন্যে এই সমস্ত বিষয় শুনিতে না পায়, তজ্জন্য সকলকে বিনয়ের সহিত অনুরোধ করিলেন।—কি চমৎকার মানব-দুর্লভ ঔদার্য্য!" সাম্যের ইহা অপেক্ষা সুন্দর নিদর্শন আমরা কল্পনাতেও আনিতে পারি না।

স্বর্গীয়া মহারাণীর নাম বঙ্গের ঘরে ঘরে বিঘোষিত,—অধিকন্তু, আলোচ্য গ্রন্থে তাঁহার জীবনের আদ্যোপান্ত বিশদ ভাবে বর্ণিত। এরূপ অবস্থায় আমাদিগের এই প্রবন্ধের অবতারণা না করিলেই চলিত। বিশেষতঃ এ প্রবন্ধে অপূর্ব্ব আদৌ নাই; অধিকাংশ কথাই আলোচ্য জীবনবৃত্ত হইতে উদ্ধৃত, আর ঐ "উদ্ধৃত অংশগুলিই পাঠ্য এবং অবশিষ্ট সমস্তই অপ্রাসঙ্গিক ও অনাবশ্যক বাগাড়ম্বরে পরিপূর্ণ" বোধ হওয়াই সঙ্গত। তবে, আমাদিগের একমাত্র 'কৈফিয়ৎ' আছে;—'বঙ্গবাসী' সম্পাদক মহাশয়ের কথায় বলিতেছি, উল্লিখিতরূপ "বিশ্বজনীন ভক্তি-প্রীতি যাঁহার পুরস্কার, তাঁহার জীবনী-আলোচনায় পুণ্য আছে।"

শ্রীপাঁচকড়ি ঘোষ।*

* "শিলং সাহিত্য সভা"র সমালোচনী শাখা হইতে প্রসূত।

অনুবাদে প্রতিবাদ।

(২)

১১। ভদ্রলোকে, এইরূপ করিয়া কর্ত্তব্য-কর্ম্মে ও হৃদয়ের ধারণাকে যে জলাঞ্জলি দিতে পারে, তাহা আগে আমি জানিতাম না। অশ্ব-ভাণ্ড ও আমভাণ্ডে বর্ণসাম্য দেখিয়া প্রকৃত তত্ত্ব কে বুঝিতে না পারে?

১২। "শিল্পিনঃ কর্ম্মজীবিনশ্চ শূদ্রাশ্চ মাসে-নৈকং রাজ্ঞঃ কর্ম্ম কুর্য্যুঃ (বিষ্ণুসূত্র)। তর্করত্ন মহাশয় এই অংশের অনুবাদ করিয়াছেন,—'শিল্পী, কারু এবং শূদ্রগণ প্রতি মাসে রাজার এক একটী কর্ম্ম করিয়া দিবে।' ভগবান্ মনু এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

"কারুকান্ শিল্পিনশ্চৈব ——————।
একৈকং কারয়েৎ কর্ম্ম মাসি মাসি মহীপতিঃ॥"

৭ অঃ, ১৩৮।

যাঁহারা সংস্কৃত না জানেন, তাঁহারাও বিষ্ণুসূত্র এবং মনুবচনটী ভাল করিয়া পড়ুন।

প্রতিমাসে এক একটী কর্ম্ম করা ভিন্ন আর কোন অর্থ হইতে পারে কি না সকলেই বুঝিবেন।

'মাসেন একং কর্ম্ম' আর 'মাসি মাসি' বা 'মাসে মাসে' 'একৈকং কর্ম্ম' এই যে ঋষিবচন, ইহার অন্য প্রকার অনুবাদ হওয়া কি ঋষিগণের অভিপ্রায়-বিরুদ্ধ নহে?

"এক একটী কর্ম্ম করিতে যদি এক মাস সময় লাগে, শিল্পিপ্রভৃতি যদি বিনা-বেতনে রাজবাড়ীতে সে কর্ম্ম করিতে থাকে, তবে তাহাদের সংসার চলিবে কিরূপে?" এই অপূর্ব্ব যুক্তি আলোচক বাবু দেখাইয়া মেধাতিথি ও কুল্লুক ভট্টের উক্তি উদ্গীর্ণ করিয়াছেন,

"মাসং মাসমেকমেহঃ কর্ম্ম কারয়েৎ।"

(মেধাতিথি)

'মাসি মাস্যেকং দিনং কর্ম্ম কারয়েৎ।'

(কুল্লুকভট্ট)

ব্যাখ্যাকার মেধাতিথি ও কুল্লুকভট্ট ভগবান্ বিষ্ণু ও মনু অপেক্ষা অবশ্য মান্য নহেন, মেধাতিথি ও কুল্লুকের কথায় যে বিষ্ণু ও মনুর কথা অমান্য করিতে হইবে, এ কথা এক মহাপুরুষই বলিতে পারেন। তার পর আরও একটু দেখা যাক্। ধরিয়া লইলাম, মেধাতিথি ও কুল্লুকের উক্তিই অক্ষরে অক্ষরে সত্য, তাহা হইলেই ত অপূর্ব্ব-যুক্তিবাদীর মন স্থির হইবে? উত্তম!

তবে মেধাতিথি ও কুল্লুকের সংস্কৃত বাক্যটীর বাঙ্গালা করিয়া দেই।

মাসের মধ্যে এক দিন অর্থাৎ অন্ততঃ সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত অবিচ্ছেদে কর্ম্ম করাইবে।

'একং দিনং' বা 'একং অহঃ' এই স্থলে দ্বিতীয়া বিভক্তি থাকাতে ঐরূপ অর্থ হইবে। 'কালাধ্বনোরতিসংযোগে' এই সূত্রানুসারে দ্বিতীয়া বিভক্তি কিনা। 'দিনের কিয়ৎক্ষণ কর্ম্ম করান' বোধ হইলে দ্বিতীয়া বিভক্তি হইত না। এখন যুক্তিবাদী দয়ালু মহাশয়, বল দেখি, গ্রীষ্মকালের রৌদ্রে, সমগ্র দিন এইরূপ বিনা-বেতনে অবিচ্ছেদ শ্রমে তোমার করুণ হৃদয়ে কি ব্যথা লাগিতেছে না?

আরও দেখ, শিল্পী বা কারু, একমাস বা ততোধিক কাল পীড়িত, উত্থানশক্তিরহিত, রাজা সে অবস্থাতেও তাহাকে ধরিয়া আনিয়া মাসের একটী দিন খাটাইয়া লইতে পারেন, তাহার ত বাধক কিছু নাই। মেধাতিথি ও কল্লুকভট্ট তাহাতে ত কিছু বলেন নাই।

তবে কি বলিবে? যে, রাজা বিবেচক ও ধার্ম্মিক হইবেন এবং প্রজাপীড়ক হইবেন না; এই সব সাধারণ নিয়মেই ঐ প্রকার পীড়ন নিষিদ্ধ হইয়াছে। এখন বল দেখি, মনু, বিষ্ণু এবং তর্করত্ন মহাশয়কে তুমি অপরাধী কর কেন? যে প্রকার কর্ম্ম করাইলে, কারু-শিল্পি-প্রভৃতির পীড়া না হইবে, সেই জাতীয় এক একটী কর্ম্ম মাসে করাইলে দোষ কি?

'একং দিনং' বলিলেও রাজার সাধুতার উপর নির্ভর করিতে হয়, 'একৈকং' বলিলেও রাজার সাধুতার উপর নির্ভর করিতে হয়। তবে বিষ্ণু মনুর সঙ্গে তর্করত্ন মহাশয়কে দূর করিয়া পরের দোহাই দেওয়ার আবশ্যক কি?

আমরা তাহাকেও অমান্য করি না; অথবা বশি, বিষ্ণু, মনু, মেধাতিথি, কুল্লুকভট্ট এবং তর্করত্ন মহাশয়—সকলেরই উক্তির তাৎপর্য্য, 'বিবেচনা মত কর্ম্ম করান'।

১৩। 'বধ্যেষ্বপি ন ভ্রুকুটীমাচরেৎ।'

বিষ্ণু—

'বধ্য ব্যক্তির প্রতিও রূঢ় ব্যবহার করিবেন না' তর্করত্ন মহাশয় এই অনুবাদ করিয়াছেন।

আমরা অনুবাদের লক্ষণ পূর্ব্বে দেখাইয়াছি। ভ্রুকুটীর অভিপ্রেত অর্থ যে রূঢ় ব্যবহার মাত্রই, তাহা সকলেরই স্বীকার্য্য। নতুবা 'ভ্রুকুটী করিবে না' নিষেধ থাকিলেও দণ্ডাঘাত, অর্দ্ধচন্দ্র প্রদান, কঠোর উক্তি ইত্যাদি করিতে পারিবে না কি? তাহা হইলে ঋষিবচনের তাৎপর্য্য রক্ষা ও রাজার কর্ত্তব্য-উপদেশ ত যথেষ্টই হইল।

যে অপূর্ব্ব আলোচক ইতিপূর্ব্বেই 'একং বা 'একৈকং' পদের অর্থ 'এক দিন' করিতে সঙ্কুচিত হন নাই, সেই পণ্ডিতাভিমানী মহাপুরুষই ভ্রুকুটীর প্রকৃত ভাবার্থ-গ্রহণেও পরাঙ্মুখ।—ইহাকেই বলে,—

'দিবা কাকরবাত্তীতা রাত্রৌ সন্তরতে নদীম্।'

আবার এই অনুবাদ উপলক্ষ্যে যে রসিকতা প্রকাশ তাঁহার আছে, তাহা অতি অপূর্ব্ব। আহা! আলোচক বলিতেছেন, যদি রূঢ় ব্যবহারই না করিবে, তবে বধ করিবে কিরূপে? এমন না হইলে আর যুক্তি! যদি বলা যায়, সন্ধ্যা করিবার সময় কথা কহিবে না, তাহা হইলে লোকে কি বুঝে? সন্ধ্যার মন্ত্রও পড়িবে না!! এমন সূক্ষ্ম বুদ্ধি না হইলে, আর তিনি তর্করত্ন মহাশয়ের ভ্রম-প্রদর্শনে অগ্রসর হইয়াছেন? যা হউক, স্থূলবুদ্ধি লোকে, ওরূপ স্থলে বুঝিয়া থাকে, 'কেবল সন্ধ্যামন্ত্রই পড়িবে, অন্য কথা কহিবে না।' সেইরূপ এখানেও যে দণ্ড আছে, তাহা ব্যতীত অন্য কোন রূঢ় ব্যবহার করিবেন না, এইরূপ ভাবার্থ সকলেই বুঝিয়াছে।

১৪। 'আপদ্যনন্তরা বৃত্তিঃ'।

আপৎকালে অর্থাৎ নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট জীবিকা দ্বারা নির্ব্বাহ না হইলে, পর পর বৃত্তি অবলম্বন করিবে; অর্থাৎ ব্রাহ্মণ রাজ্যপালন, ক্ষত্রিয় কৃষ্যাদি, তাহাতেও অভাব হইলে, ব্রাহ্মণ কৃষ্যাদি করিতে পারিবে।'

তর্করত্ন মহাশয়ের অনুবাদ।

মনু বলিয়াছেন,

'অজীবংস্তু যথোক্তেন ব্রাহ্মণঃ স্বেন কর্ম্মণা।
জীবেৎ ক্ষত্রিয়ধর্ম্মেণ————————।
উভাভ্যামপ্যজীবংস্তু————————।
কৃষিগোরক্ষমাস্থায় জীবেৎ————।'

১০ম অঃ ৮১।৮২।

ভাবার্থ,—যথোক্ত নিজ কর্ম্ম দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ না হইলে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিবে; এই দুই প্রকারে জীবিকানির্ব্বাহ না হইলে, কৃষিকর্ম্ম গো-পালন করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিবে। তর্করত্ন মহাশয় বিষ্ণু ও মনুর একবাক্যতা করিয়াছেন, অনন্তরা—এই আনন্তর্য্য হইতেই তাদৃশ ভাব আনিয়াছেন। তর্করত্ন মহাশয়, আনন্তর্য্যের যে অর্থ করিয়াছেন, তাহাতে লাঘব আছে এবং মনুসম্মত লাঘব কেমন করিয়া আছে, তাহা ব্যুৎপন্ন নৈয়ায়িক মাত্রেই বুঝিবেন।

আলোচক বাবু তাহা বুঝিবেন কেন? তিনি বলিলেন, 'তাহাতেও অভাব হইলে ব্রাহ্মণ কৃষ্যাদি করিতে পারিবে' ইহা বিষ্ণুর মত নহে।

ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যবস্থার এ রীতি নহে। এ সব বিষয়ে ঋষিগণের ঐকমত্য সমাধানই কর্ত্তব্য।

সাহেবী ধরণে ধর্ম্মশাস্ত্র-ব্যাখ্যা আলোচক বাবু অবশ্য করিতে পারেন, তর্করত্ন মহাশয় তাহা করিবেন কিরূপে? কাজেই তিনি মনু ও বিষ্ণুবচনের এক প্রকার ভাবার্থই বুঝিয়াছেন ও বলিয়াছেন।

১৫। 'সর্ব্বশস্যেভ্যশ্চ' ইত্যাদি। 'সর্ব্বশস্য' পদের অর্থ বড়ই কঠিন, তাই, তর্করত্ন মহাশয় ছাড়িয়া দিয়াছেন না! বলি, আলোচক-পুঙ্গব, তর্করত্ন যদি এই সর্ব্বশস্য স্বীয় অনুবাদকুশূলে রক্ষা করিতেন, তাহা হইলে ত আপনার উদ্দাম-রসনার তৃপ্তি হইত না। ফলে বর্ণ পতন, পদ পতন, বা বর্ণ বিপর্য্যয় বা পদবিপর্য্যয় কোন্ মুদ্রিত পুস্তকে নাই? ১৮ ও ২৫ ফাল্গুন এবং ২ চৈত্র এই তিন সপ্তাহের সেই কাগজে যে সব ভ্রমপ্রদর্শনের চেষ্টা অথবা অনভিজ্ঞের অদ্ভুত অভিনয় হইয়াছিল, তৎসমস্তই আমি খণ্ডন করিলাম। পরের কথা পরে হইবে। সে তিন সপ্তাহের কাগজ আমার নিকট নাই, যদি এক আধটী উক্তি পরিবর্জ্জিত হইয়া থাকে ত নিম্নলিখিত ঠিকানায় আমাকে তাহা জানাইলে বাধিত হইব।

তর্করত্ন মহাশয়ের অনুবাদ পড়িয়া আমার ধারণা হইয়াছে, তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা পণ্ডিতগণ প্রযত্ন-সহকারে ভাবিয়া দেখিবেন, তাঁহার অনুবাদ নির্দ্দোষ এবং বিশেষ অপূর্ব্ব।

শ্রীদ্বারকেশ তর্কভূষণ।

মলানদীঘি—ষ্টেশন, রাজবাঁধ, বর্দ্ধমান।

পত্র।

গত চৈত্রমাসে 'অনুবাদে প্রতিবাদ' নামক যে প্রবন্ধ জন্মভূমিতে প্রকাশিত হইয়াছে, তদুপলক্ষ্যে আমার কিঞ্চিৎ বক্তব্য;—

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দ্বারকেশ তর্কভূষণ মহোদয়ের লিখিত 'অনুবাদে প্রতিবাদ' পাঠ করিয়া, আনন্দিত, লজ্জিত এবং দুঃখিত হইয়াছি।

আনন্দিত হইয়াছি কেন?

একজন পণ্ডিত আমার অনুবাদের কিয়দংশও যে তন্ন তন্ন করিয়া, বিচার-সহকারে পাঠ করিয়াছেন সেই জন্য এবং শ্রীযুক্ত তর্কভূষণ,

প্রায় সর্ব্বত্রই যে আমার আশয় যথাযথ উদ্ভাবন করিয়াছেন, সেজন্যও বটে।

লজ্জিত হইয়াছি কেন?

তর্কভূষণ মহোদয় খদ্যোতকে সূর্য্য বলিয়াছেন—আমার অযোগ্য অতি-প্রশংসা করিয়াছেন বলিয়া।

দুঃখিত হইয়াছি কেন?

নিষ্প্রোয়জন এবং সঙ্কল্প-প্রতিকূল লিপি-যুদ্ধের প্রযোজক হইতেছি বলিয়া।

নিষ্প্রয়োজন কেন?

বলিতেছি;—

(১) আমার অভ্রান্ততা-প্রতিপাদন।

(২) আলোচকের ভ্রমপ্রদর্শন।

(৩) সাধারণের ভ্রমাপনোদন।

এই প্রকার প্রতিবাদ প্রবন্ধের এই ত্রিবিধ প্রয়োজন আপাততঃ দেখা যায় বটে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে।

সদুদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া যাঁহারা আলোচনা করেন, তাঁহাদিগকে প্রকৃত কথা বুঝান উচিত; নতুবা, প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হওয়া বিধেয় নহে। সেই জন্যই এ ক্ষেত্রে আমি এ প্রতিবাদের নাম দিয়াছি লিপি-যুদ্ধ। লিপি-যুদ্ধে উক্ত প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না। দশটা গালাগালি দেওয়া, দুটা রসিকতা করা এবং আগচ্ছ'র উত্তরে, সজোরে কাগচ্ছ, খাগচ্ছ, গাগচ্ছ গোছের প্রত্যুত্তর দেওয়া চিরকালই চলিতে পারে। 'বেড়ে বলিয়াছে'র দল অর্থাৎ প্রকৃত শাস্ত্র-জ্ঞান-হীন, সাধারণে, জোয়ারের তৃণের ন্যায় একবার এ-দিক একবার ও-দিক করিতে থাকে। তিনটী প্রয়োজনের কোনটীই সিদ্ধ হয় না।

এই জন্যই বাদী প্রতিবাদীর যোগ্যতা ও অভিপ্রায়-নিরূপণ এবং মধ্যস্থ-নিরূপণ ব্যতীত বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া নিষিদ্ধ। অতএব এ প্রকার লিপিযুদ্ধ নিরর্থক ত বটেই, বরং নিষিদ্ধ।

সঙ্কল্প-প্রতিকূল কেন?

তাহাও বলিতেছি;—

যে পত্রিকায় আমার শাস্ত্র-প্রকাশের আলোচনা হইতেছে, মাঘ মাসের প্রথমে সেই সংবাদপত্রেই মৎসম্পাদিত বিশুদ্ধ নিত্যকর্ম্মের সমালোচনা প্রকাশিত হয়, তাহাতে অনুবাদে দোষ-প্রদর্শনের চেষ্টা থাকে। আমি পাঠ করিয়া দেখিলাম, আমার অনুবাদে দোষ নাই; সম্পাদকেরই ভ্রম হইয়াছে। তখন সম্পাদকের উদ্দেশ্য বুঝি নাই, তখন সম্পাদককে প্রকৃত সম্পাদকের ন্যায় গৌরবের চক্ষে দেখিয়াই, আমার বক্তব্য সম্পাদকের নিকট লিখিয়া পাঠাইলাম। সেই পত্রে সম্পাদকের ভ্রম-প্রদর্শন এবং নিজ পক্ষের নির্দ্দোষতা-প্রকটন করিয়াছিলাম।

কিন্তু সে পত্রখানি আদ্যন্ত প্রকাশিত হইল না, পাছে আপনাদের ভ্রম প্রকাশিত হয় এবং আমার পক্ষ নির্দ্দোষ বলিয়া স্থিরীকৃত হয়, এই ভয়ে সম্পাদক মহাশয় নিজের গুরুতর কর্ত্তব্য-কর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া সেই পত্রের অনতিপ্রয়োজনীয় ২।৪ পংক্তিমাত্র, দুই সপ্তাহ পরে কাগজে প্রকাশ করিলেন। এই ব্যবহার দেখিয়া, আমি সম্পাদকের বা সম্পাদক প্রভৃতির উদ্দেশ্য বুঝিলাম, কোন রকমে প্রসিদ্ধি লাভ করাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য, সম্পাদকের কর্ত্তব্য-পালন তাঁহাদের উদ্দেশ্য নহে।

তখন একবার দেশের অবস্থা ভাবিলাম, চাকরী প্রভৃতির দুর্দ্দশা চিন্তা করিলাম। তখন আমার প্রকৃতই মনে হইল, আহা, এ সব ব্যক্তি দয়ার পাত্র। আমার নিন্দা করিয়া যদি ইহারা প্রতিষ্ঠিত হয়, ত হউক, আমার তাহাতে ক্ষতি কি? লোকে আমাকে ভ্রান্ত ভাবিবে, ভাবুক; আমিই কি আমাকে অভ্রান্ত মনে করি? মানুষ ভ্রমের দাস। মানুষকে যে অভ্রান্ত মনে করে, সেই-ই মহাভ্রান্ত। (বলা বাহুল্য, আমার প্রযুক্ত এই মানুষ শব্দ ঋষিগণের বোধক নহে।) আমার পক্ষসমর্থনে বা তাহাদের ভ্রমপ্রদর্শনে তাহারা অকারণ ভীত হয়, ত কাজ কি আমার তাহাতে? আমি তৎসম্বন্ধে আর কোন কথাই কহিব না। সুতরাং এই লিপিযুদ্ধ মদীয় সঙ্কল্পের প্রতিকূল। যে উদ্দেশ্য মনে করিয়া আমি কথা কহিব না ভাবিয়াছি, এই 'অনুবাদে প্রতিবাদ' সে উদ্দেশ্যের আংশিক পরিপন্থী; সুতরাং সঙ্কল্প-প্রতিকূল; অতএব আমি আমার আনন্দাভিলাষী সম্পাদকবর্গকে এবং পণ্ডিতগণকে সবিনয়ে অনুরোধ করিতেছি, এ প্রসঙ্গের প্রতিবাদ প্রবন্ধ প্রচার বা প্রণয়ন তাঁহারা যেন না করেন।

'মন্নিন্দয়া যদি জনঃ পরিতোষমেতি
নন্বপ্রযত্নসুলভোঽয়মনুগ্রহো মে।
শ্রেয়োঽর্থিনো হি পুরুষাঃ পরতোষহেতোঃ
দুঃখার্জ্জিতান্যপি ধনানি পরিত্যজন্তি॥*

অদ্য অগত্যা এই মনোভাব প্রকাশ করিতে হইল।

শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন।

শালিবাহন বংশ।

("মহারাষ্ট্র দেশের প্রাচীন বিবরণ" প্রবন্ধের অনুবৃত্ত)

বাল্যকালে বোধোদয়ে পড়িয়াছি, মহারাজ শালিবাহন শকজাতিকে পরাজিত করিয়া এক অব্দ প্রচলিত করেন, তাহা 'শকাব্দ' নামে পরিচিত। কিন্তু আধুনিক পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ শালিবাহনের অস্তিত্বই উড়াইয়া দিয়াছেন, শকাব্দের সহিত তাঁহার সম্বন্ধও সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, শালিবাহন কোনও নৃপতি-বিশেষের নাম নহে;—যাদব, চৌলুক্য, রাষ্ট্রকূট প্রভৃতির নামের ন্যায় ইহাও একটী বংশোপাধি। এই বংশীয় নরপতিগণ খৃষ্টপূর্ব্ব ৭৩ অব্দ হইতে ২১৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মহারাষ্ট্র ও তেলিঙ্গন (তেলিঙ্গনা) প্রদেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন। শকাব্দের প্রবর্ত্তনের সহিত ইহাঁদের কোনও সংস্রব নাই। শকজাতীয় নরপতিগণই শকাব্দের প্রবর্ত্তয়িতা। এই সকল সিদ্ধান্তের স্পষ্টীকরণার্থ বর্ত্তমান প্রবন্ধের অবতারণা।

প্রথম কথা, শকাব্দের প্রবর্ত্তক কে? এ বিষয়ে সাধারণের বিশ্বাসের সহিত প্রাচীন ও আধুনিক পণ্ডিতগণের মতের ঐক্য নাই। সাধারণে শালিবাহনকেই শকাব্দের প্রবর্ত্তক মনে করেন। স্যার রাজা রাধাকান্তদেব বাহাদুরের "শব্দকল্পদ্রুম" নামক বৃহদভিধানেও মহারাজ শালিবাহনকেই শকাব্দের প্রবর্ত্তয়িতা বলা হইয়াছে। শব্দকল্পদ্রুম-মতে শালিবাহনের জন্মদিবস হইতেই শকাব্দ আরম্ভ হয়। কিন্তু বৃহজ্জাতক ও বৃহৎসংহিতার টীকাকার ভট্টোৎপল (খৃষ্টীয় ৯৮৬ অব্দে) বিক্রমাদিত্যকে শকাব্দের সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভাস্করাচার্য্যকৃত "করণকুতূহল" নামক গ্রন্থের "গোধল" কৃত টীকার ও আলবেরুণী (খৃঃ ১১শ শতাব্দী) নামক মুসলমান পর্য্যটক ও পণ্ডিতের গ্রন্থের উল্লেখও ভট্টোৎপলের উক্তির সমর্থক। তাঁহাদের উভয়ের মতেই বিক্রমাদিত্য শকাব্দের প্রচলন করেন।

আলবেরুণী বলিয়াছেন, তাঁহার সময়ে হিন্দুরা শকাব্দকে "শক-কাল" বলিতেন। সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বেত্তা ভাস্করাচার্য্য শকাব্দকে 'শকনৃপসময়' ও মহামতি বরাহমিহির উহাকে

* শ্রদ্ধাস্পদ তর্করত্ন মহাশয়ের পত্রপ্রাপ্তির পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত দ্বারকেশ তর্কভূষণ মহাশয়ের অবশিষ্ট প্রবন্ধ প্রকাশ করিতে আমরা স্বীকার করিয়াছি; অতএব বাধ্য হইয়া সেই অংশটুকু মাত্র প্রকাশ করিতে হইয়াছে। জ, স।

"শকভূপ-কাল" ও "শকেন্দ্র-কাল" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। চৌলুক্য বংশীয় "মঙ্গলীশ" নামক জনৈক নরপতির একটী প্রস্তর লিপি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। তাহাতে লিখিত আছে যে, "শক" রাজার রাজ্যাভিষেকের ৫শত বৎসর পরে, উক্ত প্রস্তরলিপি ক্ষোদিত হয়। সেই উক্তি এইরূপ;—"শক-নৃপতি-রাজ্যাভিষেকসংবৎসরেষ্বতিক্রান্তেষু পঞ্চসু শতেষু" ইত্যাদি এবং "শকনৃপকাল সংবৎসরে" ইত্যাদি। অন্যান্য প্রাচীন প্রস্তরলিপিতেও শকাব্দকে "শকনৃপকাল" ও "শকোপনীক (শকজাতীয়) রাজার রাজ্যভিষেক কাল" বলা হইয়াছে। প্রচলিত পঞ্জিকাসমূহেও শকাব্দের পরিবর্ত্তে "শকনৃপতেরতীতাব্দ" লিখিত থাকে। এই সকল উক্তির অর্থ পর্য্যালোচনা করিলে, পূর্ব্বোদ্ধৃত কিংবদন্তী ও মতসমূহের ভ্রমাত্মকতা প্রমাণিত হইয়া, এক অভিনব তত্ত্বের আভাস প্রাপ্ত হইয়া যায়। সেই অভিনব তত্ত্ব এই যে, "শকাব্দ" শালিবাহন বা বিক্রমাদিত্য কর্ত্তৃক শকজাতির ধ্বংসের পর স্থাপিত হয় নাই; বরং ভারতে শকজাতির অভ্যুদয় কালেই শকজাতীয় নৃপতিবিশেষ দ্বারা এই অব্দ প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল।

দ্বিতীয় কথা, শালিবাহন কোনও রাজবংশের উপাধি অথবা নৃপতিবিশেষের নাম? নানাঘাট ও নাশিক প্রভৃতি স্থানে প্রাপ্ত প্রাচীন প্রস্তরলিপি ও শিলাশাসনাদি পাঠ করিলে, শালিবাহন যে একটী বংশের নাম, এই বিশ্বাসই দৃঢ়ীভূত হয়। শালিবাহন নামের পরিবর্ত্তে, কোনও কোনও স্থানে "শালিবান," "শাতবাহ" বা "শাতবাহন" নাম দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে "শাতবাহন" নামই বিশুদ্ধ। শালিবাহন শব্দ শাতবাহন শব্দের অপভ্রংশ। প্রাচীন প্রস্তরলিপি ও শাসনাদিতে সর্ব্বত্র "শাতবাহন" নামই দৃষ্ট হয়। হেমচন্দ্রও স্বীয় ব্যাকরণে শালিবাহন শব্দকে 'শাতবাহন' শব্দের অপভ্রষ্ট রূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এতদনুসারে ও "প্রাকৃতে শাতবাহন"ঃ এই বাক্যানুসারে শালিবাহন না হইয়া 'শাতবাহন' নাম হওয়াই সঙ্গত ও বিশুদ্ধ। বাণভট্ট স্বপ্রণীত হর্ষচরিতে ও বাৎস্যায়ন তাঁহার কামসূত্রে শালিবাহনের পরিবর্ত্তে শাতবাহন নামই ব্যবহার করিয়াছেন। সুতরাং আমরাও আর শালিবাহন না লিখিয়া 'শাতবাহন' লিখিব।

শাতবাহন বংশের ইতিহাস ভারতের অপরাপর প্রদেশের প্রাচীন রাজবংশের ইতিহাসের ন্যায় তমসাচ্ছন্ন হইলেও, সহ্যাদ্রি পর্ব্বতের স্থানে স্থানে গুহার মধ্যস্থিত প্রাচীন দেবমন্দির ও চৈত্যবিহারাদিতে যে সকল প্রস্তরলিপি, অনুশাসন ও মুদ্রাদি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহার সাহায্যে কিয়ৎপরিমাণে পরিস্ফুট হইয়াছে। ঐ সকল প্রস্তরলিপি ও দাক্ষিণাত্যের অন্যান্য স্থানে প্রাপ্ত প্রাচীন মুদ্রাদি অবলম্বন করিয়া সুপ্রসিদ্ধ পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতপ্রবর ডাক্তার রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর মহোদয় যে সকল ঐতিহাসিক সত্য আবিষ্কার করিয়াছেন, এই প্রবন্ধে তাহার সারাংশ সংকলিত হইবে। পাঠকগণের বুঝিবার সুবিধার জন্য প্রথমতঃ কতিপয় প্রস্তর-লিপির মর্ম্মানুবাদ প্রদান করা যাইতেছে।

নাশিকের নিকটস্থিত পর্ব্বতগুহায় একটী মন্দিরে খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীর ক্ষোদিত এক শিলালিপি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। তাহাতে লিখিত আছে যে, শাতবাহন-রাজবংশীয় 'কৃষ্ণরাজ' নামক জনৈক নরপতির নাশিকস্থিত প্রতিনিধি কর্ত্তৃক ঐ মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল।

নানাঘাট নামক পর্ব্বতের গুহায় একটী মন্দির আছে। সেই মন্দিরের সম্মুখস্থিত প্রাচীরে কয়েকটী প্রতিমূর্ত্তি ও তাহাদের নাম ক্ষোদিত রহিয়াছে। সেই নামগুলি এই;—

১—রায়া সিমুক সাতবাহনো (অর্থাৎ রাজা সিমুক শাতবাহন) ২—দেবী নায়নিকায়া রঞ্ঞো চ সিরিসাতকনিনো; (রাণী 'নায়নিকা'র ও রাজা শ্রীশাতকর্ণির [প্রতিমূর্ত্তি])৩—কুমারো ভায়া; (রাজপুত্র ভায়া)। ৪—মহারঠিগণকয়িরো; (মহাবীর মারাঠা সেনাপতি বা মারাঠা জাতীয় মহাবীর)। ৫—কুমারো হকুসিরি; (রাজকুমার হকুশ্রী)। ৬—কুমারো সাতবাহনো; (রাজপুত্র শাতবাহন)। ডাঃ ভাণ্ডারকর, এই লিপিকে খৃষ্টাব্দ প্রারম্ভের সমসাময়িক বলিয়া অনুমান করেন। এই মন্দিরে একটী প্রস্তরলিপিও আছে; কিন্তু উহা এত ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে যে, পাঠ করিয়া উহার অর্থোদ্ধার করা দুষ্কর।

নাশিকের নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতগুহাস্থিত একটী বিহারে চারিটী প্রস্তরলিপি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এই প্রস্তরলিপিগুলি খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রারম্ভে ক্ষোদিত হইয়াছিল, বোধ হয়। তন্মধ্যে প্রথমটীতে যে বিবরণ উৎকীর্ণ রহিয়াছে, তাহার সারাংশ এইরূপ,—

গোবর্দ্ধন (নাশিক) প্রদেশের অন্তর্গত, এই ত্রিরশ্মি নামক পর্ব্বতের গুহায় "ক্ষহরাত লহপান" নামক নৃপতির জামাতা, দীনীকের পুত্র পরোপকারপরায়ণ "উষবদাত" এই মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছেন।* উষবদাত তিন লক্ষ গাভী ও ষোলটী গ্রাম দেবোদ্দেশে ব্রাহ্মণদিগকে দান করিয়াছেন। তিনি প্রতি বৎসর একলক্ষ ব্রাহ্মণকে ভোজন করান। প্রভাস বা সোমনাথপট্টনস্থ আট জন ব্রাহ্মণের ধর্ম্মার্থে নিজব্যয়ে বিবাহ দিয়াছেন। তিনি বহু স্থানে—বহু দেশে, ধর্ম্মার্থে উদ্যান অট্টালিকা, ধর্ম্মশালাদি নির্ম্মাণ ও কূপ-তড়াগাদি খনন করাইয়া দিয়াছেন। ইবা, পারদা, দমণা, তাপী, (তাপ্তী), করবেণা ও দাহনুকা প্রভৃতি নদীর উভয় তীরে পথিকগণের সুবিধার জন্য নৌযান, ধর্ম্মশালাদি-নির্ম্মাণ ও জলসত্র-স্থাপন এবং তাহাদিগের অর্থসাহায্য করিবার জন্য বৃত্তি নিরূপণ করিয়া দিয়াছেন। আর বহু স্থানে বেদের পঠন-পাঠনার্থ পাঠশালা স্থাপন ও বেদশিক্ষয়িতা ব্রাহ্মণগণের জন্য সহস্র মুদ্রা বৃত্তি নিরূপণ করিয়া দিয়াছেন। তিনি পোষ্করাণি তীর্থে গমন করিয়া, যথাবিধি তীর্থোচিত কর্ত্তব্যাদি সমাধা করত তথায় একটী গ্রাম ও তিন সহস্র গাভী দান করিয়াছিলেন। উষবদাতের রণবাদ্যের শব্দ শ্রুতিগোচর হইবা মাত্র 'মালয়' জাতি ভীত হইয়া তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল।*

দ্বিতীয় প্রস্তরলিপিতে উষবদাতের যে বর্ণনা আছে, তাহা এই;—

৪২ শকাব্দে (১২০ খৃষ্টাব্দে) উষবদাত চতুর্দ্দিক্-দেশাগত বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের বাসের জন্য এই বিহার উৎসর্গ করিয়াছিলেন। গোবর্দ্ধন-(নাশিক)-বাসী মহাজনমণ্ডলের নিকট, বাৎসরিক ৭৫ কার্ষাপণ† (কিঞ্চিদধিক ২৩৪ টাকা) সুদে তিনি ৩ সহস্র কার্ষাপণ গচ্ছিত রাখিয়াছেন। বর্ষাকালে এই বিহারে যে ২০ জন বৌদ্ধ-ভিক্ষু বাস করিতেন, ঐ গচ্ছিত টাকার সুদ হইতে তাঁহাদের বস্ত্রাদি আবশ্যক দ্রব্যের অভাব দূর করা হইবে। এই বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী করিবার জন্য তিনি নাশিকে একটী মহতী সভা আহূত করিয়া, পূর্ব্বোক্ত আদেশগুলি প্রস্তরোপরি ক্ষোদিত করত এই বিহারের দ্বারদেশে সংলগ্ন করিয়া দিয়াছেন। ৪১ ও ৪০ শকাব্দে তিনি দেবোদ্দেশে ব্রাহ্মণগণকে বহু অর্থ দান করিয়াছিলেন।

তৃতীয় প্রস্তরলিপিতে উষবদাতের ও চতুর্থ প্রস্তরলিপিতে তাঁহার স্ত্রী দখমিত্রার দয়া ও দানধর্ম্মের উল্লেখ আছে, "কার্লে" গ্রামের নিকটস্থিত একটী পর্ব্বতগুহায় প্রাপ্ত প্রস্তরলিপিতেও বৌদ্ধ-ভিক্ষুগণের জীবিকা নির্ব্বাহার্থ উষবদাতের গ্রামদানের বিষয় লিখিত আছে।

পুনা জেলার অন্তর্গত "জুন্নর" সহরের নিকটবর্ত্তী গিরিগুহায় যে প্রস্তরলিপি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহাতে উষবদাতের শ্বশুর নহপানের উল্লেখ আছে। এই প্রস্তরলিপিতে নহপানকে "মহাক্ষত্রপ রাজাধিরাজ" বলা হইয়াছে।

নাশিকের সমীপবর্ত্তী অপর পর্ব্বতগুহায় এক বিস্তীর্ণ বিহারে চারিটী প্রস্তরলিপি আছে।

---

* এ স্থলে বলা আবশ্যক যে, উষবদাত বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন।

* J. B. A. S. (Bom) Vol. vii. Nosik Inscription No I7.

† কার্ষাপণ—প্রাচীনমুদ্রাবিৎ। ১৬ মাষা পরিমাণ রৌপ্যমুদ্রা।

তন্মধ্যে যেটী সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, তাহাতে শাতবাহন-বংশীয় জনৈক নরপতির সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণনা দৃষ্ট হয়।—মহারাজাধিরাজ গোতমীপুত্র শাতকর্ণি,—অশিক, অশ্মক, মূলক, সুরাষ্ট্র, কুকুর, অপরান্ত, অনূপ, অকরাচণ্ডী ও বিদর্ভ প্রভৃতি * দেশের এবং বিন্ধ্যাবৎ, পারিযাত্র, সহ্য, কৃষ্ণগিরি, মলয় মহেন্দ্র, চকোর ও শ্রেষ্ঠগিরি প্রভৃতি পর্ব্বতের অধিপতি ছিলেন। অনেক বড় বড় নরপতি তাঁহাকে ভয় করিতেন ও কর দিতেন। তাঁহার পশুশালার জন্তুগণ পূর্ব্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিম এই সমুদ্রত্রয়ের জলপান করিত। তিনি ভীতের ও শরণাগতের একমাত্র আশ্রয়-দাতা ছিলেন; এবং প্রজাগণের সুখে সুখী ও দুঃখে দুঃখী হইতেন। তিনি ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই পুরুষার্থ-ত্রয়ের আলোচনার জন্য পৃথক্ পৃথক্ স্থান ও সময় নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন; এবং নিয়মিতরূপে যথানির্দ্দিষ্ট স্থানে ও সময়ে তদালোচনায় নিবিষ্ট হইতেন। তিনি বিদ্যা ও সজ্জনগণের আশ্রয় এবং কীর্ত্তি ও সদাচারের মন্দির ছিলেন। তিনি অদ্বিতীয় বুদ্ধিমান্, অদ্বিতীয় যোদ্ধা, অদ্বিতীয় ধনুর্দ্ধর ও অদ্বিতীয় ব্রাহ্মণ-প্রতিপালক ছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় বর্ণসঙ্কর-বৃদ্ধির পথ অবরুদ্ধ ও ব্রাহ্মণগণের উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। তাঁহার বিক্রম দেখিয়া লোকে রাম (বলরাম), কেশব, অর্জ্জুন ও ভীমসেনের পরাক্রমের কাহিনী বিস্মৃত হইয়াছিল। তিনি প্রতাপে নভাগ, নহুষ, জনমেজয়, সগর, যযাতি, রাম (রামচন্দ্র) ও অম্বরীষের তুল্য ছিলেন। তিনি অসংখ্য যুদ্ধে শত্রুসেনার বিনাশ ও ক্ষত্রিয়গণের গর্ব্ব খর্ব্ব করেন এবং শক-যবন-পহ্লব জাতির দমন ও খগারাত পক্ষারাত বংশের মূলোচ্ছেদ করেন। যে প্রাচীন শাতবাহন বংশে তিনি জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন, সেই শাতবাহন বংশের বিলুপ্ত কীর্ত্তির পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন।" এই লিপির শেষপংক্তিতে এই বিহারবাসী ভদ্রায়ন-পন্থী বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের ভরণপোষণ-ব্যয়নির্ব্বাহার্থে তাঁহার একটী গ্রামদানের উল্লেখ আছে।

এই মহারাজ গোতমীপুত্র শাতকর্ণির প্রধানতম শত্রু উজ্জয়িনীপতি "রুদ্রদাম"। জনুগড়ের প্রস্তর-লিপিতে গোতমীপুত্র শাতকর্ণিকে "দক্ষিণাপথাধীশ" এই বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন। ইহা হইতে অনুমিত হইতেছে যে, তিনি সমগ্র দাক্ষিণাত্যের সার্ব্বভৌম অধিপতি ছিলেন। অপর প্রস্তরলিপি-পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, ধনকটক বা তেলিঙ্গণে (তেলিঙ্গানাতে) গোতমীপুত্রের রাজধানী ছিল এবং তাঁহার পুত্র 'শ্রীপুলুমাবি' পিতার অধীনে থাকিয়া তাঁহার প্রতিনিধিরূপে (১৩০খৃঃ—১৫৪ খৃঃ) মহারাষ্ট্রদেশ শাসন করিতেন।

এই রাজবংশীয় আরও কয়েকজন রাজার নাম অন্যান্য প্রস্তরলিপি ও প্রাচীন মুদ্রা প্রভৃতিতে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। তদবলম্বনে ডাঃ রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর মহোদয় শাতবাহন বংশীয় নরপতিগণের যে বংশ তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন, এ স্থলে তাহা উদ্ধৃত হইল।—

১। সিমুক (খৃঃ পূঃ ৭৩—খৃঃ পূঃ ৫০)
২। কৃষ্ণরাজ (খৃঃ পূঃ ৫০—খৃঃ পূঃ ৩০)
৩। শাতকর্ণি (খৃঃ পূঃ ৪০—খৃঃ ১৬)
[ক্ষহরাত নহপান ও তদীয় জামাতা উষবদাত প্রভৃতি]
(ইহাঁদের রাজ্যকাল প্রায় ৫৩ বৎসর)
৪। গোতমীপুত্র শাতকর্ণি (খৃঃ ১৩৩ অঃ—১৫৪ খৃঃ)
৫। শ্রীপুলুমারি (খৃঃ ১৫৪—১৫৮ খৃঃ)
৬। শিবশ্রী (১৫৮ খৃঃ—১৬৫ খৃঃ)
৭। শিবস্কন্দ (১৬৫ খৃঃ—১৭২ খৃঃ)
৮। যজ্ঞশ্রী (১৭২ খৃঃ—২০২ খৃঃ)
৯। বিজয় (২০২ খৃঃ—২০৮ খৃঃ)
১০। চন্দ্রশ্রী (২০৮ খৃঃ—২১১ খৃঃ)
১১। পুলোমবি (২১১ খৃঃ—২১৮ খৃঃ)

তেলিঙ্গানা প্রদেশের অন্তর্গত "ধনকটক" (গণ্টুরের নিকটবর্ত্তী বর্ত্তমান "ধরণিকোট") নগরে শাতবাহন বংশীয় নরপতিগণের রাজধানী ছিল। বয়স্থ নরপতিগণ ধনকটকে থাকিয়া রাজ্যশাসন করিতেন এবং অল্পবয়স্ক রাজকুমারগণ মহারাষ্ট্র ও কর্ণাট প্রভৃতি প্রদেশে প্রতিনিধি শাসন-কর্ত্তারূপে প্রেরিত হইতেন। মহারাষ্ট্রদেশে যে সকল রাজকুমারের শিলাশাসন ও মুদ্রা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, নিম্নে তাহাদের নাম এবং প্রতিনিধিরূপে মহারাষ্ট্রদেশ-শাসনের কাল প্রদত্ত হইল।

শ্রীমুলুমাবি (খৃঃ ১৩০—১৫৪ খৃঃ)
যজ্ঞশ্রী (খৃঃ ১৫৫—১৭২ খৃঃ)
মঢ়রী পুত্র (খৃঃ ১৭২—১৮০ খৃঃ)

ইহাঁদের মধ্যে "মঢ়রীপুত্র" ধনকটকের সিংহাসনে কখনই আরোহণ করেন নাই।

কৃষ্ণরাজ ও শাতকর্ণি—ইহাঁরাও কিছুদিন মহারাষ্ট্র শাসন করিয়াছিলেন, দেখা যায়;—কিন্তু কতদিন শাসন করিয়াছিলেন, তাহা জানিবার কোনও উপায় নাই।

ডাক্তার বর্জ্জেস্ বনবাসী নামক স্থানে যে প্রস্তর-লিপি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তদনুসারে শাতবাহন বংশের একটী শাখা কর্ণাট প্রদেশ শাসন করিত, অবগত হওয়া যায়।

উল্লিখিত বংশ-তালিকা দৃষ্টে অনুমিত হয় যে, এই শাতবাহন-বংশীয় নরপতিগণই পুরাণে 'আন্ধ্রভৃত্য-বংশীয়" নামে কীর্ত্তিত হইয়াছেন।* মৎস্যপুরাণে আন্ধ্রভৃত্যগণকে "শ্রীপর্ব্বতীয়" (অর্থাৎ তেলিঙ্গনা প্রদেশীয়) বলায়, শাতবাহন-বংশীয় নরপতিগণের সহিত, তাঁহাদের অভিন্নতা প্রতিপাদিত হইতেছে। পুরাণ-মতে এই বংশে সর্ব্বশুদ্ধ ত্রিশ জন নৃপতি জন্মগ্রহণ ও ৪৫৬ বৎসর রাজত্ব করেন। ইহাঁদের মধ্যে মহারাষ্ট্র ও তেলিঙ্গানা প্রদেশে ১৮ জন নরপতি প্রায় ৩ শত বৎসর কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। অবশিষ্ট ১২ জন নরপতি শাতবাহন-বংশের শাখাবিশেষ-সম্ভূত;—ইহাঁরা কর্ণাট প্রভৃতি প্রদেশ প্রায় ১৫০ বৎসর শাসন করেন।

ইতিপূর্ব্বে উষবদাতের যে প্রস্তরলিপি উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাও অপরাপর প্রস্তরলিপি পাঠে, পুরাতত্ত্ববিদ্গণ অনুমান করেন যে, "ক্ষহরাত নহপান" ও তদীয় জামাতা "উষবদাত" প্রভৃতি ভূপতিগণ দক্ষিণাপথাধীশ মহারাজ গোতমীপুত্র শাতকর্ণির অব্যবহিত পূর্ব্বে প্রায় ৬৩ বৎসরকাল মহারাষ্ট্রদেশ শাসন করেন। ইহাঁদের নাম পুরাণের বংশ-তালিকায় প্রাপ্ত হওয়া যায় না এবং এই নামগুলি ভারতবর্ষীয় বলিয়াও বোধ হয় না। 'ক্ষহরাত নহপান'কে জুন্নরের শিলাশাসনে "ক্ষত্রপ" বলা হইয়াছে। এই "ক্ষত্রপ" শব্দের সহিত পারসীক সত্রপ (Satrah) শব্দের বিশেষ সাদৃশ্য দৃষ্ট হইতেছে। গোতমীপুত্র শাতকর্ণির প্রস্তরলিপি পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, তিনি শক-যবন-পহ্লবাদি অনার্য্য-জাতি সংহার ও খগরাত বা ক্ষহরাত বংশের মূলোচ্ছেদ করেন। "ক্ষহরাত" ও "খগরাত" শব্দদ্বয়ও একপর্য্যায়-ভুক্ত ও অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্যযুক্ত বলিয়া বোধ হয়।

এই সকল কারণে অনুমিত হয় যে, ক্ষহরাত নহপান ও উষবদাত অন্ধ্রভৃত্য বা শাতবাহন-বংশীয় নহেন; তাঁহারা খুব সম্ভবতঃ শকাদি অনার্য্যবংশসম্ভূত হইবেন, বোধ হয়।

ভারতীয় পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ বলেন, মৌর্য্যবংশের অধঃপতনের পর, ব্যাক্‌ট্রিয়ার গ্রীকগণ খ্রীষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে ভারতে প্রবেশ করিয়া উড়িষ্যা পর্য্যন্ত অধিকার করে। গ্রীকগণের পর তুরেনিয়ান্ (তুরুষ্ক) ও মাথীয়ান্ (শক) হূণসত্রপাদি অনার্য্য জাতিগণ খ্রীষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দী হইতে খৃষ্টীয় পাঁচ শতাব্দী পর্য্যন্ত ভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে স্ব স্ব আধিপত্য বিস্তার করে। গর্গসংহিতা নামক প্রাচীন গ্রন্থেও ভবিষ্যৎ-কথন-প্রসঙ্গে কথিত হইয়াছে যে, মৌর্য্যবংশের অধঃপতনের পর, দুষ্ট যবনগণ (ব্যাক্‌ট্রিয়ার গ্রীকগণ) অযোধ্যা, পঞ্চাল (রোহিলখণ্ড), কুসুমধ্বজ (পাটনা) ও মথুরা প্রভৃতি প্রদেশ অধিকার করিবে। যবনগণের পর শক জাতি ভারতে আধিপত্য স্থাপন করিবে। পুরাণেও শক-যবনাদি অনার্য্য জাতিগণের ভারতাক্রমণের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

পুরাতত্ত্ববিদ্গণের বিবেচনায় খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দী হইতে খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত ভারতে শকজাতির প্রাদুর্ভাব-কাল। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে শকজাতির ক্ষমতা এতদূর বর্দ্ধিত হইয়াছিল যে, তাহারা আর্য্যাবর্ত্তের অধিকাংশ অধিকার পূর্ব্বক দাক্ষিণাত্যে প্রবেশ

* অশ্মক ও মূলক—দক্ষিণাত্যের অন্তর্গত। সুরাষ্ট্র বর্ত্তমান সুরত। কুকুর—রাজপুত স্থানের অংশবিশেষ। বিদর্ভ বেরার। অকরাচণ্ডী—সম্ভবতঃ মালবের পূর্ব্বাংশ। অনূপ—পুরাণানুসারে বিন্ধ্যপর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী প্রদেশ। রঘুবংশের বর্ণনানুসারে নর্ম্মদা তীরবর্ত্তী প্রদেশ। মাহিষ্মতী ইহার রাজধানী। অপরান্ত—উত্তর-কঙ্কণের রাজধানী। কঙ্কণের মহারাষ্ট্রীয় উচ্চারণ "কোঁকণ"। ইতিপূর্ব্বে মুদ্রাকর-প্রমাদবশতঃ কোঁকণ স্থলে "কাঁকণ" মুদ্রিত হইয়াছে।

* স্থানভাবে আমরা এবার পৌরাণিক বংশ-তালিকা উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না।

করিয়া মহারাষ্ট্র দেশে তাহাদের আধিপত্য স্থাপন করে। গোতমীপুত্রের শিলালিপিপাঠেও জানা যায় যে, তাঁহার সময়ে অর্থাৎ খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথম পাদে শক-যবন-পহ্লব ও খগরাত বংশীয় অনার্য্যগণ মহারাষ্ট্রদেশের শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতেছিলেন। গোতমী-পুত্র শাতকর্ণি পূর্ব্বোক্ত বিদেশীয়গণকে পরাজিত ও মহারাষ্ট্রদেশ হইতে বিতাড়িত করিয়া, শাত-বাহনবংশের বিলুপ্ত কীর্ত্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। ডাঃ ভাণ্ডারকর বিবেচনা করেন যে, শকবংশীয় যে সেনানায়ক সর্ব্বপ্রথম মহারাষ্ট্রদেশ জয় করিয়াছিলেন, তিনিই "শকাব্দ" নামে প্রসিদ্ধ ও প্রাচীন তাম্র-শাসনাদিতে বহুলরূপে ব্যবহৃত সংবৎসর-গণনারম্ভক-কাল বা অব্দ স্থাপন করেন। ফল কথা, শকজাতির আগমন-নির্ণা-য়ক অব্দই শকাব্দ নামে প্রসিদ্ধ। এই কারণে, প্রাচীন প্রস্তরলিপি-সমূহে এই অব্দ "শক-কাল", "শক-নৃপ-সংবৎসর" ও "শক-নৃপ-কাল" প্রভৃতি নামে অভিহিত হইয়াছে। ডাঃ ভাণ্ডার-করের মতে কনিষ্ক অথবা শালিবাহন শকাব্দের প্রবর্ত্তক নহেন।

ডাঃ ভাণ্ডারকরের এই মত পরিস্ফুট করণার্থ কিছুদিন পূর্ব্বে নব্যভারতে (৯ম খণ্ড, শ্রাবণ, কার্ত্তিক ও পৌষের সংখ্যায়) আমরা "শকাব্দ" শীর্ষক কয়েকটী প্রস্তাব লিখিয়াছিলাম। শকাব্দ সম্বন্ধে আমাদের সমস্ত ব্যক্তব্য শেষ হইবার পূর্ব্বেই শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় অধী-রতা প্রকাশ করত উহার এক প্রতিবাদ প্রকাশ করেন। যাহা হউক, উল্লিখিত প্রবন্ধের তৃতীয় প্রস্তাবের প্রারম্ভে বলিয়াছিলাম যে,—"ডাঃ ভাণ্ডারকরের মতে কাশ্মীরাধিপতি শকজাতীয় ভূপতি কনিষ্ক শকাব্দের প্রবর্ত্তক নহেন। ডাঃ ভাণ্ডারকর শালিবাহনকেও শকাব্দের প্রব-র্ত্তক বলিয়া স্বীকার করেন না।"—নব্যভারত ৯ম খণ্ড—পৌষ।

এই প্রবন্ধাংশ প্রকাশিত হওয়ার পর কৈলাস বাবু স্বীয় প্রতিবাদ প্রবন্ধের এক স্থলে বলিতেছেন,—"ব্রাহ্মণগণ বৌদ্ধ-রাজাদিগের কীর্ত্তি-বিলোপের জন্য বিবিধ প্রকার চেষ্টা করিয়াছেন। * * * তাঁহারা পরম সৌগত সম্রাট্ কনিষ্কের কীর্ত্তিবিলোপের জন্য কোনও চেষ্টা করেন নাই, তাহা কখনই বলা যাইতে পারে না। এই জন্যই আমরা বলিতেছিলাম, বৌদ্ধদ্রোহী ব্রাহ্মণগণ শককুলেন্দ্র কানিষ্কের প্রবর্ত্তিত অব্দ হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী শালিবাহনের প্রবর্ত্তিত বলিয়া প্রচার করিয়াছেন এবং ইহাও বলা যাইতে পারে যে, এই মত মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণগণের কল্পনা-প্রসূত। পণ্ডিত-প্রবর ভাণ্ডারকর দেশীয় গৌরব রক্ষার জন্যই চেষ্টা করিয়াছেন।" (নব্যভারত ৯ম খণ্ড, ৬৫৬। ৭ পৃষ্ঠা)।

কৈলাস বাবুর মুখে পাণ্ডিত্যাগ্রগণ্য ডাঃ ভাণ্ডারেকর সম্বন্ধে এইরূপ কথা শুনিয়া আমরা অতিশয় লজ্জিত ও মর্ম্মপীড়িত হইয়াছি। ডাঃ ভাণ্ডারকর যে শালিবাহনকে শকাব্দের প্রবর্ত্তক বলিয়া বিশ্বাস করেন না, এ কথা নব্য-ভারতে প্রকাশিত প্রবন্ধে বিশেষরূপে উল্লিখিত হইয়াছিল। তথাপি কেন যে কৈলাস বাবু তাঁহার স্কন্ধে উক্ত জঘন্য ও অলীক দোষারোপ করিয়াছেন, তাহা বলিতে পারি না। ফলতঃ, কৈলাস বাবু, স্বীয় বিজ্ঞতা প্রদর্শন জন্য এরূপ বালকোচিত হঠকারিতা ও অধীরতা প্রকাশ করিয়া ভাল করেন নাই।

কৈলাস বাবুর দ্বিতীয় অভিযোগ মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণগণের নাম। এই অভিযোগের সহিত বিবিধ ঐতিহাসিক-তত্ত্ব জড়িত আছে বলিয়া আমরা ইহার বিচার করিব। মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণগণ যে শকাব্দকে শালিবাহন-প্রবর্ত্তিত বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন, এ কথা সত্য। কিন্তু তাঁহাদের এই ব্যবহার যে বৌদ্ধ-বিদ্বেষ-সঞ্জাত, এ কথার প্রমাণ কি? তাঁহারা যে "পরম-সৌগত" কনিষ্কের "কীর্ত্তি বিলোপের জন্য" এরূপ করিয়াছিলেন, এরূপ বিবেচনা করিবার কোনও উপযুক্ত কারণ আছে কি? কৈলাস বাবু যে অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন, তাহার স্বপক্ষে কোনও প্রমাণ প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। তাঁহার বিশ্বাস মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণগণ কনিষ্কের কীর্ত্তি-বিলোপেচ্ছু হইয়াই, শকাব্দের সহিত শালিবাহনের সম্পর্ক স্থাপিত করিয়াছেন। আমাদের ধারণা কিন্তু অন্যরূপ। আমাদের মনে হয়, উত্তর-ভারতবাসী ব্রাহ্মণ-গণই প্রথমতঃ কনিষ্ককে শকাব্দের প্রবর্ত্তয়িতৃত্ব হইতে বঞ্চিত করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বে দেখিয়াছি, ভট্টোৎপল শকাব্দকে বিক্রমাদিত্যের প্রবর্ত্তিত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া-ছেন। তিনি খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর লোক। বলা বাহুল্য, তিনি মহারাষ্ট্রীয় নহেন। আল-বেরুণী একাদশ শতাব্দীতে এ দেশে আসিয়া, উত্তর-ভারত-বাসিগণের নিকট শুনিয়াছিলেন যে, শকাব্দ বিক্রমাদিত্যের প্রবর্ত্তিত অব্দ। আর্য্যাবর্ত্তবাসী ব্রহ্মগুপ্ত খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি শকাব্দকে "শকনৃপান্তে" স্থাপিত অব্দ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার উক্তির মর্ম্ম-ব্যাখ্যা স্থলে টীকাকার বলিয়াছেন, বিক্রমাদিত্য শকজাতির বিনাশসাধন করিয়া যে অব্দ প্রবর্ত্তিত করেন, তাহাই শকাব্দ।

শকাব্দ শালিবাহন-প্রবর্ত্তিত অব্দ, এই মত কখন প্রথম প্রচারিত হয়, তাহা নিঃসন্দেহ নির্ণয় করা সুকঠিন। তবে এ কথা নিশ্চয়রূপে বলা যাইতে পারে যে, খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে এই মত প্রচলিত ছিল না। কারণ ঐ কালের পূর্ব্বে মহারাষ্ট্রদেশে যে সকল প্রস্তরলিপি ও তাম্রশাসন ক্ষোদিত হইয়াছিল, সে সকলের কোনটীতেই শকাব্দের সহিত শালিবাহনের নাম সংযুক্ত দৃষ্ট হয় না—বরং সেই সমস্ত লিপিতে শকাব্দকে স্পষ্টতই "শক-নৃপকাল" বলা হইয়াছে। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে মহারাষ্ট্র দেশে রচিত গ্রন্থেও (ভাস্করাচার্য্য কৃত গোলা-ধ্যায়ে) শকাব্দকে "শক-নৃপ-সময়" বলা হইয়াছে। সুতরাং প্রতিপন্ন হইতেছে যে, শকাব্দ মহারাষ্ট্রীয়গণ দ্বারা শালিবাহনের নামে প্রচারিত হইবার বহু শতাব্দী পূর্ব্বে, উত্তর-ভারতের "বৌদ্ধবিদ্বেষী" ব্রাহ্মণ পণ্ডিত-গণ শকাব্দকে "হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী" বিক্রমাদিত্যের নামে প্রচারিত করিয়া শকজাতীয় বৌদ্ধ নর-পতির কীর্ত্তিবিলোপের চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের চেষ্টা অনেকাংশে সফলও হইয়াছিল। কৈলাস বাবু আমাদিগকে জানা-ইয়াছেন যে, তিনি খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভকালে ক্ষোদিত একটী মহারাষ্ট্র দেশের প্রস্তর-লিপিতে শকাব্দের সহিত শালিবাহনের নাম সংযুক্ত দেখিয়াছেন। কিন্তু ইহার কত পূর্ব্বে উত্তরাপথ-বাসিগণ বিক্রমাদিত্যের সহিত শকাব্দকে সংযোজিত করিয়াছিলেন, তাহা চিন্তা করিলে, কনিষ্কের কীর্ত্তি-বিলোপাপরাধে নিরীহ মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণগণকে অভিযুক্ত করা কৈলাস বাবুর পক্ষে যুক্তিসঙ্গত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না।

ডাঃ ভাণ্ডারকর বলেন, খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত মহারাষ্ট্র দেশে সর্ব্বত্র শকাব্দকে "শককাল" বা "শকনৃপকাল" বলিত। প্রাচীন কালে ইহা "শকনৃপতির রাজ্যাভিষেককাল হইতে আরব্ধ" অব্দ নামে পরিচিত ছিল। পরে উহা ক্রমে সংক্ষিপ্ত হইয়া "শকনৃপকাল" ও "শককাল"নামে পরিচিত হইল। কিছু দিন পরে "শককাল" শব্দ সংক্ষিপ্ত হইয়া—"শাকে" এই রূপ প্রাপ্ত হইল। "শককালাব্দের অমুক বর্ষে" বুঝাইতে "শাকে" শব্দ ব্যবহৃত হইত। কাল-ক্রমে "শাকে" সংক্ষিপ্ত হইয়া "শকে" (অর্থাৎ অমুক শকাব্দে) হইল। এইরূপে ক্রমে "শক" শব্দের প্রাকৃতিক অর্থ সাধারণের স্মৃতিপথ হইতে বিলুপ্ত হইয়া, উক্ত শব্দ সাধারণতঃ সংবৎসর-গণনারম্ভ-সূচক অব্দের নামান্তর বা প্রতিশব্দরূপে ব্যবহৃত হইতে লাগিল। * এবং কালগণনাসাধক অব্দের সহিত প্রায়ই কোনও না কোনও বিখ্যাত ঘটনা বা মহাপরাক্রমশালী নৃপতির সম্বন্ধ থাকে, সাধারণের এইরূপ সংস্কার থাকায় ও অতি প্রাচীন কাল হইতে মহারাষ্ট্র দেশে ঐ অব্দ প্রচলিত থাকায়, মহারাষ্ট্রীয়গণ শকাব্দের (বা প্রাচীন শককালের) সহিত তাঁহাদের স্বদেশীয় মহাপরাক্রান্ত বিখ্যাত প্রাচীনতম ভূপতি শালিবাহনের নাম সংযো-জিত করিয়াছিলেন। এইরূপে শকজাতির আগমন-কাল-নির্ণায়ক অব্দ "শালিবাহন—শকে" পরিণত হইয়াছে।

দাক্ষিণাত্যের বিশেষতঃ মহারাষ্ট্র দেশের

* আমাদের বিবেচনায় এইরূপ হইবার আরও একটা কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। শক শব্দের অপর এক মৌলিক অর্থ 'কালগণনা সাধক অব্দ'। 'শক্যতে কালগণনা অনেন ইতি শকঃ।' অর্থাৎ যে অব্দ দ্বারা কালগণনা করিতে সমর্থ হওয়া যায়, তাহাই 'শক' এই অর্থে বরাহমিহির যুধিষ্ঠিরের প্রবর্ত্তিত অব্দকে (শককালস্তস্য রাজ্ঞশ্চ) "যুধিষ্ঠিরের শক-কাল" নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই অর্থেই মহারাষ্ট্রীয়গণ অদ্যাপি বিক্রমাব্দকে "বিক্রমশক" বলিয়া থাকেন। এই সকল কারণে, আমাদের বোধ হয়, 'শকনৃপসংবৎসর' শব্দ যখন সংক্ষিপ্ত হইয়া কালক্রমে "শক" শব্দে পরিণত হইল, তখন তৎসংশ্লিষ্ট ঐতিহাসিক তত্ত্ব, অর্থাৎ "ঐ অব্দ যে শকজাতির আগমন নির্ণায়ক" এই তত্ত্ব ভুলিয়া গিয়া সাধারণ লোকে ঐ 'শক' শব্দ প্রাচীন অর্থে—সামান্যতঃ কালগণনার সাধন, এই অর্থে ব্যবহার করিতে লাগিল।

সর্ব্বত্র এইরূপ জনশ্রুতি প্রচলিত আছে যে, একদা উজ্জয়িনীপতি বিক্রমাদিত্য মহারাষ্ট্র রাজধানী "প্রতিষ্ঠানপুর" আক্রমণ করিলে, মহারাজ শালিবাহনের সহিত তাঁহার ঘোরতর সংগ্রাম সংঘটিত হয়। সংগ্রামে বিক্রমাদিত্য সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়েন। এই সুপ্রসিদ্ধ ঘটনাকে চিরস্মরণীয় করিবার জন্য মহারাজ শালিবাহন "শকাব্দ" প্রবর্ত্তিত করেন।

পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ বলেন যে, খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে সত্রপবংশীয় "চষ্টন" নামক কোনও পরাক্রান্ত বীরপুরুষ উজ্জয়িনী প্রদেশে স্বীয় আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন। চষ্টনের পৌত্র রুদ্রদাম ও গোতমীপুত্র শাতকর্ণির প্রস্তর-লিপিসমূহ পাঠে অনুমিত হয় যে, সত্রপবংশীয় নহপান বা অপর কোনও ভূপতি কর্ত্তৃক মহারাষ্ট্র দেশ বিজিত হইলে, গোতমী-পুত্র শাতকর্ণি তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া দেশ হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিয়াছিলেন। বোধ হয়, এই ঐতিহাসিক ঘটনাকে ভিত্তিস্বরূপ করিয়া উপরি উদ্ধৃত কিংবদন্তী রচিত হইয়াছে। উজ্জয়িনীর অধিপতি কর্ত্তৃক মহারাষ্ট্র-আক্রমণ ও শালিবাহন (গোতমীপুত্র শাতবাহন) কর্ত্তৃক তাঁহার পরাজয়-ঘটনা বহুকাল পর্য্যন্ত লোকের স্মৃতিপথ হইতে অপসৃত হয় নাই। এদিকে, উজ্জয়িনীর সহিত বিক্রমাদিত্যের সম্পর্ক সাধারণের চক্ষে এত ঘনিষ্ঠ বলিয়া বোধ হয় যে, উজ্জয়িনীপতির কথা উঠিলেই লোকে সাধারণতঃ বিক্রমাদিত্যকেই বুঝিয়া থাকে। কাজেই যে সময়ে বিখ্যাত নরপতি বলিয়া শালিবাহনের সহিত শকাব্দের সংযোগ ঘটিল, সেই সময়েই তাঁহার সহিত বিক্রমাদিত্যের সংগ্রামের কিংবদন্তীও রচিত হইল। এইরূপে পূর্ব্ববর্ণিত ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহের অল্প স্বল্প অবশিষ্ট স্মৃতিকে ভিত্তি করিয়া পরবর্ত্তী কালে শালিবাহনের সহিত বিক্রমাদিত্যের সংগ্রাম ও তদন্তে শালিবাহনের জয়সূচক "শকাব্দ" নামক অব্দসংস্থাপন প্রভৃতি কিংবদন্তীর উৎপত্তি হইয়াছে। নতুবা, পরম সৌগত বৌদ্ধ নরপতির কীর্ত্তিবিলোপের জন্য মহারাষ্ট্রবাসী ব্রাহ্মণগণ শকাব্দকে শালিবাহনের নামে প্রচার করেন নাই। শকজাতির উপর জয় লাভ করিয়া সেই জয়বার্ত্তা চিরস্মরণীয় করিবার জন্য শালিবাহন শকাব্দ স্থাপন করেন, এ তত্ত্ব মহারাষ্ট্রীয়গণের নিকট সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত। এমন কি, যে সময়ে শালিবাহন কর্ত্তৃক শকাব্দ স্থাপন সম্বন্ধীয় পূর্ব্বোদ্ধৃত কিংবদন্তী রচিত হইয়াছিল সে সময়ে কনিষ্কের নাম ও তাঁহার সহিত যে শকাব্দের কোনও সম্বন্ধ আছে, এ কথা মহারাষ্ট্র দেশের লোকে আদৌ অবগত ছিল কি না সন্দেহ।

পূর্ব্বোদ্ধৃত বংশতালিকায় নেত্রপাত করিলে দৃষ্ট হইবে যে, ১৬ খৃষ্টাব্দের পর ও খৃষ্টীয় ১৩৩ অব্দের পূর্ব্বে যে সকল নরপতি শালিবাহনের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নামযুক্ত কোনও শিলালিপি অদ্যাপি প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। ইহার কারণও সহজেই অনুমেয়। এই সময়ে বোধ হয়, শাতবাহনবংশীয় নরপতিগণ হীনবীর্য্য হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং শকাদি অনার্য্য জাতিগণ তাঁহাদিগের হস্ত হইতে মহারাষ্ট্র দেশ বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই অপ্রসিদ্ধ ও হীনবীর্য্য নরপতিগণের নাম আমরা বায়ুপুরাণ ইহাতে সঙ্কলিত করিয়া বংশতালিকা সম্পূর্ণ করিতেছি।

অপীলব (খৃঃ ১৬ অঃ—২৮ খৃঃ অঃ)
পটিমাবি (খৃঃ ২৮ অঃ—৫২ খৃঃ অঃ)
নেমিকৃষ্ণ (৫২ খৃঃ—৭৭ খৃঃ অঃ)
হাল (৭৭ খৃঃ—৭৮ খৃঃ অঃ)
সপ্তক (৭৮ খৃঃ অঃ—৮৩ খৃঃ অঃ)
পুরীকসেন (পুরীন্দ্রসেন) [খৃঃ ৮৩—১০৪ খৃঃ অঃ]
শাতকর্ণি (১০৪ খৃঃ অঃ—১০৫ খৃঃ অঃ)
চকোর শাতকর্ণি (১০৫ খৃঃ—১০৫॥ খৃঃ অঃ)
শিবাস্বাতী (১০৫॥ খৃঃ—১৩৩ খৃঃ অঃ)

ইহাঁরা সকলে ধনকটকে রাজ্য করিতেন। ইহাঁদের বীর্য্যহীনতা নিবন্ধন শাতবাহন-বংশীয় নরপতিগণের যে কীর্ত্তি বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, তাহা শিবাস্বাতীর পুত্র গোতমী-শাতকর্ণির পরাক্রমে ও চেষ্টায় পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই গৌতমীপুত্র শাতকর্ণিই শকাদি জাতিকে মহারাষ্ট্র দেশ হইতে বিতাড়িত করেন।

শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর।

জন্মভূমি।

৫ম ভাগ। } জ্যৈষ্ঠ। ১৩০২। { ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

অদৃষ্ট।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

শঙ্করা ও শিলাবতীর সঙ্গমস্থল হইতে পূর্ব্বদিকে কিছুদূর যাইলে, বামদিকে বল্লভীগ্রাম। বল্লভীতে সুরম্য রাজপ্রাসাদ-তুল্য একটী প্রকাণ্ড ভগ্ন অট্টালিকা এখনও দেখিতে পাওয়া যায়; উহার সুন্দর সুরঞ্জিত কক্ষাবলী এবং বিচিত্র শোভাসম্পৎপূর্ণ স্থূল ও বিশাল স্তম্ভশ্রেণী এখন কালের নির্ম্মম গদাঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িতেছে; সেই সব ভগ্নস্তূপে প্রকাণ্ড মহীরুহ সকল উদ্গত হইয়াছে; গভীর নিশীথে নিশাচর পেচক তাহাদের শাখা হইতে কর্কশ চীৎকার করিয়া সকলের হৃদয়ে দারুণ ভীতি উৎপাদন করে; অসংখ্য বিষধর ভীষণ ফণা বিস্তার করিয়া সেই সব ভগ্নস্তূপবিবরে, কখনও বা তরুকোটরে অবস্থান করিতেছে—পথিকেরা দূর হইতে সেই সব সর্পের বিকট গর্জ্জন শুনিতে পায়। নিশাগমে সে ভগ্নস্তূপ সন্নিকটে যায় কার সাধ্য? নিশীথের অন্ধকার-বিমিশ্র অস্পষ্ট ছায়ালোকে সে ভগ্ন অট্টালিকা-স্তূপ দেখিলে মনে হয়, অতি ভীষণ ও বিকট দর্শন রাক্ষস বুঝি তাহার বদন বিস্তার করিয়া ব্রহ্মাণ্ড গ্রাস করিতে আসিতেছে।

কিন্তু চিরদিন উহার এ অবস্থা নহে; কিছুকাল পূর্ব্বে উহা স্বর্গপুরীর ন্যায় শোভমানা ছিল; এমন একদিন ছিল, যখন ঐ পুরী হইতে ইন্দ্রসম শত ভ্রাতা বাহির হইতেন; তাঁহাদের অসংখ্য পুত্র-কন্যা শারদ নীলাম্বরে নক্ষত্রমালার ন্যায় সর্ব্বদা ফুটিয়া থাকিত। অমানিশার গভীর অন্ধকারকে উপহাস করিয়া ঐ পুরীর অসংখ্য আলোকমালা দিগ্‌দিগন্তে তাহাদের কিরণ বিস্তার করিত। এই পুরী যে কত দূরাগত শ্রান্ত ক্লান্ত পথিকের বিশ্রাম লাভের স্থল ছিল, কত অনাথ দীন-দুঃখীর একমাত্র আশ্রয় ছিল, তাহার সংখ্যা নাই। কিন্তু মনুষ্যের কর্ম্মদোষে বা মা-চঞ্চলা কমলার নিগ্রহে, কোন্ পাপে কার অভিশাপে জানি না, আজ সেই স্বর্গপুরীর এ হেন শোচনীয় অধঃপতন ঘটিয়াছে!

বড় অধিক দিন এ দারুণ অধঃপতন ঘটে নাই; কুড়ি পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বেও এ পুরীর গৌরব-যশোভাতি অতি মৃদু মৃদু জ্বলিতেছিল। পূর্ব্বশ্রী নষ্ট হইয়াও অস্তগত দিনমণির ম্লান কিরণমালার ন্যায় ইহার জ্যোতিঃ অল্প অল্প বিকাশ পাইতেছিল। পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে এই পুরীতে বিবাহ উপলক্ষে আনন্দ-উৎসবের অনন্ত

উৎস ছুটিয়াছিল—উৎসাহ-উল্লাসের অনন্ত তরঙ্গ খেলিয়াছিল! পুরী সে সময়ে নব সাজে সজ্জিত! বিবিধ রত্নভূষণ-পারিপাট্যে সমলঙ্কৃত! দ্বারে দ্বারে পূর্ণ কুম্ভ, আম্রশাখা! তোরণ-শীর্ষে পুষ্পমালালহরী! তোরণে তোরণে মৃদুল-গম্ভীরে নহবৎ বাজিতেছে; অসংখ্য আলোক-মালা দর্শকমণ্ডলীর নয়ন ঝলসিয়া দিতেছে! বসন্তের সুপরিষ্কৃত, সুনীল গগনপটে, তারকা-নাথ চন্দ্রমা যেমন শোভা পায়, তেমনি সুনীল চন্দ্রাতপতলে অসংখ্য বৈদূর্য্যমণি-সঙ্কাশ সহস্র আলোক-শিখা শোভা পাইতেছে; তন্নিম্নে সুকণ্ঠী মধুর সপ্তমে তান উঠাইয়া কি সঙ্গীত সুধা ছড়াইতেছে! মরি মরি! কি "উজ্জ্বলে মধুরে" মিশিয়াছে! কত দর্শক! হেমালঙ্কার-বিশিষ্টা কত সুন্দরী! ঐ সব গবাক্ষে মুখ রাখিয়া গায়িকার সঙ্গীত স্বরলহরী শুনিতেছে! কি অতুল শোভা! সুবর্ণের হিল্লোলে যেন সুবর্ণের শতদল প্রস্ফুটিত হইয়াছে! সে পুরীর এইরূপ কত শোভা, কত সম্পদ্, কত সৌন্দর্য্য! তাহার কণামাত্র বর্ণিবার আমার সাধ্য কোথায়? কিন্তু হায়! সে সব এখন কিছুই নাই; অনন্তের জন্য অতীতের গর্ভে সে সব লীন হইয়া গিয়াছে! সে পুরীর সুখময়ী মূর্ত্তি ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, কেবল তাহার মর্ম্ম-ঘাতিনী স্মৃতি, এখনও কয়েক জন জীবিত থাকিয়া অতিকষ্টে হৃদয়ে বহন করিতেছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

অতি পূর্ব্বকালে বসুগোষ্ঠী এ পুরী প্রতিষ্ঠা করেন; তাঁহাদের অনন্ত গৌরব-কাহিনী এখন কল্পনার সামগ্রী ও স্বপ্ন প্রায় বস্তু হইয়া পড়িয়াছে! সে সব পুরাতন কাহিনী তুলিয়া এখন আর পাঠককে বিরক্ত করিব না। কুড়ি বৎসর পূর্ব্বেকার ঘটনা লইয়া আমি এ উপন্যাস আরম্ভ করিয়াছি, সেই আরম্ভ ধরিয়াই ইহার উপসংহার করিব।

কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে এ পুরীর কর্ত্তা ছিলেন, গোলোকনাথ বসু। তিনি তাঁহার পিতার অনুরোধক্রমে দুই বিবাহ করেন; প্রথমা স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্রের নাম রাধিকামোহন; দ্বিতীয়া স্ত্রী বিন্ধ্যবাসিনীর (ইহাঁর প্রচলিত নাম বিন্দুবাসিনী বা বিন্দু) গর্ভে প্যারীমোহন জন্মগ্রহণ করেন। প্যারী রাধিকা অপেক্ষা আট বৎসরের ছোট; রাধিকা যখন আট বৎসরের, তখন তাঁহার জননী ইহলোক ত্যাগ করেন।

গোলোকনাথের প্রথমা স্ত্রী, সংসারে লক্ষ্মী-রূপিণী ছিলেন; দেব-দ্বিজে ভক্তি, অতিথি-অভ্যাগতে সৎকার, দীন-দুঃখীর উপর দয়া, আত্মীয়-স্বজনের প্রতি প্রীতি, এ সকল তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ গুণ ছিল; তিনি সপত্নী বিন্দুবাসিনীকে সহোদরার ন্যায় স্নেহ করিতেন; কিন্তু তথাপি তিনি বিন্দুর মন পাইতেন না! বিন্দুবাসিনী অতি হীন ও দরিদ্র-ঘরের কন্যা! তাঁহার স্বভাব অতি মন্দ ছিল—আপনার খাওয়া হইলেই হইল, আপনার পরা হইলেই হইল, আপনি যাহা বুঝি, বলি বা করি, সব ভাল—অন্যের সব মন্দ! ইহা ব্যতীত হৃদয়ে বড় হিংসা, বড় ঈর্ষ্যা, বড় রোষ ছিল। সকলে রাধিকার মাকে "বড়গিন্নী" বলিত এবং বড়ই প্রশংসা করিত; তাহাকে "ছোটগিন্নী" বলিত; এ সকল তাহার প্রাণে আদৌ সহিত না। রাধিকার মা বিন্দুকে গৃহিণীপণা শিখিবার জন্য এবং সংসারের ভার লইবার জন্য কতবার অনুরোধ করিতেন, কিন্তু বিন্দু অকারণ অভিমানের বশবর্ত্তিনী হইয়া কিছুই শিখিত না, অথচ তাঁহার কার্য্যেরও অনুমোদন করিত না।

রাধিকামোহনের বয়স এক্ষণে তেইশ বৎসর; মার মৃত্যুর পর হইতে পিতার অসামান্য যত্নে ও স্নেহে লালিত-পালিত হইয়াছেন; গোলোক-

নাথ তাঁহার প্রথমা স্ত্রীর প্রিয়-দাসী নিস্তারিণীর হস্তে রাধিকার ভার দিয়াছিলেন; নিস্তারিণী রাধিকার মাকে 'মা' বলিত;—সত্যই সে রাধিকাকে সহোদরাধিক ভালবাসিত। কিন্তু এ সব বিন্দুবাসিনীর চক্ষুঃশূল! নিস্তারিণীকে দেখিলে তাহার অঙ্গে যেন কে বিষ ঢালিয়া দিত। গোলোকনাথ বেশ বুঝিতেন, বিন্দুবাসিনী অকারণে এই মাতৃহীন পুত্রের উপর বিদ্বেষবতী; কিন্তু তিনি হাল্কা-লোকের ন্যায় সে বিষয় লইয়া কখনও তর্ক-বিতর্ক করিয়া আত্মমর্য্যাদা ও সাংসারিক শান্তি নষ্ট করিতেন না; দুষ্টা বিন্দুবাসিনীও তাঁহার হৃদয়ে গরলরাশি ঢালিবার অবসর পাইত না। গোলোকনাথের এক আশা ছিল, বিন্দুর পুত্র প্যারীমোহন জ্যেষ্ঠ রাধিকার উপর বড় ভক্তিমান্।

গোলোকনাথ বড় দয়ালু লোক ছিলেন, দীন-দুঃখীর জন্য তিনি সততই মুক্তহস্ত—এজন্য তাঁহার সময়ে অনেক সম্পত্তি বিক্রয় হইয়া গিয়াছিল। স্বজাতির জন্য তিনি সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতেও প্রস্তুত ছিলেন; গ্রামান্তরে একটী অনাথা বিধবা কায়স্থ কামিনীর কন্যাদায় শুনিয়া তিনি কন্যাটীকে দেখিতে গেলেন এবং দেখিয়াই তাহাকে পুত্রবধূ করিতে তাঁহার মত হইল; কন্যাটী বড় হইয়াছে—বেশ সুরূপা। তিনি রাধিকামোহনের সহিত সেই কন্যাটীর বিবাহের আয়োজন করিলেন; এই বিবাহেই শেষবারের মত বসুগোষ্ঠীর বিশাল-পুরী শোভিত হইয়াছিল। ইহার আংশিক বর্ণনা পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে আমরা পাঠক মহাশয়কে জানাইয়াছি।

শুভ মুহূর্ত্তে রাধিকামোহন বিবাহ করিতে গেলেন। গ্রামবাসীরা আনন্দ এবং উৎসাহে মত্ত হইয়া, সে রাত্রে কেহ আর নিদ্রা গেল না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

অরুণের রক্তিম-রাগে নব ঊষা প্রকটিত হইতেছে; বসুদের বাটীতে যুবতীরা আনন্দের হুলাহুলি দিতে লাগিল—সারা রাত্রি তাহারা কেহ ঘুমায় নাই; বর বাহির হইবার পর হইতে তাহারা পাশা খেলিয়া আর গল্প করিয়া রাত কাটাইয়াছে—রাধিকামোহনের বিবাহে তাহাদের এত আনন্দ-উল্লাস; প্রভাত হইবামাত্র তাহারা আনন্দ-কোলাহল করিতে করিতে অন্দরের ঘাটে আসিয়া তাহার স্বচ্ছজলে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হইল; বর আসিবার পূর্ব্বেই তাহারা স্নান করিয়া নব-বস্ত্রে সজ্জিতা হইয়া থাকিবে; নবোঢ়া বধূকে লইয়া তাহারা আজ আনন্দের তরঙ্গে ভাসিবে; কিন্তু বাঙ্গালীর মেয়ে যেখানে একত্রে পাঁচটী মিশিয়াছে, সেইখানেই তাহারা সহস্র কার্য্য ভুলিয়া কথার মালা গাঁথিতে বসিয়াছে! হেমাঙ্গিনী সুবদনীর গায়ে জল ছিটাইয়া দিয়া তাহাকে কহিল,—ওলো, ঐ,

"পদ্মসতী সারারাতি কেঁদে কেঁদে সারা,
শিশির আকারে বহে তপ্ত অশ্রুধারা।"

সুবদনী হেমার গা টিপিয়া কহিল,—

আর কি ভাবনা সই উঠিছে তপন,
এবে দেখ্, কমলিনী প্রফুল্ল কেমন!

হেমা। ওলো,

যুবতীর প্রাণ-পতি বিরহের পরে,
দেখা দিলে কত সুখ উপজে অন্তরে!

সুব। কিন্তু,

কমলিনী, কলঙ্কিনী সকলেতে কয়,
ভ্রমরে আদরে কেন দেয় সে হৃদয়!

হেমাঙ্গিনী কি বলিতে গেল; কিন্তু তাহার বলা হইল না; সৌদামিনী তাহাদের কথায় বাধা দিয়া কহিল,—"ওলো, এখন ছড়া রাখ্, যদি বর দেখতে চাস্ তো চল্, ঐ শোন্ বাজনা বাজ্‌ছে।"

সকলেই মহা ব্যস্ত হইয়া পড়িল; অতি ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া সকলে অন্দরে ছুটিল! বসুদের বাড়ী যেন বায়ু-বেগান্দোলিত তড়াগের ন্যায় চঞ্চল হইয়া উঠিল! কেহ শঙ্খ লইয়া, কেহ জল-ঝারি লইয়া, কেহ পুর্ণ-কলস লইয়া, কেহ বা কিছুই না লইয়া দৌড়িতে লাগিল।

যথাসময়ে বর-কন্যা আসিয়া উপস্থিত হইল! দেবতা-প্রণাম ইত্যাদি মাঙ্গলিক কার্য্য হইলে স্ত্রীলোক বর-কন্যাকে একাসনে বসাইয়া সকলে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন; গ্রামের যত নারী বর-কন্যা দেখিতে আসিয়াছে! সকলেই আনন্দিত হইয়া বলিতে লাগিল,—"তা বেশ হ'য়েছে, ক'নে একটু বড়, তা ভালই হ'য়েছে! এমন না হ'লে বরের সঙ্গে মানাবে কেন? যেমন ছেলে, তেমনই মেয়ে! যেন চাঁদের বামে চাঁদ ব'সেছে! মেয়ে যেন রূপে ঘর আলো ক'রেছে।" অন্তঃপুরের কামিনীরা ক'নেকে লইয়া সম্পর্কমত কত আহ্লাদ-আমোদ করিতে লাগিল! চতুর্দ্দিকে আনন্দের তরঙ্গ বহিতেছে, এমন সময় গৃহিণী ঠাকুরাণী (ওরফে বিন্দুবাসিনী) ক'নে দেখিতে নামিলেন। তিনি যখন আসিতেছেন, সকলেই তাঁহার পানে চাহিয়া দেখিল, তাঁহার মুখ গম্ভীর ও মলিন—যেন অন্ধকারে আবৃত! সে মুখ দেখিয়া সকলে চমকিত হইল! কেহ বা ভীত হইল! কেহ বা প্রমাদ গণিল।

তিনি আসিয়া ক'নে দেখিয়াই মুখ বাঁকাইয়া বলিলেন,—"মাগো, এমন ধেড়ে কুনো কায়স্থের ঘরে! হোক রূপ! সাদা ফ্যাকফেকে কটা চামড়া অনেকেরই আছে! রূপ নিয়ে কি ধুয়ে খাব! কি ক'রে এর মা একে দেখে পেটে ভাত দিচ্ছিল?" কেহ কোন উত্তর করিল না; গৃহিণী ক'নের মুখের ঘোমটা তুলিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—"তোমার নাম কি গা?"

কন্যা ধীরে ধীরে একবার তাহার নয়নপল্লব দুখানি তুলিয়া গৃহিণীর পানে চাহিয়া, পর-মুহূর্ত্তেই নিম্নদৃষ্টিতে কহিল—"শ্রীমতী সরোজিনী দাসী।"

গৃহিণী যেন ঈষৎ ব্যঙ্গস্বরে কহিলেন—"ওমা, তোমার নাম শ্রীমতী সরোজিনী দাসী! তোমার মা তোমার বেশ নামটী তো রেখেছে! কেবল কপাল-দোষে সময় মন্দ!" তার পর গৃহিণী অন্যান্য স্ত্রীলোকগণের পানে চাহিয়া কহিলেন—"মেয়েখুব পাকা! বেশ চট্‌পটে! নামটী কেমন ব'ল্লে দেখেছ! সেকালে কিন্তু এরূপ ছিল না; অত শ্রীমতী অমুক-তমুকের আমরা ধার ধারি নাই; আমাদের এত বয়স হ'য়েছে, তবু কেউ নাম জিজ্ঞাসা কর্‌লে বলি, শুধু বিন্দুবাসিনী।" সকলেরই মুখের পানে চাহিয়া গৃহিণী এত কথা বলিলেন; কিন্তু কেহই তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিল না—কেহ একটীও কথা কহিল না; সকলে স্থিরনিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া; এমন সময়ে নিস্তারিণী বলিল,—"শ্রীমতী বলাতে আর কি দোষ গেছে গিন্নি?"

"তুই আবার কে গো?" বলিয়া গৃহিণী নিস্তারিণীর পানে চাহিয়া দেখিল; নিস্তারিণী অনেক কালের দাসী, সে রাধিকামোহনকে মানুষ করিয়াছে;—সে ভয় করিবার পাত্রী নয়, সে একটু সম্মুখে আসিয়া কহিল,—"আমি নিস্তারিণী গো গিন্নি?"

গিন্নি। এত লোক থাক্‌তে তোর গায়ে যে হিং লাগ্‌লো দেখ্‌ছি!

নিস্তা। সকলের গায়েই লেগেছে! ওরা কুটুমের মেয়ে, তোমাকে ভয়ে কিছু বলিল না।

গিন্নী। তোর তবে খুব ভরসা,—না?

নিস্তা। হবে না কেন? নিস্তারিণী তো আর কারও চুরীদারি করেনি!

গিন্নি। ভারি যে শক্ত শক্ত শোনাচ্ছিস্?

নিস্ত. এর আর শক্ত-নরম কি? হক্ কথা বল্‌ব! একটা বিয়ের ক'নে মেয়ে, তাকে নিয়ে এত কথা!

গিন্নী। তোর বাবার কিলা হারামজাদি!

নিস্তা। আমার বাবার এতে আছে! বরং মা, তোমার বাবার এতে কিছু নেই!

এইবার প্রমাদ ঘটিল! সুর এবার দীপকে চড়িল! গৃহিণী দৃপ্তা বাঘিনীর আকার ধারণ করিয়া, চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া বলিতে লাগিল,—"হারামজাদি, বাঁদি বেটী, তোর যত বড় মুখ, তত বড় কথা! আমার বাপ তোলা! আমার উপর মর্দ্দানী! জান না, এখনই ঝাঁটিয়ে বিষ ঝেড়ে দেব।" নিস্তারিণী তখনও বলিতে লাগিল,—"মা, বে-সম্পর্ক কথা তো বলিনি, অত চটো কেন? গোড়ায় কার দোষ, সকলেই জানে।" তখন গৃহিণী আরও উগ্রচণ্ডা হইয়া বলিল,—"থাম্ হারামজাদি, তোকে হাতে না মেরে ভাতে মার্‌চি, তোর অন্ন তুল্‌ছি, থাম্।" নিস্তারিণী এবার হাসিতে হাসিতে একটা কলসী লইয়া—"তা গিন্নি, আর বড় প্রত্যাশাও করিনে, এ সংসার থেকে যা পেয়েছি, তাতেই আমার খুব চল্‌বে"—এই কথা বলিতে বলিতে জল আনিতে চলিয়া গেল। গৃহিণী হিংসায় এবং রাগে অধীরা হইয়া উপরে উঠিয়া গেলেন।

সহসা কি-একটা বিসদৃশ কাণ্ড ঘটিয়া গেল! সকলের মন অত্যন্ত খারাপ হইয়া গেল! সকলেই বুঝিল, এ সংসারে শীঘ্র একটা প্রলয়-কাণ্ড উপস্থিত হইবে! সকলেই নীরবে, বিশুষ্ক মুখে, পরস্পরের মুখের দিকে চাহিতে লাগিল! বিবাহের ক'নে আজ গৃহে উপস্থিত! সকলের আজ কত আনন্দ! কিন্তু কেহই আর এখন আনন্দ করিতে চাহে না! যাহারা আনন্দে বিভোর হইয়া সারা নিশি বসিয়া জাগিয়াছে, এখন তাহারাই ভাবিতে লাগিল, মানে মানে গৃহে যাইতে পারিলে বাঁচি! আনন্দ-কলরবপূর্ণ পুরী আজ নিমেষে নিস্তব্ধ হইল! কি যেন এক অদৃশ্য মায়াবলে আনন্দের স্রোত অন্তর্হিত হইয়া গেল! আজ হাস্য-ময়ী সুরপুরী যেন বিষাদের করুণ-রোলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

আনন্দের পুরী আজ নিরানন্দ-নীরে নিমগ্ন হইল দেখিয়া নিস্তারিণী মনে মনে বড়ই ক্ষুব্ধ ও দুঃখিত হইল; সে ভাবিল,—আজ এ মঙ্গলের দিনে অমঙ্গলের একটা কলহ কখনই রাখা হইবে না; এইরূপে সে আপনার মনেই কি বিচার করিয়া গৃহিণীর পায়ে-হাতে ধরিয়া অনেক গালি-মন্দ খাইয়া তাঁহাকে একরূপ শান্ত করিল, তথাপি তিনি সে আনন্দের দিনে সে মাঙ্গলিক কার্য্যে বড় যোগ দিলেন না।

দেখিতে দেখিতে কয়দিনের মধ্যে বিবাহের উৎসব, উৎসাহ এবং উল্লাস থামিয়া গেল; আত্মীয়, কুটুম্ব যে যার গৃহে গেল; বিয়ের ক'নেও তাহার পিত্রালয়ে মার কাছে গেল।

আবার শুভদিনে, শুভক্ষণে সরোজিনীর দ্বিরাগমন হইল—এবার সরোজিনী প্রকৃত পক্ষে শ্বশুর-ঘর করিতে আসিল; এবার গৃহস্থ ও পাড়া-প্রতিবেশী স্ত্রীগণের সহিত তাহার আলাপ ও সখ্য হইতে লাগিল। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, এইরূপে এক বৎসর কাটিল।

সংসারের মধ্যে শ্বশুর, শাশুড়ী, স্বামী-ইহাঁদিগের প্রতি সরোজিনীর অসীম শ্রদ্ধা ও ভক্তি; নিস্তারিণীকে সরোজিনী বড় ননন্দার ন্যায় মান্য করিত। অন্যান্য দাস-দাসীগণকেও যথোচিত শ্রদ্ধা ও যত্ন করিত। শাশুড়ীর সকল কাজেই সরোজিনী সাহায্য করিত, তিনি কিন্তু বধূকে আন্তরিক স্নেহ করিতেন না।

দেবর প্যারীমোহনের উপর সরোজিনীর অতুল স্নেহ! প্যারীমোহনও "বড়-বউ" বলিতে অজ্ঞান হইতেন; কেহ অত্যুক্তি ভাবিবেন না, লক্ষ্মণ যেমন সীতাদেবীকে ভক্তি করিতেন, প্যারীমোহনও সেইরূপ সরোজিনীর উপর ভক্তিমান্ ছিলেন। এ কিন্তু বিন্দুবাসিনীর চক্ষুঃশূল! এজন্য প্যারীর উপর তিনি সদাই "গর্‌গর্" করিতেন; কিন্তু জ্ঞানবান্ পুত্র কিছু না বলিয়া কেবল মনে মনে হাসিতেন।

পাড়া-প্রতিবেশিনীদের মধ্যে হেমাঙ্গিনীর সহিত সরোজিনীর বেশী ভালবাসা হইয়াছিল; বসুদের বাটীর পার্শ্বেই হেমার পিত্রালয়, তাহার স্বামী শ্বশুর-ঘরেই বাস করিতেন; হেমা, ছেলেবেলা হইতে রাধিকামোহনকে "দাদা" বলিত এবং সরোজিনীকে কখনও "বউ" কখনও বা "সরোজ" বলিয়া ডাকিত।

হেমাঙ্গিনী সরোজিনীকে বড় ভালবাসিত। সে তাহার সংসারে একটু অবকাশ পাইলেই সরোজিনীকে দেখিতে আসিত। সরোজিনীকে তাহার দেখিয়া সুখ! তাহার সহিত কথা কহিয়া সুখ! সরোজিনীকে একদণ্ড দেখিতে না পাইলে সে জগৎ অন্ধকার দেখিত। সে সরোজিনীর চুল বাঁধিয়া দিবে, সিঁদুর পরাইবে, গহনা দিয়া সাজাইবে। সে আসিবার পূর্ব্বে একদিন সরোজিনী আপনি চুল বাঁধিতেছিল; তাই দেখিয়া হেমাঙ্গিনী বড় অভিমান করিল; সরোজিনী বলিল,—"হেমা, তুমি ভাই, আমাকে এত ভালবাস?"

হেমা। বউ, তুই কি ভালবাসিতে মানা করিস্?

সরো। মানা করিনি, কিন্তু চিরদিন যদি এক সঙ্গে না থাকৃতে পাই?

হেমা। সরোজ, এমন অশুভ দিন কেন হবে ভাই? যদিই হয়, তোমাকে না দেখ্‌তে পেয়ে আমি ম'রে যাব।

বলিতে বলিতে হেমাঙ্গিনীর চক্ষুতে জল আসিল—সরোজিনীও কাঁদিয়া ফেলিল। অশ্রুতে অশ্রু মিশিল! ভালবাসার অশ্রু! জগতে কি অতুল পদার্থ!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

পূর্ণিমার চাঁদ যদি রাহুতে গ্রাস না করিত, প্রতিষ্ঠায় যদি বিসর্জ্জন না আসিত, সমীরণে যদি ধূলি না মিশিত, আর অমৃতে যদি গরল না উঠিত, তবে কি সুখেরই হইত?

যেমন চাঁদে কলঙ্ক, নদীতে তরঙ্গ, কুসুমে কীট, আকাশে বজ্র, আশায় ভঙ্গ, সোণায় খাদ, তেমনই সুখের সংসারে কলহ আর অশান্তি! বসুদের এমন যে সোণার সংসার, কোন দিকে কোন অভাব নাই, তথাপি ঘরের ভিতর সকলের মনের অমিল—মুখ বাঁকাবাঁকি! যিনি গৃহিণী (বিন্দুবাসিনী), তাঁহার হৃদয় অভিমান, ক্রোধ, হিংসায় পূর্ণ! অকারণে তিনি সরোজিনীকে, রাধিকামোহনকে দেখিতে পারেন না! নিস্তারিণীও তাঁহার শত্রু! এমন কি, হেমাঙ্গিনী, সরোজিনীকে বড় ভালবাসিত বলিয়া সেও তাঁহার চক্ষুঃশূল! এমন অবস্থায় সংসারে সুখশান্তি কিরূপে বিরাজ করিবে?

সরোজিনী ও নিস্তারিণী যত মানাইয়া লইতে ইচ্ছা করিত, বিন্দুবাসিনী ততই সেই সকল সামান্য "ছুতানাতা" ধরিয়া সংসারে কলহের আগুন জ্বালিয়া দিত। এই সকল কারণে কর্ত্তা গোলোকনাথ বসু সর্ব্বদাই বড় মনোদুঃখে কালযাপন করিতেন। তিনি গম্ভীর প্রকৃতির লোক বলিয়াই কাহারও কাছে কোন কথা বলিতেন না; তিনি ভাবিতেন,—"গৃহিণী এই শেষ দশাতেও যদি সামান্য বালকের ন্যায় কলহ ছাড়িতে না পারিলেন, তখন আর উহাঁকে কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই।"

বিন্দুবাসিনী একদিন অষথারূপে নিস্তারিণীকে আক্রমণ করিলেন। নিস্তারিণী, রাধিকামোহনের বিবাহের দিন হইতে মনে মনে সঙ্কল্প করিয়াছিল, গৃহিণী যতই বলুক, সে জবাব দিবে না! কিন্তু আজ কি গ্রহের ফের! আর নিস্তারিণীরও রক্তমাংসের দেহ!—গৃহিণীর কথা তাহার প্রাণে সহিল না! সেও গৃহিণীকে মুখের মত শুনাইয়া দিল! একেবারে কলহের তরঙ্গ বহিতে লাগিল! কর্ত্তা মহাশয়, রাধিকামোহন, প্যারীমোহন সকলে বাটীর মধ্যে আসিয়া পড়িলেন! রাধিকামোহন ও প্যারীমোহন মাকে নিরস্ত করিতে লাগিলেন! তথাপি কি তিনি শান্ত হন? তখন কর্ত্তা মহাশয় সকল কথা শুনিয়া, সমস্তই বিন্দুবাসিনীর দোষ বুঝিয়া, তাঁহাকে মিঠেকড়া রকম ভর্ৎসনা করিলেন।

এ কি বিন্দুবাসিনীর প্রাণে সহ্য হয়? একে দাসী, তার সঙ্গে ঝগড়ায় কর্ত্তার তিরস্কার! বিন্দুবাসিনী ঘরে যাইয়া, ক্ষোভে, রোষে, ঘৃণায় মরিবার জন্য আফিং খাইলেন! সে আবার এক প্রলয় কাণ্ড! পুলীশের দারোগা, কনষ্টেবল পর্য্যন্ত হাজির! যাহা হউক, কোনরূপে বিন্দুবাসিনীর প্রাণ রক্ষা হইল! কিন্তু মরিলেই ছিল ভাল!

এই কেলেঙ্কারী কাণ্ডে গোলোকনাথ বসুকে মাথা হেঁট করিতে হইল! সে সকলের বিস্তারিত বর্ণনা একালে আর নিষ্প্রয়োজন!

গোলোকনাথ বসুর এখন শেষ দশা বলিতে হইবে! বয়স প্রায় ষাট বৎসর! এই বয়সে সাংসারিক এই সব অনর্থপাতে তাঁহার হৃদয় একেবারে ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি সদাই নির্জ্জনে বসিয়া নিস্তব্ধভাবে দারুণ চিন্তায় অভিভূত থাকিতেন; তিনি ভাবিতেন,—"বসুগোষ্ঠীর বিমল কীর্ত্তি-চূড়া এইবার খসিল! হায়! ধনে, মানে, কুলে, শীলে অগ্রগণ্য—এমন বনেদী বংশের অদৃষ্টে ভগবান কি পরিণামে ইহাই লিখিয়াছিলেন?

তিনি সূচনা দেখিয়া সমাপ্তির আশঙ্কায় পলে পলে শিহরিতে লাগিলেন!

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

গোলোকনাথ বসুর বয়স ষাট বৎসর হইয়াছে; এই বয়সে নানাবিধ দুশ্চিন্তায় তাঁহার মন সর্ব্বদাই খারাপ থাকিত; তাঁহাদের বংশে কখনও আত্ম-কলহ—আত্মবিচ্ছেদ নাই; সম্প্রতি কিন্তু সে সব পূর্ণমাত্রায় তাঁহাদের গোষ্ঠীতে প্রবেশ করিয়াছে; এই সব ভাবিয়া তিনি ক্রমশঃ পীড়িত হইয়া পড়িলেন; প্রথম প্রথম তিনি কাহাকেও কিছু বলিতেন না, কিন্তু তাঁহার পীড়া যখন দারুণ উদরাময়ে পরিণত হইল, যখন একেবারে শয্যাগত হইলেন, তখন সুবৈদ্য সকল আসিলেন; চিকিৎসা চলিতে লাগিল,—ব্যবস্থা মত সেবা-শুশ্রূষার কোন ত্রুটী হইল না; রোগ কিন্তু উদরাময়, আর এই বৃদ্ধ বয়স! তা ছাড়া বহু পুরে চিকিৎসারম্ভ; এই সকল কারণে রোগের উপশম হইল না, ক্রমশঃ তাহা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

বেগবতী নদী যেমন সম্মুখের সমস্ত বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া সজোরে ছুটিয়া যায়, বসুজ মহাশয়ের রোগও সমস্ত ঔষধ ও ব্যবস্থা না মানিয়া বৃদ্ধির দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল; কবিরাজ মহাশয়েরা সমস্ত লক্ষণ দেখিয়া, সব অবস্থা বুঝিয়া, এ যাত্রা বসুজ মহাশয়ের প্রাণের আশা ত্যাগ করিলেন। তাঁহারা পরস্পর কথা-বার্ত্তায় কহিলেন,—"স্বয়ং কাল আসিয়া এবার বসুজ মহাশয়কে আক্রমণ করিয়াছেন! ইহাঁকে বাঁচায়, কার সাধ্য?"

গোলোকনাথ বসু মনে মনে নিজ অবস্থা

সবই বুঝিলেন। বুঝিয়া তিনি কাতর হইলেন না; তিনি ভাবিলেন, যাইবার এই তাঁর উপযুক্ত সময়! এখনও দুঃখের ভিতর সুখ-রশ্মি মৃদু মৃদু জ্বলিতেছে! তিনি সহসা একদিন প্রাতে কবিরাজ মহাশয়গণের উপস্থিত কালে গ্রামের আর কয়েক জন ভদ্রবংশীয়কে আহ্বান করিয়া আনাইলেন। সকলের সম্মুখে একখানি "উইল" করিলেন; আমরা তাহা সংক্ষেপে বলি;—"রাধিকামোহন বার্ষিক ১২০০ শত টাকা আয়ের জমিদারিটী পাইলেন। প্যারীমোহন মাসিক ১০০৲ শত টাকা আয়ের তেজারতি কারবার পাইলেন; প্যারীর বিবাহের জন্য পৃথক্ ১৫০০৲ শত টাকা রহিল। ভদ্রাসন বাটীতে উভয় ভ্রাতার তুল্যাংশ রহিল; প্যারীমোহনের পড়া-শুনার খরচ যৌথ হইতে হইবে। সকলেই স্বাক্ষর করিলেন।

"উইলের" পর হইতে রোগ ভয়ানক বাড়িয়া উঠিল। বসুজ মহাশয় আর পাশ ফিরিয়া শুইতে পারেন না! সেই দীর্ঘ-দেহ পুরুষ-প্রবর, মহামতি ভীষ্মদেবের ন্যায় স্থিরভাবে যেন শরশয্যায় শয়ান হইলেন! পদতলে রাধিকামোহন, প্যারীমোহন, সরোজিনী; একপার্শ্বে নিস্তারিণী, অপর পার্শ্বে বিন্দুবাসিনী। হেমাঙ্গিনী ও তাহার স্বামী হরিনাথ রায় তাহাদের ঘর বন্ধ করিয়া বসুদের বাটীতে আসিয়া রহিলেন।

শয্যাশায়ী থাকিয়া একদিন বসুজ মহাশয় এই সব প্রিয়জনের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইল! হায়! এই সব প্রাণাধিক প্রিয়, চির-পরিচিতগণের নিকট হইতে চিরদিনের জন্য বিদায় লইয়া কোথায় অপরিচিতের ন্যায়, একা, কোন্ অপরিচিতের দেশে যাইতে হইবে। অহহ! মরিবার চিন্তা কি ভীষণ! তাহা কি কল্পনা করিতে পারা যায়! গোলোকনাথের চক্ষু দিয়া অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। সে ধারা দেখিয়া কেহই আর অশ্রু-সংবরণ করিতে পারিল না! তখন তিনি ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন—"তোমরা কাঁদিও না, তোমরা কাঁদিলে এখনই দারুণ যাতনায় আমার হৃৎপিণ্ড ছিঁড়িয়া যাইবে! তোমাদের হাসি-মুখ দেখিলে আমি সুখে মরিব।"

সকলে পাষাণে বুক বাঁধিয়া বসনাঞ্চলে চক্ষু মুছিলেন।

গোলোকনাথ আবার কহিলেন,—"আমার কালপূর্ণ হ'য়েছে, আমি চল্লেম; বাপ রাধিকামোহন, প্যারীমোহন, কোথা বাপ তোমরা?"

"আমরা এখানে বাবা!" দুই ভ্রাতায় একটু অগ্রসর হইয়া বসিলেন।

অশ্রুতে চক্ষুর তারা ডুবিয়া গিয়াছে। গোলোকনাথ কিছুই দেখিতে পান না। বিন্দুবাসিনী অশ্রু মুছাইয়া দিলেন।

গোলোকনাথ কহিলেন,—"বাপ, তোমরা বড় বুদ্ধিমান্! তোমাদিগকে আর কি বলিব! দুই ভায়ে কখনও মনের অমিল ক'রো না।"

বৃদ্ধ আর বলিতে পারিলেন না, তাঁহার কণ্ঠরোধ হইল!

কিছুক্ষণ পরে বিন্দুবাসিনীর পানে চাহিয়া কহিলেন,—"রাধিকা তোমার পেটের ছেলে! সরোজ তোমার মেয়ে! তোমাকে আর বলিব কি? আমি তো যাই! তুমি সব গুছিয়ে নিয়ে থেকো।"

বৃদ্ধ গভীর দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিলেন। আবার ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন,—"নিস্তার! মা তুই আমার! তোর উপর দিয়া আমি নিশ্চিন্ত——"

তাঁহার মনে ভূতপূর্ব্ব কত কি আসিল! তিনি আবার কাঁদিলেন, কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন,—"মা সরোজিনী, ও কি মা! তুমি কেঁদো না; তুমি আমার সোণার লক্ষ্মী! ও মা! তুমি আমার——"

আর বলিতে পারিলেন না! বড় কাতর হইয়া পড়িলেন। একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া ধীরে ধীরে কহিলেন,—"হায়, আর আমি বলিতে পারি না; কিন্তু কথা কহিতে বড় ইচ্ছা। ওঃ! চোখে সব অন্ধকার! আ-মা-য়—" সহসা স্বর বন্ধ হইল! কবিরাজ মহাশয় নাড়ী দেখিলেন; সকলকে ইঙ্গিতে কহিলেন,—"বড় খারাপ, বেশী ক্ষণ নয়।"

কবিরাজ নাড়ী ধরিয়া বসুজ মহাশয়ের নাম ধরিয়া ডাকিলেন; তিনি চক্ষু মুদিয়াই অতি ক্ষীণস্বরে অস্পষ্টভাবে কহিলেন,—"হরিবোল হরিবোল, হরিবোল!"

কবিরাজের চক্ষে জল-ধারা বহিতেছে; গৃহস্থিত সকলের চক্ষু অশ্রুরাশিতে পরিপূর্ণ! সকলেই বাষ্পাকুলিত-লোচনে বসুজ মহাশয়কে হরিনাম শুনাইতে লাগিলেন।

হরিনাম শুনিতে শুনিতে গোলোকনাথের অমরাত্মা পুষ্পক বিমানে চড়িয়া স্বর্গারোহণ করিলেন! মহাকাল অলক্ষ্যে আসিয়া দেহ হইতে সেই অনুল্য মণি হরণ করিল! শূন্য দেহ পড়িয়া রহিল!

বসুগোষ্ঠীর আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার কাতর চীৎকারে গগন পূর্ণ হইল! আজ রাধিকামোহন, প্যারীমোহন, বিন্দুবাসিনী, সরোজিনী, নিস্তারিণী, হেমাঙ্গিনী শোকে অধীর হইয়া ধূলায় পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন! আজ দাস-দাসীরা পর্য্যন্ত শোকে অধীর হইয়া পড়িল! অপর কথা কি, একেবারে দশখানা গ্রামের লোক ভাঙ্গিয়া পড়িল! সকলেই শিরে করাঘাত করিয়া "হায় হায়" রবে কতই বিলাপ করিতে লাগিল!—"আহা! এমন লোক কি আর হইবে? দীন-দুঃখীর পানে আর কে চাহিবে? আতুরকে আর কে আশ্রয় দিবে? নিরাশ্রয়ের আর কে আশ্রয় হইবে? ভগবান্! কোন্ পাপে আজ তুমি এমন দয়ার সাগর শুষ্ক করিলে?"

গভীর হরিধ্বনি করিতে করিতে গোলোকনাথের মৃতদেহ শ্মশানে নীত হইল! কাষ্ঠ-স্তূপে সে দেহ শয়ন করাইয়া তাহাতে অগ্নি সংযোগ করা হইল!

অহহ, কি ভীষণ দৃশ্য! আজ শ্মশানের লেলিহান অগ্নিজিহ্বা তেমন দয়ার শরীর দগ্ধ করিল! চিতার অদূরে চারিদিকে অসংখ্য লোক! সকলে আজ শ্মশান পর্য্যন্ত আসিয়াছে! সকলের চক্ষু হইতে আজ অশ্রু বিগলিত হইতেছে! প্রচণ্ড অগ্নিশিখা আজ সেই নয়নজলে প্রতিফলিত হইতে লাগিল।

তেমন অপার্থিব মহাপুরুষকে ভস্মরাশিতে পরিণত করিয়া অগ্নি নির্ব্বাপিত হইল। সকলে তাঁহার অতুল কীর্ত্তি-কাহিনী ভাবিতে ভাবিতে মর্ম্মান্তিক বেদনা লইয়া গৃহে ফিরিল।

বসুগোষ্ঠীর অদৃষ্ট-চক্র অতঃপর আর এক-দিকে বিঘূর্ণিত হইতে চলিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

পিতার মৃত্যুর পর রাধিকামোহন স্বয়ং সমস্ত বিষয়-কার্য্য দেখিতে লাগিলেন। তিনিও তাঁহার পিতার ন্যায় সকলের সহিত সদয় ব্যবহার করিতেন। সকলে তাঁহার বিশেষ সুখ্যাতি করিত।

এই সময়ে নিশিকান্ত দাস সর্ব্বদা তাঁহার নিকটে যাওয়া-আসা করিতে লাগিল; নিশিকান্ত রাধিকামোহনের সহপাঠী, উভয়েই সমবয়স্ক; নিশিকান্ত অল্প বয়স হইতে বিদেশ জমিদারী-কার্য্য করিয়া এ বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞ হইয়াছিলেন। নিশিকান্ত বলিতেন, বিদেশে তাঁহার পক্ষে সহ্য হইল না বলিয়া তিনি বাটী চলিয়া আসিলেন! এক্ষণে গ্রামে বা তন্নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে একটী জমিদারী-চাকুরী পাইলে তিনি তাহা অনায়াসে করিতে পারেন। তিনি

আরও বলিতেন, তাঁহার চাকুরী করিবার বড় প্রয়োজনও নাই! বিদেশে অনেকদিন থাকিয়া তিনি "মোটা ভাত-কাপড়ের" সংস্থানটা করিয়াছেন; তবে একেবারে বেকার বসিয়া থাকিলে "মাটী" হইয়া যাইতে হইবে, তাই একটা চাকুরীর অনুসন্ধান করা।

আমরা সংক্ষেপে বলি, রাধিকামোহন নিশিকান্তের নিয়ত যাওয়া-আসাতে এবং তাঁহার সহিত সর্ব্বদা কথা-বার্ত্তায়, তাঁহার প্রতি অনুরাগী হইয়া উঠিলেন! আর নিশিকান্ত যে একজন সুযোগ্য ব্যক্তি, এটা তাঁহার বিলক্ষণ ধারণা হইল। তিনি ভাবিতেন, "নিশিকান্ত যদি আমার এই ক্ষুদ্র জমিদারীর ভার গ্রহণ করে, তাহা হইলে ইহার কার্য্য বেশ সুশৃঙ্খলরূপেই চলিবে। আমারও অনেক উপকার হইবে! নিশিরও কিছু কিছু পোষাইবে।"

তিনি একদিন নির্জ্জনে উপরের বৈঠকখানায় বসিয়া নিশিকান্তকে মনের কথা বলিলেন। নিশিকান্ত দুই একদিন ইতস্ততঃ করিয়া, দুই চারিটী আপত্তি তুলিয়া, আবার তাহা খণ্ডন করিয়া, রাধিকামোহনের কার্য্যে স্বীকৃত হইলেন।

নিশিকান্ত রাধিকামোহনের চাকুরী করিতেন বলিয়া, রাধিকামোহন তাঁহাকে চাকরের মত দেখিতেন না—পর ভাবিতেন না! তিনি নিশিকান্তকে কনিষ্ঠ ভ্রাতার মত দেখিতেন।

একদিন নিশিকান্ত কি কার্য্য উপলক্ষে রাধিকামোহনের বৈঠকখানায় বসিয়া আছেন; তিনি যেখানে বসিয়াছেন, তাহার সম্মুখেই অন্দরে যাইবার দ্বার; সহসা সেই দ্বার উন্মুক্ত হইল; নিশিকান্ত ভাবিলেন, বুঝি রাধিকামোহন আসিতেছেন? তিনি ব্যগ্র হইয়া চাহিয়া দেখিলেন! কিন্তু এ কি দেখিলেন? বিদ্যুৎশিখার ন্যায় অসামান্য রূপলাবণ্যশালিনী এক যুবতী কামিনী! তাঁহার আলুলায়িত কুন্তলজাল, অগাধ জলরাশির ন্যায় আন্দোলিত হইতেছে; আর উজ্জ্বল প্রভাময় মুখমণ্ডল প্রস্ফুটিত কমলের ন্যায় শোভা পাইতেছে! নিশিকান্ত পলকের মত ইহাঁকে দেখিলেন—সেই যুবতী গৃহমধ্যে তাঁহাকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া, লজ্জায় বেপমানা হইয়া ঝটিতি পার্শ্বে সরিয়া গেলেন; যাইবার সময় তাঁহার সেই অবেণী-সম্বদ্ধ, নিতম্ব-চুম্বিত ঘনকেশরাশি পবন-সঞ্চালিত নবঘন-ঘটার ন্যায় চঞ্চল হইয়া উঠিল—উন্মুক্ত দ্বার আবার ধীরে ধীরে রুদ্ধ হইয়া গেল। একবার বিদ্যুৎ চমকিতে যতক্ষণ লাগে, সেই সময়ের মধ্যে এই কাণ্ড ঘটিয়া গেল! নিশিকান্ত নীরব, নিশ্চল হইয়া বসিয়া রহিলেন! তাঁহার জ্ঞান-বুদ্ধি যেন কে ইন্দ্রজালে হরিয়া লইল। কিছুক্ষণ পরে নিশিকান্ত প্রকৃতিস্থ হইয়া ভাবিতে লাগিল,—"মরি, মরি, কি সুন্দর! এমন সৌন্দর্য্য এ জীবনে কখনও দেখি নাই।" অনুমানে বোধ করি, এ রমণী সরোজিনী! সকলে যে বলে, সরোজিনীর অতুল রূপরাশি, সে কথা ঠিক!"

নিশিকান্ত উঠিল! সোপানে নামিতে নামিতে চারিদিকে চাহিয়া দেখিল; মনে মনে ভাবিল,—"আর একবার সে মনোমোহিনীকে দেখিতে পাইব না?"

নিশিকান্ত গৃহে যাইয়াও সরোজিনীর সে অতুল রূপরাশি ভাবিতে লাগিল।

রাত্রে শয়ন করিয়াও সরোজিনীর সেই অতুল রূপরাশি মনে মনে ভাবিতে লাগিল।

নিশিকান্ত কুটীরে শয়ন করিয়া কোহিনূরের স্বপ্ন দেখিতে লাগিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

একদিন অপরাহ্ণে প্যারীমোহন হাস্য-প্রফুল্ল মুখে বাটীতে প্রবেশ করিতেছেন দেখিয়া সরোজিনী জিজ্ঞাসিলেন,—"আজ খুব হাসিমুখে যে ঠাকুর পো! বল, "পাস্" হ'য়েছ তো?"

প্যারীমোহন আনন্দের সহিত কহিলেন,—"হাঁ বড় বউ, তোমাদের আশীর্ব্বাদে আমি পাস্ হ'য়েছি।"

প্যারীমোহন বল্লভীর ইস্কুল হইতে "এন্ট্রান্স" পাস্ করিলেন।

প্যারীমোহন জননীকে এই সংবাদ দিয়া, তাঁহার এক সহপাঠীর সহিত দত্তদের পাড়ায় গেলেন।

সন্ধ্যার পর রাধিকামোহন গৃহে আসিলে সরোজিনী তাঁহাকে প্যারীমোহনের "পাস্" হওয়ার সংবাদ জানাইলেন; রাধিকামোহন বড় আনন্দিত হইয়া কহিলেন,—"প্যারী গেল কোথায়?"

সরো। দত্তদের বাড়ী গেছে, এখনই আস্‌বে।

একটু পরেই প্যারীমোহন আসিয়া অগ্রজকে আনন্দের সংবাদ শুনাইলেন। রাধিকামোহন বড় আহ্লাদিত হইয়া কহিলেন,—"তুমি দীর্ঘজীবী হও ভাই,—বংশের মান-গৌরব বৃদ্ধি কর।"

প্যারীমোহন "ফার্ষ্ট ডিবিজানে" বৃত্তি পাইয়া পাস্ হইয়াছেন। তাঁহাকে এবার কলেজে পড়িতে হইবে! কিন্তু বল্লভীতে কলেজ নাই। তাঁহার শিক্ষকেরা বলিয়াছেন, কলিকাতায় গিয়া না পড়িলে, ভাল পড়া হইবে না। আর তাঁহার সহাধ্যায়ী পরীক্ষোত্তীর্ণ পূর্ণ দত্তও যে কলিকাতায় পড়িবে, এ সকল কথা প্যারীমোহন তন্ন তন্ন করিয়া অগ্রজকে বলিলেন। রাধিকামোহনেরও সম্পূর্ণ মত যে, প্যারী কলিকাতাতেই থাকিবে।

সকল কথা শুনিয়া সরোজিনী কহিলেন,—"ঠাকুর পো, তোমাকে ছেড়ে দিয়ে মা থাকবেন কি ক'রে? আমরা থাকব কি ক'রে? আর সেখানে যখন তোমার মন কেমন করবে?"

প্যারী। পূর্ণ আর আমি দুজনে একসঙ্গে থাকব! ছুটী হ'লেই আস্‌ব।

প্যারীমোহনের মা এ সংবাদ পাইলেন! তিনি তো কিছুতেই পাঠাইবেন না। সরোজিনীরও অমত। অনেক বুঝাইয়া-সুঝাইয়া, দুই ভ্রাতায় মা ও বধূকে স্বীকার করাইলেন।

গ্রহবিপ্রকে ডাকাইয়া একটী ভাল দিন দেখান হইল।

শুভদিনে প্যারীমোহন দেবতাকে, মাকে, বড়-বধূকে এবং অন্যান্য পূজনীয়গণকে প্রণাম করিয়া কলিকাতা যাত্রা করিলেন। তাঁহারা কাঁদিতে কাঁদিতে কত আশীর্ব্বাদ করিয়া প্যারীমোহনকে বিদায় দিলেন। বিদায় লইবার কালে প্যারীমোহন, মা ও বড়-বধূর স্নেহ ও বাৎসল্য-পূর্ণ মুখের পানে চাহিয়া আর অশ্রু-সংবরণ করিতে পারিলেন না।

আহা! প্যারীমোহন কখনও ঘরের বাহির হয় নাই।

কলিকাতায় সমস্ত সুবন্দোবস্ত করিয়া দিয়া আসিবার নিমিত্ত স্বয়ং রাধিকামোহন সঙ্গে চলিলেন।

পথে পূর্ণ দত্ত প্যারীর সঙ্গী হইল! তাহারও চক্ষু রক্তবর্ণ—সেও কাঁদিয়াছে! যিনি কখন ঘরের বাহির হন নাই, তিনি এ বিদায়ের শোক বুঝিবেন না।

অপরাহ্ণ পাঁচটার সময় অনুকূল বাতাসে পাল তুলিয়া দিয়া প্যারীমোহনের নৌকা রূপনারায়ণের অগাধ জল-রাশি ভেদ করিয়া কলিকাতা অভিমুখে ছুটিল।

অসংখ্য বীচিমালা-বিক্ষুব্ধ নদীর অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দেখিয়া প্যারীর ও পূর্ণর মন মুগ্ধ হইল।

নবম পরিচ্ছেদ।

শুভ্র উষা! দিশালা শুভ্র বসনে সাজিয়া হাসিতেছে! পশ্চিম আকাশে কনককান্তি সুধাংশুমালী শুভ্রকায় ধরিয়া দিগন্তে অদৃশ্য হইতেছেন! সুবিস্তৃত, অনন্ত আকাশ-পট শুভ্র, তাহাতে দুই একটী শুভ্র নক্ষত্র দীপ্ত; সুমন্দ মলয়ানিল মৃদু মৃদু বহিতেছে! এ সময়ে প্রকৃতির সৌন্দর্য্য দেখিলে পথিকের সমস্ত ক্লান্তি, সমস্ত শ্রান্তি দূর হয়।

এমন সময় রাধিকামোহন আসিয়া স্বীয় কক্ষে প্রবেশ করিলেন; তখন সরোজিনী অখিলকে কোলে লইয়া পালঙ্কে নিদ্রা যাইতেছেন; উন্মুক্ত বাতায়ন-পথ দিয়া শুভ্র আকাশের শুভ্রকান্তি আসিয়া সরোজিনীর অনিন্দ্য-সুন্দর দেহে পড়িয়াছে! সে দেহ হইতে যেন রূপের তরঙ্গ ছুটিতেছে! আঁখিযুগ ঘুম-ঘোরে আচ্ছন্ন! মধুর অধর-যুগল যেন রক্তকমলের অপরিস্ফুট দলরাজি! আর চারু, সূক্ষ্ম কুন্তল-জাল প্রভাত-মৃদু-সমীরণে কম্পিত হইয়া কখনও ললাটে, কখনও ওষ্ঠে, কখনও বা রক্তিমগণ্ডে চুম্বন করিতেছে।

রাধিকামোহন সে রূপে মুগ্ধ হইলেন! পালঙ্কের আরও নিকটবর্ত্তী হইলেন; সরোজিনীর সেই সুন্দর মুখের পানে চাহিয়া দেখিলেন, সুন্দর নয়ন-প্রান্তে অশ্রুকণা! যেন প্রভাত-নলিনী-হইতে নীহারিকা-বিন্দু ঝরিতেছে! আবার একি! সে ওষ্ঠদ্বয় মধ্যে মধ্যে কম্পিত হইতেছে! তিনি মুগ্ধ এবং বিস্মিত হইলেন! আবার স্থির-নেত্রে চাহিয়া রহিলেন; বুঝিলেন, সরোজিনী নিদ্রাবস্থায় স্বপ্ন দেখিয়া কাঁদিতেছেন।

বিহঙ্গমকুলের কলরবে সরোজিনীর ঘুম ভাঙ্গিল! পালঙ্ক-পার্শ্বে স্বামীকে দেখিয়াই ধীরে ধীরে তিনি পালঙ্ক হইতে নামিলেন এবং স্বামীকে প্রণাম করিলেন। রাধিকামোহন প্রেম-ভরে সরোজিনীর রক্তিমগণ্ডে চুম্বন করিলেন; সরোজিনী জিজ্ঞাসিলেন;—"তুমি কতক্ষণ এসেছ?"

রাধিকা। এইমাত্র।

সরো। কাল সন্ধ্যাবেলা তোমার আসিবার কথা ছিল।

রাধিকা। জোয়ার-ভাঁটার দোষে রাত্রি আড়াই প্রহরের সময় ঘাটে নৌকা পৌঁছিল।

সরো। পথে তবে বড় কষ্ট হ'য়েছে?

রাধিকা। না সরোজ, এমন বিশেষ কিছুই হয় নাই।

স্বামী-স্ত্রীতে মুক্ত-বাতায়ন-সম্মুখে উপবেশন করিলেন।

সরোজিনী জিজ্ঞাসিলেন—"ঠাকুরপো কেমন আছে?"

রাধিকামোহন কলিকাতায় প্যারীমোহনকে রাখিয়া আসিতেছেন।

রাধিকামোহন প্যারীমোহনের কুশলবার্ত্তা জানাইলেন। তার পর তিনি সরোজিনীকে জিজ্ঞাসিলেন,—"তুমি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কি স্বপ্ন দেখ্‌ছিলে? কেন কাঁদ্‌ছিলে?"

সরো। কে তোমাকে ব'ল্লে?

রাধিকা। তোমার চ'খে জল দেখেই আমি বুঝেছি, তুমি স্বপ্ন দেখে কাঁদ্‌ছ। কি স্বপ্ন, আমাকে বল।

সরো। এখন না, পরে বল্‌ব, তুমি আগে সুস্থির হও।

রাধিকা। আমি এখন কিসে অস্থির আছি? তুমি বল; আমার কোন কষ্ট হয় নাই।

সরো। সে বড় দুঃস্বপ্ন,—নাই বা শুনিলে!

রাধিকা। শুনিতে আমার বড় ইচ্ছা হইতেছে! তুমি বল! হ'ক্ দুঃস্বপ্ন।

স্ত্রীলোকেরা দুঃস্বপ্ন-বৃত্তান্ত কাহাকেও বড় শুনাইতে চাহে না; সরোজিনীরও ইচ্ছা ছিল না; কিন্তু স্বামীর নির্ব্বন্ধে পড়িয়া তাঁহাকে বলিতে হইল; সরোজিনী স্বামীর মুখের পানে একবার চাহিয়া বলিতে লাগিলেন,—"অনেক রাত পর্য্যন্ত জেগে প্রায় ভোরের সময় ঘুমিয়ে প'ড়েছি! হঠাৎ স্বপ্নে দেখ্‌লুম, তোমাতে আমাতে যেন একটা মাঠের ধার দিয়ে যাচ্ছি! আমাদের দুই পাশে ধানের ক্ষেত! ক্ষেতে ধান ফ'লে র'য়েছে, যেন সোণা ফ'লে র'য়েছে! মা-লক্ষ্মী যেন দুই হাতে করিয়া স্বর্ণ-বৃষ্টি ক'রেছেন। তুমি আমার হাত ধ'রে নিয়ে যাচ্ছ! এমন কিছুদূর যেয়ে একটী সুন্দর ঘর দেখ্‌তে পেলুম! ঘরের দ্বার বন্ধ! দ্বারের দুই পাশে যেন আমরা দুইজনে বস্‌লুম্! সেখানে কেমন যে চমৎকার সুগন্ধ, তা আর কি বল্‌ব? কোথা যেন সুস্বরলহরী কাণে আস্‌ছে! চারিদিকে যেন শীতল আলোর স্রোত ব'চ্ছে! আমরা তো মুগ্ধ! কাহারও মুখে কোন কথা নাই! হঠাৎ ঘরের দ্বার খুলে গেল! ভিতর হ'তে যেন দেবী-প্রতিমা বাহিরে এলেন! আহা! তাঁর রূপ, তাঁর শোভা, আমি কি ব'লে তোমাকে বুঝিয়ে দিব? কত আলো যে তাঁকে ঘেরে র'য়েছে, কত অলঙ্কার যে তিনি প'রে র'য়েছেন, তার সংখ্যা নাই! কিন্তু তাঁর বিষণ্ণ মুখ! চক্ষু দিয়ে অশ্রুবিগলিত হচ্ছে! তিনি ক্রমশঃ ঘর থেকে বেরিয়ে যান দেখে, আমি তাঁর পায়ে জড়িয়ে ধর্‌লুম; কাতর হ'য়ে যেন বল্‌লুম,—"কোথা যাও মা?" তিনি আমার দিকে চেয়ে দেখ্‌লেন, কিছু বল্লেন না,—চল্লেন; আবার আমি তাঁর পায়ে লুটিয়ে প'ড়ে বল্‌লুম,—"আমাদিগে ছেড়ে কোথা যাও মা?" তিনি যেন কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে ব'ল্লেন,—"এখানে আর থাক্‌ব না মা, আমি যাই মা!" আমি তখনও কত কেঁদে, তাঁর পায়ে ধ'রে কত বিনয় ক'রে বল্লুম—"কেন যাবে মা? আমাদের কি অপরাধ মা?" কিন্তু তিনি আর কোন কথা কইলেন না, আর সেখানে দাঁড়া'লেন না; বরাবর চ'লে গেলেন। তিনি যত যান, সেই সব সোণার ক্ষেত তত্তই জ্ব'লে যায়! তখন আমি আশ্চর্য্য হ'য়ে দেখি, সেই ছোট ঘরটী আমাদের উপরের-তেতালার মা-লক্ষ্মীর ঘর হ'য়ে গেল! তোমাতে আমাতে যেন লক্ষ্মীহীন ঘরের সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছি! তখন দুঃখে, নৈরাশ্যে আমার বুক যেন ভেঙ্গে গেল; আমার অঙ্গ অবশ হ'য়ে এলো! মাথা ঘুরতে লাগ্‌লো! অস্থির হ'য়ে তোমার পানে চেয়ে দেখ্‌লুম, তুমি মলিন-মুখে দাঁড়িয়ে আছ! মুখে তোমার কথা নাই; এমন সময়ে হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল।"

স্বপ্ন শুনিয়া রাধিকামোহন নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন; সরোজিনী বলিলেন,—"এ বড় দুঃস্বপ্ন! অদৃষ্টে কি আছে, তা ভগবানই জানেন।"

রাধিকামোহন ধীরে ধীরে কহিলেন,—"অদৃষ্টে যা আছে, তা'ই হবে! ঈশ্বরের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।"

পালঙ্কে সরোজিনীর শিশু কাঁদিয়া উঠিল।

সরোজিনী যাইয়া শিশুকে বক্ষে তুলিয়া লইলেন। রাধিকামোহন অন্যদিকের গৃহে যাইয়া, মাকে প্রণাম করিয়া, প্যারীমোহনের সকল সংবাদ শুনাইলেন। মার সব কথা জিজ্ঞাসা শেষ হইয়া গেলে, তিনি বহির্ব্বাটীতে আসিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

সন ১২৭৬ সালে বঙ্গদেশে আসিয়া সর্ব্বনাশিনী ম্যালেরিয়া-রাক্ষসী যেরূপে "তাহার কালানল-সন্নিভ দংষ্ট্রাকরাল ভয়ানক বক্ত্রে" দুর্ব্বল বাঙ্গালীজাতিকে কবলিত করিয়াছে,

তাহা অনেকেই অবগত আছেন; এই রাক্ষসীর দুর্দ্দমনীয় প্রভাবে শত শত, সহস্র সহস্র গ্রাম একেবারে জন-মানবশূন্য হইয়া গিয়াছে! প্রতি গ্রামে, প্রতি গৃহে, অরোগী আর কেহ নাই, সকলেই রোগ-শয্যায় পড়িয়া আছে! কে কার চিকিৎসা করে! কে বা কার সেবা করে! রোগ-শয্যায় পড়িয়াই, রোগী বিনা-চিকিৎসায়, বিনা-সেবায় প্রাণত্যাগ করিল; গৃহে গৃহে শবের স্তূপ সজ্জিত হইল। কিন্তু কে সে সব শব-দেহ লইয়া শ্মশানে দাহ করিতে যায়? যাহারা অতি কষ্টে বাঁচিয়া আছে, তাহাদের উঠিবার সামর্থ্য নাই। তাহারা জীবিত থাকিয়াই শবের ন্যায় বিকৃতাকার হইয়াছে। দিনে দিনে সেই সব শবরাশি পচিয়া উঠিল! দুর্গন্ধে চারিদিক পূর্ণ হইল! সে গলিত-মেদ-মাংসে অসংখ্য ক্রিমি-কীট জন্মিল! তখন দূর-বন হইতে শৃগাল, কুক্কুর, শকুনী, গৃধিনী আসিয়া সেই শবের গলিত-মাংস তীক্ষ্ণ দংষ্ট্রায় খণ্ড খণ্ড করিতে লাগিল! সেই দুর্গন্ধময় মাংসখণ্ড সকল লইয়া ঐ সব হিংস্র বনচরেরা উন্মত্তের ন্যায় চারিদিকে ঘুরিতে লাগিল। মহাপ্রলয়ে অগ্নিমুখ দানবের বিকট চীৎকারের ন্যায় তাহাদের কর্কশ ও ভয়ানক চীৎকারে গ্রাম পরিপূর্ণ হইল। সে সময়ে কোন কোন গ্রামের অবস্থা এত ভীষণ যে, কণ্ঠাগত-প্রাণ রোগীকেও ঐ সব হিংস্র-পশু শয্যা হইতে টানিয়া আনিয়া তাহাদের ক্ষুরধার দশনে ও নখাগ্রে বিদীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে! সে দৃশ্য অতি ভীষণ, অতীব বীভৎস;—তাহা বর্ণন করে কার সাধ্য?

এই ভীষণ ম্যালেরিয়া বল্লভীতে প্রবেশ করিল। ধনী, নির্দ্ধন, স্ত্রী, পুরুষ, শিশু, যুবা, বৃদ্ধ কেহই ইহার আক্রমণ হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন না। বাঁধ ভাঙ্গিলে বন্যার জল যেমন দ্রুতবেগে গ্রামের পর গ্রাম ডুবাইয়া অগ্রসর হইতে থাকে, সূর্য্যমণ্ডল মেঘাচ্ছন্ন হইলে পৃথিবীতে ছায়া যেমন দ্রুতবেগে ছুটিয়া যায়, ম্যালেরিয়াও ঠিক সেইরূপ গ্রামের এক পার্শ্ব হইতে আরম্ভ করিয়া সজোরে গ্রামের ভিতর প্রবেশ করিতে লাগিল; আজ উত্তর পাড়া, কাল দক্ষিণ পাড়া; তার পর বামুন পাড়া, কায়েত পাড়া, বেণে পাড়া; এইরূপে সমস্ত বল্লভী গ্রামে ম্যালেরিয়া জয়-ডঙ্কা মারিয়া স্বীয় আধিপত্য স্থাপন করিল।

চারিদিকে একটা হৈ-হৈ রব পড়িয়া গিয়াছে; কেবল সামাল্, সামাল্! সহসা প্রবল ঝড় উঠিলে গাঙের মাঝে নৌকা সকল যেমন ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়ে, এও ঠিক সেইরূপ হইয়া পড়িল। কাল যাকে ভাল দেখিয়াছি, আজ সে শয্যাগত; ও-বেলা যে উঠিয়া বেড়াইয়াছিল, এ-বেলা সে শুইয়াছে; কেহ বাজার হইতে আসিয়া বাজার রাখিতে সময় পায় নাই, তাহার কম্প আসিয়াছে, 'সে লেপমুড়ি দিয়া শয়ন করিল'! কেহ স্নান করিয়া উঠিল, তাহার কম্প আসিল, সেই কম্পেই তাহাকে শয্যায় ফেলিল! কেহ আহার করিতে বসিয়াছে, সবে দুই গ্রাস মুখে দিয়াছে, থর্ থর্ করিয়া কাঁপিয়া তাহার জ্বর আসিল! ম্যালেরিয়ার ঠিক এইরূপ ব্যাপার। ইহার একটী বর্ণও অত্যুক্তি বা মিথ্যা নহে!!

গ্রামে প্রথম দুই চারিদিন আত্মীয় বা বন্ধু-বান্ধবেরা পরস্পরের খোঁজ-খবর লইল। এ উহার বাটীতে দেখিতে-শুনিতে গেল, আসিল। কিন্তু আর যায়ই বা কে, আর আসেই বা কে? তখন আর কে কার খবর রাখে? সকলেরই সমান অবস্থা!

পাঠক মহাশয়! অধিক লেখা বাহুল্য মনে করি। আপনি সহজেই বুঝিতে পারিতেছেন, বসুদের বাটীও এই ম্যালেরিয়া হইতে নিষ্কৃতি পায় নাই! বাস্তবিক পক্ষে ইহাঁদের

কেহই নিষ্কৃতি পান নাই! রাধিকামোহন, প্যারীমোহন, তাঁহার মাতা, সরোজিনী, হেমাঙ্গিনী, তাঁহার স্বামী, নিস্তারিণী, অন্যান্য দাস-দাসী সকলেই ম্যালেরিয়ার অত্যাচারে শয্যাগত! কেহ যে কাহারও মুখে একটু জল দিবে, এমন লোক নাই! হাসপাতাল অপেক্ষাও ইহাঁদের বাটীর অবস্থা শোচনীয়!

বল্লভীর আর সাড়াশব্দ মাত্র নাই! সমস্ত গ্রাম নীরব, নিস্তব্ধ! যেন মহাপ্রলয়ে বা কোন রাক্ষসীর উষ্ণ দীর্ঘশ্বাসে বা সেইরূপ কি-একটা অদ্ভুত ঘটনায় গ্রামের জীবন-দীপ নির্ব্বাপিত! গ্রামের যে সব আবাসে অনন্ত আলোকমালা ও আনন্দ-কলরব বিরাজ করিত, যে সকল স্থানে গ্রামের বালক ও যুবাগণ আসিয়া কত ক্রীড়া-কৌতুক, কত আমোদ উল্লাসে মাতিয়া থাকিত, আজ ম্যালেরিয়া-দেবীর শুভাগমনে সেই আবাসে আঁধার ও অনন্ত নীরবতা! সেই সব ক্রীড়া-ক্ষেত্র একেবারে জন-মানব-হীন! অদৃষ্টের বিপর্য্যয়ে দেবতার সুখময় নন্দন-কানন আজ পিশাচের নৃত্য-লীলা! অহো! কি দুরদৃষ্ট!

একাদশ পরিচ্ছেদ।

কিন্তু "চিরদিন কভু সমান না যায়!" অমাবস্যার মেঘাবৃত কাল-রজনী নিত্যই হইতে পারে না! দুঃখের নিশি একদিনের জন্যও পোহাইয়া থাকে! যিনি দুঃখ দিবার কর্ত্তা, তিনিই সুখ বিতরণ করেন! কে তাঁর দুর্ব্বোধ নীতি বুঝিবে বল? যাঁহার ইচ্ছায় ভীষণ বজ্র চরাচর কম্পিত করে, প্রবল বাত্যা পৃথিবীকে তুলিয়া লইয়া সাগর-গর্ভে নিক্ষেপ করে, তাঁহার ইচ্ছায় আবার নীলাকাশে সুমোহন পূর্ণচন্দ্র হাসিতে থাকেন, সুখ-স্পর্শ মৃদু মধুর সমীরণ বহিতে থাকে, কোকিল পঞ্চমে তান উঠায়, বনে কত সুন্দর কুসুম ফুটিয়া উঠে!

যাঁহার ইচ্ছায় এই যম-যন্ত্রণা, তাঁহারই ইচ্ছায় আবার সুখশান্তি ফিরিয়া আসিল! যাঁহার ইচ্ছায় ঘরে ঘরে রোগীর শয্যা সজ্জিত হইয়াছিল, তাঁহারই ইচ্ছায় আবার অনেকে নীরোগ ও শয্যা হইতে উঠিল! বল্লভীতে আরোগ্যের বিজয়-দুন্দুভি আবার বাজিল! মঙ্গলের বিজয়-নিশান আবার উড়িল! তাই বলি, কে তাঁর দুর্ব্বোধ নীতি বুঝিবে বল?

গ্রামবাসীরা অল্পে অল্পে সুস্থ হইতে লাগিল! ঠিক পূর্ব্ব-দেহ, পূর্ব্ব-স্বাস্থ্য কেহ পুনর্লাভ করিতে পারিলেন না সত্য, কিন্তু সকলেই অনেক পরিমাণে খাড়া হইয়া দাঁড়াইলেন! দারুণ ঝটিকায় যে মহীরুহ সমূলে উৎপাটিত হইতেছিল, বহু শাখা প্রশাখা নষ্ট হইয়া তাহা অনেক কষ্টে জীবিত রহিল।

বহুদিনের পর বল্লভীবাসীরা একে একে বাটীর বাহির হইলেন। পরস্পরের সহিত অতীব আনন্দে দেখা-সাক্ষাৎ করিতে লাগিলেন! পরস্পরের দেখা-সাক্ষাতের তো আশাই ছিল না! তাই আজিকার দেখা-সাক্ষাতে তাঁহাদের বড়ই আনন্দ হইল! আনন্দে নিরানন্দও মিশ্রিত ছিল! কিন্তু সে কথা আজ আমরা তুলিব না। আজ বল্লভীবাসী বন্ধু-বান্ধবেরা যেন বহুদিনের পর বহুকাল-ব্যাপিনী নিদ্রা হইতে উঠিয়া, তাহাদের অদ্ভুত স্বপ্ন-বৃত্তান্ত সকল লইয়া পরস্পর পরস্পরের সমবেদনা আকর্ষণ করিতে লাগিল!

আজ অনেক দিনের পর রাধিকামোহন বৈঠক-খানায় আসিয়া বসিয়াছেন; কয়েক জন বন্ধুবান্ধব তাঁহার সহিত দেখা-সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। কিন্তু তিনি নিশাকান্তকে দেখিতে না পাইয়া মনে কষ্ট অনুভব করিলেন—নিশিকে তিনি ভালবাসিতেন। নিশিকে ডাকিতে এক-জন লোক গেল।

নিশিকান্তও আসিতেছিল—পথের মধ্যে

লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইল; নিশিকান্ত আসিয়া রাধিকামোহন ও অন্যান্য সকলকে নমস্কার করিয়া বসিল। রাধিকামোহন তাঁহাকে কুশল-বার্ত্তা জিজ্ঞাসিলেন। নিশিকান্তও প্রায় মাসাবধি জ্বরভোগ করিয়াছে।

বৈঠকখানায় বন্ধু-বান্ধবগণের নানাবিধ সদালাপ চলিতে লাগিল।

নিশিকান্ত আজও সেই দ্বারসম্মুখে বসিয়াছে! যে দ্বার-সম্মুখে বসিয়া একদিন সে চারু-চঞ্চল-কেশী, নিবিড়-নয়ন-পল্লব-শালিনী স্থির-বিদ্যুৎ-প্রভাশোভিনী সরোজিনীকে দেখিয়া বিমুগ্ধচিত্ত হইয়াছিল, আজও বুঝি সে স্থানের মাহাত্ম্যে আবার সরোজিনীকে মনে পড়িল! তেমনই করিয়া সরোজিনীর মুখচন্দ্র আর একবার ফুটিয়া উঠিবে না? সেই দীর্ঘায়ত, সুপরিষ্কৃত, প্রভাত-শুকতারার ন্যায় স্থির চক্ষু তেমনই করিয়া আর একবার চাহিয়া দেখিবে না? নিবিড় নিতম্ব চুম্বিত সেই আলুলায়িত কুন্তলরাশি গভীর বনমাঝে ছায়ার ন্যায় আর একবার দুলিয়া উঠিবে না? সে ছায়া নিশিকান্তের পক্ষে বড় আরামপূর্ণ, বড় সুশীতল! নিশিকান্ত সে ছায়ায় নিয়ে জীবন-সমাধি করিবে!

নিশির মন চঞ্চল হইল। সে সাগ্রহ নয়নে দ্বার পানে চাহিয়া রহিল! কিন্তু প্রতি শুক্তিতেই কি মুক্তা ফলে, না—প্রতি নিশিতেই পূর্ণিমার চাঁদ উদয় হয়? আজ আর আশা মিটিল না, পিপাসার শান্তি হইল না! দারুণ বিকারের পিপাসা তো শান্ত হইবার নহে!

আজ অনেক দিনের পর নিশির হৃদয়ে নষ্ট-প্রায় স্মৃতি পুনরায় জাগিয়া উঠিল! আশার গাঙে আবার জোয়ার বহিল! শুষ্কতরু আবার মুঞ্জরিল! এ ঠিক নীলাকাশে আবার করাল কাদম্বিনী সাজিল! সিন্দূরে আবার কালিমা-সঞ্চার হইল!

স্মৃতির সমীরণ-তাড়নে নিশিকান্তের নির্ব্বাপিত হৃদয়-কুণ্ডে প্রলয়ের অগ্নি আবার গর্জ্জিয়া উঠিল! এ অগ্নি বুঝি ব্রহ্মাণ্ড দগ্ধ করিতে পারে!

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

একদিন রাত্রি এক প্রহরের সময় সরোজিনী সতৃষ্ণ-নয়নে নিম্নের পথপানে চাহিয়া বাতায়নতলে বসিয়া আছেন। বাহিরে তখন বিমল জ্যোৎস্না! চারিদিক নীরব, গম্ভীর! সম্মুখে সুন্দর সরোবর! তাহার পার্শ্ব দিয়াই পথ; পথে আজ জন-মানব নাই।

এমন অনেকক্ষণ চাহিয়া চাহিয়া সরোজিনী তাহার আশার সামগ্রী বুঝি দেখিতে পাইলেন না, তাই অতি নৈরাশ্য-ভরে মুখ ফিরাইয়া নিস্তারিণীকে কহিলেন,—"ঠাকুরঝি, আজ বুঝি কি সর্ব্বনাশই ঘটিল!"

নিস্তারিণী ছেলেকে ঘুম পাড়াইতেছিল; সে আস্তে আস্তে কহিল,—"অত উতলা হ'য়ো না বৌন্।"

সরোজিনী গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন! নিস্তারিণী আর স্থির থাকিতে পারিল না। আস্তে আস্তে শয্যা হইতে উঠিয়া সরোজিনীকে বলিল,—"আমি একবার দত্তদের বাড়ী দেখে আসি! রাধিকা রোজ সকালে তাদের বাড়ী যায়।"

নিস্তারিণী নীচে আসিয়া হেমাঙ্গিনীকে সরোজিনীর নিকট পাঠাইয়া দিল; হেমাঙ্গিনীর স্বামী রায় মহাশয়কে কাছারীতে দেখিতে পাঠাইল; নিজে দত্তদের বাটীতে চলিল।

কিন্তু সেখানে রাধিকামোহনের কোন সংবাদ পাইল না; নিস্তারিণী বড়ই ভগ্নমনে ফিরিল! আসিতে আসিতে ভাবিল,—"সরোজিনীকে আজ কি বলিয়া বুঝাইয়া রাখিব?"

ভাবিতে ভাবিতে আসিতে আসিতে নিস্তারিণী চন্দ্রকিরণে দেখিল, সরোবরের উপর বাঁধানো চত্বরে কে যেন বসিয়া আছে! কে তিনি, ঠিক ঠাওর হইতেছে না! তাই নিস্তারিণী ধীরে ধীরে চত্বরের দিকে আসিল। একটু দূর হইতে দেখিতে পাইল, রাধিকামোহনই বসিয়া আছেন। তখন একটু দ্রুত অগ্রসর হইয়া যাইয়া কহিল,—"রাধিকামোহন, সারাদিন কোথা ছিলে?"

রাধিকামোহন সে কথায় কোন উত্তর না দিয়া, ইঙ্গিতে নিস্তারিণীকে সেখান হইতে সরিয়া যাইতে বলিলেন। নিস্তারিণী বুঝিল, এখানে বুঝি অন্য কেহ আছেন! তাই সরিয়া গেল।

সেই সময়ে ঘাটের নিম্নের সোপান হইতে একটী ভদ্রলোক রাধিকামোহনের নিকট উঠিয়া আসিলেন; অনুমানে বোধ হইল, তিনি মুখ-হাত-পা ধুইতে ঘাটে নামিয়াছিলেন। সে যাহা হউক, তিনি আসিলে রাধিকামোহন তাঁহাকে বিনীতভাবে কহিলেন,—"তবে দেখিবেন মহাশয়, আপনারই উপর আমার ভরসা।"

তিনি কহিলেন—"আমার একার মতে তো কার্য্য হইবে না; তবে আমি আপনার জন্য সাধ্যমতে চেষ্টা করিব।"

রাধিকা। মহাশয় দয়া করিলেই যথেষ্ট হইবে।

তিনি। আপনিও আমার কন্যাদায়ের কথাটা স্মরণ রাখিবেন।

রাধিকা। যে আজ্ঞা।

তিনি বিদায় লইলেন।

রাধিকামোহন একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বাটীর দিকে অগ্রসর হইলেন। ফটকে ঢুকিতেছেন, দেখিলেন, হরিনাথ রায় উপস্থিত! রাধিকামোহন সাগ্রহে জিজ্ঞাসিলেন, "হরিনাথ, এমন সময়ে কোথা থেকে?"

হরিনাথ। বেশ ভাই! তোমার জন্যে আজ—যাই হ'ক, সব ভাল তো?

রাধিকামোহন একটু দুঃখের হাসি হাসিয়া, একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,—"অমনি প্রাণে প্রাণে।"

তার পর হরিনাথের সহিত দুই চারি কথা কহিয়া রাধিকামোহন উপরে গেলেন; স্বীয় কক্ষে প্রবেশ করিলেন; হেমাঙ্গিনী নামিয়া আসিল—হরিনাথ তাহাকে লইয়া ঘরে গেলেন।

সরোজিনী যেন প্রাণ পাইলেন; তাঁহার আনন্দ রাখিতে স্থান নাই! তিনি দেবতাগণের চরণে কত মানসিক করিয়াছেন! একবার সকাল হইলে হয়, তিনি দেবতার পূজা দেন।

সরোজিনী ও নিস্তারিণী রাধিকামোহনকে তাঁহার সারাদিন অনুপস্থিতির জন্য কত কথা জিজ্ঞাসিলেন, কিন্তু তিনি অন্য কথায় সব জবাব দিলেন! প্রকৃত কথা কিছুই বলিলেন না।

নিদারুণ চিন্তায় ও নিরানন্দে সারাদিনটা কাটিয়াছে! তাই সরোজিনী ও নিস্তারিণী শুইবামাত্র ঘুমাইয়া পড়িল! কিন্তু দুশ্চিন্তার অগ্নিময় কটাহ মাথায় করিয়া রাধিকামোহন সমস্ত রাত্রি জাগিয়া রহিলেন! তিনি একবারও চোখে-পাতায় করিলেন না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ পাইন।

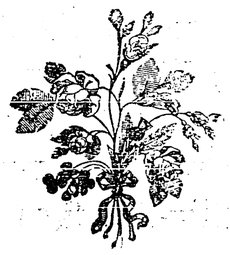

গড়মান্দারণ ও জাহানাবাদের ইতিবৃত্ত।

শ্রীশ্রীমতী মহারাজ্ঞী ভারতেশ্বরীর শাসনাধীন রাজ্য মধ্যে হুগলী জেলার অভ্যন্তরে, যে গড়মান্দারণ ও জাহানাবাদ নামে প্রাগুক্ত গ্রামদ্বয় রহিয়াছে, তন্মধ্যে জাহানাবাদ একটী স্বনামখ্যাত পরগণা ও ঐ জেলার উপবিভাগ বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই উপবিভাগ এক্ষণে তিনটী থানায় বিভক্ত আছে।

যথা (১)—জাহানাবাদ, (২) গোঘাট, (৩) খানাকুল। এই তিন থানার সমুদয় স্থান লইয়া এই বিভাগে ফৌজদারি ও দেওয়ানি যাবতীয় বিচার-কার্য্য, "গবর্ণমেণ্ট-নিয়োজিত" বিচারপতি মহোদয়গণ কর্ত্তৃক নিষ্পন্ন হয়। তন্নিবন্ধন এখানে পৃথক্ পৃথক্ দুইটী আদালত-গৃহ, একটী কারাগার, পুলিস থানা, মিউনিসিপাল, লোকেলবোর্ড, পোষ্ট আফিস ও রেজষ্টরি প্রভৃতি অনেকগুলি কার্য্যালয় এবং স্কুল স্থাপিত আছে। ইহার পশ্চিম ৬ মাইল দূরে "গড়মান্দারণ"; এই স্থান থানা গোঘাটের অন্তর্গত ও নিকটবর্ত্তী জবনাধিকার সময়ে এই মান্দারণ গ্রামে রাজস্ব-সংগ্রহ হইত। তন্নিমিত্ত ইহা 'সরকার মান্দারণ' নামে বিখ্যাত হইয়াছে।

চারি শত বৎসরের অধিক হইল;—

"যে হুসেন সাহা, সর্ব্ব উড়ীয়ার দেশ।
দেব-মূর্ত্তি দেউল ভাঙ্গিয়া কৈল শেষ॥"

ইত্যাদি শ্রীচৈতন্য-ভাগবত অন্ত্যখণ্ড।

ইতিহাসে বর্ণিত আছে, ১৩৪৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত গৌড়-বঙ্গদেশ এক প্রকার স্বাধীন পাঠান-রাজ্য ছিল। যে সময়ে সম্রাট্ হুমায়ুন এবং তৎপুত্র আকবর শা, দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করিয়া চতুর্দ্দিকে ক্ষমতা বিস্তার করিয়াছিলেন, সেই সময়ে গৌড়-নগরে "শা হুসেন" গৌড়-বঙ্গের অধীশ্বর ছিলেন। উৎকল-প্রদেশেও তাঁহার আধিপত্য ছিল। দিল্লীশ্বরের সহিত গৌড়েশ্বরের অধিক সৌহৃদ্য থাকা বশতঃ দিল্লীশ্বর গৌড়-রাজ্যের প্রতি হস্তার্পণ করেন নাই।

বিদিত আছে,—সম্রাট্ আকবরের প্রসিদ্ধ মন্ত্রী, "আবুল ফজল" আইন-ই-আকবরি নামক গ্রন্থ প্রণয়ন এবং দ্বিতীয় মন্ত্রী "রাজা তোড়ম্বল" রাজ্যের ভূমি-সংক্রান্ত নিদর্শনপত্র ও যাবতীয় হিসাব প্রস্তুত করেন। সেই সময় হইতেই রাজস্ব-সংগ্রহের সেরেস্তায় চাকলা, সরকার ও পরগণা লিখিবার রীতি ও নীতি প্রচলিত হয়।

গৌড়-বাঙ্গালায় তৎসময়ে রাজস্ব-সংগ্রহের অতীব বিশৃঙ্খলা এবং অনেক স্থান ("গয়রাবাদি") পতিত ভূমি ও জঙ্গলে পরিপূর্ণ এবং হিংস্র-জন্তুর অধিক দৌরাত্ম্য ও পথ, ঘাট অতিশয় দুর্গম ছিল। আদৌ রাজ্যের সীমা নির্দ্দিষ্ট ছিল না। গৌড় বর্দ্ধমান হইতে যে একটী রাজবর্ত্ম শ্রীক্ষেত্র ধাম পর্য্যন্ত গিয়াছে, তাহাই কেবল ১৪০৭ খৃষ্টাব্দে পাঠান-বংশীয় নবাব "গায়েশ উদ্দিন" কর্ত্তৃক প্রস্তুত ও নেড়া-দেউল নামক স্থান পর্য্যন্ত বাঙ্গালার সীমা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল।

অদ্যাপি সেই নবাবি-রাস্তার মধ্যভাগ চন্দ্রকোণার দক্ষিণ কোঙাই নদীর পরপারে নেড়া-দেউল নামে প্রসিদ্ধ গ্রাম, সরাই ও তত্রস্থানে একটী প্রস্তরনির্ম্মিত দেউলে স্থাপিত "শঙ্কর" ও একটী সুদীর্ঘ দীর্ঘিকা রহিয়াছে। ঐ শিবালয়ের চূড়া নাই, উহা নেড়া-দেউল-বিশিষ্ট—এই জন্যই ঐ স্থানের নাম নেড়া-দেউল। ঐ স্থানই বঙ্গ অর্থাৎ গৌড়-বঙ্গের শেষ ও উড়িষ্যা দেশের প্রথম সীমা; উহা মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত। দেউলের আকার, বিচিত্র; গঠন ও নির্ম্মাণ-কৌশল দেখিলেই তৎকালের স্থপতি কর্ত্তৃক প্রস্তুত বলিয়া বিবেচিত হয়।

বহুশাস্ত্র-বিশারদ "দবির খান" ও "সাকর মল্লিক" ইহাঁদের অপর নাম শ্রীরূপ ও সনাতন গোস্বামী; এই দুই মহাত্মা তৎসময়ে উক্ত হুশেন শা গৌড়পতির প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। কেহ কেহ বলেন, শ্রীরূপ ও সনাতন গোস্বামী জবন, বস্তুতঃ তাহা নহে। শ্রী-চৈতন্য-চরিতামৃত। ভক্তিরত্নাকর, সংস্কৃত-লঘুতোষণী ভক্তমাল এবং অন্যান্য ভক্তিগ্রন্থ-সমূহে দৃষ্ট হয়, তাঁহারা ভরদ্বাজগোত্র-সমুদ্ভব কর্ণাট দেশস্থ রাজবংশীয় যজুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণ ছিলেন।

সংস্কৃত বিদ্যাদি অধ্যয়ন-নিমিত্ত বঙ্গে আসিয়া প্রথমতঃ (নৈহট্ট) নৈহাটী এবং বাকলা চন্দ্রদ্বীপে অবস্থিতি ও তত্রস্থানে নানা শাস্ত্র দর্শন ও নানা বিদ্যা উপার্জ্জন করিয়া তদনন্তর গৌড়ের উত্তর "রামকেলী" নামক গ্রামে বাস নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন। পারস্য বিদ্যাতেও তাঁহাদিগের বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল।

এমন কি, এক এক সময়ে বড় বড় মোল্লা মৌলবি সাহেবদিগকে ঐ বিদ্যার বিচারে পরাভব করিতেন। গৌড়-ইতিহাসের একস্থানে নিদর্শন আছে যে, সম্রাট্ আকবর শা দিল্লি হইতে গৌড়েশ্বরকে পারস্য ভাষায় যে সকল পত্রাদি লিখিতেন; তত্তাবতের উত্তর লিখিবার কারণ, গৌড়েশ্বর বিজ্ঞ সচিবের হস্তে সমর্পণ করিতেন, কিন্তু ঐ সচিব সেই সকল পত্রের (এবারত) অর্থাৎ বর্ণনা বুঝিতে ও উত্তর লিখিতে অক্ষম হইয়া, মহাত্মা শ্রীরূপ ও সনাতন দ্বারা (গৌড়েশ্বরের অগোচরে) সে সকলের উত্তর লেখাইয়া নবাব-সন্নিধানে উপস্থিত করিলে নবাব তাহাই সম্রাট্-সমীপে প্রেরণ করিতেন।

সেই সকল পত্রের রচনা এতদূর প্রাঞ্জল ও সুমিষ্ট যে, তৎপাঠে সম্রাট্ মুগ্ধ ও সন্তুষ্ট হইয়া, একদা ধন্যবাদের সহিত লেখকদিগকে মন্ত্রিত্ব পদে নিযুক্ত করিবার জন্য নবাব সাহেবের প্রতি আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। তদনুসারেই তাঁহারা মন্ত্রিত্ব পদে অভিষিক্ত হন। তাঁহাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও নবাব খাস করিয়া তাঁহাদিগকে সম্মান-সূচক 'দবিরখান' ও 'সাকর মল্লিক' নাম দিয়া সেই নামে তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিতেন। ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে আছে;—

"সনাতন রূপ মহামন্ত্রী সর্ব্বাংশেতে।
শুনিলেন রাজা শিষ্ট-লোকের মুখেতে॥
গৌড়-রাজ জবনের অনেক অধিকার।
সনাতন রূপে আনি দিলা রাজ্যভার॥
ম্লেচ্ছভয়ে বিষয় করিলা অঙ্গীকার।
এ দুই প্রভাবে রাজ্য বৃদ্ধি হৈল তার॥"

ভক্তমাল গ্রন্থেও আছে;—

"দবির খান আর সাকের মল্লিক।
সে ভাবে দোঁহার সর্ব্ব খেতাব অধিক॥"

* * * *

কিছুদিনের পর তাঁহারা মন্ত্রিত্ব পদ ত্যাগ করিয়া শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ঔদার্য্যগুণে বৈষ্ণব-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বোক্ত সম্রাট্ আকবরের প্রধান মন্ত্রী রজঃপুতবংশীয় রাজা তোড়ম্বল রাজস্ব-সংগ্রহের সেরেস্তায় হিন্দু-স্থানে যে ব্যবস্থা প্রচার করিয়াছিলেন, শ্রীমৎ রূপ সনাতন মন্ত্রিদ্বয়ের মন্ত্রণানুসারে গৌড়পতি গৌড়-বঙ্গের রাজস্ব-সেরেস্তায় সেই ব্যবস্থা সংস্থাপন মনস্থ করিয়া উপযুক্ত কর্ম্মচারীদিগকে "জঙ্গলবুরি" ইত্যাদি পারস্য ভাষায় এক এক খানি সনন্দ অর্থাৎ ক্ষমতাপত্র প্রদান করিয়া তাঁহাদিগকে স্থানে স্থানে নিয়োগ করিয়াছিলেন।

"জঙ্গলবুরি" ইহা পারস্য শব্দ। এই শব্দের বাঙ্গালা অর্থ বনকর্ত্তন, ভূমি-আবাদ ও লোকালয়-স্থাপন ইত্যাদি। নবাব সাহেব

কর্ত্তৃক যৎসময়ে কর্ম্মচারীদিগকে সনন্দ প্রদত্ত হয়, তৎসময়ে "খাঁ জাহান" নামে এক জন বিচক্ষণ কর্ম্মচারী গৌড়ের দক্ষিণ-মধ্য বঙ্গদেশে সংস্করণ কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

তিনি—উষ্ট্র, হস্তী, অশ্ব, পাইক পদাতি ও বহুলোক এবং নানাপ্রকার খাদ্য সামগ্রী সমভিব্যাহারে গৌড় হইতে বহির্গমনপূর্ব্বক নবাব গায়েশউদ্দিনের প্রকাশ্য রাস্তায় বর্দ্ধমান ও দামোদর নদ উত্তীর্ণ হইয়া কানন মধ্যে আমোদর নদের তটে উপনীত হইয়া ঐ স্থান অতি রমণীয় বিবেচনায় তত্র স্থানে "ছাউনী" এবং লোক-লস্কর থাকিবার নিমিত্ত পট-গৃহ স্থাপন করিয়া ক্রমশঃ পাইক পদাতি ও মজুর দ্বারা সমুদয় জঙ্গল কাটাইয়া নবাব সাহেবের অর্থানুকূল্যে পরিখা অর্থাৎ চতুর্দ্দিকে গড়খাই ও গড়ের ভিতরে স্থপতিগণ কর্ত্তৃক প্রস্তর-নির্ম্মিত সুরম্য-হর্ম্ম্য এবং মসজিদ্ আদি নির্ম্মাণ করাইয়া স্থানটীকে উৎকৃষ্ট ও পরিশোভিত করণানন্তর জাবনিক ভাষায় "মন্দারণ" এই শব্দে নামকরণ করিয়াছিলেন।

তৎকালীন এই স্থানকে কেহ কেহ গৌড়-মান্দারণ ও কেহ বা ভিতর গড়মান্দারণ বলিত। এইজন্য গৌড় শব্দের অপভ্রংশেই হউক অথবা উহার উত্তর-পূর্ব্বদিকে গড় থাকাতেই হউক, "গড়মান্দারণ" বলিয়া নামকরণ হইয়াছিল। "জঙ্গল" ইহা পারস্য শব্দ, বঙ্গাভিধানে এই শব্দের অর্থ বন এবং আরব্য ও পারস্যাভিধানে জঙ্গল শব্দের অর্থ "মান্দারণ" ; যথা ;—

"মনদারণ জঙ্গল, তাছি, খাল।
মরুচা, কেল্লা, বিকা, ভাল ॥"

পূর্ব্বে এই মান্দারণেই মধ্যবঙ্গ-রাজ্যের রাজস্ব সমুদয় সংগৃহীত হইত। তজ্জন্য আজ পর্য্যন্ত ইহা 'সরকার মান্দারণ' বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই মান্দারণ গড়ের অভ্যন্তরে যে সকল মস্‌জিদ্, অট্টালিকা, বড় দরগা, ছোট দরগা নামে পীরের আস্তানা ও বৃহৎ তোরণাদি প্রস্তরে নির্ম্মিত হইয়াছিল, সে সকল ক্রমে ক্রমে ভগ্ন ও স্থানচ্যুত হইয়া এক্ষণে কেবলমাত্র সে সকলের চিহ্ন বর্ত্তমান ও প্রস্তরগুলি খণ্ড ভণ্ড অবস্থায় ইতস্ততঃ পড়িয়া আছে।

কিংবদন্তী যে, খাঁ জাহান ঐ প্রদেশ প্রকাশ করিয়া আবার নবাব সাহেবের আজ্ঞানুসারে রাজস্ব-সংগ্রহের নিমিত্ত পূর্ব্ব-বঙ্গের সীমায় গিয়াছিলেন। তাঁহার "দেওয়ান গাজী" নামে জনৈক বংশধর তৎকালে মান্দারণে অবস্থিতি করিয়া আস্তানাদি রক্ষা করিতেন। তিনি, সিদ্ধ পুরুষের ন্যায় পীর হইয়া উঠিয়াছিলেন। যে স্থানে তাঁহার সমাধি-ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছিল, সেই গোরস্থানে একটী প্রস্তরফলকে পারস্যাক্ষরে জাবনিক ভাষায় যাহা লেখা আছে, তাহার "আল্লাতালা" ভিন্ন আর কিছুই পড়া যায় না।

ফরাজি মুসলমান ব্যতীত পীরের প্রতি অন্যান্য মুসলমানদিগের যেরূপ ভক্তি আছে, আমাদিগের বাঙ্গালীদিগেরও পীরের প্রতি তদ্রূপ ভক্তি দেখা যায়। এমন কি, অনেক হিন্দুতেও পীরকে শিরণী, মৃন্ময় ঘোটক ও দীপ দান করিয়া থাকেন। সেই নিয়মানুসারেই ঐ পীরস্থানে শিরণী দিবার নিমিত্ত অনেক হিন্দুর যাতায়াত আছে। ফলতঃ এই এক কথা রাষ্ট্র আছে যে, তিনি হিন্দুদিগকে কাফের বলিতেন। একদা, হিন্দু-ধর্ম্ম নাশ করিবার নিমিত্ত হিন্দুদিগের সহিত যুদ্ধে সজ্জিত হইয়াছিলেন, সেই অধর্ম্ম বশতই নিজে হত হইয়া আপনার পাপে আপনিই নিরয়গামী হইয়াছিলেন।

মান্দারণ গড়ের উপর ও ভিতরে নানা গুল্মলতাদির বন আছে। তন্মধ্যে বট, অশ্বত্থ ও তিন্তিড়ি প্রভৃতি যে সকল বড় বড় গাছ দৃষ্ট হয়, সে গুলি সে-কালের বলিয়া বোধ হয় না। গড়ের কিঞ্চিৎ পূর্ব্ব-দক্ষিণদিকে আমোদর খালের

আবর্ত্ত ও ঐ আবর্ত্তের নিকটবর্ত্তী চতুর্দ্দিকে পরিখা-বিশিষ্ট একটী "কাজলা" নামক দীর্ঘ জলাশয় আছে। ঐ জলাশয়ের জল দেখিতে কাজলের ন্যায় অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণ, পাশে পাশে নলিনীদল আছে ; এদেশে যত প্রাচীন পুষ্করিণী আছে, তাহা প্রায় সমস্ত অগভীর ও শৈবাল-পূর্ণ ; কিন্তু এই দীর্ঘিকা অতিশয় গভীর। ইহার মধ্যজলে ছোট বড় অনেকগুলি কুম্ভীর আছে। তন্মধ্যে বৃহৎকায় ছাদারি মাদারি নামে দুইটী পোষিত কুম্ভীর ছিল ছাদারি কুম্ভীরটীকে আমরা দেখি নাই, সে বহুকাল হইল হত হইয়াছে। দুই বৎসরের পূর্ব্বে মাদারি কুম্ভীরটীকে দেখিয়াছিলাম, তাহার অসাধারণ ধর্ম্ম ও ক্ষমতা দর্শনে সকলে বিস্ময়াপন্ন হইতেন।

কেহ কোন কামনা করিয়া ইহার খাদ্যোপযোগী কপোত কি কুক্কুট অথবা হুংস লইয়া দরগায় উপস্থিত হইলে, ঐ স্থানে যে একজন ফকির নিযুক্ত আছেন, তিনি পীরকে গুড়ের শিরণী দিয়া দর্শক অথবা মানস-কর্ত্তাকে সঙ্গে লইয়া জলাশয়ের ঘাটে গিয়া উচ্চৈঃস্বরে 'মাদারি, মাদারি', বলিয়া ডাকিলেই কুম্ভীরটী তৎক্ষণাৎ জল হইতে উত্থিত হইয়া মুখ প্রসারণ পূর্ব্বক ঠিক তীরের গতিতে ঘাটের ধারে আসিয়া উপস্থিত হইত। মানসকর্ত্তা কি দর্শক অথবা ঐ ফকির মানসিক পাখীটীকে জলে নিক্ষেপ করিলে কি তীরে দাঁড়াইয়া হাতে করিয়া ধরিলে সে তৎক্ষণাৎ আদরপূর্ব্বক পাখীটীকে বদনে লইয়া জলমধ্যে নিমগ্ন হইত। দর্শক আবার তাহাকে দেখিবার ইচ্ছায় পুনঃ আহ্বান করিলে সে জল হইতে পুনরুত্থিত হইয়া এবং পাখীটীকে বদন হইতে সজীব অবস্থায় দেখাইয়া নানা কৌতুক করত দর্শকের কৌতূহল-বর্দ্ধন করিত। তাহার আকার দেখিলে অন্তঃকরণে ভয়ের সঞ্চার হইত বটে, কিন্তু সে কখন কাহারও অনিষ্টাচরণ করে নাই। তাহার ব্যবহার দেখিলেই তাহাকে অতি শান্তস্বভাব বলিয়া বোধ হইত। পরিতাপের বিষয়, কিছুদিন হইল, কুম্ভীরটী দৈব-দুর্ব্বিপাকে মারা গিয়াছে।

উপরে যে কাজলা দীঘীর উল্লেখ হইয়াছে, উহার জল কাজলের ন্যায়, তাই কাজলের অপভ্রংশে দীঘীর নাম কাজলা-দীঘী। ঐ জলাশয়ের দক্ষিণে মোহানা স্বরূপ যে একটী স্রোত আছে, ঐ স্রোতটী আমোদর-আবর্ত্তের সহিত যোগ থাকায় অন্যান্য কুম্ভীরগুলি বর্ষাকাল সমুপস্থিত হইলেই ঐ জলাশয় ত্যাগ করিয়া খালে ও দহে গিয়া বাস করে।

গড়ের অভ্যন্তরে এক এক সময় ঝঞ্ঝাবাতের ন্যায় হু হু শব্দ শুনিতে পাওয়া যায় ; পরন্তু ঐ শব্দ যে কোথা হইতে কি সূত্রে উদ্ভূত হয়, তাহা কেহ ঠিক বলিতে পারে না। ফল কথা ;—পাড়টী অত্যুচ্চ ; এমন কি, যখন গড়ের ভিতর প্রবেশ করা যায়, তখন যেন একটী গুহার মধ্যে প্রবেশ করিতেছি এবং তাহার তলস্থ ভূমি যেন বাহিরের সমতল নহে, মনে এই ভাব উদয় হয়। সেইরূপ গড়ের বহির্ভাগে যে বায়ু সঞ্চালিত হয়, সেই বায়ু গড়ের মধ্যে প্রবেশ করিলেই হুহু শব্দ হইতে থাকে, এমন বোধ হয়।

যে সময়ে খাঁ জাহান কর্ত্তৃক মান্দারণে জনপদ স্থাপিত হইয়াছিল, তিনি সেই সময়ে গৌড় হইতে কতকগুলি তন্তুবায়, সূত্রধর এবং কর্ম্মকার ও তাম্বূলী প্রভৃতি জাতিকে সঙ্গে আনিয়া মান্দারণের অন্যান্য ভাগে তাহাদের বাস নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। ঐ সকল জাতীয়েরা ক্রমান্বয়ে এই দেশে ব্যাপ্ত ও এক একটী থাক হইয়া তাহাদিগের বংশ-পরম্পরা এ পর্য্যন্ত মান্দারণ-তাঁতি, মান্দারণ-ছুতার, মান্দারণ-কর্ম্মকার ও মান্দারণ-তাম্বূলী বলিয়া জনসমাজে পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে।

পূর্ব্বেই উল্লেখ হইয়াছে যে, মোগল সম্রা-

টের প্রসিদ্ধ মন্ত্রী তোড়রমল রাজস্ব-সংগ্রহের উপায়-বিধানার্থ এক এক স্থানের আয়তন লইয়া চাকলা, সরকার ও পরগণা আখ্যা দিয়া ভিন্ন ভিন্ন থাক করিয়াছিলেন। চাকলা প্রভৃতি শব্দগুলি উর্দ্দূভাষা। এই ভাষার বাঙ্গালা অর্থ (১) প্রদেশ মধ্যে যে গ্রাম শ্রেষ্ঠ এবং যে স্থানে রাজপ্রতিনিধি থাকিতেন, সেই স্থানের নাম চাকলা; (২) যে স্থানে কোন রাজকর্ম্মচারী উপবিষ্ট হইয়া রাজকর আদায় করিতেন, সেই স্থানের নাম সরকার; (৩) যে অঞ্চলে ঐ কর আদায় হইত, সেই স্থানের নাম পরগণা।

খাঁ জাহান ঐ মান্দারণের পূর্ব্ব, উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিম এই চতুঃসীমাবর্ত্তী বহু দূরস্থিত ঝাড়ি জঙ্গল কর্ত্তন ও পতিত ভূমি সকল কর্ষণ দ্বারা অতি উর্ব্বরা করিয়া স্থানে স্থানে লোকালয়, বিপণি ও রাস্তার স্থানে স্থানে সরাই এবং পান্থশালা স্থাপন ও বড় বড় দীঘী খনন করাইয়াছিলেন। তৎকালে জাহানাবাদ ও ইহার সংলগ্ন অন্যান্য পরগণা মধ্যবঙ্গ ও বর্দ্ধমান গৌড়-দেশের অন্তর্গত বলিয়া অভিহিত হইয়াছিল।

খাঁ জাহানের অধ্যবসায়ে এই মধ্য বঙ্গের যে যে স্থানে লোকালয় ও বিপণি স্থাপন হইয়াছিল, তন্মধ্যে যে স্থান সর্ব্ব অগ্রে পত্তন ও আবাদ হয়, খাঁ জাহান সেই সেই স্থানে মুসলমান ও অন্যান্য জাতির বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়া সেই স্থান স্বকীয় নামানুসারে "জাহান" এবং নূতন আবাদ স্থান বলিয়া জাহান নামের পরেই "আবাদ" এই যুক্ত নামে "জাহানাবাদ" নাম রাখিয়া আবার ঐ নামেতেই পরগণা নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন। সেই হইতেই জাহানাবাদ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে।

খাঁ জাহানের বন্দোবস্ত সময়ে গৌড়-রাজ্য মধ্যে বর্দ্ধমান প্রধান নগর ছিল। ঐ স্থানে তৎসময়ে জনৈক রাজপ্রতিনিধি ছিলেন। তজ্জন্য বর্দ্ধমান চাকলা শব্দে ব্যবহৃত হইয়াছিল। সমস্ত রাইয়তগণ সরকার মান্দারণে রাজকর্ম্মচারীর নিকট খাজনা দিতেন এবং সেই কর্ম্মচারী সেই সংগৃহীত কর রাজপ্রতিনিধির সমীপে (বর্দ্ধমানে) প্রেরণ করিতেন।

ইতিহাসে দৃষ্ট হয়, নেড়া-দেউলের উত্তর, বর্দ্ধমানের দক্ষিণ, ভাগীরথীর পশ্চিম তীরবর্ত্তী এবং মল্লভূমির পূর্ব্ব প্রান্তের প্রদেশসমূহকে সকলে মধ্যবঙ্গ দেশ এবং বর্দ্ধমানকে গৌড়ের অন্তর্গত বলিত। এই জন্য তৎসময়ের শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সম্প্রদায়ী মহামহোপাধ্যায় আচার্য্যগণের গ্রন্থে শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর উৎকল হইতে গৌড় যাত্রাদি দেশভ্রমণে ব্যক্ত আছে;—

"নেড়া দেউল উৎকলের সীমা ছাড়াইলা।
মধ্য দেশ হয়ে প্রভু গৌড়ে প্রবেশিলা॥
খণ্ডে গিয়া প্রভু প্রিয়জন দর্শনেতে।
যে হইলা পরস্পর না পারি বর্ণিতে॥"

ভক্তিরত্নাকর তৃতীয় তরঙ্গ।

খণ্ড,—ইহা জেলা বর্দ্ধমানের অন্তঃপাতী শ্রীখণ্ড নামে প্রসিদ্ধ গ্রাম। ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থপ্রণেতা শ্রীমন্নরহরিদাস ঠাকুরের কিছু কম ২০০ শত বৎসরের পরবর্ত্তী মহাকবি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরও বিদ্যাসুন্দরে লিখিয়াছেন;—

"দেখি পুরী বর্দ্ধমান, সুন্দর চৌদিকে চান,
ধন্য গৌড় যে দেশে এ দেশ।
রাজা বড় ভাগ্যধর, কাছে নদ দামোদর,
ভাল বটে, জানিনু বিশেষ॥"

আবার অন্য স্থানেও বলিয়াছেন;—

"কি জানি হারায় বিদ্যা, হাসিবেক গৌড়॥"

আরও বলিয়াছেন;—

"সে যদি আসিত বঙ্গে, লস্কর আসিত সঙ্গে,
হাটের দুয়ারে কি কপাট।"

এই সমস্ত প্রমাণে সুস্পষ্ট উপলব্ধ হয় যে, বর্দ্ধমান গৌড়ের অন্তর্গত আর জাহানাবাদ ইত্যাদি ও ইহার অঙ্গভুক্ত অন্যান্য পরগণা বাস্তবিক মধ্য দেশের অন্তর্গত। জাহানাবাদ পরগণা পরিসরে কম নহে। থানা জাহানাবাদ, থানা গোঘাটের অধীন সমুদয় গ্রাম, থানা খানাকুল ও থানা হরিপালের অধীন কতকগুলি গ্রাম এই পরগণার সীমাভুক্ত। ইহার ব্যাপকতা পূর্ব্ব-পশ্চিম দীর্ঘ ৪৬ মাইল ও উত্তর-দক্ষিণে ২০ মাইল।

এই পরগণার ভূমি সকল অতি উর্ব্বরা, যত্ন-পূর্ব্বক আবাদ করিলে ফল ও শস্য উত্তমরূপে উৎপন্ন হয়। ধান্য এবং রবিখন্দ, গোধূম, যব, মসুর, খাঁসারি, মটর, মুগ, সর্ষপ, তিল, পাট, তামাক, ইক্ষু, আলু এবং ব্যঞ্জনের যোগ্য অন্যান্য শাক সবজী ও ফল-মূল উত্তম জন্মে। স্থানে স্থানে আম্র ও পনসাদির বাগ-বাগিচাও আছে। এই পরগণার মধ্যে যে কয়টী নদ-নদী প্রবাহিত হইতেছে, তন্মধ্যে দামোদর ও দ্বারকেশ্বর নদ সর্ব্বপ্রধান।

এই পরগণায় ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, রজঃপুত, বৈদ্য, সদ্গোপ, গোপ, তেলী, তাম্বূলী, কামার, কুমার, গন্ধ-বণিক, সুবর্ণ-বণিক, তাঁতি, মুসলমান, বাগ্দি, ডোম, চাঁড়াল, কেওরা, প্রভৃতি নানা জাতির বাস আছে। তাহাদিগের মধ্যে অধিকাংশ লোক ব্যবসা বাণিজ্য, চাকরি এবং কৃষিকার্য্য দ্বারা দিন গুজরান করে। পূর্ব্ব হইতেই জাহানাবাদ একটী থাক-বিশিষ্ট স্থান বলিয়াই তামলী জাতি প্রভৃতি যাহারা অন্যত্র গিয়া বাস করিতেছে, তাহাদের বংশীয়গণ জনসাধারণ ও কুটুম্ব-সমাজে জাহানাবাদের তাম্বূলী বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন।

এখনও কোন কোন গৃহস্থের ঘরে যে সকল পূর্ব্বকার নবাবি সনন্দ এবং বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্র-অধিরাজ বাহাদুরের প্রদত্ত আমল নামাদি প্রাচীন দলিল আছে, সে সকলের প্রস্তাবনা এবং বৈষয়িক কারবারে মহাজনদিগের খাতার ফিরিস্তি ইত্যাদি দেখিলেই সুস্পষ্ট উপলব্ধি হয় যে, তখনকার নবাবি আমল হইতেই কি সনন্দ, কি পাট্টা, কি তায়তাদ, কি অন্যান্য দলিল, কি খাতা; যাবতীয় বিষয়ে 'সরকার মান্দারণ পরগণে জাহানাবাদ' বলিয়া লিখিবার রীতি ছিল ও এখনও সেই রীতি আছে।

গৌড় বাদসার আমলেও তাঁহার সাম্রাজ্যভুক্ত এই বঙ্গ-ভূমিতে অনেক গুলি চাকলা, সরকার ও পরগণা স্থাপিত হইয়াছিল। তৎকালে অনেকেই রাজানুগ্রহে জায়গীর ও নিষ্কর স্বরূপ জমি ভোগ করিয়া সংসার নির্ব্বাহ করিতেন। এখন সে অনুগ্রহ নাই।

মান্দারণের অনতিদূর পূর্ব্ব এক ক্রোশ ব্যবধান "সানবাদি" নামক গ্রামে প্রস্তরের খিলানযুক্ত একটী প্রকাণ্ড সিংহদ্বার ও তাহার উত্তর দুই ক্রোশ ব্যবধান "তেজুয়া" ও "মদিনা" নামক গ্রামে ইষ্টক ও প্রস্তর-নির্ম্মিত মস্‌জিদ্ ও স্থানে স্থানে ভগ্ন পাকা বাড়ীর চিহ্ন আছে। ঐ তোরণ ও মস্‌জিদের গঠনের অবস্থা দেখিলেই পূর্ব্বকালে কোন মহাবল পরাক্রান্ত প্রতিভাশালী ব্যক্তি-কর্ত্তৃক স্থপতি দ্বারা ঐ সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল বলিয়া বিবেচনা হয়। কেননা ওরূপ ধরণের নির্ম্মাণ কৌশল, বিচিত্র গঠন, এখনকার রাজ-মিস্ত্রীদিগের হইতে সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই। ঐ সকলের জমাট ও গাঁথনি অতি অদ্ভুত। ঐ সময়ের প্রাচীন কীর্ত্তি সকল নিরীক্ষণ করিলে তৎকালীন বাঙ্গালার ঐশ্বর্য্য ও শিল্পনৈপুণ্যের বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়। বাস্তবিক, তখন এতদ্দেশে স্থাপত্য বিদ্যার অশ্চর্য্যরূপ উন্নতি হইয়াছিল।

ঐ তোরণের ও মস্‌জিদের উপরিভাগে

ইট ও পাথরের গাঁথনি মধ্যে চতুষ্কোণ বিশিষ্ট এক এক কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তর-খণ্ডের উপর ক্ষোদিত পারস্য ও আরব্য অক্ষরে যাহা লেখা আছে, সে সকল অক্ষর-যোজনা বা পাঠ মিলান অতি দুঃসাধ্য। যেহেতু আমাদিগের তাদৃশ বিদ্যাবুদ্ধি ও ঐ ভাষায় বিশেষ বুৎপত্তি নাই। আমরা এক প্রকার পল্লবগ্রাহী-মাত্র। কষ্টে-সৃষ্টে যা কিঞ্চিৎ পাঠ করিয়াছি, তদ্দ্বারা জানিয়াছি যে, মস্‌জিদের উপর প্রস্তর-খণ্ডের লেখা গুলিতে মুসলমানদিগের "কোরাণ" গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত "লা এলাহি ইল্লা" ইত্যাদি "মহম্মদীয়" ঈশ্বরের স্তোত্র পাঠ লিখিত আছে।

বস্তুতঃ ঐ মস্‌জিদ্ ও সিংহদ্বার যে কোন্ সময়ে কোন্ ব্যক্তি কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও সংস্থাপিত হইয়াছিল, অবশ্যই ঐ লেখার ভিতর তাহার নাম থাকিবার সম্ভব; কিন্তু ঐ বিদ্যায় যাঁহাদের বিশেষ ব্যুৎপত্তি আছে, তাঁহাদিগের ব্যতীত অপরে জানিবার উপায় নাই। তোরণ-দ্বার অবস্থা দৃষ্টে উহা মান্দারণ বহির্দুর্গের দ্বার বলিয়াই বিবেচিত হয়। বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি এবং অনেকেই বলেন যে, ঐ দ্বার-দেশের লেখা-গুলির ভিতরে;—

"তীর ভোর বিঘা, কুলাভোর সাঁজা"

তৎসময়ের চাষ্যভূমি ও রাজকরের পরিমাণ মাত্র লেখা আছে। সুতরাং সে কথা অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। কেন হয় না? তখনকার কালে জমি-জমা সম্বন্ধে প্রজার উপর জমিদার-দিগের বড় একটা অত্যাচার ছিল না। শুভঙ্করী নিয়ম-মতে ৪ হাতের কাঠায় ২০ কাঠাতে ১ এক বিঘা বলিয়া জমির পরিমাণ ছিল, এখন আবার তাহা খণ্ডন হইয়া ইংরাজী দুই গজে কাঠার পরিমাণ হইয়াছে। জমা বৃদ্ধির ত কথাই নাই, উহা আবার বর্ষে বর্ষে পরিবর্ত্তন হইতেছে। ছলে, বলে, কল কৌশলে, ইস্তমুরারি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ও লাখরাজের অপবাত মৃত্যু হইতেছে। সর্ব্বপ্রকার জমির উপর রোডসেস্ পবলিকওয়ার্ক-সেস্ করের প্রভুত্ব বাড়িয়াছে। অন্যান্য করদায়েও প্রজাগণ প্রপীড়িত।

সময়ে সময়ে অনাবৃষ্টি-নিবন্ধন প্রজাদিগকে মাথায় হাত দিয়া কাঁদিতে হয়। দারুণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে "হা অন্ন, যো অন্ন" বলিয়া কঙ্কালদেহ ধারণ করিয়া নগরে নগরে ভিক্ষার জন্য বেড়াইতে হয়। তখনকার কালে প্রায় এ সকল নিয়ম ছিল না। তখনকার নৃপতিগণ শস্যরক্ষার নিমিত্ত স্থানে স্থানে বড় বড় দীঘী কাটাইতেন, সেই সকল দীঘীতে সর্ব্বদা জল পরিপূর্ণ থাকিত এবং অনাবৃষ্টি-নিবন্ধন ফসল বিনাশের সম্ভাবনা হইলে সেই সকল দীঘীর মোহান খুলিয়া দিলেই অনায়াসে ক্ষেত্রসমূহ জলপ্লুত হইত। হায়! এখন সেই সকল দীঘী কাল-প্রবাহে, পঙ্কে মজিয়া রহিয়াছে। সে সকল উদ্ধার করিলে প্রজার উপকার হইতে পারে, কিন্তু উদ্ধারের নিমিত্ত রাজার আদৌ দৃষ্টি নাই।

"তীর-ভোর বিঘা কুলাভোর সাঁজা" এই কথার অর্থ এই যে, এক ব্যক্তি এক স্থানে একটী ধনু হস্তে দাঁড়াইয়া ঐ ধনুকের গুণে একটী পক্ষ বিশিষ্ট শর যোজনাপূর্ব্বক বাম হস্তে ঐ ধনু ধরিয়া এবং দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলি দ্বারা আকর্ণ পর্য্যন্ত গুণ টানিয়া ঐ শর ক্ষেপণ করিলে, শরটী যে স্থানে পতিত হউক না, সেই পতিত স্থান শরচালকের দাঁড়াইবার স্থান হইতে তাহারই দীর্ঘ, প্রস্থ লইলে জমির পরিমাণ ১/০ বিঘা ও সেই জমিনে (প্রজার পরিশ্রমে) যে কোন শস্য উৎপন্ন হইত, প্রজা রাজকর স্বরূপ রাজাকে এক কুলা অর্থাৎ এক সূর্প পরিমিত শস্য প্রদান করিত এবং রাজা সাদরে তাহাই গ্রহণ করিতেন। এইরূপ নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া পূর্ব্বকার নৃপতিগণ রাজ্যরক্ষা করিয়া গিয়াছেন। ভারতে কথিত আছে;—

"সুখেন লভ্যা দধতঃ কৃষীবলৈ-
রকৃষ্টপচ্যা ইব শস্যসম্পদঃ
বিতন্বতি ক্ষেমমদেবমাতৃকাঃ
চিরায় তস্মিন্ কুবরশ্চকাশতে॥"

তখনকার সম্রাটদিগের ভূরি-পরিমাণে ঐ সমস্ত গুণ বর্ত্তমান ছিল। তাঁহারা প্রজারঞ্জক ছিলেন, প্রজার নিকট সামান্য মাত্র কর গ্রহণ করিয়াই রাজ্য রক্ষা ও স্থানে স্থানে জলাশয় প্রতিষ্ঠা করিতেন। বার্ষিক নিয়মিত কর ব্যতীত অন্য কিছু কর গ্রহণ করিতেন না। এখন দেহি দেহি পুনঃপুনতেও রাজা, জমিদার সন্তুষ্ট নহেন। সে-কালের সহিত এ-কালের তুলনা করিয়া দেখিলে, যুগপৎ হর্ষ বিষাদে পরিপূর্ণ হইতে হয়।

১৫৯৫ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে (সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময়ে) রাজা মানসিংহ যখন বাঙ্গালায় প্রবেশ ও যশোহর রাজা প্রতাপআদিত্যকে যুদ্ধে হত ও তাহার মৃতদেহ পিঞ্জরাবদ্ধ করত দক্ষিণাভিমুখে পূর্ব্বোল্লিখিত নবাবি রাস্তায় সৈন্য সামন্ত লইয়া শ্রীক্ষেত্র গমন করেন, তখন তিনি গৌড়-বঙ্গের শেষ সীমা পূর্ব্বোক্ত নেড়া-দেউল দেখিয়াছিলেন; তাহা ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর দেশ-বর্ণনায় লিখিয়াছেন। যথা;—

"আজিলা মোগলমারি উচালন দিয়া।
ক্রমে ক্রমে অনেক সরাই এড়াইয়া॥
মল্লভূমি কর্ণগড় দক্ষিণে রাখিয়া।
বাঙ্গালার সীমা নেড়া-দেউল দেখিয়া॥"

মল্ল-ভূম, বিষ্ণুপুর ও কর্ণগড়, ব্রাহ্মণ-ভূম পরগণা-ভুক্ত। রায় গুণাকর ঐ নবাবি রাস্তার পার্শ্বভাগে যে যে গ্রাম ও সরাইয়ের উল্লেখ করিয়াছেন, সে-গুলি সকলই সত্য। সে সমুদয় আমাদেরই এ দেশের নিকটস্থ এবং এ পর্য্যন্ত সে সকলের পূর্ব্ব নামই আছে। ঐ রাস্তার পার্শ্বেই মান্দারণ গ্রাম। পূর্ব্বকালে ঐ স্থানে সরাই ছিল না। বোধ হয়, কবিবর তজ্জন্যই ঐ স্থানের নামোল্লেখ করেন নাই। বিশেষতঃ মান্দারণে জবনের বাসই অধিক ছিল, মধ্যে মধ্যে তাহাদিগের অত্যাচার-জনিত গো-হত্যা হইত; এজন্য হিন্দু সাধুশীল, ব্যক্তিগণ গ্রামে প্রবেশ করা দূরে থাকুক, আদৌ স্থান মাড়াইতেন না।

মান্দারণের উত্তর এক মাইল ব্যবধান কামারপুকুর নামক গ্রামে আমার জন্মভূমি। "রামকৃষ্ণ পরমহংস" যাঁহার আদি নাম শ্রীগদাধর বন্দ্যোপাধ্যায়, সেই মহাত্মা এই গ্রামেই জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। বাল্যকালে তাঁহার সহ একত্রেই ক্রীড়া-কৌতুক করিতাম। এই গ্রামের প্রান্তভাগে অর্থাৎ ঐ রাস্তার ধারে যে সরাই আছে, তাহা 'নূতন চটি' বলিয়া প্রসিদ্ধ।

রাজা মানসিংহ বাঙ্গালা ও উড়িষ্যা হইতে দিল্লী গমন করিবার কিছুদিন পরেই তৎপুত্র জগৎসিংহ পাঠানদিগের হস্তে পতিত হইয়াছিলেন। স্বর্গীয় ৺ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গড় মান্দারণ ও জগৎসিংহের সমর-বৃত্তান্তের কিঞ্চিৎ মাত্র অংশ "দুর্গেশনন্দিনী" উপন্যাস মধ্যে সন্নিবেশ করিয়াছেন।

কিন্তু প্রকৃষ্টরূপ অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছি, তিনি যে শৈলেশ্বর লিঙ্গের কথা উল্লেখ করিয়াছেন,—কৈ, তাহা ত মান্দারণের মধ্যে নাই? ঐ স্থানের উত্তর কাঁটালি নামক গ্রামে (কলিকাতা হইতে পশ্চিম মুখে যে রাস্তা ভদ্রাট নাগপুর পর্য্যন্ত গিয়াছে), সেই রাস্তার নিকট যে শৈলেশ্বর নামে শিব আছেন, তাহার ইষ্টক-নির্ম্মিত মন্দিরটী সে-কালের নহে, ৪০ কি ৫০ বৎসর হইবে—গ্রামের লোকের

সাহায্যে ঐ শিব-স্থাপন ও মন্দির নির্ম্মাণ হইয়াছে। আর গড়ের উত্তর বহির্ভাগে "অগৃহীর ন্যায়" যে একটী শিবলিঙ্গ প্রোথিত আছে, তাহার মন্দির অথবা পূর্ব্বেও যে মন্দির ছিল, তাহারও কিছুমাত্র চিহ্ন নাই এবং নিকটে কোন সরোবরও নাই।

যদি ঐ শিব গৌড়-বঙ্গাধিপের স্থাপিত বলিয়া স্বীকার করি, তাহা হইলে প্রাচীন ইতিহাসের লেখা মিথ্যা হয়। সুতরাং আমার এই কথাতে অনেকে বলিতে এবং সংশয় করিতে পারেন, তবে কি বঙ্কিম বাবুর ঐ কথা স্ব-কপোল-কল্পিত? না, তা নয়।—পূজ্যপাদ বঙ্কিম বাবু মিথ্যা লিখিবার পাত্র নহেন, তিনি বাগ্‌বাদিনীর বরপুত্র, তাঁহার লেখনী-মুখ হইতে যাহা উদ্গীরণ হইয়াছে, তাহাকে কেমন করিয়া মিথ্যা বলিব? শ্রীধর্ম্ম-মঙ্গল গৌড়কাব্য-রচয়িতা স্বর্গীয় "খেলারাম" (ইনি ঘনরাম নহেন) ঘনরাম প্রণীত ধর্ম্ম-মঙ্গলের পূর্ব্বে যে একখানি ধর্ম্ম-মঙ্গল নামে গৌড়-কাব্য লিখিয়াছেন, তাহাতে ময়নার গড় হইতে (এই ময়নার গড় মেদিনী-পুর জেলার অন্তর্গত) ধর্ম্মপুত্র লাউসেন যখন গৌড়-যাত্রা করেন, তখন ধর্ম্মরাজ স্বপ্নে উপদেশ দিয়া যাহা বলিয়াছিলেন, কবিবর তাহাই বর্ণন করিয়াছেন। কবিবরের সেই বর্ণনা যে কতদূর সুমিষ্ট ও সুমধুর পাঠক মহোদয়গণ তাহা অনুভব করিবেন। তিনি শৈলেশ্বর শিব সম্বন্ধে এই মত লিখিয়াছেন;—

"স্থিত শৈলেশ্বর শিব বঙ্গের অঞ্চলে।
সুরম্য সরসী এক তার মাঝে ঝলে॥
কমল কুমুদ আদি নানা ফুল দল।
বিকাশিয়া ভুষে তার নীল উরঃস্থল॥
শুন বাছা লাউসেন বলি রে তোমায়।
এওজাৎ দিও, নেড়া-দেউল তলায়॥"

ইত্যাদি।

(অঞ্চল শব্দ) দেশের সীমা বিশিষ্ট স্থান। (এওজাৎ) এও শব্দে সাধ্বী স্ত্রী, জাৎ শব্দে উৎসব। তলা শব্দে, দেবতাস্থান। যাত্রা প্রভৃতি শুভ-কার্য্যাদিকালে সে-কালে অনেকেই দেবতাস্থানে সধবা স্ত্রীলোকদিগকে আহ্বান করিয়া গুবাক, নারিকেল, রম্ভা, পান এবং তৈল সিন্দুর প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাদিগের পূজা ও মঙ্গলাচরণ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া যাত্রা করিতেন। তাহারই নাম এওজাৎ; এখনও সেই রীতি অর্থাৎ এওজাৎ পদ্ধতি এতদ্দেশে প্রচলিত আছে।

মান্দারণের দক্ষিণ ৯ ক্রোশ ব্যবধানে বঙ্গের শেষ সীমা নেড়া-দেউল। ঐ স্থানে একটী সুদীর্ঘ সরোবর-সন্নিধানে যে অত্যুচ্চ প্রস্তর-নির্ম্মিত প্রাসাদ মধ্যে শ্রীশ্রী মহাদেব (লিঙ্গ-মূর্ত্তি) স্থাপিত আছেন, তাহা গৌড়-কীর্ত্তি বলিয়া অনেকে সেই গৌড়পতির গুণ কীর্ত্তন করেন। ঐ প্রাসাদের সম্মুখ দরজার উপরি-ভাগে একখানি প্রস্তরে দেবনাগরাক্ষরে যে খোদাই করা একটী কবিতা আছে, তাহা অস্ফুট। ঐ শিব যে কাহার স্থাপিত, তাহা নির্ণয় হইতে পারে না। ফলতঃ ইতিহাসে যে একটী সংস্কৃত কবিতা আছে, তাহা এই;—

"দুর্ব্বারারিবরূথিনীপ্রমথনে
দানে চ বিদ্যাধরৈঃ
সানন্দং হৃদি যস্য মার্গণগুণ-
গ্রামো গণৈর্গীয়তে।
কাম্বোজান্বয়জেন গৌড়পতিনা
তেনেন্দুমৌলেরয়ং
প্রাসাদো নিরমায়ি "কুঞ্জরঘটা"
বর্ষেণ ভূভূষণ॥"

ঐ শিবের আদি নাম শৈলেশ্বর, এক্ষণে কেহ কেহ কামেশ্বর বলেন। ধর্ম্মপুত্র লাউসেন যে এওজাৎ দিয়াছিলেন, তদনুসারে এখনও ঐ দেব-স্থানে এওজাৎ হয়। গৌড়কাব্য-রচয়িতা

খেলারাম যে কোন্ বংশে জন্মগ্রহণ ও কোন্ স্থানে বসিয়া ঐ কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, তাহা সবিশেষ জানিবার উপায় নাই।

এই বদনগঞ্জ গ্রামের সন্নিহিত শ্যাম-বাজার নামক গ্রামে তারাচাঁদ মালী নামে এক অন্ধ ব্যক্তি ঐ কাব্যের ৪। ৫ পালা গীত অভ্যাস করিয়া নানাস্থানে ধর্ম্মমঙ্গল গান করিয়া দিনপাত করিত। কিছুকাল হইল, গৃহদাহে তাহার মৃত্যু হইয়াছে। এখন আর সে গ্রন্থখানি তাহার বাটীতে নাই। ঐ স্থানের জনৈক ধীবর জাতিই ধর্ম্মপণ্ডিতের বাটীতে তাহাদিগের কুলদেবতা শ্রীশ্রী৺ দলুরায় ধর্ম্মের খট্টার উপর পূজার আসনে বস্ত্রাবরণে রজ্জু-বন্ধনের মধ্যে যে একটী গ্রন্থ আছে, পণ্ডিতের পূর্ব্বপুরুষগণ ঐ গ্রন্থের ডোর খুলিবার পক্ষে নিষেধ আজ্ঞা করায় সেই কুসংস্কার বশতঃ চেলখণ্ডে ডোর-বন্ধনে ছিল। আমি অনেক অনুনয় বিনয় দ্বারা গ্রন্থখানি খুলিলে যে পাপ হইবে, সেই পাপ স্কন্ধে লইব, ইহাই স্বীকার করিয়া গ্রন্থ-ডোর উন্মোচন করিয়া দেখিয়াছি; কাব্যখানি পূর্ব্বকালের তুলট-ছাঁচের কাগজে বঙ্গাক্ষরে পরিষ্কার পয়ারে লিখিত। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, খট্টার উপরে যে স্থানে ৺ দলুরায়ের পূজা হয়, তাহারই নীচে গ্রন্থখানি থাকাতে ফুল-জল চন্দনে আর্দ্র হইয়া পরস্পর পত্র জমাট হইয়া শেষের প্রায় বিস্তর পত্র একেবারে নষ্ট হইয়াছে; উহা উদ্ধার হইবার উপায় নাই। পুস্তকে দেব-দেবী-বন্দনায় কবিবর আত্ম-পরিচয় সম্বন্ধে এই মাত্র লিখিয়াছেন;—

"ভুবন শকে বায়ু মাস শরের বাহন।
খেলারাম করিলেন গ্রন্থ আরম্ভণ॥
হে ধর্ম্ম এ দাসের পুরাও মনস্কাম।
গৌড়কাব্য প্রকাশিতে বাঞ্ছে খেলারাম॥
তোমার কৃপায় যদি গ্রন্থ পূর্ণ হয়।
অষ্টমঙ্গলায় দিব আত্ম-পরিচয়॥"

ধর্ম্মমঙ্গল, সূত্রখণ্ড, গৌড়-কাব্য।

এতদ্দ্বারা সুস্পষ্ট উপলব্ধ হইতেছে যে, গ্রন্থখানি ৮ পালা গীতে সম্পূর্ণ ও ১৪৪৯ শকের পৌষমাসে আরম্ভ হইয়াছিল। আহা! কবি-বরের কাব্য-খানি অতি অলৌকিক রসভাব-সমন্বিত। ইহাতে গৌড় বৃত্তান্ত অনেক আছে। ইহা সাহিত্য-সংসারের আদর্শ। অষ্টমঙ্গলা প্রভৃতি শেষের পদ গুলি নষ্ট হওয়া বশতঃ কবির পরিচয় প্রকাশ করিতে সুতরাং অসমর্থ হইলাম। পরন্তু, অনুসন্ধানে আছি, যদি গ্রন্থ-খানি সমুদয় সংগ্রহ হইয়া উঠে; ঘনরাম-প্রণীত ধর্ম্মমঙ্গল যেরূপ সাহিত্যজগতে প্রকাশিত হইয়াছে, কবিবরের এই অপূর্ব্ব কাব্যখানিও সাধারণের দৃষ্টিগোচর নিমিত্ত মুদ্রা-যন্ত্রের সাহায্যে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

এক্ষণে মান্দারণে যে কয়েক-ঘর মুসলমানের বাস আছে, তাঁহারা ঐ স্থানের আদিম বাসিন্দা বলিয়া পরিচয় দেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করিলে আদি বৃত্তান্ত কিছুই বলিতে পারেন না। আবার যাঁহাদিগের ইতিহাসের দিকে কম দৃষ্টি, তাঁহারা মন্দারণের বিষয় যে নানা কথা বলেন, তাহা বিশ্বাস্য নহে। উপরেই বলা হইয়াছে যে, প্রাচীনেরা এবং ইতিহাস যাহা বলেন, তাহাই সত্য। এবং তাহাই গ্রাহ্য। মান্দারণের প্রাচীন কীর্ত্তি-গুলি যে কারণে ধ্বংস হইয়াছে, তাহার প্রকৃত কারণ এই;—

"শাকে আগে মাতৃকা যোগিনীগণ শেষে।
বরগীর বিভ্রাট হইবে এই দেশে॥"

মাতৃকা ১৬, যোগিনী ৬৪; "অঙ্কস্য বামা গতিঃ" ভারতচন্দ্রের এই লেখনীর ভঙ্গীতে ১৬৬৪ শকাব্দে এই বঙ্গদেশে বরগীর হাঙ্গামা হয়। বরগীরা মহারাষ্ট্রীয় অর্থাৎ মারহাট্টা দেশের লোক শৈব-হিন্দু। সে-কালের লোক ত্রৈলিঙ্গ

শব্দের অপভ্রংশে ইহাদিগকে তেলগা বলিত। রাজ্য-লোভ এবং দস্যুতা তাহাদিগের প্রধান বৃত্তি ছিল। তাহারা রাজ্য ও অর্থ-লোলুপ হইয়া বহুসংখ্যক দলে বলে এই বঙ্গদেশ আক্রমণ করিয়া প্রজাবর্গের যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিত।

মুসলমানদিগের প্রতি তাহাদের বিদ্বেষ-ভাব ছিল। খাঁ সাহেবের স্থাপিত ঐ মান্দারণে তখন অনেক গুলি ষোড়াপন্ন আয়মাদার মুসলমান ছিলেন। বরগীরা প্রথমতঃ উড়িষ্যা হইতে পূর্ব্বোলিখিত নবাবি রাস্তায় বঙ্গে আসিয়া মান্দারণ গড়ে উপস্থিত হয় এবং আমোদর নদের উভয়-তীরে ছাউনী ও শিবির স্থাপন করে। বৈরতা নিবন্ধন ঐ সম্পত্তিশালী মুসলমানদিগের প্রতি ঘোরতর অত্যাচার এবং বলপূর্ব্বক তাহাদিগের যথা-সর্ব্বস্ব লুঠ করিয়া তাহাদিগের ঘর-দ্বার ও মসজিদ্ আদি ভাঙ্গিয়া দেয়। সেই সময়ে ঐ স্থানের অনেক মুসলমান ও অন্যান্য জাতি স্থান-ভ্রষ্ট হইয়া প্রাণভয়ে পলায়ন ও অন্যত্র গিয়া বাস করিয়াছিল।

বরগীরা এই স্থানে কিছুদিন থাকিয়া পশ্চাৎ ভাগীরথীর পশ্চিমতীরবর্ত্তী প্রদেশ অধিকার করে। পরিশেষে মল্লবংশাবতংশ বিষ্ণুপুরাধিপতি ৺ রাজা গোপালসিংহ দেব বাহাদুরের আদেশক্রমে তাঁহার সৈন্য সামন্ত কর্ত্তৃক ঘোরতর যুদ্ধের পর বরগীরা বঙ্গদেশ হইতে বিতাড়িত হয়। প্রবাদ আছে ;—

বিষ্ণুপুর রাজধানীর গড়ের ভিতর যে একটী প্রকাণ্ড লৌহময় "আগ্নেয় অস্ত্র" অর্থাৎ অটল কামান বনের মধ্যে পতিত আছে, এমন কি, ভারতবর্ষে যাহার যোড়া নাই এবং যাহার শব্দে গর্ভিণীর গর্ভপাত হয়, সেই কামান দ্বারা ঐ বরগীর হাঙ্গামার সময় বিষ্ণুপুরের কুলদেবতা যিনি এক্ষণে কলিকাতার বাগবাজারে বিরাজ করিতেছেন, "শ্রীশ্রীমদনমোহন জাউ"—গোলাক্ষেপণ করিয়া বহুশত বরগীর প্রাণ বিনষ্ট করিয়াছিলেন।

সে আজ ২৫০ বৎসরের কথা। সেই বরগীর হাঙ্গামায় খাঁ জাহানের যাবতীয় মান্দারণের কীর্ত্তি বরগী কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইয়াছে। তৎসময়ে এতৎস্থানের জনৈক কবি বিলাপযুক্ত একটী ছড়া অর্থাৎ পাঁচালির ছন্দে কবিতা লিখিয়াছিলেন, (তাহা ঠিক সেই সময়ের লিখিত) ৬ পাত পুঁথি আছে। বাহুল্যহেতু তাহার সমগ্র না লিখিয়া পাঠকগণের কৌতূহল বর্দ্ধনের নিমিত্ত কিছু লিখিতেছি, যথা ;—

(নাগরা তালের ছন্দ।)

"শুন সবে, একভাবে, আশ্চর্য্য কাহিনী।
আচম্বিতে, সহরেতে, তেলগা নাম শুনি।
"বলে সবে বর্গী এল ? (২) সব লুটিল,
ভাঙ্গিল ঘর বাড়ী।
ঊর্দ্ধশ্বাসে, পলায় ত্রাসে, দোকানি পসারি।
"বলে আর রক্ষা নাই ! (২) কোথা যাই,
কি করি বল না।
বর্গীগণে, মান্দারণে, করিয়াছে থানা॥
"তাদের লোক-লস্কর ! (২) যেন তস্কর,
ফিচ্চে ঘরে ঘরে।
যা পাচ্চে, তা নিচ্চে, কেবা বারণ করে।
ঘরে কি মানুষ আছে ! (২) সব গিয়াছে,
গড় বিষ্ণুপুরে।
বর্গীর, অত্যাচার, জানাতে রাজারে॥"
ইত্যাদি।

জেলা মুর্শিদাবাদের উত্তর মালদহ জেলার অন্তর্গত রামকেলী গ্রামের দক্ষিণ গৌড় রাজ্য। ঐ স্থানের পূর্ব্ব ৬ ক্রোশ অন্তরে পাণ্ডুয়া গ্রাম নিবাসী পরলোকগত "মুন্সী এনাতুল্লা সাহেব"—ইনি মেদনীপুর জেলার গড়বেতা থানার পূর্ব্বতন পুলিসের দারোগা ও আমার

শিক্ষক ছিলেন। আমি তাঁহার নিকট পারস্য বিদ্যা অধ্যয়ন করিতাম। তাঁহার নিকট পারস্য ভাষায় যে একখানি গৌড় ইতিহাস ছিল, তাহা আমরা নকল করিয়া লইয়াছিলাম। মধ্যে মধ্যে তাহা পাঠ করিতাম। সে আজ পঁয়ত্রিশ বৎসরের কথা।

জাহানাবাদের ভূতপূর্ব্ব ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত সৈয়দ মৌলবী আবদুল মজিদ খাঁ বাহাদুরের আদেশ-ক্রমে আমি ঐ ইতিহাস অবলম্বন করিয়া মান্দারণের বৃত্তান্ত সোমপ্রকাশ সংবাদ পত্রিকায় লিখিয়া প্রকাশ করিয়াছিলাম এবং ১২৬৮ সালের বৈশাখ মাসে এডুকেশন গেজেট পত্রিকায় তাহা মুদ্রিত হইয়াছিল। ফলতঃ তৎ সময়ে তাহাতে অনেক বিষয় লেখা হয় নাই।

পূর্ব্বে এ কথা বলা হইয়াছে যে, মান্দারণ কীর্ত্তি স্থাপনার পরেই গৌড়রাজাজ্ঞানুসারে খাঁ জাহান রাজস্ব বন্দোবস্তের নিমিত্ত পূর্ব্ববঙ্গ বাকলা চন্দ্র-দ্বীপ অঞ্চলে গিয়াছিলেন। তাহার পর যশোহরের অন্তর্গত "বাঘের হাটে" গিয়া তত্রস্থানে মান্দারণের অনুরূপ, আর একটী কীর্ত্তি স্থাপন করেন। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটির সাংবাৎসরিক অধিবেশনে যে সকল প্রাচীন বিষয়ের আন্দোলন হয়, তাহাতে বাঘের হাট মহকুমার ভূত-পূর্ব্ব ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু গৌরদাস বসাক মহাশয়ের রিপোর্টে এবং ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের ১৩ই মার্চ্চ এডুকেশন গেজেট পত্রিকায় বিস্তারিত প্রকাশ আছে। মান্দারণ ও বাঘের হাটের কীর্ত্তি যে এক সময়ের কিছু অগ্রপশ্চাৎ খাঁ জাহানকর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়াছিল, তাহা তদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হইবে।

মহাত্মা খাঁ-জাহানের তেজস্বিতা, ক্ষিপ্রকারিতা, উদারচিত্ততা, বুদ্ধিমত্তা, পরোপকারিতা ও ধর্ম্মনিষ্ঠা প্রভৃতি সদ্‌গুণ ছিল। কিন্তু তাঁহার "পীরআলি" নামে জনৈক বংশধর অতি দুর্ব্বৃত্ত ও পাষণ্ড হইয়া পশুবৎ আচরণ দ্বারা অনেক হিন্দুর ধর্ম্ম নষ্ট ও অনেকের জাতি ভ্রষ্ট করিয়াছিলেন।

জাহানাবাদের পূর্ব্ব ২ ক্রোশ ব্যবধানে, রণজিৎ রায় কর্ত্তৃক একটী বিস্তীর্ণ দীঘী ও এক ক্রোশ ব্যবধানে গড়-বাড়ী নামক গ্রামে ঐ রণজিতের একটী ক্ষুদ্র দুর্গ মধ্যে তস্য বংশীয়গণের বাড়ী আছে। রণজিৎ জাতিতে সদ্গোপ,—অত্যন্ত বলশালী বীর-পুরুষ ;—মুর্শিদাবাদের নবাবের সেনাপতি ছিলেন ; প্রবন্ধ-বাহুল্য-হেতু তাঁহার সবিশেষ বিবরণ এখানে লিখিলাম না। পরে লিখিব।

৪০ চল্লিশ বৎসরের পূর্ব্বে জাহানাবাদে যে সকল লোমহর্ষণ ব্যাপার ঘটিয়াছিল, তাহার এক একটী ঘটনা লিখিতে হইলে প্রবন্ধ-বাহুল্য হয়। তজ্জন্য ভীত হইয়া সংক্ষেপে লিখিতেছি। মহকুমা স্থাপন হইবার বহু-পূর্ব্বে জাহানাবাদ প্রদেশ একপ্রকার অরাজক পুরীর ন্যায় হইয়াছিল। তৎকালীন শ্রীল শ্রীযুক্ত ড্যাম্পেয়ার সাহেব (সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট) বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যা এই তিন প্রদেশের পুলিস আমলাদিগের হর্ত্তা-কর্ত্তা-বিধাতা পুরুষ ছিলেন। তিনি বহুদূরে থাকিয়া পোলীসের কাজ-কর্ম্ম পর্য্যবেক্ষণ করিতেন।

এদিকে লম্বোদর সদৃশ পুলীস-আমলা এক প্রকার দুগ্ধ ফেননিভ-শয্যায় সুখে নিদ্রা যাইতেছেন ; কিন্তু হতভাগ্য প্রজাদিগকে অনিদ্রায় কালযাপন করিতে হইত। জেলার মাজিষ্ট্রেট-সাহেব পাইক, চৌকীদার, থানাদার, বরকন্দাজ, জমাদার, বকসী, দারোগা প্রভৃতি পুলীস-কর্ম্মচারীদিগের "বাহাল বরতরফ" করণের কর্ত্তা ছিলেন। কিন্তু তাঁহার দেওয়ান, পেস্কার, নাজির প্রভৃতি আমলাগণের এতদূর

আধিপত্য ছিল যে, ষোড়শোপচারে পূজা পাইলেই কাহারও কোন দোষের কথা কর্ত্তৃপক্ষের কর্ণগোচর করিতেন না। কি ভদ্রলোক কি অন্যান্য ব্যক্তি,—অপমান ও অত্যাচারের ভয়ে পুলীস-কর্ম্মচারীদিগকে যম সদৃশ জ্ঞান করিতেন।

সুতরাং দস্যু, তস্কর প্রভৃতি বদমাইসের বাদসাগণ অসঙ্কুচিতচিত্তে স্ব স্ব দুরভিসন্ধি সাধন করিত। দস্যুদিগের দৌরাত্ম্যে কি গৃহী, কি কৃষক, কি পথিক—নিষ্কণ্টকে বসবাস অথবা নির্ভয়ে কোন স্থানে যাতায়াত করিতে পারিত না। প্রসিদ্ধ ভিকুদাসের মাঠ, তেলভেলের মাঠ, ভাদুরের মাঠ, কলু-পুষ্করিণী, সুলতান দীঘী, ময়রা দীঘী, ভাগবীখাঁর দীঘী, সাঁইতার জলা, আমোদর খাল, আশুদের খাল, তারাযোলীর খাল, পচার খাল, মুণ্ডেশ্বরী মলুই-পুরের মাঠ, নারাপুরের সরাই ও অন্যান্য মাঠ ঘাট ইত্যাদি এই সমুদায় স্থানে দস্যুগণের প্রধান আড্ডা ছিল। মুসলমান, বাগদী, ডোম, চাঁড়াল, কেওরা—এই সকল জাতির মধ্যে অনেকে দস্যুতা ও ডাকাইতি করিত। আবার "যে রক্ষক, সেই ভক্ষক"—ফাঁড়িদার, চৌকিদার প্রভৃতি তাহাদের সহায়তা করিতেন ও দলভুক্ত হইতেন।

দস্যুগণ প্রকাশ্যে মাঠে গোঠে, মৃণ্ময়ী কালীমূর্ত্তি স্থাপন ও মহাড়ম্বরে তাঁহার পূজা করিয়া মদ্য মাংস পান আহার করত স্থানে স্থানে ডাকাইতি করিত ক্রমে ক্রমে তাহাদিগের সেই সকল অত্যাচার যখন গবর্ণমেণ্টের শ্রুতিগোচর হয়, তখন মহামতি শ্রীল শ্রীযুক্ত লর্ড ডেলহৌসী গবর্ণর জনারল বাহাদুর এবং বঙ্গের শ্রীল শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুর থানা দেওয়ানগঞ্জ, থানা জাহানাবাদ, থানা খানাকুল, থানা রায়না, থানা চন্দ্রকোণা, থানা ঘাটাল, এই ছয় থানার এলাকা লইয়া ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের কিছু পূর্ব্বে দ্বারকেশ্বর নদের উপকূলে অর্থাৎ জাহানাবাদে উপবিভাগের ব্যবস্থা করিয়া ঐ বিভাগে ভূতপূর্ব্ব ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল মহাশয়কে নিযুক্ত করেন।

উক্ত রায় বাহাদুর (ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ঈশ্বর বাবু) প্রথমেই জাহানাবাদ উপবিভাগের বিচার-আসনে আসীন হইয়া সেই সকল বদমায়েসদিগকে সুশাসনে আনিতে সুযোগ প্রাপ্ত হন। তিনি দিবসে ৩।৪ বার পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিয়া বহুরূপীর বেশ ধারণ করিতেন এবং ছদ্মবেশে দস্যুদিগের আড্ডায় আড্ডায় স্বয়ং গমন করিয়া অলক্ষিতভাবে থাকিতেন। তিনি কতকগুলি গুপ্ত-চরকেও নিজ আয়ত্তে রাখিয়াছিলেন।

কোন স্থানে কোন ঘটনা হইলে তিনি চরকর্ত্তৃক সংবাদ পাইয়া ঘটনার পূর্ব্বেই নির্ভীকচিত্তে তিমিরাবৃত রাত্রে স-অস্ত্রে স-সজ্জা ভাবে গমন করিয়া চোরিত দ্রব্য সহিত দস্যু ডাকাইতদিগকে ধৃত করিতেন। তিনি নিজে ক্ষমতাশালী কৃষ্ণকায় বীরপুরুষ ছিলেন। তাঁহার সূক্ষ্মদর্শিতা, ন্যায়পরতা আজি পর্য্যন্ত অনেকের অন্তঃকরণে জাগরূক আছে। তাঁহার বিচারকার্য্য দৃষ্টে দুষ্টেরা তাঁহাকে যমসদৃশ ভয় এবং শিষ্টেরা পিতার ন্যায় ভক্তি শ্রদ্ধা করিতেন। তাঁহার সময়ে অনেকানেক প্রসিদ্ধ ডাকাইত ও দস্যুগণ রাজদণ্ডে দণ্ডিত হওয়ায় দেশে বহুল পরিমাণে শান্তি বিরাজ করিয়াছিল।

শ্রীহারাধন দত্ত ভক্তিনিধি।

জাহানাবাদ।

বিচিত্র সংগ্রহ।

(আফ্রিকার আশ্চর্য্য প্রথা)

সুসভ্য ইউরোপ হইতে অসভ্য আফ্রিকা পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই সকলে নিজ নিজ জাতীয় বিশেষত্ব রক্ষা করিয়া চলে। কিন্তু সভ্য-জাতির অভ্যাস এই যে,তাঁহারা স্বদেশীয় আচারপদ্ধতির অক্ষুণ্ণ অনুমোদনে সর্ব্বদাই বদ্ধ-পরিকর, কিন্তু অন্য জাতিকে কোন দীর্ঘকাল প্রচলিত জাতীয়-প্রথা পালন করিতে দেখিলেই তাহা কুসংস্কার বলিয়া নাসিকা সঙ্কুচিত করেন। তথাপি অধিকাংশ লোকেই প্রথা-বহির্ভূত কাজ করিতে নারাজ;—এমন দেশও আছে, যেখানে প্রথা-বহির্ভূত কাজ করিলে, রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হয়।

মৃতদেহের সৎকার সম্বন্ধে আফ্রিকার প্রায় সকল জাতির মধ্যেই নানাপ্রকার আশ্চর্য্য পদ্ধতি দেখিতে পাওয়া যায়। যে সকল দেশে মৃত-দেহ সমাহিত করিবার নিয়ম আছে, সেই সকল দেশেই কতকগুলি সমাধিস্থান নির্দ্দিষ্ট আছে; কিন্তু আফ্রিকার কোন কোন অংশে গৃহ-প্রাঙ্গণের বহির্ভাগে মৃত-দেহ সমাহিত করিলে, মৃত-ব্যক্তির প্রতি অত্যন্ত অসম্মান প্রকাশ পায়,—এই সকল স্থানে কেবল দাসগণের মৃত-দেহই অন্তঃপুরের সীমা ছাড়াইয়া দূরে নিক্ষেপ করা হয়। যাহারা অত্যন্ত অধিক সম্মানের পাত্র, তাহাদের মৃত-দেহ গৃহ-মধ্যেই প্রোথিত করিবার নিয়ম। আফ্রিকার মধ্যে বেহি নামক স্থানের প্রথা আরও অধিক বিস্ময়কর;—এই প্রদেশের লোকে মৃত-ব্যক্তির গলায় দড়ি লাগাইয়া, তাহাকে কুটীরের চালে ঝুলাইয়া রাখে; ক্রমে মাংস পচিয়া হাড় বাহির হইয়া পড়ে এবং মস্তক খসিয়া যায়। তখন সেই মাংসহীন কঙ্কাল-সার দেহ গো-চর্ম্মের মধ্যে পুরিয়া কোন একটী কুটীর-অভ্যন্তরে প্রোথিত করা হয় এবং সেই কুটীরই মৃত-ব্যক্তির সমাধিস্তম্ভ বলিয়া পরিগণিত হয়। পশ্চিম-আফ্রিকার শ্লেভকোষ্ট নামক উপকূল-ভাগে তদ্দেশীয় অধিবাসী যরুবাস্ জাতির বিশ্বাস যে, অতি সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তিগণেরই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া মহা সমারোহে সম্পন্ন হয়, তদনুসারে মৃত-ব্যক্তির আত্মীয়বর্গ অত্যন্ত ধুম-ধামের সহিত মৃত-দেহের সৎকার করিয়া থাকে। এই কার্য্যে অর্থের অনাটন ঘটিলে, মৃত-ব্যক্তির আত্মীয়গণ স্ব স্ব কন্যা-পুত্র বিক্রয় দ্বারা অর্থসংগ্রহ করিতেও পশ্চাৎপদ হয় না। যতদিন পর্য্যন্ত অর্থ সংগৃহীত না হয়, ততদিন তাহারা মৃত-দেহ অতি সাবধানে লুকাইয়া রাখে; অর্থসংগ্রহ হইলে, তাহা সমারোহপূর্ব্বক সমাহিত করা হয়।

কিন্তু 'রুয়াহি' নদীর তীরবর্ত্তী 'মাহেঞ্জ' জাতি মৃতদেহ লইয়া অন্যপ্রকার ব্যবহার করে। মৃত-ব্যক্তির দেহ ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া ইহারা পিণ্ডাকার করে, তদনন্তর কোন দূরবর্ত্তী অরণ্যে গর্ত্ত খুঁড়িয়া তাহার মধ্যে মৃত-দেহ নিক্ষেপ করিয়া আসে। মাটি চাপাইয়া তাহা ঢাকিবার কোন আবশ্যকতা অনুভব করে না।

আফ্রিকার কোন-কোন অংশে মৃত-দেহের সহিত জীবিত ব্যক্তিকে সমাহিত করিবার প্রথা প্রচলিত আছে; এই প্রথা নিতান্ত আধুনিক বলিয়া বোধ হয় না, "আরব্য উপন্যাস" পাঠ করিলে বোধ হয়, পূর্ব্বকালে অনেক দেশেও এ প্রথার প্রচলন ছিল। মৃত-ব্যক্তির সহিত সাধারণতঃ তাহার পত্নীই সমাহিত হইয়া থাকে, কিন্তু কোন বর্দ্ধিষ্ণু লোকের মৃত্যুতে দুই চারি জন দাস-দাসীও গৃহস্বামীর সমাধির সাহচর্য্য লাভ করে।

আফ্রিকার কোন কোন জাতি বৃদ্ধ এবং পীড়িত ব্যক্তিদিগের জীবন নিতান্ত নিষ্প্রয়ো-

জনীয় বলিয়া মনে করে। পশ্চিম-আফ্রিকার 'পেওউই' জাতি সুস্থ, সবল এবং কর্ম্মক্ষম ব্যক্তি ভিন্ন অন্য সকলকে ইহলোক হইতে অপসৃত হইতে বাধ্য করে; দুর্ব্বল-শিশু কিংবা পরিণত-বয়স্ক রুগ্নদিগের সম্বন্ধেই যে এই নিয়ম, তাহা নহে, কিন্তু যে সকল বৃদ্ধ কাঠ কুড়াইতে, জল তুলিতে কিংবা অন্য কোন শ্রমসাধ্য কার্য্যে অক্ষম, তাহারাও এইপ্রকার অবাঞ্ছিত মৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পায় না।

'মিউকুইসগণ' পশ্চিম-আফ্রিকার ভ্রমণশীল জাতি; ইহারা শান্তিপ্রিয় এবং নিরীহ; কিন্তু সর্ব্বদাই তাহাদের দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতে হয় বলিয়া তাহারা বৃদ্ধ ও আর্ত্ত-দিগকে বিনাশ করে। পথ-ভ্রমণ করিতে করিতে যদি কোন বৃদ্ধ ক্লান্তি বশতঃ অধিক পিছাইয়া পড়ে, তাহা হইলে সেই দলপতি সেই বৃদ্ধের আত্মীয়কে সতর্ক করিয়া দেয়; তখন সেই ব্যক্তি—এমন কি, সে যদি বৃদ্ধের পুত্র হয়, তথাপি—বৃদ্ধর পশ্চাতে আসিয়া মস্তকে দণ্ডাঘাতপূর্ব্বক তাহার ভব-যন্ত্রণা শেষ করে। বজ্রাঘাতের ন্যায় এই অতর্কিত দণ্ডের নিষ্ঠুর আঘাত সম্ভাবনা মৃত্যুর পূর্ব্বমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাহার মনে উদয় হয় না।

কাহারও সহিত দেখা-সাক্ষাৎ হইলে এই সকল জাতির সম্ভাষণ-প্রণালী অতি বিস্ময়-কর। কোন পূজনীয় ব্যক্তিকে অভ্যর্থনা করিতে হইলে, ইহাদিগের অনেক প্রকার সম্মান-প্রকাশক অনুষ্ঠানের বিধান আছে; যথা,—পূজনীয় ব্যক্তির সম্মুখে হাত ও পায়ে ভর দিয়া হামাগুড়ি দিয়া যাওয়া, মস্তক কর্দ্দমানুলিপ্ত করা এবং কথা কহিবার সময় ধীরে ধীরে করতালি দেওয়া ইত্যাদি। মস্তক কর্দ্দমানুলিপ্ত করাই সম্মান-প্রদর্শনের প্রকৃষ্ট উপায়। সম্মানিত ব্যক্তির সহিত বাক্যালাপ করিবার সময় কোন কোন জাতি বাহুদ্বয়ে এবং শরীরে মাটি মাখিয়া থাকে। 'নিগার' নদীর তীরে যে সকল অসভ্যের বাস, তাহারা কোন পরিচিত ব্যক্তির সাক্ষাৎ পাইলে হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া তাহা প্রবলরূপে আন্দোলিত করে; ইহা তাহাদের মধ্যে অত্যন্ত অধিক ভদ্রাচরণ বলিয়া পরিগণিত। যাহা হউক এ প্রথাও তত আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হয় না, কিন্তু ইহারা যে সম্মানিত ব্যক্তির প্রতি সম্মান-প্রদর্শনের জন্য তাহার গাত্রে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করে এ প্রথা বড়ই বিস্ময় কর এবং ঘৃণাজনক। এই প্রকার সম্মান-প্রদর্শন-প্রথা যদিও ক্রমে বিরল হইয়া পড়িতেছে, তথাপি অসভ্যগণ ইহাকে বন্ধুত্ব এবং সদিচ্ছা-পরিচায়ক বলিয়া মনে করে। পেথেরিক প্রণীত "সুদান" নামক গ্রন্থে এই প্রথা সম্বন্ধে একটী রহস্যোদ্দীপক গল্প লিখিত আছে। গ্রন্থকার লিখিয়াছেন যে, তিনি ঘটনাক্রমে এই অসভ্যদিগের এক দলপতির সম্মুখীন হন। সর্দ্দার-শ্রেষ্ঠ নিকটে আসিয়া তাঁহার করগ্রহণ পূর্ব্বক অতি গম্ভীর-ভাবে তদীয় করতলে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিল, অনন্তর মুখমণ্ডলেও সেই সম্মানজনক অনুষ্ঠানের পুনরভিনয়! অসভ্যের এইরূপ ধৃষ্টতা দেখিয়া সাহেব ক্রোধ এবং ঘৃণায় ভয়ানক উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন এবং তাহার সমুন্নত নাসিকায় একটী প্রবল মুষ্ট্যাঘাতে তাহাকে ভূমিসাৎ করিবার ইচ্ছা করিলেন; কিন্তু সেই অসভ্য সর্দ্দারের মুখে এমন একটী বিনয়-নম্র প্রশান্ত এবং প্রীতি-প্রফুল্ল ভাব অঙ্কিত ছিল যে, সাহেব তাঁহার ক্রোধ-সংক্ষুব্ধ উদ্যত হস্ত প্রতিহার করিয়া তাহার হস্তে ও মুখে পূর্ব্ববৎ নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিলেন। এই ভদ্রাচরণে সর্দ্দার যেরূপ আনন্দিত হইল, তাহা বর্ণনাতীত;—সে প্রফুল্ল-চিত্তে তাহার সহচরকে বলিল,—"এই সাহেব নিশ্চয়ই একজন মস্ত আদ্‌মী।" নিষ্ঠীবন-ত্যাগ কখন কখন আশীর্ব্বাদ-রূপে পরিগণিত

হইয়া থাকে। 'কঙ্গো' রাজ্যের রাজ-মন্ত্রী যখন প্রথম রাজসভায় উপস্থিত হন, তখন তাঁহাকে রাজ-সন্নিধানে নতজানুভাবে উপবেশন করিতে হয়। অনন্তর একখণ্ড মলিন বস্ত্রে রাজা নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিলে, মন্ত্রী সেই বস্ত্রখণ্ড ভাঁজ করিয়া তাহাতে ওষ্ঠস্পর্শ করেন। আফ্রিকাতে আরও নানাবিধ কৌতুক-জনক প্রথা প্রচলিত আছে, কিন্তু সভ্যজাতির নিকট তাহা অধিকতর কুরুচির পরিচায়ক।

জাপানে অঙ্গরাগ।

প্রাচ্য-ভূখণ্ডে জাপান সভ্যতা ও উন্নতির সর্ব্বোচ্চ শিখরে অধিষ্ঠিত, কিন্তু এই সভ্যতা অধিক দিন আরম্ভ হয় নাই। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বেও জাপানের লোকের সুপরিচ্ছন্ন মূল্যবান্ পরিচ্ছদের প্রতি দৃষ্টিপাত ছিল না; কিন্তু তাহারা সর্ব্বাঙ্গে সুন্দর অঙ্গরাগ করিত, এখনও এ প্রথা সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হয় নাই। উচ্চ হইতে নীচ—সর্ব্বশ্রেণীর মধ্যেই এই অঙ্গরাগের প্রতি অনুরাগ লক্ষিত হইত, এবং যদিও ডাই-মিওগণের (জাপানী ভদ্রলোক) দেহ সুদৃশ্য বস্ত্রে আচ্ছন্ন থাকায়, তাঁহাদের গাত্রস্থিত এই সকল অঙ্গরাগ সাধারণের দৃষ্টির অগোচর থাকে, তথাপি নিম্ন শ্রেণীর জাপানীগণের শরীরের দিকে চাহিলে তাহাদের সর্ব্বাবয়বে নীল এবং লাল কালীতে সিংহ, ব্যাঘ্র, সর্প ও নর-নারীর দেহ অঙ্কিত দেখিতে পাওয়া যায়। এই বিচিত্র অঙ্গরাগের মধ্যে যথেষ্ট চিত্র-কৌশলের পরিচয় আছে। ইহাদের মুখমণ্ডলে কোন প্রকার অঙ্কন-চিহ্ন দেখা যায় না।

জাপানে অনেক লোকের দেহে যুদ্ধের দৃশ্য অতি সুকৌশলে অঙ্কিত দেখা যায়। একজন নাপিতের দেহে একটী প্রসিদ্ধ জাপানী-যুদ্ধের দৃশ্য অঙ্কিত ছিল। এই কার্য্যের জন্য তাহাকে যে পরিমাণে অর্থ ও সময় ব্যয় করিতে হইয়াছিল, তাহাতে তাহার সখ অবশ্যই অসাধারণ বলিতে হইবে। এই সুদৃশ্য অঙ্গরাগের জন্য উক্ত নর-সুন্দরকে দীর্ঘ—দুই বৎসর কাল চিত্রকরের অধীন থাকিতে হইয়াছিল; দুই বৎসর প্রত্যহ দুই এক ঘণ্টা করিয়া ছুঁচ বিঁধাইয়া শরীরে ছাপ মারা অল্প সাহস, ধৈর্য্য এবং অধ্যবসায়ের কাজ নহে।

যাহারা শরীরের অংশে সামান্য অঙ্গরাগ করে, তাহাদিগকে অন্ততঃ এক সপ্তাহ ধরিয়া প্রত্যহ দুই ঘণ্টা কাল ছুঁচের আঘাত সহ্য করিতে হয়। ক্রমে জাপানে যখন পাশ্চাত্য-সভ্যতার আলোক বিকীর্ণ হইতে লাগিল, তখন প্রজা-হিতৈষী গবর্ণমেণ্ট আইন করিয়া এই কষ্টকর প্রথা উঠাইয়া দিলেন এবং নিয়ম করিলেন, অতঃপর যাহারা এইরূপে অঙ্গরাগ করিবে, তাহাদিগকে কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইবে।

এই আইন বিধিবদ্ধ হওয়ার পর অঙ্গরাগ-সম্পন্ন প্রত্যেক ব্যক্তিকে গবর্ণমেণ্ট হইতে একখানি করিয়া সার্টফিকেট দেওয়া হইয়াছিল; ভারপ্রাপ্ত পুলিশ কর্ম্মচারিগণ দেখিতে চাহিলেই তাহাদিগকে এই সার্টফিকেট দেখাইতে হইত। এইরূপ সাবধানতা অবলম্বন করাতে অঙ্গরাগ করিবার নিয়ম বহু পরিমাণে নিবারিত হয়, কিন্তু ইহা সম্পূর্ণরূপে নিবারিত হইয়াছে কিনা সন্দেহ। যাহাই হউক, এই নিয়ম করাতে অনেক দক্ষ কারুকারের অন্ন মারা গিয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যে ইউরোপীয় সভ্যতার খাতিরে জাপান গবর্ণমেণ্ট এই অঙ্গরাগ-প্রথার বিলোপ-সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, সেই ইউরোপীয়ানগণই জাপানে পদার্পণ করিয়া কৌতূহলের সহিত আপনাদিগের দেহের কোন কোন অংশে চিত্র অঙ্কিত করিতে লাগিলেন! ভক্ত হিন্দু-

তীর্থযাত্রিগণ যেমন দ্বারকায় উপস্থিত হইয়া আপনাদিগের বক্ষে দ্বারকাপতি শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম অঙ্কিত করিয়া লন, সেইরূপ যে সকল দেশ-পর্য্যটক জাপানের বন্দরে পদার্পণ করিতেন, তাঁহারাই জাপান-ভ্রমণের স্থায়ী স্মৃতি-চিহ্ন স্বরূপ, শরীরে একটা সর্প, একটা ড্রাগণ বা একটী নর্ত্তকীর ছবি আঁকাইয়া লইয়া পুনর্ব্বার জাহাজে উঠিতেন। অনেক ইউরোপীয়ান্ এবং আমেরিকানের দেহ এখন পর্য্যন্ত এইরূপে চিত্রিত দেখা যায়। সাধারণতঃ বাহুর উপরেই এই সকল চিত্র অঙ্কিত হইয়া থাকে। যে ইংরেজ-লেখকের বর্ণনা আমরা এই প্রবন্ধে সঙ্কলিত করিতেছি, তিনিও জাপানে উপস্থিত হইয়া, স্বকীয় বাহুদ্বয়কে চিত্রিত করিবার প্রলোভন সংবরণ করিতে পারেন নাই;—কোন বিখ্যাত চিত্রকর দ্বারা তিনি এক হস্তে 'সভেসিন' নামক জাপানী বাদ্য-যন্ত্রধারী এক নর-কঙ্কালের এবং অন্য হস্তে এক-খানি অসি-চিত্র অঙ্কিত করিয়া লইয়াছিলেন। এই স্মৃতি-চিহ্ন লাভের জন্য তাঁহাকে চারি ঘণ্টা কাল ধরিয়া অনবরত বাহুমূলে ছুঁচ বিঁধাইতে হইয়াছিল।

এই সকল চিত্রকরের নিকট নানাবিধ চিত্র-পূর্ণ এক একখানি আদর্শ-পুস্তক থাকে; অঙ্গ-রাগেচ্ছু ব্যক্তিগণ তাহা হইতেই ইচ্ছানুরূপ চিত্র মনোনীত করিয়া লন; তাহার পর, নীল অথবা লাল রঙ্গ-যুক্ত ছুঁচ এবং ব্রশের সাহায্যে চিত্র অঙ্কিত করা হয়। বাহুমূলে, বক্ষে অথবা পৃষ্ঠে চিত্র অঙ্কিত করিবার পূর্ব্বে চিত্রকর উষ্ট্রের কেশ-নির্ম্মিত পেন্সিল দ্বারা নির্দ্দিষ্ট স্থানে 'ফরমাইস' মত চিত্রের মোটামুটি নক্সা আঁকিয়া লয়, তাহার পর একটী ছুঁচ রঙ্গে ডুবাইয়া সেই নক্সার উপর বিঁধাইতে থাকে এবং অনেকগুলি ছুঁচের সাহায্যে সেই চিত্রটীকে সম্পূর্ণ করিয়া তুলে। বার চৌদ্দটী ছুঁচ ক্রমাগত সজীব দেহের উপর প্যাঁট্‌প্যাঁট্ করিয়া বিঁধিতেছে ইহা বড় সহজ কথা নহে, কিন্তু কৌতূহল-বৃত্তির নিকট এই কষ্ট কষ্ট বলিয়া গণ্য হয় না; ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই, বঙ্গ-অন্তঃপুরে এমন বালিকা এবং যুবতীর সংখ্যা নিতান্ত অল্প, যাঁহারা গহনা পরিবার লোভে নাক এবং কান বিঁধাইতে সঙ্কুচিত হন। কৌতূহল এবং আমোদস্পৃহা অনেক সময়েই কঠিন কার্য্যকে সহজ করিয়া তুলে।

যাহা হউক, উল্লিখিতরূপে চিত্র অঙ্কিত করার পর, চিত্রাঙ্কিত অংশে অত্যন্ত বেদনা অনুভূত হয় এবং দশ বার দিন পর্য্যন্ত তাহা ফুলিয়া থাকে; ইহাতে প্রায়ই কোন বিপদের আশঙ্কা নাই, কিন্তু কখন কখন রঙ্গে রক্ত বিষাক্ত হইয়া অত্যন্ত বিপদ উপস্থিত করে।

ইটালীর মহারাণী।

ইটালীর মহারাণী ইউরোপের রাজ্ঞীগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সুন্দরী। শুধু রূপে নহে, গুণেও তিনি অতুলনীয়া। "উম্যান-এট-হোম" নামক একখানি বিলাতি কাগজে তাঁহার সম্বন্ধে অনেক কথা প্রকাশিত হইয়াছে। এই অলৌকিক রূপবতী এবং গুণবতী রাজ্ঞী সম্বন্ধে কোন কোন কথা আমাদের পাঠকগণের গোচর করিতেছি।

মহারাণীর নাম মার্গেরিট। তিনি প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ পূর্ব্বক প্রতিদিন রাজকীয় প্রমোদোদ্যানে বিবিধ প্রকার সুন্দর সুন্দর পুষ্প চয়ন করিয়া, তদ্দ্বারা মহারাজের পাঠগৃহ সুসজ্জিত করেন। শীতকালে কিংবা বর্ষার দিনে তিনি পুষ্পতরু এবং লতা-সংরক্ষণী গৃহে সুগন্ধি কুসুম সংগ্রহে ব্যস্ত থাকেন। কুইরিনাল-স্থিত পাঠগৃহের স্ফাটিক বারান্দায় মহারাজের যে সকল ফুলের গাছ সংরক্ষিত আছে, তাহা পর্য্যবেক্ষণেই তাঁহার অপরাহ্ণ অতিবাহিত হয়। উত্তর-ইটালীর অন্তর্গত মঞ্জা নামক স্থানে মহারাজের যে বৃক্ষবাটিকা আছে, সেখানে মহারাণী অনেক সময় অতিবাহিত করেন। তিনি এতই ফুল ভালবাসেন যে, তিনি অনেক সময়েই বলেন,—"আমি কখন বেশী ফুল সংগ্রহ করিতে পারিলাম না!" কারনেসন, ভায়োলেট, স্থলপদ্ম এবং লাল গোলাপ ফুল তাঁহার অত্যন্ত অধিক প্রিয়; ভায়োলেট ফুলের গন্ধই তিনি সর্ব্বাপেক্ষা বেশী পছন্দ করেন।

রূপ এবং গুণেই যে তিনি ইউরোপীয় রাজ্ঞী-সমাজে অদ্বিতীয়া এমন নহে, মার্গেরিটের ন্যায় শিক্ষিতা রাজমহিষী প্রতীচ্য ভূখণ্ডে আর একজনও নাই। রাজ্ঞী ইংরেজী, ফরাসী, জর্ম্মান, স্পেনীয় এবং লাটিন ভাষায় সুপণ্ডিতা; তাঁহার মাতৃভাষা ইতালীয় ভাষার ন্যায়; তিনি ঐ সকল ভাষায় দ্রুত এবং সুস্পষ্টরূপে কথা কহিতে পারেন। গ্রীক্ ভাষাতেও তাঁহার অসামান্য দক্ষতা লক্ষিত হয়। ইউরোপীয় সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কাব্যগুলির সহিত যে তাঁহার শুধু পরিচয় আছে তাহা নহে, সেগুলি তিনি সুন্দররূপে আয়ত্ত করিয়াছেন;—তিনি অনেক সময়েই পেট্রার্ক, দান্তে, গেটে প্রভৃতি মহাকবিদিগের কাব্য হইতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট অংশগুলি আবৃত্তি করিয়া থাকেন; সেক্ষপীয়রের নাটকগুলি তাঁহার নিকট এতই আদরণীয় যে, তিনি সেই মহাকবির কাব্য-সুন্দরীবৃন্দের উপর একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ লিখিয়াছেন।

শারীরিক ব্যায়ামের প্রতিও মহারাণীর বিশেষ লক্ষ্য আছে। রোমে তিনি মহারাণী; মঞ্জায় তিনি গ্রাম্য ভদ্রমহিলা; গিরিসঙ্কুল অল্প প্রদেশে তিনি সাহসিনী পর্ব্বতচারিণী। কোন

প্রকার বিপদ তাঁহাকে কাতর করিতে পারে না, কষ্টেও তিনি সম্পূর্ণ উদাসীনা; এই গুণ তিনি তাঁহার পিতৃবংশ হইতে লাভ করিয়াছেন। পর্ব্বতের অতি বিপদ-সঙ্কুল অংশে, সমুন্নত গিরি-শৃঙ্গে, জনমানব-শূন্য তুষার নদীতে, দুরারোহ সঙ্কীর্ণ পার্ব্বত্য-পথে এবং সঙ্কটময় জীর্ণ সাঁকোর উপর ভ্রমণ করিতে তাঁহার বড় আনন্দ!—তিনি এই সকল স্থানে নিঃশঙ্কচিত্তে পরিভ্রমণ করেন। শীকার, মৎস্যানুসন্ধান, ঘোড়দৌড় প্রভৃতি অপেক্ষা পর্ব্বতে আরোহণ করাই তাঁহার নিকট অধিক প্রীতিকর। মঞ্জাতে তাঁহার একটী কুসুমোদ্যান আছে, সেটীর সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি তাঁহার একান্ত আকাঙ্ক্ষণীয়; বাগানের মালীরা বলে,—"মহারাণী ফুলের চাষেই জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন এবং এই বিষয়ে তাঁহার অভিজ্ঞতা অসাধারণ। মহারাণী যতদিন মঞ্জায় বাস করেন, ততদিন বাগানের কোন কাজে অন্যকে হাত দিতে দেন না।

পল্লীগ্রামে বাসকালে মহারাণী রাজোচিত কায়দার দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখেন,—রিপেন্সন, ডিনার পার্টি প্রভৃতি অনুষ্ঠানে তিনি আনন্দ লাভ করেন; কিন্তু গ্রীষ্ম ও শরৎকালে যখন তিনি দূরবর্ত্তী পল্লীভ্রমণে বহির্গত হন, তখন কোন প্রকার আড়ম্বরের দিকে তাঁহার দৃষ্টি থাকে না। ফ্লরেন্স নগরে ভ্রমণকালে তাঁহার সঙ্গে একজন মাত্র সহচরী ভিন্ন অন্য কাহাকেও দেখা যায় না, কখন কখন একখানি ভাড়াটিয়া গাড়ীতে চড়িয়া সাধারণ ভদ্র-মহিলার ন্যায় তিনি ঘুরিয়া বেড়ান। ভিনিসের রাজপ্রাসাদ হইতে ছদ্মবেশে বাহির হইয়া সাধারণের ন্যায় পথ পরিদর্শন করেন, নদীতীরে লোকের ভিড়ের দিকে কৌতুক-বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া থাকেন, অথবা নৌকার মাঝিদের সঙ্গে আলাপ করিয়া তাহাদের নৌকায় উঠিয়া খালের মধ্যে বায়ু সেবন করেন। অনেক সময় তাঁহার

ছদ্মবেশ প্রকাশিত হইয়া পড়ে, রাজভক্ত প্রজাগণ দলে দলে তাঁহার চতুর্দ্দিকে সমাগত হইয়া তাঁহার প্রতি তাহাদের আন্তরিক ভক্তি প্রদর্শন করিতে থাকে, বিব্রত হইয়া তিনি তখন পলায়নের পথ খুঁজিয়া পান না!

তাঁহার দৈনিক কার্য্য সুশৃঙ্খলা ক্রমে নিয়মিত। মধ্যাহ্নের পূর্ব্বেই তাঁহার চিঠীপত্র লেখার কাজ শেষ হইয়া যায়; মধ্যাহ্ন-আহারের পর তিনি সাধারণের হিতকর কার্য্যে সময় ক্ষেপ করেন,—এই সময় তিনি দাতব্য-সমিতির কার্য্যাধ্যক্ষ বা অন্যান্য দেশ-হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠাতৃগণের সহিত সাক্ষাৎ করেন। কৃষি এবং চিত্র-প্রদর্শনীর প্রতি তাঁহার প্রবল অনুরাগ দেখা যায়। সর্ব্বপ্রকার শিল্পের তিনি অত্যন্ত আদর করেন এবং রমণীগণের কার্য্যে উৎসাহ এবং সাহায্য দান করেন। চিকিৎসালয়, অনাথ-আশ্রম ও পণ্যবিথীতে গমন করিয়া তিনি তত্তৎ স্থানের অভাব ও অভিযোগ অবগত হন; মনুষ্য জাতির কল্যাণকল্পে যে কিছু অনুষ্ঠান, তাহাতেই তাঁহার অকৃত্রিম সমবেদনা দেখা যায়। এই সমস্ত বিষয় পর্য্যবেক্ষণ করিতে তাঁহার মধ্যাহ্ন অতিবাহিত হয়; অনন্তর তিনি নিজের আনন্দের জন্য যৎকিঞ্চিৎ সময় ব্যয় করেন,—তাঁহার বন্ধু-বান্ধবগণের সহিত দেখা-শুনা কার্য্যে এই সময় অতিবাহিত করেন। তাহার পর প্রায় সাড়ে চারিটার সময় তিনি ভ্রমণে বহির্গত হন।

সন্ধ্যার পর মহারাজের পাঠগৃহে মহারাজের সঙ্গে দুই এক ঘণ্টা কাল গল্প করেন, কখন কাব্য পাঠ করিয়া তাঁহাকে শ্রবণ করান, কখন বা গীত-বাদ্য করেন। পিয়ানো, বাঁশী, বেহালা প্রভৃতি যন্ত্রে তাঁহার যথেষ্ট দক্ষতা আছে। রাত্রি সাতটার সময় সান্ধ্য ভোজন শেষ হয়; এই সময় ভোজন-গৃহে অতি অল্প লোকই উপস্থিত থাকে,—মহারাজ, মহারাণী, নেপল্‌সের যুবরাজ এবং দুই একজন সম্ভ্রান্ত অতিথির এ সময় একত্র সম্মিলন দেখা যায়।

অন্ধের অনুভব-শক্তি।

যাহারা জন্মান্ধ কিংবা পরে কোন কারণে দৃষ্টিশক্তি হইতে বঞ্চিত হয়, তাহাদিগের অবস্থা অতি শোচনীয়, সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহাদিগের এই কষ্টও কিয়ৎপরিমাণে বিদূরিত হয়। দৃষ্টিশক্তির অভাবে অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের ক্ষমতা অত্যন্ত প্রবল হইয়া থাকে। ফরাসী-লেখক ডুকো বলেন,—"অন্ধদিগের মধ্যে প্রায় কখন উন্মাদ দেখা যায় না।" অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তিই স্বীকার করেন যে, দৃষ্টিশক্তি গভীর চিন্তাকে ব্যাহত করিয়া দেয়। গভীর চিন্তা করিবার সময় মেলব্রেঙ্ক গৃহের সমস্ত দরজা ও শার্সি বন্ধ করিয়া দিতেন, তাঁহার গৃহে একটুও আলোক প্রবেশ করিত পারিত না। চিন্তা করার সুবিধা হইবে ভাবিয়া ডিমোক্রিটাস্ আপনার চক্ষুদ্বয়কে বিনষ্ট করিয়াছিলেন। ডুকো বলিয়াছেন,—"কোন বিষয় সম্বন্ধে আমাদের মনোযোগ বৃদ্ধি করিতে হইলে, আমরা আমাদের চক্ষু মুদ্রিত করিয়া চিন্তা করি; ইহাতে আমাদের কৃত্রিম অন্ধতা লাভ হয়। ভিডেরস্ যখন চক্ষুর্দ্বয় মুদ্রিত করিয়া বক্তৃতা করিতেন, তখন তাঁহার বক্তৃতা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী এবং সুন্দর হইত।

অন্ধতায় শ্রবণশক্তি অত্যন্ত তীব্র হয়। ইয়র্কসায়রে একজন অবস্থাপন্ন ভদ্রলোক বাস করিতেন, তিনি অন্ধ হইলেও শর-চালনা বিষয়ে অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন; তাঁহার শ্রবণশক্তি এমন তীক্ষ্ণ ছিল যে, একটী বালক নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য স্থানের নিকটে ঘণ্টাধ্বনি করিলেই তিনি তীর নিক্ষেপ করিতেন, কিন্তু তাঁহার লক্ষ্য কদাচ ব্যর্থ হইত!

অন্ধদিগের স্মৃতিশক্তি দীর্ঘকাল স্থায়ী। চার্লোর মতে জাপানে অনেক অন্ধ এইজন্য উপার্জ্জনক্ষম; বিব্বাচিত অন্ধ দ্বারা সেখানে সাধারণ ঘটনাবলী স্মৃতিবদ্ধ করিয়া রাখা হয়। ইংলণ্ডের একজন মাদুর-নির্ম্মাতা, কবি টমসনের 'সিজন' নামক কবিতা ও অন্য দুইটী সুদীর্ঘ কবিতা এবং খৃষ্টীয় ধর্ম্ম-পুস্তকের অধিকাংশ ভাগ কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিয়াছিলেন।

অন্ধদিগের স্পর্শজ্ঞানও অত্যন্ত অধিক। কোলরিজ লিখিয়াছেন,—"হেলোভ নামক স্থানে একটী অন্ধ মোটা-কাগজে ছাপান হরফ হাত দিয়া অনুভব করিয়া অবলীলাক্রমে পড়িতে পারিতেন।" স্পর্শ দ্বারা বর্ণ বৈচিত্র্য অনুভব করা অল্প ক্ষমতার কাজ নহে, কিন্তু অনেক অন্ধ যে শুধু স্পর্শ দ্বারা বস্তুর বর্ণনির্ণয় করিতে সক্ষম, এ সম্বন্ধে নানাবিধ গল্প শুনিতে পাওয়া যায়; আমরা একজন জন্মান্ধের কথা জানি, তাহাতে এই গুণটী সুস্পষ্ট লক্ষিত হইত। তাহার অনেক গুলি ছাগল ছিল, পথে তাহাকে যাইতে দেখিয়া একজন জিজ্ঞাসা করিল,—"বলরাম! কোথা যাও?"—সে উত্তর দিল,—"একটা ছাগলের সকাল হ'তে কোন খোঁজ পাচ্ছিনে, সেটাকে খুঁজতে যাচ্ছি।" তাহাকে বলা হইল,—"পথের ধারে ঐ ছাগলটা চরছে; দেখ দেখি, ওটা কিনা?" বলরাম তাহাকে ধরিয়া তাহার গ'য়ে একবার হাত বুলাইল, তাহার পর বলিল,—"এটা কেন হবে? এটা যে সাদা! আমার যে কালো ছাগল।" আমরা তাহাকে এ কথা বলিতে শুনিয়াছি। এই লোকটী বড় বড় অশ্বত্থ গাছে উঠিয়া তাহার ছাগলের জন্য পাতা কাটে, আম-কাঁঠালের সময় গাছে উঠিয়া আম-কাঁঠাল পাড়ে এবং স্বহস্তে বৃক্ষচ্ছেদন করে। একদিন তাহাকে একটী বড় গাছ কাটিতে দেখিয়া একজন পরিহাসপ্রিয় লোক কৌতুক করিবার জন্য বলিলেন,—"বলরাম! স'রে দাঁড়াও, গাছটা ঘাড়ে পড়লো যে!" বলরাম দন্ত-বিকাশপূর্ব্বক হাসিয়া উত্তর করিল,—"আপনি ঠাট্টা কচ্চেন, ওটা কখন এদিকে পড়বে না।" প্রবল অনুভব শক্তির ইহা একটী সুন্দর দৃষ্টান্ত। অনেকে অনেক-দিন অন্ধ থাকিয়া সুচিকিৎসার গুণে কি অন্য কোন কারণে দৃষ্টিশক্তি পুনঃ প্রাপ্ত হয়; চক্ষু লাভ করিয়াও তাহারা দৃষ্টি অপেক্ষা স্পর্শ দ্বারা বস্তুর আকার-নিরূপণে ব্যগ্রতা প্রকাশ করিয়া থাকে।

প্রতিভা সর্ব্বত্রই কার্য্যকরী এবং উর্ব্বরা। যে প্রতিভার অধিকারী, তাহার মস্তিষ্ক কখন নিষ্ফলে কালযাপন করে না; অন্ধ হইলেও প্রতিভাবলে সে জগতে অসাধারণ কার্য্য করিতে পারে;—অন্ধ হইয়াও সণ্ডারসন গণিতশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়াছিলেন, নক্ষত্রসমূহের গতিবিধি সম্বন্ধীয় নিয়ম আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। যে আলোকের উজ্জ্বল অনুভূতি তিনি কোন দিন চক্ষু দ্বারা অনুভব করিতে পান নাই, সেই আলোকের প্রকৃতি এবং সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে তাঁহার মত কি সত্য ও সুন্দর! রামধনুর বিচিত্র বর্ণ-সমাবেশের গুপ্ত রহস্য তাঁহার দ্বারাই সর্ব্ব-প্রথমে উদ্ঘাটিত হয়।

জেনোয়ার অন্ধ-দার্শনিক হুবারের মধু-মক্ষিকার পরিশ্রম সম্বন্ধীয় আবিষ্কার অনেক চক্ষুষ্মানেরও শিক্ষাপ্রদ। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং প্রতিভা সম্মিলিত হইয়া অন্ধদিগকে খ্যাতির পথে অগ্রসর করে;—ডেভিডসন কয়লার খনিতে উপস্থিত হইয়া চক্ষুর নির্ম্মাণ-কৌশল সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতেন, অন্ধ ইঞ্জিনিয়ার মেটকাফ ডার্ব্বিসায়রের দুর্গম অরণ্য ভেদ করিয়া পথ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; অন্ধ কবি এবং গায়ক র‍্যাকলক চারিটী বিভিন্ন ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন, কবিতা ও গদ্য এ উভয়ই তাঁহার বিলক্ষণ আয়ত্ত ছিল, উভয় বিষয়ই তিনি

উত্তমরূপ লিখিতে পারিতেন। বিখ্যাত ইতিহাসবেত্তা প্রেসকট্ অন্ধ না হইলেও তাঁহার দৃষ্টিশক্তি এতই ক্ষীণ ছিল যে, লেখা-পড়া করা তাঁহার পক্ষে দুঃসাধ্য হইত; কিন্তু তাঁহার প্রণীত ইতিহাস আজ ইউরোপ এবং আমেরিকা এই উভয় মহাদেশেই ইতিহাস-শিক্ষার্থীর নিকট অবলম্বন স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে।

কোন কারণে কাহারও দৃষ্টিশক্তি বিনষ্ট হইলে সেই ব্যক্তির অনেক গুলি শক্তি প্রবল হইয়া উঠে। গইস্ নামক একজন পাদরীর চক্ষুর্দ্বয় দৃষ্টিহীন হইয়া পড়িলে, একটী রমণী তাঁহার এই দৈব বিপত্তিপাতে সমবেদনা প্রকাশের জন্য গির্জ্জায় গমন করিলেন। চক্ষু নষ্ট হওয়ার জন্য পাদরী সাহেব অনেক দুঃখ করিলেন, কিন্তু উপাসনার সময় তাঁহার চিত্তাকর্ষক বক্তৃতা শুনিয়া উক্ত রমণী বিগলিত-চিত্তে বলিলেন,—"মহাশয়! পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ যে, আপনার দৃষ্টিশক্তি বিলুপ্ত হইয়াছে, আপনার চক্ষু থাকিতে আপনি কোন দিন এমন উৎকৃষ্ট চিত্তাকর্ষক বক্তৃতা করেন নাই।"

শ্রীজলধর সেন।

চিকিৎসা-বিধান।

দীর্ঘপাঠে পাঠক মনে করিবেন না, আমরা কি এক অভিনব চিকিৎসার বিধান করিতে বসিয়াছি। চিকিৎসার বিধান করিয়াছেন চিকিৎসক; আমরা আলোচক।

"চিকিৎসা-বিধান" আধুনিক বিশ্ববিসর্পিত হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা সংক্রান্ত একখানি প্রকাণ্ড পুস্তক। আমরা ইহার তিন খণ্ডের উপহার পাইয়াছি। এ প্রবন্ধ তাহার সংক্ষিপ্ত আলোচনা-মাত্র। এই তিন খণ্ড পুস্তক প্রায় তেরশত পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।

কলিকাতার সুপ্রতিষ্ঠিত হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর কালী এই "চিকিৎসা-বিধানে"র প্রণেতা। "চিকিৎসা-বিধানে"র আলোচনায় আমাদের অপার আনন্দ। অধুনা ভারতভূমে, বিশেষতঃ বঙ্গদেশে, হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার প্রভূত প্রচার ও প্রসার; পরন্তু ইহা এদেশ-বাসীর প্রকৃতি পক্ষে সম্যক্ উপযোগী ও উপাদেয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এতৎ-সংক্রান্ত একখানি সৎগ্রন্থের আলোচনায় আনন্দ না হইবে কেন?

ডাক্তার কালী মহাশয় সু-চিকিৎসক; অধিকন্তু এক জন কৃতবিদ্য সু-লেখক। ইতিপূর্ব্বে ইহাঁর প্রণীত "বৃহৎ ওলাউঠা-সংহিতা" নামক পুস্তকের আলোচনায় পাঠক ইহাঁর পূর্ণ পরিচয় পাইয়াছেন। সু-লেখকের সংজ্ঞা-বিশ্লেষণ বহু প্রকারেই হইতে পারে। এ প্রবন্ধে সে বিশ্লেষণের স্থান-সংকুলান হইবে না; পরন্তু এ ক্ষেত্রে তাহা নিষ্প্রয়োজন। তবে ডাক্তার কালী মহাশয়কে সু-লেখক বলিতে হইলে, এক কথায় বলা যায়, তিনি স্বাধিকারভুক্ত সন্দর্ভ, সাধারণের বোধগম্য করিবার জন্য যে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাতে তিনি সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য হইয়াছেন।

কেবল সু-লেখক বলিলেই, ডাক্তার কালী মহাশয়ের প্রশংসাবাদ একেবারে পক্ষপাতিতা শূন্য হয় না। চিকিৎসা-গ্রন্থ-প্রণয়নে ইতিমধ্যে কেহ কেহ সু-লেখক বলিয়া সবিশেষ যশোভাগী হইয়াছেন। বৈদেশিক চিকিৎসা-গ্রন্থের কেবল অনুবাদে, সঙ্কলনে বা সংগ্রহে সু-লেখকের প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করা যায়। তেমন প্রতিষ্ঠাবান্ লেখকের দুই একটী দৃষ্টান্ত দেদীপ্যমানও জানি, কিন্তু চিকিৎসা-গ্রন্থে সম্পূর্ণ নিজস্ব বিষয়ের সমাবেশ করিয়া, প্রগাঢ় গবেষণা বা গভীর চিন্তাশীলতার পরিচয়ে, সু-লেখকের পূর্ণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, এমন লেখকের সংখ্যায় শূন্যপাত করিতে হয়। আমাদের বিবেচনায়, "চিকিৎসা-বিধান" সে সংখ্যার সূত্রপাত। প্রমাণজন্য বহু উদাহরণ সংগৃহীত হইতে পারে; কিন্তু স্থানাভাবই সে সংকল্প সিদ্ধির পক্ষে বিষম ব্যাঘাত। এই প্রকার-পীড়ার প্রবন্ধ-লিখিত "আমাদের নিজের কথা"ই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ হইতে পারে। "চিকিৎসা-বিধানে" বহুবিধ বৈদেশিক গ্রন্থ হইতে অনুবাদ সংগ্রহ ও সংকলন হইয়াছে। তাহাতে গবেষণার গভীরত্ব প্রতিপন্ন হয়। সংকলন ও সংগ্রহের সাকল্যে শক্তি-শালিতার পরিচয় যেমন পদে পদে, রোগ নিদর্শনে ভূয়োদর্শনের প্রমাণও তেমনই পত্রে পত্রে। জ্বর-চিকিৎসা পর্ব্বটী এ প্রমাণের পূর্ণ কেন্দ্র-কেতু। বাঙ্গালী চিকিৎসকের পরিপক্ক মস্তিষ্কের উজ্জ্বল উদাহরণ।

ডাক্তার কালী মহাশয় বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিক। হোমিওপ্যাথি ঔষধ-প্রক্রিয়ায় নিগূঢ় শক্তি-তত্ত্ব নিহিত। দার্শনিক দৃষ্টির অনুপাতে শক্তি-তত্ত্বের স্বরূপনির্দ্দেশ। "এক ফোটা ঔষধ এত আশ্চর্য্য ফলপ্রদ কেন?" "চিকিৎসা বিধানে" এই বিষয়টী বুঝাইবার জন্য, "গ্রন্থকার "তত্ত্ব-শক্তি" ও স্থূল-শক্তির যে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করিয়াছেন, তাহাতে দার্শনিক গভীর ভাব পূর্ণ মাত্রায় প্রতিপাদিত হয়। দার্শনিকের সে গভীর ভাব, অতি সহজ ও সরল বাঙ্গালা ভাষায় ব্যাখ্যাত। এই শক্তি-তত্ত্ব বিশ্লেষণ "চিকিৎসা-বিধানের" অষ্ট-পৃষ্ঠব্যাপী। সুতরাং এখানে আদ্যন্ত উদ্ধারের স্থানাভাব। তবে নিম্নলিখিত দুই একটী উদ্ধৃত অংশে গ্রন্থকারের দর্শন-শক্তির কতক আভাস পাওয়া যাইবে,—

(১) তত্ত্ব-শক্তি প্রকৃত রোগারোগ্যকারিণী, ইহার কার্য্য দ্রব্যের পরিমাণের আনুপাতিক নহে। * (২) স্থূলশক্তি—ইহার নামান্তর তন্মাত্রত্ব শক্তি বা তন্মাত্রত্ব শক্তি, ইহার কার্য্য দ্রব্যের মাত্রা বা পরিমাণের আনুপাতিক অর্থাৎ ঔষধের পরিমাণ যতটুকুমাত্র বা তাহার কোন আনুপাতিক। স্থূল শক্তি প্রকৃত রোগারোগ্য কারিণী নহে। * * * প্রকৃত হোমিওপ্যাথি এই তত্ত্বশক্তি সহায়েই রোগ আরোগ্য করিয়া থাকে। হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সকলের কতক সুগার অব্ মিল্ক (দুগ্ধ শর্করা) সহ টি টিউরেটেড্ অর্থাৎ বিচূর্ণীকৃত হইয়া কতক বা য়্যালকোহল্ (সুরাবীর্য্য) সহ ডাইলিউটেড্ হইয়া প্রস্তুত হয়,—প্রস্তুতকালে তাহারা যে যথারীতি ঘর্ষিত, আলোড়িত ও মিশ্রিত হয়, তাহাতেই ঐ সকল ঔষধে বৈদ্যুতিক শক্তির ন্যায় শক্তিবিশেষ জন্মে। ঔষধে এই প্রকার শক্তির উদ্ভব করা কার্য্যকেই ইংরেজিতে পোটেন্সিয়েসন্ বলে। ঔষধের পোটেন্সিয়েসন্ করা হইলেই তাহাকে শক্তীকৃত ঔষধ বলা যায়, যে শক্তিসংযোগে ঔষধের এই শক্তীকৃত অবস্থা হয়, তাহাই তত্ত্ব-শক্তি নামে অভিহিত হইয়াছে।

* * * *

অনেকে মনে করিতে পারেন যে, ঔষধের পরমাণু যত, ঔষধের তত্ত্ব-শক্তি তত, কিন্তু তাহা অনেক সময় ঠিক কথা নহে। কারণ অগ্নি একটী প্রত্যক্ষ শক্তি (উহা কোন পদার্থ নহে), অগ্নি কণামাত্র অঙ্গারে নিবিদ্ধ থাকিলেও কণিকামাত্র স্থানে উহার শক্তি সীমাবদ্ধ নহে; উহা লক্ষ লক্ষ গৃহ দগ্ধ করিতে পারে, উহার কণিকামাত্র শক্তিও অসীম।

প্রকৃত শক্তি-তত্ত্ব কয় জন বুঝে? ডাক্তার কালীর সে প্রয়াসে, তাঁহার "চিকিৎসা-বিধান" ধন্য হইয়াছে। আর হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা সম্বন্ধে যাহা কিছু জ্ঞাতব্য, তাহা প্রায়ই "চিকিৎসা-বিধানে" দেখিতে পাইবে। একটু শ্রম-সহকারে, আর একটু মনোভিনিবেশে পাঠ করিলে, "চিকিৎসা-বিধানের" সাহায্যেই অনেকটা চিকিৎসা সক্ষম হওয়া যায়, আমাদের এইরূপ বিশ্বাস।

ভাষার সরলতা এবং যথাযোগ্য বাক্‌বিন্যাস-পটুতা গুণে "চিকিৎসা-বিধানের" আলোচ্য

* ইংরেজিতে ফোরস্ ইত্যাদি পদ যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, এই তত্ত্ব-শক্তি তাহা নহে। ইহা তৎ (দ্রব্যের) গুণ বিশেষ। যে সূক্ষ্ম বীজ হইতে প্রকাণ্ড বটবৃক্ষের জন্ম হয়, সেই বীজে বট-বৃক্ষের প্রকৃত বটত্বশক্তি নিহিত থকে, ইহা বীজের গুণবিশেষ। এই গুণ বীজের পরিমাণের আনুপাতিক নহে।

নীরস বিষয়ও আয়ত্ত করিতে মস্তিষ্কেরশান্তি খুব কমই হইয়া থাকে। বাঙ্গালায় অনেক বৈদেশিক বৈজ্ঞানিক শব্দের সংজ্ঞানির্ণয় দুরূহ ব্যাপার। বাঙ্গালীর বোধগম্য করিয়া, অনুবাদে বৈদেশিক শব্দের প্রকৃতপ্রয়োগে অনেককে পরাভব স্বীকার করিতে হইয়াছে; ডাক্তার কালী মহাশয় সে সম্বন্ধে প্রায়ই সর্ব্বত্রই বিজয়ী। শব্দ-সৃষ্টিতে তিনি সিদ্ধ হস্ত। এই জন্য "চিকিৎসা-বিধান" কেবল চিকিৎসা মণ্ডপের কেন, বাঙ্গালা সাহিত্য সংসারেরও একটী সসার সহায়-সম্পত্তি। ভাষা যেমন সরল ও সহজ, তেমনই গাম্ভীর্য্যপূর্ণ। কেবল ভাষার গুণেই চিকিৎসা-রসানভিজ্ঞ ব্যক্তিরও পাঠোন্মেষণা হইতে পারে।

আলোচ্য বিষয়ের শ্রেষ্ঠত্ব ও গুরুত্ব প্রতি-পাদন করিবার জন্য ডাক্তার কালী মহাশয় কিরূপ তেজস্বিনী ভাষায় স্বকীয় মতপোষণী যুক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহার একটু নমুনা এইখানে উদ্ধৃত হইল,—

"হোমিওপ্যাথির ন্যায় অধিকতর বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে অন্য কোন মতের চিকিৎসাই স্থাপিত নহে, ইহা সত্য; কারণ, যে কলখানি বিজ্ঞ ও অতি উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি না হইলে চলিবে না, যদি এমন হয়, তবে জানিবে, কল ঠিক হয় নাই, অথবা সে কলে দোষ আছে। কিন্তু দেখ, রেলগাড়ির ইঞ্জিনখানা স্বল্পশিক্ষিত ড্রাই-ভার (পরিচালক) এমন কি, ফায়ারম্যানও (অগ্নি-রক্ষকও) সর্ব্বদা দ্রুতগতিতে সম্মুখদিকে চালাইতেছে, পশ্চাৎধাবিত করিতেছে ও ইচ্ছামত থামাইতেছে। এই প্রকার গাড়ির ইঞ্জিনখানার ন্যায় যে কল যত সামান্য বুদ্ধির লোক দ্বারা যত পরিমাণ সহজে পরি-চালিত হইতে পারে, সেই কল তত পরিমাণ উৎকৃষ্ট ও তত দৃঢ় বিজ্ঞান-ভিত্তির উপর নির্ম্মিত। এই কথা বৈজ্ঞানিকমাত্রেই স্বীকার করিবেন। আবার দেখ, আমাদের দেশে থনার বচন দ্বারা যে অতি সামান্য অজ্ঞ লোকেও অনেক কঠিন ও জটিল বিষয় বলিতে এবং দেখাইতে সক্ষম হয়, তাহার মূল কথা এই যে, তাহা অতি শ্রেষ্ঠ ও প্র্যাক্‌টিক্যাল এবং বিচক্ষণ বিজ্ঞানোপরি সংস্থাপিত। এইরূপ সত্যতা আমরা হোমিওপ্যাথিতে অধিকতররূপে দেখিতে পাই। ২য়, ৩য়, পৃষ্ঠাস্থ রোগিদ্বয়ের বৃত্তান্তে দেখ যে, ঐ ঐ স্থলে কেবলমাত্র জিহ্বা যন্ত্রের কলটী ধরিয়া রোগীদ্বয়কে আশ্চর্য্যজনক আরোগ্য করা হইল। ২৫২ পৃষ্ঠাস্থ বিকার-রোগী "যাহাকে সম্মুখে পায়, তাহাকেই কামড়াইয়া ধরে"—বেলেডোনা-বিকারের এই একটী প্রধান লক্ষণ দৃষ্টে বেলেডোনা দিয়া হাতে হাতে দৈবশক্তির ন্যায় ঔষধের ফল দেখিলাম। এই প্রকার অনেক সময় অতি সূক্ষ্ম-তম জ্ঞানের কিম্বা কুটিল বিচারের অপেক্ষা না করিয়া, প্যাথলজী বা নিদানের অন্ধকার ও অনিশ্চিত গৃহে না ঘুরিয়া, এমন কি রোগের নাম পর্য্যন্তও অনেক সময় না জানিয়া, হোমিওপ্যাথির সরল বিধি 'সম-লক্ষণ-সূত্রে ঔষধের ও রোগীর লক্ষণের সমতা লক্ষ্য করিয়া ঔষধ প্রয়োগে" অতি উৎকট উৎকট রোগ মুহূর্ত্ত-মধ্যে অনেক সামান্য শিক্ষিত ব্যক্তিও আরোগ্য করিতে সক্ষম হয়। আমার কথার সত্যতা বোধ হয়, বঙ্গদেশের অনেক গ্রামেই অনেকে বহুবার লক্ষ্য করিয়াছেন। আমি অনেক সময় স্বচক্ষে দেখিয়াছি, যে, অনেক গ্রাম্য-স্কুল-পণ্ডিত ও স্বল্প-শিক্ষিত ভদ্রলোক মহাশয়েরা হোমিওপ্যাথির দ্বারা এতদূর কঠিন ও উৎকট পীড়া আরোগ্য করিয়াছেন যে, তাহা বিজ্ঞানা-ভিমানী চিকিৎসকদিগের দ্বারা সম্ভব হইত কিনা সন্দেহ। তাঁহারা প্যাথলজী ইত্যাদি কিছু জানেন না বলিলেই হয়, এমন কি, অনেক রোগের নাম পর্য্যন্তও জানেন না; কিন্তু মহাত্মা হানিমানের সরল বিধি অর্থাৎ সম-লক্ষণ-সূত্রে ঔষধের ও রোগীর লক্ষণের সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়া ঔষধ-প্রয়োগেই তাঁহাদের ব্রহ্মাস্ত্র। আমি ইহার দ্বারা ইহা বলিতেছিনা যে, এনাটমী, প্যাথলজী, নিদান ও ফিজিওলজী ইত্যাদি শিক্ষা কিছুই নহে; মূল কথা আমার এই যে, হোমিওপ্যাথি এ প্রকার একখানি বিশেষ বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসার কলবিশেষ সৃষ্ট হইয়াছে যে, প্যাথলজী, ফিজিওলজী ইত্যাদিতেও জ্ঞান না থাকিয়াও, এমন কি রোগের নাম পর্য্যন্তও অনেক সময় না জানিয়া, সামান্য শিক্ষিত ফায়ারম্যান বা ড্রাইভারের ন্যায় অনেকে হোমিওপ্যাথির কলখানি সুন্দর চালাইতে সক্ষম হন। অথবা অভ্যস্ত খনার-বচন ব্যবহারের ন্যায় কেবলমাত্র হোমিওপ্যাথির ভৈষজ্য-তত্ত্ব সহায়ে অদ্ভুত ফল দেখাইতে সক্ষম হন। এই একমাত্র গুণের দ্বারাই হোমিওপ্যাথি বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিবার যোগ্য। মৃত রাজেন্দ্র দত্ত মহাশয় ও মৃত লোকনাথ মৈত্রেয় মহাশয় ফিজিওলজী, প্যাথলজী ইত্যাদির বিশেষ ধার ধারিতেন না; তাঁহারা "সম-লক্ষণ-মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া যে যশলাভ করিয়া গিয়াছেন, তাহা এ পর্য্যন্ত অত্যুচ্চ শিক্ষিত কোন শিবিল সার্জ্জনের অদৃষ্টে ঘটিয়াছে কিনা সন্দেহ!!!"

রীতিমত শিক্ষা ভিন্ন জীবন-মরণ-ব্যাপারে

বার তার হস্তক্ষেপ-কারিতা সুযুক্তি সঙ্গত নহে। তবে হোমিওপ্যাথি, চিকিৎসার একটা নিরাপদ পন্থা; বিশেষতঃ ইহার ঔষধ-প্রয়োগের বিপ-র্য্যয় তাদৃশ হানিকর নহে। "চিকিৎসা-বিধানে" ঔষধ-প্রয়োগাদির বিষয় যে প্রণালীতে প্রকটিত হইয়াছে, তাহাতে ঔষধ প্রয়োগে বিপর্য্যয় ঘটিবার আদৌ সম্ভাবনা নাই।

স্থূলকথা, বিবিধ বিধানে "চিকিৎসা-বিধান" সাধারণের পরম উপকারী হ য়াছে। মুমুক্ষের পক্ষে যেমন মহাভারত, হোমিওপ্যাথিচিকিৎসা-প্রার্থী ও চিকিৎসাকারীর পক্ষে "চিকিৎসা-বিধান" সেইরূপ। কি চিকিৎসা হিসাবে, কি সাহিত্য হিসাবে, "চিকিৎসা-বিধান" বাঙ্গালী মাত্রেরই অপূর্ব্ব গৌরব-পদার্থ। এখন একজন বাঙ্গালী, এই "চিকিৎসা-বিধানের" দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া, স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক বলিতে পারেন, এতদিন পরে বাঙ্গালায় এমন একখানি চিকিৎসা গ্রন্থ হইয়াছে, যাহা যাবতীয় সুসভ্য পরকীয় ভাষায় অনুবাদিত হইবার সম্পূর্ণ যোগ্য।

এই "চিকিৎসা-বিধানে"র একত্র তিন খণ্ডের মূল্য ৭৲ সাত টাকা। কলিকাতা ১৫০ নং কর্ণওয়ালিসষ্ট্রীট, সি, কাইলাই এণ্ড কোম্পানীর নিকট প্রাপ্তব্য।

তারা।

(১)

ঢুলু ঢুলু আঁখি, তারা! কহ কি কারণ?
একি তব প্রেম নিদর্শন!
নিশিকোলে অবিরত, আকাশ-কুসুম মত,
মৃদু হাসি ঢাল সুধা সোহাগের ভরে;
অনিমিষে চেয়ে রই উদাস অন্তরে!

(২)

সংসার বাসনা, আশা, উন্নতি-প্রয়াস,
জীবনের সুখ অভিলাষ!—
অসার স্বপন প্রায়, অযতনে ঠেলে পায়,
মধুর মাধুরী তোর করিতে গ্রহণ,
সাধ হয়, প্রাণ মন করি সমর্পণ!

(৩)

নিবিড় তামসী নিশি আঁধার ভুবন,
লক্ষ্যহীন না চলে নয়ন!
ভ্রান্ত পান্থ চলে ধীরে, আসে পাশে চায় ফিরে,
হাসিয়া ললিত হাসি দেখাইয়া পথ,
প্রেমময়ি! কর তার পূর্ণ মনোরথ।

(৪)

সীমাহীন সাগরের ভৈরব-গর্জ্জন,
অবিশ্রান্ত করে যেন রণ!
অতি ক্ষুদ্র ভেলা প্রায়, ধীরে পোত ভেসে যায়,
কর্ণধার কর্ণমাত্র তুমি লক্ষ্য স্থল,
অর্ণবে তোমার দীপ্তি ভরসা কেবল!!

(৫)

মৃত্যু-শয্যা শায়ী নর ক্ষীণ কলেবর,
হীন বল বিকল অন্তর!—
জীবনের আশা তার, তোর মত অনিবার,
ঢালে প্রাণে ধীরে ক্ষীণ মধুর কিরণ,
আশাময়ি! এ কেমন মায়ার ছলন?

(৬)

প্রবাসে হুতাসে ভাসে প্রেমিক-হৃদয়,
সঙ্গোপনে মর্ম্ম-ব্যথা সয়!
নীরবে তোমার পানে, চেয়ে থাকে শূন্য প্রাণে,
মনে হয় প্রেমিকার সজল নয়ন,
স্বপনে স্বপন দেখা সে বিধুবদন!

(৭)

নব অনুরাগে মত্ত নবীন দম্পতি,
নিদ্রা যায় যুবক যুবতী!
গবাক্ষে অলক্ষ্যে আসি, মধুহাসি পরকাশি,
প্রেমিকের প্রেম-লীলা কর দরশন,
ভালবাস দেখিতে কি মিলন-চুম্বন?

(৮)

শশধর সহচরী, সুদূর আসন,
কেবা জানে কি ভাবে মগন!
কণ্ঠহার কলঙ্কের,
শোভা পায় শশাঙ্কের,
বাসি ভয়, পাছে হয়, কলঙ্ক আভাষ!
সঙ্গগুণে হয় তার স্বরূপ প্রকাশ!!

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ দত্ত।

সয়তান।

বলিহারী বাইবেলের কবি!—তোমার অনেক অনুশীলন ও সাধনার ফল—সয়তান চিত্রের অবতারণা। যে পাপ করে, সে-ত পাপী; কিন্তু যে মূর্ত্তিমান পাপ,—পাপে যে গঠিত, পাপে যে বর্দ্ধিত, পাপেই যে লয়-প্রাপ্ত,—সুতরাং পাপই যার প্রাণ, তাহাকে ত পাপী বলিলে চলিবে না, তাহার জন্য নূতন আখ্যার প্রয়োজন।—নহিলে, মনের ভাব প্রকাশের জন্য যে ভাষার সৃষ্টি, সে ভাষা যে অসম্পূর্ণ রহিয়া যায়!—তাই বাইবেলের কবি অনেক ভাবিয়া, অনেক চিন্তিয়া, অনেক অনুশীলন ও সাধনা করিয়া, সেই মূর্ত্তিমান পাপের নামকরণ করিলেন—**সয়তান**।*

এই সয়তান-চিত্র কবির সম্পূর্ণ নিজস্ব-ধন। এবং এই চিত্রটীর জন্য কবির অপূর্ব্ব ও অসাধারণ উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

পাশ্চাত্য কবি মহামতি মিল্টন বাইবেলের এই সয়তান চিত্রের উপর তাঁহার অপূর্ব্ব কবিত্ব তুলিকা বুলাইয়া কাব্য-জগতে কি অপূর্ব্ব সুন্দর সৃষ্টি করিয়াছেন, ইংরাজী-অভিজ্ঞ পাঠকের তাহা অবিদিত নাই। * আজ জন্মভূমির চিন্তাশীল ও সহৃদয় পাঠকবর্গকে সেই মহাকবির আলেখ্য-খানির এক অংশের একটু পরিচয় দিব, এবং সয়তানধর্ম্মী মানবের মতিগতি ও কার্য্য পদ্ধতির একটু আলোচনা করিব। ফলতঃ, বাইবেলের কবি ও প্যারাডাইস্ লষ্টের কবি সয়তান সম্বন্ধে যে সব কথা বলিয়াছেন, উপস্থিত প্রবন্ধ, সেই অমৃতময়ী উক্তির ক্ষীণ প্রতিধ্বনি মাত্র।

মহাকবির সৃষ্ট সয়তানের 'ছক'টী এইরূপ;—

ঈশ্বর অলোক, সয়তান অন্ধকার। ঈশ্বর সুখ, সয়তান দুঃখ। ঈশ্বর শান্তি, সয়তান অশান্তি। ঈশ্বর যাহা করিয়াছেন, সয়তান তাহার বিপরীত করিয়াছে। সয়তানের তাহাতে অন্য লাভ না থাকুক, সে তাহা দেখিবে না। ঈশ্বরের উজ্জ্বল চিত্রফলকে স্বন কালিমা ঢালিয়া দিয়াই সে পরিতৃপ্ত। সয়তান হিংসা, পাপ ও কামের সংমিশ্রণ। অথবা তাহার স্বরূপ, সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করা আমাদের পক্ষে একান্ত দুঃসাধ্য।

ঈশ্বর এই পরিদৃশ্যমান বিশাল ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিলেন। স্বর্গ ও মর্ত্ত্য সুবর্ণ শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইল। মনুষ্যের আদি-পুরুষ, ঈশ্বরের প্রতিকৃতি স্বরূপ হইল। তেমন রূপ—অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্যে ও সৌকুমার্য্যে সমুজ্জ্বল—তেমন রূপ কেবল মনোমধ্যে অনুভব করিতে পারা যায়। আর সেই রূপের ভিতর কি অপূর্ব্ব সুন্দর হৃদয়!—পাপের মলিনতা দূরে থাকুক,—পুণ্যে ও পবিত্রতায় সে হৃদয় পরিপূর্ণ। আর সেই যে সরলতা—তাহা কি নির্ম্মল, স্বচ্ছ এবং নির্দ্দোষ ও আবিলতাশূন্য! এই 'কুহকদুরিতপূর্ণ' সংসারে তেমন সরলতা বড় দেখিতে পাইবে না! সন্ধ্যা-সমীরণ-কম্পিতা শ্যাম-পল্লবিনী কুসুমিতা লতিকার ন্যায় যেন সেই সরলতা মধুর সৌন্দর্য্যে ঢল ঢল করিতেছে। সেই আদি-পুরুষ নির্ব্বাক-নির্নিমেষ নেত্রে, তাঁহার সেই অলৌকিক সৌন্দর্য্যময়ী, প্রিয়তমা সহধর্ম্মিণীর মুখপানে চাহিয়া আছেন। সেই লাবণ্যময়ী রমণীও অপূর্ব্ব রূপপ্রভায় প্রদীপ্ত স্বামীর মুখপানে চাহিয়া আছেন। সেই চারি চক্ষুর পলক বুঝি আর পড়ে না! আ-মরি মরি! কি রূপ রে! রূপে কি প্রাণময়ী প্রতিভা-রে! সেই আদি-রমণীর কি সুন্দর নয়ন! নয়নে কি স্নিগ্ধ দৃষ্টি! দৃষ্টিতে কি সারল্য! সারল্যে কি প্রীতি-পবিত্রতা! প্রীতি-পবিত্রতায় কি নিরবচ্ছিন্ন বিমল প্রেম! মধুকর গুন্ গুন্ রবে, কমল-ভ্রমে, সেই সৌন্দর্য্যময়ীর মুখপানে ধাবিত হইতেছে; কুসুমিত তরুশাখে বসিয়া, সেই সৌন্দর্য্য বিমোহিত হইয়া, মধুরকণ্ঠ বিহঙ্গ মধুর গান করিতেছে! সে সকলই সুন্দর! সম্মুখে স্রোতস্বতী প্রবাহিত; সেই স্বভাব সুন্দরী আদি-রমণী স্রোতস্বতীর স্বচ্ছসলিলে নিজ প্রতিবিম্ব দেখিতেছেন; দেখিতে দেখিতে আপন সৌন্দর্য্যে আপনি আত্ম-হারা হইতেছেন! সেই আদি-পুরুষের ললাটে প্রতিভার কিরণ সমুজ্জ্বল; নয়নে পবিত্রতা, মুখে দিব্য জ্যোতি, অধরে মৃদু হাসি, হৃদয়ে পুণ্য!—আবার সেই শোভাময়ী সৌন্দর্য্য-প্রতিমা আদি-রমণীর সমগ্র অবয়বে প্রেম ও পবিত্রতা, শান্তি ও করুণা, দয়া ও ধর্ম্মজ্যোতি যুগপৎ প্রকটিত।

আবার দেখ;—সন্ধ্যার ক্রোড়ে নব-রবি অস্তগত হইল। স্বামী ও স্ত্রী আকাশপানে চাহিয়া দেখিলেন। দেখিলেন,—সূর্য্য নাই—অন্ধকার! ভাবিলেন, "এ আবার কি হইল! ঐ প্রখর আলোক সহসা নিবিল কেন? হায়, আর কি দেখিতে পাইব না?" রাত্রি শেষ হইল। প্রভাতে আবার পূর্ব্ব-গগনে রবির উদয় হইল! মহা উল্লাসে, প্রীতিপূর্ণ-নেত্রে স্বামী ও স্ত্রী সূর্য্যোদয় দেখিতে লাগিলেন। ভাবিলেন, "ইহা কি সেই সূর্য্য, না নূতন?" আবার সন্ধ্যা হইল,—সূর্য্য অস্ত গেল;—যথা সময়ে আবার প্রভাত আসিল,—প্রভাতের সহিত সূর্য্যও দেখা দিল! তখন স্বামী স্ত্রী বুঝিলেন, সেই একই সূর্য্যের উদয়াস্ত হইতেছে বটে। কেবল দিবা ও রাত্রিতে দিন বিভক্ত হইয়াছে মাত্র।

তখন মৃত্যু, জরা, শোক, তাপ—কিছুই নাই!

তারপর কবি দেখাইতেছেন, ঈশ্বরের এই মধুর সৃষ্টি দেখিয়া, সয়তানের হিংসা হইল। হিংসা পূর্ব্বাবধিই ছিল। ঈশ্বর স্বর্গের রাজা, সর্ব্বশক্তিমান; সয়তান তাহা সহ্য করিতে পারে না। সুতরাং সে স্বর্গে এক মহা বিদ্রোহ তুলিল। কিন্তু বিদ্রোহে পরাস্ত হইয়া, কিসে ঈশ্বরের প্রতি বিরুদ্ধাচরণ করিবে, তাহার সুযোগ খুঁজিতেছিল। যখন ঈশ্বর এক পৃথিবী সৃষ্টি করিলেন, সয়তান হিংসা চরিতার্থ জন্য ঈশ্বরের সৃষ্টি বিলোপ করিতে সঙ্কল্প করিল। সৃষ্টির ধ্বংস না হউক, আলোকে অন্ধকার, পুণ্যে পাপ, সরলতায় কপটতা মিশাইয়া দিয়া সয়তান আনন্দ অনুভব করিতে যত্নবান হইল। এই অপূর্ব্ব কুসুম-উদ্যান, মরু-ভূমিতে পরিণত করিবার জন্য তাহার একান্ত জিদ্ বাড়িল। সৃষ্টির এই আলো ও শোভা তাহার চক্ষে অসহ্য হইল। যেমন শরতের আকাশ, অতি নির্ম্মল ও শুভ্র—কোথাও কিছু নাই,—সহসা এক খণ্ড কাল মেঘ আসিয়া একটু একটু করিয়া দেখিতে দেখিতে সমগ্র আকাশ গভীর অন্ধকারে ঢাকিয়া ফেলে, সয়তানের গভীর হিংসা-দাবাগ্নিতে তেমনি একটু একটু করিয়া এই পবিত্র কুসুম-উদ্যান দগ্ধ করিল। সয়তান সর্পের আকারে, সেই সরলতাময়ী আদি রমণীকে ভুলাইয়া পাপ-স্পর্শ করাইল; আদি রমণীও স্বামীকে সেই পাপে প্রলোভিত করিলেন।

* শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার-লিখিত 'জন্মধর্ম্মী মানব'—নবজীবন।

* Milton's Paradise Lost.

কবি দেখাইলেন, সেই হইতেই মনুষ্য মধ্যে নানা পাপ ও অশান্তি এবং জরা ও মৃত্যু!

সয়তানের অভীষ্ট সিদ্ধ হইল!

তারপর, কবি আরও দেখাইতেছেন;—

সয়তান ইহাতেও ক্ষান্ত নহে। মানুষ পাপের অন্ধকারে ডুবিয়াও এক একবার পুণ্যের আলোক দেখিবার জন্য ব্যাকুল-হৃদয়ে ভগবান্‌কে ডাকিতে থাকে,—আর সয়তান তখন করে কি?—মা, সে সেই অন্ধকারে 'আলেয়ার' আলো দেখাইয়া মানুষকে আরও প্রলুব্ধ করে; তাহাকে ঘোর অন্ধকারে—অধঃপতনের চরম সীমায় লইয়া যায়, শেষে তাহার সর্ব্বনাশ সাধন করে।

কবি শেষে বলিতেছেন,—এই সয়তান সর্ব্বদাই মানুষের মনের ভিতর উঁকি মারিতেছে; সময় ও সুবিধা পাইলেই তাহাকে দংশন করে।

তাই বলিতেছিলাম, বলিহারী বাইবেলের কবি!—সয়তান চরিত্রের উদ্ভাবনায় প্রকৃতই তোমার বাহাদুরী আছে! মহাকবি মিল্‌টনের যে আজ জগৎ যুড়িয়া কৃতিত্ব, তাহারও মূলে তুমি।—তোমারই সয়তানের ছায়া লইয়া তাঁহার কাব্যচিত্র সম্পূর্ণ। কি পাকা কথা,—যে পাপ করে, সে ত পাপী; কিন্তু যে মূর্ত্তিমান্ পাপ,—তাহাকে ত পাপী বলা চলে না,—সে সাক্ষাৎ সয়তান

এইরূপ সয়তানধর্ম্মী জীব, এই সংসার ক্ষেত্রেও বিরাজ করে। সয়তানকে কবিগণ সর্পের সহিত তুলনা করিয়াছেন। সর্পের ন্যায় খল, এই অনন্ত প্রাণিজগতে আর কিছু পরিদৃষ্ট হয় না; কিন্তু সর্প-হৃদয় সয়তানধর্ম্মী মনুষ্য, বুঝি, সেই সর্প অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর!—সয়তানের খলতা বুঝি সর্পকেও পরাভব করে!

বুদ্ধিকৌশলে সর্পকেও বশীভূত করা যায়, কিন্তু সর্প-হৃদয় মনুষ্যকে বশীভূত করা বড় শক্ত কথা। সাপের বিষ-দাঁত ভাঙ্গিয়া দেওয়া যায়, মন্ত্রগুণেও তাহাকে মুগ্ধ করা যায়;—কিন্তু সর্প-হৃদয় সয়তানধর্ম্মী মনুষ্যকে তুমি কি ঔষধে, কোন্ যাদুমন্ত্রে বশ করিবে? তা ছাড়া, এমনও শুনা গিয়াছে, কোন অত্যাচার না করিলে বা হিংসার উত্তেজক কোন লক্ষণ প্রকাশ না করিলে, কোন কোন কালসাপও সময়-বিশেষে জীবহিংসা করে না। সর্পের জীব-হিংসা অনেক সময় আত্মপ্রাণ রক্ষার জন্য। প্রাণভয়েই সে অনেক সময় অপরের প্রাণ হনন করে। বিশেষ, হিংসার আকরেই সর্পের জন্ম; সুতরাং হিংসাই তাহার স্বধর্ম্ম। এ হিসাবে, সাপের 'সাত খুন' মাপ আছে। কিন্তু তুমি মনুষ্যদেহধারী, জ্ঞানবিবেকের অধিকারী, ভগবানের রাজ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীব,—তুমি কি কারণে, কোন্ যুক্তিতে সর্প অপেক্ষাও শতগুণ ভীষণ ও ভয়াবহ হও, বল দেখি? সাপের ত একটা 'নিশানা' আছে; সাপ বলিলেই লোকে সাত হাত তফাতে যায়; কিন্তু তুমি সয়তানধর্ম্মী মনুষ্য,—সর্প অপেক্ষাও শতগুণ হিংস্রক ও খলস্বভাব, তোমাকে চিনিব কি প্রকারে? সর্প-দংশনে ঔষধ আছে, মন্ত্র আছে, রোজাও আছে;—কিন্তু হে সয়তানধর্ম্মী নর-সর্প! তোমার দংশনে ঔষধ কৈ, মন্ত্র কৈ, রোজাই বা কৈ? সর্প যতই খল হউক, মনুষ্য-বুদ্ধির নিকট তাহাকে মাথা নোঙ্গাইতেই হইবে;—কিন্তু তুমি সয়তান-ধর্ম্মী মনুষ্য, তোমাকে কি উপায়ে, কোন্ বুদ্ধিবলে মনুষ্য-সমাজ আঁটিয়া উঠিবে বল? সাপ—সকলেরই জানা কথা যে, সাপ; কিন্তু তুমি যে সাপ+সয়তান দুই-ই। সুতরাং তুমি যথায় বিষবহ্নি উদ্গীরণ কর,—সেখানে আর কিছুতেই রক্ষা নাই,—সেখানকার সকলই জ্বলিয়া পুড়িয়া খাক্ হয়।

ঘা না খাইলে লোকে তোমাকে হঠাৎ

চিনিবে কিরূপে বল?—বিশেষ তুমি কখন সাপ হইয়া কামড়াও, আবার কখন রোজা হইয়া ঝাড়াও;—তোমার ও সূক্ষ্মবুদ্ধির ভিতর সহসা প্রবেশ করে, সাধ্য কার? সত্য বলিতেছি, যদি তুমি শুধু সাপ হইতে, তাহা হইলে পৃথিবীর বিশেষ কিছু ক্ষতি-বৃদ্ধি হইত না; কিন্তু একাধারে তুমি সাপ+সয়তান হইয়া,—সাপের ষোল আনা কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়া লইয়া বেশীর ভাগে সয়তানের যাবতীয় বৃত্তিগুলি আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছ!—সুতরাং চাই কি, আমি সাপকেও এক দিন বিশ্বাস করিলেও করিতে পারি, কিন্তু হে চৌদ্দপুয়া দেহধারী সয়তান-ধর্ম্মী মনুষ্য,—তোমার নামে আমি শিহরিয়া উঠি!

তুমিই দেবতার মন্দির ভাঙ্গিয়া বারনারীর কেলিগৃহ নির্ম্মাণ কর; শান্তিময় সোণার সংসারকে তুমিই শ্মশানে পরিণত করিয়া থাক; আর হে জগতের প্রভা-শোভা-আভা-বিভা-আলোক-অসহিষ্ণু, শ্রী-কাতর সর্প+সয়তান-ধর্ম্মী মনুষ্য,—তুমিই বড় সাধের "সাজান বাগান" শুকাইয়া মারিয়া ফেলিয়া, তথায় মরুভূমির বালুকাস্তূপ সঞ্চয় করিয়া আনন্দ পাও!—তোমাকে আমরা কোন্ নামে অভিহিত করিব, বল?

দেখ, সোণার সীতা বিসর্জ্জিতা হইয়াছিলেন,—তোমার মহিমায়; রামরূপী নারায়ণ রাজতক্তে না বসিয়া জটাবল্কল পরিধান করিয়া বনবাসী হইয়াছিলেন,—মূলে তোমার শক্তি বিদ্যমান ছিল বলিয়া; পাঞ্চালনন্দিনী রজস্বলা-দশায় কেশাকর্ষণ সহকারে পাপ কৌরব-সভায় আনীতা হইয়াছিলেন,—তাহার মূলেও তুমি; পঞ্চপাণ্ডব যে অজ্ঞাতবাসে অতি কষ্টে প্রতিপল যুগসম অতিবাহিত করিয়া জীয়ন্তে মরিয়াছিলেন,—তাহাতে ও তোমার প্রভাব দেখিতে পাই। তুমি কখন পুরুষবেশে মারিচ হইয়া 'মায়ামৃগ' সাজিয়া লক্ষ্মীস্বরূপিনী জনকনন্দিনীর সর্ব্বনাশ সাধন কর; আবার কখন নারীবেশে মন্থরা সাজিয়া কৈকেয়ীর হৃদয়ে বিষের বাতি জ্বালিয়া দাও।—কখন তুমি শকুনিরূপী মন্ত্রী হইয়া মতিচ্ছন্ন নৃপতিকে পাপ-মন্ত্রে দীক্ষিত কর; আবার কখন বা পূতনারূপিনী রাক্ষসী হইয়া মোহিনী বেশে হেসে হেসে পৌরস্ত্রী কুল-কামিনীগণকে মুগ্ধ কর! তাই বলিতেছিলাম, হে সয়তানধর্ম্মী বিধাতার অদ্ভুত সৃষ্টি!—তুমি পুরুষ কি নারী, দেবতা কি দানব, ডাকিনী কি সাপিনী,—তোমায় আমি চিনিলাম না!

কবিগণ কাব্যে ও সাহিত্যে তোমাকে অশেষপ্রকারে আলোচনা করিয়া দেখিয়াছেন; তোমাকে ঠিক চিনিতে পারেন নাই, তোমার যথোচিত আখ্যাও দিতে পারেন নাই। সকল দেশে, সকল সময়ে, সকল অবস্থাতেই তোমাকে দেখিতে পাই। সেই বৈদিক ও পৌরাণিক যুগ হইতে অধুনাতন নব্যতন্ত্রের 'উন্নতির' যুগ পর্য্যন্ত ধারাবাহিকরূপে তোমার একটা ইতিহাস আছে। হিন্দুর অধঃপতন, ম্লেচ্ছের উত্থান; ম্লেচ্ছের পতন, পাশ্চাত্য জাতির অভ্যুদয়—সকলই অল্পবিস্তর তোমার সাহায্যেই হইয়াছে ও হইতেছে! কথাটা এই যে, যখনই কোন দেশ বা রাজ্য এক হস্ত হইতে হস্তান্তরে গিয়াছে, প্রায়ই দেখা গিয়াছে, আত্ম-প্রতিষ্ঠায় যত্নবান, স্বার্থপর, নিচাশয় কোন ব্যক্তি অতি গোপনে তাহার মূলে সহায়তা করিয়াছে! হয় ত পরিণামে তাহার ইষ্টলাভ হইল না, কিন্তু তথাপি সে সেই কার্য্যে সহায়তার জন্য আনন্দ অনুভব ভিন্ন অনুতাপ করিবে না। যে কেবল পাপের জন্য পাপ করে, সে সয়তান ভিন্ন আর কি? কিন্তু—এ হিসাবে, তুমি একের বন্ধু, অন্যের শত্রু। অপরেরও যে বন্ধু হও, তাহা স্বইচ্ছায় নহে, এবং অপরের বন্ধু হওয়া তোমার স্বভাব-বিরুদ্ধ। তুমি যে মনে-

জ্ঞানে জানিয়া শুনিয়া কাহারও ইষ্টসাধন করিতে পার, কাহারও শ্রী সহিতে পার, এ কথা তুমি 'হলপ' করিয়া বলিলেও আমি বিশ্বাস করিতে পারিব না। তুমি আপনার আলোকে আপনি-ই শঙ্কিত হও; আপনার ইষ্টসাধন করিতে গিয়া পাছে অন্যের এক চুল ইষ্ট হয়, এই ভাবনায় তুমি অনেক সময় আত্মইষ্টও সিদ্ধ কর না।

পাঠক, সয়তানধর্ম্মী, সেই "দুই ভাইয়ের" গল্প কি শুন নাই?—একদিন গ্রীষ্মকালে, ঠিক দু'পুর বেলা, দুই ভাই একটা প্রকাণ্ড মরুভূমি পার হইয়া যাইতেছিল। সঙ্গে মাত্র এক কলসী জল। যখন উভয়েই পিপাসায় বড় কাতর হইয়া পড়িল, তখন উভয়েই একটু একটু জলপান করিতে মনস্থ করিল। কিন্তু জল কলস নামাইয়া উভয়ের মধ্যে বচসা উপস্থিত হইল, কে অগ্রে জলপান করিবে? বচসা যখন বড়ই বাড়িয়া উঠিল, তখন দৈবাৎ, সেই যত্নসঞ্চিত,—গ্রীষ্মকালীন দ্বিপ্রহর রৌদ্রে মরুভূমি মাঝে সেই পূর্ব্বসঞ্চিত তৃষ্ণার জল-টুকু, কলসী গড়াইয়া পড়িয়া গেল! চক্ষের নিমেষে সেই উত্তপ্ত বালুকারাশি সেই জল-টুকু শুষিয়া লইল। সে শোষণে একটু চোঁ শব্দও হইল না। তখন দুই ভাইয়ের চৈতন্য হইল। 'কে অগ্রে পান করিবে' এই লইয়া বিবাদ;—এখন সে পানের আশাই এককালে লোপ পাইল;—তা অগ্র আর পশ্চাৎ! তখন উভয়ে অতি কাতরভাবে, সঘন সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে সেই জলপতিত স্থানটুকু নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। বুঝি, মনে হইতে লাগিল, "এই বালুকাভ্যন্তর হইতে কি পুনরায় সেই হারানিধি পাওয়া যায় না? কি করিলে এখন এই বালির রাশি নিঙ্গাড়িয়া জল বাহির করিতে পারা যায়?"

দুই ভাইয়ের যখন এইরূপ মনের অবস্থা, তখন সেই জল-পতিত স্থানটুকু হইতে ঈষৎ ধূম উত্থিত হইল। ক্রমেই সে ধূম ঘন আকার ধারণ করিল। তখন সেই দুই ভাইয়ের মনে একটু ভয়, একটু বিস্ময়, একটু কৌতূহলেরও আবির্ভাব হইল। দেখিতে দেখিতে তাহারা দেখিল, সেই বালুকা স্থান সহসা দ্বিধা বিভক্ত হইয়া একটী গহ্বরে পরিণত হইল এবং সেই গহ্বর হইতে প্রকাণ্ড এক ভয়াবহ-মূর্ত্তি দৈত্য বা যক্ষ উত্থিত হইয়া তাহাদের সম্মুখে দাঁড়াইল। তখন সেই মূর্ত্তি দেখিয়া দুই ভাইয়ের আত্মাপুরুষ, একেবারে উড়িয়া গিয়াছে;—প্রাণভয়ে তাহারা বাত্যান্দোলিত কদলী বৃক্ষের ন্যায় কাঁপিতে লাগিল। যক্ষ তাহাদিগের ভয় দূরীকরণার্থ, যতদূর সম্ভব বিনীতভাবে, যক্ষের গলার আওয়াজে কহিল, "তোমাদের কোন ভয় নাই; আমি তোমাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়া বর দিতে আসিয়াছি, যথা ইচ্ছা গ্রহণ কর। কিন্তু দেখ, আমার বরের বিশেষত্ব এই, তোমাদের দুই ভাইয়ের মধ্যে যে অগ্রে আমার নিকট যাহা প্রার্থনা করিবে, দ্বিতীয় ব্যক্তি বিনা প্রার্থনায় তাহার দ্বিগুণ ফললাভ করিবে। তা প্রথম ব্যক্তি তার মনের যতখানি মানস সবটাই প্রার্থনা করিতে পারে; সে প্রার্থনা যতই দুঃসাধ্য হউক আমি অম্লান-বদনে তাহা পূর্ণ করিব; কিন্তু এ কথা মনে রাখিও, দ্বিতীয় ব্যক্তি বিনা প্রার্থনায় প্রথম প্রার্থনাকারীর দ্বিগুণ ফললাভ করিবে!"

মহা সমস্যা পড়িয়া গেল! উপায় কি! হ'লো কি!—তাইত, এখন 'দুই ভাই' করে কি? কে আপনার দুনো গণ্ডা ছাড়িয়া প্রথম বর প্রার্থনা করে বল?—চাহিলেই যে এক, আর না চাহিলেই যে দুই! এখন উপায় কি? বড় ভাই ভাবিতেছে, "আচ্ছা, যক্ষ যখন বলিতেছে, যা প্রার্থনা করিব, তাই দিবে,—তা ভাল, আমিই কেন আগে যে-কোন-একটা খুব বড় বর লই না।" পরমুহূর্ত্তেই ভাবিতেছে, "উহুঁ! তা হইবে না,—আমি আগে চাই, আর ছোটজন কিনা অমনি না চাহিয়া ধাঁ করিয়া আমার দুনো লাভ করিয়া বসেন! না—তা হইবে না। ভাল, দেখি না কেন, ছোট ভাই বা আগে কি চায়!"

বলা বাহুল্য, ছোট জনও জ্যেষ্ঠের ন্যায় ভাবিতেছে, "বেশ ত, ধাঁ করিয়া আমি সাত রাজার ধন চাহিয়া বসি না কেন! (একটু ভাবিয়া) উহুঁ, তাহা হইলে দাদা যে চৌদ্দ রাজার ধন পাইয়া বসিবে!—না, তা হইবে না। তবে কি চাই? রাজ্য, রাজকন্যা, ইন্দ্রত্ব, শিবত্ব, বা আর কিছু? উঁহু, দাদা যে তা হ'লে না চাহিয়া দুনো লাভ করিবে! না—আমার চাওয়া হইল না!"

কনিষ্ঠও ত দাদার ভাই বটে; সুতরাং সেও জ্যেষ্ঠের মুখ চাহিয়া রহিল। তখন দু'জনে আকাশ-পাতাল অনেক ভাবিল, কিছুতেই কেহ অগ্রে প্রার্থনা করিতে পারিতেছে না! পারিবে কিরূপে? অগ্রে প্রার্থনা করিলেই যে অপ্রার্থনা-কারী দ্বিগুণ লাভ করিয়া বসিবে!

যক্ষ অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিল; উভয়কে ভাবিতে অনেকক্ষণ সময় দিল; শেষ যখন দেখিল, উভয়ের মনের ভিতর সমুদ্রমন্থনের হলাহল উঠিয়াছে, তখন অন্তরে একটু হাসিয়া মুখে কিছু বিরক্তির ভাব দেখাইয়া কহিল, "তবে, তোমরা কেহই কিছু চাহিলে না; আমি চলিলাম। কি আশ্চর্য্য! লোকে কত সাধ্যসাধনা করিয়া তবে একটুকু মাত্র বর লাভ করে, আর আমি অযাচিত ভাবে তোমাদের সম্মুখে আসিয়া বলিতেছি, 'যথা ইচ্ছা বর প্রার্থনা কর; সে বর যত দুর্লভ হউক, আমি পূরণ করিব'—তোমাদের দু'জনের মধ্যে এতক্ষণের মধ্যে কেহ কোন বর চাহিতে পারিলে না?"

বলা বাহুল্য, যক্ষ পরমুহূর্ত্তেই আবার প্রার্থনার নিয়মটা পুনরুল্লেখ করিয়া কহিল, "কিন্তু একথা অবশ্য তোমাদের মনে আছে, যে কিছু না চাহিবে, সে প্রথম প্রার্থনাকারীর দ্বিগুণ বস্তু বিনা প্রার্থনায় লাভ করিবে!"

নরকের আগুন জ্বলিয়া উঠিল! বাহিরে, সেই মধ্যাহ্নকালীন নিদাঘতপনতাপঝলসিত মরুভূমির সেই অনন্ত বালুকারাশি, আর সহোদরদ্বয়ের মনের ভিতরও সেই ভীষণ জ্বালাময়, সর্প হইতেও বিষম ক্রূর হিংসার আগুন!—দুই আগুনে মিশিয়া নরকের আগুন জ্বলিয়া উঠিল!—দিগ্বিদিক জ্ঞান শূন্য হইয়া, উন্মত্তের ন্যায় কনিষ্ঠ ভ্রাতা যক্ষকে কহিল, "দেব!—অন্য প্রার্থনা আমার নাই,—আমার এক চক্ষু গালিয়া আমাকে কাণা করিয়া দাও! আমার এক চক্ষু গেলে দাদার ত দুই চক্ষু যাইবে!"

যক্ষ মনে ঈষৎ হাসিয়া, অথচ একটু চমকিত হইয়া তৎক্ষণাৎ তথা হইতে অন্তর্হিত হইল। কিন্তু তাহার মনে চিরদিন একটা ঘোর-সন্দেহ রহিয়া গেল, "সর্পজাতি কি মনুষ্য হইতে অধিকতর হিংস্রক!"

আমরা বলি, সয়তানধর্ম্মী মনুষ্য, সর্প অপেক্ষা শতগুণ ভীষণ ও ভয়াবহ।

যে স্বার্থের খাতিরে অর্থাৎ আপন ইষ্ট-সিদ্ধির জন্য অন্যের একটুকু অনিষ্ট করে, সয়তান-ধর্ম্মী মনুষ্যের হিসাবে সে ত দেবতা! আপনারই হউক আর পরেরই হউক, তার ত একটা 'ইষ্ট' সিদ্ধির কল্পনাও থাকে;—কিন্তু সর্প-হৃদয়, সয়তান ধর্ম্মী, মানুষের-চামড়া-গায়ে দেওয়া জীবগুলা যে আত্ম-ইষ্ট তথা জগতের ইষ্ট সাধনের ধারণাও করিতে পারে না;—কাজে করা ত দূরের কথা! আপনার ইষ্টা-নিষ্টের প্রতিও তাহার দৃষ্টি থাকে না, এবং সে দৃষ্টি সে রাখেও না। পরের অমঙ্গল সাধনই

সয়তানের কার্য্য। নিজের যদি তাহাতে কিছু লাভ থাকে ত সে এই যে, পরের সর্ব্বনাশ সাধন করিতে সে সকল সময়ে কৃতকার্য্য হইতেছে। আমি একজনের কথা জানি, সে ব্রাহ্মণ অতি দরিদ্র, নিজের কোন লাভালাভ নাই, কিন্তু কোথাও কাহারও বিবাহের কথা শুনিলে, পীড়িতা কন্যার পথ্য বিক্রয় করিয়াও, দূরদেশে যাত্রা করিয়া, কল্পিত মিথ্যা কথা আরোপ করিয়া বরপক্ষে বা কন্যাপক্ষে কোনরূপ একটা কুৎসিত কলঙ্কের কথা প্রকাশ করে ও বিবাহে গোলযোগ ঘটাইয়া দেয়। তাহার মৃত্যুকালে আমরা একবার সেই প্রকার স্বভাবের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, ব্রাহ্মণ কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়াছিল, "কি জানি, বাব! কাহারও ভাল আমি কখন দেখিতে পারি না! আমার বুকের ভিতর কেমন করিতে থাকে।" অনেকেরই স্বভাব এমনই সয়তানের দ্বারা শাসিত!

দেখ, দেখ, ঐ যে কুঞ্চিত কটাক্ষ, বক্র-দৃষ্টি, 'ত্রিবক্র'রূপী জীবটী,—মুখে মধু হৃদে বিষ লইয়া, মিছরির ছুরিখানি শানাইয়া ঈষৎ মুচকি হাসি হাসিয়া তোমার সঙ্গ লইয়াছে,—যদি তোমার একটুখানিও সংসারাভিজ্ঞতা থাকে, তবে তুমি ও জীবটীকে তোমার ত্রিসীমানায়ও আসিতে দিবে না! উহার নিশ্বাসে বিষের বাতাস বহে; উহার ঈষন্মাত্র চোখ মুখের ইসারায় নরকের আগুন জ্বলিয়া উঠে; আর উহার অন্তস্তল স্পর্শী, অগাধ অর্থসমন্বিত "হুঁ" "না" "উঃ" প্রভৃতি এক আধটী কথায় ভীষণ রক্তপাত, অপঘাত প্রভৃতি মহা-মহা অনর্থ সংঘটিত হইয়া থাকে। পৃথিবীর ইতিহাস, অতি স্পষ্টাক্ষরে এ কথার সাক্ষ্য দিতেছে।

ওথেলোর সেই প্রাণঘাতী ভীষণ অভিনয়ের কথা মনে পড়ে কি? সেই ভীষণতার মূলে এই সয়তান-চিত্র বিদ্যমান। পাপ ইয়াগো না থাকিলে কি মহাকবির মহানাটক সম্পূর্ণ হইত? ওথেলোর হৃদয় মধ্যে যে বিষবহ্নি জ্বলিয়া উঠিল, এবং যে আগুনে পুড়িয়া সরলতাময়ী সতী-প্রতিমা দেস্‌দিমনা পুড়িয়া ছাই হইল,—সে আগুনের মূলে সেই সয়তান, বা সয়তানধর্ম্মী পাপ ইয়াগো! মহা-কবি দেখাইলেন, সয়তানের চক্রে একবার ঘুরিলে আর কাহারও রক্ষা নাই;—এক ক্যাসিওর উপর রাগ তুলিতে গিয়া পাপ ইয়াগো কতদিকে যে কত সর্ব্বনাশ করিয়া বসিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। সয়তান ইয়াগোর সেই একটুকু কথাতে যে কি আগুন জ্বলিল, তাহাকে না জানে? আর সেই আগুনে কি ফুল্ল-কুসুমই দগ্ধ হইল!* তাই বলিতেছি, সয়তান বা সয়তানধর্ম্মী জীবকে দূর হইতে নমস্কার করিও;—তাহাকে কাছে ঘেঁসিতে দিও না। বরং তুমি গাঁট-কাটা ও সিঁদেল-চোরকে বিশ্বাস করিও, তথাপি এ শ্রেণীর জীবের ছায়াও স্পর্শ করিও না।

এই সয়তানধর্ম্মী-জীব নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত। ইহাঁরা স্ত্রী-পুত্র পরিবারবর্গের মধ্যে আছেন; সমাজেও ইহাঁদিগের আধিপত্য আছে; ধর্ম্মমন্দিরে এবং সাহিত্যসংসারেও ইহাঁদিগের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। বাঙ্গালায় যে কতকগুলি কথা প্রচলিত আছে,—যথা বুড়ো বানর, বেয়াড়া বজ্জাৎ, বেজায় বোম্বেটে, পয়জারে পাজী, দারুণ দুর্ম্মুখ, পালের গোদা, হিংসুক, খল, পরশ্রীকাতর, ইত্যাদি ইত্যাদি—তাহা এই সয়তানের সহিত তাহাদিগের অল্পাধিক পরিমাণে আত্মীয়তা আছে বলিয়া। ইহাদিগের প্রত্যেকের পৃথক্ পৃথক্ কাহিনী লিখিতে গেলে, একখানি ছোট খাট 'অষ্টাদশ পর্ব্ব' হইয়া যায়;—সুতরাং আপাততঃ এইখানেই ইহার 'ইতি' করা গেল।

শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত।

* Shakespear's Othelo. Iago—"Ha! I like not that." Act III. Sc. 3.

ন্যায়দর্শন।

(১৩)

মন।

মন নবম দ্রব্য। মনের লক্ষণ—(১) ক্রিয়াবদ্‌বৃত্তিজন্যাবৃত্তিদ্রব্যবিভাজকধর্ম্মবত্ত্বং, (২) সুখসাক্ষাৎকারকরণত্বং, (৩) বিশেষগুণাভাববত্ত্বে সতি (ক), বিশেষগুণবত্তিন্নত্বে সতি (খ), বিশেষগুণবদবৃত্তিধর্ম্মবত্ত্বে সতি (গ) অণুত্বং (৪), স্পর্শবদবৃত্তিধর্ম্মবত্ত্বে সতি অণুত্বং মনস্ত্বম্।

লক্ষণের অনুবাদ।

(১) ক্রিয়াবিশিষ্ট বস্তুতে থাকে এবং জন্য-বস্তুতে না থাকে যে পদার্থ-বিভাজক ধর্ম্ম, তদ্বত্ত্বই মনের লক্ষণ, অর্থাৎ তাদৃশ-পদার্থ-বিভাজকধর্ম্ম-বিশিষ্ট যে বস্তু, তাহাই মন।

(২) সুখসাক্ষাৎকারে যাহা করণ অর্থাৎ কারণ-বিশেষ, তাহাই মন।

(৩) যাহা বিশেষ-গুণাভাব-বিশিষ্ট এবং অণু, তাহাই মন (ক); যাহা বিশেষ-গুণবর্জ্জিত এবং অণু, তাহাই মন (খ); বিশেষ-গুণবিশিষ্ট বস্তুতে যে ধর্ম্ম না থাকে, তদ্বিশিষ্ট হইয়া যাহা অণু, তাহাই মন (গ)।

(৪) স্পর্শবিশিষ্ট বস্তুতে যে ধর্ম্ম না থাকে, তদ্বিশিষ্ট হইয়া যাহা অণু, তাহাই মন।

ব্যাখ্যা।

(১) পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু এবং মনে ক্রিয়া (কর্ম্ম) আছে; পূর্ব্বে বলিয়াছি, পৃথিবী প্রভৃতি ভূতচতুষ্টয় নিত্য,—অনিত্য (জন্য),—দ্বিবিধ;—অর্থাৎ পরমাণু নিত্য, তদ্ভিন্ন অনিত্য কিনা জন্য। মন নিত্য; অনিত্য মন নাই। দ্রব্য-বিভাজক ধর্ম্ম অর্থাৎ যেরূপে দ্রব্যের বিভাগ করা হইয়াছে, তাহা—পৃথিবীত্ব, জলত্ব ইত্যাদি—নয় প্রকার। মনস্ত্বও দ্রব্য-বিভাজক ধর্ম্মের অন্তর্গত।

মন ক্রিয়াবৎ, মনস্ত্ব তাহাতে বৃত্তি অর্থাৎ থাকে; মনস্ত্ব কেবল মনে থাকে, অথচ মন জন্য নহে, সুতরাং মনস্ত্ব জন্য-পদার্থে অবৃত্তি, (থাকে না) এবং উহা দ্রব্য-বিভাজক ধর্ম্ম; তদ্বত্ত্ব মনে আছে, মন ভিন্ন অন্যত্র নাই। লক্ষণ মনে সমন্বিত হইল।

'ক্রিয়াবদ্‌বৃত্তি' কথাটী বাদ দিলে, "জন্যাবৃত্তি-দ্রব্যবিভাজকধর্ম্মবত্ত্বং" এই লক্ষণ হয়; এ লক্ষণ আত্মাতেও সমন্বিত হয়। কেননা, আত্মা জন্য নহেন, আত্মত্ব কেবল আত্মাতেই থাকে; এবং উহা দ্রব্যবিভাজক ধর্ম্ম, অতএব জন্যাবৃত্তি-দ্রব্যবিভাজকধর্ম্ম-বিশিষ্ট—আত্মাও হইলেন। জন্যাবৃত্তি-দ্রব্যবিভাজকধর্ম্মবত্ত্ব আত্মাতে থাকিল। মনই লক্ষ্য; কিন্তু লক্ষ্য অপেক্ষা অধিক স্থানে লক্ষণ-সমন্বয় হওয়াতে 'অতিব্যাপ্তি' দোষ ঘটিল।

'ক্রিয়াবদ্‌বৃত্তি' কথাটী রাখিলে আর দোষ নাই। কেননা, আত্মাতে ক্রিয়া নাই, আত্মা ক্রিয়া-বিশিষ্ট নহেন। তবে আত্মত্ব ক্রিয়াবদ্‌বৃত্তি হইবে কিরূপে? আত্মত্ব ক্রিয়াবদ্‌বৃত্তি না হওয়াতেই আত্মত্ব লইয়া যে দোষ হইতেছিল, তাহা রহিত হইল।

'জন্যাবৃত্তি' কথাটী বাদ দিয়া কেবল "ক্রিয়াবদ্‌বৃত্তি-দ্রব্যবিভাজকধর্ম্মবত্ত্ব" এই প্রকার লক্ষণ করিলে, পৃথিবী প্রভৃতিতে অতিব্যাপ্তি হয়। কেননা, পৃথিবী প্রভৃতিও ক্রিয়াবিশিষ্ট, তদ্‌বৃত্তি যে হয়, সে-ই ত ক্রিয়াবদ্‌বৃত্তি; পৃথিবীত্ব প্রভৃতি যে দ্রব্য-বিভাজক ধর্ম্ম, তাহা ক্রিয়াবদ্‌বৃত্তি। অতএব 'ক্রিয়াবদ্‌বৃত্তি-দ্রব্যবিভাজকধর্ম্মবত্ত্ব' পৃথিবী প্রভৃতিতেও থাকে।

'জন্যাবৃত্তি' কথাটী রাখিলে আর দোষ নাই, কেননা পৃথিবীত্ব জন্যাবৃত্তি নহে; ঘটপটাদিরূপ যে জন্য-পৃথিবী, পৃথিবীত্ব তাহাতেও আছে কিনা। কোন জন্য বস্তুতে যে থাকে, তাহাকে 'জন্যাবৃত্তি' বলা যায় না।

'দ্রব্যবিভাজক' কথাটী বাদ দিয়া "ক্রিয়াবদ্-বৃত্তি-জন্যাবৃত্তিধর্ম্মবত্ত্ব" এইরূপ লক্ষণ করিলে, পৃথিবী প্রভৃতির পরমাণুতে অতিব্যাপ্তি হয়; কেননা, পরমাণুত্ব, পরমাণুর রূপ ইত্যাদি ধর্ম্ম—ক্রিয়াবদ্বৃত্তি ও জন্যাবৃত্তি; পরমাণুতে ক্রিয়া আছে, অথচ পরমাণু জন্য নহে; পরমাণুত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম তাহাতেই থাকে, অন্যত্র থাকে না। এইরূপে পরমাণুতে মনের লক্ষণ সমন্বিত হয়।

'দ্রব্যবিভাজক' কথাটী রাখিলে আর দোষ নাই; পরমাণুত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম ত আর দ্রব্য-বিভাজক নহে। দ্রব্যের বিভাগ করিবার সময়ে পরমাণু বলিয়া ত ধরা হয় নাই, পৃথিবী, জল ইত্যাদি ধরা হইয়াছে; পৃথিবীত্ব জলত্বাদিই দ্রব্যবিভাজক ধর্ম্ম। শেষোক্ত ধর্ম্মপদ স্বরূপ-কথন।

(২) 'অহং সুখী' এইরূপ যে বিজাতীয় সুখ-জ্ঞান হয়, তাহাই সুখ-সাক্ষাৎকার; সুখের সাক্ষাৎকার অন্য ইন্দ্রিয় ব্যাপারে হইতে পারে না। মনের ব্যাপারই সুখসাক্ষাৎকারের হেতু। করণ—কারণ-বিশেষ; "ব্যাপারবৎ কারণং করণম্।" অর্থাৎ একটী নিজ কার্য্যকে কারণরূপে মধ্যবর্ত্তী রাখিয়া, যে বস্তু কারণ হয়, তাহাই করণ। ইন্দ্রিয়, স্বীয়সম্বন্ধরূপ কারণকে মধ্যবর্ত্তী রাখিয়া কারণ হয় এবং এই যে সম্বন্ধ, তাহাও ইন্দ্রিয়-কার্য্য; এইজন্য প্রত্যক্ষ-সামান্যে ইন্দ্রিয় করণ। যথা,—চক্ষুরিন্দ্রিয় তৈজস, এই তেজোরশ্মি ঘটে সংযুক্ত হয়; অন্যান্য কারণ সংঘটন হইলে তার পর ঘটের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয়। এই চক্ষুরিন্দ্রিয় ও ঘটের যে সংযোগরূপ সম্বন্ধ, তাহাই ইন্দ্রিয়ের কার্য্য, অথচ তাহা মধ্যবর্ত্তী কারণ বা ব্যাপার। চক্ষুঃ, ঘটের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে করণ হইল।

সুখের সহিতও মনের সম্বন্ধ আছে, সে সম্বন্ধ কিঞ্চিৎ পরম্পরা। মনের সংযোগ আত্মায় আছে, সুখ আত্মায় থাকে; সুখের সহিত মনের সম্বন্ধ এইরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সেই মানস সম্বন্ধই সুখ-সাক্ষাৎকারে মধ্যবর্ত্তী কারণ বা ব্যাপার; এইজন্য মন তাহাতে করণ। ধান্যচ্ছেদনে দাত্র করণ, কাষ্ঠচ্ছেদনে কুঠার করণ। করণত্ব অনেক বস্তুতেই থাকে। চাক্ষুষ সাক্ষাৎকারে চক্ষু করণ, শব্দ-সাক্ষাৎকারে শ্রোত্র করণ; এইরূপে সাক্ষাৎকার-করণত্বও সকল ইন্দ্রিয়ে থাকে। সুখ-সাক্ষাৎকারের করণত্ব কিন্তু অন্যত্র থাকে না, কেবল মনেই থাকে।

আপত্তি।

"সুখ-জ্ঞান-করণত্ব" এই লক্ষণ করিলেই ত হইত, 'সুখ-সাক্ষাৎকার-করণত্ব' কেন?

খণ্ডন।

জ্ঞান নানাবিধ। অনুমিতিও জ্ঞান। অনুমিতির করণ ব্যাপ্তিজ্ঞান। সুখানুমিতি বা সুখ-জ্ঞানের করণ যে ব্যাপ্তিজ্ঞান, তাহাতে মনের লক্ষণ অতিব্যাপ্ত হয়। এইজন্য সুখ-সাক্ষাৎকার-করণত্ব।

আপত্তি।

"সুখ-সাক্ষাৎকার-কারণত্বকে" মনের লক্ষণ বলিলেই হয়, 'করণত্ব' কেন? করণত্ব-প্রবেশে ত গৌরবই হয়।

খণ্ডন।

জ্ঞানাদির সমবায়ি-কারণ বা উপাদান-কারণ আত্মা। সুতরাং সুখ-সাক্ষাৎকারের উপাদান-কারণও আত্মা। অতএব যাহা সুখ-সাক্ষাৎকারের কারণ, তাহাই মন—এই ভাবের লক্ষণ করিলে, আত্মা প্রভৃতিতে অতিব্যাপ্তি হয়। 'করণ' বলিলে দোষ নাই; করণ—মন ভিন্ন আর কেহ নহে। মতান্তরে জ্ঞান-করণত্বই মনের লক্ষণ; সে কথা জ্ঞান-প্রকরণে হইবে।

(৩) রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ, স্নেহ, স্বাভাবিক দ্রবত্ব, জ্ঞান, ইচ্ছা, দ্বেষ, যত্ন, সুখ, দুঃখ, অদৃষ্ট এবং ভাবনাখ্য সংস্কার—বিশেষ-

গুণ। জ্ঞানাদি সংস্কার পর্য্যন্ত বিশেষ-গুণ আত্মার, অবশিষ্ট বিশেষ-গুণ পঞ্চ ভূতের। দিক্, কাল এবং মনে বিশেষ-গুণ নাই। তন্মধ্যে দিক্ ও কালের পরিমাণ অতি বড়। মন অণু। সুতরাং বিশেষ-গুণাভাব-বিশিষ্ট অর্থাৎ যাহাতে বিশেষ-গুণ-নাই, অথচ অণুত্ব আছে, তাহাই মন এ লক্ষণ সুসঙ্গত। (ক)।

পার্থিব পরমাণুর বিশেষগুণ প্রলয়কালে থাকে না। অতএব বিশেষ-গুণাভাব-বিশিষ্ট এবং অণু হইল পার্থিব পরমাণু, তাহাতে মনের লক্ষণ অতিব্যাপ্ত হইল। দ্ব্যণুকেও অতিব্যাপ্তি হয়। এইজন্য (খ) চিহ্নিত লক্ষণ করা হইয়াছে; যাহা বিশেষ-গুণ বিশিষ্ট নহে, অথচ অণু, তাহাই মন। পার্থিব পরমাণুতে বা দ্ব্যণুকে কদাচিৎ বিশেষ-গুণের অভাব থাকিলেও "যাহা বিশেষ-গুণ-বিশিষ্ট নহে" তাহার মধ্যে পরমাণু প্রভৃতিকে পাওয়া যায় না। ভেদ ব্যাপ্যবৃত্তি। ভেদ যাহাতে থাকে, তাহাতে সদা-সর্ব্বদাই থাকে। 'পট—ঘট নহে' এই কথায় বুঝা যায়,—পট ঘট-ভিন্ন বা পটে ঘট-ভেদ আছে। এই যে ভেদ, তাহা আজও আছে, কালও আছে, কদাচ তাহার অন্যথা হয় না। এইরূপে যে বিশেষ-গুণবিশিষ্ট, তাহাতে বিশেষ-গুণবিশিষ্টের ভেদ থাকে না। এই এক মত আছে, সুতরাং এ লক্ষণে পার্থিব পরমাণু প্রভৃতিতে অতিব্যাপ্তি হয় না। (খ)

আর একটী মত আছে, ভেদও অব্যাপ্য-বৃত্তি হইতে পারে। যে বস্তু অব্যাপ্যবৃত্তি অর্থাৎ কখন থাকে, কখন থাকে না, তদ্বিশিষ্টের ভেদও অব্যাপ্যবৃত্তি। সুতরাং বিশেষ-গুণ-বিশিষ্টের ভেদও অব্যাপ্যবৃত্তি। বিশেষ-গুণগুত পরমাণুতে কখন থাকে, আর কখন (অর্থাৎ প্রলয় কালে) থাকে না। অতএব 'বিশেষ-গুণবিশিষ্ট যাহা নহে,' তাহার মধ্যেও পার্থিব পরমাণুকে পাওয়া গেল। অতিব্যাপ্তি পূর্ব্ববৎ অক্ষুণ্ণ থাকিল। এইজন্য (গ) চিহ্নিত লক্ষণ করা হইয়াছে। বিশেষ-গুণ-বিশিষ্ট বস্তুতে যে ধর্ম্ম না থাকে, সে ধর্ম্ম অণুত্ব নহে, মনস্ত্ব প্রভৃতি তদ্বিশিষ্ট হইয়া যাহা অণু, তাহা ত মন বটেই। পরমাণুতে যখন বিশেষ-গুণ থাকে, তখন পরমাণুত্ব কোনরূপেই বিশেষ-গুণ-বদবৃত্তি অর্থাৎ বিশেষ-গুণবিশিষ্ট বস্তুতে না থাকে, যে ধর্ম্ম, তাহার অন্তর্গত হইতে পারে না। (গ)

৪। স্পর্শ-বিশিষ্ট বস্তু—পৃথিবী, জল, তেজ এবং বায়ু। আর কোন দ্রব্যেই স্পর্শ নাই। স্পর্শ-বিশিষ্ট বস্তুতে না থাকে যে ধর্ম্ম, তন্মধ্যে অণুত্ব-পরমাণুত্বাদিকে পাওয়া গেল না। কেননা, স্পর্শ-বিশিষ্ট যে চারি ভূত অর্থাৎ পৃথিবী প্রভৃতি চারি দ্রব্য, তাহার পরমাণু-দ্ব্যণুক আছে, অণুত্ব-পরমাণুত্বাদি তাহাতে যথানুভব থাকে। স্পর্শ-বিশিষ্ট বস্তুতে যে ধর্ম্ম না থাকে, তাহা গগনত্ব, দিক্ত্ব, কালত্ব, আত্মত্ব এবং মনস্ত্ব প্রভৃতি। তদ্বিশিষ্ট অথচ অণু—কেবল মনই। 'অণুত্ব' পদ দেওয়াতেই গগনাদিতে অতিব্যাপ্তি বারণ হইল। পূর্ব্ব লক্ষণেও 'অণুত্ব' পদ এই অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য।

আপত্তি।

যাহা হউক, মন যে অণু, তাহার প্রমাণ কি?

খণ্ডন।

তত্তৎ-ইন্দ্রিয় জন্য প্রত্যক্ষে মনের সহিত তত্তৎ-ইন্দ্রিয়ের সংযোগ অন্যতম কারণ। যেমন, মনের সহিত চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সংযোগ চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষে কারণ, ইত্যাদি। এই কার্য্য-কারণ-ভাবটী সকলেরই সুপরিজ্ঞাত। ইহা হইতেই 'অন্যমনস্ক' কথার সৃষ্টি। চক্ষু উন্মীলিত থাকিলেও এবং চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের অপর সকল কারণ সংঘটন হইলেও অন্যমনস্ক অবস্থায় চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয় না। এইরূপ অন্যমনস্ক থাকিলে কোনরূপ প্রত্যক্ষই হয় না। স্বল্প-তারকা-বিভূষিত বসন্ত-নির্ম্মল নীল নভোমণ্ডলে

পূর্ণিমা-শশধরের মধুর স্নিগ্ধ কলঙ্কোজ্জ্বল রুচির বিম্ব দর্শনে মন-প্রাণ যখন আত্মহারা, তখন প্রিয় সুহৃদের ঔৎসুক্য-পূর্ণ স্বরও শীঘ্র কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় না। আবার কিন্নর-কণ্ঠ গায়কের তান-লয়-পরিশুদ্ধ মনোহর সঙ্গীতে যখন তুমি মুগ্ধ, তখন ঐ শশধর সহস্র বার তোমার দিকে চাহিয়া চাহিয়া গগন-প্রাঙ্গণে গড়াগড়ি দিলেও তুমি তাহা চাহিয়া দেখ না, দেখিতে পার না। এই যে দ্বিবিধ জ্ঞান এক-কালে হয় না, ইহার কারণই মনের অণুত্ব। মন অতি ক্ষুদ্র; এক ইন্দ্রিয়ের সহিত যখন তাহার সংযোগ থাকে, তখন অন্য ইন্দ্রিয়ের সহিত ত আর সংযোগ থাকিতে পারে না। কাজেই দ্বিবিধ প্রত্যক্ষ এককালে হয় না। মনের সহিত তত্তৎ ইন্দ্রিয়ের সংযোগ তত্তৎ প্রত্যক্ষে অন্যতম কারণ কিনা। মনকে বড় বলিলে, দুইটী ইন্দ্রিয়ের (যেমন—কর্ণ ও চক্ষুর) সহিত এককালে তাহার সংযোগ হইতে পারিত, সুতরাং শ্রবণ ও দর্শন এককালে হওয়াতে ব্যাঘাত হইত না। যখন কার্য্যে দেখিতেছি, ব্যাঘাত বিলক্ষণ হয়, অন্যমনস্ক সকলেই হয়, তখন আর মনকে বড় বলা চলে না। যদি বল, দুই ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযোগ হইতে পারে, মন তত বড় নহে, কিন্তু কিছু বড়, একেবারে অণু নহে; তাহা হইলে, কল্পনার অতি গৌরব হইয়া পড়ে। কেননা, হয় পরমাণু, না হয় পরম-মহান্ অর্থাৎ আকাশাদির ন্যায় বড়—এই দ্বিবিধ দ্রব্যই নিত্য। মধ্যবর্ত্তী দ্রব্যমাত্রেই জন্য ইহা প্রত্যক্ষ অনুমান প্রভৃতি প্রমাণ সাহায্যে স্থিরীকৃত। জন্য হইলে, উৎপত্তি-বিনাশ থাকে; এক জীবের কত মনের উৎপত্তি, কত মনের বিনাশ, এইরূপ গৌরব স্বীকার না করিয়া, মনকে নিত্য বলিয়া স্থির করাই উচিত। নিত্য হইলে, অণুই বলিতে হয়; অতি বড় নহে, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত দোষের সম্ভাবনা।

আপত্তি।

সুষুপ্তি অর্থাৎ গাঢ়-নিদ্রার সময় জ্ঞান হয় না। কিন্তু কেন হয় না?—

জ্ঞান মাত্রের প্রতিই ত্বক্ ও মনের সংযোগ কারণ। সুষুপ্তি কালে মন 'পুরীততি' নাড়ীতে থাকে, সে নাড়ীতে ত্বক্ নাই। অণু মন, ত্বক্-হীন 'পুরীততি' নাড়ীতে প্রবিষ্ট হইলে, আর ত্বক্-সংযোগ হইবার সম্ভাবনা মনে থাকে না। কাজেই কোন জ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে না, এইরূপ একটী কার্য্য-কারণ-ভাব সুষুপ্তি কালে জ্ঞান না হওয়ার অনুরোধে স্বীকার করিতে হয়। এমন যদি হইল, ত চাক্ষুষাদি প্রত্যক্ষেও ত্বক্ ও মনের সংযোগ অপেক্ষণীয়। 'ত্বগিন্দ্রিয় জন্য প্রত্যক্ষ', 'স্পার্শন প্রত্যক্ষ', 'ত্বাচ প্রত্যক্ষ' ও 'ছুঁইয়া দেখা' একার্থক শব্দ। এখন দেখ, মনকে অণু বলিলেও ত্বাচ প্রত্যক্ষ ও চাক্ষুষাদি প্রত্যক্ষ এককালে হইতে পারে; কেননা, অন্য প্রত্যক্ষ কালেও ত্বাচ প্রত্যক্ষের কারণ থাকিতেছে। কিন্তু তাহা ত হয় না; হৃদয়ে প্রগাঢ় চিন্তা, নয়নে অপূর্ব্ব রূপ, শ্রবণে প্রবাসাগত সু-পুত্রের প্রথম সম্বোধন বা এই রূপ আর কিছু সংঘটিত হইলে, নিদাঘ-সন্ধ্যা-সমানীত শরীর-তর্পণ মৃদু-মন্দ সমীরণের পুষ্প-ময় স্পর্শও ত অন্তরে প্রবেশ করিতে সক্ষম হয় না। সুতরাং সে স্থলে, চাক্ষুষাদি প্রত্যক্ষের কারণ-সমষ্টিকে, ত্বাচ প্রত্যক্ষের প্রতি-বন্ধক বলিতে হইবে। এইরূপ সর্ব্বত্রই প্রতি-বন্ধক কল্পনা করিব;—শ্রাবণ-প্রত্যক্ষে, চাক্ষুষ-কারণ-সমষ্টি প্রতিবন্ধক, ইত্যাদি। সুতরাং মন অতি বড় হইলে ও ক্ষতি নাই; প্রতিবন্ধক-সত্তা নিবন্ধন দ্বিবিধ জ্ঞান এককালে হয় না।

খণ্ডন।

প্রতিবন্ধক কল্পনা করাতে গৌরবই আছে। কেননা, প্রতিবন্ধকের অভাবকে স্বতন্ত্র কারণ বলিতে হয়, ইহাই হইল নিয়ম। নানা কারণ,

নানা প্রতিবন্ধক স্বীকার করা অপেক্ষা, মনের সহিত তত্তৎ-ইন্দ্রিয়-সংযোগকে তত্তৎ প্রত্যক্ষে কারণ বলাতেই লাঘব আছে। তোমার আপত্তি স্থলে অগত্যা প্রতিবন্ধক স্বীকার করিব। তথাপি সর্ব্বত্র প্রতিবন্ধক স্বীকার অপেক্ষা লাঘব থাকিল।

অথবা জ্ঞানমাত্রের প্রতি চর্ম্ম ও মনের সংযোগ কারণ; ত্বক্ ও মনের সংযোগ কারণ নহে। চর্ম্ম—ছাল। ত্বক্—ত্বগিন্দ্রিয়। চর্ম্ম 'পুরীততি' নাড়ীতে নাই; তাই সুষুপ্তি কালে জ্ঞান হয় না। চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে চর্ম্ম ও মনের সংযোগ অপেক্ষণীয়, ত্বক্-সংযোগ তখন হয় না বলিব। সুতরাং অন্য প্রত্যক্ষকালে ত্বাচ প্রত্যক্ষের কারণসমষ্টি থাকে, এই যে কথা, তাহা আদৌ সম্ভবপর নহে।

নব্য-মত এই যে, সুষুপ্তি কালে জ্ঞানের অন্যান্য কারণ সমষ্টিই সংঘটিত হইতে পারে না, জ্ঞান হইবে কিরূপে? চর্ম্মমনঃ-সংযোগ বা ত্বক্‌মনঃ-সংযোগকে স্বতন্ত্র কারণ বলিতে হয় না।

আপত্তি।

মন যে আছে, সে বিষয়েই প্রমাণ কি?

খণ্ডন।

প্রমাণ অনুমান।

অনুমানের আকার;—"সুখাদিসাক্ষাৎকারঃ সকরণকঃ জন্য-সাক্ষাৎকারত্বাৎ চাক্ষুষবৎ।" অর্থাৎ সুখাদিসাক্ষাৎকার যখন জন্য-সাক্ষাৎ-কারের অন্তর্গত, তখন অবশ্যই তাহার করণ (কারণ-বিশেষ) আছে; যেমন চাক্ষুষের।

সেই করণ অন্য কোন ইন্দ্রিয়াদি হইতে পারে না, কাজেই মন মানিতে হয়।

ঈশ্বরীয় সাক্ষাৎকারের করণ নাই; সুতরাং যাহা সাক্ষাৎকারের অন্তর্গত, তাহারই করণ আছে, এইরূপ ব্যাপ্তি স্থির করিতে গেলে ব্যভিচার হয়; এই কারণে, 'জন্য-সাক্ষাৎকার' বলা হইয়াছে। ঈশ্বরীয় সাক্ষাৎকার জন্য নহে,—নিত্য।

আপত্তি।

ত্বগিন্দ্রিয় বা প্রাণকে সুখ-সাক্ষাৎকারের করণ বলিব। মন মানিব কেন?

খণ্ডন।

মন না মানিলে, একদা দ্বিবিধ ইন্দ্রিয়জন্য প্রত্যক্ষ বারণ করিবে কিরূপে? ত্বক্ এবং প্রাণ ত অণু নহে। সুতরাং বলিতে হইবে, চাক্ষুষের কারণ সমষ্টি শ্রাবণ প্রত্যক্ষের প্রতি-বন্ধক, ইত্যাদি; ইহাতে অতিগৌরব হয়, সে কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

এই প্রকারে লাঘব-জ্ঞানাদি সহকারে উক্ত অনুমান দ্বারা এবং অন্যবিধ অনুমান দ্বারাও মনের অস্তিত্ব সিদ্ধ করা যায়।

আপত্তি।

পার্থিবাদি কোন একটী পরমাণুকেই মন স্বরূপে কল্পনা করা যাইতে পারে; স্বতন্ত্র মন স্বীকার করা কেন?

খণ্ডন।

মনকে কোন্ পরমাণুস্বরূপ বলিবে? অর্থাৎ সে পরমাণুতে পৃথিবীত্ব বা জলত্ব ইত্যাদি কোন্ জাতির সত্তা স্বীকার করিবে। সে পরমাণুতে পৃথিবীত্ব বা জলত্ব ইত্যাদির মধ্যে কোন একটী বিশেষ জাতি স্বীকার করাতে কোন যুক্তি নাই। আবার এক পরমাণুতে এই কয়েকটী জাতিরই সত্তা স্বীকার করাও যায় না। তাহা করিলে, সাঙ্কর্য্য হয়। সাঙ্কর্য্য হইলে পৃথিবীত্বাদির জাতিত্ব লোপ হয়। সাঙ্কর্য্য প্রভৃতির কথা জাতিপ্রসঙ্গে বলিব।

মন নিত্য। সংখ্যা, অণুপরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব এবং বেগ এই কয়েকটী গুণ ও ক্রিয়া মনে আছে। মন, সত্তা দ্রব্যত্ব প্রভৃতি জাতিরও আশ্রয়।

নৈয়ায়িকের মনই সব। মন লইয়াই সংসার। বেদান্ত-সাংখ্যাদির মত কিন্তু তাহা নহে। বেদান্ত বলেন,—শরীর ত্রিবিধ;—কারণ-শরীর, সূক্ষ্ম-শরীর বা লিঙ্গ-শরীর এবং স্থূল-শরীর। অবিদ্যা বা অজ্ঞানমাত্রই কারণ-শরীর; সুষুপ্তি অবস্থাতে এই শরীরমাত্র অবশিষ্ট থাকে। সুষুপ্ত ব্যক্তির অপর শরীরদ্বয় সম্বন্ধে কোন অনুভব থাকে না, কিন্তু "সুখমহমস্বাপ্সং ন কিঞ্চিদবেদিষম্" অর্থাৎ আমি সুখে নিদ্রিত ছিলাম, কিছুই জানিতে পারি নাই;—এইরূপে কেবল অজ্ঞান ও সুখবিষয়ক প্রত্যয় হয় বলিয়া আনন্দময় অজ্ঞানস্বরূপ কারণ-দেহের অস্তিত্ব সুষুপ্তি কালেও স্বীকার করা হয়। দেহ থাকিলে তাহার অভিমানও থাকিবে; সুষুপ্তি-কালে অপর দেহদ্বয় নাই, তাই তদ্দেহ-বিষয়ক অভিমানও থাকে না, তন্মূলক কোন জ্ঞান বা চেষ্টাও সুষুপ্তিকালে হয় না। সূক্ষ্ম-শরীর বা লিঙ্গ-শরীর সপ্তদশ অবয়ব-সম্পন্ন অথচ অদৃশ্য। কর্ণ, চক্ষু, ত্বক্, জিহ্বা, নাসিকা এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়; বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়; প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান এই পঞ্চবায়ু; বুদ্ধি ও মন এই সপ্তদশ অবয়বে সূক্ষ্ম-শরীরের গঠন। স্বপ্নাবস্থাতে স্থূল-দেহ থাকে না, কিন্তু অপর দুই দেহই থাকে। কারণ-শরীর সকলের উপাদান, সুতরাং কার্য্য থাকিলেই উপাদান-কারণের সত্তা অবধারিত। ঘট থাকিলেই মৃত্তিকা থাকিবে। অন্তঃকরণে ইন্দ্রিয়াদির অভিমানমূলক সকল জ্ঞানই স্বপ্নাবস্থাতে হয়। কিন্তু স্থূল-দেহাভিমান-মূলক জ্ঞান বা গমনাদি-চেষ্টা স্বপ্নাবস্থাতে থাকে না। তবে স্বপ্ন-সঞ্চরণাদি যে কাহারও কাহারও হয়, তাহা রোগ-বিশেষের কার্য্য; সে স্বপ্নাবস্থা প্রকৃত স্বপ্নাবস্থা নহে, মূর্চ্ছা-উন্মাদাদির ন্যায় অন্তঃকরণ-ঘটিত একপ্রকার রোগ মাত্র। স্থূল-শরীর পঞ্চভূতময়। জাগ্রদবস্থায় ইহার অস্তিত্ব আছে। জাগ্রদবস্থায় তিন শরীরই বর্ত্তমান থাকে।

কারণ-শরীর, লিঙ্গ-শরীর দ্বারা সংসারের হেতু। লিঙ্গ-দেহের সহিত স্থূল-দেহের বিয়োগ-বিশেষই বেদান্তমতে প্রচলিত মৃত্যু। প্রমাণ;—"অঙ্গুষ্ঠমাত্রং পুরুষং নিশ্চকর্ষ যমো বলাৎ" ইত্যাদি। অঙ্গুষ্ঠমাত্র লিঙ্গ-দেহকেই যম আকর্ষণ করিয়া লন। এই লিঙ্গ-শরীর আবার অন্য স্থূল-দেহ আশ্রয় করে, তাহাই জন্ম। লোকান্তরে কর্ম্মফল-ভোগ এই লিঙ্গ-শরীর-সম্পর্কেই ঘটিয়া থাকে।

সাংখ্য বলেন,—দ্বিবিধ দেহ;—লিঙ্গ ও স্থূল। লিঙ্গদেহ সপ্তদশ অবয়বে গঠিত বটে, কিন্তু বেদান্তোক্ত অবয়ব হইতে এ অবয়বের পার্থক্য আছে। পূর্ব্বোক্ত দশ ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি এবং পঞ্চতন্মাত্র লিঙ্গ-শরীরের অবয়ব; পঞ্চপ্রাণ নহে। পঞ্চ-তন্মাত্র যথা,—সূক্ষ্ম আকাশ বা শব্দ-তন্মাত্র, সূক্ষ্ম বায়ু বা স্পর্শতন্মাত্র, সূক্ষ্ম তেজ বা রূপতন্মাত্র, সূক্ষ্ম জল বা রসতন্মাত্র এবং সূক্ষ্ম পৃথিবী বা গন্ধতন্মাত্র।

আর স্থূল-দেহ পঞ্চ-স্থূল-ভূতময়; মৃত্যুতেই তত্তৎ স্থূল-দেহের সম্বন্ধ নষ্ট হয়। লোকান্তরে কর্ম্মফল-ভোগ লিঙ্গশরীর-সম্পর্কেই হইয়া থাকে। ইত্যাদি মত বেদান্ত ও সাংখ্যের তুল্য।

এই উভয় মতেই বুদ্ধি ও মনে অহঙ্কার ও চিত্তের অন্তর্ভাব করিয়া লইতে হয়। অন্তঃকরণত্বরূপে সবই এক কিনা। বুদ্ধি ও মন লিঙ্গ-শরীরের অন্তর্গত, এইজন্য অহঙ্কার ও চিত্তকেও তদন্তর্গত বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়। নিশ্চয়-রূপ-বৃত্তিসম্পন্ন যে অন্তঃকরণ, তাহাই বুদ্ধি, সংশয় বৃত্তিসম্পন্ন অন্তঃকরণই মন। অভিমান বৃত্তিসম্পন্ন অন্তঃকরণ অহঙ্কার, আর স্মরণ বৃত্তিসম্পন্ন অন্তঃকরণই চিত্ত নামে ব্যবহৃত। বৃত্তিভেদে অন্তঃকরণ-ভেদ কল্পিত।

বেদান্ত-মতে অন্তঃকরণবিশেষই (অহঙ্কার) পঞ্চভূতেরই উপাদান। বেদান্ত-কথিত লিঙ্গ-শরীরে তাই আর পঞ্চতন্মাত্রের সমাবেশ নাই। অহঙ্কারের সমাবেশ অন্তর্গূঢ়ভাবে উভয়-মত-সিদ্ধ লিঙ্গ-শরীরেই আছে। স্থূল-ভূতময় স্থূলদেহ উৎপাদনের জন্য পঞ্চ-তন্মাত্রের অপেক্ষা বেদান্তে নাই। সাংখ্য-মতে পঞ্চতন্মাত্র হইতেই পঞ্চভূতের উৎপত্তি, সুতরাং স্থূলদেহ উৎপাদনের জন্য, সাংখ্য লিঙ্গ-শরীরকে তন্মাত্র-ঘটিত বলিয়াছেন।

বেদান্ত-মতে জড় পদার্থ-শ্রেণী;—কারণীভূত মূল অজ্ঞান, তৎসম্ভূত পঞ্চতন্মাত্র, তন্মাত্রের প্রত্যেকের সাত্ত্বিকাংশ হইতে উৎপন্ন পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, প্রত্যেকের রাজসিক অংশ হইতে উৎপন্ন পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, মিলিত সাত্ত্বিক অংশ হইতে উৎপন্ন অন্তঃকরণ (বুদ্ধি ইত্যাদি), মিলিত রাজসিক অংশ হইতে উৎপন্ন পঞ্চ-প্রাণ এবং অন্তঃকরণ-বিশেষসম্ভূত পঞ্চস্থূলভূত।

সাংখ্য-মতে জড়-পদার্থ-শ্রেণী,—প্রকৃতি, তৎসম্ভূত বুদ্ধি, বুদ্ধিসম্ভূত অহঙ্কার, অহঙ্কারের সাত্ত্বিক ভাগ হইতে উৎপন্ন মন ও ইন্দ্রিয়চয়, তামস অংশ হইতে উৎপন্ন পঞ্চতন্মাত্র এবং পঞ্চ-তন্মাত্র হইতে উৎপন্ন স্থূলভূত।

ন্যায়মতে এ সব কিছুই নাই। অজ্ঞান বা প্রকৃতি নামে কোন স্বতন্ত্র পদার্থ নাই, তন্মাত্র প্রভৃতি পদার্থও স্বীকৃত হয় নাই। ইন্দ্রিয়ও স্বতন্ত্র পদার্থ নহে, স্থূল-ভূতেরই অংশমাত্র। লিঙ্গশরীরাদি মানিবার প্রয়োজন নাই। মনই লিঙ্গ-শরীর-স্থানীয়।

এই মনকে যিনি বশীভূত করিতে পারেন, তাঁহার আর ভাবনা কি?

মৃত্যুর পর, মনই আত্মার সঙ্গে থাকে; সেই আত্মার সহিত বিশেষ-সংযোগে আবদ্ধ মনই মৃত্যুর পর অযোনিজ বায়বীয় দেহে প্রবিষ্ট হয়। এই দেহ আতিবাহিক দেহ। তাহাই তখন জীবের স্থূল-দেহ নামে অভিহিত হয়। জীবাত্মা অতিমহান্, আকাশের ন্যায় বৃহৎ হইলেও সেই সেই মনের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইয়া যে অদৃষ্টাধীন দেহে সম্বন্ধ-বিশিষ্ট হয়, তাহাই সেই জীবের স্থূলদেহ।

সংসার অনাদি, অদৃষ্ট অনাদি। এক একটী মনের সহিত এক একটী জীবাত্মার সম্বন্ধও অনাদি। অদৃষ্টই জীবাত্মার সহিত মনঃ-সম্বন্ধের মূল। অথচ অদৃষ্ট অনাদি বলিয়া এই মনঃ-সম্বন্ধও অনাদি। অদৃষ্টের এই অনাদিভাবের কথা অদৃষ্ট-প্রস্তাবে বুঝাইব। অদৃষ্টক্ষয় হইলে মনঃসম্বন্ধ দূর হয়। নির্ব্বাণমুক্তি অবস্থায় মনঃসম্বন্ধ থাকে না। জীবাত্মা তখন অসঙ্গ। সাংখ্য-বেদান্ত-মতে মুক্তাবস্থায় লিঙ্গ-শরীর থাকে না।

শাস্ত্রে পুরুষকে অঙ্গুষ্ঠমাত্র বলা হইয়াছে, সেই পুরুষ শব্দে—আত্ম-সম্বন্ধযুক্ত মন। অঙ্গুষ্ঠ-মাত্র শব্দে অতি-ক্ষুদ্র। অঙ্গুষ্ঠবৎ পরিমাণ মনেরও নহে, লিঙ্গ শরীরেরও নহে।

"দ্বা সুপর্ণা সহজা সখায়া" ইত্যাদি শ্রুতিতে যে জীবাত্মাকে পরমাত্মার সখা অর্থাৎ সদৃশ বলা হইয়াছে, সেই জীবাত্মাই একটী ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র পরমাণু স্বরূপ দ্রব্যের সম্পর্কে কেমন ঘূর্ণচক্রে নিপতিত, কেমন মহাবর্ত্তে বিভ্রান্ত, তাহা একবার ভাবিয়া দেখা উচিত। আর ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র পদার্থের বিক্রম একবার চিন্তা করিয়া সাবধান হওয়া উচিত।

গীতায় অর্জ্জুন বলিয়াছেন,—

"চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্॥"

শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন।

ঋষি

(১)

গৌতম।

হিন্দু-বালকেরা ইংলণ্ডের ইতিহাস মুখস্থ করে; ইউরোপে কোন্ কোন্ মহানুভব জন্ম-গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তত্ত্ব রাখে; কিন্তু যাঁহাদের জন্য হিন্দু-জাতির, তথা ভারতবর্ষের অস্তিত্ব, যাঁহাদের জন্য প্রাচ্যদেশের গৌরব, যাঁহাদের জন্যই সভ্যতা-লোকসমুজ্জৃম্ভিত মান-স্ফীত প্রতীচ্য ভূমিতেও কতিপয় সুপণ্ডিত এই অবনত হিন্দু জাতির গৌরবে বিমুগ্ধ, তাঁহাদের—সেই প্রাতঃস্মরণীয় * ঋষিগণের—বৃত্তান্তজ্ঞান ত দূরের কথা—নাম পর্য্যন্তও অনেকে অবগত নহেন। অবগতির পক্ষে অবশ্য অন্তরায়ও অনেক।

১ম অন্তরায়;—প্রবৃত্তির অভাব।
২য় ,, সংস্কৃত জ্ঞানের অভাব।
৩য় ,, কোন গ্রন্থেই ধারাবাহিকরূপে ঋষিবৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ না থাকা।
৪র্থ ,, শাস্ত্রগ্রন্থসমূহের অপ্রাপ্তি।
৫ম ,, বিপুল শ্রম ব্যতীত ফলসিদ্ধির অসম্ভাবনা।

১ম অন্তরায় দূর করিবার শক্তি আমার নাই। অবশিষ্ট অন্তরায় যথাশক্তি দূর করিবার জন্য বর্ত্তমান প্রবন্ধের অবতারণা। ভগবান্ গৌতম আমাদের গোত্রকর্ত্তা; এইজন্য প্রথমে তাঁহার বৃত্তান্ত-আলোচনাতেই প্রবৃত্ত হইলাম।

গৌতম অনেক।—

(১) ব্রহ্মা যৎকালে গয়াধামে যজ্ঞ করেন, তখন, সে যজ্ঞে পৌরোহিত্য করিবার উপযুক্ত কতিপয় মানস পুত্র সৃষ্টি করেন, গৌতম তাঁহাদিগের অন্যতম। *

(২) মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য প্রভৃতি নয় জন ব্রহ্মর্ষি, ব্রহ্মার মানস পুত্র।

বৃহস্পতি, গৌতম, সংবর্ত্ত, উতথ্য, বামদেব, অজস্য এবং উশিজ এই সপ্ত মহর্ষি অঙ্গিরার পুত্র। †

(৩) দীর্ঘতমা ঋষির ঔরসে তদীয় পত্নী প্রদ্বেষীর গর্ভে উৎপন্ন জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম, গৌতম। দীর্ঘতমা উতথ্যের পুত্র, পিতৃব্য বৃহস্পতির অভিশাপে জন্মান্ধ। উতথ্য, অঙ্গিরার অন্যতম পুত্র। মহাভারত আদি পর্ব্ব ১০৪ অধ্যায়ে এ সম্বন্ধে যাহা লিখিত আছে, ‡ তাহার সংক্ষিপ্ত ভাব এই;—উতথ্যের পত্নী—মমতা। মমতা যখন গর্ভবতী, তখন উতথ্য ঋষির কনিষ্ঠ ভ্রাতা দেবগুরু বৃহস্পতি কামাভিভূত হইয়া মমতাকে আক্রমণ করেন। মমতার নিষেধ সত্ত্বেও বৃহস্পতি ঘোর অত্যাচার

---

* প্রাতঃস্মরণীয় শব্দের গৌরব বঙ্গভাষায় নাই, যাঁহার জীবন-চরিত বাঙ্গালায় লিখিত হইয়াছে, তিনিই 'প্রাতঃস্মরণীয়'। উপরিলিখিত 'প্রাতঃস্মরণীয়' শব্দকে পাঠকগণ সে ভাবে গ্রহণ করিবেন না, ইহা আমার একান্ত অনুরোধ। শাস্ত্রে কথিত আছে,—

'ব্রাহ্ম্যে মুহূর্ত্তে চোত্থায় স্মরেদ্দেববরানৃষীন্।'

অতি প্রত্যূষে উঠিয়া দেবশ্রেষ্ঠগণকে ও ঋষিগণকে স্মরণ করা বিধেয়। সকল ঋষিই এই শাস্ত্রোপদেশানুসারে প্রাতঃস্মরণীয়।

* ব্রহ্মা সম্ভৃতসম্ভারো মানসানৃত্বিজোঽসৃজৎ।
অগ্নিশর্ম্মাণমমৃতং শৌনকং যাঞ্জলিং(যাজলিং) মৃদুম্॥
কুথুমিং বেদকৌণ্ডিল্যং হারীতং কাশ্যপং কৃপম্।
গর্গং কৌশিকবাশিষ্ঠৌ মুনিং ভার্গবমব্যয়ম্॥
বৃদ্ধং পারাশরং কণ্বং মাণ্ডব্যং শ্রুতিকেবলম্।
শ্বেতং সুতালং দমনং সুহোত্রং কঙ্কমেব চ॥
লৌকাক্ষিঞ্চ মহাবাহুং জৈগীষব্যং তথৈব চ।
দধিপঞ্চমুখং বিপ্রমৃষভং কর্কমেব চ॥
কাত্যায়নং গোভিলঞ্চ মুনিমুগ্রমহাব্রতম্।
সুপালকং গৌতমঞ্চ তথাবেদশিরোব্রতম্॥
বায়ুপুরাণ, গয়ামাহাত্ম্য, ২য় অধ্যায়

† মরীচিতনয়া রাজন্ সুরূপা নাম বিশ্রুতা।
ভার্য্যা চাঙ্গিরসো দেবাস্তস্যা পুত্রা দশ স্মৃতাঃ।
সুরূপা জনয়ামাস ঋষীন্ সর্ব্বেশ্বরানিমান্॥
বৃহস্পতিং গৌতমঞ্চ সংবর্ত্তমৃষিমুত্তমম্।
উতথ্যং বামদেবঞ্চ অজস্যমুশিজং তথা॥
মৎস্যপুরাণ ১৯৬ অঃ।

‡ অথোতথ্য ইতি খ্যাত আসীদ্ধীমানৃষিঃ পুরা।
মমতা নাম তস্যাসীদ্ভার্য্যা পরমসম্মতা॥
উতথ্যস্য যবীয়াংস্তু পুরোধাস্ত্রিদিবৌকসাম্।
বৃহস্পতির্বৃহত্তেজা মমতামন্বপদ্যত॥

উবাচ মমতা তন্তু দেবরং বদতাং বরম্।
অন্তর্ব্বত্নী ত্বহং ভ্রাত্রা জ্যেষ্ঠেনারম্যতামিতি॥
অয়ঞ্চ মে মহাভাগ কুক্ষাবেব বৃহস্পতে।
ঔতথ্যো বেদমত্রাপি ষড়ঙ্গং প্রত্যধীয়ত॥
অমোঘরেতাস্ত্বঞ্চাপি দ্বয়োর্নাস্ত্যত্র সম্ভবঃ।
তস্মাদেবং গতেঽদ্য ত্বমুপারমিতুমর্হসি॥
এবমুক্তস্তথা সম্যগ্ বৃহস্পতিরুদারধীঃ।
কামাত্মানং তদাত্মানং ন শশাক নিযচ্ছিতুম্॥
স বভূব ততঃ কামী তয়া সার্দ্ধমকাময়া।
উৎসৃজন্তন্তু তং রেতঃ স গর্ভস্থোঽভ্যভাষত॥
ভোস্তাত মা গমঃ কামং দ্বয়োর্নাস্তীহ সম্ভবঃ।
অল্পাবকাশো ভগবন্ পূর্ব্বঞ্চাহমিহাগতঃ॥
অমোঘরেতাশ্চ ভবান্ ন পীড়াং কর্ত্তুমর্হসি।
অশ্রুত্বৈব তু তদ্বাক্যং গর্ভস্থস্য বৃহস্পতিঃ॥
জগাম মৈথুনায়ৈব মমতাং চারুলোচনাম্।
শুক্রোৎসর্গং ততো বুদ্ধা তস্যা গর্ভগতো মুনিঃ॥
পদ্ভ্যামরোধয়ন্মার্গং শুক্রস্য চ বৃহস্পতেঃ।
স্থানমপ্রাপ্তমথ তদ্রেতঃ প্রতিহতং তদা॥
পপাত সহসা ভূমৌ ততঃ ক্রুদ্ধো বৃহস্পতিঃ।
তদ্দৃষ্ট্বা পতিতং শুক্রং শশাপ স রুষান্বিতঃ॥
উতথ্যপুত্রং গর্ভস্থং নির্ভর্ৎস্য ভগবানৃষিঃ।
যস্মাৎ ত্বমীদৃশে কালে সর্ব্বভূতেপ্সিতে সতি॥
এবমাত্থ বচস্তস্মাৎ তমো দীর্ঘং প্রবেক্ষ্যসি।
স বৈ দীর্ঘতমা নাম শাপাদৃষিরজায়ত॥
বৃহস্পতের্বৃহৎকীর্ত্তের্বৃহস্পতি রিবৌজসা।
জাত্যন্ধো বেদবিৎ প্রাজ্ঞঃ পত্নীং লেভে স বিদ্যয়া॥
তরুণীং রূপসম্পন্নাং প্রদ্বেষীং নাম ব্রাহ্মণীম্।
স পুত্রান্ জনয়ামাস গৌতমাদীন্ মহাযশাঃ॥
ঋষেরুতথ্যস্য তদা সন্তানকুলবৃদ্ধয়ে।
লোভমোহাভিভূতাস্তু পুত্রাস্তে গৌতমাদয়ঃ॥
ধর্ম্মাত্মা চ মহাত্মা চ বেদবেদাঙ্গপারগঃ।
গোধর্ম্মং সৌরভেয়াচ্চ সোঽধীত্য নিখিলং মুনিঃ॥
প্রাবর্ত্তত তথা কর্ত্তুং শ্রদ্ধাবাংস্তমশঙ্কয়া।
ততো বিতথমর্য্যাদং তং দৃষ্ট্বা মুনিসত্তমাঃ॥
ক্রুদ্ধা মোহাভিভূতাস্তে সর্ব্বে তত্রাশ্রমৌকসঃ।
অহোঽয়ং ভিন্নমর্য্যাদো নাশ্রমে বস্তুমর্হতি॥
তস্মাদেনং বয়ং সর্ব্বে পাপাত্মানং ত্যজামহে।
ইত্যন্যোন্যং সমাভাষ্য তে দীর্ঘতমসং মুনিম্॥
পুত্রলাভাচ্চ সা পত্নী ন তুতোষ পতিং সদা।
প্রদ্বিষন্তীং পতির্ভার্য্যাং কিং মাং দ্বেক্ষীতি চাব্রবীৎ॥

প্রদ্বেষ্যুবাচ।

ভার্য্যায়া ভরণাদ্ভর্ত্তা পালনাচ্চ পতিঃ স্মৃতঃ।
অহং ত্বাং ভরণং কৃত্বা জাত্যন্ধং সসুতং তদা॥
নিত্যকালং শ্রমেণার্ত্তা ন ভরেয়ং মহাতপাঃ॥

ভীষ্ম উবাচ।

তস্যাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা ঋষিঃ কোপসমন্বিতঃ।
প্রত্যুবাচ ততঃ পত্নীং প্রদ্বেষীং সসুতাং তদা॥
নীয়তাং ক্ষত্রিয়কুলে ধনার্থী ত্বং ভবিষ্যসি॥

প্রদ্বেষ্যুবাচ।

ত্বয়া দত্তং ধনং বিপ্র নেচ্ছেয়ং দুঃখকারণম্।
যথেষ্টং কুরু বিপ্রেন্দ্র ন ভরেয়ং পুরা যথা॥

দীর্ঘতমা উবাচ।

অদ্য প্রভৃতি মর্য্যাদা ময়া লোকে প্রতিষ্ঠিতা।
এক এব পতির্নার্য্যা যাবজ্জীবং পরায়ণম্॥
মৃতে জীবতি বা তস্মিন্নাপরং প্রাপ্নুয়ান্নরম্।
অভিগম্য পরং নারী পতিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥
অপতীনান্তু নারীণাং অদ্য প্রভৃতি পাতকম্।
যদ্যস্তি চেদ্ধনং সর্ব্বং বৃথাভোগা ভবন্তু তাঃ॥
অকীর্ত্তিঃ পরিবাদাশ্চ নিত্যং তাসাং ভবন্তু বৈ।
ইতি তদ্বচনং শ্রুত্বা ব্রাহ্মণী ভৃশকোপিতা।
গঙ্গায়াং নীয়তামেষ পুত্রা ইত্যেবমব্রবীৎ॥
লোভমোহাভিভূতাস্তে পুত্রাস্তং গৌতমাদয়ঃ।
বদ্ধোড়ুপে পরিক্ষিপ্য গঙ্গায়াং সমবাসৃজন্॥
কস্মাদন্ধশ্চ বৃদ্ধশ্চ ভর্ত্তব্যোঽয়মিতি স্ম তে।
চিন্তয়িত্বা ততঃ ক্রূরাঃ প্রতিজগ্মুরথো গৃহান্॥
সোঽনুস্রোতস্তদা বিপ্রঃ প্লবমানো যদৃচ্ছয়া।
জগাম সুবহূন্ দেশানন্ধস্তেনোড়ুপেন হ॥
তন্তু রাজা বলির্নাম সর্ব্বধর্ম্মবিশারদঃ।
অপশ্যন্মজ্জনগতঃ স্রোতসাভ্যাসমাগতম্॥
জগ্রাহ চৈনং ধর্ম্মাত্মা বলিঃ সত্যপরাক্রমঃ।
জ্ঞাত্বা চৈনং স বব্রেঽথ পুত্রার্থে ভরতর্ষভ॥
সন্তানার্থং মহাভাগ ভার্য্যাসু মম মানদ।
পুত্রান্ ধর্ম্মার্থকুশলানুৎপাদয়িতুমর্হসি॥
এবমুক্তঃ স তেজস্বী তং তথেত্যুক্তবানৃষিঃ।
তস্মৈ স রাজা স্বাং ভার্য্যাং সুদেষ্ণাং প্রাহিণোৎ তদা
অন্ধং বৃদ্ধঞ্চ তং মত্বা ন সা দেবী জগাম হ।
স্বান্তু ধাত্রেয়িকাং তস্মৈ বৃদ্ধায় প্রাহিণোৎ তদা॥
তস্যাং কাক্ষীবদাদীন্ স শূদ্রযোনাবৃষির্বশী।
জনয়ামাস ধর্ম্মাত্মা পুত্রানেকাদশৈব তু॥
কাক্ষীবদাদীন্ পুত্রাংস্তান্ দৃষ্ট্বা সর্ব্বানধীয়তঃ।
উবাচ তমৃষিং রাজা মমেম ইতি ভারত॥
নেত্যুবাচ মহর্ষিস্তং মমেম ইতি চাব্রবীৎ।
শূদ্রযোনৌ ময়া হীমে জাতাঃ কাক্ষীবদাদয়ঃ॥
অন্ধং বৃদ্ধঞ্চ মাং দৃষ্ট্বা সুদেষ্ণা মহিষী তব।
অবমন্য দদৌ মূঢ়া শূদ্রাং ধাত্রেয়িকাং মম॥
ততঃ প্রসাদয়ামাস পুনস্তমৃষিসত্তমম্।
বলিঃ সুদেষ্ণাং ভার্য্যাং স্বাং তস্মৈ তাং প্রাহিণোৎপুনঃ॥
তাং স দীর্ঘতমাঙ্গেষু স্পৃষ্ট্বা দেবীমথাব্রবীৎ।
ভবিষ্যন্তি কুমারাস্তে তেজসাদিত্যবর্চ্চসঃ॥
অঙ্গো বঙ্গঃ কলিঙ্গশ্চ পুণ্ড্রঃ সুহ্মশ্চ তে সুতাঃ।
তেষাং দেশাঃ সমাখ্যাতাঃ স্বনামপ্রথিতা ভুবি॥
মহাভারত, আদিপর্ব্ব—১০৪ অঃ।

করেন, গর্ভস্থ বালক, পিতৃব্যকে বলিতে লাগিলেন, "হে তাত! আপনি অমোঘবীর্য্য, গর্ভে আর স্থান নাই, গর্ভে আমারই ক্লেশ হইতেছে, আপনি বিরত হউন।" বৃহস্পতি সে কথা শুনিলেন না। মমতার গর্ভস্থ বালক, গর্ভদ্বার স্বীয় পদদ্বয় দ্বারা রুদ্ধ করিয়া রাখিলেন। বৃহস্পতির শুক্র, স্থানচ্যুত হইয়া পড়িল। বৃহস্পতি ক্রুদ্ধ হইয়া গর্ভস্থ বালককে অভিশাপ দিলেন, "তুই দীর্ঘতমঃপ্রবিষ্ট হইবি" অর্থাৎ জন্মান্ধ হইবি। উতথ্যের সেই পুত্র, মহর্ষি দীর্ঘতমা। দীর্ঘতমা গোধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া আর্যমর্য্যাদা-লঙ্ঘনে প্রবৃত্ত হইলে আশ্রমবাসী বহু ঋষিই বিরক্ত হইলেন। পত্নী প্রদ্বেষী, 'আর তোমাকে ভরণ পোষণ করিতে পারি না' বলিয়া অন্ধ বৃদ্ধ পতি দীর্ঘতমাকে, লোভ মোহাভিভূত গৌতম প্রভৃতি পুত্রগণ দ্বারা গঙ্গাস্রোতে ভেলায় চড়াইয়া ভাসাইয়া দিলেন। যযাতির অন্যতম পুত্র অনুর বংশসম্ভূত বলি রাজা স্রোতোনীত দীর্ঘতমা ঋষিকে দেখিতে পাইয়া পরম যত্ন-সহকারে স্বভবনে লইয়া গিয়া স্বচ্ছন্দে থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। অনন্তর সেই ঋষির নিকট রাজা ক্ষেত্রজ সন্তান প্রার্থনা করিলেন। ঋষি স্বীকৃত হইলে, বলি স্বীয় পত্নী সুদেষ্ণাকে ঋষির নিকট গমন করিতে বলিলেন। ঋষি দীর্ঘতমাকে অন্ধ এবং বৃদ্ধ দেখিয়া সুদেষ্ণা স্বয়ং তাঁহার নিকট যাইলেন না, নিজের এক দাসীকে পাঠাইয়া দিলেন। দাসীর গর্ভে ঋষির একাদশ পুত্র উৎপন্ন হইল, জ্যেষ্ঠের নাম কাক্ষীবান্। যখন এই ঋষিপুত্রেরা অধ্যয়নশীল, তখন তাহাদিগকে দেখিয়া রাজা বলিলেন, "এই সন্তানগণ আমার।" দীর্ঘতমা বলিলেন, "না; ইহারা আমার সন্তান। রাজন্! রাজ্ঞী আমাকে অন্ধ ও বৃদ্ধ দেখিয়া আমার নিকট আসিতে রুচি করেন নাই, দাসী পাঠাইয়াছিলেন; ইহারা দাসীর গর্ভে আমার ঔরসে উৎপন্ন।" বলি ঋষিকে প্রসন্ন করিয়া ভার্য্যাকে তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিলেন, ঋষি বলিপত্নী সুদেষ্ণার অঙ্গ স্পর্শ করিয়া বলিলেন, "অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম এবং পুণ্ড্র নামে পাঁচ পুত্র তোমার হইবে। তাহাদের নামানুসারে দেশের নামকরণ হইবে।"

(৪) অঙ্গিরার অন্যতম পুত্র উশিজ। উশিজ ঋষির জ্যেষ্ঠ-পুত্র দীর্ঘতমা, অন্য পুত্র গৌতম।

(৫) উশিজ-পুত্র দীর্ঘতমা বৃহস্পতির শাপে জন্মান্ধ। তাঁহার ঔরসে শূদ্রার গর্ভে কাক্ষীবান্ ঋষির জন্ম। দীর্ঘতমা ঋষির তম অর্থাৎ অন্ধতা গো (সুরভি) দূর করেন, এইজন্য তাঁহার নামান্তর হয় গোতম। কাক্ষীবান্ তাঁহার পুত্র; অতএব তিনি গৌতম পদ-বাচ্য হইতে পারেন। তাঁহার বংশ, গৌতম বংশ বলিয়াই বিখ্যাত। কাক্ষীবান্ তপোবলে ব্রাহ্মণ্যলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন।

(৪) ও (৫) সংখ্যার কথা মৎস্য পুরাণে বিবৃত আছে; তাহার অধিকাংশ মহাভারত উপাখ্যানের তুল্য। প্রভেদ এইমাত্র যে, মহাভারতে কথিত আছে, দীর্ঘতমা—উতথ্যের ঔরসে তদীয় পত্নী মমতার গর্ভে উৎপন্ন। মৎস্যপুরাণে কথিত আছে, দীর্ঘতমা উশিজ ঋষির ঔরসে তদীয় পত্নী মমতার গর্ভে উৎপন্ন। মহাভারতে কথিত আছে, গোধর্ম্ম-পরায়ণ দীর্ঘতমা পত্নী ও পুত্রগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছিলেন। মৎস্যপুরাণে কথিত আছে, ঋষি দীর্ঘতমা, অকৃতদার ছিলেন, গোধর্ম্ম শিক্ষা করিয়া তিনি কনিষ্ঠ ভ্রাতা গৌতমের পত্নীর প্রতি অত্যাচার করিতে উদ্যত হন, তাহাতে গৌতমপত্নী তাঁহাকে বহু ভর্ৎসনা করিয়া কাষ্ঠপেটকে করিয়া গঙ্গায় ভাসাইয়া দেন। মহাভারতে কথিত আছে, দীর্ঘতমা বলিরাজ-মহিষীর অঙ্গস্পর্শ করিয়া পঞ্চ পুত্রলাভের বর দিলেন। মৎস্যপুরাণে কথিত আছে, রাজ্ঞী, দীর্ঘতমা ঋষির আদেশে দধি-

লবণ-মধুমিশ্রিত তদীয় সর্ব্বাঙ্গ লেহন করিলেন; কিন্তু ঘৃণা প্রযুক্ত ঋষির মলদ্বার লেহনে অপারগ হইলেন, তাহাতে মলদ্বারহীন জ্যেষ্ঠপুত্র এবং অন্য চারি পুত্রলাভের বর ঋষি রাজমহিষীকে দিলেন। রাজমহিষী মলদ্বারহীন পুত্র হইবে শুনিয়া অনুনয় বিনয় করিলে, ঋষি বলিলেন, আমি কি করিব? তোমার দোষেই এইরূপ ঘটিল; তা যাই হউক, তোমার পৌত্রেরা সর্ব্বলক্ষণ-সম্পন্ন হইবে, পুত্রেরও মলদ্বার অভাবে কোন ক্ষতি হইবে না। মহাভারতে এ উপাখ্যানের শেষ নাই, যতটুকু ক্ষেত্রজ সন্তান উৎপাদনের উপযোগী, আবশ্যক বলিয়া মহাভারতে ততটুকুই কথিত হইয়াছে। শেষ-অংশ মৎস্যপুরাণে আছে। দীর্ঘতমা ঋষি সম্পূর্ণরূপে গোধর্ম্ম পালন করাতে গোমাতা সুরভি পরিতুষ্টা হইয়া আঘ্রাণ দ্বারা দীর্ঘতমার তম অর্থাৎ অন্ধতা হরণ করিলেন, তাহাতে দীর্ঘতমার নাম হইল, গোতম। গোতম স্বীয় পুত্র কাক্ষীবান্‌কে সঙ্গে লইয়া তপস্যার্থ 'গিরিব্রজে' গমন করিলেন। তথায়, কাক্ষীবান্ মহাতপঃপ্রভাবে মাতৃযোনিসম্ভূত অবিশুদ্ধি দূর করিয়া ব্রাহ্মণ্য দেহ প্রাপ্ত হইলেন। মহর্ষি দীর্ঘতমা সৎপুত্রবান্ হইয়া এবং তপঃপ্রভাবে যথাসময়ে ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। কাক্ষীবান্ ঋষির সহস্র সন্তান হইল, তাঁহারা কৌষ্মাণ্ড এবং গৌতম নামে অভিহিত। অর্থাৎ দীর্ঘতমা গোতম নামে অভিহিত হইলেন বলিয়া তৎপুত্র কাক্ষীবান্ গৌতমসংজ্ঞা পাইলেন, তদ্বংশীয়েরাও গৌতম নামে প্রসিদ্ধ হইলেন। *

* সূত উবাচ।
অথৌশিজ ইতি খ্যাত আসীদ্বিদ্বানৃষিঃ পুরা।
পত্নী বৈ মমতা নাম বভূবাস্য মহাত্মনঃ॥
উশিজস্য যবীয়ান্ বৈ ভ্রাতুঃপত্নীমকাময়ৎ।
বৃহস্পতির্মহাতেজা মমতামেত্য কামতঃ॥
উবাচ মমতা তস্য দেবরং বরবর্ণিনী।
অন্তর্ব্বত্ন্যস্মি তে ভ্রাতুর্জ্যেষ্ঠস্য তু বিরম্যতাম্॥

দীর্ঘতমার উপাখ্যান সম্বন্ধে মহাভারত

অয়ন্তু মে মহাভাগ গর্ভঃ কুপ্যেদ্বৃহস্পতে।
ঔশিজো ভ্রাতৃজস্তস্তে সোপাঙ্গং বেদমুদ্গিরন্॥
অমোঘরেতাস্ত্বঞ্চাপি ন মাং ভজিতুমর্হসি।
অস্মিন্নেবং গতে কালে যথা বা মন্যসে প্রভো॥
এবমুক্তস্তথা সম্যগ্‌বৃহত্তেজা বৃহস্পতিঃ।
কামাত্মা স মহাত্মাপি ন মনঃ সোঽভ্যবারয়ৎ॥
সম্বভূবৈব ধর্ম্মাত্মা তয়া সার্দ্ধমকাময়া।
উৎসৃজন্তন্তু তদ্রেতো বাচং গর্ভোঽভ্যভাষত॥
ভোস্তাত বাচামধিপ দ্বয়োর্নাস্তীহ সংস্থিতিঃ।
অমোঘরেতাস্ত্বঞ্চাপি পূর্ব্বঞ্চাহমিহাগতঃ॥
সোঽশপৎ তং ততঃ ক্রুদ্ধ এবমুক্তো বৃহস্পতিঃ।
পুত্রং জ্যেষ্ঠস্য বৈ ভ্রাতুর্গর্ভস্থং ভগবানৃষিঃ॥
যস্মাৎ ত্বমীদৃশে কালে গর্ভস্থোঽপি নিষেধসি।
মামেবমুক্তবাংস্তস্মাৎ তমো দীর্ঘং প্রবেক্ষ্যসি॥
ততো দীর্ঘতমা নাম শাপাদৃষিরজায়ত।
অথৌশিজো বৃহৎকীর্ত্তির্বৃহস্পতিরিবৌজসা॥
ঊর্দ্ধরেতাস্ততঃ সো বৈ বনতে ভ্রাতুরাশ্রমে।
স ধর্ম্মান্ সৌরভেয়াংস্তু বুবভাচ্ছ্রুতবাংস্ততঃ॥
তস্য ভ্রাতা পিতৃব্যো বৈ চকার ভরণং তদা।
তস্মিন্ নিবসতস্তস্য যদৃচ্ছেবাগতো বৃষঃ॥
যজ্ঞার্থমাহৃতান্ দর্ভাংশ্চচার সুরভীসুতঃ।
জগ্রাহ তং দীর্ঘতমাঃ শৃঙ্গয়োস্তু চতুষ্পদম্॥
তেনার্সো নিগৃহীতশ্চ ন চচাল পদাৎ পদম্।
ততোঽব্রবীদ্বৃষস্তং বৈ মুঞ্চ মাং বলিমাং বর॥
ন ময়াসাদিতস্তাত বলবাংস্ত্বৎসমঃ ক্বচিৎ।
মম চান্যঃ সমো বাপি ন হি মে বলসংখ্যয়া।
মুঞ্চ তাতেতি চ পুনঃ প্রীতস্তেঽহং বরং বৃণু॥
এবমুক্তোঽব্রবীদেনং জীবন্ মে ত্বং ক্ব যাস্যসি।
এষ ত্বাং ন বিমোক্ষ্যামি পরস্বাদং চতুষ্পদম্॥

বৃষভ উবাচ।
নাস্মাকং বিদ্যতে তাত পাতকং স্তেয়মেব চ।
ভক্ষ্যাভক্ষ্যং তথা চৈবং পেয়াপেয়ং তথৈব চ॥
দ্বিপদাং বহবো হেতে ধর্ম্ম এষ গবাং স্মৃতঃ।
কার্য্যাকার্য্যে ন বাগম্যাগমনঞ্চ তথৈব চ॥

সূত উবাচ।
গবাং ধর্ম্মন্তু বৈ শ্রুত্বা সম্ভ্রান্তস্তু বিসৃজ্য তম্।
শক্ত্যান্নপানদানাং তু গোসঙ্ঘং সম্প্রসাদয়ন্॥
প্রসাদিতে গতে তস্মিন্ গোধর্ম্মং ভক্তিভস্তু সঃ।
মনসৈব সমাদধ্যৌ ভন্নিষ্ঠস্তৎপরো হি সঃ॥
ততো যবীয়সঃ পত্নীং গৌতমস্যাভ্যপদ্যত।
কৃতাবজ্ঞোপাং ভাং মত্বা সোঽনড্বানিব ন ক্ষমে॥
গোধর্ম্মন্তু পরং মত্বা স্বয়ং তামভ্যপদ্যত।
নির্ভর্ৎস্য চৈনং রুদ্ধা চ বাহুভ্যাং সম্প্রগৃহ্য চ।
ভাব্যমর্থন্তু তং জ্ঞাত্বা মাহাত্ম্যাৎ তমুবাচ সা॥
বিপর্য্যয়স্তু ত্বং লব্ধা অনড্বানিব বর্ত্তসে।
গম্যাগম্যং ন জানীষে গোধর্ম্মাৎ প্রার্থয়ন্ সুতাম্॥
দুর্বৃত্তং ত্বাং ত্যজাম্যদ্য গচ্ছ ত্বং স্বেন কর্ম্মণা।

এবং মৎস্যপুরাণে যে মতভেদ আছে, তাহা কল্পভেদব্যবস্থায় মীমাংসনীয়।

কাষ্ঠে সমুদ্গে প্রক্ষিপ্য গঙ্গাম্ভসি সমুৎসৃজৎ।
যস্মাৎ ত্বমন্ধো বৃদ্ধশ্চ তর্ত্তব্যো দুরধিষ্ঠিতঃ॥
তমুহ্যমানং বেগেন স্রোতসোঽভ্যাসমাগতঃ।
জগ্রাহ তং স ধর্ম্মাত্মা বলির্বৈরোচনিস্তদা॥
অন্তঃপুরে জুগোপৈনং ভোক্ষ্যভোজ্যৈশ্চ তর্পয়ন্।
প্রীতশ্চৈবং বরেণৈব চ্ছন্দয়ামাস বৈ বলিম্॥
তস্মাচ্চ স বরং বব্রে পুত্রার্থে দানবর্ষভঃ।
সন্তানার্থং মহাভাগ ভার্য্যায়াং মম মানদ।
পুত্রান্ ধর্ম্মার্থতত্ত্বজ্ঞানুৎপাদয়িতুমর্হসি॥
এবমুক্তোঽথ দেবর্ষিস্তথাস্ত্বিত্যুক্তবান্ প্রভুঃ।
স তস্য রাজ্ঞঃ স্বাং ভার্য্যাং সুদেষ্ণাং নাম প্রাহিণোৎ।
অন্ধং বৃদ্ধঞ্চ তং জ্ঞাত্বা ন সা দেবী জগাম হ॥
শূদ্রাং ধাত্রেয়িকাং তস্মৈ অন্ধায় প্রাহিণোৎ তদা।
তস্যাং কাক্ষীবদাদীংশ্চ শূদ্রযোনাবৃষির্বশী॥
জনয়ামাস ধর্ম্মাত্মা শূদ্রানিত্যেবমাদিকম্।
উবাচ তং বলী রাজ্ঞা দৃষ্ট্বা কাক্ষীবদাদিকান্॥

রাজোবাচ।

প্রবীণানৃষিধর্ম্মস্য চেশ্বরান্ ব্রহ্মবাদিনঃ।
বিদ্বান্ প্রত্যক্ষধর্ম্মাণাং বুদ্ধিমান্ বৃত্তিমান্ শুচীন্॥
মমৈব চেতিহোবাচ তং দীর্ঘতমসং বলিঃ।
নেত্যুবাচ মুনিস্তং বৈ মমৈবমিতি চাব্রবীৎ॥
উৎপন্নাঃ শূদ্রযোনৌ তু ভবচ্ছন্দেঽসুরোত্তম।
অন্ধং বৃদ্ধঞ্চ মাং জ্ঞাত্বা সুদেষ্ণা মহিষী তব।
প্রাহিণোদবমানান্মে শূদ্রাং ধাত্রেয়িকাং নৃপ॥
ততঃ প্রসাদয়ামাস বলিস্তমৃষিসত্তমম্।
বলিঃ সুদেষ্ণাং তাং ভার্য্যাং তৎসম্নামাস দানবঃ॥
পুনশ্চ তামলঙ্কৃত্য ঋষয়ে প্রত্যপাদয়ৎ।
তাং স দীর্ঘতমা দেবীং তথা কৃতবতীং তদা॥
দৃষ্ট্বা লবণমিশ্রেণ ত্বভ্যক্তং মধুকেন তু।
লিহ মামজুগুপ্সন্তী আপাদতলমস্তকম্।
ততস্ত্বং প্রাপ্স্যসে দেবি পুত্রান্ বৈ মনসেপ্সিতান্॥
তস্য সা তদ্বচো দেবী সর্ব্বং কৃতবতী তদা।
তস্য সাপানমাসাদ্য দেবী পরিহরৎ তদা॥
তামুবাচ ততঃ সোঽথ যৎ তে পরিহৃতং শুভে।
বিনাপানং কুমারস্তু জনয়িষ্যসি পূর্ব্বজম্॥

সুদেষ্ণোবাচ।

নার্হসি ত্বং মহাভাগ পুত্রং মে দাতুমীদৃশম্।
তোষিতশ্চ যথাশক্তি প্রসাদং কুরু মে প্রভো॥

দীর্ঘতমা উবাচ।

ভবাপচারাদ্দেব্যেষ নান্যথা ভবিতা শুভে।
নৈব দাস্যতি পুত্রস্তে পৌত্রো বৈ দাস্যতে ফলম্॥
তস্যাপানং বিনা চৈব যোগ্যভাবো ভবিষ্যতি।
তস্মাদ্দীর্ঘতমাঙ্গেষু কুক্ষৌ স্পৃষ্টে দমব্রবীৎ॥
প্রাশিতং যদ্যদঙ্গেষু ন সোপস্থং শুচিস্মিতে।
তেন তিষ্ঠন্তি তে গর্ভে পৌর্ণমাস্যামিবোডুরাট্॥
ভবিষ্যন্তি কুমারাস্তু পঞ্চ দেবসুতোপমাঃ।

উতথ্য-তনয় যে ধর্ম্ম-নির্ণায়ক, এ কথা মনুতে লিখিত আছে*। কুল্লুকভট্ট উতথ্য-তনয় শব্দের অর্থ করিয়াছেন গৌতম (পাঠান্তরে গোতম)।

মহাভারতে লিখিত আছে, দীর্ঘতমা উতথ্যের পুত্র, মৎস্য পুরাণে দেখা যাইতেছে, দীর্ঘতমার নামান্তর গোতম আর গোতম শব্দের উত্তর স্বার্থে অণ্ করিলে হয় গৌতম। মহাভারতে ততদূর উল্লেখ না থাকিলেও, মৎস্য-পুরাণের এই উক্তি মহাভারত-বিরুদ্ধ নহে। সুতরাং এই অংশ সর্ব্বকল্পসাধারণ বলিলেও ক্ষতি নাই। অন্ততঃ কুল্লুকভট্ট সেই ভাবেই গ্রহণ করিয়াছেন। সর্ব্বশুদ্ধ আমরা পাঁচজন

তেজস্বিনঃ সুবৃত্তাশ্চ যজ্বানো ধার্ম্মিকাশ্চ তে॥

সূত উবাচ।

তদংশস্তু সুদেষ্ণায়া জ্যেষ্ঠঃ পুত্রো ব্যজায়ত।
অঙ্গস্তথা কলিঙ্গশ্চ পুণ্ড্রঃ সুহ্মস্তথৈব চ॥
বঙ্গরাজস্তু পঞ্চৈতে বলেঃ পুত্রাশ্চ ক্ষেত্রজাঃ।
ইত্যেতে দীর্ঘতমসা বলের্দত্তাঃ সুতাস্তথা॥
প্রতিষ্ঠামাগতানাং হি ব্রাহ্মণ্যং কারয়ংস্ততঃ।
ততো মানুষযোন্যাং স জনয়ামাস বৈ প্রজাঃ॥
ততস্তং দীর্ঘতমসং সুরভির্বাক্যমব্রবীৎ।
বিচার্য্য যস্মাদ্ধোধর্ম্মং প্রমাণং তে কৃতং বিভো॥
ভক্ত্যা চানন্যয়াস্মাসু তেন প্রীতাস্মি তেঽনঘ।
তস্মাৎ তুভ্যং তমো দীর্ঘমাত্মায়াপনুদামি বৈ॥
বার্হস্পত্যস্তথৈবৈষ পাপ্মা বৈ তিষ্ঠতি ত্বয়ি।
জরাং মৃত্যুং তমশ্চৈব আত্মায়াপনুদামি তে॥
সদ্যঃ স ভ্রাতমাত্রস্তু অসিতো মুনিসত্তম।
আয়ুষ্মাংশ্চ বপুষ্মাংশ্চ চক্ষুষ্মাংশ্চ ততোঽভবৎ॥
গোঽভ্যাহতে তমসি বৈ গোতমস্তু ততোঽভবৎ।
কাক্ষীবাংস্তু ততো গত্বা সহ পিত্রা গিরিব্রজম্॥
দৃষ্ট্বা স্পৃষ্ট্বা পিতুঃ সো বৈ ত্যপবিষ্টস্চিরং তপঃ।
ততঃ কালেন মহতা তপসা ভাবিতস্তু সঃ॥
বিধূয় মাতৃজং কায়ং ব্রাহ্মণ্যং প্রাপ্তবান্ বিভুঃ।
ততোঽব্রবীৎ পিতা তং বৈ পুত্রবানস্ম্যহং ত্বয়া॥
সৎপুত্রেণ তু ধর্ম্মজ্ঞ কৃতার্থোঽহং যশস্বিনা।
মুক্তাত্মানং ততোঽব্রূর্ণো বৈ ভ্রাতৃবান্ ব্রহ্মণঃ ক্ষয়ম্॥
ব্রাহ্মণ্যং প্রাপ্য কাক্ষীবান্ সহস্রমসৃজৎ সুতান্।
কৌষ্মাণ্ডা গৌতমাশ্চৈব স্মৃতাঃ কাক্ষীবতঃ সুতাঃ॥

মৎস্যপুরাণ ৪৮ অঃ।

* শূদ্রাবেদী পতত্যত্রেরুতথ্যতনয়স্য চ।
শৌনকস্য সুতোৎপত্ত্যা তদপত্যতয়া ভৃগোঃ॥

মনু।

মূল গৌতম এবং একজন গোতমের দেখা পাইতেছি।

স্বার্থে অণ্ প্রত্যয় করিলে, গোতম শব্দ গৌতম শব্দে পরিণত হয়, তাহা হইলে, ছয় জন গৌতম।

শাস্ত্রে গৌতমের প্রভাবপরিচয় প্রচুরপরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। অত্রি মরীচি প্রভৃতি ব্রহ্মপুত্র ঋষিবৃন্দ অপেক্ষা তাঁহার কীর্ত্তি কম নহে। গৌতম বর্ত্তমান মন্বন্তরে সপ্তর্ষির অন্যতম*। গৌতম এক দ্বাপর যুগে বেদ-বিভাগকর্ত্তা বেদব্যাস হন†। অত্রি বসিষ্ঠ প্রভৃতি ঋষির ন্যায় গৌতম আশ্বিন মাসে 'পূষা' নামক সূর্য্যের সহিত একত্র ভ্রমণ করিয়া থাকেন।‡ গৌতম বহু বেদমন্ত্রের স্মর্ত্তা।॥ প্রধান ঋষি-সমাজ মাত্রেই গৌতমের সমাগম শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। এই বহু-গৌতমের মধ্যে সেই মহর্ষি গৌতমকে জানা যায় কিরূপে? যে মহর্ষি, জিতেন্দ্রিয়তাবলে পৃথিবী এবং স্বর্গকে দমিত করিতে সক্ষম বলিয়া অথবা যিনি উৎপন্ন হইবামাত্র তেজঃপ্রভাবে অন্ধকার দূর করিয়াছিলেন বলিয়া, গৌতম নামে অভিহিত, তিনি কে?* এই বহুগৌতমের মধ্যে তাঁহার স্বরূপ জ্ঞান কিরূপে করা যায়?

বাল্মীকি-রামায়ণ এবং শিব-পুরাণের বচনানুসারে বোধ হয়, অহল্যার স্বামী যে গৌতম, তিনিই সুপ্রসিদ্ধ, তিনিই মহাতেজা তপোবল সম্পন্ন এবং জিতেন্দ্রিয়শ্রেষ্ঠ।

রামায়ণে কথিত আছে, মনুপুত্র ইক্ষ্বাকুর অন্যতম পুত্র নিমি, গৌতমাশ্রমের নিকটে রাজধানী স্থাপন করিলেন। গৌতমের প্রসিদ্ধি এই উক্তি দ্বারা পরিস্ফুট। যে ব্যক্তির নামে দেশ পরিচিত হয়, তিনি যে সুপ্রসিদ্ধ, এ কথা আর বলিতে হয় না। নিমি সহস্র-বার্ষিক যজ্ঞ করিতে মনঃস্থ করিয়া অত্রি, অঙ্গিরা, ভৃগু এবং বসিষ্ঠ এই চারি জন ব্রহ্মনন্দনকে যজ্ঞকার্য্যে বরণ করেন। বসিষ্ঠ কুলপুরোহিত; তিনি হোতৃরূপে বৃত হইলেন। কিন্তু বসিষ্ঠ পূর্ব্বেই সহস্রবর্ষসাধ্য ইন্দ্রযজ্ঞে আহূত হইয়াছিলেন, নিমি রাজার যজ্ঞে হোতৃকর্ম্ম তিনি করিতে পারিলেন না। বসিষ্ঠ, নিমিকে সেই সহস্র বৎসর যজ্ঞ করিতে নিষেধ করিলেন। নিমি তাহা শুনিলেন না। বসিষ্ঠ ইন্দ্রযজ্ঞে গমন করিলে, বসিষ্ঠের পরিবর্ত্তে মহর্ষি গৌতমকে হোতৃরূপে বরণ করিয়া নিমি রাজা যজ্ঞ করিতে লাগিলেন। ইহাতে বুঝা যাইতেছে, গৌতম,—ভৃগু বসিষ্ঠ প্রভৃতি ঋষিগণের সমকক্ষ। বসিষ্ঠ, ইন্দ্রযজ্ঞসমাপনের পর আসিয়া নিমি রাজার যজ্ঞের কথা শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন। তার পর সামান্য ছলে, বসিষ্ঠ নিমিকে শাপ দেন; নিমিও বসিষ্ঠকে প্রতিশাপ

* বিবস্বতঃ সুতোবিপ্র শ্রাদ্ধদেবো মহাদ্যুতিঃ।
মনুঃ সংবর্ত্ততে ধীমান্ সাম্প্রতং সপ্তমেঽন্তরে॥
বসিষ্ঠঃ কাশ্যপোঽথাত্রির্জমদগ্নিঃ সগৌতমঃ।
বিশ্বামিত্রো ভরদ্বাজঃ সপ্ত সপ্তর্ষয়োঽভবন্॥

বিষ্ণুপুরাণ—৩য় অংশ, ১ম অঃ।

অত্রির্বসিষ্ঠো ভগবান্ কশ্যপশ্চ মহানৃষিঃ।
গৌতমশ্চ ভরদ্বাজো বিশ্বামিত্রস্তথৈব চ॥
তথৈব পুত্রো ভগবান্ ঋচীকস্য মহাত্মনঃ।
সপ্তমো জমদগ্নিশ্চ ঋষয়ঃ সাম্প্রতং দিবি॥

হরিবংশ ৭।৩৪।৩৫

† ততো ব্যানো ভরদ্বাজঃ ভরদ্বাজাৎ তু গৌতমঃ।

বিষ্ণুপুরাণ—৩য় অংশ, ৩য় অঃ।

'অত্রিরেকোনবিংশোঽথ গৌতমস্তু ততঃ পরম্।'

দেবীভাগবত।

বিষ্ণুপুরাণেও ইহা কথিত আছে।

‡ পূষা চ সুরুচির্ভাতা গৌতমোঽথ ধনঞ্জয়ঃ।
সুষেণোঽন্যো ঘৃতাচী চ বসন্ত্যাখ্যুজে রবৌ॥

বিষ্ণুপুরাণ।

॥ পঞ্চযজ্ঞের মন্ত্রাদি দেখ।

* গৌতম উবাচ।
গোদমোঽহমতোঽধুমোঽদমস্তে সমদর্শনাৎ।
গোভিস্তনো মম ধ্বস্তং জন্তমাত্রস্য দেহতঃ॥
বিদ্ধি মাং গোতমং কৃত্যে যাতুধানি নিবোধ মাম্।

মহাভারত, অনুশাসনপর্ব্ব—১৩ম অধ্যায় ৯৫।

গোতম এব গৌতমঃ। ইতি টিপ্পনী।

দেন; তাহার ফলে দুজনেই দেহহীন হন।* ব্রহ্মার অনুগ্রহে বসিষ্ঠ মিত্রাবরুণ-শুক্র-সম্ভূত দেহ প্রাপ্ত হইলেন; নিমি দেহ প্রার্থনা করিলেন না। এই শাপ প্রতিশাপ হইতেই বসিষ্ঠের নিমি-বংশ-পৌরোহিত্য রহিল।

সম্ভবতঃ তদবধি গৌতম এবং কিয়দ্দিন পরে গৌতমের জ্যেষ্ঠ পুত্র শতানন্দ নিমি-বংশের অর্থাৎ প্রসিদ্ধ জনক-বংশের পুরোহিত হইলেন। অহল্যার গর্ভে গৌতমের ঔরসে শতানন্দ প্রভৃতি ঋষিগণের জন্ম।

অহল্যা ব্রহ্মার মানসী কন্যা। অহল্যা, জগতে অতুলনীয়া পরমা রূপবতী। ইন্দ্র ভাবিলেন, এ রমণী আমারই হইবে; যেহেতু আমি দেবগণের রাজা সর্ব্বোৎকৃষ্ট পাত্র। ব্রহ্মা, অহল্যাকে মহর্ষি গৌতমের নিকট গচ্ছিত করিয়া রাখিলেন।

কিছুকাল পরে ব্রহ্মা চাহিবামাত্র গৌতম অহল্যাকে অনায়াসে ব্রহ্মার হস্তে প্রত্যর্পণ করিলেন। ব্রহ্মা মহর্ষি গৌতমের এই প্রকার অপূর্ব্ব ধৈর্য্য, জিতেন্দ্রিয়তা এবং তপঃসিদ্ধি দর্শনে, তাঁহাকেই অহল্যা সম্প্রদান করিলেন। ইন্দ্রের অহল্যা-বিবাহ-আশা সমূলে নির্ম্মূল হইল। তার পর ইন্দ্র, গৌতমের অনুপস্থিতি-কালে গৌতম-মূর্ত্তিতে আশ্রমে প্রবিষ্ট হইয়া পাপপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করেন; তাহার ফলে, গৌতমের অভিশাপে ইন্দ্র বৃষণ-শূন্য, সহস্রচিহ্ন-যুক্ত এবং শক্র-হস্তগত হন। ইন্দ্র আরও নানাবিধ শাপগ্রস্ত হন।*

* আসীদ্রাজা নিমির্নাম ইক্ষ্বাকূণাং মহাত্মনাম্।
পুত্রো দ্বাদশমো বীর্য্যে ধর্ম্মে চ পরিনিষ্ঠিতঃ॥
স রাজা বীর্য্যসম্পন্নঃ পুরং দেবপুরোপমম্।
নিবেশয়ামাস তদা স্বভ্যাসে গৌতমস্য তু॥
পুরস্য সুকৃতং নাম বৈজয়ন্তমিতি শ্রুতম্।
নিবেশং যত্র রাজার্ষির্নিমিশ্চক্রে মহাযশাঃ॥
তস্য বুদ্ধিঃ সমুৎপন্না নিবেশ্য সুমহাপুরম্।
যজেয়ং দীর্ঘসত্রেণ পিতুঃ প্রহ্লাদমন্যু মনঃ॥
ততঃ পিতরমামন্ত্র্য ইক্ষ্বাকুং হি মহীপতিম্।
বসিষ্ঠং বরয়ামাস পূর্ব্বং ব্রহ্মর্ষিসত্তমম্॥
অনন্তরং স রাজর্ষির্নিমিরিক্ষ্বাকুনন্দনঃ।
অত্রিমঙ্গিরসঞ্চৈব ভৃগুঞ্চৈব তপোনিধিম্॥
তমুবাচ বসিষ্ঠস্তু নিমিং রাজর্ষিসত্তমম্।
বৃতোঽহং পূর্ব্বমিন্দ্রেণ অন্তরং প্রতিপালয়॥
অনন্তরং মহাবিপ্রো গৌতমঃ প্রত্যপূরয়ৎ।
বসিষ্ঠোঽপি মহাতেজা ইন্দ্রযজ্ঞমথাকরোৎ॥
নিমিস্তু রাজা বিপ্রাংস্তান্ সমানীয় নরাধিপঃ।
অযজদ্ হিমবৎ পার্শ্বে স্বপুরস্য সমীপতঃ॥
পঞ্চবর্ষসহস্রাণি রাজা দীক্ষামথাগমৎ।
ইন্দ্রো বর্ষসহস্রন্তু বাজিমেধমথাকরোৎ॥
ইন্দ্রযজ্ঞাবসানে তু বসিষ্ঠো ভগবানৃষিঃ।
নকাশমাগতো রাজ্ঞো হোতারং কর্ত্তুমনিন্দিতঃ॥
তদন্তরমথাপশ্যদ্ গৌতমেনাভিপূরিতম্।
কোপেন মহতাবিষ্টো বসিষ্ঠো ব্রহ্মণঃ সুতঃ॥
স রাজ্ঞো দর্শনাকাঙ্ক্ষী মুহূর্ত্তং সমুপাবিশৎ।
তস্মিন্নহনি রাজর্ষির্নিদ্রয়াপহৃতো ভৃশম্॥
ততো মন্যুর্বসিষ্ঠস্য প্রাদুরাসীন্মহাত্মনঃ।
অদর্শনেন রাজর্ষের্ব্যাহর্ত্তুমুপচক্রমে॥
যস্মাৎ ত্বমন্যং কৃতবান্ নামবজ্ঞায় পার্থিব।
চেতনেন বিনাভূতো দেহস্তে পার্থিবৈষ্যতি॥
ততঃ প্রবুদ্ধো রাজা তু শ্রুত্বা শাপমুদাহৃতম্।
ব্রহ্মযোনিমথোবাচ স রাজা ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ॥
অজানতঃ শয়ানস্য ক্রোধেন কলুষীকৃতঃ।
উক্তবান্ মম শাপাগ্নিং যন্মদণ্ডমিবাপরম্॥
তস্মাৎ তবাপি ব্রহ্মর্ষে চেতনেন বিনাকৃতঃ।
দেহঃ স সুচিরপ্রখ্যো ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥
রামায়ণ, উত্তরকাণ্ড—৬৫ম সর্গ।

* এতস্মিন্নন্তরে রাম দীনো ভ্রষ্টাময়দ্যুতিঃ।
ইন্দ্রশ্চিন্তাপরীতাত্মা ধ্যানভংশপরভাং গতঃ॥
তন্তু দৃষ্ট্বা তথাভূতং প্রাহ দেবঃ পিতামহঃ।
শতক্রতো কিমু পুরা করোতি স্ম সুদুষ্কৃতম্॥
অমরেন্দ্র ময়া বুদ্ধ্যা প্রজাঃ সৃষ্টাস্তথা প্রভো।
একবর্ণাঃ সমাভাষা একরূপাশ্চ সর্ব্বশঃ॥
তাসাং নাস্তি বিশেষো হি দর্শনে লক্ষণেঽপি বা।
ততোঽহমেকাগ্রমনাস্তাঃ প্রজাঃ সমচিন্তয়ম্॥
সোঽহং তাসাং বিশেষার্থং স্ত্রিয়মেকাং বিনির্ম্মমে।
যদূষং প্রজানাং প্রত্যঙ্গং বিশিষ্টং তত্তদুদ্ধৃতম্॥
ততো ময়া রূপগুণৈরহল্যা স্ত্রী বিনির্ম্মিতা।
হলং নামেহ বৈরূপ্যং হল্যং তৎপ্রভবং ভবেৎ॥
যস্যা ন বিদ্যতে হল্যং তেনাহল্যেতি বিশ্রুতা।
অহল্যেত্যেব চ ময়া তস্যা নাম প্রকীর্ত্তিতম্॥
নির্ম্মিতায়াঞ্চ দেবেন্দ্র তস্যাং নার্য্যাং সুরর্ষভ।
ভবিষ্যতীতি কস্মৈষা মম চিন্তা ততোঽভবৎ॥
ত্বন্তু শক্র তদা নারীং জানীষে মনসা প্রভো।
স্থানাধিকতয়া পত্নী মমৈষেতি পুরন্দর॥
সা ময়া ন্যাসভূতা তু গৌতমস্য মহাত্মনঃ।
ন্যস্তা বহূনি বর্ষাণি তেন নির্য্যাতিতা চ হ॥

অহল্যা পতিশাপে বহু সহস্রবর্ষ অনাবৃত বিজন প্রান্তরে প্রস্তরের ন্যায় নিঃস্পন্দভাবে শীতবাতাতপ সহ্য করিতে লাগিলেন। অহল্যা তখন সাধারণের চক্ষে শিলা-রূপেই প্রতিভাত হইতেন।

তৎপরে, মহর্ষি গৌতমের বচনানুসারেই অহল্যা, আশ্রমাগত শ্রীরামের পূজা করিয়া পাপমুক্তা হইলেন।

তখন হিমালয়শিখরে তপশ্চর্য্যানিরত মহর্ষি গৌতম যোগবলে শ্রীরামের আগমনার্দ্ধি জানিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ স্বীয় পরিত্যক্ত আশ্রমে আসিলেন এবং শ্রীরাম-সন্দর্শনাদি করিয়া অহল্যা-সমভিব্যাহারে পুনরায় হিমালয়ে প্রস্থান করিলেন।* ক্রমশঃ—

শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন।

ততস্তস্য পরিজ্ঞায় মহাস্থৈর্য্যং মহামুনেঃ।
জ্ঞাত্বা তপসি সিদ্ধিঞ্চ পত্ন্যর্থং স্পর্শিতা তদা॥
স তয়া সহ ধর্ম্মাত্মা রমতে স্ম মহামুনিঃ।
আসন্ নিরাশা দেবাস্তু গৌতমে দত্তয়া তয়া॥
ত্বং ক্রুদ্ধস্ত্বিহ কামাত্মা গত্বা তস্যাশ্রমং মুনেঃ।
দৃষ্টবাংশ্চ তদা তাং স্ত্রীং দীপ্তামগ্নিশিখামিব॥
সা ত্বয়া ধর্ষিতা শক্র কামার্ত্তেন সমন্যুনা।
দৃষ্টস্ত্বঞ্চ তদা তেন আশ্রমে পরমর্ষিণা॥
ততঃ ক্রুদ্ধেন তেনাসি শপ্তঃ পরমতেজসা।
গতোঽসি যেন দেবেন্দ্র দশাভাগবিপর্য্যয়ম্॥
যস্মান্মে ধর্ষিতা পত্নী ত্বয়া বানব নির্ভয়াৎ।
তস্মাৎ ত্বং সমরে শক্র শত্রুহস্তং গমিষ্যসি॥
অয়ন্তু ভাবো দুর্ব্বুদ্ধে যস্ত্বয়েহ প্রবর্ত্তিতঃ।
মানুষেষ্বপি লোকেষু গমিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥
ভত্রার্দ্ধং তস্য যঃ কর্ত্তা ত্বষ্যর্দ্ধং নিপতিষ্যতি।
ন চ তে স্থাবরং স্থানং ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥
যশ্চ যশ্চ সুরেন্দ্রঃ স্যাৎ ধ্রুবং স ন ভবিষ্যতি।
এষ শাপো ময়া মুক্ত ইত্যসৌ ত্বাং তদাব্রবীৎ॥
তান্ত ভার্য্যাং সুনির্ভর্ৎস্য সোঽব্রবীৎ সুমহাতপাঃ।
দুর্ব্বিনীতে বিনিধ্বংস মমাশ্রমসমীপতঃ॥
রূপযৌবনসম্পন্না যস্মাৎ ত্বমনবস্থিতা।
তস্মাদ্রূপবতী লোকে ন ত্বমেকা ভবিষ্যসি॥
রূপঞ্চ তে প্রজাঃ সর্ব্বা গমিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ।
যত্তদেকং সমাশ্রিত্য বিভ্রমোঽয়মুপস্থিতঃ॥
তদা প্রভৃতি ভূয়িষ্ঠং প্রজা রূপসমন্বিতা।
সা তং প্রসাদয়ামাস মহর্ষিং গৌতমং তদা॥
অজ্ঞানাদ্ধর্ষিতা বিপ্র ত্বদ্রূপেণ দিবৌকসা।
ন কামকারাদ্বিপ্রর্ষে প্রসাদং কর্ত্তুমর্হসি॥
অহল্যায়া ত্বেবমুক্তঃ প্রত্যুবাচ স গৌতমঃ।
উৎপৎস্যতি মহাতেজা ইক্ষ্বাকূণাং মহারথঃ॥
রামো নাম শ্রুতো লোকে বনঞ্চাপ্যুপযাস্যতি।
ব্রাহ্মণার্থে মহাবাহুর্বিষ্ণুর্মানুষবিগ্রহঃ॥
তং দ্রক্ষ্যসি যদা ভদ্রে ততঃ পূতা ভবিষ্যসি।
স হি পাবয়িতুং শক্তস্ত্বয়া যদ্দুষ্কৃতং কৃতম্॥
তস্যাতিথ্যঞ্চ কৃত্বা বৈ মৎসমীপং গমিষ্যসি।
বৎস্যসি ত্বং ময়া সার্দ্ধং ভদা হি বরবর্ণিনি॥
এবমুক্ত্বা স বিপ্রর্ষিরাজগাম স্বমাশ্রমম্।
তপশ্চচার সুমহৎ সা পত্নী ব্রহ্মবাদিনঃ॥
শাপোৎসর্গাদ্ধি তস্যেদং মুনেঃ সর্ব্বমুপস্থিতম্।
তৎ স্মর ত্বং মহাবাহো দুষ্কৃতং যৎ ত্বয়া কৃতম্॥

---

* তেন ত্বং গ্রহণং শত্রোর্যাতো নাস্যেন বাসব।
শীঘ্রং বৈ যজ যজ্ঞং ত্বং বৈষ্ণবং সুসমাহিতঃ॥
বাল্মীকি রামায়ণ, উত্তরকাণ্ড, ৩৫শ সর্গ।
"শতলিঙ্গীকৃতঃ স্বরাট্।" পদ্মপুরাণ।
"সহস্রভগবান্ ভব।" পুরাণ।
"অফলত্বং ভবিষ্যসি।" রামায়ণ।

* রামায়ণ আদিকাণ্ড প্রসিদ্ধ বৃত্তান্ত।

সমালোচনা।

ভবের হাট। সামাজিক উপন্যাস। শ্রীযুক্ত মাণিকলাল চট্টোপাধ্যায় প্রণীত ও প্রকাশিত। মূল্য ৸০ আনা। আজি কালি নাটকের যে দশা, উপন্যাসের দশাও প্রায় তদ্রূপ। পাঠশালের 'তালপাত' সাঙ্গ করিতে না-করিতে অনেকে কাগজে লিখিতে সুরু করেন। সে কাগজে-লেখা আর "সাদার পিঠে কালী"-দেওয়া দুই-ই সমান। "ভবের হাটের" লেখক অবশ্য সে শ্রেণীর নহেন। তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি আছে; মনুষ্য-চরিত্রের অভিধান তিনি দেখিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। তবে ইহাতে লিপি-কুশলতার বড় অভাব এবং বর্ণাশুদ্ধি বড় বেশী রকমের। আর কমা, সেমি, ছেদ—এ যে কখন্ কার পিঠে পড়িয়াছে, তাহা নির্ণয় করা কঠিন।

নূরজাহান। শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী ঘোষ প্রণীত ও প্রকাশিত। কলিকাতা, হেয়ার প্রেসে মুদ্রিত; মূল্য ১ টাকা। যখন হেয়ার প্রেসে মুদ্রিত, তখন ছাপাখানার খুটীনাটী বিষয়ে সকলই যে অতি পরিপাটী হইবে, সে পক্ষে আর কথাটী নাই। বেশ পুরু কাগজ, পাইকা অক্ষর, চক্‌চকে কালী, মানান-সই গঠন—সকলই কেতা-দুরস্ত। কিন্তু দুঃখের মধ্যে ঐ পর্য্যন্ত। ইহা নাটক, নবন্যাস, না কাব্য—কিছুই বুঝিলাম না। যদি দুই জনের কথোপকথনের নাম 'নাটক' হয়, তবে আমরা এ গ্রন্থকে নাটক বলিতে বাধ্য। যেহেতু ইহার আরম্ভ নূরজাহান ও তাহার মাতা হুরকে লইয়া।—

"হুর। কৈলা, আজিও ত ওষ্ঠে আল্‌তা দিস্ নাই। আমার মাথা খাও। চল যাই ফিরে।"

এ ভাষা কি নাটক, নবন্যাস, না কাব্যের? সুতরাং মিথ্যা কথা কহিব না, নমুনা দেখিয়াই মুখপাতে বই পড়া বন্ধ করিয়াছি;—তবে স্থানে স্থানে পাতা ওল্‌টাইয়া কিছু কিছু দেখিয়াছি বটে।

পাঠক, নূরজাহানের আর একটু নমুনা দেখ;—

"ষষ্ঠ অঙ্ক। নূর ও দাসী সিরিন। বর্দ্ধমান। (৫৯ এর পৃষ্ঠা।)

"সিরিন। বলিবে কি?

"নূর। কোন কথা?

"সিরিন। যদি কথা বল,

বলি তবে জানিতে বাসনা হয় মনে।

"নূর। বল না, অবলা কিছু আছে কি তোমার।

"সিরিন। ভারী কথা কিছু নয়।

"নূর। পাতলাই ভাল।

"সিরিন। তুমিত কৃশাঙ্গী ভারী তুলিতে পার না!

"নূর। লতিকা তুলনা যদি সদা দেয় মোরে; তা ব'লে লতিকা নহি।"

এমনই রঙ্গ, রস, রসিকতা। বড় দুঃখ, সমালোচকের ধৈর্য্যের অভাব; তাই পাঠক গোটা বই খানার মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন না। যাঁহার সে সখ আছে, তিনি গিয়া নগদ এক টাকা খরচ করিয়া এক খানি "নূরজাহান" কিনুন;—লেখকেরও কিছু লাভ হইবে, তাঁহারও কৌতূহলবৃত্তি চরিতার্থ হইবে।

নাটুকে দীনবন্ধু দেশ-দেশান্তর হইতে ভাষা সংগ্রহ করিয়া "বাহবা" লইয়াছিলেন; আমাদের এই "নূরজাহান"-লেখকেরও সে বিষয়ে বাহাদুরী কম নয়। ইহাতে পারসী আছে, মুসলমানী আছে, হিন্দী আছে, খুঁজিয়া পাতিয়া দেখিলে বোধ করি দুই একটা খৃষ্টানীও আছে,—নাই কেবল খাঁটী বাঙ্গালা। যেন রামবিহীন রামযাত্রা! আরও কথা আছে। নূরজাহানে প্রেম আছে, স্পর্শ আছে, চুম্বন আছে, চম্‌কে ওঠা আছে, বীরত্ব আছে, ধীরত্ব আছে—আরও কত কি আছে, তাহা দেখিয়া উঠিতে পারি নাই;—কিন্তু হলপ করিয়া বলিতে পারি, এক ছত্র লিপি-কুশলতা কোথাও দেখি নাই। নূরজাহানের মত নাটক নবেল দিনকত বাঙ্গালায় না বাহির হইলেই ভাল হয়।

বাণ-বিজয়। শ্রীযুক্ত মাণিকলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। মূল্য ।৵০ আনা। পৌরাণিক বাণ-রাজের আখ্যায়িকা অবলম্বনে লেখক একখানি দৃশ্যকাব্য লিখিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। ইহার স্থানে স্থানে কবিত্ব আছে।

জন্মভূমি।

৫ম ভাগ। } আষাঢ়। ১৩০২। { ৭ম সংখ্যা।

মাতৃভক্তি। *

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।"

এই অমৃতময়ী দেব-বাণী যে মহাপুরুষের মুখ হইতে প্রথম বাহির হইয়াছে, তাঁহার উদ্দেশে, তাঁহাকে শত শত নমস্কার করি। বস্তুতঃ, জননী অপেক্ষা পূজনীয়া, সংসারে আর কেহ নাই এবং জননী অপেক্ষা মহাগুরুও আর কেহ নহেন। "স্বর্গাদপি গরীয়সী"—অর্থাৎ "স্বর্গ যে এত উচ্চ ও পবিত্র, মাতা তদপেক্ষাও উচ্চ ও পবিত্র।" কথাটী অতি ধ্রুব-সত্য। হিন্দুর দেশে, মাতৃভক্তি যে কি পরম-পুণ্যময় পবিত্র বস্তু, তাহা হিন্দুই জানেন। শুধু হিন্দুর দেশ কেন, পৃথিবীর এমন কোন স্থান নাই, যেখানে মাতৃভক্তির পরিচয় পাওয়া না যায়। তবে ভক্তি-প্রাণ হিন্দুর দেশে, ভক্তি-প্রাণ হিন্দুর জীবনে, এই পবিত্র মাতৃভক্তির বিশিষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় বটে। কারণ, প্রত্যক্ষ দেবতাভাবে মাতৃপূজা আর কোন দেশে নাই।

কিন্তু হিন্দু, 'মাতা' বলিতে, কেবলই গর্ভধারিণী জননীকে বুঝেন না,—অনেকেই তাঁহার মাতৃস্থানীয়া বা মাতা। হিন্দু-শাস্ত্রকারও, মাতার "একবিংশতি নামমালা" নির্দ্দেশ করিয়াছেন। "মাতা, ধরিত্রী, জননী, দয়ার্দ্রহৃদয়া, শিবা, বিশ্বেশ্বরশ্রেষ্ঠা, নির্দ্দোষা, শমদুঃখহরা, সাধ্বী-নীয়া, পরমা, দয়া, শান্তি, ক্ষমা, ধৃতি, স্বাহা, স্বধা, গৌরী, পদ্মা, বিজয়া, জয়া ও দুঃখহন্ত্রী"—এই একবিংশতি নামমালাই হিন্দুর জপ, তপ ও আরাধ্য বস্তু। এবং এই কয়েকটীতে আত্ম-মনঃ-প্রাণ সমর্পণ করিলেই, হিন্দুর মুক্তি হয়। এতদ্ব্যতীত পৃথিবী, গো, বসুন্ধরা প্রভৃতি আরও ষোড়শ মাতা শাস্ত্রে কথিত আছে।

হিন্দুর শাস্ত্র কেবল ইহা বলিয়াই ক্ষান্ত হন নাই;—শাস্ত্র বলিতেছেন,—পিতা ও মাতা দুই-ই এক; দু'জনাই মহাগুরু এবং দু'জনাই বিশিষ্ট ভক্তির পাত্র। পিতা—জ্ঞান, মাতা—ভক্তি; পিতা—পুরুষ, মাতা—প্রকৃতি; পিতা—হর, মাতা—গৌরী। উভয়ের আধার-আধেয় সম্বন্ধ। যিনি একাধারে, অভেদজ্ঞানে, এই যুগল-মূর্ত্তির পূজা করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ সু-সন্তান। আবার হিন্দুর নীতিবেত্তা বলিতেছেন,—"মাতৃবৎ পরদারেষু"। পরস্ত্রী মাত্রেই মাতার ন্যায়। অর্থাৎ কেবলই যে মাতাকে ভক্তি করিবে এমন নহে,—পরস্ত্রীকেও

* বহুবাজার "হিন্দুধর্ম্ম-প্রচার-সমিতি"র বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত।

মাতৃবৎ ভক্তি করিবে। হিন্দুর শাস্ত্র বড় উদার, শাস্ত্রের উদ্দেশ্য অতি মহৎ ;—শাস্ত্র ইহার উপরও আবার বলিতেছেন,—স্ত্রীজাতি "পুরুষের নিকট বিশেষ সম্মানার্হা এবং দেবতার ন্যায় পূজনীয়া।" জ্ঞানের জলন্ত-ভাস্কর—তন্ত্রশাস্ত্র, আরও উচ্চ-সোপানে উঠিয়া, আরও শতগুণ পবিত্রতা প্রচার করিতেছেন,—নারীজাতি শক্তি-স্বরূপিণী ;—এ শক্তি, সেই আদ্যাশক্তি—মহাশক্তি,—চিন্ময়ী, জগন্মাতা জগদম্বার অংশ! এই নারী-মূর্ত্তিতেই ব্রহ্মময়ী-মূর্ত্তির প্রকাশ হয়। কবি-কল্পনাও স্তম্ভিত হইয়া যায়!—ইহা অপেক্ষা উচ্চাদর্শ পৃথিবীর আর কোন শাস্ত্রে, কোথাও আছে কি?

সুতরাং এক্ষণে বিশিষ্টরূপে প্রতিপন্ন হইল যে, স্ত্রীজাতিকে হিন্দু, অতি ভক্তির চক্ষেই দেখেন। সাধারণ স্ত্রীলোক সম্বন্ধেই যখন এই বিধি হইল, তখন যিনি মাতা, গর্ভধারিণী, করুণা ও স্নেহের মূর্ত্তিমতী প্রতিমা, তাঁহার প্রতি সন্তানের কতদূর ভক্তি করা কর্ত্তব্য ও কতদূর ভক্তি হইতে পারে, তাহা কেবলই অনুভবনীয়,—বুঝাইবার নহে। মাতৃচরণে হৃদয়ের যথাসর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিয়াও, পুত্র তখন মনে করে, "আরও কেন কিছু রহিল না!" না,—তবুও বুঝি পরিষ্কার করিয়া বলা হইল না!—এই যে প্রাণঘাতিনী পিপাসা, ইহারই নাম—নাম কি ঠিক জানি না—তোমরা ইহাকে ভক্তি বলিতে হয় বল।"

এই ভক্তির মধ্যে প্রীতি ও শান্তি নিহিত। ভক্তের হৃদয় প্রীতি ও শান্তিপূর্ণ। প্রয়াগে গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী—তিন মিলিয়া, এক মহাতীর্থ হইয়াছে। ভক্ত, আপনার হৃদয় মধ্যেই, সেই মহাতীর্থ রচনা করেন। তাহার অনিবার্য্য ও চরমফল—মুক্তি।

মাতৃমাহাত্ম্য প্রদর্শন করিয়া স্বয়ং কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কহিতেছেন,—"মাতা ও পিতাই পরম গুরু জানিবে। * * * গর্ভে ধারণ ও পোষণ করা হেতু মাতা, পিতা অপেক্ষাও অধিক গরীয়সী। অতএব মাতৃতুল্য গুরু, ত্রিভুবনে আর কেহই বিদ্যমান নাই। যেরূপ গঙ্গার সদৃশ তীর্থ নাই, বিষ্ণুর সদৃশ প্রভু নাই, মহেশ্বরের ন্যায় পূজনীয় নাই, সেইরূপ মাতার সমান গুরুও আর কেহ নাই। যেরূপ ত্রিলোক-বিশ্রুত একাদশী ব্রতের ন্যায়, মহৎ ব্রত আর লক্ষিত হয় না, এবং অনশনের তুল্য, যেরূপ আর কোন তপস্যাই নাই, সেইরূপ জগতে মাতার সমান গুরুও আর কেহ নাই। যেরূপ ভার্য্যার সদৃশ মিত্র নাই, পুত্রের ন্যায় প্রিয়বস্তু নাই এবং জ্যেষ্ঠা সহোদরার ন্যায় মান্যা আর কেহ দৃষ্ট হয় না, সেইরূপ মাতার ন্যায় গুরুও আর দ্বিতীয় নাই। যেমন জামাতার সদৃশ পাত্র আর দৃষ্ট হয় না; যেমন কন্যাদানের তুল্য দান আর নাই এবং ভ্রাতার তুল্য বন্ধুও যেরূপ সম্ভবে না, সেইরূপ মাতার ন্যায় গুরুও আর কেহই নাই। দেশের মধ্যে ভাগীরথীর তীরবর্ত্তী দেশ যেরূপ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, পত্রের মধ্যে তুলসী যেরূপ প্রধান এবং বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণ যেরূপ গরীয়ান্, গুরুর মধ্যে মাতাও সেইরূপ গরীয়সী, সন্দেহ নাই। পুরুষ, ভার্য্যাকে আশ্রয় করিয়া, পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে, পূর্ব্বভাবাশ্রয় হইয়া জন্মধারণ করিতে হয়, এইজন্য মাতা পরম-গুরু বলিয়া কীর্ত্তিত। ধর্ম্মবিৎ পুত্র মাতা ও পিতাকে দর্শন করিলে, অগ্রে মাতার চরণে প্রণাম করিয়া, তদনন্তর পিতৃপদে নমস্কার করিবে। * * * সুদারুণ দুঃখে অভিভূত হইয়াও পরমেশ্বরী মাতাকে দর্শন করিলে, যাহার হৃদয়ে আনন্দ বর্দ্ধন হয়, তাহার আর কোন্ বস্তু লাভের আকাঙ্ক্ষা থাকে?" *

উদ্ধৃত অংশের অক্ষরে অক্ষরে, জীবন্ত সত্য

* বৃহদ্ধর্ম্ম-পুরাণ ;—পণ্ডিত গঙ্গাচরণ ন্যায়রত্নের অনুবাদ।

প্রকটিত। এমন অমৃতময়ী দেব-বাণী, হিন্দুর শাস্ত্র ভিন্ন, আর কোথায় শুনিতে পাইব? "পুরুষ, ভার্য্যাকে আশ্রয় করিয়া, পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে, পূর্ব্বভাবাশ্রয় হইয়া, জন্মধারণ করিতে হয়, এইজন্য মাতা, পরম-গুরু বলিয়া কীর্ত্তিত।" ইহাপেক্ষা, মাতৃমাহাত্ম্যের আর কি উচ্চাঙ্গের কথা থাকিতে পারে? এইজন্য দেবাদিদেব মহাদেব, আদ্যাশক্তি ভগবতীকে দুই ভাবে দর্শন করেন। জগন্মাতা জগদম্বা, এক হিসাবে শিব-জননীও বটেন; অন্য পক্ষে শিবা, শিব-সীমন্তিনীও বটেন। সৃষ্টি-রহস্যের সেই মহাপ্রলয়ের কথা স্মরণ কর;—কারণ-সলিলে ভাসমান সেই মায়াময় গলিত শবদেহের কথা মনে পড়ে কি? ব্রহ্মা, বিষ্ণু—সে মহারহস্য ভেদ করিতে পারিলেন না,—শ্মশানচারী, সদাশিব সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন;—যুগ-যুগ কঠোর তপস্যা করিয়া, বিশ্বজননী বিশ্বেশ্বরীকে পত্নীরূপে প্রাপ্ত হইলেন। শিব-চরিত্র জগতের আদর্শ। শিবানী-চরিত্র গভীর রহস্যময়। কেবল দেবাদিদেবই সে অলৌকিক রহস্য ভেদ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। হর-গৌরী পুরুষ-প্রকৃতিও বটেন, আবার উভয়ের মধ্যে মাতা-পুত্র-সম্বন্ধও বটে। সতীর দক্ষালয় যাইবার সে উদাম-দৃশ্য মনে পড়ে কি? সামান্য রমণী-জ্ঞানে না শঙ্কর সতীকে উপেক্ষা করিয়াছিলেন? কিন্তু তার পর?—তার পর শঙ্করীর সেই কালচক্র—যুগ-চতুষ্টয়ের ভাবী-মূর্ত্তি, কল্পনা কর দেখি! অপরূপ "দশমহাবিদ্য" রূপে দেখা দিয়া, বিশ্বপ্রসবিনী, নির্ভীক মৃত্যুঞ্জয়কেও ভীত, চকিত ও স্তম্ভিত করিয়াছিলেন! শিবের পূর্ব্বস্মৃতি মনে পড়িল,—অমনি "মা—মা" রবে, তিনি, সতীর শরণাপন্ন হইলেন। সমুদ্র-মন্থনকালে, নীলকণ্ঠের সেই প্রাণ-মাতুয়ারা "দুর্গা"-নাম ও "মা"-নাম ভক্ত-পুত্রের বিশিষ্ট ভক্তির পরিচায়ক।

মাতৃ-ভক্তি অতি স্বাভাবিক। এ ভক্তি কাহাকেও শিখাইতে হয় না। ভক্ত, মাতৃ-স্তন-পানের সহিত ভক্তির আস্বাদ পান। আমরা যে এখন এত বড় হইয়াছি, জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা শিখিতেছি, গ্রন্থ ছাপাইতেছি, দশের একজন হইতে চেষ্টা করিতেছি,—আর আজ এই "শাদার পিঠে কালী" দিয়া, মুন্সী-আনা দেখাইতে বসিয়াছি,—ভাল হউক, মন্দ হউক,—এ শক্তিটুকু পাইলাম কোথায়? সকলই সেই মাতৃপ্রসাদাৎ। জননী-জঠর হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া, সেই অসহায় অবস্থায়, কাহার কৃপায়, কাহার করুণায়, আজ এত বড়টী হইয়াছি? সংসার যখন সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত, জগৎ যখন আমাদের চক্ষে সম্পূর্ণ অন্ধকার, মল-মূত্র মাখিয়া, রোগ-যন্ত্রণায় কাতর হইয়া, যখন মনোভাব মুখ ফুটিয়া প্রকাশ করিবারও ক্ষমতা ছিল না,—বল দেখি, সেই অসহায়—অজ্ঞানাবস্থা হইতে আজ কাহার অঞ্চল-বাতাসে জীবিত আছি? সেই ঘোর অজ্ঞানান্ধকারের মধ্যে, বল দেখি, ক্রমে কে আলোক দেখাইল? অন্তরের অন্তস্তলে প্রবেশ করিয়া কে বলিল,—"ভয় নাই বাছা, আমি তোর আছি!" সেই মা, সেই আমার জগদ্ধাত্রী, সেই আমার চিন্ময়-দেবতা,—আমি অন্ধ—আজ আমার চক্ষু ফুটিয়াছে,—দেখিলাম, আমার সম্মুখে স্ব-প্রকাশ! আমার জীবনদায়িনী, আমার সুখ-দুঃখে সমভাগিনী, আমার গুরুর গুরু—মহাগুরু, আমার হৃদয়-মন্দিরের মূর্ত্তিমতী প্রতিমা, আজ আমার চক্ষের সম্মুখে,—অগ্রে মাতৃ-চরণে ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি না দিয়া, আর কাহার চরণে দিব? পিতা?—পিতা ত পরে চিনিলাম;—জননী বুঝাইলেন, তবে ত পিতা চিনিতাম! যখন সুকোমল শয্যা ও আগুন পৃথক্ চিনিতাম না,—আগুন দেখিলে ঝাঁপাইয়া পড়িতে যাইতাম;—যখন বিষধরে ও খেলানায় ভেদজ্ঞান ছিল

না,—সর্প দেখিলে ধরিতে যাইতাম ;—তখন—সেই ভেদজ্ঞানের অতীতকালে, আত্মপ্রাণ তুচ্ছ করিয়াও প্রতিপদে, প্রতিমুহূর্ত্তে, কে আমার জীবন রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন ?—জননীই আমাকে প্রথম শিক্ষা দিলেন, এই বস্তুটীর নাম এই, ও-বস্তুটী ইহা নহে—উহা আর একটী। শৈশবে জননীই প্রথম আমায় দেখাইলেন, এটি বিছানা—আরামস্থল, আর ওটি বিছানা নহে—আগুন,—উহা স্পর্শ করিলেই হাত পুড়িয়া যায়। জননীর কৃপায় প্রথম শিক্ষা পাইলাম, কে পিতা, কে মাতা, কে ভ্রাতা, কে গুরু। মাতাই আমাকে প্রথম বুঝাইলেন,—এটি কি, ওটি কি ; এর গুণ কি, ওর গুণ কি। অতএব মাতাই আদিগুরু ও মহাগুরু। বুঝি এইজন্যই কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বলিতেছেন,—"ধর্ম্মবিৎ পুত্র, মাতা ও পিতাকে দর্শন করিলে, অগ্রে মাতার চরণে প্রণাম করিয়া, তদনন্তর পিতৃপদে নমস্কার করিবে।" অতএব মাতৃ-ভক্তি যে অতি স্বাভাবিক এবং সুসন্তান মাত্রেরই যে মাতৃভক্ত হইতে হইবে, সে পক্ষে আর কথাটি নাই। মাতৃ-ভক্তিতে পুণ্য আছে কিনা, সে কথা এখন বলিব না,—কিন্তু তদভাবে যে ঘোর অধর্ম্ম ও মহাপাপ সংঘটিত হয়, ইহাতে আর বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।

হিন্দুর দেশ ভিন্ন প্রত্যক্ষ দেবতাভাবে মাতৃ-পূজা আর কোন দেশে নাই। কারণ, প্রকৃত ভক্তি কি, তাহা হিন্দুই বুঝেন ; আর কর্ম্মক্ষেত্র এই ভারতভূমি আবহমান কাল হইতে, এই ভক্তির আস্বাদ পাইয়া আসিতেছেন। ইহ-কাল সর্ব্বস্ব, পরকালে-অবিশ্বাসী—পৃথিবীর অন্যান্য-জাতি ভোগ-লিপ্সা চরিতার্থ করিতে করিতে, কতটুকুই বা ভক্তির আস্বাদ পায় ?—আর তাহার সে আস্বাদ পাইবার অবসরই বা কোথায় ? কেহ কেহ জন্মান্তরবাদ গ্রহণ করিলেও, পূর্ণমাত্রায় ভক্তি উপভোগ করিতে পারে না, জানেও না। কারণ, "পরের মঙ্গল-মন্দিরে প্রাণের প্রাণ বলি দিতে" না পারিলে,—প্রকৃষ্ট পরিমাণে আত্মত্যাগ করিতে সমর্থ না হইলে, মনুষ্যত্বই লাভ হয় না,—ভক্তি ত দূরের কথা। কিন্তু হিন্দু ভিন্ন অন্য জাতি এরূপ আত্মত্যাগ করিতে পারে না,—সুতরাং হিন্দু ভিন্ন সম্পূর্ণরূপে মনুষ্যত্বের অধিকারীও আর কেহ হইতে পারে না। এই মনুষ্যত্ব লাভের সহিত ভক্তিও লাভ হয়। কারণ, হিন্দু জানেন, জীবনও অনন্ত, কালও অনন্ত ; কোন-না-কোন জীবনে, কিংবা কোননা-কোন কালে, তাঁহার ইষ্টসিদ্ধি হইবেই হইবে। সুতরাং হিন্দু ভিন্ন প্রকৃত মনুষ্যত্ব অর্জ্জন করিতে ও পরা ভক্তির অধিকারী হইতে আর কেহ সক্ষম নন। এবং হিন্দু ভিন্ন, প্রত্যক্ষ দেবতা-ভাবে মাতৃপূজাও, আর কাহারও ভাগ্যে ঘটে না। দুর্ভাগ্য দেশের এবং ততোধিক আমা-দেরও বটে যে, আজ এই মাতৃভক্তির মাহাত্ম্য আমাদেরই দেশে বুঝাইতে হইতেছে।

মাতৃভক্তির এই আদর্শ লইয়াই বোধ করি, বঙ্কিম বাবুর "আনন্দ-মঠ"এর সৃষ্টি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মাতা অর্থে, হিন্দু, অনেককেই বুঝেন ;—জন্মভূমি বা স্বদেশও হিন্দুর মাতা। স্বদেশভক্ত বঙ্কিমচন্দ্র তাই, আনন্দ-মঠে শিক্ষা দিতেছেন,—"দেশের জন্য তুমি কি দিতে পার ?—তোমার পণ কি ?" "পণ আমার জীবন-সর্ব্বস্ব।" "জীবন তুচ্ছ ; সকলেই ত্যাগ করিতে পারে।" "আর কি আছে ?—আর কি দিব ?" উত্তর হইল,—"ভক্তি !" কবি দেখাইলেন, ভক্তির তুলনায় জীবনদানও তুচ্ছ। যেখানে ভক্তি, সেখানে আত্মত্যাগ, সেখানে অহংজ্ঞান-বিসর্জ্জন, সেখানে জীবন উৎসর্গ !—না, ইহা-তেও হইল না,—যাহাকে ভক্তি করিতে হইবে, তাহার জন্য আত্ম-বলিদান,—ইহাও অতি সামান্য কথা,—আপনাকে বা আপনার-বলিতে-

যাহা-কিছু আছে—সেই সমস্ত অস্তিত্বকে, সেই মহান্ ভক্তি-ভাজনের চরণে উৎসর্গ করা চাই ;—তবেই তুমি যথার্থ ভক্ত হইলে। ভক্তি-বাদের ইহা অপেক্ষা উচ্চ নিদর্শন আর কি আছে ?

ইহাতেই বুঝা গেল, ভক্তি নিষ্ক্রিয় নহে,—ভক্তির কার্য্য অনন্ত। নানাকার্য্যে ভক্তি বিক-শিত হয়। মনে মনে ভালবাসিয়া বা ভক্তি করিয়া, কিংবা কেবলই হৃদয়ের ভাব লইয়া, ভক্তের প্রাণ স্থির থাকিতে পারে না। হৃদয়ে এই ভক্তি বা প্রেম লুকাইয়া থাকিতে পারে না বলিয়াই, ভক্ত, পুষ্প-চন্দনে আরাধ্য-দেবতার পূজা করিয়া থাকেন। প্রত্যক্ষ-দেবতাভাবে পূজা না করিলে, ভক্তের প্রাণ স্থির থাকিতে পারে না। আরাধ্য-দেবতার বিরাট-ধ্যানে, আপন অস্তিত্ব মিশাইতে না পারিলে, ভক্তের চিত্ত সুস্থির হয় না। জীবনের সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিয়াও ভক্ত কাঁদিতে থাকেন,—"আরও কেন কিছু রহিল না !" হৃদয়ের এই দারুণ পিপাসা নানাকার্য্যে প্রকাশিত হইয়া থাকে। অবশ্য, মানুষকে অনেক সময় হৃদয়ের অনেক ভাব লুকাইয়া বা চাপিয়া রাখিয়া, কাজ করিতে হয় ; কিন্তু ভক্তির কার্য্য তাহাতে হয় না, সে ভক্তি দু'দণ্ডের মধ্যে উপিয়া যায়,—তাহার প্রতিষ্ঠার স্থান হৃদয়ে নাই। ভক্তির এই কার্য্য হইতেই পূজার বিধি।

ভক্তের নিকট মাতৃপূজা অতি স্বাভাবিক। কারণ, ঈশ্বরকে শরীরিবেশে, আমরা প্রত্যক্ষ করিতে পারি না,—অন্ততঃ, এ অধম লেখকের সে সৌভাগ্য নাই, কিন্তু আমার ন্যায় হতভাগ্য জনের কি তবে পরিত্রাণ নাই ? সকলই কি ভস্মে ঘৃত নিক্ষেপ করিতেছি ?—না, আমার ইষ্টদেবতা আমার সম্মুখে স্ব-প্রকাশ। সাকার দেবতা, মূর্ত্তিমতী প্রতিমা আর কোথায় ?—আমার গৃহেই আমার মূর্ত্তিমতী দেবী-প্রতিমা—আমার জননী।—আমি অন্ধ,—মুক্তিলাভার্থ কোথায় ঘুরিয়া মরিতেছি !

মা-আমার পুণ্যের অতীত। এই পুণ্যের অতীত অবস্থা কি ?—আমার পাপের অতীত অবস্থা কি, আমি বুঝিতে পারি ; কিন্তু পুণ্যের অতীত অবস্থা কি ? যখন পুণ্যে পুণ্য বোধ হয় না, সেই অবস্থাই বুঝি পুণ্যের অতীত। সে কিরূপ ?—একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝা যাউক।

পুত্রের ভীষণ বিসূচিকা, জীবনের আশা অতি অল্প। শয্যায় মল-মূত্র ত্যাগ করিতেছে, উত্থান-শক্তি রহিত। অন্য কেহ স্পর্শ করিতেও সাহস করিতেছে না,—পাছে তদ্দ্বারা তাহাকেও আক্রান্ত হইতে হয়। এই অবস্থায়, মাতা অবিচলিত-চিত্তে, পুত্রের শয্যাপার্শ্বে বসিয়া আছেন ; নানাপ্রকারে তাহার শুশ্রূষা করিতে-ছেন ! আপনি স্বয়ং দুই হাতে করিয়া সেই মল-মূত্র পরিষ্কার করিতেছেন। মাতা কি ভাবিতেছেন, "বড় পুণ্য করিতেছি !" মাতা কি কখন ভ্রমক্রমে ভাবিয়া থাকেন,—"সন্তান হইলেও এ অতি বিপন্ন ; বিপন্নের সহায় হইলে পুণ্যসঞ্চয় হয়—সুতরাং আমারও পুণ্যসঞ্চয় হইতেছে !" এই অতি-পুণ্যের কার্য্যেও, এক লহমার জন্য, মাতার মনে হয় না যে, তিনি পুণ্য করিতেছেন। এই সন্তান অতি দুর্ব্বৃত্ত হইলেও, মাতা কখন এমনও ভাবেন না যে, এই বিপদ-কালে তিনি তাহার জন্য খাটিতেছেন। পুণ্যের কথা তাঁহার মনেই আসে না। এই খানেই পুণ্যে পুণ্যজ্ঞান থাকে না। এই অবস্থাই পুণ্যের অতীত অবস্থা। মাতার হৃদয় ছাড়িয়া, এ অবস্থা আর বড় দেখা যায় না। 'আর বড় কি !' এ সংসার খুঁজিয়াও ত দেখিতে পাই না ! বলিবে—সহধর্ম্মিণী ? না,—অনেক গুণে তিনি আদর্শস্থানীয়া হইলেও এখানে তাঁহাকে পরাস্ত হইতে হয়। এ যে প্রকৃতি-দত্ত আঁতের টান ! বত্রিশ বন্ধনের এ মানব-দেহ ধরিয়া, এক মা

ছাড়া, পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় জন কে আছে, যিনি এ আদর্শে উপনীত হইতে পারেন? তাই বলিতেছিলাম, মাতার হৃদয় ছাড়িয়া, এ অবস্থা আর দেখিতে পাই না। ভাবিলে মানুষকে অবাক্ হইতে হয়। স্বর্গ যদি থাকে, তবে তাহা এইখানে। মানুষের যে স্বর্গজ্ঞান, তাহা এই হৃদয় দেখিয়া। কোন অজ্ঞাত বা অদৃষ্ট বস্তুর কল্পনা যে আমরা করি, অগ্রে আমাদের জ্ঞানের সীমার মধ্যে, তাহার ছায়াও দেখিয়া লই। এই জীবন্ত সাকার দেবতা—মা-আনন্দময়ী প্রতিমা আমার গৃহে,—ভক্তি থাকিলে, মুক্তি ত আমার করতলগত।

এই কথা মনে রাখিয়া বিচার করিলে দেখি, মাতৃভক্তি অতি স্বাভাবিক, এবং এই ভক্তি হইতেই মাতৃপূজা বিহিত হয়।

আমাদের একটা চলিত কথা আছে,—"মায়ের চেয়ে যে ভালবাসে, তারে বলে ডাইন!" কথাটা গভীর অর্থে পূর্ণ। যতবার যত রকমে কথাটা ভাবিয়া দেখিয়াছি, ততবারই মনে মনে হার মানিয়াছি। কথাটা খুব খাঁটী বটে। অবশ্য হিন্দুর স্ত্রী—দেবী স্বরূপা;—স্বামীকে কিরূপ ভক্তি করিতে ও ভালবাসিতে হয়, তাহা তিনি জানেন,—একথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি। কিন্তু ইহাও স্বীকার করি যে, একজন 'পর'কে আপনার করিয়া লইতে হয়; আর প্রকৃতি-দত্তা আপন-অপেক্ষাও-আপনার যে মাতা, সে সম্বন্ধ হাড়ে হাড়ে—রক্তে রক্তে—মজ্জায় মজ্জায় নিহিত। এ ভালবাসার কথা একজনকে শিখাইয়া দিতে হয় না, কর্ত্তব্য-বোধে কাহাকে বলিয়া দিতেও হয় না,—এবং এ ভালবাসা কাহারও দেখিয়া শেখা নহে।

এই সেদিনের কথা,—শ্রীক্ষেত্রের-ফেরত সাগর-যাত্রীদের কথা, বোধ করি, সকলেরই স্মরণ আছে। মনে পড়ে কি?—গভীর জলে হাবু-ডুবু খাইয়া, সকলেই আত্মপ্রাণ রক্ষার্থ পরস্পর জড়াজড়ি করিয়া মরিয়াছিল! কিন্তু সে অপরূপ করুণ-দৃশ্যের কথা মনে হয় কি!—সন্তান ডুবিয়াছে, মাতাও ডুবিয়াছেন,—কিন্তু মায়ের বুকের ভিতর ঐ সাগর-ছেঁচা ধন, ঐ অমূল্য রতন, ঐ প্রাণের প্রাণ—মহাপ্রাণ বস্তুটি কি, বল দেখি? মাও ডুবিয়াছেন, ছেলেও ডুবিয়াছে,—কিন্তু মরিতে বসিয়াও মহাদেবী পুত্রস্নেহে আত্মহারা!—দুই হাতে দৃঢ় বাহু-পাশে, সন্তানকে আগুলিয়া আছেন! বুঝি তখনও মায়ের মনে হইয়াছিল, নিজে মরিয়াও যদি বাছাকে রাখিয়া যাইতে পারি! এমন মায়ের প্রতি ভক্তি, কি বুঝাইবার বস্তু? না বলিবার কথা?—স্বর্গ আর কোথায়?—স্বর্গ এই মাতৃহৃদয়ে! এমন সবটা মনঃ-প্রাণ দিয়া ভালবাসিতে আর কে পারে? এ ত কর্ত্তব্যের দায় নহে,—এ যে আঁতের টান!

সংসারে, যাঁহারা যথার্থ বড়লোক, তাঁহারা সকলেই মাতৃভক্ত, অথবা মাতৃভক্ত বলিয়াই তাঁহারা বড়লোক। মাতাকে বা পিতাকে যে না ভক্তি করে,—তাহার সহস্র বিদ্যা-বুদ্ধি-খ্যাতি-মান থাকুক,—ধর্ম্মরাজ্যে সে, নগণ্য কীটানুকীট মাত্র। যাহার পিতৃভক্তি বা মাতৃভক্তি নাই, ঈশ্বরে ভক্তি বা মনুষ্যে প্রীতিও সে করিতে পারে না। যিনি যথার্থ বড়লোক, তিনি পিতৃ-মাতৃ-ভক্ত, সুতরাং ধার্ম্মিক। অগ্রে মাতা-পিতাকে ভক্তি করিতে না শিখিলে, কিছুতেই ধর্ম্মপথে অগ্রসর হওয়া যায় না।

যে কোন ভাল কার্য্য প্রথম গৃহেই আরম্ভ করিতে হয়। এই আরম্ভের পরিণতি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড পরিব্যাপ্ত। গৃহ ছাড়িয়া যখন বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড বুকের মধ্যে রাখিব মনে করিয়াছি,—দেখিয়াছি, ভিত্তিস্থান পাকা হয় নাই। মাতা-পিতাকে কেন্দ্রীভূত করিয়া, হৃদয়ে অপরাজিতা ভক্তি লইয়া, চলিতে হইবে;—তবেই সে পরম দেবতার সিংহাসন মস্তক-স্পর্শ করিতে পারে।

মাতা-পিতাকে মূর্ত্তিমান্ দেবতাজ্ঞানে ভক্তি-পূজা করিতে করিতেই পরম দেবতা ভগবানের প্রতি প্রাণ টানিতে থাকে। যিনি অধিক ভাগ্যবন্ত ও ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ, তাঁহাকে আর স্বতন্ত্র ভগবান্‌কেও খুঁজিতে হয় না,—একমাত্র মাতৃ-চরণে, হৃদয়-পারিজাত উৎসর্গ করিলেই, তাঁহার মুক্তি হয়। এরূপ সুসন্তান, ইহ সংসারে অতি বিরল। এরূপ জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ লীলা-ছলে কালে-ভদ্রে ধরাধামে অবতীর্ণ হন। সর্ব্বান্তঃকরণে ও প্রাণান্তপণে, মাতা-পিতাকে শাস্ত্রবিহিত সেবা করিলে, চতুর্ব্বর্গ ফল লাভ হয়; মুক্তিও সেই মহাত্মার আয়ত্তাধীন। মাতা-পিতার চরণ-পূজা ভিন্ন, তাঁহার আর অন্য যোগ নাই, তপস্যা নাই, ধ্যান-ধারণাও নাই;—অন্য দেবতা তিনি জানেনই না।

মহাভারতের সেই ধর্ম্ম-ব্যাধের কথা স্মরণ কর!—তেমন পিতৃ-মাতৃ-ভক্ত সুসন্তান সকলেরই আদর্শ নয় কি?

পাণ্ডবের মাতৃভক্তিও পৃথিবীর আদর্শ। হিন্দু-সন্তান মাত্রেই মহাভারতের অমৃতময় কথা, কিছু-না-কিছু জানেন; সুতরাং পাণ্ডব-গণের মাতৃভক্তির বিস্তারিত পরিচয় দিতে গেলে পুঁথি বাড়িয়া যায়। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডব-পক্ষে কর্ণধারস্বরূপ থাকায় যে, তাঁহারা অনন্ত বিপদ-সমুদ্র হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি?—কিন্তু—কিন্তু মাতৃ-ভক্তির যদি কোন মাহাত্ম্য থাকে, তবে এ কথা সকলকেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে,—"হাঁ, পাণ্ডব, হরিপদে মনঃ-প্রাণ সমর্পণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু যদি কুন্তীর মত মাতা না থাকিতেন এবং সেই মাতৃ-পদে যদি তাঁহাদের ঐকান্তিক ভক্তি না থাকিত, তবে বুঝি, পাণ্ডবেরও ধর্ম্ম-জীবন অসম্পূর্ণ রহিয়া যাইত!"

বস্তুতঃ, মাতৃভক্তিও পঞ্চপাণ্ডবের অন্যতম সহায় বা ব্রহ্মাস্ত্র-বিশেষ। এই মাতৃভক্তিরূপ ব্রহ্মাস্ত্রপ্রভাবে, জীবনের শত-সহস্র বিপদেও তাঁহারা অচল—অটলভাবে দাঁড়াইয়াছিলেন; এবং যথাসময়ে একে একে সেই সকল বিষম বিঘ্নবাধায় ও সমস্যাপূর্ণ মহা পরীক্ষায়ও জয়যুক্ত হইয়াছিলেন। যখন অধর্ম্ম-পরায়ণ কৌরব-কর্ত্তৃক, ধর্ম্মপ্রিয় পঞ্চপাণ্ডব স-মাতা বারণাবতে নির্ব্বাসিত হইলেন, তখন এক মা ভিন্ন, তাঁহারা আর কাহাকে জানিতেন? পথশ্রমে ক্লান্ত হইলে বৃকোদর সেই ছোট ভাই ক'টিকে ও জননীকে স্কন্ধে করিয়া, লোকের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা মাগিয়া বেড়াইতেন! তেজস্বিনী, আর্য্যরমণী, কুন্তীর ন্যায় মাতা পাইয়াছিলেন এবং সেই মাতৃপদে অচলা ভক্তি ছিল বলিয়াই বুঝি, জতুগৃহদাহ প্রভৃতি বিপদে, পাণ্ডব পরিত্রাণ পান। তখন এক মাতা ভিন্ন তাঁহারা আর সংসারের কিছুই জানিতেন না। মাতৃপদ-ধ্যান ও মাতৃ-পূজায়, পাণ্ডব, জীবন অতিবাহিত করিতেন। তার পর সেই একচক্রানগরীতে ব্রাহ্মণের বাটীতে পাণ্ডবের অবস্থানের কথা মনে কর! বকাসুরের দারুণ-দৌরাত্ম্যে ও সেই ভীষণ নিয়ম রক্ষার জন্য, সেই ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ পত্নীর পাষাণভেদী করুণ-বিলাপের কথা ভাবিয়া দেখ! সে সময় কুন্তীর সেই অলৌকিক মহত্ত্বের কথা মনে পড়ে কি?—নিজ পুত্রের প্রাণ দিয়াও ব্রাহ্মণ-পুত্রের জীবন রক্ষা করিবেন, প্রতিজ্ঞা করিলেন। মাতৃভক্ত সন্তানও অবনতমস্তকে, মাতৃ-আজ্ঞা শ্রবণ করিলেন। মাতৃমাহাত্ম্যে অবশেষে মহাবাহু ভীমসেন, বকাসুরেরই প্রাণসংহার করিলেন। এখানে আর্য্য-রমণীর মহত্ত্বে, ধর্ম্মপুত্রকেও শিক্ষালাভ করিতে হইয়াছিল। সুমাতা কুন্তীর উপদেশে যুধিষ্ঠির বুঝিলেন যে, মায়ের কথাই সার বটে। আশ্রয়দাতার উপকারার্থ অবস্থা-বিশেষে, নিজ পুত্রের প্রাণ দেওয়াও সঙ্গত। মাতৃভক্ত ভীমসেনের অদ্ভুত মাতৃভক্তি-বলে বকাসুর

হত হইল, একচক্রাবাসিবর্গের দারুণ উৎকণ্ঠাও দূর হইল। মহাকবি কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন সুমাতা ও সুসন্তানের অপূর্ব্ব অভিনয় দেখাইয়া জগৎকে স্তম্ভিত করিলেন।

তারপর, পাণ্ডবের সেই দ্রৌপদী-লাভের কথা মনে কর দেখি! উপন্যাস বল, কবি-কল্পনা বল, গল্প বল,—পঞ্চম বেদকে যাহা ইচ্ছা সম্ভাষণ কর,—কিন্তু এ অপরূপ-চিত্র, পৃথিবীর আর কোন্ কবি,—কোন্ ইতিবৃত্ত-লেখক কাব্যে বা ইতিহাসে অঙ্কিত করিয়াছেন? দ্রুপদ-নন্দিনী দ্রৌপদীকে লাভ করিয়া পাণ্ডব, মাতৃসকাশে উপনীত হইলেন; মাতা অনুমতি করিলেন, জয়যুক্ত বস্তুকে তোমরা পাঁচ-ভাই সমান অংশ করিয়া লও। মাতা আজ্ঞা করিয়াছেন,—শাস্ত্র, নীতি, সমাজ, লোকাচার,—অতলজলে নিমজ্জিত হউক,—সে মাতৃ-আজ্ঞা পালন করিতেই হইবে। সুতরাং কৃষ্ণা পঞ্চ-পাণ্ডবেরই মহিষী হইলেন।* মায়ের একটা কথা-রক্ষার জন্য, যে দেশের লোক, আর কোন দিকে ভ্রূক্ষেপও না করিয়া, এক রমণীকে পাঁচ ভাইয়ে বিবাহ করিতে পারে, সে দেশের মাতৃ-ভক্তির পরিচয় আর কি দিব? পাণ্ডবের মাতৃ-ভক্তি জগতের আদর্শ!

কুন্তী ও গান্ধারীর সেই শিব-পূজার কথা মনে পড়ে কি? একশত আটটী সুবর্ণ-বিল্বপত্রে যে দেবাদিদেবকে পূজা করিতে পারিবে, আশুতোষ তাহারই প্রতি প্রসন্ন হইবেন। কাজেই গান্ধারী পুত্রগণকে বলিয়া, অবিলম্বেই নির্দ্দিষ্ট-পরিমাণ সুবর্ণ-বিল্বপত্র সংগ্রহ করিলেন।—গর্ব্বে তিনি ফুলিয়া উঠিলেন। দুঃখিনী কুন্তী মনের দুঃখে কাঁদিতে লাগিলেন। পুত্রগণ একে একে সকলেই কারণ জিজ্ঞাসা করিলে কুন্তী অর্জ্জুনকে মনোদুঃখের কারণ জ্ঞাপন করেন। (সুমাতা অন্তর্য্যামিনী-সদৃশী,—কোন্ পুত্র দ্বারা কি কাজ সাধিত হইবে, তাহা তিনি পূর্ব্বেই বুঝিতে পারেন; তাই কুন্তী কেবলমাত্র অর্জ্জুনকে মনোভাব প্রকাশ করেন।) অর্জ্জুন ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "মা! এজন্য আর চিন্তা কি?—তোমার অভীষ্ট নিশ্চয়ই সিদ্ধ হইবে জানিও।" যথাসময়ে ধনুর্দ্ধারী তৃতীয় পাণ্ডব, শিব-মন্দিরে উপনীত হইয়া, তথা হইতে অব্যর্থ লক্ষ্যে, কুবের-ভাণ্ডারে বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, অল্পক্ষণ মধ্যে মণি-কাঞ্চনে মন্দির ভরিয়া গেল, সুবর্ণ-বিল্বপত্রে শিব-লিঙ্গ ঢাকিয়া পড়িল। দর্পহারী, গান্ধারীর সকল দর্প চূর্ণ করিলেন। কুবের-ভাণ্ডার হইতে ধন জয় করিয়া, মহারথী অর্জ্জুন 'ধনঞ্জয়' নাম প্রাপ্ত হইলেন। আশাতীত মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল দেখিয়া কুন্তীর আর আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। কবি, সংসারে মাতৃ-ভক্তিরই জয় দেখাইলেন।

সন্তানের প্রতি মাতৃস্নেহের প্রভাবও বড় কথা নহে।—দুর্য্যোধনের অঙ্গে গান্ধারীর সেই পদ্মহস্ত-সঞ্চালনের কথা স্মরণ কর!—এক উরু-দেশ ভিন্ন, দুর্য্যোধনের আর সর্ব্বাঙ্গ পাষাণময় হইয়াছিল। অধর্ম্মের উপর ধর্ম্মের অভিসম্পাত ফলিবে নাকি,—তাই হতভাগ্য পুত্র, চক্রীর চক্রে পড়িয়া, কৌপীন পরিধান পূর্ব্বক, মাতা গান্ধারীর সহিত সাক্ষাৎ করিল। গান্ধারী পুত্রকে বিজয়ী করিবার মানসে, পদ্মহস্ত-সঞ্চালনে, দুর্য্যোধনের অনাবৃত সর্ব্বাঙ্গ পাষাণবৎ করিলেন,—কেবল চক্রীর চক্রে, আবৃত স্থানটুকু স্বাভাবিক মাংসপিণ্ডে পরিণত হইয়া রহিল।—মহাকবি দেখাইলেন যে, পুত্রের প্রতি

* যদিও ইহা শাস্ত্রবিরুদ্ধ নয়, তথাপি কূট-তর্কের খাতিরে এরূপ লিখিত হইল। কৃষ্ণার পঞ্চস্বামী হওয়ার হেতুবাদ মহাভারতে সবিস্তারে বর্ণিত আছে। এটা বর কি অভিশাপ, তাহা যাঁহারা নিবিষ্টচিত্তে ভারত পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সে সকল রহস্যই প্রকাশ করিয়াছিলেন। এখানে তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

মায়ের আশীর্ব্বাদ ব্যর্থ হইবার নহে,—আর মাতৃ-স্নেহও বড় একটা সাধারণ জিনিস নয়!

একটা চলিত প্রবাদ আছে যে, মুমূর্ষু-পুত্র মাতৃক্রোড়ে থাকিলে, মহাকাল তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। কথাটার আর কোন মূল্য না থাক্,—ইহাতে এইটুকু বুঝা যায়, মাতার স্নেহাশীর্ব্বাদে, সন্তান ইহ-সংসারে অমরের ন্যায় বিচরণ করিতে পারে। ভালবাসা এমনই বস্তু বটে! তাই কবি আদর্শটাকে আর একটু উঁচাইয়া, আদর্শ-সতী সাবিত্রীর ক্রোড়ে সত্যবানের মৃত-দেহ রাখিয়া, মহাকালকে তাহা স্পর্শ করিতে না দিয়া জগৎকে শিক্ষা দিলেন, ভালবাসাই স্বর্গ এবং স্বর্গের নামই ভালবাসা। যদিও এখানে এ উপমাটী ঠিক খাটে না,—একটী মাতা-পুত্র সম্বন্ধ,—অন্যটী স্বামী-স্ত্রী সম্বন্ধ—তথাপি এ কথা অবশ্যই বলিতে পারি, মূলে ঐ দুই বস্তুই এক।—একটী ভালবাসার প্রভাব, অন্যটী সতীর প্রেমের পরাক্রম।—প্রেমের মধ্যেও যে প্রগাঢ় ভালবাসা নিহিত, তাহা বলাই বাহুল্য। কেবল পাত্র ও অধিকারিভেদে, একই বস্তু দুই মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। এই ভালবাসার মূলে ভক্তি ও প্রীতি বিশিষ্টরূপে নিহিত। এই মূল বস্তুটী নিম্নগামী হইলেই ভালবাসা—ভালবাসা হয়, আর ঊর্দ্ধগামী হইলেই তাহা ভক্তি, প্রীতি ও প্রেম নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

মহাকবি বাল্মীকিও সতী-প্রতিমা সীতা ও লব-কুশের চরিত্রে, এই ভালবাসা ও ভক্তি-চিত্র উজ্জ্বলরূপে অঙ্কিত করিয়াছেন। শ্রীরামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞের সময়, যজ্ঞীয় অশ্বকে বন্ধন করিয়া, দুধের ছেলে লব-কুশ, দুর্জ্জয় রাঘব-সৈন্যকেও পরাভূত করিয়া, শেষে অশেষ শৌর্য্য-বীর্য্য-সম্পন্ন খুল্লতাতত্রয় এবং পিতাকেও যুদ্ধে জয় করিয়াছিল। মাতৃভক্ত পুত্রদ্বয়ের মায়ের পদধূলিই ব্রহ্মাস্ত্র-স্বরূপ এবং মাতৃপদ-চিন্তাই অমোঘ বীর্য্যবলের সহায়। আদর্শ জননীও, পুত্রদ্বয়ের শরীরে অস্ত্রলেখা দেখিয়া, তাহাদের বক্ষে স্বহস্তে "রক্ষা-কবচ" সংরক্ষিত করিয়াছিলেন,—তাই সতী-পুত্রদ্বয়, পিতৃ-সমরেও জয়ী হইতে পারিয়াছিলেন। কবি দেখাইলেন, মাতৃভক্তের প্রভাব কিরূপ অলৌকিক এবং সন্তানের প্রতি মাতার আশীর্ব্বাদও কিরূপ কার্য্যকারী।

সুমাতার আদর্শে, সন্তান আদর্শের চরম-সীমায় উপনীত হইতে পারে। মাতার চরিত্রে সন্তানের চরিত্র গঠিত হয়। মাতার শিক্ষায় সন্তানও সুশিক্ষা লাভ করিয়া থাকে। তাই সংসারে সুমাতার গৌরব-মাহাত্ম্য এত অধিক; তাই সুসন্তান মাতৃভক্তিবলে, অসাধ্যও সাধন করিতে পারে। পৃথিবীর ইতিহাস স্বর্ণাক্ষরে এ কথার সাক্ষ্য দিতেছে। পৃথিবীর যত বড়-লোকের জীবনী আলোচনা করা যায়, দেখিতে পাই, প্রায় সকলেই মাতৃভক্ত, অথবা মাতৃভক্ত বলিয়াই বড়লোক; এবং প্রায় সকল জননীই সুমাতা।

মাতার শিক্ষা সন্তানের কতদূর কার্য্যকরী হইতে পারে, তাহা পাশ্চাত্য-পণ্ডিত স্মাইল্‌স্ সাহেব তৎপ্রণীত "চরিত্র" (Character) নামক গ্রন্থে, "হোম" নামক অধ্যায়ে, বিশিষ্টরূপে আলোচনা করিয়াছেন। সন্তান বাল্যকালে অধিক সময় মাতার নিকট থাকে, সুতরাং মাতার প্রায় সকল কার্য্যেরই অনুকরণ করিয়া থাকে। মাতার নিকট দয়া, দাক্ষিণ্য, ভক্তি, স্নেহ, ভালবাসা—সন্তান এ সমস্তই শিক্ষা করে। সুতরাং জননীরও সুমাতা হওয়া আবশ্যক। ইংরেজীতে "মহৎ লোকের জননী" (Mothers of Great-men) নামক একখানি পুস্তক আছে, তাহাতেও, সুমাতা হইতে হইলে কি কি গুণের প্রয়োজন, তাহা অতি সুন্দররূপে আলোচিত হইয়াছে এবং সন্তান জননীর নিকট কতদূর

শিক্ষালাভ করিতে পারে, তাহাও বিশিষ্টরূপে বর্ণিত হইয়াছে। জনৈক সুবিখ্যাত ইংরেজ জীবনী লেখকও স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন,—"এটা খুব খাঁটী সত্য যে, গুণবান্ পুত্রের জননীও গুণবতী"।* বস্তুতঃ, সকল দেশের সকল লোকেই মাতৃ-মাহাত্ম্যের পোষকতা করিয়া থাকে। স্ত্রী-জাতি দ্বারা রামায়ণ, মহাভারত, শকুন্তলা, ইলিয়াদ, হাম্‌লেট, প্যারাডাইস্ লষ্ট প্রভৃতি লিখিত হয় নাই সত্য; স্ত্রীজাতি জেনাফনের মত দশ সহস্র সৈন্য লইয়া, শত্রুর দেশ হইতে অজানিত পথে, নির্ব্বিবাদে, স্বদেশে আসিতে সমর্থ হন নাই সত্য; কিংবা শত-সহস্র বাধা ও নিরাশার সম্মুখীন হইয়া, মহাবীর নেপোলিয়নের মত আল্‌পস পর্ব্বত উত্তীর্ণ হইতেও পারেন নাই বটে,—কিন্তু এই মাতৃস্বরূপা স্ত্রী-জাতির বা সুমাতার পদতলে বসিয়া, একদিন বাল্মীকি, ব্যাস, কালিদাস, হোমার, সেক্‌স-পিয়র, মিলটন, জেনাফন, নেপোলিয়ন প্রভৃতি মহারথিগণ শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। ভীষ্ম, ভীমার্জ্জুন, রাম, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, গালবপ্রভৃতি তেজস্বী ও মহা-মনস্বিগণ একদিন এই মাতা বা মাতৃস্থানীয়ার চরণে শরণ লইয়া, জগতে অক্ষয়-কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। এই মাতা বা মাতৃস্বরূপা স্ত্রীজাতির নিকট একদিন ভক্তি-কর্ম্ম-জ্ঞানের আস্বাদ পাইয়া, বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্য, খ্রীষ্ট, মহম্মদ, কুমারিল ভট্ট, ধ্রুব, প্রহ্লাদ, প্রতাপ, আকবর আজি জগতের আদর্শস্থানীয় হইয়া আছেন। পুত্র, জননীর নিকট হইতে সহিষ্ণুতা, সংযম, বাধা ও বিঘ্নের সহিত অবিচলিত-চিত্তে সংগ্রাম, ঈশ্বরে ভক্তি, সর্ব্বজীবে প্রীতি প্রভৃতি শিক্ষালাভ করে। এই মাতার দৃষ্টান্তে কন্যাও জীবন এবং চরিত্রের গঠন করিয়া থাকে। সীতা, সাবিত্রী, বেহুলা, দময়ন্তী, পদ্মিনী প্রভৃতি, একদিন এই মাতা বা মাতৃস্বরূপিণী পালনকর্ত্রীর নিকট চরিত্র লাভ করিয়াছিলেন বলিয়াই আজ পতি-ভক্তি ও পতিপ্রেম-প্রভাবে জগৎ-পূজ্যা হইয়া আছেন। এইজন্যই হিন্দুর শাস্ত্র কহিতেছেন যে, জননী আদিগুরু ও মহাগুরু। এই গুরুর গুরু কল্পতরুর পাদমূলে সন্তানের সকল অভীষ্টই সিদ্ধ হয়। সুতরাং মাতৃ-উপাসনাতে সন্তানের মুক্তিও হইতে পারে।

আমাদের দেশে একটা চলিত-কথা আছে, —"কু-পুত্র যদিচ হয়, কু-মাতা কখন নয়"!— কথাটা বড়ই খাঁটী। সন্তান, কু-সন্তান হইতে পারে বটে, কিন্তু মাতা, কু-মাতা হইতেই পারেন না। অর্থাৎ পুত্র যতই কেন অসৎ, কদাচারী, দুর্ম্মতি-পরায়ণ হউক না,—তাহার প্রতি মাতার স্নেহ সমভাবেই থাকে। বুঝি, দয়ার ভাগটা আর একটু বেশীও থাকে।—"রাম হরি, ওরা ত মানুষের-মত হইয়াছে,—এ ভূত অভাগার আর কোন উপায় নাই"—এমন কথা অনেক মায়ের মুখেই শুনিতে পাই। তখন সেই স্বাভাবিক স্নেহের সহিত দয়ার আধিক্য হওয়াতে অন্য দুই পুত্র—"রাম হরি" অপেক্ষা জননী বুঝি, ভূতকেই অধিক কৃপাচক্ষে দেখেন। তিনের প্রতি স্নেহ সমানই থাকে,—তবে অকৃতী, অধম, অসহায় বলিয়া, ঐ ভূতর প্রতি মায়ের দয়া বুঝি বেশী হয়। হিন্দুর সংসারে, এ দৃশ্য বিরল নহে।

"যার কেউ নাই, তার মা আছে"—অনেক দুঃখেও এ বড় সুখের সান্ত্বনা! এমন সান্ত্বনা বুঝি, পৃথিবীর আর কোথাও মিলে না। জীবনের তৃপ্তি ত অনেক রকমে হয়, কিন্তু মাতৃস্নেহের ন্যায় তৃপ্তি কি সন্তান আর কিছুতে পায়? হিন্দুর সংসারে, পুত্রের আহার করিবার সময়ে, মাতার এই স্বর্গীয় স্নেহটী বড়ই সুন্দর-রূপে বিকশিত হইয়া থাকে!—"বাবা! ও ক'টী ভাত খা, এই মাছটুকু খা,—খা না বাবা,—খা না;—তোর্ পেটের আঁত যে এখনও ভরে নেই,—আমার মাথা খাস্, আর দুটী খা"—এ সময়ের মায়ের এই স্নেহ-দৃষ্টিটী কি কেহ লক্ষ্য করিয়াছেন?—সেই স্নেহের সহিত ঈষৎ কাতরতা, সেই পুত্রের আহারে নিজের আহার-বোধ, সেই একবার পুত্রের মুখের পানে, আরবার সেই অন্নব্যঞ্জনের দিকে সঘন-দৃষ্টি—মায়ের সেই অকৃত্রিম স্নেহপূর্ণ ভাব, কেহ লক্ষ্য করিয়াছেন কি? যেন সাক্ষাৎ করুণাধার মা-আনন্দময়ী তখন ধরাধামে অবতীর্ণা!

মাতার প্রতি সন্তানের ভক্তি যে অতি স্বাভাবিক, তাহা আর না বলিলেও চলে। অতি নিষ্ঠুরহৃদয় হইলেও, সে, মাতার প্রতি ভক্তি করিতে পারে এবং করিয়াও থাকে।

মাতৃভক্তি সৎকার্য্যের প্রধান সহায়। মাতার চরণ-চিন্তা অনেক পাপ-কার্য্যের অন্তরায়। নিজের জীবনে দেখিয়াছি, যখন অন্তরে পাপের আবির্ভাব হয়, কিংবা সেই পাপ-কার্য্যসাধনে মন ছট্‌ফট্ করিতে থাকে, তখন আমার প্রত্যক্ষ দেবতা মাতার পাদপদ্ম স্মরণ করিয়া আমি প্রকৃতিস্থ হই;—সেই মাতৃপদ চিন্তারূপ পুণ্যের আগুনে, আমার পাপ-চিন্তা পুড়িয়া খাক্ হইয়া যায়।

সংসারে মাতৃলাভ বা মাতৃপূজা অনেক পুণ্যের কাজ। সুমাতা লাভ করা আরও জোর-কপালের কথা। "যার মা নাই, সংসারে তার কেউ নাই"—এ বড় খাঁটী কথা!—এ যে কি কথা, তাহা আমি নিজেই বুঝিতে পারি,—অপরকে বুঝাইবার শক্তি আমাতে নাই। অপ্রত্যক্ষ দেবতার জ্ঞান আমাদের কতটুকু?—তাহাও কি এই প্রত্যক্ষ সাকারদেবতা জননীকে দেখিয়া নয়? এই মাতৃভক্তি হইতেই ভগবানের প্রতি প্রাণ টানিতে থাকে। কিন্তু সবার মূলেই আমার সেই স্নেহের মূর্ত্তিমতী প্রতিমা, পরম পুণ্যময়ী জগদ্ধাত্রীরূপিণী জননী।

মহাবীর নেপোলিয়ন একস্থলে বলিয়াছেন, —"আমি যদি কোনরূপে ভাল এবং মহৎ হইয়া থাকি, সে কেবল আমার মাতার শিক্ষকতায়।" কথাটার অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রকটিত। শৈশবে মহৎ-হৃদয় ম্যাটসিনী, এক বৃদ্ধ অন্ধকে দেখিয়া, করুণ-হৃদয়ে, মাতার নিকট হইতে পয়সা চাহিয়া, তাহাকে দিয়াছিলেন; মাতা তখন হইতেই সন্তানের চরিত্র আরও উজ্জ্বল করিয়া দিতে থাকেন। তাহারই ফলে এক দিন স্বদেশ-প্রেমিক মহাত্মা, স্বদেশের দুর্গতি বুঝিয়াছিলেন এবং বুঝিয়া সেই মত কার্য্য করিতেও সমর্থ হইয়াছিলেন।

ধ্রুব যে হরিপদে স্মরণ লইয়া, ধ্রুব-লোক পাইয়াছিলেন, তাহাও এই মায়ের করুণায়। মাতা সুনীতিই শিক্ষা দেন,—"হরি ভিন্ন আমাদের আর গতি নাই;—হরিকে ডাক, তিনিই কূল দিবেন।" মায়ের এই অমূল্য উপদেশ পাইয়াছিলেন বলিয়াই না ধ্রুব, ধ্রুব-লোক প্রাপ্ত হন? আর সেই ধ্রুবের মাতৃভক্তিই বা কি অপূর্ব্ব!—হরিভক্তি-প্রভাবে ধ্রুব, যেমন ধর্ম্মরাজ্যে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া গিয়াছেন, মাতৃ-ভক্তিতেও ধ্রুবের সেইরূপ আস্থা ছিল। সেই অরণ্যে মুনিবালকদিগের সহিত খেলাইয়া, বন্য-ফল লইয়া ধ্রুব কুটীরে আসিত; মাতৃপদে প্রণাম করিয়া সোণারচাঁদ শিশু সেই বন-ফল জননীকে দিতেন,—রাজমহিষী সুনীতি চোকের জলে বুক ভাসাইয়া ধ্রুবকে কোলে লইয়া, মুখচুম্বন পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিতেন;—আর মনে মনে কহিতেন,—"বাপ আমার! তোমা হ'তে যেন সুখী হই!"

বালক সিন্ধুরও বিশিষ্ট পিতৃ-মাতৃ-ভক্তি পুরাণে দেখিতে পাই। অন্ধ ও বৃদ্ধ জনক-জননীকে সেবা-শুশ্রূষা করাই সিন্ধুর জীবনের

---

* It is an established fact that a worthy man has a worthy mother.

ব্রত ছিল। সেই অন্ধের-নড়ী—বালক সিন্ধুই বন-ফল ও স্নিগ্ধ-জল আনিয়া ক্ষুৎপিপাসাক্লিষ্ট পিতামাতার প্রাণরক্ষা করিত। আর এই পিতা-মাতার সেবা করিতে গিয়াই, মৃগয়াবেশী অযোধ্যারাজ দশরথের নিশীথশর—শব্দভেদী বাণে, ভক্ত-পুত্রকে অকালে ইহলোক ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। পুরাণে, ইতিহাসে, কাব্যে, সংসারে—ভক্ত-পুত্রের এমন শত সহস্র দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয়।

মাতা অসহিষ্ণু, প্রগল্‌ভা বা অপ্রিয়বাদিনী হইলেও, ভক্ত-সন্তান, আপন লক্ষ্য-পথ হইতে বিচ্যুত হন না। মাতাকে সন্তুষ্ট করিতে তিনি প্রাণ-পাত করিয়া থাকেন। মাতা সৎ হউন আর অসৎ হউক, পুত্রের কিন্তু কোনমতে মাতৃভক্তি হইতে বিচলিত হওয়া উচিত নয়। মাসিডনাধিপতি মহাবীর আলেকজাণ্ডার দি গ্রেটের কথা মনে হয় কি? তাঁহার মাতা এইরূপ সদা-অসন্তুষ্টা, অপ্রিয়বাদিনী ও অসহিষ্ণু ছিলেন। আলেকজাণ্ডারের এত পদ-সম্ভ্রম এবং ধন-সম্পত্তিতেও তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন না। এক সময়ে মাসিডনাধিপতি স্থানান্তরে ছিলেন; তাঁহার অবর্ত্তমানে, তাঁহার প্রধান কর্ম্মাধ্যক্ষ এ্যাণ্টিপেটার রাজ্য পরিদর্শন করেন। আলেক-জাণ্ডার-জননী প্রতিনিয়তই এ্যাণ্টিপেটারের কার্য্যের প্রতিবাদ করিতে থাকেন। তাহাতে এ্যাণ্টিপেটার বিরক্ত হইয়া, প্রভুকে পত্র লিখেন যে, রাজমাতার জন্য তিনি সুশৃঙ্খলে রাজকার্য্য সমাধা করিতে পারেন না। তাহার উত্তর-স্বরূপ মাতৃভক্ত আলেকজাণ্ডার এইমাত্র বলিয়া-ছিলেন,—"এ্যাণ্টিপেটার জানেন না যে, মা'র-আমার এক ফোঁটা চোখের জলে, তাঁহার শত-সহস্র পত্র মুছিয়া যাইতে পারে!" * অতএব দেখা গেল, পাশ্চাত্য-জাতির মধ্যেও মাতৃভক্তি বিরল নহে।

মার্কণ্ডেয়পুরাণে মাতৃভক্তির কয়েকটী অতি-সুন্দর চিত্র আছে। রাজা ঋতধ্বজ ও তৎপত্নী মদালসার অলর্ক নামক অন্যতম এক পুত্র ছিল। সেই অলর্ককে শৈশব হইতেই, মদালসা তত্ত্ব-জ্ঞান প্রদান করেন। অলর্ক যৌবন-সীমায় পদার্পণ করিলে, মদালসা তাঁহাকে একটী অসূ-রীয় দান করেন; তন্মধ্যে একটু করা কাগজে-লেখা "শাসনপত্র" রক্ষিত ছিল। ঘটনাক্রমে কাশীপতির সহিত যুদ্ধে অবসন্ন হইয়া পড়িলে, অলর্কের সেই মাতৃপ্রদত্ত "শাসনপত্রের কথা মনে পড়িল। সেই শাসনপত্রে যে গভীর তত্ত্ব-জ্ঞান নিহিত ছিল, পুত্র অলর্ক সেই মত কার্য্য করিলেন এবং পরিণামে একজন ধর্ম্মজ্ঞ মহা-পুরুষও হইয়া উঠিলেন।

রাজপুত্র অবীক্ষিতের পিতৃ-মাতৃ ভক্তিও অতি সুন্দর! কোন সময়ে তাঁহার মাতা বীরা "কিমিচ্ছক" নামক একটী দুষ্কর ব্রত করেন। বীরা পুত্রকে কহিলেন,—"আমি কিমিচ্ছক নামক উপবাসপর একটী ব্রত করিব; * * * সেই ব্রত তোমার পিতা, তুমি ও আমি, এই তিন জনেরই আয়ত্ত। অতএব পুত্র! তুমি তাহাতে অঙ্গীকার করিলেই আমি ব্রতকার্য্যে যত্নবতী হইতে পারি। * * * যাহা কিছু বল ও পরাক্রমসাধ্য, তাহা তোমার আয়ত্ত। উহা তোমার সুসাধ্য, দুঃখসাধ্য, অথবা অসাধ্যও হইতে পারে। অতএব হে পুত্র! যদি তোমার সাধ্য বিষয়ে তুমি অঙ্গীকার কর, তবেই এ ব্রতের উদ্যোগ করি। এখন তোমার যাহা অভিপ্রায় প্রকাশ কর।" পুত্র অবীক্ষিত কহি-লেন,—* * * "আমার শরীর দ্বারা যাহা

* Alexander only said, "Antipater doth not know that one single tear of my mother is able to blot out six hundred of his epistles."

নিষ্পন্ন হইবে, আপনার আজ্ঞানুসারে আমি তাহা সম্পাদন করিতে প্রস্তুত আছি। যথা-সময়ে ব্রত আরম্ভ হইল। পুরোহিত অর্থী-গণকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন,—"করন্ধম-মহিষী কিমিচ্ছক-ব্রত করিতেছেন। কে কি ইচ্ছা করিতেছ? কাহার কি দুঃসাধ্য সাধন করিতে হইবে?—প্রকাশ কর।" অবীক্ষিতও সেই কথার পোষকতা করিয়া কহিলেন,—"হে অর্থিগণ! আমার প্রতিজ্ঞা-বাক্য শ্রবণ কর। আমার ভাগ্যবতী মাতা কিমিচ্ছক ব্রতে উপো-ষিত রহিয়াছেন, এই সময়ে আমার শরীর দ্বারা যাহার যাহা কিছু সাধিত হইতে পারে, সে তাহাই প্রকাশ করুক। এই কিমিচ্ছক-ব্রতকালে তোমরা কে কি প্রার্থনা করিতেছ বল, আমি তাহাই প্রদান করিতে প্রস্তুত আছি।" *

মাতৃভক্তির ইহা অপেক্ষা উদ্দাম দৃশ্য আর কি হইতে পারে? যদিও রাজপুত্র অবীক্ষিতকে কোন প্রাণঘাতী কঠোর সমস্যায় পড়িতে হয় নাই, তথাপি এই প্রতিজ্ঞায়, পিতৃ প্রার্থনা পূর-ণের জন্য, তাঁহাকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও বিবাহ করিতে হইয়াছিল।

রাজপুত্র ভনন্দনের মাতৃভক্তিও অতুলনীয়। মাতা কৃপাবতী তাঁহাকে "বৎস! গোপাল হও" বলিয়া গো-পালনে নিযুক্ত করিলে, তিনিও মাতৃ-আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া মাতাকে প্রণাম পূর্ব্বক হিমালয়-পর্ব্বতবাসী নীপনামক রাজর্ষির নিকট গমন করিলেন। কহিলেন,—"মাতা আমাকে 'তুমি গোপাল হও' বলিয়া আদেশ প্রদান করিয়াছেন, সুতরাং পৃথিবী-পালন অবশ্য কর্ত্তব্য। * * * পৃথিবী এখন বলবান্ জ্ঞাতি-গণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত রহিয়াছে।" রাজর্ষি নীপ ভনন্দনকে অস্ত্রবিদ্যা দিলেন। ভনন্দন ধর্ম্মযুদ্ধে জয়ী হইয়া, পৃথিবী-রাজ্য পিতৃ-পদে সমর্পণ করিলেন।" *

এমন মাতৃভক্ত ও মাতৃ-উপাসক পুত্রগণ যদি অক্ষয় স্বর্গ বা ততুচ্চ ফল—মুক্তি লাভ না করিবে, তবে এ সংসারে স্বর্গ বা মুক্তিলাভ আর কাহার ভাগ্যে ঘটিবে? হিন্দুর নানা পুরাণে, নানা ধর্ম্মগ্রন্থে, এইরূপ নানা ভাবের পিতৃ-মাতৃ-ভক্ত মহাত্মা দেখিতে পাই। এ অবধি আমরা যতগুলি পিতৃ-মাতৃ-ভক্তের নামোল্লেখ করিয়াছি, প্রায় সকলেই ভক্তির চরমপথে উপনীত হইয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের পরিণাম কি হইয়াছিল, আমরা কেহই দেখিতে যাই নাই। তবে পুরাণ-ইতিহাসে যতদূর বুঝিয়াছি, তাহাতে বলিতে পারি, মুক্তি অর্থে যদি "লয়" বা ব্রহ্মে লীন হওন হয়, তবে সে পরম নির্ব্বাণ-পদও কোন কোন মহাত্মা লাভ করিয়াছিলেন। আর মুক্তিঅর্থে যদি স্বর্গলোক অনন্ত বৈকুণ্ঠ বা তদপেক্ষাও কোন উচ্চলোক হয়, তাহাও অনেকের ভাগ্যে ঘটিয়াছিল।

বিনতা-পুত্র গরুড়ও পরম মাতৃভক্ত ছিলেন। সর্প-জননী কদ্রুর সহিত পণ রাখিয়া, বিনতা ঘটনা-চক্রে পরাভূত হন। শেষে নিজ অঙ্গী-কার অনুসারে কদ্রুর দাসী হইয়া তিনি মনো-দুঃখে কালযাপন করেন। কিন্তু পুত্র গরুড় অসাধারণ উপায়ে, মাতার দুর্জ্জয়-পণের প্রতি-রোধ করেন। ভক্ত পুত্রের কল্যাণে বিনতা আবার স্বাধীন হন।

মহাভারতের যক্ষ ও যুধিষ্ঠির-সংবাদের সেই কথা মনে পড়ে কি? যক্ষ কহিলেন, "পৃথিবী অপেক্ষা গুরুতর কি? আকাশ অপেক্ষা উচ্চতর কি?" ধর্ম্মপুত্র উত্তর দিলেন, "মাতা

* পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত এবং পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বীরসিংহ শাস্ত্রী ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ধীরানন্দ কাব্যনিধি কর্ত্তৃক অনুবাদিত মার্কণ্ডেয়পুরাণ।

পৃথিবী অপেক্ষা গুরুতরা; পিতা আকাশ অপেক্ষা উচ্চতর।" মহাকবি, এই একটীমাত্র কথায়, মাতা-পিতার কি উচ্চাসনই দিয়া গিয়াছেন! *

যুধিষ্ঠিরের মাতৃভক্তি বড় উচ্চ। মাতা ও বিমাতা তাঁহার নিকট দুই-ই সমান। যখন যক্ষ বলিল, "তোমার ভ্রাতৃগণের মধ্যে যে একটীকে ইচ্ছা কর, তিনি জীবিত হউন।" যুধিষ্ঠির নকুলের জীবন প্রার্থনা করিলেন। যক্ষ আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, "ভীমার্জ্জুনকে পরিত্যাগ করিয়া তুমি যে বিমাতৃ-পুত্র নকুলের জীবন প্রার্থনা করিতেছ?" যুধিষ্ঠির কহিলেন,—"ধর্ম্ম বিনষ্ট হইলেই বিনষ্ট করেন এবং রক্ষিত হইলেই রক্ষা করিয়া থাকেন। * * * আমার পিতার কুন্তী ও মাদ্রী দুই ভার্য্যা; ইহাঁরা উভয়েই পুত্রবতী থাকেন, ইহাই আমার নিশ্চিত অভিপ্রেত। আমার পক্ষে কুন্তী যাদৃশী, মাদ্রীও তাদৃশী; তাঁহাদিগের প্রতি আমার কিছুমাত্র ইতরবিশেষ নাই; আমি মাতৃদ্বয়ের প্রতি সমান ভাব ইচ্ছা করি; অতএব হে যক্ষ! নকুল জীবিত হউন।" †

এরূপ উচ্চ জ্ঞান ও ভক্তি-তত্ত্ব ধর্ম্মপুত্রের মুখেই শোভা পায় বটে। একাধারে ভক্তি-জ্ঞানের এরূপ অপরূপ চিত্র অতি অল্পই দেখিতে পাই।

"মাতা সকল অবস্থাতেই পুত্রের পূজনীয়া। আবার যখন তিনি পতিহীনা হন, তখন তাঁহাতেই পিতা রহিয়াছেন ভাবিয়া তাঁহাকেই পিতৃপূজা ও মাতৃপূজা উভয় পূজাই দিতে হয়। মাতা বিধবা হইলে তাঁহাকে অধিকতর পূজা করিও; তিনি যেন বুঝিতে না পারেন যে, তাঁহার সমস্ত সৌভাগ্য চলিয়া গিয়াছে। আমাদের শাস্ত্রে বলে যে, পিতা-মাতার যত সেবা কর না কেন, সহস্রবর্ষেও তাঁহাদের ঋণ পরিশোধ করিতে পারিবে না।* কথাটীর অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রকটিত হইতেছে।

আমরা যতদূর আলোচনা করিয়াছি, তাহাতে সাধ্যানুসারে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি যে, ভক্তি কি এবং মাতৃভক্তিই বা কি বস্তু, এবং তাহার ফলই বা কি? এক্ষণে বোধ হয়, সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, এই মাতৃভক্তি ঔপন্যাসিক নহে; আর এইরূপ মাতৃ-উপাসনাতেই সন্তান মুক্তিলাভ করিতে পারেন।

পুরাণ-ইতিহাসের কথা ছাড়িয়া, আমাদের বর্ত্তমান সমাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেও অনেক মাতৃভক্ত পুত্র দেখিতে পাই। স্বর্গীয় জজ দ্বারকানাথ মিত্র ও স্বর্গীয় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বিশিষ্ট মাতৃভক্ত ছিলেন। এই মাতৃভক্তির কৃপায়, তাঁহারা ঐহিক ও পারত্রিক উভয়বিধ মঙ্গল লাভ করিয়া গিয়াছেন, সন্দেহ নাই। ৺ রামগোপাল ঘোষও একজন বিশিষ্ট মাতৃভক্ত ছিলেন। শুনিতে পাই, তিনি যে জ্বলন্ত বাগ্মিতার "শব-দাহ" আইন বিধিবদ্ধ করিতে দেন নাই, তাহার মূলে নাকি তাঁহার মাতৃ-আজ্ঞা নিহিত ছিল। অর্থাৎ সেই পুণ্যবতী জননী নাকি এই অহিতকর আইনের বিরুদ্ধে পুত্রের নিকট দুই একটী মর্ম্মান্তিক কথা কহেন। হাইকোর্টের বর্ত্তমান জজ শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও একজন মাতৃভক্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ। অজ্ঞাতনামা এমন কতশত মাতৃভক্ত মহাত্মা আছেন, কে বলিতে পারে? আর ইহাও কে বলিতে পারে যে, সংসারের কত ঝড়—কত তুফানের মধ্যে, ভক্ত পুত্র, একমাত্র মাতৃভক্তি বলে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছেন!

একটী সুন্দর পৌরাণিক-কিংবদন্তী আছে। এক দিন পার্ব্বতী, কুমার কার্ত্তিকেয় ও গজাননকে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়া আসিতে বলেন। পার্ব্বতী কহিলেন,—"তোমরা দু'ভায়েই পৃথিবী ভ্রমণ করিতে যাও; দেখি, কে অগ্রে ফিরিতে পার।" কথা শুনিয়া কার্ত্তিক "তথাস্তু" বলিয়া, তখনই তাঁহার ময়ূরে চড়িয়া পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিতে চলিলেন; মনে মনে ভাবিলেন, "আমি ত এলেম ব'লে; দাদা আর ইঁদুরে চ'ড়ে কতদূরই বা যাবেন?" কিন্তু গজানন কোথাও না গিয়া, কেবল ভক্তিভরে ব্রহ্মাণ্ডরূপিণী জগদম্বাকে একবার মাত্র প্রদক্ষিণ করিয়া, সাষ্টাঙ্গে প্রণামানন্তর উপবেশন করিলেন। যথাসময়ে কুমার কার্ত্তিকেয় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, অগ্রজকে মাতৃসকাশে উপস্থিত দেখিয়া, সাগ্রহে কহিলেন,—"একি মা! দাদা যে এখানে বসিয়া আছেন?—আমি ত মা! তোমার আদেশ পালন করিলাম।" ভগবতী একটু হাসিয়া কহিলেন,—"বাবা, তোমার সাধের ময়ূর আছে,—তুমি মনে করিলে আর পৃথিবী বেড়াইলে; কিন্তু তোমার দাদা আমার কাছে থাকিয়াই সে কাজ সম্পন্ন করিয়াছেন।"

গল্পটীর ভিতর এই শিক্ষা পাওয়া যায়, ভক্তিভরে একমাত্র জননীর পাদপদ্মে দেহ-মনঃপ্রাণ সমর্পণ করিলে, তাহার আর কোথাও যাইতে হয় না,—কোন দেবতার উপাসনা করিতে হয় না,—তাহার অন্য কোন যোগ-যাগ-সাধনাও নাই,—মুক্তি তাহার করতলস্থ।

অদ্বৈত-গুরু ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের সেই মাতৃভক্তির কথা স্মরণ হয় কি?—মায়া-বাদ-প্রবর্ত্তক ভগবান্ শঙ্কর সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া, সিদ্ধ হইয়াও, মাতৃ-পাদ-পদ্ম বিস্মৃত হন নাই,—মাতা বিশিষ্টা দেবীর অন্তিমকালে তিনি গৃহে প্রত্যাগমন করেন এবং তাঁহার পদধূলি মস্তকে লইয়া, তাঁহারই ইচ্ছামত প্রথমে "শিবলোক" আহ্বান করিলেন। যোগীশ্বর সাক্ষাৎ-শঙ্করের আহ্বানমাত্রেই তথায় শিবলোকের আবির্ভাব হইল; জননী শিবলোকে যাইতে ভীত হইলেন; অদ্বৈত-গুরু যোগবলে আবার তৎক্ষণাৎ "বিষ্ণুলোক" আহ্বান করিলেন; বিষ্ণুলোকেরও আবির্ভাব হইল। রত্নগর্ভা, ভাগ্যবতী জননী, পুত্রের কল্যাণেই সেই আনন্দধাম বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হইলেন!—আর সেই ভক্ত পুত্র?—ভগবান্ শঙ্কর-চরিত পৃথিবীর আদর্শ!—একাধারে এত জ্ঞান, গবেষণা ও পাণ্ডিত্য লইয়া,—উপনিষদস্থ "একমেবাদ্বিতীয়ম্"—ও "সচ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহম্ শিবোঽহম্" এই অপূর্ব্ব ভাবময় গভীর ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া, দ্বাত্রিংশ বর্ষে, কেদারেশ্বর তীর্থে যোগবলে দেহ ত্যাগ করেন। বুঝি, শঙ্করের অসাধারণ মাতৃভক্তিই শঙ্করকে এই চরম আদর্শে লইয়া যায়। যখন অদ্বৈতগুরু সংসারাশ্রম ত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হন, তখন কি তাঁহাকে কম-সমস্যার মধ্যে পড়িতে হইয়াছিল!—এক দিকে মাতার পুনঃপুনঃ নিষেধ, অন্যদিকে প্রাণের ঐকান্তিক টান!—শঙ্কর সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করিতে কিছুতেই মাতৃ-আজ্ঞা না পাইয়া, শেষে যে অদ্ভুত উপায় অবলম্বন করিলেন, তাহা মনে হয় কি?—মহাজ্ঞানী শঙ্কর নদী পার হইবার সময় স্বীয় শক্তিবলে নদীতে বৃহৎ একটা-মায়া-কুম্ভীর সৃজন করিয়া জননীকে কহিলেন,—"মা, যদি তুমি আমাকে সন্ন্যাসী হইতে আজ্ঞা দাও, তবে আমি এই ভীষণ কুম্ভীর-গ্রাস হইতে পরিত্রাণ পাই; নচেৎ আমার জীবনের আশা ত্যাগ কর!" অগত্যা বিশিষ্টা দেবী, পুত্রকে সন্ন্যাস অবলম্বন করিতে আদেশ দিলেন,—অদ্বৈত-গুরুরও আজীবন-সঞ্চিত আশা ফলবতী হইল।

শঙ্কর-জীবনের এই ঘটনায় আমরা এই শিক্ষা পাই, জননী অজ্ঞান হইলেও তাঁহাকে অবমাননা করা উচিত নয়! ভাল কাজ করিতে হইবে, অথচ সে কাজে জননীর মত নাই,—তখন ভক্তিবলে মাতাকে সন্তুষ্ট করিয়া, তাঁহার

* মহাভারত;—বর্দ্ধমান রাজবাটীর বঙ্গানুবাদ।
† মহাভারত;—বর্দ্ধমান রাজবাটীর বঙ্গানুবাদ।

* শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু প্রণীত "প্রথম নীতি-পুস্তক।"

আজ্ঞা লইয়া, সেই কাজ সম্পন্ন করা বিহিত। শঙ্কর যেমন পরম জ্ঞানী, মহাতত্ত্বদর্শী, সেইরূপ ভক্তিমান্‌ও বটেন! মূলে, এই মাতৃভক্তি ছিল বলিয়াই, শঙ্কর, সাক্ষাৎ-শঙ্করজ্ঞানে আজিও দাক্ষিণাত্যাঞ্চলে পূজিত হইতেছেন এবং সেই শঙ্কর-চরিত আজি জগতের আদর্শস্থানীয় হইয়া রহিয়াছে।

অতএব যতদূর আলোচনা করিলাম, তাহাতে সাধ্যানুসারে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, মাতৃভক্তি অতি অপূর্ব্ব বস্তু এবং ইহার প্রভাবও অতি অপূর্ব্ব।

যে আর অন্য কোন ধর্ম্ম জানে না, কর্ম্ম জানে না, যোগ জানে না, তপস্যা জানে না; তন্ত্র জানে না, মন্ত্র জানে না,—পার্থিব সংসারেরই বা কি, আর পরমার্থ তত্ত্বেরই বা কি,—কোন বিষয়েরই কোন ধার ধারে না,—একমাত্র মাতাকেই চিন্ময়ী, জগদ্ধাত্রী-রূপিণী, মহাদেবী বলিয়া জানে এবং সেইরূপ জানিয়া বিশিষ্টরূপ ভক্তি ও প্রীতিতে মাতৃপূজা ও মাতৃ-উপাসনা করিতে থাকে, মুক্তি তাহার করতলস্থ! বলিবে, কেন?—সেরূপ লোক কি পাপ করিতে পারে না?—দস্যুও ত নরশোণিত পান করিয়া, মহাভক্তিভরে মহাকালীর পূজা করিয়া থাকে, তবে সেও কি মুক্তি পাইবে?—তদুত্তরে আমার বক্তব্য, এ ভক্তির সহিত মাতৃভক্তির তুলনাই হইতে পারে না।

পূর্ব্বে বলিয়া ও দেখাইয়া আসিয়াছি যে, মাতৃভক্তি সৎকার্য্যের সহায় এবং অসৎচিন্তারও অন্তরায়। অন্তরের সকল বৃত্তিগুলি যখন এক হইয়া সেই মাতৃস্বরূপা পরম দেবতার পানে অনুধাবিত হয়,—তখনই ভক্তির আবির্ভাব। এই ভক্তি লইয়াই ভক্তের জীবন পরিপূর্ণ।—অসচ্চিন্তার অবসর কৈ? তাহার স্থান কোথায়?

নদীতে কখন বান্ আসিতে দেখিয়াছ? নদী-হৃদয় পরিপূর্ণ করিয়া, অগাধ জলরাশি যখন নদীর দুইটী পার্শ্ব ভাসাইয়া লইয়া যায়,—দৃশ্য বল দেখি! অগাধ জলরাশি তখন উচ্চ নীচ দেখে না, পাহাড় পর্ব্বত মানে না, অপ্রতিহত-প্রভাবে আপনার বলে আপনি চলিয়া যায়। ভক্তিপ্রবণ হৃদয়েরও এই অবস্থা। সেখানে নূতন করিয়া বান্ আসে না। হৃদয় পূর্ণ করিয়া ভক্তি চারিদিকের বাধা-বিঘ্ন, পাপ-প্রলোভন না মানিয়া, আপনার মহালক্ষ্য পথে চলিয়া যায়। ভক্তির লক্ষ্য-পথ—চিদ্‌ঘন সচ্চিদানন্দ বৈকুণ্ঠধাম। মাতৃভক্ত পুত্র মাতার হৃদয়েই সেই বৈকুণ্ঠ-ধাম অবলোকন করেন।

শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত।

নামোচ্ছ্বাস।

রাধা-রাধা বলি
কি কবে বেজেছিল,
কেবা সে স্বর-ধারা
কি সাধে সেধেছিল!
সুদূর অতীতের
আঁধার-পারাবার
পলকে লঙ্ঘিয়ে
সমুখে সে আবার;—
ছড়ায়ে মধু-ধারা
ভরি সকল কাণে,
মরম পরশিয়ে
বাজে প্রাণের প্রাণে!
রাধা-রাধা বলি
পাখীর কলকলি,
উজানে উনমাদে
যমুনা-ছলছলি!
বহে মলয়-বায়ে
কুসুম-সৌরভ,
আরো সুরভি সেই
রাধা-রাধা-রব!
পাতার মরমরে
ঝরে সে নাম-সুধা,
আনিয়ে ঘুম-ঘোরে
নিবারে তৃষা ক্ষুধা!
ভ্রমরা-গুঞ্জনে
সে-ধ্বনি-কাণাকাণি,
কোকিলা-কুহুরবে
সে-নাম-জয়ধ্বনি!
ফুল্ল চাঁদনীতে
জাগে সে-নামস্মৃতি,
জড়ায়ে গলাগলি
লতা-বিতানে প্রীতি!
কোথা সে-রব উঠে
কোথা সে-রব ফুটে,
ভাসে সে নিশিদিশি
সারা গগন ছুটে!
হরিত স্বন পাতা
স্নিগ্ধ তরুছায়ে
বিছায়ে শেজ কোথা
সুখে থাকে মিশায়ে!
ভ্রমে পুলিনে, খেলে
যমুনা-হিল্লোলে,
ধেয়ে গগন-পথে
উঠে জলদ-কোলে!
ছুঁয়ে বাসব-ধনু
কত-রঙ্গিল প্রাণে,
স্বপন-সঙ্গীত
ঢালে অমর-কাণে!
তারা-মুকুতাগুলি
গুণিয়ে একে একে,
ঘোরা বিভোরা হ'য়ে
চমকি থেকে থেকে!
ঝরে সে স্বরধারা
পাখীর গানে-গানে,
রবির রাঙ্গা-রাঙ্গা
কিরণ-রেণু সনে!
কখন বিনি-রবে,
কভু বীণার তানে,
কাণে না পশে কভু,
সুধ বাজয়ে প্রাণে!
কে জানে, আন-মনে
কিছু বুঝিতে নারি,
সদাই বাজে যেন,
দিবস-শর্ব্বরী,
রাধা-রাধা বলি
ক্ষণে না পাশরি!
বাঁশরি কিবা সে গো
কারি' বা বাঁশরি।

শ্রীশ।—

আষাঢ়ে-গল্প।

বড় বর্ষা বাদল। চারিদিক্ জলে জলময়! বৃষ্টির আর বিরাম নাই। কখন ফোঁটা ফোঁটা, কখন টোসা টোসা, কখন ইলসেগুড়ুনি, কখন মুষলধারে! দিনের বেলায় সূর্য্যের মুখ দেখা যায় না। রাত্রে মেঘের ঘন অন্ধকার। এক-দিকে মেঘের ডাক; আর সে ডাক থামিলেই ভেকের ডাক। বড় অবিচ্ছিন্নতা। পুকুরে জল ছাপাইয়া উঠিয়াছে। খাল বিল জলে ভরিয়াছে। কাণা-নদীতে খরস্রোত পড়িয়াছে। ঘর হইতে বাহির হওয়া দায়। এ-দিকে আষাঢ়ের দিন আর ফুরায় না। ছেলেবেলায় এমনি দিনে আমরা ঠাকুরদাদাকে ঘিরিয়া আষাঢ়ে-গল্প শুনিতাম। সে সব অনেক দিনের কথা। আজ আমি নিজেই ঠাকুরদাদার পদ অধিকার করিয়াছি, কাজেই আজ আমার আষাঢ়ে-গল্প

বলিবার পালা, তাই আজ তোমাদের কাছে একটা যেমন তেমন "রচা" আষাঢ়ে-গল্প লইয়া উপস্থিত হইলাম। কেবলমাত্র অনুরোধ, যাঁহারা আমার নাতিপুতির বয়সী, তাঁহারা যেন শুনিতে শুনিতে 'হুঁ" দিয়া যান। তবে যাঁহারা আমার মত মাথায় শুভ্র কেশ লইয়া নাতিপুতি-পরিবৃত হইয়া জীবনের দিনান্তে উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহাদের একবার রামচরণের দশা দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করি, "কেন এমন হয়? সৎপথে থাকিয়াও কেন সুখ-সৌভাগ্য মিলে না? অনেক দেখিয়াছি, অনেক দেখিতেছি, তবু "কেন এমন হয়"র জবাব খুজিয়া পাই না। এ সুন্দর বিশ্বরাজ্যে এত বিশৃঙ্খলা কেন? নিয়তির শৃঙ্খল এত অকাট্য কেন? ধর্ম্মাচরণে পূর্ব্বজন্মের পাপক্ষয় হয় না কেন? ধর্ম্মের পরাজয় কেন? অধর্ম্মের অভ্যুদয় কেন? তাহার উপর এত অসামঞ্জস্য কেন? রাজার বেটা ঘোড়া চড়ে, চড়ুক; গরিবের ছেলে সে-ঘোড়া-চাপা মরে কেন? এ রহস্য আমায় কে বুঝাইবে? দেখিতে দেখিতে চ'খের জল চ'খে রাখিয়া ভাবিয়াছি "কেন এমন হয়?" নিজে মীমাংসা করিতে পারিব না, তোমরা কি "আষাঢ়ে-গল্প" পড়িতে পড়িতে আমার এ "কেন"র রহস্য ভাবিয়া দেখিবে?

---

(১)

ঠিক এমনি সময়েই আমার গল্পের আরম্ভ। চারিদিকে জল থৈ থৈ করিতেছে। তার উপর আবার মূষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে। আকাশের কড়কড়ানিতে কাণ কালা হইয়া যায়। বিদ্যুতের চকচকানিতে চোকে ধাঁধা লাগে; সঙ্গে সঙ্গে একটু হাওয়া দিয়াছে—বৃষ্টির কোঁটাগুলি উড়িয়া আসিয়া গায়ে কাঁকরের মতন বিঁধিতেছে। সেই বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে রামচরণ ঘরে আসিতেছিল। রামচরণের মাথায় ছাতা নাই, টোকা নাই, পল্লীগ্রাম-সুলভ একখানা তাল-পাতার আচ্ছাদনও নাই। রামচরণের মাথায় জল-বৃষ্টি পড়িতেছিল, সেই বৃষ্টির জল তাহার মাথা-গা বহিয়া পড়িয়া, ছিন্ন-মলিন-বসন-প্রান্ত দিয়া ঝরিতেছিল; রামচরণের লক্ষ্য নাই, রামচরণের গ্রাহ্য নাই,—রামচরণ একমনে চলিয়াছে। খানিক দূরে একটা নারিকেল গাছের উপর একটা বজ্র পড়িয়া, রামচরণের চোক ঝলসিয়া দিল। মুহূর্ত্তমাত্র চক্ষু মুদিয়া তারপর রামচরণ আবার চলিতে লাগিল। সে দুর্দ্দিনে রাধানগরের গ্রাম্য-রাস্তা দিয়া বড় লোকজন চলাচল করিতেছিল না। যাহারা বাহির হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কেহ বা তখনকার দুর্য্যোগ অতিক্রম করিবার জন্য নিকটস্থ গৃহস্থের অতিথি হইয়াছিল, কেহ বা গৃহ লক্ষ্য করিয়া দৌড়িতেছিল। রামচরণ চলিতে চলিতে কয়েকটা গৃহ অতিক্রম করিয়া গেল, কিন্তু কোন ঘরে প্রবেশ করে নাই। প্রবেশ করিলেও আজ রাধানগরের কেহ রাম-চরণকে আশ্রয় দিত কিনা সন্দেহ।

কতক্ষণ পরে হাঁটিতে হাঁটিতে ভিজিয়া ভিজিয়া শ্রান্ত হইয়া, রামচরণ বাড়ী পৌঁছিল। কিন্তু এতক্ষণ পথে নিরাশ্রয় রামচরণের যে কষ্ট না হইতেছিল, বাড়ী পৌঁছিয়া আশ্রয়ে আসিয়া রামচরণের ততোধিক কষ্ট হইতে লাগিল। অনবরত বৃষ্টিতে রামচরণের ঘরের চাল ছেঁদা হইয়া, ভিতরে জল পড়িতেছিল। সেই জলে তাহার জিনিস-পত্র সব ভিজিয়া ছিল। রাম-চরণ তাহার বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিতে গিয়া দেখিল যে, তাহার ঘরের কাপড়খানি পরিহিত বস্ত্রেরই মত আর্দ্র, সুতরাং রামচরণের আর কাপড় ছাড়া হইল না। এদিকে রামচরণের স্ত্রী, জল হইতে রক্ষা করিবার জন্য এখানকার জিনিস সেখানে, সেখানকার জিনিস ওখানে সরাইয়া রাখিয়াছিল, সুতরাং জিনিসপত্রের

স্তূপ সব একাকার দেখাইতেছিল। রাম-চরণের ঘরে বসিবার স্থান ছিল না। তবুও তাহারই মধ্যে কতকগুলি জিনিস সরাইয়া রামচরণ মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। কিন্তু এখনও রামচরণের কষ্টের শেষ হয় নাই। রাম-চরণ বসিবার অল্পকাল পরেই রামচরণের এক-মাত্র ঘরের একখানি দেওয়াল পড়িয়া গেল। সে পতিত দেওয়ালে রামচরণের স্ত্রী প্রোথিত ও রামচরণ অর্দ্ধপ্রোথিত হইল। রামচরণের স্ত্রীকে টানিয়া বাহির করিবার শক্তি ছিল না, তবুও যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া টানিয়া বাহির করিল। তখন রামচরণের স্ত্রী অজ্ঞান-অচৈতন্য।

রামচরণ আজ তিন দিন অভুক্ত। কোনরূপে এতক্ষণ সে বিপদের সঙ্গে যুঝিতেছিল, এখন আবার স্ত্রীকেও সংজ্ঞাহীন দেখিয়া, রামচরণের চেতনা বিলুপ্ত হইল।

সেইখানে মৃত্তিকার স্তূপে পড়িয়া রামচরণ ও রামচরণের স্ত্রীর মাটীর দেহ বৃষ্টির জলে ভিজিতে লাগিল।

---

(২)

যে সময়ে নিরাশ্রয় রামচরণ বৃষ্টির জলে ভিজিতে ভিজিতে তাহার বাড়ীর দিকে যাইতে-ছিল, ঠিক সেই সময়ে রাধানগরের জমিদারের কাছারি-বাড়ীর দুইতলা বৈঠকখানায় বড়ই রঙ্গরসের তরঙ্গ উঠিতেছিল। আজ স্বয়ং জমিদার বড়ই প্রসন্ন, সুতরাং গ্রহ-উপগ্রহগণের মধ্যে আমোদের অবধি ছিল না। কিন্তু সে আমোদ-আহ্লাদ যত কিছু, দরিদ্র হতভাগ্য রামচরণকে লইয়াই হইতেছিল। সে হাসির ফোটরার, সে উপহাসের টিট্‌কারির আজ রাম-চরণকে লইয়াই আরম্ভ, রামচরণকে লইয়াই শেষ। সে হাসির উচ্চরব রামচরণের কাণ পর্য্যন্ত কিন্তু পৌঁছায় নাই, আর রামচরণ দরিদ্র বলিয়া বুঝি উপরওয়ালার কাণ পর্য্যন্তও যাইতে পারে নাই।

নাই যাক্, জমিদার কিন্তু বলিতেছিলেন,—"যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল! বেটার স্পর্দ্ধা দেখ! আমার বিপক্ষে সাক্ষী দেওয়া! এখন সাক্ষী দিয়া হাজতের সুখ দেখ!"

অমনি পাঁচ সাতটী গলা পাঁচ সাত রকম স্বরে জমিদারের পক্ষ সমর্থন করিতে লাগিল। কেহ বলিল,—"বেটা কি ধর্ম্মিষ্ঠ, হলফ লইয়া মিথ্যা কথা বলিবেন না!" কেহ বলিল,—"রাখ তোর্ ধর্ম্ম। গরিবের আবার ধর্ম্ম!" কেহ বলিল, —"ধর্ম্মাধর্ম্ম বুঝি না; যাহার পেটে ভাত জোটে না, তাহার জমিদারের সঙ্গে লাগাই অধর্ম্ম। আর পাপের ফল হাতে হাতে, কেমন? নহিলে হাজতের সুখ অদৃষ্টে ঘটিবে কেন।" ক্রমে মাত্রা উঠিতে লাগিল। কেহ বলিল,—"সাক্ষী দিবার সময় আমার মনে হইতেছিল, বেটার মাথাটা হাতে কাটিয়া ফেলি।" কেহ বলিল,—"হুকুম পাইলে একরাত্রের মধ্যে বেটার ঘর পোড়াইয়া, বেটার ভিটায় নুন বুনিয়া দি।" কেহ বলিল,—"বেটার স্ত্রী বড় সুন্দরী, চাষার ঘরে অমন দেখা যায় না; বেটা আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিয়া অমন সুন্দরী স্ত্রী লইয়া ঘর করিবে?"

ইহারই মধ্যে জমিদার বলিয়া উঠিলেন,—"হরিশ মতলবটা কিন্তু ঠাওরাইয়াছিল ভাল! আমাদের সব সাক্ষীর এক কথা; বেটা যেমন উল্টা কথা বলিয়াছে, অমনি উহারই উপর মিথ্যা-সাক্ষ্য দিয়াছে বলিয়া দরখাস্ত! অমনি সঙ্গে সঙ্গে হাকিমের হুকুম,—জামিন, নহিলে হাজত। তা বেটার আর জামিন কে দিবে? কাজেই হাজত। আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিয়া বাছাকে আর ঘরে ফিরে যাইতে হইল না! বাহবা বুদ্ধি! বলিহারি বুদ্ধি!!"

জমিদারের কথা শেষ হইতে না হইতে হরিশ তিন হাত আগু হইয়া আসিয়া, তুমিষ্ঠ

হইয়া প্রণাম করিয়া, জমিদারের পায়ের ধূলা লইয়া বলিল,—"আমার আবার বুদ্ধি! ও বুদ্ধি সব আপনার!! আপনার খাইয়া এ দেহ, এ প্রাণ! আমার কি স্বতন্ত্র আর কিছু আছে? বুদ্ধি বলুন, বিবেচনা বলুন; কল বলুন, কৌশল বলুন; যা কিছু সব আপনার।"

মুহূর্ত্ত মধ্যে হরিশের নম্রতার কথা, বুদ্ধির কথা, জমিদারের দানের কথা ছড়াইয়া পড়িল। একজন বলিল,—"হরিশ বোধ হয় আর জন্মে চাণক্য ছিল।" আর একজন অমনি লাফাইয়া বলিয়া উঠিল—'ছাই জান তুমি! এখন সে টীকি-নাড়ার সময় গিয়াছে!! হরিশ দ্বিতীয় বিসমার্ক; ও মনে করিলে ফ্রান্স রাজ্যটা এখানে বসিয়াই বুদ্ধি-বলে শাসন করিতে পারে। আর তাই বা এমন কি শক্ত? যে তারের খবর হইয়াছে, বসিয়া বসিয়া দু-চারটে টেলিগ্রাফ করিলেই হইল।" ৩নং বলিল,—"আমিও ত তাই বলি। শুধু ফ্রান্স কেন, হরিশ মনে করিলে, শুধু বুদ্ধির জোরে চোখের পলকে সমস্ত পৃথিবীটা উল্টাইয়া দিতে পারে। তবে যে করে না, শুধু এই আমাদের জমিদার বাবুর অনুরোধে। যাহার নুন খাইতে হয়, তাহার বিনা-অনুমতিতে কিছু করিতে আছে কি?" তখন কোণ হইতে একটা নাকি আওয়াজ বলিল,—"তা যদি নুন খাঁওয়ার কথা বল, তবে ভাঁই, ঠিক কথাই বলিয়াছ। আমাদের জমিদার নয় তঁ যেন দ্বিতীয় দাঁতাকর্ণ।" নাকি আওয়াজটী অনেক হাঁটাহাঁটি ও দরখাস্তের পর, তাহার মেয়ের বিবাহের উপলক্ষে পূর্ব্ব-দিনে এক টাকা চাঁদার অঙ্গীকার পাইয়াছিল। তাহার মধ্যে নায়েব দশ আনা পায় নাই বলিয়া নাকি আওয়াজকে হাঁটাইতেছিল। জমিদার বাবুর কিন্তু সেই একটাকা-পাওনা-প্রত্যাশা-ওয়ালার নাকি আওয়াজ ভাল লাগিল না, তাই তিনি নাকি আওয়াজে বলিলেন,—"আমি তঁ দাঁতাকর্ণ, তুমি দ্বিতীয় হুর্ব্বাসা নাকি?" অমনি চারিদিক হইতে সানুনাসিক স্বর বাহির হইতে লাগিল। আমি আর সে চন্দ্রবিন্দু একত্র করিয়া দেখাইতে পারি না; কাহারও যদি দেখিতে ইচ্ছা হয়, তবে শঙ্খচুন্নীদের কলরব কল্পনা করিয়া লইলেই বাবুদের চন্দ্রবিন্দুর দৌড়ের কতকটা আভাস পাইবেন।

যাক্ সে সব কথা, আসল কথাটা এখন পর্য্যন্ত বলা হয় নাই। রামচরণ হাজতে যাইলে, দুই দিন পরে তাহার এক অতি দূর-বর্ত্তী কুটুম্ব সন্ধান পাইয়া জামিন হইয়া তাহাকে খালাস করিয়া লইয়া গিয়াছিল। আর হাজতে থাকার সময় নাকি জেল-দারোগার সঙ্গে সাজোষ করিয়া রামচরণকে দুই দিন খাইতে দেওয়া হয় নাই।

রামচরণের খালাসের সংবাদ জমিদার ও তাঁহার শকুনির দল এখন পর্য্যন্ত শুনিতে পান নাই; কাজেই আমাকে এ কথা এখানে খুলিয়া বলিয়া তাঁহাদেরও জানাইতে হইল।

---

(৩)

রামচরণ উঠিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার দাঁড়াইবার স্থান ছিল না। এ সংসারে রাম-চরণের মত অপরাধীর দাঁড়াইবার স্থানই বা কোথায়? রামচরণের অপরাধের সংখ্যা হয় না!—সে দরিদ্র হইয়া সৎপথে থাকে; যা আনে, তাহারই মধ্যে যোগাড় করিয়া খায়; তাহার খাজনা কখনও বাকী পড়ে না; মহাজন কখনও রামচরণের নামে খতের নালিস করে না। রামচরণের প্রতিবাসীও ত রামচরণের মত উপায় করে, কিন্তু তাহার সকালে আনিতে সন্ধ্যায় কুলায় না; তার উপর আবার খাজনার তাগাদা, মহাজনের তাগাদা। সে রামচরণের আপেক্ষিক স্বচ্ছলতা দেখিয়া হিংসা করিবে না ত কি? আর রামচরণের স্বচ্ছল সংসার বলিয়া

রামচরণ কি তাহার প্রতিবাসীর কাছে অপরাধী হইবে না? তারপর, রামচরণ সত্য কথা বলিতে চায়, সে জমিদারের স্বপক্ষে মিথ্যা-সাক্ষ্য দিল না;—দরিদ্র রামচরণের আবার ধর্ম্মভয়? এ অপরাধের কি আর প্রায়শ্চিত্ত আছে? এর উপর আবার সে সুন্দরী স্ত্রী লইয়া ঘর করে! দুজনে পরস্পর বড় ভাব,—এ উহার দুঃখ দেখিতে পারে না, ও ইহার সুখে সুখী। রাম-চরণের ঘরকন্নায় মারপিট হয় না! রামচরণের স্ত্রী যাহা পায়, তাহাতেই সন্তুষ্ট। "আমার হইল না" বলিয়া রাগ করিয়া, তিন দিন উপবাস করিয়া রামচরণের স্ত্রী প্রতিবাসীদের বাড়ী দুঃখের কাহিনী শুনাইতে যায় না! আর কত বলিব? যে দিকে দেখি, তাহাতেই রামচরণের অপরাধ! রামচরণের উপর প্রতিবাসীর হিংসা, জমিদারের রাগ, সবই ত রামচরণের অপরাধে! এত অপরাধের সনদ স্কন্ধে লইয়া রামচরণ যে এত দিন দাঁড়াইয়া আছে, ইহাই আশ্চর্য্য! হায়! রামচরণ! দারিদ্র্য অপরাধ লইয়া জন্ম-গ্রহণ করিয়াও সুখে-স্বচ্ছন্দে ধর্ম্মপথে থাকিতে চাও? তোমার যে এতদিন পৃথিবী হইতে অবসর গ্রহণ করাই উচিত ছিল!

রামচরণের স্ত্রী এ পর্য্যন্ত কথা কহিতে পারিতেছিল না। অনেক যত্নে যখন সে কথা কহিতে পারিল, তখন যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া চীৎকার করিতে লাগিল। সর্ব্বাপেক্ষা হাঁটুতেই বেশী আঘাত লাগিয়াছিল বলিয়া সে প্রথমে হাঁটু দেখাইল। রামচরণ হাত দিয়া দেখিল, এরই মধ্যে হাঁটু বিষম ফুলিয়াছে, অনেক কষ্টে স্ত্রীকে ধরিয়া যখন দাঁড় করাইতে গেল, তখন সে হাঁটু ধরিয়া বসিয়া পড়িল। অনুভবে রামচরণ বুঝিল, তাহার স্ত্রীর পায়ের হাঁটুর হাড় ভাঙ্গিয়াছে।

তখন শুশ্রূষা করিবার আগে রামচরণের স্ত্রীকে একটা আশ্রয়ে রাখা আবশ্যক হইল। কিন্তু আশ্রয়ই বা কোথায়? নিজের ঘর ভাঙ্গি-য়াছে। রামচরণের শরীরে বল নাই। তাহার হাত কাঁপিতেছিল, তবুও সেই কম্পিত হস্তে স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া যথাসাধ্য ভাঙ্গাঘরের জিনিস-পত্র সরাইয়া রামচরণ কতকটা ঘর খাড়া করিল। এখন কয়েকখানি তালপাতা হইলেই রামচরণ কতকটা আশ্রয় করিয়া লইতে পারে।

রামচরণ আশ্রয় ভিক্ষা করিতে প্রতিবাসীর নিকট যায় নাই, কিন্তু কি জানি, কি ভাবিয়া তাহাদের নিকট কয়খানা তালপাতা ভিক্ষা করিতে গেল।

রামচরণ বড়ই কাতরতার সহিত, বড়ই দুঃখ জানাইয়া প্রথমে একজনের কাছে কয়-খানি তালপাতা চাহিল। তাহার পুকুরের পাড়ে সত্তরটা তালগাছ ছিল। কিন্তু রামচরণ চাহিলে সে তালপাতা দিতে পারিল না। রামচরণের ইচ্ছা হয়, তালপাতা কিনিয়া আনুক না কেন? পরের কাছে তালপাতা চাহিতে আজ তাহার লজ্জা করে না? সে না কখনও কাহারও কাছে ধার করে নাই বলিয়া অহঙ্কার করে!! রাম-চরণের প্রতিবাসী রামচরণকে তালপাতা দিল না।

প্রত্যাখ্যাত হইয়া শুষ্কমুখে রামচরণ ফিরিল। আবার সেই নিরাশ্রয়া আহতা পত্নীর মুখ মনে পড়িল। এবার আর কিছু না বলিয়া খানিকটা দূরের আর এক জনের তালগাছে রামচরণ উঠিল। একখানা পাতা কাটিতে যাইতেছে, এমন সময়ে কোথা হইতে সংবাদ পাইয়া তালগাছের অধিকারী লাঠী লইয়া রাম-চরণকে তাড়া করিল। রামচরণের আর পাতা কাটা হইল না। রামচরণ গাছ হইতে নামিয়া আসিলে সে দুই এক ঘা রামচরণের পিঠে বসাইয়া দিল এবং অভিধান ছাড়া অনেক কথায় রামচরণকে ও তাহার পিতৃপুরুষদিগকে

সম্বোধন করিল। রামচরণ কোন কথা না বলিয়া কতক্ষণ শূন্যদৃষ্টিতে সেই আঘাতকারীর দিকে চাহিয়া রহিল। পরে হঠাৎ ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িল।

রামচরণ কি উদ্দেশে বা কোথায় দৌড়িল, রামচরণই জানে না। কতক্ষণ দৌড়াইয়া দৌড়াইয়া হাঁফাইয়া রামচরণ গ্রামের প্রান্ত-ভাগে বসিয়া পড়িল। এই সময় রামচরণের মাথাটা কেমন করিতেছিল।

যেখানে রামচরণ বসিয়া পড়িল, সেইখানে ভিক্ষোপজীবিনী অশীতিপরা এক বৃদ্ধা বাস করিত। ইহ-সংসারে বৃদ্ধার আর কেহ ছিল না। বৃদ্ধা সেই বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে একখানি তালপাতার ঘরে বসিয়া কাঁপিতে-ছিল। হঠাৎ রামচরণ তাহাকে টানিয়া বাহির করিয়া পার্শ্বস্থ খালের জলে তাহাকে বসাইয়া দিল, পরে তাহার তালপাতার বেড়া ভাঙ্গিয়া লইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে আবার বাড়ীর মুখে দৌড়িল।

এখনও স্ত্রীকে পূর্ব্বাবস্থায় বসিয়া থাকিতে দেখিয়া রামচরণের বুক ভাঙ্গিয়া গেল। সে প্রাণপণে সেই ভগ্নঘরে তালপাতার বেড়া লাগা-ইয়া কতক্ষণ বসিয়া বসিয়া কাঁদিল। সেই তপ্ত অশ্রুতে বিকৃত-মস্তিষ্ক রামচরণ কতক শীতল হইয়া আবার প্রকৃতিস্থ হইল। তার পর ধীরে ধীরে বাহিরে যাইয়া স্ত্রীকে কোলে করিয়া ঘরে আনিল।

এতক্ষণ ভাল করিয়া রামচরণ স্ত্রীর মুখ-পানে চায় নাই; হঠাৎ চাহিয়া দেখিল, সে কাঁদিতেছে। রামচরণ জিজ্ঞাসা করিল,—"এখন বেদনা কেমন আছে?" রামচরণের স্ত্রী বলিল,—"এখন অনেক ভাল। তুমি দুই দিন আস নাই কেন?"

রামচরণ। সে অনেক কথা। পরে বলিব।

রামচরণের স্ত্রী। আচ্ছা—অসময়ে এখন সে সব লইয়া তোমায় বিরক্ত করিব না। কিন্তু তোমার মুখ এত শুষ্ক কেন? বোধ হয় খাওয়া হয় নাই। চল, চারিটী ভাত রাঁধিয়া দেই। আমি এখন ভাল আছি, ভাত রাঁধিতে পারিব।"

রামচরণের স্ত্রী উঠিতে গিয়া পড়িয়া গেল। "হা অদৃষ্ট! স্বামীকে চারিটী ভাত দিতেও পারিলাম না" বলিয়া রামচরণের স্ত্রী মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। রামচরণ দেখিল,—তাহার স্ত্রীর দৃষ্টি বড়ই নৈরাশ্য-ব্যঞ্জক। সঙ্গে সঙ্গে তাহার এক হাত আবার অজ্ঞাতে সেই বেদনা-স্থানে আসিয়া পড়িয়াছে। রামচরণের বড়ই বুকে বাজিল।

হঠাৎ অস্ফুট চীৎকারে দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়ায় রামচরণের স্ত্রী দেখিল,—রামচরণ প্রাণপণে দুই হাত দিয়া আপনার গলায় কাপড় জড়াইয়া টানিতেছে। "ও কি" বলিয়া ছাড়াইতে গিয়া, রামচরণের স্ত্রী আবার পড়িয়া গেল। তাহার হাত রামচরণের পদপ্রান্তে পড়িল। সেই হাত ছাড়াইয়া বিকৃতমস্তিষ্ক রামচরণ আবার ঊর্দ্ধ-শ্বাসে দৌড়িল।

কতক্ষণ পরে শ্রান্ত হইয়া ঘুরিয়া-ফিরিয়া রামচরণ কবিরাজের বাড়ী উপস্থিত হইল। কবিরাজ মহাশয় তখন ইটের গুঁড়ার সঙ্গে কুইনাইন মিশাইয়া "মহা-জ্বরাঙ্কুশ-লৌহ" তৈয়ারি করিতেছিলেন। হঠাৎ বাহিরে ডাক শুনিয়া ত্রস্তভাবে ইটের গুঁড়া সরাইয়া রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কে ও?"

বিকৃত-স্বরে উত্তর হইল,—"আমি রেমো।"

রামচরণ আর রামচরণ বলিয়া পরিচয় দিল না।

না জানি কি ডাক আছে মনে করিয়া পৈতা কোমরে গুঁজিয়া তাড়াতাড়ি কবিরাজ মহাশয় বাহিরে গেলেন। পরে যখন শুনিলেন যে, রাম-চরণের স্ত্রীর পা ভাঙ্গিয়াছে বলিয়া সে ঔষধ চায়, তখন অশ্রদ্ধা করিয়া কথাটা উড়াইয়া দিয়া

বলিলেন,—"তার আর কি, একটু চূণে-হলুদে দাওগে; না হয় একটু রাঙচিত্রের আটা, একটু ফণিমনসার রস গরম করিয়া দিও। ও কিছু নয়, আপনিই সেরে যাবে।"

সে অশ্রদ্ধার হাসি রামচরণের বুকে বিঁধিল। সে খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া হঠাৎ কবিরাজের ঔষধালয়ে ঢুকিল। কবিরাজের দিকে চাহিয়া চাহিয়া তাহার এক শিশি "অঘোরনৃসিংহ রস" তাঁহারই মাথায় ঢালিয়া দিল। কতকগুলা কুষ্মাণ্ডখণ্ড খাইয়া ফেলিল। পরে যেখানে নিম-কাঠের জ্বালে কবিরাজের "মহাকামেশ্বর" মোদক সিদ্ধ হইতেছিল, সেইখানে গিয়া একখানা আধ-পোড়া নিমকাঠ লইয়া কবিরাজকে তাড়া করিল। কবিরাজ পলাইয়া গেলেন। রামচরণ কতকগুলা "বিষম-জ্বরান্তক চূর্ণ", কতকগুলা "ভাস্করলবণ" লইয়া আবার গৃহের দিকে দৌড়িল।

---

(৪)

রামচরণ বাড়ীতে আসিয়া দেখিল যে, তাহার যে আত্মীয়টী তাহাকে জামিন দিয়া খালাস করিয়া আনিয়াছিল, সে বসিয়া তাহার স্ত্রীর সুশ্রূষা করিতেছে। বিকৃতমস্তিষ্ক রাম-চরণের মনে তখনই উদয় হইল, তাহার স্ত্রী বুঝি ভ্রষ্টা। আর তাহার আত্মীয়টীই বুঝি তাহার স্ত্রীকে কুপথগামিনী করিতে চেষ্টা করি-তেছে। তখন ঔষধ ফেলিয়া দিয়া বদ্ধমুষ্টি রাম-চরণ তাহার আত্মীয়কে আক্রমণ করিল।

ইতিপূর্ব্বেই রামচরণের আত্মীয়ের মুখ হইতে রামচরণের স্ত্রী তাহার দুরদৃষ্টের কথা শুনিয়াছিল, এখন আবার রামচরণের যে বুদ্ধি-বিকৃতি হইয়াছে, তাহা আর রামচরণের স্ত্রীর বুঝিতে বাকী রহিল না। সে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। আর সে দৃশ্য দেখিয়া রামচরণের আত্মীয়ও চক্ষের জল সংবরণ করিতে পারিলেন না।

স্ত্রীর ক্রন্দনে হঠাৎ যেন রামচরণের চমক ভাঙ্গিল। হঠাৎ বিগত ঘটনাবলী আবার উজ্জ্বল হইয়া তাহার মনে দীপ্ত হইল। রামচরণ তাহার আত্মীয়ের পায়ে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল।

পুনরাবৃত্ত-সংজ্ঞ হইয়া রামচরণ আর সে বিপদ-সাগরে কিনারা দেখিতে পাইল না। রাম-চরণের স্ত্রীর সঙ্কট পীড়া। ইহ-জগতে জীবনের সঙ্গিনী বুঝি ইহজন্মের মত ছাড়িয়া যায়! নিজের শরীর চিন্তায়, ক্ষুধায়, তৃষ্ণায় অবসন্ন। রামচরণের সহায় নাই, লোকবল নাই, সম্পত্তি নাই। তার উপর শিরে সংক্রান্তি। দু-দিন পরে মোকদ্দমা। রামচরণ একমনে কি ভাবিতে ভাবিতে উপরের দিকে চাহিল। ভাবিল এ দিন কি তাহার কাটিবে না?

রামচরণ কখন আদালত দেখে নাই। রাম-চরণের বিশ্বাস ছিল, আদালত ধর্ম্মের স্থান,—আদালতে মিথ্যা টিকে না। রামচরণ মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় নাই। তবে তাহার কিসের ভয়? কয়জন কুচক্রীর ষড়যন্ত্রে, না হয়, তাহার কিছু কষ্ট হইয়াছে, কিন্তু পরিণামে ধর্ম্মের জয়। এবার গেলেই রামচরণের মুক্তি, ইহার আবার তদ্বির-তাগাদা কি? রামচরণ অকাট্য যুক্তির ভিত্তিতে তাহার দৃঢ় বিশ্বাস বসাইল। পাগল খরস্রোতা নদীর স্রোত ফিরাইতে বালির বাঁধ বাঁধিল!

তবুও রামচরণের সুবুদ্ধি আত্মীয় রামচরণের কথা বুঝিল না—মানিল না; উকীল নিযুক্ত করিতে বড়ই পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। রামচরণের স্ত্রী তাহার সঙ্গে যোগ দিল। রাম-চরণের দৃঢ় বিশ্বাস এ পর্য্যন্তও টলে নাই, তবে তাহাদের কথায় বাধ্য হইয়া রামচরণ উকীল নিযুক্ত করিল।

এ পর্য্যন্ত কবিরাজ মহাশয়ই একাকী রাম-চরণের সঞ্চিত ধন শোষণ করিতেছিলেন, এখন

আবার উকীল বাবু তাহার উপর ভাগ বসাইলেন। লক্ষ্মীর বরপুত্রদের আগমনে এতদিন পর্য্যন্ত যাহা হয় নাই—তাহাই হইল। রামচরণের হেলে যোড়াটী বিক্রয় হইল। স্বটীবাটী সুদখোর মহাজনের ঘরে পড়িল। চাষের জমী 'কট-কোবালা'য় চৌহদ্দী সমেত উঠিল। ধানভরা মড়াই শূন্যগর্ভ হইল। উনুনের হাঁড়ি শিকায় উঠিল। ইহজগতে, ইহজন্মে রামচরণের ভাগ্যে আর সে শিকা ছেঁড়ে নাই।

---

(৫)

সেদিনের বিপদে হাবুডুবু খাইয়া চক্ষে অন্ধকার দেখিয়া রামচরণ ভগবান্‌কে ডাকিয়াছিল,—"এ বিপদের দিন তিনি কি কাটাইবেন না?" রামচরণ ভাবে নাই যে, ইহার উপর তাহার আরও বিপদ হইতে পারে, ইহার উপর নূতন দিন আরও নূতন বিপদ প্রসব করিতে পারে। হায়! রামচরণ! যদি একবার ভাবিয়া দেখিতে, এ সংসারে খোঁড়ার পা'ই খালে পড়ে, বিধবারই সন্তানটী মারা যায়, আর যেখানে সৌভাগ্য—সেইখানেই শুধু জলে জল বাধে।

রামচরণের আত্মীয়টী মোকদ্দমার তদ্বির করিতেছে দেখিয়া, জমিদার বাবুর একটা আশঙ্কা হইয়াছিল। তার উপর যখন তাঁহারা শুনিলেন যে, রামচরণের মোকদ্দমায় উকীল নিযুক্ত হইয়াছে, অমনি তাঁহাদের লোক রামচরণের সেই আত্মীয়টীর বাড়ী যাওয়া-আসা করিতে লাগিল। সে নাকি রামচরণের উদ্ধার-সঙ্কল্পে বড় বদ্ধপরিকর হইয়া লাগিয়াছিল, তাই জমিদারের আমলায় প্রথম প্রথম বড় আমল পায় নাই। তাই হঠাৎ একদিন তাহার ক্ষেতের ধান লুট হইয়া গেল, তাহার খোড়ো ঘরটী পুড়িয়া গেল, তার উপর কয় নম্বর খাজনার মোকদ্দমা রুজু হইল। বেগতিক দেখিয়া রামচরণের আত্মীয় জামিন-নামায় ইস্তফা দিলেন। রামচরণের অদৃষ্টে আবার হাজতের সুখভোগ আসিয়া জুটিল। সেই রুগ্ন স্ত্রীকে অসহায় অবস্থায় একা ঘরে ফেলিয়া যাইতে রামচরণের মনে কি হইয়াছিল, তাহা রামচরণ ভিন্ন আর কেহ জানে না।

হাজত-সুখ-ভোগের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে মোকদ্দমার ধার্য্য দিন উপস্থিত হইল। অমনি হাজত হইতে আসিয়া রামচরণ আদালতে দাঁড়াইল। নিজের মোকদ্দমা হইবার আগে রামচরণ সেই আদালতে দাঁড়াইয়াই আর দুইটী মোকদ্দমা দেখিবার সুবিধা পাইয়াছিল। সেইখানে অর্থী-প্রত্যর্থীর তদ্বির, উকীল-মোক্তারের বাচালতা, আমলা-ফয়লাদের ব্যবহার দেখিয়া, রামচরণের বুদ্ধি-শুদ্ধি লোপ হইয়া গেল। তখন রামচরণ ভাগ্যে সেই আত্মীয়টীর পরামর্শে উকীল নিযুক্ত করিয়াছিল বলিয়া আশ্বস্ত হইল। কনষ্টেবলের জিম্মায় থাকিয়াও রামচরণ তাহার উকীলের মুখ দেখিতে পাইয়াছিল। রামচরণের উকীলের বড় মুখ, আদালতে রামচরণ তাহার বড়ই পসার দেখিল।

দেখিতে দেখিতে রামচরণের মোকদ্দমার ডাক হইল। রামচরণ অপরাধীর কাঠগড়ায় যোড়হাতে দাঁড়াইল। আর অমনি রামচরণের সেই পসারওয়ালা উকীল বাবুকে একটী লোক আর এক মোকদ্দমায় তাহার ডাক হইয়াছে বলিয়া লইয়া গেল। কাঠগড়ার আসামী রামচরণ ফ্যাল ফ্যাল করিয়া উকীল বাবুর দিকে চাহিয়া রহিল। ইহারই কিঞ্চিৎ আগে উকীল বাবুকে জমিদারের লোকের সঙ্গে পরামর্শ করিতে দেখা গিয়াছিল। লোকে আরও বলে,—এ মোকদ্দমায় উকীল বাবু নাকি জমিদারের পক্ষ হইতে যৎকিঞ্চিৎ রজতমুদ্রা দক্ষিণা পাইয়াছিলেন। তা লোকে বলে বলুক, আমি কিন্তু তাই বলিয়া কাগজপত্রে সে কথা লিখিয়া হুগলী-ঘর করিতে পারিব না।

বড় আশা করিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়া রামচরণ উকীল দিয়াছিল, আজ তাহার বড় আশায় ছাই পড়িল।

রামচরণের এক কথার মোকদ্দমা এক কথায় শেষ হইয়া গেল, কেহ তাহার হইয়া এক কথাও বলিল না। রামচরণ আপনাকে নির্দ্দোষ বলিতে গেলে, কেহ তাহার কথায় কর্ণপাতও করিল না। বিনা বাক্যব্যয়ে (দোষী!) রামচরণের চারি মাস কয়েদের হুকুম হইয়া গেল।

তারপর কাঠগড়া হইতে নামাইয়া একটা কনষ্টেবল যখন রামচরণের হাতে লোহার হাতকড়া লাগাইতেছিল, যখন জ্ঞানহীন, শোকে দুঃখে ক্ষিপ্ত রামচরণ আপনার মরণ কল্পনা করিয়া নিমেষ-শূন্য চক্ষে তাহার হাতে হাতকড়া পরান দেখিতেছিল, তখন হঠাৎ মর্ম্মভেদী করুণ তীব্র চীৎকারে আদালত প্রতিধ্বনিত হইল। "ধর্ম্মাবতার ওঁর কোন দোষ নাই, ওঁর বদলে আমায় জেলে দিন" বলিয়া আলুলায়িত-কেশা, মুক্তবসনা একটী রমণী জনতা ভেদ করিয়া আসিয়া রামচরণের পদপ্রান্তে পড়িয়া গেল। রামচরণের রুগ্না পত্নীর সেই তীব্র চীৎকার আজও আমার কাণে বাজিতেছে, সে চীৎকার আজও ভুলি নাই, কালও ভুলিব না; বুঝি জনমে ভুলিতে পারিব না। রামচরণের সে দুর্দ্দশা নিজের চক্ষে না দেখিলে বুঝি তাহার দুঃখ ষোল কলা পুরে না, তাই আজ হতভাগিনী রামচরণ-পত্নী নিজের রোগ উপেক্ষা করিয়াও আদালতে আসিয়াছিল।

আদালতে বড় একটা গোল বাধিয়া গেল। পাছে রামচরণের স্ত্রীর সে অবস্থা দেখিয়া হাকিমের দয়া হয়, তাই ভাবিয়া কে একজন কোথা হইতে আসিয়া রামচরণের স্ত্রীকে কোথায় লইয়া গেল।

"জন্মের মত বুঝি শেষ দেখা" ভাবিতে ভাবিতে কনষ্টেবলের সঙ্গে রামচরণের মূর্ত্তি সে ধর্ম্মাধিকরণ হইতে অপসৃত হইয়া গেল।

---

(৬)

তোমরা অনেকক্ষণ আমার গল্পে "হুঁ" দাও নাই। বুঝি ঠাকুরদাদার "আষাঢ়ে গল্প" ভাল লাগে নাই। তা আমি কি করিব, "আষাঢ়ে গল্প" "আষাঢ়ে গল্পের" মতই হইবে। এ গরীব-চাষার জীবনে কমলিনীর "মুচকে হাঁসি", রাজনন্দিনী বিনোদিনীর "প্রণয়ের বাঁশি" আমি কোথায় পাইব? যাই হউক, তোমরা আর দু-পাঁচ বার আধ-ঘুমন্ত ভাবে আমার গল্পে "হুঁ" দিয়া যাও, আমি গল্পটা শেষ করিয়া ফেলি।

রামচরণের স্ত্রী কোথায় কি অবস্থায় আরোগ্য হইয়াছিল, তাহা তাহার স্মরণ নাই; কিন্তু আরোগ্য হইয়া সে আবার গ্রামে ফিরিয়া আসিল।

রামচরণের স্ত্রী দেখিল, তাহাদের ভিটাটী সমভূমি হইয়া গিয়াছে, সাধের ঘরটুকু কোথায় উড়িয়া গিয়াছে। উনুনশালে যেখানে নিকাইয়া-চুকাইয়া রামচরণের স্ত্রী বড় পরিষ্কার করিয়া রাখিত, সেখানে কতকগুলি উইএর ঢিবি উঠিয়াছে। শুইবার ঘরে আগাছা জন্মিয়াছে। গোয়ালঘরে শৃগালে গর্ত্ত করিয়া বাসা করিয়াছে। রামচরণের স্ত্রীর চক্ষে জল আসিল, সে কতক্ষণ সেখানে বসিয়া বসিয়া কাঁদিল।

অনেকক্ষণ পরে রামচরণের স্ত্রী উঠিয়া দেখিল সবই গিয়াছে, খালি পেটের জ্বালা যায় নাই। ভাবিয়া ভাবিয়া সে একজনের বাড়ী গিয়া দুটী ভাত চাহিল, তাহারা একদিন দুটী ভাত দিয়া পরদিন তাড়াইয়া দিল। নিতান্ত নিরুপায় হইয়া রামচরণের স্ত্রী ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিল। কিন্তু যুবতী রামচরণের স্ত্রীকে কে রোজ ভিক্ষা দিবে? আজ যে বাড়ী ভিক্ষা মিলিত, কাল সে-বাড়ী আর ভিক্ষা মিলিত না।

রামচরণের স্ত্রীর কখন একসন্ধ্যা অন্ন জুটিত, কখন জুটিত না। সকলে রামচরণের স্ত্রীকে খাটিয়া খাইতে বলিত শুনিয়া সে একদিন মজুরদের সঙ্গে ছয় পয়সায় খাটিতে গেল। সেখানে রামচরণের স্ত্রীকে সকল পুরুষ-মজুরেরা ঠাট্টা-তামাসা করিতে লাগিল, রামচরণের স্ত্রী দশ-পয়সার চোখের জল ফেলিয়া মজুরির পয়সা না লইয়াই ফিরিয়া আসিল। এই সময় জমিদারের শকুনির দলের একজনের হঠাৎ একজন চাকরাণী দরকার হইল। রামচরণের স্ত্রী খুসি হইয়া দাসীবৃত্তি করিতে গেল। সেখানে তাহার দিন দিন যত্ন বাড়িতে লাগিল, আর দাসীবৃত্তি করা দূরে থাকুক, অন্যলোকে তাহারই পরিচর্য্যা করিতে লাগিল। লজ্জায় রামচরণের স্ত্রী সেখান হইতে পলাইয়া আসিল।

এবার ক্রোধে, দুঃখে, ক্ষোভে ম্রিয়মাণা রামচরণের স্ত্রী অনাহারে উপবাসে রাস্তার উপর আসিয়া পড়িয়া রহিল। ইচ্ছা যে, শৃগাল-কুকুরে আসিয়া তাহাকে খাইয়া যাক্, কিন্তু সে সুখ তাহার কপালে ঘটিল না। রাত্রে শৃগাল-কুকুর কাছে আসিলে রামচরণের স্ত্রী ভয়ে উঠিয়া দাঁড়াইল, বনচর পশুরা পলাইয়া গেল।

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া রামচরণের স্ত্রী যে বাড়ীতে দাসীবৃত্তি ছাড়িয়া আসিয়াছিল, পেটের জ্বালায় আবার সেইখানেই দাসীপনা করিতে গেল। এবার সেখানে গিয়া গ্রামের আরও কতকগুলি স্ত্রীলোক দেখিল। তাহারা ভাল কাপড় পরিয়া, ভাল গহনা পরিয়া বড় সুখ-স্বচ্ছন্দে দিন কাটাইতেছিল। রামচরণের স্ত্রীকে দেখিয়া তাহারা নিজেদের সৌভাগ্যের কথা বলিল। রামচরণের স্ত্রীকে কত গহনার লোভ, কত টাকার লোভ, কত সুখের লোভ দেখাইল। কয়েদ-খালাসী রামচরণের ঘরে আর তাহার অন্ন জুটিবে না বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিল। রামচরণের স্ত্রী প্রথম প্রথম ঘৃণায় তাহাদের সঙ্গে কথা কহিত না, ক্রমে তাহাদের সঙ্গে কথা কহিতে শিখিল।

এদিকে দেখিতে দেখিতে ছয় মাস কাটিয়া গেল, তবু রামচরণ ফিরিল না। অমনি গ্রামে 'জেলে রামচরণের মৃত্যু-সংবাদ' রাষ্ট্র হইল। অনেকে দয়া করিয়া সে সংবাদ রামচরণের স্ত্রীকে আনিয়া দিল। রামচরণের স্ত্রী এতদিন সিঁতিতে সিন্দূরের বলে যে লোভ সংবরণ করিয়াছিল, আজ সেই সিঁতির সিন্দূর মুছিল।

জেলে থাকিয়া একদিন স্ত্রীকে স্বপ্ন দেখিয়া হতভাগ্য রামচরণ তাহার স্ত্রীকে দেখিবার জন্য বড় ব্যস্ত হইয়াছিল। আসিতে দেয় নাই বলিয়া উন্মনা হইয়া প্রহরীদের উপর অত্যাচারও করিয়াছিল। সেই অপরাধে রামচরণের আর ছয় মাস কারাদণ্ড বৃদ্ধি হয়। তাই আজ ছয় মাস ফুরাইলেও রামচরণের কারাদণ্ড ফুরায় নাই।

রামচরণের স্ত্রী যাহাদের বাড়ী দাসী হইয়া গিয়াছিল, সেখানকার লোকেরা রামচরণের মৃত্যু-সংবাদ লইয়া তাহার স্ত্রীর অদৃষ্টের ভবিষ্যৎ ঘন-অন্ধকার গাঢ়তর করিয়া দেখাইতে লাগিল। কতদিন যাইতে যাইতে সে নিরাশ দগ্ধ হৃদয়ে সে মেঘের ঘন অন্ধকারে বিদ্যুৎ খেলিল। ধীরে ধীরে সেই কালো আকাশ আলো করিয়া রামচরণের স্ত্রীর হৃদয়ে ভোগ-লালসা প্রবেশ করিল। অভাগিনী জন্মের মত মরিল।

---

(৭)

সংসারে যাহা একবার যায়, তাহা আর ফিরে না; যাহা একবার ভাঙ্গে, তাহা আর গড়ে না। রামচরণের "সেদিন" গিয়াছে, আর "সেদিন" ফিরিবে কেন? তাহার কপাল একবার ভাঙ্গিয়াছে, আবার সে গড়িবে কেন?

তবুও 'সেদিন" ফিরিয়া পাইবার আশায়

মুগ্ধ রামচরণ আবার তাহার ভাঙ্গা কপাল লইয়া বৎসরান্তে গ্রামে ফিরিল। তখন রামচরণের স্ত্রী যে ঐশ্বর্য্য কখন স্বপ্নেও দেখে নাই, সেই ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী। সে রামচরণকে ফিরিয়াও দেখিল না। তবু রামচরণ তাহার স্ত্রীর সন্ধানে ফিরিতে লাগিল। যাহাকে একদিনের তরে স্বপ্নে দেখিয়া রামচরণ ছয় মাস কারাগারের যন্ত্রণা ভোগ করিতে পারিয়াছে, আজ তাহার আশা ছাড়িতে পারে কৈ? পাগল রামচরণ, কোন্ দিন কাহাকে স্ত্রী বলিয়া যত্ন করিতে শিখিয়াছিল, আজ তাহারই ছায়ার অনুসরণ করিতে লাগিল।

অনেক কষ্টে, অনেক যত্নে, অনেক কলে অনেক কৌশলে শেষে রামচরণ একদিন তাহার স্ত্রীর দেখা পাইল। সে দেখায় কিন্তু তাহার শুধু বুক ফাটিল, মুখ ফুটিল না। অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী স্ত্রীর সম্মুখে নির্ব্বাক্ নিঃস্পন্দ চিত্রার্পিত রামচরণের মুখে বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। কিন্তু যে তাহার সর্ব্বনাশ করিয়াছে, তাহার সর্ব্বনাশ করিতে রামচরণ কৃতসঙ্কল্প হইল।

যে বাগান-বাটীতে রামচরণের স্ত্রী থাকিত, সেইখানকার এক পাঁদাড়ে অমাবস্যার অন্ধকার রাত্রে রামচরণ লুকাইয়া রহিল। রাত্রি দুই প্রহরের সময় একখান পাল্কি আসিতেছে দেখিয়া রামচরণ লাঠী লইয়া সসজ্জ হইল। কিন্তু হৃদয়ের দুর্দ্দমনীয় বেগ সে আর দমন করিতে পারিল না। পাল্কি হইতে কেহ না নামিতে নামিতে রামচরণ পাল্কি আক্রমণ করিল। লাঠীর চোটে দুই জন বেহারার পা, এক জনের মাথা ভাঙ্গিয়া দিল। কিন্তু শেষে আর একজন রামচরণকে ধরিয়া ফেলিল। গোলযোগ দেখিয়া পাল্কির বাবুটী নামিয়া পড়িলেন। তাঁহার কেশাগ্রও ক্ষত হইল না।

তখনই হুলস্থূল পড়িয়া গেল। ডাকাত রামচরণকে পাঁচ সাত জনে মিলিয়া বাঁধিয়া ফেলিল। তাহাদের হাত হইতে ছিনাইয়া দুই এক বার রামচরণ পাল্কির বাবুটীকে আক্রমণ করিতে গিয়াছিল। রীতিমত "উত্তম মধ্যম" খাইয়া শেষে নিরস্ত হইল। বদ্ধ-হস্ত-পদ রামচরণ ক্রোধে ফুলিতে ফুলিতে এতক্ষণ মাটীর দিকে চাহিয়া ছিল। যখন দেখিল যে, সে গোলে তাহার স্ত্রীও বিপক্ষদলে মিশিয়াছে, তখন বালকের মত উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল। তাহার সে তপ্ত অশ্রুতে মাটী ভিজিল, কিন্তু উপস্থিত কাহারও মন ভিজিল না।

তখন দেখিতে দেখিতে চৌকিদার আসিল, কনষ্টেবল আসিল, পুলিস আসিল। তাহারা লাঠীর গুঁতা দিতে দিতে "শালা, শ্বশুরা" প্রভৃতি মিষ্ট কথায় রামচরণকে সম্বোধন করিতে করিতে থানায় লইয়া গেল। সেখানে আবার হাতে হাতকড়ি পরিয়া ভিজা মাটীতে বসিয়া বসিয়া মশার কামড় সহ্য করিতে করিতে রামচরণের সমস্ত রাত্রি কাটিল। মৃত্যু কামনা করিয়া কপালে হাতকড়ি মারিয়া মরিতে এখনও রামচরণের সাহস হইল না। এখনও রামচরণের স্ত্রীর রূপ তাহার মনে জাগিতেছিল। চাষা রামচরণ ভাবিল,—চাষার মেয়েকে গহনা পরিলে কি এত সুন্দর দেখায়?

আবার আসামী-শ্রেণীতে ভুক্ত হইয়া রামচরণ আদালতে গেল। আবার তাহার বিরুদ্ধে দলে দলে লোক সাক্ষী দিতে আসিল। সেই সাক্ষীদের মধ্যে রামচরণের স্ত্রীও ছিল। অন্যান্য সাক্ষীদের জবানবন্দীর সময় রামচরণ নিস্তব্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া ছিল, কিন্তু তাহার স্ত্রীর জবানবন্দীর সময় আদালতে কাঁদিয়া বড় গোল করিল। সে গোলে অনেকে চক্ষু মুছিল। হাকিমের মন শুদ্ধ কতক্ষণের জন্য গোলমাল হইয়া গেল। কিন্তু সে কতক্ষণ, শুদ্ধ কতক্ষণের জন্য। অল্পকাল পরে প্রহরি-পরিবেষ্টিত হইয়া রামচরণ

জেলে গেল। আর পাল্কী করিয়া রামচরণের স্ত্রী বাগানে গেল।

রামচরণের দ্বিতীয় বার জেল হইবার পরে গ্রামের দু-একটা বয়াটে ছেলে, দু-একটা বুড়ী-মাগী কিছু কাণাঘুষা করিয়াছিল। কিন্তু দেশের মুখপাত্র খবরের কাগজওয়ালারা লিখিয়াছিলেন, —"অমুক গ্রামের অমুক জমিদারের সাহায্যে পুলিশ ডাকাইত দমন করিতে পারিয়াছে। জমিদারেরা ডাকাইত দমনে সাহায্য করিলে দেশের অনেক মঙ্গল।"

যাহা হউক অপরাধী রামচরণ জেলে গেল, পৃথিবী ঠাণ্ডা হইল। লোকের হাড় জুড়াইল।

---

(৮)

নূতনের আদর দুদিনের বেশী নয়, তাই রামচরণের স্ত্রীর আদর কমিতে লাগিল। এখন তাহার আর বড় কথা থাকে না। এখন লোকে আর বড় তাহার প্রিয়প্রাত্র হইতে চেষ্টা করে না। রামচরণের স্ত্রী যে একথা বুঝিতে পারে নাই, তাহা নহে; তবে কোন কিছু করিবার সুবিধা পায় নাই। একদিন অবশেষে সুবিধা পাইয়া কতকগুলি গহনাপত্র চুরি করিয়া জমিদারের এক শকুনির সঙ্গে ভাসিল। শকুনি দুদিনের পর গহনাগুলি হাত করিয়া রামচরণের স্ত্রীকে তাড়াইয়া দিল। তারপর আবার যা ছিল তাই। উঠিতে উঠিতে পাকা-ঘুঁটি কাঁচিয়া গেল।

বয়স বছর বছর বাড়িয়া চলে। রামচরণের স্ত্রীর বয়সও বাড়িয়া চলিতেছিল। সঙ্গে সঙ্গে সে রূপের ছটা, সে কেশের পারিপাট্য, সে লাবণ্যের ঘটাও লুকাইতেছিল। সে বিধাতার "মহামহিম পাঠ",—যে পাঠে মানুষ ঘাড় নোয়াইয়া ঈশ্বরের অনন্ত সৌন্দর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে পায়,—কোথায় ধীরে ধীরে মিশাইয়া যাইতে লাগিল। যে রূপ বিক্রয় করে, সে কিছু আর রূপের অধিকারী থাকে না; তাই রামচরণের স্ত্রীর রূপ গেল,—সে যৌবনে বৃদ্ধা হইল। সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি কদর্য্য রোগ আসিয়া তাহাকে ঘেরিল।

রামচরণের স্ত্রী আবার ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিল বটে, কিন্তু এখন আর রোজ ভিক্ষায় বাহির হইতে পারিত না। মাসের মধ্যে দশ দিন রোগের জ্বালায় অস্থির হইয়া গাছতলায় পড়িয়া থাকিত। তাহার উপর আবার কোথা হইতে বায়ুরোগ আসিয়া জুটিল। রামচরণের স্ত্রী ভিক্ষায় গিয়া অনেক আবোল-তাবোল বকিতে আরম্ভ করিল। তাহার এককালে ঐশ্বর্য্য ছিল, দাস-দাসী ছিল, গহনাপত্র ছিল, কত কি ছিল, সেই সব বলিয়া গৃহস্থকে জ্বালাতন করিত। ক্রমে গ্রামের ছেলেরা সে সব কথা টের পাইল। তাহারা রামচরণের স্ত্রীর নাম রাখিল—"বুড়ি রাণী"। "বুড়ি রাণী" বলিয়া ক্ষেপাইতে আরম্ভ করিলে রামচরণের স্ত্রীর দিক্-বিদিক্ জ্ঞান থাকিত না। সেদিন ভিক্ষা ত হইতই না, বেশীর ভাগ ছেলেদের বেশী গাল-মন্দ দিলে, চড়টা চাপড়টাও বিনামূল্যে মিলিত।

দিন দিন অন্নাভাবে রামচরণের স্ত্রী কৃশ হইতে লাগিল, কিন্তু কৈ ত মরিল না। ক্রমে তাহার ভেদাভেদ-জ্ঞান রহিত হইতে লাগিল; এখন সে আর শৃগাল-কুকুরের সঙ্গে এক জায়গায় বসিয়া উচ্ছিষ্ট অন্ন খাইতে আপত্তি করিত না। এক কথায় রামচরণের স্ত্রীর দুর্দ্দশার অবধি ছিল না।

রামচরণের স্ত্রীর পরিণাম বড় ভয়ঙ্কর। সে জীবন্ত নরকের জলন্ত প্রতিমূর্ত্তি আর শেষে লোকালয়ে স্থান পাইত না। যেখানে যাইত, সেইখান হইতেই দূরীকৃত হইত। সে অস্থি-পঞ্জরের সমাহার দেখিয়া লোকে চমকিত, সে বিকট হাস্যে শিশু ভয় পাইত, সে গায়ের গন্ধে ভূত পলাইত। আমরা আর তাহাকে চক্ষের সামনে রাখিতে পারি না।

কিন্তু যাহারা রামচরণের স্ত্রীর এদশা করিল, তাহাদের দশা কি হইতেছে, একবার দেখিতে হয়। এই বর্ষায় যদি রাধানগর গ্রামের ভিতর পর্য্যন্ত না যাইতে পার, তবে এইখানে, এই গ্রামের প্রান্তভাগে দাঁড়াইয়া শোন দেখি, বৈঠকখানা হইতে তেমনি উচ্চ হাসির ধ্বনি শোনা যায় কিনা? হায় সভ্যতা! হায় পৃথিবীর ধন!! যদি কিছুতে স্রষ্টার সৃষ্টি বিপর্য্যস্ত করিয়া থাকে, তবে সে আর কিছু নয়, কেবল তুমি!

---

(৯)

তোমরা ঘুমাইয়াছ বলিয়া আমি এইখানেই আমার "আষাঢ়ে-গল্প" শেষ করিয়াছিলাম, এখন আবার "তার পর কি হইল" জিজ্ঞাসা করিলে বলিতে পারিব কেন? আমি আমার সেই ছেলে বেলার "কেন" ভাবিতে ভাবিতে আমার "খেই" হারাইয়া ফেলিয়াছি। তবে যদি বড় বেশী পীড়াপীড়ি কর, তবে এক কথায় বলিয়া রাখি, "তার পর" যা হবার তা হইল। যে বাগান-বাড়ীতে রামচরণের স্ত্রী ঐশ্বর্য্যভোগ করিয়াছিল, একদিন সকালে গ্রামের সব লোক সেই বাগান-বাড়ীর দরজায় একটা নগ্নদেহ দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিল। অনেক কালের বুড়া রামধন সে দেহটা দেখিয়া গোপনে তাহার স্ত্রীর কাণে কাণে বলিয়াছিল যে, সেটা রামচরণের দেহ, তবে গ্রামের লোকে সে সন্ধান পায় নাই। দেহটার মাথায় একটা লাঠির আঘাতচিহ্ন ছিল, কিন্তু অনেক অনুসন্ধানের পর গলায়-দড়ি সাব্যস্ত হইয়া লাস জ্বালান হইয়া গেল। "তার পর" সব গোলমাল চুকিয়া গেল, জমিদার বাবুর জয়জয়কার হইল, গ্রামের লোক দেখিয়া শুনিয়া, ঠেকিয়া শিখিয়া, ধনের ঐশ্বর্য্যের পূজা করিতে শিখিল। পৃথিবী যেমন ছিল, তেমনি চলিতে লাগিল। "তার পর"—

আমার কথাটি ফুরাল
'নটে'-গাছটি মুড়াল
ইত্যাদি ইত্যাদি

কেমন এই বর্ষায় "আষাঢ়ে-গল্প" ভাল লাগিল ত?

শ্রীনারায়ণচন্দ্র সেন।

ঋষি।

(১)

গৌতম।

[গত জ্যৈষ্ঠ মাসের জন্মভূমিতে ৩৩৬ পৃঃ টীকায় মৎস্যপুরাণের—

"বৃহস্পতিং গৌতমঞ্চ সংবর্ত্তমৃষিসত্তমম্।
উতথ্যং বামদেবঞ্চ অজস্যমুশিজং তথা॥"

এই বচনটী উদ্ধৃত হইয়াছে। এই বচনের শেষ পাদে 'অজস্য' আছে, উহা কিন্তু অশুদ্ধ; 'অযাস্য' হইবে। সুতরাং অঙ্গিরার অন্যতম পুত্র 'অজস্য' নহেন, 'অযাস্য'।

লিপিভ্রমে তত্ত্বভ্রম যেন কাহারও না হয় এই অভিপ্রায়ে আবার বলিতেছি, অঙ্গিরার সাত পুত্র;—বৃহস্পতি, গৌতম, সংবর্ত্ত, উতথ্য, বামদেব, অযাস্য এবং উশিজ।]

মহর্ষি গৌতমের আর এক আশ্রম ছিল দক্ষিণাপথে। সম্ভবতঃ সেই স্থানে তপঃসিদ্ধি-লাভের পর গৌতম মিথিলাতে আগমন করেন। শিবপুরাণে কথিত আছে, বহুবৎসর অনাবৃষ্টি বশতঃ প্রজাক্ষয় আরম্ভ হইলে, গৌতম তপস্যা দ্বারা বরুণের সন্তোষ-সাধন করিয়া পৃথিবীর অনাবৃষ্টি দূর করিবার জন্য প্রার্থনা করেন। বরুণ "দৈববিধান অন্যথা করা অনুচিত" বলিলে,

গৌতম অগত্যা নিজ-আশ্রম-সমীপবর্ত্তী প্রাণিগণের উপকারার্থ বলিলেন,—"তবে এই আশ্রমে জলের অসদ্ভাব দূর করুন।" বরুণ "তথাস্তু" বলিয়া এবং উপযুক্ত উপদেশ দিয়া অন্তর্হিত হইলেন। তখন একটী গর্ত্ত অক্ষয় জলের ভাণ্ডার হইল। আশ্রমবাসী মুনি-ঋষিগণ সকলেই সেই জলে আপ্যায়িত হইতে লাগিলেন। নানাস্থানের মুনিগণ তথায় আসিয়া অনাবৃষ্টি-ক্লেশ হইতে উদ্ধার পাইলেন। একদা গৌতম-শিষ্যগণ, জল-আনয়নার্থ তথায় গিয়াছিলেন, ঋষিপত্নীরা তাঁহাদিগকে জল লইতে দেন নাই। শিষ্যগণ প্রত্যাবৃত্ত হইলে, গৌতমপত্নী অহল্যা জল আনিয়া দিলেন। অহল্যা স্বামীকে কি কাহাকেও কোন কথা বলিলেন না।

কিন্তু ঋষিপত্নীরা ঋষিগণের নিকট কত-প্রকার করিয়া অহল্যার নিন্দা করিলেন। অহল্যা তাঁহাদের কতই অপমান করিয়াছেন এইরূপ বলিলেন। ঋষিরা প্রথমে বিচলিত হন নাই, পরিশেষে তাঁহাদেরও মন টলিল। দারুণ ঈর্ষার বশবর্ত্তী হইয়া অহল্যা ও গৌতমের সর্ব্বনাশ-সাধনে ঋষিরা প্রবৃত্ত হইলেন। ঋষিরা তপস্যাবলে গণেশের নিকট বর পাইলেন। সেই বরপ্রভাবে বাধ্য হইয়া ভক্তবৎসল গণেশ গো-রূপে গৌতমক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়া শস্যনাশে প্রবৃত্ত হইলেন। গৌতম, নিবারণাভিপ্রায়ে, গোগাত্রে কুশমুষ্টিক্ষেপ করিবামাত্র মায়া-গো মায়াবলে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। গৌতম একেবারে জ্ঞানশূন্য হইলেন। ষড়যন্ত্রকারী ঋষিরা আসিয়া ধিক্কার দিতে লাগিলেন। তাঁহারা মিলিত হইয়া অহল্যা এবং গৌতমকে আশ্রম-বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। তৎপরে মহর্ষি গৌতম ধর্ম্মমর্য্যাদানুসারে সেই ঋষিগণের নিকটেই প্রায়শ্চিত্ত-ব্যবস্থা গ্রহণ করিলেন; তাঁহারা ব্রহ্মগিরি প্রদক্ষিণ, শিব পূজা এবং গঙ্গাস্নান করিতে ব্যবস্থা দিলেন।

মহর্ষি গৌতম যথাবিধি প্রায়শ্চিত্ত করিতে লাগিলেন, গৌতমের শিষ্য-প্রশিষ্যগণ তদ্বিষয়ে সাহায্য করিতে লাগিলেন। নিষ্পাপ মহর্ষি গৌতমের পূজায় ভগবান্ মহেশ্বর প্রীত হইয়া সশরীরে তাঁহার সম্মুখবর্ত্তী হইলেন এবং বলিলেন,—"তুমি নিষ্পাপ, ঋষিগণের এই প্রকার ষড়যন্ত্রে তোমাকে ক্লেশভোগ করিতে হইয়াছে।" শিব ঋষিগণের সমস্ত ব্যাপার বর্ণনা করিলেন। গৌতম বলিলেন,—"তা হউক, তাঁহাদের জন্যই ত, প্রভু! আমি আপনার সন্দর্শন প্রাপ্ত হইলাম; তাঁহারা আমার উপকারই করিয়াছেন। আর লোকশুদ্ধির জন্য আমাকে প্রায়শ্চিত্তও সমাপন করিতে হইবে।" শিব বলিলেন,—"তোমার অভিলষিত বর প্রার্থনা কর।" গৌতম, গঙ্গা প্রার্থনা করিলেন। শিবের আদেশে গঙ্গা গৌতমকে স্নান করাইতে সম্মতা হইলেন, কিন্তু সেই মুনিগণকে পাপমুক্ত করিতে সম্মতা হইলেন না। পরিশেষে মহর্ষি গৌতমের অনুনয়-বিনয়ে বাধ্য হইয়া গঙ্গা সেই আশ্রম-সমীপে প্রবাহিতা হইলেন। গৌতম সব জানিতে পারিয়াছেন জানিয়া ঋষিরা অতিশয় লজ্জিত হইলেন। যাহা হউক, গঙ্গাস্নানে তাঁহারাও পবিত্র হইলেন। অহল্যা এবং গৌতমকে সকলে পূজা করিতে লাগিল। এই গঙ্গা গোদাবরী। মহারাষ্ট্রদেশে গোদাবরীর গঙ্গা নাম—প্রসিদ্ধ। গৌতমের আনীত বলিয়া গোদাবরীর অপর নাম গৌতমী।*

* পুরা ঋষিবরশ্রেষ্ঠো গৌতমো নাম বিশ্রুতঃ।
যস্য পত্নী পরা সাধ্বী হ্যহল্যা নাম বিশ্রুতা॥
তয়া সহ ঋষিশ্রেষ্ঠস্তপশ্চক্রে সুশোভনম্॥
দক্ষিণস্যাং দিশি যো বৈ গিরির্ব্রহ্মেতিসংজ্ঞিতঃ।
তত্র তেন তপস্তপ্তং বর্ষাণামযুতং ধ্রুবম্॥
কদাচিদ্বৈ হ্যনাবৃষ্টিরভবৎ সর্ব্বদুঃখদা।
বর্ষাণাঞ্চ শতং রৌদ্রং লোকা দুঃখমুপাগতাঃ॥
আর্দ্রঞ্চ পল্লবং নৈব দৃশ্যতে পৃথিবীতলে।
জলং নৈব বিদৃশ্যেত জীবানাং প্রাণধারকম্॥
তদা তে ঋষয়শ্চৈব মনুষ্যাঃ পশবস্তথা।

মহর্ষি গৌতম, মিথিলা-সমীপবর্ত্তী আশ্রম হইতে হিমালয়ে প্রস্থান করেন, ইহা রামায়ণে লিখিত আছে। সুতরাং দক্ষিণাপথে তাঁহার যে আশ্রম, তাহা পূর্ব্বের। এতদ্ভিন্ন আরও তিন

পক্ষিণশ্চ মৃতাঃ সর্ব্বে গতাশ্চৈব দিশো দশ॥
তদ্দৃষ্ট্বা ঋষয়ো বিপ্রাঃ প্রাণায়ামপরায়ণাঃ।
ধ্যানেনৈব তদা কেচিৎ কালং নিন্যুঃ সুদারুণম্॥
গৌতমোঽপি স্বয়ং তত্র বরুণার্থে তপঃ শুভম্।
চকার চৈব ষণ্মাসং প্রাণায়ামপরায়ণঃ॥
তস্মৈ তদা বরং দাতুং বরুণঃ স সমাগতঃ।
প্রসন্নোঽস্মি বরং ব্রূহি দদামি ঋষিসত্তম॥
ততশ্চ গৌতমস্তং বৈ বৃষ্টিঞ্চৈবার্থয়ৎ তদা।
ততঃ সোঽপি বচস্তস্মা উবাচ ঋষিসত্তমাঃ॥
বরুণ উবাচ।
দৈবাজ্ঞা চ সমুল্লঙ্ঘ্যা ব্রহ্মণা ন কথং ময়া।
অন্যৎ প্রার্থয় সুজ্ঞোঽসি তদহং করবাণি তে।
ইতি তদ্বচনং শ্রুত্বা গৌতমো বাক্যমব্রবীৎ॥
যদি প্রসন্নো দেবেশ যদি দেয়ো বরো মম।
তদহং প্রার্থয়াম্যদ্য কর্ত্তব্যং হি ত্বয়া তথা॥
মহতামাশ্রয়ঃ পুংসাং মহত্ত্বায়োপজায়তে।
মহান্তশ্চ স্বরূপঞ্চ পশ্যন্তি নেতরেঽশুভাঃ॥
শুভস্যাশ্রয়তস্তুচ্ছো লভতে বিবিধং ফলম্।
দারিদ্র্যং দূরতো যাতি সূর্য্যং দৃষ্ট্বা যথা তমঃ॥
দুঃখং শোকং ভয়ং পাপমুৎকর্ষং লভতে নরঃ।
যথা নরঞ্চ সেবেত তাদৃশং ফলমশ্নুতে॥
মৃগেশমন্দিরে সেবা মুক্তাফলকরী মতা।
শৃগালমন্দিরে সেবা হ্যস্থিলাভকরী বিদুঃ॥
উত্তমানাং স্বভাবোঽয়ং পরদুঃখসহিষ্ণুতা।
স্বয়ং দুঃখঞ্চ সম্প্রাপ্তং সহ্যতেঽন্যস্য বার্য্যতে॥
কল্পবৃক্ষস্বভাবো হি সজ্জনশ্চ জলাধিপ।
বৃক্ষঞ্চ হাটকঞ্চৈব চন্দনঞ্চেক্ষুকং তথা॥
পশ্যেদ্ভুবি পরার্থে তু কুশলাঃ সন্তি কেন চ।
দুঃখদগ্ধস্য যদ্দুঃখনাশনং স্বসুখায় বৈ॥
পরোপকারিণং দৃষ্ট্বা পাপং পাপা বিদূরতঃ।
ভবন্তি চ ঋষিশ্রেষ্ঠাঃ শ্রুতিরেষা সনাতনী॥
ইয়ঞ্চ পৃথিবী দেবী চতুর্ভির্ধার্য্যতে শুভা॥
যে দীনেষু দয়াং নিত্যং কুর্ব্বন্তি কৃপয়া যুতাঃ।
যেষাঞ্চৈব ন দর্পো বৈ জায়তে চ কদাচন॥
উপকারপরা যে চ জিতেন্দ্রিয়তয়া তথা।
মহাযৌবনব্যাধৌ চ স্বস্থাস্তিষ্ঠন্তি নিত্যশঃ॥
এতৈশ্চ পুণ্যস্তম্ভৈশ্চ ধার্য্যতে পৃথিবী পুনঃ।
ন কেবলঞ্চ শেষেণ ধৃতা চৈব ধরা স্বয়ম্।
তস্মাচ্চ জলরাজোঽসি দেয়ং সর্ব্বং ত্বয়া মম॥
ইদঞ্চ প্রার্থ্যতে মেঘজলং নিত্যফলপ্রদম্।
দেহি মে ত্বং মহারাজ কৃপাং যদি করিষ্যসি॥
ইতি সম্প্রার্থিতে তেন গৌতমেন মহাত্মনা।
উবাচ বচনং তস্মৈ গর্ত্তঞ্চ ক্রিয়তাং ত্বয়া॥
ইত্যুক্তঞ্চ কৃতং তেন জলেন পূরিতং তদা।
অক্ষয়ঞ্চ জলং তেঽস্তু তীর্থভূতং ভবেদিহ॥
তব নাম্না চ বিখ্যাতং ক্ষেত্রঞ্চৈব ভবিষ্যতি।
অত্র দত্তং হুতং জপ্তং শ্রাদ্ধঞ্চৈবাক্ষয়ং ভবেৎ॥
ইত্যুক্ত্বান্তর্দ্দধে দেবঃ স্তুতস্তেন মহাত্মনা॥
ততশ্চ গৌতমস্তত্র জলং প্রাপ্য সুদুর্লভম্।
নিত্যং নৈমিত্তিকং কর্ম্ম চকার বিধিবৎ তদা॥
ব্রীহীংশ্চৈব যবাংশ্চৈব নীবারানপ্যনেকধা।
বাপয়ামাস তত্রৈব হবনার্থং মুনীশ্বরাঃ।
জলঞ্চৈবাক্ষয়ং তত্র সুতশ্চৈব ঋষীশ্বরাঃ॥
বৃক্ষাশ্চ বিবিধাস্তত্র পুষ্পাণি চ ফলানি চ।
ধান্যানি বিবিধানীহ হ্যাসংস্তত্রাপ্যনেকশঃ॥
ঋষয়ো হ্যাগতাস্তত্র গৌতমানুমতাস্তদা।
পশবঃ পক্ষিণশ্চৈব সমাজগ্মুঃ সুখায় বৈ॥
তদ্বনং সুন্দরং হ্যাসীৎ পৃথিব্যা মণ্ডলে পরম্॥
ঋষয়োঽপি বনে তত্র শুভকর্ম্মপরায়ণাঃ।
বাসং চক্রুরনেকে চ পুত্রশিষ্যসমন্বিতাঃ।
বাপয়ামাসুর্ধান্যানি কালক্রমণহেতবে॥
ততশ্চৈবাত্র তে তস্য দুঃখং কালস্য নাবিদন্।
আনন্দং তদ্বনে হ্যাসীৎ প্রভাবাদ্গৌতমস্য চ॥
এবং জাতে তদা তত্র যজ্জাতং শ্রূয়তাং পুনঃ॥
কদাচিদ্গৌতমেনৈব জলার্থে প্রেষিতা গতাঃ।
শিষ্যান্ জলসমীপে তু গতান্ দৃষ্ট্বা ন্যষেধয়ন্॥
ঋষিপত্ন্যো বয়ং তত্র গ্রহীষ্যামো বিদূরতঃ।
পশ্চাচ্চৈব জলং গ্রাহ্যমিত্যেবং পর্য্যভর্ৎসয়ন্॥
পরাবৃত্য তদা তৈশ্চ ঋষিপত্ন্যৈ নিবেদিতম্।
সা চাপি তান্ সমাদায় সমাশ্বাস্য চ তাঃ স্বয়ম্।
জলং নীত্বা দদৌ তস্মৈ গৌতমায় তপস্বিনে॥
নিত্যং সম্পাদয়ামাস জলেন ঋষিসত্তমাঃ।
তাশ্চৈব ঋষিপত্ন্যশ্চ ক্রুদ্ধাস্তাং পর্য্যভর্ৎসয়ন্॥
স্বাম্যগ্রে বিপরীতঞ্চ তাভিঃ সর্ব্বং নিবেদিতম্॥
অহল্যা মানবী নাথ ভর্ৎস্যতে চৈব নিত্যশঃ।
বয়ঞ্চ জীবিতা যূয়ং নিঃস্থলাঃ স্থলতাং গতাঃ॥
অনৃতং সাহসং মায়া মূর্খত্বমতিলোভতা।
অশৌচত্বং নির্দ্দয়ত্বং স্ত্রীণাং দোষাঃ স্বভাবজাঃ॥
ধিগ্জীবিতঞ্চ ভবতাং তপশ্চ কিং ফলপ্রদম্।
অস্মাকং জীবিতং ধিক্ চাহল্যা নিত্যং প্রকুপ্যতি॥
ইতি তাসাং বচঃ শ্রুত্বা গাম্ভীর্য্যমবলম্বিতাঃ।
তস্যা বাক্যমিদং নৈব ভবিষ্যতি ভবেদিতি॥
সত্যং বদতি সা নো চেজ্জীবিতঞ্চ কুতো ভবেৎ।
কৃতঘ্নাশ্চ বয়ং সর্ব্বে যদ্যেনাং কুৎসিতং বচঃ।
ব্রবীমশ্চ কথং পুষ্টা যয়া চ জীবিতা বয়ম্॥
তাশ্চ পরস্পরং নিত্যং তস্মৈ ক্লেশপরায়ণাঃ।
সা চাপি বিনয়েনৈব তাসাঞ্চ কোমলং বচঃ॥
দুষ্টাস্তা ঋষিপত্ন্যশ্চ স্বামিভ্যঃ পর্য্যভর্ৎসয়ন্॥
কদাচিদ্বনচর্য্যায়া ঋষয়স্তে গতাঃ স্বয়ম্॥
দৈবযোগাৎ তয়া তত্র তাসাং দুঃখং নিবেদিতম্।
গৌতমাগ্রে বচঃ শ্রুত্বা দুঃখেন চ সমন্বিতাঃ।
সত্যং বদন্তি পত্ন্যশ্চ মেনিরে তে বচস্তদা॥

স্থানে গৌতমাশ্রম পাওয়া যায়। একটী জরাসন্ধ-রাজধানীর নিকটে, অন্যটী রেভিলগঞ্জের নিকটে এবং অপরটী জনকপুরীর নিকটে।

জরাসন্ধ-রাজধানীর নিকটবর্ত্তী যে গৌতমাশ্রম, তৎসম্বন্ধে বক্তব্য পরে প্রকাশ করিব।

সর্ব্বে তে চ মিলিত্বা তু পত্ন্যঃ সর্ব্বাস্তথা পুনঃ।
বিচারতৎপরা হ্যাসন্ ভাবিকর্ম্মপ্রসঙ্গতঃ॥
সূত উবাচ।
তৈশ্চ বিচারিতং যচ্চ শ্রূয়তামৃষিসত্তমাঃ।
ময়া চ কথ্যমানং তদ্‌ব্রাহ্মণস্য বিচেষ্টিতম্॥
যূয়ঞ্চ জীবিতা মেঽদ্য মানশ্চামানিনঃ কথম্।
তদা দুঃখং ভবেদেব নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥
তস্মাৎ তথা চ কর্ত্তব্যং যথা মানো ভবেন্ন হি।
অন্তরায়ৈশ্চ তপসাং ন হন্তেভ কদাচন॥
তস্মাচ্ছলঞ্চ কর্ত্তব্যং যথাস্বমাশ্রমাদ্বহিঃ।
অস্মাভির্বহুধা ভর্ৎস্য নিষ্কাস্যেত যথা তথা॥
এবং বিচার্য্য তৈস্তত্র পূজিতোঽথ বিনায়কঃ।
উপাসনঞ্চ তস্যৈব চক্রুস্তে ঋষিসত্তমাঃ॥
দূর্ব্বাদলৈরমেকৈশ্চ শতপত্রৈশ্চ তণ্ডুলৈঃ।
সিন্দূরৈশ্চন্দনৈশ্চৈব ধূপারাত্রিকপূজনৈঃ॥
মোদকৈর্বিবিধৈশ্চৈব পূজয়ামাসুর্বৈ তদা।
ততঃ প্রসন্নো হরজস্তেভ্যশ্চেদং বচোঽব্রবীৎ॥
গণপতিরুবাচ।
প্রসন্নোঽস্মি বরং ব্রূত যূয়ং কিং করবাণি বঃ।
তদীয়ং ভবচঃ শ্রুত্বা ঋষয়ো বাক্যমব্রুবন্॥
যদি প্রসন্নো দেবেশ দেয়োঽস্মাকং বরস্ত্বয়া।
তথা কার্য্যং ত্বয়া দেব গৌতমো হ্যাশ্রমাদ্বহিঃ॥
নিষ্কাস্যতে চ ঋষিভিঃ পরিভর্ৎস্য পুনঃপুনঃ।
এবং সম্প্রার্থিতস্তৈস্তু বিঘ্নস্য বচনং পুনঃ।
শ্রূয়তামৃষয়ঃ শ্রেষ্ঠা অযুক্তং ক্রিয়তেঽধুনা॥
অপরাধং বিনা তস্মৈ ক্রুধ্যতে হানিরেব চ॥
উপকৃতং পুরা যৈস্তু তেভ্যো দুঃখং ন দীয়তে।
যদা চ দীয়তে দুঃখং তদা নাশো ভবেদিহ॥
ঈদৃশঞ্চ তপঃ কৃত্বা সাধ্যতে ফলমুত্তমম্।
শুভং ফলং স্বয়ং হিত্বা সাধ্যতে ন হিতং পুনঃ॥
দত্ত্বা তু কাঞ্চনঞ্চৈব গৃহ্যতে কাচমেব চ।
পশ্চাদ্ যুক্তঞ্চ যৎ স্যাত্বে কর্ত্তব্যং তৎ তথা পুনঃ॥
ইত্যেবং বচনং শ্রুত্বা তস্য তে ঋষিসত্তমাঃ।
বুদ্ধিমোহং তদা প্রাপ্তা ইদমেব বচোঽব্রুবন্॥
কর্ত্তব্যং হি ত্বয়া স্বামিন্নিদমেব ন চান্যথা।
ইত্যুক্তস্তু তদা দেবো গণেশো বাক্যমব্রবীৎ॥
অসাধুঃ সাধুতাঞ্চৈব যাতি চৈব কদাচন।
সাধুশ্চাসাধুতাং নৈব প্রাপ্নোতীতি সুনিশ্চিতম্॥
অসাধুঃ সাধবে দুঃখং দদাতি দুষ্টযোগতঃ।
সুখঞ্চ মন্যতে সাধুরগ্রে সুখবিবৃদ্ধয়ে॥
দুঃখদাতুস্তদা সাধুঃ সুখঞ্চৈব প্রযচ্ছতি॥
যদা চ ভবতাং দুঃখং জ্ঞাতং নাশনমাত্মনঃ।
তদা সুখং প্রদত্তঞ্চ গৌতমেন মহর্ষিণা॥
ইদানীন্তু ভবদ্ভিশ্চ তস্মৈ দুঃখং প্রদীয়তে।
নৈতদ্যুক্ততমং লোকে সর্ব্বথা ঋষিসত্তমাঃ॥

স্ত্রীবলাম্মোহিতা যূয়ং নূনমেবং করিষ্যথ।
এতদ্ধিততমং তস্য ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ।
পুনশ্চায়মৃষিশ্রেষ্ঠো দাস্যতি বঃ সুখং ধ্রুবম্॥
ইত্যেবং বচনং তেন যদ্যপ্যুক্তং ন মেনিরে।
তদাধীনতয়া তেন কৃতঞ্চ শ্রূয়তাং পুনঃ॥
ভবদ্ভিঃ প্রার্থ্যতে যচ্চ করিষ্যে তৎ তথা হ্যহম্।
পশ্চাত্তাবি ভবেদেব ইত্যুক্ত্বান্তরধীয়ত॥
গৌতমশ্চ ন জানাতি ঋষিকৃত্যং দুরাশয়ম্।
আনন্দমনসা তেন ক্রিয়তে নিত্যকর্ম্ম চ॥
তদনন্তরং যজ্ঞজাতং শ্রূয়তামৃষিসত্তমাঃ।
গৌতমস্য চ কেদারস্তত্রাসন্ ব্রীহয়ো যবাঃ॥
গণপতিস্তত্র গৌর্ভূত্বা জগাম দুর্ব্বলঃ কিল।
কম্পমানস্তদা গত্বা কেদারে গৌতমস্য চ।
ব্রীহীংশ্চ ভক্ষয়ামাস যবাংশ্চ ঋষিসত্তমাঃ॥
এতস্মিন্নন্তরে দৈবাদ্ গৌতমশ্চ সমাগতঃ।
কেদারে চৈব দৃষ্ট্বা গাং দয়ালুর্গৌতমঃ স্বয়ম্॥
তৃণস্তম্বং সমাদায় বারয়ামাস তাং তদা।
তৃণস্তম্বেন স্পৃষ্টা সা পপাত পৃথিবীতলে॥
মৃতা চ তৎক্ষণাদেব ঋষেশ্চ পশ্যতস্তদা।
ঋষয়শ্ছন্নরূপান্তে ঋষিপত্ন্যস্তথাঽপ্যুতাঃ॥
উচুস্তে চ তদা সর্ব্বে কিং কৃতং গৌতমেন চ।
গৌতমোঽপি স্বয়ং তত্র হাহল্যা সাপি বিস্মিতা॥
কিং জ্ঞাতঞ্চ কথং দেবঃ কুপিতো মধুসূদনঃ।
কিং কর্ত্তব্যং ক্ব গন্তব্যং হত্যা চ সমুপস্থিতা॥
এতস্মিন্নন্তরে বিপ্রা গৌতমং পর্য্যভর্ৎসয়ন্।
বিপ্রপত্ন্যস্তথাহল্যাং দুর্ব্বচোভির্ব্যথাং দদুঃ॥
ঋষিপত্ন্য উচুঃ।
ধিগ্ জ্ঞানং তে ঋষিশ্রেষ্ঠ ধিক্ তপস্তে বহুজ্ঞতাম্।
ধিগ্‌হোমং তে ত্রিকালে চ ধিক্ কর্ম্ম বিবিধঞ্চ যৎ॥
ধিগ্‌হেতুং তব চাতুর্য্যং ধিক্ ত্বাং তে তু বহুশ্রুতম্।
সর্ব্বো ধিক্কারতাং যাতু তদীয়ো গুণসঞ্চয়ঃ॥
ইত্যেবং পরিভর্ৎস্যৈব ঋষয়স্তেঽমলাশয়াঃ।
মুখং ন দৃদৃশুস্তাং হ্যস্য গোয়স্যোচুঃ পরস্পরম্॥
অন্যচ্চৈব কৃতং তৈস্তু ঋষিভিঃ সুদুরাত্মভিঃ।
শ্রূয়তামৃষয়ঃ শ্রেষ্ঠাঃ কথয়ামি যথাশ্রুতম্॥
ঋষয়ো ঋষিপত্ন্যশ্চ শিষ্যাঃ পুত্রাস্তথা পুনঃ।
গৌতমং পর্য্যভর্ৎসন্ত গম্যতাং গম্যতামিতি॥
মুখং ন দর্শনীয়ঞ্চ দৃষ্ট্বা নূনং ভবেদিহ॥
যাবদাশ্রমসমীপে ত্বং তাবদেব হবির্ভুজঃ।
পিতরশ্চৈব গৃহ্ণন্তি হ্যস্মদ্দত্তং ন কিঞ্চন॥
তস্মাদ্গচ্ছ পুনস্ত্বঞ্চ পরিবারসমন্বিতঃ।
ইত্যুক্ত্বা তে তদা সর্ব্বে পাষাণৈঃ সমতাড়য়ন্॥
গৌতমোঽপি তদা তত্র হা হা কিং কিং ভবিষ্যতি।
সত্যঞ্চ ঋষয়ঃ শ্রেষ্ঠা গচ্ছামীতি বচোঽব্রবীৎ॥
ইত্যুক্ত্বা গৌতমস্তস্মাৎ স্থানাচ্চ নির্গতস্তদা।
গত্বা ক্রোশং তদা চক্রে আশ্রমং তদনুজ্ঞয়া॥

ভাগবতে কথিত আছে,—পুরুবংশীয় রাজা মুদ্গল হইতে মৌদ্গল্য-গোত্র ব্রাহ্মণের উৎপত্তি। ঐ রাজারই যমজ সন্তান দিবোদাস এবং অহল্যা। গোতমের ঔরসে অহল্যার গর্ভে

যাবচ্চৈবাভিশাপো বৈ তাবৎ কার্য্যং ন কিঞ্চন।
কর্ম্মণি মাধিকারোঽস্তি দৈবে পিত্র্যে চ বৈদিকে॥
তত্রৈব সংস্থিতশ্চৈব গৌতমো ঋষিসত্তমঃ।
ঋষয়ো নৈব ভাষন্তে ঋষিপত্ন্যস্তথৈব চ॥
যথা তেন ন গচ্ছন্তি যত্রাসৌ ঋষিসত্তমঃ॥
কদাচিৎ পথি দৃষ্টো বৈ দৃষ্ট্বা পত্ন্যো যথা পুনঃ।
বস্ত্রং কৃত্বান্তরীয়ঞ্চ গচ্ছন্তি মায়িনস্তদা॥
তদা দুঃখং মহৎ প্রাপ্তং গৌতমেন মহর্ষিণা।
মাসার্দ্ধঞ্চ ততো নীত্বা ঋষীন্ সম্প্রার্থয়ৎ তদা॥
অনুকম্প্যো ভবদ্ভিস্তু কথ্যতে ক্রিয়তে ময়া।
যথা নদীয়ং পাপঞ্চ নচ্ছত্যেভি নিবেদ্যভাম্।
নোপদেশং বিনা সিদ্ধির্জায়তে কর্ম্মণো নৃণাম্॥
ইত্যুক্তাস্তে তদা বিপ্রা মোচুশ্চৈব পরস্পরম্।
অত্যন্তনেবয়া পৃষ্টা মিলিত্বা হ্যেকতঃ স্থিতাঃ॥
গৌতমো দূরতঃ স্থিত্বা নত্বা চ ঋষিসত্তমান্।
পপ্রচ্ছ বিনয়াবিষ্টঃ কিং কার্য্যং হি ময়াধুনা।
ইত্যুক্তে ঋষিণা তেন ঋষয়ো বাক্যমব্রুবন্॥
ঋষয় ঊচুঃ।
নিষ্কৃতিং হি বিনা শুদ্ধির্জায়তে ন কদাচন।
তস্মাৎ ত্বং দেহশুদ্ধ্যর্থং প্রায়শ্চিত্তং সমাচর॥
ক্রান্ত্বা চ পৃথিবীং সর্ব্বাং পাপং স্বঞ্চ প্রকাশয়।
পুনরাগত্য চাত্রৈব চর মাসব্রতং তথা॥
শতমেকোত্তরঞ্চৈব ব্রহ্মণশ্চ গিরেস্তথা।
প্রক্রমণং বিধায়ৈব শুদ্ধিস্তেন ভবিষ্যতি॥
অথবা তু সমানীয় গঙ্গাং স্নানং সমাচর॥
পার্থিবানাং তথা কোটিং কৃত্বা দেবং বিশেষতঃ।
গঙ্গায়াঞ্চ ততঃ স্নাত্বা পূতশ্চৈব ভবিষ্যসি॥
প্রথমং দশ তথা চৈকং গিরেঃ প্রক্রমণং কুরু।
শতকুম্ভৈস্তথা স্নাত্বা পার্থিবী নিষ্কৃতির্ভবেৎ॥
ইত্যেবমৃষিভিঃ প্রোক্তং তথেবোমিতি তদ্বচঃ।
পার্থিবানাং তথা পূজাং গিরেঃ প্রক্রমণং তথা।
করিষ্যামি ঋষিশ্রেষ্ঠা আজ্ঞয়া শ্রীমতামিহ॥
ইত্যুক্ত্বা ঋষিবর্য্যশ্চ কৃত্বা প্রক্রমণং গিরেঃ॥
তদাজ্ঞপ্ত ঋষিস্তত্র পার্থিবানকরোৎ তদা।
বিধানপূর্ব্বকং তচ্চ চকার গৌতমঃ স্বয়ম্॥
ধ্যানঞ্চৈব শিবস্যৈব কৃত্বা বিধিবিধানতঃ।
অহল্যা চ তথা সাধ্বী যুক্তং সর্ব্বং চকার সা॥
শিষ্যাশ্চ প্রতিশিষ্যাশ্চ চক্রুঃ সেবাং তদা তয়োঃ।
শিবঃ প্রসন্নস্তাং যাতঃ কদাচিদৃষিসত্তমাঃ॥
কৈলাসশিখরাৎ তত্র গিরিজা-গণকৈঃ সহ।
আগত্য বচনং তস্মৈ বরং ব্রূহি যনেপ্সিতম্॥
তদীয়ং সুন্দরং রূপং শিবস্য পরমাত্মনঃ।
দৃষ্ট্বা হৃদি মুদা যুক্তো হ্যসাধ্যং কিং ভবেন্মম॥
নমস্কৃত্য শিবায়ৈব স্তুতিং চক্রে স্বয়ং তদা।
নির্গুণায় নমস্তভ্যং শঙ্করায় নমঃ পুনঃ॥
পশ্চাৎ প্রকৃতিরূপায় পুরুষায় নমঃ পুনঃ।

পশ্চাদ্বিষ্ণুস্বরূপায় ততশ্চ ব্রহ্মণে নমঃ॥
ব্রহ্মণা বিষ্ণুনা চৈব পূজ্যায় সংশয়চ্ছিদে।
পশ্চাদ্রুদ্রস্বরূপায় ততশ্চ ব্যাপকায় চ॥
ব্যাপ্যায় চ নমস্তভ্যং ব্রহ্মণে পরমাত্মনে।
অকারাদি-ক্ষকারান্ত-বীজরূপায় তে নমঃ॥
নির্গুণায় গুণায়ৈব স্বরূপায় নমোঽস্তু তে।
নমস্কারং ততঃ কৃত্বা বদ্ধাঞ্জলিপুটঃ স্থিতঃ॥
নিষ্পাপং কুরু মে দেব শিবো বাক্যমুপাদদে॥
ধন্যোঽসি কৃতকৃত্যোঽসি নিষ্পাপোঽসি সদা মুনে।
এভির্দুষ্টৈঃ কিল ত্বঞ্চ চ্ছলিতোঽসি মহামুনে।
তবৈব দর্শনাল্লোকা নিষ্পাপাশ্চ ভবন্তি চ॥
কৃতঘ্নাশ্চ তথা জাতা নিষ্কৃত্যা নৈব শুদ্ধিতাঃ।
দর্শনাদেব শেষং যৎ পাপঞ্চ দূরতো গতম্॥
ইত্যুক্ত্বা শঙ্করস্তস্মৈ ভেষাং দুশ্চরিতং তদা।
সর্ব্বং নিবেদয়ামাস শ্রুত্বা বিস্মিতমানসঃ॥
আহ পুনঃ শিবং সোঽপি উপকারঃ কৃতো মহান্।
যদ্যেবং ন কৃতং তৈস্তু দর্শনং তে কুতো ভবেৎ॥
ধন্যাশ্চ ঋষয়শ্চৈব মহ্যং শুভতরং কৃতম্।
ইত্যেবং বচনং শ্রুত্বা প্রসন্নঃ শঙ্করঃ পুনঃ॥
ধন্যোঽসি ত্বমৃষিশ্রেষ্ঠ ব্রিয়তাং বরমুত্তমম্।
গৌতমোঽপি বিচার্য্যৈবং লোকে বিশ্রুতমিত্যুত॥
অন্যথা ন ভবেদেব তস্মাদুক্তং সমাচরেৎ।
নিশ্চিত্যৈবং মুনিশ্রেষ্ঠঃ শঙ্করং বাক্যমব্রবীৎ॥
সত্যং নাথ ব্রবীষি ত্বং তথাপি পঞ্চভিঃ কৃতম্।
মাঙ্গথা ভবতীত্যত্র যজ্ঞাতং জ্ঞায়তাং কুতঃ।
যদি প্রসন্নো দেবেশ গঙ্গা চ দীয়তাং মম॥
ইত্যুক্ত্বা বচনং তত্র ধৃত্বা চরণপঙ্কজম্।
ন মশ্চকার দেবেশং গৌতমো লোককাম্যয়া॥
ততস্তু শঙ্করো দেবঃ পৃথিব্যাশ্চ দিবশ্চ সঃ।
সারঞ্চৈব সমুদ্ধৃত্য রক্ষিতং পূর্ব্বমেব যৎ॥
বিবাহে ব্রহ্মণে দত্তং হ্যবশিষ্টঞ্চ কিঞ্চন।
তৎ তস্মৈ দত্তবান্ শম্ভুর্ভক্তবৎসলতাং স্বয়ম্।
খ্যাপয়ন্ ভুবনে তস্য গৌতমস্য মহাত্মনঃ॥
গঙ্গাজলং তদা তত্র স্ত্রীরূপমভবৎ পরম্।
তস্যাশ্চৈব ঋষিশ্রেষ্ঠঃ স্তুতিং কৃত্বা নতিং ব্যধাৎ॥
ধন্যাসি কৃতকৃত্যাসি পাবিতং ভুবনং ত্বয়া।
মাঞ্চ পাবয় গঙ্গে ত্বং পতিতং নিরয়ে ধ্রুবম্॥
শম্ভুরপি তদা তস্মৈ পাবয় ত্বং মদাজ্ঞয়া।
উচিবান্ বচনং তত্র সর্ব্বেষাং হিতকৃন্নৃণাম্॥
ইতি শ্রুত্বা বচস্তস্য শম্ভোশ্চ গৌতমস্য চ।
উবাচৈব পুনর্গঙ্গা শ্রূয়তামৃষিসত্তমাঃ॥
ঋষিঞ্চ পাবয়িত্বাহং সপারিবারন্তু শঙ্করম্।
গমিষ্যামি বচঃ সত্যং ব্রবীমি ঋষিসত্তমাঃ॥
ইত্যুক্তে গঙ্গয়া তত্র ঈশ্বরো বাক্যমব্রবীৎ।
ত্বয়া তত্রৈব স্থাতব্যং যাবৎ কলিঃ সমাব্রজেৎ॥
বৈবস্বতে মন্বন্তরে হ্যষ্টাবিংশতিমে যুগে।

শতানন্দের জন্ম। শতানন্দের পুত্র সত্যধৃতি;

ভাবং ত্বয়া চ স্থাতব্যং লোকানাং হিতকাম্যয়া ॥
এবং শ্রুত্বা বচস্তস্য উবাচ সা সরিদ্বরা।
ময়া চৈব স্থিতঞ্চাত্র কাশ্যাঞ্চ পাবনায় বৈ ॥
পুনরত্রৈব কিং স্থাস্যে পাবয়িত্বা ঋষিং ব্রজে।
তদা মেতি ঋষিশ্চাপি শঙ্করশ্চাহ তাং পুনঃ ॥
স্থিত্বা কিঞ্চিৎ পুনর্গঙ্গা বাক্যমুচে সুশোভনম্।
মাহাত্ম্যমধিকং চেৎ স্যাৎ সর্ব্বেভ্যশ্চ মুনীশ্বর ॥
অন্যচ্চৈব ঋষীনেভাংস্ত্বনুকারণতঃপরান্।
পাবিতুং ন সমর্থাস্মি অন্তর্দ্ধানং ব্রজে হ্যহম্ ॥
ইতি চাম্বচ্ছরশ্চ বপুষা সুন্দরেণ হ।
তিষ্ঠেচ্চ মৎসমীপে হি সগণো গিরিজাসহ ॥
এবং তস্যা বচঃ শ্রুত্বা শঙ্করো বাক্যমাদদে।
বস্যামি শ্রদ্ধয়া দেবি অহং ভিন্নো ন কাহিচিৎ ॥
তথাপি হীয়তে ব্রহ্ম হ্রীয়তাঞ্চ ত্বয়া পুনঃ।
ইত্যেবং বচনং শ্রুত্বা গঙ্গা চ প্রত্যপূজয়ৎ ॥

সূত উবাচ।

এতস্মিন্নন্তরে দেবা ঋষয়শ্চ পুরাতনাঃ।
সুতীর্থান্যুপানেকানি ক্ষেত্রাণি বিবিধানি চ ॥
আগত্য গৌতমঞ্চৈব গঙ্গাঞ্চ গিরিশং তথা।
জয় জয়েতি ভাষন্তো পূজয়ামাসুঃ সাদরম্।
স্তুতিঞ্চ বিবিধাং তেষাং চক্রুস্তে চ মুদান্বিতাঃ ॥
গঙ্গা প্রসন্না তেভ্যশ্চ গিরিশশ্চ তথৈব চ।
বরং ব্রূত ঋষিশ্রেষ্ঠা দদামঃ প্রিয়কাম্যয়া ॥

ঋষয় উচুঃ।

যদি প্রসন্নো দেবেশ প্রসন্না ত্বং সরিদ্বরে।
স্থাতব্যমত্র-যুষ্মাভিঃ প্রিয়ার্থং সংকৃতাং নৃণাম্ ॥

গঙ্গোবাচ।

যূয়ং সর্ব্বে প্রিয়ার্থঞ্চ তিষ্ঠন্তু কিং ময়া পুনঃ ॥
গৌতমং পাবয়িত্বাহং গমিষ্যামি যথাগতম্।
ভদ্রং বঃ সদা প্রাপ্তু পবিত্রীক্রিয়তাং জগৎ ॥
ইত্যুক্তাস্তে তদা সর্ব্বে উচুঃ শুভতরং বচঃ।
অস্মাকং পাবনায়ৈব স্থাতব্যং ভুবনে ত্বিহ ॥

গঙ্গোবাচ।

ভবৎসু মে বিশেষোঽত্র জ্ঞেয়শ্চৈব কথং ভবেৎ ॥

সূত উবাচ।

ইত্যুক্তাস্তে তদা দেবা ঋষয়ঃ সরিতস্তথা।
ক্ষেত্রাণি তীর্থমুখ্যানি প্রণিপত্যাব্রুবংস্তদা ॥

সর্ব্বে দেবা উচুঃ।

সিংহরাশৌ যদা স্যাদ্বৈ গুরুঃ সর্ব্বসুরোত্তমঃ।
তদা বয়ঞ্চ সর্ব্বে বৈ আগমিষ্যামস্ত্বাং পুনঃ ॥
একাদশ চ বর্ষাণি লোকানাং পাতকত্বিহ।
ক্ষালিতং যদ্ভবেদেব মলিনাঃ স্ম সরিদ্বরে ॥
তস্যৈব ক্ষালনার্থঞ্চ যাস্যামঃ সর্ব্বথা প্রিয়ে ॥
অনুগ্রহায় লোকানামস্মাকং প্রিয়কাম্যয়া।
স্থাতব্যং শঙ্করেণৈব ত্বয়া চৈব সরিদ্বরে ॥
যাবৎ সিংহে গুরুশ্চৈব স্থাস্যামস্তাবদেব হি।
ত্বয়ি স্নানং ত্রিকালঞ্চ শঙ্করস্য চ দর্শনম্।
কৃত্বা পাপং বিমোক্ষ্যামো নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥

তাঁহার পুত্র শরদ্বান্। শরদ্বানের উর্ব্বশী-দর্শন-

ইত্যেবং প্রার্থিতা তৈস্তু গৌতমেন মহর্ষিণা।
স্থিতোঽসৌ শঙ্করশ্চৈব স্থিতা সা চ সরিদ্বরা ॥
তদ্দিনং হি সমারভ্য সিংহস্থে চ বৃহস্পতৌ।
আয়ান্তি সর্ব্বতীর্থানি ক্ষেত্রাণি দৈবতানি চ ॥
পুষ্করাদ্যানি তীর্থানি গঙ্গাদ্যাঃ সরিতস্তথা।
বাসুদেবাদয়ো দেবা বসন্তি গৌতমীতটে ॥
যাবৎ তত্র স্থিতানীহ তাবৎ তেষাং ফলং ন হি।
স্বপ্রদেশে সমায়াতে হ্যেতেষাঞ্চ ফলং লভেৎ ॥
গঙ্গাং রেবাং গয়াঞ্চৈব গোমতীঞ্চ ঋষীশ্বরাঃ।
গন্তব্যং নান্যথা ক্বাপি যাবৎ সিংহে গুরুর্ভবেৎ ॥
গোমতীং প্রথমং গত্বা গোদাবরীং ততো ব্রজেৎ।
পুনশ্চ গোমতীং গত্বা হন্ত্যাভিঃ পরিমুচ্যতে ॥
ত্র্যম্বকং নাম বিখ্যাতং জ্যোতির্লিঙ্গমুত্তমম্।
গৌতম্যাশ্চ তটে প্রোক্তং মহাপাতকনাশনম্ ॥
এবং বঃ সমাখ্যাতং যৎ পৃষ্টোঽহং মুনীশ্বরাঃ।
ইত্যেবং বচনং শ্রুত্বা পুনরূচুস্তদা হি তে ॥

ঋষয় উচুঃ।

গঙ্গা চ জলরূপেণ কুতো জাতা বদ প্রভো।
তন্মাহাত্ম্যং বিশেষেণ বক্তুমর্হস্যশেষতঃ ॥
যৈর্বিপ্রৈর্গৌতমায়ৈব কৃতং দুষ্টং দুরাত্মভিঃ।
তেষাং কিঞ্চ ততো জাতমুচ্যতাং ব্যাসশিষ্য বৈ ॥
এবং শ্রুত্বা বচস্তেষামুবাচ রোমহর্ষণঃ ॥

সূত উবাচ।

শ্রূয়তামৃষয়ঃ সম্যক্ কথয়ামি যথাশ্রুতম্।
এবং সম্প্রার্থিতা দেবৈর্গৌতমেন তদা স্বয়ম্ ॥
ব্রহ্মণশ্চ শিরেস্তস্মাদবতার সরিদ্বরা।
উদুম্বরস্য শাখায়াঃ প্রবাহো নিঃসৃতস্তদা ॥
তত্র স্নাত ঋষিশ্রেষ্ঠো গৌতমো নাম বিশ্রুতঃ।
সমাগতাশ্চ তে সর্ব্বে স্নানং চক্রুর্মুদান্বিতাঃ ॥
গঙ্গাদ্বারঞ্চ তন্নাম প্রসিদ্ধমভবৎ তদা ॥
পশ্চাৎ ক্ষেত্রে চ ঋষয়ো গৌতমস্পর্দ্ধনস্তদা।
স্নানার্থমাগতান্ দৃষ্ট্বা হন্তর্দ্ধানং গতা স্বয়ম্ ॥
মা মেতি গৌতমস্তত্র ব্যাজহার মুনীশ্বরাঃ ॥

গৌতম উবাচ।

ইমে চৈব মদীয়াশ্চ সাধবো বাপ্যসাধবঃ।
এতৎপুণ্যপ্রভাবেণ দর্শনং দীয়তে ত্বয়া ॥

গঙ্গোবাচ।

এতে দুষ্টতমাশ্চৈব নৈব দৃশ্যা ময়া পুনঃ।
কৃতঘ্না দ্রোহিণশ্চৈব বরাকা মানিনো ধ্রুবম্ ॥
জাল্মাঃ পাষণ্ডিনশ্চৈব বর্জ্যাস্তে ঋষিসত্তম।
ইতি বাণী সমুৎপন্না হ্যাকাশে ঋষিসত্তমাঃ ॥
তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্যা ঋষির্বাক্যমুপাদদে।
মাতশ্চ শ্রূয়তামেতন্মহত্তাং রীতিরেব চ ॥
অপকারিষু যে লোক উপকারং চরন্তি বৈ।
তেন পূতো ভবাম্যত্র ভগবদ্বাক্যতঃ শ্রুতম্ ॥
তস্মাৎ ত্বয়া চ তৎ কার্য্যং সত্যঞ্চ ভগবদ্বচঃ ॥
পুনর্বাণী সমুৎপন্না সত্যঞ্চ কথ্যতে ত্বয়া।
তথাপি সংগ্রহার্থঞ্চ প্রায়শ্চিত্তং চরান্ত চেৎ ॥

বিকার-সম্ভূত অকামজ অপত্য কূপ এবং কূপী। *

বিষ্ণুপুরাণে কথিত আছে,—মৌদ্গল্যগোত্র ব্রাহ্মণবংশের প্রবর্ত্তয়িতা পুরুবংশীয় রাজা মুদ্গল হইতে বৃদ্ধাশ্ব। বৃদ্ধাশ্বের যমজ সন্তান দিবোদাস ও অহল্যা। অহল্যার গর্ভে শরদ্বান্ ঋষির ঔরসে ধনুর্ব্বেদান্তগামী সত্যধৃতির জন্ম। ঋষি সত্যধৃতির উর্ব্বশী-দর্শন-বিকারসম্ভূত অকামজ অপত্য কূপ এবং কূপী। †

মহাভারতে কথিত আছে,—মহর্ষি গোতমের পুত্র শরদ্বান্। শরদ্বান্ ঋষির ধনুর্ব্বেদে পাণ্ডিত্য এবং অনুরাগ ছিল। তাঁহার বিপুল তপস্যায় ইন্দ্র সন্তপ্ত হইয়া, তপস্যা-ভঙ্গের জন্য 'জানপদী' নাম্নী অপ্সরাকে গোতমপুত্র শরদ্বানের আশ্রমে প্রেরণ করেন। শরদ্বান্ ধৈর্য্যচ্যুত হইলেন না, কিন্তু আশ্রম ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। ইতিমধ্যে তাঁহার অজ্ঞাত মানস-বিকার বশতঃ শরস্তম্বে যে কন্যা ও পুত্র উৎপন্ন হন, তাঁহারাই কূপ ও কূপী নামে অভিহিত। *

রামায়ণ, মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ এবং ভাগবত এই চারিখানি গ্রন্থই পরস্পর অনৈকমত্য-সম্পন্ন—আপাততঃ এইরূপই বোধ হয়।

বস্তুতঃ কিন্তু, 'রাজ-গৃহ' প্রবন্ধে রাজ-বংশ-বিবরণ সম্বন্ধে আমি যে মীমাংসা করিয়াছি, তাহাই এ স্থলেও অনুসরণীয়। অর্থাৎ বংশ-বিবরণ পুরাণশাস্ত্রে পুত্র-পর্য্যায় ক্রমে লিপি-বদ্ধ নাই, অধস্তন-বংশীয়দিগের মধ্যে অতি প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের নামকীর্ত্তন করিয়াই বংশা-বলী শেষ করা হইয়াছে। একই গ্রন্থের কোন স্থলে দুই এক জন অনতি-প্রসিদ্ধ ব্যক্তির নামও আছে, কোন স্থলে বা তাঁহাদের নাম নাই। এই প্রকার একই গ্রন্থে পূর্ব্বাপর দুই অধ্যায়ে বংশগণনায় নামব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। দৃষ্টান্ত-স্থলে মহাভারত আদিপর্ব্ব ৯৩।৯৫ অধ্যায়ের উল্লেখ করিতে পারি। 'রাজগৃহ' প্রবন্ধে এই ব্যতিক্রম প্রদর্শন করিয়াছি। এক গ্রন্থেই একই স্থলে যখন ব্যতিক্রম, তখন বিভিন্ন গ্রন্থে যে ব্যতিক্রম থাকিবে, তার আর বৈচিত্র্য কি? ইহা কিন্তু মতভেদ নহে। সংক্ষেপ ও বিস্তার অনুসারে এই পার্থক্য হয়।

জানপদী এবং উর্ব্বশী—উভয় অপ্সরাই বোধ হয়, ইন্দ্রপ্রেরিত। কূপ-জনক উভয়কেই দর্শন করেন। এইজন্য কোন গ্রন্থে উর্ব্বশী-দর্শন এবং কোন গ্রন্থে জানপদী-দর্শন কথিত হইয়াছে।

শতমেকোত্তরঞ্চাত্র কার্য্যং প্রক্রমণং গিরেঃ।
ততশ্চৈবাধিকারশ্চ জায়তে দুষ্টকর্ম্মণাম্ ॥
ইতি শ্রুত্বা বচস্তস্যাশ্চক্রুশ্চৈবং তথা পুনঃ।
গৌতমশ্চ ততঃ শ্রুত্বা ক্ষন্তব্যশ্চাপরাধকঃ ॥
এবং কৃতে তদা তেন গৌতমেন তদাজ্ঞয়া।
কুশাবর্ত্তং তদা চক্রে গঙ্গাদ্বারাদযোগতম্ ॥
ততঃ প্রাদুরভূৎ তত্র তথৈব শ্রীতয়ে পুনঃ।
কুশাবর্ত্তঞ্চ বিখ্যাতং তীর্থমাসীদনুত্তমম্ ॥
তত্র স্নাতো নরো যস্তু মোক্ষায় পরিকল্পতে ॥
তত্রৈব ঋষয়ো দিব্যাং স্তুতিং কৃত্বা পুনঃপুনঃ।
অহল্যায়াঃ পুরঃ কৃত্বা ঋষিপত্ন্যস্তথা পুনঃ।
চক্রুস্তে তু তদা স্নানং কৃতার্থা হ্যভবংস্তদা ॥
শিবস্য দর্শনং কৃত্বা আনন্দং পরমং গতাঃ ॥

শিবপুরাণ, জ্ঞানসংহিতা; ৫২ অঃ ২—৫৪ অঃ ৪১ শ্লোক।

* মুদ্গলাদ্বৃদ্ধনির্ব্বৃত্তং গোত্রং মৌদ্গল্যসংজ্ঞিতম্।
মিথুনং মুদ্গলাদ্বৃদ্ধাশ্ব্যাদ্দিবোদাসঃ পুমানভূৎ ॥
অহল্যা কন্যকা যস্যাং শতানন্দস্তু গৌতমাৎ।
তস্য সত্যধৃতিঃ পুত্রো ধনুর্ব্বেদবিশারদঃ ॥
শরদ্বাংস্তৎসুতো যস্মাদুর্ব্বশীদর্শনাৎ কিল।
শরস্তম্বেঽপতদ্রেতো মিথুনং তদভূচ্ছুভম্ ॥
তদ্দৃষ্ট্বা কৃপয়াগৃহ্ণাৎ শান্তনুর্মৃগয়াং চরন্।
কৃপঃ কুমারঃ কন্যা চ দ্রোণপত্ন্যভবৎ কৃপী ॥

ভাগবত ৯।২১।৩৩—৩৬।

† মুদ্গলাচ্চ মৌদ্গল্যাঃ ক্ষত্রোপেতা দ্বিজাতয়ো ভূবঃ। মুদ্গলাদ্বৃদ্ধশ্বঃ, বৃদ্ধশ্বাৎ দিবোদাসোঽহল্যা মিথুনমভূৎ। শরদ্বতোঽহল্যায়াং শতানন্দোঽভবৎ। তস্মাদপি সত্যধৃতিঃ ধনুর্ব্বেদান্তগো জজ্ঞে। সত্য-ধৃতস্তু বরাপ্সরসমুর্ব্বশীং দৃষ্ট্বা রেতঃ স্কন্নং শরস্তম্বে পপাত, তচ্চ দ্বিধাগতমপত্যদ্বয়ং কুমারঃ কন্যকা চ ভবৎ। মৃগয়ামুপাগতঃ শান্তনুর্দৃষ্ট্বা কৃপয়া জগ্রাহ। তয়োঃ সঃ কুমারঃ কৃপঃ কন্যাকাখ্যায়ো জননী কৃপী।

বিষ্ণুপুরাণ ৪।১৯।১৬—১৮।

* মহাভারত, আদিপর্ব্ব ১৩০ অঃ।

পুরাণে যে পুত্রাদি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা 'সন্তান'-বাচক। কোথাও পৌত্র, কোথাও প্রপৌত্র, কোথাও তাহারও অধস্তন পুরুষ, পুত্র শব্দে বুঝিতে হইবে। স্মৃতিতেও পুত্র শব্দ অনেক স্থলে পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্রের বোধক।

'অমুক হইতে অমুক উৎপন্ন' এরূপ থাকিলে ত কোন গোলই নাই। কেননা, পূর্ব্বপুরুষ হইতে অধস্তন পুরুষ ত উৎপন্ন বটেই। আজও "বিষ্ণুঠাকুরের সন্তান" ইত্যাদি ব্যবহার প্রচলিত-কথাতেও আছে।

ভাগবতে যে আছে,—"মুদ্গল হইতে দিবোদাস এবং অহল্যা উৎপন্ন," ইহার অর্থ মুদ্গলের ধারায় দিবোদাস এবং অহল্যার জন্ম। সুতরাং "মুদ্গল হইতে বৃদ্ধশ্ব, বৃদ্ধশ্বের যমজ-সন্তান—দিবোদাস ও অহল্যা" এই বিষ্ণুপুরাণ-বচনের সহিত ভাগবতের বিরোধ নাই।

আমরা এই পুরাণদ্বয়ের কথায় এই বুঝি,—মুদ্গলের ধারায় বৃদ্ধশ্বের জন্ম, বৃদ্ধশ্বের ধারায় দিবোদাস ও অহল্যার জন্ম।

তারপর গোতম ও গৌতম। গোতম এবং গৌতম এক ঋষির নাম, ইহা মহাভারতে পাইয়াছি। তবে ইনি গৌতম নামেই প্রসিদ্ধ।

তদ্ভিন্ন অপর কতিপয় গৌতম এবং একজন গোতমের সত্তাও পুরাণে পাওয়া যায়, তাহা দেখাইয়াছি।

দীর্ঘতমার নাম গোতম। তাঁহারও নামান্তর গৌতম হইলেও তিনি গোতম নামে প্রসিদ্ধ। দীর্ঘতমা গোতম-গোত্রের প্রবর্ত্তক আর অপর গোতম বা গৌতম, গৌতম-গোত্রের প্রবর্ত্তক।

দিবোদাস-ভগিনী অহল্যা এই দুই বংশীয়ের মধ্যে কোন এক ঋষির পত্নী ছিলেন। সেই ঋষির নাম ছিল শরদ্বান্। গৌতম শব্দের উত্তর অপত্যার্থ অণ্ প্রত্যয়ের লুক্ করিয়া সেই শরদ্বান্‌কেই কোন স্থলে 'গোতম' বলা হইয়াছে, আর কোন স্থলে লুক্ না করিয়া, অথবা গৌতম শব্দের উত্তর অণ্ প্রত্যয় করিয়া 'গৌতম' বলা হইয়াছে। ব্রহ্মার মানসী কন্যা অহল্যার গর্ভে মহর্ষি গৌতমের ঔরসে উৎপন্ন জনক-পুরোহিত প্রসিদ্ধ শতানন্দের ন্যায় শরদ্বৎ-পুত্রের নামও ছিল শতানন্দ। শতানন্দের বংশে সত্যধৃতির জন্ম হয়।

সত্যধৃতির বংশে দ্বিতীয় শরদ্বানের উৎপত্তি হয়। গোতম-বংশীয় বলিয়া দ্বিতীয় শরদ্বানের পিতাও গোতম বা গৌতম নামে কথিত হইয়াছেন। সত্যধৃতির বংশ-সম্ভূত বলিয়াই হউক বা অন্য কোন কারণেই হউক, দ্বিতীয় শরদ্বানের নামান্তর সত্যধৃতি কৃপ ও কৃপী তাঁহার অপত্য। ভাগবতে গোতম বা গৌতম-বংশীয় এক ঋষি—গোতম, শতানন্দ, (১ম) সত্যধৃতি এবং শরদ্বান্ এই কয়েক জন ঋষির নাম প্রসিদ্ধ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

গোতম বা গৌতম-বংশীয় সেই দিবোদাস-ভগিনী অহল্যার স্বামী ঋষির নামান্তর শরদ্বান্, শতানন্দ এবং (২য়) শরদ্বান্ বা (২য়) সত্যধৃতি প্রসিদ্ধি এবং আবশ্যক অনুসারে এই কয়েক ঋষির নাম বিষ্ণুপুরাণে উল্লিখিত হইয়াছে। ভারতে গোতম আর তদ্বংশীয় (২য়) শরদ্বান্ অর্থাৎ দ্বিতীয় সত্যধৃতি মাত্র উল্লিখিত হইয়াছেন। এরূপ একনামক নানা ব্যক্তির অস্তিত্ব পুরাণে রাজবংশ-তালিকায় যথেষ্ট আছে। অথচ এ স্থলে এইরূপ মীমাংসা করিলে কোন দোষই হয় না।

রামায়ণে কথিত আছে,—"অহল্যা ব্রহ্মার মানসী কন্যা এবং প্রথম রূপবতী," ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণে কীর্ত্তিত হইয়াছে,—"অহল্যা ত্রিলোকসুন্দরী উর্ব্বশী ও পুরূরবার বংশ-সম্ভূত রাজা দিবোদাসের ভগিনী" এই বিরোধ-পরিহারার্থই দুই অহল্যা স্বীকার করিতে হইল।

বিষ্ণুপুরাণ, ৪র্থ অংশ, ১৮ অধ্যায় হইতে দেখিয়া যাও, পুরুবংশে তিন জনমেজয়, তিন ভীমসেন;—১ম পরিক্ষিৎ, ১ম পরিক্ষিৎপুত্র জনমেজয়, শ্রুতসেন, ভীমসেন, উগ্রসেন; ২য় পরিক্ষিৎ, ২য় পরিক্ষিৎপুত্র জনমেজয়, শ্রুতসেন, ভীমসেন, উগ্রসেন ইত্যাদি এক নামে নানা ব্যক্তি দেখিতে পাইবে। গৌতম-বংশেও তাহাই হইয়াছে। কল্পভেদ-ব্যবস্থাও আছে বটে, কিন্তু উপায় থাকিলে কল্পভেদ অনুসারে মীমাংসা করাও ত উচিত নহে।

যে গোতম এবং গৌতম গোত্রকার, তাঁহাদের পরিচয় এইবার দিতেছি।

ব্রহ্মার পুত্র গৌতম, গোত্রকার নহেন।

এই গৌতম এবং গোতম উভয়েই ব্রহ্মনন্দন মহর্ষি অঙ্গিরার সন্তান। গৌতম—পুত্র; আর গোতম—পৌত্র। গোদমন (জিতেন্দ্রিয়ত্ব) প্রভৃতি গুণে অঙ্গিরো-নন্দনের গৌতম সংজ্ঞা হয়।

গোতম, উতথ্য-পুত্র দীর্ঘতমারই নামান্তর। গো (সুরভি) ইহাঁর তমঃ (অন্ধত্ব) দূর করিয়াছিলেন বলিয়া ইহাঁর নাম হয় গোতম। কোন স্থলে ইনিও গৌতম নামে অভিহিত হইয়াছেন।

ফলে, গোতম এবং গৌতম এই দুই মহর্ষিকে লইয়া বড়ই গোলে পড়িতে হয়। গোতমও কখন গৌতম নামে অভিহিত হইয়াছেন, আবার গৌতমও কখন গোতম নামে অভিহিত হইয়াছেন। মৎস্যপুরাণে অঙ্গিরো-নন্দন গৌতমকে গোত্রকার বলা হইয়াছে আর অঙ্গিরোবংশ-সম্ভূত আর এক গৌতমকে গোত্রকার বলা হইয়াছে। বর্ণাশুদ্ধি বশতঃ দুই গৌতম গোত্রকার হইয়াছেন; বস্তুতঃ ভন্মধ্যে এক ঋষির নাম গোতমই হইবে, গৌতম নহে। কেননা, মৎস্যপুরাণে ঋষিগণের বংশবর্ণন-প্রসঙ্গে শত শত গোত্রের উল্লেখ আছে, কিন্তু প্রসিদ্ধ গৌতম-গোত্রের উল্লেখ নাই। অথচ দুই গৌতমের উল্লেখ আছে। তাহাতেই বিশেষ বিশ্বাস হয়, এক ঋষি গোতমই হইবেন।

আমরা শাস্ত্রপ্রমাণে সিদ্ধান্ত করিয়াছি, অহল্যাপতি * গৌতমই অঙ্গিরার পুত্র এবং তিনিই গৌতম গোত্রকার। আর গোতম দীর্ঘতমারই নামান্তর এবং তিনিই গোতম-গোত্রকার।

প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছি,—(১) অহল্যা ব্রহ্মার মানসী কন্যা। অন্য অপূর্ব্ব রূপবতী রমণীর সৃষ্টি যখন হয় নাই, অহল্যা সেই সময় সৃষ্ট। তিনি, যে গৌতমের নিকট ন্যাসস্বরূপে স্থাপিত হইয়াছিলেন, তিনি যে অতি পূর্ব্বতন ঋষ, তাহাতে আর সন্দেহ কি? ব্রহ্মার মানসপুত্র মরীচি প্রভৃতির মধ্যে তাঁহাকে পাইলেই ভাল হইত; না হয়, তাঁহাদের পুত্র-পর্য্যায়ে যাঁহাকে পাইতেছি, সেই গৌতমই হইতে পারেন, অধিক অধস্তন নহেন। অহল্যাপতির নাম রামায়ণে একবারও গোতম বলিয়া উক্ত হয় নাই, গৌতম নামই উক্ত হইয়াছে। (২) দীর্ঘতমা জন্মান্ধ। কোন স্থলে তিনি গৌতম নামে অভিহিত হইলেও তিনি যে অহল্যাপতি নহেন, তাহা স্থির। দীর্ঘতমার পত্নীর নাম প্রদ্বেষী। দীর্ঘতমার আর বিবাহ হয় নাই। শূদ্রাগর্ভে কাক্ষীবান্ প্রভৃতিকে উৎপাদন করিয়া, কাক্ষীবান্ ঋষির তপঃপ্রভাবে ব্রাহ্মণ্য-লাভের পর, সেই সৎপুত্র-সাহায্যে দীর্ঘতমা ব্রহ্মলোকে গমন করেন, ইহা শাস্ত্রোক্তি। অহল্যাগর্ভসম্ভূত শতানন্দ প্রভৃতি ঋষিগণ যে ইহাঁর পুত্র নহেন, তাহা দীর্ঘতমার প্রসঙ্গ পাঠ করিলেই বুঝিবে। (৩) দীর্ঘতমা বা তৎপুত্র কাক্ষীবান্ প্রভৃতির আশ্রম মগধ-রাজধানী গিরিব্রজের সমীপে। আর অহল্যা-

* অহল্যা বলিলে ব্রহ্মনন্দিনী অহল্যাকেই বুঝিবে। অন্য অহল্যার বিশেষণ দিবোদাস-ভগিনী; এইটুকু মনে রাখিবে।

পতি গৌতম মহর্ষির আশ্রম মিথিলাতে। (৪) এক নামে অনেক ঋষি আছেন, তন্মধ্যে কোন ঋষি গোত্রকার হইলে, তাঁহাকে তত্ত্বতঃ জানা যায়,—প্রবরের সাহায্যে। গোত্রকার ঋষির তত্ত্ব-নির্দ্ধারক-বংশ-সম্বন্ধযুক্ত ঋষিরাই প্রবর-পদবাচ্য। শ্রীধর স্বামী বলিয়াছেন,—"প্রবরৈশ্চ তস্মিন্নেব বংশেঽবান্তরভেদঃ, নতু বংশান্তরম্।" গোতম-গোত্রের প্রবর,—"গোতম, বসিষ্ঠ, বার্হস্পত্য।" গৌতম-গোত্রের প্রবর দ্বিবিধ,—"গৌতম, আঙ্গিরস, অপ্সার, নৈয়ধ্রুব, বার্হস্পত্য" এই একপ্রকার, আর, "গৌতম, আঙ্গিরস, আয়াস" এই একপ্রকার।

গোতম-গোত্রের প্রবরে আঙ্গিরসের নামগন্ধ নাই। বার্হস্পত্য অর্থে বৃহস্পতির বংশ-সম্ভূত ঋষিবিশেষ। ভরদ্বাজ বৃহস্পতির ঔরসে এবং দীর্ঘতমার জননী হইতে উদ্ভূত। সুতরাং দীর্ঘতমাই যে এই গোতম, তাহার তত্ত্বনিরূপণ আঙ্গিরস ঋষির অসমভিব্যাহৃত 'বার্হস্পত্য' ঋষি দ্বারা সম্পূর্ণ হইতেছে।

আঙ্গিরস—অঙ্গিরঃ-সন্তান অথবা অঙ্গিরা (অঙ্গিরা এব স্বার্থে অণ্)। গৌতম অঙ্গিরার পুত্র, আঙ্গিরস প্রবর তাহার সূচক। তৎপরে গৌতম-গোত্রের একশাখা গৌতম-ভ্রাতা বৃহস্পতির বংশের সহিত ঘনিষ্ঠ-ভাবে থাকেন, তাঁহাদের অন্যতম প্রবর 'বার্হস্পত্য।' গৌতম-গোত্রের অপর শাখা গৌতম-ভ্রাতা অয়াস্য ঋষির বংশের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে থাকেন, তাঁহার প্রবর বার্হস্পত্য নহে, 'আয়াস' (অয়াস্যস্য অপত্যম্—অণ্) গৌতম-গোত্রের এই দুই শাখা হইতেও বুঝা যাইতেছে যে, যে গৌতম বৃহস্পতি-বংশ এবং অয়াস্য-বংশের সহিত সমান-সম্বন্ধযুক্ত, তিনিই গৌতম-গোত্র-কার। ফলে, 'আঙ্গিরস' ঋষির সাহায্য থাকাতে অঙ্গিরঃপুত্র গৌতমই যে গৌতম-গোত্রকার, তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। গোতম-গোত্রের প্রবরান্তর্গত বসিষ্ঠ, ব্রহ্মার মানসপুত্র প্রসিদ্ধ বসিষ্ঠ হইতে পৃথক্, ইনি গোতমেরই বংশ-সম্ভূত। গৌতম-গোত্রের প্রবরান্তর্গত অপ্সার, নৈয়ধ্রুব ঋষিদ্বয়ও কশ্যপ-বংশীয় অপ্সার, নৈয়ধ্রুব হইতে পৃথক্। শ্রীধর স্বামীর লিখিত বংশ-শব্দ স্পষ্টার্থ-প্রতিপাদক হইলে এই কল্পনাই করিতে হয়। পূর্ব্বকালে এ সব প্রবরান্তর্গত ঋষিরা প্রসিদ্ধ ছিলেন। ইহাঁদের দ্বারা গোত্রকারের তত্ত্ব-নিরূপণ প্রকৃতই হইত।

অথবা শ্রীধর স্বামীর লিখিত 'বংশ' শব্দ 'সন্তান'-বোধক অর্থাৎ রক্ত-সম্বন্ধ-বোধক। তাহা হইলে মাতামহ-বংশীয় ঋষিরাও প্রবর-মধ্যে নিবিষ্ট থাকেন, ইহা বলা যায়। বলিলে, অনেক কল্পনার দায় হইতেও অব্যাহতি পাওয়া যায়। একবংশের প্রসিদ্ধ ঋষিকে অন্য গোত্রের প্রবর-নিবিষ্ট দেখিলে আর একনামা বহু ঋষির অস্তিত্ব কল্পনা করিতে হয় না। দৃষ্টান্ত দেখুন,—কশ্যপ মরীচির পুত্র, অপ্সার ঋষি এবং নৈয়ধ্রুব ঋষি কাশ্যপ-গোত্রের প্রবর, অতএব এই ঋষিদ্বয়কে মরীচি-বংশীয় বলা যাইতে পারে। অঙ্গিরঃ-পুত্র গৌতম মরীচির দৌহিত্র। (মৎস্যপুরাণে ইহা কথিত হইয়াছে জ্যৈষ্ঠের জন্মভূমি টীকা দেখ)। অতএব গৌতম-গোত্রের যে শাখা গৌতম-মাতামহ-বংশের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে ছিলেন, তাঁহাদের প্রবর-মধ্যে গৌতম-মাতামহ মহর্ষি মরীচির বংশ-সম্ভূত অপ্সার ও নৈয়ধ্রুব ঋষির নাম পাওয়া যায়। যে শাখা তাহা ছিলেন না, তাঁহাদের প্রবর মধ্যে সে নামও নাই।

দীর্ঘতমা বা গোতমের মাতা মমতা বসিষ্ঠের কন্যা হইতে পারেন, তাই গোতম-গোত্রের প্রবর-মধ্যে বসিষ্ঠ আছে[৭]। এই প্রবর দর্শনে গোতম ও গৌতমের তত্ত্বনিরূপণ হয়।

ব্রহ্মার মানস-পুত্র গৌতমও যে গোত্রকার নহেন, তাহাও বুঝা যায়, এই প্রবর হইতে।

মহাভারত সভাপর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, দীর্ঘতমা এবং তদীয় পুত্র গৌতম কাক্ষীবান্ (দীর্ঘতমার নাম গোতম, এইজন্য তৎপুত্র গৌতম নামে খ্যাত) ইন্দ্রসভায় থাকেন।

আর গৌতম—দক্ষ প্রচেতা প্রভৃতি চতুর্দ্দশ প্রজাপতির অন্যতম এবং তিনি ব্রহ্মার সভায় থাকেন।

গয়ামাহাত্ম্যে যে সব ব্রহ্মনন্দনের কথা উক্ত হইয়াছে, ব্রহ্মলোকবাসী ঋষিগণের মধ্যে তাঁহাদের একজনেরও নাম নাই, সুতরাং ব্রহ্মার সভায় যে গৌতমের অস্তিত্ব কীর্ত্তিত হইয়াছে, তিনিও গয়ামাহাত্ম্যোক্ত গৌতম নহেন, গোত্রকার গৌতম।

দীর্ঘতমার ঔরসে, প্রদ্বেষীর গর্ভে উৎপন্ন গৌতম লোভ-মোহাভিভূত এবং পিতৃদ্বেষী বলিয়া বর্ণিত। সুতরাং গোত্রকারত্ব-রূপ উচ্চ পদ তাঁহার হইতে পারে না। কাক্ষীবান্ অত্যন্ত তপস্বী হইলেও তিনি গোত্রকার গৌতম নহেন। প্রসিদ্ধ গৌতমের নাম-নিরুক্তি * দর্শনে এবং প্রজাপতি গৌতমের ও গৌতম-কাক্ষীবান্ ঋষির বিভিন্ন লোকে অধিষ্ঠান দর্শনে এতদুভয়ের পার্থক্য বুঝা যায়। দীর্ঘতমার ভ্রাতা গৌতমও গোত্রকার নহেন। কেননা, মৎস্যপুরাণে দুই গৌতম অর্থাৎ এক গোতম আর এক গৌতম গোত্রকার বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন; তন্মধ্যে একজন অঙ্গিরার পুত্র। যে গোত্রে আঙ্গিরস প্রবর, তিনি অঙ্গিরার পুত্র, এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সুতরাং আঙ্গিরস-প্রবরযুক্ত গোত্র-কার গৌতম অঙ্গিরারই পুত্র, অন্য কেহ নহেন। দীর্ঘতমার নামান্তর গোতম; তদ্বংশও বিস্তৃত, এবং 'গৌতম' (গোতমস্যাপত্যম্—অণ্) নামে অভিহিত এইজন্য; প্রবরেও 'বার্হস্পত্য'কে দেখিতে পাইতেছি এইজন্য এবং অন্য গোতমের সংবাদ পাইতেছি না এইজন্য; দীর্ঘতমাকেই গোতম-গোত্রকার বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছি।

গৌতমের বংশে শতানন্দ প্রভৃতি ঋষিগণের জন্ম হয়। শতানন্দের কথা রামায়ণে আদি-কাণ্ডে প্রসিদ্ধ। মাতার দুঃখে শতানন্দ বিশেষ দুঃখিত ছিলেন। তিনি বিশ্বামিত্রকে রাম-সমভিব্যাহারে জনকপুরে উপস্থিত দেখিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, মাতার শাপ-মুক্তি হইয়াছে ত? ইত্যাদি। গোতম-বংশে কাক্ষীবান্ এবং কাক্ষীবৎ-পুত্র ভগবান্ চণ্ডকৌশিক প্রভৃতি ঋষিগণের জন্ম হয়। (১) শরভঙ্গ, (২) আরুণি, (৩) নচিকেতা, (৪) একত, দ্বিত, ত্রিত প্রভৃতি ঋষিগণ 'গৌতম' নামে অভিহিত হইলেও তাঁহারা গৌতম-বংশীয় বলিয়া গৌতম, না, গোতমবংশীয় বলিয়া গৌতম নামে প্রসিদ্ধ, তাহা বলা যায় না। অতএব ইহাঁদের প্রসঙ্গ অঙ্গিরঃ-সন্তান-কীর্ত্তন-প্রসঙ্গে বর্ণনীয়। প্রসিদ্ধ ধর্ম্ম-শাস্ত্রবক্তা গোতম সম্ভবতঃ দীর্ঘতমা।

কেননা, মনুসংহিতায় কথিত হইয়াছে, শূদ্রাকে বিবাহ করিলেই ব্রাহ্মণ পতিত হয়, ইহা উতথ্য-তনয়ের মত। দীর্ঘতমা যে উতথ্য-তনয়, তাহা দেখাইয়াছি। অথচ গোতম একজন ধর্ম্মশাস্ত্রবক্তাও বটেন। দীর্ঘতমার নামান্তরও গোতম। টীকাকারও উতথ্য তনয়-অর্থে গোতম বা গৌতম লিখিয়াছেন। তবে এমনও হইতে পারে,—দীর্ঘতমা, প্রসিদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্রবক্তা গোতম বা গৌতম হইতে বিভিন্ন হইলেও শৌনকাদির ন্যায় তাঁহারও মত মনু কীর্ত্তন করিয়াছেন।

* গোদম ইতি—গো-পদার্থং ভূমিঞ্চ দময়তি বশী-করোতীতি গোদমঃ; তত্র হেতুঃ—দমত ইতি দমেন ইন্দ্রিয়জয়েন দময়তীতি জিতেন্দ্রিয়ত্বাৎ গাং দ্যাঞ্চ দময়িতুং শক্তোঽস্মীত্যর্থঃ। অধূমঃ নির্দ্ধূমাগ্নিতুল্যঃ, অতএবাদমঃ অক্লেন দময়িতুমযোগ্যঃ; তত্র হেতুঃ—তেত্বয়ি সমদর্শনাৎ সমস্য ব্রহ্মণো দর্শনাৎ।

'গোভিস্তমো মম ধ্বস্তং জাতমাত্রস্য দেহতঃ।' ইতি পাঠে দেহতো মাতুর্দ্দেহাজ্জাতমাত্রস্য অকৃততপসোঽপি মম সূর্য্যতুল্যস্য; গোভী রশ্মিভিস্তমোঽন্ধকারং ধ্বস্ত-বতোঽহং, গাবঃ অতমাঃ তমোবিরোধিনো যস্য স ইতি ব্যুৎপত্ত্যা গোতমোঽস্মি। নীলকণ্ঠঃ অস্মাৎ স্বার্থে অণ্ প্রত্যয়ে গৌতম ইতি। (টী)

ফলতঃ কিন্তু, গোতম-সংহিতাকার প্রসিদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্রবক্তা গোতম—দীর্ঘতমা, ইহাই স্থিরবোধ হয়, আর বৃদ্ধ-গৌতম-সংহিতাকার—অঙ্গিরোনন্দন গৌতম। এই অঙ্গিরোনন্দন গৌতম, ন্যায়শাস্ত্র-প্রবর্ত্তক। সেই মহর্ষি গৌতম হইতে এ পর্য্যন্ত মিথিলা, ন্যায়শাস্ত্রচর্চ্চার প্রসিদ্ধ স্থান।

বহুদর্শী পণ্ডিতবর তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয় সাংখ্যতত্ত্ব-কৌমুদীর টীকায় লিখিয়াছেন,—শারীরক-সূত্র-কর্ত্তা ভগবান্ বেদব্যাস, ভগবান্ গৌতমের শিষ্য। ব্যাস, শারীরক-সূত্রে ন্যায়-মত-খণ্ডনে প্রবৃত্ত হইলে, গুরু গৌতম "এ চক্ষুতে আর বেদব্যাসের মুখাবলোকন করিব না" স্থির করেন। পশ্চাৎ বেদব্যাসের অনুনয়-বিনয়ে স্বভাব-শীতল ঋষির কোপশান্তি হইল, কিন্তু আত্মসঙ্কল্প অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য স্বাভাবিক চক্ষুর্দ্বয়ে তাঁহার মুখাবলোকন না করিয়া, যোগবলে চরণে চক্ষু সৃষ্টি করিয়া, তদ্দ্বারা বেদব্যাসের মুখাবলোকন করিলেন। এই হইতে গৌতমের নামান্তর হইল 'অক্ষপাদ'।"

প্রসিদ্ধ তার্কিক জাবালি, গৌতম-শিষ্য জাবালের পুত্র। * মহাভারত, বনপর্ব্বে, পুলস্ত্য-ভীষ্মসংবাদে কথিত হইয়াছে,—ব্রহ্মর্ষি গৌতমের তপোবন—তীর্থ, তথায় অহল্যাহ্রদ এবং জনককূপ আছে। এ গৌতমাশ্রম মিথিলারই অন্তর্গত। তবে মিথিলা-প্রদেশে প্রসিদ্ধ গৌতমাশ্রমে অহল্যা-হ্রদ ও জনক-কূপ আছে কি না অনুসন্ধেয়।

রাজগৃহ-মাহাত্ম্যে রাজ-গৃহ মধ্যে গৌতমবন এবং অহল্যা-হ্রদের অস্তিত্ব কীর্ত্তিত হইয়াছে। † রাজগৃহ জরাসন্ধের রাজধানী, মহাভারতে এই-স্থান গিরিব্রজ নামে অভিহিত। এই রাজধানী-সন্নিধানে গৌতমাশ্রমে তপোবনের অস্তিত্বের কথা মহাভারতেও আছে, কিন্তু তিনি কক্ষীবৎ-পিতা গৌতম বা গোতম দীর্ঘতমা। এইসব বিবেচনা করিলে বোধ হয়, তাঁহারই বংশীয় শরদ্বান্ ঋষি, রাজর্ষি দিবোদাস-ভগিনী অহল্যাকে বিবাহ করেন। সেই অহল্যা হইতেই রাজগৃহে অহল্যা-হ্রদের সৃষ্টি হইয়াছে। গৌতম-বংশীয় বলিয়া এই শরদ্বান্ও 'গৌতম' নামে অভিহিত।

বলা বাহুল্য, এ অহল্যাও ব্রহ্ম-দুহিতা নহেন, এ গৌতমও অঙ্গিরঃ-পুত্র নহেন; সুতরাং দুই শরদ্বান্, সত্যধৃতিদ্বয় এবং অপর শতানন্দ দীর্ঘতমার বংশসম্ভূত ঋষি। কৃপাচার্য্যও এই বংশীয়।

রেভিলগঞ্জের নিকটবর্ত্তী গৌতমাশ্রম, গৌতম-বংশীয় অন্য কোন ঋষির হইবে।

সে যাহা হউক, গোতম ও গৌতম দুই গোত্রই মহর্ষি অঙ্গিরা হইতেই উদ্ভূত।

এক গৌতম-ঋষি-সংবাদ-কীর্ত্তন-প্রসঙ্গে গোতম ও গৌতম দুই মহর্ষির কথাই কীর্ত্তিত হইল। এক্ষণে ইহাঁদিগকে প্রণাম করিয়া, ইহাঁদিগেরও আদিপুরুষ ভগবান্ অঙ্গিরার কথা কীর্ত্তন করিবার জন্য অবসর গ্রহণ করিলাম।

শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন।

---

* সত্যকামো জাবালো * * গৌতমমিয়ায় তং হোবাচ ব্রহ্মচর্য্যং ভবতো বিবৎস্যামি ন এবমুবাচ * * নমিধং সোম্যাহরোপ ত্বানেষ্যে। জাবালশ্রুতি মনু ১০ অঃ ৫ শ্লোকের মেধাতিথিভাষ্য।

† ততশ্চ গচ্ছেচ্ছুভগে গৌতমস্য বনং শুভম্।
অহল্যায়াং নদে স্নাতা বিন্দতে পরমাং গতিম্॥
অহল্যায়া হ্রদঃ খ্যাতো মণিনাগস্য দক্ষিণে।
তত্র স্নাত্বা নরো মুচ্যেৎ পাতকাদুপপাতকাৎ॥
গৌতমস্যাশ্রমস্তত্র সুখদঃ সর্ব্বদেহিনাম্॥
অহল্যা নাম ভার্য্যাস্য তপোনিষ্ঠা পতিব্রতা।
তয়োস্তত্র প্রভাবেণ নির্ম্মিতং ভীর্থমুত্তমম্॥
গঙ্গোদ্ভেদমিতিপ্রাহুর্বিখ্যাতং তৎ তদাখ্যয়া॥
অন্নদানং তথা স্নানং হুতং শ্রাদ্ধং তথৈব চ।
সর্ব্বমক্ষয়তাং যাতি প্রাপ্নোতি বৈশ্রবং পদম্॥
শূদ্রায়াং গৌতমো যত্র বর্ম্মাখ্যায়াংশিতব্রতম্।
ঔশীনর্য্যামজনয়ৎ কাক্ষীবন্তং সুতং মুনিঃ॥

ভট্টিকাব্যের গ্রন্থকার। *

"কাব্যং যশসেঽর্থকৃতে ব্যবহারবিদে শিবেতরক্ষতয়ে।
সদ্যঃপরনির্ব্বৃতয়ে কান্তাসম্মিততয়োপদেশযুজে॥"

কোন কাব্যের টীকাদি লিখিবার পূর্ব্বে প্রাচীন টীকাকারগণ প্রায়শঃ মম্মট ভট্টের এই কারিকাটী উদ্ধৃত করিয়া থাকেন। উক্ত কারিকাতে কবির কাব্য লিখিবার প্রয়োজন এবং পাঠক-সাধারণের উহার আলোচনা করিবার আবশ্যকতা প্রতিপাদিত হইয়াছে। কবি কাব্য লিখেন,—(১) যশসে—অমর কীর্ত্তি লাভ করিবার নিমিত্ত; (২) অর্থকৃতে—ধনলাভের জন্য;—উদাহরণস্থলে "শ্রীহর্ষাদের্ধাবকাদীনামিব ধনং" বলা হয়। কাশ্মীরাধিপতি শ্রীহর্ষদেবের কবিযশঃস্পৃহা বড়ই বলবতী ছিল, অথচ তদনুরূপ কবিত্ব ছিল না; তাই দরিদ্র-কবি ধাবককে প্রচুর ধনদান পূর্ব্বক রত্নাবলী, নাগানন্দ প্রভৃতি প্রণয়ন করাইয়া "শ্রীহর্ষো নিপুণঃ কবিঃ"—এই খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। † কবির কাব্য লিখিবার তৃতীয় প্রয়োজন—শিবেতরক্ষতয়ে—অমঙ্গল-বিনাশনের নিমিত্ত; যেমন ময়ূর ভট্ট সূর্য্যশতক প্রণয়ন করিয়া দুরারোগ্য কুষ্ঠব্যাধি হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন। এই গেল কবির কথা। তার পর পাঠকের কথা। উহাঁরা কাব্যালোচনা করিবেন,—(১) ব্যবহারবিদে—লোকাচার-পরিজ্ঞানের নিমিত্ত; যেমন মৃচ্ছকটিক নাটক পড়িলে রাজা শূদ্রকের সময়ে (প্রায় ৩০০ খৃঃ পূঃ) ধর্ম্মাধিকরণে কিরূপ বিচারপ্রণালী প্রচলিত ছিল, তাহা জানা যায়। (২) সদ্যঃপরনির্ব্বৃতয়ে—কাব্য-পাঠ মাত্রেই কি এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দরসে হৃদয় আপ্লুত হইয়া যায়, তাহার অনুভবের নিমিত্ত। বিশেষতঃ (৩) কান্তাসম্মিততয়োপদেশযুজে—শ্রুতিপ্রভৃতি আমাদিগকে প্রভুর ন্যায় আদেশ করেন; পুরাণেতিহাস বন্ধুর ন্যায় উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন; কিন্তু পতিহিতৈষিণী প্রণয়িনী যেরূপ উন্মার্গগামী ভর্ত্তাকে অবসর বুঝিয়া নানাছাঁদে বিনাইয়া কোমল মধুর স্ফুটাস্ফুট বচনাবলী দ্বারা ধীরে ধীরে সৎপথে আসিতে উপরোধ করিয়া থাকেন, তদ্রূপ কাব্য, পাঠকের মনে নানা রস ও ভাবের অবতারণা করিয়া, তাহারই ভিতর দিয়া মহৎ চরিত্রের সাধু আদর্শ প্রভৃতি অলক্ষিতভাবে হৃদয়-পটে মুদ্রিত করিয়া, অল্পাধিক উপদেশ প্রদান করিয়া থাকে।

উল্লিখিত উদ্দেশ্যাবলীর কোন্‌টী অবলম্বন-পূর্ব্বক ভট্টিকাব্যের গ্রন্থকার তদীয় মহাকাব্য প্রণয়ন করিয়াছেন এবং উহা পাঠ করিলে পাঠকেরই বা কি ফললাভ হয়, তাহা প্রসঙ্গক্রমে যথাস্থানে আলোচিত হইবে। উপস্থিত, ভট্টিকাব্য কাহার রচিত—ইহাই আমাদিগের প্রধানতঃ, আলোচনার বিষয়। ভর্ত্তৃহরি নামক কবি এই গ্রন্থের প্রণেতা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হন। তাহা হইলে, সংস্কৃত সাহিত্যে দুই জন কবি ভর্ত্তৃহরি নামে খ্যাত ছিলেন * বলিতে হইবে;—(১) শৃঙ্গারশতক, নীতিশতক এবং বৈরাগ্যশতক এই কোষকাব্যত্রয়ের গ্রন্থকার ও (২) ভট্টিকাব্যের রচয়িতা। এ স্থলে আপত্তি হইতে পারে যে, দুই জন ভর্ত্তৃহরি কল্পিত না হইয়া একজন কবিকেই শতকত্রয় এবং ভট্টিকাব্যের রচয়িতা বলা যায় না কেন? এই আপত্তি-খণ্ডনের নিমিত্ত দুই প্রকার প্রমাণ

---

* শিল্প সাহিত্য-সভার সমালোচনী শাখার বিশেষ অধিবেশনে শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য, বিদ্যাবিনোদ, এম্-এ, কর্ত্তৃক পঠিত। জ, স।

† এই উদাহরণের যাথার্থ্য সম্বন্ধে অনেকেরই কিন্তু সন্দেহ আছে।

* শব্দশাস্ত্রের সম্প্রদায়-বিশেষ-গুরু, বাক্যপদীয় নামক গ্রন্থরচয়িতা প্রসিদ্ধ ভর্ত্তৃহরি এই দুইজনের অন্তর্গত কি না, তাহা অনুসন্ধান করা উচিত। জ, স।

প্রয়োগ করা যায়; প্রথম বাহ্য,—কোষ-কবি ভর্ত্তৃহরি এবং ভট্টি-কবি ভর্ত্তৃহরির ভিন্ন ভিন্ন জীবনাখ্যায়িকা লোকসমাজে প্রচারিত আছে; দ্বিতীয় আভ্যন্তরিক,—তাঁহাদিগের রচিত কাব্য মধ্যে বিভিন্নভাব ও রুচি পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

শৃঙ্গারশতক প্রভৃতির রচয়িতা ভর্ত্তৃহরি রাজা ছিলেন। কথিত আছে, তিনি—ভারতের হারুণ-অল-রসিদ—রাজা বিক্রমাদিত্যের অগ্রজ ছিলেন। মধ্যযুগের রাজন্যবর্গের যেমন রীতি ছিল, তিনিও তদ্রূপ বিলাসী রাজা ছিলেন। শুনা যায়, একদিন কোন সন্ন্যাসী একটী ফল আনিয়া রাজাকে বলিলেন যে, এই ফলভক্ষণকারী ব্যক্তি চির-যৌবনসম্পন্ন হইবেন। ভোগবিলাস-পরায়ণ স্ত্রৈণ রাজা, নিজে না খাইয়া, সেই ফল রাণীকে উপহার দিলেন। রাণীর এক উপপতি ছিল, তিনি তাহাকে দিলেন। ঐ ব্যক্তির অপর এক উপপত্নী ছিল, সে উহাকেই ফল অর্পণ করিল। সেই রমণীর আবার রাজার প্রতি প্রগাঢ় আসক্তি ছিল, সে পরকীয়া-ভাবের নিষ্কামত্ব প্রদর্শনপূর্ব্বক রাজাকেই ফল প্রদান করিল। এইরূপে ফলটী পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া রাজা বিস্মিত হইলেন এবং অনুসন্ধান পূর্ব্বক আমূল বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া সংসারে বীত-রাগতা বশতঃ তৎক্ষণাৎ অবধূতাশ্রম গ্রহণ করিলেন। প্রবাদ—তদীয় নীতিশতকের প্রথম শ্লোকে এই ঘটনাই উল্লিখিত হইয়াছে—

"যাং চিন্তয়ামি সততং ময়ি সা বিরক্তা
সা চান্যমিচ্ছতি জনং স জনোঽন্যরক্তঃ।
অস্মৎকৃতেঽপি পরিতুষ্যতি কাচিদন্যা
ধিক্ তাঞ্চ তঞ্চ মদনঞ্চ ইমাঞ্চ মাঞ্চ ॥"

এই ভর্ত্তৃহরির জীবনী অনেক পরিমাণে শান্তিশতক-কার শিহ্লন মিশ্রের * অনুরূপ। শৃঙ্গার, নীতি ও বৈরাগ্য-শতকের উদ্দেশ্য ও ভাব প্রায়ই শান্তিশতকের ন্যায়। এমন কি, ভর্ত্তৃহরির অনেক কবিতা শান্তিশতকে অবিকল দেখিতে পাওয়া যায়; উদাহরণ স্থলে নিম্নে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইল। ইহাতে উভয় কবিই যেন সমস্বরে স্বীয় জীবনের পূর্ব্বকাহিনী এবং তাৎকালিক ভাব জনসমাজে বিবৃত করিতেছেন,—

"যদাসীদজ্ঞানং স্মরতিমিরসংস্কারজনিতং
তদা জ্ঞাতং নারীময়মিদমশেষং জগদপি।
ইদানীমস্মাকং পটুতরবিবেকাঞ্জনজুষাং
সমীভূতা দৃষ্টিস্ত্রিভুবনমপি ব্রহ্ম মনুতে ॥"

ভট্টিকাব্যের গ্রন্থকারের জীবনী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তিনি, পরম ভাগবত শ্রীমদ্ভাগবতের টীকাকার শ্রীধর স্বামীর পুত্র। তাঁহার অদ্ভুত শৈশব-কাহিনী ভক্তমাল গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করা গেল—

"শ্রীল শ্রীধরস্বামী জগতে বিদিত।
শ্রীমদ্ভাগবত-টীকা কৈল বিস্তারিত ॥
* * *
শাঙ্করী বিরুদ্ধ গৌণ রক্ষণা ব্যাখ্যান।
দূষিয়া স্থাপিলা শুদ্ধ মত বিলক্ষণ ॥
* * *
গৃহে এক স্ত্রী মাত্র পূর্ণগর্ভবতী।
ত্যজিয়া যাইতে বন হৈল দৃঢ়মতি ॥
হেন কালে নারী পুত্র প্রসব হইয়া।
কালপ্রাপ্তি হৈল তার বালক রাখিয়া ॥
সাধু উৎকণ্ঠাতে গৃহে রহিতে না পারে।
চিন্তিত বালক এই কেবা রক্ষা করে ॥
ভাবিতে ভাবিতে দৈবে এক জ্যেঠী-ডিম্ব।
চাল হতে প'ড়ে গেল বিনা অবলম্ব ॥
ভাঙ্গিয়া ভিতর হতে বাচ্ছা নিকলিয়া।
খাইল সম্মুখে এক মক্ষিকা ধরিয়া ॥
সাধু তাহা দেখি মনে বিচার করিল।
সেই শিশু রক্ষিবে যে ইহারে রক্ষিল ॥
এতেক ভাবিয়া ত্যজি গমন করিল।
অনাথ বালক গ্রাম্য লোকেতে পালিল ॥
সেই শিশু, কালে মহা-পণ্ডিত হইল।
ভট্টিনামে রামলীলা সাহিত্য রচিল ॥"

গ্রন্থকার নিজ কাব্যের উপসংহারে আত্ম-পরিচয়-স্থলে এই মাত্র বলিয়াছেন—

"কাব্যমিদং বিহিতং ময়া বলভ্যাং
শ্রীধরসেন(?)নরেন্দ্র পালিতায়াম্।" *

ইহাতে দেখা যায় যে, ভট্টিকাব্যের গ্রন্থকার বলভী-নগরাধিপ শ্রীধরসেন(?) ভূপতির আশ্রয়ে থাকিয়া এই কাব্য রচনা করেন।

উপরে যাহা বর্ণিত হইল, তদ্দ্বারা উভয় কবির জীবনীতে বিলক্ষণ বৈষম্য পরিলক্ষিত হইতেছে এবং উহাই উভয় কবি একই ব্যক্তি না হইবার যথেষ্ট প্রমাণ। † এই গেল বাহ্য প্রমাণ; আভ্যন্তরিক প্রমাণও দুই একটী প্রদর্শিত হইতেছে।—কোষকাব্যের রচয়িতা ভর্ত্তৃহরির উদ্দেশ্য ভাল হইলেও, শৃঙ্গার-শতকে আদিরসের অযথা অনেক ছড়াছড়ি করিয়া উক্ত শতকের নাম সার্থক করিয়াছেন এবং স্বীয় রুচিরও বিলক্ষণ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু ভট্টিকাব্যের রচয়িতা তদীয় প্রকাণ্ড গ্রন্থে অনতিস্থূল একটী সর্গে (একাদশে) মাত্র আদিরসের অবতারণা করিয়াছেন। তাহাতেও তাঁহার দুইটী উদ্দেশ্য বুঝা যায়;—প্রথম, সমস্ত রসের প্রধান আদিরস একটা মহাকাব্যের অঙ্গী না হইলেও অঙ্গরূপে থাকা আবশ্যক; * দ্বিতীয় গ্রন্থের প্রধান উদ্দেশ্য শব্দশাস্ত্রের নানাবিষয়ক উদাহরণ-প্রদর্শন, তাই কাব্যমধ্যে আদিরসের উদাহরণও প্রয়োজন। টীকাকারও বলেন—"মাধুর্য্যমপি কাব্যস্য গুণ উক্তঃ। ইতি তৎ-প্রদর্শনার্থং লঙ্কাপ্রভাতবর্ণনমধিকৃত্য আহ।" এ স্থলে ইহাও উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, এ বিষয়ে কবি অনেক পরিমাণে সংযত রুচি অনুসরণ করিয়া মাঘ, ভারবি, শ্রীহর্ষাদিরও অপেক্ষা সমধিক প্রশস্ত হইয়াছেন।

আর একটী আভ্যন্তরিক প্রমাণ দেখা যায়। কোষকাব্যের কবি ভর্ত্তৃহরি প্রগাঢ় শৈব ছিলেন। তিনি বৈরাগ্যশতকে শিবার্চ্চনা-বিষয়ক শ্লোকমালার একটীতে মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন;—

"মহেশ্বরে বা জগতামধীশ্বরে
জনার্দ্দনে বা জগদন্তকারণে।
ন বস্তুতো মে প্রতিপত্তিরস্তি
তথাপি ভক্তিস্তরুণেন্দুশেখরে ॥"

মহাকালাধিষ্ঠিত উজ্জয়িনীর ভূতপূর্ব্ব অধীশ্বরের এবং সম্প্রতি অবধূতাশ্রমাবলম্বীর ইহা হইবারই কথা। কিন্তু ভট্টিকাব্যের গ্রন্থকার একজন বিশ্ববিখ্যাত বৈষ্ণবের সন্তান, তাঁহার অবশ্য বৈষ্ণব হওয়াই স্বাভাবিক এবং "রামলীলা-সাহিত্য" রচনা করিয়া তিনি ঘোর বৈষ্ণব ভক্তমাল-রচয়িতারও প্রশংসাভাজন হইয়াছেন। বিশেষতঃ টীকামুখে ভট্টিকাব্যের টীকাকারগণ সমস্বরে স্বীকার করিয়াছেন যে, কাব্যের প্রথম শ্লোকে "সনাতনঃ পিতরমুপাগমৎ স্বয়ং" এই পদ দ্বারা কবি স্বীয় ইষ্টদেবতাকেই স্মরণ করিয়াছেন।

ভট্টিকাব্যের গ্রন্থকারের নাম কি ছিল, তাহা অদ্যাবধি বিতর্কের বিষয় হইয়া রহিয়াছে।

---

* শিহ্লন মিশ্রের জীবনী বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের জীবনীর অবিকল অনুরূপ;—অধিক কি, উভয়কে একই ব্যক্তি বলিয়া যেন সন্দেহ হয়।

* বলভী একসময় ভারতবর্ষের মধ্যে সুসমৃদ্ধ রাজধানী ছিল, সেই সময়ের এবং তৎস্থলীয় রাজগণের বিস্তৃত বিবরণ অনুসন্ধান করিলে ভাল হয়। জং সং।

† উভয়ের আবির্ভাব-কালেরও বিলক্ষণ অন্তরায় রহিয়াছে। ভর্ত্তৃহরির অনুজ বিক্রমাদিত্যের অনেক পরে শঙ্করাচার্য্য এবং শঙ্করাচার্য্যের অনেক পরে ভট্টিকারের পিতা শ্রীধর স্বামী জন্মপরিগ্রহ করেন।

* শৃঙ্গারবীরশান্তানামেকোঽঙ্গী রস ইষ্যতে।
অঙ্গানি সর্ব্বেঽপি রসাঃ। সাহিত্যদর্পণ।

টীকাকার জয়মঙ্গলের মতে গ্রন্থকারের নাম ভট্ট বা ভট্টি এবং কবির অনুকরণে তিনিও স্বকৃত টীকার নাম 'জয়মঙ্গলা' রাখিয়াছেন। তাঁহার টীকার উপক্রমণিকায় আছে—"শ্রীস্বামিসূনুঃ কবির্ভট্টিনামা রামকথাশ্রয়ং মহাকাব্যং চকার"; আবার পরিসমাপ্তিতে লিখিয়াছেন; "ইতি শ্রীস্বামিসূনোর্ভটমহাব্রাহ্মণস্য কৃতৌ" ইত্যাদি। বৈদ্য টীকাকৃৎ ভরতমল্লিক বলেন,—"ভর্তৃহরির্নাম কবিঃ শ্রীরামকথাশ্রয়ং মহাকাব্যং চকার।" কবি আপন গ্রন্থ মধ্যে আপনার নাম কুত্রাপি উল্লেখ করেন নাই; অপর কবিগণ হইতে ইহাও তাঁহার এক বিশেষত্ব। বঙ্গানূদিত ভক্তমালেও * তাঁহার নাম দেওয়া হয় নাই। কিন্তু ভক্তমালোদ্ধৃত বিবরণ পাঠ করিলে স্বতই অনুমান হয় যে, যেহেতু পরম ভাগবত পিতা শ্রীধর স্বামী অনাথশরণ ভগবান্ শ্রীহরির উপরেই নবজাত শিশুর ভরণের ভারার্পণ করিয়া সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করেন, তাহাতে কবির নাম 'ভর্তৃহরি' হওয়াই স্বাভাবিক। শৈশবে "গ্রাম্য লোক" দ্বারা প্রতিপালিত হওয়াতে তদীয় নামের প্রাকৃতাপভ্রংশ হইয়া 'ভট্টি' এই অদ্ভুত আকার ধারণ করাও নিতান্ত অসম্ভব নহে। অথবা, "কালে সেই শিশু মহাপণ্ডিত" হইলে 'ভর্তৃহরি ভট্ট' এই নাম ধারণ করিয়া, পিতা শ্রীধর স্বামী যেমন মাত্র 'স্বামী' নামে পরিচিত হইয়া থাকেন, তদ্রূপ, 'ভট্ট' এই খ্যাতিতেই, বোধ হয়, তৎকালে পরিচিত হইতেন এবং তজ্জন্যই তদ্রচিত কাব্যও 'ভট্টিকাব্য' এই সংজ্ঞা লাভ করিয়াছে। এইরূপ কল্পনা দ্বারা জয়মঙ্গল ও ভরতমল্লিকের বিবাদের একপ্রকার সমন্বয় হইতে পারিত; কিন্তু তাহাতে এক মহান্ অন্তরায় রহিয়াছে। সাহিত্যদর্পণে মহাকাব্যলক্ষণে আছে;—

"কবের্ব্বৃত্তস্য বা নাম্না নায়কস্যেতরস্য বা।
নাম্নাস্য—" দর্পণটীকাকার রামচরণ তর্কবাগীশ (১৬২৩ শকাব্দ) উক্ত কারিকার উদাহরণস্থলে লিখিয়াছেন—"কবিনামকং মহাকাব্যং যথা মাঘভারবিপ্রভৃতি; বৃত্তনামকং কুমারসম্ভবাদি; নায়কনামকং রঘুপ্রভৃতি; ইতরনামকং ভট্টিপ্রভৃতি।" ইহাতে জয়মঙ্গলের মত সম্পূর্ণ বিপর্য্যস্ত হইতেছে। তবে, কবির নামে নাম না হইলে, "ভট্টিকাব্য" এই সংজ্ঞার তাৎপর্য্য কি? এতৎসম্বন্ধে কাব্যের পরিসমাপক নিম্নোদ্ধৃত দুইটী শ্লোক দ্বারা দুই প্রকার মীমাংসা কল্পিত হইতে পারে—

(১) "ব্যাখ্যাগম্যমিদংকাব্যমুৎসবঃসুধিয়ামলম্।
হতা দুর্ম্মেধসশ্চাস্মিন্ বিদুষাং প্রীতয়ে ময়া॥"

ইহাতে একপ্রকার অনুমান করা যাইতে পারে যে, গ্রন্থকার পণ্ডিত(ভট্ট)গণের পরিতোষার্থ কাব্য রচনা করাতে কাব্যের নাম 'ভট্টিকাব্য' হইয়াছে।

(২) "কাব্যমিদং বিহিতং ময়া বলভ্যাং
শ্রীধরসেন*নরেন্দ্রপালিতায়াম্।
কীর্ত্তিরতো ভবতান্নৃপস্য তস্য
ক্ষেমকরঃ ক্ষিতিপো যতঃ প্রজানাম্॥"

এতদ্দ্বারা অনুমান করা যায় যে, কাব্যরচনার শ্রেষ্ঠতম ফল 'কীর্ত্তি' আশ্রয়দাতা ভট্টারকের নামে উৎসর্গীকৃত হওয়াতেই 'ভট্টিকাব্য' এই নাম সিদ্ধ হইয়াছে।

যাহা হউক, ভরতমল্লিকের মতই সমধিক প্রমাণ বলিয়া এতদ্দেশে গৃহীত হইয়াছে এবং ভর্তৃহরি নামক কবি ভট্টিকাব্যের গ্রন্থকার, ইহা একরূপ সর্ব্ববাদিসম্মত। "সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃতসাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাবে" স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় ভরতমল্লিকের মত পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রাচীন টীকাকার জয়মঙ্গলকে প্রামাণিক বলিয়া তাঁহার মত গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি বলেন,—"ভট্টিকাব্য ভর্তৃহরি-রচিত—ইহা অসম্ভব, কেননা ভর্তৃহরি স্বয়ং রাজা হইয়া বলভীরাজের আশ্রয়ে ছিলেন—তাহা হইতে পারে না। যদিও উক্ত প্রমাণ বড় অকাট্য নহে, তথাপি তৎসম্বন্ধে আমাদিগের মতবিরোধ নাই; বরং উহা অপেক্ষা গুরুতর প্রমাণাবলীর দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে যে, রাজা ভর্তৃহরি ভট্টিকাব্যের রচয়িতা নহেন।" ভরতমল্লিকও এমন কথা বলেন নাই যে, কোষকাব্য-প্রণেতা রাজা ভর্তৃহরি ভট্টিগ্রন্থ লিখিয়াছেন। এই আপাত-বিরোধ মীমাংসার জন্যই দুইজন ভর্তৃহরি কল্পিত করা গিয়াছে। অপর, জয়মঙ্গল প্রাচীন টীকাকার বলিয়াই যে প্রামাণিক হইবেন, এরূপ বলাও সঙ্গত নহে; তাহা হইলে কালিদাসের 'দুর্ব্বাখ্যাবিষমূর্চ্ছিতা' ভারতীকে সঞ্জীবনী দ্বারা উজ্জীবিতা করিবার প্রয়াস অর্ব্বাচীন মল্লিনাথকে করিতে হইত না। যাহা হউক, জয়মঙ্গল প্রামাণিক—সন্দেহ নাই, তথাপি যে ভরতমল্লিক অধুনাতন হইয়াও তাঁহার মতের বিপরীত মত প্রকাশ করিতে সাহসী হইয়াছিলেন, ইহাতে বোধ হয় তিনি নিজমতপোষক সবিশেষ প্রমাণ অবশ্যই পাইয়া থাকিবেন। বিশেষতঃ, প্রাগুক্ত দর্পণ-টীকাকার প্রায় দ্বিশতবর্ষপ্রাচীন তর্কবাগীশকেও ভরতেরই তুল্যমতাবলম্বী দেখিতে পাওয়া যায়। জয়মঙ্গল যে তাৎকালিক কোন অমূলক কিংবদন্তীর উপর নির্ভর করিয়া যদৃচ্ছাক্রমে একটা মত খ্যাপন করিয়া যান নাই, কে বলিতে পারে? অপিচ ইতিপূর্ব্বে কাব্যের পরিসমাপক যে দুই শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা হইতে দেখা যায় যে, বিদ্বদ্বর্গের পরিতুষ্টির জন্য এবং স্বীয় আশ্রয়দাতা যশস্বী হউন—এই উদ্দেশ্যেই, তিনি কাব্য-রচনা করেন। কাব্য লিখিয়া নিজে নাম করিব—এমন ভাব তাঁহার দেখা যায় না। এমন কি, অপর কবিগণের ন্যায় তিনি সর্গ-সমাপ্তি-সময়েও আপনার নামোল্লেখ করিতে সঙ্কুচিত হইয়াছেন; এরূপ বিনীত নিষ্কাম কবি নিজ নামে কাব্যের নামকরণ করিয়াছেন—ইহা আপাতদৃষ্টিতেই যেন অসঙ্গত বোধ হয়।

স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় তদীয় "সংস্কৃত-ভাষা ও সংস্কৃত-সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাবে" সংস্কৃতভাষার সরল, মধুর, ললিত প্রভৃতি রচনার উদাহরণস্থলে ভট্টিকাব্যের দ্বিতীয় সর্গের প্রথম হইতে ঊনবিংশতি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন। ফলতঃ ভট্টির দ্বিতীয় সর্গের প্রথমাংশ পাঠ করিলে, বোধ হয়, যদি কবি সাধ করিয়া ব্যাকরণের নিগড়বদ্ধ না হইতেন, তাঁহার স্থান মাঘ-ভারবি-নৈষধের, পূর্ব্বে না হউক, পার্শ্বেই হইত। শব্দশাস্ত্রের উপর তাঁহার যেরূপ অধিকার ছিল, অপর কোন কবির তদ্রূপ ছিল কিনা সন্দেহ; অথচ সহৃদয়তা এবং কবিত্বও তাঁহাতে যথেষ্ট ছিল। কাব্য লিখিয়া নিজের কবিত্বখ্যাপন করা অপেক্ষা যাহাতে তাঁহার শক্তি বিদ্যার্থীর উপকারার্থ নিয়োজিত হয়, ইহাই যেন কবির একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। এই কাব্য-প্রণয়ন সম্বন্ধে অস্মদ্দেশে এক অদ্ভুত কিংবদন্তী প্রচারিত আছে। কবি একজন অতি প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ ছিলেন; নানা দিগ্দেশ হইতে অনেক ছাত্র তাঁহার নিকট অধ্যয়নমানসে আসিত। একদা তিনি অধ্যাপনা করিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার ও ছাত্রদিগের মধ্য দিয়া হঠাৎ একটী হস্তী চলিয়া গেল এবং তজ্জন্য এক বৎসর অধ্যাপনা বন্ধ রাখিতে হইল। বেদাঙ্গ ব্যাকরণের পাঠ বন্ধ থাকিলেও

* মূলগ্রন্থ ভক্তমাল দেখিবার নিতান্ত বলবতী স্পৃহা সত্ত্বেও এ যাবৎ লেখকের ভাগ্যে তাহা ঘটিয়া উঠিল না।

* বঙ্গীয় পুস্তকে এইরূপ পাঠ দেখা যায়। কিন্তু "শ্রীধরজেন" এই পাঠই যেন গ্রন্থকারের অভিপ্রেত বোধ হয়। লিপিকরপ্রমাদে 'জ' স্থলে 'স' হওয়া বিচিত্র নহে। জয়মঙ্গল "শ্রীধরসূনু" এই পাঠ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

কাব্যাদি উপশাস্ত্র সম্বন্ধে তত আটা-আঁটি নাই, এই নিমিত্ত, শিষ্যদিগের উপরোধে, তিনি ব্যাকরণ-শিক্ষার সাহায্যকারী কাব্যগ্রন্থ-প্রণয়নে প্রবৃত্ত হন এবং সংবৎসর কাল মধ্যে উহা সমাপ্ত করিয়া ছাত্রদিগকে পড়াইয়াছিলেন।* এই জনশ্রুতির তথ্যানুসন্ধান সুদূরপরাহত। মনুসংহিতার চতুর্থ অধ্যায়ে অনধ্যায়-প্রকরণে বিধান আছে ;—

"পশুমণ্ডূকমার্জ্জার-শ্বসর্পনকুলাখুভিঃ।
অন্তরাগমনে বিদ্যাদনধ্যায়মহর্নিশম্ ॥"

"পশুর্গবাদিঃ"—(কুল্লুকভট্ট)। গবাদিতে হস্তীও থাকিবার কথা; তাহা হইলে এক অহোরাত্র মাত্র অনধ্যায় হওয়া উচিত ছিল,—সংবৎসর অনধ্যায়ের কোন হেতু দেখা যায় না। তবে মূষিক, নকুল, ভেক, সর্পাদি ক্ষুদ্র জন্তুর অন্তরাগমনে যে ব্যবস্থা, একটা প্রকাণ্ড জন্তুর পক্ষেও কি সেই ব্যবস্থা? এইরূপ বিতর্ককারী কোন তার্কিক দিগ্‌গজ গজপক্ষে, অনুপাতক্রমে এক বৎসর অনধ্যায় বিধান করিয়া এই একটা অমূলক কিংবদন্তী রটাইয়াছেন কি না কে বলিতে পারে?

অস্মদ্দেশীয় টোলের ছাত্রদিগের নিকট ভট্টিকাব্যের বিলক্ষণ সমাদর দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা আশৈশব, ব্যাকরণ-সূত্রগুলি শুষ্ক উদাহরণ সহ কণ্ঠস্থ করিয়া থাকেন; তাই, এই কাব্য-মধ্যে ঐ সকল সূত্রের সুপ্রযুক্ত সরস উদাহরণমালা দেখিয়া তাঁহারা বড়ই প্রীতিসহকারে সেইগুলি আবৃত্তি করিতে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু ব্যাকরণ-বিমুখ ইদানীন্তন কাব্য-মধুকরগণের পক্ষে ভট্টিকাব্য নিতান্ত নীরস ও কর্কশ বোধ হইবারই কথা। বস্তুতঃ, প্রথম কয়েক সর্গ ভিন্ন ভট্টির অপর সর্গগুলি যেন ব্যাকরণের এক এক পরিচ্ছেদ। কাব্য-বিভাগে ভট্টি যেমন দ্বাবিংশতি সর্গে বিভক্ত, ব্যাকরণ-বিভাগে উহা আবার, প্রধানতঃ, চারি কাণ্ডে বিভক্ত;—প্রথম হইতে পঞ্চম সর্গ—প্রকীর্ণকাণ্ড, ষষ্ঠ হইতে নবম—অধিকারকাণ্ড, দশম হইতে ত্রয়োদশ—প্রসন্নকাণ্ড এবং চতুর্দ্দশ হইতে দ্বাবিংশ—তিঙন্ত কাণ্ড। প্রকীর্ণকাণ্ড নানাবিষয়ক, সুতরাং ইহাতে কবির কবিত্বের স্ফূর্ত্তিলাভের একটু অবকাশ ছিল; তাই প্রথম হইতে পঞ্চম * সর্গ সাহিত্যসেবীর কথঞ্চিৎ মনোরঞ্জন করিতে পারে এবং এই জন্যই বিশ্ববিদ্যালয়ে এই কয় সর্গের যৎকিঞ্চিৎ আদর। অধিকারকাণ্ডে কৃত্তদ্ধিতাদি প্রত্যয়ের উদাহরণ প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রসন্নকাণ্ডে কবি বাক্যের প্রসাদসূচক অলঙ্কার প্রভৃতির অবতারণা করিয়াছেন এবং তিঙন্তকাণ্ডে আখ্যাত-প্রকরণ, অর্থাৎ ক্রিয়ারূপ প্রদর্শন করিয়াছেন। এই স্থূল বিভাগ ব্যতীত প্রত্যেক কাণ্ডের আবার নানা উপ-বিভাগ আছে,—এ স্থলে তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। ব্যাকরণই কবির একমাত্র লক্ষ্য হওয়াতে কাব্যের বিষয়-নির্ব্বাচনে তিনি মৌলিকতা-প্রদর্শনের অবসর পান নাই; কিন্তু আধুনিক কবিগণের প্রধান উপজীব্য বাল্মীকির অমর গ্রন্থের আশ্রয়-গ্রহণ করাতে কাব্যের উপাদানের নিমিত্ত তাঁহাকে বড় বেগ পাইতেও হয় নাই।

এখন এই প্রবন্ধ-সূচনায় উদ্ধৃত মম্মট ভট্টের কারিকাটীর প্রতি লক্ষ্য করিয়া দেখা যাউক, এই মহাকাব্য লিখিয়া গ্রন্থকারের কি প্রয়োজন সাধিত হইয়াছে এবং উহা পাঠে অধ্যয়নকারীরই বা কি ফললাভ হইয়া থাকে। পূর্ব্বেই

* এ দেশে প্রচলিত প্রবাদ;—অধ্যয়নে অনাবিষ্ট রাজপুত্র, ভর্ত্তৃহরির নিকটে অধ্যয়নার্থ নিযুক্ত হয়। রাজপুত্রের ষড়যন্ত্রেই পাঠকালে অধ্যাপক এবং রাজপুত্রের মধ্য দিয়া হস্তী চালিত হয়। তৎপরে ভর্ত্তৃহরি সেই ষড়যন্ত্র জানিতে পারিয়া কাব্যচ্ছলে ব্যাকরণ উপদেশ দেন। জ, স।

* পঞ্চম সর্গ 'প্রকীর্ণ' ও 'অধিকার' এই উভয়কাণ্ড-মিশ্রিত।

বলা গিয়াছে, ভট্টিকাব্যের গ্রন্থকার 'কবি-যশঃ-প্রার্থী' ছিলেন না—বরং তৎকাব্যজনিত কীর্ত্তি—কৃতজ্ঞতার উপহার স্বরূপ আশ্রয়দাতা নরেন্দ্র-নৃপতিকেই উৎসর্গীকৃত করিয়াছেন। কিন্তু কবি স্বয়ং কিছু প্রার্থী না হইলেও, উল্লিখিত নিষ্কাম সহৃদয়তা প্রদর্শন করাতে, তদীয় ন্যায্য প্রাপ্য কবিযশঃ সমধিক পরিবর্দ্ধিতই হইয়াছে। ব্যাকরণাধ্যায়ীদিগের দুষ্প্রাপ্য উদাহরণরাশি রসাত্মক বাক্যাকারে গ্রথিত করিয়া প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য প্রকাশ করাতে, কবি-কীর্ত্তির সঙ্গে তদীয় পাণ্ডিত্য-কীর্ত্তি সম্মিলিত হইয়া গ্রন্থকারকে অনন্য-সাধারণ যশস্বী করিয়া তুলিয়াছে; সুতরাং ভট্টিকাব্য তদীয় প্রণেতার 'যশসে'ই হইয়াছে বলিতে হইবে। * অধ্যয়নকারীরও বিশেষ ফল আছে। মম্মট-মতানুযায়ী 'ব্যবহার'-পরিজ্ঞান ইহাতে কিঞ্চিৎ হয় বটে, কিন্তু কবিগুরু বাল্মীকি অনেক পূর্ব্বেই অধিকতর দক্ষতা-সহকারে তাহা সর্ব্বজনগোচরীভূত করিয়া গিয়াছেন। কাব্যের অংশবিশেষ (যথা, দ্বিতীয় সর্গ) পাঠ করিলে সদ্যঃ-পর-নির্ব্বৃতি'ও হইয়া থাকে। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা এই মহাকাব্য পাঠকের 'উপদেশযুজে'ই প্রণীত হইয়াছে। রামচরিত্রের পুণ্যকাহিনী যে গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে, তাহা কাব্যাংশে যেরূপই হউক না কেন, অধ্যয়নকারীর অন্তঃকরণে নায়কের মহৎ চরিত্রের ছায়া অল্পাধিক পাতিত করিবেই করিবে। এই নৈতিক উপদেশ ব্যতীতও ভট্টিকাব্যানুশীলনকারীর অন্যবিধ উপদেশ লাভ হয়, যাহা অপর কাব্য-গ্রন্থ হইতে লাভ করা দুষ্কর। ধৈর্য্যসহকারে এই গ্রন্থ সমগ্র অধ্যয়ন করিতে পারিলে শব্দ-শাস্ত্রে বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে পারা যায়। কিন্তু যিনি এই উপদেশপ্রার্থী, তাঁহার গ্রন্থোপসংহারকালীন গ্রন্থকারের একটী কথা মনে রাখা উচিত।

"দীপতুল্যঃ প্রবন্ধোঽয়ং শব্দলক্ষণচক্ষুষাম্।
হস্তামর্ষ ইবাস্কানাং ভবেদ্ব্যাকরণাদৃতে ॥"

ফলতঃ অগ্রে ব্যাকরণ-শাস্ত্রে কিঞ্চিৎ ব্যুৎপন্ন না হইয়া এই কাব্য অধ্যয়ন করিলে যথেপ্সিত ফললাভ করা এক প্রকার অসম্ভব।

"মধুরেণ সমাপয়েৎ";—সুতরাং কিঞ্চিৎ অপ্রাসঙ্গিক হইলেও, আরও দুই একটী কথা বলিতে হইল। টোলের ভট্টাচার্য্যদিগের মুখে একটী শ্লোকার্দ্ধ শুনা যায়;—

"ভট্টাবেকত্রয়ো মাঘে রঘৌ কাব্যং পদে পদে।"

এই 'একে'র ব্যাখ্যা কেহ করেন 'সর্গ', কেহ করেন 'শ্লোক।' সর্গবাদীরা দ্বিতীয় সর্গ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। তৎসম্বন্ধে পূর্ব্বেই যৎকিঞ্চিৎ আলোচিত হইয়াছে। শ্লোকবাদিগণের মধ্যে কেহ উক্ত সর্গের ষষ্ঠ, কেহ বা ঊনবিংশ শ্লোক নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ফলতঃ, উক্ত উভয় শ্লোকই অতি মধুর এবং তজ্জন্য তাহা পাঠকসাধারণের সুবিদিত হইলেও, এই প্রবন্ধের উপসংহারে উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না;—

"প্রভাতবাতাহতিকম্পিতাকৃতিঃ
কুমুদ্বতীরেণুপিশঙ্গবিগ্রহম্।
নিরাস ভৃঙ্গং কুপিতেব পদ্মিনী
ন মানিনীশং সহতেঽন্যসঙ্গমম্ ॥"

* * *

"ন তজ্জলং যন্ন সুচারুপঙ্কজং
ন পঙ্কজং তদ্‌যদলীনষট্‌পদম্।
ন ষট্‌পদোঽসৌ ন জুগুঞ্জ যঃ কলং
ন গুঞ্জিতং তন্ন জহার যন্মনঃ ॥"

* কাব্যের কীর্ত্তি-উপহার লাভ করিয়া, রাজা নরেন্দ্র কবির কিঞ্চিৎ পুরস্কার বিধান করিয়াছিলেন কি না এবং রামলীলাত্মক কাব্য-প্রণয়নে কবির কোন (আধ্যাত্মিক বা শারীরিক) অশিবোপশম হইয়াছিল কি না, জানা যায় নাই। সুতরাং ভট্টিকাব্য, গ্রন্থকারের 'অর্থকৃতে' এবং 'শিবেতরক্ষতয়ে'ও হইয়াছিল কি না বলা অসম্ভব।

আশা করি, এতদ্দ্বারা ভট্টিকাব্যের গ্রন্থকারের স্বভাবসিদ্ধ কবিত্বশক্তি কতক পরিমাণে অনুভব করা যাইবে।

শ্রীপদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য।

চোর

কি জানি কোথায়, পরাণ আমার
সহসা হারায়ে যায়,
কাহারে জিজ্ঞাসি, কে দিবে বলিয়া,
কেমনে মিলিবে তায়?
যে কেহ রাখিবে, ফিরিয়া সে দিবে,
অশান্ত পরাণ মোর,
তাহারে বাঁধিতে জগতে নাহিক
তেমন কঠিন ডোর!

জনম অবধি, রূপের ভিখারী,
চির পিপাসিত প্রাণ,
যেথা সে রূপের, বিমল বিকাশ,
সেথা তা'র অধিষ্ঠান!
রূপ সে দেবতা, রূপ সে ধরম,
রূপ সে পরম প্রীতি,
চাহি গো চরণে আত্ম-বিসর্জ্জন,
রূপ সে স্বরগ-স্মৃতি!
বুঝি বা কোথায় রূপের মাঝারে,
ভিখারী পরাণ মোর,
চির তৃষা তার, করিতেছে দূর,
রূপের ধেয়ানে ভোর!

চন্দ্রমা তারকা, গগনে বিরাজে,
উথলে রূপের হাসি,
জোছনা মিশিছে তটিনীর বুকে,
উছলে তরঙ্গরাশি!
বায়ু ব'হে যায়, সৌরভ-আকুল,
কুসুমে ছেয়েছে দিক্,
সেই বাঁধা সুরে মিশিছে পঞ্চম,
পুলকে কুহরে পিক!
প্রসন্নসলিলা স্রোতস্বতী বহে,
—মৃদু মৃদু ঢেউ গুলি,
তটভাগে তার, পর্ব্বত দাঁড়ায়ে,
উন্নত মস্তক তুলি'!
জ্ঞানপদতলে যেন বা বহিছে,
প্রেম-মন্দাকিনী-ধারা,
মধুর ভঙ্গিমা, সে রূপ হেরিয়া,
হ'য়েছি আপনা-হারা!
ওই যে অশোক, স্তবকে নমিত,
লতিকা জড়ায়ে বুকে,
ও রূপের মাঝে, যৌবন ফুটিছে
রক্তিমা শোভিছে মুখে!
আজি যে আঁধার গভীর আঁধার,
আকাশ মেঘেতে ঢাকা,
তবু এ আঁধারে আঁধারের রূপ,
উজ্জ্বলে মধুরে আঁকা!
রূপ কোথা নাই এ বিশ্ব মাঝারে?
রূপের আকার কই!
যাহা কিছু হেরি, তার মাঝে রূপ,
রূপের রহস্য ওই!
অন্তের আশ্রয়ে রূপের প্রকাশ,
নিজে সে আকার-হীন,
সাগর ভূধর, সর্ব্বত্র সমান,
কেহ নহে রূপহীন!
এ বিশ্ব সংসার রূপেতে উজ্জ্বল,
রূপেতে আপনা-হারা,
এ রূপের মাঝে কোথা সে আমার,
পরাণ পাগল পারা?
অনন্তের মাঝে কোথা গো পাইব
এ ক্ষুদ্র পরাণ মোর,
কাহারে ধরিব, কে দিবে গো ধরা,
কেবা সে পরাণ-চোর!

হৃদয় সরসে একটি কমল,
আজিও ফুটিতে বাকি,
আধুরী রঞ্জিত মুখখানি তার,
আবেশ-বিভোল আঁখি!
বুঝি বা নির্ম্মল জোছনা ছানিয়া,
গ'ড়েছে অতুল দেহ,
সে রূপ মাঝারে ক্ষুদ্র হৃদিটুকু,
তাহাতে অপার স্নেহ!
তার হাসিমাঝে দেখিবারে পাই
রূপের উজ্জ্বল বিভা,
পরাণ আমার সে রূপ ধেয়ানে
মগন হ'য়েছে কিবা!
কুঞ্জে সে বালিকা রূপের প্রতিমা
হাসিয়ে পলায়ে যায়,—
তোমার পরাণ কে ক'রেছে চুরি
আমি ত জানিনা তায়!"
খেলা-শ্রান্ত দেহ প'ড়েছে এলায়ে,
ঘুমায় রূপসী বালা,
অধরের হাসি, নিবেও নিবেনি
বুকে কাঁপে ফুলমালা!
হৃদয়ে তুলিতে ভাঙ্গিল না ঘুম,
জাগিলে দিবে না ধরা;
সুধার অধরে একটি চুম্বন!
—অধর অমৃতে ভরা!
একটি চুম্বনে মোহ সে টুটিল,
ফুটিল অধরে হাসি,
বসন্ত পরশে যেন বা ফুটিল,
কাননে কুসুম রাশি!
সেই হাসি মাঝে, লুকায়ে রেখেছে,
হারান' পরাণ মোর,
হৃদয়ে বাঁধিয়া, চোরেরে জিজ্ঞাসি,
"তুমি সে পরাণ চোর?"

শ্রীবিপিনবিহারী রক্ষিত

ন্যায়-দর্শন।

(১৪)

দ্রব্য-শেষ।

পৃথিবী হইতে মন পর্য্যন্ত নয়টী দ্রব্যের কথা বলা হইয়াছে। ন্যায় বৈশেষিক মতে আর দ্রব্য নাই। কিন্তু—

"তমঃ খলু চলং নীলং পরাপরবিভাগবৎ।
প্রসিদ্ধদ্রব্যবৈধর্ম্ম্যাৎ নবভ্যো ভেত্তুমর্হতি॥"
"রূপবত্ত্বাৎ ক্রিয়াবত্ত্বাৎ দ্রব্যন্তু দশমং তমঃ।"
ইত্যাদিরূপে মীমাংসকাদি সম্প্রদায় অন্ধকারকে নবদ্রব্যাতিরিক্ত দশম দ্রব্য বলিয়া থাকেন।

উপরি-প্রদর্শিত কারিকার মর্ম্ম বা মীমাংসকাদি সম্প্রদায়ের মত এই,—

অন্ধকার সকলেরই প্রত্যক্ষসিদ্ধ। অন্ধকারের প্রভাবে অনেকের জীবিকানির্ব্বাহ হয়, অনেকে হৃতসর্ব্বস্ব হয়। অন্ধকারের মাহাত্ম্যে কত অত্যাচার-অনাচার অনায়াসে সম্পাদিত হইয়া যায়। কত রাজ্যের উত্থান পতন অন্ধকারের উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়াছে। এহেন অন্ধকারকে প্রত্যক্ষ না করিয়াছেন কে? প্রতিদিন যাহা দেখিতে হয়, তামসীর যাহা নিত্য সহচর, সে অন্ধকারকে অপ্রমাণ বলিয়া কেহ কি উড়াইয়া দিতে পার? তা যদি না পার, তবে বল ত অন্ধকার জিনিসটী কি? অন্ধকার কৃষ্ণবর্ণ; গাঢ় অন্ধকার মসীবর্ণ।

কবি অধিক অন্ধকার দেখিয়া বলিয়াছেন, —"বর্ষতীবাঞ্জনং নভঃ"—আকাশ যেন অঞ্জন বৃষ্টি করিতেছে!

কবির কথা কেন, অন্ধকারের কৃষ্ণবর্ণ ত সকলেরই প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ। কৃষ্ণবর্ণ লইয়াই ত অন্ধকার। আবার প্রদীপ-হস্তে চলিয়া যাও, অন্ধকার সরিয়া যাইবে। সুতরাং অন্ধকারে রূপ এবং চলন-ক্রিয়া—দু-ই আছে। অন্ধকারে

দূরত্ব, সামীপ্য, সংযোগ, বিভাগও আছে। "সে অন্ধকার দূর, এ অন্ধকার নিকট, এই অন্ধকার এখানে আছে, আলো আসিয়াছে—এই অন্ধকার সরিয়া গেল; আবার আসিল" এই সকল ব্যবহারের মূলে অন্ধকারগত দূরত্ব-সামীপ্য, সংযোগ-বিভাগেরই পরিচয় পাওয়া যায়। সুতরাং ক্রিয়া ও রূপ প্রভৃতি গুণের সমবায় সম্বন্ধে আশ্রয় বলিয়া অন্ধকারে দ্রব্যত্ব সিদ্ধ হইতেছে। অনুমানের আকার,—

"অন্ধকারো দ্রব্যং রূপবত্ত্বাৎ", অথবা "পরত্বাপরত্ববত্ত্বাৎ", কিংবা "ক্রিয়াবত্ত্বাৎ ঘটাদিবৎ" ইত্যাদি।

অর্থাৎ রূপ, অথবা পরত্ব অপরত্ব (দূরত্ব-সামীপ্য ও জ্যেষ্ঠত্ব-কনিষ্ঠত্ব), কিংবা ক্রিয়া—যাহাতে সমবায় সম্বন্ধে থাকে, তাহাই দ্রব্য, যেমন ঘটাদি। অন্ধকারে রূপাদি আছে, অতএব অন্ধকারও দ্রব্য।

এইরূপে অন্ধকারে দ্রব্যত্ব সিদ্ধ হইল।

দ্রব্যবিশেষ অন্ধকার কিন্তু নবদ্রব্যের অন্তর্গত হইতে পারে না। কেননা, সকল দ্রব্য হইতেই বৈলক্ষণ্য অন্ধকারে আছে। এই দেখ;—পৃথিবীতে গন্ধ আছে, যাহাতে গন্ধ নাই, তাহা পৃথিবী নহে। প্রস্তরে আপাততঃ গন্ধ না পাওয়া যাইলেও প্রস্তর দাহ করিয়া চূর্ণ করিলে তাহাতে ত গন্ধ পাওয়া যায়; বিকারে যখন গন্ধ আছে, তখন প্রস্তরের গন্ধও অনুমেয়। তবে সে গন্ধ অতি অস্পষ্ট, তাই ঘ্রাণে পাওয়া যায় না।

কিন্তু অন্ধকারের কোন পুরুষে গন্ধের নামগন্ধ নাই। প্রস্তরের মত অন্ধকারের পুত্র-পৌত্রেও যদি গন্ধ থাকিত, তাহা হইলে না হয় বলিতাম, অন্ধকারেও গন্ধ আছে—অন্ধকারও পৃথিবী। ফলে তা ত নয়। অন্ধকারে গন্ধ-সামান্যাভাব, একেবারেই গন্ধ নাই, অতএব অন্ধকার পৃথিবী নহে। আর কৃষ্ণবর্ণ অর্থাৎ নীলরূপ অন্ধকারে আছে বলিয়া অন্ধকারকে জল, তেজ ইত্যাদি কোন দ্রব্যেরও অন্তর্গত বলা যায় না। কেননা, নীলরূপ, নব দ্রব্যের মধ্যে এক পৃথিবীতেই বর্ত্তমান। অন্য কোন দ্রব্যে নীলরূপ নাই।

সুতরাং "অন্ধকারো ন পৃথিবী গন্ধানধিকরণত্বাৎ জলবৎ, অন্ধকারো ন জলাদিমনোহস্তদ্রব্যং নীলরূপবত্ত্বাৎ নীলপটাদিবৎ" এই হইল অনুমানের আকার।

অর্থাৎ গন্ধ যাহাতে থাকে না, তাহা পৃথিবী নহে, যেমন জল; অন্ধকারে গন্ধ থাকে না, অতএব তাহা পৃথিবী নহে। জল প্রভৃতি মন পর্য্যন্ত যে আটটী দ্রব্য, তাহাতে নীলরূপ নাই; যাহাতে নীলরূপ থাকে না, তাহা জলাদির অন্তর্গত নহে, যেমন নীল বস্ত্র; অন্ধকারে নীলরূপ আছে, অতএব তাহা জলাদি নহে।

এই অনুমান অন্ধকারকে অতিরিক্ত দ্রব্য বলিয়া প্রমাণিত করিতেছে। অতএব অন্ধকার দশম দ্রব্য। অন্য দ্রব্যের চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষে আলোক অন্যতম কারণ, অন্ধকারের চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষে আলোকাভাব অন্যতম কারণ।

অন্ধকারে রূপ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব এবং বেগ এই দশটী গুণ ও ক্রিয়া এবং বিশেষ-গুণের মধ্যে রূপ অন্ধকারে থাকে। অন্ধকারও নিত্য-অনিত্য-ভেদে দ্বিবিধ। পরমাণু স্বরূপ অন্ধকার নিত্য, তদ্ভিন্ন অন্ধকার অনিত্য।

এই মতের ন্যায়শাস্ত্র-সম্মত খণ্ডন,—

তেজের অভাবই অন্ধকার, অন্ধকার অতিরিক্ত দ্রব্য নহে। যে পদার্থ সকলকে মানিতে হয়, তদ্দ্বারা কার্য্য নির্ব্বাহ হইলে, অতিরিক্ত পদার্থ কল্পনা করা অনুচিত। তেজের অভাব সকলেরই স্বীকৃত বস্তু, অন্ধকার তাহারই নামান্তর। অভাবেরও প্রত্যক্ষ হয়, প্রত্যক্ষ প্রসঙ্গে সে কথা বুঝাইব। নীলরূপ-প্রত্যয় ভ্রমমাত্র। তেজের ক্রিয়া লইয়াই অন্ধকারে ক্রিয়া-প্রত্যয় হইয়া থাকে। যেমন কোন স্থলে, ঘট আনিলে, তথায় ঘটাভাব থাকে না, আবার ঘট সরাইলে ঘটাভাব থাকে, এস্থলে ক্রিয়া থাকিল ঘটে (কর্ত্তার ক্রিয়া আছে, তাহা এস্থলে অনুল্লেখ্য), এজন্য ঘটাভাবেও ত কেহ গমনাদি ক্রিয়ায় আরোপ করিতে পারে। অন্ধকারের পক্ষেও তদ্রূপ, তবে ভ্রান্তিমূলক ব্যবহারটা কিছু অধিক দাঁড়াইয়াছে, প্রভেদ যা এইখানে। দূরত্ব-নিকটত্ব ব্যবহারও আশ্রয়ের দূরত্ব নিকটত্ব প্রযুক্ত। যে স্থানে অন্ধকার, সেই স্থান দূর হইলেই অন্ধকারে দূরত্ব-ব্যবহার, আর সেই স্থান নিকট হইলেই অন্ধকারে নিকটত্ব ব্যবহার হইয়া থাকে। অতএব সমবায়-সম্বন্ধে দূরত্ব-নিকটত্ব অন্ধকারে থাকে না। পৃথক্ত্ব-সংখ্যা-পরিমাণাদিও সমবায়-সম্বন্ধে অন্ধকারে থাকে না। রূপ এবং ক্রিয়া অন্ধকারে সমবায়-সম্বন্ধে আছে ইহা সিদ্ধ করিতে পারিলে সবই সিদ্ধ হইত, নতুবা ভ্রমসঙ্কুল মনুষ্যের দুই একটা ব্যবহারের মাত্র দোহাই দিয়া পদার্থ সিদ্ধ করা যায় না। বিশেষতঃ অন্ধকারকে দ্রব্য বলিলে, অন্ধকারের উৎপত্তি, ধ্বংস, তদীয় অনন্ত অবয়বের উৎপত্তি-ধ্বংস কল্পনা করিতে হয়, এ কি কম গৌরব! অভাব পদার্থের অন্তর্গত বলিলে অন্ধকারেরও উৎপত্তি-ধ্বংস মানিতে হয় না। তদীয় অবয়বের অসত্তা প্রযুক্ত অনন্ত অবয়বের উৎপত্তি-ধ্বংসও স্বীকার করিতে হয় না। অভাব পদার্থ নিত্য কিনা। তবে সর্ব্বদা অন্ধকার থাকে না, অন্ধকারের সম্বন্ধ থাকে না বলিয়া। অভাব নিত্য হইলেও কখন কখন কেন যে অনিত্যবৎ প্রতীত হয়, তাহার কারণ অভাব-প্রকরণে বক্তব্য।

আপত্তি।

তেজের অভাবকে অন্ধকার না বলিয়া অন্ধকারের অভাবকেই তেজ বলি না কেন?

উত্তর।

উষ্ণস্পর্শ, ভাস্বর রূপ ত অভাবের ধর্ম্ম হইতে পারে না। অগ্নি সূর্য্য প্রভৃতি, প্রত্যক্ষ তেজঃ পদার্থ। উষ্ণস্পর্শাদি অগ্নি প্রভৃতিরই ধর্ম্ম। অগ্নি প্রভৃতি ত আর অভাব পদার্থ নয়। অতএব তেজ স্বতন্ত্র দ্রব্য, ইহা স্বীকার করিতেই হয়। এমন যদি হইল, তবে আর অন্ধকার স্বতন্ত্র দ্রব্য কেন? তেজের অভাবই অন্ধকার।

শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন।

মুসলমান-রাজধানীতে বর্ণিয়ার।

ইংরেজী-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে সকলেই বর্ণিয়ারের নাম অবগত আছেন। প্রাচীনকালে যে সকল বৈদেশিকগণ ভারত-ভ্রমণে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে ফ্রান্সিস্ বর্ণিয়ার সুপ্রসিদ্ধ; মুসলমান-সম্রাটদিগের রাজধানীতে দীর্ঘকাল বাস করিয়া তিনি যে সকল বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, আধুনিক ঐতিহাসিকবর্গের নিকট তাহা পরম সমাদরের বস্তু। তাহাই অবলম্বন করিয়া আমরা মোগল-সম্রাটগণের রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার, মোগলের অন্তঃপুরচারিণী বিলাসিনী বেগম হইতে আরম্ভ করিয়া সাধারণ পল্লী-নারীগণের অবস্থা, রাজস্ব ও সৈন্যবিভাগের বিবরণ তন্ন তন্ন করিয়া জানিতে পারি। সেই বৈদেশিক পর্য্যটকের এই সকল বর্ণনা কি অপক্ষপাত এবং সুন্দর!

১৬৬৩ খৃষ্টাব্দের ১লা জুলাই বর্ণিয়ার সাহেব মুসলমান-রাজধানী—সুখ এবং ঐশ্বর্য্যের সুবর্ণ-কুঞ্জ, বিলাসিতা ও সভ্যতার মরকত-নিকেতন দিল্লী নগরী হইতে তাঁহার স্বদেশীয় বন্ধু ভি-লা-মোট লি ভেয়ার সাহেবকে দিল্লীর বিবরণ-সম্বলিত মোগল-সম্রাটগণের এবং প্রজাপুঞ্জের

রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহারই সারমর্ম্ম আমাদের পাঠকবর্গকে উপহার দিব। ইহাতে পাঠকগণ প্রাচীন দিল্লীর বিবরণ মাত্রই যে জানিতে পারিবেন, তাহা নহে; নাগরিক জীবনের অনেক কথা এবং ইতিহাসে অপ্রাসদ্ধ অনেক জ্ঞাতব্য ঘটনাও ইহাতে জানিতে পারিবেন।

বর্ণিয়ার এই সুদূর প্রবাসে আসিয়া সুদৃশ্য মুসলমান-রাজধানীর সৌন্দর্য্য এবং বৈচিত্র্যে মুগ্ধ হইয়া প্রিয়তম বান্ধবকে লিখিয়াছিলেন,—"ইউরোপীয়গণ ভারতে আসিয়া ভারতের বিভিন্ন নগর সম্বন্ধে কিজন্য অশ্রদ্ধেয় মত প্রকাশ করেন, তাহা বুঝিতে পারা যায় না; তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়জনক। তাঁহাদের বিশ্বাস,—ভারতের অট্টালিকা এবং সৌধশ্রেণী পাশ্চাত্য ভূভাগের স্থাপত্য গৌরবের সমকক্ষতা-লাভে অসমর্থ; কিন্তু তাঁহাদের একথা স্মরণ রাখা উচিত যে, ঋতুভেদে বিভিন্ন দেশের গৃহ-হর্ম্ম্যাদি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে নির্ম্মিত হইয়া থাকে। পারীস্, লণ্ডন কিংবা আমষ্টার্ডাম প্রভৃতি ইউরোপীয় নগরীতে যাহা উপযোগী, দিল্লীতে তাহা অনাবশ্যক হইতে পারে। ইউরোপের নগরগুলি শীতপ্রধান দেশের উপযোগী করিয়া নির্ম্মিত হইয়াছে; কিন্তু দিল্লী উষ্ণপ্রধান দেশের মহানগরী, এখানে গ্রীষ্ম এতই অধিক যে, রাজ্যের অধিপতিগণও মোজা ব্যবহার করেন না, পাপোষই (চটি) তাঁহাদের একমাত্র পদাবরণ; মস্তকে অতি সূক্ষ্ম-বস্ত্র-নির্ম্মিত পাগড়ী, গাত্রবস্ত্রগুলিও বেশ পাতলা। গ্রীষ্মকালে গৃহপ্রাচীরগুলি অগ্নিময় হইয়া উঠে, তাহাতে করস্পর্শ করা কিংবা উপাধানে মস্তক রাখা অতি কঠিন। বৎসরের মধ্যে ছয় মাসেরও অধিককাল সকলে নগ্নদেহে মুক্ত-বায়ুতে পড়িয়া থাকে, নিম্নশ্রেণীর লোক পথ-প্রান্তেই কালাতিপাত করে। বণিকসম্প্রদায় এবং সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তিগণ সযত্ন জল-সিঞ্চিত উপবনে কিংবা প্রমোদগৃহে বাস করে।

প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে (১৬২৩ খৃষ্টাব্দে) সম্রাট শা—জাহান স্বনাম চিরস্মরণীয় করিবার অভিপ্রায়ে প্রাচীন দিল্লীর সন্নিকটে একটী নগর নির্ম্মাণে কৃতসঙ্কল্প হন। নিজের নাম অনুসারে এই নগরের নাম তিনি শা—জাহানাবাদ—সংক্ষেপে জাহানাবাদ প্রদান করেন। আগ্রা হইতে তিনি এই স্থানে রাজধানী উঠাইয়া আনিবার সঙ্কল্প করেন; কারণ, তাঁহার মতে আগ্রা গ্রীষ্মকালে সম্রাটের বাসের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত স্থান। প্রাচীন দিল্লী অতি সন্নিকটবর্ত্তী হওয়াতে বর্ণিয়ার জাহানাবাদের পরিবর্ত্তে ইহাকে দিল্লী নামেই অভিহিত করিয়াছেন।

দিল্লীনগর যমুনাতীরে সমতল ভূখণ্ডে সংস্থাপিত। নদীর দিক ভিন্ন নগরের অন্য তিনদিক ইষ্টক-প্রাচীরে সংরক্ষিত; ঘণ্টায় তিন মাইল করিয়া চলিলে, প্রায় তিন ঘণ্টাতে এই প্রাচীর বেষ্টন করিয়া আসা যায়।

দিল্লীদুর্গে যে সকল মহল্লা আছে, তাহা অর্দ্ধচন্দ্রাকার। রাজ-পরিবারগণ এখানে বাস করিতেন। এই সকল মহল হইতে যমুনাবক্ষ অতি স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়, অন্তরালে কেবল একটী বৃহৎ সৈকত প্রান্তর। এই ভূমিখণ্ডে গজযুদ্ধ প্রদর্শিত হইত। সম্রাটের অধীনস্থ ওমরাহ, সর্দ্দার কিংবা রাজন্যবর্গের সৈন্যশ্রেণী এই স্থানে সমবেত হইয়া কৃত্রিম যুদ্ধক্রীড়া প্রদর্শন করিত, সম্রাট প্রাসাদ-বাতায়ন হইতে এই দৃশ্য অবলোকন করিতেন। দুর্গ-প্রাচীর এবং গোলাকার পুরাতন মন্দিরাদি আংশিক পরিমাণে ইষ্টক-নির্ম্মিত, কিয়দংশ লোহিত প্রস্তর নির্ম্মিত। এই সকল প্রস্তর মার্ব্বেলের ন্যায়, দেখিতে অধিকতর সুদৃশ্য। দুর্গ-প্রাচীর নগর-প্রাচীর অপেক্ষা সমুন্নত, সুদৃঢ় এবং প্রশস্ত। নগরের অভিমুখে ছোট

ছোট কামান বিন্যস্ত ছিল। নদীর দিক্ ভিন্ন অন্য কয় দিকে দুর্গের সন্নিকটে গভীর খাত আছে; এই খাতে দুর্গ সংরক্ষিত হইত। এই খাত পাষাণবদ্ধ এবং জলপূর্ণ,—জলে অসংখ্য মৎস্য বাস করিত। এ সকল সত্ত্বেও দুর্গ তেমন নিরাপদ বা দৃঢ় ছিল না। বর্ণিয়ার বিশ্বাস করিতেন যে, একটী সাধারণ ব্যাটারীর সাহায্যেই তাহাকে সমভূমি করিতে পারা যাইত।

এই জলাশয়ের সহিত একটী বৃহৎ উপবন সংলগ্ন ছিল। সুন্দর পুষ্প এবং বিবিধ প্রকার হরিৎবর্ণের লতা-পল্লবে তাহা পরিপূর্ণ থাকিত; লোহিত প্রাচীর এবং তাহার পার্শ্বেই এই সমস্ত পুষ্প-লতার বিচিত্র বর্ণ নয়ন-সমক্ষে এক অপূর্ব্ব আভা বিকীর্ণ করিত।

এই উপবন প্রান্তে একটী সম-চতুর্ভুজ রাজকীয় প্রান্তর; ইহার একদিকে দুর্গদ্বার, অন্যদিকে রাজপথ ছিল। রাজানুগ্রহপ্রার্থী অনেক ক্ষুদ্র ভূস্বামী সময়ে সময়ে এই স্থানে বস্ত্রাবাস স্থাপন করিয়া বাস করিতেন। যে সকল ওমরাহ এবং মনসবদার দুর্গে প্রহরীর কার্য্য করিতেন, তাঁহাদিগকেও অনেক সময় এখানে থাকিতে হইত।

ইহার নিকটেই রাজকীয় অশ্বশালা ছিল। এই প্রান্তরে প্রত্যহ প্রভাতে অশ্ব-সমূহকে পাদচারণে অভ্যস্ত করা হইত। রাজকার্য্যের জন্য যে সকল অশ্ব ক্রয় করা হইত, তাহাদের পরীক্ষাও এখানে চলিত। যে সমস্ত অশ্ব তুর্কীস্থান হইতে আমদানী, তাহাদের বল এবং দেহায়তন প্রয়োজনানুরূপ বলিয়া প্রতিপন্ন হইলে, অশ্বের উরুদেশে রাজকীয় চিহ্ন এবং সেই অশ্বের আরোহী যে ওমরাহের অধীনে কার্য্য করিত, সেই ওমরাহের অধিকার-জ্ঞাপক চিহ্ন অঙ্কিত করা হইত। বর্ণিয়ার বলেন,—এই উপায় অবলম্বন করাতে অশ্বারোহিগণের প্রতারণার পথ রুদ্ধ হইয়াছিল।

বর্ণিয়ারের পর্য্যটন-কাহিনী পাঠে জানিতে পারা যায়,—এই সময়ে দিল্লী আগরা প্রভৃতি ভারতীয় প্রধান নগরে দৈবজ্ঞের অত্যন্ত অধিক প্রাদুর্ভাব ছিল। সেই সময়ের সহিত তুলনায় এ কালে যে 'গণৎকার' শ্রেণীর অত্যন্ত হ্রাস হইয়াছে, তাহার আর সন্দেহ নাই।

তিনি লিখিয়াছেন,—পূর্ব্বোক্ত প্রান্তরের নিকটেই বাজার,—বাজারে অসংখ্য প্রকারের দ্রব্যাদি বিক্রেয় হইত, বাজারে হিন্দু ও মুসলমান দৈবজ্ঞের হুড়াহুড়ি। ইহারা রৌদ্রের মধ্যে ধূলি-ধূসরিত একখানি আসন বিছাইয়া বসিয়া থাকিত,—হস্তে একটী যন্ত্র এবং সম্মুখে রাশি-চক্রাঙ্কিত একখানি বৃহৎ পুঁথি খোলা। দলে-দলে লোক স্ব স্ব ভাগ্যফল পরীক্ষা করিবার জন্য তাহাদের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িত এবং ইহাদের ভবিষ্যৎ বাক্যে অসাধারণ শ্রদ্ধা প্রকাশ করিত। একটী পয়সা পাইয়াই ইহারা গরীব লোকের নিকট তাহাদের অদৃষ্ট ফল গণনা করিয়া দিত এবং হাত-মুখ পরীক্ষা করিয়া পুঁথির পাতা উল্টাইয়া বিড় বিড় করিয়া মন্ত্র পড়িয়া দৈববাণী করিত যে, অমুক মুহূর্ত্তে কাজ আরম্ভ করিলে শুভ হইবে। নির্ব্বোধ স্ত্রীলোকের দল শ্বেতবস্ত্রে আপাদ-মস্তক আবৃত করিয়া গণকের চারি পার্শ্বে সমবেত হইত এবং অসঙ্কুচিত-চিত্তে তাহাদিগের সমস্ত গুপ্ত কথা এবং জীবনের সকল ঘটনা ব্যক্ত করিত।

এই সকল দৈবজ্ঞের মধ্যে গোয়া-নিবাসী একজন ওলন্দাজের ভণ্ডামী উল্লেখ-যোগ্য। সে অন্যান্য দৈবজ্ঞের ন্যায় আসনের উপর গম্ভীর-ভাবে বসিয়া থাকিত; লেখাপড়া জানিত না, কিন্তু সেজন্য তাহার পসারের কোন বিঘ্ন ঘটে নাই। তাহার সাজ-সরঞ্জামের মধ্যে কোন নাবিকের পরিত্যক্ত একটা দিক্‌দর্শন-যন্ত্র এবং পর্ত্তুগীজ ভাষায় মুদ্রিত দুই খানি পুরাতন ধর্ম্ম-পুস্তক। এই পুঁথি দুই খানি সে তাহার

জ্যোতিষশাস্ত্ররূপে ব্যবহার করিত এবং তাহাতে যে সমস্ত চিত্র ছিল, তাহা ইউরোপীয় রাশিচক্র বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস জন্মাইত।

এই সকল 'বাজারে-দৈবজ্ঞ' ভিন্ন আরও কতকগুলি দৈবজ্ঞ দেখা যাইত। তাহারা ধনবান্‌দিগের গৃহে যাতায়াত করিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিত। অনেকে যথেষ্ট বেতন দিয়া দৈবজ্ঞদিগকে প্রতিপালন করিতেন এবং তাহাদের পরামর্শ ভিন্ন সামান্য কার্য্যেও হস্তক্ষেপ করিতেন না। কোরান খুলিলেই তাহারা ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমানের সকল সন্দেহ মিটাইয়া দিতে পারিত।

যে রাজপথের কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে, তাহা পঁচিশ ত্রিশ ফিট বিস্তৃত এবং অতি সরল। উভয় পথের উপর অসংখ্য অট্টালিকা ও বহুদূর বিস্তৃত চক-চকে বিবিধ দ্রব্যের ভিন্ন ভিন্ন দোকান, পাশে একটী করিয়া কুঠারী, দোকানদারেরা রাত্রে ইহারই মধ্যে পণ্যদ্রব্য বন্ধ রাখিত।

এই সকল দোকানের উপর ব্যবসায়ীদিগের সমুন্নত গৃহ; রাজপথ হইতে তাহা অতি সুদৃশ্য বলিয়া বোধ হইত, এই সকল গৃহে বায়ু অবাধে সঞ্চারিত হইত এবং পথের ধূলি তত উর্দ্ধে উঠিতে পারিত না। অনেক ব্যবসায়ী অন্যত্র বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া সেখানেই বাস করিত, কেবল কাজকর্ম্মের সময়ই তাহাদিগকে দোকানে দেখা যাইত।

এই দুইটী রাজপথ ভিন্ন আরও অনেকগুলি পথ ছিল; কিন্তু সেগুলি এরূপ সরল কিংবা সুন্দর নহে, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে সেগুলি নির্ম্মিত হওয়াতে সেই সমস্ত পথে কোন শৃঙ্খলা লক্ষিত হইত না। এই সকল পথের ধারে মন্সবদার, ওমরাহ, আমলা, সওদাগর প্রভৃতির বাসগৃহ;—কোনগুলি ইষ্টক-নির্ম্মিত, কতক প্রস্তর-নির্ম্মিত। মৃৎকুটীরের সংখ্যাও নিতান্ত অল্প নহে। এই গৃহগুলি বেশ পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন। মৃৎপ্রাচীর চুনকাম করা, চালের ছাউনির নীচে লম্বা লম্বা মোটা বেত্রদণ্ড। বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ণ-কুটীরে পদাতিক সৈন্য এবং তাম্বুবাহী কুলি মজুর ও ভৃত্যবর্গ বাস করিত।

পর্ণকুটীরের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক হওয়াতে দিল্লীতে অনেক সময়েই অগ্নির উপদ্রব লক্ষিত হইত। এক বৎসরের মধ্যে তিনবার অগ্নি-কাণ্ডে প্রায় ষষ্টিসহস্র গৃহ ভস্মসাৎ হয়; সেই সেই অগ্নিকাণ্ডে বহুসংখ্যক অন্তঃপুরচারিণী রমণী এবং উষ্ট্র-অশ্বাদি গৃহপালিত পশু দগ্ধ হইয়াছিল।

নদীতীরে এবং নগরপ্রান্তে ওমরাহদিগের বাসস্থান। ইউরোপীয় নগরের প্রধান সজ্জা সুন্দর সুন্দর দ্রব্যপূর্ণ দোকানশ্রেণী,—দিল্লীতে তাহার যথেষ্ট অভাব ছিল। দিল্লীতে দোকান-দারেরা দোকানের সাজ-সজ্জার দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিত না; সুন্দর সুন্দর পণ্যদ্রব্য কিছু থাকিলেও তাহারা তাহা গুদামে আবদ্ধ করিয়া রাখিত, সাধারণ দর্শকের নয়ন-পথবর্ত্তী করা আবশ্যক বলিয়া বিবেচনা করিত না। সুদৃশ্য দ্রব্যের পরিবর্ত্তে বাজারে কলসপূর্ণ তৈল, ঘৃত, স্তূপাকার চাউল, গোধূম, ছোলা, মটর প্রভৃতি শস্য দৃষ্টিপথে পতিত হইত। ফলের দোকানে দাড়িম্ব, পেস্তা, বাদাম, পেয়ারা, আঙ্গুর প্রভৃতি ফল বিক্রয় হইত;—তরমুজ প্রভৃতি ফলের অত্যন্ত আদর ছিল।

গ্রীষ্মকালের দুই মাস প্রচুর আম্র পাওয়া যাইত, কিন্তু দিল্লীতে আম্রের আবাদ ভাল হইত না। গোয়া, বঙ্গদেশ এবং গোলকুণ্ডার আমদানী আম্রই অতি উৎকৃষ্ট বলিয়া গণ্য হইত।

নগরে মিষ্টান্নের দোকান অনেক ছিল, বর্ণিয়ার সাহেবের মতে সেগুলি সুখাদ্য বলিয়া বিবেচিত হয় নাই; বিশেষতঃ বিশ্বের

মক্ষিকা এবং নগরের ধূলি সেগুলি আচ্ছন্ন করিয়া থাকিত।

পাঁউরুটী পাওয়া যাইত, কিন্তু সেগুলি অখাদ্য। ওমরাহগণের বাড়ীতেই রুটী প্রস্তুত হইত। বাজারে নানাবিধ মাংস বিক্রয় হইত, অনেক দোকানে রাঁধা-মাংসও পাওয়া যাইত। কিন্তু বাজারের এই সকল মাংস অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর বলিয়া ভদ্রলোকে তাহার আদর করিত না। ছাগমাংস অপেক্ষা ছাগীমাংস বিক্রয়েই বিক্রেতাদিগের অধিক অনুরাগ দেখা যাইত। নানাপ্রকারের মৎস্যও প্রচুরপরিমাণে বিক্রয় হইত। খোজাগণ অতিরিক্ত পরিমাণে মৎস্যভক্ত ছিল।

দুর্গের প্রবেশদ্বারে দুইটী বৃহৎ প্রস্তর-নির্ম্মিত হস্তী। একটী হস্তীর উপর চিতোরের গৌরব-রবি জয়মল্ল, অন্যটীর উপর বালক-বীর পুত্তের প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। সেই সুবৃহৎ হস্তীতে দুই জন মহাপুরুষের প্রতিমূর্ত্তি নিরী-ক্ষণ করিলে ভারতের অতীত বীর-গৌরবের কথা মনে করিয়া হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে।

দুর্গমধ্যে সুপ্রশস্ত রাজপথ বিস্তৃত; একটী ক্ষুদ্র খালের দ্বারা তাহা দুইভাগে বিভক্ত। রাজপথের দুই ধারে পাঁচ ছয় ফিট উচ্চ ও চারি ফিট প্রস্থ পাদপথ। মনসবদারগণ রাত্রি-কালে এই পাদপথের উপর দিয়া অশ্বারোহণে ইতস্তত বিচরণ পূর্ব্বক নগর রক্ষা করিত। খালের জল রাজান্তঃপুর পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইত, সম্রাটের অন্তঃপুরচারিকাগণ সেই জল অবাধে ব্যবহার করিতেন, প্রাঙ্গণের চতুর্দ্দিক্ ধৌত করিয়া এই জল 'গড়খাতে' পতিত হইত। আলিমর্দ্দান খাঁ নামক একজন পারস্যবাসী এই খাল খনন করেন, যমুনার সহিত এই খালের সংযোগ ছিল।

দুর্গমধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক পথ আছে, সেই সকল পথের ধারে বাজার বসিত। এই সকল পথে ওমরাহগণ সপ্তাহে একদিন দিবারাত্রি অশ্বারোহণে নগর-পরিক্রমণ করিতেন। যে সকল ওমরাহ নগররক্ষায় ব্রতী থাকিতেন, সম্রাটের পাকশালা হইতে তাঁহাদের জন্য সদ্যঃপ্রস্তুত খাদ্যদ্রব্য প্রেরিত হইত। ওমরাহগণ এই খাদ্য যথেষ্ট সম্মানের সহিত গ্রহণ করিতেন,—'খানা' আসিয়া হাজির হইলেই তাঁহারা সম্রাটের প্রাসাদ অভিমুখে দৃষ্টি করিয়া আভূমি-নত হস্ত মস্তক পর্য্যন্ত তুলিয়া তিনবার 'তসলিম্' করিতেন।

দুর্গমধ্যে বহুসংখ্যক বস্ত্রাবাস, তাহাতে বিভিন্ন বিভাগের কর্ম্মচারিগণ সরকারী কর্ম্ম করিতেন। কারখানাতে প্রতিদিন অনেক লোক কাজ করিত। কোন কারখানায় স্বর্ণ-রৌপ্যের কাজ, কোথাও চিত্রকর্ম্ম, কোথাও দর্জ্জীর কাজ, বস্ত্রবয়ন, বিনামা-নির্ম্মাণ ইত্যাদি নানাপ্রকার কার্য্যে কারিকরেরা ব্যস্ত থাকিত। প্রত্যেক কারিকরকে সকাল হইতে আরম্ভ করিয়া সন্ধ্যাপর্য্যন্ত খাটিতে হইত, সন্ধ্যাকালে তাহারা স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিত।

অতঃপর বর্ণিয়ার আমখাসের কথা উত্থাপন করিয়া লিখিয়াছেন,—আমখাস বাস্তবিকই একটী বিরাট সৌধ। ইহা একটী সুবৃহৎ চক; তাহার উপরে কোন গৃহ নাই। গৃহটী ভিন্ন ভিন্ন কক্ষে বিভক্ত, কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বারপথে কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে উপনীত হওয়া যায়। ইহার এক অংশে সুবৃহৎ সিংহদ্বার, সিংহদ্বারের উপর এক বিস্তৃত গৃহ। এই গৃহের নাম—"নাগর-খানা"। এখানে প্রত্যহ দিবসের নির্দ্দিষ্ট সময়ে নহবৎ বাজিত। নিস্তব্ধ রাত্রে সুকোমল শয্যায় শয়নপূর্ব্বক অর্দ্ধনিদ্রিত অবস্থায় এই নহবতের গম্ভীর নাদ অতি মধুর, সুন্দর এবং উদার বলিয়া অনুভূত হইত। 'নাগরখানা' অতি উচ্চে এবং সম্রাটের নৈশ শয়নাগারের অনেক দূরে অবস্থিত ছিল বলিয়া সঙ্গীতের তীব্রতা তাঁহার বিরক্তি উৎপাদন করিত না।

'নাগরখানার' ঠিক সম্মুখভাগে, রাজসভার পার্শ্বেই সুপ্রশস্ত সুসজ্জিত হল। তাহার শ্রেণী-বদ্ধ স্তম্ভসমূহ এবং ছাদ সুন্দর বর্ণে চিত্রিত ও সুবর্ণ-খচিত। এই হল অতি উচ্চ; বায়ুর অবারিত প্রবাহে হলের অভ্যন্তরভাগ হিল্লোলিত। হল ও রাজান্তঃপুরের মধ্যে একটী বৃহৎ প্রাচীর। এই প্রাচীরে গৃহপ্রাঙ্গণ হইতে চারি হস্ত উর্দ্ধে একটী প্রশস্ত 'ঝরকা' বা বাতায়ন। এই বাতায়ন পথে সম্রাট প্রত্যহ মধ্যাহ্নকালে সিংহাসনে উপবেশন করিতেন, তাঁহার কোন কোন পুত্র দক্ষিণে বা বামে স্ব স্ব আসন গ্রহণ করিতেন, খোজাগণ নিকটে দণ্ডায়মান হইয়া সসম্ভ্রমে চামরবীজন করিত। কাহারও হস্তে ময়ূরপুচ্ছের পাখা, কাহারও হস্তে বৃহৎ তাল-বৃন্ত, কেহ রাজাজ্ঞা-পালনের জন্য যুক্তকরে সম্মানভরে দণ্ডায়মান। সিংহাসনের নিম্নেই রৌপ্য-রেলের বেষ্টনীর মধ্যে ওমরাহ, রাজা এবং ভিন্ন ভিন্ন দেশের রাজদূতগণ অবনত-মস্তকে যুক্তকরে অবস্থিত। তাঁহাদের পরই আরও কিঞ্চিৎ দূরে মনসবদারগণের স্থান; দরবার-গৃহের অবশিষ্টাংশ উচ্চ-নীচ ভদ্র-অভদ্র, ধনী-দরিদ্রের সমাগমে পরিপূর্ণ। রাজ-সভায় সকলেরই প্রবেশাধিকার ছিল, আম-খাসে উপস্থিত হইয়া উচ্চ-নীচ সকলেই রাজ-দর্শন করিতে পাইত।

দিনের মধ্যে দেড় ঘণ্টা কি দুই ঘণ্টাকাল দরবার বসিত। এই সময়ে দলে দলে রাজ-কীয় অশ্বকে সিংহাসনের সম্মুখ দিয়া লইয়া যাওয়া হইত;—তাহারা কিরূপ অবস্থায় আছে এবং কেমন কাজ করিতেছে, তাহাই দেখান বোধ হয় এই প্রকার অশ্ব-পরিচালনের উদ্দেশ্য। অশ্বদল চলিয়া গেলে হস্তিদলকে সুচিত্রিত এবং সজ্জিত করিয়া লইয়া যাওয়া হইত; তাহাদের পৃষ্ঠে মূল্যবান্ স্বর্ণ-মুক্তা-খচিত চাদর, সেই চাদরের উপর রজতশৃঙ্খল, শৃঙ্খলের উভয় প্রান্তে দুইটী অনতিবৃহৎ ঘণ্টা এবং উভয় কর্ণমূলে দুইটী শ্বেত চামর। বৃহৎ হস্তীর পাশে এইরূপ সুসজ্জিত ক্ষুদ্র হস্তী। মৃদু-মন্থর গতিতে চলিতে চলিতে সিংহাসনের সম্মুখে আসিয়া প্রত্যেক হস্তী মাহুতের অঙ্কুশ-তাড়নে নতজানু হইয়া এবং শুণ্ড উর্দ্ধে তুলিয়া একবার গম্ভীর শব্দ করিত,—সকলের অনুমান হইত, হস্তী বাদশাহকে 'তস্‌লিম' করিতেছে।

তাহার পর হরিণ, নীল-গাই, বৃহৎশৃঙ্গ মহিষ, ব্যাঘ্র, উজ্‌বেক-জাতি কর্ত্তৃক উপহার-প্রদত্ত সুন্দর শিকারী কুক্কুর, বিবিধ প্রকার শিকারী পক্ষী একে একে সম্রাটের সম্মুখ দিয়া লইয়া যাওয়া হইত; এই সকল পশু-পক্ষী বাদসাহের আনন্দ-উৎপাদনের জন্য দ্বন্দ্বযুদ্ধে নিয়োজিত হইত। পশু-পক্ষীর দল চলিয়া গেলে দুই একজন ওমরাহ অশ্বারোহণে সম্রাটের সম্মুখ দিয়া বীরবেশে অগ্রসর হইত; অশ্বা-রোহীর সর্ব্বাঙ্গ চর্ম্মে আবৃত, অশ্বের দেহও চিত্রবিচিত্র বস্ত্রখণ্ডে আচ্ছাদিত।

আমখাসে সম্রাটের নিকট আবেদনকারি-গণ উপস্থিত হইলে, তাহাদের আবেদন-পত্র উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিয়া সম্রাটের কর্ণগোচর করা হইত। কাহারও বিরুদ্ধে কোন প্রকার অভিযোগ থাকিলে, সম্রাট স্বয়ং বাদী-প্রতি-বাদীকে প্রশ্ন করিতেন এবং কাহারও প্রতি কোন অত্যাচার কিংবা উৎপীড়ন হইয়া থাকিলে তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করিতেন। সপ্তাহের মধ্যে একদিন তিনি গোপনে অভিযোগকারিগণের প্রার্থনা-পত্র শ্রবণ করিতেন; এবং প্রতি সপ্তাহে একদিন দুইজন প্রধান কাজীর সহিত 'আদালতখানা' দর্শন করিতে যাইতেন। ন্যায়-বিচারের প্রতি সম্রাটের বিশেষ লক্ষ্য ছিল।

আমখাসে উপস্থিত হইয়া, একদিকে যেমন তাহার মহিমাদীপ্ত ভাব, সেই বিরাট সৌধের

গাম্ভীর্য্য, বিচিত্র সজ্জা, সমগ্র ভারতের শৌর্য্য বীর্য্য, পাণ্ডিত্য প্রভৃতির একত্র-সমাবেশ দেখিয়া নয়ন ও মন মুগ্ধ হইয়া যাইত, অন্যদিকে হীন তোষামোদের উচ্চ কলরব তেমনই বিরক্তিকর ছিল। সম্রাটের মুখ হইতে কোন একটী কথা বাহির হইলেই চতুষ্পার্শ্বস্থ ওমরাহ-বর্গের মধ্য হইতে তাহার বিপুল প্রতিধ্বনি উত্থিত হইত;—প্রধান ওমরাহগণ আকাশের দিকে দুই হস্ত তুলিয়া "কেরামৎ" "কেরামৎ" বলিয়া উঠিতেন, যেন এমন আশ্চর্য্য কথা তাঁহাদের কর্ণে আর কখনও প্রবেশ করে নাই। বাস্তবিক সম্রাটের সভায় এমন একটীও সভাসদ ছিলেন না, যাঁহারা নিম্নলিখিত পারসী বয়াৎটি না জানিতেন কি তাহা আবৃত্তি করিতে গৌরব অনুভব না করিতেন;—

"আগার সা রোজা গয়াদ সাব আস্তইন।
বে বায়েদ গুপ্ত ইনাক্ মা উ পার উইন॥"

অর্থাৎ—

"মধ্যাহ্ন সময়ে যদি রাজা কহে
'হইয়াছে এবে রাতি'।
কহিও, 'নিশ্চয়, দেখ দেখ চাহি
উঠিয়াছে নিশাপতি'॥"

সকলের মধ্যে চাটুকারিতা এমনই প্রবল ছিল।

আমখাসের পরই 'গোসলখানা'। এই গৃহে অতি অল্প লোকেরই প্রবেশাধিকার ছিল। এই গৃহ আমখাসের ন্যায় বৃহৎ নহে। কিন্তু ইহার অভ্যন্তর-ভাগ বেশ প্রশস্ত, চিত্রিত এবং সুবর্ণ-রঞ্জিত। চারি পাঁচ ফিট উচ্চ একটী মঞ্চে সম্রাটের বসিবার স্থান। সম্রাট তাহারই উপর আসন পাতিয়া উপবেশন করিতেন, ওমরাহবর্গ চারিদিকে দণ্ডায়মান থাকিত, কোন বিশিষ্ট পদস্থ ব্যক্তি গোপনে সম্রাটের সাক্ষাৎপ্রার্থী থাকিলে তাহার সহিত সম্রাটের এইখানে সাক্ষাৎ হইত; রাজ্য-সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় পরামর্শও এখানে চলিত। প্রভাতে আম-দরবারে কোন ওমরাহ অনুপস্থিত থাকিলে যেমন তাঁহার অর্থদণ্ড হইত, সায়াহ্নে এখানে অনুপস্থিতির জন্যও সেইরূপ দণ্ডের ব্যবস্থা ছিল। কেবল এক ব্যক্তি সম্বন্ধে এ নিয়ম খাটিত না। এই ব্যক্তির নাম দানেশ মন্দ। তিনি সাহিত্যজীবী ছিলেন, তাঁহার হস্তে পররাষ্ট্র-সম্বন্ধীয় অনেক কার্য্যভারও ন্যস্ত ছিল। কিন্তু প্রতি বুধবারে অন্যান্য ওমরাহের ন্যায় তাঁহা-কেও 'গোসলখানায়' উপস্থিত হইতে হইত। সম্রাট প্রত্যহ একবার দরবার স্থলে সাধারণকে দর্শন দিতেন। এরূপ করিবার বিশেষ উদ্দেশ্যও ছিল;—পীড়িতাবস্থায় যদি সম্রাট কোন দিন দরবারে অনুপস্থিত থাকিতেন, তাহা হইলে সাধারণের মধ্যে অত্যন্ত বিভীষিকার সঞ্চার হইত; সকলেই ভাবিত, হয় ত সম্রাটের জীবনের হানি হইয়াছে।

বর্ণিয়ার সম্রাটের দরবার-গৃহের ও বহি-র্মণ্ডপের যথেষ্ট বর্ণনা করিয়াছেন; অন্তঃপুর সম্বন্ধেও দুই একটী কথা লিখিতে বিরত হন নাই। সম্রাটের অন্তঃপুরের কথা অবগত হওয়া এই বৈদেশিক দূতের পক্ষে কিরূপ অসম্ভব ছিল, তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়। যে অন্তঃপুরে চন্দ্র-সূর্য্যেরও প্রবেশাধি-কার ছিল না, প্রধানতম ওমরাহও যাহার চতুঃসীমায় যাইতে পারিতেন না, সেখানে তিনি কিরূপে প্রবেশলাভ করিবেন? তাঁহার কৌতূহল নিবারিত হইত না এবং এজন্য তিনি বিশেষ ব্যস্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু হঠাৎ একদিন তাঁহার সম্রাটের অন্তঃপুর দর্শনের সুযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। বর্ণিয়ার চিকিৎসক ছিলেন; সম্রাটের দিল্লীতে অনুপস্থিতিকালে একদিন তিনি সংবাদ পাইলেন, একজন বেগম অত্যন্ত পীড়িত হইয়াছেন, চিকিৎসকের উপ-দেশ-গ্রহণের জন্য তাঁহার অন্তঃপুর ত্যাগ করা

অসম্ভব; সুতরাং বর্ণিয়ারকে অন্তঃপুরে লইয়া যাইবার আদেশ হইল। একজন খোজা তাঁহার আপাদমস্তক কাশ্মীরী শালে আবৃত করিয়া তাঁহাকে অন্তঃপুরে লইয়া গিয়াছিল। অন্তঃপুরের সৌন্দর্য্য বিস্ময়কর, ত্রিদিবের নন্দনোদ্যানের ন্যায় তাহা প্রীতিকর এবং মনোরম। সুন্দর সুন্দর বিভিন্ন কক্ষ, সেই সকল কক্ষে বেগমগণ তাঁহাদের সম্ভ্রম ও আর্থিক সংস্থান অনুসারে বিলাসে পরিপূর্ণ হইয়া বাস করিতেন। প্রত্যেক কক্ষের দ্বারদেশে জলপূর্ণ চৌবাচ্চা; চারিদিকেই উপবন, মনোহর বনপথ, ছায়াচ্ছন্ন নেপথ্য, ঝিল, উৎস, সুশীতল পাতালঘর,—গ্রীষ্মের প্রখর রৌদ্র হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য অন্তঃপুরচারিকাগণ দিবসে এই সকল গৃহে বিশ্রাম করিতেন, রাত্রিকালে উন্নত প্রাসাদে সুখস্পর্শ সমীরণের কোমল হিল্লোলে তাঁহারা নিদ্রা যাইতেন। নদীর সম্মুখে একটী ক্ষুদ্র সুন্দর মন্দির, তাহা সুবর্ণ-মণ্ডিত এবং তাহার অভ্যন্তর-ভাগ সুন্দর চিত্রে ও বৃহৎ সমুজ্জ্বল দর্পণে সুসজ্জিত। আমখাসে সময়ে সময়ে যে উৎসবের সমাবেশ হইত, বর্ণিয়ার তাহার মধ্যে একটীর সুন্দর চিত্র প্রকাশ করিয়াছেন। এমন দৃশ্য সচরাচর দেখা যাইত না।

সম্রাট সমুজ্জ্বল এবং বহুমূল্য পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া দরবার-হলে আসিয়া সিংহাসনে উপবেশন করিতেন। সাদা ফুলকাটা সাটীনের উপর রেশম ও স্বর্ণসূত্রের কারুকার্য্য-বিশিষ্ট পরিচ্ছদই তিনি পরিধান করিতেন। তাঁহার পাগড়ী মণি-মুক্তায় ভূষিত, পাগড়ীর সম্মুখভাগে একখণ্ড বৃহৎ হীরক বসান ছিল, তাহার জ্যোতি সূর্য্যের ন্যায়। সুপ্রসিদ্ধ পর্য্যটক টেভার নিয়ারের হিসাব অনুসারে এই হীরক-খণ্ডের মূল্য এক লক্ষ আশী হাজার টাকা। সম্রাটের গলদেশে তুল্যমান হার উদরের উপর পর্য্যন্ত আসিয়া পড়িত; সেই হার দীপ্তিমান হীরকে গ্রথিত। সিংহাসনের পায়া ছয়টী; সকলগুলিই বিশুদ্ধ স্বর্ণে নির্ম্মিত, মাণিক্য-খচিত, মধ্যে মধ্যে নীলকান্ত ও পদ্মরাগ মণি দ্বারা অলঙ্কৃত। এই সমস্ত হীরক-রত্নাদির সংখ্যা এবং মূল্য কত, সে সম্বন্ধে বর্ণিয়ার কোন কথা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেন নাই; কারণ, সিংহাসনের অতি নিকটে যাইবার কাহারও অধিকার ছিল না, তাহাদের গুণাগুণ বিচার করাও সকলের সাধ্যায়ত্ত নহে। কিন্তু তাঁহার অনুমান,—এই সিংহাসনের মূল্য চারি কোটী টাকার কম নহে। ইহাই সেই সুপ্রসিদ্ধ "ময়ূর-সিংহাসন"।

সিংহাসনের পাদদেশে উৎকৃষ্ট বেশ-ভূষায় সজ্জিত ওমরাহগণ কাতার দিয়া দণ্ডায়মান, তাঁহাদের সম্মুখভাগস্থ রৌপ্য-নির্ম্মিত রেল মূল্যবান্ বস্ত্রে আবৃত, এই আবরণ-বস্ত্রের ঝালর স্বর্ণ-খচিত। ঊর্দ্ধদেশে ফুলদার সাটীনের সুদৃশ্য চন্দ্রাতপ লোহিত রেশম-রজ্জু-বদ্ধ, লম্বমান রজ্জুর প্রান্তভাগে রেশম ও স্বর্ণমণ্ডিত থোপ। গৃহপ্রাঙ্গণে বহুমূল্য রেশম-গালিচা বিস্তীর্ণ। দরবার-গৃহের সম্মুখে এক বৃহৎ বস্ত্রাবাস, তাহার দণ্ডগুলি রৌপ্যনির্ম্মিত, অতি স্থূল, কয়েকটী গুণবৃক্ষের ন্যায় সমুচ্চ। এই বস্ত্রাবাসের বহির্দ্দেশ লাল এবং অভ্যন্তর-ভাগ বিবিধ বর্ণের পুষ্পচিত্রে চিত্রিত; দেখিলে সেগুলি স্বাভাবিক ফুল বলিয়া ভ্রম হয়!

এই দরবার-গৃহের এক একটী গ্যালারী সুসজ্জিত করিবার ভার এক একজন ওমরাহের প্রতি সমর্পিত হইত। ওমরাহগণ এই ব্যয়ভার নিজে বহন করিতেন।

উৎসবের তৃতীয় দিনে সম্রাট তুলাদণ্ডে তৌল হইতেন,—অকৃত্রিম স্বর্ণে তাঁহার দেহের গুরুত্ব পরিমাণ করা হইত। যদি কোন বৎসর সম্রাটের দেহভার পূর্ব্ববার অপেক্ষা একসের অধিক হইত, তাহা হইলে সভাসদ্-বর্গ সম্রাটের সম্মুখে তুমুল আনন্দধ্বনি করিয়া তাঁহার কুশলাকাঙ্ক্ষার পরিচয় দিতেন।

এই উৎসব উপলক্ষে ওমরাহগণ নিজ নিজ পদমর্য্যাদা অনুসারে সম্রাটকে বিবিধ মূল্যবান্ দ্রব্য উপহার প্রদান করিতেন। সেই সকল দ্রব্যের মধ্যে উৎকৃষ্ট মুক্তা, হীরক, চুনী, পান্না, স্বর্ণ-নির্ম্মিত রত্ন-খচিত পাত্র ও স্বর্ণমুদ্রাই প্রধান।

মধ্যে মধ্যে প্রাসাদের অন্তঃপুরে মেলা বসিত; প্রধান প্রধান ওমরাহ ও মনসবদারদিগের সুন্দরী সুরসিকা রমণীগণ এই মেলার আয়োজন করিতেন। নানা প্রকার বস্ত্র, স্বর্ণখচিত পাগ্‌ড়ী, উৎকৃষ্ট মস্‌লিন্ প্রভৃতি দ্রব্য এখানে বিক্রেয় হইত। রমণীগণ বিক্রয় করিতেন; সম্রাট্ বেগম প্রভৃতিরা ক্রয় করিতেন। এই মেলার নাম 'খোস্‌রোজা।' সম্রাট, পণ্যদ্রব্য ক্রয় করিবার সময় সাধারণ লোকের ন্যায় দুই এক পয়সার জন্য ঝগড়া করিতেন; বিক্রেত্রীগণও ছাড়িবার পাত্রী নহেন, তাঁহারা সম্রাটকে 'বেমকা বাজে খদ্দের' বলিয়া বিদ্রূপ করিতেন। অনেক বাক্‌বিতণ্ডার পর মূল্য স্থিরীকৃত হইলে, সম্রাট মূল্য ফেলিয়া দিয়া চলিয়া যাইতেন এবং রৌপ্যমুদ্রার পরিবর্ত্তে যেন ভ্রমক্রমেই স্বর্ণমুদ্রা অর্পণ করিতেন।

প্রতি বুধবারে প্রাসাদান্তঃপুরে নর্ত্তকীদিগের আসিবার নিয়ম ছিল। শাজাহান তাহাদিগকে লইয়া সমস্ত রাত্রি আমোদ করিতেন; কিন্তু আরঙ্গিব তাঁহার পিতার অপেক্ষা অধিক গম্ভীর ছিলেন, তিনি এই সকল আমোদে যোগ দিতেন না। কিন্তু প্রতি বুধবারে আমখাসে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শন করাতে তিনি আপত্তি করিতেন না।

জাহাঙ্গীর কিরূপ সদাশয় ব্যক্তি ছিলেন, বর্ণিয়ার তাহার এক গল্প লিখিয়াছেন। জাহাঙ্গীরের রাজসভায় বার্ণার্ড নামক একজন ফরাসী ডাক্তার ছিলেন; ঔষধ প্রয়োগ এবং অস্ত্রচিকিৎসায় তাঁহার যথেষ্ট দক্ষতা ছিল বলিয়া সম্রাট তাঁহাকে অত্যন্ত আদর করিতেন। এমন কি, সম্রাটের সহিত উক্ত ডাক্তারের একত্র পানাহারও চলিত। বার্ণার্ডের প্রাত্যহিক বেতনের পরিমাণ দশ মোহর ছিল, কিন্তু সম্রাট-পরিবারে কোন বেগমের কিংবা কোন ওমরাহ-পত্নীর পীড়া হইলে তিনি বহুমূল্য উপহার লাভ করিতেন। সম্রাটের সহিত তাঁহার বিশেষ খাতির ছিল বলিয়াও অনেকে তাঁহাকে অনেক দ্রব্য উপহার দিতেন। কিন্তু বার্ণার্ডের অর্থের প্রতি বিশেষ স্পৃহা ছিল না; অনেক সময়েই তিনি উপহার-দ্রব্য দক্ষিণহস্তে গ্রহণপূর্ব্বক বামহস্তে প্রত্যর্পণ করিতেন। তাঁহার প্রতি অনেকেরই বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল, বিশেষতঃ নর্ত্তকীগণ তাঁহার নিকট প্রচুর অর্থ উপহার পাইত বলিয়া তাঁহার প্রতি অত্যন্ত প্রীতি প্রকাশ করিত। প্রত্যহ রাত্রে নৃত্যগীতের জন্য তাঁহার গৃহে যে সকল নর্ত্তকীর সমাবেশ হইত, তাহাদের মধ্যে একজন অপরূপ রূপবতী ছিল, নৃত্যকৌশল এবং সুকণ্ঠেও সে অদ্বিতীয়া। তাহার সুনিপুণ পদচালনা, বঙ্কিম কটাক্ষের বিদ্যুৎস্ফুরণ, কণ্ঠ-নিঃসৃত সঙ্গীতের মোহকারী তান বার্ণার্ডের হৃদয় মুগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছিল। তিনি সেই কুমারীর প্রেমাভিলাষী হইলেন, কিন্তু নিরাশ প্রেমিকের ন্যায় তাঁহার হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল; কারণ, সেই নর্ত্তকীর মাতা তাঁহাদের মিলনের পথে সম্পূর্ণ বাধা উৎপাদন করিয়াছিল। সে তাহার কন্যাকে এক মুহূর্ত্তের জন্যও সঙ্গছাড়া করিত না, সুতরাং উভয়ের মধ্যে স্বাধীনভাবে কথাবার্ত্তা চলিবারও

সুবিধা ছিল না। একদিন বার্ণার্ড কোন বেগমের কঠিন রোগ আরোগ্য করিলে, সম্রাট তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া আম-দরবারের প্রকাশ্য সভাস্থলে বহুসংখ্যক ওমরাহদিগের সাক্ষাতে তাঁহাকে পুরস্কৃত করিতে ইচ্ছা করেন। প্রেমবিদগ্ধ বার্ণার্ড সম্রাটকে আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন,—"জাঁহাপনা! আমি এই রাজদত্ত মূল্যবান্ উপহার গ্রহণে অনিচ্ছুক হইতেছি, এজন্য অপরাধ গ্রহণ করিবেন না, ইহার পরিবর্ত্তে যদি আমার ঈপ্সিত যুবতী নর্ত্তকীকে উপহার দান করেন, তাহা হইলে আমি তাহাই পরম কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে গ্রহণ করিব।" সভাসদ্‌গণ হাসিয়া উঠিল, কিন্তু সম্রাট উচ্চহাস্যে সভাস্থল পূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর ভৃত্যদিগকে আদেশ করিলেন,—"ডাক্তারের এই অভীপ্সিত উপহার তাঁহার স্কন্ধদেশে চাপাইয়া দেওয়া হউক।" অবিলম্বে আদেশ পালিত হইল; ডাক্তার সেই হাস্য মুখরিত জনকোলাহল-পূর্ণ সভাস্থল হইতে সজীব উপহার স্কন্ধে লইয়া জয়গর্ব্বে গৃহে ফিরিলেন।

আনন্দোৎসবের অবসানে হস্তিযুদ্ধ আরম্ভ হইত। নদীতীরে সৈকত-ভূমির উপর যুদ্ধ-ক্ষেত্র নির্দ্দিষ্ট ছিল; যুদ্ধক্ষেত্রের চারিদিকে পাঁচ ছয় ফিট উচ্চ এবং তিন চারি ফিট স্থূল প্রাচীর; নাগরিকগণ তাহার চারিদিকে সমবেত হইত এবং সম্রাট, বেগমগণ ও ওমরাহবর্গ প্রাসাদ-বাতায়ন হইতে তাহা নিরীক্ষণ করিতেন।

যুদ্ধের জন্য হস্তিদ্বয় যুদ্ধক্ষেত্রে আনীত হইত। তাহাদের পৃষ্ঠদেশে দুই জন করিয়া মাহুত থাকিত; কারণ, যুদ্ধকালে এক জন ভূপতিত কি আহত হইলে, আর এক জন তাহাকে পরিচালিত করিতে পারিত। হস্তিদ্বয় উভয়ে উভয়কে আক্রমণ করিত,—দন্তে দন্তে, মস্তকে মস্তকে, শুণ্ডে শুণ্ডে ভয়ানক যুদ্ধ! সকলেই কুতূহল নেত্রে সেই দৃশ্য দেখিত। যুদ্ধ আরম্ভ হইলে আর শীঘ্র নিবৃত্ত হইত না; উভয়কে যুদ্ধে বিমুখ করিতে হইলে, তাহাদের মধ্যে বোম আওয়াজ করিতে হইত, এই অতর্কিত শব্দে ভয় পাইয়া তাহারা পলায়ন করিত। বিজয়ী হস্তী ও তাহার মাহুত যথেষ্ট পুরস্কার লাভ করিত। কিন্তু এই গজযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে মাহুতেরা স্ব স্ব স্ত্রী-পুত্রাদির নিকট বিদায় লইয়া আসিত; যুদ্ধোন্মত্ত হস্তীর পৃষ্ঠ হইতে প্রাণ লইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করা সহজ ছিল না। যদি কোন মাহুতের এরূপ অবস্থায় মৃত্যু হইত, তাহা হইলে সম্রাট তাহাদিগের অনাথ-পরিবারের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করিতেন। অনেক সময় দর্শকগণকেও হস্তিপদতলে দলিত হইতে হইত।

অনন্তর বর্ণিয়ার সাহেব জুম্মা মসজিদের হৃদয়গ্রাহিণী বর্ণনা করিয়াছেন। প্রতি শুক্রবারে সম্রাট এখানে উপাসনা করিতে আসিতেন। তাঁহার মসজিদে আসিবার পূর্ব্বে পথ জলসিক্ত করা হইত, প্রাসাদ হইতে মসজিদ পর্য্যন্ত অস্ত্রধারী সৈন্য রক্ষিত হইত। সম্রাট বাহির হইলে পাঁচ ছয় জন অশ্বারোহী তাঁহার সম্মুখে জনতা দূর করিতে করিতে অগ্রসর হইত। সম্রাট কখন হস্তিপৃষ্ঠে সুদৃশ্য হাওদার উপর আরোহণপূর্ব্বক সমজিদে যাইতেন, কখন স্বর্ণ ও রত্নাদি-খচিত তাঞ্জামে উঠিতেন, মূল্যবান্ সুন্দর পরিচ্ছদে ভূষিত আট জন বাহক সেই তাঞ্জাম স্কন্ধে করিয়া লইয়া চলিত। ওমরাহগণ কেহ অশ্বারোহণে, কেহ পাল্কীতে সম্রাটের অনুবর্ত্তী হইতেন। অসংখ্য খাস, নিশান, ছাতা আড়ানি ইত্যাদি সঙ্গে সঙ্গে চলিত।

'কারণ সর' (বেগম সরাই) দিল্লীর আর একটী উল্লেখ যোগ্য সৌধ। সম্রাট শাজাহানের প্রথমা কন্যা বেগম সাহেবার নামে ইহা প্রতিষ্ঠিত। এখানে পারস্য দেশীয় সওদাগরদিগের আড্ডা ছিল, উজবেক প্রভৃতি অন্যান্য-দেশীয় সওদাগরগণও এখানে বাস করিতেন। তাঁহাদের আনীত মূল্যবান্ পণ্যদ্রব্য-সমূহ সুন্দর সৌধে সজ্জিত থাকিত।

দিল্লী-নগরের অল্পদূরে আর একটী প্রকাণ্ড সৌধের নাম 'সাহ লামার'। ইহার চতুর্দ্দিকে সুন্দর উপবন। 'সাহ লামার' দিল্লীশ্বরের প্রমোদ-গৃহ ছিল। শাজাহান সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ১৬৩২ খৃষ্টাব্দে ইহা নির্ম্মাণ করেন। এই প্রকাণ্ড হর্ম্ম্য ভিনিসীয় আদর্শে নির্ম্মিত।

প্রায় সার্দ্ধ দুই শতাব্দী পূর্ব্বে বর্ণিয়ার দিল্লীনগরের এই প্রকার বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন; আমরা পাঠকবর্গের কৌতূহল দূর করিবার জন্য তাহার সারমাত্র সংগ্রহ করিয়া ক্ষান্ত হইলাম। সমস্ত বর্ণনা অবিকল উদ্ধৃত করা যথেষ্ট স্থান এবং সময়সাপেক্ষ। বর্ণিয়ারের মুসলমান-রাজধানীর বিবরণ পাঠ করিলে বাস্তবিকই মুগ্ধ হইতে হয়; সার্দ্ধ দুই শত বৎসর পূর্ব্বের ভারতীয় সমাজের একটী মোহন চিত্র নয়ন সমক্ষে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে। যাহা দেশ ও কালের অতীত হইয়া পড়িয়াছে, যে বিলুপ্তপ্রায় গৌরব অতীত স্মৃতির জীর্ণ আবরণে অবরুদ্ধ রহিয়াছে, তাহা যথাযথ ভাবে চিত্রিত দেখা অতীব প্রীতিকর। পাঠ করিতে করিতে মনে হয়, আমরা যেন সেই প্রাচীন কালের মোগল-রাজধানীতে প্রবেশ করিয়াছি;—সেই উৎসবময়ী দিল্লীনগরী, অর্দ্ধচন্দ্র-শোভিত মোগল-গৌরব-কেতন দিল্লীর দুর্গশীর্ষে উড্ডীন হইতেছে; গৃহে গৃহে আনন্দ-বাদ্য, সঙ্গীতের মধুর উচ্ছ্বাস; সমগ্র ভারতের বিলাস উপকরণ সম্রাটের তৃপ্তির জন্য সেখানে আনীত হইতেছে এবং ভারতের শ্রেষ্ঠ সুন্দরীগণ পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যে বিকশিত হইয়া ভারতের শাসনকর্ত্তাগণের উপর

কঠোর শাসনদণ্ড নিক্ষেপ করিতেছেন। কে জানিত, এক শতাব্দী মধ্যে সেই সুবৈশ্বর্য্য-বিলাসপূর্ণ দিল্লী মহাশ্মশানে পরিণত হইবে?—সমস্তই কালসাগরে বিলীন হইয়া গিয়াছে, কেবল দিল্লীর সমুন্নত সৌধ, উচ্চ মিনার, সুন্দর প্রাসাদগুলি এখনও জলবুদ্বুদের ন্যায় জগতের সম্মুখে তাহার ভবিতব্যতার কঠোর শাসনের নির্ব্বাক্ সাক্ষী স্বরূপ দৃশ্যমান রহিয়াছে।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

সমালোচনা।

হাসি ও অশ্রু। শ্রীসরোজকুমারী দেবী প্রণীত। শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী সম্পাদিত। মূল্য এক টাকা। পাঠক, নামেই বুঝিয়াছেন, ইহা এক খানি কবিতা পুস্তক। পুস্তক খানি নূতন প্রকাশিত বটে, কিন্তু কবিতাগুলি সব নূতন নয়। ইহার অধিকাংশই ইতিপূর্ব্বে ভিন্ন ভিন্ন মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। নব্যসমাজে লেখিকার নাম আছে। স্ত্রীলোকের গ্রন্থকর্ত্রী হওয়া সম্বন্ধে আমাদের মতবিরোধ থাকিলেও, সরোজকুমারীর লেখার বেশ একটুখানি অপূর্ব্বত্ব আছে, একথা অম্লান-বদনে বলিতে পারি। সে অপূর্ব্বত্বটুকু আজিকার অনেক "নব্য কবির" মধ্যেও দেখিতে পাই না।

"হাসি ও অশ্রু" নামে আমাদের আপত্তি আছে, আর সম্পাদিকার কবিতা নির্ব্বাচনেও ত্রুটী দেখিতে পাই। নামে আপত্তি এই জন্য, ইহার প্রায় সকল কবিতাই অশ্রুমাখা,—হাস্যের অবতারণ কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। সুতরাং "হাসি ও অশ্রু" নামকরণ না করিয়া "অশ্রুহার" বা "অশ্রুমালা" নাম রাখাই সঙ্গত ছিল। সম্পাদিকার ত্রুটী

এই,—কবিতা সাজান ভাল হয় নাই; আর বইখানা তিনি অযথা বাড়াইয়াছেন। এ বিষয়ে আমরা লেখিকার বেশী দোষ দিতে পারি না। কারণ, তিনি হৃদয়ের আবেগে ও সহৃদয়তার আধিক্যে একই রকমের কান্না অনেকবার কাঁদিয়াছেন; হৃদ্‌যন্ত্রে একই সুরের আলাপ অনেকবার করিয়াছেন;—সেই কান্না বা গানের সুরগুলি লইয়া মালা গাঁথিবার সময় সম্পাদিকার সে বিষয়ে খরদৃষ্টি রাখা উচিত ছিল। সম্পাদন কার্য্যও ত তাই। নচেৎ, কেবলমাত্র লেখকের লেখাগুলি একত্র করিয়া প্রচার করিলে সম্পাদকে ও প্রকাশকে প্রভেদ রহিল কি? এই জন্য "হাসি ও অশ্রু"র অনেক কবিতা একঘেয়ে ও পুনরুক্তি-দোষে দুষ্ট হইয়াছে।

"হাসি ও অশ্রু" যে ধরণের কবিতা পুস্তক, এ ধরণের কবিতার প্রবর্ত্তক ও নেতা—"সারদা-মঙ্গলের" কবি—৺বিহারিলাল চক্রবর্ত্তী। চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের গুণভাগ ছাঁকিয়া লইয়াছেন,—তাঁহার মেধাবী শিষ্য, প্রতিভাবান, বঙ্গের কৃতি-কবি শ্রীরবীন্দ্রনাথ। সেই রবি কবির পাঠশালে এখন অনেকে "হাতেখড়ি" দিতেছেন; দুই এক জন "লামেক"ও হইয়াছেন। কিন্তু দুঃখ এই, "সাত নকলে আসল খাস্ত" হইয়া পড়িতেছে। গুরুর গুণ বড় একটা কাহাতেও বর্ত্তিতেছে না,—দোষের ভাগ ষোল আনা সুদসমেৎ সকলে আদায় করিয়া বসিতেছেন। তাঁহাদের কবিতা, পড়িতে অনেক সময় অরুচিকর বোধ হয়। দেখিয়া সুখী হইলাম, সরোজকুমারীর কবিতা তেমন "হেঁয়ালি"র মত দুর্ব্বোধ ও প্রাণহীন নহে। ইহাঁর অধিকাংশ কবিতাই আন্তরিকতাপূর্ণ। গ্রন্থের ভাষা সরল ও মর্ম্মস্পর্শিনী; গ্রন্থকর্ত্রীর লিপিকুশলতাও প্রশংসনীয়। তবে দেশ কাল ও পাত্র বিবেচনা করিয়া বিষয়গুলি তেমন মনোজ্ঞ বলিতে পারিলাম না। কারণ,

"দেরে ওই প্রেমরাশি তীব্র হলাহল!
হৃদয় জ্বলিয়া যায় অতৃপ্ত তিয়াসা,
মেটেনি কখন মোর পরাণের আশা;
জ্ব'লে গেছে পান করি মরমের তল!"

আমাদের দেশের মেয়েছেলের ইহা আদর্শ হইতে পারে কি? তবে,

"কি যে লিখি বুঝিতে পারি না!
আকুল মর্ম্মের মাঝে যে উন্মাদ সুর বাজে,
দুটি ছত্রে লিখিতে বাসনা!"

এ কর্ম্মকাতরতা কবির উক্তি বটে।

উপসংহারে, আমরা "হাসি ও অশ্রুর" "নিমেষ" শীর্ষক একটী কবিতা পাঠকবর্গকে উপহার দিলাম। ইহাতে লেখিবার ভাবপ্রবণতা, ভাষার কমনীয়তা ও হৃদয়ের প্রতিধ্বনি কিরূপ প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা চিন্তাশীল পাঠক লক্ষ্য করিবেন;—

"ভাঙ্গা ভাঙ্গা দুটী মেঘ পাশাপাশি ধীরে এসে
ক্ষণিক চাহিল দোঁহাপরে।
আত্মহারা আশা দুটী জীবন সীমায় ভেসে
মরমের মাঝে যায় ঝ'রে।
একটী সুখের দিন শত দিবসের মাঝে
যেমন ক্ষণিকে চ'লে যায়,
মলিন শুকানো ফুল ঝরিবার আশে আছে,
একটু বাতাসে ঝ'রে যায়।
তেমনি দুইটি প্রাণ অজানা স্বপনে ধীরে,
আবেশেতে দোঁহাপানে চায়।
সাধ মনে একবার চাহিতে নয়ন ভ'রে
অমনি পলক পড়ে হায়!
পরিশ্রান্ত আঁখি দুটী ঢুলিয়া পড়িতে চায়
কত সাধ জাগে মনে মনে।
পলক ফেলিতে হায় নিমেষ ফুরায়ে যায়
ঘুমমাখা মধুর স্বপনে!"

রঘুবংশ। প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ। মহাকবি কালিদাসের অমৃতময়ী লেখনী প্রসূত রঘুবংশের বঙ্গানুবাদ। শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র দাস এম্, এ, বি, এল্ কর্ত্তৃক অনুবাদিত। মূল্য ২৲।

"রঘুবংশ" অমর কবি কালিদাসের উৎকৃষ্ট মহাকাব্য। নবীন বাবু সেই মহাকাব্য বঙ্গ-

ভাষায় অনুবাদ করিয়া, বঙ্গবাসীকে এক উজ্জ্বল রত্ন উপহার দিয়াছেন। সংস্কৃত কাব্যের এমন মনোহর অথচ অবিকল অনুবাদ প্রায় দেখা যায় না। যাঁহারা সংস্কৃত জানেন না, মহাকবির সে মহাকাব্য সম্যক্ উপলব্ধি করিয়া, তাহার মধুর রস আস্বাদনে তাঁহারা বঞ্চিত। তাঁহারা জানেন না, সংস্কৃত সাহিত্যভাণ্ডারে কি উজ্জ্বল রত্ন-রাজি বিরাজ করিতেছে! এই অনুবাদ পাঠ করিলে, তাঁহারা সে অমূল্য মণি-মাণিক্যের আভাস পাইবেন। বঙ্গভাষাকে বিবিধ রত্নরাজিতে সাজাইতে যাঁহার প্রয়াস, তিনি চিরদিনই আমাদের ধন্যবাদের পাত্র। নবীন বাবু শিক্ষিত ও কৃতী; বড় সুন্দর বিষয়েই তিনি হস্তক্ষেপ করিয়াছেন এবং তাঁহার হস্তে মহাকবির সে মহাকাব্যের মর্য্যাদা রক্ষিত হইয়াছে।

সংস্কৃত সাহিত্যের অনেক অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। অনেক অনুবাদ পাঠ করিয়া মনে হইয়াছে, অনুবাদকের পরিশ্রম বৃথায় গিয়াছে। যাঁহারা সংস্কৃত জানেন না, সে অনুবাদ পাঠে, অশ্বত্থামার দুগ্ধের পরিবর্ত্তে দুগ্ধবৎ পানীয় গ্রহণের ন্যায়, তাঁহারা কাব্যের সম্যক্ সৌন্দর্য্য উপভোগে বঞ্চিত হইয়াছেন। কিন্তু নবীন বাবু কৃত রঘুবংশের এই বঙ্গানুবাদ সে শ্রেণীর অনুবাদ নহে। দুই একটীর পরিচয় দিতেছি।

প্রথম সর্গে, মহারাজ দিলীপ, রাণী সুদক্ষিণার সহিত বসিষ্ঠের আশ্রমে গমন করিতেছেন। সে পথের বর্ণনা অতি সুন্দর;—

"রথের ঘর্ঘরে ভাবি মেঘের গর্জ্জন
ঊর্দ্ধমুখে কেকারবে গায় শিখিগণ
পুলকে ষড়জ রাগে, করিয়া শ্রবণ
সুদক্ষিণা সহ রাজা আনন্দে মগন।
অদূরে দাঁড়ায়ে পথে হরিণ হরিণী,
নির্ভয়ে নেহারে রথ বিশাল নয়নে,
কৌতুকে সে আঁখি-শোভা দেখে রাজা-রাণী
পরস্পর আঁখি সহ তুলনে দুজনে।"

ষষ্ঠ সর্গে, অজরাজের সহিত ইন্দুমতীর মিলন বর্ণিত হইয়াছে। স্বয়ংবর-সভায় বহু দেশ হইতে বহু রাজা সম্মিলিত হইয়াছেন। সুনন্দা একে একে সকলের পরিচয় দিতেছে, কিন্তু

"ভোজের ভগিনী ইন্দুমতীর হৃদয়ে,
না পশিল সুনন্দার বচন মধুর;
পশে কি সুধাংশু অংশু নিশীথ সময়ে
মুদিত কমলে, রবি-বিরহ-বিধুর?
যে যে রাজগণে ছাড়ি চলিলা যুবতী
ডুবিল তাঁদের মুখ দুখের আঁধারে;
রাজপথে দীপশিখা নিশীথে যেমতি
গেলে চলি, হর্ম্ম্যরাজি ডুবে অন্ধকারে!"

অজের সহিত ইন্দুমতীর মিলন হইল;—

"এক দিকে বর পক্ষ প্রফুল্ল সভায়,
অন্য দিকে রাজবৃন্দ বিষণ্ণ হৃদয়,
ফুটিলে কমল যথা সরসে ঊষায়
বিষাদে মুদিত আঁখি কুমুদ-নিচয়!"

অষ্টম সর্গে, মহারাজ রঘু, পুত্রের প্রতি রাজ্যভার অর্পণ করিয়া, বানপ্রস্থ ব্রত অবলম্বন করিলেন। সে কেমন?—

"সূর্য্যকুলাকাশে আহা কি শোভা উদয়!
শমাশ্রমে অস্ত রঘু পূর্ণ-শশধর,
অন্য দিকে স্বর্ণাসন-সুমেরু উপর
উদিত অরুণ-রূপে রঘুর তনয়!"

একদিন মহারাজ অজ, রাণী ইন্দুমতীকে লইয়া উপবনে বিহার করিতেছিলেন, সেই সময় মুনিবর নারদ বিমানপথে যাইতেছিলেন। তাঁহার বীণায় পারিজাত-মালা শোভা পাইতেছিল। সহসা বীণাচ্যুত হইয়া সেই পারিজাত, রাণী ইন্দুমতীর হৃদয়ে পতিত হইল। সেই কুসুম-স্পর্শে ইন্দুমতীর প্রাণবিয়োগ হইল। অজের করুণ-বিলাপে উপবন পূর্ণ হইল;—

"সুকুমার পারিজাত-কুসুম প্রহারে
পার হে বধিতে, বিধি, যদি অবলারে,
কোন্ দ্রব্যে ইচ্ছা তব না হয় সাধন,
সংহার করিতে তব বাসনা যখন?"

এমন আকুল ক্রন্দনে এই অষ্টম সর্গ পূর্ণ।

"অজ-বিলাপ" অতি সুন্দর ও মধুর। উদ্ধৃত শটুকু অনুবাদ বলিয়া মনে হয় কি?

ইন্দুমতীর বিরহে শোকাতুর রাজা চারি দিকেই প্রিয়তমাকে দেখিতেছেন। মৃতা পত্নীকে বলিতেছেন,—

"বায়ু-কোলে দোলে লতা নিকুঞ্জ ভিতর,
বিলাস-বিভ্রম সে কি হরিল তোমার?
কোকিলা হরিয়া তব কলকণ্ঠ-স্বর
দিতেছে দ্বিগুণ ব্যথা চিত্তে অভাগার;
হরিণী হরিল চারু চঞ্চল দর্শন,
কলহংসী হরিয়াছে মন্থর-গমন।"

দুঃখ রহিল, সকল স্থান উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না।

রাবণ-বিনাশের পর, রামচন্দ্র সীতাকে লইয়া অযোধ্যায় ফিরিতেছেন। ত্রয়োদশ সর্গে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। পথে আসিতে আসিতে রামচন্দ্র একে একে সীতাকে নানা শোভা দেখাইতেছেন। সে বর্ণনার সৌন্দর্য্যে রঘুবংশের ত্রয়োদশ সর্গ অতি অপূর্ব্ব হইয়াছে। ইংরাজিতে সমুদ্রের বর্ণনা পড়িয়াছি, কিন্তু এমন মনোহারিত্ব কোথাও আছে কি?—

"অপূর্ব্ব প্রেমে খেলা খেলেন সাগর,—
শত মুখে নদীকুল চুম্বিছে তাঁহারে,
প্রদানি তাদের মুখে তরঙ্গ অধর
চতুর সরিত-পতি তোষেন সবারে।"

রথ মেঘের পথ দিয়া আসিতেছিল। সীতা কৌতুকে রথের ভিতর হইতে মেঘ স্পর্শ করিতে হস্ত প্রসারণ করিতেছিলেন, সহসা বিদ্যুৎ আসিয়া, সীতার কর-স্পর্শ করিতেছে। রামচন্দ্র বলিতেছেন,—

"যবে তুমি কুতূহলে রথ বাতায়নে
প্রসারিছ কর, দেবি, পরশিতে ঘনে,
বারিদ আনিয়া নিজ বিজলী বলয়
পরাইছে করে যেন, ক্ষণ তেজোময়!"

তার পর, নানা স্থান দেখাইতে দেখাইতে, রামচন্দ্র গঙ্গা-যমুনার অপূর্ব্ব সঙ্গম স্থলে উপস্থিত হইলেন। সীতাকে সেই গঙ্গা-যমুনার অপূর্ব্ব মিলন-শোভা দেখাইতেছেন;—

"সুনীল যমুনাজলে মিলি কুতূহলে
বহিছেন ওই শ্বেত সুর-তরঙ্গিনী—
মুক্তাহারে গাঁথা যেন ইন্দ্রনীলমণি,
শ্বেত-পদ্মমালা কিম্বা নীল উতপলে।
মানসের হংসরাজি ধবল বরণা
নীল-হংসদলে যেন হ'য়েছে মিলিত,
ভূতলে চিত্রিত শ্বেত চন্দন রচনা—
শোভে যেন কৃষ্ণপত্রে অগুরু অঙ্কিত।
কোথাও জোছনা-জাল যেন রে চিত্রিত
স্থানে স্থানে ছায়া-লীন তিমিরপটলে,
কোথাও বা শরদের শুভ্র অভ্রদলে
ভেদি যেন নীলাকাশ হ'তেছে লক্ষিত।
ধবল ভবেশ-অঙ্গ বিভূতি-ভূষিত
রহিয়াছে যেন কৃষ্ণভুজঙ্গে বেষ্টিত—
এরূপে কতই রূপ হের, বরাননে,
ধরেন জাহ্নবী মিলি যমুনার সনে।
এহেন সঙ্গমস্থলে গঙ্গা-যমুনার,
তত্ত্বজ্ঞান অভাবেও যদি কোন জন
অবগাহি দেহ, হয় সুপবিত্র-মন,
মরণে না হয় তার জন্ম পুনর্ব্বার।"

অমর কবির সর্ব্বভেদিনী প্রতিভা সর্ব্বত্রই এমন সৌন্দর্য্য ঢালিয়া গিয়াছে! নবীন বাবুর বঙ্গানুবাদেও সেই সৌন্দর্য্য ফুটিয়াছে। আমরা তাঁহার অনুবাদ পড়িয়া মুগ্ধ হইয়াছি। এখনও তাঁহার অনুবাদ সম্পূর্ণ হয় নাই, আমরা সাগ্রহে তাহার প্রতীক্ষা করিতেছি।

সংস্কৃত রঘুবংশের ন্যায়, এই বঙ্গানুবাদ আমাদের বঙ্গভাষায় অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিবে। নবীন বাবু যে ভাবুক ও কবি, তাহার পরিচয় পাইয়াছি। কাব্যখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর-রূপে বঙ্গভাষায় এক উজ্জ্বল রত্ন স্বরূপ দেখিতে আমাদের ইচ্ছা বলিয়া, নবীন বাবুকে একটা অনুরোধ করি, মূলের সহিত সম্পূর্ণ মিল রাখিয়া তিনি অনুবাদ করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছেন বটে, কিন্তু সকল স্থানে ভাষার লালিত্য রক্ষিত হয় নাই। ভাব পরিস্ফুট হইয়াছে, কিন্তু ভাষা যেন কোথাও কোথাও অনুস্বার ও বিসর্গ বিহীন সংস্কৃত ভাষার ন্যায় স্থানে স্থানে কিছু নীরস ও কঠোর হইয়াছে। নবীন বাবু আর একটু চেষ্টা করিলে, বোধ হয় তাহা পরিহার করিতে পারেন।

জন্মভূমি।

৫ম ভাগ। } শ্রাবণ। ১৩০২। { ৮ম সংখ্যা।

নয়ন-চাঁদের ব্যবসা।

প্রথম পর্ব্ব।

আঠারো।

নয়ন-চাঁদের বাড়ী ফরাশ-ডাঙ্গা। নয়ন-চাঁদ গুলি খাইয়া থাকেন।

এক দিন সন্ধ্যাবেলা, নয়ন, লম্বোদর, গগন প্রভৃতি বন্ধুগণ, আড্ডায় বসিয়া নিত্য-ক্রিয়ায় ব্যস্ত ছিলেন। ক্রিয়াটীর গুণ এই যে, মাঝে মাঝে মজার মজার কথা চাই, তাহা না হইলে, প্রাণে তত্টা আমেজ হয় না।

তাই, লম্বোদর জিজ্ঞাসা করিলেন,—"নয়ান! আজ কাল তোমার কিছু সুখ সওয়াল দেখিতেছি। চিনির জলে আর সে তোমার ঘোলা নাই। এখন সন্দেস-টুকু, রসগোল্লা-টুকু, এ না হইলে আর তোমার চাট হয় না। মুখে একটু তোমার কান্তি বাহির হইয়াছে, শরীরে লাবণ্য দেখা দিয়াছে, গায়ে তোমার তেলা মারিয়াছে। মকের টাকা পাইয়াছ না কি?"

আর সকলেও বলিয়া উঠিলেন,—"সত্য হে! ব্যাপার খানা কি বল দেখি, নয়ান? গুলিখোর বলিয়া তোমাকে আর চেনা যায় না। স্বয়ং মা লক্ষ্মীকে বাঁটিয়া যেন তুমি মুখে মাখিয়াছ! নয়ান! কিসে তোমার কপাল ফিরিল, তা বল।"

নয়ন অনেক ক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। বিশেষ চিন্তা করিয়া, অবশেষে, বাক্‌খাঁই-স্বরে বলিলেন,—"আড্ডাধারী মহাশয়! ইহাঁদিগকে জিজ্ঞাসা করুন, ইহাঁরা হিন্দু কি মুসলমান?"

গগন বলিলেন,—"ধান ভানিতে শিবের গীত! কোথাকার কথা কোথা! মুসলমান কেন আমরা হইতে যাইলাম? কবে তুমি কারে কাছা খুলিয়া নামাজ করিতে দেখিয়াছ যে, ফট্ করিয়া এমন কথা জিজ্ঞাসা করিলে? নয়ান! আজ তুমি আর অধিক ছিটে টানিও না, তোমার হেড খারাব হইয়া গিয়াছে।"

নয়ন উত্তর করিলেন,—"চটি কেন ভাই! কথাটা যখন বলিলাম, তখন অবশ্য তাহার মানে আছে। তোমরা জিজ্ঞাসা করিলে যে, আমার সংসার সচ্ছল কিসে হইল? যদি সব কথা খুলিয়া বলি, হয় তো তোমরা হাসিয়া উঠিবে। তার চেয়ে না বলা ভাল। আজ কাল আমার হইল ধর্ম্মগত প্রাণ। বন্ধু হইলে কি হয়? তোমাদের মতি-গতি অন্যরূপ।

কিসে আমার দু পয়সা হইল, তা আমি তোমাদিগকে বলিতে চাই না। আর তোমরাও জিজ্ঞাসা করিও না।"

নয়নের কথায় সকলের ঘোরতর কুতূহল জন্মিল। কিসে নয়নের পয়সা হইল, এ কথাটী শুনিবার জন্য সকলের প্রাণ বড়ই উৎসুক হইল। বলিবার জন্য নয়নকে সকলে বার বার অনুরোধ করিলেন। নয়ন কিন্তু কিছুতেই বলেন না। অবশেষে স্বয়ং আড্ডাধারী মহাশয় আসিয়া অনুরোধ করিলে, নয়ন বলিতে লাগিলেন।

নয়ন বলিলেন,—"আমি বলি! কিন্তু যাহা বলিব, তাহা শুনিয়া যদি হাসো, কি ঠাট্টা বিদ্রূপ কর, তাহা হইলে জানিব যে তোমরা বন্ধু নও, তোমরা মুসলমান, নাস্তিক, শাক্ত, কৃষ্টান, বৈষ্ণব, ব্রহ্মজ্ঞানী,—আর কি নাম করিতে বাকি রহিল, আড্ডাধারী মহাশয়?"

আড্ডাধারী মহাশয় হাসিয়া বলিলেন,—"আর কি বাকি আছে? বাকি আর কিছুই নাই। সেই যে ব্রাহ্মণ-দেবতা বলিয়াছিলেন,—'ওরে আঁটকুড়োর বেটারা! যদি সতর পর্য্যন্ত বলিলি, তবে আর আঠারোর বাকি কি রাখিলি?' ছেলেরা কেবল সতর পর্য্যন্ত বলিয়াছিল; তা নয়ান! তুমি সতর ছাড়িয়া উনিশ পর্য্যন্ত উঠিয়াছ। বাকি আর কিছু রাখ নাই। হিন্দু, ব্রহ্মজ্ঞানী, কৃষ্টান যা কিছু আছে, সব বলিয়াছ।"

লম্বোদর জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ব্রাহ্মণ কারে গালি দিয়াছিল, আর এ সতর, আঠারোর মানে কি?"

আড্ডাধারী মহাশয় উত্তর করিলেন,—"এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি আঠারো বলিলে খেপিতেন। দেখা পাইলেই ছেলেরা তাই তাঁকে আঠেরো বলিয়া খেপাইত। গালি তো যা মুখে আসিত তা দিতেন, তা ছাড়া, ইট, পাটকেল, যাহা কিছু সম্মুখে পাইতেন, তাহা ছুড়িয়া সেই ব্রাহ্মণ-দেবতা ছেলেদের মারিতেন। একদিন এক পুষ্করিণীতে ব্রাহ্মণ স্নান করিতেছিলেন। কতকগুলি ছেলেও সেই পুকুরে স্নান করিতেছিল। ব্রাহ্মণকে দেখিয়া আঠারো বলিবার নিমিত্ত ছেলেদের মুখ চুলকাইয়া উঠিল। কিন্তু ভয়! ছেলের গন্ধ পাইয়াই রাগে ব্রাহ্মণের গা গশ্ গশ্ করিতেছিল, জবা ফুলের মত চক্ষু করিয়া মাঝে মাঝে তিনি কট্ মট্ করিয়া ছেলেদের পানে চাহিতেছিলেন। 'একবার আঠারো বলিলে হয়!' মনে মনে ভাবটা তাঁর এইরূপ। বড়ই বিপদ! আঠার না বলিলেও নয়, ওদিকে ব্রাহ্মণের এইরূপ উগ্রশর্ম্মা মূর্ত্তি। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া একজন বালক হঠাৎ বলিয়া উঠিল,—'ভাই! এ পুকুর-পাড়ে কয়টা তাল গাছ আছে?' এই কথা বলিতেই অপর সব বালকেরা গুণিতে আরম্ভ করিল—এক দুই ৩। ৪। ৫। ৬। ৭। ৮। ৯। ১০। ১১। ১২। ১৩। ১৪। ১৫। ১৬। ১৭—এতক্ষণ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণ চুপ করিয়া শুনিতেছিলেন। ছেলেরা যেই ১৭ বলিল, আর ব্রাহ্মণ একবারে রাগে জ্বলিয়া উঠিলেন। একবারে অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন—'তবে রে আঁটকুড়োর বেটারা! আর বাকি রইলো কি? যদি সতর পর্য্যন্ত বলিলি, তবে আর আঠারোর বাকি রাখিলি কি?' এই বলিয়া নানারূপ গালি দিয়া ব্রাহ্মণ ছেলেদের মারিতে দৌড়িলেন। ছেলেরা পুষ্করিণী হইতে উঠিয়া যে যেদিকে পাইল, ছুটিয়া পলাইল। তাই বলিতেছি, নয়ান! তুমি আমাদিগকে কৃষ্টান বলিলে, শাক্ত বলিলে, বৈষ্ণব বলিলে, আর ব্রহ্মজ্ঞানী পর্য্যন্ত বলিলে। বাকি আর কি রহিল? আঠারো ছাড়িয়া উনিশ, বিশ পর্য্যন্ত হইয়া গেল।"

নয়ন কিছু অপ্রতিভ হইলেন। নয়নের মন কিছু নরম হইল। নয়ন বলিলেন,—"না, না, তোমাদের আমি ও-সব কথা বলি নাই। শাক্ত, বৈষ্ণব, ব্রহ্মজ্ঞানী, কৃষ্টান কি তোমাদের আমি বলিতে পারি? আমি বলিয়াছি যে, যে আমার কথা বিশ্বাস না করিবে, সে তাই।"

দ্বিতীয় পর্ব্ব।

কপাৎ।

নয়ন বলিলেন,—"মনের মিল থাকে, তবে বলি ইয়ার! তোমরা হিন্দু হও, আমিও তাই। মুসলমান হও, আমিও তাই। তোমরা যে ঠাকুর-গুলি মানিবে, আমিও সে গুলিকে মানিব। আমিও যে ঠাকুর-গুলিকে মানিব, তোমাদেরও সে গুলিকে মানিতে হইবে। তা না হইলে, মনের মিল রহিল কোথায়?"

সকলেই বলিলেন,—"ঠিক! ঠিক! নয়ান বলিতেছে ভাল। আমাদেরও ঐ মত।"

নয়ন বলিলেন,—"আমি হক্ কথা বলিব। আজ আমার অবস্থা একটু ফিরিয়াছে বলিয়া, পুরাতন বন্ধুদের আমি তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করিব না; তবে দেশের হাওয়া বুঝিয়া আমি তোমাদিগকে কাজ করিতে বলি। আজ কাল দেশের যেরূপ হাওয়া পড়িয়াছে, তাতে সেকালের মত এখন আর হাবড়-হাটি ব্রহ্মজ্ঞান তেত্রিশ কোটি দেবতার পায় তেল দিলে চলিবে না। উহারই মধ্যে দুই চারিটী মাতালো মাতালো দেবতা বাছিয়া লইতে হইবে। পূজা দিতে হয়, সেই দুই চারিটী দেবতার দাও। আর সব দেবতারা মুখ হাঁড়ি করিয়া থাকেন, থাকুন! ঘরের ভাত বেশি করিয়া খাবেন।"

সকলেই বলিলেন,—"ঠিক! ঠিক! ঠিক কথা! হাবড় তাবড় তেত্রিশ কোটির চা'ল কলা যোগায় কে হে, বাপু! পূজা না পাইয়া, মুখ হাঁড়ি করিয়া, বসিয়া থাক, থাক! বেচারি গুলিখোরদের যে পুঁটি মাছের প্রাণ, সে টী তো বুঝিতে হবে? উহার মধ্যে দু-একটী বাছিয়া লও, লইয়া বাকি সব না-মঞ্জুর করিয়া দাও।"

নয়ন বলিলেন,—"আমারও ঠিক ঐ মত। ভাবিয়া চিন্তিয়া আমি দুইটী দেবতা বাহির করিয়াছি, এক গেলেন কাটিগঙ্গা, আর এক হইলেন ফনী মনসা। বাকি সব না-মঞ্জুর।"

সকলেই একবাক্য হইয়া সায় দিলেন। সকলেই স্বীকার করিলেন যে, এই দুইটী দেবতাই অতি চমৎকার দেবতা। আর সমুদয় দেবতাকে না-মঞ্জুর করিয়া, মাটীতে মাথা ঠুকিয়া, এই দুইটী দেবতাকে সকলে প্রণাম করিতে লাগিলেন। মাটীতে মাথা ঠুকিতে ঠুকিতে সকলে বলিলেন,—"হে মা কাটিগঙ্গা! হে বাবা ফনী মনসা! তোমাদের পায়ে গড়। ওঁ নমঃ। ওঁ নমঃ। ওঁ নমঃ।"

নয়ন পুনরায় বলিলেন,—"কিন্তু এখনও আসল দেবতাটীর কথা বলা হয় নাই। শেষে বলিব, তাই মনে করিয়া সেটী বাকি রাখিয়াছি। সে দেবতাটী, মা শীতলা। তাঁরই বরে আমার সুখ, আমার সম্পত্তি, আমার ঐশ্বর্য্য। সাবধান! কাঁচা-খাওয়া দেবতা!

সকলেই বলিলেন,—"সাবধান! কাঁচা-খাওয়া দেবতা!"

নয়ন বলিলেন,—"এ বাপু ঘেঁটু নয়, পেঁচো নয়, তোমার মাণিক পীর নয়। এ মা শীতলা! ইংরেজি খবরের কাগজে পর্য্যন্ত মা'র নাম বাহির হইয়াছে। মা'র বরে আমার সব।"

শীতলার নাম শুনিয়া সকলেই স্তম্ভিত। ভয়ে সকলের প্রাণ আড়ষ্ট হইয়া উঠিল। আর একটু আগে তেত্রিশ কোটি দেবতা না-মঞ্জুর হইয়া গিয়াছিল। আড়াল হইতে পাছে শীতলা সে কথাটী শুনিয়া থাকেন, এই

ভয়ে সকলের মনে ঘোরতর আতঙ্ক উপস্থিত হইল।

উপস্থিত সভ্যদিগের মধ্যে গগন একটু সাহসী পুরুষ ছিলেন। অতি সাহসে ভর করিয়া গগন জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি করিয়া হইল, ভাই? তুমি আধ পয়সার চিনির জলে ষোলা ফেলিয়া, সেই ষোলাটী চুষিয়া চা'ট করিতে। তা ঘুচিয়া আজ তোমার সন্দেস রসগোল্লা কি করিয়া হইল, ভাই?"

নয়ন বলিলেন,—"হাঁ! এখন পথে এস! পূজা মানো তো সব কথা খুলিয়া বলি, তা না হইলে নয়ান এই চুপ!'

এই কথা বলিয়া নয়ন "কপাং" করিয়া মুখ বুজিলেন।

যার যেমন ক্ষমতা সকলে শীতলার পূজা মানিলেন। নয়ন তখন পুনরায় মুখের চাবি খুলিয়া আপনার কথা আরম্ভ করিলেন।

তৃতীয় পর্ব্ব।

এই কিল খা এই কিল।

নয়ন বলিতেছেন,—এবার আমার বড়ই দুর্ব্বৎসর পড়িয়াছিল। খাওয়া কোনও দিন হয়, কোনও দিন হয় না। ভাগ্যক্রমে এমন সময় কলিকাতায় বসন্তের বিভিষিকাটী পড়িল। পরে যিনি যা করুন্, কিন্তু ফিকিরটী আমিই প্রথমে বাহির করি। জলা হইতে দিব্য একটু এঁটেল মাটী লইয়া আসিলাম। তাই দিয়া চমৎকার একটী শীতলা গড়িলাম। শীতলা-গড়া কিছু মাত্র কঠিন নয়। গোল করিয়া মাটীর একটী চাবড়া করিলেই হইল। তাহার উপর উত্তমরূপে সিন্দুর মাখাইলাম। টানা-টানা লম্বা-লম্বা দুইটী চক্ষু করিলাম। পুরাতন রাঙতা দিয়া শীতলাটী ছোট বড় বসন্তে ছাইয়া ফেলিলাম। শীতলাটী হাতে করিয়া, গিন্নীকে সঙ্গে লইয়া, কলিকাতায় চলিলাম।

সেখানে উপস্থিত হইয়া এক স্থানে শুনিলাম যে, একজন শীতলার পাণ্ডা ছিল। বসন্ত রোগে তাহার তিনটী ছেলে মরিয়া গিয়াছে। রাগ করিয়া লাঠি দিয়া সে তাহার শীতলা ভাঙ্গিয়া, দেশে চলিয়া গিয়াছে। সন্ধান করিয়া সে যে খোলার ঘরে থাকিত, আমি সেই স্থানে গিয়া উপস্থিত হইলাম। তাহার সেই ঘরটী ভাড়া করিলাম। বাড়ীওয়ালী ও আশে পাশের লোককে বলিলাম যে, মা আমাকে স্বপ্ন দিয়াছেন। স্বপ্নে বলিয়াছেন যে, ঐ যে পাণ্ডা ছিল, সে ভাল করিয়া মা'র পূজা করিত না। লোকে পূজা দিলে, আগে থাকিতে সে নৈবিদ্যির মাথার মণ্ডাটী খাইয়া ফেলিত। মা তাই তার উপর কুপিত হইয়া তাহাকে নির্ব্বংশ করিয়াছেন। সেই দুরাচারের পরিবর্ত্তে মা আমাকে সেবাদাস নিযুক্ত করিয়াছেন। তখন চারিদিকে খুব ডামাডোল, খুব মহামারি, লোক মরিয়া উড়কুড় উঠিতেছে। ভয়ে লোক কাঁটা হইয়া রহিয়াছে। আমাকে পাইয়া সকলের প্রাণটা আশ্বস্ত হইল। সকলেই বলিল যে, "মা জাগ্রত বটে! একজন পাণ্ডা যাইতে না যাইতে, কোথা হইতে শীতলা হাতে করিয়া আর একটী পাণ্ডা আসিয়া উপস্থিত হইল। আর আমাদের কোনও ভয় নাই।"

পাড়ায় আমার বিলক্ষণ পসার প্রতিপত্তি হইল। পাড়ার পূজাতেই অনায়াসে আমার সব খরচ নির্ব্বাহ হইতে পারিত। কিন্তু অভিপ্রায় আমার সে আর তা নয়। আমার অভিপ্রায় যে, মরসুম্ থাকিতে থাকিতে দু পয়সা রোজগার করিয়া পুনরায় ইয়ার বক্সির কাছে ফিরিয়া আসিব। কলিকাতার আড্ডাগুলি সাহেবেরা সব উঠাইয়া দিয়াছেন। সেখানে আমার মন টিকে না। তাই, শীতলাটী হাতে করিয়া প্রতিদিন ভিক্ষায়ও বাহির হইতাম। তাই কি ছাই শীতলার গান জানি! কিন্তু চিরকাল

হইতে আমি দশ-কর্ম্মা; যে কাজে দাও, সেই কাজে আছি, সব কাজে হুন্‌হর। নিজেই একটী শীতলার ছড়া বাঁধিলাম। তাহার কতকটা বলি, শুন—

"শীতলা বলেন আমি যার ঘরে যাই।
ছেলে বুড়ো অ্যাণ্ডা বাচ্ছা টপ্ টপ্ খাই॥
চৌষট্টি হাজার এই বসন্তের দল।
গৃহস্থের ঘরে গিয়া দেয় রসাতল॥
বড় বসন্ত ছোট বসন্ত বসন্তের নাতি।
কারো ঘরে নাহি রাখে বংশে দিতে বাতি॥
ডেকে বলে যত ঐ কাল বসন্তের পাল।
পাঁটা ছড়া কোরে ছাড়াই লোকের গায়ের ছাল॥
ফাটা বসন্ত বলে আমরা কেও-কেটা নই।
ফেটে মরে মানুষ যেন তপ্ত খোলার খই॥
নেচে নেচে বলে ওই ধসা বসন্ত যত।
মাংস পচা গন্ধে প্রাণ করি ওষ্ঠাগত॥
পাকা-মুখো বসন্ত বলে নীচে কোরে মুখ।
হাড় মাস খেয়ে আমরা প্রাণে পাই সুখ॥
খুদে বসন্ত বলে তোমরা মিছে কর গোল।
আমার চোটে লোকের গা ফুলে হয় ঢোল।
হাড়ভাঙ্গা বসন্ত বলে যারে যেথা পাই।
ছেলে বুড়ো সব আমরা কাঁচা খোরে খাই॥
শীতলা বলেন আমি চা'ল পয়সা চাই।
না দিলে ছেলের মা আর রক্ষা নাই॥
চা'ল পয়সা আনো হবে পূজোর বাজার।
বসন্ত ধরিবে নয় তো চৌষট্টি হাজার॥"

বলিব কি ভাই আর রোজগারের কথা! ধামা ধামা চা'ল আর গণ্ডা গণ্ডা পয়সা। ধামায় যেন পয়সা-বৃষ্টি হইতে লাগিল! সে সময় যদি কেহ বলিত যে,—"নয়ান! হাই-কোর্টের জজগিরি খালি হইয়াছে, তুমি সেই জজগিরিটী কর।" আমি তাতেও রাজি হইতাম না। প্রথম দিনের রোজগারটী আনিয়া গিন্নীকে বলিলাম,—"গিন্নি! এক বার বাহির হইয়া দেখ দেখি বাপধোন! ব্যাপার-খানা কি? বড় যে গুলিখোর বলিয়া মুখ-ঝামটা দাও! গুলিখোর না হইলে এরূপ ফিকির বাহির করে কে, বাপ ধোন? এরূপ বুদ্ধি যোগায় কার?'

কিন্তু, দেখ লম্বোদর ভায়া! তোমাদের আমি একটী জ্ঞানের কথা বলি। সাদা-চোখোদের যে কখনও বিশ্বাস করিবে না, সে কথা বলা বাহুল্য। সাদা-চোখোদের মনটী সদাই জিলেপির পাক। সত্য-কথা কারে বলে, তারা একবারে জানে না। প্রমাণ চাও? আচ্ছা, প্রমাণও করিয়া দিই। এই দেখ, ছিঁচ্‌কে-চোর বলিয়া তাহারা আমাদের মিথ্যা অপবাদ রটায়। আচ্ছা, তাহারা তামা, তুলসী, গঙ্গাজল হাতে করিয়া বলুক,—কবে কার ছিঁচ্‌কে কোন্ গুলিখোরে চুরি করিয়াছে? আড্ডাধারী মহাশয়! আপনিও বলুন্,—ছিটের জন্য কবে কোন্ গুলিখোর আপনার নিকট ছিঁচ্‌কে আনিয়াছে। ঘটি-চোর বল, বাটি-চোর বল, ঘাড় হেঁট করিয়া মানিয়া লই। তোমাদের দু'কড়ার ছিঁচ্‌কে কে কবে চুরি করে, বাপু? তাই বলি, হে সাদা-চোখোগণ! ভুলিয়াও কি তোমরা কখনও সত্য-কথা বলিতে শিখিবে না?

লম্বোদর, গগন প্রভৃতি বলিলেন,—"ঠিক বলিয়াছ! সাদা-চোখোদের বিশ্বাস নাই। সাদা-চোখোদের ছাঁওয়া মাড়াইলে নাইতে হয়।"

নয়ন বলিলেন,—আর বিশ্বাস করিও না, এই পেশাদার মাতালদের। মন তাদের সাদা বটে, কিন্তু কখন্ কি ভাবে থাকে, তার ঠিক নাই। সাত ঘাটের জল এক করিয়া তুমি চারিটী পয়সার যোগাড় করিলে, আড্ডায় আসিয়া সেই চারি পয়সার ছিটে টানিলে, নেশাটী করিয়া তুমি আড্ডা হইতে বাহির হইলে, আর হয় তো কোথা হইতে একটা

মাতাল আসিয়া তোমার গায়ের উপর টলিয়া পড়িল। তোমার নেশাটী চটিয়া গেল। শীতকাল, মেঘ করিয়াছে, গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়িতেছে, ফুর ফুর করিয়া বাতাস হইতেছে। সহজেই নেশাটী বজায় রাখা ভার, তার উপর কোথা হইতে হয় তো একটা মাতাল আসিয়া তোমার গায়ে বমি করিয়া দিল। তোমার নেশাটীর দফা একবারে রফা হইয়া গেল। পেশাদার মাতালেরা এইরূপ লোকের মর্ম্মান্তিক করে। পা'ল পার্ব্বণে পেট ভরিয়া মদটুকু খাওয়া গেল, অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া থাকা গেল, মৌজ হইল, এ কথা বুঝি। তা নয়! সকাল নাই, সন্ধ্যা নাই, দিন নাই, ক্ষণ নাই, অষ্ট প্রহর তুমি মদ খাইয়া তর্ হইয়া থাকিবে! মেজাজটী গরম করিয়া রাখিবে! ঠাকুর দেবতা লইয়া তোমার বাড়ীতে লোকে গান করিতে আসিবে, আর লাঠি লইয়া তুমি তাদের মারিতে দৌড়িবে! এ কি বাপু! এরে কি ভাল কাজ বলে? না এরে হিন্দুধর্ম্ম বলে? থুঃ! ছি!

লম্বোদর জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এইরূপ কোনও একটা মাতালের পাল্লায় পড়িয়াছিলে না কি?"

নয়ন উত্তর করিলেন,—"হাঁ ভাই! তবে ভাগ্যে আমার শীতলাটী জাগ্রত, হেলা ফেলা গুড়ুক তামাকের শীতলা নয়, তাই সে যাত্রা আমি রক্ষা পাইয়াছিলাম।"

সকলেই অতি আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ব্যাপার খানা কি বল দেখি?"

নয়ন বলিলেন,—ভাই! এক দিন প্রাতঃকালে শীতলাটী হাতে করিয়া এক মাতালের বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইয়াছিলাম। জানি কি ছাই যে, সে মাতালের বাড়ী? তাহা হইলে কি আর যাইতাম? তার বাড়ীতে গিয়া, মন্দিরেটী বাজাইয়া, সবে মাত্র আরম্ভ করিয়াছি,—"শীতলা বলেন আমি যার ঘরে যাই"—আর মিনসে করিল কি জান ভাই! এক না কম্বল-মুড়ি দিয়া, 'আঁ আঁ' শব্দ করিতে করিতে, ঘরের ভিতর হইতে বাহিরে দৌড়িয়া আসিল। তার সেই বিকট 'আঁ আঁ' শব্দ শুনিয়াই পেটের পিলে আমার চমকিয়া গেল। শশব্যস্ত হইয়া প্রাণ লইয়া আমি পলাইবার উদ্যোগ করিলাম। তা ভাই! পলাইতে না পলাইতে বেটা যেন ঠিক কেঁদো বাঘের মত আসিয়া আমার পিঠের উপর পড়িল। তার পর দুঃখের কথা বলিব কি ভাই, এই কিল! এই কিল, তো এই কিল! আর সে কিল তো নয়! এক একটী কিলে মনে হইল যেন পিঠের সব জায়েন খুলিয়া গেল। ভাবিলাম,—হায় হায়! কেন মরিতে শীতলার ব্যবসা করিতে গিয়াছিলাম? শীতলার ব্যবসা করিতে গিয়া, এমন যে সখের প্রাণটী, সে প্রাণটী আজ হারাইলাম!

চতুর্থ পর্ব্ব।

বসিয়া আছে দুইটী ভূত।

যাহা হউক, মনের সাধে কিল মারিয়া মিনসে আমার শীতলাটী কাড়িয়া লইল। আমি পলাইলাম। প্রাণটা যে রক্ষা পাইল, তাই ঢের। পথে যাইতে যাইতে, মনে মনে শীতলাকে বলিলাম যে,—"মা! আর তোমার গান করিতে আমি চাই না, তোমার চা'ল পয়সা আর চাই না। পিঠের হাড়গুলি যে চুরমার হইয়া গিয়াছে, এখন তাই তুমি রক্ষা কর, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়া যাই।"

গগন বলিলেন,—"ঈশ! তাই তো। এ যে ঠিক সেই সুবল ঘোষের কথা!"

লম্বোদর জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সুবলের কি হইয়াছিল?"

গগন বলিলেন,—"দুধ বেচিয়া সুবলের পিসী

কিছু টাকা করিয়াছিলেন। পিসী মরিয়া যাইলে সুবল সেই টাকাগুলি পাইলেন। টাকা পাইয়া সুবল মনে করিলেন যে দুর্গোৎসবটী করি। ঠাকুর-গড়া হইল, পূজার দিন আসিল। জিলিপি, চোরা, মযুর, গণেশের শুঁড়, এই সব দেখিয়া সুবলের মনে বড় আনন্দ হইল, হাড়ে হাড়ে তাঁর ভক্তি বিঁধিয়া গেল। পূজার কয়দিন স্বয়ং নিজে ক্রমাগত শাঁক বাজাইলেন। প্রাণপণ চিক্কুড়ে শাঁকে ফুঁ দিলেন। কোঁৎ পাড়িয়া শাঁক বাজাইতে বাজাইতে এখন গোগ্‌গোলটী বাহির হইয়া পড়িল। তার পর সেই গোগ্‌গোলের জ্বালায় অস্থির! গোগ্‌গোলের জ্বালায় অস্থির হইয়া বিসর্জ্জনের সময় সুবল গিয়া ঠাকুরের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। গলায় কাপড় দিয়া, হাত যোড় করিয়া ঠাকুরকে বলিলেন,—

ধন চাই না, মা! মান চাই না, মা!
চাই না পুত্রের বর।
এখন শঙ্খ বাজাইতে গিয়া এই যে বেরিয়েছে
গোগ্‌গোল তাই রক্ষা কর॥

নয়ানেরও ঠিক তাই হইয়াছিল। চা'ল চাই না মা! পয়সা চাই না মা! এখন এই হাড়গুলি যোড়া লাগাইয়া দাও। কেমন হে নয়ান! ঠিক নয়?"

নয়ন বলিলেন,—হাঁ, ভাই, ঠিক তাই। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা বলিব কি ভাই! পাঁচ সাত দিন পরে আমার নামে এক চিঠি! যে শীতলা কাড়িয়া লইয়াছিল, তার চিঠি! ডাকে সেই খোলার ঘরে গিয়া চিঠি উপস্থিত! মাতালটা আমার ঠিকানা জানিল কি করিয়া? চিঠিতে লেখা ছিল যে, শীঘ্র আসিয়া তোমার শীতলা লইয়া যাইবে। তোমার এ জাগ্রত শীতলা। এ শীতলা লইয়া আমি বড় বিপদে পড়িয়াছি। তোমার কোন ভয় নাই। শীঘ্র তোমার শীতলা লইয়া যাইবে।

যাই কি না যাই? এই কথা লইয়া মনে মনে অনেক তোলা পাড়া করিতে লাগিলাম। পিন্নী রাগিয়া বলিলেন,—'যাও-ই-না ছাই! তোমায় কি সে খাইয়া ফেলিবে?'

আমি বলিলাম—"তুমি তো বলিলে, যাও-ই-না ছাই! কিন্তু সে কিলের স্বাদ তো আর তুমি জান না? মনে করিতে গেলে এখনও আমার আত্মা-পুরুষ শুকাইয়া যায়। চুণে-হলুদ বাটিয়া হাতে তোমার কড়া পড়িয়া গেল, তবু বল, যাও-ই-না ছাই! এঁটেল মাটী দিয়া আর একটী শীতলা গড়িতে পারিব, প্রাণটী তো আর এঁটেল মাটী দিয়া গড়িতে পারিব না!"

যাই হউক, অবশেষে যাওয়াই স্থির করিলাম। সন্ধ্যার পর, ভয়ে ভয়ে, কাঁপিতে কাঁপিতে, প্রাণটী হাতে করিয়া সেই মাতালের বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইলাম। বাটীর ভিতর প্রবেশ করিলাম। নজনঃ ন মানবঃ। কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। বাহিরের ঘরের দ্বারের নিকটে গিয়া একটু উঁকি মারিয়া দেখিলাম, বাপুরে! বলিতে এখনও সর্ব্ব শরীর শিহরিয়া উঠে! বাহিরের ঘরের ভিতরে দেখি, না, বসিয়া আছে দুইটী ভূত!

লম্বোদর বলিলেন,—"মাইরি?"

নয়ন বলিলেন,—"মাইরি ভাই! দেখিলাম যে, ঘরের ভিতর বসিয়া আছেন দুইটী ভূত!"

সর্ব্ব শরীর ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। পা যেন মাটীতে পুতিয়া গেল! টাকরা পর্য্যন্ত ধূলি মাড়িয়া গেল! পলাইতে পা উঠে না, চেঁচাইতে রা সরে না! অজ্ঞান হতভোম্বা হইয়া আমি সেই খানে দাঁড়াইয়া রহিলাম।

দুই জনের মধ্যে যিনি কর্ত্তা-ভূত, আমাকে দেখিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। মুখ দিয়া তাঁর আগুনের হলকা বাহির হইতে লাগিল। তিনি আমাকে হাত ছানি দিয়া ভিতরে ডাকিলেন। আমাতে কি আর আমি ছিলাম যে,

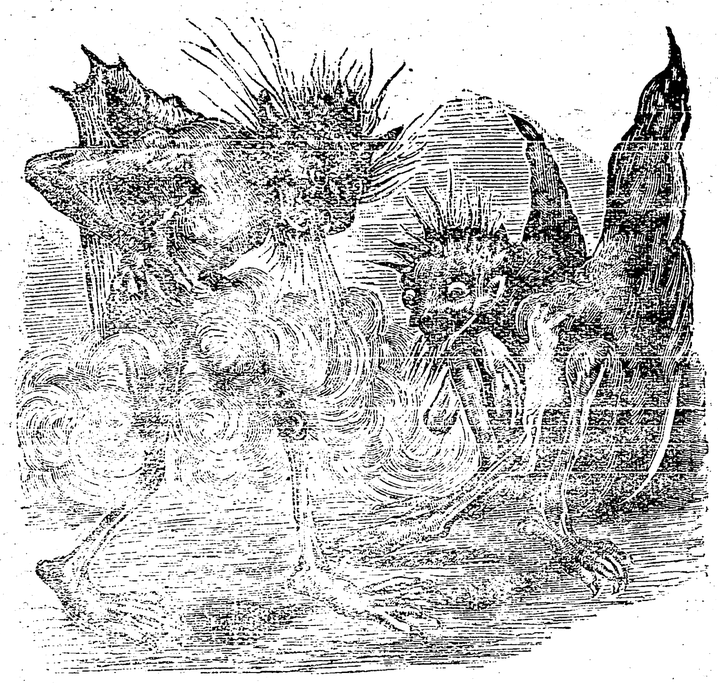

ভাবিব চিন্তিব? সুড়্ সুড়্ করিয়া ভিতরে যাইলাম। ইষারা করিয়া আমাকে বলিতে বলিলেন। আস্তে আস্তে আমি ঘরের এক পাশে বলিলাম।

কর্ত্ত-ভূত বলিলেন,—"আমাকে চিনিতে পারিলে না? আমি আর কেহ নই, আমি সেই মিত্তির জা, যে তোমার শীতলা কাড়িয়া লইয়াছিল। তোমার এ শীতলাটী জাগ্রত বটে! কেবল ঐ শীতলাটীর জন্য ভূত হইয়া আমাকে আট্‌কে থাকিতে হইয়াছে, তা না হইলে বাস আমার বৈকুণ্ঠে। এখন তোমার শীতলাটী ফিরিয়া লও, যে, আমি বৈকুণ্ঠে চলিয়া যাই।"

দ্বিতীয় ভূত বলিলেন,—"আহা! ইঁহারে তুমি অনেক কিল মারিয়াছ; তাড়াতাড়ি বিদায় করিও না! ইহার শীতলা কেন যে জাগ্রত, সে কথাগুলি ইহাকে খুলিয়া বল। লোকের কাছে গিয়া এ গল্প করিবে। তাহা হইলে লো'কে আরও ভক্তিভাবে ইহার শীতলাকে পূজা দিবে। ইহার দুপয়সা রোজগার হইবে। পেটে খাইলে পিঠে সয়। পিঠে বিলক্ষণ হইয়াছে; এখন পেটে খাইবার সুবিধা করিয়া দাও।"

কর্ত্তা-ভূত আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেমন হে! সব কথা শুনিতে চাও? কিসে বৈকুণ্ঠটী আমার কাণের কাছ দিয়া গিয়াছে, সে কথা শুনিতে চাও?"

ভূতেদের কথা শুনিয়া আমার মনে অনেকটা সাহস হইয়াছিল, ধড়ে প্রাণের সঞ্চার হইয়াছিল; আমি বলিলাম,—"আজ্ঞে হাঁ! শুনিতে চাই বই কি! তবে মহাশয়ের কিলের কথা মনে হইলে, আর জ্ঞান থাকে না।"

কর্ত্তা-ভূত হাসিয়া বলিলেন,—"না, না, আর কিল মারিব না। তোমার ঘাড়ও মট্‌কাইয়া দিব না। কেন তোমার শীতলাকে জাগ্রত বলিতেছি, এখন সে সকল কথা শুন।"

আড্ডাধারী মহাশয় ও লম্বোদর গগন প্রভৃতি বলিয়া উঠিলেন,—"নয়ান! তোমার

সাহস তো কম নয়! স্বচ্ছন্দে বসিয়া ভূতেদের সঙ্গে তুমি গল্পগাছা করিলে? বুকের পাটা তো তোমার কম নয়?"

নয়ন উত্তর করিলেন,—"বেঁধে মারে সয় ভাল। করি কি? ভূতের খর্পরে গিয়া পড়িয়াছি, পলাইবার তো যো ছিল না! কাজেই কাদায় গুণ ফেলিয়া পড়িয়া থাকিতে হইল। তা না হইলে সদাই ভয় হইতেছিল। কি জানি? ভূতের মরজি! যদি বলিয়া বসে যে, তোমার পিঠ দেখিয়া আমাদের হাত সুড় সুড়্ করিতেছে; এস দুইটী কিল মারি। তোমার ঘাড় দেখিয়া আমাদের হাত নিশ্‌পিশ্ করিতেছে, এস ভাঙ্গিয়া দিই! তাহা হইলে কি করিতাম! যাহা হউক, সেরূপ কোন বিপদ ঘটে নাই। ভূতগুলি দেখিলাম, ভাল-মানুষ ভূত। সেই কর্ত্তা-ভূতের এখন আশ্চর্য্য কাহিনী শুন।"

পঞ্চম পর্ব্ব

কর্ত্তা-ভূত বলিতেছেন।

কর্ত্তা-ভূত বলিতেছেন,—তোমার শীতলাটী কাড়িয়া মনে মনে আমার বড়ই আনন্দ হইল। কারণ এইরূপ কাজে যেরূপ আমার আনন্দ হইত, এমন আর কোনও কাজে নয়। কিন্তু তোমার শীতলাটী জাগ্রত শীতলা, মরা শীতলা নয়। ভাল এঁটেল মাটী, ভাল সিন্দুর, ভাল রাঙ্গতা দিয়া গড়া। বেলে মাটী নয়, মেটে সিন্দুর নয়, জাল রাঙ্গতা নয়। তাই দুই দিন পরেই আমার বসন্ত হইল। তোমার সেই চৌষট্টি হাজার বসন্তে আমায় ছাইয়া ধরিল। চুলের ডগা হইতে পায়ের কোড়ে আঙ্গুলের আগা পর্য্যন্ত, তিল রাখিবার স্থান ছিল না। বৈদ্য আসিয়া মহাদেব-চূর্ণ ও গৌর-চন্দ্রিকা ঘৃতের ব্যবস্থা করিলেন। মহাদেব-চূর্ণ খাইতে দিলেন, আর গৌর-চন্দ্রিকা ঘৃত গায়ে মাখিতে বলিলেন। ঔষধের ব্যবস্থা দেখিয়াই বুঝিলাম যে এবার গতিক বড় ভাল নয়। তিন দিন পরে রাত্রিকালে যমদূতেরা আমাকে লইতে আসিল। চারিটী যমদূত আসিয়াছিল। সব বিকটমূর্ত্তি, দেখিলে প্রাণ শুকাইয়া যায়।

যমদূতেরা আসিয়া আমার মাথায় হাত বুলাইয়া টিকিটী খুঁজিতে লাগিল, ইচ্ছা যে, টিকিটী ধরিয়া আমাকে যমপুরে লইয়া যায়। কিন্তু আগে থাকিতে আমি একটী বুদ্ধির কাজ করিয়া রাখিয়াছিলাম। সেই দিন প্রাতঃকালে রোগের বে-গতিক দেখিয়া, মনে মনে করিলাম যে, পৃথিবীতে আসিয়া আমি কখনও কোনও একটী পুণ্যকর্ম্ম করি নাই চিরকাল পাপ করিয়াছি। নরহত্যা, ব্রহ্মহত্যা, গোহত্যা, স্ত্রীহত্যা, চুরি, জাল, প্রভৃতি যাহা কিছু পাপ কর্ম্ম, সকলই করিয়াছি। ভাল কাজ একটীও কখনও করি নাই। এখন তো দেখিতেছি, মৃত্যু উপস্থিত। যমকে গিয়া জবাব দিব কি? তাই মনে করিলাম যে, এই অন্তিমকালে একটী পুণ্য কাজ করি। আমি চান্দ্রায়ণটী করিলাম। গোয়ালে আমার একটী এঁড়ে বাছুর ছিল। আমি মিত্তির-জা! আমার গোয়ালের এঁড়ে বাছুর কেমন তা বুঝিয়া লও। এক ফোঁটা দুধ থাকিতে গাইকে আমি কখনই ছাড়ি নাই। মা'র দুধ কারে বলে বাছুরটী তা কখনও চক্ষে দেখে নাই। অন্য খাওয়া দাওয়াও তদ্রূপ। সুতরাং না খাইয়া খাইয়া বাছুরটী অস্থিচর্ম্ম-সার হইয়াছিল। মর-মর হইয়াছিল। সেই এঁড়ে বাছুরটী একজন ব্রাহ্মণকে দান করিলাম। দড়ি ধরিয়া বাছুরটীকে ব্রাহ্মণ লইয়া চলিলেন। আমার বাড়ীর বাহির হইয়াই রাস্তার উপর বাছুর শুইয়া পড়িল, সেই খানেই মরিয়া গেল।

চান্দ্রায়ণ করিতে মাথাটী নেড়া হইয়াছিলাম। মাথাটী ঠিক্ বোম্বাই ওলের মত

হইয়াছিল। যমদূতেরা টিকি ধরিয়া আমাকে যমের বাড়ী লইয়া যাইবেন, তার যো ছিল না। অন্ধকারে যমদূতেরা আমার মাথায় হাত বুলাইয়া দেখিল যে, টিকি নাই! যমদূতেরা ফাঁফরে পড়িল। কি ধরিয়া আমাকে লইয়া যায়? অবশেষে চিন্তা করিয়া তাহারা আমার হাত ধরিল। গৌর চন্দ্রিকা ঘৃতে আর বসন্তের রসে আমার গা হড়-হড়ে হইয়াছিল। অনায়াসেই আমি হাতটী ছাড়াইয়া লইলাম। পা ধরিল, হড়াৎ করিয়া পাটীও ছাড়াইয়া লইলাম। যেখানে ধরে আর আমি পিছলে গিয়া সরিয়া বসি। কখনও তক্তপোষের উপর, কখনও তক্তপোষের নীচে, কখনও ঘরের মাঝখানে, কখনও পাশে, এ-কোণে, সে-কোণে, যমদূতদিগের সঙ্গে সমস্ত রাত্রি অন্ধকারে আমি এইরূপ পেছলা-পিছলি করিতে লাগিলাম। কিন্তু তারা হইল চারিজন, আমি হইলাম একা। কত ক্ষণ আর পেছলা-পিছলি করিব? ভোর মাথায় তাহারা হাতে ছাই ও মাটী মাখিয়া আসিল। সুতরাং আর আমি পিছলে যাইতে পারিলাম না। আমাকে বাঁধিয়া ফেলিল।

উত্তমরূপে বাঁধিয়া, যমদূতেরা আমাকে কাঁটাবন দিয়া হিঁচড়ে লইয়া চলিল। আমি পাপী কিনা? কাঁটা ফুটিয়া, ছড়িয়া গিয়া, শরীর হইতে আমার দরদর-ধারে রক্ত পড়িতে লাগিল। অবশ্য জীয়ন্ত অবস্থায় যে শরীরে আমি মিত্তির-জা ছিলাম, সে শরীর নয়। যে শরীর যমালয়ে যায়, সেই শরীর; ঠিক বুড়ো আঙুলের মত। সকাল হইল। প্রাতঃক্রিয়া সমাধা করিবার নিমিত্ত যমদূতেরা একটী পুকুরের সাঁন-বাঁধা ঘাটে গিয়া বসিল। একটী যমদূত আমার নিকট পাহারা রহিল, বাকি তিন জন ঘাটে যাইল।

আমার নিকট যে যমদূতটী ছিল, সে আমাকে বলিল,—"খুব মজার লোক তো তুমি! এত লোককে আমরা লইয়া যাই। কিন্তু সমস্ত রাত্রি পেছলা-পিছলি কাহারও সঙ্গে কখনও করিতে হয় নাই। আচ্ছা, ভাল, তোমাকে আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। তোমার মাথায় তো টিকি দেখিলাম না। অনেকের মাথায় আজ কাল টিকি দেখিতে পাই না। টিকি না পাইলে আমাদের বড়ই অসুবিধা হয়। তা আমাদের অসুবিধা হয় হউক তাহাতে বড় ক্ষতি নাই। কিন্তু কথাটা জিজ্ঞাসা করি এই যে,—এই যাদের মাথায় টিকি না থাকে, তাদের সঙ্গে লোকের ঝগড়া হইলে, লোকেরা কি ধরিয়া তাদের দুই গালে দুই থাবড়া মারে?"

আমি উত্তর করিলাম,—"ভাত খাইতে সুবিধা হইবে বলিয়া কি লোকে মাথায় টিকি রাখে?"

যমদূত জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তবে কি জন্যে? আমরা ভাল করিয়া ধরিতে পারিব, সেই জন্যে?"

আমি উত্তর করিলাম,—"তা ও নয়। এই যে তারের খবর আছে, সেই টক্ টক্ করিয়া শব্দ হয়? টিকি না থাকিলে, মাথা দিয়া সেই তারের খবর বাহির হইয়া যায়। সেই জন্য লোকে মাথায় টিকি রাখে।"

যমদূত বলিলেন,—"হুঁ! বটে! সেই জন্যে? এখন বুঝিলাম।"

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া, যমদূত বলিলেন,—"তোমাদের পাড়ায় নেই-আঁকুড়ে দাদাকে জানিতে?"

আমি বলিলাম—"জানিবার বই কি, আজ কয় বৎসর তিনি মরিয়া গিয়াছেন, শুনিয়াছি, মরিয়া ভূত হইয়াছেন।"

যমদূত বলিলেন—"হুঁ! তিনি ভূত হইয়াছেন। ভগিনীকে যম-যন্ত্রণা হইতে উদ্ধার করিবার জন্য, তিনি বলিয়াছিলেন, এই পুষ্করিণীটী আমার।"

আমি বলিলাম,—"এ পুষ্করিণী তাঁর কেন হবে? এ পুকুর যে রাঘব গাঙ্গুলির!"

যমদূত বলিলেন,—"হাঁ, এ পুষ্করিণী রাঘব গাঙ্গুলির বটে, তবে নেই-আঁকুড়ে দাদা বলিয়াছিলেন যে, আমার,—সে কেবল ভগিনীকে যমের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কি হইয়াছিল, বলিবেন?"

যমদূত বলিলেন,—"বলিব না কেন, বলিব! তবে তুমি যে মহিরাবণের বেটা অহিরাবণের মত পেছলা-পিছলি কর! সে জন্য তোমার সহিত কথা কহিতে ইচ্ছা করে না! যাই হউক, শুন।"

ষষ্ঠ পর্ব্ব।

নেই-আঁকুড়ে দাদা।

যমদূত বলিতেছে,—নেই-আঁকুড়ে দাদার একটী বিধবা ভগিনী ছিলেন। একাদশীর দিন বৈকাল বেলা বাড়ীর নিকট বাগানে বেড়াইতে বেড়াইতে তিনি দেখিতে পাইলেন যে, একটী কলাগাছে দিব্য একখানি আওট পাতা হইয়া রহিয়াছে। মনে মনে করিলেন যে, কা'ল এই আওটপাতা খানিতে আমি ভাত খাব। দৈবের কর্ম্ম, সেই রাত্রিতে তাঁর মৃত্যু হইল। বিধবা অতি পুণ্যবতী ছিলেন। সেই জন্য বিষ্ণুদূতেরা তাঁহাকে বৈকুণ্ঠে লইয়া যাইবার নিমিত্ত আসিল। এদিকে আবার একাদশীর দিন খাবার বাসনা করিয়াছিলেন, সুতরাং আমরাও তাঁহাকে লইতে যাইলাম। বিধবাকে লইয়া বিষ্ণুদূতে ও যমদূতে কাড়া-কাড়ি উপস্থিত হইল। ক্রমে শ্রাদ্ধ গড়াইল! সেই ঘরের ভিতর সেই রাত্রিতে বিষ্ণুদূতে আর যমদূতে ঘোরতর যুদ্ধ বাধিয়া গেল। অবশেষে আমরা জিতিলাম। বিষ্ণুদূতদিগকে তাড়াইয়া দিলাম। যেমন তোমাকে লইয়া যাইতেছি, সেইরূপ বিধবাকেও কাঁটাবন দিয়া হিড় হিড় করিয়া টানিয়া লইয়া চলিলাম। যমপুরীতে লইয়া উপস্থিত করিলাম। বিধবার মাথায় ক্রমাগত ডাঙ্গস মারিতে যম হুকুম দিলেন। ডাঙ্গসের প্রহারে জর-জর হইয়া বিধবা পরিত্রাহি ডাক ছাড়িতে লাগিল। আর মাঝে মাঝে বলিতে লাগিল যে, "হায় রে! যদি আমার নেই-আঁকুড়ে দাদা এখানে থাকিত, তাহা হইলে দেখিতাম, কি করিয়া যম আমার এরূপ সাজা দিত?" যমের কাণে সেই কথাটী প্রবেশ করিল। যম জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মাগি কি বলিতেছে?" আমরা বলিলাম, "বিধবা বলিতেছে যে, যদি আমার নেই-আঁকুড়ে দাদা এখানে থাকিত, তাহা হইলে দেখিতাম যে, যম কি করিয়া আমার এরূপ সাজা করিত।" যমের রাগ হইল। যম বলিলেন,—"নিয়ে আয় তো রে, ওর নেই-আঁকুড়ে দাদাকে! দেখি, কি করিয়া সে আপনার বোন্‌কে বাঁচায়?" নেই-আঁকুড়ে দাদাকে আনিতে আমরা দৌড়িলাম। নেই-আঁকুড়ে দাদা ঘরে নিদ্রা যাইতেছিলেন। ভগিনী যে মরিয়াছে, ভগিনীর যে এরূপ দুর্দ্দশা হইয়াছে, তাহার তিনি কিছুই জানিতেন না। আমরা তাঁহাকে উঠাইলাম। আমরা বলিলাম, "চলুন, যম আপনাকে ডাকিতেছেন।" তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আমার কি সময় হইয়াছে?" আমরা বলিলাম,—"না, আপনার এখনও সময় হয় নাই। এই শরীরেই আপনাকে একবার যমের বাড়ী যাইতে হইবে। একটা কথার মীমাংসা করিয়া আপনি এখনি ফিরিয়া আসিবেন।" নেই-আঁকুড়ে দাদা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কথাটা কি? শুনিতে পাই না?" যমের বাড়ী গিয়া তাঁহার ভগিনী কি বলিয়াছিলেন, আমরা সে সব কথা তাঁহাকে খুলিয়া বলিলাম। নেই-আঁকুড়ে

দাদা বলিলেন,—"বটে! আচ্ছা, চল যাই।" পথে যাইতে যাইতে নেই-আঁকুড়ে দাদা ক্রমাগত বলিতে বলিতে চলিলেন,—"দেখ, এই স্থলে আমি একটী দেবালয় করিব মানস করিয়াছি।" আবার খানিক দূর গিয়া,—"এই স্থলে আমি একটী অতিথি-শালা করিব, আমার এই ইচ্ছা।" আবার খানিক দূর গিয়া,—"সাধারণে জল পান করিবে বলিয়া এই জলাশয়টী আমি করিয়া দিয়াছি।" এইরূপ স্কুল, কালেজ, ডাক্তারখানা, রাস্তা, ঘাট করিবার কথা আমাদিগকে শুনাইয়া শুনাইয়া বলিতে লাগিলেন। যমপুরীতে উপস্থিত হইলাম, যমের সম্মুখে নেই-আঁকুড়ে দাদাকে খাড়া করিয়া দিলাম। যম বলিলেন,—"নেই-আঁকুড়ে! শোন্! তোর্ বোন্ ব্রাহ্মণের ঘরের বিধবা। একাদশীর দিন আঙট পাতে ভাত খাইবার মানস করিয়াছিল। সেই পাপের জন্য আমি তার মাথায় ডাঙ্গস মারিতে হুকুম দিয়াছি। সে বলে, আমার নেই-আঁকুড়ে দাদা থাকিলে যম আমার এরূপ সাজা দিতে পারিত না। তার আস্পর্দ্ধার কথা শুনিয়া তোরে আমি এখানে আনিয়াছি। কি করিয়া বোন্‌কে বাঁচাইবি, বাঁচা!" নেই-আঁকুড়ে দাদা বলিলেন,—"আমার পুণ্যের অর্দ্ধেক আমি আমার ভগিনীকে দিলাম। সেই পুণ্য লইয়া আমার ভগিনীকে আপনি খালাস দিন্।" নেই আঁকুড়ের কি পুণ্য আছে দেখিবার নিমিত্ত যম চিত্রগুপ্তকে আদেশ করিলেন। খাতা-পত্র দেখিয়া চিত্রগুপ্ত বলিলেন যে, নেই-আঁকুড়ের পুণ্য কিছুই নাই। রাগিয়া যম বলিলেন,—"শুন্‌লি তো নেই-আঁকুড়ে! তোর এক ছটাকও পুণ্য নাই! বোন্‌কে তার আবার ভাগ দিবি কি?" নেই-আঁকুড়ে উত্তর করিলেন,—"পুণ্য আছে কি না আছে, আপনার এই যমদূতদিগকে জিজ্ঞাসা করুন।" যম আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন। আমরা বলিলাম,—"হাঁ মহাশয়! পথে আসিতে আসিতে, 'এখানে দেবালয় করিবার মানস আছে,' 'এখানে স্কুল করিবার মানস আছে' নেই-আঁকুড়ে এইরূপ নানা কথা বলিয়াছিলেন।" যম আরও রাগিয়া উঠিলেন। বলিলেন,—"ভণ্ড! সে সকল কাজ তো তুই করিস্ নাই! কেবল মনে মনে মানস করিলে কি হইবে?" নেই-আঁকুড়ে উত্তর করিলেন,—"আমার ভগিনী আঙট পাতে ভাত খাইয়াছিলেন, না কেবল মানস করিয়াছিলেন?" যম বলিলেন,—"মানস করিয়াছিল।" নেই-আঁকুড়ে বলিলেন,—"তবে?" যম বুঝিলেন। যম বুঝিলেন যে কেবল মানস করিলে যদি পাপের শাস্তি দিতে হয়, তাহা হইলে পুণ্যের মানস করিলেও পুণ্যের ফল দিতে হয়। বে-আইনি করিয়া তিনি যে বিধবার মাথায় ডাঙ্গস মারিতে আজ্ঞা করিয়াছিলেন, যম এখন তাহা বুঝিলেন। বিধবাকে মুক্ত করিয়া দিবার আদেশ করিলেন। বিষ্ণু-দূতেরা আসিয়া বিধবাকে বৈকুণ্ঠে লইয়া গেল। নেই-আঁকুড়ে দাদা আপনার ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। তাহার কিছু দিন পরে নেই-আঁকুড়ের মৃত্যু হইল। তাঁহার গতি হয় নাই। ভূত হইয়া তিনি এখন লোকের উপর উপদ্রব করিতেছেন।

সপ্তম পর্ব্ব।

এঁড়ে গরু।

কর্ত্তা-ভূত অর্থাৎ মিত্তির-জা বলিতেছেন,—যমদূতদিগের কাজ সারা হইলে পুনরায় তাহারা আমাকে যমালয় অভিমুখে লইয়া চলিল। অনেক ক্ষণ পরে যমপুরীতে গিয়া আমরা উপস্থিত হইলাম। যমদূতেরা যমের সম্মুখে আমাকে খাড়া করিয়া দিল। যম

সিংহাসনে বসিয়া আছেন। পাশে খাতা-পত্র লইয়া চিত্রগুপ্ত। চারিদিকে শত শত বিকট-মূর্ত্তি যমদূত। কাহারও হাতে মুগুর, কাহারও হাতে ডাঙ্গস, কাহারও হাতে সাঁড়াসী। আমার পাপ-পুণ্যের হিসাব দেখিতে যম চিত্রগুপ্তকে আদেশ করিলেন। অনেক খাতা-পত্র উল্টাইয়া চিত্রগুপ্ত বলিলেন,—"মহাশয়! ইহার পুণ্য তো কিছুই দেখিতে পাই না, সকলই পাপ! অতি উৎকট উৎকট পাপ! ইহার মত মহাপাতকী পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় ছিল না। মরিবার সময় এ যে চন্দ্রায়ণটী করে, তাও সব ফাঁকি। যমদূতদিগকে কষ্ট দিবার নিমিত্ত কেবল মাথাটী নেড়া হইয়াছিল। পুণ্য ইহার কিছুমাত্র নাই, কেবল পাপ। তবে এক বিন্দু পুণ্য আছে এই যে, মৃত্যু হইবার পূর্ব্বে একজন ব্রাহ্মণকে একটী মর-মর এঁড়ে গরু দান করিয়াছিল। কিন্তু বাছুরটী ব্রাহ্মণকে ঘরে লইয়া যাইতে হয় নাই; পথেই শুইল, আর মরিল। মরিয়া সে এঁড়ে বাছুরটী এখন যমপুরীতে আসিয়াছে।"

আমাকে সম্বোধন করিয়া যম বলিলেন,—"কেমন হে, মিত্তির-জা! চিত্রগুপ্তের মুখে তোমার হিসাব শুনিলে তো! এখন তুমি কি করিতে চাও! তোমার যে রতি মাত্র পুণ্যটুকু আছে, আগে তাহার ফল ভোগ করিয়া লইতে চাও, না আগে পাপের ভোগ ভুগিতে চাও?"

আমি উত্তর করিলাম,—"মহাশয়! আপনার এখানে কিরূপ দস্তুর, কিরূপ আইন-কানুন্, তা তো আমি জানি না? আমাকে একটু বুঝাইয়া বলুন, আমার পুণ্যের ফল কিরূপ হইবে, আর পাপের ভোগই বা কি প্রকার হইবে? তার পর আমি আপনাকে বলিব, আগে আমি কোন্‌টী চাই।"

যম উত্তর করিলেন,—"সমস্ত জীবন তুমি উৎকট উৎকট ঘোর মহাপাতক করিয়াছ। সেজন্য চিরকাল তোমাকে রৌরব প্রভৃতি নরকে বাস করিতে হইবে। তোমার গলিত দেহে কৃমি প্রভৃতি নানারূপ ভয়াবহ কীট দংশন করিবে। অগ্নিতে তোমাকে পুড়িতে হইবে। অষ্ট প্রহর যমদূতে তোমার মাথায় ডাঙ্গস মারিবে। সাঁড়াসী দিয়া যমদূতে তোমার গায়ের মাংস ছিঁড়িবে। বিধিমত তোমার যন্ত্রণা হইবে, যাতনায় তুমি চীৎকার করিবে। চিরকাল তোমাকে এইরূপ শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। তবে সেই যে, সামান্য একটু নাম মাত্র পুণ্য করিয়াছিলে, মরিবার পূর্ব্বে সেই যে মর-মর এঁড়ে বাছুরটী ব্রাহ্মণকে দান করিয়াছিলে, কেবল মাত্র এক দিনের জন্য সেই পুণ্যটুকুর ফল ভোগ করিতে পাইবে। সেই এঁড়ে গরুটী এখন এখানে আসিয়াছে। এক দিনের জন্য তাহারে তুমি যা আনিয়া দিতে বলিবে, তাহাই সে আনিয়া দিবে; যা করিতে বলিবে, তাহাই সে করিবে। তোমার পুণ্যের ফল এই।"

আমি বলিলাম,—"পুণ্যের ফলটী আমি প্রথমে ভোগ করিয়া লইব। পাপের যা যাহা হয়, তাহার পর আপনি করিবেন।"

যম আজ্ঞা করিলেন,—"তবে! মিত্তির জার সেই এঁড়ে গরুটী আন্‌তো!"

এঁড়ে গরু আনিতে, যমদূত সব দৌড়িল। এঁড়ে গরু আনিয়া যমের দরবারে হাজির করিল। আমি দেখিলাম, এখন আর সে অস্থি-চর্ম্ম-সার এঁড়ে বাছুর নাই! আমার ঘরে খাবার কষ্ট ছিল, যমের ঘরে তো আর সে কষ্ট ছিল না! যমপুরীতে অনেক ঘোল ভূষি খাইয়া বাছুরটী এখন বিপর্য্যয় এক ষাঁড় হইয়াছিল। লম্বা লম্বা বিপর্য্যয় দুই সিং! দেখিলে হরিভক্তি উড়িয়া যায়! চক্ষু ঘোর রক্তবর্ণ! রাগে আস্ফালন করিয়া ফোঁশ

কোঁশ করিতেছে। রাগে পা দিয়া মাটী চষিয়া ফেলিতেছে। কারে খুঁতাই, কারে মারি, সদাই এই মন! দুই দিকে দুই দড়ী ধরিয়া চারি জন যমদূতে টানিয়া রাখিতে পারিতেছে না।

যম বলিলেন,—"মিত্তির-জা! এই তোমার সেই এঁড়ে গরু! তুমি ইহাকে যাহা বলিবে, এই এঁড়ে গরু আজ সমস্ত দিন তাহাই করিবে।"

এঁড়ে গরুকে ছাড়িয়া দিবার নিমিত্ত যম আদেশ করিলেন। চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া, ঘাড় হেঁট করিয়া, সিং নীচে করিয়া, এঁড়ে গরু আসিয়া আমার নিকট দাঁড়াইল।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কেমন হে এঁড়ে গরু! আজ আমি তোমাকে যা বলিব, তাই তুমি করিবে তো?"

এঁড়ে গরু উত্তর করিল,—"আজ্ঞে হাঁ! আজ সমস্ত দিন আপনি যাহা করিতে হুকুম করিবেন, আমি তাহাই করিব।"

আমি বলিলাম,—"এঁড়ে গরু! তবে তুমি এক কাজ কর। তোমার একটী সিং তুমি এই যমের নাভিকুণ্ডলে প্রবিষ্ট করিয়া দাও, আর একটী সিং চিত্রগুপ্তের নাভিকুণ্ডলে দিয়া, আজ সমস্ত দিন এই দুই জনকে ঘুরাও, সমস্ত দিন দুই জনকে ন্‌ন্‌ ন্‌ন্‌ করিয়া চরকীর পাক খাওয়াও।"

লম্বোদর, গগন, আড্ডাধারী মহাশয়, সকলেই হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। সকলেই বলিলেন,—"বাহবা! বাহবা! মিত্তিরজা! তুমি একজন লোক বটে! কিন্তু নয়ান, মিত্তির-জা তোমাকে ঠিক কথা বলেন নাই। নাভিকুণ্ডলে মিত্তির-জা যে সিং দিতে বলিবেন, মিত্তির-জা তেমন পাত্র নন্। শরীরের অন্যস্থানে সিং দিতে বলিয়াছিলেন। কিন্তু কথাটী ভদ্র-সমাজে বলিবার যোগ্য নয়। সেই জন্য বোধ হয় মিত্তির-জা তোমার নিকট আসল কথাটী গোপন করিয়াছিলেন।"

নয়ন উত্তর করিলেন,—"আমারও মনে সে সন্দেহটী উপস্থিত হইয়াছিল। কারণ, যখন এই নাভিকুণ্ডলের কথাটী বলেন, তখন মিত্তির-জা-ভূতের মুখে ঈষৎ একটু হাসির রেখা জলুষ মারিয়াছিল। যাহা হউক, মিত্তির-জা-ভূত কি বলিতেছেন, তাহা শুন।"

মিত্তির-জা-ভূত বলিলেন,—আমার আদেশ পাইয়া এঁড়ে গরু, যম ও চিত্রগুপ্তকে তাড়া করিল। ভয়ে দুই জনের প্রাণ উড়িয়া গেল। সিংহাসন হইতে যম লাফাইয়া পড়িলেন। খাতা-পত্র ফেলিয়া চিত্রগুপ্তও লাফাইয়া পড়িলেন। তার পর, এই দৌড়! দৌড়! প্রাণপণ যতনে দৌড়!

কিন্তু দৌড়িয়া যাবেন কোথা? এঁড়ে গরু না-ছোড়-বান্দা! যেখানে দৌড়িয়া পলান, সিং বাগাইয়া সঙ্গে সঙ্গে সেইখানেই আমার সেই এঁড়ে গরু গিয়া উপস্থিত হয়।

অষ্টম পর্ব্ব।

মিত্তির-জার পুণ্য।

কর্ত্তা-ভূত বলিতেছেন,—যমপুরীর ভিতর কোনও স্থলে পলাইয়া যম ও চিত্রগুপ্ত নিস্তার পাইলেন না। যেখানে তাঁহারা যান, আরক্ত-ঘূর্ণিত-নয়নে এঁড়ে গরুও সেই স্থলে গিয়া তাঁহাদিগকে তাড়া করে। যমপুরী ছাড়িয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে দুই জনে ইন্দ্রের ইন্দ্রলোকে গিয়া উপস্থিত হইলেন, সেখানেও এঁড়ে গরু সঙ্গে সঙ্গে। শিবের শিবলোকে যাইলেন, সেখানেও এঁড়ে গরু! ব্রহ্মার ব্রহ্মলোকে, সেখানেও এঁড়ে গরু! পরিত্রাণ আর কোথাও পান না। অবশেষে হাঁপাইতে হাঁপাইতে দুই জনে বৈকুণ্ঠে গিয়া উপস্থিত। যেখানে নারায়ণ শুইয়া আছেন, আর লক্ষ্মী পা টিপিতেছিলেন, গলদ্ঘর্ম্ম মুমূর্ষু প্রায় যম ও চিত্রগুপ্ত সেই স্থলে গিয়া উপস্থিত। বৈকুণ্ঠের দ্বারে সুদর্শন চক্র ঘুরিতেছিল। এঁড়ে গরু বৈকুণ্ঠের ভিতর প্রবেশ করিতে পারিল না। সিং পাতিয়া দ্বারে দাঁড়াইল। যম ও চিত্রগুপ্ত বাহির হইলেই তাঁহাদিগকে সিংতে লইয়া ঘুরাইবে।

যম ও চিত্রগুপ্তের দুরবস্থা দেখিয়া, নারায়ণ বিস্ময়াপন্ন হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া নারায়ণকে তাঁহারা আদ্যোপান্ত বিবরণ শুনাইলেন। নারায়ণ বলিলেন,—'এ মানুষটী দেখিতেছি সাধারণ মনুষ্য নয়। ইহাকে মিষ্ট কথা বলিয়া বশ করিতে হইবে। তা না হইলে, ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব, শিবের শিবত্ব, ব্রহ্মার ব্রহ্মত্ব, আমার নারায়ণত্ব, এসব কাড়িয়া লইবে। দেশে দেশে আমাদিগকে ফকির হইয়া বেড়াইতে হইবে। চল, আমরা এখন সকলে সেই মানুষটীর কাছে যাই।"

যম বলিলেন,—"দ্বারে সেই এঁড়ে গরু দাঁড়াইয়া আছে। বাহির হইলেই আমাদের সে নিগ্রহ করিবে। আপনি গিয়া সেই মিত্তির-জাকে সান্ত্বনা করুন, আমরা এই স্থলে বসিয়া থাকি।"

নারায়ণ বলিলেন,—"তোমাদের ভয় নাই, তোমরা আমার সহিত এস। আমি এঁড়ে গরুকে বুঝাইয়া বলিব, সে তোমাদের প্রতি কোনরূপ অত্যাচার করিবে না।"

এইরূপ আশ্বাস পাইয়া যম ও চিত্রগুপ্ত ভয়ে ভয়ে নারায়ণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন, নারায়ণ আগে আগে চলিলেন। দ্বারে আসিয়া দেখিলেন যে, এঁড়ে গরু সিং পাতিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

নারায়ণকে দেখিয়া এঁড়ে গরু বলিল,—'মহাশয়! আপনার বাটীতে যম ও চিত্রগুপ্ত গিয়া আশ্রয় লইয়াছে। শীঘ্র তাহাদিগকে বাহির করিয়া দিন্। তাহাদিগকে সিঙে লইয়া আমি ঘুরাইব। মিত্তির-জা আমাকে এই আজ্ঞা করিয়াছেন।"

সুমিষ্টভাষে নারায়ণ বলিলেন,—"এঁড়ে গরু! তুমি ব্যস্ত হইও না। যম ও চিত্রগুপ্ত পলায় নাই। ঐ দেখ, আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছে তাহাদিগকে সিঙে লইয়া ঘুরাইতে মিত্তির-জা তোমাকে বলিয়াছেন। আচ্ছা, মিত্তির-জা যদি যম ও চিত্রগুপ্তকে অব্যাহতি দেন, তাহা হইলে তুমি তাঁর কথা শুনিবে তো?"

এঁড়ে গরু উত্তর করিল,—"মিত্তির-জা আমাকে হুকুম দিয়াছেন। মিত্তির-জা যদি পুনরায় বলেন, না, ইহাদিগকে সিঙে করিয়া ঘুরাইতে হইবে না, তাহা হইলে তাঁর কথা শুনিব না কেন? অবশ্য শুনিব।"

নারায়ণ বলিলেন,—"তবে আমার সঙ্গে এস! সকলে চল, মিত্তির-জার কাছে যাই।"

নারায়ণ আগে, তাঁহার পশ্চাতে এঁড়ে গরু, তাহার পশ্চাতে যম ও চিত্রগুপ্ত; এইরূপে সকলে পুনরায় যমপুরীর দিকে চলিলেন। এঁড়ে গরু দুই চারি পা যায়, আর মাঝে মাঝে পশ্চাৎ দিকে চাহিয়া দেখে, পাছে যম ও চিত্রগুপ্ত পলায়!

মিত্তির-জা-ভূত বলিলেন,—আমার নিকট হইতে পলাইয়া যম ও চিত্রগুপ্ত কি করিয়াছিলেন, কোথায় গিয়াছিলেন, তাহা আমি চক্ষে দেখি নাই। পরে নারায়ণের নিকট যাহা আমি শুনিয়াছিলাম, তাহাই তোমাকে বলিলাম। জাগ্রত-শীতলার পাণ্ডা! তুমি মনে করিওনা যে, আমি—মিত্তির-জা, এতক্ষণ চুপ করিয়াছিলাম।

যম যেই সিংহাসন ফেলিয়া পলাইলেন, আর টুপ করিয়া আমি সেই খালি সিংহাসনে গিয়া বসিলাম। সিংহাসনে বসিয়া যমদূত-

দিগকে হুকুম দিলাম,—"যমপুরীতে যত পাপী আছে, এই মুহূর্ত্তে তোমরা তাদের সকলকে খালাশ কর।"

যমপুরীতে তৎক্ষণাৎ মহা-সমারোহ পড়িয়া গেল। শত শত, সহস্র সহস্র, লক্ষ লক্ষ, পাপী খালাশ পাইতে লাগিল। দুর্গন্ধ পুঁজময় নরক হইতে উঠাইয়া পাপিগণকে স্নান করাইতে লাগিলাম, সুগন্ধ আতর গোলাপ তাহাদিগের দেহে সিঞ্চন করিতে লাগিলাম। অগ্নিময় জ্বলন্ত নরক হইতে উঠাইয়া সুস্নিগ্ধ জলে পাপীদিগের শরীর সুশীতল করিতে লাগিলাম। শত শত কর্ম্মকার আনিয়া পাপীদিগের হস্ত পদের শৃঙ্খল কাটিতে লাগিলাম। মর্ম্মভেদী ক্রন্দনের ধ্বনি বিলুপ্ত হইয়া যমপুরীতে আজ চারিদিকে আনন্দের কোলাহল পড়িয়া গেল। সহস্র সহস্র পাপী নলবস্ত্র হইয়া যোড় হাতে আমার সিংহাসনের সম্মুখে দাঁড়াইল। সকলে বলিতে লাগিল,—"ধন্য মিত্তির-জা! শুভক্ষণে আপনার মা আপনাকে গর্ভে ধরিয়াছিলেন আজ আপনার কৃপায় যমযন্ত্রণা হইতে আমরা রক্ষা পাইলাম। না হইলে, নির্দ্দয় যম যে আরও কতকাল আমাদিগকে পীড়ন করিত, তাহা বলিতে পারি না।"

সম্মুখে দাঁড়াইয়া যোড়-হাতে পাপিগণ এইরূপে আমার স্তাবকতি করিতেছে, এমন সময় নারায়ণ, এঁড়ে গরু, যম ও চিত্রগুপ্ত সেই স্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নারায়ণকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম। ভক্তিভাবে তাঁহার পায়ে গিয়া পড়িলাম।

নারায়ণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—'মিত্তির-জা! এ কি বল দেখি? যমের উপর তোমার এত রাগ কেন?"

আমি উত্তর করিলাম,—"আজ্ঞে না! যমের উপর আর আমার আড়ি কি? তবে রসিকতা করিয়া যম বলিলেন, চিরকাল আমাকে নরকভোগ করিতে হইবে, কেবল একটী দিন আমি পুণ্যের ফল ভোগ করিতে পাইব। তাই যা! সে যা হউক, এখন আর আমার পাপ কোথায়? এই সাক্ষাতে দেখুন, লক্ষ লক্ষ পাপীদিগকে আমি উদ্ধার করিয়াছি। যে লোক লক্ষ লক্ষ পাপীদিগকে উদ্ধার করে, তার আবার পাপ কোথায়? তার পর,—আমি আপনার শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করিলাম, যে পাদপদ্ম ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ ধ্যানে পায় না, আজ সেই শ্রীপাদপদ্ম আমি স্পর্শ করিলাম। তবে আর আমার পাপ কোথায় রহিল?"

নারায়ণ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—"মা মিত্তির-জা! তোমার আর কিছুমাত্র পাপ নাই, তুমি আমার সঙ্গে বৈকুণ্ঠে চল। এঁড়ে গরুকে মানা করিয়া দাও, যেন যম ও চিত্রগুপ্তের প্রতি সে কোনরূপ অত্যাচার না করে।"

এঁড়ে গরুকে আমি মানা করিয়া দিলাম। এঁড়ে গরু আপনার গোয়ালে চলিয়া গেল। নারায়ণের সঙ্গে আমি বৈকুণ্ঠে চলিলাম। যাইবার পূর্ব্বে যোড়-হস্তে নারায়ণের নিকট একটী প্রার্থনা করিলাম যে, এই পাপীগুলিকে যেন সঙ্গে লইয়া যাইতে পারি। সুপ্রসন্ন হইয়া নারায়ণ অনুমতি করিলেন। সেই লক্ষ লক্ষ পাপীদিগকে সঙ্গে করিয়া নারায়ণের সঙ্গে আমি বৈকুণ্ঠে চলিলাম।

ক্রমে সকলে বৈকুণ্ঠের দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইলাম। আমাকে দেখিয়া কিন্তু সুদর্শন চক্র ফোঁশ করিয়া উঠিল। আর সকলকে ভিতরে যাইতে দিবে, কেবল আমাকে ভিতরে যাইতে দিবে না। নারায়ণের পায় আমি পুনরায় কাঁদিয়া পড়িলাম।

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া নারায়ণ আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"নয়ন-চাঁদ বলিয়া এক

ব্যক্তির শীতলা কি তুমি কাড়িয়া লইয়াছিলে?"

আমি উত্তর করিলাম,—"হাঁ মহাশয়! মৃত্যুর পূর্ব্বে আমি সে কাজটী করিয়াছিলাম।"

নারায়ণ বলিলেন,—"ঈশ! করিয়াছ কি? সে যে ভারি জাগ্রত শীতলা! এমন কাজও করে! আর সব পাপ আমি ক্ষমা করিতে পারি, কিন্তু সে শীতলা-কাড়া পাপটী আমি ক্ষমা করিতে পারি না। যাও, শীঘ্র ভূত হইয়া তুমি মর্ত্ত্যে ফিরিয়া যাও। নয়ন চাঁদের শীতলাটী ফিরিয়া দাও। আর, সকলকে গিয়া বল, যেন নয়ন চাঁদের শীতলাকে সকলে পূজা করে।"

কি করিব? কাজেই ভূত হইয়া আমাকে ফিরিয়া আসিতে হইল। এখন তোমার শীতলাটী লইয়া যাও যে, পুনরায় আমি বৈকুণ্ঠ গমন করি।

এই বলিয়া মিত্তির-জা-ভূত আমার শীতলাটী আমাকে ফিরিয়া দিলেন।

নবম পর্ব্ব।

শেষ।

আড্ডাধারী মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আচ্ছা নয়ান! সেই যে আর একটী ভূত সেখানে বসিয়া ছিল, সে ভূতটী কে? তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে?"

নয়ন উত্তর করিলেন,—"হাঁ, করিয়াছিলাম! শুনিলাম যে, সেটী নেই-আঁকুড়ে দাদার ভূত। মর্ত্ত্যে আসিবার পূর্ব্বে তাহাকেও উদ্ধার করিবার নিমিত্ত, মিত্তির-জা নারায়ণের অনুমতি পাইয়াছিলেন।"

সকলে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তাহার পর কি হইল?"

নয়ন বলিলেন,—"শীতলাটী হাতে করিয়া আমি বাহিরে দাঁড়াইলাম। ভূত দুইটী সরু সরু বাঁশের সলার মত লম্বা হইল। তাহার পর হায়ুই-বাজির মত একে একে সোঁ সোঁ করিয়া আকাশে উঠিল। বৈকুণ্ঠে চলিয়া গেল।"

সকলে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তাঁহার পর তুমি কি করিলে?"

নয়ন বলিলেন,—"আমি বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। আগে যদি এক গুণ পসার ছিল, এখন দশ গুণ পসার হইল। কালেজের সেই যারা এম-এ পাশ দিয়াছে, সভা করিয়া তাহারা আমার শীতলার বক্তৃতা করিল। খবরের কাগজে আমার শীতলার নাম উঠিল। ফিরিঙ্গিরা আসিয়া আমার শীতলার পূজা দিতে আরম্ভ করিল। একদিন লোক সব হাঁড়ি-চড়ানো বন্ধ করিয়া, খই-কলা খাইয়া রহিল। আমার বুজরুকি চারিদিকে খুব জাহির হইল। ক্রমে আমি বসন্তর ডাক্তার হইলাম। টাকা কড়ি ঘরে ধরে না। কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে মরসুমটী কমিয়া গেল। সাহেবেরা গণিয়া বলিয়াছেন যে, আবার পাঁচ বৎসর পরে সেইরূপ হিড়িক পড়িবে। তখন তোমাদেরও এক একটী শীতলা বানাইয়া দিব। রাত্রি হইয়াছে। আজ আর নয়। এস একবার সাধের দেবতাগুলিকে নমস্কার করিয়া আপনার আপনার ঘরে যাই।"

সকলে মাটীতে মাথা ঠুকিতে লাগিলেন। আর বলিতে লাগিলেন,—"হে মা কাটি-গঙ্গা! হে বাবা ফণী মনসা! তোমাদের পায়ে গড়। ওঁ নমঃ, ওঁ নমঃ, ওঁ নমঃ।" *

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়।

---

* পাঠকের মনে থাকে যেন এটী গুলিখোরের গল্প।
জ, স।

একটী সঙ্গীত।

"আর কি সময় নাহি রসময়
বাজাতে মোহন-বাঁশী—"

সুদূরে যমুনা-তীরবর্ত্তী নিধুবনে কদম্বতলে হৃদয়াপহারী মোহন-বাঁশী বাজিয়া উঠিল। তাহার মনোমুগ্ধকর স্বর তমাল-বনের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনিত হইল। বনের পশু-পক্ষী নীরবে তাহা শুনিতে লাগিল। সুস্নিগ্ধ সমীরণের মৃদুমন্দ গতি মৃদুতর হইয়া আসিল। বন-বৃক্ষ-লতাও যেন নিঃস্তব্ধে ঊর্দ্ধমুখে সেই মধুর রবে মনোনিবেশ করিল। কলনাদিনী, খরপ্রবাহিণী, ললিত-লহরী-মালিনী যমুনা সেই উন্মত্তকরী স্বরলহরী শ্রবণে আপন লহরী-লীলা সংযত করিয়া স্বর-প্রবাহ-বেগ ফিরাইয়া বিপরীত-গতিতে প্রবাহিত হইতে লাগিল। ব্রজের প্রতিগৃহে সেই মোহন মধুর স্বর প্রবেশ করিল। গৃহকর্ম্ম-ব্যাপৃতা স্বামিসেবা-নিরতা, সংসার-নিবিষ্টমনা, প্রবৃত্তি-বিমুগ্ধা ব্রজ-রমণীর কর্ণে সেই দূরাগত বংশীরব সুস্পষ্ট ধ্বনিত হইল। প্রাণের পূর্ণ আবেগে, মরমের ব্যথায় ব্যথিত হইয়া ব্রজাঙ্গনা চমকিত হইল,—উদ্ভ্রান্ত মনে গাইল;—

"আর কি সময় নাহি রসময়
বাজাতে মোহন-বাঁশী—" *

যে মোহন-বাঁশীর রবে ব্রজাঙ্গনা আত্মহারা হয়,—যে মধুর স্বরে তাহার সংসার-বাসনা বিসর্জ্জিত হয়—হৃদয় ব্যাকুলিত হয়,—এ বাঁশী কাহাকে ডাকিতেছে, তাহার ভাবার্থ বুঝিতে না পারিয়া সকলেই চঞ্চলা হয়,—আজ অসময়ে সেই স্বর তাহার কর্ণে প্রবেশ করিয়া হৃদয় ভেদ করিয়াছে, প্রাণের ভিতর দিয়া মরম স্পর্শ করিয়াছে। একি মোহন-বাঁশী!! তাহার কি এই কাজ?—এ যে কালের ভেরী!

তাই ব্রজবধূ আজ উন্মনা,—কাহাকে সংসার হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য আজ এ কালের ভেরী বাজিল, তাহা বুঝিতে না পারিয়া ব্রজবধূ বিচলিতা। আঘাতিত হৃদয়কে জিজ্ঞাসা করিল,—"একি আমারই জন্য? আমার ত এখনও সময় হয় নাই; আমি সাধের সংসার সেদিন পাতাইয়াছি—সংসার-প্রবৃত্তি আমাকে দিন দিন অধিকতর মুগ্ধ করিতেছে, আমি স্বামি-প্রেমনিবিষ্ট-মনা, আমার আশা-ভরসা এখনও আমার সম্মুখে পূর্ণ প্রকাশিত। সংসার-লীলার আমি এখনও কিছু শেষ করিতে পারি নাই,—আমার কত সাধ অপূর্ণ—কত ঘুঁটি আমার এখনও কাঁচা,—এখনই আমায় খেলা শেষ করিতে হইবে—আমাকে সংসার হইতে নিবৃত্ত হইতে হইবে? সে বিষম বেদনা সহ্য করিব কিরূপে?"

পূর্ণ বাসনা, প্রবল প্রবৃত্তির বিপরীতে সেই কাল-ভেরী-স্বরূপ মোহন-বাঁশী শুনিয়া বিধুরা ব্রজাঙ্গনা বলিয়া উঠিল,—"আজ অসময়ে এরূপ কার্য্য কেন কর প্রভু! তোমার ঐ বাঁশী শুনিলে কে স্থির থাকিতে পারে—কাহার হৃদয় না তোমার দিকে ধাবিত হয়? আর যাহার কর্ণে তোমার ঐ কাল-ভেরী-রব একবার প্রবেশ করে, সে আর তোমার নিকট না যাইয়া থাকিতে পারে না। কি আকর্ষণ তোমার ঐ মধুর বংশীরবে!! যে একবার আকৃষ্ট হইয়া তোমার নিকট গিয়াছে, সে আর ফিরিল না—নিবৃত্ত হইয়া তোমারই নিকট রহিয়া গেল!

* পরম পূজ্যপাদ, সাধক-প্রবর স্বর্গীয় মহাত্মা রামকৃষ্ণ পরমহংস একদিন এই গীতটী শ্রবণ করিয়া নিতান্ত বিচলিত হন। সমাগত ব্যক্তিগণ তৎকালে তাঁহার সেরূপ মনোভাবের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে মহাত্মা এই গীতটীর মর্ম্ম ও তাহার প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি-ঘটিত গূঢ়ার্থ তাঁহাদের নিকট প্রকাশ করেন। লেখকের এক সহৃদয় বন্ধু সেই সময়ে তথায় উপস্থিত ছিলেন, সেই বন্ধুর নিকট এই প্রকার কথোপকথন শ্রবণ করিয়া লেখক এই ভাব সংগ্রহ করিয়াছেন।

তাই বলিতেছিলাম, আজ অসময়ে এ নিবৃত্তি-ভেরীরব কেন দীনবন্ধু!! ভোগে আমার এখনও আকাঙ্ক্ষা মিটে নাই, প্রেমে স্নেহে হৃদয় পূর্ণ, আশায় প্রাণ উত্তেজিত,—এখন এই আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ রাখিয়া, স্নেহ-প্রেমের বন্ধন ছিন্ন করিয়া, এ আশার প্রবাহ শুকাইয়া কেমন করিয়া যাই বল দেখি? প্রবৃত্তির এ প্রবলতা কিসে রোধ করিব প্রভু? অসময়ে আজ কেন ডাক দয়াময়? তুমি ত রসময়—সংসার-রঙ্গে কি বঞ্চিত করিবে? কি জানি, তোমার রসময় বংশীরবের কি আকর্ষণ!—সময় নাই, অসময় নাই, সর্ব্বদাই প্রাণ বিচলিত করে—হৃদয় উদ্বেজিত করিয়া তুলে,—সকলেই নিবৃত্ত হইয়া তোমার দিকে ধাবিত হয়। সুকোমল-দেহা, লাবণ্যময়ী, সুকুমারী বালিকা—যাহার বিমল মাধুরীতে নয়ন ভরিয়া যায়, যাহার প্রতি-পদক্ষেপে লাবণ্য ছড়াইয়া যায়, যাহার কোমল প্রাণ কেবলমাত্র সংসার-খেলা শিখিতেছিল, পিতামাতার স্নেহে, সহোদরের আদরে, আত্মীয়ের আপ্যায়িতে যে মায়ার পুতুল প্রবৃত্তি-বশে নিম্ন হইতে নিম্নতর হইতেছিল—অসময়ে এই নিবৃত্তি-ভেরীরবে তাহাকে মাতৃক্রোড় হইতে বিচ্ছিন্ন করিলে কেন দয়াময়? যাহার মধু-মাখা বাক্যে জগৎ ভুলিতেছিল, যাহার প্রতি কার্য্যে মধুময় ভাব—মনোমোহন ব্যবহার—প্রীতি-প্রসন্ন বদন,—তাহার সেই পবিত্র বিমল হৃদয়ে নিবৃত্তি-উৎপাদন জন্য এত সত্বরতা কেন প্রভু? তাই বলিতেছিলাম, আর কি সময় নাই?

সারবান্ পর্ব্বত-সদৃশ সংসারের সুদৃঢ় আশ্রয়স্বরূপ প্রতিপালক পুরুষ—যাঁহার অন্তরালে থাকিয়া জগতের কত ঝটিকা, ঝঞ্ঝাবাত,—কত অগ্নিবৃষ্টি, ভূমিকম্প হইতে রক্ষা পাইয়াছি,—যাঁহার আশ্রয়ে থাকিয়া যুবক-সন্তান আপনার উন্নতি-পথে অগ্রসর হইতে শিখিতেছিল, আপনার স্থান অনুসন্ধান করিয়া কর্ম্মপথের পথিক হওয়ার উপায় শিখিতেছিল,—যাঁহার আশ্রয়ে থাকিয়া, যাঁহার সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া মনের শান্তিতে বালক শিক্ষা লাভ করিতেছিল,—সেই সংসার-পথ-প্রদর্শক, সুশিক্ষা-দাতা, প্রতিপালক, নিরবলম্বনের অবলম্বন, সৎকর্ম্মনিরত পুরুষকে আজ অসময়ে ডাকিলে কেন দয়াময়? সন্তান যাঁহাকে পিতা বলিয়া—যাঁহার স্নেহ লাভ করিয়া আশ্রিত, প্রতিপালিত হইতেছিল,—মাতা যাঁহাকে সুসন্তান বলিয়া গৌরব করিতেছিলেন,—ভ্রাতা-ভগিনী যাঁহাকে সংসার-সহায় করিয়া জীবনে সুখশান্তি লাভ করিতেছিল,—সেই প্রতিপালক পুরুষকে নিবৃত্ত করিবার জন্য এত ত্বরা করিলে কেন রসময়?—তাই ব্রজাঙ্গনা উদ্বেলিত-প্রাণে, বিচলিত-মনে তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে,—"আর কি সময় নাই?"

তোমার মোহন-বংশীরবে, তোমার কাল-ভেরীরবে আজ ব্রজাঙ্গনা নিবৃত্ত হইতে প্রস্তুত। কিন্তু কত দৃঢ়-বন্ধন যে কত দিকে তাহাকে সংসারে প্রবৃত্তি দিয়া আকৃষ্ট করিয়া রাখিতেছে, তাহাকে ছয়জনে ছয়দিকে পথ দেখাইতেছে—সে সকল দিকের সকল বন্ধনগুলি কিরূপে ছিন্ন করিবে—কিরূপে সবগুলিকে বঞ্চনা করিবে দয়াময়?

"সদা গুরুজন-নিকটেতে রই—
বাঁশী শুনে মনে চমকিত হই"

বাঁশী শুনিয়া চমকিত, বিচলিত, উদ্‌ভ্রান্ত হইয়াছি; কিন্তু আমি প্রকৃষ্ট সংসারী, সদা গুরুজনের নিকটে আমার স্থান—গুরুজনের স্নেহ-মমতার রজ্জু আমার হৃদয়ে বড় জোরে বাঁধন দিয়াছে—সেই স্নেহ, মমতা, শ্রদ্ধা, কেবলই যে আমাকে তাহাদের দিকে আকর্ষণ করিতেছে—গুরুজনের উপদেশ-কথা আমায় যে সংসার-প্রবৃত্তিতে গাঢ় হইতে গাঢ়তর নিবেশ

জন্য নিয়ত টানিতেছে ;—এ ক্ষুদ্র হৃদয়ে সে বল নাই যে প্রভু! কি করিয়া মায়া-মমতার আকর্ষণ বিচ্ছিন্ন করি? গুরুজনের মায়া-বন্ধনে আমি আবদ্ধ, এই সংসার-প্রবৃত্তিতে সদাই আকৃষ্ট,—আমি বিচলিত হইয়াও সে মায়ার মোহ এড়াইতে পারিতেছি না রসময়! তাহার উপর আরও কত জ্বালা—আরও কত লোক কত-দিকে বাধা দিতেছে,—এমন কি-জোর প্রাণের ভিতর দিয়াছ যাহাতে এত বাধা অতিক্রম করিতে পারি? তাহার উপর—

"ননদি-গঞ্জনা কেমনেতে সই"

আমার মন নিবৃত্তি-বংশীরবে আকৃষ্ট দেখিয়া আজ ননদি আমায় কত গঞ্জনা দিতেছে—তাহার ভ্রাতার সংসারে মনোনিবেশ করার জন্য আমায় যে নিয়ত উত্তেজনা করিতেছে! গঞ্জনায়, উত্তেজনায়, প্ররোচনায় ভর্ৎসনায় আমাকে সেই সংসার-প্রবৃত্তি-পথে অগ্রসর হইতে ক্রমাগত অনুযোগ করিতেছে, সেই উত্তেজনায় আজ আমি উত্তেজিত, সেই প্ররোচনায় আমি সদাই প্রবৃত্ত,—তাই বলি, আজ অসময়ে কেন ডাক প্রভু! এই উত্তেজনা হইতে নিষ্কৃতি-লাভের উপায় বলিয়া দাও; এই অনুযোগের প্রতিবাদ করিবার ক্ষমতা যে আমার নাই দয়াময়! এই গঞ্জনা-অনুযোগের উপর আরও যে কত বাধা রসময়! নানাজনে নানাদিক্ হইতে কেবল প্রবৃত্তি-পথেই লইয়া যাইতেছে, কেবল সেই দিকেই সহায়তা করিতেছে ;—এত জ্বালার উপরেও আবার—

"প্রতিবাদী প্রতিবাসী।"

আজ প্রতিবাসীরাও যে আমার নিবৃত্তির প্রতিবাদ করিতে চারিদিক্ হইতে অগ্রসর হইতেছে! কেহ স্নেহে, কেহ মায়ায়, কেহ আত্মীয়তায়, কেহ শ্রদ্ধায়, কেহ ভক্তিতে, কেহ আপ্যায়িতে, কেহ সখিত্বে—সকলেই কেবল সেই সংসার-প্রবৃত্তিতে নিবিষ্ট করিতে চাহিতেছে। এত বাধা, এত প্রতিবাদ কি করিয়া কোন্ বলে অতিক্রম করি—কোন্ সাহসে অবহেলা করি প্রভু!

বিধুরা, বিচলিতা ব্রজবালা কত কথা বলিতেছে,—সে আজ অসময়ে কিরূপে এই ঘোর মায়াময় সংসার-প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করিবে, তাহার জন্য কত উপায় অনুসন্ধান করিতেছে,—কিন্তু সে মোহন-বাঁশীর বিশ্রাম নাই, সে কাল-ভেরীর কালাকাল নাই,—অবিরাম অবিচ্ছেদে সেই স্বর-লহরী ছড়াইতেছে, ব্রজবাসিনী ব্রজাঙ্গনাকে উন্মত্ত করিয়া তুলিতেছে! সে বংশী-স্বরের আকর্ষণ জগতের সকল আকর্ষণকে প্রতিহত করিতেছে। গুরুজনের মমতা, প্রণয়ীর প্রেম, অপত্যের স্নেহ, ননদির গঞ্জনা, প্রতিবাসীর প্রতিবাদ—সকলকেই নিষ্ফল করিতেছে, সেই নিবৃত্তি-মহাফলের জন্য নিয়ত স্বরসুধা বর্ষণ করিতেছে। রসময়ের বংশীধর-রন্ধে ব্রজাঙ্গনা আস্বাদ-কবরী প্রেমরসার্দ্রা, পরম প্রেমিকের প্রেমাকর্ষণে ব্রজবাসী আকৃষ্ট। জগতে এমন কোন বল নাই—প্রাণীর প্রাণে এমন কোন শক্তি নাই—যাহার নিকট সে মহাশক্তিমানের আকর্ষণ প্রতিহত হইবে।

বিচলিতা, উদ্‌ভ্রান্তা, ব্রজাঙ্গনা আজ সংসার-নিবৃত্ত হইতে প্রস্তুত হইল। মায়া, মমতা, মিত্রতা, স্নেহ, ভক্তি, গঞ্জনা, প্রতিবাদ—সকলই ভুলিয়া, সকল বাধা অবাধে অতিক্রম করিয়া, সেই পরম প্রেমিকের মহাশক্তিতে আকৃষ্ট হইল—সংসারের সকল প্রবৃত্তি আজ বিসর্জ্জন দিল। তাহার সময়-অসময়ের ভেদজ্ঞান লুপ্ত হইল,—গুরুজনের নিকট লজ্জা, আত্মীয়-স্বজনের নিকট কুণ্ঠা, ননদির গঞ্জনা, সকলই বিস্মৃতা হইয়া একান্ত-হৃদয়ে সেই পরম পুরুষের সন্নিধানে ধাবিতা হইল। কুলত্যাগিনী হইয়া সেই সর্ব্ববিঘ্ন-বিনাশন, সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বপ্রতিপালক, সর্ব্বসন্তাপহারী, সর্ব্বজন-মনোমোহন, সেই অকূল-কাণ্ডারী পুরুষোত্তমের চরণতলে আশ্রয় গ্রহণ করিল।

হে অসময়-নিবর্ত্তক পরম-রসময়! এ নিরাশ্রয়ের প্রাণেও নিবৃত্তি-সঙ্গীত-সুধা বর্ষণ কর; সংসার-প্রবৃত্তি-বিমুগ্ধ অদম্য হৃদয়বেগ প্রতিরোধ করিয়া তোমার চরণতলে স্থল গ্রহণ করি।

শ্রীষষ্ঠীদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

নূতন কথা।

(১)

আমাদের বনে-জঙ্গলে বেড়েলা বলিয়া একটী গাছ হয়। লোকে উহাকে বালাও বলে। রাজশাহী অঞ্চলে ইহার নাম বরিয়ার।

বেড়েলাকে ইংরেজিতে সাইডা (sida) বলে। সাইডা এক প্রকার গাছ নয়, অনেক প্রকার। যে সব গাছগুলি ঠিক বেড়েলার মত, উদ্ভিদ্-শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতেরা তাহাদিগকে সাইডা-শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন। তাহার পর পাতার ইতর-বিশেষ দেখিয়া এক একটী গাছকে এক একটী বিশেষ নাম দিয়াছেন, যথা,—সাইডা কারপিনিফোলিয়া, সাইডা রমবিফোলিয়া ইত্যাদি। জবা, স্থলপদ্ম, ঢেঁড়শ, সাইডা, ইহারা সব এক জাতীয় উদ্ভিদ্। এই জাতিকে উদ্ভিদ্-শাস্ত্রে ম্যালভ্যাসি (malvaceae) বলে। ম্যালভ্যাসি-জাতীয় উদ্ভিদের ছালে পাট প্রস্তুত করিতে পারা যায়।

বেড়েলার ছালেও পাট বা আঁশ হয়। কিন্তু শণ ও প্রকৃত পাটের গাছ হইতে আঁশ বাহির করা যেরূপ সহজ, বেড়েলার গাছ হইতে আঁশ বাহির করা সেরূপ সহজ নয়। সেইজন্য এদেশের লোকে কখনও ইহা হইতে আঁশ বাহির করে নাই। এত দিন গাছের আঁশ হইতে কেবল দড়ি-দড়া, চট ও গুণ প্রস্তুত হইত, সুতরাং শণ ও পাটের আঁশ হইতেই সমুদয় কাজ চলিত। জাহাজ প্রভৃতির জন্য দড়ি-দড়ার এখন অধিক আবশ্যক হইয়াছে। বিদেশীয় আমদানি-রপ্তানির জন্য চট গুণেরও অধিক প্রয়োজন হইয়াছে। তা ছাড়া কলের সহায়তায় আজ কাল গাছের আঁশ হইতে সতরঞ্জি, গালিচা, উত্তম উত্তম কাপড় ও কাগজ প্রস্তুত হইতেছে। মোটা আঁশে দড়ি-দাড়া হয়, সরু আঁশে কাপড় হয়, নিতান্ত অকর্ম্মণ্য আঁশ লইয়া কাগজ প্রস্তুত হয়। নারিকেলের ছোবড়ায় উত্তম দড়ি-দড়া হয়। দক্ষিণ-দেশে কালিকট নামক নগরে নারিকেলের ছোবড়ার কারখানা আমি দেখিয়াছি। সে স্থানে ছোবড়া হইতে সাহেবেরা এরূপ সূক্ষ্ম সুতা প্রস্তুত করিতেছেন যে, দেখিলে চমৎকার বোধ হয়।

ফিলিপাইন্ দ্বীপে এক প্রকার কলা গাছ আছে। সেই কলা গাছের বালদো হইতে সেখানে লোকে পাট প্রস্তুত করে। সেই কলার আঁশে যেরূপ বলশালী রশি প্রস্তুত হয়, এমন আর কোনও দ্রব্যে হয় কিনা সন্দেহ। কলা হইতে এদেশেও আঁশ বাহির করিতে পারা যায়, কিন্তু অতি ক্ষীণ ও ভঙ্গপ্রবণ। বিশেষ তাহাতে কোনও কাজ হয় না। সখ করিয়া ঢাকার তাঁতিরা তাহা হইতে দুই এক বার কাপড় প্রস্তুত করিয়াছিলেন। কিন্তু সে সখের জিনিস। ব্যবহারোপযোগী নয়, অর্থ-লাভেরও উপায় নয়। আমার এই বোধ হয় যে, এদেশের কলার আঁশে কাগজ ভিন্ন আর অন্য কোনও বস্তু প্রস্তুত করিতে যাইলে তাহাতে লাভ হইবে না। কলার বালদো কাটিয়া, আকমাড়া কল দিয়া তাহার জল বাহির করিয়া, তাহাকে শুকাইয়া, কাগজের কলে বেচিলে লাভ হইতে পারে। কিন্তু দুই

এক মণ কলার আঁশ কাগজের কলে আনিলে কেহ ফিরিয়াও চাহিয়া দেখিবে না। শত শত ভীমের বলে যে সমুদয় কল পরিচালিত হয়, সে কলে কোনও দ্রব্যের দুই এক মণে কি হইবে? তাহা লইয়াও কোন কাজ হয় না। সে নিমিত্ত সকলের এই কথাটী সর্ব্বদা মনে রাখা আবশ্যক যে, কোনও একটী নূতন বিষয় প্রচলন করিতে হইলে, কোনও একটী নূতন বিষয় হইতে অর্থ লাভের কল্পনা করিলে, প্রথমেই দেখিতে হইবে যে, সে জিনিসটী অধিক পরিমাণে পাওয়া যায় কি না যায়। তাহা না হইলে সে দ্রব্যের প্রতি কেহ ফিরিয়াও চাহিবে না। আমাদের দেশে পার্ব্বত্য প্রদেশে যে বন্য কলা গাছ হয়, কাগজের নিমিত্ত তাহা হইতে আঁশ সংগ্রহ করিয়া বিক্রয় করিলে লাভ হইতে পারে। কিন্তু প্রথম নমুনা আনিয়া কলওয়ালাদিগকে দেখাইতে হয়। কলওয়ালারা তাহার নিমিত্ত কি মূল্য দিবেন, তাহা ঠিক্ করিতে হয়। সে মূল্যে লাভ হইতে পারে কিনা, একথা বুঝিয়া তবে সে কার্য্যে হাত দিতে হয়। আমাদের দেশে নটরাচর যে কলা দেখিতে পাই, উদ্ভিদ্-শাস্ত্রে তাহাকে মুসা স্যাপিয়েণ্টম (Musa sapientum) বলে। ফিলিপাইন দ্বীপের যে কলা গাছে রশারশ্মি হয়, তাহাকে মুসা ফিলিপিনেনসিস (Musa phillipinensis) বলে। এদেশে এই কলার চাষ করিবার নিমিত্ত অনেক বার যত্ন হইয়াছিল। গাছ হয়, কিন্তু সেরূপ কাজ হয় না। মান্দ্রাজে একবার দেখিয়াছিলাম, একজন এই কলার কতকগুলি আঁশ হাতে করিয়া বিক্রয় করিবার নিমিত্ত রাস্তায় দাঁড়াইয়া আছে। আমি তাহার সেই আঁশগুলি ক্রয় করিয়া লইলাম। সে বলিল, মালীরা ইহা দিয়া ফুলের মালা গাঁথিয়া থাকে।

অনেক স্থানে আনারসের মত যে বড় বড় গাছ হয়, তাহার পাতার আঁশেও উত্তম রশি প্রস্তুত হয়। বাঙ্গলায় ইহাকে বন-আনারস, মুরগা বা কোঁয়া বলে। উদ্ভিদ্-শাস্ত্রে ইহার নাম আগাভি আমেরিকানা (Agave americana)। বেড়ার জন্য অনেক রেলের ধারে এই গাছ প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। পশ্চিমে এই গাছ দিয়া লোকে বাগানেরও বেড়া দিয়া থাকে। এ গাছ আমাদের দেশের নয়। আনারস, আতা, নোনা, পেঁপে, আলু, তামাক, শিয়ালকাঁটা প্রভৃতি গাছের মত ইহাকে আমরা আমেরিকা হইতে পাইয়াছি। পূর্ব্বকালে আমেরিকার মেক্সিকো নামক দেশে এই গাছকে লোকে নানা কার্য্যে পরিণত করিত। আস্ত পাতা দিয়া ঘর ছাইত। পাতা চাঁচিয়া কাগজ প্রস্তুত করিত, পাতা হইতে আঁশ বাহির করিয়া দড়ি-দড়া করিত। মূল হইতে সাবাং প্রস্তুত করিত। কচি কচি পাতা রাঁধিয়া খাইত। ফুলের শাখা হইতে মদ্য প্রস্তুত করিত। সম্প্রতি এই গাছের আঁশ আমি বিলাতে পাঠাইয়াছিলাম। সে স্থানের ব্যবসাদারেরা এই আঁশ প্রতি মণ দশ টাকা হইতে পনর টাকা পর্য্যন্ত দরে ক্রয় করিতে পারেন।

বন-আনারসের আর একটী জাতি আছে। তাহার নাম আগাভি রিজিডা, রূপ সিসলিয়ানা (Agave rigida varicty sissaliana) ইংরেজিতে আজকাল ইহাকে সিসল হেম্প বলে। আমেরিকার উপকূলে বারমুডাস নামক দ্বীপে ইহার বাস। বিলাতে ইহার আঁশ পঁচিশ টাকা মণ দরে বিক্রীত হইতেছে। বারমুডাস দ্বীপের লোক ইহা বেচিয়া বড় মানুষ হইয়া গিয়াছেন। বারমুডাস ইংরেজের রাজ্য। সেস্থানে ইংরেজ-গবর্ণর আছেন। তাঁর ইচ্ছা অন্য দেশে সিসলের চাষ না হয়, বারমুডাসবাসীদিগের একাধ্য নিজস্ব থাকে। যাহাতে এ গাছের চারা অন্য দেশে না যাইতে পায়, তিনি সেইরূপ আইন করিলেন। কিন্তু আমাদের গবর্ণমেণ্ট কৌশল করিয়া ইহার চারা এদেশে আনিয়াছেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইংরেজিতে এ গাছকে সিসল হেম্প বলে। হেম্প (hemp) কথাটীর এক অর্থ "পাট", অপর অর্থ "গাঁজা"। তাই মিরর খবরের কাগজে সেই সময়ে গবর্ণমেণ্টকে তিরস্কার করা হইল। মিরর বলিলেন,—"গবর্ণমেণ্ট এই বার দেশটীকে একেবারে উৎসন্ন দিবার নিমিত্ত কল্পনা করিয়াছেন। এক দেশী গাঁজার জ্বালায় অস্থির, তাহার উপর আবার কোথা হইতে গবর্ণমেণ্ট নূতন প্রকারের সিসল নামক গাঁজা আনিয়া উপস্থিত করিলেন! বিলাতি গাঁজা পাইয়া এইবার মেয়ে-মর্দ্দে সব গাঁজা খাইবে, দেশটী ছারে-খারে যাইবে।" বলা বাহুল্য যে, মিরর ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন। দেশে নূতন প্রকার গাঁজা আসে নাই, নূতন এক প্রকার পাটের বীজ আসিয়াছে, যাহার মূল্য আমাদের এ পাটের চেয়ে অন্ততঃ চারিগুণ অধিক। গবর্ণমেণ্ট যদি কৃতকার্য্য হন, তাহা হইলে দেশী পাটের চাষ করিয়া যেখানে আজকাল লোকে এক টাকা পায়, সিসল পাটের চাষ করিয়া সেখানে চারি টাকা পাইবে। আচ্ছা ভাল, নানারূপ পাট বা গাছের আঁশকে ইংরেজি ভাষায় হেম্প বা গাঁজা বলে কেন? যথা;—ম্যানিলা হেম্প অর্থাৎ ম্যানিলা দেশের কলার আঁশ, নিউজিলাণ্ড হেম্প অর্থাৎ নিউজিলাণ্ড দেশের আঁশ, সন হেম্প অর্থাৎ আমাদের শণ, সিসল হেম্প ইত্যাদি। হেম্প মানে যে পাটও হয় গাঁজাও হয়, তাহা বোধ হয় অনেকে জানেন না। অনেকে বোধ হয় একথাও জানেন না যে প্লম্ (Plum) মানে কুল নয়, পেয়ার (Pear) মানে পেয়ারা নয়, র‍্যাট (Rat) মানে নেঙটি ইঁদুর নয়। প্লম মানে আলুবোখারা, পেয়ার মানে নাসপাতি, র‍্যাট মানে বড় ইঁদুর, মাউস্ (Mouse) মানে নেঙটি ইঁদুর! হেম্প মানে গাঁজাও হইল আবার পাটও হইল কেন? রুশিয়া দেশে যে গাঁজার গাছ আছে, তাহাতে গাঁজা, অথবা চরস, অথবা সিদ্ধি হয় না, তাহাতে কেবল পাট হয়। সেই পাট বিলাতে আমদানি হইত। সুতরাং সে পাটের নাম হেম্প হইয়াছিল। ভারতবর্ষে আবার সেই হেম্প গাছ হইতে গাঁজা, চরস ও সিদ্ধি হয়। সুতরাং গাঁজা, চরসের নামও হেম্প হইল। হিমালয়-পর্ব্বতে বন্য গাঁজার গাছ হইতে কিরূপে পাট প্রস্তুত করিতে হয়, তাহা আমি লোকদিগকে শিখাইয়াছিলাম। তাহারা ইহা হইতে এক্ষণে সামান্যভাবে চট প্রস্তুত করে।

এ সম্বন্ধে আজ আর আমি অধিক লিখিতে সাহস করি না। কেবল আরম্ভ করিয়া রাখিলাম। কারণ, নয়ন-চাঁদ এবার জন্মভূমির অনেকগুলি পৃষ্ঠা অধিকার করিয়াছেন। নয়ন বাবুর গল্পটী আমি করিয়াছি বটে, কিন্তু তাঁর সব কথা সত্য বলিয়া আমার বিশ্বাস হয় না।

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়।

রাজা রামমোহন রায়।

অতি অধিক দিনের কথা নয়, তথাপি রাজা রামমোহন রায়-সম্বন্ধে এদেশীয় ও বিদেশীয় লেখকেরা কতই না ভুল করিয়াছেন ও করিতেছেন! এখন হইতে সবিশেষ অনুসন্ধানশীল ও অনুশীলনশালী না হইলে, প্রকৃত তত্ত্ব উদ্ধার করা অসাধ্য হইয়া পড়িবে। সেই জন্যই এই প্রবন্ধে রামমোহন রায়ের জীবনী সংক্রান্ত ৫ পাঁচটী বিষয়ের নিষ্পত্তি করা গেল। এত কাল সেই বিষয়-পঞ্চক ভ্রমমগ্ন

ছিল। এত কালের পর সে সকলের মীমাংসা হইল। আমাদের প্রস্তাবিত বৃত্তান্ত গুলি এই,—

১ম। তাঁহার জন্মাব্দ, জন্মমাস ও জন্মদিবস।

২য়। ব্রাহ্ম সমাজের মূল দলিল। যাহার উপর "কলিকাতা-ব্রাহ্মসমাজ" বা বর্ত্তমান "আদি-ব্রাহ্মসমাজ" গৃহের ইতিহাসের মূল তত্ত্ব ও গৃহের স্বত্ব নির্ভর করিতেছে।

৩য়। তাঁহার ভ্রাতৃজায়ার সহমরণের আমূল অথচ সঠিক্ বর্ণনা।

৪র্থ। তাঁহার প্রপিতামহ না অতিবৃদ্ধ-প্রপিতামহ প্রথম "রায়" উপাধি প্রাপ্ত হন?

৫ম। পিতা-পিতামহাদির নাম, ধাম ও বিষয়-কর্ম্মাদির বিশৃঙ্খলার দূরীকরণ ও তদ্বিষয়ে নিগূঢ় সংবাদ প্রদান করা।

ক্রমে ক্রমে উক্ত বিষয়-সমুদয় আলোচিত হইতেছে।

১। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে ২৭শে সেপ্টেম্বরে রাজা রামমোহন রায় মহোদয়, ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী ব্রিষ্টল নগরে তনুত্যাগ করেন। কিন্তু তিনি কোন্ অব্দে, কোন্ মাসের কোন্ দিনে জন্ম-গ্রহণ করেন, তৎসম্বন্ধে বিস্তর মত-ভেদ আছে। প্রথমতঃ অব্দ লইয়াই বিসংবাদী মতের অস্তিত্ব রহিয়াছে। তাঁহার জন্মাব্দ-সম্বন্ধে এই ত্রিবিধ মত প্রচলিত রহিয়াছে,—

(ক) ১৭৭২ খৃষ্টাব্দ।

(খ) ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দ।

(গ) ১৭৮০ খৃষ্টাব্দ।

পাঠক! ভাবিয়া দেখুন, কি বিড়ম্বনা! বাঙ্গালীর জন্মাব্দ, শাকে বা সালে জানা গেল না; খৃষ্টাব্দ দ্বারা জানিতে হইতেছে, তাহাও আবার সাহেবদের সাহায্যে (১)! তারিখ জানিবার কথা তো সুদূর-পরাহত। অধিক কি, জন্মমাসও অজ্ঞাত! সেই খৃষ্টাব্দও আবার নিঃসন্দেহ নয়। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দই রাজা রাম-মোহনের জন্মাব্দ, এই মতটী সমধিক প্রচলিত (২)। আমেরিকা-নিবাসী একেশ্বরবাদী পাদ্রী ডল্ সাহেব ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের ১৮ই জানুয়ারিতে "ইণ্ডিয়ান মিরার" পত্রে যে এক পত্র প্রকাশিত করেন, তাহাতে সাহেব ইহাই প্রতিপন্ন করেন যে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে রামমোহন রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র রমাপ্রসাদ বাবু—ডল্ সাহেব, কিশোরীচাঁদ মিত্র, রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতির সমক্ষে বলিয়াছিলেন, ১৭৭২ খৃষ্টাব্দের মে মাসে অর্থাৎ বঙ্গীয় ১১৭৯ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে তাঁহার পিতৃদেবের (রামমোহন রায়ের) জন্ম হইয়াছিল। সম্ভবতঃ বাবু কিশোরীচাঁদ মিত্রজের প্রশ্নের উত্তরে রমাপ্রসাদ বাবুকে এই তত্ত্বটী বলিতে হইয়াছিল (৩)। এস্থলে ডল্ সাহেবের লিখিত পত্রখানি অবিকল উদ্ধৃত না করিলে, পাঠকগণকে নিবিড় অজ্ঞানতা-তিমিরাবৃত থাকিতে হইবে, সুতরাং তাঁহারা সুবিচার-সঙ্গত কোন একটা মীমাংসায় উপনীত হইতে পারিবেন না বুঝিয়া পত্রখানির প্রতিলিপি প্রদত্ত হইল;—

(১) কেননা, রামমোহন-বিষয়ক প্রায় সকল বিষয়, সাহেবদের আবিষ্কৃত। বর্ত্তমান প্রস্তাবেও যাহার সিদ্ধান্ত হইতেছে, তাহাও প্রধানতঃ ডল্ সাহেবেরই শ্রমের ফল।

(২) বাবু কিশোরীচাঁদ মিত্র, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি এই মতাবলম্বী। পাদ্রী ম্যাক্ ডোনাল্ড ১৭৮০ খৃষ্টাব্দ চালাইবার উদ্যোগী।

(৩) কেননা, কিশোরীচাঁদ বাবু কলিকাতা রিভিউ পত্রে ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে ষাণ্মাসিক সংখ্যায় (জুলাই হইতে ডিসেম্বর মাসে) একবার রামমোহন রায়ের জীবনী লেখেন। সেই লেখার ১৩। ১৪ বৎসর পরে এই ঘটনা ঘটে। ইহার পর (১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে) তিনি উক্ত পত্রে দ্বিতীয় প্রস্তাব লিখিয়াছিলেন। তিনি সেবারে রাজা রামমোহন রায়-সম্বন্ধে যে সন্দর্ভ লেখেন, তাহাতে তিনি রমাপ্রসাদ রায় মহাশয়ের বর্ণিত রামমোহনের জন্মাব্দ ও জন্মমাস কেন উল্লেখ করেন নাই, বুঝিলাম না।

"THE YEAR AND THE MONTH IN WHICH RAMMOHAN ROY WAS BORN.

"To the Editor of the Indian Mirror.

"There need be no doubt whatever as to the year and the month in which Rammohan Roy was born. His son, Roma Pershad Roy, chief pleader of the Supreme Court, made the matter perfectly clear to a circle of visitors and clients, in 1858, at his residence, the well known house of his father in Calcutta. Kisori Chand Mitter was present and Dr. Rajendra Lala Mittra, and I was one of the listenors. I put his words on record at the time and here they are :—

'My father was born at Radhanagar near Krishnagar, in the month of May, 1772 or accordingly to the Bengali Era, in the month of Jaista 1179.'

"I asked for the day, and Roma Pershad replied that I cannot tell without consulting the horescope, which at this distance of time, is not easy to be found.

"After this, it need not be surmised that the Great Rammohan was born in 1774, or in 1780.

"We need not guess, since we have the highest authority for saying that Rammohan was born in May 1772.

Yours &c.
Dall." (4)

ইহার পর ইণ্ডিয়ান্ মেসেঞ্জারে ব্রিটানিকা এন্‌সাইক্লোপিডিয়া হইতে একাংশ উদ্ধৃত হয়। তাহাতে মুদ্রিত হইয়াছিল,—১৭৭২ খৃষ্টাব্দের ২২শে মে তারিখে রামমোহন রায়ের ভূমিষ্ঠ হওয়ার দিন। ব্রিটানিকার উক্ত অংশ, কুমারী বিবি কলেটের লিখিত। ইহার পর হইতে কলেটের সহিত আমার লেখা-লেখি চলিতে-ছিল। আমি তাঁহাকে অন্যান্য কথার সঙ্গে এ বিষয়ে যাহা লিখি, তাহা এই,—

"No 21

* * * *

"Sometime ago, I read in the column of the Indian Messenger, a passage quotted from Britanica Encyclopedia regarding the birth date of the Raja. As far as I remember it exactly tallies with the date 22nd May 1772, as given in your letter to me. I shall esteem it a great favour, if you kindly inform me of the definite authority of the Raja's date of birth. In reply to this, I expect to have many things from you and am ready to report on this point especially.

With sincere thanks, I remain
faithfully yours
Mahendranath Roy Vidyanidhi." (5)

বিবি কলেট, ইহার উত্তরে লেখেন—

* * * *

"The date of the Raja's birth is the 22nd May of 1772. This fact came to me from Babu P. B. Mukherjee of Rajshahi College, who had it from Babu Rabindra Nath Tagore who had it from Babu Lalit Mohan Chatterjee great grandson of the Raja.

With many thanks, I remain,
Dear Sir,
Faithfully yours
S. D. Collete.

To
Pandit M. Roy Vidyanidhi." (6)

মিস্ কলেটের এই পত্রে স্পষ্টই দৃষ্ট হইল,

(4) The Indian Mirror, 18th January 1880.

(5) 16 th August, 1891.

(৬) এই পত্রে তারিখ নাই।

তিনি রাজসাহী কলেজের অধ্যাপক বাবু ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের নিকট হইতে রাজার জন্মাব্দ প্রাপ্ত হন। ফণিভূষণ বাবু, বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকটে উহা লাভ করেন। রবীন্দ্রনাথও প্রমাণ নহেন। কেননা, তিনিও বাবু ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সমীপ হইতে উহা জ্ঞাত হইয়াছিলেন। যদি এখন ললিতমোহন বাবুর কোন প্রকার অভিপ্রায় বা কোন লিপি পাওয়া যায়, তবে এক্ষেত্রে তাহাই বলবৎ প্রমাণ বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে; সুতরাং একেবারে তাহাই প্রকাশিত হইতেছে। ললিতমোহন বাবু আমাদিগকে যাহা লিখিয়া দিয়াছেন, পাঠক এই দেখুন, তাহাতে কি আছে,—

"I have heard from my grand father, the late Babu Radha Prashad Roy the first born of the celebrated Rammohan Roy that his father died in his 62 nd year (Sixty-second) date and month unknown.

Lalitmohan Chatterjee."

ললিতমোহন বাবু উক্ত ক্ষুদ্র লিপিতে তারিখ দেন নাই।

পাঠক! দেখুন, যে ললিতমোহন বাবুর উপর নির্ভর করিয়া এত আড়ম্বর, এত অনুষ্ঠান, এত উদ্যোগ করিয়া একটা মহতী ঘটনার সূচনা হইতেছিল, তাহার মূলে কি শাঙ্ঘাতিক কুঠারাঘাতই হইল! হরি! হরি! ললিতমোহন বাবু অব্দও জানেন না! যাহা জানেন, তাহা অঙ্ক কষিয়া বাহির করিতে হইবে! ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দ, রাজার পরলোক-প্রাপ্তির কাল। ইহা হইতে ব্যবকলনের সাধারণ নিয়মে ৬২ অন্তর করিলে ১৮৩৩—৬২ = ১৭৭১ খৃষ্টাব্দ লব্ধ হয়। অনেক কষ্টে যে সাল পাওয়া গেল, তাহার সহিত ডল্ সাহেবের বর্ণনার মিল নাই! মাস ও তারিখও যে অজ্ঞাত! তবে "২২শে মে" কেমন করিয়া তাঁহার জন্মাহ হইতে পারে, বল দেখি? ফলতঃ ১১৭৯ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে (১৭৭২ খৃষ্টাব্দ, মে) তাঁহার উদ্ভব হইয়াছিল, এই অংশটী নির্ব্বিবাদে স্বীকার্য্য। তারিখটী যে কেবল দুষ্প্রাপ্য, তাহা নয়; কিন্তু একেবারেই অপ্রাপ্য। তদ্বিষয়ে চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য্য হইয়াছি।

এই বার দ্বিতীয় বিষয়ের তত্ত্বানুশীলনে ব্যাপৃত হইয়া দেখা যাউক, কত দূর তাহাতে অগ্রসর হওয়া যাইতে পারে।

২। কলিকাতায় ব্রাহ্ম-সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইবার সূচনার সাল, মাস, তারিখ কেহই অদ্যাবধি জানেন না। বিক্রেতা কয় জন, এবং কি একাধিক, কাহার নিকট হইতে কত টাকায় উহা ক্রয় করা হইয়াছিল, তাহাও সকলেরই অজ্ঞাত। ক্রেতা কে? ক্রেতার সংখ্যা একাধিক কি না? ভেণ্ডার অর্থাৎ ষ্ট্যাম্প-বিক্রেতার নাম কি? কোন্ সালের কোন্ তারিখে ষ্ট্যাম্প খানি ক্রীত হইয়াছিল? কত টাকা মূল্যের ষ্ট্যাম্পে ভূমি ক্রয় করা হইয়াছিল, ইত্যাদি সংবাদ জানিবার কোন উপায়ই ছিল না। তখন কিরূপ ভাষায় দলিল লিখিত হইত, কলিকাতার বিভাগ—সীমা-সরহদ্দই বা কিরূপ ছিল অর্থাৎ এখন যে স্থানের নাম যোড়াসাঁকো, তখনও সেই স্থান, ঐ নামেই প্রসিদ্ধ ছিল, কি উহার অপর কোন পুরাতন নাম প্রচলিত ছিল, ইত্যাদি বিদিত হইতে পারা যাইবে বলিয়া তাহার অবিকল প্রতিলিপি এখানে মুদ্রিত হইল।

"শ্রীশ্রীহরি

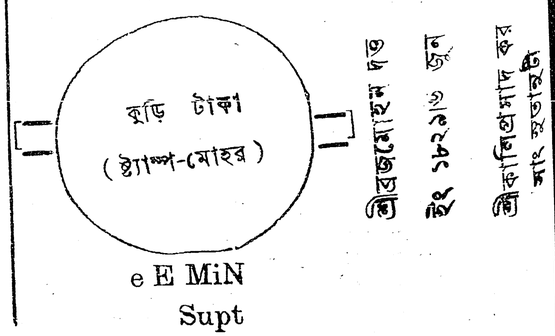

মহামহিম শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু কালীনাথ রায় ও শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও শ্রীযুত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ও শ্রীযুত দেওয়ান রামমোহন রায় মহাশয় বরাবরেষু———

লিখিতং শ্রীকালীপ্রসাদ কর ওলদে ৺ বৈষ্ণবচরণ কর এবনে ৺ রামলস্কর কর কস্য জমি বিক্রয় কবলা পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে সহর কলিকাতা সুতানুটী গ্রামের মধ্যের আমার পৌত্রীক বসতবাটী যে আছে ইহার চৌহদ্দী চিৎপুর রোডের পূর্ব্বধার ফুলবিরতনের বাটীর দক্ষীণ ৺ রামকৃষ্ণ করের বাটীর উত্তর রাধামণি ব্রাহ্মণীর বাটীর পশ্চিম এই চতুর সীমার মধ্যে আমার পৌত্রীক খরিদা পাট্টাই জমি মায় এমারত কম বেস ৵৪৶ চারি কাঠা অর্দ্ধপুয়া আমার অসাধারণ ভোগ দখলে আছে। ঐ চারি কাঠা অর্দ্ধপুয়া জমি মায় এমারত মহাসয়দিগের নিকট চিরকাল ব্রহ্মসমাজের নিমিত্তে মবলগে সিক্কা ৪২০০ চারি হাজার দুই শত টাকা পোনে বিক্রয় করিলাম। জমি মজকুরা আমুল মামুল মাফিক আমল দখল করিয়া মহাশয়রা ইচ্ছামত নওয়া ইমারত বানাইয়া জদালএ খরিদ করিতেছেন তদাসয় পুরস্ত চিরকাল করিবেন আমি কি আমার উত্তরাধিকারির সহিত কস্মীন কালে দাওা নাই দাওা করি কিম্বা কেহ করে সে ঝুটা ও বাতিল এতদার্থে পোনের রেবাক টাকা নগদ দস্ত বদস্ত পাইয়া বিক্রয় কবলা লিখিয়া দিলাম ইতি সন ১২৩৬ বার সত্ত ছত্রীষ সাল তারিখ ২৮ জৈষ্ঠী

ইসাদী

শ্রীরামধন মালাকার সাং সিমিলা — শ্রীকালীনাথ কর সাং সুতানুটী

শ্রীবংশীধর আমদার
সাং কলিকাতা

রসীদ রুপেয়া বাবুদি উপরের লিখাত জমি মায় এমারত বিক্রয়ের পোন সন ১২৩৬ সাল তাং—

আসামী	রুপেয়া	
নিজরোজ		
ওঃ খোদ		
রোক সিক্কা	৪২০০	নং চারি হাজার দুই শত টাকা মাত্র শ্রীকালিপ্রসাদ কর সাং সুতানুটী

ইসাদী

শ্রীকালিনাথ কর সাং সুতানুটী — শ্রীরামধন মালাকর সাং সিমিলা

শ্রীবংশীধর আমদার
সাং কলিকাতা।" (৭)

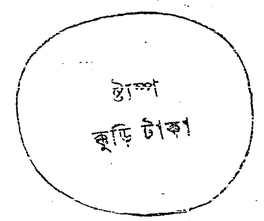

এই দলিল ব্রাহ্ম-সমাজের প্রামাণিক ইতিহাস। ব্রাহ্ম-সমাজ-সকলের বিশেষতঃ "আদি ব্রাহ্ম-সমাজের" ইহা এক উপাদেয় দ্রব্য। এ দলিল বাবু রমাপ্রসাদ রায় মহোদয়ের ভবনে রক্ষিত। উক্ত দলিল দ্বারা নিম্ন-লিখিত বিষয়-সমুদয় পাওয়া গেল,—

ক। ২০৲ কুড়ি টাকার ষ্ট্যাম্পে দলিল লিখিত হইয়াছে। ৪২০০ বিয়াল্লিশ শত টাকায় গৃহ সহিত ৵৪৶ চারি কাঠা আধ পোয়া জমি বিক্রীত হইয়াছিল! এখনকার সঙ্গে তখনকার ভূমি-মূল্য তুলনা করিলেও, উভয় সময়ের একটা বৃত্তান্ত বিদিত হওয়া যায়। ভূমি-মূল্য এখন অগ্নিতুল্য—দুর্ম্মূল্যতা-দোষ স্পর্শে ক্রয়ে অধিকার নাই!

(৭) এই দলিলের বর্ণাশুদ্ধি গুলিও যথাযৎ রাখিয়া দেওয়া গেল। অন্যথা প্রকৃত প্রতিলিপি প্রদর্শন করা অসম্ভব হইয়া উঠে।

খ। ১২৩৬ সালের ২৮ শে জ্যৈষ্ঠে (১৮২৯ খৃষ্টাব্দ ৬ই জুন) উক্ত দলিলের লিখন-পঠন-কার্য্য নির্ব্বাহিত হইয়াছিল।

গ। ভেণ্ডার অর্থাৎ ষ্ট্যাম্প-বিক্রেতার নাম ব্রজমোহন দত্ত।

ঘ। বিক্রেতার নাম শ্রীকালীপ্রসাদ কর। সে ব্যক্তি সুতানুটী-নিবাসী। সুতরাং তখনও সুতানুটীর অস্তিত্ব ছিল। এখন ঐ স্থান, যোড়াসাঁকো নামে পরিচিত।

ঙ। ক্রেতৃগণের তালিকায় যে দ্বারকানাথ ঠাকুর ও প্রসন্নকুমার ঠাকুরের নাম দৃষ্ট হইতেছে, তাঁহাদের পরিচয় ভাল করিয়া না দিলেও, কোন হানি হইবে না। কারণ, তাঁহারা অনেকটা খ্যাতিমান্ লোক। বাবু কালীনাথ রায় টাকী-নিবাসী—জমিদার। মুন্সী তাঁহার সাধারণ উপাধি। আর, পণ্ডিতপ্রবর রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ই, ব্রাহ্ম-সামাজের আচার্য্য ছিলেন। রামমোহন রায়, নিজ নাম সর্ব্বশেষে দিয়াছেন। দ্বারকানাথ ঠাকুর, কালীনাথ রায়, প্রসন্নকুমার ঠাকুরের সঙ্গে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের নাম ক্রেতৃতালিকায় সন্নিবেশিত থাকায়, এ বিষয়ে তাঁহার কার্য্যকারিতার গুরুত্ব কত বেশী, তাহা বিলক্ষণ অনুভূত হইল। রামমোহন রায় তখনও "রাজা" উপাধি-পরিশোভিত নহেন। তৎকাল পর্য্যন্তও তিনি যে "দেওয়ান" খ্যাতিতে পরিচিত ও প্রখ্যাত ছিলেন, বিদ্যমান দলিলই তাহার প্রত্যক্ষ সাক্ষী।

ব্রাহ্ম সমাজ শব্দ রামমোহনের আমলে হয় নাই, একথা অনেকেই লিখিয়াছিলেন। শ্রীমান্ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "রামমোহন রায়" নামক পঠিত প্রস্তাবের আমরা 'প্রবাহে' (৮) যে নানা দোষের সমালোচনা করি, তাহাতেও আমরা আমাদের পূর্ব্বতন লেখকদের ঐ কথারই প্রতিধ্বনি করিয়াছিলাম। আমাদের সমালোচনায় অন্যান্য কথার খণ্ডন-চেষ্টা "পাক্ষিক সমালোচকে" হইয়াছিল; কিন্তু কেহই উহার একাল পর্য্যন্ত প্রতিবাদ করিতে পারেন নাই। আমরা এক্ষণে নিজের ভ্রম নিজেই স্বীকার করিয়া লইলাম অর্থাৎ রামমোহন রায়ের সময়েই "ব্রাহ্ম-সমাজ" শব্দের প্রচলনের সূত্রপাত ঘটিয়াছিল।

৩। তৃতীয় আলোচ্য ব্যাপার—সেই সতীদাহ। সতীদাহে রামমোহনের মন বিচলিত করিয়া দিয়াছিল। যাঁহারা বলেন, রামমোহন রায় স্ব-চক্ষে আপন ভ্রাতৃজায়ার সহমরণ দেখিয়াছিলেন, তাঁহারা ভ্রান্ত। একে একে তাঁহাদের ত্রুটি প্রদর্শিত হইতেছে।

সাধারণ্যে কি জানিতেন বা এক্ষণেও কি জানেন, আমাদের জিজ্ঞাসিত পশ্চাল্লিখিত প্রশ্নাবলী দৃষ্টে পাঠক বুঝিবেন। কেননা, এতৎকাল সে সকল কথার অস্তিত্বই ছিল না।

ক। রামমোহনের সর্ব্বশুদ্ধ কয় ভ্রাতা? সকলেই কি সহোদর? যদি বৈমাত্রেয় ভ্রাতা থাকেন, তবে সহোদর ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতার মধ্যে কে জ্যেষ্ঠ, কে কনিষ্ঠ? প্রত্যেকের নাম কি? তাঁহাদের সংখ্যা কত?

খ। রামমোহন রায়ের কোন্ ভ্রাতার—অগ্রজ ভ্রাতার পত্নী, না অনুজ ভ্রাতার পত্নী সহমৃতা হন?

গ। সহোদর ভ্রাতার—না বৈমাত্রেয় ভ্রাতার—পত্নীর সহমরণ ঘটিয়াছিল? রামমোহনের সহোদর ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতার নাম কি?

ঘ। যদি সহোদর অথচ অগ্রজ ভ্রাতার পত্নী সহমৃতা হইয়া থাকেন, তবে সেই ভ্রাতার নাম কি?

(৮) ১২৯১ সালের, ফাল্গুন মাসে "প্রবাহ' পত্রে "ভারতী পত্রিকায় প্রচারিত শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রামমোহন রায়' প্রস্তাবের সমালোচনা" প্রস্তাব দ্রষ্টব্য।

ঙ। সেই রমণীই রামমোহন রায়ের ঐ মৃত ভ্রাতার একমাত্র প্রণয়িনী কি না?

চ। যদি তিনি স্বামীর একমাত্র বনিতা না হন, তবে তিনি কোন্ বনিতা?

ছ। তাঁহার সপত্নীদের নাম অবগত হইবার উপায় আছে কি না?

জ। মৃত্যু-সময়ে তাঁহার বয়স আনুমানিক কত হইয়াছিল?

ঝ। কোন্ সালে, কোন্ মাসে, কোন্ তারিখে, কোন্ পক্ষের কোন্ তিথিতে, কয় ঘটিকায় সহমরণ হইয়াছিল? উহার ইংরেজী সাল-তারিখই বা কি কি?

সাধারণের পক্ষে এ সকল প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নয়, জানি; সুতরাং আমরাই উত্তর দিতেছি! এতগুলি প্রশ্ন করিবার তাৎপর্য্য এই যে, স্থূলদর্শী লোকেরা এ সকল তত্ত্বের সংবাদ রাখেন না; অথচ উক্ত প্রশ্নে জ্ঞান না থাকিলে, সুনিষ্পত্তি ঘটিবার সম্ভাবনা কোথায়? ক্রমান্বয়ে সকল প্রশ্নের উত্তর দিতেছি।

ক। রামমোহনের দুই ভ্রাতা ছিলেন। সর্ব্বশুদ্ধ তাঁহারা তিন ভ্রাতা। দুই জন সহোদর ও এক জন বৈমাত্রেয়। জগন্মোহন জ্যেষ্ঠ, রামমোহন মধ্যম। সর্ব্ব কনিষ্ঠের নাম রামলোচন। তিনিই বৈমাত্রেয় ভ্রাতা।

খ। রামমোহনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পত্নী সহগমন করেন।

গ। তিনি রামমোহনের সহোদর ভ্রাতার পত্নী। তাঁহার সেই সহোদর ভ্রাতার নাম জগন্মোহন। উপরেই বলিয়াছি, বৈমাত্রেয় ভ্রাতার নাম রামলোচন।

ঘ। এই জগন্মোহনের পত্নীরই সহমরণ হইয়াছিল।

ঙ। তিনি জগন্মোহনের একমাত্র বনিতা নহেন।

চ। তিনি দ্বিতীয়া বা মধ্যমা।

ছ। সর্ব্বশুদ্ধ তাঁহার তিন সপত্নী। সর্ব্বসমেত জগন্মোহনের চারিটী ভার্য্যা। তাঁহার নাম অলকমণি বা অলকমঞ্জরী। তাঁহার জ্যেষ্ঠা সপত্নীর নাম যশোদা, তৃতীয়ার নাম অজ্ঞাত, চতুর্থীর নাম দুর্গামণি।

জ। সহমৃতা কামিনী অলকমণির মরণকালে ৪০ চল্লিশের অধিক বয়স হইয়াছিল।

ঝ। ১২১৬ সালে ২৭শে চৈত্র রবিবারে শুক্লপক্ষীয় চতুর্থী তিথিতে অপরাহ্নে এই ঘটনা ঘটে। ১২১৬ সালের ২৭শে চৈত্র—১৮১০ খৃষ্টাব্দের ৮ই এপ্রেল।

৪। কে প্রথমে "রায়" উপাধি প্রাপ্ত হন,—ইহাই আমাদের বিচার্য্য চতুর্থ প্রস্তাব। তাহার বিবরণ এই;—রামমোহন রায়ের প্রপিতামহ কৃষ্ণচন্দ্র "রায়" উপাধি প্রাপ্ত হন, বহুলোকের এই মত। কিন্তু তাহা ঠিক্ নয়। উক্ত কৃষ্ণচন্দ্রেরও ঊর্দ্ধতন দুই পুরুষ, ঐ উপাধি-ভূষিত হইয়াছিলেন। অর্থাৎ রামমোহন রায়ের অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহ (ঊর্দ্ধতন পঞ্চম পুরুষ) পরশুরাম, 'রায়' এই উপনামে প্রথম সুসজ্জিত হইয়াছিলেন। তালিকা দিয়া বিষয়টী বিশদ ভাবে বুঝাইতেছি। এই উপলক্ষে এই বংশের সহিত এই প্রবন্ধ-লেখকের কি সম্বন্ধ, তাহাও এই কারণে লিখিত হইল যে, এ বিষয়ে আমাদের বাক্য কত দূর বলবত্তর হওয়া উচিত।

১৮। গোবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়। (৯)
|
১৯। কমলমিশ্র।
|
২০। রামনাথ।
|
২১। সুন্দরাচার্য্য।
|
২২। পরশুরাম "রায়" [৫ম পুরুষ (ঊর্দ্ধতন)]
|
২৩। শ্রীবল্লভ (৪র্থ পুরুষ)।

(৯) বাম দিকের অঙ্কগুলিতে কান্যকুব্জাগত ভট্ট নারায়ণ হইতে কে কত অধস্তন, তাহাই বুঝাইতেছে।

২৩। শ্রীবল্লভ [(৪র্থ পুরুষ)।]
২৪। কৃষ্ণচন্দ্র (৩য় পুরুষ)।
২৫। ব্রজবিনোদ (১০) (২য় পুরুষ)।

২৬। রামকিশোর — ২৬। রামকান্ত (১ম পুরুষ)
২৭। নবকিশোর — ২৭। রামমোহন।
২৮। শ্রীনাথ — ২৮ রাধাপ্রসাদ, ২৮। রমাপ্রসাদ
২৯। গোপীনাথ চূড়ামণি গোস্বামী।
৩০। শ্রীমহেন্দ্রনাথ, (বর্ত্তমান প্রবন্ধলেখক)।

যাঁহারা কৃষ্ণচন্দ্রকে প্রথম 'রায়' উপাধিধারী বলেন, তাঁহারা—আর, যে যে লোক, পরশুরামকে প্রথম 'রায়' উপাধি প্রাপ্ত কহেন, তাঁহারা—অর্থাৎ এই সম্প্রদায়-যুগলই একটী মূল বিষয়ে এক-মতাবলম্বী। উভয় দলেই বলেন, যিনি যজন-যাজন ও সংস্কৃত অধ্যাপনা কতক কতক ত্যাগ করেন, তিনিই নবাব-সংসারে প্রথম প্রবিষ্ট হইয়া তৎ-কর্ম্মোপলক্ষে 'রায়' উপাধি প্রাপ্ত হন। পরশুরামই নবাব-সংসারে প্রথম প্রবিষ্ট হন। তাহার প্রমাণ এইখানে এখনই দেওয়া হইল,—

"My ancestors were Brahmins of a high order and from time immemorial were devoted to the religious duties of their race, down to my fifth progenitor, who about one hundred and forty year ago gave up spiritual exercises for worldly pursuits and agrandisement." (11)

পরশুরামই যে প্রথমতঃ নবাব-সংসারে প্রবেশ লাভ করিয়াছিলেন, তাহার নির্দ্দেশ, রাজা রামমোহন রায়ের লিপিতে পাওয়া গেল। প্রামাণিক লেখা উপেক্ষা করিয়া অন্যের অগ্রাহ্য মতে আস্থা স্থাপন করার কোন বিশিষ্ট যুক্তি বা কারণই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। এতৎসম্পর্কে আমাদের বক্তব্য এই—

(ক) যে উপাধির কথা লইয়া আন্দোলন হইতেছে, তাহা একটী পুরাতন কথা। প্রাচীন বিষয় সত্য, কি মিথ্যা, নির্ণয় করিতে গেলে, লিপি ও প্রবাদের উপর নির্ভর করিতে হয়। যথায় লিপি পাওয়া যায়, তথায় তাহাই প্রবাদ অপেক্ষাও বলবত্তর। এস্থলে রামমোহন রায়ের লেখনী-প্রসূত বর্ণনাই আমাদের প্রধান অবলম্বন। অতএব সেই লিপি এ বিষয়ে বিলক্ষণ সহায়তা করিতেছে।

(খ) বংশের পরিচয় ও ইতিবৃত্ত অবগত হওয়া, অথবা সমাচার রাখা, যাঁহাদের অভ্যাস ও প্রকৃতি, তাঁহারা ঊর্দ্ধতন ৭।৮ সাত আট পুরুষের সংবাদ রাখেন। এই নিয়মে আমি আমাদের ঊর্দ্ধতন সপ্তম পুরুষ কৃষ্ণচন্দ্র রায় মহাশয়ের বৃত্তান্ত জ্ঞাত আছি। ইহার অধিক আমার বিদিত নাই। রামমোহন রায়, ঊর্দ্ধতন কমল মিশ্র, রামনাথ ও সুন্দরাচার্য্য প্রভৃতির বিষয় জানিতেন। তাঁহারা ক্রমান্বয়ে রামমোহনের অষ্টম, সপ্তম ও ষষ্ঠ পুরুষ। সুতরাং তিনি ঊর্দ্ধতন পঞ্চম পুরুষ পরশুরামের বিষয় যে জ্ঞাত ছিলেন, তাহা অনুক্তসিদ্ধ। কেবল অনুমানে বা যুক্তিতে নির্ভর করিয়া এ কথার অবতারণা করিয়াছি, ভ্রমক্রমেও কেহ ইহা হৃদয়ে স্থান দিবেন না। এতদ্বিষয়ে রামমোহন রায় মহোদয় যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা উপরে উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছি। সুতরাং এখন বলিতে পারি—"প্রত্যক্ষে কিং প্রমাণং?" প্রত্যক্ষ বিষয়ে প্রমাণের প্রয়োজন কি? চাক্ষুষ প্রমাণ ভিন্ন আর কি প্রমাণ চাই?

(১০) ব্রজবিনোদের ৭ সাত পুত্র। তন্মধ্যে রামকিশোর—দ্বিতীয় ও রামকান্ত—পঞ্চম পুত্র।

(11) Ram Mohan Roy's Autobiographiy in Mary Carpenter's work pp 17. para 3 rd.

৫। এই বার আমরা পঞ্চম বা শেষ বিষয়ে মনোযোগী হইতেছি। এস্থলে তাঁহার পিতা-পিতামহাদির নাম, ধাম ও বিষয়-কর্ম্মের নিগূঢ় সংবাদ বলিবার কথা। বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এ সম্পর্কে লিখিয়াছেন,—

"ব্রজবিনোদ, নবাব সেরাজ উদ্দৌলার অধীনে মুর্শিদাবাদে কোন সম্ভ্রান্ত পদে নিযুক্ত ছিলেন; কিন্তু তাঁহার প্রতি কোন অন্যায় ব্যবহার হওয়াতে, তিনি কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া গৃহে আসিয়া অবশিষ্ট জীবন ক্ষেপণ করেন।" (১২)

রামমোহন রায়ের পিতা-পিতামহাদির কথা বলিতে গিয়া অনেকেই ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। সেবারেণ্ড ডাক্তার ল্যাণ্ট কার্পেণ্টার লিখিয়াছেন—

"Rammohan Roy was the son of Ramkant Roy. His grand father resided at Moorshedabad and filled some important offices under the Moguls; but being ill-treated by them towards the end of his life, the son (Ramkant Roy) took up his abode in the District of Burdwan, where he had landed property." (13)

উহার তাৎপর্য্য এই,—

তিনি (রামমোহনের প্রপিতামহ) মোগলদিগের অধীনে কোন উচ্চ পদে সমারূঢ় ছিলেন। তাঁহার পুত্র (রামকান্ত রায়) শেষাবস্থায় সম্রাট্ কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইয়া বর্দ্ধমান জেলায় গিয়া বাস করেন। তথায় তাঁহার ভূমি-সম্পত্তি ছিল। (১৪)

(১২) বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্কলিত রামমোহন রায়ের জীবনচরিত।

(13) Biographical sketch, p. 1. para 2.

(১৪) পাঠক! দেখুন, সাহেব, রামমোহনের পিতামহের নাম পর্য্যন্তও অজ্ঞাত। সুতরাং আমাকে তাঁহার নাম লিখিয়া দিতে হইতেছে। তাঁহার নাম ব্রজবিনোদ রায়।

এই সকল উক্তি অতিমাত্র স্থূল বর্ণনায় পূর্ণ; সূক্ষ্ম কথা ইহাতে কিছুই পাওয়া গেল না। কেননা,—

(ক) বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কোন্ গ্রামে রামকান্ত বসতি গ্রহণ করেন, তাহার কোনও নিদর্শন নাই।

(খ) তখন "জেলা" বলিয়া কোন প্রদেশের নামকরণই হয় নাই। "চাকলে" এইরূপ সংজ্ঞামাত্র হইয়াছিল। সুতরাং বর্দ্ধমান "জেলা" না বলিয়া বর্দ্ধমান "চাকলে" বলা উচিত।

(গ) রামমোহন রায়ের পিতামহ, মোগলদিগের কোন কর্ম্মই করিতেন না। পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি, রামমোহনের পিতামহের নাম ব্রজবিনোদ রায়। তিনি ১১৪৮ সাল হইতে ১১৯৩ সালের ২২শে মাঘ এই সময়ে অর্থাৎ ১৭৫১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বর্ত্তমান ছিলেন। তখন মোগলদের প্রতাপ খর্ব্ব হইয়া আসিয়াছে। তখনকার দিল্লীর সম্রাট্দের নাম ও তাঁহাদের রাজ্যকাল আলোচনা করিলেই আমাদের উক্তি সপ্রমাণ হইবে।

মহম্মদ সা	১৭১৯—১৭৪৮ খৃষ্টাব্দ	২৯ বর্ষ
আমোদ সা	১৭৪৮—১৭৫৪ ,,	৬ বর্ষ
দ্বিতীয় আলমগীর	১৭৫৪—১৭৫৯ ,,	৫ বর্ষ

দিল্লীতে এই সকল মোগল সম্রাট্ হইয়াছিলেন; তখন তো বিশৃঙ্খলাই চলিতেছিল; সুতরাং তিনি যে মোগল সম্রাট্দের অধীনে কর্ম্ম করিতেন, ইহা কিরূপে সম্ভাবিত হয়?

কৃষ্ণচন্দ্র রায়, বর্দ্ধমান চাকলের অন্তর্গত রাধানগরে প্রথম বাস করেন। তৎপুত্র ব্রজবিনোদ, রাধানগরেই থাকিতেন; সুতরাং তিনি কেমন করিয়া মোগলদের অধীনে কর্ম্ম করিবেন? তাঁহার পিতা কৃষ্ণচন্দ্র রায় মুর্শিদাবাদের নবাব সুলতান আজিম ওয়াসান কর্ত্তৃক প্রেরিত বর্দ্ধমান-রাজ জগৎরামের এক প্রধান

কর্ম্মচারী ছিলেন। সেই পদের নাম শিখদারি ছিল। এখন যাহা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট-পদ, তখন তাহাকে শিখদারি বলিত। তিনি কি উপলক্ষে খানাকুল-কৃষ্ণনগরাঞ্চলে সমাগত হন, তাহার বিবরণ এই—

বর্দ্ধমানের রাজা কীর্ত্তিচন্দ্র রায়, মুর্শিদাবাদের নবাব সুলতান আজিম ওয়াশানের অধীনে বর্দ্ধমানের জমিদারী ইজারা-স্বরূপ লন। সুতরাং তাঁহাকে কর আদায় দিবার জন্য তিনি দায়ী ছিলেন। তাঁহার নিকট হইতে খানাকুল-কৃষ্ণনগরের অনন্তরাম চৌধুরী আবার ইজারা লইয়াছিলেন। এই চৌধুরী, তেজস্বী ব্যক্তি ও অতি দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপশালী ছিলেন। বর্দ্ধমান-রাজ-সংসারে তিনি নিয়মিত কর দিতেন না, কখনও কখনও অনিয়মে দিতেন। বর্দ্ধমান-রাজ, এই কারণে নবাবের নিকট এক জন উপযুক্ত কর্ম্মচারী প্রার্থনা করেন। নবাব, স্বীয় অমাত্য ভবানন্দ রায়কে এক সুযোগ্য পাত্র অনুসন্ধান করিতে অনুমতি করেন। রায় ভবানন্দ, তদনুসারে জ্ঞাতি-সম্পর্কীয় ভ্রাতা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের প্রসঙ্গ এইরূপে উত্থাপন করেন,—"আমার ভ্রাতৃ-সম্পর্কীয় কৃষ্ণচন্দ্র পার্সী উর্দ্দু বিলক্ষণ অবগত আছেন। তিনি ধর্ম্মভীরু অথচ কার্য্যদক্ষ ব্যক্তি।" অধিকাংশ স্থলেই শুনিতে পাওয়া গিয়া থাকে, উজিরের যে অভিপ্রায়, নবাবেরও তাহাতেই সায়। এস্থলেও তাহাই ঘটিল। ভবানন্দের প্রস্তাব উত্থাপিত হইবামাত্র কৃষ্ণচন্দ্রই মনোনীত হইয়া খানাকুল-কৃষ্ণনগর অঞ্চলে প্রেরিত হইলেন। অনেকের মুখেই শুনিতে পাই, কতকগুলি শিখ-সৈন্য, কার্য্য-সৌকার্য্যার্থে তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছিল। তন্নিমিত্ত বহুদিবস পর্য্যন্ত রায় বংশীয়েরা "শিখদার" নামে পরিচিত ছিলেন (১৫)। কৃষ্ণচন্দ্র রায় জাহানাবাদের উপকণ্ঠে গোঘাট নামক স্থানে ছাউনি ফেলেন (১৬)। এই সময়ে তাঁহার পিতৃপিতামহের বা পিতামহীর বা মাতার সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধ-বাসর। তজ্জন্য তিনি অনন্তরাম চৌধুরীকে লোক দ্বারা কৃষ্ণনগর হইতে এক অশূদ্রপ্রতিগ্রাহী অশূদ্রযাজী ব্রাহ্মণ পাঠাইবার নিমিত্ত পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন। উক্ত চৌধুরী, হরিচরণ তর্কপঞ্চানন চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে প্রেরণ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র রায়, তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া তাঁহার সংস্কৃত জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া অতিমাত্র হৃষ্ট হইলেন। কিন্তু তিনি চৌধুরীর অভীষ্ট দেব, ইহা অবগত হইয়া তাঁহাকে উপযুক্ত পাথেয় ও বিদায় দিয়া স্বস্থানে পাঠাইয়া দিলেন। এরূপ অমত করিবার তাৎপর্য্য এই যে, চৌধুরী কায়স্থ; তিনি কায়স্থের গুরু; শূদ্রযাজী। অতএব সেরূপ ব্রাহ্মণে তাঁহার ইষ্টসিদ্ধির সম্ভাবনা সুদূর-পরাহত। পুনরায় চৌধুরীকে অশূদ্রযাজী বিপ্র প্রেরণার্থে দ্বিতীয় পত্র লিখিলেন। এইবার নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেরিত হইলেন। তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্যে প্রগাঢ় নিষ্ঠায় তিনি মোহিত হইলেন। তাঁহারই প্ররোচনায় কৃষ্ণচন্দ্র, কৃষ্ণনগরে আসিলেন। তথায় অভিরাম গোস্বামীর প্রতিষ্ঠিত৺গোপীনাথ মূর্ত্তি দেখিয়া পরম পুলকিত হইলেন এবং এখানে বাস করিতে ইচ্ছা করিয়া কৃষ্ণনগরের পর-পারে দারকেশ্বর নদের বামকূলে "রাধা-

(১৫) অদ্যাপি বর্ত্তমান "শিখদার" নামক পুষ্করিণী ঐ কথাই সপ্রমাণ করিতেছে। কাহারও কাহারও মতে "শিখদার" শব্দের অর্থ ঐরূপ নয়। তাঁহাদের মতে কৃষ্ণচন্দ্র রায় মহাশয়ের যে ধরণের কার্য্য করিতে আসিয়াছিলেন, সেইরূপ কার্য্য-কারককেই "শিখদার" বলিত।

(১৬) এই জাহানাবাদ তখন বর্দ্ধমান চাকলে, পরে বর্দ্ধমান জেলা, তৎপরে হুগলী জেলার অন্তর্গত থাকে। ইহা গয়া জেলার অধীনস্থ জাহানাবাদ নয়।

নগরে" বসতি গ্রহণ করিলেন। ইঁহারই পুত্র ব্রজবিনোদ। তৎপুত্র রামকান্ত, তৎপুত্র রামমোহন। পাঠক এখন বুঝিলেন, পৈতৃক সম্পত্তি রাধানগরে কাহারও কিছু ছিল কি না? আর কেনই বা রাধানগরে প্রথমবাস হইল? রামমোহনের পিতা বা পিতামহ তথায় বাস করেন নাই, তাহাও স্থিরীকৃত হইল। তাঁহার প্রপিতামহই যে রাধানগরের আদি-নিবাসী, তাহা প্রতিপন্ন হইল। (১৭)

এই প্রবন্ধের আরম্ভে আমরা রাজা রামমোহন রায়ের ৫ পাঁচটী বিষয়ের মীমাংসার ভার লইয়াছিলাম; আমাদের সাধ্যানুসারে বিবিধ-প্রমাণাদি সংগ্রহ করিয়া আমরা তৎ বিষয়ের সম্যক্ আলোচনা ও মীমাংসা করিতে যত্ন করিয়াছি; কত দূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, তাহা বিজ্ঞ পাঠকবর্গেরই বিচারাধীন।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি।

(১৭) মৎ প্রকাশিত বংশাবলি।

দ্বিতীয় প্রভাত।

আর কেন? হে বিলাসী, উঠ এইবার,
পরিহর শোক-শয্যা, মুছ অশ্রুধার;
খোল রুদ্ধ-বাতায়ন; পূর্ব্বপথ দিয়া
প্রভাত-আলোক-রাশি পড়ুক আসিয়া।
বদ্ধবদ্ধ বিভীষিকা,—সংশয়ের জাল,—
দুষ্ট দুঃস্বপনরূপী পিশাচের পাল,
সব হ'য়ে যাক্ দূর। সুন্দর প্রভাতে
সুন্দর সুবর্ণময়ী প্রকৃতির সাথে
কর আজি নব পরিচয়। হের আজি
শোভে বন উপবন নব সাজে সাজি;
নবীন বাসন্তী-রঙে নবীন আকাশে
ভাসে শান্ত মেঘতরী। প্রতি শাখে হাসে
ফুলকুল; পরিমল বহিছে মলয়;—
অঙ্গে অঙ্গে ধরিত্রীর যৌবন-উদয়।
বরষার বক্ষভেদী বিলাপের তান,
করুণ-ক্রন্দন-গীত আদি অবসান।
ওই শুন, চারিপাশে উল্লাসের সুর;
দোয়েল পাপিয়া পিক গাহিছে মধুর
অধীর উচ্ছ্বাসভরে। উঠে প্রতিধ্বনি
ভরিয়া কানন, কুঞ্জ, আকাশ, অবনী।

নিত্য হেন আর্ত্তরব, নিত্য হাহাকার
এত উৎসবের মাঝে সাজেনাক আর।
বেদনা যাতনা জ্বালা পাশরিয়া সব
আজিকে সফল কর বিশ্বের উৎসব;
জীবন-জনম-ব্যাপী অনন্ত রোদন
একান্ত আগ্রহ-ভরে করি সমাপন,
ক্ষুদ্র কণ্ঠখানি তব আনন্দে সাধিয়া
বিশ্বের সঙ্গীত-স্রোতে দাও মিশাইয়া।
দুঃখী একা তুমি নহ; এইরূপে, হায়,
সময়-সমুদ্র-তীরে—অসীম-বেলায়—
চরাচর কাঁদে চিরদিন; অতি দূর
অনাদি হইতে বাজে রোদনের সুর!
কোন্ কার্য্য বন্ধ তবু আছে এ জগতে?
কোন্ আনন্দের ছবি অনন্তের পথে
হ'য়ে গেছে পরিম্লান? হয়নাকি আর
বর্ষে বর্ষে বসুধায় বসন্ত-সঞ্চার?
প্রত্যহ ঝরিছে ফুল, তবু কিরে কম
কাননের হাসি? মরিতেছে বিহঙ্গম,
কুঞ্জের সঙ্গীত কভু আছে কি নীরব?—
সেই হাসি, সে উল্লাস, সেই শোভা সব?

রে অবোধ! দূর কর বৃথা এ বিলাপ,
আত্ম-অদৃষ্টের স্বরে আত্ম-অভিশাপ,—
নিষ্ঠুর তাড়না। এস তুমি পুনর্ব্বার
বাহিরিয়া পৃথিবীর প্রাঙ্গণ-মাঝার।
কর পুন প্রাণ পণ; দেখ অন্বেষিয়া
হৃদয়-ভূমিতে কোথা উঠেছে রুসিয়া
উৎসাহের কুশাঙ্কুর বরষার রসে;

কোথা সহিষ্ণুতা-রূপে মৃত্যুর পরশে
ফুটিয়াছে সুবর্ণের ফুল, ফলিয়াছে
তিতিক্ষার ফল। কোন্ শূন্যে উঠিয়াছে
পূর্ণপ্রেম-চন্দ্ররূপে পূর্ণ শশধর,—
সৌন্দর্য্যের কেন্দ্র সেই অসীম সুন্দর।
সেই ফুলফলে আজি হরষে সাজিয়া,
সে প্রেমসুন্দরে চাহি, এস বাহিরিয়া
জীবনের রণে; বীরবেশে অনুক্ষণ
অবিকল কীর্ত্তিরাশি করিয়া অর্জ্জন,
অখণ্ড মালিকাখানি দাও উপহার
অনন্তের পদে,—সর্ব্ব-আরাধনা-সার
অন্তিম অঞ্জলি।

আজি এই নিশাশেষে,
অসীমের শিষ্য তুমি, সাধকের বেশে,
যুক্ত-করে, জানু পাতি, ঊর্দ্ধ-আঁখিতার
পরম গুরুরে তব ডাক একবার।
বল,—"ওহে রাজ-রাজ! আজি শুভক্ষণে
পলাতক-ভৃত্যে তব পড়ে কি স্মরণে?
আর কি ক্ষমিয়া তারে করিবে প্রেরণ
জগতের কাজে? শক্তিহারা তনু মম
সর্ব্বশক্তিত্রয় করে ধরিয়া আবার,
করিবে কি অভিনব জীবনী-সঞ্চার?
সুখহীন, গৃহহীন কর্ম্মবিবর্জ্জিত
অভাজনে পুনর্ব্বার করিবে স্থাপিত
তোমার ঐশ্বর্য্যভরা মহারাজ্য-মাঝে?
যথা শোভে শত সাধ; যথায় বিরাজে
তোমার মূরতি আঁকা সহস্র মন্দির;
নিত্য বিশ্বহিতে রত, উৎসাহে অধীর
সংখ্যাতীত সৈনিক তোমার; সেই খানে,
স্বর্গমর্ত্ত্যজয়ী সেই সুখ-অধিষ্ঠানে
পদাশ্রয় দিবেনাকি দাসে? যে বাসনা
আজি তা'র বক্ষ'পরে করেছে রচনা
ইন্দ্রপুরীনিভ নব কীর্ত্তি-রঙ্গালয়,
সে কি ছায়াপুরী সম হইবে বিলয়?
তাই, যদি হে দেবতা, অদৃষ্ট তাহার,
এ বিপুল কর্ম্ম-ভূমে কর্ম্ম-প্রতিষ্ঠার
যোগ্য যদি নহে দাস, তবু অকিঞ্চন
শুধু বৈতালিক সম করিবে কীর্ত্তন
মঙ্গল মহিমা-গীত; অথবা দুয়ারে
দাঁড়াইয়া দৌবারিক রবে একধারে।
সে সম্পদ ধরিবে সে মাথায় তুলিয়া,
অতি সুপ্রসন্ন বলি লইবে ভাবিয়া
ভাগ্য তার, জন্ম তার, মানিবে সফল।
জিজ্ঞাসিবে যবে কেহ, হৃদয়ের তল
ধ্বনিত করিয়া তার উঠিবে বচন,—
"আমার রাজার সৈন্য কে করে গণন?
ক্ষুদ্র আমি, তবু আমি তা'রই একজন।"

শ্রীনিত্যকৃষ্ণ বসু।

ম্যাক্‌বেথ।

(১)

ডন্‌ক্যান স্কটলণ্ডের রাজা, ম্যাক্‌বেথ সেনাপতি। ম্যাক্‌বেথ রণকুশল বীর-পুরুষ, সুতরাং রাজার বিশেষ প্রিয়পাত্র;—পদ, প্রভুত্ব, সম্মান, তাঁহার কিছুরই অভাব ছিল না। সম্প্রতি এক দল বিদ্রোহী, নরওয়ে প্রদেশের সৈন্য-সাহায্যে, স্কটলণ্ড-রাজের অধিকার মধ্যে বিশেষ গোলযোগ উপস্থিত করিয়াছিল। ম্যাক্‌বেথ সেই বিদ্রোহীদিগকে দমন করিয়া যথেষ্ট খ্যাতি ও প্রতিপত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

ব্যাঙ্কো নামে স্কটলণ্ড-রাজের আরও একজন সেনাধ্যক্ষ ছিলেন। বিদ্রোহিগণকে দমন করিয়া ম্যাক্‌বেথ ও ব্যাঙ্কো অশ্বারোহণে এক প্রান্তরের উপর দিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন। সহসা দেখিলেন, স্ত্রী-আকৃতি, বীভৎসরূপা তিনটা অদ্ভুত জীব তাঁহাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান;—তাহারা ম্যাক্‌বেথ ও



ডাকিনীত্রয়ের সহিত ম্যাক্‌বেথ ও ব্যাঙ্কোর সাক্ষাৎ।

ব্যাঙ্কোর পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইল। সেই দীর্ঘ শীর্ণ অবয়ব, অদ্ভুত বেশ ভূষা ও বিকট আকৃতি দেখিলে, তাহাদিগকে এ পৃথিবীর কোন জীব বলিয়া মনে হয় না। আকার স্ত্রীলোকের মত, কিন্তু তাহাতে শ্মশ্রু বিরাজিত। ম্যাক্‌বেথ বিস্ময়ের সহিত তাহাদিগকে সম্বোধন করিলেন; কিন্তু ইহাতে তাহারা যেন কিছু বিরক্তির ভাব করিয়া তাহাদিগের বিকট অথচ ক্ষীণ আঙ্গুল গুলা আপন আপন মুখে তুলিল। তিন জনের মধ্যে যে অগ্রে ছিল, সেই সর্ব্বপ্রথমে ম্যাক্‌বেথকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "গ্লেমিসের অধিপতি ম্যাক্‌বেথের জয়!" ম্যাক্‌বেথ আপনাকে এই জীবদিগের দ্বারা এইরূপে অভিহিত হইতে দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। কিন্তু যখন সেই দ্বিতীয় মূর্ত্তি বলিল, "জয় কদর-ঈশ্বর ম্যাক্‌

বেথের জয়!" তখন ম্যাক্‌বেথের আর বিস্ময়ের সীমা রহিল না। কারণ, ম্যাক্‌বেথের কদর-অধিপতি হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। তার পর সেই তৃতীয় মূর্ত্তি আরও বিস্ময় উৎপাদন করিয়া বলিল,—

"জয় ম্যাক্‌বেথের জয়!
স্কটলণ্ডের রাজা হবে ম্যাক্‌বেথ নিশ্চয়!"

স্কটলণ্ডের অধিপতি ডন্‌ক্যান্ জীবিত, তাঁহার পুত্রগণও বর্ত্তমান;—সে সকল সত্ত্বেও ম্যাক্‌বেথ রাজা হইবেন, ম্যাক্‌বেথ কিছুতেই সে আশা করিতে পারেন না। সুতরাং তাহাদের মুখে এই ভবিষ্যদ্বাণী শুনিয়া ম্যাক্‌বেথ অধিকতর বিস্মিত হইলেন।

যখন ম্যাক্‌বেথ এইরূপ বিস্ময়ে অভিভূত, তখন ব্যাঙ্কো ডাকিনীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কে? তোমরা কি কল্পনা-সৃষ্টিত কোন জীব?—কি, যেমনই আকার দেখিতেছি, এমনই আকার ধারী অন্য কোন প্রাণী? আমার বন্ধুকে তোমরা "জয় জয়" রবে সংবর্দ্ধনা করিলে কেন? ভবিষ্যতে ইনি রাজা হইবেন, তাহাও ব্যক্ত করিলে! দেখ, তোমাদের কথায়, ইনি অভিভূত! কৈ, আমায় ত কিছু বলিলে না? আমার জন্য ভবিষ্যতে কি আছে, যদি জান, ত বল। কিন্তু আমি তোমাদের অনুগ্রহপ্রার্থী নহি।"

তখন তাহারা ব্যাঙ্কোকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল, "ম্যাক্‌বেথ হইতে তুমি ক্ষুদ্র, কিন্তু তবু বড়। ম্যাক্‌বেথের তুলনায় তুমি সমাক্ সুখী হইতে পারিবে না, কিন্তু অধিকতর সুখী হইবে। রাজা হইবে না, কিন্তু রাজার পিতা হইবে। জয় ব্যাঙ্কোর জয়! জয় ম্যাক্‌বেথ ও ব্যাঙ্কোর জয়!"

ব্যাঙ্কো তাহাদিগের এই হেঁয়ালীর অর্থ কিছুই বুঝিলেন না। বস্তুতই কথাগুলার মধ্যে দুইটা অর্থ ছিল।

ম্যাক্‌বেথ। আমি গ্লেমিসের অধিপতি তাহা জানি। কিন্তু কদরের অধিপতি,—ইহা তোমরা কিরূপে বলিলে? কদরের অধিপতি আজিও জীবিত;—কেমন করিয়া এ কথা বিশ্বাস করি? আর রাজ্যলাভ?—স্কটলণ্ডের রাজসিংহাসন? তাহাও অসম্ভব! এ প্রান্তরে দাঁড়াইয়া, এ ভবিষ্যদ্বাণী বলিয়া কেন আমাদের গতিরোধ কর!

কিন্তু আর কেহ কিছু বলিল না। সহসা সেই মূর্ত্তিত্রয় শূন্যে বিলীন হইয়া গেল।

তখন সেনাপতিদ্বয় বুঝিলেন যে, উহারা হয় দেবযোনি, নয় ডাকিনী।

ম্যাক্‌বেথ ও ব্যাঙ্কো এই অদ্ভুত বিষয়ের আলোচনা করিতে লাগিলেন।

ম্যাক্‌বেথ। যদি আর একটু অপেক্ষা করিত ত, ভাল হইত।

ব্যাঙ্কো। যাহা দেখিলাম, সত্য কি কল্পনা, অথবা কোন ঔষধপ্রভাবে আমাদের দুই জনেরই বুদ্ধি লোপ পাইয়াছে, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না!

ম্যাক্‌বেথ। তোমার সন্তানগণ রাজা হইবে!

ব্যাঙ্কো। তুমি রাজা হইবে!

ম্যাক্‌বেথ। আরও শুনিলে না?—কদরের অধিপতি!

এইরূপে যখন উভয়ে চিন্তামগ্ন, তখন স্কটলণ্ড-অধিপতির নিকট হইতে একজন দূত আসিয়া ম্যাক্‌বেথকে অভিবাদন করিল। ম্যাক্‌বেথের বীরত্বে রাজা এরূপ সন্তুষ্ট হইয়াছেন যে, তিনি দূতমুখে ধন্যবাদ পাঠাইয়া জানাইয়াছেন, "ম্যাক্‌বেথ আজি হইতে কদরের অধিপতি হইলেন!"

ম্যাক্‌বেথ সেই কথা শুনিলেন;—স্তম্ভিত ও বিস্মিত হইলেন।

ব্যাঙ্কো। একি! প্রেতে সত্য কথা কহিল!

ম্যাক্‌বেথ। কদরের অধিপতি আজিও জীবিত। তবে আমার প্রতি এ সম্মান কিরূপে প্রদত্ত হইল?

রাজদূত। কদর-ঈশ্বর বিদ্রোহীদিগের সহিত যোগ দিয়াছিলেন বলিয়া রাজা তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া সে রাজ্য আপনাকে অর্পণ করিয়াছেন।

ধীরে ধীরে ম্যাক্‌বেথের হৃদয়ে দুরাশার বীজ রোপিত হইল। তিনি মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "আমি গ্লেমিসের অধিপতি ছিলাম,—আজি হইতে আবার কদরেরও অধিপতি হইলাম।—কিন্তু সে উচ্চতর সম্মান এখনও বাকী! তাহাও কি এইরূপ সত্য হইবে? (ব্যাঙ্কোর প্রতি) ব্যাঙ্কো, তোমার কি বিশ্বাস হয় না যে, তোমার বংশধরগণ রাজা হইবে?"

ব্যাঙ্কো। থাক্,—সে কথায় বিশ্বাস করিয়া কাজ নাই। সে কথায় বিশ্বাস করিলে রাজ্যলাভের জন্য আমাদিগকে উত্তেজিত করিবে। শুনিয়াছি, নরকের জীব, দুই একটা সত্য কথা বলে বটে! কিন্তু তাহাতে দুর্ব্বল মানব-মন, প্রলোভনে ভুলিয়া পাপপথে অগ্রসর হয়; শেষে সকল আশা-ভরসা লোপ পাইয়া থাকে,—অধিকন্তু অশেষ নিগ্রহ-ভোগ করিতে হয়।

কিন্তু ডাকিনীগণের সেই ভবিষ্যদ্বাণী ধীরে ধীরে ম্যাক্‌বেথের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইতেছিল। ব্যাঙ্কোর সতর্কতায় তাঁহার আর মনোযোগ দিবার অবসর রহিল না। কেমন করিয়া স্কটলণ্ডের অধিপতি হইতে পারিবেন, সেই চিন্তায় তাঁহার হৃদয় আলোড়িত হইতে লাগিল। ধীরে ধীরে ম্যাক্‌বেথের হৃদয়ে বড় একটা ভীষণ ঝড় উঠিতেছিল। ধীরে ধীরে হত্যার কল্পনা মনে জাগিল। মুহূর্ত্তের জন্য ম্যাক্‌বেথ শিহরিলেন। কিন্তু মুহূর্ত্তের মধ্যে সে ভাব বিদূরিত হইল। বর্ত্তমানে দৃষ্টিশূন্য হইয়া ম্যাক্‌বেথ সুদূর ভবিষ্যতের ছবি মানস চক্ষে প্রত্যক্ষবৎ দেখিতে লাগিলেন।

সেই ভাবে ম্যাক্‌বেথ ও ব্যাঙ্কো স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন।

ডাকিনীগণ ম্যাক্‌বেথকে দেখিবার অগ্রে বিকট ও বীভৎস আনন্দে নৃত্যগীত করিতেছিল এবং ম্যাক্‌বেথের সর্ব্বনাশ-সাধনের জন্য, মায়াজাল বিস্তার করিয়া গায়িতে গায়িতে চলিয়াছিল,—

"সুন্দরকে মন্দ দেখি মন্দকে সুন্দর।
বদ্ হাওয়া কুয়া দিয়া ফিরি নিরন্তর॥" *

সেই "বদ্ হাওয়া" ম্যাক্‌বেথকে স্পর্শ করিল।

সেই হইতেই ম্যাক্‌বেথ-জীবনের অতি ভীষণ নাটকের অতি ভীষণ অভিনয় আরম্ভ হইল।

(২)

ম্যাক্‌বেথ রাজ-সমীপে উপস্থিত হইলে রাজা তাঁহাকে যথেষ্ট অভ্যর্থনা করিলেন; বহুবিধ প্রশংসাবাক্যে তাঁহাকে সম্মানিত করিলেন। ম্যাক্‌বেথের প্রতি আপনার ঐকান্তিক অনুরাগ প্রদর্শন করিতে অভিলাষী হইয়া তিনি বলিলেন, "ম্যাক্‌বেথ! তুমি আজি যে বীরত্বের পরিচয় দিয়াছ, তাহাতে আমি বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। দেখ, তোমায় আমি অতি যত্নে পালন করিয়াছি এবং যাহাতে তুমি দিন দিন সুন্দর বৃক্ষের ন্যায় বর্দ্ধিত হও, সেজন্য আমার যত্নের কখন ত্রুটী হইবে না। আর ব্যাঙ্কো! বীরত্বে তুমিও কিছু কম নহ; এস, তোমাকে হৃদয়ে ধারণ করি। ম্যাক্‌বেথ! তোমার নিকট অধিকতর ঋণী হইব বলিয়া

* শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার লিখিত ম্যাক্‌বেথের সমালোচনা।—নবজীবন।

আজি আমি তোমার গৃহে অতিথি হইতে সঙ্কল্প করিয়াছি।”

ম্যাক্‌বেথ। মহারাজ! এ সৌভাগ্য আমার আশাতীত। আমি স্বয়ং যাইয়া আমার প্রিয়তমা পত্নীর নিকট এ শুভ সংবাদ দিব। এখন বিদায় প্রার্থনা করি।

ম্যাক্‌বেথ ভাবিতে ভাবিতে চলিলেন, “এক ভবিষ্যৎ বাণী পূর্ণ হইয়াছে, তার পর—রাজ্য-লাভ; মধ্যে কিন্তু মহাবাধা। এ বাধা অতিক্রম করিতে হইবে! কে জানে, হয়ত বা পতন হইবে! অন্তরে যে বাসনা জাগিতেছে, হে নক্ষত্রমণ্ডলি! আলোক নিবাও, সে দৃশ্য তোমরা দেখিও না। চক্ষু যেন হৃদ্যের সে ভীষণ ক্রিয়া দেখিতে না পায়! চক্ষু মুদ্রিত থাক্।”

---

(৩)

রণজয়ের পর, ম্যাক্‌বেথ তাঁহার প্রিয়তমা পত্নী লেডী ম্যাক্‌বেথকে এক খানি পত্র লিখিয়াছিলেন। সে পত্রের মর্ম্ম এইরূপ;—“জয়লাভের পর ব্যাঙ্কো ও আমি এক প্রান্তরের উপর দিয়া আসিতেছিলাম, হঠাৎ অদ্ভুত স্ত্রী-মূর্ত্তি তিনটী দেবযোনিকে দেখিতে পাই। তাহাদিগকে দেখিয়া আমরা বিস্ময়ে মগ্ন হইলাম। একজন আমাকে ‘কদর পতি’ বলিয়া সম্ভাষণ করিল। আর একজন বলিল, “স্কটলণ্ডের আমিই ভাবী রাজা!” পরক্ষণেই দেখি, তাহারা শূন্যে মিশাইল। পথে রাজার দূতমুখে শুনিলাম, সত্যই আমি কদর-পতি হইয়াছি। এক ভবিষ্যৎবাণী পূর্ণ হইল, অন্য আশা সত্য কিনা, কে জানে! তুমি আমার উচ্চ পদের সঙ্গিনী; এ সংবাদ তোমায় দেওয়া উচিত। আমার আনন্দে তোমার যে আনন্দ, তাহাতে, তোমায় কেন বঞ্চিত করিব? যাহা লিখিলাম, তাহা এখন গোপন রাখিও।”

স্থান—ম্যাকবেথের শিবির-কক্ষ। সেই শিবির-কক্ষে লেডী ম্যাকবেথ বার বার স্বামীর এই পত্র পড়িতেছেন, আর মনে মনে বলিতেছেন, “স্বামিন্! এত দিন গ্লেমিসের অধিপতি ছিলে, আজি কদরপতিও হইলে! তোমার আশা আছে, উৎসাহ আছে, উচ্চপদলাভে বাসনাও আছে! কিন্তু তবু আমি তোমার স্বভাবকে সন্দেহ করি। পাপাচরণ ভিন্ন এ অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে না; অথচ তাহাতে তুমি বীতস্পৃহ। প্রতারণাকে তুমি ঘৃণা কর; অথচ রাজ্যলালসা প্রবলা! শীঘ্র তুমি এস, আমার উৎসাহ-অনল তোমার হৃদয়ে দিয়া তোমায় কর্ত্তব্য-পথে অগ্রসর করি!”

লেডী ম্যাক্‌বেথ অত্যন্ত কঠিন-হৃদয়া, ধন-লুব্ধা ও দুরাকাঙ্ক্ষা-পরায়ণা রমণী। কার্য্যসাধনের পথ, পাপে বা অত্যাচারে পরিপূর্ণ থাক্, সে তাহা গ্রাহ্য করে না। স্বামীর উচ্চপদ-লাভের সংবাদ পাইয়া অবধি, কি উপায়ে স্কটলণ্ডের রাজ-সিংহাসন লাভ হয়, সে, তাহাই ভাবিতে লাগিল। যখন দূত-মুখে শুনিল যে, রাজা তাঁহাদের গৃহে অতিথি হইবেন, তখন আর তাহার আনন্দের অবধি রহিল না,—পুলকিত-অন্তরে ভাবিতে লাগিল, “অদ্য এ গৃহে রাজা অতিথি হইবেন!—নরকের প্রেত আয় তোরা, রমণী হৃদয়ের কোমলতা কাড়িয়া নে! প্রস্তর-কঠিনতায় এ হৃদয় আবৃত করিয়া দে! হৃদয়ের দ্বার বন্ধ থাক্ যে অবধি কার্য্যের অবসান না হয়, করুণা আসিয়া যেন এ উদ্দেশ্য-সাধনে বিচলিত না করে। পাপ-উত্তেজনা করিতে, ভীষণ হত্যায় মন মাতাইতে, যে কেহ পার, এস! এ রমণী-হৃদয়, উত্তেজনায় পূর্ণ করিয়া, ভীষণ করিয়া দাও! এ পয়োধরে বিষ ঢালিয়া দাও! ঘোর অন্ধকার, নরকের ধূমে শরীর ঢাকিয়া এস! নির্ম্মল গগন, সে আঁধার ভেদ করিয়া সুতীক্ষ্ণ আসর আঘাত যেন দেখিতে না পায়!”

যথা সময়ে ম্যাক্‌বেথ গৃহে উপস্থিত হইলেন। তখন স্বামী-স্ত্রীতে মিলিয়া সেই পাপ বিষয়েরই আলোচনা করিতে বসিলেন।

ম্যাক্‌বেথ। প্রিয়তমে! অবশ্যই শুনিয়া থাকিবে, আজি মহারাজ আমাদের গৃহে অতিথি হইবেন।

লেডী ম্যাক্‌বেথ। কবে আবার ফিরিয়া যাইবেন?

ম্যাক্‌বেথ। শুনিতেছি, কল্যই ফিরিবেন।

লেডী ম্যাক্‌বেথ। সে কল্য কখন আসিবে না! দেখ, তোমার ও-সরল মুখচ্ছায়া, দর্পণে প্রতিবিম্বের ন্যায়;—লোকে তোমার হৃদয়ের ভাব সহজেই বুঝিতে পারে।—উহা আবরণে ঢাকিয়া ফেল! পবিত্র কুসুমের ন্যায় সরলতা দেখাও; কিন্তু কুসুমের কীটের ন্যায় হৃদয়ের মাঝে সর্প লুকাইয়া রাখ! কিসের ভয়? তুমি কি বুঝিতেছ না, রাজাকে হত্যা করা ভিন্ন অভীষ্ট-সিদ্ধি হইবে না? আমার উপর সকল ভার দাও, তুমি অভ্যর্থনার জন্য ব্যস্ত থাক; কিন্তু সাবধান, মলিন-বিষণ্ণ-মুখে থাকিও না! ভয়ের লক্ষণ যেন প্রকাশ পায় না!

আগুনে ইন্ধন পড়িল।

---

(৪)

উদার-হৃদয় স্কটলণ্ড-রাজ আপন স্বভাবগুণে, সম্ভ্রান্ত ও উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিগণের সহিত সর্ব্বদা দেখা-সাক্ষাৎ করিতেন। এক্ষণে ম্যাক্‌বেথকে অধিকতর সম্মানিত ও আপ্যায়িত করিবার জন্য তাঁহার দুই পুত্র ম্যাকম্ ও ডোনালবেনের সহিত বহুসংখ্যক গণ্য মান্য সভাসদ-সমভিব্যাহারে ম্যাক্‌বেথের গৃহে অতিথি হইলেন।

ম্যাক্‌বেথের পুরী বড় সুন্দর। সুগন্ধের সহিত নির্ম্মল বাতাস, গৃহের চারিদিকে মৃদুমন্দ সঞ্চালিত হইতেছে। গৃহের দেওয়ালে ও স্তম্ভশিখরে বিহঙ্গমগণ সুবিধামত কুলায় বাঁধিয়াছে। যে স্থানে যেমন পক্ষিগণ বিরাজ করে, বুঝা যায়, যেন চিরদিনই সেখানে সুমধুর বসন্তানিল বহিতে থাকে। সেই প্রাসাদ অবলোকন করিয়া, রাজা বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন এবং লেডী ম্যাক্‌বেথের সাদর-অভ্যর্থনায় অধিকতর প্রীতিলাভ করিলেন। লেডী ম্যাক্‌বেথের সেই সহাস্য বদন দেখিয়া কে বুঝিবে, সে হাসির মাঝে কি বিষের ছুরি লুকান, আছে! কে বুঝিবে, সে হৃদয়ে ফুল-কুসুমরূপে কি ভীষণ বিষধর বিরাজ করিতেছে!

লেডী ম্যাক্‌বেথ কহিলেন, “মহারাজ! আপনার আগমনে এ পুরী আজি পবিত্র ও গৌরবান্বিত হইল! আপনার যথোচিত সেবা করি, সে সামর্থ্য আমাদের কৈ? এখন যাহা কিছু করিব, যদি ইহার দ্বিগুণও করিতে পারিতাম, তাহা হইলেও, মহারাজ! আপনার দয়ার নিকট তাহা অতি তুচ্ছ হইত।”

এরূপ বিনীত-সৌজন্যে ডন্‌ক্যান অতিশয় প্রীত হইলেন এবং বলিলেন, “আপনার স্বামী কোথায় গেলেন? চলুন, তাঁহার নিকট যাই। আমি তাঁহাকে বড় ভালবাসি। আমার স্নেহ তাঁহার প্রতি চিরদিন সমান থাকিবে, জানিবেন।”

---

(৫)

এদিকে, দুর্গের এক নিভৃত প্রকোষ্ঠে বসিয়া, ম্যাক্‌বেথ গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। ডন্‌ক্যান অতি উদার-প্রকৃতি, দয়ালু,—বিশেষতঃ ম্যাক্‌বেথের প্রতি তিনি অধিকতর স্নেহবান্। একে রাজা, তায় নিতান্ত আত্মীয়ের ন্যায় স্নেহব্যবহার, তার উপর অতিথি;—তাঁহার বিরুদ্ধে

অস্ত্রধারণে! মহাপাপ!—ম্যাক্‌বেথ শিহরিলেন!

আবার সেই প্রান্তরের সেই ছবি চক্ষের সম্মুখে প্রকটিত হইল। ম্যাক্‌বেথ ভাবিতেছেন;—"বড়ই ভীষণ ব্যাপার! হায়, শীঘ্রই যদি ইহার সমাধান হইতে পারে,—এই হত্যা যদি পরিণাম ডুবাইয়া দিয়া আকাঙ্ক্ষা মিটাইতে পারে, তাহা হইলে কোন ভাবনা থাকিবে না! তাহা হইলে পরলোকের জন্য আর কিছু ভাবি না!—কিন্তু তাহা হইবার নয়;—বিচারে দণ্ডভোগ করিতেই হইবে! এই যে হত্যাকাণ্ড আজি ঘটিতে চলিল, না জানি, ইহার পরিণাম কি ভীষণ! বিধাতার অপক্ষপাত বিচারের কাছে ইহার দণ্ড পাইতেই হইবে! মহামতি ডন্‌ক্যান আমার প্রভু, আমি তাঁহার ভৃত্য;—হত্যা? নিতান্তই অন্যায়, গর্হিত এবং ধর্ম্ম-বিগর্হিত কার্য্য! তারপর, তিনি অতিথি! কেহ তাঁহার হত্যাকারী আসিলে তাহার বিরুদ্ধে আমিই দ্বার রুদ্ধ রাখিব,—ইহাই নিয়ম। তার পর, ডন্‌ক্যান নির্ম্মল ও উদার-চরিত্রে অতি সদাশয়;—তাঁহাকে হত্যা? ধর্ম্মে সহিবে না! বাতাসে বাতাসে সে হত্যাকাহিনী ঘরে ঘরে ফিরিবে! যে কেহ শুনিবে, তাহারই হৃদয়ে করুণার উৎস ছুটিবে! দেবগণ এ ভীষণ-কাহিনী ভীষণরূপে আন্দোলন করিবেন,—তুমুল ঝটিকা উঠিবে,—মানবের চক্ষে অজস্র জলধারা প্রবাহিত হইতে থাকিবে!—না, তবে থাক্! দুরাকাঙ্ক্ষা আমায় মাতাইয়া তুলিয়াছে,—আর অন্য উত্তেজনা নাই। উচ্চাসনে উঠিতে আশা!—প্রাণ উঠিতে চাহে, কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়া যায়!"

ম্যাক্‌বেথের হৃদয়ে যখন এইরূপ সংগ্রাম চলিতেছিল, সেই সময় সাক্ষাৎ পাপরূপিণী লেডী ম্যাক্‌বেথ সেখানে আবির্ভূত হইল। বলিল, "তুমি কেন চলিয়া আসিলে? রাজা তোমার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন; তাঁহার ভোজন শেষ হইয়াছে;—তুমি এখানে বসিয়া কি ভাবিতেছ?"

ম্যাক্‌বেথ। এ কার্য্যে আর অগ্রসর হইব না! দেখ, সম্প্রতি তিনি আমায় যথেষ্ট সম্মানিত করিয়াছেন। প্রজাবৃন্দ এখনও আমার সুযশ গাহিতেছে।—এত শীঘ্র তাহা নষ্ট করিব না।

লেডী ম্যাক্‌বেথ। যে আশায় এমন কার্য্যে অগ্রসর হইতেছিলে, সে কি তবে মদকের নেশা? এখন বুঝি সে নেশা ছুটিয়াছে? এখন বুঝি, বুঝিতেছ এবং তাই এমন সভয়-দৃষ্টিতে চাহিতেছ? বুঝিলাম, আমার প্রতি তোমার যে প্রেম, তাহাও এইরূপ! হায়, এক্ষণে তুমি স্বীয় অভীষ্ট পূর্ণ করিতে এমন ভীরু হইলে? তুমি কি মনে কর, জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অলঙ্কারস্বরূপ এ সিংহাসন-লাভ অল্পে অল্পে হইবে? তোমার সাধ আছে, সাহস নাই। বিড়াল যেমন মৎস্যপ্রার্থী হইয়াও জলে নামিতে ভয় পায়, তুমিও কি সেইরূপ নও?

ম্যাক্‌বেথ। চুপ কর। আমি মিনতি করি, ক্ষান্ত হও! মনুষ্যের উচিত কার্য্যে ম্যাক্‌বেথ পশ্চাৎপদ নহে!

লেডী ম্যাক্‌। কোন্ পশু তবে এ লালসা আমার নিকট ব্যক্ত করিয়াছিল? এই কঠিন ব্রত সাধন করিতে যখন হৃদয়ে স্থান দিয়াছিলে, তখনই তুমি মানব-নামের যোগ্য ছিলে! এখন সে আকাঙ্ক্ষা কার্য্যে পরিণত কর, তাহাতেই তোমার পুরুষার্থ! সময় ও সুযোগ তখন খুঁজিয়াছিলে, এখন তাহা আপনা হইতেই মিলিয়াছে;—এখন কিনা তুমি সাহসহীন ও একান্ত ভীরু! দেখ, আমি সযত্নে শিশুকে স্তন্য পান করাইয়াছি, তাহাকে কত স্নেহ করি, কত ভালবাসি,—আমার মুখের পানে চাহিয়া যখন সে সুমধুর হাসি হাসিয়া থাকে, তাহার সে হাসিমুখ দেখিতে দেখিতে, তাহার দন্তহীন মুখ হইতে স্তন ছিনাইয়া লইয়া অনায়াসে আছাড়িয়া তাহার মস্তক চূর্ণ করিতে পারি!—তোমার ন্যায় যদি প্রতিজ্ঞা করি, তবে এমন কার্য্য-সাধনেও আমি বিচলিত হই না!

ম্যাক্‌বেথ। আচ্ছা, তাই যেন হইল,—কিন্তু যদি বিফল হই?

লেডী ম্যাক্‌। বিফল?—সাহসে বুক বাঁধ—কখনই বিফল হইবে না! রাজা পথ-শ্রান্ত,—শীঘ্রই ঘুমাইয়া পড়িবেন। যে দুইজন রক্ষক তাঁহার গৃহে থাকিবে, মদ্যপান করাইয়া তাহাদিগকে এমন উন্মত্ত রাখিব যে, তাহারা মৃতপ্রায় পড়িয়া থাকিবে,—কিছুই দেখিবে না, কিছুই বুঝিবে না। বল দেখি, তখন কোন্ কার্য্য না করা যায়? সেই ভৃত্যদ্বয়ের উপরেই তখন হত্যার ভার চাপাইতে পারিবে!

ম্যাক্‌বেথ। কি কঠিন তুমি! দেখ সেই ভৃত্যদ্বয়কে রক্তাক্ত করিয়া রাখিলে লোকে কি বুঝিবে যে, তাহারাই তাহা করিয়াছে?

লেডী ম্যাক্‌। কে তাহা অবিশ্বাস করিবে? আমরা আবার রাজার শোকে এমন ক্রন্দনের রোল তুলিব যে, কেহ কিছুই বুঝিবে না!

ম্যাক্‌বেথ। (একটু ভাবিয়া) তবে তাহাই স্থির! আমি এ কার্য্যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলাম। তবে তুমি যাও। বাহিরে সৌজন্যের ভাণ করিয়া, অন্তরে যাহা লুকাইয়া আছে, অন্তরে তাহা রাখিও!

নরকের আগুন জ্বলিতে আরম্ভ হইল।

---

(৬)

স্কটলণ্ড-রাজ ডন্‌ক্যান পথশ্রান্তিহেতু শীঘ্রই নিদ্রাভিভূত হইলেন। তাঁহার গৃহের রক্ষকদ্বয়ও লেডী ম্যাক্‌বেথ-প্রদত্ত ঔষধ-মিশ্রিত সুরা-

সেবনে অচেতন হইয়া পড়িল। ম্যাক্‌বেথ রাজাকে হত্যা করিবার জন্য উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তে সেই ভীষণ মুহূর্ত্তের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

তখন লেডী ম্যাক্‌বেথের মনে সন্দেহ হইতেছিল,—"হত্যার জন্য স্বামীকে উত্তেজিত করিয়াছি বটে, কিন্তু কি জানি কি হয়! স্বামীর লালসা বাড়িয়াছে, তাহা নিশ্চয়। কিন্তু তিনি নিতান্তই ভীরু ও সন্দিগ্ধচিত্ত; তাঁহা দ্বারা একার্য্য সমাধা হওয়া নিতান্তই অসম্ভব বলিয়া মনে হইতেছে। সেইজন্য মনে করিয়াছিলাম, আমিই এই কার্য্য সাধন করিব। হৃদয়ও দৃঢ় করিয়াছিলাম।—রমণীহৃদয়ের কোমলতা দূর করিয়া এই ভীষণ কার্য্য সাধন করিতে অগ্রসরও হইয়াছিলাম। কিন্তু কে জানিত, সেই নিদ্রিত নৃপতিকে আমার পিতার ন্যায় দেখিতে হইবে! তাই শিহরিয়া উঠিলাম! নহিলে কি এ কার্য্যের জন্য আমার স্বামীর মুখ চাহিতাম?"

এদিকে ম্যাক্‌বেথ রাজ হত্যার জন্য মন দৃঢ় করিয়া যখন ভাবিতেছেন তখন তিনি সহসা দেখিলেন, সম্মুখে যেন একখানি তীক্ষ্ণধার অসি ঝলমল করিতেছে! ম্যাক্‌বেথ বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন,—"এ কি দেখিতেছি? এ তরবারি কোথা হইতে আসিল? আমি হস্তে ধারণ করিতে পারি, ঠিক এমনই অবস্থায় অসি ঝুলিতেছে!—এস, তোমায় ধারণ করি! একি বিভীষিকা! চক্ষে যেমন দেখিতেছি, হস্ত তেমন স্পর্শ করিতে পারি কৈ? একি তবে আমার উত্তপ্ত মস্তিষ্কের একটা মহাবিকার? তবু তোমায় দেখিতেছি! আমার হস্তে যে অসি রহিয়াছে, তোমায়ও ত ঠিক ইহার প্রতিরূপ দেখিতেছি! এই নয়ন কি তবে প্রতারিত হইল? তবে যাহা দেখিতেছি, তুমি কি তাহা নও? এখনও দেখিতেছি! একি! এই আবার দেখিতেছি,—এই অসি শোণিতে সিক্ত! না, আর কিছুই ভ্রম নয়,—সকলই বুঝিতেছি। ঘোরা রজনী,—



ম্যাক্‌বেথ কর্ত্তৃক রাজ-হত্যা।

অর্দ্ধ জগৎ মৃতবৎ প্রতীয়মান হইতেছে,—ভীষণ স্বপ্নে কাহারও চিত্ত এখন আন্দোলিত। শ্মশানে প্রেতগণ আনন্দে নৃত্য করে;—হত্যাকারী ধীরপদে হত্যায় প্রবৃত্ত,—অতি ভয়ঙ্কর সময়! কঠিন পৃথিবী, নীরবে পড়িয়া থাক,—ম্যাক্‌বেথের এ পদশব্দ শুনিও না! প্রস্তরখণ্ডও যেন, আমি কোথায় চলিয়াছি, তাহা না জিজ্ঞাসা করে! (নেপথ্যে ঘণ্টাধ্বনি) আর না,—আর না, বৃথা বাক্যে আর কালক্ষেপ করিব না। ডন্‌ক্যান এখনও জীবিত!"

সেই অবস্থায় মহাপাপ ম্যাক্‌বেথ ডন্‌ক্যানের শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিল এবং সেই সদাশয়, প্রজা-বৎসল, রাজাধিরাজ, প্রভু ও নিদ্রিত অতিথিকে হত্যা করিল! সে হত্যা অতি ভীষণ!—ম্যাক্‌বেথ হইতেও ভীষণ!—সেই ভীষণ রজনী হইতেও ভীষণ!

মুহূর্ত্তের জন্য হত্যাকারীর প্রাণ শিহরিল!

---

(৭)

হত্যার পর ম্যাক্‌বেথ মহাপাপিনী পত্নীর সহিত সাক্ষাৎ করিল। বলিল, "কার্য্য সমাধান! তুমি কি কোন শব্দ শুনিতে পাইয়াছ?"

লেডী ম্যাক্। পেচকের শব্দ, আর ঝিল্লীর রব, ইহাই শুনিয়াছি। তুমি কি কোন কথা কহিয়াছিলে?

ম্যাক্। কখন?

লেডী ম্যাক্। যখন তুমি ফিরিতেছিলে?

ম্যাক্। এই দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠে কে শয়ন করিয়া আছে?

লেডী ম্যাক্‌বেথ। রাজকুমার ডোনাল্‌বেন্।

ম্যাক্। ওঃ! কি দুঃখের দৃশ্য! কি কাজই করিলাম!

লেডী ম্যাক্। দুঃখের দৃশ্য কিরূপ? এমন নির্ব্বোধের ন্যায় কথা কহিও না!

ম্যাক্। যখন হত্যা করিলাম, অনুচর-দ্বয়ের মধ্যে একজন ঘুমাইতে ঘুমাইতে হাসিয়া উঠিল, আর একজন বলিল, 'হত্যা'! দুইজনে জাগিল, আমি দাঁড়াইয়া দেখিলাম! তার পর তখনই আবার ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়া উভয়েই ঘুমাইয়া পড়িল!

লেডী ম্যাক্। এক কক্ষে দুইজন আছে।

ম্যাক্। একজন বলিল, 'ভগবান্ রক্ষা কর!' আর একজন বলিল, 'শান্তি হউক!' বুঝি তাহারা হত্যাকারী ম্যাক্‌বেথের রক্ত-কলুষিত হস্ত দেখিয়াছিল! তাহাদিগের সে উক্তি শুনিয়া কৈ, আমি ত 'শান্তি' উচ্চারণ করিতে পারিলাম না!

লেডী ম্যাক্। এ চিন্তা মনে স্থান দিও না।

ম্যাক্। কিন্তু 'শান্তি' এ কথা কেন মুখে আনিতে পারিলাম না? ভগবানের দয়া এখন আমার অধিক প্রয়োজন। 'শান্তি' মুখে আনিতে যেন কণ্ঠরোধ হইল! কেন এমন হইল?

লেডী ম্যাক্। এমন করিয়া এ দুশ্চিন্তা হৃদয়ে বহন করিও না। ইহাতে উন্মত্ততা আসিবে!

ম্যাক্। আমার মনে হইল, যেন শুনিতে পাইলাম, কে বলিতেছে, 'আর ঘুমাইও না, ম্যাক্‌বেথ নিদ্রানাশ করিল!'

লেডী ম্যাক্। একি! এ সব ভাবনা কেন ভাবিতেছ?

ম্যাক্। তবু যেন শুনিলাম, কে বলিতেছে, 'আর ঘুমাইও না! ম্যাক্‌বেথ সুখের নিদ্রা নাশ করিল! ম্যাক্‌বেথের আর কখন নিদ্রা হইবে না,—ম্যাক্‌বেথেরও নিদ্রানাশ হইবে!

লেডী ম্যাক্। এমন চীৎকার কে করিল? একি! তুমি বীর,—হৃদয় এমন দুর্ব্বল করিও না। এ সকল চিন্তায় হৃদয় উন্মত্ত করিও না। রক্তে হস্ত দূষিত, জলে ধৌত করিয়া ফেল। এ অস্ত্র কেন লইয়া আসিলে? এ অস্ত্র সেখানে থাকিবে। যাও, রাজার সেই অনুচর-দ্বয়ের দেহ রক্তাক্ত করিয়া রাখিয়া এস।

ম্যাক্। আমি আর যাইতে পারিব না। যাহা করিয়াছি, তাহার চিন্তায় আমি ভীত! পুনর্ব্বার তাহা দেখিবার সাধ্য আমার নাই।

লেডী ম্যাক্। ধিক্ তোমায়! এই তোমার প্রতিজ্ঞা? যে নিদ্রিত এবং মৃত, সে ত পটে-আঁকা ছবির ন্যায়! বালকের আঁখিই তাহাতে ভীত হয়!—দাও, ও-অস্ত্র আমাকেই দাও! আমিই এখনি গিয়া সেই ভৃত্যদ্বয়ের শরীর রক্তাক্ত করিয়া আসি। লোকে বুঝিবে, তাহারাই রাজহত্যা করিয়াছে।

তখন লেডী ম্যাক্‌বেথ সেই রক্তাক্ত অসি হস্তে হত ডন্‌ক্যানের সেই প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া সঙ্কল্প সিদ্ধ করিল।

ফিরিয়া আসিয়া স্বামীকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "এই দেখ, আমারও হস্ত তোমার ন্যায় রক্তাক্ত হইয়াছে! কিন্তু তুমি যেমন ভীত, আমার অন্তর তেমন নহে। চল, এক্ষণে এই হস্ত ধুইয়া ফেলি। দেখ, এ কার্য্য কত সহজ! চল, এক্ষণে শয়ন করা যাক্। কেহ না জানিতে

পারে যে, আমরা এখনও জাগিয়া আছি।—চিন্তামগ্ন হইও না।"

তখন ম্যাক্‌বেথ ও লেডী ম্যাক্‌বেথ শয়নাগারে প্রবেশ করিল।

---

(৮)

পরদিন প্রাতে হত্যাকাণ্ড প্রকাশ পাইল। ম্যাক্‌বেথ ও লেডী ম্যাক্‌বেথ কপট প্রভুভক্তি দেখাইয়া মুক্তকণ্ঠে শোকপ্রকাশ করিতে লাগিল। রাজার শয়নাগারের ভৃত্যদ্বয়ের উপর হত্যাপরাধ সম্পূর্ণরূপে আরোপ করিয়া ম্যাক্‌বেথ তাহাদিগকে বিনাশ করিল তাহাতেও কিন্তু লোকে ভুলিল না। কি জানি, ম্যাক্‌বেথের উপরেই সকলেরই একটা সন্দেহ জন্মিল। কেননা, সে নিরীহ ভৃত্যদ্বয়ের অপেক্ষা রাজহত্যা বিষয়ে ম্যাক্‌বেথেরই দুষ্প্রবৃত্তির সম্ভাবনা অধিক। ডন্‌ক্যানের দুই পুত্র ম্যালকম ও ডোনালবেন ম্যাক্‌বেথের গৃহ হইতে তৎক্ষণাৎ পলায়ন করিলেন। ম্যালকম ইংলণ্ডের শরণার্থী হইলেন এবং ডোনালবেন আয়র্লণ্ডে প্রস্থান করিলেন।

রাজার পুত্রদ্বয় এইরূপে পলায়ন করিলে ম্যাক্‌বেথ সেই শূন্য সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন। এইরূপে সেই ডাকিনীগণের ভবিষ্যদ্বাণী সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ হইল।

ম্যাক্‌বেথ এইরূপ উচ্চপদ প্রাপ্ত হইলেও হৃদয়ে শান্তি পাইলেন না। তিনি সর্ব্বদাই এইরূপ ভাবিয়া থাকেন, "সেই ডাকিনীগণের ভবিষ্যদ্বাণী আমার পক্ষে সত্য হইল, কিন্তু তার পর? তার পর এ রাজ্য আর আমার থাকিবে না, ব্যাঙ্কোর বংশধরগণ এরাজ্যের অধীশ্বর হইবে।"

লেডী ম্যাক্‌বেথেরও সেই চিন্তা। ম্যাক্‌বেথ ভাবিতেছেন, "বৃথা রাজহত্যা করিয়া এ নিষ্ফল মুকুট মস্তকে ধারণ করিলাম! ব্যাঙ্কোর পুত্রদিগের জন্য এই মন এতই কলুষিত করিলাম! ব্যাঙ্কোর বংশধরগণের জন্যই তেমন সদাশয় মহামতি রাজাকে হত্যা করিলাম! না, তাহা কখনই হইতে দিব না। ভাগ্য যদি প্রতিকূল, তথাপি তাহার সহিত সংগ্রাম আমার পণ!"

ভাবিতে ভাবিতে ভাবনা এতদূর বাড়িল যে, ম্যাক্‌বেথ মনে মনে কহিল,—"ব্যাঙ্কো ও তাহার পুত্রগণকে হত্যা করিতে না পারিলে এ রাজ্যভোগে শান্তি আর মিলিবে না।"

তখন এক বিরাট ভোজের আয়োজন হইল!

---

(৯)

ম্যাক্‌বেথ ও লেডী ম্যাক্‌বেথ এই রাত্রে মহাভোজের আয়োজন করিল। সেই ভোজে সম্ভ্রান্ত সকল ব্যক্তিই নিমন্ত্রিত হইলেন। ব্যাঙ্কো ও তদীয় পুত্রগণও আহূত হইলেন। যে পথ দিয়া ব্যাঙ্কো ও তাঁহার পুত্র ফ্লিয়েন্সকে আসিতে হইবে, সেই পথে ম্যাক্‌বেথ দুই জন ঘাতক নিযুক্ত করিয়া রাখিল। পিতা-পুত্রে যখন সেই পথে আসিতেছেন, হত্যাকারিগণ সহসা ব্যাঙ্কোকে হত্যা করিল। ব্যাঙ্কোর পুত্র পশ্চাৎ আসিতেছিলেন; পিতাকে আক্রান্ত হইতে দেখিয়া তিনি পলায়ন করিলেন। ব্যাঙ্কোর এই পুত্র হইতেই স্কটলণ্ডের ভবিষ্যৎ রাজবংশের সৃষ্টি হয় এবং পরে পুরুষানুক্রমে তাঁহারাই স্কটলণ্ডের সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। এই রাজবংশের শেষ রাজা স্কটলণ্ডের ষষ্ঠ জেম্‌স। তিনি প্রথম জেম্‌স নামে অভিহিত হইয়া ইংলণ্ডের সিংহাসন অধিকার পূর্ব্বক ইংলণ্ড ও স্কটলণ্ড একই সাম্রাজ্যে সম্মিলিত করেন।

ম্যাক্‌বেথের গৃহে সে রাত্রিতে ভোজ চলিতেছিল। লেডী ম্যাক্‌বেথ কপট স্নেহ দেখাইয়া নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণকে অভ্যর্থনা করিতেছিলেন। ম্যাক্‌বেথও সকলের সহিত শিষ্টালাপ করিতে লাগিলেন এবং ব্যাঙ্কোর অনুপস্থিতি দেখিয়া, কপটদুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এদিকে ঘাতকদ্বয় ম্যাক্‌বেথের গৃহে উপস্থিত হইল। ম্যাক্‌বেথ গৃহের বাহিরে আসিয়া সকল সংবাদ অবগত লইলেন। ব্যাঙ্কো হত হইয়াছে, কিন্তু তাহার পুত্র ফ্লিয়েন্স পলায়ন করিয়াছে;—ম্যাক্‌বেথের শিরে যেন বজ্রাঘাত হইল। তিনি বলিয়া উঠিলেন,—"তবে বুঝি আবার আমার পীড়া উপস্থিত হয়। ফ্লিয়েন্সের মৃত্যু-সংবাদ পাইলে আমি একেবারে আরোগ্য লাভ করিতাম। তাহা হইলে বোধ হয়, আমি প্রস্তরের ন্যায় স্থির থাকিতাম এবং সর্ব্বব্যাপী বায়ুর ন্যায় নিশ্চিন্তে বিচরণ করিতাম; কিন্তু এখন আমি সন্দেহের নিকৃষ্ট কারাগারে বন্দী। বৃদ্ধ মর্ম্মে নিহত, কিন্তু যে ক্ষুদ্র কীট পলায়ন করিল, কালে তাহা হইতেই মহাবিষ উদ্গীর্ণ হইবে।"

ঘাতকদ্বয় প্রস্থান করিল। ম্যাক্‌বেথ আবার ভোজসভায় উপস্থিত হইলেন। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের নিকট হইতে ম্যাক্‌বেথের সহসা এইরূপ চলিয়া আসা ভাল হয় নাই বুঝিয়া, লেডী ম্যাক্‌বেথ স্বামীকে সমোধনপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, "তোমার যথোচিত অভ্যর্থনার ত্রুটী হইতেছে। কেবল ভোজনের জন্যই যদি এ আয়োজন হইত, তাহা হইলে ইহাঁরা গৃহে বসিয়াই যথেষ্ট ভোজন করিতে পারিতেন,—আমাদের এ আয়োজনের আবশ্যক হইত না।"

ম্যাক্‌। প্রিয়তমে! তুমি যথার্থই বলিতেছ। আমার যথেষ্ট ত্রুটী হইয়াছে। (নিমন্ত্রিতগণের প্রতি) আপনারা সকলে আহার করুন, পান করুন।

নিমন্ত্রিত একজন লর্ড। মহারাজ! আপনার আসন গ্রহণ করুন।

ম্যাক্‌। ব্যাঙ্কোর অনুপস্থিতিতে আমার বড়ই কষ্ট হইয়াছে। তিনি এখানে উপস্থিত থাকিলে আমার রাজ্যের গৌরব বাড়িত; সকল মহৎ ব্যক্তিকেই আজি এখানে উপস্থিত দেখিতাম।

লর্ড। আপনার আসন গ্রহণ করুন।

কিন্তু সেই সময় ম্যাক্‌বেথ স্বীয় আসনের পানে চাহিয়া দেখিলেন, যেন ব্যাঙ্কোর প্রেতমূর্ত্তি তদুপরি বসিয়া আছে! ম্যাক্‌বেথ শিহরিলেন। ভীত, চকিত ও স্তম্ভিত-নেত্রে চাহিয়া বলিলেন, "কৈ, আমার আসন? সকলই ত পূর্ণ দেখিতেছি!"

লর্ড। সে কি মহারাজ! এই ত আপনার আসন শূন্য রহিয়াছে! আপনি এরূপ চঞ্চল হইতেছেন কেন?

ম্যাক্‌বেথ ব্যাঙ্কোর মূর্ত্তিপানে চাহিয়া আপনা-আপনি বলিতে লাগিল, "এ কাজ কার? তুমি বলিতে পার না যে, একাজ আমি করিয়াছি। তোমার ঐ শোণিতাক্ত কেশ লইয়া কেন আমায় ভয় দেখাইতেছ?"

তখন লেডী ম্যাক্‌বেথ দেখিলেন, বড়ই গোলযোগ উপস্থিত। বুঝি বা সকলই প্রকাশ পায়। তিনি ব্যস্ততার সহিত বলিতে লাগিলেন, "হে ভদ্র-মহোদয়গণ! আপনারা বসুন। আমার স্বামীর এইরূপ পীড়া আছে। শীঘ্রই আবার সুস্থ হইবেন। উঁহার প্রতি আপনারা লক্ষ্য রাখিবেন না। তাহাতে আরও মন্দ হইবে;—পীড়া আরও বাড়িতে থাকিবে।"

তার পর চুপি চুপি ম্যাক্‌বেথকে বলিলেন, "ছিঃ! তুমি কি?—তুমি কি মানুষ?"

ম্যাক্‌। মনুষ্য ত নিশ্চয়ই! দেখিতেছ না,—যাহা দেখিলে নরকের প্রেত, সেও ভীত হয়,—দেখিতেছ না, আমি নির্ভয়ে তাহাই দেখিতেছি!

লেডী ম্যাক্‌বেথ পুনর্ব্বার সেইরূপ চুপি

চুপি বলিতে লাগিলেন, "কি অসার প্রলাপ! মনে নাই, ডন্‌ক্যানের হত্যাকালে শূন্যে এইরূপ তরবারী দেখিয়াছিলে? এ তোমার অন্তরের আতঙ্কের চিত্র! শীতকালের রাত্রে অগ্নির পার্শ্বে বসিয়া ঠাকুর-মার মুখে এইরূপ কল্পিত ভয়ের কথা শুনিয়া ভীরু স্ত্রীলোকের হৃদয়ই আন্দোলিত হয়! কি লজ্জা! এখনও ত ঐ সিংহাসনের পানে চাহিয়া আছ!"

ম্যাক্। তুমি একবার দেখ!—আমি মিনতি করিতেছি, তুমি একবার দেখ! না, কি ভয় আমার? তোমার ঐ শোণিতাক্ত-কেশ-সঞ্চালনে আমি ভীত হইব না! পার, সাধ্য থাকে, কথা কও!

প্রেতাত্মা যেন সহসা অন্তর্হিত হইল।

লেডী ম্যাক্। (পূর্ব্ববৎ চুপি-চুপি) একি বুদ্ধিনাশ! ছিঃ! কি ঘৃণা!

ম্যাক্। বহুকাল হইতে রক্তপাত ও হত্যা চলিয়া আসিতেছে;—হত্যা হইল, সকলই ফুরাইল; কিন্তু এখন দেখি, এ বড় অদ্ভুত! হত্যা হইল, তবু ত সকলই ফুরাইল না!—আবার উত্থান!

লেডী ম্যাক্। দেখ, তোমার জন্য ভদ্র মহোদয়গণ অপেক্ষা করিতেছেন।

তখন ম্যাক্‌বেথ একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণকে আদর অভ্যর্থনা করিতে লাগিলেন।

আবার যেন প্রেতাত্মার আবির্ভাব হইল। আবার ম্যাক্‌বেথ শিহরিলেন, আবার লেডী ম্যাক্‌বেথ কপটতায় নিমন্ত্রিত-ব্যক্তিদিগকে ও তিরস্কারে স্বামীকে ভুলাইয়া রাখিলেন; কিন্তু পুনঃপুনঃ এইরূপ হইতে দেখিয়া লেডী ম্যাক্‌বেথ অত্যন্ত অতি দুঃখের ভাণ দেখাইয়া সকলকে বিদায় দিলেন।

ম্যাক্‌ডফ নামে স্কটলণ্ড রাজের এক বিশ্বস্ত অমাত্য ছিলেন। তিনি এ নিমন্ত্রণে আহূত হইলেও উপস্থিত হন নাই। ম্যাক্‌বেথ ও লেডী ম্যাক্‌বেথের সন্দেহ জন্মিল। ম্যাক্‌বেথ পত্নীকে কহিলেন, "দেখ, সকলেই নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়াছে, কিন্তু ম্যাক্‌ডফ আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিল না কেন, বল দেখি? অবশ্যই ইহার কোন কারণ আছে। গুপ্তচরের নিকট শুনিয়াছি ম্যাক্‌ডফ আমার বিদ্রোহী। আজ থাক্, কাল আবার সেই ডাকিনীগণের নিকট যাইব, দেখিব, তাহারা কি বলে। দেখি, ভাগ্যে আরও কি লেখা আছে! পথ কণ্টক-শূন্য করিতে অসাধ্য-সাধন করিব,—একটীও কণ্টক থাকিতে দিব না।

লেডী ম্যাক্। তোমার এক্ষণে যেরূপ অবস্থা, তাহাতে নিদ্রার একান্ত প্রয়োজন।

ম্যাক্। তাই চল। এত যে ভয় ও বিভীষিকা, তাহার কারণ এই, এ সকল ভীষণ-কার্য্যে আমরা এই নূতন ব্রতী। ভরসা আছে, অভ্যাসে ক্রমশই কঠিন হইব।

---

(১০)

পরদিন ম্যাক্‌বেথ সেই ডাকিনীগণের অন্বেষণে সেই প্রান্তরে গমন করিলেন। সেখানে এক গহ্বর মধ্যে তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাহারা বুঝিয়াছিল, ম্যাক্‌বেথ আরও কিছু ভবিষ্যৎ জানিবার জন্য তাহাদের নিকট উপস্থিত হইবে। সেজন্য তাহারা মন্ত্র-প্রভাবে এক বীভৎস-ব্যাপারে নিযুক্ত ছিল। একটা প্রকাণ্ড কটাহ মধ্যে ক্ষুদ্র ভেক, ভুজঙ্গ, কুক্কুর-জিহ্বা, পেচকের পক্ষ, হাঙ্গরের পাকস্থলী, ব্যাঘ্রের দন্তপাঁতি, বিষাক্ত বৃক্ষের মূল, ছাগীর পিত্ত, ইহুদীর লিভার, পক্ষবিশিষ্ট সর্পের গায়ের ছাল, সমাধি-স্থান-উৎপন্ন ঝাউগাছ এবং মৃত বালকের অঙ্গুলি,—এই সকল একত্র করিয়া সিদ্ধ করিতে লাগিল। সেই সকল দ্রব্য অত্যন্ত উত্তপ্ত হইলে, তাহাতে একটা শূকরের রক্ত ঢালিয়া দিল। তাহাতে সে কটাহ শীতল হইল। এইরূপ মন্ত্রগুণে সেই ডাকিনীগণ নরকের অনুচরগণকে আপনাদের আয়ত্তাধীন করিয়া ভবিষ্যৎ বিষয় অবগত হইত।

যখন তাহারা এইরূপ কার্য্যে ব্যাপৃত ছিল, ম্যাক্‌বেথ তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি তোমাদিগকে যাহা জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি, তাহা সত্য করিয়া বল। তোমরা এ কি করিতেছ?"

ডাকিনীগণ। কি কচ্ছি, এর নাম নেই।

ম্যাক্। আমি তোমাদিগকে যে প্রশ্ন করি, একে একে তাহার উত্তর দাও।

তখন ডাকিনীগণ এক একটা করিয়া ভূত আহ্বান করিল। প্রথমে একটা কাটামুণ্ডের আবির্ভাব হইল। ম্যাক্‌বেথকে সম্বোধন করিয়া সেই কাটা-মুণ্ড কহিল, "ম্যাক্‌বেথ! সাবধান; ম্যাক্‌ডফ এখনও জীবিত!"

কাটামুণ্ড অন্তর্হিত হইল।

ম্যাক্‌বেথ বুঝিয়াছিলেন, ম্যাক্‌ডফ তাঁহার নিমন্ত্রণ রক্ষা করেন নাই,—অধিকন্তু গুপ্তচর এ কথাও প্রকাশ করিয়াছে যে, ম্যাক্‌ডফ গোপনে ম্যাক্‌বেথের শত্রুপক্ষ অবলম্বন করিয়াছে। ডাকিনীগণও ম্যাক্‌বেথকে সে বিষয়ে সাবধান করিয়া দিল;—ম্যাক্‌বেথের বিশ্বাস দৃঢ় হইল।

তারপর আর একটা উঠিল,—রক্তাক্ত শিশুর আকৃতি। সে বলিল, "ম্যাক্‌বেথ! ম্যাক্‌বেথ!! ম্যাক্‌বেথ!!!"

ম্যাক্। যদি আমার তিনটা কান থাকিত, আমি তোর কথা শুনিতাম!

শিশুমূর্ত্তি। সাহসী হও, কাহাকেও ভয় করিও না। মার, হত্যা কর! কোন নারী-পুত্র হইতে তোমার ভয় নাই!"

শিশু-মূর্ত্তি অন্তর্হিত হইল।

ম্যাক্‌বেথ বলিতে লাগিল, "ম্যাক্‌ডফ! তবে তুমি জীবিত থাক,—তোমাকে আর আমার ভয় কি? না, তথাপি নিশ্চয়কে, আরও দৃঢ়তর করিবার জন্য তোমাকে মারিব।"

তারপর আর একটা;—মুকুটধারী একটী শিশুমূর্ত্তি হস্তে একটী বৃক্ষ লইয়া আবির্ভূত হইল। সে বলিতে লাগিল, "ম্যাক্‌বেথ! আপন ক্ষমতায় আপনি দৃঢ় থাক। কে তোমার বিরুদ্ধে কি করিতেছে, ইহা ভাবিও না। কাহারও কাণাকাণি বা কিছুতে ভ্রূক্ষেপ করিও না। যতদিন পর্য্যন্ত ডন্‌সিনান পাহাড়ে বার্ণাম-কানন উপস্থিত না হয়, ততদিন তোমার পতন হইবে না!"

মূর্ত্তি অন্তর্হিত হইল।

ম্যাক্। বার্ণামকানন পর্ব্বতশিখরে উঠিবে, ইহাও কি সম্ভব? আজি আমি নিশ্চিন্ত। কিন্তু তবু আরও কিছু জানিতে ইচ্ছা করি। তোরা বল্, ব্যাঙ্কোর সন্তানগণ এ রাজ্যের অধীশ্বর হইবে কিনা?

ডাকিনীগণ। আর শুনিতে চাহিও না।

কিন্তু ম্যাক্‌বেথ তথাপি ছাড়িল না। সহসা ডাকিনীগণ সেই অপূর্ব্ব কটাহ নামাইয়া ফেলিল। সহসা কি এক শব্দ উত্থিত হইল। ম্যাক্‌বেথ সবিস্ময়ে দেখিল, একে একে আট রাজার মূর্ত্তি সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হইল। অষ্টম রাজার হস্তে একখানি দর্পণ এবং সর্ব্বশেষে ব্যাঙ্কোর মূর্ত্তি! ম্যাক্‌বেথ এক এক করিয়া সেই মূর্ত্তি দেখিতে লাগিল এবং বুঝিল, ইহারাই একে একে স্কটলণ্ডের রাজা হইবে। অষ্টমের হস্তস্থিত দর্পণে দেখিল, তাহাতে আরও কত মূর্ত্তি প্রতিবিম্বিত হইতেছে। ব্যাঙ্কো পশ্চাতে থাকিয়া আপন বংশধরগণকে দেখাইয়া হাসিতেছে। ম্যাক্‌বেথ আর দেখিতে পারিল না। স্তম্ভিত-ভাবে অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ডাকিনী-

গণও সেই অবসরে নাচিতে নাচিতে, গায়িতে গায়িতে অন্তর্হিত হইল।

তখন ম্যাক্‌বেথ নিতান্ত ক্ষুব্ধ ও আন্দোলিত-হৃদয়ে গৃহে প্রত্যাগমন করিল।

---

(১১)

গৃহে আসিয়া ম্যাক্‌বেথ শুনিল যে, ম্যাক্‌ডফ ইংলণ্ডে পলায়ন করিয়া স্কটলণ্ডের রাজপুত্র ম্যালকমের সহিত যোগদান করিয়াছে। এ সংবাদে মহাপাপী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ম্যাক্‌ডফের গৃহ আক্রমণপূর্ব্বক তাহার স্ত্রী ও পুত্রকে বিনষ্ট করিল।

ম্যাক্‌বেথের এইরূপ অত্যাচারে রাজ্যের যাবতীয় লোক মহাভীত হইল এবং তাহার প্রতি অত্যন্ত ঘৃণাপ্রকাশ করিতে লাগিল। এদিকে ম্যালকম ও ম্যাক্‌ডফ ম্যাক্‌বেথের বিরুদ্ধে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া ইংলণ্ড হইতে ফিরিতেছিলেন। ম্যাক্‌বেথের অত্যাচারে প্রাণভয়ে-ভীত সৈন্যবর্গ ও অন্যান্য লোকগণ সেই দলে গিয়া যোগদান করিল। যাহারা একান্ত ভীতিবশতঃ ম্যাক্‌বেথের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যরূপে দাঁড়াইতে সক্ষম হইল না, তাহারা অন্তরের সহিত প্রার্থনা করিতে লাগিল, "যেন আগামী যুদ্ধে মহাপাপী পরাজিত হয়, আর সেই সঙ্গে আমাদের সকল দুঃখের অবসান হয়"

ম্যাক্‌বেথের নিজের পুরাতন সৈন্য কিছুই ছিল না। যাহারা নূতন, তাহারা সবে-মাত্র যুদ্ধ অভ্যাস করিতেছে। তাহারাও ম্যাক্‌বেথের অত্যাচারে তৎপ্রতি শ্রদ্ধাহীন হইয়া তাহাকে অমান্য করিতে লাগিল। তখন ম্যাক্‌বেথ ভাবিতে লাগিল, "আমার বোধ হয়, হত ডন্‌ক্যান আমার অপেক্ষা শতগুণে সুখী। আমি বিশ্বাসঘাতক,—তাঁহাকে বিনষ্ট করিয়াছি বটে, কিন্তু তিনি এক্ষণে কবরের মধ্যে মহানিদ্রায় সুখসুপ্ত আছেন;—আর আমি বাঁচিয়া থাকিয়া এখন সাধারণের যেরূপ ঘৃণা ও অশ্রদ্ধার পাত্র হইয়াছি এবং তাহাদের ব্যবহারে যে যন্ত্রণা পাইতেছি, এ সকল সেখানে কিছুই নাই।"

রাজ্যমধ্যে যখন এইরূপ অশান্তি ও হাহাকার, তখন ম্যাক্‌বেথের মহাপাপের চির-সঙ্গিনী লেডী ম্যাক্‌বেথের অবস্থা অতি ভীষণ। নানাপ্রকার দুশ্চিন্তায় মহা-পাপীয়সী লেডী ম্যাক্‌বেথের হৃদয় নিতান্ত বিকৃত-ভাবাপন্ন হইতেছিল। ক্রমে এতদূর চিত্তবিকৃতি জন্মিল যে, হতভাগিনী উন্মাদিনী হইল। যথারীতি চিকিৎসক নিয়োজিত হইল। কিন্তু কোন ফল দর্শিল না।

এতদিনে পাপের পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইল।

---

(১২)

যে পরিচারিকা লেডী ম্যাক্‌বেথের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত ছিল, চিকিৎসক তাহার নিকট হইতে সকল বিবরণ অবগত হইতে লাগিলেন।

চিকিৎসক। তুমি যেরূপে বলিয়াছিলে, আমি এই দুই রাত্রি জাগিয়া থাকিয়াও ত তাহার কিছুই দেখিলাম না। রাজ্ঞী শেষ কোন্ দিন বেড়াইয়াছেন?

পরিচারিকা। মহারাজ যুদ্ধে যাওয়া অবধি আমি দেখিতেছি, রাজ্ঞী প্রায় সহসা শয্যা হইতে উঠেন। বাক্স খুলিয়া কি কাগজ বাহির করেন,—ভাঁজ করিতে থাকেন,—তারপর লিখিতে আরম্ভ করেন,—লিখিয়া পড়েন;—তারপর সিল-মোহর দিয়া বন্ধ করেন,—পুনর্ব্বার শয্যায় যান। কিন্তু এই সমস্ত সময়েও গাঢ়নিদ্রায় অভিভূত থাকেন।

চিকিৎ। স্বভাবের এ অতি বিসদৃশ-ভাব। ঘুমাইয়াও জাগ্রতের ন্যায় কার্য্য করা বিকৃত-

মস্তিষ্কের লক্ষণ। এইরূপ নিদ্রাবস্থায় এইরূপ কার্য্য ছাড়া কখন কিছু বলিতে শুনিয়াছ?

পরি। সে সকল কথা আমি আপনাকে বলিতে পারিব না।

চিকিৎ। আমায় তাহা বলিতে পার এবং বলা উচিত।

পরি। আপনি কেন, আর কাহাকেও আমি বলিতে পারিব না;—যখন আমার কথার কেহ সাক্ষ্য নাই।

পরিচারিকা ও চিকিৎসকে যখন এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছিল, তখন রাত্রিকাল। সেই সময় লেডী ম্যাক্‌বেথ নিদ্রিতাবস্থায় এক প্রজ্বলিত বাতি লইয়া সেইখানে উপস্থিত হইল। পরিচারিকা চিকিৎসককে বলিল, "মহাশয়, এই দেখুন! ঠিক এইরূপ অবস্থাই হয়। দেখুন, সম্পূর্ণ নিদ্রিত। ভালরূপ লক্ষ্য করুন।"

চিকিৎ। উনি ও-আলোক কোথায় পাইলেন?

পরি। আলো সর্ব্বদাই উঁহার কাছে থাকে, এইরূপ উঁহার আজ্ঞা।

চিকিৎ। চক্ষু ত খোলা রহিয়াছে!

পরি। কিন্তু চক্ষে দৃষ্টি নাই।

চিকিৎ। দেখ, দেখ, ইনি কেমন হাত ঘসিতেছেন!

পরি। এইরূপই করিয়া থাকেন। বোধ হয়, যেন হাত ধুচ্ছেন। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত এইরূপ করিয়া থাকেন।

হতভাগিনী লেডী ম্যাক্‌বেথ আপনা-আপনি বলিতে লাগিল, "এখনও এখানে দাগ রহিয়াছে!"

চিকিৎ। ইনি কথা কচ্ছেন, শোন। আমি সকল কথা স্মরণ রাখিবার জন্য লিখিয়া লই। (তথাকরণ)

লেডী ম্যাক্‌। দূর—দূর, নরকের কালি! মুছিয়া যা! এক, দুই,—এই ত ঠিক সময়! উঃ! কি অন্ধকার! নরক এতই অন্ধকার! ছিঃ প্রভু, ছিঃ! তুমি না যোদ্ধা? তবে এত ভয় কেন? যে জানে জানুক, তাহাতে আমাদের কিসের ভয়? কিন্তু কে জানিত, সেই বুড়ো-শরীরে এত রক্ত ছিল?

চিকিৎ। (পরিচারিকার প্রতি) লক্ষ্য কচ্ছ?

লেডী ম্যাক্‌। ম্যাক্‌ডফের এক স্ত্রী ছিল, সে এখন কোথায়? আচ্ছা এই হাত কি পরিষ্কার হ'বে না?—থাক্ প্রভু, আর ও-কথায় কাজ নাই। তোমার এই আতঙ্কেই দেখ্‌ছি, সকলই পণ্ড হয়।

চিকিৎ। যাহা জানিয়াছ, তাহা না জানিলেই ভাল ছিল।

পরি। ইনি যাহা বলিলেন, তাহা না বলাই উচিত ছিল।

লেডী ম্যাক্‌বেথ হাত নিষ্পীড়ন করিতে করিতে আবার বলিতে লাগিল, "এখনও এখানে রক্তের গন্ধ র'য়েছে! সমস্ত আর সুগন্ধিতেও কি এ দুর্গন্ধ দূর হ'বে না? ওঃ! ওঃ! ওঃ!

চিকিৎ। কি ভয়ানক দীর্ঘশ্বাস! হৃদয় একান্তই ভারাক্রান্ত!

পরি। সমগ্র রাজসম্মান পাইলেও এমন হৃদয়ভার বহন করিতে আমি সম্মত হইতাম না। (চিকিৎসকের প্রতি) যাহাতে উনি ভাল হন, ভগবানের নিকট সেইরূপ প্রার্থনা করুন।

চিকিৎ। এই পীড়ার প্রতিকার করা আমার সাধ্যাতীত। আমি জানি, অনেকে এরূপ নিদ্রাবস্থায় বেড়াইত; কিন্তু তাহারা বেশ শান্তিতে মরিয়াছে।

লেডী ম্যাক্‌বেথ আবার বলিতে আরম্ভ করিল,—"দেখ, হাত ধোও, রাত্রিবাস পর। ওরূপ বিষণ্ণ হইও না। আমি আবার বল্‌ছি,—

উন্মাদিনী বেশে লেডী ম্যাক্‌বেথ।



ব্যাঙ্কো কবরে শায়িত,—সে কিছু কবর হইতে উঠিতে পারিবে না!

চিকিৎ। বটে!—এতদূর!

লেডী ম্যাক্। চল, শুই গে। ঐ শোন, বাহিরের ফটকে আঘাত হইতেছে! এস, এস, এস! আমার হাত ধর। যাহা হইয়াছে, তাহা হইয়াছে! চল, শয্যায় চল, নিদ্রা যাই।

এইরূপ বলিয়া লেডী ম্যাক্‌বেথ সেখান হইতে দ্রুত প্রস্থান করিল।

চিকিৎ। (পরিচারিকার প্রতি) আচ্ছা, এখন কি বরাবর শয্যাতেই চলিয়াছেন?

পরি। হাঁ, শয্যাতেই যাইবেন।

চিকিৎ। চারিদিকেই নানাপ্রকার কানাকানি হইতেছে। অস্বাভাবিক কার্য্য হইতেই এইরূপ অস্বাভাবিক যন্ত্রণার উৎপত্তি হইয়া থাকে! দেখ, পাপে কলুষিত যে মন, তাহা একদিন অন্যের সকল কথাই ব্যক্ত করিয়া ফেলে! দৈব ভিন্ন বৈদ্যের ঔষধে ইহাঁর কোন প্রতিকার হইবে না। তুমি উহাঁর সঙ্গে সঙ্গে থাক! যে কিছু চিন্তার কারণ, যথাসাধ্য দূর করিয়া দিও। ইহাঁকে দেখিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছি। কিছুই বলিতে পারি না। আমি এক্ষণে বিদায় হই।

---

(১৩)

এদিকে স্কটলণ্ডরাজের পুত্র ম্যালকম্, ম্যাক্‌ডফ সমভিব্যাহারে বিস্তর সৈন্য-সামন্ত লইয়া ম্যাক্‌বেথকে আক্রমণ করিতে উপস্থিত হইলেন। ম্যাক্‌বেথও সে সংবাদ শুনিয়া নিশ্চিন্ত রহিলেন না,—যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। এক একবার কিন্তু মনে হইতে লাগিল, "হয় ত সে ডাকিনীদের কথা কল্পনা মাত্র।" আবার ধীরে ধীরে দুরাশা সে হৃদয় উত্তেজিত করিয়া দিতে লাগিল। ম্যাক্‌বেথ ভাবিতে লাগিল, "কেনই বা ভয় করিব?—বার্ণামকানন যদি দনসিনান্ দুর্গে উপস্থিত না হইবে, ততদিন কেন ভয় করিব? মৃত মহারাজের পুত্র ম্যালকম্—সে ত বালক,—রমণীগর্ভজাত;—রাজ্যের যত সর্দ্দার, সবাই বিশ্বাসঘাতক, বিদ্রোহী।—যাক্, দূর হউক, তাহারা বালকের সহিত যোগদান করুক,—ম্যাক্‌বেথ তাহাতে ভীত নয়। এ বুকের ভিতর যে অন্তর, সন্দেহের ভারে তাহা কখন অবসন্ন হইবে না, কিংবা ভয়ে কখন কম্পিতও হইবে না।"

ম্যাক্‌বেথ যখন এইরূপ চিন্তায় মগ্ন, দূত আসিয়া বিপক্ষ সৈন্যের উদ্যোগ সম্বন্ধে সকল কথা জানাইল। শুনিয়া ম্যাক্‌বেথ উত্তেজিত হইয়া উঠিল। বলিল, "হয় বিদ্রোহ চিরদিনের জন্য নিবাইয়া দিব, নয় নিজে রাজ্যচ্যুত হইব! অনেক দিন বাঁচিয়া থাকিলাম! এ জীবনবৃক্ষের সবুজ-পত্র হরিদ্রা বর্ণ হইয়াছে। বার্দ্ধক্যের এ অবস্থায়, প্রেম বল, সম্মান বল, প্রভুত্ব বল, অনুচরবর্গ বল,—আমার ভাগ্যে কিছুই মিলিবে না। কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে নিষ্ঠুর অভিশাপ, কৃত্রিম সম্মান, ইহা লইয়াই আমাকে থাকিতে হইবে।"

এমন সময় লেডী ম্যাক্‌বেথের সেবায়নিযুক্ত সেই চিকিৎসক সেখানে উপস্থিত হইল। ম্যাক্‌বেথ জিজ্ঞাসা করিল, "রোগীর সংবাদ কি?"

ডাক্তার। পীড়ার ত কিছুই দেখিলাম না। কল্পনায় নানা বিভীষিকা দেখিয়া তাঁহার চিত্তবিকৃতি ঘটিয়াছে।

ম্যাক্। এ পীড়ার চিকিৎসা কর। অন্তরের এ ব্যাধি দূর করিতে কি পারিবে না? তাঁহার স্মৃতি হইতে এ বদ্ধমূল সন্তাপ উন্মোচন করিয়া দাও! মস্তিষ্কে জলন্ত আগুনের মত যে যন্ত্রণা দিবারাত্রি জ্বলিতেছে, তাহা নিবাইতে, তেমন ঔষধ কি কিছুই নাই? যে ব্যথায় হৃদয় জর্জ্জরিত, তাহা অপনোদন করিতে তেমন মহৌষধি কি কিছুই নাই?

ডাক্তার। এ পীড়ায় রোগীই আপনার চিকিৎসক।

ম্যাক্। তোমার ঔষধ কুক্কুরকে প্রদান কর,—আমি চাহি না! এ রাজ্যের যত সর্দ্দার সকলই পলাইতেছে, আমি আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি না। ডাক্তার, তুমি রোগীর প্রতি লক্ষ্য রাখ। যদি তাহাকে ভাল করিতে পার, আমি তোমার এমন প্রশংসা করিব যে, চারিদিকে সে প্রশংসার প্রতিধ্বনি হইবে।—এই ইংরেজ-সৈন্যগণকে দূর করিয়া দিতে কি কোন ঔষধ আছে? দূর হউক, যে পর্য্যন্ত বার্ণামকানন ডান্‌সিনান দুর্গে না আসিতেছে, সে পর্য্যন্ত আমি নিশ্চিন্ত থাকিব।

মহাপাপীর জীবন-নাটকের কি ভীষণ পরিণাম!

---

(১৪)

এদিকে ইংরাজ-সৈন্য-সমভিব্যাহারে ম্যাক্‌ডফ ও স্কটলণ্ড-রাজপুত্র ম্যালকম্ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া ম্যাক্‌বেথকে আক্রমণ করিতে আসিলেন। রাজপুত্র আজ্ঞা করিলেন, "সৈন্যগণ, তোমরা সকলে এক একটা বৃক্ষশাখা ছেদন করিয়া হস্তে ধারণ কর; তাহাতে আমাদের সৈন্যের সংখ্যা, শত্রুপক্ষ ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিবে না।"

সৈন্যগণ তাহাই করিল।

ম্যাক্‌বেথ তৎকালে ডন্‌সিনান দুর্গে অবস্থান করিতেছিলেন। দুর্গ-প্রাচীরে যথারীতি পতাকা উড্ডীয়মান হইল। ম্যাক্‌বেথ দুর্গ রক্ষার জন্য যথানাধ্য যত্নও করিলেন। কিন্তু স্বপক্ষ-সেনা দলে দলে বিপক্ষদলে যোগ দিতেছে শুনিয়া তিনি এবার কিছু নিরুৎসাহ হইলেন। সহসা শুনিলেন, যেন কোথায় কোন স্ত্রীলোক কাঁদিতেছে। কারণ জিজ্ঞাসার জন্য লোক পাঠাইয়া ভাবিতে লাগিলেন, "আমার এমন দিন গিয়াছে, যখন নিশীথে এমনই রোদনধ্বনি শুনিয়া মনে বড় আতঙ্ক হইত। কোন দুর্ঘটনার কথা শুনিলে শরীর কণ্টকিত হইত। আজি আর সেদিন নাই। এখন যেন ভীতি ও বিভীষিকা একত্রিত হইয়া আমার পান ও ভোজনের সঙ্গীস্বরূপ হইয়াছে;—তাহাতে আর আমার ভয় নাই।"

লোক ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল, রাণী ম্যাক্‌বেথের মৃত্যু হইয়াছে। শুনিয়া ম্যাক্‌বেথ কহিল, "এখন মরা ঠিক হয় নাই, আর কিছু পরে হইলেই ভাল হইত! এই মৃত্যুসংবাদ শুনিবার, অন্য দিন ছিল। আজ কাল করিয়া দিন চলিয়া যায়, সে দিন ক্রমে কালে বিলীন হয়। অতীত দিন ক্রমশঃ মৃত্যুর-পথে লইয়া যায়। ক্ষুদ্র ক্ষণস্থায়ী দীপ নিবিয়া যাক্।—এ জীবন সচল ছায়ার ন্যায়! রঙ্গালয়ে ক্ষুদ্র অভিনেতা যেমন আপনার অভিনয় শেষ করিয়া যায়,—কখন হাসি কখন কান্না, কখন দর্প কখন ক্রোধ—সকল ভাবই ব্যক্ত হয়;—তারপর? তারপর আর তাহার কথা কেহ কিছুই জানে না,—এ জীবনও তেমনি;—বাতুলের গল্পের মত!—কোলাহল আওয়াজে পূর্ণ বটে, কিন্তু কিছুই অর্থ নাই!"

সেই সময় দূত আসিয়া সংবাদ দিল, "মহারাজ, বড় অদ্ভুত ব্যাপার উপস্থিত। আমি প্রহরী ছিলাম, দেখিলাম, বার্ণামকানন ক্রমে ক্রমে ডান্‌সিনান দুর্গে চলিয়া আসিতেছে!"

ম্যাক্‌বেথ। মিথ্যা কথা!

দূত। যদি মিথ্যা হয়, যে-কোন শাস্তি দিবেন!

ম্যাক্। যদি তোর কথা মিথ্যা হয়, তবে প্রথমেই যে বৃক্ষ দেখিব, তাহাতে তোকে ঝুলাইয়া রাখিব! আর যদি সত্য হয়, তাহাতে আমি ভয় করি না।—আমি দেখিতেছি, ডাকিনীদের কথায় ক্রমশই আমার সংশয় হইতেছে।—"যে পর্য্যন্ত না বার্ণাম কানন ডান্‌সিনান দুর্গে আসে, ততক্ষণ তুমি নিশ্চিন্ত থাক"—আজি ত বার্ণাম কানন ডান্‌সিনানে আসিতেছে। কিন্তু আর বিলম্ব নহে,—যাইতে হইবে।

তখন সসৈন্যে সজ্জিত হইয়া ম্যাক্‌বেথ বহির্গত হইল।

যে দূত দেখিয়াছিল, বার্ণাম কানন চলিয়া আসিতেছে, এক হিসাবে তাহার দেখা ভুল হয় নাই। কারণ, বিদ্রোহী সেনাদল রাজপুত্রের আদেশ অনুযায়ী বার্ণাম কানন হইতে বৃক্ষশাখা ছেদন করিয়া আপনাদিগকে এরূপ ভাবে লুকাইয়া আসিতেছিল যে, দূর হইতে দেখিলে বহুবিস্তৃত একটা সচল কানন ভিন্ন অন্য কিছু বোধ হয় না।

ডাকিনীগণের ভবিষ্যৎ বাণীর এক অংশ এই ভাবে পূর্ণ হইল। মন্দভাগ্য ম্যাক্‌বেথ সে কথার অর্থ উপলব্ধি করিতে পারে নাই।

---

(১৫)

দুই দলে যুদ্ধ বাধিল। উভয় দলেই বিস্তর আহত ও নিহত হইতে লাগিল। ক্রমে ম্যাক্‌ডফ ম্যাক্‌বেথের সম্মুখীন হইলেন। ইতিপূর্ব্বে এই ম্যাক্‌ডফের পুত্র-পরিবারকে ম্যাক্‌বেথ হত্যা করিয়াছিল। ম্যাক্‌ডফ ম্যাক্‌বেথকে "নারকী" "কুক্কুর" বলিয়া সম্বোধন করিল। প্রত্যুত্তরে ম্যাক্‌বেথ বলিল, "তোমার বিস্তর আত্মীয় আমি নিহত করিয়াছি। আমার আত্মা অতি ভারাক্রান্ত। তুমি ফিরিয়া যাও।"

ম্যাক্‌ডফ সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না। উভয়ে যুদ্ধ বাধিল। তুমুল যুদ্ধ চলিল; কেহ পরাস্ত হইল না। ম্যাক্‌বেথ বলিল, "বৃথা এ পরিশ্রম! আমার দেহ হইতে তুমি শোণিত বাহির করিতে পারিবে না; তদপেক্ষা বরং এই অশরীরী বায়ুর সহিত সংগ্রাম করা তোমার সহজ! আমার এ জীবন যাদুমন্ত্রে রক্ষিত। নারীগর্ভজাত কাহারও হস্তে আমার মৃত্যু হইবে না!"

ম্যাক্‌ডফ। সে কথায় আর বিশ্বাস করিও না। সে মন্ত্র আর খাটিতেছে না। এই ম্যাক্‌ডফ তাহার জননী-জঠর হইতে অসময়ে, চিকিৎসকের অস্ত্র-প্রয়োগ-কৌশলে নিঃসৃত হইয়াছিল!

শুনিয়া ম্যাক্‌বেথ শিহরিল। বলিল, "ডাকিনীগণের কথা আর বিশ্বাস করিব না। তাহাদের কথার দুইটা করিয়া অর্থ। যখন শুনিলাম, তখন আশায় লুব্ধ হইয়া কিছুই বুঝিয়া দেখি নাই!—আমি তোমার সহিত যুদ্ধ করিব না।

ম্যাক্‌ডফ। তবে অধীন হও,—পরাভব স্বীকার কর! জগতের দৃশ্য-বস্তু হইয়া জীবন ধারণ কর! অসাধারণ জন্তুর ন্যায় সবাই তোমায় দেখিবে এবং লিখিয়া রাখিব, "এই স্থানে এক অতি নৃশংস অত্যাচারী আছে, দেখিয়া যাও!"

ম্যাক্‌বেথ ও ম্যাক্‌ডফের যুদ্ধ।



ম্যাক্‌বেথ। না, তাহা হইবে না। বালক ম্যাকম রাজা হইবে, আর আমি তাহার পদানত হইয়া থাকিব,—না, তাহা হইবে না! যদিও বার্ণাম কানন চলিয়া আসিয়াছে, যদিও শুনিলাম, তুমি নারীগর্ভজাত নহ, তথাপি আমি নিরস্ত হইব না! শেষ কি হয় দেখিব।

আবার যুদ্ধ বাধিল। উভয়ের ঘোরতর যুদ্ধ চলিতে লাগিল। শেষে ম্যাক্‌ডফের হস্তে অধর্ম্ম-দীক্ষিত ম্যাক্‌বেথ প্রাণত্যাগ করিল।

ডাকিনীদের ভবিষ্যদ্বাণী, আর এক অংশে এইরূপে সফল হইল।

পাঠককে এখন একবার ডাকিনীদের সেই মূল মন্ত্রটী স্মরণ করিতে বলি;—

"সুন্দরকে মন্দ ভাবি মন্দকে সুন্দর।
বদ্‌হাওয়া কুয়া দিয়া ফিরি নিরন্তর॥"

মহাপাপী ম্যাক্‌বেথের জীবন-নাটকের শেষ অভিনয় এইরূপে সম্পন্ন হইল। আর এই পাপের পার্শ্বে সেই মহাপাপ মূর্ত্তি, সাক্ষাৎ নরক হইতেও-অতি-ভীষণ লেডী ম্যাক্‌বেথ,—তাহার পরিণামও পাঠক দেখিয়াছেন।

যথাসময়ে সমস্ত প্রজাবর্গ মিলিয়া, মহা-সমারোহে স্কটলণ্ড-রাজপুত্র ম্যাকমকে তদীয় পিতৃ-সিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়া প্রীতি ও শান্তি লাভ করিল।

কিন্তু পরিণামে ডাকিনীদের কথানুযায়ী, ব্যাঙ্কোর বংশপরম্পরাই ঐ রাজ্য ভোগ করিতে লাগিল;—তাহা এ আখ্যায়িকার অন্তর্ভুক্ত নহে।

শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত।

প্রভাত-চিন্তা।*

(সমালোচনা)

"প্রভাত-চিন্তা" বাঙ্গালীর এক গৌরবের জিনিস। "সকলেই মাটী খোঁড়ে, কোহিনূর একজনের ভাগ্যেই মিলিয়া থাকে" সাহিত্যের সরসক্ষেত্রে অনেকেই মাটী খুঁড়িয়াছেন, কিন্তু কোহিনূর এক জনের ভাগ্যেই মিলিয়াছে।—সে একজন, পূর্ব্ববঙ্গের উজ্জ্বল নক্ষত্র, গুণী, গুণগ্রাহী, বিদ্বজ্জন-সমাজের মুখপাত্র, কীর্ত্তিমন্ত, সৌভাগ্যবান্ ও লেখকাগ্রগণ্য শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন ঘোষ।

কালীপ্রসন্ন বাবু বঙ্গ-সাহিত্যের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন। তাঁহার অমানুষী প্রতিভা তাঁহাকে অমর করিবে। তদ্বিরচিত অতি অপূর্ব্ব ও উপাদেয় গ্রন্থাবলী—"প্রভাত-চিন্তা", "নিভৃত-চিন্তা", "ভ্রান্তিবিনোদ" ও "প্রমোদ-লহরী" প্রভৃতি যিনি নিবিষ্ট-চিত্তে পাঠ করিবেন, তিনিই স্বীকার করিবেন, বঙ্গ-সাহিত্যে সত্য-সত্যই এক যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে। "প্রভাত-চিন্তা" আমাদের জাতীয় জীবনের পথ-প্রদর্শক;—আশা, উৎসাহ ও উদ্দীপনায় জাতীয়-সাহিত্যে ইহা অতুল্য;—সুতরাং এই "প্রভাত-চিন্তা"ই জাতীয় সাহিত্যের 'কোহিনূর'।

প্রকৃত গুণের পূজা করিতে বাঙ্গালী আজিও শিখে নাই। তাই এ অমূল্য গ্রন্থের কিঞ্চিৎ পরিচয় আজি আমাদিগকে দিতে হইতেছে। যাঁহার "বান্ধব" একদিন কত লোককে মানুষ করিয়াছে, যাঁহার দু'ছত্র সমালোচনার আশায় কত লেখক, কত কবি একদিন আশাপূর্ণ-নেত্রে চাহিয়া থাকিত, আজি সেই সাহিত্য-নিষ্ঠ, সুপ্রতিষ্ঠিত, "বান্ধব"-সম্পাদকের কোহিনূর—"প্রভাত-চিন্তা"র পরিচয় আমাদিগকে দিতে হইতেছে! যাঁহার বাগ্মিতায় পূর্ব্ববঙ্গ মুগ্ধ, যাঁহার ভাষার ওজস্বিতায় বঙ্গ-সাহিত্য উদ্দীপিত, যাঁহার ভাব ও চিন্তা, কবিত্ব ও দর্শন-তত্ত্বের সংমিশ্রণে গঠিত, বঙ্গ-সাহিত্যের সেই অন্যতম নেতা ও সুহৃদের "প্রভাত-চিন্তা" উপলক্ষ করিয়া আজ আমাদিগকে দুই একটী কথা বলিতে হইতেছে।

"প্রভাত-চিন্তা" কালীপ্রসন্ন বাবুর সম্পূর্ণ নিজস্বধন। ইহার উদ্দেশ্য অতি মহৎ, ভাব অতি গভীর, ভাষা অতি অলৌকিক শক্তিশালিনী; অথচ বিশুদ্ধ, সরল ও মর্ম্মস্পর্শিনী। এই গ্রন্থে লেখকের এক দিকে যেমন ভাবের গভীরতা ও অপূর্ব্ব কবিত্বশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, অন্যদিকে তেমনই কূট-দর্শন-তত্ত্বের সুন্দর মীমাংসা ও অভিনব বিচার-প্রণালী পরিদৃষ্ট হয়। আলোচ্য বিষয়গুলি অতি মনোজ্ঞ ও মানব-জীবনের একান্ত প্রয়োজনীয়। এরূপ ভাবুকতা-পূর্ণ অনুশীলন ও সাধনা-লব্ধ বস্তু সাহিত্যে অতি বিরল।

গ্রন্থের প্রথম প্রতিপাদ্য বিষয়—"নীরব কবি।" এই প্রবন্ধে, লেখক, অতি সংক্ষেপে, প্রকৃত কবি-হৃদয়ের, যে গূঢ়-তত্ত্ব বিবৃত করিয়াছেন, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেরই অনুমোদিত। তিনি কবিতার সর্ব্বোচ্চ গ্রাম নির্দ্দেশ করিয়া বলিতেছেন, "প্রকৃত কাব্য এক অনির্ব্বচনীয় অমৃত। মনুষ্যের অপূর্ণ এবং অপবিত্র ভাষা উহাকে ধারণ কিংবা বহন করিতে সমর্থ হয় না। যাঁহার হৃদয় যতক্ষণের জন্য তাদৃশ কাব্যের বিলাস-ক্ষেত্র হয়, তিনি ততক্ষণের জন্য হিমাচলের অবিচলিত স্থৈর্য্যের ন্যায়, আকাশের অনন্ত বিস্তারের ন্যায়, অক্ষুব্ধ সমুদ্রের অনির্ব্বচনীয় গাম্ভীর্য্যের ন্যায় এবং যোগরত তাপসের ধ্যানের ন্যায়, নিঃস্তব্ধ ও নীরব রহেন। তিনি শুধু হৃদয়েই সেই স্বর্গীয় সুধাসিন্ধুর কণিকা মাত্র পান করিয়া কৃতার্থ হন; লৌকিক বাক্য এবং লোক-ব্যবহৃত বর্ণমালায় কিছুই ব্যক্ত করিয়া উঠিতে পারেন না। লোকে স্বপ্নাবস্থায় যেরূপ দৌড়িতে চাহে, কিন্তু কোন মতেই দৌড়িতে পারে না; কথা কহিবার জন্য ব্যাকুল হয়, কিন্তু কোন কথাই অধরে ফুটিল বলিয়া অনুভব করে না; তিনিও তথাবিধ দশা প্রাপ্ত হইয়া তখন স্তম্ভিত ভাবেই অবস্থিত থাকেন। যাঁহারা বিধাতার প্রসাদে অথবা প্রকৃতির কোন অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় নিয়মে এইরূপ কবি-প্রাণ লাভ করিয়াছেন এবং লোকাতীত কবিত্বের পূর্ণ আবির্ভাবে সময়ে সময়ে এইরূপ অভিভূত হন, আমরা তাঁহাদিগকে চিনি আর না চিনি, তাঁহারাই সাধক, তাঁহারাই সিদ্ধ এবং তাঁহারাই মানবজাতির দিব্য চক্ষু। তাঁহারা উদাসীন হইলেও আসক্তের ন্যায় কর্ম্মরত ও স্নেহ-প্রবণ। তাঁহারা বাহিরে অতি কঠিন-প্রকৃতির লোক হইলেও অন্তরে অবলার ন্যায় কোমল। বৈরাগ্যই তাঁহাদিগের ভোগ এবং তৃষ্ণাই তাঁহাদিগের পরমা তৃপ্তি।"

উদ্ধৃত পঙক্তি কয়েকটী মনোযোগের সহিত পাঠ করিলে বুদ্ধিমান্ পাঠককে স্বীকার করিতেই হইবে যে, লেখক অতি নিপুণ সমালোচকের ন্যায় মনুষ্য-হৃদয়ের অতি গূঢ় ইতিহাস পাঠ করিয়াছেন এবং যাহা প্রকৃত-সৌন্দর্য্য, তাহার ধ্যানে বিভোর হইয়া, এই কয়েকটী কথা হৃদয়ের ভাষায় পরিব্যক্ত করিয়াছেন। এই "নীরব কবি" বান্ধব-সম্পাদকের অতি অপূর্ব্ব সৃষ্টি।

দ্বিতীয় প্রবন্ধ—"অভিমান।" প্রকৃত অভিমান কাহাকে বলে এবং তাহার ফল কি, এই

* শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ প্রণীত। ৪র্থ সংস্করণ। ঢাকা, আরমাণিটোলা, বান্ধবকুটীরে প্রকাশক শ্রীযুক্ত হরকুমার বসুর নিকট প্রাপ্তব্য। মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রবন্ধে তাহার মীমাংসা হইয়াছে। লেখক এই অভিমানের দুইটী স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন;—একটী আত্মরক্ষক, অন্যটী পরপীড়ক। পরপীড়ক অভিমানের তিনি এইরূপ বিশ্লেষণ করিতেছেন;—"যে অভিমান বিষ-মক্ষিকার মত বিনা প্রয়োজনে পরের মর্ম্মস্থলে দংশন করে, বিনা কারণে পরপীড়নে প্রবৃত্ত হয়, পরের স্বাধীনতা ও সম্মান-প্রিয়তার উপর কোন-না-কোনরূপে একটুকু আঘাত করিতে পারিলেই, অন্তরে অতি নিকৃষ্ট লুক্কায়িত আনন্দ অনুভব করিতে থাকে, এবং পৃথিবীতে অন্য কাহারও যশ, মান, সুপ্রতিষ্ঠা ও সমুচ্ছ্রিত ভাব সহিয়া লইতে প্রস্তুত নহে, উহা সর্ব্বতোভাবে পরিহার্য্য সন্দেহ নাই। উল্লিখিত-প্রকার অভিমান জগতের উপদ্রব-বিশেষ, এবং মানব-জাতির কলঙ্ক ও উৎপাতস্বরূপ। উহা অভিমান নহে, বস্তুতঃ অভিমানের অতি কদর্য্য বিকার।"

পরন্তু প্রকৃত অভিমানের মহত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া লেখক পুনরায় বলিতেছেন;—"কিন্তু যে অভিমান অন্য কাহাকে পীড়া না দিয়া, সুন্দর একখানি স্বাভাবিক বর্ম্মের ন্যায় মনুষ্যের হৃদয় ও মনকে পরের আক্রমণ হইতে আবরিয়া রাখে;—যাহা কটাক্ষ, কটুভাষা কিংবা ভ্রূকুঞ্চনে প্রদর্শিত না হইয়া স্বসম্মান-রক্ষাপর শান্ত মহত্ত্বের মধুর মূর্ত্তি ধারণ করে;—যাহা সরোবরের স্বচ্ছ সলিলে প্রতিভাত সূর্য্যরশ্মির ন্যায় লোকচক্ষুর অসহ্য হয় না, অথচ এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে বিলসিত রহিয়া মনুষ্যত্বের প্রতি মনুষ্যের ভক্তি জন্মায়; তাদৃশ সদভিমানের অনাদর করা দূরে থাকুক, আমরা উহা মানব-প্রকৃতির এক অমূল্য আভরণ বলিয়া সম্মান করি।"

উদ্ধৃত অংশের অক্ষরে অক্ষরে জীবন্ত সত্য প্রকটিত। এমন করিয়া চলিত-কথার বিশ্লেষণ করিতে পারেন, কয় জন লোক?

তৃতীয় প্রবন্ধ—"মনুষ্যের জীবনচরিত।" প্রকৃত জীবনী হওয়া যে, একরূপ অসম্ভব, লেখক অতি দক্ষতার সহিত তাহা সপ্রমাণ করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, "চরিতাখ্যায়কেরা প্রায়শঃই বহিঃস্থ ব্যক্তি। ভিতরের প্রকৃত তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হওয়া তাঁহাদিগের পক্ষে সাধারণতঃ অসাধ্য। এই হেতু, তাঁহারা মানব-জীবনের বাহির লইয়াই সদা ব্যাপৃত; তাঁহারা বাহির হইতে উঁকি মারিয়া, যৎকিঞ্চিৎ যাহা দেখিতে পান, তাহারই সঙ্গে কল্পনার কোটি কথা মিশাইয়া, বাস্তব এবং অবাস্তব উভয়বিধ উপকরণ দিয়া, এক অদ্ভুত বস্তু সৃজন করেন।"

লেখকের এই মতটীকে আমরা সম্পূর্ণরূপে অনুমোদন করি।

চতুর্থ প্রবন্ধ—"জীবনের ভার।" এই প্রবন্ধে লেখক একটী গুরুতর জটিল রহস্যের উদ্ঘাটন করিয়াছেন।—"শোক নাই, দুঃখ নাই, ভোগ্য বস্তুর অভাব নাই, অন্য কোনরূপ অভাবেরও তাড়না নাই;—তথাপি হৃদয় স্ফূর্ত্তিহীন, চক্ষু নিস্তেজ, মুখচ্ছবি বিষাদে মলিন।" কেন এমন হয়? ভাব-প্রবণ বাঙ্গালী—বিশেষতঃ কবি-জীবন এই দুর্ব্বিষহ ভারে প্রপীড়িত ও অত্যন্ত অবসাদ-গ্রস্ত। লেখক বলিতেছেন, কর্ত্তব্য কার্য্যে ত্রুটী, লক্ষ্য-বিচ্যুতি এবং সর্ব্বোপরি ঘোর আলস্যেই এই বিষ মনুষ্য-হৃদয়ে প্রবেশ করে। "শ্রমশীল হও এবং কর্ম্ম কর, ইহা ভিন্ন তোমার গত্যন্তর নাই"—প্রবন্ধের ইহাই সার কথা।

"I slept, and dreamt that
life was Beauty,
I woke, and found that
life was Duty."

"নিদ্রায় দেখিনু হায়! মধুর স্বপন,—
কি সুন্দর সুখময় মানব-জীবন!

জাগিয়া মেলিনু আঁখি,
চমকিয়া পুন দেখি,—
কঠোর-কর্ত্তব্য-ব্রত—জীবন-যাপন।"

কথাটা উপন্যাস নহে,—অতি কঠোর সত্য।

তাই লেখক উপসংহারে বলিতেছেন,—"জীবনের ঐ ভার প্রকৃতির অঙ্কুশ-তাড়না;—আসন্ন-বিপত্তির পূর্ব্বলক্ষণ অথবা আরব্ধ-ব্যাধির পূর্ব্ববেদনা। উহার অর্থ,—শঙ্কিত হও,—সাবধান হও,—ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। মনুষ্য যখন জীবনের ভারে ঐরূপ অবসন্ন হইয়া পড়ে, তখন প্রকৃতি তাহাকে অস্ফুটস্বরে উপদেশ দেন যে,—কার্য্য কর এবং জীবনের কার্য্যে তৎপর হও; নহিলে জীবনে সজীবতা নাই। মনুষ্য যখন হৃদয়ের স্বাস্থ্য ও আত্মার স্ফূর্ত্তিতে বঞ্চিত হইয়া জীবন্মৃতের ন্যায় পড়িয়া থাকে, তখন প্রকৃতি তাহাকে যন্ত্রণার অব্যক্ত-শাসনে প্রকারান্তরে বুঝাইতে থাকেন যে, কার্য্য কর এবং জীবনের কার্য্যে তৎপর হও; নহিলে জীবনে শান্তি নাই। মনুষ্য যখন আপনাকে ঐরূপে ছাড়িয়া দিয়া একবারেই অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে,—স্রোতের জলে তৃণের মত ভাসিয়া যায়, উত্থানের চেষ্টাও পরিত্যাগ করে, তখন প্রকৃতি তাহার পুনরুজ্জীবনের জন্য অনুতাপের অরুন্তুদ বেদনায় এইরূপ আদেশ করেন যে,—সময় থাকিতে উত্থিত হও,—সময় থাকিতে স্বশক্তির আশ্রয় লও,—বিধাতার এই কর্ম্মভূমিতে অকর্ম্মণ্যের স্থান নাই।"

আজিকার দিনে আলস্য-প্রাণ বাঙ্গালী জাতির এই কথাগুলি জপমালা করা উচিত।

পঞ্চম প্রবন্ধ—"মহত্ত্ব ও মিতব্যয়।" অথবা "এই দুইয়ের স্বরূপ ও সম্বন্ধ"। এই প্রবন্ধে লেখকের সুদূর-দর্শিতা ও মানব-চরিত্রে অভিজ্ঞতা অতি উজ্জ্বলরূপে প্রকটিত।—"What would life be without arithmetic, but a scene of horrors?" কথাটা ঠিক। লেখকের সহিত আমরাও একবাক্যে বলি, "পরার্থ আত্মশাসন, পরার্থ আত্মসুখ বিসর্জ্জনই প্রকৃত মহত্ত্ব এবং "প্রকৃত মিতব্যয়ের পরিণাম ফল, চরম-লক্ষ্য এবং মূলসূত্রও ঐরূপ পরপোষণ ও পরার্থ আত্মোৎসর্জ্জন।" অবশ্য, "কার্পণ্য ও মিতব্যয়িতা এক কথা নহে। * * * যাঁহারা পরের ভাবনা ভাবিয়া আপনারা মিতব্যয়ী হন, পরকে এক মুষ্টি দেওয়ার উদ্দেশ্যে আপনারা এক মুষ্টি কম খান, পরকে সুখ-সম্ভোগে একটুকু অধিকারী করার অভিলাষে আপনাদিগের সুখ-সম্ভোগের চক্র একটুকু সঙ্কোচন করেন, তাদৃশ মিতাচার-পরায়ণ মহাত্মাদিগকে কৃপণ বলিলে পাতক হইবে। তাঁহারাই প্রকৃত পুণ্যশ্লোক।"

যিনি প্রকৃত অসংযত-চিত্ত ও খামখেয়াল-প্রকৃতি, অথচ মনে মনে আপনাকে 'উদার' ও 'মহৎ-হৃদয়' বলিয়া বড়াই করেন, তিনি এ মিতব্যয়ের মহত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন না। কিন্তু সংসার-আশ্রমে থাকিতে হইলে যে, এ নীতিটী একান্ত পালনীয়, সে পক্ষে আর কথাটী নাই।

ষষ্ঠ প্রবন্ধ—"নিন্দুকের এত নিন্দা কেন?" লেখক এই প্রবন্ধে সমাজের বেশ একখানি নক্সা আঁকিয়াছেন এবং সেই সঙ্গে মনুষ্য-হৃদয়ের পরস্পর-বিরোধী বৃত্তি-নিচয়ের বেশ একটী সামঞ্জস্যের অভাব প্রদর্শন করিয়াছেন। সয়তানধর্ম্মী নিন্দুকের কার্য্যফল দেখাইতে গিয়া তিনি মহাকবি সেক্সপিয়রের সহিত বলিতেছেন,—"যে আমার অর্থ অপহরণ করে, সে প্রকৃত প্রস্তাবে আমার কিছু নিতে পারে না। উহা অবস্তুমধ্যে পরিগণনীয়। উহা আমার ছিল, এক্ষণে তাহার হইল এবং পূর্ব্বেও উহা সহস্র সহস্র লোকের ভোগে আসিয়াছিল। কিন্তু যে আমা হইতে আমার সুনামটী চুরি করিয়া লয়, সে আপনি ধনী হয় না, অথচ আমায় যথার্থ দরিদ্র করে।"

কথাটী বড় খাঁটী। লেখক তাই সদুঃখে প্রবন্ধের উপসংহারে বলিতেছেন,—"মনুষ্য-সমাজের উপরিতন স্তরসমূহেও নিন্দায় অদ্যাপি পরোপকার-প্রবৃত্তি ও পরার্থপরতার ঐকাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। মনুষ্য প্রীতি, স্নেহ ও বিবেকের বশবর্ত্তী হইয়াই মনুষ্যের নিন্দা করে না। যেদিন তাহা হইবে, সেদিন মনুষ্য-সমাজের অর্দ্ধেক দুঃখভার কমিয়া যাইবে। বোধ হয়, তখন মনুষ্য শত্রুকেও সদ্‌গুণের জন্য সরল-হৃদয়ে সম্মান করিতে শিখিয়া পৃথিবীতেই স্বর্গসুখের পূর্ব্বস্বাদ লাভ করিবে।"

সপ্তম প্রবন্ধ—"রাজা ও প্রজা"। এই প্রবন্ধে লেখক রাজা ও প্রজার সম্বন্ধ, প্রাচীন ও নব্যযুগের রাজবিধি, রাজা ও প্রজার মনের ভাব প্রভৃতি বিষয়ে অতি বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়াছেন। বর্ত্তমান যুগের লক্ষণ নির্ণয় করিয়া তিনি বলিতেছেন,—"মানব জাতির চিন্তা-স্রোতের গতি আজকাল প্রাকৃত তন্ত্রেরই অনুকূল। মনুষ্যের রাজ-নৈতিক কিংবা সমাজিক-প্রভুত্ব, যাহাতে একের হস্তে ন্যস্ত না থাকিয়া যথাযথরূপে সকলের মধ্যে বিভক্ত হয়, এই অস্ফুট আকাঙ্ক্ষাই বর্ত্তমান সময়ের বিশেষ লক্ষণ এবং এক্ষণকার কাব্য, সাহিত্য ও সমাজ-সমালোচন-সংক্রান্ত সর্ব্বপ্রকার লেখাই উল্লিখিত লক্ষণে চিহ্নিত।"

অষ্টম প্রবন্ধ—"বিনয়ে বাধা।" উপস্থিত প্রবন্ধেও লেখক মনুষ্য-হৃদয়ের ইতিহাস অতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিয়াছেন। বিনয় বস্তুটী কি এবং কোন্ কোন্ কারণে উহা বাধাপ্রাপ্ত হয়, তাহা অতি সুন্দররূপে আলোচিত হইয়াছে। সে সকল কারণের মধ্যে একটী কারণ এখানে উদ্ধৃত হইতেছে। লেখক বলিতেছেন,—"কাহারও মন কিয়ৎ-পরিমাণে বিনয়ের স্বভাবসুন্দর মাধুরীর দিকে, কিন্তু তিনি বিনীত হন না,—লজ্জায়। সে লজ্জা অভিমানে স্ফুরিত, অভিমানে জড়িত। লোকের নিকট ছোট হইয়া চলিতে হইলে, তাঁহার আত্মা লজ্জায় একেবারে ম্রিয়মাণ হয়।"

নবম বা শেষ প্রবন্ধ—"প্রকৃতি-ভেদে রুচি-ভেদ।" এই প্রবন্ধে লেখক শিক্ষা, সংসর্গ, অভ্যাস, শক্তি প্রভৃতির তারতম্যানুসারে রুচির প্রভেদ দেখাইয়াছেন। "এক বিষয় যে সকলেরই ভাল লাগিবে, এমন কিছু কথা নাই"—এই কথাটা নানাদিক্ হইতে তিনি দেখিয়াছেন ও দেখাইয়াছেন। ইহাতেও লেখকের বিলক্ষণ অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। 'কিছুতেই রুচি নাই' এমন লোক যদি কেহ জগতে থাকেন, তাঁহার সম্বন্ধে লেখকের বক্তব্য এই,—*** "তাঁহার অবস্থা স্মরণ করিয়া কেহই তাঁহাকে ঈর্ষা করিবে না। তিনি পণ্ডিত হইলেও মহামূর্খ, পরম সাধু হইলেও মহাপাতকী। এই শোভা-বিলাসিনী সুরম্য মেদিনী তাঁহার বাস্তুভূমি নহে।"

অতি সংক্ষেপে আমরা "প্রভাত-চিন্তা"র সার কথাগুলির আলোচনা করিলাম। ইহা হইতেই চিন্তাশীল পাঠক সাহিত্যরথী কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়ের অন্তর্দৃষ্টি ও গভীর অনুশীলনের পরিচয় পাইবেন। জগদীশ্বর তাঁহাকে প্রতিভা দিয়াছেন, তিনিও আজ এই দীর্ঘকাল যাবৎ সেই প্রতিভার সদ্ব্যয়ই করিয়া আসিতেছেন।—বোকা পাঠকদের মন ভুলাইবার জন্য, কিংবা সাহিত্যের আসর জমাইয়া 'বাহবা' লইবার আশায়, অথবা অধিক বই কাট্‌তির উদ্দেশ্যে তিনি কখন 'দোকানদারি' করেন নাই। যাহা প্রকৃত সৌন্দর্য্য ও মানবজীবনের আদর্শ, যাহা জাতীয়-জীবন-সংগঠনের প্রধান সহায়,—জননী জন্মভূমির প্রিয়পুত্র, সাহিত্য-ধর্ম্মের উপাসক, কর্ম্মযোগ-প্রচারক, 'বান্ধব'-সম্পাদক মহাশয় সেই সাধু পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন। এখনও তিনি অশ্রান্ত শ্রমে ও আন্তরিক ভাবে ভাষার

উন্নতি-কল্পে ব্রতী আছেন। এজন্য বঙ্গসাহিত্য এবং সমগ্র বাঙ্গালীজাতি তাঁহার নিকট ঋণী। বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার স্থান অতি উচ্চে। তিনিই এখন নব্যবঙ্গের শিরোমণি।

সাহিত্যের এই "কর্ম্মযোগী"র বিরুদ্ধে অযথা কোন কথা শুনিলে বড় কষ্ট হয়। মহত্ত্ব যে দেশে অতি বিরল, অকৃতজ্ঞতা ও পরশ্রীকাতরতাটা সেই দেশেই কিছু বেশী। দুর্ভাগ্য বাঙ্গালী-জীবনে এই কলঙ্কটা বড় বেশী রকমের দেখিতে পাই। তাই এই "প্রভাত-চিন্তা"র ন্যায় অত্যুৎকৃষ্ট ও প্রথম শ্রেণীর প্রবন্ধ-পুস্তকের 'আভা' সহিতে না পারিয়া, গত ২৫এ জ্যৈষ্ঠের "এডুকেশন গেজেট" এক "প্রাপ্ত-পত্র" স্কন্ধে লইয়া খানিকটা 'বিষ-বহ্নি' উদ্গীরণ করিয়াছেন। উহার লেখক যিনিই হউন, তিনি ক্ষমার যোগ্য। কারণ, তাঁহার যে, কিছুমাত্র হিতাহিত-জ্ঞান ও আত্মসম্মান বোধ নাই, তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। সম্ভবতঃ কোন গুহ্য কারণে—স্বার্থে আঘাত লাগায়, তিনি এই বিষ, কালীপ্রসন্ন বাবুর উপর ঢালিয়া থাকিবেন। কিন্তু সম্পাদক মহাশয় জানিয়া শুনিয়া, সে লেখা কিরূপে পত্রস্থ করিলেন? 'যা-তা' একটা লেখা পেলেই কি ছাপিতে হয়? তাই বলিতেছি, এ বিষয়ে আমরা লেখক অপেক্ষা সম্পাদককে অধিক দায়ী মনে করি।

লেখকের "গাত্রদাহ"টা কিরূপ তীব্র, তাহার পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক মনে করি। তবে কিরূপ অসার বাক্যে তিনি পুস্তকখানির আলোচনা করিয়াছেন, তাহা নিম্ন-উদ্ধৃত কয়েক পঙ্‌ক্তি-পাঠে বিলক্ষণ উপলব্ধি হয়;—

"আমি বহুকাল পূর্ব্বে বান্ধবের দুই এক সংখ্যা পড়িয়াছিলাম। সেই দলিলে এক পাতাও না পড়িয়া নিজেই কত লোকের নিকট সাধারণতঃ কালীপ্রসন্ন বাবুর লেখার—এমন কি খাস "প্রভাত-চিন্তা"রও প্রশংসা করিয়াছি। এ রকম অনেকেই করিয়া থাকেন।"

দেখুন পাঠক! লেখকের কেমন আত্মসম্মান-বোধ! নিজে যে দোষে দুষ্ট, অবলীলাক্রমে আর সকলকে বা "অনেক"কে সেই দলভুক্ত করিতে কিছুমাত্র লজ্জিত বা কুণ্ঠিত নহেন! সুতরাং ইহাঁর লেখার গুরুত্ব কিরূপ ও ইহাঁর দায়িত্বজ্ঞান কত দূর, তাহা সহজেই বুঝা যায়। কবি সত্যই বলিয়াছেন;—

"Fools rush in where angels fear to tread."

কিন্তু সম্পাদক মহাশয় কোন্ নীতিবশে ঐ অসার আলোচনা পত্রস্থ করিলেন? ইহার যথোচিত প্রতিবাদ করিলেও, লেখককে সম্মান করা হয়! আজ প্রায় কুড়ি বৎসর হইল, "প্রভাত-চিন্তা" প্রকাশিত হইয়াছে,—বেশ যুড়িয়া ইহার সুখ্যাতি,—বাঙ্গালার প্রধান সমালোচক, সুবিজ্ঞ "সাধারণী"-সম্পাদকও সে সময় মুক্তকণ্ঠে ইহার প্রশংসা করিয়াছিলেন;—আর আজ এত দিন পরে, খামকা-"লেখকের" এ 'গাত্রদাহ' কেন? লব্ধ "এডুকেশন গেজেটের" বর্ত্তমান সম্পাদক মহাশয়কে কথাটা জানাইবার জন্যই আমাদের এই প্রস্তাবের অবতারণা। কারণ, এখন ত আর সে নরদেব—'ভূদেব' নাই!

ন্যায়-দর্শন।

(১৫)

গুণ—রূপ।

দ্রব্যনিরূপণের পরেই গুণনিরূপণ কর্ত্তব্য। কেননা, গুণ দ্রব্যের পরম সহায়। গুণ না থাকিলে দ্রব্য, শূন্যবৎ। গুণের গুণেই দ্রব্যের এত প্রভাব। ঐ যে ঘট নামক দ্রব্যটী তোমার

সম্মুখে রহিয়াছে, উহা হইতে যদি গুণ অপহরণ করা যাইত, তাহা হইলে, তুমি কি আর উহাকে দেখিতে পাইতে? উহাকে স্পর্শ করিতে পারিতে? কখনই না। এমন যে গুণ, সেই,—দ্রব্যের জীবনপ্রতিম যে গুণ, অদ্য তাহারই আলোচনা উপক্রান্ত হইতেছে।

গুণ—চতুর্ব্বিংশতি প্রকার। যথা,—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, জ্ঞান, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, যত্ন, গুরুত্ব, দ্রবত্ব, স্নেহ, বেগাদি সংস্কার, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম এবং শব্দ।

যে সকল গুণের নাম পড়িয়া অর্থ বুঝিতে পারিলে না, যথাসময় তৎসমস্তই বিবৃত হইবে। গুণ, দ্রব্য ভিন্ন অন্যত্র থাকে না। সূক্ষ্ম অর্থ; দ্রব্যের সহিত গুণের যে প্রকার সম্বন্ধ সচরাচর পরিগৃহীত হইয়া থাকে, অন্যের সহিত গুণের তাদৃশ সম্বন্ধ নাই। স্পন্দনাদি-ক্রিয়াও দ্রব্যের ধর্ম্ম, গুণের নহে।

এই গুণ যেমন চতুর্ব্বিংশতি প্রকারে বিভক্ত হইয়াছে, তদ্রূপ সংক্ষেপে ইহার বিভাগ-প্রণালী প্রদর্শিত হইতেছে। তাহার ফল, গুণের সজাতীয়তাজ্ঞান এবং প্রকৃত পরিচয়ে সুবিধা।

রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, পরত্ব, অপরত্ব, দ্রবত্ব, গুরুত্ব, স্নেহ এবং বেগনামক সংস্কার, মূর্ত্তদ্রব্যের গুণ। মূর্ত্তদ্রব্য—অর্থে, যে সকল দ্রব্যের পরিমাণ, কোন-না-কোন দ্রব্যপরিমাণ হইতে ন্যূন। আকাশ, কাল, দিক্, জীবাত্মা এবং পরমাত্মা অমূর্ত্ত; অর্থাৎ মূর্ত্ত নহেন। কেননা, এ সকল দ্রব্যের পরিমাণ কোন পরিমাণ অপেক্ষাই ন্যূন নহে, এ সব পরিমাণ অতি বৃহৎ অনবধার্য্য। এতদ্ভিন্ন সকল দ্রব্যই মূর্ত্ত।

পৃথিবীও মূর্ত্তদ্রব্য, জলও মূর্ত্তদ্রব্য; গন্ধ জলে না থাকিলেও পৃথিবীতে আছে, সুতরাং মূর্ত্তদ্রব্যের গুণ বটেই। আবার স্নেহ পৃথিবীতে না থাকিলেও জলে আছে, সুতরাং মূর্ত্তদ্রব্যের গুণ বটেই। এইরূপ দেখিয়া লইবে।

ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, ভাবনা (সংস্কার-বিশেষ), শব্দ, জ্ঞান, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ এবং যত্ন—অমূর্ত্তদ্রব্যের গুণ। আর সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ এবং বিভাগ মূর্ত্তামূর্ত্ত-সাধারণ গুণ।

সংযোগ, বিভাগ, দ্বিত্বাদি সংখ্যা এবং পৃথক্ত্ববিশেষ (দ্বি-পৃথক্ত্বাদি) অনেক দ্রব্যবৃত্তি-গুণ। এক ভিন্নই অনেক, দুই তিন সকলই অনেক।

কেবল একটী দ্রব্যে সংযোগাদি থাকিতে পারে না।

অন্য সকল গুণই একৈক-দ্রব্য বৃত্তি। যেমন রূপ; ঘটে রূপ আছে, পটে রূপ আছে, এইরূপ নানাদ্রব্যেই রূপ আছে বটে, কিন্তু যে-রূপ, ঘটে আছে, অর্থাৎ তদ্ঘটে আছে, সে-রূপ অন্যত্র নাই। একজাতীয় রূপ নানাদ্রব্যে থাকিতে পারে বটে, কিন্তু এক-রূপ নানাদ্রব্যে থাকে না। যাবতীয় শুক্লরূপ একজাতীয়, যাবতীয় রক্তরূপ একজাতীয় ইত্যাদি। এক-জাতীয় হইলেই যে এক হয়, তাহা নহে: যেমন ব্রাহ্মণ সকলেই একজাতীয় হইতে পারেন, কিন্তু এক হইতে পারেন না, এক হইবেন সেই সেই ব্যক্তি। তবে, এক অর্থে 'একজাতীয়' যে অর্থে 'যে জাতীয়' এবং সেই অর্থে 'সেই জাতীয়' বোধ করিতে হয়, এরূপ ব্যবহারও আছে। অর্থের মারপেচ করিয়া ব্যবহার করিতে হয় কর; ফলে কিন্তু দ্রব্যভেদে রূপা-দিরও ভেদ হইবে।

রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ, স্নেহ, সাংসিদ্ধিক-দ্রবত্ব, জ্ঞান, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, যত্ন এবং ভাবনানামক সংস্কার 'বিশেষ গুণ' নামে অভিহিত, এতদ্ভিন্ন আর সকল গুণই 'সামান্য গুণ'।

এই রীতিক্রমে সজাতীয়তা বিজাতীয়তা স্থির করিবে।

এক্ষণে যথাক্রমে প্রত্যেক গুণের বিবৃতি করিতেছি:—

রূপ ১ম গুণ। রূপের অর্থ বর্ণ বা রং। রক্ত (লাল), নীল, হরিত (সবুজ), পীত, কৃষ্ণ, শ্বেত এবং বিচিত্র ইত্যাদি নানাপ্রকার রং আছে। এই সব রং বা রূপ চ'খে দেখা যায়। অন্য কোন বাহ্যেন্দ্রিয় দ্বারা রূপ-জ্ঞান হয় না। রূপ, দ্রব্যাদিপ্রত্যক্ষে কারণ।

যে দ্রব্যে স্পষ্টরূপ নাই, তাহা চ'খে দেখা যায় না, আর তাহার গুণ-কর্ম্মাদিও চ'খে দেখা যায় না। মনে কর, ঘট সম্মুখে আছে, আলোক আছে, ঘট দেখিতে তোমার মনো-যোগ আছে, তুমি ঘটে চক্ষুঃসংযোগ করিলে, আর তাহা, তাহার পরিমাণ, তাহার সংযোগ ইত্যাদি নানাগুণ তোমার নয়নগোচর হইল; কিন্তু যাহাতে রূপ নাই, তাহা ঘটের অপেক্ষা বৃহদ্দ্রব্য হইলেও অধিক আলোক থাকিলেও তাহা চ'খে দেখিবার জন্য অধিকতর মনোযোগ থাকিলেও, তোমার নয়নগোচর হইবে না, আর তাহার গুণাদি ত দেখিতে পাইবেই না; যেমন বায়ু। সহস্র চেষ্টাতেও কি বায়ু দেখিতে পাও? কেন পাও না—বায়ুর রূপ নাই বলিয়া; কেমন? চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ যে-সে রূপ থাকিলেও হয় না, স্পষ্ট রূপ থাকা চাহি।

উত্তপ্তভর্জ্জনকপাল-(মুড়ি ইত্যাদি ভাজি-বার পাত্র)-স্থিত অগ্নি চ'খে দেখা যায় না, অথচ হাত দিলে হাত পুড়িয়া যায়, কুঁচির কাটি জ্বলিয়া উঠে; সুতরাং অগ্নি আছে; কিন্তু সে অগ্নিতে স্পষ্ট রূপ নাই,—স্পষ্ট রূপের দার্শনিক নাম উদ্ভূত রূপ। উদ্ভূতরূপের অভাবেই তাহা নয়নগোচর হয় না।

রূপ—নিত্য এবং অনিত্য। অর্থাৎ জলীয় পরমাণুতে আর তৈজস পরমাণুতে যে রূপ থাকে, তাহা নিত্য অপর রূপমাত্রই অনিত্য।

ফলে দাঁড়াইল, শুক্লরূপ দুই প্রকার অর্থাৎ নিত্য এবং অনিত্য; নিত্য-শুক্লরূপ জলীয় এবং তৈজস পরমাণুতে বর্ত্তমান। অপর শুক্ল-রূপ এবং তদিতর যাবতীয় রূপ সবই অনিত্য, অর্থাৎ সে সব রূপের উৎপত্তি বিনাশ আছে।

পার্থিব পরমাণুর রূপ অগ্নি-সংযোগে নষ্ট হয় এবং উৎপন্ন হয়। কাঁচা ঘট, কাল বর্ণ; পোড়াইলে তাহা লাল হয়। অর্থাৎ এই পোড়ান বা অগ্নি-সংযোগ-বিশেষ, ঘটের পূর্ব্ব-রূপ-নাশের কারণ এবং অগ্নি-সংযোগবিশেষই বর্ত্তমান রক্ত রূপের উৎপত্তির কারণ।

জন্য রূপের সামগ্রী দ্বিবিধ। সামগ্রী অর্থে, কারণসমষ্টি; যে সব কারণ একত্র সংঘটিত হইলে, কার্য্য অর্থাৎ রূপ উৎপন্ন হয়, তাহা দুই প্রকার। এক-পাক (অগ্নি-সংযোগ-বিশেষ)-ঘটিত সামগ্রী; অপর, অবয়বরূপঘটিত সামগ্রী। পাক প্রভৃতি কারণাবলী সংঘটন হইলেও রূপ উৎপন্ন হয়, যেমন পার্থিব পরমাণুতে। আর পাক না থাকিলেও অবয়বরূপ প্রভৃতি কারণা-বলীসংঘটন হইলে, রূপ উৎপন্ন হয়—যেমন বস্ত্রাদিতে। বস্ত্রের অবয়ব সূত্র, সূত্ররূপই বস্ত্ররূপের কারণ।

নব্য পণ্ডিতগণের মত এই প্রকারই।

কিন্তু মহর্ষি গৌতম যে পাকজ-রূপের বিষয় জানাইয়াছেন, তাহা কেবলই যে অগ্নিতে পাক, ইহা আমার বোধ হয় না। সূর্য্যকিরণে পাকও বুঝিবে। এই জন্যই অপক্ক ফল এবং পরিণত ফলে বর্ণভেদ হয়। এসব বর্ণভেদে সূর্য্যকিরণই কারণ। পার্থিব পদার্থ মাত্রের রূপই হয় অগ্নি-পাক হইতে, না হয় সূর্য্যকিরণ-পাক হইতে উৎপন্ন; ইহাই প্রকৃত শাস্ত্রমত। জলের রূপ পাকজ নহে, পাকজ হইলে নানারূপ হইতেও পারিত। এক পাত্রে পরিষ্কার জল

লইয়া তাহা অগ্নিতেই সিদ্ধ কর আর সূর্য্য কিরণেই পক্ক কর, তাহার রূপপরিবৃত্তি কিছুতেই হইবে না। সুতরাং পাকজ-রূপ জলে স্বীকার করার যুক্তি নাই। তেজ—মনে কর, সূর্য্য বা সূর্য্যকিরণ চিরকালই এক প্রকার, সুবর্ণ বা অগ্নিরও পাকে রূপের পরিবর্ত্তন হয় না, তবে পার্থিব পদার্থের মিশ্রণে হয়। সুতরাং পাকজ-রূপ তেজেও স্বীকার করা নিষ্প্রয়োজন। জল ও তেজের অবয়বে রূপ আছে, তাহাই যথা-ক্রমে অবয়বী-জল ও অবয়বী-তেজের রূপের কারণ। পৃথিবীর পক্ষে তাহা বলা যায় না। কেননা, পূর্ব্বে দেখিলে, অবয়বিতে কাল রূপ, কিছুকাল পরে দেখ,—রক্তরূপ। এখন আদি অবয়ব-পরমাণুতে বল কোন্ রূপ স্বীকার করিবে? কালরূপ বলিলে, পরে অবয়বীতে রক্তরূপ কেমন করিয়া হয়—এই আপত্তি; রক্তরূপ বলিলে, পূর্ব্বে অবয়বী কাল হইল কেন—এই আপত্তি। সুতরাং পাকজরূপ স্বীকার কর।

এই যে রূপান্তর, ইহা সূর্য্যকিরণ-সংযোগ বা অগ্নিসংযোগ বশতই সম্ভূত ইহা মানিতে হয়।

আম-গাছে, আমই হয়, কাঁঠাল হয় না; কাঁঠাল-গাছে কাঁঠালই হয়, আম হয় না। তদ্রূপ সূর্য্যকিরণ বা অগ্নির সংযোগে পৃথিবীরই রূপান্তর হয়, অপরের হয় না। এ সমুদয় রূপেরই উপাদান-করণতা পৃথিবীতে বর্ত্তমান, জল ও তেজে শুক্লরূপ ভিন্ন অন্য রূপের উপাদান-কারণতা নাই। আবার জলে যে শুক্লরূপ, তাহাতে জৌলুশ নাই; তেজে যে শুক্লরূপ, তাহার জৌলুশ আছে। সুতরাং বুঝিবে, জলে কেবল অজৌলুশ বা অভাস্বর-শুক্লরূপের উপাদান-কারণতা, আর তেজে কেবল জৌলুশ-শুক্লরূপের উপাদান-কারণতা আছে।

রূপে, রূপত্ব, গুণত্ব এবং সত্তাজাতি আছে। শুক্লত্ব নীলত্বাদি রূপত্বের ব্যাপ্যজাতি। শুক্ল-রূপে থাকে শুক্লত্ব, নীলরূপে নীলত্ব ইত্যাদি।

শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন।

সমালোচনা।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন-চরিত। অপ্রকাশিত কবিতা, পত্র ও গ্রন্থাবলীর সমালোচনা-সম্বলিত। শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু, বি, এ, প্রণীত। দ্বিতীয় সংস্করণ। (সচিত্র) কলিকাতা, ২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটে, শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকানে প্রাপ্তব্য। মূল্য ২৲ দুই টাকা।

নব্যবঙ্গের সর্ব্বপ্রধান কবি, প্রথিতনামা শ্রীমধুসূদনের নাম কে না শুনিয়াছেন? চিন্তাশীল যোগীন্দ্র বাবু সেই মহাকবির জীবনী-সঙ্কলন করিয়া সমগ্র বাঙ্গালী জাতির ধন্যবাদ-ভাজন হইয়াছেন। "প্রকৃত যাহা হৃদয়ের ইতিহাস, তাহাকেই আমরা জীবনী বলি।" যোগীন্দ্র বাবু যে, কবিবরের স্থূল-জীবনীর সহিত সেই হৃদয়ের ইতিহাসও বুঝিতে চেষ্টা পাইয়াছেন, ইহাই আমাদের প্রধান আনন্দের বিষয়। ইংরেজীতে যেমন ডাডেন সাহেব, মহাকবি সেক্সপিয়রের "Mind and Art" বুঝাইয়া, লেখক ও কবি-সম্প্রদায়ের ধন্যবাদ-ভাজন হইয়াছেন, বঙ্গ-সাহিত্যে যোগীন্দ্র বাবুও তেমনই শ্রীমধুসূদনের "Mind and Art" বুঝাইতে চেষ্টা পাইয়া, লেখক ও কবি-সম্প্রদায়ের ধন্যবাদ-ভাজন হইলেন। এরূপ গ্রন্থ বঙ্গ-সাহিত্যে সম্পূর্ণ নূতন। যোগীন্দ্র বাবুর নিরপেক্ষ ও নির্ভীক সমালোচন, বিচারনৈপুণ্য ও উদ্ভাবনী শক্তি বিশেষ প্রশংসনীয়। বিদ্বজ্জন-সমাজে যে, এরূপ অপূর্ব্ব গ্রন্থের আদর হইবে, সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ নাই!

এই জীবনী-লেখক যে অতি চিন্তাশীল, সহৃদয় ও কবি, গ্রন্থের অনেক স্থলে সে পরিচয় পাইয়াছি। কবির জীবন দুঃখময়, ইহা সকলেই জানেন, কিন্তু মধুসূদনের জীবন যে কিরূপ বিষম দুঃখময়, তাহা হয় ত অনেকেই জানেন না। যোগীন্দ্র বাবু মৃত-কবির সেই গভীর দুঃখময়-জীবনের আলেখ্য বড় সুন্দররূপে আঁকিয়া দেখাইয়াছেন। কবিও কাঁদিতে কাঁদিতে জীবলীলা শেষ করিয়াছেন, কবির জীবনী-লেখকও কাঁদিতে কাঁদিতে গ্রন্থ সমাপন করিয়াছেন;—আর আমরাও বড়-ব্যথা বুকে লইয়া গ্রন্থপাঠ সমাপ্ত করিয়াছি! বই পড়িয়া, হৃদয়ের উপর এরূপ গভীর শোকের রেখাপাত, অনেক দিন হয় নাই। এই জীবনী-পাঠে অনেক শিখিয়াছি, সকলকে সে শিক্ষা লাভ করিতে অনুরোধ করি। শ্রীমধুসূদনের নামের সঙ্গে শ্রীযোগীন্দ্রনাথের নামও চিরদিন গ্রথিত থাকিবে।

এই গ্রন্থ-সঙ্কলনের জন্য লেখককে যে বহু গবেষণা, বহু অনুসন্ধান, বহু পরিশ্রম, বহু যত্ন ও বহু অর্থ ব্যয় করিতে হইয়াছে, তাহা গ্রন্থস্থ বহু বহু লুপ্ত-বিষয়ের উদ্ধারেই সপ্রমাণ হয়। মধুসূদনের সমসাময়িক সমাজ ও সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, পাশ্চাত্য-শিক্ষার প্রভুত্ব, প্রাচীন ও নব্যতন্ত্রের সার তত্ত্ব প্রভৃতি অনেক কথা ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সে এত যে, ক্ষুদ্র সমালোচনায় তাহার গুণাগুণ সম্যক্‌রূপে বুঝান' যায় না।

কোন কোন স্থলে লেখকের সহিত আমাদের মতবিরোধ হইয়াছে; কিন্তু তাহাতে মূল-বিষয়ের কিছু যায়-আসে না। কেবল একটী গুরুতর বিষয়ে কিছু বলা আবশ্যক মনে করি। অশোকবনে সীতা ও সরমার কথোপকথন উপলক্ষ করিয়া যোগীন্দ্র বাবু বলিতেছেন, "সীতা-চরিত্রের উৎকর্ষ-সাধনের জন্যই মধুসূদনের অধিকতর প্রশংসা। * * * মহর্ষিকল্পিত সীতা-চরিত্রেও যে একটু ত্রুটি লক্ষিত হইয়া থাকে, মেঘনাদ-বধে মধুসূদন তাহা সংশোধন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। মায়াবী-মারীচের আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিয়া সীতাদেবীর লক্ষ্মণের প্রতি অনুযোগ রামায়ণে যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে আমাদিগকে যথার্থই ব্যথিত হইতে হয়।"

ব্যথিত যে হইতে হয়, তাহার আর কথা কি? কিন্তু ব্যথিত হইতে হয় বলিয়া ত আর সত্যের অপলাপ করা চলে না! "প্রকৃতির বুকে যে কথা লুকান' আছে, হৃদয়ের ভাষায় তাহা পরিব্যক্ত" করাই না কবির কবিত্ব? কবি যে-জগতের সৃষ্টি করেন, তাহাও ত এই পরিদৃশ্যমান জগৎকে দেখিয়া!—সুতরাং আদি-কবি ও মহাকবি মহর্ষি বাল্মীকিও যে, পৃথিবীর আদর্শ—সীতাচরিত্রের মধ্যেও "চন্দ্রের কলঙ্ক" টুকু আরোপ করিবেন, তাহার আর কথা কি? আদর্শ চরম-সীমায় উপনীত হইলেও স্বভাবের নিখুঁত ফটোটী বজায় রাখাও ত কবির একটা প্রধান কাজ। অমন অবস্থায় সীতার মুখ দিয়া ওরূপ বিষবহ্নি উদ্গীরণ হওয়াই অধিক স্বাভাবিক। প্রকৃতিদত্ত নারী-হৃদয়ের স্বাভাবিক দৌর্ব্বল্যই বল, আর যাহাই বল, ঐ টুকুই নারীর নারীত্ব। নারী-চিত্র যত উচ্চ হউক, তাহা নারী-চিত্র—নর-চিত্র নহে। বাল্মীকি সীতাদেবীকে আদর্শের শীর্ষস্থানীয়া করিলেও, স্বভাবের অবিকল প্রতিকৃতি—নারীর নারীত্বটুকু ত লোপ করিতে পারেন না। বিশেষ, মহর্ষি যদি ওখানে ওরূপ হৃদয় বিদারক মর্ম্মান্তিক কথা সীতার মুখ দিয়া বাহির না করেন, তাহা হইলে ঐখানেই ত রামায়ণ শেষ হয়! ঐখানেই ত তাঁহার সকল কৌশল ব্যর্থ হয়। মহাবীর লক্ষ্মণের মত সংযতেন্দ্রিয় ব্রহ্মচারীর হৃদয়কে বিচলিত করিতে হইলেই ত, ঐরূপ বজ্রধার-অপেক্ষাও-নির্ম্মম কঠিন বাক্য উচ্চারণ করা চাই;—

"অনার্য্য করুণারম্ভ নৃশংস কুলপাংসন॥

* * * * *

সুদুষ্ঠস্তং বনে রামমেকমেকোঽনু গচ্ছসি।
মমহেতোঃপ্রতিচ্ছন্নং প্রযুক্তো ভরতেন বা॥"

মহর্ষি নাকি অন্তর্য্যামীর ন্যায় মনুষ্য-হৃদয় বুঝিতেন, তাই তিনি লক্ষ্মীস্বরূপিণী, জগৎপূজ্যা সীতা দেবীর মুখ দিয়াও ঐ বিষ বাহির করিয়াছিলেন! আদর্শ যত উচ্চ হউক না কেন, অগ্রে ত স্বভাবের সঙ্গতি রক্ষা চাই;—তারপর উদ্দেশ্যসিদ্ধির পথও ত পরিষ্কার করা আবশ্যক। সীতা যদি অমন সময় ওখানে অপেক্ষাকৃত নরম-সুরে লক্ষ্মণকে ভর্ৎসনা করিতেন, তাহা হইলে লক্ষ্মণও তাঁহাকে অরক্ষিতাবস্থায় ফেলিয়া যাইতেন না, আর অরক্ষিতাবস্থায়

ফেলিয়া না যাইলে পৌরাণিক সত্যও সিদ্ধ হইত না,—মানবশিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইত! আর, কেবলমাত্র কাব্যের দিক হইতে সীতাকে দেখিলে ইহাও বলা যাইতে পারে যে, পতিগতপ্রাণা, রামময়-জীবন জনকনন্দিনীর, স্বামীর জীবন রক্ষার জন্য (অন্ততঃ সে সময় তাঁহার মনে সেইরূপ বিশ্বাসই হইয়াছিল) লক্ষ্মণের প্রতি ঐরূপ অনুযোগ করাই স্বভাব-সঙ্গত। সতী স্ত্রীর ইহাই ধর্ম্ম। আবার সীতার মত আদর্শ সতীর ইহাই অধিকতর স্বভাব-সঙ্গত

যোগীন্দ্র বাবু লিখিতেছেন, "বহুদিনের বিশ্বাস, একদিনের ব্যবহারে অ-স্মাৎ এরূপ সন্দেহে পরিবর্ত্তিত হওয়া স্বাভাবিক নয়"। এ বড় শক্ত কথা! এক কথায় ইহার মীমাংসা কি করিব? তবে লক্ষ্মণের প্রতি সীতা যে, অবিশ্বাসিনী হইয়া ঐরূপ কথা বলিয়াছিলেন, এরূপ নাই বা মনে করিলাম? কেবলমাত্র লক্ষ্মণকে কর্ত্তব্য নিরত করিবার জন্যও ত তিনি অমন কথা বলিতে পারেন! প্রথমে 'যাদু-বাছা' বলিয়া, স্তব-বিনয় করিয়া, মিষ্ট কথায় বুঝাইয়া দেখা গেল—কার্য্যসিদ্ধি হইল না;—এরূপ স্থলে একটা কড়া কথা কহিলেই যদি সে কার্য্যসিদ্ধি হয়, ত তাহাতে ক্ষতি কি? মনের অগোচর ত কিছুই নাই। বিশেষ কোনটা বড়?—সেই আসল উদ্দেশ্য সিদ্ধিটা, না, একটা কড়া কথা কহায় হৃদয়ে আঘাত লাগিবে, সেই চিন্তাটা? আবার সেই সময়টাই বা কেমন? মায়াবী মারীচ রামের কণ্ঠস্বরের অনুকরণ করিয়া অতি করুণ-স্বরে লক্ষ্মণকে ডাকিতেছে,—"আমার প্রাণ যায়, তুমি একবার এস!" যখন স্বামীর প্রাণ লইয়া এমন বিপদ, কোন্ স্ত্রী তাহা আপন কাণে শুনিয়া স্থির থাকিতে পারে? আবার সীতার মত কোন্ স্ত্রী তাহা শুনিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন? কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিচারের সে সময় নহে। প্রেমের এ আকর্ষণের নিকট কর্ত্তব্যজ্ঞান থাকেও না। সে অবস্থায় স্বামীর জীবন রক্ষা কি উপায়ে হইতে পারে, উদ্বেলিত হৃদয়ে সেই চিন্তা ভিন্ন অন্য চিন্তা আসিতেই পারে না। ইহাই স্বাভাবিক এবং সেই স্বামীর রক্ষার জন্য লক্ষ্মণকে উত্তেজিত করিতে সীতা যাহা কিছু বলিয়াছেন, প্রয়োজন হইলে তদপেক্ষা আরও কিছু মর্ম্মান্তিক কথা বলা অসঙ্গত হইত না। সেই অবস্থা মনে রাখিয়া এবং ইহাই বলা যায়, লক্ষ্মণের প্রতি কোন প্রকার অবিশ্বাসের ভাব সীতার মনে স্থান পায় নাই। লৌহকে আপন ইচ্ছামত কার্য্যে নিযুক্ত করিতে হইলে যেমন উগ্নির উত্তাপে গলাইতে হয়, 'রামের কখন বিপদ হইতে পারে না' এই বিশ্বাসে বলীয়ান্ লক্ষ্মণের সে কঠিন হৃদয় বিচলিত করিতেই সীতার এই উক্তি।

তার পর আর এক কথা,—অন্যান্য দেশের প্রাচীন কবিদিগের মতে যাহা কিছু আদর্শ-স্বরূপ সৃষ্ট হইবে, তাহাতে কণামাত্রও দুর্ব্বলতা বা মলিনতা থাকা উচিত নহে। বিশেষতঃ প্রাচীন গ্রীক কবিদিগের এইরূপ একটা ধারণা ছিল। মাইকেল সেই গ্রীক-কবিদিগের শিষ্য। যোগীন্দ্র বাবু এখানে বোধ হয়, মাইকেলের পক্ষ-সমর্থন করিতে গিয়াই মহর্ষির আদর্শ সৃষ্টি সীতা-চরিত্রের এই স্থান টুকু সেইরূপ "কলঙ্ক"-শূন্য দেখিতে চাহেন। কিন্তু আমাদের মনে হয়, আদর্শ ঠিক্ সেই ভাবে দেখা সঙ্গত নহে। স্বাভাবিক গুণের চরম উৎকর্ষকেই আমরা আদর্শ বলি। অতএব যে দিক দিয়াই দেখা যাক্ না কেন, মহর্ষি-রচিত সীতা-চরিত্রের এই "চন্দ্রের কলঙ্ক" টুকুই অধিকতর স্বাভাবিক এবং অধিকতর পরিস্ফুট; মাইকেলের তাহার উপর 'কারিগিরি' করিতে না যাওয়াই উচিত ছিল। আর আমাদেরও, রামায়ণকে কেবলমাত্র "কবি-কল্পিত" সৃষ্টি মনে না করাই ভাল।

তথাপি, একথাও অম্লান বদনে বলিতে পারি, এই অপূর্ব্ব গ্রন্থে প্রশংসার বিষয় এত অধিক আছে যে, তাহার সহিত ওজনে ও ত্রুটীটুকু ত্রুটীই নয়! কেবল কর্ত্তব্যানুরোধে কথাটী উল্লেখ করিলাম মাত্র।

উপসংহারে আবার বলি, এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া আমরা যেরূপ তৃপ্তিলাভ করিয়াছি, অনেক দিন এরূপ তৃপ্তিলাভ ভাগ্যে ঘটে নাই। এরূপ গ্রন্থ দেশের গৌরব!

হোমিওপ্যাথিক সরল জ্বর চিকিৎসা। ডাক্তার শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য ।০ চারি আনা। এই গ্রন্থ শিক্ষানবিশদিগের উপকারে আসিতে পারিবে।

জন্মভূমি।

৫ম ভাগ। } ভাদ্র। ১৩০২। { ৯ম সংখ্যা।

অদৃষ্ট।

(গত জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যায় প্রকাশিতের পর)

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

সরোজিনী প্রভাতে মহা ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া স্নান করিয়া আসিতেছেন, নিস্তারিণী ফুল তুলিতে গিয়াছে, হেমাঙ্গিনী পূজার আয়োজন করিতেছে। সরোজিনী আজ স্বামীর মঙ্গলার্থে পূজা দিবেন।

সরোজিনী আর্দ্রবসনে উপরে যাইতেছেন, এমন সময়ে বিন্দুবাসিনী আসিয়া তাঁহার সম্মুখের পথ আগুলিয়া দাঁড়াইলেন; দাঁড়াইয়া অতি ইতর লোকের ন্যায় সরোজিনীকে কটূক্তি করিতে লাগিলেন। সরোজিনী একেবারে বিস্মিত, স্তম্ভিত আর কতকটা ভীত! হইবারই কথা যে! এ যে বিনামেঘে বজ্রাঘাত!

সরোজিনী জিজ্ঞাসিলেন,—"কি হ'য়েছে মা! আমি কি ক'রেছি?"

বিন্দু। 'কি হ'য়েছে মা!' যেন কিছু জানেন না!

সরো। আমি সত্যই কিছুই জানি না।

বিন্দু। জান না, তো তোমাদের এত আস্পর্দ্ধা কেন? দেনার দায়ে আমি কেন টাকা দেব? আমি কি ধার ক'রে খেয়েছি? এই জন্যেই ভিন্ন হ'য়েছি; তবু তোমাদের লোভ!

প্যারীমোহন কলিকাতা যাইবার কয়েক মাস পরে বিন্দুবাসিনী রাধিকামোহনের সহিত ভিন্ন হইয়াছেন।

নিস্তারিণী ফুল লইয়া ঘরে ঢুকিতেছে; সম্মুখেই সরোজিনীকে দেখিয়া কহিল,—"সরোজিনী! আবার সেই বর্দ্ধমানের লোক এসেছে!"—

তাহার কথা শেষ হইতে-না-হইতেই, বিন্দুবাসিনী জোর গলা বাহির করিয়া বলিতে লাগিল,—"পাজি বেটী! বর্দ্ধমানের লোক এসেছে তো আমার কি লা? সকলে মিলে দল বেঁধেছ? আমি দেনার টাকা দেব? কেন? কার জন্যে? আমি কি ব্যাটার বে দিয়েছি? তোর মনিবকে বল্‌তে পারিস্ নে? তার মাগ-ছেলের গায়ে তো গহনা আছে!"

বিন্দুবাসিনী একাই একশ! কথার তোড়ে সাম্‌নে দাঁড়ায় কার সাধ্য! নিস্তারিণীর মুখে কোন কথা সরিল না। বিন্দুবাসিনীর মুখ হইতে বৃষ্টিধারার ন্যায় গালিবর্ষণ হইতে লাগিল। সরোজিনী অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

বিন্দুবাসিনীর চীৎকারে রাধিকামোহন বাটীর ভিতর আসিতে বাধ্য হইলেন। তথাপি সে চীৎকার থামে না; অবশেষে রাধিকামোহন, বিমাতার হাতে পায়ে ধরিয়া বলিলেন,—"মা, আপনি থামুন; আপনার কাছে এক পয়সা চাহিব না; চাহিয়া আমি ঋকুমারী করিয়াছি! পিতার ঋণ, যেখান হইতে পারি, আমি শোধ দিব।"

ঋণ বর্দ্ধমানের রাজবাটীতে। বহুপূর্ব্বে জমিদারী নীলাম হইয়া উক্ত বসুরা উক্ত রাজবাটীতে অনেক টাকার দেনাদার হন; পূর্ব্বে অনেক টাকা পরিশোধ হইয়াছে! এখনও মায় শুদে-আসলে দুই হাজার টাকা দেনা! বহুকালের দেনা, এবার কড়ায়-গণ্ডায় শোধ করিতে হইবে।

হিসাবমত বিন্দুবাসিনীও এক হাজার টাকার দেনাদার! কিন্তু তিনি এক পয়সা দিবেন না। রাধিকামোহন তাঁহার কাছে টাকা চাহিয়াছিলেন বলিয়া তিনি এতক্ষণ লঙ্কাকাণ্ড করিলেন।

বৈঠকখানায় রাজার লোক বসিয়া আছেন,—কাল রাত্রি হইতে তাঁহাদিগকে টাকা দেওয়া হইবে বলিয়া রাধিকামোহন প্রতিশ্রুত হইয়া আছেন। এখন টাকা কোথায়? রাধিকামোহন মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন! তিনি কি করিয়া মুখ দেখাইবেন?

সাধ্বী সতীর প্রাণে কি স্বামীর কষ্ট সহ্য হয়? স্বামীর বিষণ্ণ বদন দেখিয়া সরোজিনীর বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইয়া গেল! সরোজিনীর নয়নপল্লব অশ্রুধারায় সিক্ত হইল। সতী মুখ ফিরাইয়া অশ্রু মুছিয়া স্বামীকে কহিলেন,—"স্বামিন্! এজন্য চিন্তা কেন? দুই হাজার টাকা তো এখনও তোমার ঘরে তোলা আছে?"

রাধিকা। কোথা সরোজিনী? তা হ'লে তো আজ বংশের বিপুল মান রক্ষা হয়!

সরোজিনী গহনার বাক্স খুলিলেন—গহনাগুলি বাহির করিলেন! অবশেষে নিজের গাত্র হইতে সবগুলি উন্মোচিত করিয়া আনিয়া স্বামীর সম্মুখে ধরিয়া কহিলেন,—"এতে দু হাজার টাকা হবে।"

রাধিকামোহন সেদিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া, সরোজিনীর মুখের পানে চাহিয়া কহিলেন,—"তোমার গহনা বেচে দেনা দোব?" সরোজিনী কহিলেন,—"এখন বাঁধা দাও—দেনা শোধ কর।"

রাধিকামোহন সরোজিনীর আপাদ-মস্তক দেখিয়া কহিলেন,—"এ তুমি কি সেজেছ?"

সরো। কেন অনর্থক বেলা হয়?

রাধিকামোহন কোন উত্তর করিলেন না! তাঁহার যেন বুদ্ধি লোপ হইল। বৈঠকখানা হইতে রাজার লোক রাধিকামোহনকে শীঘ্র টাকা আনিতে বলিয়া পাঠাইলেন।

তখন আর উপায় নাই। রাধিকামোহন নিশিকান্তকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। নিশিকান্ত আসিয়া গহনার ফর্দ্দ করিয়া সেগুলি বাঁধা দিয়া দুই হাজার টাকা আনিলেন।

বেলা এক প্রহরের সময় রাজার লোক টাকা লইয়া উঠিয়া গেল। বসুগোষ্ঠী ঋণ হইতে মুক্ত হইলেন।

কিসে কি হয়, কে বলিতে পারে? কোন্ সূক্ষ্মগতিতে মানবের মঙ্গল অমঙ্গল সাধিত হইতেছে, তাহা কে নির্ণয় করিতে পারে? কিছুক্ষণ পূর্ব্বে কে ভাবিয়াছিল যে, দেনার দায়ে সরোজিনীর অলঙ্কার-রাশি বেণের দোকানে বাঁধা পড়িবে?

গহনা বাঁধা পড়িল বলিয়া বিস্ময়ের কথা কিছুই নহে; মানব-জীবনের ঘটনার বৈচিত্র্য দেখিয়াই পলকে পলকে বিস্মিত, স্তম্ভিত ও শিহরিত হইতে হয়!

সরোজিনীর অঙ্গে আর অলঙ্কারের লেশমাত্র নাই। তথাপি সে দেহের অপূর্ব্ব, অব্যক্ত এক পবিত্র জ্যোতিঃ তাঁহাকে সর্ব্বাংশে অতুলনীয় করিয়া রাখিল।

সরোজিনী পূজার আয়োজন ব্যর্থ করিলেন না! যাহা ঘটিবার, তাও ঘটিবেই! ঘটিয়াও গেল! তবে তুমি কর্ত্তব্য-কর্ম্মে অবহেলা করিবে কেন?

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

সমুদ্র-মেখলা পৃথিবী সূর্য্যমণ্ডলকে একবার প্রদক্ষিণ করিল! সময়ের চক্র আপনার নির্দ্দিষ্ট পথে একবার বিঘূর্ণিত হইয়া আসিল—কালসাগরে একটী তরঙ্গ মিশিয়া গেল। এক বৎসর অতিবাহিত হইল—প্যারীমোহনের কলেজ গ্রীষ্মাবকাশে বন্ধ হইল।

প্যারীমোহন ছুটী পাইয়া পূর্ণ দত্তের সহিত বাটী আসিতেছেন; হৃদয়ে আনন্দের হিল্লোল বহিতেছে। কিন্তু সে আনন্দের হিল্লোলে নিরানন্দের ফেনরাশি উঠিল, আশার প্রদীপ নিরাশার নির্ম্মম ফুৎকারে নির্ব্বাপিত হইল! সুখের নন্দন-কানন দুঃখের মরুভূমি হইয়া উঠিল।

তিনি বাটীতে আসিয়া দেখিলেন, মা দাদার সহিত পৃথক্ হইয়াছেন; তিনি আর বড়-বধূর সহিত কথা কহেন না; দাদা বা বড়-বধূও বড়-একটা এদিকে আসেন না।

এ অভাবনীয় পরিবর্ত্তন দেখিয়া প্যারীমোহন একেবারে বিস্মিত, স্তম্ভিত এবং বড়ই মর্ম্মাহত হইলেন। তিনি একদিন সরোজিনীকে কহিলেন,—"তুমি গহনা পর না কেন বড়-বউ?"

সরোজিনী কহিলেন,—"আলস্য হয়।"

প্যারীমোহন ভাবিতে লাগিলেন,—"বড়-বধূর কি প্রত্যহই আলস্য হয়? অবশ্য এর কোন কারণ আছে।"

পূর্ণ দত্তের সহিত প্যারীমোহনের বড় সখ্য! একদিন পূর্ণদের বাটীতে কোন কার্য্য উপলক্ষে পূর্ণ দত্ত আসিয়া বসুদের বাটীর সকলকে নিমন্ত্রণ করিয়া গেল! পূর্ণর মার বড় সাধ যে, সরোজিনী তাঁহাদের বাটীতে যান, এজন্য তিনি পুনরায় বিশেষ করিয়া বলিয়া পাঠাইলেন।

কিন্তু নিরাভরণা সরোজিনী যান কি করিয়া? রাধিকামোহন বিষণ্ণ-বদনে বসিয়া রহিলেন! প্যারীমোহন আসিয়া অগ্রজের বিষণ্ণ মুখ দেখিয়া বড়ই উদ্বিগ্ন হইলেন! তিনি অগ্রজের কোন অসুখের আশঙ্কা করিলেন! তিনি কি বলিবেন, কি জিজ্ঞাসিবেন, ভাবিয়া পান না।

আগুন কখনও লুকাইয়া থাকে না! ক্রমশঃ সকল কথাই প্যারীমোহন শুনিলেন। তখন তিনি বুঝিলেন, বড়-বধূর একখানিও গহনা নাই! তাই আজ দাদা মহাশয় কিরূপায় দীনভাবে বিষণ্ণ-মুখে বসিয়া আছেন! এ অবস্থায় তিনি বড়-বধূকে পাঠাইবেন কি করিয়া? সেখানে আরও পাঁচটী কুটুম্বের কন্যা একত্রিত হইয়াছেন! না পাঠাইলে কিন্তু পূর্ণরা যার-পর-নাই মনোদুঃখ করিবে!

এইখানেই মানবের দুর্ব্বলতা! কিন্তু তা রাজার রাণী একেবারে ভিখারিণী সাজিবে কিরূপে?

কিন্তু সে সাধ্বী সরোজিনী অনেক বলিল! স্বামীকে, দেবরকে অনেক বুঝাইল! গহনা না পরিলে কি আত্মীয়তা থাকে না? যাদের গহনা নাই, তাদের কি কুটুম্বিতা নাই?

কোন কোন পাঠক-পাঠিকা সরোজিনীর এ ভাবকে হয় তো অস্বাভাবিক বোধ করিবেন!

আমরা এখানে সংক্ষেপেই বলি, কোনরূপে সেদিন পূর্ণর বাটীতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করা হইল!

কিন্তু সেইদিন হইতে প্যারীমোহনের হৃদয়ে একটা দারুণ অশান্তি আসিয়া উপস্থিত হইল!

সংসারের নানা বিসদৃশ মূর্ত্তি দেখিয়া তিনি অন্তরে অন্তরে দগ্ধ হইতে লাগিলেন; তিনি ভাবিতেন,—"কে-বলে এ সংসার, সুখের হাট, এ তো দুস্তর দুঃখের অকূল পাথার!"

তিনি একদিন বিরলে বসিয়া জননীকে অতি বিনীত-ভাবে বর্দ্ধমানের ঋণ-সংক্রান্ত সকল কথা বলিলেন। বর্দ্ধমানের ঋণ তো দাদার একার নহে! সে ঋণের জন্য কেবল দাদার অর্থ যাওয়া উচিত নহে! তাঁহার মতে—"দাদার বড় সংসার, কিন্তু আমাদের কম খরচ, ঋণের সব টাকাই তো আমাদের দেওয়া উচিত ছিল! দাদা ক্রমশঃ শোধ করিতেন।"

কিন্তু তাঁর কথা কে শোনে? বিন্দুবাসিনী তাঁহার উপর বড়ই রাগ করিলেন।

প্যারীমোহন আর কিছু বলিলেন না, নিরস্ত হইয়া গেলেন।

যে কয়দিন বাটীতে রহিলেন, প্যারীমোহন ইস্কুলের বালকের মত—পরের ঘরে পরের ছেলের মত, চুপ করিয়া রহিলেন। তিনি সংসারের কোন কথায় কথা কহিলেন না, কোন দিকে চাহিয়া দেখিলেন না।

ছুটীও শেষ হইয়া আসিল, প্যারী পুর্ণর সঙ্গে কলিকাতায় গেলেন।

কিন্তু যে হৃদয় লইয়া কলিকাতা হইতে আসিয়াছিলেন, সে হৃদয় লইয়া বাটী হইতে যাইতে পারিলেন না।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

ম্যালেরিয়া একবার ধরিলে আর রক্ষা নাই। কয়েক মাস পরে রাধিকামোহন পুনরায় ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইলেন; অনেকেই আবার পড়িলেন, কিন্তু এবার কতকটা 'গা-সওয়া" হইয়া উঠিল।

রাধিকামোহন মধ্যে কয়েকদিন বেশ সুস্থ রহিলেন, আবার পড়িলেন! এইরূপ পুনঃপুনঃ আক্রমণে তাঁহার দেহ বড় অসুস্থ হইয়া পড়িল। তিনি চিরকাল সুখে লালিত-পালিত, অশেষ ভোগ সুখে তাঁহার দেহ পরিপুষ্ট, সে দেহ যেন একেবারে ভাঙ্গিয়া গেল! স্বাস্থ্য চিরতরে নষ্ট হইল! তেমন রূপ-লাবণ্যে যেন কে কালী ঢালিয়া দিল। এমনই ম্যালেরিয়া-রাক্ষসীর প্রতাপ!

রাধিকামোহন এক্ষণ তাঁহার জমিদারীর অনেক কার্য্যই নিশিকান্তের উপর নির্ভর করিলেন। নিশিকান্তও বিশেষ দক্ষতার সহিত তাঁহার আদিষ্ট-কার্য্য সকল সমাধা করিতেন। এমন কি, বহু সময়ে নিশিকান্ত রাধিকামোহনের আশাতিরিক্ত রূপে কার্য্যে সফলতা দেখাইতেন। এমন কৃতী পুরুষকে—এমন কর্ত্তব্য-নিষ্ঠ কর্ম্মচারীকে কে না ভালবাসিবে? মনের মত কার্য্য করিলে কে না তার পক্ষপাতী হয়?

বিশেষতঃ নিশিকান্ত যেমন কাজের লোক, তেমনই মিষ্টভাষী! সকল লোকেই নিশিকান্তের কথায় পরিতুষ্ট হইত! শরীরের অসুস্থতা নিবন্ধন রাধিকামোহন বাটীর ভিতরে বসিয়াই জমিদারীর কার্য্য দেখিতেন; এজন্য নিশিকান্তকেও প্রায় সর্ব্বদা তাঁহাদের বাটীর ভিতরে যাইতে হইত! জমিদারীর কার্য্য না করিলেও রাধিকামোহন নিশিকে ডাকিয়া পাঠাইতেন; নিশির সহিত দুই দণ্ড বাক্যালাপ করিয়াও তিনি বড় প্রীত হইতেন। তিনি বাটীর সকলকেই প্রায় বলিতেন,—"নিশির কাছে আমি চিরদিন কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ থাকিব।"

কিন্তু কোন বস্তুর উপর-উপর আমরা যাহা দেখিতে পাই, তাহার অভ্যন্তরও যদি সেইরূপ দেখিতে পারিতাম, তাহা হইলে আর ভাবনা ছিল কি? মনুষ্যের আকৃতির মত যদি তাহার প্রকৃতি গঠিত হইত, তাহা হইলে তো এ সংসার স্বর্গোপম হইত! অন্ততঃ অতি সহজেই তাহা হইলে ভাল-মন্দ বুঝিতে পারা যাইত!

নিশিকান্ত এই যে সরল, সাধু-পুরুষটীর মত নিত্য হিসাব লইয়া আসে যায়, নানাবিধ প্রিয়বাক্যে রাধিকামোহনকে পরিতুষ্ট করে, এ গেল তাহার উপরের ভাব! তাহার অন্তর কিন্তু কেহ দেখে নাই! সেখানে ইন্দ্রের অশনি, বরুণের পাশ, যমের দণ্ড, শিবের ত্রিশূল, এই-রূপে অষ্ট বজ্র মিশিয়া একটা ভয়ঙ্কর ব্রহ্মাস্ত্র প্রস্তুত হইতেছে! আর কিছুপরেই এ দারুণ ব্রহ্মাস্ত্রে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড লণ্ডভণ্ড হইয়া যাইবে!

অনেক সময়ে বোধ হয়, এ সংসারটা সত-রঞ্চ-খেলার ছক্! পাকা খেলওয়াড় নিশিকান্ত এই ছকে "কিস্তিমাৎ" করিবার মৎলবে আছেন! তাই এখন ব'ড়ের চালে চ'লছেন! ঘোড়া, গজ, নৌকা, মন্ত্রী এখনও হাতে আছে!

কিন্তু সে কথা এখন থাক্! সম্মুখে ঐ যে একটা ভয়ঙ্কর বিপদ প্রগাঢ় অন্ধকার-রাশির ন্যায় চারিদিক্ আবৃত করিয়া আসিতেছে,—পাঠক, এখন সেইটা দেখি আসুন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

বৈশাখের সন্ধ্যাকাশে যেমন আচম্বিতে করাল-কাদম্বিনী জাগিয়া উঠে, তেমনই রাধিকামোহনের অদৃষ্টাকাশে সহসা এক ঘোর বিপদের ভীষণ মেঘ দেখা দিল। সহসা গ্রামের ঈশান বাবু আসিয়া রাধিকামোহনকে বলিলেন,—"আগামী কল্য লাট কল্যাণপুর নীলাম হইবে।" রাধিকামোহনের মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল! লাট কল্যাণপুর যে তাঁহারই পত্তনী মহাল! একে তাঁহার রুগ্ন শরীর, তার উপর আবার এই বিপদের কথা শুনিয়া তিনি একেবারে কাঁপিতে লাগিলেন; তৎক্ষণাৎ নিশিকান্তকে ডাকিয়া পাঠাইলেন; নিশিকান্ত আসিলে তিনি বলিলেন,—"নিশি! এ যে বিনামেঘে বজ্রাঘাত!"

নিশি। কি হইয়াছে মহাশয়?

রাধিকা। বুঝি আমার সর্ব্বনাশ হইল! লাট কল্যাণপুর নীলাম হইবে।

নিশি। কে এ কথা বলিল মহাশয়?

রাধিকা। ঈশানবাবু এইমাত্র হুগলী হইতে আসিয়া আমাকে এই সংবাদ দিয়া গেলেন।

নিশি। তিনি মিথ্যা বলিবেন না!

রাধিকা। নিশি! এ বৎসর কি কিছুই টাকা দেওয়া হয় নাই?

নিশি। কিরূপে দেওয়া হইবে মহাশয়! টাকা কোথা পাইব? এ দুর্ব্বৎসরে কিছুই আদায় হয় নাই; যাহা হইয়াছে, সমস্তই আপনার খরচ হইয়াছে; বলেন তো খাতাপত্র সব আনি।

রাধিকা। খাতাপত্রে আবশ্যক কি? আমি তো তোমাকে অবিশ্বাস করিতেছি না; কিন্তু একদিনের জন্যও তো বল নাই যে, রাজ-বাটীতে কিছুই ওয়াশীল পড়িতেছে না।

নিশি। আপনার কঠিন পীড়া, কিরূপে আমি আপনাকে বিরক্ত করি!

রাধিকা। ইহা তো আমারই কাজ! তোমার উপর যে সমস্তই ভার দিয়া আমি নিশ্চিন্ত আছি নিশি!

নিশিকান্ত নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। এ তর্ক-বিতর্কের সময় নহে ভাবিয়া রাধিকামোহন জিজ্ঞাসিলেন,—"নিশি? তহবিলে কি মজুত?"

নিশি। কিছু কম একশত টাকা।

রাধিকামোহন মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন! এ নীলাম বন্ধ করিতে দুই হাজার টাকা চাই! স্বরে আর কোন অলঙ্কার নাই যে, তিনি তাহা বাঁধা দিবেন! এ সময়ে কে তাঁহাকে এত টাকা দিবে? রাধিকামোহন ভগবান্‌কে স্মরণ করিলেন।

তিনি ভাবিতে ভাবিতে উঠিলেন, তাঁহার পদদ্বয় কাঁপিতেছে! তিনি বিমাতার কাছে যাইয়া, তাঁহার পায়ে ধরিয়া মিনতি করিয়া, সমস্ত বিপদের কথা জানাইয়া দুই হাজার টাকা কর্জ্জ চাহিলেন। কিন্তু মরুভূমিতে কি জল-সঞ্চার হয়, না, পাষাণ কখনও কোমল হয়? বিন্দুবাসিনীর নৃশংস হৃদয়ে এক বিন্দুও দয়ার সঞ্চার হইল না। সে রমণী হইলে কি হইবে, তাহার হৃদয়ে বিন্দুমাত্র স্নেহ ছিল না। এ নিদারুণ বিপদে বিন্দুবাসিনী রাধিকামোহনকে একটী পয়সাও সাহায্য করিল না।

রাধিকামোহন আসিয়া নিরবলম্বের ন্যায় বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার জ্ঞানবুদ্ধি সবই যেন বিলুপ্ত হইল! তিনি দেখিতে লাগিলেন, তাঁহার চারিদিকে যেন নৈরাশ্যের ভীষণ-সমুদ্র স-ফেন তরঙ্গ-ভঙ্গে গর্জ্জিয়া উঠিতেছে!

তখন নিশিকান্ত ধীরে ধীরে রাধিকা-মোহনকে বলিলেন—"আপনি এত নিরাশ হইবেন না।"

রাধিকামোহন নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। নিশি আবার বলিল,—"বহুদিন বিদেশে থাকিয়া কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়াছি; এখন আপনার ঘোর বিপদ! এখন আমার সে অর্থে আপনার উপকার দর্শিতে পারে।"

এ সব কথা রাধিকামোহন স্বপ্নের ন্যায় ভাবিতে লাগিলেন! এ যে মরুভূমিতে সুধা-বৃষ্টি! এও কি সম্ভব? তিনি নিশির মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন।

নিশি। আমি সত্যই বলছি মহাশয়!

বাস্তবিক নিশিকান্ত রাধিকামোহনকে দুই হাজার টাকা কর্জ্জ দিল! রাধিকামোহন তদ্দণ্ডে নিশিকান্তকে একখানি "অনডিম্যাণ্ড হ্যাণ্ড নোট" লিখিয়া দিলেন।

রাধিকামোহন যে কি বলিয়া নিশিকে কৃতজ্ঞতা জানাইবেন, খুঁজিয়া পান না; তিনি কহিলেন,—নিশি! ঈশ্বর তোমাকে সুখে রাখুন; আমরা সপরিবারে তোমার নিকট ঋণী।"

রাধিকামোহন সেই রাত্রিতেই হুগলী যাত্রা করিলেন; দ্রুত গমনে সক্ষম এমন ১২ জন বেহারা তাঁহার পাল্কী লইয়া চলিল; তাঁহাকে তৎপর দিবস হুগলী পঁহুছিতেই হইবে। তাঁহার এই দুর্ব্বল শরীরে, কেবল সাহসে ভর করিয়া তিনি পাল্কীতে উঠিয়া চলিলেন। শীঘ্র পঁহু-ছেন, এই আশায় তিনি ক্রমাগত বেহারাগণকে দ্রুত চলিতে বলিলেন। কিন্তু মনুষ্যের আশা কদাচিৎ সফল হয়!

এ সংসার পাপপুণ্যের—কর্ম্মফলের ভোগ-ভূমি! কর্ম্মফল অদৃষ্টরূপে মনুষ্যের জীবনকে শাসিত করে! সেই অদৃষ্টের হাত এড়াইয়া যাইবার কাহারও সামর্থ্য নাই! যদি থাকিত, তবে রাধিকামোহন এত চেষ্টাতেও—এমন কি, যাহা দুর্লভ, সেই দুই সহস্র টাকা হস্তগত করিয়াও—কেন জমিদারী রাখিতে পারিলেন না? এমনই দুরদৃষ্ট যে, পথের মাঝে তাঁহার পাল্কীর বাঁট ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি হুগলী যাইয়া পঁহুছিলেন, রাত্রি এক প্রহরের সময়! যাইয়া শুনিলেন, লাট কল্যাণপুর ১০,০০০ হাজার টাকা মূল্যে বিক্রয় হইয়া গিয়াছে! শুনিবামাত্র তিনি সেখানে ছিন্নমূল কদলীবৃক্ষের ন্যায় আছাড় খাইয়া পড়িলেন! তাঁহার মূর্চ্ছা হইল! সকলে ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে তুলিল! সকলেই তাঁহার সেবা-শুশ্রূষা করিতে লাগিল।

তৎপর দিবস যখন তিনি বাটী আসিলেন, তখন পাল্কীতেই তিনি মৃতবৎ—একেবারে সংজ্ঞা নাই! সকলে ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে ঘরে তুলিয়া লইয়া গেল! সরোজিনী ও নিস্তারিণী তাঁহাকে দেখিয়া একেবারে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

রাধিকামোহনকে দেখিয়া যখন সকলে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল, তখন নিশিকান্ত বাহিরে আসিয়া দেখিল, পাল্কীর মধ্যে নোটের বাণ্ডিল পড়িয়া আছে; আর তিলমাত্র বিলম্ব সহিল না; "প্রাপ্তমাত্রেণ ভোক্তব্যং"—নিশি-কান্ত তৎক্ষণাৎ তাহা উঠাইয়া লইয়া সেখান হইতে প্রস্থান করিল। কেবা কিসের সংবাদ রাখে? নোটের বাণ্ডিল যে পাল্কীতে ছিল, তাহা কেহই জানিত না।

এদিকে রাধিকামোহনের সেই প্রবল জ্বর আর বিচ্ছেদ হইল না; সমান ভাবে তাহা চৌদ্দ দিন ভোগ করিল,—একেবারে সংজ্ঞাহীন অবস্থা; তৎপরে ক্রমশঃ অল্পে অল্পে জ্বরের বিরাম হইল বটে, কিন্তু রাধিকামোহন শয্যা হইতে উঠিতে পারিলেন না; উঠিতে গেলে বুকে লাগে; কথা কহিলে কষ্ট হয়; কেহ তাহার নিকটে জোরে একটু শব্দ করিলে তিনি চমকিয়া উঠেন।

লাট কল্যাণপুর যাহারা নীলামে ডাকিয়া লইয়াছিল, তাহারা নিশিকান্তকে চাকুরী দিল না; তাহারা নিশিকান্তর মুখের উপরই বলিল, —"তুমি একজনের সর্ব্বনাশ করিয়াছ, আমা-দেরও যে না করিবে, তাহা কিরূপে জানিব?"

নরাধম নিশিকান্তই এ জমিদারী নীলামের মূল!

সেই ধূর্ত্ত কিন্তু রাধিকামোহনের বিমাতার নিকটে আসিয়া, তাহাকে কথায় মুগ্ধ করিয়া, প্যারীমোহনের কারবারে একটী চাকুরী লইল। নিশিকান্তর প্রধান একটা গুণ ছিল, যে তাহাকে একবার পরীক্ষা না করিয়াছে, সেই তাহার মুখমিষ্টিতে তাহার পক্ষপাতী হইয়াছে। ধূর্ত্ত, শঠ, প্রবঞ্চকদিগের এই গুণটা প্রায়ই থাকে

রাধিকামোহনের ব্যারামের সময়ে নিশি-কান্ত প্রত্যহ দুই তিন বার আসিয়া দেখিয়া যায়; অনেক সময়ে সে রাধিকামোহনের সেবা-শুশ্রূষার বন্দোবস্ত ও সাহায্য করে; অপর কথা কি, নিস্তারিণী ও সরোজিনী নিশিকে জিজ্ঞাসা করিয়াই রোগীর আহার-ঔষধের ব্যবস্থা জানিয়া থাকে।

কিন্তু এই প্রচ্ছন্নবেশী ধূর্ত্ত নরাধমের হৃদয়ে যে গরলের সমুদ্র বহিতেছে, তাহা কে বুঝিতে পারিবে বল? কে জানে যে, অমৃতে হলাহল উঠিবে? সুখস্পর্শ সমীরণে অগ্নির জ্বালাময় তরঙ্গ বহিবে? যে ধর্ম্ম দিয়া, মন দিয়া, বুঝি প্রাণ দিয়াও উপকার করে, সে যে মৃত্যু-বাণ লইয়া ঘুরিতেছে, এও কি কাহারও ধারণা হয়?

স্বামীর এ সঙ্কট পীড়ায় নিশিকান্তের কাছে সরোজিনীর কিছুই লজ্জা ছিল না বলিলেই হয়; অনেক সময়ে সরোজিনী বাধ্য হইয়া নিশিকান্তকে স্বামীর রোগ-সম্বন্ধীয় কথা জিজ্ঞাসা করিয়া লয়। লিখিতে হৃদয় স্তম্ভিত হইয়া পড়ে, লেখনী অবশ হয়,—একদিন নরাধম নিশি নিভৃতে সরোজিনীকে দেখিয়া স্বীয় পাপাভিলাষ ব্যক্ত করিয়া ফেলিল! সাধ্বীর তখন সে মনের অবস্থা অনুভবনীয়, বলিবার নহে;—সাধ্বী কর্ণে অঙ্গুলি দিয়া ত্বরিত-পদে সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন।

কিন্তু পাপিষ্ঠের হৃদয় উত্তেজিত! পিশাচ তখন মোহান্ধ! তাহার বিবেক-বুদ্ধি বিলুপ্ত হইয়াছে! পুনরায় একদিন সে সেই পাপকথা উচ্চারণ করিল। পুনরায় সরোজিনীকে পলা-য়নপরা দেখিয়া কহিল,—"সুন্দরি! আজ আর যেতে দিচ্ছি না! আমার কথা রাখ, নচেৎ জান, আমার হাতে কি ব্রহ্মাস্ত্র আছে?" সরোজিনী সে সব কথায় কর্ণপাতও না করিয়া প্রচণ্ডবেগে নিশিকে এক পদাঘাত করিয়া গৃহের বাহির হইলেন। নরাধম তথাপি ঘুরিয়া সরোজিনীর কেশমুষ্টি ধরিল। তখন "রক্ষা কর,

রক্ষা কর" বলিয়া সরোজিনী আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। সেখানে হেমাঙ্গিনী, নিস্তারিণী প্রভৃতি সকলে আসিয়া পড়িল! পাপিষ্ঠ পিশাচ তখন লম্ফ দিয়া বেগে পলায়ন করিল।

কেহ এ সব কথা রাধিকামোহনকে শুনাইল না। শুনিলে মিছামিছি কেবল তাঁহার ক্রোধ হইবে, দুঃখে, অপমানে, অভিমানে তাঁহার সে ভগ্ন-হৃদয় আরও ভাঙ্গিয়া পড়িবে;—তাই কেহ রাধিকামোহনকে সে পাপ-কথা শুনাইল না।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

দুরাত্মা নিশিকান্ত নিভৃতে বসিয়া সরোজিনীর কথা ভাবিতে লাগিল,—"এত করিলাম, শেষে ঘর হইতে টাকা দিলাম, আমি যে কত উপকার করি, তাহা কত দেখাইলাম, তথাপি সরোজিনী হস্তগত হইল না! কিন্তু এখনও একেবারে আশা ছাড়িব না।"

দুরাশয় আশায় মুগ্ধ হইয়া দুরভিসন্ধি-সাধনের নিমিত্ত ভিতরে ভিতরে অনেক মতলব আঁটিল। ইতরজাতীয়া স্ত্রীগণের সাহায্য লইল! কিন্তু সে নরাধমের সাধ্য কি যে, সতী-সাধ্বীর কেশাগ্রভাগ স্পর্শ করিতে পারে?

গ্রামের দুএকজন লোক ক্রমশঃ নিশিকান্তকে জিজ্ঞাসিতে লাগিল,—"তুমি আর বসুদের বাড়ী যাও না যে?" এজগতে পাপাত্মার অসাধ্য কিছুই নাই! নিশিকান্ত অবাধে সকলকে কহিল,—"রাধিকা বসুর স্ত্রী সরোজিনী কুলটা; কুলটা আমাকে মজাইতে চায়! আমি গরীবের ছেলে! শেষে কি প্রাণ যাবে? প্রাণের ভয়ে ওদিকই ছাড়িয়া দিয়াছি"

ইতর, অকর্ম্মণ্য ও নিষ্কর্ম্মা লোকের ইহাতে বড় আনন্দ! তাহারা ইহা লইয়া গ্রামে একটা স্থূলস্থূল কাণ্ড বাধাইয়া বসিল; সরোজিনী ও নিস্তারিণী সবই শুনিল! রাধিকামোহন চব্বিশ ঘণ্টাই শয্যাগত আছেন; তাঁহাকে এ সব কথা কেহ শুনাইল না। সরোজিনী স্বামীর সেবা-পরায়ণা হইয়া এ সব কথা মনে স্থান দিলেন না।

একদিন গ্রামের কয়েকজন লোক নিশিকান্তকে লইয়া ঐ সকল কথার আন্দোলন-আলোচনা করিতেছে; সকলেরই মতে—"মেয়ে-মানুষ ভাল হইলে পুরুষের সাধ্য কি? আর একাজে নিশিরই বা দোষ কি?" গুঁড়ীর সাক্ষী মাতাল! তাহা না হইলে মিলিবে কেন?

কিন্তু সেই সময়ে সহসা সেখানে ঈশানবাবু আসিয়া পড়িলেন—গ্রামে তিনি স্পষ্টবক্তা বলিয়া প্রসিদ্ধ; তিনি ঐ কথা শুনিয়াই ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিলেন; তিনি রাগিয়া উঠিলে স্পষ্টরূপে কথা কহিতে পারিতেন না; তাঁহার "তোতলা" দোষ ছিল; তিনি বিষম রাগিয়া কহিলেন—"খ-খ-খ-বরদার, ওসব কথা ব-ব-ব লিস্ না।" এইরূপে তিনি বিধিমতে তাহাদিগকে তিরস্কার করিলেন। নিশিকান্তকে তিনি "চোর, মিথ্যাবাদী, বিশ্বাস-ঘাতক" এবং আরও অকথ্য ভাষায় গালি-গালাজ দিতে লাগিলেন। সকলকেই বুঝাইয়া দিলেন, এই নরাধমের দুরভিলাষ চরিতার্থ হয় নাই বলিয়া পাপিষ্ঠ সেই সৎকুলে কালী দিতে বসিয়াছে। অনেকে সেই সময় হইতে আবার নিশিকান্তকে ঘৃণা করিতে লাগিল।

দুর্জ্জনের স্বভাবই এই যে, সে সুজনের নামে অপযশ দিয়া, নিজের অপকীর্ত্তি ঢাকিবার চেষ্টা করে! নিশিকান্তও তাই করিয়াছিল; কিন্তু এক্ষণ আবার সকলের নিকট লাঞ্ছিত, ঘৃণিত ও অপমানিত হইয়া রাধিকামোহনের সর্ব্বনাশ সাধনের পথ পরিষ্কার করিতে উদ্যত হইল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

সন্ধ্যাকাল, আকাশে মেঘ, ঝড়, বিদ্যুৎ, বজ্রাঘাত। জগৎ অন্ধকারে আবৃত হইয়া আসিতেছে! গঙ্গা যেন রণোন্মাদে উন্মত্তা হইয়া পর্ব্বত-প্রমাণ তরঙ্গ তুলিতেছেন। ঠিক এমনই সময়ে গঙ্গার ধারে দাঁড়াইয়া পূর্ণ দত্ত প্যারীমোহনকে বলিলেন,—"ভাই! তোমাকে কত নিষেধ করিলাম—তুমি নিষেধ শুনিলে না দেখ দেখি, নদীর কি ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি!"

প্যারীমোহন কহিলেন,—"যেমনই হ'ক, আমি নদী পার হইব।"

পূর্ণ। কিরূপে হইবে? নৌকা বন্ধ।

প্যারী। নৌকা না পাই, সাঁতার দিয়া পার হইব।

প্যারীর স্বর দৃঢ়তা-ব্যঞ্জক।

পূর্ণ। আজ নাই গেলে।

প্যারী। এ পত্র পেয়ে কি আর নিশ্চিন্ত থাকা যায়! আজ আমি নিশ্চয় যাইব।

এক টাকা লইয়া একজন মাঝি সে ভয়ঙ্কর সময়ে তাঁহাদিগকে গঙ্গাপার করিয়া দিল।

প্যারী ঠিকা-গাড়ি ভাড়া করিয়া উঠিলেন। পূর্ণ প্যারীর পানে চাহিয়া রহিল! প্যারীও পূর্ণর পানে চাহিয়া রহিল! উভয়েরই চক্ষু হইতে বারিবিন্দু বিগলিত হইল! সেই চক্ষুর জলে দুই বন্ধু পরস্পরের নিকট বিদায় লইলেন।

পূর্ণ সে রাত্রে হাবড়াতে কোন আত্মীয়ের বাটীতে রহিলেন।

পরদিন রাত্রিকালে প্যারীমোহন বাটীতে পৌঁছিলেন—পথে তাঁহার বড় কষ্ট হইল। বাটী আসিয়া দেখিলেন, জননী শয্যাগত—প্রায় মুমূর্ষু অবস্থা। বাটীতে কেহ কোথাও নাই—তেমন বিশাল পুরী নীরব, নিস্তব্ধ! কেবল একটী দাসী মার কাছে শুইয়া থাকে।

প্যারীমোহন জননীর পদতলে বসিলেন। বিন্দুবাসিনী এমন সময়ে পুত্রকে দেখিয়া একেবারে বিস্মিত, স্তম্ভিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার এত কঠিন পীড়া, তথাপি তিনি প্যারীকে এসব কথা কিছুই লিখেন নাই—পাছে প্যারীমোহন পড়া-শুনা বন্ধ করিয়া আসে! দেশে আবার দারুণ ম্যালেরিয়া দেখা দিয়াছে; পাছে প্যারীর কোন অসুখ হয়। বিন্দুবাসিনী আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসিলেন—"এমন সময়ে যে বাপ্ প্যারী! কোন অসুখ হয়নি তো?"

প্যারীমোহন কহিলেন,—"না মা! আমি ভাল আছি! কিন্তু তোমার শরীর এ কি হ'য়েছে? তোমার সেবা নাই, শুশ্রূষা নাই!"

বিন্দু। কে করে বাপ! গ্রামে কি আর লোক পাওয়া যায়? কাল সকালে দেখ্‌বে, গ্রামের সব ঘর-বাড়ী শূন্য! রোজ কত লোক যে মর্‌ছে! তুমি এ সময়ে কেন এলে বাবা?

প্যারী। ঈশান বাবু আমাকে পত্র লিখেছিলেন,—তুমি শয্যাগত, বাটীতে কেহ নাই, এসব শুনে থাকি কি ক'রে মা?

প্যারীমোহন গভীর নিশ্বাস ফেলিলেন। বিন্দুবাসিনী বলিলেন—"আমি মলুম না কেন বাবা?"

প্যারীমোহন কাঁপিতে লাগিলেন; বিন্দুবাসিনী কহিলেন,—"বাবা প্যারী! তুমি তো সবই শুনেছ, আমারই দোষে রাধিকা গৃহ ত্যাগ করে'ছে। না বুঝে গরল খেয়েছি, তার ঔষধ কি? এখন পাপের প্রায়শ্চিত্ত হ'চ্ছে!"

বিন্দুবাসিনী কাঁদিতে লাগিলেন; প্যারীমোহন মার অশ্রু মুছাইয়া দিতে দিতে কহিলেন,—"না মা! তুমি কেঁদো না; তা হ'লে তোমার রোগ বাড়বে; যদি বল, আমি কালই প্রাতে দাদাকে বউকে আন্‌তে যাব।"

বিন্দু। বাবারে! রাধিকাকে আনতে আমি

তিনবার লোক পাঠিয়েছিলুম; কিন্তু তুমি একবার গেলেই আ'সবে।

প্যারী। আমি আজই ভোরের সময় যাইব।

বিন্দু। পার্‌বে প্যারী?

প্যারী। হাঁ মা! আমি পার্‌ব, আমার কোন কষ্ট হয়নি।

বিন্দু। তবে নিশিকে একবার ডাক্‌তে পাঠাও।

প্যারী। না মা! তোমার পায়ে পড়ি, সে নরাধমের নাম আর মুখে এনো না।

অতি প্রত্যূষে উঠিয়া প্যারীমোহন রাধিকামোহনকে আনিতে যাত্রা করিলেন।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

রাধিকামোহন জমিদারী নীলামের ভয়ে নিশিকান্তকে "হ্যাণ্ডনোট" লিখিয়া দিয়া দুই হাজার টাকা লইয়াছিলেন; কিন্তু এমনই অদৃষ্টের ফের যে, জমিদারীও পাইলেন না, আর সেই টাকাও দুষ্ট নিশিকান্ত কর্ত্তৃক অপহৃত হইল। অবশেষে সেই হ্যাণ্ডনোটই রাধিকামোহনের পক্ষে মৃত্যুবাণ তুল্য হইল।

দুরাত্মা নিশিকান্ত গ্রামে লাঞ্ছিত, অবমানিত হইয়া মনে মনে ভাবিল,—"একটা মেয়েমানুষ লাথি মারিল, অথচ বশ হইল না; দেখি, এবার লাথির প্রতিশোধ দিতে পারি কিনা?" নরাধম হ্যাণ্ডনোটের নালিশ করিল, যথাসময়ে শমন আসিল।

রাধিকামোহন বিস্মিত হইলেন! বিস্ময়ের কথাই যে। তিনি রোগশয্যায় পড়িয়া মধ্যের এত ব্যাপার কিছুই শুনেন নাই। তিনি নিশিকে পুনঃপুনঃ ডাকিয়া পাঠাইলেন! কিন্তু সে আসিল না! তখন রাধিকামোহনের দৃঢ় ধারণা হইল, দুই হাজার টাকার নোটের বাণ্ডিল তবে এই দুরাত্মাই চুরী করিয়াছে।

এ দিকে হ্যাণ্ডনোটের নালিশ বিনা আপত্তিতে ডিক্রি হইয়া গেল।

নরাধম নিশিকান্ত বসুদের বাটীতে যাতায়াত করিয়া বেশ বুঝিয়াছিল যে, রাধিকাকে জব্দ করিবার জন্য তাহার বিমাতাই ব্রহ্মাস্ত্র! সে রাধিকার বিমাতার মনোভাব বেশ বুঝিয়া লইয়াছিল। ধূর্ত্ত নরাধমকে প্রশ্রয় দিয়ে সাংসারিক গুহ্য-ব্যাপার এইরূপেই প্রকাশিত হইয়া উভয় পক্ষকে নষ্ট করে। পাপিষ্ঠ নিশিকান্ত পূর্ব্ব হইতে বিন্দুবাসিনীকে বুঝাইয়া দিয়াছিল যে, রাধিকার অংশ নীলাম হইলে সে প্যারীমোহনের নামে ডাকিয়া লইবে।

অচিরে ডিক্রিজারি হইল! রাধিকামোহনের সম্পত্তি ক্রোক হইল। রাধিকামোহন আবার বিমাতার পায়ে ধরিয়া কাঁদিয়া পড়িলেন,—"মা! এবার টাকা না দিলে আর দাঁড়াবার স্থান নাই, এবার দয়া কর মা!" কিন্তু ধন্য সে রমণীর নিষ্ঠুর হৃদয়! সে এ মর্ম্মস্পর্শী কাতরোক্তিতে কর্ণপাতও করিল না। সে মনে ভাবিয়াছিল, এই ইন্দ্রভবন তাহার প্যারী একা ভোগ করিবে। রামের বনবাস হইলে, তাহার ভরত আসিয়া নিষ্কণ্টকে অযোধ্যার সিংহাসনে বসিবে!

রাধিকামোহন টাকা দিতে পারিলেন না—তাঁহার বাড়ী-ঘর সব নিলামে বিক্রয় হইয়া গেল! নিশিকান্ত নিজেই সে সব ডাকিয়া লইল। তখন বিন্দুবাসিনী এ নরাধমের ধূর্ত্ততা বুঝিলেন।

এক সপ্তাহের মধ্যে রাধিকামোহনকে গৃহ ত্যাগ করিবার নোটীস্ দেওয়া হইল। রাধিকামোহন নীরবে রোগ-শয্যায় শুইয়া কেবল অশ্রুমোচন করিলেন মাত্র! কিন্তু এ রুগ্নদেহে তিনি স্ত্রী-পুত্র লইয়া যান কোথা?

এত বড় জগতে তাঁহার অধিকৃত আর এক হাত স্থান নাই! হাতে পয়সাও নাই! এ অবস্থায় ভগবান ভিন্ন আর ভরসা কে?

হেমাঙ্গিনীর স্বামী হরিনাথ রায়ের পিতৃভিটা বসন্তপুর গ্রাম—বল্লভী হইতে ১০ ক্রোশ! হরিনাথ ও নিস্তারিণী পরামর্শ করিয়া সকলকে লইয়া সেইখানে উঠিয়া গেল। সেখানে খোড়ো মাটীর ঘর! রাধিকামোহন সেই মাটীর উপর শয্যা পাতিয়া শয়ন করিলেন। তাঁহার সুরম্য প্রাসাদ কোথায় পড়িয়া রহিল। নিস্তারিণীর কিছু গুপ্ত-সঞ্চিত ধন ছিল—সে এখন রাধিকামোহনের জন্য তাহা ব্যয় করিতে লাগিল।

নিশিকান্ত আইনের সাহায্যে বাটী অধিকার করিলেন।

দেবতার সিংহাসনে আজ পিশাচের অধিষ্ঠান হইল! নন্দনে নরকের দৃশ্য দেখা গেল।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

রাত্রি এক প্রহরের সময় প্যারীমোহন বসন্তপুরে পঁহুছিলেন। একটী লোক হরিনাথ রায়ের বাটী দেখাইয়া দিল। প্যারীমোহন বাড়ীর ভিতর ঢুকিলেন; একটী ঘরের সম্মুখে যাইয়া দেখিলেন, ভিতরে একটী প্রদীপ মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতেছে। সেই খানে কোলে একটী শিশু লইয়া এক রমণী বসিয়া আছেন। রমণীর সম্মুখে একটী রুগ্ন ব্যক্তি শুইয়া আছেন। প্যারীমোহন ভাবিলেন,—কে ইহারা? দাদা কোথা? আর বড়-বউ কোথা? এ বাড়ীতে কি দাদা থাকেন না? সে লোকটা কি আমাকে ঠকাইল! এমন সময়ে পিছন হইতে কে জিজ্ঞাসিল,—"কে তুমি গা?"

প্যারীমোহন পিছু ফিরিয়াই বলিল,—"কে নিস্তার দিদি?"

"প্যারীমোহন! কোথা থেকে ভাই?"

প্যারী সে কথার উত্তর না দিয়া কহিলেন,—"নিস্তার দিদি! দাদা কোথায়? বউ কোথা? অখিল কোথা?

গৃহের ভিতর হইতে রাধিকামোহন ডাকিলেন,—"এসো ভাই প্যারী!" স্বর বড় দুর্ব্বল, কিছু অস্পষ্ট ও বিকৃত।

প্যারী গৃহে প্রবেশ করিয়া অগ্রজকে ও বড়বধূকে প্রণাম করিলেন; প্যারী কম্পিত-কণ্ঠে জিজ্ঞাসিলেন,—"দাদা এ কি?" প্যারী, অগ্রজের আকৃতি দেখিয়া চমকিত হইয়াছেন। রাধিকামোহন ধীরে ধীরে কহিলেন,—"প্যারী! কেবল তোমাকে দেখিবার জন্যই বেঁচে আছি।"

প্যারিমোহন বড়বধূকে দেখিয়া একেবারে অবাক্ হইয়া রহিলেন। সে সোণার অঙ্গে যেন কে কালী ঢেলে দিয়েছে। প্যারীমোহন জিজ্ঞাসিলেন,—"বড়বউ! তোমার কোলে কি প্রাণাধিক অখিল?"

সরোজিনী প্যারীমোহনকে অখিলের কঠিন পীড়ার সংবাদ দিলেন। অখিলের মরণাপন্ন পীড়া! জ্বর, প্লীহা, যকৃৎ! সর্ব্বাঙ্গ হরিদ্রাবর্ণ হইয়া গিয়াছে। গত দুই দিবস হইতে প্রাণের কোন আশা নাই। আজ সন্ধ্যা হইতে অবস্থা আরও মন্দ! রাত্রি পোহায় কি না! এমন সময় হরিনাথ রায় কবিরাজের বাটী হইতে ঔষধ আনিয়া দিলেন; রাত্রি দুই প্রহরের সময় আর একবার দিতে হইবে, বলিয়া রাখিলেন। সরোজিনী প্রাণাধিক শিশুকে বুকে করিয়া বসিয়া রহিলেন। প্যারীমোহন মধ্যে মধ্যে শিশুর গায়ে হাত দিয়া দেখিতেছেন; আর আর সকলে ঘুমাইয়া পড়িল! আজ তিন দিনের পরিশ্রান্ত প্যারীমোহনও অনেক রাত্রে একবার তন্দ্রাভিভূত হইলেন।

রাত্রি আড়াই প্রহরের সময় শিশুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বড় শীতল হইয়া আসিল! সরোজিনী নিস্তারিণীকে ডাকিলেন; নিস্তারিণীর ঘুম ভাঙ্গিল না, কিন্তু প্যারীমোহন চমকিত হইয়া উঠিয়া পড়িলেন; তিনি শিশুর অঙ্গে হাত দিয়া বড়ই ভীত হইলেন, সকলকে উঠাইলেন; হরিনাথকে আর একবার কবিরাজের বাড়ী পাঠাইলেন; কিন্তু কবিরাজ আসিলেন না; তিনি যে ঔষধ দিয়াছিলেন, তাহা দেওয়া হইল, কিন্তু কোন ফল হইল না। শিশুর দেহে সমস্তই মৃত্যু-লক্ষণ দেখিতে পাওয়া গেল। আহা! সেই দুধের ছেলে! তাহার মৃত্যু-যন্ত্রণা! লিখিয়া তাহা বলিতে পারা যায় না।

শিশুর সে যন্ত্রণা, জননীর প্রাণে সহে কি? সরোজিনী দরবিগলিত ধারায় কাঁদিতে লাগিল,—"হে যম! আমাকে নাও অথিসকে আমার বাঁচাও।"

কি ভয়ঙ্করী নিশি! দেহ রোমাঞ্চিত হয়! কি গাঢ় সূচীভেদ্য অন্ধকার! অন্ধকারের ভিতর হইতে যেন অন্ধকার ছুটিতেছে! ও কি সব ভীষণ দৃশ্য! উহারা বিকট-বদন বিস্তার করিয়া ব্রহ্মাণ্ড গ্রাস করিতে আসিতেছে! চোখে আর দেখিতে পারা যায় না! কি ভীষণ তাণ্ডব নৃত্য! আবার ও কি সব ভয়ঙ্কর শব্দ! "মার্, মার্, মার্; হান্, হান্ হান্; কাট্, কাট্, কাট" আর শোনা যায় না; জগৎটা যেন ওলট্-পালট্ হচ্ছে। সরোজিনী ভয়ে থর থর কাঁপিতেছে! কিন্তু তখনও প্রাণাধিক পুত্রকে বুকে চাপিয়া ধরিয়াছে! সরোজিনী যেন শুনিলেন, একটা নগ্নকায়া ভীষণা প্রেতিনী আসিয়া বলিল,—"দে, দে, ওকে খাব!" তাহার মুখ দিয়া আগুন বাহির হইতেছে! সেইরূপ আবার একটা আসিল, আবার একটা! সকলেই যেন হাঁ করিয়া সরোজিনীর প্রাণাধিক শিশুকে খাইতে চায়! সহসা শিশুর বিকট-বীভৎস মুখভঙ্গী হইল! সরোজিনী বিকট-চীৎকার করিয়া মূর্চ্ছিতা হইল! সোণার শিশু মায়ের বুকে শক্তিশেল দিয়া ইহলোক হইতে অন্তর্হিত হইল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

নিস্তারিণী ও হরিনাথ মৃত-শিশুর অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া করিয়া আসিল; হেমাঙ্গিনী সরোজিনীর শুশ্রূষা করিতে লাগিল, কিন্তু মুহুর্ম্মুহুঃ সরোজিনীর মূর্চ্ছা হইতেছে। প্যারীমোহন অগ্রজের কাছে বসিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।

পরদিবস প্রাতে প্যারীমোহন আন্তরিক অনুরাগের সহিত সকলকে লইয়া কলিকাতা যাত্রা করিলেন; বাটীতে পঁহুছিয়াই দেখিলেন, মা সংজ্ঞাহীনা—তাঁহার প্রবল জ্বর আসিয়াছে; প্যারীমোহন মার কাছে বসিয়া তাঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

এদিকে সরোজিনীর মুহুর্মুহুঃ মূর্চ্ছা আসিতেছে! সেই সঙ্গে প্রবল জ্বর! অগ্রজ রাধিকামোহনেরও জ্বর, বিরাম নাই, বিচ্ছেদ নাই; সেই সঙ্গে তাঁহার বক্ষে বিষম ব্যথা, পার্শ্বে বেদনা! তাঁহার আহারে রুচি নাই, চক্ষে নিদ্রা নাই, অষ্টপ্রহর তিনি শয্যাগত! আদৌ কথা কহিতে পারেন না, কহিতে গেলে তাঁহার বুকে লাগে! কেহ জোরে কথা কহিলেও তিনি চমকিয়া উঠেন। আবার এই দেখ, হরিনাথ ও হেমাঙ্গিনী একরূপ সুস্থ থাকিয়া তাঁহাদের সেবা-শুশ্রূষা করিতেছিল, কিন্তু তাহারাও জ্বরে পড়িল। কেবল নিস্তারিণী ও প্যারীমোহন রোগীদের সেবা-শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। জননী, ভ্রাতা, ভ্রাতৃবধূ, হরিনাথ ও হেমাঙ্গিনী, সর্ব্বশুদ্ধ এই পাঁচটী রোগীর ভার প্যারীমোহনকে রাখিতে হইল।

এদিকে গ্রামের যে অবস্থা, তাহা বর্ণন করে কার সাধ্য? গত বৎসর যাহারা কোনরূপে বাঁচিয়া গিয়াছে, এ বৎসর তাহাদের প্রাণ লইয়া টানাটানি! বর্ণনা-বাহুল্যে প্রয়োজন নাই, আমরা সংক্ষেপেই বলি, গ্রামখানি এক-দিক্ হইতে লোকশূন্য হইয়া আসিতেছে। যতক্ষণ কোন আত্মীয়-স্বজন আছেন, শবের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করিতেছেন; যাহারা শেষ পড়িতেছে, তাহাদের দেহ শৃগাল, কুক্কুরের ভক্ষ্য হইতেছে।

এ অবস্থায় সাহায্য পাইবার আশায় প্যারীমোহন কাহাকে ডাকিবেন? সকলের ঘরে হাঁসপাতাল! গৃহে গৃহে শ্মশান। কিন্তু স্ত্রী-পুত্র-হীন ঈশানবাবু স্বয়ং আসিয়া যুক্তি-পরামর্শ দিয়া এবং রোগীর সেবা করিয়া প্যারী-মোহনকে অনেক সাহায্য করিতে লাগিলেন! এই সময়ে ঈশানবাবু অযাচিত হইয়া অনেক গৃহস্থকে উপকৃত করিলেন। তাঁহারই যত্ন ও চেষ্টায় অনেক মৃতদেহ শৃগাল-কুক্কুরের মুখ হইতে আচ্ছিন্ন হইয়া অগ্নিসংস্কৃত হইল!

কলিকাতা হইতে যাত্রা করিয়া অবধি প্যারীমোহন একদিনও, একটী মুহূর্ত্তের জন্য বিশ্রাম পান নাই! তিনি নিজের সুখ-স্বচ্ছন্দতার প্রতি তিলমাত্র লক্ষ্য না করিয়া রোগীর সেবায় মনোনিবেশ করিয়াছেন; প্যারীর প্রাণান্ত পণ! কিন্তু অনশন, অর্দ্ধাশন, অনিদ্রা, ভাবনা, চিন্তায় প্যারীমোহনের দেহ জর্জ্জরিত হইয়াছে! তাঁহার অন্তর সর্ব্বদাই যেন আগুনে পুড়িতেছে।

এই সময়ে নিশিকান্ত একদিন তাঁহাদের বাটীতে আসিলেন। প্যারীমোহন তাহাকে বাটীর ভিতর প্রবেশ করিতে নিষেধ করিলেন। নিশিকান্ত আইনানুসারে তাঁহার নিষেধ শুনিতে চাহিল না। ক্রমে দু এক কথায় নিশির সহিত প্যারীর তুমুল বিবাদ বাধিয়া উঠিল। প্যারী-মোহন যেরূপ রাগিয়াছিলেন, নিশিকান্ত আর একটা কথা কহিলেই তাহাকে ধরিয়া প্রহার করিতেন। নিশি, প্যারীর প্রচণ্ডমূর্ত্তি দেখিয়া পশ্চাৎপদ হইল; দূর হইতে বলিল,—"দেখ প্যারী! আমি জোর করিয়া বাড়ী ঢুকিতে পারি কি না!"

প্যারীমোহন ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া কহিলেন,—"আচ্ছা দেখ্‌ব! কিন্তু যদি না আসিস্, তুই"—প্যারী তাহাকে অকথ্য-ভাষায় গালি দিলেন; তাঁহার তখন দিগ্বিদিক্ জ্ঞান ছিল না।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

সরোজিনীর সেই মূর্চ্ছা আর অবিচ্ছিন্ন জ্বর, ক্রমে বিকারে দাঁড়াইল। তৃতীয় দিবসের রাত্রি, বড় ভীষণ রাত্রি! সে রাত্রি আর পোহায় না! সমস্ত রাত্রিই সরোজিনী প্রলাপ বকিতে লাগিল! তাহার একপার্শ্বে নিস্তারিণী, অপর পার্শ্বে হেমাঙ্গিনী বসিয়া শুশ্রূষা করিতেছে। সেই আর্দ্র, রাশীকৃত কুন্তল-রাশি সতীর মুখমণ্ডলের চারিদিকে অসাবধানে পড়িয়া আছে! আর সেই মুখমণ্ডল যেন এক অনির্ব্বচনীয় শোভা ধারণ করিয়াছে! কপালের গাঢ় সিন্দুর রেখা "দপ্ দপ্" করিয়া জ্বলিতেছে! প্যারীমোহন সরোজিনীর নাড়ী ধরিয়া বসিয়া আছেন, সহসা তিনি মুখ বিকৃত করিলেন! ঈশানবাবুও হাত দেখিয়া বলিলেন,—"অতিক ভাল নয়" সে কথা রাধিকামোহনের কর্ণে গেল! তিনি সাহসে ভর করিয়া, ঈশান-বাবুকে ধরিয়া অতি কষ্টে একবার সরোজিনীর সম্মুখে আসিয়া বসিলেন! সাধ্বী-সতী বুঝি জনমের শোধ, শেষবারের মত একবার স্বামীকে দেখিবার নিমিত্ত নয়ন উন্মীলন করিল। ওষ্ঠদ্বয় একবার কাঁপিয়া উঠিল—মুখে অস্পষ্টভাবে কি

দুই একটী কথা উচ্চারিত হইল। চক্ষুর্দ্বয় পুনরায় মুদ্রিত হইয়া গেল! সে চক্ষু আর একবারের জন্যও উন্মীলিত হইল না! সমস্ত দেহ হিমবৎ! নাড়ীতে আর রক্তের গতি নাই! সকলের অলক্ষ্যে প্রাণবায়ু পলায়ন করিয়াছে। সহসা প্রভাতের বিহঙ্গমকুল ডাকিয়া উঠিল। সকলেই বুঝিল, প্রভাতে সতী-সাধ্বী স্বামি-পদ দর্শন করিয়া পুণ্যবলে স্বর্গারোহণ করিলেন।

যে গেল, সে বুঝি নিষ্কৃতি পাইল! যাহারা রহিল, শোকে দুঃখে তাহাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল! সরোজিনীর শোকে যে সকলেই অধীর হইলেন, একথা বলা বাহুল্য! যথাসময়ে মৃতের সৎকার হইয়া গেল। প্যারীমোহন পুত্রস্থানীয় হইয়া বড়বধূর মুখাগ্নি করিলেন! হায়, এইজন্যই কি তিনি কলিকাতা হইতে আসিয়াছিলেন? তাঁহার চক্ষু হইতে অবিরলধারে অশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল! নিস্তারিণী আর হেমাঙ্গিনী কাঁদিয়া পাগলের ন্যায় হইল।

শ্মশান হইতে আসিয়াও প্যারীমোহনের কর্ত্তব্য শেষ হয় নাই! একশয্যায় জননী, অপর শয্যায় অগ্রজ পড়িয়া আছেন! আবার তাঁহাদের সেবায় মনোনিবেশ করিলেন।

এখন রাধিকামোহনের অবস্থা ভাবিতে গেলে প্রাণের ভিতর অবধি শিহরিয়া উঠে! এজগতে তাঁহার কিসের অভাব ছিল? বুদ্ধি, বিদ্যা; রূপ, যৌবন; ধন, দৌলৎ; বাড়ী ঘর; মান, সম্ভ্রম; স্ত্রী, পুত্র—কোনদিকে কিছুরই অসদ্ভাব ছিল না। দেহে কোন অসুখ ছিল না, মনেও কোন চিন্তা ছিল না। এতদিন জীবন-তরী, সময়ের স্রোতে দিব্য ভাসিয়া আসিয়াছিল। কিন্তু সহসা সে স্রোতের গতি ফিরিল! অনুকূল স্রোত প্রতিকূল হইল! তাহাতে পর্ব্বত-প্রমাণ তরঙ্গ উঠিল! তরঙ্গের পর তরঙ্গ আসিতে লাগিল! আকাশে মেঘ, ঝড়, বিদ্যুৎ, বজ্রাঘাত! পৃথিবীতে তুফান, অন্ধকার, হাহাকার, বিলাপ! সেই বিষম তুফানে তরণী চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া ডুবিয়া গেল! এখন একা তরঙ্গের ভিতর পড়িয়া জ্ঞানহীন, সংজ্ঞাহীন! তবু তো প্রাণ যায় না! গেলে এত কষ্ট সহিবে কে? কিন্তু আর বড় কষ্ট সহিতে হইল না; সরোজিনীর মৃত্যুর দিন হইতেই রোগের যন্ত্রণা অতিরিক্ত বৃদ্ধি পাইল! তার পরদিন বেলা আড়াই প্রহরের সময় রাধিকামোহন অতিকষ্টে একবার ডাকিলেন,—"ভাই প্যারীমোহন।" "দাদা, দাদা" বলিয়া প্যারীমোহন অগ্রজের হাতখানি ধরিলেন; রাধিকামোহন উঠিয়া বসিতে চান! সকলেই বুঝিল, রাধিকামোহনের শয্যাকণ্টক হইয়াছে! প্যারী দাদাকে বুকে করিয়া বসিলেন! দাদা জনমের শোধ একবার কনিষ্ঠের পানে চাহিয়া দেখিলেন! অহো! চক্ষু অন্ধকারে ঢাকিয়া আসিতেছে! জিহ্বা জড়াইয়া গেল! কি বলিতে যাইয়া আর বলা হইল না; প্যারীর পানে যেমন চাহিয়া ছিলেন, তেমনই চাহিয়া রহিলেন! আর সে চক্ষুতে পলক পড়িল না! প্যারীমোহন বড়ই কাতর হইয়া মর্ম্মভেদী স্বরে "দাদা, দাদা" বলিয়া কত ডাকিলেন, কিন্তু দাদা কোন কথারই উত্তর দিলেন না! স্থির-নেত্রে চাহিয়া রহিলেন!

স্নেহহীন, দয়াহীন, মমতাহীন, নির্ম্মম সংসারের অশেষ জ্বালায় জ্বলিয়া-পুড়িয়া, রাধিকামোহন এতদিনে, মরিয়া সকল জ্বালা জুড়াইলেন।

নিস্তারিণী চীৎকার করিয়া উঠিল, আছাড় খাইয়া পড়িল! কিন্তু সবই বৃথা!

প্যারীমোহন ধূলায় পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন; দাদা স্নেহের ডোর কাটিয়া পলাইলেন, কিন্তু তিনি এখনও স্নেহ-পাশ ছিন্ন করিতে পারেন নাই। কিন্তু তাঁহাকে

কান্না থামাইয়া আবার উঠিতে হইল! বিন্দুবাসিনীর মৃত্যু-যাতনা উপস্থিত! পুত্র যাইয়া মার পদতলে বসিলেন, কত কাঁদিলেন! এজগতে প্যারীর এখন মা বই আর কেহ নাই! সব অভাব পূরণ হইবে, কিন্তু মার অভাব এজীবনে আর পূরণ হইবে না। কিন্তু তাঁর অভাব হইবে বলিয়া, নিয়তির অভাব তো অপূর্ণ থাকিতে পারে না! অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড কালের বশে ঘুরিতেছে; বিন্দুবাসিনীও কালের বশে, সৌভাগ্য ফলে একমাত্র পুত্রের কোলে শয়ন করিয়া সুখে স্বর্গে গমন করিলেন। পতি বা পুত্রের মুখ দেখিয়া মরিতে পাইলেই রমণীর স্বর্গবাস!

মাকে কোলে লইয়া, মার স্নেহপূর্ণ মুখের পানে চাহিয়া প্যারী কত কাঁদিলেন।

যখন মানুষকে সান্ত্বনা দিবার কেহই থাকে না, ক্রন্দনই তখন শোক-সন্তাপ নাশের একমাত্র উপায়।

প্যারীমোহন বসিয়া ভাবিলেন,—'সব লীলা ফুরাইল, এজগতের সহিত আর আমার কোন সম্পর্ক নাই! কার জন্য শোক, কার জন্য সন্তাপ! অখিলকে লইয়া মা, দাদা, বড়-বউ, সকলেই স্বর্গে গিয়াছেন! তাঁহাদের জন্য শোক করা অন্যায়! দেবতার জন্য আবার শোক কি?" ভাবিতে ভাবিতে আবার হৃদয় উদ্বেলিত হইল—"দাদা! বড়-বউ! আপনারা এজীবনে কত কষ্ট পাইয়াছেন! এক-দিনের জন্য আপনারা সুখী হ'তে পেলেন না!" সহসা আবার ক্রোধের উদ্রেক হইল! চক্ষু রক্তবর্ণ হইল! দন্তে দন্ত নিষ্পেষিত হইল!—"দুরাচার নিশি! এ সময় তোকে পাইলে, তোর মাথা চূর্ণ করিয়া ফেলি! কুকুর, শেয়াল দিয়া তোর দেহ খাওয়াই! স্নেহ, মায়া, করুণা, মমতা—এসব দুর্ব্বলতার লক্ষণ।"

এমন সময়ে ঈশানবাবু গ্রামের অন্য পার্শ্বে একটা শবদাহ করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন; তিনি বলিলেন—"আর দেরী কেন ভাই! শবদাহ করা যাক্; এদুটো হইয়া গেলে, আবার দেখ্‌তে হবে।" বেশী লোক তো নাই—দুইজনে তো আর দুইটা মড়া তুলিতে পারেন না! শ্মশান আবার কিছু দূরে! প্যারীমোহন বলিলেন—"এই ভদ্রাসনেই, এই পুকুরের পাশেই আজ মার ও দাদার শবদাহ করব।" ঈশানবাবু বলিলেন,—"বেশ, তাই হোক।"

কয়েক দণ্ডের মধ্যেই চিতা ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতে লাগিল! ঈশানবাবু সেখানে বসিয়া তামাকু খাইতে লাগিলেন। প্যারীমোহন নির্ব্বাক্ হইয়া, ধীর গম্ভীরভাবে চিতার চারিধারে ঘুরিতে লাগিলেন! কিন্তু তাঁহার দৃষ্টি চিতায়! পাঠক! তাঁহার মনোভাব বুঝিতে পারেন কি?

এমন সময়ে বাটীর ভিতর দুইজন লোক প্রবেশ করিল। একজন দূর হইতে বলিল,—"ঐ লোকটী প্যারীমোহন বসু, উহাঁকে শমন ধরাও—ঐ আসামী।" আদালতের পেয়াদা অগ্রসর হইল; প্যারীমোহন দেখিলেন, পশ্চতে সেই নরাধম নিশি! তৎক্ষণাৎ প্যারী-মোহন চিতা হইতে একটা জলন্ত কাষ্ঠ তুলিয়া লইয়া বেগে তাহা নিক্ষেপ করিল! তখনই সম্মুখে পেয়াদাকে দেখিয়াই "কে তুই হারাম-জাদ্" বলিয়া যেমন তাহাকে ঘুষি উঠাইলেন, সে প্রাণভয়ে সটান দৌড় মারিল! জলন্ত কাষ্ঠ যাইয়া নিশির মস্তকে পড়িল। "ম'লাম, ম'লাম" বলিয়া নরাধম সেইখানে যন্ত্রণায় শুইয়া পড়িল।

তখন প্যারীমোহন তাহার পদদ্বয় সজোরে ধরিয়া অতি নির্দ্দয়রূপে তাহাকে টানিয়া আনিতে লাগিল। প্যারীমোহনের মূর্ত্তি তখন বড় ভীষণ, বড় রৌদ্র রসপূর্ণ!

নিশিকান্ত কাতর-স্বরে বলিল,—"আমাকে কোথায় নিয়ে যাও?"

প্যারী। এই জলন্ত চিতায় পোড়াইতে!

নিশি। আমাকে জীবন্ত পুড়িয়ে মেরো না, আমাকে রক্ষা কর, দয়া কর।

দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া, চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া, প্যারী কহিলেন,—"দয়া, দয়া, দয়া কিরে পামর! দুর্ব্বলেরা দয়া করে! নরাধম, নিষ্ঠুর, পিশাচ, বিশ্বাসঘাতক, মহাপাতকী, দাদা তোকে কত দয়া করেছিলেন বল্ দেখি! কিন্তু তুই তার কি প্রতিশোধ দিয়েছিলি, সেটাও স্মরণ কর্!"

প্যারীমোহনের স্বর বড় রুক্ষ, বড় কর্কশ, একে বারে স্নেহশূন্য!

প্যারীমোহন তাহাকে আবার টানিয়া আনিতে লাগিলেন। নিশিকান্তের দেহ রক্তাক্ত হইতে লাগিল! নিশি কাতর-স্বরে জোড়-হস্তে কহিল—"দোহাই ধর্ম্ম, তোমার কি ধর্ম্ম নাই প্যারী?"

প্যারীমোহন গম্ভীরকণ্ঠে কহিলেন,—"চুপ্ কর্ নির্লজ্জ, বর্ব্বর! নরাধম!—ধর্ম্ম! ধর্ম্মের দোহাই দিতেছিস্! যখন দাদার জমিদারী-নীলামের গুপ্ত অভিসন্ধি করিয়াছিলি, তখন তোর ধর্ম্ম কোথায় ছিল? যখন দাদার দুই হাজার টাকা চুরি করিয়াছিলি, তখন তোর ধর্ম্ম কোথায় ছিল? যখন সতী-সাধ্বীর ধর্ম্ম নষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছিলি, তখন তোর ধর্ম্ম কোথায় ছিল? সতী-সাধ্বীর নামে বৃথা-কলঙ্ক দিবার কালে ধর্ম্মকে তোর স্মরণ হয় নাই? ধার্ম্মিক, দয়াবান্ মনিবকে গৃহত্যাগ করাইবার সময়ে ধর্ম্মকে তোর স্মরণ হয় নাই? পামর! তুই আবার ধর্ম্ম দেখাস্ কি?

নিশিকান্ত তখনও করজোড়ে কহিতে লাগিল,—"জগদীশ্বর তোমার মঙ্গল করিবেন; আমাকে ছেড়ে দাও।" প্যারীমোহন উন্মত্তের ন্যায় কহিতে লাগিলেন—"রেখে দে তোর জগদীশ্বর, আমি জগদীশ্বর মানি না, জগদীশ্বর নাই; যদিও থাকে, তাহার কিছুমাত্র দয়া নাই, তাহার সুবিচার নাই; তাহার যদি দয়া থাকিত, তাহা হইলে কি বসুগোষ্ঠী নিপাত যায়? তাহার যদি সুবিচার থাকিত, তোর মত মহাপাপিষ্ঠ এখনও নরকে যায় না?"

প্যারীমোহন বলিতে বলিতেই নিশিকে টানিয়া আনিতে লাগিলেন; সেই ধূলি-কঙ্করময় স্থানের উপর দিয়া সজোর আকর্ষণে নিশির দেহ ক্ষত বিক্ষত হইল; তাহা দিয়া রক্তধারা বহিতে লাগিল, পুনরায় সেই সব ক্ষত স্থানে ধূলি-কঙ্কর প্রবেশ করিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গে অব্যক্ত যন্ত্রণা হইতে লাগিল; পুড়িয়া মরিবার ভয়ে নিশি প্যারীমোহনকে কতই কাকুতি মিনতি করিতে লাগিল; শেষে বালকের ন্যায় আর্ত্তস্বরে উচ্চ চীৎকার করিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল! কিন্তু প্যারীমোহনের দৃঢ় সঙ্কল্প হইয়াছে, নরাধম, পশুকে আজ জীবন্ত পোড়াইয়া ধরার ভার লাঘব করিবেন। তিনি নিশির সে যন্ত্রণা, কাকুতি-মিনতি, সে ক্রন্দন কিছু দেখিতে বা শুনিতে পাইলেন না। তিনি উন্মত্তের ন্যায় আপন মনে নিশিকে চিতার পানে লইয়া চলিলেন! সেখানে উপস্থিত দর্শকেরা উৎসুক নয়নে তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া রহিল! এরূপ রোমহর্ষণ ভীষণ ব্যাপার তাহারা কখনও দেখে নাই!

কিন্তু সহসা দূর হইতে কে গম্ভীর-কণ্ঠে কহিলেন—"ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও।" প্যারীমোহন সম্মুখে চাহিয়া দেখিলেন, শুভ্রকেশ, শুভ্র শ্মশ্রু, শুভ্রবসন, ঠিক নারদ ঋষির ন্যায় এক মহাপুরুষ, সেখানে দাঁড়াইয়া, তাঁহার এক হস্তে বীণা, অপর হস্ত ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া তাঁহাকে এই ভীষণ কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে বলিতেছেন; তাঁহার সাধু সৌম্য মূর্ত্তি! সে মূর্ত্তি দেখিয়া প্যারীমোহনের মনে সহসা এক অভূতপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার হইল—

দেহ কণ্টকিত হইয়া উঠিল! তাঁহার কণ্ঠ-স্বর শুনিয়া, আর তাঁহার প্রসারিত হস্ত ও প্রস্ফুটিত স্থির লোচনযুগল দেখিয়া প্যারীর মন যেন সহসা নিস্তেজ হইল—দেহে যেন অবসাদ অনুভূত হইল—তাঁহার সে প্রচণ্ড সিংহ-বিক্রম যেন মুহূর্ত্তে কোথায় অন্তর্হিত হইল। সেই মহাপুরুষ গম্ভীর-স্বরে বলিলেন,—"প্যারীমোহন! নিশিকে ছেড়ে দাও।" প্যারী নিশিকে পরিত্যাগ করিল।

সেই মহাপুরুষ তখন কয়েক পদ মাত্র অগ্রসর হইয়া তাঁহার বীণাযন্ত্রে ঝঙ্কার দিয়া গাহিতে লাগিলেন,—

"জগতের পতি, দয়াময় অতি,
পদে রাখ মতি, ঘুচিবে সংশয়।
শুভাশুভ যত, জানিও নিশ্চিত,
পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফলে হয়॥
অদৃষ্টেতে যাহা আছয়ে লিখন,
অবশ্যই তাহা হইবে পূরণ:
যে দিনের যাহা, ঘটিবেক তাহা,
কারও সাধ্য নাই লঙ্ঘিবারে তায়॥
তিনি ইচ্ছাময় যা করেন যবে,
সকলই মঙ্গল জীবে তা বুঝিবে'
অসন্তোষপ্রদ, যদিও বিপদ,
গুপ্ত মঙ্গল তাহে আছয়ে নিশ্চয়॥"

সঙ্গীতে প্যারীমোহনের উত্তপ্ত হৃদয় শীতল হইল! মরুভূমে মন্দাকিনী বহিল। তিনি অগ্রসর হইয়া সেই মহাপুরুষের চরণতলে লুটাইয়া পড়িলেন; মহাপুরুষ ধীরে ধীরে স্পষ্ট-স্বরে বলিলেন,—"প্যারী! যেরূপে পার, আমার অনুগামী হও।" প্যারীমোহন উঠিয়া কি জিজ্ঞাসিতে গেলেন, কিন্তু আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না—মহাপুরুষ সন্ধ্যার অন্ধকারে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেলেন, প্যারীমোহন বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া নীরবে সেখানে দাঁড়াইয়া রহিলেন। এমন সময়ে "দুম্" করিয়া মড়ার মাথার খুলি ভাঙ্গিয়া গেল! তাহার জলন্ত প্রতপ্ত মেদ-মজ্জা-অস্থি যাইয়া নিশিকান্তের সর্ব্বাঙ্গে লাগিল। নিশি যন্ত্রণায় অধীর হইয়া সেখানে পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল,—শেষে উঠিয়া দৌড়িতে আরম্ভ লাগিল! পুষ্করিণীর জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল! কিন্তু জলে পড়িয়া দেহ দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠিল! জল হইতে উঠিবামাত্র নিশির দেহ নানা স্থানে ফাটিয়া রক্ত ছুটিতে লাগিল! সে তখন অব্যক্ত যন্ত্রণায় অধীর হইয়া কখনও দৌড়িতে লাগিল, কখনও ধূলায় পড়িয়া গড়াইতে লাগিল, কখনও বা হতজ্ঞান হইয়া পড়িয়া রহিল। দুই তিন দিন সে এইরূপ যমযন্ত্রণায় মৃতপ্রায় হইয়া একদিন রাস্তার ধারে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল। অনেকক্ষণ তাহার জ্ঞান-চৈতন্য হইল না! যখন তাহার অনুসন্ধানে কয়েক জন লোক আসিল, তখন অসংখ্য শৃগাল-কুক্কুর ও শকুনী-গৃধিনী নিশির দেহ খণ্ড-বিখণ্ড করিতেছে! তখনও নিশির সে দেহে প্রাণ আছে!

অহো! সে সময়ের যন্ত্রণা কি ভয়ানক! একটা জীবন্ত প্রাণীকে দংশিয়া দংশিয়া প্রাণে মারিতেছে! বোধ করি, ভাষায় এমন কোন শব্দ নাই, যাহার প্রয়োগে এরূপ মৃত্যুর স্বরূপ বুঝান যায়!

নিশি, অতি ক্ষীণ স্বরে কতবার তাহাকে রক্ষা করিতে বলিল; কিন্তু সেই নরশোণিত-পিপাসু উন্মত্ত পশুগণের সম্মুখে কেহ অগ্রসর হইতে পারিল না; শৃগাল কুক্কুর ও শকুনী-গৃধিনী সুখে জীবন্ত নিশিকে উদরসাৎ করিল।

দুষ্ট নিশিকান্তের এইরূপ ভীষণ মৃত্যু হইল! তাহার দেহের এইরূপ জঘন্য পরিণাম ঘটিল! আমরা প্রার্থনা করি, ঈশ্বর তাহার আত্মার সদ্গতি করুন।

শুনা যায়, নিশিকান্তের মৃত্যুর পর, তাহার স্ত্রী ও কয়েকটী শিশুসন্তান কয়েক দিন অনশনে দিনপাত করিয়াছিল! কারণ, নিশির উপযুক্ত তাহার এক আত্মীয় নিশির মৃত্যুর পর, তাহার যাহা কিছু ছিল, একদিন আত্মসাৎ করিয়া লইয়া যায়। নিশির মৃত্যুর পর, গ্রামের এক নরাধম, প্রলোভন দেখাইয়া নিশির পত্নীকে হস্তগত করিতে চেষ্টা করে! "ধার করিলেই শোধ করিতে হয়!" এ বিষয়েরও ঋণগ্রহণ ও পরিশোধ এইরূপেই প্রায় হইয়া থাকে! তাহার শত শত দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। কিন্তু সে নিরাশ্রয়া সতী রমণী, কাহারও সাহায্য না পাইয়া, অবশেষে উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়া তাহার সতীত্ব-ধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছিল। আর তারপর সেই অপোগণ্ড শিশুসন্তান কয়টী শৃগাল-কুক্কুরের উদরে যাইয়া ক্ষুধার জ্বালা ভুলিল। অহো অদৃষ্ট রে !!!

কথায় কথায় আমরা প্যারীমোহনের কথা বলিতে ভুলিয়া যাইতেছি; প্যারীমোহন শবদাহ করিয়া উঠিতেছেন, এমন সময়ে সেই আদালতের পেয়াদা পুলীসের দুইজন কনেষ্টেবল লইয়া আসিয়া তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিল। প্যারীমোহন বিনা বাক্যব্যয়ে তাহাদের সঙ্গে যাইয়া সে রাত্রি হাজতে বাস করিলেন—আগামী কল্য প্রাতে তাঁহার নামে মহকুমায় চালান দেওয়া হইবে, দারোগা বাবুর এইরূপ হুকুমজারি হইয়া রহিল। কিন্তু তৎপর-দিবস প্রত্যূষে, যখন হাজৎ-ঘর খোলা হইল, তখন দেখা গেল, আসামী ফেরার—সুতরাং একটা হুলস্থূল পড়িয়া গেল! প্যারীমোহনের অনুসন্ধান হইল, গ্রামে গ্রামে হইল, কলিকাতায় হইল, নানা জেলায়, বহু গ্রামে তাঁহার অনুসন্ধান হইল—তিনি একজনকে জীবন্ত পুড়াইয়া মারিয়াছেন বলিয়া অভিযুক্ত! গবর্ণমেণ্ট পুরস্কারের লোভ দেখাইলেন, কিন্তু কোথাও প্যারীমোহনকে পাওয়া গেল না।

* * * *

সেই যেদিন প্যারীমোহন কয়েদীর বেশে ভদ্রাসন পরিত্যাগ করিয়া গেলেন, সেদিন হইতে আজ পর্য্যন্ত বসুদের সে ভিটায় আর কেহ উঠে না, সে ভিটায় আর সন্ধ্যা পড়ে না। হিংস্র জন্তু, ক্রূর সর্প, আর নিশাচর পক্ষী সকল একত্র হইয়া তথায় বাস করিতেছে। এখনও পথিকেরা দূর হইতেও ভগ্ন-প্রাসাদ পানে চাহিয়া চাহিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করে।

গ্রামবাসীরা বিনাকরেও সেখানে আর বাস করিতে চাহে না; তাহারা বলে, ভদ্রাসনে শবদাহ হইলে, তাহাতে স্ত্রী-পুত্র লইয়া বাস করিবে, এমন রক্ত কার ঘাড়ে আছে? শুধু তাই নয়—তাহারা বলে, প্রত্যহ দ্বিপ্রহর নিশীথে, ভদ্রাসনের সেই সব শবদাহ-স্থল হইতে অগ্নি জ্বলিতে থাকে! নানাবিধ ভৌতিক মূর্ত্তি সেখানে আসিয়া ঘুরিয়া-ফিরিয়া বেড়ায়! এ অবস্থায় কে সে ভিটায় উঠিবে বল? সুতরাং উচ্চ-প্রাচীর-পরিবেষ্টিত সেই পুরী এখন সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত! কালের ভীষণ গদাঘাতে সেই উচ্চ প্রাসাদ-সৌধসালা ক্রমশঃ চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া একটা ভয়ানক ভগ্ন-স্তূপে পরিণত হইতেছে! মনুষ্যের অগম্য স্থল হইয়াছে! দেবতার নন্দনকানন পিশাচের নৃত্য-ভূমিতে পরিণত হইয়াছে।

কেন এমন হইল? কেন বসুগোষ্ঠীর ঐশ্বর্য্য, ভোগ, ধন, অর্থ, সম্পদ্, সৌভাগ্য বিনষ্ট হইল? কেন বংশধরগণের অকাল-মৃত্যু হইল? কেন তাহারা নির্ব্বংশ হইল? ইহার একমাত্র উত্তর,—"অদৃষ্ট"! অদৃষ্ট কি? মানবের পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত "কর্ম্মফল"! কর্ম্মফলই অদৃষ্ট! অদৃষ্টই কর্ম্মফল। এ কর্ম্মফল অতিক্রম করিয়া কেহ এক পদ যাইতে পারিবেন না! স্বয়ং বিধাতা মনুষ্যের "অদৃষ্টে" এই "কর্ম্মফলই" লিপিবদ্ধ করেন! অতএব এস ভাই! যে কেহ প্যারিমোহনের ন্যায় সংসার-তাপ-বিদগ্ধ আছ, যে কেহ অদৃষ্টের তরঙ্গে প্রতিনিয়ত ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতেছ, এস! সুখসম্পৎ-সৌভাগ্যশালী! তুমিও এস ভাই! সকলে মিলিয়া আজ সমস্বরে এই অদৃষ্টের—এই কর্ম্মফলের অনন্ত মহিমা কীর্ত্তন করি,—

"নমস্যামো দেবান্ ননু হতবিধেস্তেঽপি বশগাঃ
বিধির্ব্বন্দ্যঃ সোঽপি প্রতিনিয়তকর্ম্মৈকফলদঃ
ফলং কর্ম্মায়ত্তং কিমমরগণৈঃ কিঞ্চ বিধিনা
নমস্তৎ কর্ম্মভ্যো বিধিরপি ন যেভ্যঃ প্রভবতি॥"

সমাপ্ত।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ পাইন।

নাটক।

অভিধান।

ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভাষাগত পার্থক্যে নাটকের ভিন্ন ভিন্ন নাম হইলেও, ইহার অর্থ এক। রঙ্গভূমিতে অভিনয় দ্বারা যে কাব্যের প্রদর্শন হইয়া থাকে, তাহাকেই দৃশ্য-কাব্য বা নাটক কহে। কাব্য দুই প্রকার;—শ্রব্য ও দৃশ্য। নিজে পাঠ করিয়া, কি অপরের পাঠ শুনিয়া, যে কাব্যের মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে পারা যায়, তাহাই শ্রব্য-কাব্য। 'কেবল পাঠ-করিয়া বা শুনিয়া যাহার মর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম হয় না, কিংবা হৃদয়ঙ্গম হইলেও যে কাব্য পড়িয়া বা শুনিয়া সম্পূর্ণরূপ তৃপ্তি লাভ করিতে পারা যায় না—আরও যেন কিছু জানিবার জন্য প্রাণে একটা আকাঙ্ক্ষা থাকিয়া যায়, কাব্যোল্লিখিত চরিত্র চোখের উপর আনিবার সাধ হয়—তখন চরিত্রটীকে হৃদয়ে অঙ্কিত করিবার জন্য কোন মনুষ্যের উপর সেই চরিত্রের রূপগুণ আরোপ করিয়া কাব্যোল্লিখিত চরিত্রের অনুকরণে অনুষ্ঠিত ক্রিয়া দেখিবার প্রয়োজন হয়, তাহাই দৃশ্য-কাব্য। দৃশ্য—যাহা দেখিতে হয়, যাহা না দেখিলে চলে না, যাহা না দেখিলে দৃষ্টির কার্য্য সম্পূর্ণ হয় না। অভিনয়-যোগ্য দৃশ্য-কাব্য অভিনীত না হইলে তাহা খনির তিমির-গর্ভে সূর্য্যকান্ত মণি।

কোনও নির্দ্দিষ্ট সময়ের, নির্দ্দিষ্ট স্থানের, নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তির ও তৎসাময়িক এবং তাহার আনুষঙ্গিক অপরাপর ব্যক্তিগণের জীবন্ত চিত্র সম্মুখে ধরিয়া, যে কাব্য সেই ব্যক্তির ও তৎসহচর ব্যক্তিগণের জীবনাংশের সহিত আমাদিগকে পরিচিত করিয়া দেয়, তাহাই দৃশ্য-কাব্য ও নাটক। সংস্কৃত ভাষায় নাটকের আর এক নাম 'রূপক' উপমান আর উপমেয়ের অভেদ-জ্ঞানই রূপক।

যখন আমাদের পরিচিত দুঃখী-দাস—যাহাকে প্রাতঃকালে এক পয়সার শফরী কিনিয়া, তার মধ্যে দুটা ফেলিয়া দিয়া হায় হায় করিতে শুনিয়াছি, সেই আমাদের পরিচিত, হয়ত অনুগৃহীত অতি দুঃখী-দাস রঙ্গমঞ্চে, বিচিত্র চিত্রপট-কুঞ্জ মধ্যে দাঁড়াইয়া, ঝগ্‌ঝগে রগ্‌রগে অতি মনোহর বেশবিন্যাসে আমাদের সম্মুখে দাঁড়ায়—আর সেইমত বেশভূষায়, দেখিলে কিন্তু ভয় হয়, এমন শ্মশ্রুগুম্ফে আবৃতবদন রাবণাখ্য তাহারই কোন সহচরের সম্মুখে হাত নাড়িয়া মুখ নাড়িয়া হাত জোড় করিয়া, নানারূপ অঙ্গভঙ্গী করিয়া বলে;—

"হে রক্ষঃকুলপতি,
শুনেছি, মরিয়া নাকি বাঁচিয়াছে পুনঃ
রাঘব? এ মায়া, পিতঃ বুঝিতে না পারি;
কিন্তু অনুমতি দেহ, সমূলে নির্ম্মূল
করিব পামরে আজি। ঘোর শরানলে

করি ভস্ম, বায়ু-অস্ত্রে উড়াইব তারে,
নতুবা বাঁধিয়া আনি দিব রাজপদে।"

তখন পার্শ্বস্থিত দর্শকগণের মধ্যে যদি কেহ সেই ভীষণদর্শন রক্ষঃকুলপতির মূর্ত্তি দেখিয়া ভয়ে জড় সড় হইয়া ঘুমাইয়া পড়ে, আমরা অমনি তার গা ঠেলিয়া বলি, ওহে ভাই ওঠ ওঠ, উঠে দেখ, ইন্দ্রজিৎ আসিয়াছে;—দুঃখী দাস আসিয়াছে, কখন বলি না।

যখন পিতৃবিয়োগাবধুর ডেনমার্কের রাজপুত্র—অতিধীর অতিসরল অতিপবিত্র হ্যামলেট, কি করিবেন কিছুই বুঝিতে না পারিয়া কৃত্রিম উন্মত্ততায় হৃদয়ের গভীর আবেগ প্রকাশ করিতে করিতে রঙ্গমঞ্চে দাঁড়াইয়া দর্শকের চক্ষু-নিপীড়নে জল বাহির করেন, তখন দর্শক তাহাকে ডেনমার্কের রাজপুত্র ভাবিয়াই অশ্রুপহার দিয়া থাকে, বিলু সাহেব মনে করিয়া নয়।

দৃশ্যের আর এক অর্থ অভিনেয়। অভিনয় দেখিতে না পাইলে, কোন দৃশ্যকাব্য শুনিয়া শুনিয়া পড়িয়া পড়িয়া—আবার শুনিলে আবার পড়িলেও বোধ হয় যেন সাধ মিটিল না, যেন হৃদয়ের কোন দেশের কোন স্থানে কি যেন একটা অকথ্য অভাব, কি যেন একটা অতি কষ্টকর কষ্ট রহিয়া গেল।

ড্রামা।

ইংরেজী ভাষায় দৃশ্য-কাব্যকে ড্রামা বলিয়া থাকে। Drama পদটী drao ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। drao কথাটা গ্রীসীয়। গ্রীসদেশই ইউরোপীয় নাটকের পথপ্রদর্শক। drao অর্থে ক্রিয়া। এই ক্রিয়াকে মূল ধরিয়া ইংরেজী নাট্যশাস্ত্রকারেরা ক্রিয়ার অনুকরণে ক্রিয়ানুষ্ঠান—নাটকের এই অর্থ করিয়াছেন। যে কাব্য কোন কালানুষ্ঠিত কিংবা অনুষ্ঠানযোগ্য ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করায় কিংবা করাইতে পারে, তাহাই drama। উপন্যাস ইতিহাসাদি শ্রব্য-কাব্য কালানুষ্ঠিত কিংবা অনুষ্ঠান-যোগ্য ক্রিয়ার আভাস দিতে পারে মাত্র।

অভিনয়।

যেমন দৃশ্য এক অর্থ অভিনেয়, তেমনি অনুকরণের এক নাম অভিনয়। যে সকল ভাবভঙ্গী কথাবার্ত্তায় আমরা কালানুষ্ঠিত অবস্থার অনুকরণ করি, তাহাকে অভিনয় বলে। মল্লি নাথ বলেন, অভিনয় রসাভিব্যঞ্জক চেষ্টাবিশেষ। অভিনয় রসাভিব্যঞ্জক হওয়া চাই। ইহার সহিত নাটকের প্রাণের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। অভিনয়ে রস না থাকিলে দৃশ্য-কাব্যের উদ্দেশ্য নষ্ট হয়। কাব্যের দোষ থাকিলে অনেক সময় তাহা অভিনয়ের গুণে মানাইয়া যায়। আবার অভিনয়ের নীরসতায় অনেক উৎকৃষ্ট নাটকও জীবন থাকিতে শুকাইয়া মরে। দুই একটী ভাষাতত্ত্ববিৎ ও দুই একজন চিন্তাশীল ইক্ষু-নিষ্পীড়কের মত রসাধারজ্ঞ ভাবুক পাঠকের আশ্রয়ে মুখ লুকাইয়া আত্মরক্ষা করিয়া থাকে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি দৃশ্য চক্ষু দিয়া না দেখিলে তাহা হইতে প্রাণের পূর্ণ তৃপ্তি হয় না। আবার কোন কোন দৃশ্য-কাব্য নিপুণ অভিনেতার সহস্র চেষ্টায় বিশেষ অভিনয়-নৈপুণ্যেও দর্শকের মন ভিজাইতে পারে না। লাভের মধ্যে শুষ্কসলিলা স্রোতস্বিনীর সমীরপ্রহত হৃদয়ে গগনব্যাপী সৈকত-আবেগের মত আবর্জ্জনার তরঙ্গ উত্থিত করিয়া দর্শকের প্রাণের চারিধারে অতৃপ্তির রাশি ছড়াইয়া দেয়। অভিনয়ে রস থাকে না বলিয়া সহস্র সহস্র নাটক জন্মিবামাত্রই মরিয়া যায়। কোন কোনটী বা যকৃৎগ্রস্ত বালকের ন্যায় দুধ ছাড়িয়া ভাত ধরিবার অগ্রেই শুদ্ধমাত্র বাহ্য চাকচিক্যে চোখের নেশা আনিয়া প্রাণের সহিত না মিশিতে মিশিতেই লীলা সংবরণ করে। জীবনের অস্তিত্ব দেখান ভিন্ন তাহাকে আর বড় বেশী কাজ করিতে হয় না। আবার কোন কোনটী মানব-চক্ষে দুই চারি দিন সামান্য একটু কার্য্য করিয়াই ক্লান্ত হইয়া পড়ে। এ গুলির কার্য্য সীমাবদ্ধ। যাহা যৎকিঞ্চিৎ ভাব লইয়া সে গুলি কল্পনার বিশাল ক্ষেত্রে অবতীর্ণ, তাহাতে সে গুলিকে বাঁধা একটা সীমাবদ্ধ স্থানের ভিতর ঘোরাফেরা করিতে হয়, বেশী দূর যাইতে হয় না। সেই স্থানটুকুই সে গুলির প্রতাপের লীলাক্ষেত্র। মানব দেখিতে দেখিতে চলিতে চলিতে যদি ভাবরাজ্যের পথ ধরিয়া অনেক দূর চলিয়া যায়, তবে—যদি তাহার প্রয়োজন হয়—তাহাকে পশ্চাৎ ফিরিয়া কখন বা শাদা চোখে, কখন বা কৌতূহলের অথবা পাঠ-প্রিয়তার পরিবীক্ষণ-নয়নাবরণে দুটী চক্ষু আবৃত করিয়া সে গুলির লীলা দেখিতে হয়। মানুষের জ্ঞানপ্রসারের আলোকাভিহত হইয়া সাহিত্যের নৈশগগনের অনেক উজ্জ্বল তারা নিবিয়া গিয়াছে। আবার মাহেন্দ্রক্ষণ-কল্পিত কোন কোন দৃশ্যকাব্যাভিনয়ের এত রস যে, সে গুলি অব্যয় অনন্ত শক্তিধারিণী প্রকৃতির ন্যায় মানব-হৃদয়রাজ্যে চিরজীবনের জন্য আধিপত্য করিয়া থাকে। বর্ত্তমান হইতে দূর—অতিদূর ধরণীর সৃষ্টিসীমাপ্রান্তের অতীতের কুজ্ঝটিকার ভিতর হইতে জন্ম লইয়াও প্রবাহিনীর মত রসতরঙ্গে তরঙ্গময়ী একই আবেগে বেগবতী, অক্ষুণ্ণ সৌন্দর্য্যে অনলসগমনে কুলকুলকল্লোলে মানব হৃদয়-সাগরে আসিয়া পড়িতেছে। দিন নাই ক্ষণ নাই, সময় নাই অসময় নাই, যখনই তাহার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ কর, দেখিতে পাইবে, সেই তরতর গতি,—শুনিতে পাইবে, সেই কুলকুলধ্বনি,—বুঝিতে পারিবে, আদরিণী আদরকণ্ডুয়ন পাইলে, মৃদুহাস্যি সলিলকণায় হৃদয়ের অন্তস্তল পর্য্যন্ত কেমন সুশীতল করিয়া দেয়—কেমন সংসারক্লেশদগ্ধ তোমায় ডাকিয়া ডাকিয়া আদর করিয়া রসতরঙ্গে ভাসাইয়া দেয়।

এক কথা,—অভিনয়-রস-মাধুর্য্যই নাটকের মহত্ত্ব—নাটকের নাটকত্ব।

অভিনয়ের প্রকারভেদ।

অভিনয় চারি প্রকার—আঙ্গিক, বাচিক, আহার্য্য ও সাত্ত্বিক।

শুদ্ধ অঙ্গভঙ্গী দ্বারা যে অভিনয় তাহার নাম আঙ্গিক। নেত্রবক্ত্রবিকারে, হস্ত-সঞ্চালনে, শরীর-কম্পনে, কেশোৎপাটনে, বক্ষপীড়নে,—উঠিয়া-পড়িয়া দুলিয়া-দুলিয়া, লাফালাফি করিয়া গড়াগড়ি খাইয়া, হাঁ করিয়া হাই তুলিয়া শুদ্ধমাত্র শারীরিক চেষ্টায়, নীরবে মনোভাবপ্রকাশের নাম আঙ্গিক। হাস্যরসোদ্রেকই আঙ্গিক অভিনয়ের প্রধান কার্য্য। করুণরসোদ্গার, আঙ্গিক অভিনয় করিতে পারে কিনা, বলিতে পারি না। কিন্তু আমার বোধ হয়, রঙ্গমঞ্চে দাঁড়াইয়া আঙ্গিক অভিনয়ে দর্শকের মন করুণরসার্দ্র করিতে যাইলে, বিপরীতই ফল হয়।

আঙ্গিক।

মহর্ষি-কণ্বের আশ্রম-সন্নিহিত বনমধ্যে, শূল্য উখ্য নানাবিধ উপায়ে আপাদ-কণ্ঠোদর মৃগমাংসে পূর্ণ করিয়াও ক্ষুধার্ত্ত—সুতরাং রাজার দুর্ব্বোধকানন-প্রিয়তায়, রাজকার্য্যে অবহেলায় অতিবিরক্ত বিদূষক—রাজা প্রেমরাক্ষসীর করালকবলে পড়িয়াছে, কেমন করিয়া তাঁরে গৃহে ফিরাইব, কেমন করিয়া গৃহপ্রতিনিবৃত্ত রাজার, বহুদিন হইতে সঞ্চিত সন্দেশের সুমেরু রসনাগ্রে ধরিয়া, বৃন্দাবন লীলা হইতেও অতি গুরুতর বিদূষক লীলার পরাকাষ্ঠা দেখাইব—ভাবিয়া-ভাবিয়া উদ্বিগ্ন-মানস মাধব্য দুষ্মন্তকে বহুক্ষণের পর দেখিয়া, দেখাইয়া দেখাইয়া মুখাদির ভঙ্গীতে যে অনাহার-ক্লেশ প্রকাশ করিয়াছিল, তাহাই আঙ্গিক অভিনয়ের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

আঙ্গিক অভিনয় স্বভাব-সৌন্দর্য্য প্রদর্শনের একটা অতিশয়োক্তি অলঙ্কার।

শুদ্ধ কথার কৌশল দেখাইয়া যে অভিনয়, তাহার নাম বাচিক। তোৎলা কথা, অনুনাসিক স্বরাদির প্রয়োগ, স্বাগতিক কথা, করুণ-সঙ্গীত ইত্যাদি বাচিক অভিনয়ের অঙ্গ। আমাদের দেশের অভিনেতাদিগের মধ্যে খাঁটী বাচিক অভিনয় বড় একটা দেখা যায় না। অনেকেই দুটা মনের কথা কহিতে যাইয়াও হাত-পা ছুড়িয়া অস্থির হন।

আহার্য্য।

শুদ্ধ বেশভূষাদি দ্বারা—শুদ্ধ রঙ্গমঞ্চে আবির্ভাবে যে অভিনয় নিষ্পন্ন হয়, তাহাই আহার্য্যাভিনয়। নির্ব্বাক্ দুর্ব্বলসিং যখন শুদ্ধমাত্র চলাফেরায় জীবনের অস্তিত্ব দেখাইয়া, লাল পাগড়ী, ঢাল-তরবারি, আর সযত্নে দ্বিধাকৃত, পরিণদ্ধ, আকর্ণবিশ্রান্ত শ্মশ্রুগুম্ফে আপনার বীরত্ব ও চোর ধরিবার পরিচয় প্রদান করে, তখন তাহাকে আহার্য্য অভিনয় বলে।

সাত্ত্বিক।

স্তম্ভ, অবসাদ, রোমাঞ্চ, কম্প, অশ্রু ও দীর্ঘশ্বাস প্রভৃতি দ্বারা যে অভিনয় প্রদর্শিত হয়, তাহাই সাত্ত্বিকাভিনয়। সাত্ত্বিক অভিনয় অনেক স্থলে আঙ্গিকেরই প্রকারভেদ। কোন কথা মুখে বলিতে পারিলেও, মুখে না বলিয়া যদি অঙ্গভঙ্গী দ্বারা মনোভাব প্রকাশ করিতে চাই, তাহা হইলেই অভিনয় আঙ্গিক হইল; কিন্তু যখন হৃদয়ের সাত্ত্বিক ভাবপ্রাবল্যে মানব আর কিছু বলিয়া উঠিতে পারে না, যখন তাহা বাক্যের সীমা অতিক্রম করে, তখন সেই অবস্থার অনুকরণের নাম সাত্ত্বিক অভিনয়।

বিমিশ্র।

অভিনেতৃগণ সচরাচর পূর্ব্বোক্ত অভিনয়ের মধ্যে দুটী কি তিনটী অথবা সকলগুলিই দেখাইয়া থাকেন। এইরূপ দুটী তিনটী এক সঙ্গে মিলাইয়া যে অভিনয়, তাহার নাম বিমিশ্র।

শুদ্ধ আঙ্গিক অভিনয় কখন ভাষায় স্থান পায় না। বাচিক অভিনয়ে অভিনীত কালক্রমে অবস্থাই নাটক-অভিধান প্রাপ্ত হইয়া সাহিত্য-জগতে রাজত্ব করিয়া আসিতেছে।

ভাবপ্রকাশ।

মনের ভাব যে-কোন প্রকারেই হউক, প্রকাশ করা মানুষের স্বভাব। অন্তর্নিহিত ভাব সকলকে দুঃখ, শোক, আনন্দ-যন্ত্রণাদিকে কথাতূলিকায় অঙ্কিত করিয়া বাহিরে বাহির করিতে না পারিলে, মন কখন স্থির থাকিতে পারে না। ভাবপ্রকাশের সঙ্গে মানব-স্বভাবের নিত্যসম্বন্ধ।

মন কথা কহিবার জন্য ভগবদ্দত্ত অনেকগুলি ভাষা পাইয়াছে। সে কথাগুলির উচ্চারণ করিবার অধিকার শুধু রসনাকে দেওয়া হয় নাই। মনের ভাষার সকল বাক্য, সকল পদ, সকল অক্ষর রসনা নিজায়ত্ত করিতে পারে নাই। চক্ষু-কর্ণ-নাসিকাদি অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণ হস্ত-পদ-বক্ষাদি অবয়ব সকল—সকলেই মনকে কথা বলিতে দেওয়ায় কিছু-না-কিছু সাহায্য আবহমান কাল হইতে করিয়া আসিতেছে। সে ভাষার কতক শুনিয়া, কতক দেখিয়া, কতক বা শুদ্ধ অনুভব দ্বারা বুঝিয়া লইতে হয়। কতক আবার এমনি দুর্ব্বোধ যে, দর্শনে, স্পর্শনে, শ্রবণে,—আজীবন ধ্যান করিয়া, অবিরাম চিন্তার দোলায় দুলিয়া দুলিয়াও বুঝিতে পারা যায় না। অনেক রাক্ষস-চরিত্রের বহিরাবরণ কবি-প্রতিভায় উন্মোচিত হইয়া, আমাদিগকে কত মনোহর দেবমূর্ত্তি দেখাইয়া দিয়াছে। কত বিশ্বনাশী নেপোলিয়ন বিশ্বাধার-মূর্ত্তিতে গোপাল-মাধুর্য্যে আমাদিগের হৃদয় কুঞ্জে, ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি-পরিচ্ছন্ন, যশোধারা

নিষিক্ত হৈম সিংহাসনে, চির-জীবনের জন্য স্থান লইয়াছে। মনের কথা বুঝিতে পারি নাই বলিয়া কত দেব-প্রতিমার ললিত-সৌন্দর্য্যের ভিতরে ভিতরে ভীষণতার ছায়া দেখিয়া নয়ন মুদিয়াছি, কাছে আসিতে দেখিলে দূরে সরিয়া গিয়াছি—পুরীষগন্ধি কুসুম-ভ্রমে অগ্রেই নাসিকা আবৃত করিয়া, গোলাপ-কুসুম-সৌরভ সুখ হইতে আপনাকে বঞ্চিত করিয়াছি। মনের কথা বুঝিতে পারেন নাই বলিয়াই রাম-কর্ত্তৃক সীতার অগ্নি পরীক্ষা, মনের কথা বুঝিতে সমর্থ হয় নাই বলিয়াই, হতভাগ্য ওথেলো স্ত্রীহত্যার পাতকী হইয়াছিল। মন সকল সময়েই কথা কয়। কিন্তু ভাষা তার বড় এলোমেলো। মনের ভাষার স্বর-ব্যঞ্জনের সমষ্টির তুলনায় চীন-বর্ণমালা, বিশাল সাগরের তুলনায় তৃণাগ্রভাগের শিশির-বিন্দু। কাজেই মনের সকল কথা আমরা বুঝিতে পারি না, মনের সকল ইঙ্গিত বুঝিয়া মনের স্বরূপ স্থির করিতে পারি না। অপর দিকে মনের কথা বলিয়া কিংবা মনঃনির্দ্দিষ্ট ইঙ্গিত করিয়া, সকল সময় মনের প্রকৃত চিত্র অপরের সম্মুখে ধরিতে পারি না। আমরা কত লোকের রোদনেই না হাসিয়াছি, আবার কত লোককে হাসাইতে গিয়া কাঁদাইয়া ফেলিয়াছি। কত দেবতাকে দানব স্থির করিয়াছি, আবার কত দানবকে দেবতা-জ্ঞানে পূজা করিয়াছি। মন বহুভাষাবিৎ। চক্ষু-জল, মুখ-মালিন্য, হাস্য, নৃত্য, এইরূপ কত ভাষায় যে মন কত কথা কয়, তাহার সংখ্যা—এই মন নামক জিনিষটীর যিনি সৃজন করিয়াছেন, তিনিই বলিতে পারেন।

কিন্তু তুমি-আমি বুঝিতে পারি আর নাই পারি, তাহাতে মনের কিছু আসে যায় না। মন নিত্য যে-কোন ভাষাতেই হউক ভাব প্রকাশ করিতেছে। তুমি-আমি শুনিতে পাই আর নাই পাই, মন সেই কখন বা সুবোধ্য, কখন বা দুর্ব্বোধ্য ভাষায় আপনার ইচ্ছামত অবকাশে যারে পাইতেছে, তারই সঙ্গে কথা কহিতেছে। নদী, নির্ঝরিণী, তরু লতা, পর্ব্বত-প্রান্তর কে না মনের কথা শুনিতে পায়? পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ কাহার সহিত না মন কথা কয়? পূর্ণিমার নীলগগন-সাগরে ভাসমান, তূলশুভ্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলদ-কুঞ্জের মধ্যে হৈম রজত কিরণোজ্জ্বল তারানাথের অমিয় কলেবরে কত মনের কথাই না মিশিয়া রহিয়াছে। সুমন্দ-মারুত-হিল্লোলে দিগন্তব্যাপী সন্ধ্যার অরুণিম-প্রান্তরে কত কথাই না ভাসিয়া গিয়াছে! জল-নিমগ্ন ভগ্ন অর্ণবযানাস্কশায়ী কত হতভাগ্যের, স্বদেশের কুটীরবাসিনী নিত্যচিন্তিতা, আবেগ-ময়ী প্রণয়িনীর উদ্দেশে উচ্চারিত কত কথাই না ডুবিয়া গিয়াছে! লোচন-দ্বার-বিনির্গত প্রাণের কত কথায় কত শ্যামলতৃণ অঙ্কুরিত, কত সমাধিচ্ছদ মর্ম্মরপ্রস্তর-নিষিক্ত, কত শ্মশানাঙ্ক-স্পর্শী রাবণের চুল্লী নির্ব্বাপিত! কত স্থানে মনের কথা পড়িয়া আছে কে বলিতে পারে?—চেতন, অচেতন, উদ্ভিদ কত স্থানে কত মনের কথা গড়াগড়ি যাইতেছে, কে সংখ্যা করিতে পারে!

প্রকৃতি-দাক্ষিণ্যে, জ্ঞানে, অভ্যাসে, সাধনায় কোন কোন মহাত্মা, জগতের কাছে আত্ম-গোপন করিতে পারেন কিনা জানি না, কিন্তু যদি পারেন—যিনি পারেন, সে অসাধারণ শক্তিমান্ মহাপুরুষেরও মন নীরব নয়। তাঁহার জীবনের প্রতিক্ষণ ঈশ্বর-সমীপে উদ্ঘাটিত রহিয়াছে। উন্মুক্ত-মার্গ প্রাণের কথাস্রোত নিয়ত সেই দিকেই ধাবিত হইতেছে। তাও যাঁর না হয়, তিনি প্রকৃতির ত্যজ্যপুত্র। হয় তিনি যোগ-দিগ্‌গজ ঈশ্বরে চির সংন্যস্ত-চিত্ত, কামনা-ত্যাগী দেবতা, নয় তিনি অননুমেয়, ভয়ঙ্কর হইতেও ভয়ঙ্কর নররূপী শয়তান।

তবে মানবের পূর্ণদেবত্ব ও পূর্ণদানবত্ব

আমার জ্ঞানে কাঁঠালের আমসত্ত্ব বলিয়াই বোধ হয়। শৈশব হইতেই মানব জীবনের আরম্ভ। Wordsworth বলেন, শিশু মানবের পিত। বাপের বেটা, পিতার অধিকার হইতে যতই দূরে চলিয়া যাউক না কেন, পিতার গুণ কিছু না কিছু তাহাতে থাকিবেই।

যোগিশ্রেষ্ঠ কণ্বও, প্রাণ হইতে প্রিয়তমা কন্যা শকুন্তলার স্বামি-গৃহে গমন কালে, যোগি-জনোচিত ধীরতায়, চিত্তসংযমে, মনের কথা চাপিয়া চাপিয়া, আর যখন থাকিতে পারিলেন না, তখন তরুলতাদির সম্বোধনে "সেয়ং যাতি শকুন্তলা পতিগৃহং সর্ব্বৈরনুজ্ঞায়তাং" বলিয়া হৃদয়ের গভীর আবেগ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

বীরশক্তি-আশিনী ভ্রাতৃ-স্বামিকা মধুরতা-ময়ী রাক্ষসী ক্লিয়পেট্রা, অক্টেভিয়স্‌কে ভুলাই-বার সকল কৌশল বিফল হইল দেখিয়া সযত্নে বক্ষধৃত ভুজঙ্গশিশুকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিল,—

"আয় আয় প্রাণনাশী ঘৃণিত ভুজগ!
বিষম জটিল এই জীবন-বন্ধনে,
তীক্ষ্ণ-দন্তে খণ্ড খণ্ড করি একেবারে
দেরে বিলাইয়া, বিষে-ভরা রে অভাগা!
ধর্ ক্রোধ, শীঘ্র কার্য্য কর্ সমাধান।
থাকিত যদ্যপি তোর্ কথার শকতি
তোর মুখ-বিনিঃসৃত কথা, যদি কর্ণে
পশিত আমার—মহান সীজার! তুমি
গর্দ্দভ নৈতিক জ্ঞানহীন!"

মনের কথা সকল বুঝিতে পারা যায় না বলিয়া কি মানুষ নিশ্চিন্ত? আটলাণ্টিক মহা-সাগরের পার ছিল না বলিয়া নাবিকগণ, সেই মহান্ জলরাজ্য অতিক্রম করিয়া সুবর্ণ-প্রসবিনী ভারতকে কি অন্বেষণ করিতে ছাড়িয়াছিল? ভারতকে অন্বেষণ করিতে করিতে, যেমন শস্য-শ্যামলা আর এক বসুন্ধরা সভ্য ইউরোপবাসীর চক্ষে দ্বিতীয় স্বর্গের ন্যায় ভাসিয়া উঠিয়াছিল, মনের কথা বুঝিবার আগ্রহে মনোবিজ্ঞান-রাজ্যের অনুসন্ধানের ফলে প্রায় প্রতি জাতীয় জীবনে, সাহিত্য-সাগরে তেমনি সন্তানক-বনাবৃত, সর্ব্বরত্ন-শোভমান, মন্দাকিনী-সলিল-সুস্নিগ্ধ নন্দন-কাননের ছবি জাগিয়াছিল। আমেরিকার আবিষ্কার হইতেই ইউরোপ সভ্য-জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। মহা-কাব্যের বিকাশ হইতেই জাতীয় জীবন সাহিত্য-রত্নে অলঙ্কৃত হইয়াছে।

আমেরিকা আছে শুনিয়া অনেকে তৃপ্ত না হইয়া, সে দেশ দেখিতে ছুটিয়াছিল, অনেকে আবার দেখিতে পাইবে না জানিয়া, লোক মুখে সে দেশের সংবাদ শুনিয়া তৃপ্ত হইয়াছিল, সে দেশের ছবি আনিয়া তাহাকেই সেই ভূ-স্বর্গ কল্পনা করিয়া দুগ্ধের স্বাদ ঘোলে মিটাইয়াছিল। মহাকাব্য-প্রখ্যাত সেই মনোহর দেশ কখনও দেখিতে পাইব না বুঝিয়া, সেই মহাদেশের মহারাজ কখনও তাহাদের চোখে পড়িবে না স্থির জানিয়া, মানবে সেই দেশ সেই দেশাধী-শ্বরের আর সেই দেশবাসী নর-নারীর চিত্র দেখিয়াই তৃপ্তি লাভ করিয়াছে। মনের মনে অনেক অশ্রুতপূর্ব্ব-কথা শুনিবার আগ্রহে শ্রব্য-কাব্যের সৃষ্টি! মানব-মনের স্বরূপ দেখাই-বার আগ্রহে দৃশ্য-কাব্য বা নাটকের উৎপত্তি।

দেখিবার বড় সাধ—বনবাসী রাজ-রাজেশ্বর পুত্রের অর্দ্ধাঙ্গ-ভাগিনী নবনীত-কোমলা সীতা পঞ্চবটী বনে কেমন সংসার পাতিয়াছিলেন। কেমন পঞ্চ-গন্ধর্ব্বোপম বীর-স্বামী সোহাগিনী কুরুকুল-কমলিনী রাজসূয়-যজ্ঞাধিষ্ঠাত্রী কৃষ্ণা বিরাট্‌গৃহে পরিচারিকার বেশে দিন যাপন করিতেছিলেন! কেমন মনে শুভক্ষণ পাইয়া, মলিন-বেশেই আবার স্বামীসনে সিংহাসনে বসিয়াছিলেন! কেমন করিয়া রাজরাণী আত্ম-বিস্মৃত হইয়া কাম্যবনে পাচিকোচিত কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া, ভীমের ন্যায় ঔদরিকের পরিতোষে

হাড়ি ধরিবার বেড়ী ধরিয়াছিলেন! এইরূপ, যাহা আর দেখিতে পাইবে না, যাহা করিতে পারিবে না, কিন্তু যাহা দেখিবার জন্য প্রাণে চিরদিনের তরে একটা আকাঙ্ক্ষা অবিসংবাদী প্রভুত্বের মৌরসপাট্টা লইয়া বসিয়া আছে,—যাহা করিতে পারিলে জীবনের যেন অনেকটা ভার-লাঘব হয়, এমন মহাত্ম-জনোচিত কার্য্য দেখিবার ও পাঁচ জনকে দেখাইবার জন্য, মানব অনেক দিন হইতেই অনুকরণ করিতে শিখিয়াছে। এই অনুকরণক্রিয়া সাহিত্যের সহিত সংলগ্ন হওয়া অবধি আমরা নাটক দেখিয়া আসিতেছি।

সেই সহস্র বিপদ মধ্যে সহস্র প্রকারে উৎপীড়িত হইয়াও অচল অটল যুধিষ্ঠির—সহস্র প্রলোভনেও স্থির-প্রতিজ্ঞ রাম; হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুগণের উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া কুরুকুল-ধ্বংসপথে দ্রুতগামী দুর্য্যোধন; ধর্ম্মের জয়দর্শ-নার্থী সুতরাং কুরুপতির অন্নভোক্তা হইয়াও শত্রু-সম্মুখে প্রাণের আবরণ উন্মোচনকারী এবং সেই কারণে শিখণ্ডীর ন্যায় অসমস্পর্দ্ধী ব্যক্তিরও বধ্য মহাবীর ভীষ্ম—গভীর নিশিতে শত্রুকরে জীবনবিনাশী, পঞ্চমৃত্যুবাণপ্রদাতা কুরুবৃদ্ধ—কত দেবাত্মার শত শত মস্তিষ্ক সিংহাসনে আরোহণ করিয়া, স্বর্গগমনের পর আবার কতবার ফিরিয়া—সেই সকল মহাজীবনের প্রতিমূর্ত্তি আমাদিগকে দেখাইয়াছে।

সকল জাতীয় জীবনেই অতি প্রাচীন কাল হইতেই নাটকাভিনয়ের সূত্রপাত হইয়াছিল। কিন্তু সকল জাতীয় সাহিত্যেই নাটক স্থান পায় নাই। মুসলমান-সাহিত্যে নাটকের অস্তিত্ব নাই। তাই বলিয়া কি বুঝিব, মুসলমান-জীবনে কখনও নাটক অভিনীত হয় নাই? আমরা আরব্যোপন্যাসে একটা গল্প পড়িয়া থাকি। একজন বণিক্ অপর একজন বন্ধু-বণিকের কাছে কতকগুলি জলপাই ফল রাখিয়া কোন দূরদেশে গমন করেন। বস্তুতঃ, একজন বণিক্ বিদেশে যাইবার সময় কতকগুলি কুম্ভ সুবর্ণ-মুদ্রায় ভরিয়া তাহা জলপাইয়ে আচ্ছাদিত করিয়া—জলপাইয়ের কলসী বলিয়া বন্ধুর কাছে রাখিয়া যান। বলিয়া যান, বিদেশ হইতে ফিরিয়া তিনি সেই কলসীগুলি লইয়া যাইবেন। বণিক্ দূরদেশে চলিয়া গেল। সেখানে কার্য্যের অনুরোধে তাহার দেশে ফিরিতে বিলম্ব হইল। একদিন বন্ধুর কতকগুলি জলপাইয়ের প্রয়োজন হইয়াছিল। তিনি গচ্ছিত ফলের মধ্যে কতকগুলি তখন লইয়া, আবার সময়-বিশেষে তাহা পূরাইয়া রাখিবেন মনে করিয়া, সেই কলসীর ফল কিছু ব্যবহার করিতে গেলেন, প্রথম দিন কিছু ফল ব্যবহার করিলেন। আবার এক দিন প্রয়োজন হইল। এইরূপ দুই এক দিন কলসী হইতে ফল বাহির করিতে যাইয়া তিনি বন্ধুর কৌশল বুঝিতে পারিলেন। স্বর্ণমুদ্রা দেখিয়া বন্ধুর লোভ হইল। সেই মুদ্রার পরিবর্ত্তে তাম্রমুদ্রা কলসীতে রাখিয়া তিনি সকল ধন আত্মসাৎ করিলেন এবং কলসী-মুখ যেমন ছিল আবার তেমনি জল-পাইয়ে পূরিয়া রাখিলেন। কিছুদিন পরে বণিক্ স্বদেশে ফিরিয়া বন্ধুর গৃহ হইতে কলসী আনিবার সময় দেখিলেন, বন্ধু বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে। বণিক্ রাজার কাছে বিচারপ্রার্থী হইয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন, "প্রতাপের অবতার! বন্ধুর কাছে সুবর্ণমুদ্রা গচ্ছিত রাখিয়া-ছিলাম, বন্ধু আমার ন্যস্ত ধন সব লইয়া তাহার স্থানে কতকগুলি তাম্রমুদ্রা রাখিয়াছে।" বন্ধু রাজাদেশে রাজসম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, বলিল, "যেখানের কলসী সেই স্থানেই ছিল। কলসীর ভিতরে যা ছিল, তাই আছে, আমি কলসীস্পর্শও করি নাই।" রাজা বড়ই বিপদে পড়িলেন। এ দুজনের ভিতর কার কথা সত্য? বন্ধু বিশ্বাসঘাতক না বণিক্ প্রবঞ্চক! রাজা

কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। আদেশ করিলেন, এখন যাও; পরে তোমাদের মোকদ্দমার বিচার করিব। রাজার কাছে কলসী রক্ষিত হইল। কলসীর কথা নগরমধ্যে প্রচার হইয়া গেল। সকলেই শুনিল যে, রাজার কাছে এক বিচিত্র মোকদ্দমা উপস্থিত। রাজা সে মোকদ্দমার মীমাংসা করিতে পারেন নাই। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই শুনিল যে, রাজা সে মোকদ্দমায় দোষী নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ হন নাই। বিস্মিত নগরবাসীর দুই বন্ধুর সম্বন্ধে অবিরাম চিন্তায়, সমীরণের গায় কাব্যকথা ভাসিয়া উঠিল। নরপতি, মোকদ্দমা সম্বন্ধে কি করিবেন, বুঝিতে না পারিয়া, হয়ত কিছু সন্ধান পাইতে পারেন, বিবেচনায় ছদ্মবেশে নগরভ্রমণে বাহির হইলেন। ভ্রমণ করিতে করিতে এক মাঠে দেখিলেন, কতকগুলি রাখালবালক কি একরকম নূতন খেলা খেলিতেছে, দেখিলেন একটী বালক তৃণ-সিংহাসনে বসিয়া রাজা সাজিয়াছে। অপর দুইটী বালক সেই রাখাল-রাজের সম্মুখে কর-জোড়ে দাড়াইয়া বিচারপ্রার্থী। চারিদিকে দর্শক, সিংহাসন-পার্শ্বে প্রহরী, সিংহাসন বেড়িয়া অমাত্যবর্গ—নীরবে রাজার বিচার-কার্য্য দেখিতেছে। রাখাল-রাজ বাদী প্রতিবাদী দুই জনকেই সম্বোধন করিয়া বলিল, তোমরা দুইজনেই যখন বলিতেছ নির্দ্দোষী, তখন জলপাইপূর্ণ কলসী না দেখিলে আমি বিচার করিতে পারি না। কলসী ভৃত্যগণ কর্ত্তৃক আনীত হইল। রাজা আসামীকে জিজ্ঞাসা করিল, তোমার কাছে কত দিন হইতে এই কলসী গচ্ছিত রহিয়াছে? উত্তর হইল, দুই বৎসর। তখন রাখাল রাজ কলসী-মুখ হইতে দুই চারিটা ফল তুলিয়া বলিল, 'অমাত্যগণ! বল দেখি, এই ফল কতদিনের হইতে পারে?' অমাত্যবর্গ পরীক্ষার জন্য কিয়ৎক্ষণ সেই কৃত্রিম ফল লইয়া নাড়াচাড়া করিল। আসামীর মুখ শুকাইল। অমাত্যবর্গ একবাক্যে বলিল, 'মহারাজ! এ ফল দুই বৎসরের নয়! ইহা অতি অল্পদিনের, বহুদিনের হইলে এমন সরস থাকিত না।' আসামী দোষী সাব্যস্ত হইল। আসামীকে প্রহরিগণ শাস্তি দিবার জন্য লইয়া গেল। বিচারকার্য্যও শেষ হইল। রাজা রাখাল বালকগণের এই অপূর্ব্ব বিচারাভিনয় দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। পরে সেই বালককে দিয়াই সেই বিশ্বাসঘাতক বণিকের বিচার করাইলেন।

এই গল্প হইতেই বুঝিতে পারা যায়, যদিও মুসলমান-সাহিত্যে নাটক ছিল না, তথাপি অভিনয় করিতে লোকে ছাড়িত না। জাপানীদিগের মধ্যেও অভিনয়ে ঘৃণাবশেই হউক, কিংবা অন্য যে কোন কারণেই হউক, নাটক সাহিত্য মধ্যে স্থান পায় নাই। সেখানে আজিও নিম্নশ্রেণীর লোকদিগের দ্বারা অভিনয়-কার্য্য সাধিত হইয়া থাকে।

জাতীয় জীবন ছাড়িয়া সমগ্র মানবজীবনের কথা ধরি না কেন। দেখিতে পাই, জন্মগ্রহণ করিবার চারি পাঁচ বৎসর পরে, মানুষ যেই ভাষায় একটু দখল পাইল—যেই দুই চারিটা মনের কথা কহিবার অবকাশ পাইল, অমনি অভিনয় আরম্ভ করিয়াছে। মানবজীবনের উপর নাটকের কি একটা বিচিত্র শক্তি, যে, সুবিধা পাইলেই তাহাকে আপনার কার্য্যে খাটাইয়া লয়। পাঁপরকুচির পাতার পাঁপর, অশ্বত্থ পত্রের লুচি, ধূলার চাল, জলের তেল লইয়া দোকান পাতিয়া বসিয়া থাকিতে অনেক শিশু দোকানদারকে আমরা কতকাল হইতেই না দেখিয়া আসিতেছি। অবগুণ্ঠনে বদন আবৃত করিয়া, কলসী-কক্ষে কত পঞ্চম-বর্ষীয়া গৃহিণীকে সেই দোকানের সম্মুখ দিয়া যাইতে যাইতে, সেই দোকানে সওদা করিতে দেখিয়াছি। পঞ্চমবর্ষীয় গৃহস্বামীর সম্মুখে, পঞ্চমবর্ষীয়া জায়ার, হাত নাড়িয়া মুখ নাড়িয়া কথা, দুই কিংবা তিন বৎসরের পুত্রকন্যা লইয়া তাহাদের কত আদর-যত্ন; সমবয়স্কা অন্য কোন গৃহিণীর আগমনে কত অভ্যর্থনা, কত স্ফূর্ত্তি কেনা দেখিয়াছে? কেনা বাল্যজীবনে কিছু না কিছু একটা অভিনয় দেখাইয়াছে? অভিনয়-কার্য্য মানবজাতি সৃষ্টির কাল হইতেই করিয়া আসিতেছে। অভিনয়-ক্রিয়া জাতীয় জীবন মুকুল প্রস্ফুটিত হইবার সঙ্গেই স্ফূর্ত্তি পাইয়াছে। সাহিত্যের উন্নতির সঙ্গে, সভ্যতার প্রসারের সঙ্গে নাট্যরসের ধারা বহিয়াছে। যেখানেই দেখিয়াছি, জাতীয়-জীবন অঙ্কুরিত, সেইখানেই অনুভব করিয়াছি, অনাঘ্রাত কুসুম-সৌরভের ন্যায় স্ফুটনোন্মুখ নাটকের সর্ব্বতোমুখী শক্তির সঞ্চার। অমনি দেখিয়াছি, কুসুম-পরিমল-লোলুপ মধুপের ন্যায় চারিধার হইতে প্রতিভা আসিয়া তাহাকে বেষ্টন করিয়াছে।

আর একটা বিষয় নাটকের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিশেষ সাহায্য করিয়াছে। যখনই কোন জাতি কোন আসন্নবিপদ হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছে, অথবা মৃতপ্রায় অবস্থা হইতে কোন মহানুভব রাজার চেষ্টায় যত্নে ও শুশ্রূষায় অথবা মৃতসঞ্জীবনী সুশাসন ঔষধের গুণে জীবনযৌবনে ফিরিয়াছে, অথবা কোন ধর্ম্মাত্মার আবির্ভাবে দেশবাসীর হৃদয় শান্তরসসিক্ত হইয়াছে, তখনই সে দেশে আমরা নাটকের উদ্ভব দেখিয়াছি। মানুষ একটু স্বচ্ছন্দ হইতে পাইলেই পাঁচ জনে মিলিয়া আমোদ করিতে ভালবাসে। মানুষ যখন একলা থাকে, মন তখন তাহার কুলবধূর মত অবগুণ্ঠনাবৃত মৃদুভাষী, আপনার কথা আপনি শুনে, নির্জ্জনতার আবরণ প্রতিহত হইয়া তাহার কথা তাহারই কাছে ফিরিয়া আসে। পাঁচজনের মাঝে পড়িলে কিন্তু মানুষ মুখর হয়। আবার আমোদ উৎসবের ভিতর পড়িলে তাহার কথাত একটা তুমুল বিদ্রোহ তুলিয়া বসিতে চায়।

নাটকের উৎপত্তি।

যখনই পাঁচ জন একত্র মিলিয়া খেলা করিয়া বসিল, অমনি হাস্য নৃত্যাদি রঙ্গের সূত্রপাত হইল। তবে লোক বুঝিয়া রঙ্গের তারতম্য। পাঁচ জন মূর্খের সম্মিলনে নৃত্য-গীতাদির উন্মাদতরঙ্গ; পাঁচ জন অর্দ্ধশিক্ষিতের একতায় উচ্ছৃঙ্খল ভাষার গীতাভিনয়। পাঁচ জন মিলিত শিক্ষিতের হাতে পড়িয়া সেই গীতাভিনয় ভাষায় একটু মার্জ্জিত হইয়া নাটকের আকার ধারণ করিয়াছে। সকল দেশেই দেখিতে পাই, প্রতিভাসম্পন্ন কোন অশিক্ষিতের বা অর্দ্ধশিক্ষিতের নৈসর্গিক উদ্ভাবনী-শক্তিবলে নাটকের বীজ রোপিত হইয়াছে। অথবা কোন শিক্ষিতের সহায়তায় অশিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যেই অগ্রে অভিনয়-কার্য্যের সূত্রপাত হইয়াছে।

প্রায় সকল সভ্যদেশেই দেখিতে পাই, জাতীয় জীবন লইয়া এক সময় দেশবাসিগণের ভিতর একটা না একটা বিষম অস্থিরতা উপস্থিত হইয়াছে। হয় কোন বহিঃশত্রুর আক্রমণে, কোন জাতি চিরদাসত্বে গা ঢালিয়া জীবনটাকে সেই প্রবল জাতির অন্তর্ভুক্ত করিয়া জগতের চক্ষুর অন্তরালে পড়িতে উদ্যত হইয়াছে, না হয়, অন্তর্বিদ্রোহে আপনাকে ছিন্নভিন্ন করিয়া, আপনার বিরাট্ শরীর খণ্ড খণ্ড করিয়া, আপনাকে জাতীয় ভগ্নাংশে পরিণত করিতে প্রবৃত্ত করিয়াছে। যেখানে জাতীয়তা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, সেখানে সব ফুরাইয়াছে। যে খানে ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে রক্ষা পাইয়াছে, সেখানে নমিত, অভগ্ন তরুশাখার ন্যায়, বিপদ-মুক্ত হইয়া প্রবল হইতে প্রবলতর বেগে ঊর্দ্ধ হইতে আরও ঊর্দ্ধে উঠিয়া প্রতি জাতি একটা অদম্য

জীবন-প্রবাহের পরিচয় দিয়াছে। বালক জননীর অনাদরে মৃত্তিকায় পড়িয়া উচ্চচীৎকারে মনোবেদনা প্রকাশ করে, জননীর আদর পাইয়া, কোলে উঠিলে চাঁদ ধরিবার সাধ করে। জাতীয় জীবনও সেইরূপ অদৃষ্টের প্রশ্রয় পাইলে পূর্ণ মানবত্ব লাভ করিবার যে—কটা বিধাতৃ নির্দ্দিষ্ট পথ আছে, সেই পথ ধরিয়া বিদ্যুদ্বেগে ছুটিয়া যায়। তখন সে জাতি কিসে না উন্নত? সাহিত্যে ধর্ম্মে, বিজ্ঞানে, জ্ঞানে, ঐশ্বর্য্যে কোন বিষয়েই না সে পূর্ব্ব জীবন হইতে, ঊর্দ্ধ হইতে ঊর্দ্ধে চলিয়া যায়? তখন গণিত, বিজ্ঞান, জ্যোতিষ, চিত্র, শিল্প, স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য, সেই দূরসংস্থ দিনকরের চতুর্দ্দিকে গ্রহতারার ন্যায়—সেই উন্নত জীবনের চারিধার অবিরাম-গতিতে ঘুরিতে থাকে। তখন অলোক-গর্ভিতে প্রাণের কথারাশি সাহিত্য-ব্যোমপৃষ্ঠে চাপিয়া, উন্মুক্ত অগণ্য হৃদয়ে প্রতিফলিত হইতে হইতে চারিধারে ছুটিতে থাকে। তখনই কাব্য নাটকের উদ্ভবে মানব-মনের জটিল ভাষার অভিধান প্রস্তুত হয়। ভারতে যেই বৌদ্ধ ও হিন্দুদিগের ধর্ম্ম-সংগ্রামের অবসান হইল ও হিন্দুত্বের পুনঃ-প্রতিষ্ঠা হইল, পারস্যরাজের অগণ্য সৈন্যস্রোত থারমাপলী গিরিকন্দরে ব্যাহত হইয়া, যেই মারাথন সমর-সাগরে মিলাইয়া গেল; অগষ্টসের শাসন-বন্ধনে গ্রিবীয় ও পেট্রিসীয়গণের চিরবিচ্ছিন্ন প্রাণ যেই একতায় জড়াইয়া গেল, নরশোণিত-রঞ্জিত রোমের-প্রান্তর সকল শ্যামল শোভায় ভরিয়া গেল; ট্যাঙরাজাদিগের হস্তে পড়িয়া পরস্পর-বিরোধী চীন-তাতার যেই এক সাম্রাজ্যে পরিণত হইল, এলিজাবেথের আশ্রয়ে বসিয়া ইংরেজ যেই ধর্ম্মপীড়নের হাত হইতে রক্ষা পাইল; এদিকে ক্ষুদ্রদ্বীপগ্রাসোদ্যত, দুর্দ্দান্ত স্পেনরাজ-প্রেরিত, ভীষণ আরমেডা, সহস্র ফণায় আসিতে আসিতে কালিয়ের ন্যায় ছিন্নমুণ্ড নিস্তেজ হইয়া যেই প্রাণ লইয়া পলাইয়া গেল, অমনি সেই সকল দেশে নাট্য-প্রতিভার বিকাশে পৃথিবী আলোকিত হইয়া উঠিল।

খৃষ্টের পূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীতে গ্রীসীয় নাটকের চরমোন্নতি কাল। বিয়োগান্ত-দৃশ্য-কাব্য-রচয়িতা ইসকাইলস, মারাথনের সমরক্ষেত্রে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী হইতে চীন নাটকের আরম্ভকাল। অন্তর্বিদ্রোহের কুফল ও শান্তি সচ্ছলতার সুখ দেখানই তাৎকালিক নাটকের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। ইহাতে ইহাই বুঝা যায়, বহুকালব্যাপী অন্তর্বিদ্রোহের পর চীনদেশে শান্তি স্থাপিত হইয়াছিল! আর এই সময়েই তাতার-বংশীয় নৃপতিগণ চীন-সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়াছিলেন! অগষ্টসের সময়েই ইটালী মহাকবি-প্রসবিনী। বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে ভারতে কালিদাস, এলিজাবেথের সময় ইংলণ্ডে সেক্‌স্‌পিয়র। প্রুসীয়রাজ মহান ফ্রেডরিকের জর্ম্মান জাতীয়ত্বের পুনর্গঠন ফলে গেটের বিকাশ। যথেচ্ছাচারী রাজার ও রাজবংশীদিগের অত্যাচারের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া ও প্রজাসাধারণের হস্তে পড়িয়া ফ্রান্সে ভলটেয়ার হিউগো আদি কবিকুলের চিরজীবন্ত লীলা-সমাগম।

প্রথম প্রথম প্রায় সকল দেশেই ধর্ম্মের উপরেই নাটকের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছিল। বৈষ্ণব-কবিদিগের গান হইতেই আমাদের দেশে গীতাভিনয়ের আরম্ভ হইয়াছে। দেবতা-সম্বন্ধীয় জাতীয় উৎসবে, যাত্রায়, নাটকাদি রচিত হইয়া অভিনীত হইত। ইংলণ্ডের ধর্ম্মযাজকগণের অভিনীত দৈবক্রিয়া হইতে বিলাতী নাটকের উৎপত্তি। গ্রীসদেশে এপলো ডাইওনিসিয়স প্রভৃতি দেবগণের প্রীত্যর্থে জাতীয় উৎসব হইত। সেই সময় হইতেই গ্রীসে নাটক অভিনয়ের আরম্ভ হইয়াছিল। সর্ব্বদেশেই নাটক ধর্ম্মমূলক ঘটনাবলী হইতে আরম্ভ করিয়া ভাষার সঙ্গে ক্রমশঃ উন্নীত হইয়া অবশেষে সার্ব্বজনিক চিত্রাঙ্কনে পরিণত হইয়াছিল। কোন নাটকই ধর্ম্মের একটা সঙ্কীর্ণ বন্ধনীর ভিতরে বেশী দিন থাকিতে পারে নাই।

ভারতীয় নাট্য।

অতি প্রাচীনকাল হইতেই ভারতবর্ষে নাটক অভিনীত হইয়া আসিতেছে। কোন দেবতার অথবা কোন প্রখ্যাতবৃত্ত দেবাংশ-সম্ভূত বীর রাজার জীবনের কোন বিশেষ শিক্ষাপ্রদ ঘটনা অবলম্বনে নাটক রচিত হইয়া, কোন রাজার নাট্যশালায় অথবা কোন উৎসব উপলক্ষে কোন দেবমন্দিরের সম্মুখে অভিনীত হইত। তবে কোন্ সময় হইতে অভিনয়কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে, নির্ণয় করিবার যো নাই! রামায়ণ মহাভারতের কোন স্থলেই নাট্যশালার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। নাট্যশালায় অভিনীত কোন দৃশ্য-কাব্যের ত কথাই নাই। তবে অনেক সমারোহ উপলক্ষে, নট, নর্ত্তকী, গায়ক বাদ্যকরের সমাবেশ দেখিতে পাই। রাম-লক্ষ্মণাদির জন্ম ও রামের রাজ্যাভিষেক সময়ে সঘ, নট নর্ত্তকাদি দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়াছিল। পঞ্চপাণ্ডবের বিরাটভবনে আত্মপ্রকাশের সময়েও বিরাট-গৃহে ঐরূপ নটাদি দ্বারা উৎসব-ক্রিয়া সমাহিত হইয়াছিল। কিন্তু কোনও স্থলে কোন অভিনয়ের উল্লেখ নাই, কোন নাটকের কথাও শুনিতে পাই না। এ সকল স্থলে নট—যে নৃত্য-ব্যবসায় দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, সেই নর্ত্তক অথবা "নটা বৈতালিকাস্তত্র নর্ত্তকাঃ সূত মাগধাঃ" নট নর্ত্তক হইতে ভিন্ন নাটক অভিনেতা—স্পষ্ট বুঝা যায় না। রামায়ণে লিখিত আছে—"রাজাদশরথের পুত্রোৎপত্তি কালে স্বর্গলোকে দেব-দুন্দুভি সকল নিনাদিত হইতে লাগিল। গন্ধর্ব্বেরা সুমধুর গান ও অপ্সরারা নৃত্য করিতে লাগিল। এবং অযোধ্যা-নগরীতে মহা সমারোহ মহোৎসব হইল। তাহার সুবিপুল ক্ষুদ্র পথ সকল নট ও নর্ত্তকগণে এরূপ পরিব্যাপ্ত হইল যে, ঐ সকল পথে একেবারে মনুষ্যের সমাগম রুদ্ধ হইয়া পড়িল।" ইহাতে নট যে নর্ত্তক হইতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। কিন্তু তাহাদের পথে দাঁড়াইয়া লোক-সমাগম রোধ করিতে দেখিয়া, তাহাদের কার্য্য নির্ণয়ে আমাদিগকে হতাশ হইতে হয়।

তবে সংস্কৃত-সাহিত্যে ভাণ নামক যে নাটক দেখিতে পাই, তাহা একজনেরই দ্বারা অভিনীত হয়। তাহাতে অভিনেতা স্বর-পরিবর্ত্তনে নাটোল্লিখিত ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিগণের কথা কহিয়া থাকে, শুদ্ধ বাক্যাভিনয় দেখানই ভাণ-নাটকের উদ্দেশ্য। ভাণ-নাটক একাঙ্ক। ইহাতে রঙ্গমঞ্চের আগম-নির্গমের কোনও ইঙ্গিত নাই, কাজেই যেখানেই হউক দাঁড়াইয়া একজন ব্যক্তিই এই নাটকের অভিনয় দেখাইতে পারে। ইহাতে নট, কখন বা নট-মূর্ত্তিতে নাট্যোল্লিখিত কোন ব্যক্তিকে প্রশ্ন করে, আবার নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিমূর্ত্তিতে নট নিজেই সেই প্রশ্নের উত্তর করে। মাণিকপীরের গানে আমরা দেখিয়াছি যে, চামরধারী অভিনেতা "জিবরিল ও জিবরিল" বলিয়া কাহাকে সম্বোধন করিতেছে; আবার "হাঁ হাঁ কি বল" বলিয়া আপনিই তাহার উত্তর দিতেছে। আমরা ভাঁড়ের নিকটেও স্বর-বৈচিত্র্যে বাক্যাভিনয়ের চূড়ান্ত দেখিয়াছি। রামায়ণ মহাভারতোক্ত নট যদি এই শ্রেণীর অভিনেতা হয়, তাহা হইলে তাহারা পথে, গৃহে, নাটমন্দিরে যেখানেই হউক দাঁড়াইয়া অভিনয় দেখাইতে পারে।

খৃষ্টের জন্মের বহু পূর্ব্বেই যে আমাদের দেশে নাটকের অস্তিত্ব ছিল, তাহা ভরতঋষি-প্রণীত নাট্যশাস্ত্র পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়। অনেক দেশেই বহুকাল হইতে নাটক অভিনীত হইয়া আসিতেছে, কিন্তু কোনও

দেশে এমন নাটক-রচনার-প্রণালী বিধিবদ্ধ করিয়া এমন সুন্দর নাট্যশাস্ত্র প্রণীত হয় নাই। ইহাতে ইহাই বুঝা যায় যে, অতি প্রাচীনকালে ভারতে শুধু নাটকের অস্তিত্ব না ছিল এমন নয়, আর্য্যগণ নাটকাভিনয়-কার্য্যে সমধিক উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু হয় সে সকল নাটক সাহিত্যে স্থান পায় না, নয়, নাটক অভিনয়ভার নটনামক নীচ জাতীয় ব্যক্তিগণের হস্তে সমর্পিত হইয়াছিল বলিয়া, সে সকল নাটক কালে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। প্রাচীন ভারতের অনেক ইতিহাস, অনেক কাব্য বংশ-পরম্পরায় মুখে মুখে চলিয়া আসিয়াছিল। বেদোক্ত ঋক্ আবির্ভূত হইবার বহুকাল পরে লিবদ্ধাকারে পরিণত হইয়াছিল। নাটকও যদি মুখে মুখে চলিয়া আসিত, তাহা হইলে, বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব কালে, নটগণ অভিনয়ের প্রশ্রয় না পাওয়ায়, নাটকের বিলোপ হওয়া বিচিত্র নয়। ভরত নিজেই লক্ষ্মী-স্বয়ংবর নামক নাটক রচনা করিয়াছিলেন। তাহা নারদাদি মুনিগণ ও উর্ব্বশী আদি অপ্সরাগণ কর্ত্তৃক ইন্দ্রের সভায় অভিনীত হইয়াছিল। এখন সে নাটকের অস্তিত্ব শুদ্ধমাত্র নামে পর্য্যবসিত হইয়াছে। অনেকের মতে এই নাটকই সংস্কৃত-সাহিত্যের সর্ব্বপ্রথম দৃশ্য-কাব্য। ইন্দ্র যদি বৈদিক মতের সৃষ্টিদাতা আকাশদেব না হইয়া ভূতলে নারদৈহিক মূর্ত্তিতে অবতীর্ণ কোনও প্রতাপবান্ রাজা হইতেন, আর সেই রাজা যদি অসীম ভুজবলে অনার্য্যদিগকে দমন করিয়া, ভারতে সমৃদ্ধ আর্য্যরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিতেন, আর তাঁহার সুশাসনে তদধিকৃত জনপদ যদি স্বর্গের সহিত তুলনীয় হইতে পারিত, তাহা হইলে তাঁহার সভায় অভিনীত লক্ষ্মী স্বয়ংবর নাটকের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কারণ থাকিত না। তবে পুরাণের ইন্দ্র নাকি স্বর্গের দেবতা, সেই জন্যই লক্ষ্মী স্বয়ংবরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কিছু সন্দেহ হয়। বিশেষ যখন বুঝি সর্ব্বপ্রথম নাটককার শুদ্ধ মাত্র একখানি নাটক রচনা করিয়া, কখন নাটক, প্রকরণ, ভাণ, ব্যায়োগ, প্রহসনাদি দশবিধ রূপক; নাটিকা, ত্রোটকাদি অষ্টাদশ উপরূপকের অস্তিত্ব কল্পনায় আনিয়া, সে সকলের রচনা বিধিবদ্ধ করিয়া সুন্দর অলঙ্কার শাস্ত্রের সৃষ্টি করিতে পারেন না; তখন আমাদের বোধ হয়, লক্ষ্মীস্বয়ংবর-রচয়িতা আর নাটকচন্দ্রিকার লেখক এক ব্যক্তি নহেন। তবে যদি ভরত ঋষি শুদ্ধ এক ব্যক্তি হন, তাহা হইলে আমার বিশ্বাস "লক্ষ্মীস্বয়ংবর" কবিকল্পিত উক্তি মাত্র। ভরতপ্রণীত নাটকচন্দ্রিকার পূর্ব্বে ভারতে চন্দ্রিকোক্ত সকল প্রকার নাটকেরই অভিনয় হইয়াছিল। কালবশে সে সকল নাটক লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, ইহাই আমাদের অনুমান হয়। যখন আমরা দেখিয়াছি, তখন তাহা একেবারে মেঘ-নির্ম্মুক্ত মধ্য আকাশের পূর্ণচন্দ্রমার ন্যায় জগতে স্নিগ্ধ কিরণ বিকীর্ণ করিতেছে। তখন বৌদ্ধের পাণ্ডিত্যমুক্ত সংস্কৃতসুধার স্রোত চারিধারে ছুটিয়াছিল। আধুনিক ঐতিহাসিকের মতে, তখন ধর্ম্ম আবার বৈদিকাভিমুখে ফিরিতে ফিরিতে অস্তংযত রশ্মিতে বহু দূর যাইয়া পড়িয়াছিল। বেদের তেত্রিশ দেবতা তেত্রিশ কোটি হইয়াছিল। সাহিত্য-সাগরে বিষ্ণু স্কন্দ পদ্মাদি পুরাণ সকল প্রায় চারি লক্ষ শ্লোকের তুফান তুলিয়াছিল। এমনই সময়েই না সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহাকাব্যও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ খণ্ডকাব্যের রচয়িতা বিক্রমাদিত্য-নবরত্ন-সভার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রত্নের শকুন্তলা—জর্ম্মন-কবি যে শকুন্তলার নামে, যৌবনের ফুল, বয়ঃপরিণতির ফল, স্বর্গ, মর্ত্ত্য, আত্মার তৃপ্তি, পুষ্টি, পরিণতি সকলই মাধান দেখিয়াছেন—সে-ই কল্পনার মাধুর্য্যের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফুল সহসা প্রস্ফুটিত হইয়া সর্ব্ব লোকের

নয়নাকর্ষণ করিয়াছিল! এমনই সময়ে না শূদ্রকের মাটীর গাড়ী সুকুমার মনোহারিত্বে মাতলি-পরিচালিত পুষ্পককে লাঞ্ছনা দিয়াছিল? গল্প-মাধুর্য্যে কোন্ দেশের কোন্ নাটক মৃচ্ছকটিককে পরাস্ত করিতে পারে? কিন্তু এই বিকসিত নাটক-কুসুমের মুকুল কোথায়? মৃচ্ছকটিক, বিক্রমোর্ব্বশী, শকুন্তলা—এরা যে সকল দেশের, সকল সময়ের সকল প্রাণের আশা-সাধন সুধাভাণ্ড! ভুবনান্তগামী, পূর্ণ প্রস্ফুটিত কাব্যফুলের পরিমল! অনেক দেশে—যেথায় মহা মহা নাট্য-সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছে এমন অনেক দেশ দেখাইব—যেথায় সর্ব্বগুণালঙ্কৃত নাটক একেবারে জন্মগ্রহণ করে নাই। উৎকৃষ্ট নাটক জন্মিবার বহু দিন পূর্ব্বেই তাহার সূচনা হইয়া আসিতেছিল।

সংস্কৃত নাটক-জীবনীকে প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। উন্নতির কাল, অবনতির কাল ও অধঃপতনের কাল।

উন্নতির কাল সম্বন্ধে পণ্ডিতদিগের মধ্যে বিস্তর মতভেদ। ঐতিহাসিক তত্ত্ববিৎদিগের অনুসন্ধানের ফলে, কালিদাসের প্রাদুর্ভাব খৃঃ পূঃ ৫৬ অব্দ হইতে পঞ্চম শতাব্দী পর্য্যন্ত নির্ণীত হইয়াছে। অধ্যাপক ওয়ার্ড বলেন, শকুন্তলা ও মৃচ্ছকটিক খৃষ্টের পূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল। অনেকের ধারণা বিক্রমাদিত্য সেই সময়েই প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। তাহা হইতেই সংবতের আরম্ভ। সংবৎ খৃষ্টের পূর্ব্ব ছাপান্ন অব্দ হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। খৃঃ পূঃ ৫০০ বৎসর হইতে আরম্ভ করিয়া খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দী পর্য্যন্ত ভারতে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাধান্য। বৈদিক ব্রাহ্মণদিগের গর্ব্ব সংস্কৃত-সাহিত্যের শক্তি নষ্ট করিয়া, পালিভাষ বিদ্ শ্রমণগণ তখন ভারতের নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার করিতেছিলেন। ভারতের সম্রাট্ মগধের রাজগণ তখন বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী। এই বংশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজা অশোকের রাজত্বকালে, রাজধানী পাটলীপুত্র নগরে খৃঃ পূঃ ২৪২ অব্দে বৌদ্ধাচার্য্যদিগের তৃতীয় মহাসভা আহূত হইয়াছিল। বৌদ্ধদিগের ধর্ম্মপ্রতাপে তখন হিন্দুধর্ম্ম নিস্তেজ নীরব। হিন্দুর জাতীয়-জীবন লুপ্তপ্রায়। এমন সময়ে ত সংস্কৃত-সাহিত্যের কাছে কিছুই আশা করা যায় না। অশোকের মৃত্যুর পর কিন্তু বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রতাপ আর তেমন অক্ষুণ্ণ রহিল না। মগধের রাজগণ হীন-প্রতাপ হইয়া গেল। অল্প দিনের মধ্যে সেথায় অন্য এক রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হইল। খৃঃ পূর্ব্ব ৭১ অব্দ পর্য্যন্ত সে বংশের স্থিতি। তাহার পরেই মগধ অন্ধ্ররাজগণের হস্তে পড়ে। ইতিহাস পাঠে জানা যায়, ঠিক্ এই সময়েই সময়ের অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, ভারতে হিন্দুধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতে প্রমার, পরিহার, চালুক্য ও চৌহান বংশের উদ্ভব হইল। যদিও অনেক ঐতিহাসিক গৌতমের আবির্ভাব হইতে পঞ্চম শতাব্দী পর্য্যন্ত বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রভাবের কাল নির্ণয় করিয়াছেন, কিন্তু অশোকের মৃত্যুর পর হইতেই দেখা যায়, পুনরুজ্জীবিত হিন্দুধর্ম্ম-প্রতিহত বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতের মধ্য হইতে সরিয়া সরিয়া, ভারতের প্রান্ত সীমায় যাইয়া পঁহুছিয়াছিল। বহুদূর-ব্যাপী বহুকালের বটবৃক্ষের ন্যায় এই মহাতরু এখন জটায় ভর দিয়া দাঁড়াইয়াছিল; স্কন্ধ অন্তঃসারশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল, মাথার ভার বহন করিবার পূর্ব্বের মত তার আর শক্তি ছিল না। কাশ্মীরের শক রাজা প্রথম শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন। ধর্ম্ম সে স্থান হইতে তিব্বত, চীন, তাতারাদি দেশে ছড়াইয়া পড়ে। অপর দিকে সাগর পার হইয়া বৌদ্ধধর্ম্ম সিংহল, শ্যাম, সুমাত্রাদি দেশ সকলে আপনার আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। মধ্য-ভারতে তাহার আর ততটা প্রতাপ ছিল না।

আবার সেই সময়েই হূণ শকাদি অন্যান্য জাতি কর্ত্তৃক ভারত আক্রান্ত হইয়াছিল। কণৌজে গুপ্তবংশের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। এমন সময় মালবদেশের কোন ক্ষুদ্র অংশে বিক্রমাদিত্যের ন্যায় কোন প্রমারবংশীয় রাজার আবির্ভাব কিছু বিচিত্র নয়। আর তাঁহার সভায়, উৎসাহ পাইবার আশায় ভারতের নানাদেশের পণ্ডিত-মণ্ডলীর আগমন কিছু অসম্ভব নয়। তবে রাজতরঙ্গিণীকারের কথিত কাশ্মীররাজ মাতৃগুপ্ত যদি বিক্রমাদিত্যের পূর্ব্বসভাসদ কালিদাস হ'ন, তাহা হইলে, শকুন্তলা-প্রণেতার জন্মকাল একেবারে ষষ্ঠ শতাব্দীতে আসিয়া পড়ে। কোথায় খৃঃ পূঃ এক শতাব্দী, কোথায় ষষ্ঠ খৃষ্টীয় শতাব্দী। কালিদাসের অস্তিত্ব এই সাত শত বৎসরের অনির্দ্দিষ্ট কাল মধ্যে ঘুরিয়াছিল। আর্য্যদর্শনের জটিল সন্ন্যাসী বলেন মৃচ্ছকটিক ৩০০০ বৎসর পূর্ব্বে আর কালিদাস-কৃত গ্রন্থ ২০০০ পূর্ব্বে রচিত। আমরা প্রত্নতত্ত্বের ধার ধারি না, আমরা জানি ইতিহাসের কথা-স্রোতে অনেক সত্য কিংবদন্তী ভাসিয়া গিয়াছে কাজেই ইতিহাসকারগণের সকল মত লইয়া, আর ভারতকেও আমাদের নাট্য সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া বলিতে পারি, কোন অনির্দ্দিষ্ট পূরাকাল হইতে আরম্ভ করিয়া, দশম শতাব্দী পর্য্যন্ত ভারতীয় নাটকের উন্নতিকাল। এই সময়ে কালিদাসের শকুন্তলা, বিক্রমোর্ব্বশী, শূদ্রকের মৃচ্ছকটিক, ভবভূতির মালতীমাধব, মহাবীরচরিত উত্তররচিত ও ভট্টনারায়ণের বেণীসংহার রচিত হইয়াছিল। ইহার মধ্যে কালিদাস ও ভবভূতির রচিত নাটক, শুদ্ধ ভারতীয় নাটকগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থানে কেন, সমগ্র জগতের মধ্যে যত শ্রেষ্ঠ নাটককার আছেন, তাহাদের সহিত একাসনে বসিবার যোগ্য।

শূদ্রক নিজে রাজা ছিলেন। অবন্তীনগর তাঁহার রাজধানী ছিল। কাহারও কাহারও মতে তিনি মগধের অন্ধ্রবংশীয় পঞ্চম শতাব্দীর কোন নরপতি; হয় তিনি কালিদাসের সমকালিক, নয় তিনি কালিদাসের কিছু পূর্ব্বসময়ের লোক। কেননা, তাঁহার নাটক-পাঠে ইহা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, বৌদ্ধধর্ম্মের আঘাতে হিন্দুর জাতীয় জীবনে তখন কিছু শৃঙ্খলা ছিল না। মৃচ্ছকটিকের নায়ক চারুদত্ত ব্রাহ্মণ হইয়াও বণিক্ ছিলেন, নাট্যোল্লিখিত উজ্জয়িনীরাজ একজন নীচ জাতীয় রমণীর পাণিগ্রহণ না করিয়াই, তাহাকে পাটরাণী করিয়াছিলেন; তাঁহার শ্যালক শকার সংস্থানক অযথা প্রজাপীড়ন করিলেও তিনি তাহা চক্ষে দেখিতেন না। বিচারালয়ে কাঞ্জীর-বিচার চলিত। বিচারাভিনয় বিচারকের হঠকারিতার পরিচয় দিত। অদণ্ড্য দণ্ড্য হইত, দণ্ড্য বিনাবিচারেই মুক্তিলাভ করিত। রাজার প্রতিও লোকের তেমন ভক্তি ছিল না। সুবিধা পাইলে অপরিণামদর্শী, অত্যাচারী, স্ত্রীবশ রাজাকে সিংহাসন চ্যুত করিয়া ক্ষত্রিয় ভিন্ন অপেক্ষাকৃত হীনজাতীয় ব্যক্তিকে রাজা করিতে কুণ্ঠিত হইত না। শূদ্রক রাজা বলিয়াই, অপর একদেশীয় রাজার পাপাচরণ ও সেই পাপের ফল প্রকাশ করিতে ভীত হন নাই। এই মৃচ্ছকটিকই বোধ হয় কালিদাসের অভিজ্ঞান-শকুন্তলের উদ্বোধক। যদিও ইহাতে কালিদাসের কবিত্ব নাই, তথাপি গল্পচাতুর্য্যে ও চরিত্রাঙ্কনে, অভিজ্ঞান-শকুন্তলের পূর্ব্বাভাষ দিবার যোগ্য গ্রন্থ। মারলোর ফষ্টস্ এডওয়ার্ডস্ যেমন সেক্‌স্‌পিয়র রচিত নাটকাবলীর পথ-প্রদর্শক, শূদ্রকের মৃচ্ছকটিকও কালিদাসের নাটকাবলী সম্বন্ধে সেইরূপ। মৃচ্ছকটিক প্রকরণাখ্য রূপক।

কালিদাসের পর ভবভূতি। মালতীমাধব, মহাবীর-চরিত, উত্তরচরিত—ভবভূতি-প্রণীত নাটকত্রয়। ভবভূতি বিদর্ভনগরে কাশ্যপ-

গোত্রীয় ব্রাহ্মণের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। মধ্য-ভারতের উচ্চ পর্ব্বতমালার মধ্যে জাত, গম্ভীরা-প্রকৃতি-অঙ্কে পালিত, মধুরগম্ভীর হিমালয়-উপত্যকায় অদৃষ্টচালিত হইয়া চিরাবস্থিত—এই প্রতিভার অবতার কালিদাস হইতে কবিত্বে দূরে থাকিলেও, প্রকৃতির গাম্ভীর্য্যবর্ণনে, চরিত্রাঙ্কনে ও ভাষার ওজস্বিতায় তিনি কোন দেশের কোন মহাকবির দ্বিতীয় নহেন। তাহার স্বকপোল-কল্পিত প্রকরণ মালতীমাধব, ও রামসীতার চরিত্র-বর্ণনে লিখিত উত্তরচরিতের স্থান নাট্য-সাহিত্যের অতি উচ্চে। স্থানে স্থানে ভাষার জটিলতায় ও ভাবের দুর্ব্বোধ্যতায় তিনি ন্যায়তঃ প্রাপ্য উচ্চতর স্থান হইতে আপনাকে বঞ্চিত করিয়াছেন। তিনি আপনার শক্তি বুঝিতেন। তাঁহার শক্তি সকলে অনুভব করিতে পারিল না বলিয়া, তাৎকালিক পণ্ডিত-মণ্ডলী তাঁহাকে কালিদাসের তুল্য সমাদরে গ্রহণ করিলেন না বলিয়া যে, তিনি অনন্ত কাল ও বিপুলা পৃথ্বীর দোহাই দিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার মত প্রতিভাশালীর যোগ্য কথা। তাঁহার একটু ভ্রম হইয়াছিল। সংস্কৃত ভাষা আরও উন্নীতা হইবে, সেই সে কালের স্বাধীনতার লীলাক্ষেত্র ভারতে রাজ-সহায়া মাতৃভাষা আরও গৌরবান্বিতা হইবে, বিবেচনা করিয়া, তিনি ভবিষ্যৎকে প্রত্যক্ষে আনিয়া, ভাষাটা একটু বেশী রকমের ভাব গাম্ভীর্য্যে ভরাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার প্রাদুর্ভাব-কাল অষ্টম শতাব্দী। তখন তাঁহার জ্ঞান ছিল না, আর শত বৎসর পরে ভারতকে মুসলমানের হাতে পড়িতে হইবে, সংস্কৃত ভাষার অত্যুন্নত মস্তকে কুঠারের আঘাত পড়িবে, আর তাহাকে গগনব্যাপিনী হইয়া শাখা প্রশাখায়,—গণিতে, জ্যোতিষে, সঙ্গীতে, কবিতায়—চৌষট্টি কলায় পৃথিবীতে ছায়া বিতরণ করিতে হইবে না। তাঁহার জ্ঞান ছিল না, মহাকবি হইয়াও তিনি বুঝিতে পারেন নাই,—অদৃষ্টের অভিনয়-বৈচিত্র্যের লীলাভূমি ভারতে চিরান্ধকারের রাজত্ব আসিবে। যে জাতি আলেক্‌জান্দ্রিয়ার সাহিত্য-সাগরে বাড়বানল জ্বালিয়াছিল, যে জাতির চক্ষে অভিনয়-প্রদর্শন একটা ঘৃণার কথা, সেই জাতির হস্তে ভারত-শাসনের ভার পড়িবে। আর সংস্কৃত, রাজার সাহায্য পাইবে না। আর আর্য্যজাতি, নিত্য চক্ষের উপরে দেবমূর্ত্তি ভগ্ন, উৎসব ব্যাহত, শস্যক্ষেত্র পরাধিকৃত, ধন অপহৃত, অন্ন পরকবলিত, আত্মীয় স্বজন যবনাস্ত্র হত দেখিয়া ভাষার চিন্তা করিতে পারিবে না; অভিনয়ের উৎকর্ষে মন দিতে পারিবে না। সপ্তদশ শতাব্দীর ইংলণ্ডের অন্তর্ব্বিদ্রোহ-কালে, ও তাহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী সুরুচিক খৃষ্টিয়দিগের প্রাধান্য-সময়ে ইংলণ্ডে নাটকের যে দুর্দ্দশা হইয়াছিল, সেই ভাব যদি আর কিছুকাল থাকিত, যদি গ্যারিকের জীবন-কাল অতিক্রম করিয়া, সেই নাট্য-সাহিত্যাকাশের ঘোর অন্ধকার চলিয়া যাইত, তাহা হইলে সেক্‌সপিয়রেরও ভবভূতির ন্যায় দুর্দ্দশা যে না ঘটিতে পারিত, কে বলিতে পারে? বুঝিতে পারিলে মিসরের চিত্রাক্ষরেও আনন্দ দিতে পারে। বুঝিতে না পারিলে মদনমোহনের অতি প্রাঞ্জল 'পাখী সব'ও বিরক্তিকর হয়।

কালিদাস সৌন্দর্য্যের কবি। জগতের যত কিছু সৌন্দর্য্য আছে, সকলের তিলাংশ লইয়া তিনি শকুন্তলা-তিলোত্তমা রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু তিলোত্তমা রূপে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইলেও রম্ভা কি জানি কি গুণে নারীমধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন পাইয়াছিল। কবিমধ্যে কালিদাস সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইলেও কুমারসম্ভব হইতে মনোহারিত্বে বহুদূরে থাকিলেও পণ্ডিতগণ কি জানি কেন মাঘের শিশুপালবধকে কাব্যের শ্রেষ্ঠ

পদবী প্রদান করিয়াছিল। শুধু সুন্দর লইয়া জগৎ নয়, সুন্দর অসুন্দর দুইয়ের ছবি তুলিকায় তুলিয়াই জগতে সেক্‌সপিয়রের আজ এত মান। তাই আজ অনুবাদিত মালতীমাধব, নাটকরূপে শকুন্তলা হইতে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের অধিকতর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। উইলসন বলেন, "কল্পনাগৌরবে ভবভূতি কালিদাস হইতে যদিও দুর্ব্বল, কিন্তু হৃদয়ের আবেগ দেখাইতে তিনি অধিকতর পারদর্শিতা দেখাইয়াছেন। ভবভূতি কোন নাটকেই হাস্যরস-অবতারণার চেষ্টাও করেন নাই। তাঁহার কোনও পুস্তকের কোনও চরিত্র সদা প্রফুল্ল বিদূষকের কাছেও দাঁড়াইতে পারে নাই। কিন্তু প্রকৃতির সুন্দর সুন্দর দৃশ্যবর্ণনায় ও মানবচিত্তের ছবি দেখাইতে তিনি কালিদাস হইতে বেশী নিপুণতা দেখাইয়াছেন। তিনি কালিদাস হইতে উচ্চতর কবি-পদবীর দাবী রাখেন।"

কালিদাসকে কেহ কেহ ভারতের সেক্‌সপিয়র বলিয়া থাকেন। অধ্যাপক ওয়ার্ড বলেন,—"এ কথা যদি বলিতে হয়, তাহা হইলে তাহা ভবভূতির নামেই প্রযোজ্য হইতে পারে। তাহা হইলে কবির উক্তি সার্থক হইয়াছে—এই বিপুলা পৃথ্বীর একস্থানে, এই অনন্তকালের এক অংশে মানব তাহার মর্ম্ম বুঝিয়াছে।"

কাব্যে হাস্যরস কিংবা ব্যঙ্গোক্তি না থাকিলে তাৎকালিক আলঙ্কারিকেরা তাহাকে শ্রেষ্ঠ কাব্য বলিয়া গণ্য করিতেন না। যে কাব্যে তাহা ছিল না, তাহাতে ভাবের প্রগাঢ়তা, চরিত্রাঙ্কনের কুশলতা, স্বভাব সৌন্দর্য্যবর্ণনের মধুরতা থাকিলেও, তাহাকে শ্রেষ্ঠ কাব্যমধ্যে স্থান দিতে সাহসী হইতেন না। তাই ভবভূতির নাটক, কালিদাস ও শূদ্রকাদির নাটকের মত সাদরে গৃহীত হইত না। আমাদের দেশেও ত এখন যে নাটকে গান না থাকে, তাহা নাটকই নয়; যাহাতে হাসি নাচ তামাসা না থাকে, তাহা বিয়োগান্তই হউক আর সংযোগান্তই হউক, অভিনয়ের যোগ্যই নয়। সুতরাং তাহা বঙ্গীয় পাঠকের কাছে আদর পায় না। তাই বিয়োগান্ত দৃশ্যকাব্য 'জনা'য় গানের ছড়াছড়ি, প্রাণ লইয়া কাড়াকাড়ি। তাই, রসিকরাজ বঙ্কিম যে পুস্তকে অতি সন্তর্পণে বিষাদের বেড়ায় ঘেরিয়া হাস্যরসাত্মক দৃশ্যের অবতারণা করিয়াছেন, সেই আদ্যন্ত করুণরসে-ভরা চন্দ্রশেখরের অভিনয়ে রসিকতার বাড়াবাড়ি। তাই রবীন্দ্রনাথ করুণরস তরঙ্গায়িত রাজা ও রাণীর বক্ষে গানের তুবড়ীতে আগুন দিয়াছেন। সেক্ষপিয়রের অবিমিশ্র বিয়োগান্ত ম্যাকবেথ নাটকে যে দ্বারবানের দৃশ্য আছে, অনেক বিজ্ঞসমালোচক তাহাকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া অনুমান করেন।

ভবভূতি মহাকবি। তিনি লোক ভুলাইবার জন্য মেঘরাগে ঝিঁঝিঁট মিশাইয়া জংলা করেন নাই। সেইজন্য দুর্গোৎসবে ঘণ্টাধ্বনি ও ইতুপূজায় ঢাকের আওয়াজ হয় নাই বলিয়া তাঁহার জীবদ্দশায় তাঁহার পুস্তকের আদর হয় নাই।

ভবভূতির পর হইতেই সংস্কৃত নাটক, সাহিত্যের মধ্যগগন পার হইয়া গেল। তবুও এই উন্নতিকালের আর দুইখানি পুস্তকের নাম উল্লেখযোগ্য। একখানি বিশাখদত্তের মুদ্রারাক্ষস, অপর খানি ভট্টনারায়ণের বেণীসংহার। মুদ্রারাক্ষস ঐতিহাসিক নাটক। মগধের রাজা নন্দকে হত করিয়া চন্দ্রগুপ্ত সিংহাসনে আরোহণ করেন। নন্দের মন্ত্রী রাক্ষস, যদিও প্রভুর মৃত্যুর পর, চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রীত্ব করিতে লাগিলেন, তথাপি বর্ত্তমান রাজা ও তাঁহার প্রধান সহায় ব্রাহ্মণ-চাণক্যের উপর তাহার মর্ম্মান্তিক ক্রোধ রহিল। চতুর চাণক্য তাহা বুঝিয়া, চন্দ্রগুপ্তের প্রতি তাহার ক্রোধ-অপনয়নের চেষ্টা করিলেন। প্রথমে রাক্ষসের

উদ্দেশ্য-সম্বন্ধে রাজার মনে সন্দেহ জন্মাইয়া তাহাকে পদচ্যুত করাইলেন। পরে কৌশলে মন্ত্রীকে নিজবশে আনিয়া, তাহাকে শাস্তি দিবার পরিবর্ত্তে সসম্মানে পূর্ব্বপদ দেওয়াইয়া রাজা ও মন্ত্রীর মধ্যে সদ্ভাব স্থাপিত করিলেন। ঘটনা অতি সামান্য, কিন্তু গ্রন্থকার এমন কৌশলে, সেই ঘটনাকে নিজায়ত্ত করিয়া গ্রন্থখানিকে নাটকে পরিণত করিয়াছেন যে, দেখিলে, বিস্মিত হইতে হয়। চরিত্রাঙ্কনে, নীতি কুশলতায় গ্রন্থকার অসাধারণ পাণ্ডিত্য দেখাইয়াছেন। ভাষা এই অভিনব নৈতিক নাটকেরই উপযোগী ওজস্বী। চরিত্রের বিশেষত্ব-রক্ষণেও তিনি বিশেষ নিপুণতা দেখাইয়াছেন। চাণক্য একগুঁয়ে রাগী-ব্রাহ্মণ, আপনার গণ্ডা কিছুতেই ছাড়িতে চাহেন না; পায়ে কুশাঙ্কুর বিধিলে, কুশ উপাড়িয়া, তাহার মূলে দধি ঢালিয়া কুশবংশ লোপ করিতেও তিনি কুণ্ঠিত নহেন। আপনার কো'ট রক্ষা হইলে, প্রাধান্য বজায় থাকিলে, তবে তাহাতে ব্রাহ্মণের মহত্ত্ব লক্ষিত হইত। রাক্ষস ভাল মানুষ। আপনার কো'ট ছাড়িয়া দিলে যদি গোলমাল মিটিয়া যায়, তাহা হইলে, তা ছাড়িয়া দিতে তাহার আপত্তি নাই। বর্ণগর্ব্বরক্ষা, ব্রাহ্মণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করা চাণক্যের জীবনের প্রধান কার্য্য ছিল। সে গর্ব্বে আঘাত করিলে, কাহারও আর তাঁহার হস্তে নিস্তার ছিল না। রাক্ষসের নিজের সঙ্গে বড় একটা সম্পর্ক ছিল না। তিনি প্রভুপরায়ণ ছিলেন, বন্ধুদিগের মঙ্গল-সাধনই তাঁহার কার্য্য ছিল। বন্ধুদিগের উপর আচরিত অনিষ্টের প্রতিবিধান করাই তাহার জীবনের উদ্দেশ্য ছিল। এই পরস্পর-বিরোধী দুই চরিত্রের একত্র সমাবেশ, জগতের অতি অল্প নাটকেই দেখা যায়। আলঙ্কারিক-নির্দ্দিষ্ট নিয়মপালনে, নাটকের প্রধান গুণ একতা—কার্য্যের একতা, সময়ের একতা ও স্থানের একতা দেখাইতে জগতের কোন নাটককারের তিনি দ্বিতীয় নহেন। মহানুভব উইলসন বলেন, "সমস্ত নাট্যসাহিত্যে মুদ্রারাক্ষস অপেক্ষা কার্য্যের একতা-প্রদর্শনের অন্য কোন উৎকৃষ্টতর উদাহরণ দেখান বড়ই দুর্ঘট। ইহাতে সমস্ত চরিত্রের কার্য্যকলাপ, বিবদমান রাজা ও মন্ত্রীর মধ্যে সৌহার্দ্দ-স্থাপনের জন্য।"

বেণীসংহার—কবি ভট্টনারায়ণ বিরচিত। ভট্টনারায়ণ কনৌজ হইতে আদিশূর কর্ত্তৃক বঙ্গদেশে আনীত পঞ্চ-ব্রাহ্মণের একজন। বেণীসংহার আনুমানিক নবম শতাব্দীতে লিখিত। কুরু-সভায় দুঃশাসন-কর্ত্তৃক কেশাকর্ষণে আনীতা, সভাস্থলে অগণ্য-লোকের সম্মুখে অপমানিতা দ্রৌপদীর লাঞ্ছনার প্রতিশোধ লইবার জন্য ভীম দুঃশাসনের বক্ষরক্ত-পান ও দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গ করিয়া, শোণিত-রঞ্জিত করে দ্রৌপদীর বেণী বাঁধিয়াছিলেন। ইহাতে কবিত্ব আছে, চরিত্রাঙ্কন-নিপুণতা আছে, চরিত্রের বিশেষত্ব ভাল রকমই লক্ষিত হয়; কিন্তু সকল থাকিতেও লিপি-কুশলতাদোষে বেণীসংহার পূর্ব্বোক্ত নাটক গুলির সমকক্ষ হইতে পারে নাই।

বেণীসংহারের পর হইতেই—দ্বাদশ শতাব্দী হইতে চতুর্দ্দশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ভারতীয় নাটকের অবনতির কাল। ভাষায় আর তেমন আদিমতা নাই, গাম্ভীর্য্য নাই, মনোহারিত্ব নাই। ভাব-প্রস্রবিণী আর তেমন সহস্র ধারায় প্রবাহিত হইয়া, অগণ্য-তারকোজ্জ্বল নীল-গগনের ছবি বুকে ধরিয়া মানব-হৃদয়-সাগরে পড়িতে পারিল না। আর তাহার বল্মীক-লঙ্ঘনের বল নাই; বালিয়ারী সৈকতকণায় পরিণত করিয়া স্রোতে ভাসাইবার জল নাই; এখন তাহাকে আসিতে আসিতেই পথেই শুকাইতে হয়। তাহাকে আনিতে হইলে পথ খনন করিতে হয়; মন ভিজাইতে হইলে

অগ্রে ছাঁকিয়া কলসে তুলিতে হয়। ভাষা কৃত্রিমতা-দোষদুষ্ট ও আবিলতাপূর্ণ হইয়া আসিয়াছে। অর্থ দুর্ব্বোধ হইয়া গিয়াছে, ভাব-মধুরতা কথার চতুরতায় পরিণত হইয়াছে।

এই অবনতিকালের প্রারম্ভেই দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বভাগে কাশ্মীররাজ শ্রীহর্ষ অথবা তৎসভাসদ ধাবক কর্ত্তৃক রত্নাবলী রচিত হয়। মামুদের ভারত-আক্রমণের পর শত বৎসর অতীত হইয়াছে। কাশ্মীরপ্রান্তে গজনীকেশরীর নখরপ্রহারক্ষত শুকাইয়া গিয়াছে। হিন্দুর ভয়, আশঙ্কা, উৎকণ্ঠা অনেকটা দূরে গিয়াছে। এমন সময় মাতৃ-ভাষা আর একবার মাথা তুলিলেন। কিন্তু তাহার মুখে আলতা রঙে এখন বিষাদ-কালিমা মিশিয়াছে। সর্ব্বস্থানে এখন আর তার তেমন আদর নাই। প্রাকৃত এখন তার অনেক স্থান অধিকার করিয়াছে। তাই রত্নাবলী গদ্যাংশে অতি মধুর হইলেও, ইহাতে কবিতার উচ্ছ্বাস নাই, কল্পনার বিকাশ নাই, ভাবোদ্রেকের শক্তি নাই। তথাপি ইহাতে পণ্ডিতজনোচিত ভাষার গৌরব আছে, বাক্‌পটুতা আছে। রত্নাবলী চারি অঙ্কে সম্পূর্ণ—ইহা আলঙ্কারিকের মতে নাটিকা।

রত্নাবলীর পর আরও দুই এক খানি নাটক এই সময়ে রচিত হইয়াছিল। যদিও এই সময়ে কবিতা নিস্তেজ হইয়া আসিতেছিল, তথাপি তাহাতে এখনও বর্ণহীনতা আসে নাই; অস্ত গমনের পূর্ব্বলক্ষণ—লোহিত বর্ণের আবরণ পড়ে নাই।

এই সকল নাটকের মধ্যে রাজশেখরের বিদ্ধশালভঞ্জিকা ও প্রচণ্ডপাণ্ডব উল্লেখযোগ্য। বিদ্ধশালভঞ্জিকা রত্নাবলীর অনুকরণে সাংসারিক ঘটনাবলম্বনে লিখিত নাটিকা। প্রচণ্ডপাণ্ডব মহাভারতোক্ত ঘটনা হইতে লিখিত। ইহা দুই অঙ্কে সম্পূর্ণ। দ্রৌপদীর বিবাহ হইতে আরম্ভ করিয়া, পাশক্রীড়ায় যুধিষ্ঠিরের সর্ব্বস্ব-নাশ ও বনগমনে ইহার শেষ। ইহার পর হইতেই সংস্কৃত নাটকের অধঃপতনের কাল। মুসলমানের আধিপত্য ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই প্রতিষ্ঠিত। সাহিত্যের গৌরব বিলুপ্ত। মাগধী, শৌরসেনী, প্রাকৃত প্রভৃতি ভাষার পরিবর্ত্তে, তামিলী, উৎকল, মারাঠী, হিন্দি, মৈথিলী, বঙ্গ প্রভৃতি ভাষার অলক্ষ্য পরিবর্ত্তনে উৎপত্তি। চারি দিকেই যেন একটা অন্ধকারের আবরণ। অনেক স্থলে সংস্কৃতের সহিত ভাষার দূর সম্পর্ক—"অজ্জউত্ত ইহস্মি,"—আর্য্যপুত্র ইহ অস্মি, "ইসিসি চুম্বিয়ায়িং"—ঈষদীষচ্চুম্বিতানি, "সুউমার"—সুকুমার—প্রাকৃতের সহিত সংস্কৃতের সে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ লুপ্ত হইয়াছে। মনের কথা, আজ-কালের ইংরেজীর ন্যায়, সংস্কৃতে অনুবাদ করিয়া তবে লিপিবদ্ধ করিতে হয়। সংস্কৃত আর প্রাণের উচ্ছ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে ছুটিতে পারে না। অধিকারীর পাণ্ডিত্য দেখাইবার জন্য, ভাবজটিলতা আনিবার জন্য, অর্থ দুর্ব্বোধ করিয়া অপরকে সহজে বুঝিতে না দিবার জন্য, সংস্কৃত এখন জিলিপির পাকে পড়িয়াছেন। তাহার উপর দেশের দুরবস্থায়, পণ্ডিত মূর্খ সকলের প্রাণেই একটা রুচিবিভ্রাট ঘটিয়াছে। আদিরসই তাহার এখন গতি, আদিরসেই তাহার স্থিতি। সহস্র সহস্র আদিরসে অনুপ্রাণিত উদ্ভট শ্লোক স্বতঃ উৎপন্ন হইয়া, জাতীয়তাহীন, রাজশ্রীহীন, ভারতীয় জীবন-আকাশের চারি ধারে উড়িয়া বেড়াইতে বেড়াইতে কালিদাসের লেখনী হইতে উৎপত্তির দাবী করিতে ছিল। তথাপি এমন সময়েও এমন জাতীয় জীবনের ঘোর তমোময় রজনীতে কোন্ বহুদূরস্থিত অদৃষ্ট গ্রহচূর্ণাংশ উল্কার মত, দুই এক খানি দৃশ্যকাব্য অন্ধকার ভেদ করিয়া কোথা হইতে আসিয়া জ্বলিয়া উঠিল।

শ্রীচৈতন্যদেবের প্রাদুর্ভাবের অব্যবহিত পূর্ব্বে ও পরে ধর্ম্মসংস্রবে বঙ্গে একটা নূতন জীবনের সঞ্চার হইল। সেই সময় একদিকে যেমন বঙ্গসাহিত্যে প্রাণ প্রবেশ করিল, অন্যদিকে সংস্কৃত কাব্যেরও সময়যোগ্য যথাসম্ভব স্ফূর্ত্তি হইল। জয়দেবের প্রসন্নরাঘব, রূপগোস্বামীর বিদগ্ধমাধব, ললিতমাধব ও দানকেলী-কৌমুদী সেই জীবন-বিকাশের ফল। যদিও এ সকল নাটকে তেমন নাটকত্ব নাই, তথাপি স্থানে স্থানে সুন্দর কবিত্ব আছে। মুরারি মিশ্রের অনর্ঘরাঘবও এই সময়ে রচিত।

এই সময়ে অনেকগুলি প্রহসন রচিত হইয়াছিল। প্রায় সকল গুলিই অশ্লীলতা-দোষদুষ্ট। তবে দুই এক খানিতে শক্তির পরিচয়ও পাওয়া যায়। উইলসনের গ্রন্থে চারি খানি প্রহসনের উল্লেখ দেখিতে পাই;—ধূর্ত্তনর্ত্তক, ধূর্ত্তসমাগম, হাস্যার্ণব ও কৌতুকসর্ব্বস্ব। এই প্রহসন গুলিতে তাৎকালিক সমাজের অবস্থা অনেকটা বুঝা যায়। আর বুঝা যায়, যাহা না থাকিলে নাটক জন্মিতে পারে না, ভারতবর্ষে এমন কি বস্তুর অভাব হইয়াছিল। এই সকল প্রহসন হইতে বুঝা যায়—যোগী সন্ন্যাসীর ভণ্ডামি, কুক্রিয়াসক্তি; দেশের লোকের চরিত্রহীনতা; গোবৈদ্যের প্রাদুর্ভাব; শান্তিরক্ষকের নিশ্চেষ্টতা; যোদ্ধার বাহাড়ম্বর; পণ্ডিতের মূর্খতা; মূর্খের পাণ্ডিত্যাভিমান,—দেশের অধঃপতন হইলে যাহা যাহা ঘটিতে পারে, সুতরাং যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, সমস্তই এই সকল পুস্তক পাঠে জানিতে পারা যায়।

তাহার পর—তাহার পর যদুপতেঃ ক্ব গতা মথুরাপুরী রঘুপতেঃ ক্ব গতোত্তরকোশলা? ভারতের জীবন অনন্ত অতলস্পর্শ সাগরগর্ভে ডুবিয়া গিয়াছে! যাহা কেহ কখন দেখিতে পায় নাই, ভারতীয় জীবন এখন সেই অভিধান-কবলিত-পরশমণি।

ভারতীয় নাট্য সম্বন্ধে সমস্ত বিষয় এ প্রবন্ধে লিখিত হইল না। যাঁহারা তাহা জানিতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদিগকে স্যার রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহোদয় প্রণীত ভারতীয় নাট্যরহস্য পাঠ করিতেঅনুরোধ করি।

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ।

গিরি-গঙ্গা।

প্রথম সর্গ।

গিরি-নিকুঞ্জে।

রজনি! শশাঙ্ক-সখি! গিরিকুঞ্জবনে
ওকি তোর আনন্দ-উৎসব!!
কি চঞ্চল উন্মাদিনী আকুল সম্ভোগ,
বৈদ্যুতিক বিজন সম্ভব!!
ঘন চন্দ্র-সুধা পান অঘোরে হারালি মান
লুটিতেছে বক্ষে তোর মধু-সমীরণ;
আলু-থালু অভাগিনি ভুলে নে বসন॥

আবেশে অলস নিশি শ্যামাঙ্গ-শিখরে
ঝরে তোর সুখাশ্রু-নীহার;
লাজে নতমুখী লতা, নিদ্রাভাণে তরু
বাঁচায় সরম বনিতার;
তরুণ কুসুম-রাশ অপাঙ্গে বঙ্কিম হাস
শশীর কলঙ্ক তোরে করিছে নির্দ্দেশ;
আ ছি ছি যামিনি তুই নিলাজের শেষ॥

বিলাসিনি! ফুলশয্যা নহে ত নবীন
নহে নব বসন্ত-যৌবন;
চপল না হ'লে সুখ বাসিবি না প্রিয়-
মত্ততা কি চির-বিনোদন?
ঝটিকা তরঙ্গ বিনা নিরুদ্বেল স্তরহীনা
বাসনার সন্তরণে পূরে না কি সাধ?
প্রমোদে কি চিরদিন মিলাবি প্রমাদ?

বিনোদ-বাসর-সাজ বিজনে সুন্দরি
বিজনে লো বঁধু-সমাগম—
প্রেমের সন্তোষ কোথা নিরজন বিনা,
চক্ষে নাহি ভোগের জনম।
নাহি ধরণীর শ্বাস গঞ্জনা লাঞ্ছনা হাস,
অবাধে এলায়ে যথা পড়িব আবেশে—
ঘৃণা লাজ বাঁধ নাই,—প্রেম সেই দেশে॥

সেই দেশে,—প্রিয়-বক্ষ-নিকুঞ্জ-কাননে
অবিরাম নিদ্রা যথা যাই ;
বিভোল মদির-সুখ-স্বপন-তরঙ্গে
কঠোর চমক যথা নাই ;—
মিলনে পাগল রই, জগতে চেতন নই,
সঙ্গীত-হিল্লোলে ভাসি অকূলে বেড়াই—
সেই পুণ্যভূমি—প্রেম-সাধনার ঠাঁই॥

কোথা হেন নিরজন ; মাত্র সে কল্পনা,
কল্পনায় নির্ম্মাণ তাহার ;
নন্দন-গহন-ভাগে, মন্দার পুলিনে,
হতে পারে,—নহে সে ধরার।
হেথা সুখ-অংশ লাগি পিছে মুখে শত আঁখি
জড়িত সৌভাগ্যে সদা, জীর্ণ দীন হীন ;
ছাড়িবে না, যেথা যাও রবে সম্মুখীন॥

তাই নীলাচল তোর নহে নিরালয়,
ভ্রান্তি যদি রহে সে দুরাশ ;
দেখ অই বেলাভূমি চারু অধিত্যকা,
নিসর্গের গরিমা প্রকাশ—
কিবা সমতল ভাগ, কিবা সে মোহন রাগ
জাগে অই বনে বনে নর-নিকেতন ;
জ্যোৎস্নালস-তন্দ্রা-অর্দ্ধমুদিত-নয়ন॥

অই উপবনে—শ্যাম লতা-বিজড়িত
শোভে অই পুষ্প-পথ যার—
শোন্ নিশি —ওকি কেন এমন নিশীথে
নারী কল-কণ্ঠের ঝঙ্কার !!
সাধে-না-বলিতে চাই জগতে বিজন নাই ;—
দেখ্ তোর সুখে কত তৃষিত নয়ান,
চাহিয়া করিছে নিশি, নিশি-অবসান॥

কুসুম-প্রহরী-দৃপ্ত তোরণ পশ্চাতে
জাগে কিবা রতন-মন্দির !
ওরা কে ? জীবন্ত ফুল ? কল্পনার প্রাণ ?
অরুণিত বালিকা মিহির ?
লাবণ্য ভাঙ্গিয়া ফেলে ননীকে দিয়াছে ঢেলে
অঙ্গে অঙ্গে ছোটে জ্যোতি চূর্ণ মরকত
ওরা দেবী ? ওই কি সে মন্দার পর্ব্বত ?

শ্রাবণে পূর্ণাঙ্গী নদী প্রফুল্ল-যৌবনা
উছলিত কান্তির লহর—
টল টল দেহ-ভার বহন-কাতরা
হেমন্তের নিশীথ মন্থর !
কর্ণে কুসুমের দুল ফুলে ঢাকা এলো চুল
ললাটে কুন্তলে ফুল ফুলের কঙ্কণ ;—
চন্দ্রালোকে ফুলে ঘেরা কে ওরা ক'জন ?

মধ্যে ও কে সুহাসিনী সুকেশা সুন্দরী
জলময়ী কমল-লতিকা !!
ওকি নিশীথের দূর মিলন-সঙ্গীত,
বসন্তের প্রভাত যূথিকা !!
অথবা চাঁদের হাসি মানবী সেজেছে আসি !!
ওকে ? ও ত পারিজাত নহে অমরার ?
তবে সে অতুল কিসে ? ভ্রান্তি দেবতার !!

মধুর কুমুদ পদ্ম মৃণাল-বন্ধনে,
আশে পাশে লতায় গাঁথনি ;—
বিচিত্র সে পুষ্পাসনে পুষ্প-পরাজিতা
সমাসীনা চম্পক-বরণী।
কেলি-শতদল-বনে কামদা অপ্সরা সনে
সুরালসা বেদ-বীণা-বিনোদিনী-সমা,
প্রমদা প্রমোদবনে কেও মনোরমা ?

ওরা সহচরী,—ওকি বীণার ঝঙ্কার ?
মরি মরি মন-উন্মাদন !!

কার লীলা-রাজ্যে তুই উঠালি কল্পনা,
চক্ষে একি ভাসালি স্বপন ?
উঠিল বীণার তান কাঁপে রজনীর প্রাণ
চলিতে না পারে আর বসন্ত-পবন,
সঙ্গে নারী-কণ্ঠ, গানে ভরিল গগন॥

এ কুঞ্জে চেওনা শশী, এ কণ্ঠে মজিলে
নিশিনাথ ! হারাবে চেতনা ;
বরণ ভুলিয়া যাই—অস্ত তব ছার—
ভুলে যাবে, নিশি পোহাবে না।
তরঙ্গ তরঙ্গ গায় হৃদয়ে বসিয়া যায়,—
যথা ফুলশয্যা-স্বপ্ন বাল-বিধবার,
হাসি-অশ্রু—মাখামাখী বেহাগ-সঞ্চার।

পর্ব্বত-প্রদেশ পুরি উঠিল সঙ্গীত,
"এস তুমি হে মনোমোহন !"
চম্পক-অঙ্গুলি-স্পর্শে শিহরিল বীণা
করিল সে কণ্ঠানুসরণ—
রবিরে জীবনে যথা কাদম্বিনী ঢাকে, তথা
জীবনে আমার তোমা' দিব আবরণ—
এস তুমি হে মনোমোহন !"

"এস তুমি হে মনোমোহন !
সাগর-গামিনী পূর্ণা প্রবাহিণীকূলে
প্রেমিকের চারু বিচরণ—
কিংবা শৈল-লীলা-ক্ষেত্রে, সরলা নির্ঝর নেত্রে,
শ্মশানে কুসুমরাজ্যে প্রান্তরে গোপন,—
এস তুমি হে মন-মোহন !"

"ঊষার আলস্য-ভঙ্গে, শুভ্র প্রভাতের
সুশীতল জগতে নীরব
এস তুমি হে প্রাণবল্লভ !
অথবা বাঁধিও গ্রন্থি সন্ধ্যার অঞ্চলে
ভোল যদি হৃদয়-বান্ধব !
না হয় তামসী যবে শাসনে প্রমত্তা রবে
আতঙ্কে জগত-জীব নিদ্রা যাবে সব—
এস এস হে প্রাণবল্লভ !"

"এস এস হে প্রাণবল্লভ !
হাসির কুঙ্কুমে দিও বসন রঞ্জিয়া,
জাগাইব বসন্ত-উৎসব ;—
বরষার ধারা যত না হয় আনিও তত
অশ্রুজল—চাতকের একমাত্র রব,
এস তুমি হে প্রাণবল্লভ !"

"ভাসে প্রাণে কলধ্বনি দূরস্থা নদীর,
ছায়াসনে তার,
মিশে এস জীবন-আধার !
না হয় মিলাও তনু তরলিত হয়ে
অই জ্যোৎস্না সনে, ডুবে থাকি অনিবার।
শ্যাম শৈশবের স্মৃতি, পুষ্পের সৌরভ-প্রীতি,
চিন্তার স্বপন হ'য়ে হৃদয়ে আমার—
এস এস জীবন-আধার !!"

"হে পার্ব্বতি !" বীণা ফেলি কহে নারী এক,
"হে পার্ব্বতি নয়ন-রঞ্জিনি !
একাকিনী একাসনে এ ভাবে পোহাবে
কত জন্ম-তিথির যামিনী ?
সখি ! হেমহংস-আনে আছ কি আলস্যে ব'সে ?
অন্য সহচরী ত্বরা করে নিবেদন
"দ্বারে সেনাপতি রাণি, মাগে দরশন।"

বিদ্যুতে চমকে যথা অম্বর নির্ম্মল,
রঙ্গে দেহ লোহিত আভায় ;
চমকে অনঙ্গ-লোভা হেমাঙ্গী পার্ব্বতী,
সেনাপতি ! হা ধিক্ তোমায় !!
বর্ণ বিঁধে কোটে লাল সিন্দূর হইল গাল—
ভানু-কর-লেখা-ফুল্ল রক্তপদ্মদলে
ঊষার, যে বর্ণ ছানে সরসী-হিল্লোলে—

পার্ব্বতী কনকপদ্মে সেই বর্ণ-ছায়,
কপোল ললাট গণ্ডদেশ
মধুর লোহিতাভাসে ক্ষণ বিভাসিত,
ক্ষণ জ্যোতিঃ চক্ষে সমাবেশ ;—

কহিল কুসুমাসীনা (দূরে যা নিলাজ বীণা)
"নিশীথে প্রমোদ বলে সেনাপতি মাগে
রাণী-দরশন? সহচরি কহ আগে

প্রকৃতিস্থা তুমি?" সুহাসিনী সহচরী
কহে, "রাণী না পার্ব্বতী,
পার্ব্বতীর জন্মদিনে রাণীর মরণ";—
"হে পার্ব্বতি! মোহকরী অতি
সুধা;—পানে স্বর্গতার, ঘ্রাণে যদি অর্দ্ধাহার,
মোরা অর্দ্ধপথে আজ পুণ্য স্বরগের,
বিচিত্র কি অপলাপ ঘটিবে জ্ঞানের?—

নহে পরিহাস, সত্য কানন তোরণে
সেনাপতি, মিথ্যা না উচ্চারি;"
বিরতি-ভ্রূকুটী-রেখা ভাগিল নয়নে,
ঘৃণা হাস হাসিল কুমারী।
সে হাসি বড়ই ক্ষীণ, না ফুটিতে হয় লীন,
ক্রোধে নাসা বিস্ফারিত কাঁপে ওষ্ঠাধর—
গর্ব্বিতা ঐন্দ্রিলা-মূর্ত্তি নন্দন ভিতর!!

তুলি নেত্র, ক্রোধাভাসে রঞ্জিত গোলাপে,
"সহচরি!" কহিল পার্ব্বতী—
"রাজ-বৈদ্যাগারে কর সংবাদ-প্রেরণ—
উন্মাদ মন্দার-সেনাপতি।
নতুবা বুঝি না কেন দুর্ম্মতি ঘটিবে হেন?
দুর্ম্মতি? দুর্ম্মতি নহে, মতির বিকার—
পদ্ম পত্র আছে? ব্যাধি ঘুচাই তাহার॥"

অদূরে সরসী স্বচ্ছ নবীনা নীলাঙ্গী
অচেতন নিশীথ-নিদ্রায়;
পূর্ণ বক্ষে ঊর্দ্ধমুখ একমল, কুণ্ঠিত
শশধর-পরশ জ্যোৎস্নায়।
পার্ব্বতীর আজ্ঞা পেয়ে পঞ্চনারী যায় ধেয়ে
মোহিনী মাতঙ্গীদল দলি পদ্মবন
মুহূর্ত্তে পল্লব আনি করিল অর্পণ॥

সুবর্ণ কঙ্কণ-কাঁটা লেপিয়া কজ্জলে,
"সেনাপতি"—পদ্ম পত্র গায়
সগর্ব্বে টানিল আঁক মন্দারের রাণী—
"সেনাপতি"—আর না গুছায়।
কপাল রক্তিমতর, স্বেদবিন্দু মুক্তাধর
উদিল ললাটে,—ফুল্ল চমকে নীহার,—
রাণি! ছিছি নেত্র-কোণে ওকি!! জলভার?

"সেনাপতি!"
লিখিল পার্ব্বতী,
"রজনী তৃতীয় যামে প্রমোদ-মন্দিরে,
জন্মতিথি-আনন্দ-উৎসবে,
বুঝিবে অস্ফুট জ্ঞান মন্দার-বালক
রাণী নহে মত্ত মহাহবে।
স্থির-চিত্ত-বৃত্তি কাজ নহে এ কহিতে লাজ—
যে দ্বারী দিয়াছে তোমা অন্তঃপুরদ্বার
নিশিতে,—উচিত দণ্ড দিব প্রাতে তার॥"

"সহচরি"—বাম করে পদ্ম পত্র লিখি
করে রাণী সখী-সম্বোধন,
দূত করে দেহ পত্র সেনাপতি-পাশে
অবিলম্বে করুক বহন"।—
"অলকা!"—প্রধানা উঠে কৃতাঞ্জলি করপুটে
সম্ভ্রমে দাঁড়ায়,—রাণী কহে "নিশি যায়—
সজনি! বিশ্রাম গৃহে মোরে রেখে আয়॥"

বিশ্রামে চলিল রাণী, সখীবৃন্দ যায়,
কেঁদে চায় রতন মন্দির—
নিষ্প্রভ আলোক, হীন কান্ত ফুলদল,
হুহু করে বসন্ত সমীর!!
কে তুই লুকায়ে ছিলি এ আনন্দ ভেঙ্গে দিলি
হা পাষাণ! ওঃ কি তীব্র কর্কশ কঠোর
পেচকের ধ্বনি!! একি সুখ নিশি ভোর!!

শ্রীরামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

রাঢ়েশ্বর শিবলিঙ্গ।

রাঢ়েশ্বরের নাম শত বৎসর পূর্ব্বে সমগ্র বঙ্গদেশে বিশেষতঃ পশ্চিম-বঙ্গে প্রসিদ্ধ ছিল। প্রত্যহ কত শত যাত্রী দূর-দূরান্তর হইতে আসিয়া বাবা রাঢ়েশ্বরের অনুগ্রহ প্রার্থনা করিত; কিন্তু কাল-সহকারে সে ভাব এখন তিরোহিত। রাঢ়ের কতিপয় স্থান ভিন্ন রাঢ়েশ্বরের নাম পর্য্যন্ত কোন স্থানে নাই।

প্রাচীন গৌরবের আবাসভূমি—সেই সমৃদ্ধ রাঢ়েশ্বরের কথা শুনিয়া, যাঁহারা সংসারের অনিত্যতা উপলব্ধি করিতে চাহেন বা প্রত্নতত্ত্ব প্রমোদ উপলব্ধি করিতে চাহেন, তাঁহাদিগকে সাদরে আহ্বান করিতেছি।

বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত দুর্গাপুর ষ্টেশনের অন্যূনাধিক দেড় ক্রোশ দূরে ব্রাহ্মণাড়া নামে একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। গ্রামসীমা পার হইলেই একটী ক্ষুদ্র বন। বনের সীমা প্রস্থে কম হইলেও দৈর্ঘ্যে নিতান্ত কম নহে। এই বনমধ্যে রাঢ়েশ্বর নামক একটী শিবলিঙ্গ আছেন। এই শিবলিঙ্গ-সম্বন্ধীয় এবং এই স্থানের অতীত ঘটনা-সম্বন্ধীয় বিবরণ প্রকাশ করাই এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

রাঢ়েশ্বর লিঙ্গ—অতিবৃহৎ এবং ইহাঁর নির্ম্মাণ অতি সুন্দর। চারিজন মনুষ্য পরস্পর হাত ধরাধরি করিয়া বেষ্টন করিলে, রাঢ়েশ্বরকে বেষ্টিত করা যায়। ঊর্দ্ধে প্রায় তিন হাত। কাশীধামের তিলভাণ্ডেশ্বর শিবলিঙ্গের সহিত তুলনা করিলে, রাঢ়েশ্বরকে যদিও পরিমাণে কিছু হ্রস্ব বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু রাঢ়েশ্বরের ন্যায় সুন্দর নির্ম্মাণ ও চাক্‌চিক্য আর কোন শিবলিঙ্গের দেখা যায় না। রাঢ়েশ্বরের গৌরীপট্টের নাভীস্থলে, পূর্ব্বে একটী মহামূল্য প্রস্তর ছিল। রাত্রিকালে এই প্রস্তরের আলোকে মন্দিরের অভ্যন্তর দেশ আলোকিত হইত। প্রবাদ আছে যে, রাত্রিকালে ঐ প্রস্তরটী প্রজ্বলিত দেখিয়া বিষধর সর্পগণ মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিয়া আপনাদের ফণা বিস্তৃত করিয়া রাঢ়েশ্বরের চতুর্দ্দিকে গর্জ্জন করিয়া বেড়াইত; কোন লোক বা কোন পশু পর্য্যন্ত রাত্রিকালে মন্দিরে প্রবেশ করিতে পারিত না। মহারাষ্ট্র-দেশবাসী কোন দুষ্ট সন্ন্যাসী, এই মহামূল্য রত্ন অপহরণ করিয়া লইয়া যায়। গৌরীপট্টের যে স্থানে ঐ প্রস্তরটী নিহিত ছিল, সেই স্থানটী এখন গর্ত্তের ন্যায় হইয়া আছে। পূজকগণ বর্ত্তমান সময়ে সেইস্থানে এরূপভাবে তৈলাক্ত সিন্দুর লেপন করিয়া রাখিয়াছেন যে, দেখিলেই বোধ হয়, যেন প্রস্তরটী বহিষ্কৃত করা.ত সেই স্থান হইতে রক্তধারা পড়িতেছে।

রাঢ়েশ্বরের মন্দির অতি উচ্চ এবং উহা প্রস্তর-নির্ম্মিত। যদিও এখন উহার কোন বিশেষ শোভা সম্পত্তি নাই, কিন্তু উহা অদ্ভুত শিল্পনৈপুণ্যের আদর্শ বলিয়া সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। কেননা, ঐ মন্দিরের সমকালীন কোন অট্টালিকা বা দেবমন্দিরাদি এখন দেখিতে পাওয়া যায় না। এখন ঐ মন্দির দেখিলেই দর্শকগণ মনে করে যে, এখনই উহা ভাঙ্গিয়া পড়িবে; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। বহুদিনাবধি মন্দিরটী ঐরূপ ভাবেই অবস্থান করিতেছে এবং অসংখ্য প্রবল ঝটিকা ঐ অবস্থাতেই মস্তকে সহ্য করিয়া আসিতেছে। মন্দিরের প্রস্তরসন্নিবেশ এখন কিছু শিথিল হইয়াছে এবং দুই একটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্ভিদ মন্দিরের চূড়াদেশে আশ্রয় লইয়াছে। মন্দিরের বহির্ভাগে প্রস্তর-সন্নিবেশ শিথিল হইয়া যে সমস্ত ছিদ্র হইয়াছে, সেই সমস্ত ছিদ্র মধ্যে খোঁটা পুতিয়া লোকে শতশত প্রস্তর খণ্ডরজ্জুবদ্ধ করিয়া ঝুলাইয়া রাখিয়াছে। স্থানীয় লোকে ঐ সমুদায় রজ্জুলম্বিত প্রস্তরখণ্ডকে "বাচা" বলে। কাহারও

কোন সঙ্কট পীড়া কিংবা কোন বিপদ উপস্থিত হইলে, তাহাদের আত্মীয় বন্ধুবান্ধব রাঢ়েশ্বরের নিকটে পূজা দিবার মানসিক করিয়া, ঐরূপ "বাচা" বন্ধিয়া যায়; পরে তাহাদের অভীষ্টসিদ্ধি হইলে, নির্দ্দিষ্ট সময়ে পূজা দিয়া ঐ সমস্ত "বাচা" খুলিয়া লয়।

মন্দিরের সম্মুখে প্রস্তর-নির্ম্মিত নাটশালা ছিল। এখন উহা ভগ্ন হইয়া গিয়াছে; কেবল সেই প্রস্তরগুলি তথায় স্থানে স্থানে পড়িয়া আছে। পূর্ব্বে শত শত সন্ন্যাসী ঐ স্থানে চারি দিকে অগ্নি জ্বালিয়া রাত্রি যাপন করিত; এখনও সময়ে সময়ে তথায় দুই একটী সাধুলোকের সমাগম হয়।

মন্দিরের সীমা অতিক্রম করিলেই, বৃক্ষলতাসুশোভিত বন। অন্যান্য বৃক্ষাপেক্ষা তথায় বিল্ববৃক্ষের সংখ্যাই অধিক। বিল্ববৃক্ষগণ, আপনাদের পত্র দ্বারা ভগবান্ রাঢ়েশ্বরের অর্চ্চনা হইবে ভাবিয়া জন্মসার্থক্য সম্পাদন করিবার জন্যই যেন সেই স্থানে প্রভূতরূপে উদ্ভূত হইয়াছে!

মন্দিরের উত্তরভাগে কিছু দূরে "কালদীঘি" নামক সরোবর। ঐ সরোবরের জল অতি নির্ম্মল; শত শত শ্বেত-পদ্ম, রক্ত-পদ্ম, সুঁষি, শালুকসমূহ প্রস্ফুটিত হইয়া দিবা-রাত্রি উহার শোভা সম্পাদন করিতেছে। জলচর পক্ষিগণ সর্ব্বদা নানাবিধ শব্দে যেন ভগবান্ রাঢ়েশ্বরের গুণকীর্ত্তন করিতেছে। কালদীঘিরও চতুঃপার্শ্বে বিল্ববৃক্ষের বন; উহা এত ঘন যে সূর্য্যকিরণ প্রবেশ করিতে পারে না।

মন্দিরের পশ্চিমভাগে ও নৈর্ঋতকোণে কিছুদূর গমন করিলেই ঠাকুর-পুষ্করিণী, পড়েল, পদ্ম-পুষ্করিণী প্রভৃতি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অনেকগুলি জলাশয় দেখিতে পাওয়া যায়। যে মহাত্মা ঐ সকল সুবিস্তৃত জলাশয় খনন করাইয়াছিলেন, তাঁহার অন্যান্য কীর্ত্তি-চিহ্ন বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে; কেবল দেবাদিদেব রাঢ়েশ্বর এবং ঐ সমুদয় জলাশয় তাঁহার অক্ষয়কীর্ত্তি জাজ্বল্যমান রাখিয়াছে।

কোন্ সময়ে এবং কোন্ ব্যক্তি দ্বারা রাঢ়েশ্বর-শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, তৎসম্বন্ধে স্থানীয় লোকপরম্পরায় বিলক্ষণ প্রবাদ আছে এবং তৎসম্বন্ধে অনেক বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণও পাওয়া গিয়াছে। ঐ সকল প্রবাদের তথ্যানুসন্ধান জন্য, রাণীগঞ্জের প্রসিদ্ধ উকীল, ব্রাহ্মনাড়া-নিবাসী উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় অনেক চেষ্টা করিয়া বহুতর বিশ্বস্ত প্রমাণ অবগত হইয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এক্ষণে সেই সমস্ত প্রমাণমূলক রাঢ়েশ্বর-সম্বন্ধীয় বিবরণ পাঠকবর্গকে অবগত করাইতেছি।

রাঢ়েশ্বরের মন্দিরের চতুর্দ্দিকে যে সকল স্থান এখন অরণ্য বা শস্যক্ষেত্ররূপে পরিণত হইয়াছে, উহার মধ্যে প্রায় দুই ক্রোশ ব্যাপিয়া একটী রাজধানী ছিল। স্থানে স্থানে এখনও উহার অনেক চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু কালপ্রবাহে ক্রমে তাহাও ভাসিয়া যাইবে। যে স্থান একদিন রাজ-মহিলাগণের বিলাসভূমি ছিল, এখন তাহা ভয়ানক ব্যাঘ্র-ভল্লুকের আবাসভূমি হইয়াছে। রাজবাটীর সামান্য কোন অমঙ্গল হইলে, যে স্থানে বেদজ্ঞ পুরোহিতমণ্ডলীর উচ্চ বেদধ্বনিতে পূর্ণ হইত, তথায় কিনা শৃগালগণ "ফেউ ফেউ" শব্দ করিয়া চতুর্দ্দিকে বেড়াইতেছে। কালের বিচিত্র গতি কে বুঝিবে!

কোন্ মহাপুরুষ প্রথম এই রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না; তবে মুখোপাধ্যায় মহাশয় যেরূপ অনুমান করিয়াছেন, তদনুসারে ইহা বুঝা যায় যে, যে সময়ে বিদেশীয় বণিক্‌গণের কৌশলজালে জড়ীভূত হইয়া যবনরাজ্যের শাসনপ্রণালী বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল এবং যে সময়ে দুর্ব্বৃত্ত মহারাষ্ট্রবাসিগণ দস্যুবৃত্তি করিয়া দেশের উচ্ছেদ সাধন

করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল, সেই সময়ে বঙ্গদেশীয় কতকগুলি ক্ষুদ্র রাজ্য কিছু দিনের জন্য স্বাধীনভাব ধারণ করিয়াছিল। যে রাজধানীর কথা বলিতেছি, ইহা তাহাদেরই অন্যতম "আঢ়রাজ্য"। তৎকালে রাজা ভুবনেশ্বর রায় এই আঢ়-রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন। তিনিই ঐ সমস্ত সুবৃহৎ জলাশয় খনন এবং রাঢ়েশ্বর-শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া অক্ষয়কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। তৎকালে এ দেশে পারসী-ভাষার অধিক প্রচলন ছিল, তদনুসারে রাজা ভুবনেশ্বর রায়কে লোকে সাহাজাদ রায় বলিত।

সাহাজাদ রায় যদিও ব্রাহ্মণ-বংশসম্ভূত রাজা ছিলেন, তথাপি তিনি অতি সাহসী ও প্রবলপরাক্রমশালী ছিলেন। তিনি স্বীয় বুদ্ধিকৌশলে বহুসংখ্যক সৈন্য সংগ্রহ করিয়া আপনার রাজ্যে স্বাধীনত্ব রক্ষা করিয়াছিলেন এবং দুর্গাদি নির্ম্মাণ করিয়া আপনার রাজধানীর বিশেষ উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। দস্যুনিবারণ জন্য নগরীর চতুর্দ্দিকে প্রস্তর-নির্ম্মিত অত্যুচ্চ প্রাচীর নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং চারিধারে চারিটী সিংহদ্বার স্থাপিত ছিল।

এই আঢ়-রাজধানীর দক্ষিণ-প্রান্তে ব্রাহ্মনাঢ় নামক স্থানে দক্ষিণদ্বার সংস্থাপিত ছিল, তথায় রাজসভাসদ ও পুরোহিতমণ্ডলীর আবাসস্থান ছিল। বর্ত্তমান সময়েও উহা ব্রাহ্মনাড়া নামে খ্যাত। ঐ দ্বারের সম্মুখবর্ত্তী স্থানে শক্তিরূপা অখিলেশ্বরী দেবীর প্রকাণ্ড মন্দির এবং ঐ ব্রাহ্মণাঢ়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানে মহারাজের নামধেয় দেবাদিদেব অনাদি ভুবনেশ্বর শিবলিঙ্গের মন্দির ও সম্মুখে শিবকুণ্ড। রাজধানীর কিছুদূরে রাণী বসন্তকুমারী একটী প্রকাণ্ড জলাশয় খনন করাইয়াছিলেন। বসন্তকুমারীর মৃত্যুর পর বসন্তকুমারী যে দুশ্চরিত্রা ছিল, ইহা প্রকাশ হয়, এইজন্য সাহাজাদ রায় "এই সরোবর থাকিলে কুলটা বসন্তকুমারীরও নাম অক্ষয় থাকিতে পারে" ভাবিয়া ঐ সরোবরের ধ্বংসসাধনে যত্নবান্ হইয়াছিলেন। এখনও ঐ সরোবর সামান্য জলাশয়রূপে পরিণত হইয়া আছে। ঐ জলাশয়ের প্রস্তর-কার্য্য দেখিলে এখনও চমৎকৃত হইতে হয়। রাজা ভুবনেশ্বর রায় অতিশয় ধার্ম্মিক ছিলেন। তিনি শক্তমন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন বলিয়া শক্তিরূপা অসংখ্য দেবীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। শিবালয় ও অন্যান্য দেবালয় স্থাপন করিতেও ত্রুটি করেন নাই। ঐ সমুদয় দেবদেবীর প্রতিষ্ঠা ও মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করিয়াও তাঁহার মনের শান্তি হয় নাই; আপনার অক্ষয়কীর্ত্তি-স্থাপন মানসে একটী শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য তিনি বহু দিনাবধি ব্যগ্র ছিলেন, কিন্তু নানাবিধ প্রতিবন্ধক বশতঃ তাঁহার সে চেষ্টা ফলবতী হয় নাই।

একদিন মহারাজ বিলাস-কাননে নিদ্রিত আছেন, হঠাৎ স্বপ্ন দেখিলেন,—যেন দেবী অখিলেশ্বরী তাঁহার সম্মুখে আসিয়া বলিলেন, "ভুবনেশ্বর! তোমার মনোভিলাষ এত দিনে পূর্ণ হইবে। প্রত্যূষে উঠিয়া আমার মন্দিরের নিকট আসিয়া যে মহাপ্রভাব যোগীকে দেখিতে পাইবে, তিনিই তোমার কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপনের মূল কারণ হইবেন। তাঁহার যে অদ্ভুত যোগাসন আছে, তদ্দ্বারাই তোমার অভিলষিত শিবলিঙ্গ নির্ম্মিত হইবে"। স্বপ্ন দেখিবামাত্র মহারাজের নিদ্রাভঙ্গ হইল, তিনি চকিতের ন্যায় উঠিয়া বসিলেন। ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া যখন কিছুই দেখিতে পাইলেন না, তখন ঐ সমস্ত দেবী-বাক্যই স্থির করিয়া উৎকণ্ঠিত-হৃদয়ে রজনী-প্রভাতের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ধীরে ধীরে রাত্রি প্রভাত হইল; মহারাজ ব্যস্ত-হৃদয়ে প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া স্বপ্নবাক্যানুসারে অখিলেশ্বরীর মন্দিরাভিমুখে গমন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, স্বপ্ন মিথ্যা নহে।

এই রাজধানীর অন্যূন চারি ক্রোশ দূর উত্তরে, অজয়-নদীর তীরে "কেন্দুলা" নামে একটী ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। তথায় দেশখ্যাত শক্তি উপাসক তন্ত্রশাস্ত্র-বিশারদ গোস্বামীদের আবাসভূমি। এতদ্দেশীয় শক্তিমন্ত্রোপাসক সম্ভ্রান্ত কুলীন ব্রাহ্মণগণের মধ্যে অধিকাংশই ইহাঁদের শিষ্যপরম্পরা ছিল; তবে এখন আর ততদূর প্রভাব নাই। শক্তিরূপা মহিষ-মর্দ্দিনী দেবী ইহাঁদের কুলদেবতা। মহারাজ স্বপ্নাবস্থায় যাঁহার কথা শুনিয়া অখিলেশ্বরীর মন্দিরের নিকট উপস্থিত হইয়াছেন, এই যোগী তাঁহাদেরই পূর্ব্বপুরুষ। ইহাঁর নাম বিরূপাক্ষ। ইনি সিদ্ধপুরুষ ছিলেন, ভগবতী কালিকার আরাধনা করিয়া তাঁহার সাক্ষাৎ লাভ করিয়া সিদ্ধকাম হইয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে। ভগবতী কালিকার আরাধনা করাই তাঁহার জীবনের প্রধান কার্য্য ছিল। তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞতা ও কালীভক্তির পরিচয় এখনও বিলক্ষণ পাওয়া যায়। শক্তিপূজার অনেকগুলি পদ্ধতি তিনি স্বয়ং লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কালীভক্তির প্রমাণস্বরূপ একটী শ্লোক নিম্নে প্রদত্ত হইল, পাঠকবর্গ একটু মনোযোগ করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন, যে, কি অপূর্ব্বভক্তি এবং কবিত্ব তাহাতে নিহিত আছে। ভাব এই—

বৃন্দারকবৃন্দারকবৃন্দালকমালিকালি-কালিয়া।
স্বনরুচিস্বনরুচি চরণং শরণং করোমি দুর্গায়াঃ॥

সেই মহাত্মা দুর্গোৎসবের পদ্ধতি লিখিতে বসিয়া গ্রন্থারম্ভে দেবীর চরণে প্রণাম করিবেন। তাঁহার মনে হইল, দুর্গোৎসবের পদ্ধতি লিখিতেছি, দুর্গারই চরণে প্রণাম করা উচিত। যদিও শাক্তগণের পক্ষে দুর্গা, কালী, তারা প্রভৃতি মূর্ত্তিভেদ হইলেও সবই সমান; কিন্তু পদ্ধতিকারের হৃদয়ে কালীভক্তি অতিপ্রবল, তাই কালিকাদেবীর চরণ-যুগলও তাঁহার মনে হইল। কি করিবেন স্থির করিতে না পারিয়া পরে দুর্গাদেবীর গৌরকান্তি চরণদ্বয় স্বীয় কল্পনা-বলে কালীর চরণের ন্যায় করিয়া লইলেন,—অনন্তর এইরূপ ভাবে প্রণাম-ক্রিয়া সমাধান করিলেন,—দেবশ্রেষ্ঠগণের অলক-গুচ্ছস্বরূপ যে মধুকর-নিকর, তদীয় শ্যামল-প্রভা-সংসর্গে নিবিড় জলদকান্ত দুর্গা-পদে শরণাপন্ন হই।

এই বিরূপাক্ষ যোগী দেশের হিত-সাধনার্থে নানাস্থান ভ্রমণ করিয়া লোকশিক্ষা প্রদান করিতেন। ভুবনেশ্বর রায় অতি ধার্ম্মিক এবং পরম শাক্ত বলিয়া তাঁহার মঙ্গল-সাধনার্থে আজ তিনি আঢ়-রাজধানীতে উপস্থিত হইয়াছেন।

মহারাজ ভুবনেশ্বর রায় বিরূপাক্ষের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার চরণে দণ্ডবৎ পতিত হইলেন। বিরূপাক্ষ তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি দেখিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং স্বয়ং তাঁহাকে হাত ধরিয়া উঠাইয়া নানাবিধ মিষ্ট-বাক্যে মহারাজের আনন্দ জন্মাইতে লাগিলেন। মহারাজ, আপনার স্বপ্নবাক্য হঠাৎ বিরূপাক্ষের নিকট প্রকাশ করিলে, পাছে ফলোদয় না হয়, এই ভাবিয়া, প্রথমতঃ মিনতিসহকারে আপনার রাজধানীতে বাস করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন। যোগিশ্রেষ্ঠ বিরূপাক্ষ রাজধানীতে অবস্থানের অনেক আপত্তি দেখাইলেন, কিন্তু মহারাজের অখণ্ডনীয় বিনতি-বাক্যে বশীভূত হইয়া অবশেষে স্বীকার করিলেন।

অখিলেশ্বরী দেবীর মন্দির নিকটে তাঁহার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল; কিন্তু তিনি এক স্থানে কখনই থাকিতেন না, রাজধানীর সমুদয় দেবালয়ই তাঁহার বাসস্থান ছিল। রাজা ভুবনেশ্বর, বিরূপাক্ষের প্রতি এরূপ ভক্তি ও বিশ্বাস স্থাপন করিতে আরম্ভ করিলেন যে, বিরূপাক্ষ তাঁহার ভক্তিসূত্রে আবদ্ধ হইয়া

প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, যতদিন মহারাজের ভক্তিশ্রদ্ধা অক্ষুণ্ণ থাকিবে, ততদিন আমি আঢ়-রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া যাইব না। বিরূপাক্ষের অবস্থান অবধি রাজধানীর কোন অমঙ্গল ছিল না।

মহারাজ ভুবনেশ্বর যখন দেখিলেন যে, বিরূপাক্ষ তাঁহার প্রতি শিষ্যের ন্যায় স্নেহ করেন, তখন একদিন তিনি গোপনে বসিয়া বিরূপাক্ষের নিকট আপনার শিবলিঙ্গ-প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা এবং স্বপ্নাবস্থায় দেবী অখিলেশ্বরীর আদেশ সমস্তই বলিলেন; আর এই মহৎকার্য্য সাধন করিতে বিরূপাক্ষকে প্রবৃত্ত করাইবার জন্য, চরণে ধরিয়া আপনার বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। যোগিশ্রেষ্ঠ বিরূপাক্ষ মহারাজের প্রতি এতদূর সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে, স্বীয় যোগাসন দিতে অমত করিতে পারিলেন না। বিরূপাক্ষ ইহাও বুঝিয়াছিলেন যে, মহারাজের এই কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিলে জগতে চিরস্থায়ী কীর্ত্তি থাকিবে, এইজন্য স্বীয় যোগাসন-প্রস্তর-দান এবং স্বয়ং ইহার উদ্যোগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

এতদিনে মহারাজ ভুবনেশ্বরের কামনা পূর্ণ হইল। তিনি নানা দেশ হইতে কারুকর আনাইয়া ভগবান্ রাঢ়েশ্বরের মন্দির নির্ম্মাণ করাইতে আরম্ভ করিলেন। সুদক্ষ ভাস্কর দ্বারা বিরূপাক্ষের অদ্ভুত যোগাসন-প্রস্তরে আপনার অভিলষিত সুবৃহৎ শিবলিঙ্গ ও গৌরীপট্ট নির্ম্মিত হইল। অনন্তর মহারাজ, শুভদিনে নানাদেশাগত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ এবং বিরূপাক্ষের সাহায্যে মহাসমারোহে রাঢ়েশ্বর শিবলিঙ্গ-প্রতিষ্ঠাকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। এই রাঢ়েশ্বর হইতেই তাঁহার কীর্ত্তি এ পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।

শ্রীদ্বারকেশ তর্কভূষণ।

সিপাহী-যুদ্ধে ভুক্তভোগী।

মিরাট।

অনিয়মিত অশ্বারোহী-সৈন্যের এক জন হাবিলদার কুমান সিং বিদ্রোহকালীন ঘটনার কথা এইরূপ বিবৃত করিয়াছেন।—১লা কিংবা ২রা মে ৩য় অশ্বারোহীর একজন সওয়ার ব্রজ-মোহন সর্ব্বসমক্ষে এই কথা বলিল যে, আজ তাহাকে নূতন টোটা দিয়া বন্দুক ছুড়িতে হইয়াছে। যদিও তজ্জন্য সকলেই তাহাকে নীচ অন্ত্যজ বলিয়া ঘৃণা করিতেছে, কিন্তু কাল যখন তাহারা সকলেই এই কাজ করিতে আদিষ্ট হইবে, তখন দেখা যাইবে, কে তাহা অস্বীকার করিতে সাহস করে। তাহার এই কথা শুনিয়া নায়েক পীর আলি এবং কুদ্রাও আলি বলিল যে,"শস্ত্রাগারের একজন লোক শপথ করিয়া বলিয়াছে, এই টোটাতে শূকর এবং গোরুর চর্ব্বি মিশ্রিত আছে। সুতরাং এই সকল টোটা স্পর্শ করিতে গেলেই আমরা নিঃসন্দেহ পতিত ও জাতিভ্রষ্ট হইব। যদিও মুসলমানদের এ সম্বন্ধে তাদৃশ শঙ্কার কারণ নাই, কেননা, তাহারা সহজেই এই অপবিত্রতার হাত হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে; কিন্তু হিন্দুদের পক্ষে ইহা বিষম সমস্যার কথা। তাহারা একবার জাতিচ্যুত হইলে আর তাহাদের পুনরুদ্ধারের কোন উপায় নাই। যাহা হউক আমরা প্রথম ক্রপের লোক, আমরা যখন শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইব, তখন আমাদের এই টোটা ব্যবহার করিতে বলিলে, কেমন দৃঢ়তার সহিত তাহা অস্বীকার করিব, তাহা একবার দেখিও। তোমরা আমাদের ন্যায় সাহসে নির্ভর করিয়া নির্ভীক-চিত্তে তোমাদের কাপ্তানকে বলিবে, যে পর্য্যন্ত রেজিমেণ্টের সকল সিপাহী এই বসামিশ্রিত টোটা ব্যব-

হার না করিতেছে, ততক্ষণ আমরা কখনই ইহা স্পর্শ করিব না।” তদনন্তর হিন্দুরা গঙ্গাজল ও মুসলমানেরা কোরাণ স্পর্শ করত প্রতিজ্ঞা করিল, তাহারা সকলেই এই প্রস্তাব অনুসারে কার্য্য করিবে। পরদিন কাওয়াজের বিশ ভূমিতে সকলে সমবেত হইলে তাহারা টোটা ব্যবহার করিতে অস্বীকার করিল। যে টোটা তাহাদের দেওয়া হইয়াছিল, তাহা নূতন নহে, —সেই পুরাতন, ইতিপূর্ব্বে তাহারা তাহা কত-বার ব্যবহার করিয়াছে; কিন্তু এক্ষণে সন্দেহ প্রযুক্ত তাহা ব্যবহার করিতে সম্মত হইল না। সে যাহা হউক, অশ্বারোহী সেনাগণ এরূপ অবধ্যতা প্রদর্শন করাতে ৯ই মে ৮৫ জনকে কারাবদ্ধ করা হইল। অনতিবিলম্বে একটা গুজব উঠিল, দুই রাত্রি এবং এক দিনে দুই সহস্র লৌহ শৃঙ্খল প্রস্তুত করিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে এবং তদ্দ্বারা অবশিষ্ট সিপাহীদের শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হইবে। তৎকালীন লোকের মনের ভাব অত্যন্ত উদ্বেগে পূর্ণ ছিল। যখন যাহার মনে যে ভাবের উদয় হইত, তাহারা সেই কথাই চারিদিকে রটাইয়া বেড়াইত। আবার ১০ই মে অপরাহ্ণে ইহা শুনা গেল, বন্দুকধারী সৈন্যেরা আসিয়া ২০ নং রেজি-মেণ্টের নিকট হইতে অস্ত্রাগারের ভার কাড়িয়া লইবে। এই কথা প্রচারিত হইলে, ১১ এবং ২০ সংখ্যক রেজিমেণ্টের সিপাহীরা প্যারেড্ ভূমিতে উপস্থিত হইয়া অস্ত্রধারণ করিল। ৩য় অশ্বারোহী সৈন্যের অফিসারেরা রেজিমেণ্টের সওয়াদের প্যারেড্ ভূমিতে উপস্থিত হইতে আদেশ করিলেন এবং এক জন আশ্বারোহী সৈন্যকে জেলখানা অভিমুখে পাঠাইয়া দিলেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে তাহারা প্রত্যাগত হইয়া সংবাদ দিল যে, কারাবদ্ধ সিপাহী এবং কয়েদীরা জেল ভাঙ্গিয়া প্রস্থান করিয়াছে। যখন সিপাহীরা সকলে এইরূপ উত্তেজিত, তখন ১১ সংখ্যক রেজিমেণ্টের কর্ণেল ফিনিস্ সাহেব ২০ সংখ্যক রেজিমেণ্টের সিপাহীদিগকে প্রসন্ন করিবার মানসে তাহাদের সমীপবর্ত্তী হইলেন, কিন্তু উক্ত রেজিমেণ্টের একজন সিপাহীর বন্দুকের গুলিতে তিনি তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিলেন। এই ঘটনার পরেই চারিদিকেই মহাগণ্ডগোল উপস্থিত হইল। মুহুর্ম্মুহুঃ বন্দুকের শব্দে কর্ণ বধির হইয়া যাইতে লাগিল। সাহেবদের বাঙ্গালা আগুন দিয়া ভস্মীভূত করিয়া ফেলিল। কত লোকের মহামূল্য সম্পত্তি, অমূল্য জীবন নষ্ট হইতে লাগিল। সেই ধ্বংসকামী উন্মত্ত সিপাহীদের সম্মুখে যে সকল খৃষ্টানেরা পড়িল, তাহারাই ছিন্নগ্রীবা হইয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিল।

তদনন্তর বিদ্রোহীরা দিল্লীর দিকে অগ্রসর হয়। অশ্বারোহী সৈন্যেরাই অগ্রগামী হইয়া-ছিল। ইহাদের সঙ্গে অনেক কারামুক্ত কয়েদীও ছিল। ইত্যবসরে অস্ত্রধারী ইংরেজ সৈন্য আসিয়া উপস্থিত হইল এবং তাহারা জনতার মধ্যে বন্দুক চালাইতে আরম্ভ করিল। ইহাতে বিদ্রোহীরা ছত্রভঙ্গ হইয়া কে কোথায় প্রস্থান করিল। সিপাহীদের মধ্যে প্রায় ৩৯ অশ্বারোহী সৈন্য তাহাদের অফিসরদের অনুগত ছিল। রাত্রি ১১ ঘটিকার সময় হাবিলদার মেজর সেখ আলিবক্স কুমার সিংএর নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তিনি তোপের মুখে ফাঁসিকাষ্ঠে প্রাণ সমর্পণ করিবেন, না দিল্লী যাত্রা করিবেন? এই কথা শুনিয়া কুমান সিং উত্তর দিলেন যে, অফিসারদের পরিত্যাগ করিয়া তিনি কোথাও যাইতে পারিবেন না এবং প্রাণ থাকিতে এমন কৃতঘ্নতার কাজ তাঁহা দ্বারা হইবে না। আর যে পর্য্যন্ত উক্ত অফিসারেরা নিরাপদে ইউরোপীয় লাইনে না অবস্থিতি করিতেছেন, সে পর্য্যন্ত তিনি কোন কার্য্য করিতে অগ্রসর হইবেন না।

এই সময়ে সহরের এবং সদরের যত বদ-মায়েস লোক ছিল, তাহারা লুণ্ঠনাভিপ্রায়ে চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। আর শত শত বাঙ্গালা অগ্নিদাহে ভস্মীভূত হইতে লাগিল।

পরদিন যখন কুমান সিং আহার্য্য কিনিবার নিমিত্ত সহরে যান, তখন তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র সেবা সিংএর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। এই সেবা সিং কারারুদ্ধ ৮৫ জন অশ্বারোহীর মধ্যে এক জন ছিল। তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল যে, দিল্লী যাইতে তাহার অভিলাষ আছে কিনা। তদুত্তরে সে বলিল, যদি তাহার প্রাণ দান করা হয়, তাহা হইলে সে পুনরায় ইংরেজ-রাজের চাকরি স্বীকার করিবে, নতুবা তাহার ইচ্ছামত যেখানে হউক এক স্থানে বাস করিবে। তাহার প্রমুখাৎ অবগত হওয়া গেল যে, দুই দল বদমায়েস সহরমধ্যে ঘোরতর উপদ্রব করিয়াছে। তাহারাই সকল বাঙ্গালায় আগুন লাগাইয়া দিয়াছে এবং জজ সাহেবের কাছারি ভস্মরাশিতে পরিণত করিয়াছে। আর এই সকল শোণিত-পিপাসু বিপ্লবকারীদের হস্তেই খৃষ্টীয়ান কেরাণীদের জীবন বিসর্জ্জন করিতে হইয়াছে। উক্ত দুই দলের মধ্যে এক দলের নেতার নাম মহম্মদ আলি খাঁ। তাহার বাড়ী সহরের “নয়া” বাজারে। সে ৫০০ শত লোক পাইয়া সমস্ত রাত্রি রাস্তায় রাস্তায় বিকট চীৎকার ও নানা প্রকার অত্যাচার করিয়া বেড়াইতেছে। অপর দলের নেতা একজন মৌলবী, তাহার নাম জানা যায় নাই। সেও অবাধে অত্যাচারের প্রবল স্রোত প্রবাহিত করিয়াছিল।

বিদ্রোহী সেনারা পূর্ব্ব হইতেই কোন প্রকার ষড়যন্ত্র করে নাই। আর যদ্যপি ঈদৃশ ভয়ঙ্কর দুরভিসন্ধি তাহারা পূর্ব্ব হইতেই হৃদয়ে পোষিত করিয়া রাখিত, তাহা হইলে তাহাদের স্ত্রী-পুত্র পরিবার কখন আপনাদের সঙ্গে রাখিত না। তাহাদিগকে পূর্ব্ব হইতেই যথাস্থানে পাঠাইয়া নির্ভয়-হৃদয়ে যথেচ্ছাচারের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে কোন মতেই কুণ্ঠিত হইত না। কিন্তু বিদ্রোহীরা পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত ছিল না বলিয়া এই বিপ্লবের সময় তাহাদের পরিবারবর্গ কয়েক দিন সহরের নানা স্থানে বিচরণ করত স্ব স্ব গৃহে চলিয়া যায়।

রাত্রি মসীময়ী ছিল বলিয়া, কুমান সিং বিদ্রোহীদের মধ্যে কাহাকেও চিনিতে পারেন নাই। তাঁহার মতে বিপ্লবকারীরা সম্ভবতঃ কসাই, শ্রমোপজীবী এবং মুসলমান হইবে।

বিশ সংখ্যক পদাতিকদলের হাবিলদার মৌলাবক্স বলিয়াছেন,—৯ই মে কাওয়াজের সময় ৮৫ জন অশ্বারোহী সৈন্য অবাধ্যতাপরাধে কারারুদ্ধ হইলে পর, তিনি প্রাতঃকালীন “রিপোর্ট বুক” লইয়া মেজর টেলার সাহেবের বাঙ্গালায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিবা মাত্র সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘সিপাহীরা কি নিমিত্ত এত শঙ্কাকুল ও উদ্বিগ্নচিত্ত হইয়াছে?” তিনি বলিলেন, “নানা কারণে তাহাদের হৃদয়ে অশান্তির বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছে, বিশেষতঃ টোটার উপর ঘোর সন্দেহ জন্মিয়াছে।” তদুত্তরে মেজর সাহেব বলিলেন, “তুমি সৈন্য-গণকে আশ্বাসিত করিয়া বল, টোটাতে কোন প্রকার দূষণীয় অস্পৃশ্য পদার্থ নাই এবং তাহারা অকারণে যেন ভীত এবং শঙ্কাকুল না হয়।” হাবিলদার মৌলাবক্স সেনা-নিবাসে গিয়া টেলার সাহেবের আশ্বাস-বাণী সকলের নিকট প্রচার করিলেন এবং যে দারুণ উদ্বেগ সিপাহী-দিগের হৃদয় মথিত করিতেছিল, এই কথায় তাহাদের পূর্ব্বভাব কিয়ৎপরিমাণে অপনীত হইল, তাহারা যেন কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইল।

১০ই মে অপরাহ্ণ ৫টার সময় উক্ত হাবিল-দার সহরের এক জন ফেরিওয়ালার দোকানের

সম্মুখে দাঁড়াইয়া ছিলেন, এমন সময়ে তিনি বিস্ময়-বিহ্বল-চিত্তে দেখিলেন, তাঁহার নিজের এবং ১১শ সংখ্যক রেজিমেণ্টের সৈন্যেরা অতি দ্রুতপদে আপনাদের লাইনের দিকে যাইতেছে। ডেরিয়েন নামক একজন বাদ্যকর সেই পথ দিয়া যাইতেছিল। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, বৃটিশ-সেনা দেশীয় সৈন্যগণের নিকট হইতে অস্ত্র, শস্ত্র, গুলি, বারুদ কাড়িয়া লইবার জন্য আসিতেছে। এই কথা শুনিবা মাত্র উক্ত হাবিলদার তথা হইতে চলিয়া গেলেন। সেই সময়ে সদর বাজারে তাদৃশ কোন প্রকার গোলযোগ ছিল না, তবে বদমায়েস, কসাই এবং পাল্লাদারেরা সিপাহীগণের পশ্চাদ্‌বর্ত্তী হইয়া সেনানিবাসে আসিতেছিল; এবং চীৎকার করিয় এই কথা প্রচার করিতেছিল যে, "ইংরেজ-সেনারা দেশীয় সৈন্যগণের নিকট হইতে অস্ত্রাগারের ভার লইবার জন্য আসিতেছে।" পার্শ্বমধ্যে মৌলাবক্সের সঙ্গে মেজার টেলার এবং ডাক্তার সাহেবের সাক্ষাৎ হয়। তাঁহারা তিন জনেই অস্ত্রাগারাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তথায় উপনীত হইয়া দেখিলেন, সদর বাজারের ৭০ জন বদমায়েস সেখানে রহিয়াছে। টেলার সাহেবের আদেশ অনুসারে উক্ত হাবিলদার চারি জন সিপাহী লইয়া তাহাদিগকে তথা হইতে তাড়াইয়া দিতে গেলেন। তাহারা সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া কিছু দূরে হটিয়া গেল বটে, কিন্তু অস্ত্রাগারের সন্নিকটেই রহিয়া গেল।

এই সময়ে ১১শ সংখ্যক রেজিমেণ্ট প্যেরেড্ ভূমিতে আসিয়া সমবেত হইল। টেলার সাহেব ২০ সংখ্যক রেজিমেণ্টের সিপাহীদিগকে স্থিরভাবে আপনাদের সেনানিবাসে থাকিতে আদেশ দিলেন। তাহারা তাঁহার আদেশ-প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হইল না। ইহার অনতিবিলম্বে ৩য় অশ্বারোহীর এক জন সওয়ার হস্ত উত্তোলন করত উচ্চৈঃস্বরে এই বলিয়া যাইতে লাগিল, "বৃটিশ-সেনা দেশীয় সৈন্যদের অস্ত্রশস্ত্র কাড়িয়া লইবার জন্য আসিতেছে।" সুযোগ-প্রয়াসী অনিষ্টকারী বদমায়েসেরা ইহা শুনিবা মাত্র বজ্রনাদে এই কথা চারিদিকে বিঘোষিত করিতে লাগিল। পূর্ব্ব হইতে সিপাহীদের হৃদয় ঘোরতর উদ্বেগে পূর্ণ ছিল, এই সংবাদ পাইবামাত্র কতক সৈন্য নিতান্ত বিচলিত হইয়া স্ব স্ব আবাসস্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক অস্ত্রাগারের সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইল। ইংরেজ-সৈন্যেরা যে সিপাহীদের নিকট হইতে অস্ত্রাগারের ভার লইতে আসিতেছে না, কাপ্তেন ম্যাকডোনাল্ড সাহেব, হাবিলদার মৌলাবক্স এবং অন্যান্য অফিসারেরা এই কথা, উত্তেজিত সিপাহীদিগকে বারংবার বলিয়া সান্ত্বনা করিবার বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তখন তাহাদের চিত্ত গভীর আবেগে একপ্রকার উদ্‌ভ্রান্ত, সুতরাং এ সকল কথায় তাহারা কেহ কর্ণপাতও করিল না। তদনন্তর একাদশ-সংখ্যক রেজিমেণ্টের কর্ণেল সাহেব অস্ত্রাগারের সন্নি-কটে আসিয়া উন্মত্ত সিপাহীদিগকে শান্ত করিবার জন্য অতি সুমধুর ভাবে বলিলেন যে, "তাহাদের ভীত হইবার কোন কারণ নাই; অস্ত্রাগারের ভার হইতে কেহই তাহাদিগকে বঞ্চিত করিবে না। আর টোটায় বা ভিন্ন জাতিনাশক অস্পৃশ্য কোন পদার্থ নাই।" সিপাহীরা তখন তীব্র মনোবেদনায় আকুল, তাহাদের কর্ণে নিরন্তর "জাতিনাশ, ধর্ম্মনাশ" এই কথাই প্রতিধ্বনিত হইতেছিল সুতরাং তাঁহার কথায় আশ্বস্ত হওয়া দূরে থাকুক, বরং নির্ভয়-চিত্তে অতি পরুষভাবে তাহারা তাঁহাকে সে স্থান পরিত্যাগ করিতে বলিল। কর্ণেল সাহেবের তখন পর্য্যন্ত বিশ্বাস যে, সিপাহীরা তাঁহার কথায় শান্ত হইবে, তাহাদের মানসিক অশান্তি প্রশমিত হইবে

এবং পূর্ব্বের ন্যায় তাহারা আপনাদের কর্ত্তব্য কার্য্যে রত হইবে। কিন্তু যাহারা সর্ব্বনাশ-সাধনে কৃতসঙ্কল্প, তাহাদের নিকট এ আশা বৃথা। যাহা হউক, কর্ণেল সাহেব যখন দেখিলেন, উত্তেজিত সিপাহীরা তাঁহার উপর গুলি নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল, তখন অগত্যা তাঁহাকে সে স্থান ত্যাগ করিতে হইল।

অস্ত্রাগারে প্রায় ৪০।৫০ জন সিপাহী ছিল, তাহারা কাপ্তান ম্যাকডোনাল্ড এবং হাবিলদার মৌলাবক্সের উপর গুলি চালাইতে লাগিল। ম্যাকডোনাল্ড সাহেব একজন সিপাহীর গুলিতে আহত হইলেন। মৌলাবক্স তাঁহাকে অতি সাবধানে সার্জ্জন মেজরের বাঙ্গালায় রাখিয়া আসিলেন। এই সময়ে মেজর টেলর ঘটনা-স্থলে আসিয়া উপস্থিত হন। যখন তিনি নিরস্ত্র হইয়া সৈনিক-নিবাস দিয়া যাইতেছিলেন, তখন একজন সিপাহী তাঁহার হাতে একটী বন্দুক দিতে আসিল। মৌলাবক্স তাহাকে নিবারণ করিয়া বলিলেন, "মেজর সাহেবের বন্দুকে কোন প্রয়োজন নাই, তিনি তাহাদের কোন প্রকার অনিষ্ট-কামনা করেন না, বরং তাহাদের জন্য তিনি আত্মজীবন বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত আছেন।" এই কথা শুনিয়া সিপাহী আর কিছুই বলিল না। হাবিলদার মৌলাবক্স মেজর টেলার সাহেবের সঙ্গে ছিলেন। পথে সদর বাজারের একজন কসাই সাহেবকে তরবারির আঘাত করিল। উক্ত হাবিলদার বলপূর্ব্বক তাহাকে তৎক্ষণাৎ ভূতলে নিক্ষেপ করত, তাহার নিকট হইতে তরবারি লইয়া, তাহাকে হত্যা-করণাভিলাষে সেই তরবারি উত্তোলন করিলেন। কিন্তু টেলার সাহেব বলিলেন, "উহাকে হত্যা করিবার কোন প্রয়োজন নাই, তুমি ছাড়িয়া দাও।" আর এক স্থলে কতকগুলি বদমায়েসকে দেখিয়া হাবিলদার টেলার সাহেবকে একজন বাবুর গৃহে লুকাইয়া রাখিলেন। তিনি এবং বেণী মিশ্র দ্বারদেশে প্রহরীর ন্যায় চৌকি দিতে লাগিলেন। তখন গ্রীষ্মকাল, সেই সঙ্কীর্ণ গৃহে টেলার সাহেব নিদারুণ গ্রীষ্মে সাতিশয় কষ্ট অনুভব করাতে, তিনি আপনার বাঙ্গালায় যাইবার অভিলাষ প্রকাশ করিলেন। প্রভুপরায়ণ হাবিলদার অতি সাবধানে তাঁহাকে আপনার গৃহে রাখিয়া আসিলেন। তথা হইতে প্রত্যাগমন-কালে পথে আর একজন অফিসারের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়; তাঁহাকেও তিনি মেজর টেলারের গৃহে রাখিয়া আইসেন। তদনন্তর তিনি যখন সেনা-নিবাসের দিকে যাইতেছিলেন, তখন অদূরে ৩য় অশ্বারোহী দলের কতকগুলি সওয়ারকে দেখিতে পাইয়া ভীতচিত্তে একজন ডাক্তারের বাড়িতে আশ্রয় লইলেন। দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা সমাগত হইল। তখন তিনি আপনার রেজিমেণ্টে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় দেখেন, বিদ্রোহী সিপাহীরা নিতান্ত সন্তপ্ত-হৃদয়ে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে এবং আক্ষেপ করিয়া বলিতেছে যে, নবাগত সিপাহীরা সকল অনর্থের মূল; তাহারাই এই ভীষণ অনিষ্ট-সংঘটন করিয়াছে। যে সিপাহী, বিদ্রোহ-সঙ্কেত-সূচক বন্দুকের আওয়াজ করিয়াছিল, তাহারা তাহাকে হত্যা করিয়াছে। এই বিদ্রোহের সময় হাবিলদার মৌলাবক্স আপনার পরিবারগণকে অতি গোপনীয় স্থানে রাখিয়া, উপস্থিত বিপদ হইতে রক্ষা পান বটে, কিন্তু তাঁহাকে হৃতসর্ব্বস্ব হইতে হইয়াছিল।

শ্রীসর্ব্বেশ্বর মিত্র।



হিন্দু ও বৌদ্ধ।

(২)

গত চৈত্রমাসের জন্মভূমিতে হিন্দু ও বৌদ্ধের সংস্কার-সাম্য কারণ্ডব্যূহ নামক বৌদ্ধ-গ্রন্থ হইতে কিয়দংশে প্রদর্শন করিয়াছি। বৌদ্ধগণের মহামান্য ধর্ম্মগ্রন্থ ললিতবিস্তর হইতে বুদ্ধদেবের অবতার-লীলা প্রকাশ করিয়া পূর্ব্ব-প্রবন্ধ-কথিত বিষয়ের কিয়দংশ সমর্থন এবং নব প্রমাণ প্রকটন বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। এই প্রবন্ধ মধ্যে যে যে স্থলে আমার বিশেষ বক্তব্য থাকিবে, তত্তৎস্থলের শেষে অঙ্ক দেওয়া যাইবে, এবং উপসংহারকালে সেই সেই অঙ্কানুসারে বক্তব্যও প্রকাশিত হইবে।

বোধিসত্ত্ব ভগবান্, শ্রাবস্তী নগরীতে অনাথ-পিণ্ডদ নামক ধার্ম্মিকের উদ্যান জেতবনে একদা অবস্থিত ছিলেন। সঙ্গে জ্ঞান-কৌণ্ডিল্য প্রভৃতি দ্বাদশ সহস্র ভিক্ষু এবং মৈত্রেয় প্রভৃতি দ্বাত্রিংশৎ সহস্র বোধিসত্ত্ব। তিনি তথায় আরম্ভে কল্যাণময়, মধ্যে কল্যাণময় এবং পর্য্যবসানে কল্যাণময় পরিশুদ্ধ পরিপূর্ণ ব্রহ্ম-চর্য্য ধর্ম্ম উপদেশে জগতের উপকার করিতে লাগিলেন। শ্রাবস্তী-মহানগরী-বাসীরা তাঁহার বিধিমত পূজা করিতে লাগিল। ইত্যবসরে একদা কতিপয় দেবকুমার আসিয়া মহাযান ধর্ম্মগ্রন্থ ললিতবিস্তর কীর্ত্তন করিবার জন্য অভিবাদনপূর্ব্বক ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলেন এবং বলিলেন,—ভগবান্ পদ্মোত্তর, ধর্ম্মকেতু, দীপঙ্কর, গুণকেতু, মহাকর, ঋষিদেব, শ্রীতেজাঃ, সত্যকেতু, বজ্রসংহত, সর্ব্বাভিভূ, হেমবর্ণ, অত্যুচ্চগামী, প্রবাতসার, পুষ্পকেতু, বররূপ, সুলোচন, ঋষিগুপ্ত, জিনবক্ত্র, উন্নত, পুষ্পিত, উগ্রতেজা, পুষ্কর, সুরশ্মি, মঙ্গল, সুদর্শন, মহাসিংহতেজাঃ, স্থিতবুদ্ধিদত্ত, বসন্তগন্ধি, সত্যধর্ম্ম-বিপুলকীর্ত্তি, তিষ্য, পুষ্য, লোকসুন্দর, বিস্তীর্ণভেদ, রত্নকীর্ত্তি, উগ্রতেজা, ব্রহ্মতেজা, সুঘোষ, সুপুষ্ঠ, সুমনোজ্ঞ-ঘোষ, সুচেষ্টরূপ, প্রহসিতনেত্র, গুণরাশি, মেঘস্বর, সুন্দর-বর্ণ, আয়ুস্তেজা, সলীলগজগামী, লোকাভিলাষিত, জিতশক্র, সম্পূজিত, বিপশ্যিৎ, শিখী, বিশ্বভূ, ক্রকুচ্ছন্দ, কনক-মুনি, কাশ্যপ এবং তথাগত অর্হন্ এই সকল বোধিসত্ত্বগণ ললিত-বিস্তর কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। এক্ষণে আপনি ইহা 'বহুজন সুখায়, বহুজন-হিতায়' কীর্ত্তন করুন। ভগবান্ মৌনাবলম্বন দ্বারা তাঁহাদের প্রার্থনা-সাকল্য ব্যক্ত করিলেন। তৎপরে যথাসময়ে দেবকুমারেরা অন্তর্হিত হইলেন। বোধিসত্ত্ব ও ভিক্ষুগণের নিকট ভগবান্ ললিত-বিস্তর কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

মহাশোভা-সুখসমৃদ্ধি-সম্পন্ন তুষিত-(১) লোকবাসী সর্ব্বদেব-পূজিত দেবশ্রেষ্ঠ বোধিসত্ত্ব শ্বেতকেতু একদা অনুচর সমভিব্যাহারে মহা-বিমানে আরূঢ় হইয়া ধর্ম্মালাপ করিতেছেন ইত্যবসরে তদীয় পূর্ব্বসঞ্চিত শুভকর্ম্ম-(২) ফলে দৈববাণী হইল,—

"স্মর বিপুলপুণ্যনিচয়ং ——"
"চ্যব চ্যব হি চ্যুতির্ব্বিধিজ্ঞা
জরামরণক্লেশ-নিসূদনা বিরজা।
সমুদীক্ষন্তে বহবো
দেবাসুরনাগযক্ষগন্ধর্ব্বাঃ॥"
"——করুণমানস
প্রবর্ষ জম্বুধ্বজে বর্ষম্।
ক্লেশাগ্নিনা প্রদীপ্তে
লোকে ত্বং বীর মেঘবদ্ ব্যাপ্য।
অভিবর্ষামৃতবর্ষং
শময় ক্লেশান্ নরমরুণাম্॥"

"অয়ং স কালো মা উপেক্ষস্ব" ইত্যাদি। অর্থাৎ স্বীয় পূর্ব্বসঞ্চিত পুণ্যনিচয় স্মরণ কর। এই স্থান হইতে মর্ত্তলোকে অবতীর্ণ হও; তোমার এই অবতার, লোকের জরা-মরণ-ক্লেশ-বিনাশক, নির্ম্মল এবং যথাবিধি উপদেশক হইবে। বহুতর দেবতা, অসুর, নাগ, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব (৩) তোমার এই অবতরণের অপেক্ষা করিতেছেন। হে দয়াময়! জম্বুদ্বীপে বৃষ্টি কর; হে বীর! তুমি ক্লেশাগ্নি-প্রতপ্ত লোকে মেঘের ন্যায় ব্যাপক হইয়া অমৃতবৃষ্টি সম্পাদন দ্বারা মর্ত্ত্য-মরুভূমির ক্লেশ প্রশমন কর। অবতারের সময় এই উপস্থিত, ইহা উপেক্ষা করিও না।" ইত্যাদি।

অনন্তর বোধিসত্ত্ব শ্বেতকেতু সেই মহা-বিমান হইতে নিষ্ক্রমণপূর্ব্বক ধর্ম্মোচ্চয় নামক স্বীয় প্রাসাদে প্রবিষ্ট হইয়া সুধর্ম্ম নামক সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। এই স্থানে থাকিয়াই সেই দেবশ্রেষ্ঠ তুষিত দেবগণকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতেন। বোধিসত্ত্বগণ ও অন্তরঙ্গ দেবনন্দনগণও সেই প্রাসাদে প্রবিষ্ট হইয়া স্ব স্ব আসনে উপবিষ্ট হইলেন। তখন তথায় অপ্সরা বা সাধারণ দেবনন্দনগণের অস্তিত্ব ছিল না। সেই সংবৃত তুষিত-সমাজে অবধারিত হইল, বোধিসত্ত্ব শ্বেতকেতু দ্বাদশ বৎসরে ভূতলে অবতীর্ণ হইবেন। তখন বিশুদ্ধসত্ত্ব দেবগণ জম্বুদ্বীপে অবতরণপূর্ব্বক দিব্যাকৃতি অন্তর্হিত করিয়া ব্রাহ্মণ-বেশে ব্রাহ্মণগণকে বেদ পড়াইতে লাগিলেন (৪)।

এদিকে বোধিসত্ত্ব 'মহাবিলোকিত' করিলেন অর্থাৎ কাল-বিলোকন, দ্বীপ-বিলোকন, দেশ-বিলোকন এবং কুল-বিলোকন করিলেন।

যখন লোকে জরামরণাদি ক্লেশ সম্পূর্ণ অনুভব করে, তখনই বোধিসত্ত্বের অবতার প্রয়োজন হয়, অন্য সময়ে নহে। সে সময় তখন উপস্থিত কিনা, ইহা দেখাই 'কাল-বিলোকিত' বা কাল-বিলোকনের তাৎপর্য্য।

প্রত্যন্তদ্বীপে বোধিসত্ত্বগণের অবতার হয় না, কিন্তু "জম্বুদ্বীপ এবোৎপদ্যন্তে"—জম্বুদ্বীপেই অবতার হইয়া থাকে; এইরূপ দ্বীপাবধারণই 'দ্বীপ-বিলোকিত' বা দ্বীপ-বিলোকন।

বোধিসত্ত্বগণের অবতার কুৎসিত জনপদে হয় না, কিন্তু উত্তম জনপদেই হইয়া থাকে। এইরূপে জনপদাবধারণই 'দেশ-বিলোকিত' বা দেশ-বিলোকন।

"ন বোধিসত্ত্বা হীনকুলেষুপপদ্যন্তে। * * * অথ তর্হি কুলদ্বয় এবোপপদ্যন্তে ব্রাহ্মণকুলে ক্ষত্রিয়কুলে চ। তত্র যদা ব্রাহ্মণগুরুকো লোকো ভবতি তদা ব্রাহ্মণকুলেষুপপদ্যন্তে, যদা ক্ষত্রিয়গুরুকো লোকো ভবতি তদা ক্ষত্রিয়-কুলে উপপদ্যন্তে।"

অর্থাৎ "বোধিসত্ত্বগণ, হীনকুলে অবতীর্ণ হন না। কিন্তু ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় এই দুই বংশের মধ্যেই অবতীর্ণ হইয়া আকে। যখন লোকে ব্রাহ্মণের বিশেষ প্রাধান্য থাকে, তখন তাঁহারা ব্রাহ্মণকুলে আর ক্ষত্রিয়ের বিশেষ প্রাধান্য যখন থাকে তখন ক্ষত্রিয়কুলে বোধিসত্ত্ব-গণের অবতার হয়।" তৎকালে ক্ষত্রিয়গণের প্রাধান্য ছিল, ক্ষত্রিয়-বংশেই বোধিসত্ত্বের অব-তার অবধারিত হইল। এইরূপ অবধারণই 'কুল-বিলোকিত' বা কুল-বিলোকন (৫)।

এই সময়ে জম্বুদ্বীপে, উত্তম জনপদে, ক্ষত্রিয়-কুলে বোধিসত্ত্ব অবতীর্ণ হইবেন স্থির হইলে, ধর্ম্মোচ্চয়-প্রাসাদ-সমবেত দেবগণ ঔৎসুক্য সহ-কারে পরস্পর বিচার করিতে লাগিলেন,—কোন্ বংশে বোধিসত্ত্ব অবতীর্ণ হইবেন? কেহ কেহ বলিলেন,—কৌশল কুলে; কেহ কেহ বলিলেন, —পাণ্ডব-কুলে; কেহ কেহ বলিলেন, মথুরার কংসাদি-বংশে; কেহ কেহ বলিলেন,—মিথিলারাজ সুমিত্রের বংশে; কেহ কেহ বলিলেন,—প্রদ্যোতন-বংশে;—এইরূপ ষোড়শ

রাজকুলের উল্লেখ হইল অথচ প্রত্যেক বংশেরই দোষ প্রদর্শিত হইল। *

* কৌশল-কুলের দোষ—মাতঙ্গচ্যুতি, মাতৃ-পিতৃ-অপরিশুদ্ধি, হীনাধিমুক্তিকতা, বংশের অসুন্নতি এবং অপরিমিত ধনরত্ন-সঞ্চয়ের অভাব। মাতঙ্গচ্যুতি অর্থে চাণ্ডালভাবে পতন। কৌশল-কুল যদি অযোধ্যায় প্রসিদ্ধ রঘুবংশ হয়, তাহা হইলে ত্রিশঙ্কু রাজার চাণ্ডালতাই এ স্থলে মাতঙ্গচ্যুতি অর্থে বুঝিবে। হীনাধিমুক্তিকতা অর্থে—(ক) মুক্তি লাভ অসামর্থ্য (খ) বন্দী-মোচনের অভাব, ইত্যাদি কতিপয় অর্থ হইতে পারে।

বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে, রাজা শাক্যও রঘুবংশে সম্ভূত, শাক্যকুল রঘুবংশ হইতে পৃথক্ নহে। ত্রিশঙ্কুর চাণ্ডালভাব রঘুবংশের দোষজনক হইলে, শাক্যবংশও সে দোষের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইত না। বিশেষতঃ ত্রিশঙ্কুপুত্র রাজা হরিশ্চন্দ্র ত্রিশঙ্কুর চাণ্ডালতা প্রাপ্তির পূর্ব্বে উৎপন্ন। হরিশ্চন্দ্র ভিন্ন ত্রিশঙ্কুর অন্য পুত্রের অস্তিত্বেও প্রমাণ পাই নাই সুতরাং ত্রিশঙ্কুর চাণ্ডালতা কৌশলকুলের দোষজনক হইবে কেন? তবে এ কৌশলবংশ, কৌশল্যার পিতৃবংশ হইতে পারে। মাতঙ্গচ্যুতি অর্থাৎ কোনরূপে চাণ্ডাল-সংশ্রব সে বংশে হইয়া থাকিবে।

তবে ইহাতেও যে একটী কথা বলিবার আছে, তাহা এই,—

"ত্রিশঙ্কোর্হরিশ্চন্দ্রঃ, তস্মাৎ রোহিতাশ্বঃ * * * * ততো বিশ্রুতবান্, ততো বৃহদ্বলঃ যোঽর্জ্জুনতনয়েন ভারতযুদ্ধে ক্ষয়মনীয়ত। বৃহদ্বলস্য পুত্রো বৃহৎক্ষণঃ, ততো গুরুক্ষেপঃ, ততো বৎসঃ, বৎসাদ্বৎসব্যূহঃ, ততঃ প্রতিব্যোমঃ, তস্যাপি দিবাকরঃ, তস্মাৎ সহদেবঃ, ততো বৃহদশ্বঃ, তৎসুতুর্ভানুরথঃ, তস্যাপি সুপ্রতীকঃ, ততো মরুদেবঃ, মরুদেবাৎ সুনক্ষত্রঃ, তস্মাৎ কিন্নরঃ, কিন্নরাদন্তরিক্ষঃ, তস্মাৎ সুবর্ণঃ, ততশ্চ অমিত্রজিৎ, ততশ্চ বৃহদ্রাজঃ, তস্যাপি ধর্ম্মী, ধর্ম্মিণঃ কৃতঞ্জয়ঃ, কৃতঞ্জয়াৎ রণঞ্জয়ঃ, রণঞ্জয়াৎ সঞ্জয়ঃ, সঞ্জয়াৎ শাক্যঃ, শাক্যাৎ শুদ্ধোদনঃ ('ক্রুদ্ধোদনঃ' পাঠ মুদ্রণ-প্রমাদ-মূলক), তস্মাৎ রাহুলঃ ('রাতুলঃ' পাঠ মুদ্রণপ্রমাদ-মূলক)।"

বিষ্ণুপুরাণ ৪র্থ অংশ তৃতীয়, চতুর্থ এবং দ্বাবিংশ অধ্যায়ের লিখনানুসারে অবগত হওয়া যায়, ত্রিশঙ্কু-পুত্র হরিশ্চন্দ্র, হরিশ্চন্দ্রের পুত্র রোহিতাশ্ব, রোহিতাশ্বের বংশে বৃহদ্বলের জন্ম। রাজা বৃহদ্বল ভারতসমরে অভিমন্যুর হস্তে নিহত হন। বৃহদ্বলের বংশে শাক্য রাজার উৎপত্তি। শাক্যের বংশধর শুদ্ধোদন। শুদ্ধোদনের বংশধর রাহুল।"

আপাততঃ এই বিষ্ণুপুরাণোক্তির সঙ্গে বৌদ্ধগ্রন্থের মতভেদ অনুভূত হয়। কেননা, ললিতবিস্তরে লিখিত আছে, শাক্যবংশ সুবিস্তৃত। শাক্যবংশীয় অন্যতম রাজা সুপ্রবুদ্ধের কন্যা মায়াদেবীকে বিবাহ করেন রাজা শুদ্ধোদন; আর শাক্যবংশীয় দণ্ডপাণির কন্যা বিবাহ করেন—বুদ্ধদেব। অথচ সুপ্রবুদ্ধের কথা বলিবার আবশ্যকতা নাই, দণ্ডপাণি শুদ্ধোদনের দূর-সম্পর্কিত ব্যক্তি, ইহাও স্পষ্টই বুঝা যায়। সুতরাং শাক্য-শুদ্ধোদনের বহু পূর্ব্বতন পুরুষ হইতে পারেন, কিন্তু পিতা কখনই নহেন। এদিকে শুদ্ধোদনের পুত্র যে সর্ব্বার্থসিদ্ধ বা বুদ্ধদেব, ইহা সর্ব্বজনসিদ্ধ; কিন্তু বিষ্ণুপুরাণে শুদ্ধোদনের পর রাহুলের নাম উল্লিখিত। সর্ব্বার্থসিদ্ধের নাম-গন্ধ নাই। এ সম্বন্ধে মীমাংসা এই যে, পৌরাণিক বংশবর্ণনায় পুত্রের পর পুত্র এ রীতিক্রম অবলম্বিত হয় নাই। অধস্তন বংশধর প্রসিদ্ধ রাজাদিগেরই নাম ঐরূপে পাওয়া যায়। জন্মভূমির গত ১৩০১ সালে আমার 'রাজগৃহ' প্রবন্ধে এ কথা বিচার করিয়া বুঝান আছে। সুতরাং আমরা বলিতে পারি, শাক্য রাজা সুপ্রসিদ্ধ, তৎপরে (এমন কি ১০।১২ পুরুষ হইলেও হইতে পারে) প্রসিদ্ধ রাজা কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই, সেইজন্য বহু অধস্তন প্রসিদ্ধ রাজা শুদ্ধোদনের নাম শাক্যের পরেই স্থান পাইয়াছে। সর্ব্বার্থসিদ্ধ রাজ্য গ্রহণ করেন নাই, এইজন্য রাজগণনা প্রসঙ্গে তাঁহার উল্লেখ নাই, তদীয় পুত্র রাহুল, যিনি শুদ্ধোদনের অব্যবহিত পরবর্ত্তী রাজা, তাঁহার নাম যথাস্থানেই আছে।

আর এরূপ মীমাংসা না করিলে, বিষ্ণুপুরাণের শাক্য, শুদ্ধোদন, রাহুলকে পৃথক্ মনে করিতে হয়। বুদ্ধদেবের সম্পৃক্ত শাক্য, শুদ্ধোদন, সে রাহুল সবই স্বতন্ত্র। তাঁহারা রঘুবংশীয় নহেন। এ কল্পনায় পূর্ব্বোক্ত কৌশলবংশ শব্দে রঘুবংশই উল্লিখিত হইয়াছে, এ কথাও বলা যায়। কিন্তু এইমাত্র দোষ হয় যে, তাদৃশ প্রসিদ্ধ শাক্যবংশের নাম পুরাণে প্রবিষ্ট না থাকা যেন কেমন কেমন লাগে। সেই জন্যই আমি পূর্ব্বমীমাংসার পক্ষপাতী।

পাণ্ডবকুলের দোষ—ক্ষেত্রজপুত্র-সঙ্কুলতা এবং জ্ঞাতি-সৌহার্দ্দের অভাব। তবে যে ললিতবিস্তরে অবগত হওয়া যায়, বুদ্ধদেবের আবির্ভাবকালে 'পাণ্ডব-কুল হস্তিনার রাজা' কিন্তু পুরাণ-পাঠে অবগত হওয়া যায়, রাজা জনমেজয়ের পরে ৩।৪ পুরুষ মধ্যেই হস্তিনানগর-ধ্বংস হয় এবং কৌশাম্বীপুরীই পাণ্ডব-রাজ-কুলের রাজধানী হয়। কিন্তু বুদ্ধদেব, জনমেজয়ের একাদশ শত বৎসরান্তে প্রাদুর্ভূত ইহা অবধারিত; তৎসম্বন্ধে প্রমাণও দিব। 'জনমেজয়ের পরবর্ত্তী একাদশ শতাব্দীর মধ্যে ৩।৪ জন রাজামাত্র প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন, পুরাণে মাত্র তাঁহাদের উল্লেখ আছে" যদি এইরূপ অনুমান করা যায়, তাহা হইলে, ললিতবিস্তরের সঙ্গে মতভেদ হয় না। নতুবা বলিতে হয়, পাণ্ডবেরা হস্তিনার রাজা বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন, তাই ললিতবিস্তরে পাণ্ডবকুলের রাজধানী হস্তিনানগর

বংশ, ইহাঁরা ত অতি প্রধান; কিন্তু বোধিসত্ত্ব-প্রধানের আবির্ভাব এসব বংশেও হইতে পারে না, তবে উপায়?

বলিয়াই উল্লিখিত হইয়াছে, অথবা কৌশাম্বী নগর পরিত্যাগ করিয়া পাণ্ডববংশীয় কোন রাজা পুনরায় হস্তিনা সন্নিধানে নগর স্থাপনপূর্ব্বক তাহার নাম হস্তিনাই রাখিয়াছিলেন, এরূপ কল্পনা করিতে হয়।

মথুরার কংসাদি-বংশের দোষ—তদ্বংশীয় রাজা নাস্তিক বংশপ্রসূত দস্যুবিশেষ। নাস্তিকের বংশে বোধিসত্ত্বের অবতার হইতে পারে না। কংসের পিতৃপীড়ন, দেবদ্বেষ প্রভৃতিই নাস্তিকতার পরিচায়ক। সেই বংশে পরবর্ত্তী কোন কোন রাজাও সম্ভবতঃ নাস্তিক ছিল।

মিথিলা-রাজের দোষ—তাঁহার অতি বার্দ্ধক্য, প্রজা-উৎসাহনে অসামর্থ্য এবং বহুপুত্রতা। কিন্তু এই মিথিলা-রাজ কোন্ বংশ-প্রসূত, তাহা বলা যায় না। কেননা, প্রসিদ্ধ মিথিলাধিপতি জনক-রাজবংশে সুমিত্র নামে কোন রাজার অস্তিত্বপ্রমাণ বিষ্ণুপুরাণাদিতে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। অথচ সুমিত্রকে তাৎকালিক রাজা বলিয়াই ললিতবিস্তরে কথিত হইয়াছে। অথবা যে প্রকার প্রসিদ্ধ রাজাদের উল্লেখ পুরাণে আছে, সুমিত্র রাজা তত প্রসিদ্ধ ছিলেন না। তাই পুরাণে তাঁহার উল্লেখ নাই। এরূপ সম্ভাবনা করিলে, তিনি জনকবংশের অন্তর্গতও হইতে পারেন। তবে রঘুবংশের শেষ রাজা অগ্ন সুমিত্র বা দ্বিতীয় সুমিত্র। এই সুমিত্রকে মিথিলারাজ বলিলে, অনেক কথা অনুমানের গূঢ়-গহ্বর হইতে নিঃসারিত করিতে হয়।

প্রদ্যোতন-কুলের দোষ—চণ্ডতা, চপলতা, রৌদ্রতা এবং সাহসিকতা (অকর্ত্তব্য-হিংসাদি-প্রবৃত্তি) আর এ বংশের কার্য্যপরম্পরা লোকের অনুকরণীয় নহে।

প্রদ্যোতন-বংশ তৎকালে মগধের রাজা। ইহা হইতেই বুদ্ধদেবের আবির্ভাব কাল সুপ্রতিপন্ন হয়। বিষ্ণুপুরাণ এবং ভাগবতে প্রদ্যোত বা প্রদ্যোতন-কুলের উল্লেখ আছে। পুরাণে এই প্রদ্যোত কুলের বিবরণ এইরূপ আছে;—মগধরাজ জরাসন্ধের পৌত্র সোমাপি হইতে রিপুঞ্জয় পর্য্যন্ত রাজগণের রাজ্যকাল সহস্র বৎসর। রিপুঞ্জয়ের মন্ত্রী সুনক বা শুনক, রাজহত্যা করিয়া স্বপুত্র প্রদ্যোত বা প্রদ্যোতনকে রাজ্যাভিষিক্ত করে। প্রদ্যোত-বংশের রাজা পাঁচজন, ইহাঁরা প্রদ্যোত বা প্রদ্যোতন বলিয়াই প্রসিদ্ধ। ইহাঁদের রাজত্বকাল একশত আটত্রিশ বৎসর। রাজহত্যা, বিশ্বাসঘাতকতা যে বংশের রাজ্য-প্রতিষ্ঠার মূল, তাহা যে চণ্ড, চপল, সাহসী এবং মলিনকর্ম্মা, তাহা বলাই বাহুল্য। তবেই দেখা যাইতেছে, বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্ব দ্বাদশ বৎসরের মধ্যে প্রদ্যোতন-কুল মগধের জরাসন্ধ-সিংহাসনে আসীন। তৎকালে মগধের অন্য স্থানে সম্ভবতঃ পাটলিপুত্রে (আধুনিক পাটনা-সন্নিহিত) অন্য এক রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন,

দেবপুত্র জ্ঞানকেতুধ্বজ, তখন সেই সমবেত বোধিসত্ত্ব-দেব-মণ্ডলীকে বলিলেন,—

তাঁহারা বৈদেহীবংশ নামে অভিহিত, ইহাঁদের বিষয় পুরাণে প্রাপ্ত হওয়া যায় না, তবে ললিতবিস্তরে আছে।

প্রদ্যোতন-বংশের শেষরাজা নন্দিবর্দ্ধন। প্রদ্যোতন-বংশের পতনে শিশুনাগবংশের অভ্যুদয়। শিশুনাগ-বংশের পঞ্চম রাজা বিম্বিসার (বিম্বিসার, বিম্বিসার এই সব পাঠ পুরাণে আছে) বিম্বিসার যখন জরাসন্ধের মহনীয় সিংহাসনে আসীন, তখন বুদ্ধদেব সন্ন্যাসী। ললিতবিস্তরে ইহা কথিত আছে। বোধ হয়, শিশুনাগ প্রভৃতি চারি জন রাজার রাজত্বকাল অনধিক চত্বারিংশৎ বর্ষ। শিশুনাগ ও তদীয় বংশের রাজ্যভোগ কাল ৩৬২ তিন শত বাষট্টি বৎসর; ভাগবতে আছে, ৩৬০ তিন শত ষাট। রাজা দশ জন। প্রথম চারি জন রাজার রাজ্যকাল অনধিক চত্বারিংশৎ বর্ষ হইলে, শেষ ছয়জন রাজার রাজ্যকাল ৩২২ তিন শত বাইশ বৎসর হয়। প্রত্যেকের গড়ে কিঞ্চিন্যূন ৫৪ বৎসর করিয়া রাজত্বকাল ধরিলেই ছয় পুরুষে ৩২২ বৎসর কাটিয়া যায়। ইহা অসম্ভবও নহে। আর দশজন মাত্র প্রসিদ্ধ রাজার নাম পুরাণে উল্লিখিত আছে, অপ্রসিদ্ধ রাজা শিশুনাগবংশে আরও ছিলেন এ অনুমান কেহ করিতে চাহেন, বিশেষ আপত্তি করি না।

ফলে, বুদ্ধ-অবতারের অব্যবহিত পূর্ব্ব দ্বাদশবর্ষ মধ্যে প্রদ্যোত-রাজবংশের উল্লেখ, শিশুনাগবংশের অনুল্লেখ এবং বুদ্ধ-সন্ন্যাসকালে শিশুনাগবংশীয় রাজা বিম্বিসারের উল্লেখ ললিতবিস্তরে দেখিয়া ইহা অবধারণ করা গিয়াছে যে, এই কালের মধ্যে প্রদ্যোত-বংশের পতন, শিশুনাগবংশের অভ্যুদয় এবং বিম্বিসারের পূর্ব্ববর্ত্তী রাজ চতুষ্টয়ের বিলয় হইয়াছে।

প্রদ্যোত এবং শিশুনাগ-বংশ সম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণের এবং ভাগবতের উক্তি এ স্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি;—

"জরাসন্ধসুতাৎ সহদেবাৎ সোমাপিঃ, তস্মাৎ শ্রুতবান্, তস্যাপ্যযুতায়ুঃ, ততশ্চ নিরমিত্রঃ, ততনয়ঃ সুনক্ষত্রঃ (সুক্ষত্রঃ পাঠ প্রামাদিক), তস্মাদপি বৃহৎকর্ম্মা, ততশ্চ সেনজিৎ, তস্মাৎ শ্রুতঞ্জয়ঃ, ততো বিপ্রঃ, তস্য চ পুত্রঃ শুচিনামা ভবিষ্যতি। তস্যাপি ক্ষেম্যঃ, ততশ্চ সুব্রতাৎ ধর্ম্মঃ, ততঃ সুশ্রমঃ, ততো দৃঢ়সেনঃ, ততঃ সুমতিঃ, তস্মাৎ সুবলঃ, তস্য সুনীথঃ (সুনীতঃ পাঠ প্রামাদিক) ভবিতা। ততঃ সত্যজিৎ, সত্যজিতো বিশ্বজিৎ, তস্যাপি রিপুঞ্জয়ঃ পুত্রঃ ইত্যেতেবার্হদ্রথা ভূপতয়ো বর্ষসহস্রমেকং ভবিষ্যন্তি।

"যোঽয়ং রিপুঞ্জয়ো নাম বার্হদ্রথোঽন্তাঃ, তস্য সুনিকো নামামাত্যো ভবিষ্যতি। স বৈনং স্বামিনং হত্বা স্বপুত্রং প্রদ্যোতনামানমভিষেক্ষ্যতি। তস্যাপি পালকনামা পুত্রো ভবিতা। ততশ্চ বিশাখযূপঃ, তৎপুত্রো জনকঃ, তস্য চ নন্দিবর্দ্ধন ইত্যেতে অষ্টত্রিংশদুত্তরমেকশতং পঞ্চ প্রদ্যোতাঃ পৃথিবীং ভোক্ষ্যন্তি।

ততশ্চ শিশুনাগঃ, তৎপুত্রশ্চ কাকবর্ণো ভবিতা।

"চিন্তা করিবার প্রয়োজন কি? এই বোধিসত্ত্ব-প্রধানকেই জিজ্ঞাসা করা যাক, কীদৃশ গুণ-সম্পন্ন বংশে ভবাদৃশ বোধিসত্ত্বের আবির্ভাব হয়?" তখন মণ্ডলী তাঁহাকে সাধুবাদ দিয়া কৃতাঞ্জলি-পুটে বোধিসত্ত্ব শ্বেতকেতুর সম্মুখীন হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কীদৃশ গুণ-সম্পন্ন মহাবংশে ভবাদৃশ বোধিসত্ত্বের আবির্ভাব হয়?" তখন তিনি বলিলেন,—"চরম-ভবিক * বোধিসত্ত্ব চতুঃষষ্টিবিধ-গুণাক্রান্ত বংশে আবির্ভূত হন।" সেই চতুঃষষ্টিবিধ গুণ অতিজ্ঞান-সম্পন্নতা প্রভৃতি ললিতবিস্তর তৃতীয়াধ্যায়ে কথিত হইয়াছে। তন্মধ্যে কতিপয় গুণ ললিত-বিস্তরের ভাষাতেই আমি উল্লেখ করিতেছি;—

"ব্রতবচ্চ তৎ কুলং ভবতি, কৃতজ্ঞঞ্চ তৎ কুলং ভবতি, অদোষগামি চ তৎ কুলং ভবতি, কুলশ্রেষ্ঠঞ্চ তৎ কুলং ভবতি, ঋষিপূজকঞ্চ তৎ কুলং ভবতি, দেবতাপূজকঞ্চ তৎ কুলং ভবতি, পূর্ব্বপ্রেতপূজকঞ্চ তৎ কুলং ভবতি, ব্রাহ্মণ্যঞ্চ তৎ কুলং ভবতি, অনবদ্যঞ্চ তৎ কুলং ভবতি সর্ব্বজাতিবাদদোষৈঃ।"

অর্থাৎ ব্রতচর্য্যা, দোষশূন্যতা, কুলশ্রেষ্ঠতা, ঋষিপূজকতা, দেবপূজকতা, শ্রাদ্ধকারিতা, ব্রাহ্মণ্যতা এবং সর্ব্ববিধ জাতিদোষ-সম্বন্ধ-হীনতা, সেই কুলে থাকা চাহি। যে রমণীর গর্ভে চরমভবিক বোধিসত্ত্ব আবির্ভূত হন, তাঁহার জাতিসম্পন্নতা, কুলসম্পন্নতা এবং পাতিব্রত্য-প্রমুখ দ্বাত্রিংশদ্বিধ গুণ থাকিবে (৬)।"

ললিতবিস্তর বলিতেছেন,—

"জাতিসম্পন্নায়াঃ কুলসম্পন্নায়াঃ.....স্ত্রিয়াঃ-কুক্ষৌ চরমভবিকো বোধিসত্ত্বোঽবক্রামতি।"

বোধিসত্ত্ব-দেব-মণ্ডলী এইরূপ বংশশুদ্ধি এবং মাতৃশুদ্ধির কথা শুনিয়া চিন্তিত হইলেন, এখন কুল, এমন মাতা কোথায় পাওয়া যাইবে? পরক্ষণেই শাক্যকুলের কথা মনে পড়িল, কপিল-বস্তু-নগরবাসী শাক্যবংশীয় রাজা শুদ্ধোদনকে মনে পড়িল, তাঁহার মহিষী অন্যতম শাক্য-রাজ সুপ্রবুদ্ধের দুহিতা মায়াদেবীকে মনে পড়িল। তখন তাঁহারা দেখিলেন, শুদ্ধোদন-মহিষী মায়াদেবীই ইহাঁর জননী হইবার উপযুক্ত।

বোধিসত্ত্ব-প্রধান শ্বেতকেতু দেখিলেন, সেই স্থানই তাঁহার জন্মগ্রহণের উপযুক্ত।

তখন তিনি অবতরণার্থ উচ্চধ্বজ বিমানে আরোহণ করিয়া দেবগণকে আহ্বান করিলেন, —"শ্রদ্ধেয়গণ! শেষ ধর্ম্মানুশাসন শ্রবণ করিবে এস।" তখন সকলেই সেই বিমানে উঠিলেন; প্রভু সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া স্বীয় প্রভাবে, চরমাবতার-চিকীর্ষু অসংখ্য বোধিসত্ত্ব তাঁহা-দিগকে অবলোকন করাইলেন। তাঁহারা অদ্ভুত-দর্শনে বিস্মিত হইয়া প্রভুকে পঞ্চমণ্ডলে প্রণাম এবং স্তব করিলেন। তখন বোধিসত্ত্ব-প্রধান তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"অব-তার সময়ে ঐ সকল বোধিসত্ত্বগণ, চ্যুত্যাকার নামক ধর্ম্মালোক-মুখ শ্রোতৃবর্গের নিকট প্রকাশ করিতেছেন।" শ্রদ্ধা, প্রসাদ, প্রীতি, দেবতা-স্মরণ, দেহ-সংযম, বাক্য-সংযম, মনঃ-সংযম, মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, উপেক্ষা, লজ্জা, সত্য, অহিংসা, দানোৎকর্ষ, বুদ্ধির উৎকর্ষ এবং ধর্ম্মজ্ঞান-প্রমুখ অষ্টোত্তর শত ধর্ম্মালোক-মুখ অর্থাৎ ধর্ম্মদর্শনের প্রথম দ্বার। সমুদায় ধর্ম্মালোকমুখের বৃত্তান্ত শুনিয়া চতুরশীতি সহস্র দেবপুত্র তৎক্ষণাৎ বোধিসত্ত্বতা প্রাপ্ত হইলেন। অন্যান্য শ্রোতৃগণেরও অধিকারানুসারে পুণ্য-সঞ্চয় হইল (৭)।

প্রভু বোধিসত্ত্ব, এইরূপে দেবমণ্ডলীর আনন্দ বিধান করিয়া তাঁহাদিগের নিকট যথো-চিতরূপে বিদায় গ্রহণ করিলেন। বিদায় গ্রহণ-কালে বলিলেন,—"শ্রদ্ধেয়গণ! আমি জম্বুদ্বীপে যাইব, আমার নির্ব্বাণের কাল সমীপবর্ত্তী।" তখন দেবমণ্ডলী সরোদনে তাঁহার পাদগ্রহণ-পূর্ব্বক বলিলেন,—"প্রভো! এই তুষিত-লোক তোমা বিনা শ্রীভ্রষ্ট হইবে।" বোধিসত্ত্ব বলিলেন,—এই মৈত্রেয় তোমাদিগকে ধর্ম্ম উপ-দেশ দিবেন।" অনন্তর প্রভু মৈত্রেয়কে যৌব-রাজ্যে অভিষেক, স্বীয় উষ্ণীষ প্রদান এবং "আমার পরে তুমি নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইবে" এই প্রকার বচন প্রয়োগ করিয়া দেবমণ্ডলীকে বলিলেন,—"এক্ষণে কোন্ মূর্ত্তিতে মাতৃগর্ভে

তৎপুত্রঃ ক্ষেমধর্ম্মা, তস্যাপি ক্ষত্রৌজাঃ, তৎপুত্রো বিন্ধি(ম্বি)সারঃ, ততশ্চাজাতশত্রুঃ, তস্মাচ্চ দর্ভকঃ, দর্ভকাচ্চোদয়াশ্বঃ, তস্মাদপি নন্দিবর্দ্ধনঃ, ততো মহানন্দী ইত্যেতে শৈশুনাগা দশ ভূমিপালাস্ত্রীণি বর্ষশতানি ত্রিষষ্ট্যধিকানি ভবিষ্যন্তি।"

বিষ্ণুপুরাণ ৪ অংশ, ২৩। ২৪ অঃ।

"————————জরাসন্ধোঽভবৎ সুতঃ।
ততশ্চ সহদেবোঽভূৎ————————"
ভবিতা সহদেবস্য মার্জ্জারির্যৎ শ্রুতশ্রবাঃ।
ততোঽযুতায়ুস্তস্যাপি নিরমিত্রোঽথ তৎসুতঃ।
সুনক্ষত্রঃ সুনক্ষত্রাদ্বৃহৎসেনোঽথ কর্ম্মজিৎ।
ততঃ সুতঞ্জয়াদ্বিপ্রঃ শুচিস্তস্য ভবিষ্যতি।
ক্ষেমোঽথ সুব্রতস্তস্মাদ্ধর্ম্মসূত্রঃ সমস্ততঃ।
দ্যুমৎসেনোঽথ সুমতিঃ সুবলো জনিতা ততঃ।
সুনীথঃ সত্যজিদথ বিশ্বজিদ্যদ্রিপুঞ্জয়ঃ।
বার্হদ্রথাশ্চ ভূপালা ভাব্যাঃ সাহস্রবৎসরম্॥"

ভাগবত ৯ম স্কন্ধ ২২ অঃ।

"যোঽন্ত্যঃ পুরঞ্জয়ো নাম ভবিষ্যো বার্হদ্রথঃ।
তস্যামাত্যস্তু শুনকো হত্বা স্বামিনমাত্মজম্।
প্রদ্যোতসংজ্ঞং রাজানং কর্ত্তা যৎপালকঃ সুতঃ।
বিশাখযূপস্তৎপুত্রো ভবিতা রাজকস্ততঃ।
নন্দিবর্দ্ধনস্তৎপুত্রঃ পঞ্চ প্রদ্যোতনা ইমে॥
অষ্টত্রিংশোত্তরশতং ভোক্ষ্যন্তি পৃথিবীং নৃপাঃ॥
শিশুনাগস্ততো ভাব্যঃ কাকবর্ণস্তু তৎসুতঃ।
ক্ষেমধর্ম্মা তস্য সুতঃ ক্ষেত্রজ্ঞঃ ক্ষেমধর্ম্মজঃ।
বিধি (ম্বি, দ্বি)সারঃ সুতস্তস্যাজাতশত্রুর্ভবিষ্যতি।
দর্ভকস্তৎসুতো ভাবী দর্ভকস্যাজয়ঃ স্মৃতঃ।
নন্দিবর্দ্ধন আজেয়ো মহানন্দিঃ সুতস্ততঃ॥
শৈশুনাগা দশৈবৈতে ষষ্ট্যুত্তর শতত্রয়ম্।
সমা ভোক্ষ্যন্তি পৃথিবীং কুরুশ্রেষ্ঠ কলৌ নৃপাঃ॥"

১২শ স্কন্ধ, ১ম অধ্যায়।

"রিপুঞ্জয় এব পুরঞ্জয়ঃ।" স্বামী।

পুরাণদ্বয়ে নাম সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ভেদ লিপিকর-প্রমাদ, দ্বিবিধ নামেরই যথার্থ অস্তিত্ব প্রভৃতি কারণে ঘটিয়াছে। দুই এক বৎসরের পার্থক্যও লিপি-দোষ অথবা বৎসর-গণনার পার্থক্যেও হইতে পারে। কোন পুরাণে চান্দ্রমানে বৎসর-গণনা, কোথাও বা সৌরমানে বৎসর-গণনা আছে। যাক্, সে কথা এখানে বিচার্য্য নহে। ভাগবতের মার্জ্জারি এবং বিষ্ণুপুরাণের সোমাপি এক ব্যক্তি। মার্জ্জারি বা সোমাপি, সহ-দেবের পুত্র এবং সহদেব জরাসন্ধের পুত্র ইহা উভয় পুরাণেই ব্যক্ত। আর যিনিই সোমাপি, তিনিই যে মার্জ্জারি, তাহা ভাগবতেই আছে,—

"————————জরাসন্ধোঽভবৎ সুতঃ।
ততশ্চ সহদেবোঽভূৎ সোমাপির্যৎশ্রুতশ্রবাঃ॥"

"মার্জ্জারির্যৎসুতশ্রবাঃ" আর "সোমাপির্যৎশ্রুত-শ্রবাঃ॥" এই দুই অংশ মিলাইয়া দেখ। এই মার্জ্জারি পরীক্ষিতের সমকালবর্ত্তী রাজা।

"পরীক্ষিৎসমকালং মাগধং মার্জ্জারিমারভ্য রিপু-ঞ্জয়ান্তা বিংশতী রাজানঃ সহস্রবৎসরং ভোক্ষ্যন্তি।"

স্বামী।

পরীক্ষিৎ কলির দ্বাদশ শতাব্দীর অন্যতম রাজা ইহা আমি বহু প্রবন্ধে প্রমাণিত করিয়াছি।

শেষ প্রদ্যোতনের চরমকালের কিঞ্চিন্ন্যূনাধিক একা-দশ শত আটত্রিংশ (১১৩৮) বৎসর পূর্ব্বে পরীক্ষিতের রাজ্যকাল। সুতরাং কলির ত্রয়োবিংশ শতাব্দীর শেষে বা চতুর্ব্বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে প্রদ্যোতন-রাজবংশের পতন হইয়াছে এইরূপ সিদ্ধান্ত হয়। সর্ব্বার্থসিদ্ধ বুদ্ধ-দেবের আবির্ভাবও কলির ত্রয়োবিংশ শতাব্দীর শেষ-ভাগে। বর্ত্তমান সময়ে কল্যব্দ ৪৯৯৩। তাহা হইতে ঠিক ত্রয়োবিংশতি শত বৎসর বাদ দিলে, বর্ত্তমান সময় হইতে ২৬৯৬ বৎসর পূর্ব্বে বুদ্ধদেবের আবির্ভাব হইয়া-ছিল ইহা নির্ণীত হয়। ফল, বুদ্ধদেবের আবির্ভাব যে খৃঃ পূঃ নবম শতাব্দীর প্রারম্ভে বা অষ্টম শতাব্দীর শেষে ইহাই তথ্য। মিঃ আর, সি, দত্তের মতে খৃঃ পূঃ ৫৫৭ বৎসরে, আর কতিপয় ইংরেজ ঐতিহাসিকের মতে খৃঃ পূঃ ৬২৩ বৎসরে বুদ্ধাবির্ভাব। ললিতবিস্তর এবং পুরাণাদির বলে নিঃসন্দেহে বলা যায়, এ সব মত ভ্রান্তিমূলক।

যাঁহারা কলির প্রথম শতাব্দীতে যুধিষ্ঠিরাদির অস্তিত্ব অনুমান করেন, তাঁহাদের মতে কলির দ্বাদশশতাব্দী কি ত্রয়োদশ শতাব্দীতে অর্থাৎ খৃঃ পূঃ বিংশ শতাব্দী কি ঊনবিংশ শতাব্দীতে বুদ্ধের আবির্ভাব ইহা বলিতে হয়।

যাঁহারা কলির সপ্তম শতাব্দীতে যুধিষ্ঠিরাদির অস্তিত্ব অনুমান করেন, তাঁহাদের মতে কলির অষ্টাদশ বা ঊনবিংশ শতাব্দীতে অর্থাৎ খৃঃ পূঃ দ্বাদশ কি ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বুদ্ধের আবির্ভাব বলিতে হয়। ইত্যাদি মতের সারাসারত্ব মদীয় 'পুরাবৃত্ত' প্রভৃতি প্রবন্ধ দ্বারা নির্ণেতব্য।

* যে জন্মের পরেই নির্ব্বাণ মুক্তি হয়, তাহাই চরমভব বা শেষজন্ম, যাঁহার এই প্রকার জন্ম হয়, তিনিই 'চরমভবিক'।

সঞ্চরণ করি ?” তখন কেহ বলিলেন,—মনুষ্য মূর্ত্তিতে, কেহ বলিলেন,—ইন্দ্ররূপে; কেহ বলিলেন,—ব্রহ্মার মূর্ত্তিতে; কেহ বলিলেন,—কুবেররূপে; কেহ কেহ বলিলেন মহেশ্বর-রূপে; (৮) ইত্যাদি প্রকার নানা কথা, নানা দেবতা বলিতে লাগিলেন। তন্মধ্যে উগ্রতেজা নামে এক দেবতা বলিলেন,—“যে মূর্ত্তিতে সঞ্চরণ করিলে, ব্রাহ্মণেরা বেদাদি শাস্ত্র হইতে প্রকৃত স্বরূপ অবগত হইতে পারেন, সেই মূর্ত্তিতেই আপনার মাতৃগর্ভে সঞ্চরণ কর্ত্তব্য। সেই মূর্ত্তি কি ?—

“গজবরমহাপ্রমাণঃ ষড়্দন্তো হেমজাল-সঙ্কাশঃ সুরুচিরঃ সুরক্তশীর্ষঃ শ্রীমান্।”

এই সমস্ত স্থির হইলে, প্রভু, রাজা শুদ্ধোদনের গৃহে অষ্টবিধ পূর্ব্বনিমিত্ত প্রদর্শন করিলেন,—

১ম, তৃণ-কর্করাদির কাঠিন্য দূর হইল, দংশ-মশকাদি রহিল না, পৃথিবী, জল, বায়ু সবই আনন্দজনক হইল।

২য়, হিমালয়-গিরিচর মধুর-কূজন বিহঙ্গম-কুল শুদ্ধোদনের ভবনে আসিয়া নানাস্থানে বসিয়া আনন্দ-প্রফুল্লভাবে কল-কূজন করিতে লাগিল।

৩য়, শুদ্ধোদনের উদ্যানস্থিত বিভিন্নকালিক ফল-পুষ্প-বৃক্ষ যুগপৎ ফলপুষ্পভারে অবনত হইল।

৪র্থ, রাজা শুদ্ধোদনের পুষ্করিণী সকল শকট-চক্রাকৃতি বিশাল ফুল্ল কমলকুলে পরিশোভিত হইল।

৫ম, রাজা শুদ্ধোদনের পানীয় ভোজনীয় দ্রব্য সকল পান-ভোজনেও উপক্ষীণ হইল না, পরিপূর্ণই থাকিল।

৬ষ্ঠ, রাজা শুদ্ধোদনের অন্তঃপুরস্থিত বাদ্য-যন্ত্র সকল আপনা হইতেই বাজিয়া উঠিল।

৭ম, রাজা শুদ্ধোদনের মণিময় পাত্র সকলের জ্যোতি ও নির্ম্মলতা বৃদ্ধি পাইল।

৮ম, আর কেমন এক অপূর্ব্ব প্রভায় রাজা শুদ্ধোদনের গৃহ বিভাসিত হইল।

এদিকে মায়াদেবী স্নাতানুলিপ্তা এবং সর্ব্বালঙ্কারে অলঙ্কৃতা হইয়া রাজা শুদ্ধোদনের সমীপে আগমনপূর্ব্বক তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে* উপবেশন করিলেন এবং সহাস্যে ও সপ্রশ্রয়ে রাজাকে বলিলেন,—“আমি অদ্য হইতে সপ্তাহ ব্রত গ্রহণ করিব, দে'পূজা ও উপবাসাদি করিতে হইবে এবং অহিংসা-পরায়ণা, ও মৈত্রী-সম্পন্না হইয়া সংযতভাবে থাকিব। আপনি অনুমতি প্রদান করুন। আর অদ্যই বন্দীগণের কারামুক্তি করিয়া দিউন, অজস্র ধন দান করুন; সপ্তাহ যাবৎ কোথাও যেন নিরানন্দ থাকে না, যেন সকলেই আনন্দে মগ্ন থাকে; আর আমি যেন কোন হেয় নর-নারীর মুখ দর্শন করিতে না পাই, সৌম্য নর নারীই যেন আমার সম্মুখীন হয়; সুগন্ধ সুশব্দ ইত্যাদি ভোগই যেন আমার হয়। মহারাজের নিকট আমি এই বর প্রার্থনা করিতেছি।”

রাজা তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ করিলেন। দেবী, মহোৎসবের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর ন্যায়, মহা সুখ-সমারোহে, সুরুচির মিশ্রকানন-প্রাসাদে প্রেরিত হইলেন। মায়াদেবী স্বীয় অভিলাষানুরূপ সমস্ত আনন্দ অনুভব করত সুখ-শয়নে শয়ন করিলেন।

এদিকে দেবরাজ শক্র, সুরনায়ক ব্রহ্মা মহেশ্বর প্রভৃতি(৯) দেবগণ মিলিত হইয়া পরস্পরে কথোপকথন করিতে লাগিলেন,—“বোধিসত্ত্বকে একাকী পরিত্যাগ করা আমাদের অনুচিত এবং অকৃতজ্ঞতা-সূচক। অতএব, যাঁহার ইচ্ছা তিনি ইহাঁর অনুগমন করিতে পারেন।” তখন তাঁহারা এবং তৎক্ষণাৎ উপস্থিত অন্যান্য দেবমণ্ডলী সকলেই বলিলেন,—

* বিশেষ ধর্ম্ম-চর্য্যাদি কতিপয় সময়ে স্ত্রীলোক স্বামীর দক্ষিণ পার্শ্বে বসিবে।

“ত্যক্ত্বার্থকামরতিধ্যানসুখং প্রণীতং
অনুবন্ধয়াম ইমমুত্তমশুদ্ধসত্ত্বম্।
আক্রান্তপাদতথগর্ভস্থিতং মহাত্মং
পূজারহং অতিযশমভিপূজয়াম॥”

আমরা স্বর্গসুখ পরিত্যাগ করিয়াও ইহাঁর অনুগমন করিব, এই পূজার্হ মহাত্মা গর্ভস্থিত হইলে, ইহাঁকে পূজা করিব। ইহাঁর শৈশব, কৈশোর, যৌবন, সন্ন্যাস, মারবিজয় এবং সম্যক্ জ্ঞানলাভ—সকল সময়েই অনুসরণ করিব, পূজা করিব।

“নির্ব্বাণমার্গমুপযাস্যতি শান্তিভাবং
তাবন্মহাশয়মৃষিং ন জহাম সর্ব্বে।”

যতদিন ইনি নির্ব্বাণ লাভ না করিবেন, ততদিনই আমরা ইহাঁর অনুসরণে বিরত হইব না।

বোধিসত্ত্ব অবতীর্ণ হইবেন শুনিয়া, দেবকন্যাগণ, তাঁহার জননীকে দেখিবার জন্য অগ্রেই নিম্নকাননে আসিলেন এবং শয়ানা দেবীকে দেখিয়া রূপ বর্ণনা করিয়া সকলেই বিস্মিত ও সন্তুষ্টচিত্তে চলিয়া গেলেন।

ইন্দ্রাদি দেবগণ, প্রভু বোধিসত্ত্বের অবতরণ-রথ-রক্ষার ব্যবস্থা করিয়া পুষ্পগন্ধ হস্তে প্রণত-মস্তকে বলিতে লাগিলেন,—

“হে শুদ্ধসত্ত্ব! এই আপনার অবতরণ-কাল উপস্থিত। হে করুণাময়! সর্ব্বলোকের প্রতি কৃপা করিয়া অবতীর্ণ হউন।”

বোধিসত্ত্ব প্রভু অবতরণ-বিমানে আরূঢ় হইলেন; দেবগণ, বিমান বহন করিতে লাগিলেন; বিচিত্র মনোহর বাদ্যধ্বনি হইতে লাগিল; জগৎ মৈত্রীময় হইল; নরকের জীবেরাও দুঃখ-হীন হইয়া ক্ষণকালের জন্য আনন্দ অনুভব করিতে লাগিল, রোগ-দ্বেষ-ক্লেশাদি অমঙ্গল জগৎ হইতে বিদূরিত হইল; অপ্সরোগণ বোধিসত্ত্বের স্তবগান করিতে করিতে অনুসরণ করিতে লাগিলেন। সেই মনোহর স্তবের দুইটী গাথা এই,—

আত্মমাংস তুলয়িত্বতেবিভো
ক্ষুৎপিপাসুপ্রিয় পক্ষিকারণাৎ।
তস্যদানুচরিতস্য তৎফলং
প্রেতলোকি লভি পানভোজনম্॥

হে প্রভো! ক্ষুৎপিপাসা-কুল পক্ষিগণের জন্য আত্মমাংস প্রদান করিয়াছেন, সেই পূর্ব্বজন্মকৃত দানচর্য্যার ফলে প্রেতলোকে পানভোজন প্রাপ্ত হইয়াছেন।

মৈত্রধার্ম্মিক কিলেশসূদনা
সর্ব্বসত্ত্বকরুণায় উদ্গতা।
মোদপ্রাপ্ত পরমা উপেক্ষকা
ব্রহ্মভূত সুগতো নমোহস্তু তে।

হে মৈত্রীধর্ম্মিন্, ক্লেশসূদন! হে সর্ব্বভূতানুকম্পার্থ উদ্যত! হে মোদপ্রাপ্ত পরম উপেক্ষক ব্রহ্মস্বরূপ সুগত! তোমাকে নমস্কার করি।

বলা বাহুল্য, ব্রহ্মাদি যাবতীয় দেবগণই বুদ্ধদেবের অনুবর্ত্তী হইয়াছিলেন।

মনোহর বসন্তকাল, বিশাখা-নক্ষত্রানুগত বৈশাখ মাস, পূর্ণিমা, পুষ্যানক্ষত্রে* বোধিসত্ত্ব

* বৈশাখ মাস পূর্ণিমায় পুষ্যানক্ষত্র-যোগ কখনই হইতে পারে না। বিশাখানক্ষত্র বা তদনন্তর্ত্তী কোন নক্ষত্রই বৈশাখী-পূর্ণিমাতে হইয়া থাকে।

ললিতবিস্তরের লিপি;—

“বৈশাখমাসে বিশাখানক্ষত্রানুগতে ঋতুপ্রবরে বসন্তকালসময়ে ..... পঞ্চদশ্যাং পূর্ণিমায়াং.....মাতুঃ পুষ্যনক্ষত্রযোগে বোধিসত্ত্বস্তুষিতবরভবনাচ্চ্যুতো পাণ্ডুরগজো ভূত্বা.....দক্ষিণকুক্ষাববক্রামত।”

বিশাখানক্ষত্রের নাম থাকিলেও তাহা বৈশাখের বিশেষণ। অথচ ‘পুষ্যনক্ষত্র যোগে’ কথাটী স্পষ্ট রহিয়াছে।

সুতরাং দেবপ্রভাবেই এমন অসময়ে পুষ্যানক্ষত্রের যোগ হইয়াছিল, ইহাই ললিতবিস্তরের তাৎপর্য্য। তাহা সূচনা করিবার জন্যই ‘বিশাখানক্ষত্রানুগতে’ এই কথাটী আছে; অর্থাৎ বিশাখানক্ষত্র হওয়াই নিয়ম, কিন্তু দেবপ্রভাবে সে দিন পুষ্যনক্ষত্র-যোগ ঘটিয়াছিল। এইরূপ বিশ্বাস হয় ভালই। না হয়, ‘পুষ্যনক্ষত্রযোগে’ ইহার অর্থ “বৃহস্পতি পুষ্যনক্ষত্রে থাকিলে,

প্রভু তুষিত-লোক হইতে অবতীর্ণ হইয়া ষড়্দন্ত শুক্লবর্ণ মহাগজরূপে সুপ্তা মায়াদেবীর দক্ষিণ গর্ভে প্রবিষ্ট হইলেন।

মায়াদেবী তৎক্ষণাৎ স্বপ্ন দেখিলেন, একটী শুক্লবর্ণ, রক্তশীর্ষ, সুচরণ, মনোহর-শুণ্ড ললিত-গামী দৃঢ়গাত্রসন্ধি, ষড়্দন্ত মহাগজ গর্ভপ্রবিষ্ট হইলেন। মায়াদেবীর অসীম অননুভূতপূর্ব্ব সুখ হইল। মায়াদেবী প্রহ্লাদিত-চিত্তে শয্যা হইতে উঠিয়া সখীগণ সমভিব্যাহারে অশোক-বনিকা-উপবনে গমন করিলেন এবং তথা হইতে রাজ-সমীপে প্রেরিত লোকমুখে, রাজ-দর্শনেচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তৎশ্রবণে হৃষ্টচিত্তে অশোক-বনিকা-দ্বারে উপস্থিত হইয়া দেবীকে দেখিবা-মাত্র রাজার ভয়-সম্ভ্রম-মিশ্রিত ভাবান্তর উপস্থিত হইল। তিনি ভাবিলেন,—"একি! প্রবল যুদ্ধেও ত আমার এরূপ ভাব উপস্থিত হয় নাই; আমি যে আমার নিজস্থান এই অশোক-বনিকা তেও প্রবেশ করিতে সমর্থ হইতেছি না!"

দেবগণ, গগন তল হইতে রাজা শুদ্ধোদনের স্তব করিতে লাগিলেন। এদিকে রাজা কিন্তু স্বীয় মস্তকে অঞ্জলি-বন্ধন পূর্ব্বক অশোক-বনিকায় প্রবিষ্ট হইয়া দেবীকে বলিলেন,—"প্রিয়ে! তোমার কোন্ অভিলষিত কর্ম্ম করিব?" দেবী, রাজার নিকট স্বীয় স্বপ্নবৃত্তান্ত এবং আনন্দ অবস্থা ব্যক্ত করিয়া বলিলেন,—

"সাধু নৃপতি শীঘ্রং ব্রাহ্মণানানয়াস্মিন্
বেদ-উপনি-পাঠ যে গৃহে সুবিধিজ্ঞান্।
সুপিন মমহি যেমং ব্যাকরী তত্ত্বযুক্তং
কিমিদ মম ভবেয়া শ্রেয় পাপং কুলস্য॥"

হে রাজন্! আমার এই স্বপ্নফলে বংশের মঙ্গল হইবে কি অমঙ্গল হইবে এই তত্ত্ব যাঁহারা প্রকাশ করিতে পারিবেন, বেদ-উপনিষৎ-পাঠী-স্বপ্ন-বিধিজ্ঞ অথবা সুবিধিজ্ঞ এইরূপ ব্রাহ্মণ-গণকে শীঘ্র আনয়ন করুন।

রাজা ব্রাহ্মণগণকে আনাইলেন। তাঁহারা দেবীর নিকট আসিয়া বলিলেন,—"দেবি! কি প্রকার স্বপ্ন আপনি দেখিয়াছেন?" দেবী স্বপ্ন-বৃত্তান্ত বলিলে, ব্রাহ্মণেরা প্রীতিভরে বলিলেন,—"ভয় নাই, বংশের অমঙ্গল হইবে না। দেবী সর্ব্বলক্ষণাক্রান্ত পুত্র প্রসব করিবেন। তিনি গৃহে থাকিলে, চক্রবর্ত্তী হইবেন, কিন্তু তাহাও থাকিবেন না, তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া বুদ্ধ হইবেন, অমৃত-সরোবরে সকলের তৃপ্তি-সাধন করিবেন।" রাজা তাহা শুনিয়া মহানন্দে দান উৎসবাদি আরম্ভ করিলেন।

রাজা শুদ্ধোদন তখন ভাবিলেন, কি প্রকার গৃহে থাকিলে, মায়াদেবীর কষ্ট হইবে না এবং তিনি স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারিবেন?

তৎক্ষণাৎ ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ, আসিয়া রাজাকে 'অহমহমিকা' সহকারে বলিলেন,—"আমি দিব্য হর্ম্ম্যনির্ম্মাণ করাইয়া দিতেছি আমি দিব্য হর্ম্ম্যনির্ম্মাণ করিয়া দিতেছি।"

সকলেই মর্ত্ত্যলোক-দুর্লভ মহা হর্ম্ম্যনির্ম্মাণ করাইয়া দিলেন। মায়াদেবী তন্মধ্যে কোন একটী বিচিত্র হর্ম্ম্যে বাস করিতে লাগিলেন।

কিন্তু ভক্তবৎসল বোধিসত্ত্ব মহাব্যূহ-সমাধি-প্রভাবে সকল গৃহেই মায়াদেবীর সত্তা দেব-গণকে দেখাইতে লাগিলেন।

ব্রহ্মা, ইন্দ্র, কুবের প্রভৃতি দেবগণ, গর্ভস্থিত বোধিসত্ত্বের আজ্ঞা প্রতিপালনে সতত নিযুক্ত থাকিলেন।

এইরূপে দশ মাস অতীত হইল। রাজা শুদ্ধোদনের উপবনে দ্বাত্রিংশদ্বিধ সুনিমিত্ত প্রাদুর্ভূত হইল। তন্মধ্যে দুইটী নিমিত্ত—দেবকন্যাগণের আগমন, শতসহস্র অপ্সরোগণের বাদ্যযন্ত্র-হস্তে প্রতীক্ষা।

মায়াদেবী বুদ্ধদেবের জন্ম-সময় জানিতে পারিয়া রাজার নিকট গিয়া বলিলেন,—"মহা-রাজ! শুদ্ধসত্ত্ব মহাপুরুষের জন্মকাল উপস্থিত, আমি উদ্যানে যাইতে ইচ্ছা করি।"

মহারাজ হৃষ্টচিত্তে দেবীর অভিলাষ পূর্ণ করিলেন। অনুচরগণকে লুম্বিনী উদ্যান তৎ-ক্ষণাৎ সজ্জিত করিতে আদেশ দিয়া, মহা সমারোহে অশ্ব-হস্তী-রথ-পদাতি সমভিব্যাহারে রথারোহণে দেবীকে তথায় পাঠাইলেন।

ইন্দ্র রথ-পদ্ধতি-শুদ্ধি করিতে লাগিলেন, ব্রহ্মা পুরোবর্ত্তী হইয়া দুর্জ্জন-উপস্থিতি নিবারণ করিতে লাগিলেন। শতসহস্র দেবগণ, কৃতা-ঞ্জলিপুটে প্রণাম করিতে লাগিলেন। রাজা এই ব্যাপার দর্শন করিয়া মুদিতচিত্তে ভাবিলেন,—"এই গর্ভস্থিত বালক নিশ্চয়ই দেব-দেব; ইন্দ্র ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণের পূজা সহন করা যে-সে ব্যক্তির কর্ম্ম নহে।"

লুম্বিনী-বন গন্ধসিক্ত হইল, সুসজ্জিত হইল, দেব-দেবীগণ তথায় প্রবিষ্ট হইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

তখন মায়াদেবী লুম্বিনী বনে প্রবিষ্ট হইয়া এক দেবোপগীত অপূর্ব্ব প্লক্ষবৃক্ষতলে উপস্থিত হইলেন।

প্লক্ষবৃক্ষও বোধিসত্ত্বের তেজে অবনত হইয়া মায়াদেবীকে প্রণাম করিল।

মায়াদেবী তখন, প্লক্ষশাখা অবলম্বন করিয়া সলীলভাবে গগনতলে দৃষ্টিপাত পুরঃসর জৃম্ভিত-মুখে অবস্থিত হইলেন।

ষষ্টি শত সহস্র দেবকন্যা আসিয়া তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে বোধিসত্ত্ব, জননীর দক্ষিণ-কুক্ষি হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

ক্রমশঃ।

(বক্তব্য)

বুদ্ধদেব নারায়ণ; ইহা হিন্দুশাস্ত্রের মত। বৌদ্ধগ্রন্থেও ব্যক্তাব্যক্তভাবে এ কথা নানা স্থানে পাওয়া যায়।

বৌদ্ধেরাও অদৃষ্টবাদী।

বুদ্ধদেব জাতিভেদের বিরোধী নহেন, পক্ষপাতী। দেবপূজায় বিরোধী নহেন, পক্ষ-পাতী; ঋষি-পূজার বিরোধী নহেন, পক্ষপাতী। শ্রাদ্ধের বিরোধী নহেন, পক্ষপাতী। বুদ্ধদেব ব্রাহ্মণ্যতার বিরোধী নহেন, পক্ষপাতী।

প্রাচীন বৌদ্ধগণ বেদ-বিশ্বাসী।

জাতিহীন কুলহীন নর-নারীতে চরম ভবিক বোধিসত্ত্বির অবতার হয় না। ইহা বুদ্ধদেবের শ্রীমুখের উক্তি। উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণকুলে বা ক্ষত্রিয়-কুলে জন্ম না হইলে নির্ব্বাণ হয় না। ইহাও ললিত-বিস্তরের মত।

সত্য, অক্রোধ, অহিংসা, লজ্জা, বিদ্যা, দানশীলতা, সংযম এবং বুদ্ধি আর মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, উপেক্ষা এই বৃত্তিচতুষ্টয় এবং স্ত্রীলোকের পাতিব্রত্য, হিন্দুধর্ম্মের ন্যায় বৌদ্ধ-ধর্ম্মের সম্পূর্ণ অনুমোদিত।

ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্র এবং কুবের প্রভৃতি দেব-গণের অস্তিত্ব বৌদ্ধ-সম্মত।

পুরাণের ন্যায় ললিত-বিস্তরেও অনেক অনৈসর্গিক (?) দৈবব্যাপারের উল্লেখ আছে, সুতরাং সে বিষয়ে হিন্দু বৌদ্ধ উভয়েরই এক মত।

প্রমাণ নিম্নে প্রদর্শন করিতেছি, পার্শ্বের অঙ্ক দেখিয়া পূর্ব্বের সহিত মিলাইয়া লইবে।

(১) তুষিত—দেবতাবিশেষ। বিষ্ণুপুরাণে ইহাঁদের উল্লেখ আছে। নারায়ণও তুষিত নামে অভিহিত।

ততঃপুনঃ সর্বদেবঃ প্রাপ্তে স্বারোচিষেঽন্তরে।
তুষিতায়াং সমুৎপন্নো হ্যজিতস্তুষিতৈঃ সহ॥
ঔত্তমেত্বন্তরে চৈব তুষিতস্তু পুনঃ স বৈ।
সত্যায়ামভবৎ সত্যঃ———— ॥

(২) হিন্দুগণের ন্যায় বৌদ্ধেরাও পুনর্জ্জন্ম স্বীকার করেন, শুভ-কর্ম্মফলে উন্নতি, অশুভ-কর্ম্মফলে অবনতি ঘটিয়া থাকে, ইহা বৌদ্ধ-গণেরও বিশ্বাস।

সাংখ্যপ্রবচন দর্শনে কথিত হইয়াছে, ভগবান্ বাসুদেব জীবন্মুক্ত প্রধান; অর্থাৎ কখন তিনিও অস্মদাদির ন্যায় জীব ছিলেন, পরে শুভকর্ম্মাদির পরিপাকে জীবন্মুক্তি লাভ করিয়াছেন।

অন্য মতের সঙ্গে এ বিষয়ে পার্থক্য থাকিলেও সাংখ্যমতের সহিত সামঞ্জস্য আছে।

(৩) দেবতা, অসুর, নাগ, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব অপ্সরা সকলই হিন্দুর ন্যায় বৌদ্ধেরাও মানিতেন।

(৪) বেদের কদর্থ জনসমাজে প্রচার হইতেছে, এইজন্যই দেবগণ বেদোদ্ধারে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, বৌদ্ধগ্রন্থের ইহাই তাৎপর্য্য সুতরাং অর্থ লইয়া গোল থাকিলেও হিন্দুগণ এবং প্রাচীন বৌদ্ধগণ বেদ-বিশ্বাসী।

(৫) ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়কুলের গৌরব প্রাচীন বৌদ্ধসমাজে ছিল।

(৬) এইস্থলে ব্রত, ঋষিপূজা, দেবপূজা, শ্রাদ্ধ, ব্রাহ্মণ্যতা এবং জাতিরক্ষা যে বৌদ্ধগণের সুসম্মত, ইহা বুঝা যায়।

এখানেও জাতি-রক্ষা ও পাতিব্রত্য প্রভৃতির কথা উক্ত হইয়াছে।

(৫) (৬) আলোচনা করিয়া দেখুন নির্ব্বাণ-মুক্তি লাভ, উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়কুলে না জন্মিলে, হয় না, ইহা দেখিতে পাইবেন।

(৭) বাচিক কায়িক মানসিক শুদ্ধি, অক্রোধ, দান, লজ্জা, বুদ্ধি, সত্য ইত্যাদি ধর্ম্মলক্ষণে হিন্দুগণের সহিত ঐকমত্য বৌদ্ধদিগের জানা যায়।

মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, উপেক্ষা যোগিমাত্রেরই,—চিত্তশুদ্ধিকামিমাত্রেরই সেব্য, এ বিষয়েও মতদ্বৈধ নাই।

(৯৮) ব্রহ্মা শিব প্রভৃতির কথা।

প্রবন্ধ পাঠ করিয়া দেখুন, প্রসিদ্ধ বহু দেবতার নাম বুদ্ধ-সেবক বা বুদ্ধ-অনুবর্ত্তিগণের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট আছে; নারায়ণের নাই। কিন্তু বিষ্ণু সম্বন্ধে কোন কথা এখনও পাওয়া যায় নাই। এদিকে তুষিত, বিষ্ণুরই রূপ ইহা হিন্দুশাস্ত্র। সর্ব্বদেব-বিশ্বাসী বৌদ্ধগণের বিষ্ণুতে অবিশ্বাস, ইহাও বোধ হয় না। সুতরাং এখানে অব্যক্ত ভাবে বুদ্ধের বিষ্ণুত্ব কথিত হইয়াছে। স্থলান্তরে এই ললিত বিস্তারেই ব্যক্ত ভাবে বুদ্ধদেবের নারায়ণত্ব কথিত হইয়াছে।

শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন।

নূতন কথা।

গতবারে বলিয়াছি যে, নানারূপ পাটকে ইংরেজি-ভাষায় হেম্প বলে। কেননা, সিদ্ধির পাট পূর্ব্বে বিলাতে আমদানি হইত। আর সিদ্ধি ও গাঁজা গাছের নাম ইংরেজি ভাষায় "হেম্প"। তাই, অনেকে শণকে "হেম্প" বলিয়া থাকেন। সম্প্রতি আমার একটী বন্ধু এই কথা লইয়া বড় বিপদে পড়িয়াছিলেন। ইহাঁর বাড়ী মেমারীর নিকট, নাম যোগেন্দ্রনাথ মিত্র। ইনি কলিকাতায় চাকরি করেন, কিন্তু কৃষি-কার্য্যে বিলক্ষণ সখ আছে। ধান, আলু, আখ, কত কি দ্রব্যের চাষ করিয়া থাকেন। এবার তাঁর শণের চাষ করিতে বাসনা হইয়াছিল। ভাল বীজ পাইবেন বলিয়া সরকারি কৃষি আফিসে ইনি এক পত্র লিখিলেন। পত্রে লিখিলেন যে, "মহাশয়েরা অনুগ্রহ করিয়া আমার নিকট কিছু হেম্পের বীজ পাঠাইয়া দিবেন; ইহার যাহা মূল্য হয়, আমি তাহা দিব।" বীজ আসিল। ভাল করিয়া জমিতে চাষ দিয়া, সার দিয়া বীজ বুনিলেন। চারা বাহির হইল। কিন্তু সে চারা শণের গাছের মত নয়, অন্যপ্রকার।

যোগেন্দ্র বাবু আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মহাশয়! এবার আমি শণের বীজ বুনিয়াছিলাম, কিন্তু শণের গাছ বাহির না হইয়া অন্য গাছ বাহির হইল, ইহার অর্থ কি?"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"বীজ কোথা হইতে পাইয়াছিলেন?"

তিনি বলিলেন,—"বাঙ্গালার কৃষি-আফিস হইতে লইয়াছিলাম।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"হেম্পের বীজ চাহিয়াছিলেন?"

যোগেন্দ্র বাবু উত্তর করিলেন,—"হাঁ।"

আমি বলিলাম,—"আর শণের চাষ করিয়া কাজ নাই। আস্তে আস্তে গাছগুলি গিয়া মারিয়া ফেলুন। তা না হইলে, নয়ন-চাঁদের সুবল ঘোষের যো হইবে। গাঁজার চাষ করিতেছেন বলিয়া পুলিশের টানা-হেঁচড়ায় আপনার প্রাণ যাইবে।"

গত বারের প্রবন্ধে আমি বেড়েলার কথা আরম্ভ করিয়াছিলাম। বেড়েলার গাছ হইতে চমৎকার পাট বাহির হয়। আজ বার বৎসরের কথা হইল, রাজসাহী জিলার বলিহারের রাজা কৃষ্ণেন্দ্রনারায়ণ রায় মহাশয় এই গাছের অনেকগুলি পাট দিয়াছিলেন। বিলাতে অনেক ব্যবসাদারকে আমি ঐ পাট দেখাইয়াছিলাম। তাঁহারা সকলেই ইহার প্রশংসা করিয়াছিলেন। মসিনা বা তিসির গাছ হইতে বিলাতে এক প্রকার পাট প্রস্তুত হয়। এ পাটের অনেক দাম। আমাদের দেশে তিসির গাছ হইতে কেবল তিসি হয়, পাট হয় না। কতবার ইহা হইতে পাট বাহির করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। কিন্তু যে পাট বাহির করিয়াছিলাম, তাহা ভাল নয়। তাহা হইতে কাগজ ভিন্ন অপর কোন বস্তু প্রস্তুত হইতে পারে না। বিলাতের তিসির গাছে তিসি হয় না। সেখানে লোকে কেবল পাটের জন্য ইহার চাষ করিয়া থাকে। এই পাটে উত্তম উত্তম বস্ত্র প্রস্তুত হয়। সম্প্রতি আমেরিকার লোকে তিসির গাছ হইতে বীজও উৎপন্ন করিতেছে, আবার পাটও বাহির করিতেছে। সুতরাং এক গাছ হইতে তাহারা দুইটী ফসল লাভ করিতেছে। পূর্ব্বে এ দেশ হইতে আমেরিকায় অনেক তিসি যাইত। এখন আর যায় না। কারণ, সে স্থানে লোকে তিসির গাছ হইতে এখন বীজ উৎপন্ন করিতে শিখিয়াছে।

যাহা হউক, বিলাতে তিসির পাটে উত্তম উত্তম কাপড় প্রস্তুত হয়। আমার বেড়েলার পাট দেখিয়া ব্যবসাদারেরা বলিলেন যে, ইহাতে সেইরূপ কাপড় প্রস্তুত হইতে পারে। তাহার পর ভালরূপে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত এই পাট আমি আয়ারলণ্ড দেশে বেলফাষ্ট নগরে পাঠাইয়া দিই। যাহারা তিসির পাটে কাপড় প্রস্তুত করে, তাহারা এই পাট দিয়া কাপড় বুনিয়া দেখিল, উত্তম কাপড় হইল। তাহার পর প্রশ্ন উঠিল এই যে, এ পাট কত পাওয়া যায় আর কি মূল্যে ভারতবাসীরা ইহা যোগাইতে পারে? এ কথার এখনও মীমাংসা হয় নাই। রাজা কৃষ্ণেন্দ্রনারায়ণকে আমি পত্র লিখিয়া জিজ্ঞাসা করি, প্রত্যুত্তরে তিনি লিখিলেন যে, তিনি ইহার চাষ করেন নাই। বন হইতে জমা করিয়াছিলেন। প্রতি মণ জমা করিতে তাঁহার প্রায় এক শত টাকা খরচ পড়িয়াছিল। তবেই হইল যে, ব্যবসার নিমিত্ত এ পাট এখন দুষ্প্রাপ্য। বন হইতে জমা করিতে যাইলে অতিশয় খরচ পড়ে, তাহাতে ব্যবসা চলে না। চাষ করিলে কি হয়, তাহা দেখিবার নিমিত্ত এক্ষণে চেষ্টা করিতেছি। অনেক স্থানে বীজ পাঠাইয়া দিয়াছি। বঙ্গদেশে শিবপুর, মালিপুর, ভাগলপুর, মানভুম ও আমার নিজগ্রাম রাহুতায় ইহার বীজ পাঠাইয়া দিয়াছি। মান্দ্রাজের নিকট সৈদাপেটেও ইহার বীজ দিয়াছি। পশ্চিমে সাহারণপুরেও ইহার চাষ করিতে

চিন্তাশক্তি ও সূক্ষ্মদৃষ্টি বিশেষ প্রশংসনীয়; কিন্তু তাঁহার ভাষা ও লিপিকুশলতার প্রশংসা আমরা করিতে পারিলাম না। সৃষ্টিরহস্য বিশ্লেষণ-ব্যাখ্যা করাই তাঁহার উদ্দেশ্য; এই মূল সূত্র অবলম্বন করিয়া তিনি অনেক কথারই অবতারণা করিয়াছেন। সুতরাং, যেমন ভাবে বলিলে পাঠকের চিত্তাকর্ষক হয়, ভাষার জটিলতা নিবন্ধন, গুছাইয়া তেমন করিয়া তিনি সকল কথা বলিতে পারেন নাই। যাহাই হউক, পাশ্চাত্য-ভাব-প্লাবিত এই বাঙ্গালা দেশে আজিকার দিনে এই সকল জ্ঞান-গর্ভ কথা যদি দু' দণ্ডও কেহ কাণ পাতিয়া শুনে তবে লেখকের শ্রম সার্থক হয়। 'চাঁদরাণীর ন্যায়' 'নিদর্শনের' মূল্যও বড় অধিক হইয়াছে;—দুই টাকার স্থলে এক টাকা করিলেই সঙ্গত হয়।

রামলীলোদয়। শ্রীযুক্ত দেবনাথ মুখোপাধ্যায় কৃত অনুবাদিত। মূল্য ॥০ আনা। এই গ্রন্থখানি ভাটপাড়া নিবাসী ৺ রামকান্ত সার্ব্বভৌম কৃত রামলীলোদয় নামক সংস্কৃত গ্রন্থের বাঙ্গালা অনুবাদ। অতি সংক্ষেপে সাঙকাণ্ড রামায়ণের স্থূল মর্ম্ম বর্ণিত হইয়াছে। অনুবাদের ভাষা তেমন মনোজ্ঞ ও সরস নহে। তবে অনুবাদকের সাধু-উদ্যমের প্রশংসা করিতে আমরা প্রস্তুত।

ভক্তি-সূত্রম্। শ্রীযুক্ত শ্যামালাল গোস্বামী কৃত বঙ্গানুবাদ ও তাহার তাৎপর্য্য সহিত। মূল্য ৵০ আনা। দেবর্ষি নারদকৃত ভক্তি-সূত্র এক অপূর্ব্ব বস্তু। গোস্বামী মহাশয় বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে দেবর্ষির সেই অমৃতলহরী সরল গদ্যে অনুবাদ করিয়াছেন। অনুবাদ পড়িয়া সুখী হইলাম।

শ্রীশ্রীগীত-গোবিন্দ। বাঙ্গালা পদ্য-অনুবাদ। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রণীত ও প্রকাশিত। শ্রীজয়দেবের সুধার সমুদ্র "গীত-গোবিন্দ" বাঙ্গালীর এক গৌরবের জিনিষ। এমন "নিতুই নব" গীতি-কবিতার পদ্যানুবাদ করা বড়ই কঠিন। আহ্লাদের কথা, অনুবাদকদ্বয় অনেকাংশে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। দুই একটী অনুবাদ সত্য সত্যই "কাণের ভিতর দিয়া মরমে" প্রবেশ করে। এরূপ গ্রন্থের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়!

প্রেমানন্দ-লহরী। প্রথম খণ্ড। বহুবাজার হিন্দু-ধর্ম্ম-প্রচার-সমিতির তত্ত্বাবধারক শ্রীযুক্ত কানাইলাল দে প্রণীত ও উক্ত সমিতি হইতে প্রকাশিত। মূল্য ৵০ এক আনা। হরিনামের এমনই গুণ যে, যেমনই করিয়া নাম গান কর না, চিত্তাকর্ষক হইবে! দে মহাশয় নামের মহিমা বর্ণন, তাই তিনি সাধা-গলায় সেই রাধানাথের নামগান করিয়াছেন। এবং সেই নামগান করিতে করিতে সরল প্রাণে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেছেন,—

"মজা'লি মজা'লি রে মন আমারে মজালি রে।
আমারি অন্তরে থেকে আমায় দাগা দিলি রে।

প্রসঙ্গমালা। (সচিত্র) শ্রীযুক্ত হরনাথ বসু প্রণীত। কলিকাতা, ২০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরীতে প্রাপ্তব্য। মূল্য ।০ আনা। গ্রন্থকার বিজ্ঞাপনে লিখিতেছেন, "প্রসঙ্গমালা সরলমতি বালকদিগের উপযোগী করিয়া লিখিত হইল। ভরসা করি, ইহা বালকদিগের নীতিজ্ঞানের উদ্দীপক হইবে।" লেখকের এ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। বস্তুতঃ, ইহা পাঠে বালকেরা আমোদের সহিত নীতিজ্ঞান শিক্ষা করিতে পারিবে। গ্রন্থের ভাষাও বেশ সরল।

জন্মভূমি।

৫ম ভাগ। } আশ্বিন। ১৩০২। { ১০ম সংখ্যা।

ভৈরবী।

গত ফাল্গুন মাসের জন্মভূমিতে আমরা উত্তর-কাশী সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য অনেক কথার অবতারণা করিয়াছিলাম। আজ উত্তর-কাশীতে আমার জীবনের একটী ঘটনার কথা উল্লেখ করিব। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, উত্তর-কাশীতে অতি কদাচিৎ, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, মুমুক্ষু সাধু-সন্ন্যাসী ভিন্ন অন্য লোকের সমাগম হয় না। গৃহস্থ ভদ্র লোকের মধ্যে যদি কেহ কখন এই পুণ্যতীর্থে উপস্থিত হন, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, তীর্থ ভ্রমণকেই তিনি জীবনের একমাত্র অবলম্বন করিয়া তুলিয়াছেন এবং ভগবানের চিন্তায় সমস্ত শারীরিক কষ্ট বিসর্জ্জন করিতে সক্ষম হইয়াছেন। জীবনের কোন্ পুণ্যফলে বলিতে পারি না, কয়েকজন সাধু সন্ন্যাসীর সহিত আমিও বিশ্বেশ্বরের সেই মহিমা-মণ্ডিত সুপবিত্র পীঠতলে সমাগত হইয়াছিলাম। ভক্তি ও প্রীতিতে যে হৃদয় পূর্ণ ছিল তাহা নহে, শান্তিহীন তৃষিত জীবন লইয়া আমি ক্ষুব্ধভাবে দেশে দেশে পরিভ্রমণ করিয়াছিলাম। শান্তির অন্বেষণে আমি কোথায় না গিয়াছি? আত্মীয় স্বজন বেষ্টিত, নদী-মেখলা, শস্য-শ্যামলা বঙ্গের সমতল ভূমি ত্যাগ করিয়া উত্তর পশ্চিম প্রদেশের অনুর্ব্বর মরুভূমিতে, পঞ্জাবের বন্ধুর পার্ব্বত্য পথে, হিমালয়ের চির তুষারাচ্ছন্ন উন্নত শৃঙ্গমালায়, অনন্ত অন্ধকার-পরিপূর্ণ নিবিড় অরণ্যের চির মর্ম্মর মুখরিত নির্জ্জন উপত্যকায় অশান্ত হৃদয়ে ভ্রমণ করিয়াছি। পথে যখন বাহির হই, তখন যে একটা গন্তব্য স্থান স্থির করিয়া বাহির হই তাহা নহে, চলিতে চলিতে যেখানে গিয়া পরিশ্রান্ত হই, সেখানেই বিশ্রাম করিতে বসি, সেখান হইতে অগ্রসর হইতে আর ইচ্ছা হয় না।

এইরূপ লক্ষ্যহীন ভাবে গঙ্গোত্রীর পথ দিয়া চলিতে চলিতে একবারে উত্তর-কাশীতে আসিয়া পড়িয়াছিলাম। তীর্থস্থানের এমন একটী মহিমা আছে যে, হৃদয় যতই অশান্ত ও চঞ্চল হউক, সেখানে উপস্থিত হইলেই তাহা একটী সুপবিত্র সংযতভাবে পূর্ণ হইয়া উঠে। কারণ কি তাহা জানি না এবং অন্য লোকে যে কারণ নির্দ্দেশ করিবে, তাহার সহিত আমার মতভেদ হওয়াও আশ্চর্য্য নহে; কিন্তু আমার মনে হয়, সংসার আসক্তিপূর্ণ, তীর্থ-সমূহ আসক্তি-বর্জ্জিত। অনেক সময় অশান্তির মূলই আসক্তি। জগতের অনন্ত আসক্তি-স্রোত যখন আমাদিগকে নৈরাশ্যের জ্বালাময় মহাসমুদ্রের দিকে টানিয়া

লইয়া যায়, সেই সময় যদি আমরা একটী পবিত্র তীর্থে উপস্থিত হইতে পারি, তাহা হইলে সেই তীর্থ স্থানের প্রভাব, সমাগত সাধু ও সন্ন্যাসীগণের ধর্ম্মালোচনা, সাধারণের ভক্তি, নিষ্ঠাভক্ত হৃদয়ের নিষ্কাম প্রার্থনা—মানব হৃদয়ে একটী অপার্থিব ভাবের বিকাশ করিতে পারে। বোধ হয় হৃদয়কে প্রস্তুত করাই তীর্থভ্রমণের প্রধান উদ্দেশ্য। শুনিয়াছি এক একটী তীর্থে উপস্থিত হইয়া ভক্তগণ সেই তীর্থেশ্বরের নিকট এক একটী পদার্থ উপহার দিয়া আসেন। পুরুষোত্তমে অনেককে আম, আতা, আনারস প্রভৃতি ফল দিয়া আসিতে শুনা যায়। জীবনে তাঁহারা আর সে ফল স্পর্শ করেন না। কিন্তু এইরূপ সামান্য ফল উপহার দিলেই কি জীবনের উদ্দেশ্য সার্থক হয়? আমার মনে আছে, আমার একটী বন্ধুর কোন গুরুলোক উত্তর পশ্চিম প্রদেশের একটী প্রধান তীর্থে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহার হৃদয়টী বেশ ধর্ম্ম-প্রবণ। তীর্থদর্শনের পর তিনি কয়েকজন সাধু-সন্ন্যাসী সন্দর্শনের জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া উঠেন। অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু প্রকৃত সাধুদর্শন তাঁহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিল না। এক দিন তিনি নিকটবর্ত্তী কোন পর্ব্বতের অরণ্যময় নিভৃত প্রদেশে সান্ধ্য-শোভা নিরীক্ষণ করিতে গিয়াছেন, প্রত্যাগমন কালে দেখিতে পাইলেন, একজন বৃদ্ধ সন্ন্যাসী পাষাণ বদ্ধ গিরি নদীর তীরে একটী বৃক্ষতলে উপবেশন পূর্ব্বক অস্তোন্মুখ সূর্য্যের পশ্চিম লোহিতাভার দিকে দৃষ্টি সন্নিবদ্ধ করিয়া সন্ধ্যাবন্দনা করিতেছেন। পূর্ব্বোক্ত ভদ্র লোকটী তাঁহার নিকট আসিয়া বিনীতভাবে তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন, সন্ন্যাসী তাঁহাকে আসন গ্রহণ করিতে ইঙ্গিত করিয়া সন্ধ্যাবিধি শেষ করিলেন। অনন্তর তাঁহাকে এই দূর দেশে আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন যে, পবিত্রতা ও শান্তিলাভের আশায় তিনি এই তীর্থে সমাগত হইয়াছেন, একজন প্রকৃত সাধুর চরণ দর্শনও তাঁহার জীবনের অন্যতম কামনা ছিল,—আজ তাহাও পূর্ণ হইল। সেই নির্জ্জন শিলাতলে উপবেশন করিয়া অনেক আধ্যাত্মিক বিষয়ের অবতারণা করিলেন। আত্মা কি, নির্ব্বাণ কোথায়, কিরূপে মুক্তিলাভ হয়, ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করার পর সন্ন্যাসী সেই ভদ্র লোককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি তীর্থ স্থানে আসিয়াছেন, তীর্থ স্থলে আসিয়া ভগবচ্চরণে কোন্ দ্রব্য নিবেদন করিয়া দিলেন?',

ভদ্রলোক উত্তর দিলেন, "নারিকেল।"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "প্রকৃত উদ্দেশ্য না বুঝিয়া আপনারা কাজ করেন, শান্তিলাভ করিতেও পারেন না, তীর্থের প্রতি শ্রদ্ধাও লুপ্ত হইয়া যায়। একি খেলা?—আপনি নারিকেল উৎসর্গ করিয়া গেলেন,—যে কয়দিন বাঁচিবেন, নারিকেল খাইবেন না,—ইহাতে সংসারের ক্ষতি বৃদ্ধি কি?"

ভদ্রলোকটী যুক্তকরে বলিলেন, "কি করিব, আপনি অনুমতি করুন।"

সন্ন্যাসী। আমাকে একটী দ্রব্য দান করুন।

দর্শক। আমি ধনবান নহি, তথাপি আমার যাহা কিছু আছে, অনুমতি করিলে তাহা সাধুসেবায় সমর্পণ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি।

সন্ন্যাসী। বালক, আমি পার্থিব অর্থের প্রত্যাশী নহি।

দর্শক। প্রভু, আমার এমন কি অপার্থিব পদার্থ আছে যে, আপনাকে দান করিতে পারি!

সন্ন্যাসী। আছে বৎস, কিছু দান করিতে পারিবে কি? ভরসা করি, তাহা হইলে তোমার

তীর্থভ্রমণের উদ্দেশ্য কথঞ্চিৎ পরিমাণে সিদ্ধ হইবে।

দর্শক ভদ্রলোকটি কম্পিত-দেহে বলিলেন, "অনুমতি করুন।"

সন্ন্যাসী তখন নেই নির্ম্মল, নিস্তব্ধ সান্ধ্য-আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "তোমার হৃদয়ে যে ক্রোধ আছে, তাহাই আমাকে দান করিয়া যাও। ভবিষ্যতে তুমি আর তাহা ব্যবহার করিতে পারিবে না"

কিয়ৎকাল চিন্তার পর ভদ্র লোকটী বলিলেন "প্রভু, আমাকে বিষম পরীক্ষায় ফেলিলেন, আমি ইহাতে অক্ষম;—সংসারে প্রতিদিন কত অধম চরিত্র ব্যক্তির সহিত ব্যবহার করিতে হয়, জীবনে কাহারো উপর ক্রুদ্ধ হইব না, কিরূপে এ প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইব!"

সন্ন্যাসী। তবে লোভ?

"তাহাও পারি না, জীবনের সহিত আসক্তি বিজড়িত, আসক্তি থাকিলে লোভও থাকিবে। যদি আসক্তিতে জলাঞ্জলি দিতে পারিতাম, তবে আর সেই মর্ত্তের ধূলিরাশির মধ্যে ফিরিতে চাহিতাম না। আপনার পদপ্রান্তই সার করিতাম। কিন্তু আসক্তি-বিহীন হওয়া আমাদের ন্যায় সংসারীর কাজ নহে। আমাকে আর পরীক্ষায় ফেলিবেন না,—অগ্রমি লোভকেও জীবনের মত পরিত্যাগ করিতে অক্ষম।"

সন্ন্যাসী। অহঙ্কার ত্যাগ করিয়া যাও।

দর্শক। সংসারীর পক্ষে এ দুর্দ্দান্ত রিপুকেও ত্যাগ করা অতি কঠিন। জীবনে এক এক সময়ে অবশ্য এমন অবস্থা ঘটে, যখন আমাদের গর্ব্বোন্নত মস্তক ভূমিলুণ্ঠন করে; তখনই আমাদের হৃদয়ে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বেদনা অনুভূত হয়। অহঙ্কারে সামান্য আঘাত লাগিলে যখন আমরা এত কষ্ট অনুভব করি, তখন সেই অহঙ্কারকে পরিত্যাগ করিয়া কিরূপে কাজ করিব?

সন্ন্যাসী। তাই সংসারে থাকিয়াও যাহারা সন্ন্যাসী, তাহাদের ব্রত আরও উচ্চ, আরও কঠিন। বৎস, গৃহে ফিরিয়া যাও। বৃথা তুমি তীর্থ-দর্শন করিতে আসিয়াছিলে। এরূপ উদাসীন ভাবে লক্ষ তীর্থ ভ্রমণ করিয়াও কোন ফল নাই।

কামনা ত্যাগ করিতে পারি নাই, তাই বুঝি এত তীর্থ ঘুরিয়াও শান্তি লাভ হইল না। কোন নূতন তীর্থে আসিলে সেখানকার বৈচিত্রের মধ্যে দুই দিন বেশ মুগ্ধ থাকি; দুই দিন প্রীতিপ্রফুল্ল কোমলভাব হৃদয় পূর্ণ করিয়া রহিল; তাহার পর ক্ষুব্ধ হৃদয়ের সেই তৃষিত ক্রন্দন—অবিরাম হাহাকার!

উত্তর-কাশীতে তিনদিন ছিলাম। প্রথম দিন বেশ কাটিয়া গেল। সমস্তদিন চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া যাহা কিছু দেখিবার, সমস্ত দেখিলাম। সেখানকার মন্দির এবং পার্ব্বত্য নদী, বৃক্ষরাজীপূর্ণ কানন প্রদেশ এবং পার্ব্বত্য অধিবাসীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীর, দূর পর্ব্বতে অনন্ত-তুষার স্তূপ, সমস্ত দেখিয়া একটী পুরাতন শিব-মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। মন্দিরটী পুরাতন হইলেও পরিত্যক্ত নহে, একজন লোক প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় আসিয়া প্রদীপ জ্বালিয়া মন্দিরমধ্যস্থ শিবলিঙ্গের আরতি করে, অনন্তর দ্বার রুদ্ধ করিয়া চলিয়া যায়। পশ্চিম দেশে ছোটবড় যত শিব-মন্দির দেখিয়াছি, তাহার সকল গুলির বহির্দ্দেশেই গাড়ী বারান্দার ন্যায় একটা করিয়া বারান্দা থাকে। আমি সেই বারান্দায় আশ্রয় লইলাম, এখানে রাত্রিও অতিবাহিত করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলাম, সুতরাং সেই প্রকার আয়োজন করিয়া লইতে হইল।

সন্ধ্যার সময় যথারীতি আরতি শেষ করিয়া পূজারী ব্রাহ্মণ মন্দির ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। একে কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার রাত্রি,

লইয়া যায়, সেই সময় যদি আমরা একটী পবিত্র তীর্থে উপস্থিত হইতে পারি, তাহা হইলে সেই তীর্থ স্থানের প্রভাব, সমাগত সাধু ও সন্ন্যাসীগণের ধর্ম্মালোচনা, সাধারণের ভক্তি, নিষ্ঠাভক্ত হৃদয়ের নিষ্কাম প্রার্থনা—মানব হৃদয়ে একটী অপার্থিব ভাবের বিকাশ করিতে পারে। বোধ হয় হৃদয়কে প্রস্তুত করাই তীর্থভ্রমণের প্রধান উদ্দেশ্য। শুনিয়াছি এক একটী তীর্থে উপস্থিত হইয়া ভক্তগণ সেই তীর্থেশ্বরের নিকট এক একটী পদার্থ উপহার দিয়া আসেন। পুরুষোত্তমে অনেককে আম, আতা, আনারস প্রভৃতি ফল দিয়া আসিতে শুনা যায়। জীবনে তাঁহারা আর সে ফল স্পর্শ করেন না। কিন্তু এইরূপ সামান্য ফল উপহার দিলেই কি জীবনের উদ্দেশ্য সার্থক হয়? আমার মনে আছে, আমার একটী বন্ধুর কোন গুরুলোক উত্তর পশ্চিম প্রদেশের একটী প্রধান তীর্থে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহার হৃদয়টী বেশ ধর্ম্ম-প্রবণ। তীর্থদর্শনের পর তিনি কয়েকজন সাধু-সন্ন্যাসী সন্দর্শনের জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া উঠেন। অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু প্রকৃত সাধুদর্শন তাঁহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিল না। এক দিন তিনি নিকটবর্ত্তী কোন পর্ব্বতের অরণ্যময় নিভৃত প্রদেশে সান্ধ্য-শোভা নিরীক্ষণ করিতে গিয়াছেন, প্রত্যাগমন কালে দেখিতে পাইলেন, একজন বৃদ্ধ সন্ন্যাসী পাষাণ বদ্ধ গিরি নদীর তীরে একটী বৃক্ষতলে উপবেশন পূর্ব্বক অস্তোন্মুখ সূর্য্যের পশ্চিম লোহিতাভার দিকে দৃষ্টি সন্নিবদ্ধ করিয়া সন্ধ্যাবন্দনা করিতেছেন। পূর্ব্বোক্ত ভদ্র লোকটী তাঁহার নিকট আসিয়া বিনীতভাবে তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন, সন্ন্যাসী তাঁহাকে আসন গ্রহণ করিতে ইঙ্গিত করিয়া সন্ধ্যাবিধি শেষ করিলেন। অনন্তর তাঁহাকে এই দূর দেশে আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন যে, পবিত্রতা ও শান্তিলাভের আশায় তিনি এই তীর্থে সমাগত হইয়াছেন, একজন প্রকৃত সাধুর চরণ দর্শনও তাঁহার জীবনের অন্যতম কামনা ছিল,—আজ তাহাও পূর্ণ হইল। সেই নির্জ্জন শিলাতলে উপবেশন করিয়া অনেক আধ্যাত্মিক বিষয়ের অবতারণা করিলেন। আত্মা কি, নির্ব্বাণ কোথায়, কিরূপে মুক্তিলাভ হয়, ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করার পর সন্ন্যাসী সেই ভদ্র লোককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি তীর্থ স্থানে আসিয়াছেন, তীর্থ স্থলে আসিয়া ভগবচ্চরণে কোন্ দ্রব্য নিবেদন করিয়া দিলেন ?',

ভদ্রলোক উত্তর দিলেন, "নারিকেল।"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "প্রকৃত উদ্দেশ্য না বুঝিয়া আপনারা কাজ করেন, শান্তিলাভ করিতেও পারেন না, তীর্থের প্রতি শ্রদ্ধাও লুপ্ত হইয়া যায়। একি খেলা?—আপনি নারিকেল উৎসর্গ করিয়া গেলেন,—যে কয়দিন বাঁচিবেন, নারিকেল খাইবেন না,—ইহাতে সংসারের ক্ষতি বৃদ্ধি কি ?"

ভদ্রলোকটী যুক্তকরে বলিলেন, "কি করিব, আপনি অনুমতি করুন।"

সন্ন্যাসী। আমাকে একটী দ্রব্য দান করুন।

দর্শক। আমি ধনবান নহি, তথাপি আমার যাহা কিছু আছে, অনুমতি করিলে তাহা সাধুসেবায় সমর্পণ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি।

সন্ন্যাসী। বালক, আমি পার্থিব অর্থের প্রত্যাশী নহি।

দর্শক। প্রভু, আমার এমন কি অপার্থিব পদার্থ আছে যে, আপনাকে দান করিতে পারি!

সন্ন্যাসী। আছে বৎস, কিছু দান করিতে পারিবে কি? ভরসা করি, তাহা হইলে তোমার তীর্থভ্রমণের উদ্দেশ্য কথঞ্চিৎ পরিমাণে সিদ্ধ হইবে।

দর্শক ভদ্রলোকটি কম্পিত-দেহে বলিলেন, "অনুমতি করুন।"

সন্ন্যাসী তখন নেই নির্ম্মল, নিস্তব্ধ সান্ধ্য-আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "তোমার হৃদয়ে যে ক্রোধ আছে, তাহাই আমাকে দান করিয়া যাও। ভবিষ্যতে তুমি আর তাহা ব্যবহার করিতে পারিবে না"

কিয়ৎকাল চিন্তার পর ভদ্র লোকটী বলিলেন "প্রভু, আমাকে বিষম পরীক্ষায় ফেলিলেন, আমি ইহাতে অক্ষম;—সংসারে প্রতিদিন কত অধম চরিত্র ব্যক্তির সহিত ব্যবহার করিতে হয়, জীবনে কাহারো উপর ক্রুদ্ধ হইব না, কিরূপে এ প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইব!"

সন্ন্যাসী। তবে লোভ ?

"তাহাও পারি না, জীবনের সহিত আসক্তি বিজড়িত, আসক্তি থাকিলে লোভও থাকিবে। যদি আসক্তিতে জলাঞ্জলি দিতে পারিতাম, তবে আর সেই মর্ত্তের ধূলিরাশির মধ্যে ফিরিতে চাহিতাম না। আপনার পদপ্রান্তই সার করিতাম। কিন্তু আসক্তি-বিহীন হওয়া আমাদের ন্যায় সংসারীর কাজ নহে। আমাকে আর পরীক্ষায় ফেলিবেন না,—আমি লোভকেও জীবনের মত পরিত্যাগ করিতে অক্ষম।"

সন্ন্যাসী। অহঙ্কার ত্যাগ করিয়া যাও।

দর্শক। সংসারীর পক্ষে এ দুর্দ্দান্ত রিপুকেও ত্যাগ করা অতি কঠিন। জীবনে এক এক সময়ে অবশ্য এমন অবস্থা ঘটে, যখন আমাদের গর্ব্বোন্নত মস্তক ভূমিলুণ্ঠন করে; তখনই আমাদের হৃদয়ে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বেদনা অনুভূত হয়। অহঙ্কারে সামান্য আঘাত লাগিলে যখন আমরা এত কষ্ট অনুভব করি, তখন সেই অহঙ্কারকে পরিত্যাগ করিয়া কিরূপে কাজ করিব ?

সন্ন্যাসী। তাই সংসারে থাকিয়াও যাহারা সন্ন্যাসী, তাহাদের ব্রত আরও উচ্চ, আরও কঠিন। বৎস, গৃহে ফিরিয়া যাও। বৃথা তুমি তীর্থ-দর্শন করিতে আসিয়াছিলে। এরূপ উদাসীন ভাবে লক্ষ তীর্থ ভ্রমণ করিয়াও কোন ফল নাই।

কামনা ত্যাগ করিতে পারি নাই, তাই বুঝি এত তীর্থ ঘুরিয়াও শান্তি লাভ হইল না। কোন নূতন তীর্থে আসিলে সেখানকার বৈচিত্রের মধ্যে দুই দিন বেশ মুগ্ধ থাকি; দুই দিন প্রীতিপ্রফুল্ল কোমলভাব হৃদয় পূর্ণ করিয়া রহিল; তাহার পর ক্ষুব্ধ হৃদয়ের সেই তৃষিত ক্রন্দন—অবিরাম হাহাকার!

উত্তর-কাশীতে তিনদিন ছিলাম। প্রথম দিন বেশ কাটিয়া গেল। সমস্তদিন চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া যাহা কিছু দেখিবার, সমস্ত দেখিলাম। সেখানকার মন্দির এবং পার্ব্বত্য নদী, বৃক্ষরাজীপূর্ণ কানন প্রদেশ এবং পার্ব্বত্য অধিবাসীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীর, দূর পর্ব্বতে অনন্ত-তুষার স্তূপ, সমস্ত দেখিয়া একটী পুরাতন শিব-মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। মন্দিরটী পুরাতন হইলেও পরিত্যক্ত নহে, একজন লোক প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় আসিয়া প্রদীপ জ্বালিয়া মন্দিরমধ্যস্থ শিবলিঙ্গের আরতি করে, অনন্তর দ্বার রুদ্ধ করিয়া চলিয়া যায়। পশ্চিম দেশে ছোটবড় যত শিব-মন্দির দেখিয়াছি, তাহার সকল গুলির বহির্দ্দেশেই গাড়ী বারান্দার ন্যায় একটা করিয়া বারান্দা থাকে। আমি সেই বারান্দায় আশ্রয় লইলাম, এখানে রাত্রিও অতিবাহিত করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলাম, সুতরাং সেই প্রকার আয়োজন করিয়া লইতে হইল।

সন্ধ্যার সময় যথারীতি আরতি শেষ করিয়া পূজারী ব্রাহ্মণ মন্দির ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। একে কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার রাত্রি,

"প্রভুনীশমনীশমশেষগুণং
গুণহীনমহীশগণাভরণম্।"

গানটী অবশ্য সকলেই জানেন এবং ইহাতে নূতনত্বও কিছুই নাই; কিন্তু সেই অন্ধকার রাত্রে হিমালয়ের নিভৃত বক্ষস্থলে, এক জীর্ণ মন্দিরের মধ্যে বসিয়া ভৈরবী যে সুরে এই গান গাহিতে লাগিলেন; তাহা অনির্ব্বচনীয়। সঙ্গীতের সুর অপরিচিত নহে, বাল্যকালে 'ভারত উদ্ধারের' কল্যাণে দলপতিগণের সহিত মিশিয়া গ্রামে গ্রামে "কত কাল পরে বল ভারত রে" গাহিয়া বেড়াইয়াছি, এ সেই সুরই বটে। কিন্তু আজ যাহা শুনিলাম, তাহা সম্পূর্ণ নূতন। প্রথমে অতি ধীরে সেই সঙ্গীতধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল; তাহা সরোবরের নিস্তরঙ্গ, নীল জলের উপর নিশ্বাসস্পর্শের ন্যায় অতি মৃদু, অতি কোমল। বীণার প্রথম ঝঙ্কার যেমন ললিত, নব বধূর প্রথম প্রেমসম্ভাষণ যেমন স্নিগ্ধ এবং সঙ্কোচপূর্ণ, সন্ন্যাসিনীর কণ্ঠনিঃসৃত সঙ্গীতের প্রথম উচ্ছ্বাস সেইরূপ অতি ধীর এবং মন্থর। কিন্তু ক্রমে সেই স্বর উচ্চ হইতে উচ্চতর হইতে লাগিল, গ্রাম হইতে গ্রামে উঠিতে লাগিল, তাহার গম্ভীর ঝঙ্কারে সেই স্তব্ধ, বিজন পার্ব্বত্যভূমি পরিপূর্ণ হইয়া গেল। বোধ হইতে লাগিল, এই নিদ্রাহীন রাত্রি মহেশ্বরের স্তুতিগানে আপনাকে বিসর্জ্জন করিয়া দিয়াছে। কোমল নারীকণ্ঠের এমন তেজ আমি আর কখন শুনি নাই। আমি আত্মহারা হইয়া গান শুনিতে লাগিলাম। সঙ্গীতে যে হৃদয়কে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া দিতে পারে, তাহা বুঝিতে পারিলাম।

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ভৈরবী গান করিলেন, ক্রমে তাহা শেষ হইয়া আসিল। বোধ হইতে লাগিল, যেন গান ঘুমাইয়া পড়িতেছে,—যেমন উঠিয়াছিল, তেমনি ধীরে ধীরে গ্রামে গ্রামে নামিয়া তাহা দূর হইতে দূরান্তরে মিশিয়া গেল। এমন ধীরে বাতাশে মিশাইয়া গেল যে, মানুষের শিক্ষিত কণ্ঠের পক্ষে তাহা অতি অসম্ভব, শুধু কোন কোন বাদ্য যন্ত্রের পক্ষেই তাহা সম্ভব। গান থামিয়া গেলেও আমার মনে হইল, নৈশ প্রকৃতি তখনও প্রতিধ্বনিত হইতেছে এবং সঙ্গীততরঙ্গ সমস্ত মরজগৎ প্লাবিত করিয়া ঊর্দ্ধে বিশ্বেশ্বরের অনাদি সিংহাসনের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে।

সন্ন্যাসিনীর কণ্ঠস্বর, পশ্চিমদেশীয়া রমণীর কণ্ঠস্বরের ন্যায় নহে। সঙ্গীতে যে মাধুর্য্য ও কোমলতা প্রস্ফুটিত হইয়াছিল তাহা বঙ্গনারীর কণ্ঠেই সম্ভবে। গান শেষ হইলে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত রমণী স্তব্ধভাবে মন্দিরের মধ্যে বসিয়া রহিলেন অথবা সে সময় তিনি অন্য কোন কাজ করিতেছিলেন কিনা, অন্ধকারে তাহা বুঝিতে পারিলাম না। আমি সেই একইভাবে প্রাচীরে ঠেস দিয়া বসিয়া আছি।

কিয়ৎক্ষণ পরে সন্ন্যাসিনী উঠিলেন, অন্ধকারের মধ্যে ত্রিশূল গাছটি ধরিতে গিয়া তাহা 'ঝন্' করিয়া নীচে পড়িয়া গেল, ত্রিশূল তুলিয়া লইয়া তিনি বাহির হইয়া আসিতেই আমি অল্প শব্দ করিলাম। শব্দ শুনিয়াই সন্ন্যাসিনী চমকিয়া দাঁড়াইলেন। অন্ধকার না হইলে হয়ত বুঝিতে পারিতাম, তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিয়া দেখিতেছেন, কিন্তু সেই অন্ধকার মধ্যে কোথায় একজন মানুষ প্রাচীর ঘেঁসিয়া বসিয়া আছে, তাহা ঠিক ঠাওর করা কঠিন। তিনি পরিষ্কার হিন্দীতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখানে কোন লোক আছে কি?" আমি উঠিয়া দাঁড়াইয়া হিন্দীতে উত্তর দিলাম। বলিলাম, "আমি একজন পথিক, বহুদূর ঘুরিতে ঘুরিতে আসিয়া আজ এই মন্দিরে আশ্রয় লইয়াছি ভরসা করি, ইহাতে আপনার কার্য্যের কোন ব্যাঘাত হইবে না।" যাহারা বাল্যকাল হইতে পশ্চিমাঞ্চলে বাস করিতেছে, সেরূপ বাঙ্গালীর কণ্ঠস্বরও পশ্চিমাঞ্চলবাসীর কণ্ঠস্বরের অনুরূপ হয় না।

আমার উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থান তিন বৎসরের বেশী হয় নাই, সুতরাং আমার কণ্ঠস্বরে যে 'বাঙ্গালীয়ানা' ভাব আছে, তাহা সহজেই ধরা যাইতে পারে! হিন্দী বিশুদ্ধ হইতে পারে, কিন্তু সে আওয়াজ কোথায় পাইব? সন্ন্যাসিনী নিঃসঙ্কোচে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মালুম হোতা কি আপ্ বাঙ্গালী।" এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়া পরিষ্কার বাঙ্গালায় বলিলেন "কেমন, না?"—বিদেশী লোক বাঙ্গালাভাষায় যতই কেন অভিজ্ঞতা লাভ করুক না, এমন কতকগুলি কথা আছে, যাহা বাঙ্গালীর নিতান্ত নিজস্ব, তাহা বাঙ্গালীর রক্তমাংসের সহিত চির বিজড়িত। তেমন কায়দা করিয়া আর কেহ বলিতে পারে না; সুতরাং "কেমন, না?" এই কথা শুনিয়া বুঝিলাম, ভৈরবী বঙ্গদেশবাসিনী; শুধু তাহাই নহে, নদীয়া হুগলী বা চব্বিশ পরগণা অঞ্চলে যে তাঁহার বাস, তাহাও বেশ বুঝিতে পারা গেল। তখন কষ্টকল্পিত হিন্দুস্থানী ভাষাতে কথা কহিবার আর বিশেষ আবশ্যকতা দেখিলাম না। বাঙ্গালাতেই কথা কহিতে লাগিলাম। বাঙ্গালী স্ত্রীলোকের সঙ্গে বহুদিন পরে বঙ্গভাষায় কথা কহা হইল। বঙ্গভাষায়—আমার আজন্মের মাতৃভাষায় কথা কহিবার যে কি আনন্দ, তাহা হৃদয়ের সঙ্গে অনুভব করিলাম। ভৈরবী ত্রিশূল রাখিয়া মন্দিরের দ্বার যুড়িয়া চাপিয়া বসিয়া আমার সঙ্গে কথা কহিতে লাগিলেন; তাহাতে বঙ্গরমণী সুলভ কোমলতা নাই, সে সঙ্কোচ ভাবও বিলুপ্ত হইয়াছে; তিনি অসঙ্কোচে আমার সঙ্গে কথা কহিতে লাগিলেন, কিন্তু আমার কেমন লজ্জা হইতে লাগিল। হউক ভৈরবী, কিন্তু তথাপি তিনি স্ত্রীলোক। এই অন্ধকার রাত্রে অন্য জনপ্রাণী নাই, একজন রমণীর সম্মুখে বসিয়া স্বাধীনভাবে আলাপ করিতে আমার বিশেষ সঙ্কোচ বোধ হইতে লাগিল। অত্যন্ত অসচ্ছন্দতা অনুভব করিতে লাগিলাম, কিন্তু উপায় নাই, অবনত মস্তকে তাঁহার সমস্ত কথার উত্তর করিতে হইল। দুই একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সন্ন্যাসিনীর দিকে চাহিয়া দেখিলাম। অনুমানে বোধ হইল, তাঁহার বয়স ত্রিশ বত্রিশের অধিক নহে। কিন্তু অন্ধকারে বিশেষ লক্ষ্য না হইলেও বুঝিলাম, পরিপূর্ণ যৌবন তাঁহার উন্নত দেহে তরঙ্গায়িত রহিয়াছে। যেন ভাদ্রের নদী কানায় কানায় পূর্ণ, অটুট, অচঞ্চল, অন্ধকারের মধ্যেও দীর্ঘ চক্ষুর তীব্রজ্যোতি ফুটিয়া বাহির হইতেছে। তিনি সুগৌরী কি না, তাহা ঠিক বুঝিতে পারিলাম না, কিন্তু বেশ হৃষ্ট পুষ্ট, কথাগুলি অতি মিষ্ট, প্রত্যেক কথার মধ্যে যেন একটী গুপ্ত কৌতুকের ভাব নিহিত আছে। এ সন্ন্যাসিনী কে, জানিবার জন্য আমার অত্যন্ত কৌতূহল হইল, কিন্তু তিনি কি মনে করিবেন ভাবিয়া কোন কথাই জিজ্ঞাসা করিতে পারিলাম না, অবসরও হইল না; প্রশ্নের পর প্রশ্ন বর্ষণ করিয়া আমাকে বিব্রত করিয়া তুলিলেন। সন্ন্যাসিনীর এতখানি বাচালতা আমার নিকট কিঞ্চিৎ অপ্রীতিকর বোধ হইল; সংসার ত্যাগ করিয়া ভৈরবী হইলেই কি রমণীর স্বভাবসুলভ লজ্জাশীলতা পরিত্যাগ করিতে হয়? জীবনে এ পর্য্যন্ত আর কোন ভৈরবী দেখি নাই, ভৈরবীচরিত্র কি এমনই অনমনীয়? বঙ্কিম বাবুর 'সীতারামে' এক ভৈরবীর কথা অল্প দিন পূর্ব্বে পাঠ করিয়াছিলাম,—সে জয়ন্তী। জয়ন্তীর চরিত্র পাঠ করিয়া ভৈরবী শ্রেণীর উপর আমার অত্যন্ত ভক্তি এবং প্রবল বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। সেই মধুর চরিত্রের কথা মনে পড়িল,—কি তেজ অথচ কেমন কোমলতা। একদিকে যেমন উচ্চ ধর্ম্ম ভাব, অন্য দিকে তেমনই স্ত্রীজাতিসুলভ স্বভাবিক দুর্ব্বলতা;—পাপ সে দুর্ব্বলতার নামান্তর নহে, সে দুর্ব্বলতার

নাম উদার সমবেদনা, পীড়িত এবং ব্যথিতের জন্য করুণ ক্রন্দন। সেই ত ভৈরবী, এ আবার কি রকম ভৈরবী?—মনে মনে এই রূপ চিন্তা করিতে লাগিলাম, কিন্তু মুখ হইতে কোন কথাই বাহির হইল না, শুধু তাঁহার প্রশ্নেরই উত্তর দিয়া যাইতে লাগিলাম। স্থির করিলাম, অনেক দিন পরে একজন স্বদেশবাসীকে দেখিয়া, তিনি আগ্রহভরে তাঁহার সঙ্কোচ ত্যাগ করিয়াছেন। হয়ত ইহাই স্বাভাবিক!

ভৈরবী আমাকে যে সকল কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন তাহার সকল গুলিই আমার নিজের সম্বন্ধীয় কথা। কেন আমি এ বয়সে এ কঠিন সন্ন্যাস-ব্রত গ্রহণ করিলাম, কত দিন এ ব্রত পালন করিব, কোন্ কোন্ তীর্থ ভ্রমণ করিয়াছি, কোথায় বাড়ী, বাড়ীতে কে কে আছেন, ইত্যাদি ঘর-গৃহস্থালীর কথা। এ সকল কথা বাহুল্যরূপে এখানে বর্ণনা করা নিষ্প্রয়োজন,—আমার মনে কিঞ্চিৎ বিরক্তিই বোধ হইতেছিল। আমি আর স্থির থাকিতে পারিলাম না, কথা ঘুরাইয়া লইবার জন্য ধর্ম্ম, ইহকাল, পরকাল, পাপ-পুণ্য সম্বন্ধে গোটাকত কথা উত্থাপন করিলাম। যাহা উত্তর পাইলাম, তাহাতে পরিতৃপ্ত হইতে পারিলাম না, তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞান যে অধিক তাহা বোধ হইল না, তবে বুঝিলাম, গুরুতর বিষয় আলোচনা করিবার মত বেশ সংগ্রহ আছে। আমাকে শাস্ত্রালাপ করিতে শুনিয়া তিনি যেন কিঞ্চিৎ অসন্তুষ্ট হইলেন; সুতরাং আমি আর উৎসাহের সঙ্গে অধিক কথা পাড়িতে পারিলাম না। ভৈরবীও সে কথা ছাড়িয়া নিজের কথা পাড়িলেন, তাঁহার আত্ম পরিচয়ে বুঝিলাম, তাঁহার নিবাস গঙ্গাতীরে, তবে নবদ্বীপ কি শান্তিপুর, অথবা তন্নিকটবর্ত্তী অপর কোন গ্রাম, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। জেরা করিয়া একটা সঠিক উত্তর বাহির করাও সঙ্গত মনে হইল না। তিনি আজ বার বৎসর তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিতেছেন, অনেক তীর্থ-পর্য্যটন করিয়া আজ কয়েক দিন উত্তর কাশীতে আসিয়াছেন। এই স্থানে আমার একটু বেয়াদবী প্রকাশ হইল, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কি বিধবা?" ভৈরবী একটু হাসিয়া উত্তর করিলেন "না।" না শুনিয়া আমি অবাক্ হইয়া রহিলাম। তিনি বিধবা নহেন, কিন্তু স্বামীর সম্বন্ধে কোন কথাই এ পর্য্যন্ত উল্লেখ করেন নাই, স্বামী সঙ্গে থাকিলে একটা না একটা কথাতে তাহা প্রকাশ হইয়া পড়িত, অথচ স্বামীকে গৃহে রাখিয়া কোন্ পতিব্রতা, লক্ষ্মীপত্নী এইরূপভাবে দেশবিদেশে একাকিনী ঘুরিয়া বেড়াইতে পারে? বিশেষতঃ এরূপ সন্ন্যাসব্রত কোন প্রকারেই ধর্ম্মনীতি-সঙ্গত নহে। শাস্ত্রের কথা অধিক বলিতে পারি না, কিন্তু বোধ হয় সধবা রমণীর পক্ষে এই পথ অবলম্বন কোন শাস্ত্রেরই অনুমোদনীয় নহে; এমন অশাস্ত্রীয় কার্য্যে তাঁহার কিরূপে প্রবৃত্তি হইল, তাহাও বুঝিতে পারিলাম না। অধিকতর বিস্ময়ের সঙ্গে সন্ন্যাসিনীর মুখের দিকে চাহিতে লাগিলাম। এ ভৈরবী কি মায়াবিনী!

সন্ন্যাসিনী যখন 'না' বলিয়াছিল, তখন সে কথাটি যে মৃদু-হাস্যের সহিত অধর-প্রান্তে বহির্গত হইয়াছিল, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছিলাম নৈশ অন্ধকার সেই হাস্য গোপন করিতে পারে নাই। বলিতে কি, এই হাসি আমার নিকট অতি কদর্য্য বলিয়া বোধ হইয়াছিল। আমার মন নানাপ্রকার সন্দেহে আন্দোলিত হইতে লাগিল। হাসিতে অতি উচ্চ-ভাব প্রকাশ করে। সরল স্নিগ্ধ হাস্য অতি মধুর এবং পবিত্র, কিন্তু সময় ও অবস্থা অনুসারে হাস্যও অতি বীভৎস্যভাব ধারণ করে। ভৈরবীর হাস্যও সেই নীচ শ্রেণীর হাস্য বলিয়া অনুমান হইল। পাঠক দেখিবেন, আমার অনুমান মিথ্যা নহে।

আমার অতি দুর্ভাগ্য যে, সেই রাত্রে এই পুণ্যতীর্থে ভৈরবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়াছিল। ভৈরবী অসঙ্কোচে আমার সম্মুখে বসিয়া তাহার কলুষ জীবনের উপাখ্যান বর্ণনা করিতে লাগিল; স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করিয়া সে পর-পুরুষের সঙ্গে কুলত্যাগ করে এবং কাশীতে আসে। কাশীতে আসিয়া তাহার প্রণয়ী তাহাকে একাকিনী রাখিয়া পলায়ন করে, উপায়ান্তর না দেখিয়া সে অপর একজন পুরুষের সাহায্য গ্রহণ করে এবং তাহাকে লইয়া ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভ্রমণ করে। শেষে সেও তাহাকে পরিত্যাগ করিল। তখন সে একটী তীর্থস্থানে একজন সন্ন্যাসীর আশ্রয় লইল. সন্ন্যাসী তাহাকে সঙ্গে করিয়া বিন্ধ্যাচলে আসে এবং সেখানে আসিয়া তাহাকে ভৈরবী মন্ত্রে দীক্ষিত করে। সেই হইতে রমণী ভৈরবী হইয়াছে, এখন আর তাহার মনে কোন লজ্জা বা ভয় নাই, তাহার পাপ-পুণ্য বিচারও নাই। এই সমস্ত কথা বলিয়া সেই পাপীয়সী পাপ-পুণ্যের হিসাব দিতে বসিল; বলিল,—সংসারে পাপ বা পুণ্য কিছুই নাই, যাহাদের হৃদয় দুর্ব্বল তাহারাই পাপ-পুণ্যে বিচলিত হয়; ক্ষমতাশীল লোক পাপ পুণ্যকে করতলগত করিয়া তদ্দ্বারা পৃথিবী শাসন করে। যে ধর্ম্মভীরু, তাহাকে পুণ্যের প্রলোভনে বশ করে,—যে পাপী, তাহাকে পাপ-প্রলোভনে প্রলোভিত করিয়া প্রবৃত্তির স্রোতে ভাসাইয়া আপনার ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখে। একজন ধার্ম্মিক-ভক্ত তাহার মধুর সঙ্গীতে মুগ্ধ হইয়া যায়। ভগবৎপ্রেমে তাহার হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠে, আবার যে প্রলোভনের দাস, সংসারের সর্ব্ব-প্রকার পাপ এবং জঘন্য কর্ম্ম যে অসংকুচিত-চিত্তে সম্পন্ন করিতে পারে, সামান্য অঙ্গুলি-সঙ্কেতে তাহাকেও দাসানুদাসের ন্যায় নিজের অভীষ্টকার্য্যে নিযুক্ত করিতে পারে। রমণীর মুখে যাহা শুনিলাম, তাহাতে স্তম্ভিত হইয়া পড়িলাম। এই প্রকার পাপ-মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া যাহারা সংসারের বাহির হয়, তাহাদের দ্বারা জগতের কি অনিষ্টই না ঘটিতে পারে? এ ত ভৈরবী নহে, পিশাচী। আমাকে কেহ ভীরু বলিতে পারেন, কিন্তু আমার মনে বাস্তবিকই অত্যন্ত ভয়ের সঞ্চার হইতেছিল, তাহার পর কথা শুনিতে শুনিতে সেই শীতের মধ্যেও আমার শরীর ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিল। নানা দেশ ভ্রমণ করিয়াছি, কত সময় কত বিপদে পড়িয়াছি, কিন্তু এমন নির্জ্জন স্থানে অন্ধকার রাত্রে এমন পিশাচীর সম্মুখীন হইতে হয় নাই।

রাত্রি ক্রমে অধিক হইতে লাগিল, কিন্তু ভৈরবী তখনও উঠিতে চাহে না। যাহার মধুর সঙ্গীতে কিছুকাল পূর্ব্বে আমি মুগ্ধ হইয়াছিলাম, স্তব্ধভাবে তাহার পাপ-কাহিনীতে কর্ণ কলুষিত করিতে হইল। সমস্ত ভারতবর্ষ তাহার পাপাচরণের ক্ষেত্র, অসংযত চরিত্র স্বেচ্ছাপরায়ণ সন্ন্যাসী নামধারী ভণ্ডদল তাহার পাপ-পথের সহচর! ভৈরবীবেশে ত্রিশূলহস্তে লইয়া সে সুপবিত্র তীর্থ-সমূহে তাহার যাহা ইচ্ছা তাহাই করিয়া বেড়াইতেছে, কেহ তাহাকে বাধা দিতে পারে না, সমস্ত ধর্ম্মকর্ম্ম এবং মানব হৃদয়ের সদ্‌গুণ সমূহ সে অনায়াসে হাসিয়া উড়াইয়া দেয়।

অবশেষে ভৈরবী আমাকে তাহার সঙ্গী হইবার জন্য অনুরোধ করিল। 'আপনি' ছাড়িয়া 'তুমি' ধরিল, বলিল, "তুমি কেন এমন ভগ্ন-হৃদয়ে তীর্থে তীর্থে ঘুরিয়া বেড়াইতেছ? অশান্ত হৃদয়ে শান্তি পাইবে আশা করিতেছ, কিন্তু সে ভ্রম মাত্র। এ পথে শান্তি নাই, যাহারা তোমাকে শান্তির লোভ দেখাইয়াছে, তাহারা সকলেই প্রবঞ্চক, তাহারা সকলেই ভণ্ড, কিন্তু অন্যকে সাধু হইতে পরামর্শ দেয়।

সেদিকে কর্ণপাত করিয়া কেন আরও অধিক যন্ত্রণা ভোগ করিবে? যদি দেশভ্রমণ করিতেই ইচ্ছা থাকে, আমার সঙ্গে চল, আমি বিপদে তোমাকে সাহায্য করিব, অসুখের সময় তোমার শুশ্রূষা করিব, আমার অনুচরগণ তোমাকে গুরুর ন্যায় ভক্তি করিবে। আমি শীঘ্রই মানস সরোবরে যাইব, মানস সরোবর অতি রমণীয় স্থান, আমার সঙ্গে যাইবার ইচ্ছা থাকে ত কালই প্রস্তুত হও।"

আমি ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া গেলাম। সংক্ষেপে বলিলাম, আমাকে শীঘ্রই দেরাদূনে ফিরিতে হইবে। আমার একবার মানস-সরোবর দেখিবার বিশেষ ইচ্ছা থাকিলেও আমি আপাততঃ সেদিকে যাইতে পারিতেছি না। আমার জন্য আপনার কষ্ট স্বীকার করিবার কোন আবশ্যক নাই। ভৈরবী কোন উত্তর করিল না, নীরবে বসিয়া থাকিল, আমি পুনর্ব্বার বলিলাম, রাত্রি অনেক হইয়াছে, পথশ্রমে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছি, আমি এখন বিশ্রাম করিবার ইচ্ছা করি। ভৈরবী তখন "আচ্ছা, এখন তবে আমি যাইতেছি, তুমি আমার স্বদেশী, তোমাকে নিতান্ত আত্মীয় বলিয়া মনে করিতেছি, কাল আবার যেন দেখা হয়।"

সন্ন্যাসিনী উঠিয়া গেলে আমি নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলাম। এই দুই ঘণ্টা আমি কি যন্ত্রণাতেই না অতিবাহিত করিয়াছি! ইহা কি একটি পরীক্ষা? আমি অতি ক্ষুদ্র মানব, হৃদয়ে বল নাই, মনে সাহস নাই, জগতের কোন মহৎ অনুষ্ঠানের জন্য জীবন পথে অগ্রসর হই নাই, আমাকে এরূপ অগ্নি পরীক্ষায় ভগবান্ কেন নিক্ষেপ করিলেন? কেন, তাহা তিনিই বলিতে পারেন। যাহা হউক বিপদ দূর হইল ভাবিয়া ভগবানকে ধন্যবাদ দিলাম এবং সেই অন্ধকার কক্ষে ছিন্ন কম্বল বিছাইয়া শয়ন করিলাম, কিন্তু সমস্ত রাত্রি আর নিদ্রা হইল না। বিবিধ চিন্তায় রাত্রি কাটিয়া গেল। প্রত্যূষে পূর্ব্বদিক পরিষ্কার হইবামাত্র আমি গাত্রোত্থান করিলাম। বিশ্বেশ্বরের মন্দির প্রাঙ্গণে এক খণ্ড শিলার উপর উপবেশন করিয়া ভগবানের উপাসনা করিলাম; তাহার পর অন্যান্য কার্য্যে মনোনিবেশ করিলাম।

মধ্যাহ্নে শুনিলাম, ভৈরবী সকালেই চলিয়া গিয়াছে, কোথায় গিয়াছে। তাহা কেহ বলিতে পারিল না। তবে অনেকে বলিল, তাহার সঙ্গে তিনজন যোয়ান সাধু জুটিয়াছিল, তাহাদের সঙ্গে হাস্য পরিহাস করিতে করিতে তাহাকে গঙ্গাতীর পথে যাইতে দেখিয়াছে। একজন মন্তব্য প্রকাশ করিয়া বলিল, "সে কোন পাহাড়ীয়া কস্‌বী!" আমার মনে লজ্জা হইল, অত্যন্ত দুঃখ বোধ করিলাম। বাঙ্গালীর কন্যা, বাঙ্গালীর কুলবধূ না হইলে হয়ত তাহার জন্য ততখানি দুঃখ কষ্ট হইত না। আমি অবাক্ হইয়া সমস্ত দিন ভাবিতে লাগিলাম, বাঙ্গালীর মেয়েরও এমন সাহস হয়? কলঙ্কিনী সমস্ত ভারতে লক্ষ্মীস্বরূপা বঙ্গকুলনারীর পবিত্র নামে কলঙ্ক লেপিয়া বেড়াইতেছে, কিন্তু এমন এক দিন আসিবে, যে দিন সে বুঝিবে, পৃথিবীতে প্রকৃতই ধর্ম্ম আছে; বুঝিবে আত্মপ্রতারণা করিয়া লোকে চিরদিন সুখী হইতে পারে না। অনুতাপের অগ্নি দাবানলের ন্যায় ভগ্ন-হৃদয় আক্রমণ করে,—তখন সেই দগ্ধ হৃদয় হইতে যে আর্ত্তস্বর নির্গত হয়, তাহাতে পাপ যন্ত্রণা জগৎ সমক্ষে ঘোষিত করে।

ভারতের অনেক তীর্থে ভ্রমণ করিয়াছি—এমন ভয়ানক দৃশ্য আর কখন কোথাও দেখি নাই। অনেক উপন্যাস কাহিনী পাঠ করিয়াছি, কিন্তু এই ভৈরবী অপেক্ষা বীভৎস্য চরিত্রের বর্ণনা কোথাও পাঠ করি নাই। জানি না, ভারতবর্ষের শান্তিধাম পুণ্য তীর্থসমূহে এরূপ ভৈরবীর

সংখ্যা কত। কিন্তু বুঝিয়াছি, উপাখ্যান পুস্তকে মধ্যে মধ্যে যে সকল ভৈরবীর অনুষ্ঠিত পৈশাচিক কাণ্ডের কথা বর্ণিত দেখা যায়, তাহা নিতান্ত অতিরঞ্জিত নহে;—Trwth is stronger than Fiction—এ কথাটি কবির ভাষায় জ্বলন্ত সত্য।

শ্রীজলধর সেন।

ঠাকুর-দাদার পত্র।

(একান্ন-বর্ত্তিতা)

দাদা! তোমার পদোন্নতির সংবাদে সুখী হইলাম! তুমি ক্রমে বর্দ্ধিত-সম্মানে সুশোভিত হইয়া পিতা, মাতা, ভ্রাতা, আত্মীয়-স্বজনের সুখ-স্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি কর, দেখিয়া সুখী হই,—মা-জগদম্বার চরণে এই প্রার্থনা।

দাদা! তোমাতে আমাতে আজ অনেক প্রভেদ! তুমি নব-উল্লাসে উল্লসিত হইয়া সংসার-প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিতেছ, আমি নিষ্ক্রান্ত হইয়া চলিয়াছি। তোমার খেলা আরম্ভ হইয়াছে, আমার খেলা বহুদিন শেষ হইয়া গিয়াছে; তুমি খেলোয়াড়—আমি এখন দর্শক মাত্র। তুমি সাথী খুঁজিতেছ, জুটাইতেছ, আমার খেলার সাথী একে একে আমাকে ছাড়িয়া গিয়াছে। তুমি সাধ করিয়া বাগান সাজাইতেছ, নূতন ফুল ফুটিয়া উঠিতেছে; আমার বাগান এখন বনে পরিণত হইয়াছে। সাধ করিয়া যথায় ফুলের চারা রোপিয়াছিলাম, সেখানে এখন কণ্টকাকীর্ণ অরণ্য হইয়াছে, আমার সাধের ফুল অনেক দিন ঝরিয়া পড়িয়াছে। আমার সে অতীতের বাগান অতীতে মিশিয়াছে। আমি তাহার স্মৃতিটুকু লইয়া বসিয়া আছি। আমার সে বাগান নাই, সে মালীগিরির আদরও নাই—বাগান ভাঙ্গিয়াছে, এ মালীকে এখন চিনিবে কে? জীবনের শেষ অঙ্কে আসিয়া পড়িয়াছি; এখন আমার নিকট সুখ, দুঃখ অতীত কল্পনামাত্র; আমার ভবিষ্যৎ অন্ধকার, বর্ত্তমান অতীতের ছায়া। আমি আছি এক-রকম অতীত লইয়া; আর তুমি, তোমার সমস্ত জগৎ-সংসার বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যতে। তুমি বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যতেই ব্যস্ত; অতীতে তোমার লক্ষ্য নাই, সে অবসর-টুকু খুঁজিয়া পাইতেছ না। সংসারে কি হইয়া গেল, তাহা একবার চাহিয়া দেখিতেছ না। স্থূল কথা, তোমার জীবনে তোমাতে আমাতে অনেক প্রভেদ। তুমি আরম্ভ, আমি শেষ; তুমি প্রভাত, আমি সন্ধ্যা। জগৎ-সংসার তোমার সম্মুখে রহিয়াছে, আমি পাছে ফেলিয়া এই খেয়া-ঘাটে পাটনীর পদপ্রান্তে আসিয়া আশ্রয় ভিক্ষা করিতেছি। তুমি নবীন তরী ভাসাইতেছ, আমার ভাঙ্গা তরী ডুবুডুবু হইয়াছে। তুমি কার্য্যকারক, আমি তাহার সমালোচক।

যাও, দাদা! সংসারে প্রবেশ কর, কত সুখ, কত দুঃখ পাইবে, তাহাতে দৃক্‌পাত করিও না। কারণ তাহাতে লাভালাভ কিছুই নাই। তুমি হয় ত বুঝিবে না, কিন্তু দাদা! এই সমস্তই ক্ষণিক। এই ক্ষণিক সুখের মোহে লক্ষ্য হারাইও না। লক্ষ্যভ্রষ্ট হইলে পদে পদে পদস্খলিত হইবে।

তুমি ভাই, সংসারে প্রবেশ করিতেছ, তোমার পারিবারিক জীবন আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু পরিবার সম্বন্ধে কিছু ভাবিয়া দেখিয়াছ কি? তুমি ইংরেজী পড়িয়াছ, বড় বিদ্বান্ হইয়াছ, কিন্তু তোমার পারিবারিক বুদ্ধি বোধ হয় কি এক রকম দাঁড়াইয়াছে। আমার বিশ্বাস, এতকাল ইংরেজীর চর্চ্চাতে ইংরেজী-

বারিক একতার মূলে কুঠারাঘাত করিতেছে, সেই তোমরা কি ভারতের ভিন্ন ধর্ম্মী, ভিন্ন বর্ণীকে একতাসূত্রে আবদ্ধ করিবে? দুই জন নিকট-কুটুম্বের জন্য খাটিতে বা একটু ত্যাগ স্বীকার করিতে তোমাদের কষ্ট হয়, অথচ এই ছত্রিশ জাতির জন্য খাটিবে সঙ্কল্প করিয়াছ?

এখন তুমি বলিবে, "এই বুড়া আমার ঘাড়ে চাপিয়াছে! ইহার উপদেশে আমি আর সর্ব্বস্বান্ত হইতে পারি না। আমার সামান্য নির্দ্দিষ্ট আয়, তাহাতে নিজের খরচই কুলায় না, স্ত্রী-পুত্র লইয়া ভদ্রলোকের মত থাকিতে হইলে ন্যূনকল্পেও দু'শ,আড়াই শ টাকার কমে কুলায় না, অন্য লোকের ব্যয় কোথা হইতে দিব? ভায়া হে, তোমাদের যে এ ধুয়া, তাহা ত অনেক দিন বুঝিয়াছি। রাম না জন্মিতেই তোমাদের রামায়ণের আভাস পাওয়া গিয়াছে!

তোমার পত্রে দুইটী কথা পাইলাম, "নিজের খরচ" এবং "ভদ্রলোকের মত থাকা"। তোমার "নিজ" অর্থে কি, তাহা তুমি স্বয়ংই ব্যখ্যা করিয়াছ। তোমার "নিজ" অর্থে তুমি স্বয়ং, তোমার স্ত্রী এবং তোমার পুত্র! তোমার কন্যা-সন্তান নাই, নতুবা সেও তোমার "নিজের" মধ্যে যাইত। আচ্ছা দাদা! যাহাদিগকে তুমি "নিজ" মনে করিতেছ, তাহারা তোমাকে "নিজ" মনে করে ত? যদি তাই না হয়, তবে এ "ভূতের বেগার" খাটিতে বসিয়াছ কেন? আমার নিকট চলিয়া আইস, তোমার "নিজ" আমি দেখাইয়া দিব। তুমি হয় ত বলিবে, "বুড়া পাগল হইয়াছে। আমার স্ত্রী, আমার পুত্র, সেও আমার "নিজ" নয়, তবে কে?" কিন্তু দাদা, তুমি যাহাকে "নিজ" মনে কর, সে যদি তোমাকে তদ্রূপ মনে না করে, তথাপি কি তাহাকে তোমার গণ্ডির মধ্যে রাখিবে? বেশ দাদা! তোমার ছেলেই যদি কেবল তোমার "নিজ" হয়, তাহা হইলে তোমার পিতার ছেলেও তাহার "নিজ" হইতে পারে না কি? তুমিই যদি কেবল তোমার নিজের ছেলেটীকে লইয়া "নিজ" কর, তোমার পিতাও ত তোমাকে লইয়া সেইরূপ "নিজ" করিতে পারেন! বল ভাই, আমি ঠিক বলি-তেছি কি না?

এখন বুঝিলে, তুমিও একদিন আর এক-জনের "নিজ" ভাবনাস্থল ছিলে? তোমার পিতার প্রতি তোমার ব্যবহার দেখিয়া, ভবি-ষ্যতে তোমার পুত্রেরও তোমার প্রতি ব্যবহার নির্দ্ধারণ করিতে পারিবে বোধ হয়? তুমি যখন তোমার পিতাকে "নিজ" মধ্যে আনিলে না, তোমার ছেলেও তোমার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে পারে, তাহা এখন ভাবিয়া দেখ। একদিন তোমার জন্য যে আত্ম-সুখ তুচ্ছ করিয়াছে, তাহার জন্য আত্মসুখ তুচ্ছ করা কি তোমার কর্ত্তব্য নয়?

এখন হয় ত তুমি ইংরেজের অনুকরণে ধুয়া ধরিবে, "আমাকে মানুষ করা, আমাকে সংসারের উপযুক্ত করা পিতার কর্ত্তব্য কর্ম্ম, তিনি তাহা না করিলে কর্ত্তব্যচ্যুত হইতেন।" বলি, এই কর্ত্তব্য-জ্ঞানটা কি একধারা, না—ইহার অপর দিকও আছে? পিতা কি ভ্রাতা কি অপর গুরুজনের তোমাকে "শিক্ষিত" করা যদি কর্ত্তব্য হইতে পারে, তোমারও তাঁহাদের প্রতি কোন কর্ত্তব্য নাই কি? আমরা যখন ঘোর সংসারী ছিলাম, তখনও কিন্তু আমাদের এ কর্ত্তব্য-জ্ঞানটা খাটী ছিল।

হায় রে! এমনই কাল পড়িয়াছে, পিতা-পুত্র একত্র থাকা যুক্তিযুক্ত কিনা, তাহাই এখন তর্ক দ্বারা মীমাংসা করিতে হইতেছে! যাক, ভাই! মোদ্দা কথা, যাহাদের অনুকরণ করিতে তুমি চাও, তাহারা হয় ত একদিকে খানিকটা কর্ত্তব্যপরায়ণ হইতে পারে, কিন্তু তেমন কৃতজ্ঞ

নয়। ছেলেকে মানুষ করা পিতার কর্ত্তব্য হইতে পারে, কিন্তু ছেলে মানুষ হইলে, পিতার নিকটও কি তাহার চিরকালের জন্য অনুগত থাকা কর্ত্তব্য নহে? হায়, এই হিন্দু পরিবারে পুত্র একদিন পিতার সম্পত্তির মধ্যে ছিল! তাহা শুনিয়া হয় ত তোমার সাহেব-দেবতা হাসি-বেন, মুখ সিট্‌কাইবেন। কিন্তু জানিও যে, ইহা একটা স্বাভাবিক সুন্দর নিয়ম, পিতার প্রতি পুত্রের অনন্য-সাধারণ কৃতজ্ঞতার পরিচায়ক মাত্র।

তোমার দ্বিতীয় কথা, "ভদ্রলোকের মত থাকা"। ভদ্রলোক যে কাহাকে বলে তাহা ভাই আজ এই বুড়া বয়সেও বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। তোমাদের "ভদ্রলোকের" কি কি গুণ থাকা দরকার, তাহা ত বুঝিতে পারিতেছি না। আমরা যখন সংসারী ছিলাম, যখন তোমা-দের ন্যায় সাংসারিক সুখের কল্পনায় স্বর্গরাজ্য প্রস্তুত করিতেছিলাম, তখনও আমাদের লক্ষ্য ছিল, "ভদ্রলোকের" মত যেন চলিতে পারি। আজ তুমিও ত সেই কথাই বলিতেছ। তবে সময়ের পরিবর্ত্তনে কি ভদ্র-লোকেরও পরিবর্ত্তন হইয়াছে? আমরা ত বুঝিতাম যে, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব এবং দশ জনকে প্রতিপালন করিয়া, সাধ্যমত গুরুজন ও দেবতা-ব্রাহ্মণের সেবা করিয়া এবং সত্যনিষ্ঠ, পরোপকারী ও পর-দুঃখ-কাতর হইয়া, যে, সমস্ত গ্রামবাসীর প্রীতি-ভাজন হইতে পারে, সেই ভদ্রলোক। কিন্তু আজ-কাল তোমরা, বোধ করি, ইহাই বুঝ যে, ধর্ম্মতঃ হউক আর অধর্ম্মতই হউক, যে অর্থোপা-র্জ্জনে দক্ষ, বিলাসী,খামখেয়াল-প্রকৃতিও আত্ম-সুখেই অনুরক্ত, সেই ভদ্রলোক! আমার অনুরোধ, দাদা! এই শ্রেণীর ভদ্রলোকদিগকে তুমি দূর হইতে নমস্কার করিও।

সাধারণতঃ দেখিতে পাই, একটু উপার্জ্জন-ক্ষম হইলেই, আমাদের মত লোকে একান্ন-বর্ত্তিতাকে বিষ-দৃষ্টিতে দেখেন। বোধ হয়, তাঁহারা মনে করেন, "আমি প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া অর্থোপার্জ্জন করি, তাহা অন্যে ভোগ করিবে কেন? আমি এই এক পাল পরিবারকে খোরাক দেই কি 'প্রকারে? এই বাড়ীতে এত লোক,—মাসী, পিসী, আত্মীয়-কুটুম্ব, খুড়ী, জ্যেঠী, তস্যকুটুম্ব, ইহাদের জন্য সর্ব্বস্বান্ত হইলে ভবিষ্যতে আমার নিজের ছেলে-মেয়েরা খাইবে কি?" কিন্তু ভাই! বলিয়াছি ত, অত আপনার দিক্ দেখিলে চলিবে না,—একটু উপর বাগে দেখিতে চেষ্টা করিও। নিশ্চয় জানিও, সুখ আত্ম-প্রতিষ্ঠায় নহে, আত্ম বিসর্জ্জনে।

কালের বশে আর অদৃষ্টের দোষে, আজ একান্ন-বর্ত্তিতার সুখ তোমাকে বুঝাইতে হইতেছে! কিন্তু তোমার পিতা কি পিতা-মহকে ইহা কেহ বুঝায় নাই। তোমাদের রাজার সংসার—এত লোক একত্র রহিয়াছে, ইহাদের সুখের জন্য তোমার পিতা, পিতামহ, আত্মসুখ তুচ্ছ করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহারা সামান্য আয়ে, এত কষ্টেও সকলের মুখ চাহিয়া আসিয়াছেন কেন? এ সুখ তোমার ইংরেজের কল্পনায়ও আসিবে না।

একান্নবর্ত্তিতায় সম্পূর্ণ আত্মোৎসর্গের প্রয়োজন। তুমি হয় ত এ কথা শুনিয়াই অবাক্ হইবে; কিন্তু ইহাতে অবাক্ হইবার কিছুই নাই; তুমি যে সুখ পাও, সেটুকু আত্মোৎসর্গ করিয়া। তুমি ভালবাস কি স্নেহ কর, কি যে-কোন কোমল প্রবৃত্তির অনুশীলনে তোমার সুখানুভব হয়, দেখিও, তাহার মূলে পরার্থপরতা নিহিত। যে পরিমাণে নিজ ভুলিয়া পরের জন্য, অর্থাৎ তুমি যাহাকে আপনার মনে কর, তাহার জন্য খাটিতেছ, তোমার সুখ সেই পরিমাণে হইয়া থাকে। এদিকে দেখিতেছ, নিজের জন্য তোমার ভাবনা নাই, যে প্রকার অবস্থায়ই থাক, তোমার কষ্ট হয় না, কিন্তু ব্যক্তিবিশে-

বারিক একতার মূলে কুঠারাঘাত করিতেছে, সেই তোমরা কি ভারতের ভিন্ন ধর্ম্মী, ভিন্ন বর্ণীকে একতাসূত্রে আবদ্ধ করিবে? দুই জন নিকট-কুটুম্বের জন্য খাটিতে বা একটু ত্যাগ স্বীকার করিতে তোমাদের কষ্ট হয়, অথচ এই ছত্রিশ জাতির জন্য খাটিবে সঙ্কল্প করিয়াছ?

এখন তুমি বলিবে, "এই বুড়া আমার ঘাড়ে চাপিয়াছে! ইহার উপদেশে আমি আর সর্ব্বস্বান্ত হইতে পারি না। আমার সামান্য নির্দ্দিষ্ট আয়, তাহাতে নিজের খরচই কুলায় না, স্ত্রী-পুত্র লইয়া ভদ্রলোকের মত থাকিতে হইলে ন্যূনকল্পেও দু'শ,আড়াই শ টাকার কমে কুলায় না, অন্য লোকের ব্যয় কোথা হইতে দিব? ভায়া হে, তোমাদের যে এ ধুয়া, তাহা ত অনেক দিন বুঝিয়াছি। রাম না জন্মিতেই তোমাদের রামায়ণের আভাস পাওয়া গিয়াছে!

তোমার পত্রে দুইটী কথা পাইলাম, "নিজের খরচ" এবং "ভদ্রলোকের মত থাকা"। তোমার "নিজ" অর্থে কি, তাহা তুমি স্বয়ংই ব্যখ্যা করিয়াছ। তোমার "নিজ" অর্থে তুমি স্বয়ং, তোমার স্ত্রী এবং তোমার পুত্র! তোমার কন্যা-সন্তান নাই, নতুবা সেও তোমার "নিজের" মধ্যে যাইত। আচ্ছা দাদা! যাহাদিগকে তুমি "নিজ" মনে করিতেছ, তাহারা তোমাকে "নিজ" মনে করে ত? যদি তাই না হয়, তবে এ "ভূতের বেগার" খাটিতে বসিয়াছ কেন? আমার নিকট চলিয়া আইস, তোমার "নিজ" আমি দেখাইয়া দিব। তুমি হয় ত বলিবে, "বুড়া পাগল হইয়াছে। আমার স্ত্রী, আমার পুত্র, সেও আমার "নিজ" নয়, তবে কে?" কিন্তু দাদা, তুমি যাহাকে "নিজ" মনে কর, সে যদি তোমাকে তদ্রূপ মনে না করে, তথাপি কি তাহাকে তোমার গণ্ডির মধ্যে রাখিবে? বেশ দাদা! তোমার ছেলেই যদি কেবল তোমার "নিজ" হয়, তাহা হইলে তোমার পিতার ছেলেও তাহার "নিজ" হইতে পারে না কি? তুমিই যদি কেবল তোমার নিজের ছেলেটীকে লইয়া "নিজ" কর, তোমার পিতাও ত তোমাকে লইয়া সেইরূপ "নিজ" করিতে পারেন! বল ভাই, আমি ঠিক বলি-তেছি কি না?

এখন বুঝিলে, তুমিও একদিন আর এক-জনের "নিজ" ভাবনাস্থল ছিলে? তোমার পিতার প্রতি তোমার ব্যবহার দেখিয়া, ভবি-ষ্যতে তোমার পুত্রেরও তোমার প্রতি ব্যবহার নির্দ্ধারণ করিতে পারিবে বোধ হয়? তুমি যখন তোমার পিতাকে "নিজ" মধ্যে আনিলে না, তোমার ছেলেও তোমার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে পারে, তাহা এখন ভাবিয়া দেখ। একদিন তোমার জন্য যে আত্ম-সুখ তুচ্ছ করিয়াছে, তাহার জন্য আত্মসুখ তুচ্ছ করা কি তোমার কর্ত্তব্য নয়?

এখন হয় ত তুমি ইংরেজের অনুকরণে ধুয়া ধরিবে, "আমাকে মানুষ করা, আমাকে সংসারের উপযুক্ত করা পিতার কর্ত্তব্য কর্ম্ম, তিনি তাহা না করিলে কর্ত্তব্যচ্যুত হইতেন।" বলি, এই কর্ত্তব্য-জ্ঞানটা কি একধারা, না—ইহার অপর দিকও আছে? পিতা কি ভ্রাতা কি অপর গুরুজনের তোমাকে "শিক্ষিত" করা যদি কর্ত্তব্য হইতে পারে, তোমারও তাঁহাদের প্রতি কোন কর্ত্তব্য নাই কি? আমরা যখন ঘোর সংসারী ছিলাম, তখনও কিন্তু আমাদের এ কর্ত্তব্য-জ্ঞানটা খাটী ছিল।

হায় রে! এমনই কাল পড়িয়াছে, পিতা-পুত্র একত্র থাকা যুক্তিযুক্ত কিনা, তাহাই এখন তর্ক দ্বারা মীমাংসা করিতে হইতেছে! যাক, ভাই! মোদ্দা কথা, যাহাদের অনুকরণ করিতে তুমি চাও, তাহারা হয় ত একদিকে খানিকটা কর্ত্তব্যপরায়ণ হইতে পারে, কিন্তু তেমন কৃতজ্ঞ

নয়। ছেলেকে মানুষ করা পিতার কর্ত্তব্য হইতে পারে, কিন্তু ছেলে মানুষ হইলে, পিতার নিকটও কি তাহার চিরকালের জন্য অনুগত থাকা কর্ত্তব্য নহে? হায়, এই হিন্দু পরিবারে পুত্র একদিন পিতার সম্পত্তির মধ্যে ছিল! তাহা শুনিয়া হয় ত তোমার সাহেব-দেবতা হাসি-বেন, মুখ সিট্‌কাইবেন। কিন্তু জানিও যে, ইহা একটা স্বাভাবিক সুন্দর নিয়ম, পিতার প্রতি পুত্রের অনন্য-সাধারণ কৃতজ্ঞতার পরিচায়ক মাত্র।

তোমার দ্বিতীয় কথা, "ভদ্রলোকের মত থাকা"। ভদ্রলোক যে কাহাকে বলে তাহা ভাই আজ এই বুড়া বয়সেও বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। তোমাদের "ভদ্রলোকের" কি কি গুণ থাকা দরকার, তাহা ত বুঝিতে পারিতেছি না। আমরা যখন সংসারী ছিলাম, যখন তোমা-দের ন্যায় সাংসারিক সুখের কল্পনায় স্বর্গরাজ্য প্রস্তুত করিতেছিলাম, তখনও আমাদের লক্ষ্য ছিল, "ভদ্রলোকের" মত যেন চলিতে পারি। আজ তুমিও ত সেই কথাই বলিতেছ। তবে সময়ের পরিবর্ত্তনে কি ভদ্র-লোকেরও পরিবর্ত্তন হইয়াছে? আমরা ত বুঝিতাম যে, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব এবং দশ জনকে প্রতিপালন করিয়া, সাধ্যমত গুরুজন ও দেবতা-ব্রাহ্মণের সেবা করিয়া এবং সত্যনিষ্ঠ, পরোপকারী ও পর-দুঃখ-কাতর হইয়া, যে, সমস্ত গ্রামবাসীর প্রীতি-ভাজন হইতে পারে, সেই ভদ্রলোক। কিন্তু আজ-কাল তোমরা, বোধ করি, ইহাই বুঝ যে, ধর্ম্মতঃ হউক আর অধর্ম্মতই হউক, যে অর্থোপা-র্জ্জনে দক্ষ, বিলাসী,খামখেয়াল-প্রকৃতিও আত্ম-সুখেই অনুরক্ত, সেই ভদ্রলোক! আমার অনুরোধ, দাদা! এই শ্রেণীর ভদ্রলোকদিগকে তুমি দূর হইতে নমস্কার করিও।

সাধারণতঃ দেখিতে পাই, একটু উপার্জ্জন-ক্ষম হইলেই, আমাদের মত লোকে একান্ন-বর্ত্তিতাকে বিষ-দৃষ্টিতে দেখেন। বোধ হয়, তাঁহারা মনে করেন, "আমি প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া অর্থোপার্জ্জন করি, তাহা অন্যে ভোগ করিবে কেন? আমি এই এক পাল পরিবারকে খোরাক দেই কি 'প্রকারে? এই বাড়ীতে এত লোক,—মাসী, পিসী, আত্মীয়-কুটুম্ব, খুড়ী, জ্যেঠী, তস্যকুটুম্ব, ইহাদের জন্য সর্ব্বস্বান্ত হইলে ভবিষ্যতে আমার নিজের ছেলে-মেয়েরা খাইবে কি?" কিন্তু ভাই! বলিয়াছি ত, অত আপনার দিক্ দেখিলে চলিবে না,—একটু উপর বাগে দেখিতে চেষ্টা করিও। নিশ্চয় জানিও, সুখ আত্ম-প্রতিষ্ঠায় নহে, আত্ম বিসর্জ্জনে।

কালের বশে আর অদৃষ্টের দোষে, আজ একান্ন-বর্ত্তিতার সুখ তোমাকে বুঝাইতে হইতেছে! কিন্তু তোমার পিতা কি পিতা-মহকে ইহা কেহ বুঝায় নাই। তোমাদের রাজার সংসার—এত লোক একত্র রহিয়াছে, ইহাদের সুখের জন্য তোমার পিতা, পিতামহ, আত্মসুখ তুচ্ছ করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহারা সামান্য আয়ে, এত কষ্টেও সকলের মুখ চাহিয়া আসিয়াছেন কেন? এ সুখ তোমার ইংরেজের কল্পনায়ও আসিবে না।

একান্নবর্ত্তিতায় সম্পূর্ণ আত্মোৎসর্গের প্রয়োজন। তুমি হয় ত এ কথা শুনিয়াই অবাক্ হইবে; কিন্তু ইহাতে অবাক্ হইবার কিছুই নাই; তুমি যে সুখ পাও, সেটুকু আত্মোৎসর্গ করিয়া। তুমি ভালবাস কি স্নেহ কর, কি যে-কোন কোমল প্রবৃত্তির অনুশীলনে তোমার সুখানুভব হয়, দেখিও, তাহার মূলে পরার্থপরতা নিহিত। যে পরিমাণে নিজ ভুলিয়া পরের জন্য, অর্থাৎ তুমি যাহাকে আপনার মনে কর, তাহার জন্য খাটিতেছ, তোমার সুখ সেই পরিমাণে হইয়া থাকে। এদিকে দেখিতেছ, নিজের জন্য তোমার ভাবনা নাই, যে প্রকার অবস্থায়ই থাক, তোমার কষ্ট হয় না, কিন্তু ব্যক্তিবিশে-

যের জন্যই তোমার ভাবনা, অতএব তোমার সুখে থাকার অর্থ—তুমি কাহাকেও সুখে রাখিতেছ। কেমন, এই ত? দাদা! বরাবরই ত পরের জন্য শরীর পাত করিতেছ। তুমি যাহা উপার্জ্জন কর, তাহার কতটুকু অংশ প্রকৃতপক্ষে নিজের জন্য ব্যয় কর? ভায়া হে, এখন স্ত্রীকে অলঙ্কারে সুশোভিতই কর, আর তোমার প্রতিবেশীর উপকারের জন্যই কিছু ব্যয় কর, তোমার টাকা কিন্তু পরের জন্যই ব্যয় হইতেছে। কিন্তু ইহাতেই তোমার সুখ। তবে আবার বল কেন, পরের জন্য খাটিতে যাইব কেন? সেই ত সবই হয়। তবে আর সামান্য পার্থক্য রাখিয়া নিজের নিকটই বা লজ্জিত হও কেন, আর সমাজের নিকটই বা নিন্দিত হও কেন?

তাই বলিতেছিলাম, সেই আত্মাৎসর্গ করিতেই হইবে, তা, যাহার জন্যই কর। একান্নবর্ত্তিতায় স্বকীয় স্বচ্ছন্দের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া পরিবারের সুখ-স্বচ্ছন্দতার দিকেই লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। তোমার দিকে তাকাইতে সমস্ত পরিবার রহিল, আর তুমি থাকিবে তাহাদিগের সুখের দিকে তাকাইয়া। তুমি নিজে আর তোমার বিষয় ভাবিয়া কত করিবে? তুমি পরিবারের জন্য ভাবিবে এবং পরিবার ভাবিবে তোমার জন্য। ইহাই সামাজিক নিয়ম। এই নিয়ম ভঙ্গ করিলে তোমার সোণার সংসার ছারখার হইয়া যাইবে।

পারিবারিক সুখের অন্যতম অন্তরায় কর্ত্তৃত্বপ্রিয়তা। এটী বোধ হয় মানবের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। কিন্তু তুমি দাদা! পরিবারের মধ্যে কর্ত্তৃত্ব করিতে যাইও না। কর্ত্তার যে গুণ থাকার দরকার, তাহা যে তোমাতে সম্পূর্ণরূপ আছে, এমন মনে করি না। অনর্থক এই আপদ ডাকিয়া ঘরে আনিবে কেন? সং না সাজিয়া সাজাইতে সুখ অধিক। প্রকৃত কর্ত্তা নিজে হইয়া অন্যকে কর্ত্তৃত্ব করিতে দেওয়া যে কি সুখ, তাহা তুমি এই অল্পবয়সে না বুঝিতেও পার, কিন্তু একদিন হয় ত বুঝিবে।

আর এক কথা,—শুনিয়াছি, আজকাল আবার নাকি কি এক নূতন বিজ্ঞান বাহির হইয়াছে, তাহার নাম নাকি "অর্থ ব্যবহার"। তোমরা বলিতেছ, এই একান্নবর্ত্তিতা আধুনিক অর্থ-ব্যবহারের মতে অসঙ্গত। ইহাতে দরিদ্রতা ও আলস্য বৃদ্ধি করে। আমি ত ভাই! এ কথার খেই খুঁজিয়া পাই না। তোমাদের নূতন সমাজ, নূতন শাস্ত্র। আর আজই বা এই বণিক্‌জাতির দোহাই দিতেছ কেন? ইংরেজি-শিক্ষিত জ্ঞান-গর্ব্বিত যুবকসম্প্রদায় কোন্ কাজটীতে ইহার অনুসরণ করিতেছে? এই যে কোর্ট-পেণ্টুলন, সার্ট-কামিজ, বডি-সেমিজ, হ্যাট কোট শরীরের বাহার উড়াইতেছে, এ কোন্ অর্থ-ব্যবহারের অনুমোদিত? এই যে প্রতি মাসে দোকানদারের খাতায় তোমার বাবুদের নামে মাসে দুই তিন শত টাকা বাকী পড়িতেছে, ইহা অর্থ-নীতির কোন্ সূত্রানুসারে? আর এই যে মাংস, পলাও, কারি, কোপ্তা, পীরু ও উইলসনের কল্যাণে গাঁটির টাকা ব্যয় করিয়া বাবুরা সব রোগ ডাকিয়া ঘরে আনিতেছেন, ইহাই বা কোন্ শাস্ত্রের অনুমোদিত? স্থূল কথা, তোমরা আজ যে অর্থ-ব্যবহারের দোহাই দিতেছ, কোন্ কার্য্যে সেই নিয়ম রক্ষা করিয়া থাক?

তোমাকে উপলক্ষ্য করিয়াই এই কথাগুলি বলিলাম। অবশ্য তোমার প্রতি আমার বিশ্বাস আছে যে, তুমি বংশের নাম রাখিতে পারিবে। তবে দাদা! কাল বড় কুটিল, তাই ভয় হয়। সেইজন্য মধ্যে মধ্যে এই অনুযোগ করি। আশীর্ব্বাদ করি, তুমি পৈতৃক ধাত পাও এবং আজীবন সেই ধাতে থাকিয়া নিজে সুখী হইয়া অন্যকে সুখী কর।

ইংরেজীওয়ালাদের প্রধান একটা আপত্তি

এই যে, একজনের উপার্জ্জন কেন দশজনে ভোগ করিবে? কিন্তু একটু তলাইয়া বুঝিলে, তাঁহাদিগকে নিশ্চয়ই স্বীকার করিতে হইবে যে, সেই দশজন একদিন তাঁহাদিগকেও অল্পাধিক পরিমাণে 'ভোগ' দিয়া আসিয়াছে। কেবল আদান-প্রদান সম্বন্ধমাত্র। ভায়া হে! নিশ্চয় জানিও, তোমাদের দল কিছু বেশী করিতেছেন না!

সমাজে দরিদ্র সকল সময়েই আছে। যে ইংরেজ তোমাদের দেবতা, তাঁহার সমাজেও দরিদ্র নাই কি? তাঁহারও দরিদ্রের জন্য সামাজিক বন্দোবস্ত আছে; নতুবা poor rates কি নিমিত্ত? তাঁহারা গ্রামের লোকে চাঁদা করিয়া যদি গ্রামের দরিদ্রকে ভরণ-পোষণ করিতে পারেন, তবে তোমরা নিজেরা চাঁদা করিয়া অথবা নিজের পকেট হইতে কিছু কিছু দিয়া নিজের দুই চারিটী দরিদ্র আত্মীয়ের ভরণ-পোষণ করিবে, ইহা কি এতই কঠিন কার্য্য? কোন দরিদ্রই বিনা কার্য্যে খাইতে পারে না; তাহাদের জন্য শ্রমাগার (work house) আছে। আচ্ছা তোমরা যাহাদিগকে যাইতে দাও, তাহাদিগকে তোমরা কতখানি খাটাও বলত? তোমাদিগের জন্য তাঁহারা কিনা করিতেছেন? কোন ব্যক্তিকে টাকার লোভে এই প্রকার সানুরাগে ও সর্ব্বান্তঃকরণে খাটাইতে পারিতে কি? প্রভেদ এই, ইহাঁরা খাটিতেছেন, তোমাকে অকৃত্রিম ভাল বাসিয়া, তোমার কল্যাণের জন্য; আর তাহারা খাটিতেছে রুটি মারা যাইবার ভয়ে। এখন বলত দাদা, ইংরেজের নিয়ম তোমার দেশে প্রচলিত হইলে, তুমি খুসী হও কি চট? তবে সেই চাঁদা ত দিতেই, কিন্তু ইহাঁদের দ্বারা তোমার তথা সমাজের যে পরিমাণ অর্থ-সঞ্চয় হইতেছে, তাহা হইত না। এখন খোলা প্রাণে বল দেখি দাদা, কোন্‌টা ভাল,—শ্রমাগার না একান্নবর্ত্তী পরিবার? (work house না joint family?)

পুনরায় আশীর্ব্বাদ করি, ইংরেজীর বুকনিতে তুমি আর বিগড়াইবে না!

শ্রীরাসবিহারী মুখোপাধ্যায়।

আক্ষেপ।

কেন কাঁদি? বৃথা এ ক্রন্দন!
সারাটা জগৎ ঘুরে, চ'লে যাই অতি দূরে,
কেন হেরি প্রেমেরি মরণ!
হৃদে জাগে কত আশা, কত সাধ ভালবাসা,
কত ফুলে সাজান বাগান,
প্রেম-মন্দাকিনী-জলে, শত চাঁদ তারা জ্বলে,
শোভা হেরি পাগল পরাণ!
সেই হৃদয়ের মাঝে, তোমার মূরতি রাজে,
—শোভে যেন কমলবাসিনী,
তুমি শান্তি তুমি তৃপ্তি, হৃদয়ে তোমার দীপ্তি,
তুমি সর্ব্বশুভপ্রদায়িনী।
আমার অসীমা আশা, প্রাণপণ ভালবাসা,
তোমা সনে মিলিতে অধীর,
জাগাইয়া তুলে নিতি, নব সুখ নব প্রীতি,
নিত্য আনে বসন্ত-সমীর!
তাই এ উন্মত্ত প্রাণ, নিত্য করে তব ধ্যান,
তুমি ছাড়া কিছু নাহি আর;
ভাল ক'রে ব'লে দাও,—আজি কি বুঝাতে চাও,
সে বিশ্বাস ভুল হ'ল তার?
এই সাধ, এই তৃষা, এই যে প্রাণের ভাষা,
—এ কি শুধু আমারি কল্পনা?
এই কি বুঝাবে শেষে, ম্লান-মুখে মৃদু হেসে,
এ জগৎ দানব-রচনা!
ও প্রতিমা হৃদে ধরি, প্রাণ দিয়া পূজা করি
কখন চাহিনি প্রতিদান,
আজি কি বুঝিব তবে, সে পূজার শেষ হ'বে,
প্রেম যদি হ'ল অবসান!

থাক্ তবে সেই ভালো, নিবাইলে যদি আলো,
কহিও না কোন কথা আর,
আজি এ আঁধারে বসি, কাঁদি যদি দিবানিশি,
তাহাতে কি ক্ষতি আছে কার?
এই যে ঝরিছে আঁখি, এতেও বুঝিবে না কি,
কি যাতনা মরমে আমার,
আজি এ পূর্ণিমা-রাতি, কোথা রে চন্দ্রের ভাতি,
কেন হেরি সকলি আঁধার?
তুমি দেবী প্রেমময়ী, নিত্য তুমি স্নেহময়ী,
এই কি গো নিদর্শন তার?
কোথা সে নির্ম্মল হাসি, নয়নে অমৃতরাশি,
বুকে কোথা প্রেম-ফুল-হার?
আঁখি-জলে বুঝিলে না, বুকে বাজে কি বেদনা,
বুঝিবে না হৃদয়ের ভাষা,
কাড়িয়া লইলে যাহা, আর কি মিলিবে তাহা,
ভাঙ্গা বুকে বৃথা ধরি আশা!

বুঝেছি অনেক দিন, প্রেম-ডোর অতি ক্ষীণ,
পলে পলে প্রেমের মরণ,
একান্ত বিশ্বাস তবু, চাহিনি ছাড়িতে কভু,
করিয়াছি যদিও ক্রন্দন!
একবার বুঝিলে না, ভাল ক'রে দেখিলে না,
হৃদয়ের অসীম বিস্তার,
নিত্য চাঁদ তারা উঠে, নির্ম্মল কুসুম ফুটে,
কি মধুর মহিমা তাহার!
বাহিরে যে শোভা আছে, পাইতে আমার কাছে,
করিতাম চরণে অর্পণ,
যদি ও প্রতিমাখানি, হৃদয়-আসনে আনি,
পূজা মোর করিতে গ্রহণ!
আঁখিতে কহিতে যাহা, হৃদে গাঁথা আছে তাহা,
আজি যে ভুলিতে বল তায়,
আদরে ডেকেছ যারে, আজিকে কেমনে তারে,
অনায়াসে করিছ বিদায়!
নাহি শ্বাস অশ্রুজল, কই আঁখি ছল ছল,
কোথা তব মুরতি মধুর,
দেখাও সে স্নেহ-মুখ, জুড়াতে তাপিত বুক,
আমি ত চ'লেছি বহু দূর!
অশ্রুপূর্ণ আঁখি ল'য়ে, তোমার অশান্তি হ'য়ে,
আসিব না সম্মুখে আবার,
কহিব না কোন কথা, কি কাজ জানায়ে ব্যথা,
যাহা আছে হৃদয়ে আমার!
এই মুছিলাম আঁখি, লও যাহা আছে বাকি,
দিয়াছিলে কবে কোন্ আশা,
চাহি তব মুখপানে, ফুটিয়া উঠেছে প্রাণে,
নিতি নিতি কত ভালবাসা!
চুম্বন-মদিরা তব, জাগায়েছে আশা নব,
যতনে ফুটেছে শত সাধ,
কাড়ি লবে সব যদি, ভেঙ্গে দাও এই হৃদি,
মেঘে ঢাক ওই মুখচাঁদ!
সুতীক্ষ্ণ কৃপাণ আনি, আশাভরা বুকে হানি,
কেটে লও মুরতি তোমার;
এই মুদিলাম আঁখি, কি কাজ সরম রাখি,
বাকি কিছু রাখিও না আর!

হায় রে সে দেবী কই, প্রেমময়ী আশাময়ী,
সেকি শুধু আশার ছলনা,
এ নহে সে প্রেমানন, কোথা সুধা বরিষণ,
সত্য হ'ল অসার কল্পনা।
কাঁদি কেন তবে আর, ভাঙ্গা বীণা ছিন্ন-তার,
কেবা শুনে করুণার গান,
প্রাণ-বিনিময়ে প্রাণ, কেহ না করিবে দান,
আঁখিজলে কে বুঝিবে প্রাণ!
আমিত চাহিনি কারে, চাহি শুধু পূজিবারে,
পূজিবার দেহ অধিকার,
কনক-প্রতিমাখানি, দলিত-হৃদয়ে আনি,
ক্ষুধা তৃষ্ণা করি পরিহার!
দেখি শুধু রাত্রি দিন, ব'সে আছ চির দিন,
আপনার মহত্ত্ব-শিখরে,
করুণ নয়ন হ'তে, প্রেম সে মধুর স্রোতে,
দেখি শুধু সতত নির্ঝরে!

তাও যদি নাহি হবে, কি ফল কাঁদিয়া তবে,
চ'লে যাই দূর দেশান্তরে,
হৃদয়ের সব আশা, প্রাণ-ভরা এই তৃষা,
কেড়ে লও প্রফুল্ল অন্তরে!
সুখ-আশা-শান্তিহীন, জীবনের ক'টা দিন,
প'ড়ে থাকি প্রান্তর সুদূর,
কাটিয়া ল'য়োনা তুলে, যদি কভু হৃদিমূলে
জেগে উঠে মুরতি মধুর!

শ্রীবিপিনবিহারী রক্ষিত।

"এ্যাজ্ ইউ লাইক্ ইট্।"

(১)

এক সময়ে ফ্রান্সদেশ কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক ক্ষুদ্র রাজ্য স্ব স্ব ক্ষমতায় পরিচালিত হইত। সেই সময় এক ব্যক্তি তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা—যথার্থ রাজ্যেশ্বরকে রাজ্যচ্যুত করিয়া আপনি সিংহাসন লাভ করেন।

রাজ্যচ্যুত এবং নির্ব্বাসিত সেই রাজা আর্ডেন নামক এক কাননে পলায়ন করেন। তাঁহার যে সকল প্রভুভক্ত ও বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে রাজার সঙ্গ লইয়া সেই বনে বাস করিতে লাগিলেন। রাজা সেই আর্ডেন-কাননে প্রকৃত বন্ধু ও ভক্ত অমাত্যগণের সহিত সুখে দিন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার ভ্রাতা সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিয়া সেই স্বেচ্ছায়-নির্ব্বাসিত সামন্তগণের সমস্ত সম্পত্তি হরণ করিতে লাগিলেন। বিজন অরণ্যের মধ্যে থাকিয়াও রাজা ও রাজ-পারিষদগণ কোন কষ্টবোধ করিতেন না, বরং রাজ-সংসারে যে প্রকার চিন্তা, মিথ্যা আড়ম্বর ও একটা উদ্বেগের মধ্যে জীবন অতিবাহিত করিতে হয়, অরণ্যের মধ্যে থাকিয়া তাঁহাদের সে উদ্বেগহীন জীবন বড় প্রীতিকর বোধ হইতে লাগিল।

মধুর নিদাঘে তাঁহারা অত্যুচ্চ বৃক্ষের সুশীতল ছায়ায় উপবেশন করিয়া বন্য হরিণীগণের মধুর ক্রীড়া অবলোকন করিতেন। এই নিরীহ প্রাণীগণের উপর তাঁহাদিগের এমনই একটা স্নেহ ও প্রীতি জন্মিয়াছিল যে, যদি কখন আপনাদের আহারের জন্য তাহাদের একটীকেও মারিতে হইত, তবে তাঁহারা প্রাণে বড় ব্যথা পাইতেন। যখন দারুণ শীতে অতি শীতল বাতাস বহিত এবং সেই নির্ব্বাসিত রাজা বুঝিতেন, তাঁহার সৌভাগ্য ও রাজলক্ষ্মী এইরূপে অন্তর্হিত হইয়াছেন, তখন তিনি কিছুমাত্র অধীরতা প্রকাশ না করিয়া বরং নীরবে তাহা সহ্য করিতেন। বলিতেন, "এই যে শীতল বাতাস আমার শরীর কাঁপাইয়া তুলিতেছে, ইহা যথার্থই আমার অমাত্যের কাজ করিতেছে! এই বাতাস তোষামোদ জানে না, বরং আমি যে কত দীন, আমায় সে দশা জানাইয়া দিতেছে! আর যদিও এই বাতাস শরীরে যন্ত্রণা দিতেছে বটে, কিন্তু নির্দ্দয়তা এবং অকৃতজ্ঞার যে যন্ত্রণা, ইহা অপেক্ষা তাহা অনেক বেশী। আমি দেখিয়া থাকি, লোকে দারিদ্র্যদুঃখ নিন্দা করিয়া থাকে; কিন্তু আমার মনে হয়, দারিদ্র্যের মধ্য হইতেও অনেক সুখ পাওয়া যাইতে পারে। কে না জানে অত্যন্ত বিষাক্ত সর্পের মস্তক হইতেও অতি প্রয়োজনীয় ফলপ্রদ ঔষধ লাভ হইয়া থাকে!"

নির্ব্বাসিত রাজা এইরূপ যাহা দেখিতেন, তাহা হইতেই নীতিসংগ্রহ করিতেন এবং অকাতরে সকল দুঃখ-কষ্ট সহ্য করিতে জানিতেন। এইরূপ যে প্রকৃতি, যাহা সকল পদার্থ হইতেই নীতি আকর্ষণ করিতে সমর্থ,

সে প্রকৃতির নিকট অনুমিত হয় যে, বৃক্ষবল্লরী, তাহারও বাক্‌শক্তি আছে; বেগবতী কল্লোলিনী স্রোতস্বতী, তাহার মধ্যেও প্রগাঢ় কাব্যের ন্যায় অপূর্ব্ব তত্ত্ব লিখিত আছে; উপলখণ্ডের মধ্যে সারগর্ভ উপদেশ সকল প্রচ্ছন্নভাবে লুকাইয়া আছে এবং সকল পদার্থের মধ্যেই সেই সর্ব্বমাঙ্গল্যের সত্ত্বা বিদ্যমান রহিয়াছে। ধর্ম্মপ্রাণ রাজা এইরূপ মন, এইরূপ প্রশান্ত চিত্ত এবং এইরূপ সহিষ্ণুতা লইয়া সেই আর্ডেন-কাননে সঙ্গিগণের সহিত অতুল সুখ উপভোগ করিতেন।

---

(২)

এই নির্ব্বাসিত রাজার এক কন্যা ছিল; কন্যার নাম রোজালিন্দ। যখন তাঁহার পিতা রাজ্যচ্যুত হইয়া নির্ব্বাসিত হন, তখন নূতন রাজা ফ্রেডারিক, ভ্রাতুষ্পুত্রীকে আপনার নিকট রাখিয়াছিলেন। তাঁহারও এক কন্যা ছিল, তাহার নাম—সিলিয়া। সিলিয়া রোজালিন্দকে বড় ভালবাসিত। দুইজনের মধ্যে যথেষ্ট সৌহার্দ্দ ও সখীত্ব থাকাতে ফ্রেডারিকের ইচ্ছা যে, রোজালিন্দ তাঁহার কন্যার সহচরী-রূপে থাকে। এই অভিপ্রায়েই তিনি রোজালিন্দকে পিতার সঙ্গে নির্ব্বাসিত না করিয়া রাজসংসারে রাখিয়াছিলেন। এই দুই ভগিনীর পিতায় পিতায় যেরূপ মনান্তর ছিল, তাহাদের দুইজনের মধ্যে সেরূপ কিছুই ছিল না। বরং দুইজনের মধ্যে একটা দুশ্ছেদ্য স্নেহবন্ধন দুই জনকেই বাঁধিয়া রাখিয়াছিল। নির্ব্বাসিত পিতার কথা ভাবিতে ভাবিতে যখন রোজালিন্দের হাসি-মুখ মলিন হইয়া যাইত, সিলিয়া অমনি তখন একান্ত স্নেহভরে আপনার পিতার সেই দুষ্কৃতির প্রতিবিধান করিতে সাধ্যানুসারে যত্ন করিত। কত সান্ত্বনা-বাক্যে, কত মিষ্ট কথায় রোজালিন্দকে ভুলাইয়া রাখিত। যখন রোজালিন্দ ভাবিত, "আমার পিতা নির্ব্বাসিত, আর পিতার সর্ব্বস্ব-অপহরণকারী এই খুল্লতাতের অন্নে আমি প্রতিপালিত", তখন মলিন-বিষাদ-ছায়া তাহার মুখমণ্ডল ঢাকিয়া ফেলিত; তখন দুর্ভাগ্যবতী কুমারী হৃদয়ে বড় একটা দারুণ ব্যথা অনুভব করিত। সিলিয়া সে ভাব বুঝিয়া একান্ত যত্নের সহিত সে বিষাদ দূর করিতে চেষ্টা পাইত।

এমন প্রায়ই ঘটিত। কোনদিন সিলিয়া রোজালিন্দকে বুঝাইতেছে,—"ভগিনী আমার স্নেহের ভগিনী, এমন ম্লান-মুখে থাকিও না। ম্লানমুখে হাসি আন; আমি যে তোমার এ ভাব আর দেখিতে পারি না, বোন্!"

সিলিয়ার স্নেহে রোজালিন্দের সকল দুঃখ দূর হইত, তখন উভয়ে আবার অন্য প্রকার আনন্দের কথা আলোচনা করিতেন।

একদিন এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময় এক ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, "আপনারা কেহ মল্লযুদ্ধ দেখিবেন কি? তাহা হইলে শীঘ্র রাজসভায় আসুন।"

সিলিয়া ভাবিল, ইহাতে রোজালিন্দের মন একটু অন্যমনস্ক থাকিবে, এই ভাবিয়া তিনি রোজালিন্দকে সঙ্গে করিয়া রাজসভায় মল্লযুদ্ধ দর্শন করিতে গেলেন।

---

(৩)

এমন এক দিন ছিল, যখন এই মল্লযুদ্ধ দেখিতে স্বয়ং রাজা, তাঁহার অমাত্যমণ্ডলী এবং তাঁহার পুরমহিলাগণ সকলেই উপস্থিত থাকিতেন এবং তাঁহাদের সম্মুখেই মল্লযুদ্ধকারিগণ আপন আপন বীরত্ব দেখাইয়া যথেষ্ট সমাদর-লাভ করিত। এখনকার দিনে ইহা আর বড় একটা দেখা যায় না। এখন পল্লীগ্রামের মধ্যেই এই আমোদ প্রচলিত আছে। ফ্রেডারিকের রাজসভায় মল্লযুদ্ধ দেখিতে বিস্তর লোকের সমাগম হইয়াছিল। রোজালিন্দ এবং সিলিয়াও সেইখানে উপস্থিত হইলেন।

যাহারা মল্লযুদ্ধ করিতে আসিয়াছিল তাহাদের একজন নিতান্ত তরুণবয়স্ক যুবক, আর একজন প্রভূত ক্ষমতাশালী, দীর্ঘকায় ও প্রসিদ্ধ মল্লযোদ্ধা এবং এ কথাও সকলেই জানিত যে, এইরূপ যুদ্ধে এই যোদ্ধা বিস্তর লোককে হত্যা করিয়াছে। সেইরূপ লোকের সহিত এই তরুণবয়স্ক, যুদ্ধ-নৈপুণ্যে অনভিজ্ঞ এই যুবকের মল্লযুদ্ধে যে শেষোক্তের বিশেষ অনিষ্ট ঘটিবে, তাহা সকলেই সহজে অনুমান করিল। যখন সকলেই অনুমান করিতেছিল যে, এই যুদ্ধে নিশ্চয়ই এই তরুণ-যুবকের প্রাণ-নাশ হইবে, তখন রোজালিন্দ ও সিলিয়ার মন তাহার দুঃখে একান্ত কাতর হইয়া পড়িল।

রাজা তাঁহার কন্যা ও ভ্রাতুষ্পুত্রীকে সেই সভায় উপস্থিত হইতে দেখিয়া বলিলেন, "এই যে তোমরাও আসিয়াছ দেখিতেছি। কিন্তু ইহা দেখিয়া তেমন আমোদ পাইবে না। কেননা, এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বী পরস্পর পরস্পরের তুল্য নহে। আমার বরং ইচ্ছা, এই যুবক যেন আপনার মঙ্গলের জন্যই এই সঙ্কল্প ত্যাগ করে। দেখ দেখি, তোমরা যদি বলিয়া-কহিয়া ইহাকে নিরস্ত করিতে পার!"

যুবককে দেখিয়াই রাজকন্যাদ্বয়ের হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হইয়াছিল। এখন তাঁহারা আহ্লাদের সহিত এই কার্য্যের ভার গ্রহণ করিলেন। সিলিয়া সেই তরুণ মল্লযোদ্ধাকে বলিলেন, "আমাদের একান্ত ইচ্ছা ও অনুরোধ যে তুমি এই ব্যক্তির সহিত মল্লযুদ্ধ না কর"

রোজালিন্দও সেই কথার সমর্থন করিয়া বলিলেন, "যুবক, আমারও একান্ত সেই ইচ্ছা।" রোজালিন্দের কণ্ঠস্বরে এমন একটু দয়া এমন একটু স্নেহ ও এমন একটু মমতার ভাব মিশ্রিত ছিল যে, সেই যুবক যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত না হইয়া বরং তাদৃশ লাবণ্যময়ী, গুণবতী কুমারীর সাক্ষাতে আপনার বীরত্ব দেখাইয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সঙ্কল্প করিলেন। তিনি অতি বিনীতভাবে আপনার অসম্মতি প্রকাশ করিলেন এবং সেজন্য বারবার ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলিতে লাগিলেন, "আপনারা কেহ আমাকে আর অনুরোধ করিবেন না। আমি যে আপনাদের কথা রক্ষা করিতে পারিতেছি না, এজন্য আমি নিতান্ত দুঃখিত, জানিবেন। আমার বরং ইহাই অনুরোধ, আপনারা আমার মঙ্গল প্রার্থনা করুন এবং ঐ প্রশান্ত করুণ নয়ন যুগল আমার প্রতি ফিরাইয়া রাখুন;—আমি এই যুদ্ধ করিতে করিতে যদি পরাজিত হই, তবে জানিবেন, চির-হতভাগ্য এক ব্যক্তি আজি আপনার দুরদৃষ্টের ফলভোগ করিল! আর যদি নিহত হই, তবে জানিবেন, এমন একজনের মৃত্যু হইল যে আজীবন মৃত্যু কামনা করিতেছে! আমার এই ইচ্ছাকৃত মৃত্যুতে কাহারও কোন ক্ষতি হইবে না। কেননা, আমার জন্য শোক করে, এ পৃথিবীতে এমন আত্মীয় আমার আর কেহ নাই। আমি পৃথিবীরও কোন উপকার করিতেছি না,—কেননা, এ জগতে আমার কিছু নাই; বরং এই পৃথিবীর যে স্থানটুকু আমি অধিকার করিয়া আছি, আমি মরিলে সে স্থানে আমা অপেক্ষা এক সৌভাগ্যশালী ব্যক্তি আসিতে পারে।"

যুবক আর কোন কথা না কহিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন।

সিলিয়া বলিল, "এই যুবক যেন অক্ষত-শরীরে যুদ্ধে জয়-লাভ করিতে পারে।" কিন্তু রোজালিন্দের হৃদয় তাহার জন্য আর একটু বেশী কাঁদিল। সেই যুবক, যে আপনার শোচনীয় অবস্থা, সেই অল্প কথায় জ্ঞাপন করিলেন এবং আপনার মৃত্যু যে আপনি আহ্বান

মল্লযুদ্ধ।

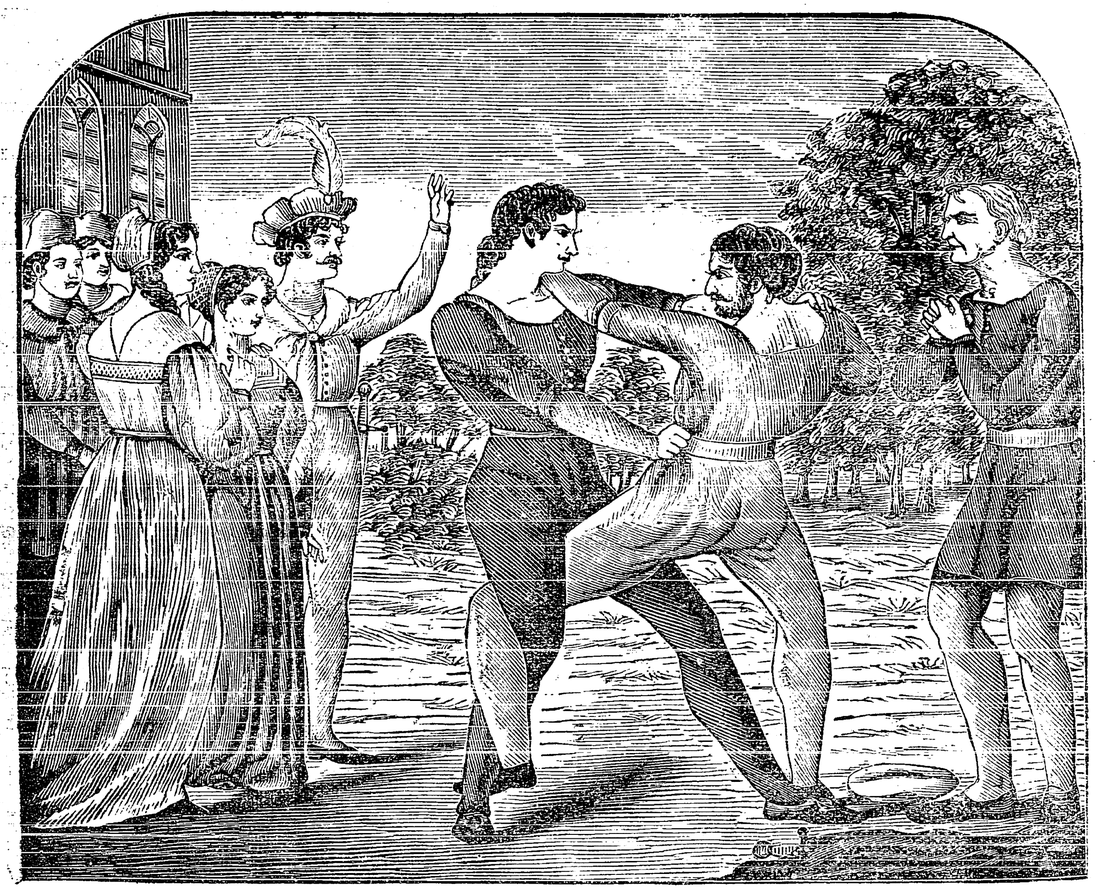

করিয়া আনিতেছে, তাহাকে রোজালিন্দ আপনার ন্যায় ভাগ্যহীন বিবেচনা করিলেন এবং বলিতে কি, যুবকের প্রতি সেই দয়া, স্নেহ, মমতা, তিন মিলিয়া-মিশিয়া রোজালিন্দের হৃদয়ে অনুরাগ-সঞ্চার করিল।

বলা ভাল, রোজালিন্দ তখন যৌবনে পদার্পণ করিয়াছেন।

---

(৪)

রোজালিন্দ ও সিলিয়া সেই যুবকের উপর এতটা দয়া ও স্নেহের ভাব প্রকাশ করাতে সেই যুবকের সাহস ও বিক্রম যেন বাড়িয়া উঠিল। যুবক অতি আশ্চর্য্যরূপ উৎসাহের সহিত সেই ভীমপরাক্রম প্রতিদ্বন্দ্বীকে যুদ্ধে আহ্বান করিয়া সহসা তাহাকে পরাস্ত করিলেন। সে ব্যক্তি এত গুরুতর আঘাত পাইল যে, তাহার কথা কহিবার কিংবা নড়িবার আর সামর্থ্য রহিল না!

ফ্রেডারিক এই দৃশ্য দেখিয়া সাতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং সেই বিজয়ী যুবককে আশ্রয় প্রদান করিতে ইচ্ছুক হইয়া তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। যুবক কহিল, "আমি রোলাণ্ড-ডি-বয়েজ্ মহাশয়ের কনিষ্ঠ-পুত্র, নাম অর্ল্যাণ্ডো।

অর্ল্যাণ্ডোর পিতা সার রোলাণ্ড অনেক দিন হইল, জীব-লীলা শেষ করিয়াছেন। জীবিতকালে তিনি নির্ব্বাসিত ডিউকের একজন বিশেষ ভক্ত ও বিশ্বস্ত বন্ধু ছিলেন। এক্ষণে

ফ্রেডারিক যখন শুনিলেন যে, এই যুবক সেই রোলাণ্ডের পুত্র,—ইতিপূর্ব্বে এই যুবকের সাহস ও বিক্রম দেখিয়া তাহার প্রতি যেটুকু স্নেহের সঞ্চার হইয়াছিল,—তাহা তৎক্ষণাৎ দূরীভূত হইল। সহোদরের প্রতি বিদ্বেষ থাকাতে তাঁহার বন্ধুবর্গের উপরও ফ্রেডারিকের এতটা বিদ্বেষভাব ছিল। তিনি এক্ষণে অত্যন্ত বিরক্তির সহিত সে স্থান হইতে চলিয়া গেলেন। কিন্তু অতিবড় শত্রু হইলেও যুবকের সেই সাহস ও বিক্রম কেহই উপেক্ষা করিতে পারে না। ফ্রেডারিকও তাহা পারিলেন না। তবে কেবলমাত্র ইহাই বলিয়া গেলেন, "এই যুবক অন্য কাহারও পুত্র হইলে ভাল হইত।"

রোজালিন্দ শুনিলেন, এই যুবক অর্ল্যাণ্ডো তাঁহার পিতার বন্ধুপুত্র। এই পরিচয়ে রোজালিন্দের আনন্দের আর সীমা রহিল না। তিনি সিলিয়াকে বলিলেন, "ভগিনি, আমার পিতা, সার রোলাণ্ডকে বড় ভাল বাসিতেন। যদি জানিতাম যে, এই যুবক তাঁহার পুত্র, তবে আমার কাতরতার সহিত চক্ষের জল মিশাইয়া এই দুঃসাহসিক কার্য্য হইতে ইহাঁকে নিবৃত্ত হইতে আরও অনুরোধ করিতাম।"

তারপর, রাজপুত্রীদ্বয় অর্ল্যাণ্ডোর নিকট গমন করিলেন। তাঁহারা দেখিলেন, রাজার আকস্মিক বিরাগভাব দেখিয়া অর্ল্যাণ্ডো কিছু বিস্মিত এবং অপ্রতিভ হইয়াছেন। তখন তাঁহারা বিবিধ উৎসাহ-বাক্যে তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে লাগিলেন। তারপর, তাঁহারা বিদায় গ্রহণ করিলেন। কিন্তু ফিরিয়াই রোজালিন্দ আর একটু বেশী আত্মীয়তা দেখাইবার জন্য অর্ল্যাণ্ডোর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং আপনার কণ্ঠ হইতে হার উন্মোচন করিয়া অর্ল্যাণ্ডোকে প্রদান করিয়া বলিলেন, "বীর, বীরত্বে আজ যে কেবল তোমার প্রতিদ্বন্দ্বীকে বশীভূত করিলে এমন নহে,—তোমার গুণে আর একজনের হৃদয়ও তোমার বশীভূত হইয়াছে। এই হার কণ্ঠে ধারণ করিও। ইহা আমার একান্ত অনুরোধ। আমার এখন সে সামর্থ্য নাই, নহিলে তোমার বীরত্বের উপযুক্ত উপহার প্রদান করিয়া কৃতার্থ হইতাম।"

---

(৫)

অর্ল্যাণ্ডো চলিয়া গেলে রোজালিন্দ ও সিলিয়া তাঁহারই সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। রোজালিন্দের কথাবার্ত্তা শুনিয়া এবং তাঁহার ভাবগতিক দেখিয়া সিলিয়ার বুঝিতে বাকী রহিল না যে, তাঁহার ভগিনী অর্ল্যাণ্ডোর প্রতি অনুরাগিনী হইয়াছেন। তিনি হাসিয়া বলিলেন, "ভগিনি, ইহা কি সত্য যে, হঠাৎ সেই যুবককে এমনই ভালবাসিলে!"

রোজালিন্দ। আমার পিতা অর্ল্যাণ্ডোর পিতাকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন।

সিলিয়া। তাহা হইলে তাহাই কি বুঝিতে হইবে, তুমিও তাঁহার পুত্রকে ভাল বাসিবে? তাহা হইলে আমার বরং অর্ল্যাণ্ডোকে ঘৃণা করাই উচিত। কেননা, আমার পিতা তাঁহার পিতাকে ঘৃণা করিতেন। কিন্তু তা বলিয়া অর্ল্যাণ্ডোকে ত আমি ঘৃণা করি না!

দুই জনের এইরূপ নানাপ্রকার কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। রোজালিন্দের মধুর প্রকৃতি সকলে ভালবাসিত এবং তাঁহাকে উপলক্ষ্য করিয়া সকলেই নির্ব্বাসিত রাজার জন্য দুঃখ করিয়া তাঁহার প্রতি যথেষ্ট স্নেহ প্রকাশ করিত। আজ অর্ল্যাণ্ডোর সবিশেষ পরিচয় পাইয়া ফ্রেডারিকের মনে বড় একটা বিষের আগুন জলিয়া উঠিল। যে কেহ নির্ব্বাসিত ডিউকের জন্য এতটুকু সমবেদনা প্রকাশ করিত, কিংবা যে কেহ রোজালিন্দের প্রতি

এতটুকু দুঃখ প্রকাশ করিত, অথবা স্নেহ দেখাইত, সেই ফ্রেডারিকের বিরাগভাজন হইত। এজন্য ফ্রেডারিকের রোজালিন্দের উপরও একটু ঘৃণা ছিল। আজ সহসা সে ভাবটা পূর্ণমাত্রায় বাড়িয়া উঠিল এবং যখন রোজালিন্দ ও সিলিয়া অর্ল্যাণ্ডোর কথা লইয়া নানা প্রকার হাস্য পরিহাস করিতেছিল, ফ্রেডারিক ক্রুদ্ধ হইয়া সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন এবং দৃঢ়তার সহিত বলিলেন,—চক্ষু তখনও আরক্তবর্ণ,—বলিলেন, "রোজালিন্দ, তুমি এই দণ্ডেই আমার গৃহ পরিত্যাগ করিয়া তোমার নির্ব্বাসিত পিতার নিকট চলিয়া যাও।"

সিলিয়া কাঁদিয়া-কাটিয়া পিতাকে এ সঙ্কল্প হইতে নিবৃত্ত হইতে বলিলেন; কিন্তু ফ্রেডারিক বলিলেন, "সিলিয়া, কেবল তোমারই জন্য উঁহাকে এত দিন গৃহে রাখিয়াছি, তাড়াইয়া দিই নাই।"

সিলিয়া। কৈ বাবা, আমি ত কখন উহাকে রাখিতে তোমায় বলি নাই! তখন আমি অতি বালিকা ছিলাম, রোজালিন্দের মর্ম্ম বুঝি নাই;—তখন তাড়াইলে বুঝি দুঃখ হইত না। কিন্তু এখন আমি ইহাকে চিনিয়াছি, ইহার মর্ম্ম বুঝিয়াছি;—তাই বাবা, তোমায় অনুরোধ করিতেছি, ইহাকে তাড়াইও না। আমরা একত্র শয়ন করিয়াছি, একই সময়ে একত্রে উঠিয়াছি, এক সঙ্গে লেখা-পড়া শিখিয়াছি, একত্রে পান ভোজন করিয়াছি,—বাবা, এত-দিনের সঙ্গিনী পরিত্যাগ করিয়া আমি থাকিতে পারিব না।"

ফ্রেডারিক। তুমি বড় অজ্ঞান, উহার ভিতর যে চাতুরী, তাহার মর্ম্ম বুঝিতে তোমার সাধ্য নাই। উহার ঐ শান্তমূর্ত্তি, ঐ উদার ভাব, ঐ সহিষ্ণুতা, অধিক কি, উহার ঐ অল্প কথাবার্ত্তা সর্ব্ব লোকের বড়ই প্রীতিকর, তাই সকলেই উহার পক্ষপাতী। ও, চলিয়া গেলে, তোমারই রূপ-গুণের সুখ্যাতি সকলের মুখে মুখে ফিরিবে। উহার জন্য তুমি কোন অনু-রোধ করিও না। যাহা বলিয়াছি, তাহা অন্যথা হইবার নয়।

সিলিয়া নিরস্ত হইল। তখন সে মনে মনে ঠিক করিল, রোজালিন্দ যদি নির্ব্বাসিত হইল, তবে আমিও উহার সঙ্গ লইব।

---

(৬)

সিলিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিলেন, "আমরা দুইজনেই স্ত্রীলোক;—এমন অবস্থায় আমাদের এই পরিচ্ছদে দেশ পর্য্যটন করা সুবিধার কথা নহে";—সুতরাং তিনি স্থির করিলেন যে, দুই জনে দুইটী কৃষক-কুমারীর ন্যায় বেশ ধারণ করিয়া প্রস্থান করিবেন।

রোজালিন্দ। দুইজনেই কুমারী না হইয়া একজন বরং কৃষক-কুমারী আর একজন কৃষক-কুমারের বেশ ধারণ করি এস।

সেই যুক্তিই স্থির হইল। আকৃতিতে রোজালিন্দ সিলিয়া অপেক্ষা কিছু বড়। সুতরাং রোজালিন্দ কৃষক-কুমার এবং সিলিয়া কৃষক-কুমারী সাজিলেন। দুইজনে ভ্রাতা-ভগিনী বলিয়া পরিচয় দিবেন, এইরূপ স্থির করিলেন।

আপনাদের এইরূপ বেশভূষা-পরিবর্ত্তন করিয়া পথ খরচের জন্য কিছু অলঙ্কার ও অর্থাদি লইয়া উভয়ে নিশীথে গোপনে বাটীর বাহির হইলেন। উদ্দেশ্য, আর্ডেন-কাননে নির্ব্বাসিত ডিউকের নিকট দুইজনে উপস্থিত হইবেন।

রোজালিন্দ এক্ষণে পুরুষের বেশ ধারণ করিয়াছেন। নাম পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তন করিয়া গ্যানিমেড্ নাম ধারণ করিয়াছেন, সুতরাং তিনি পুরুষের নির্ভীকভাবও যেন কতকটা ধারণ করিলেন। যে অকৃত্রিম স্নেহের টানে সিলিয়া রাজভবনের সকল সুখে জলাঞ্জলি দিয়া

রোজালিন্দের সহিত এই দুঃসহ পথক্লেশ স্বীকার করিয়াছিলেন, রোজালিন্দ সে অকৃত্রিম স্নেহ পরিষ্কাররূপে বুঝিয়াছিলেন; তাই তিনি নানা প্রকারে সিলিয়ার চিত্ত প্রফুল্ল রাখিতে যত্নবতী হইলেন। রোজালিন্দ এমনই সুন্দর কথা-বার্ত্তায় ও আনন্দ উৎসাহে চলিতে লাগিলেন যে, বোধ হইল, যেন সত্যসত্যই তিনি এক কষ্টসহিষ্ণু নির্ভীক কৃষক-যুবক এবং তাঁহার ভগিনী পল্লীবাসিনী এ্যালিয়েনার অভিভাবক। যথাসময়ে তাঁহারা আর্ডেন-কাননে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বলা বাহুল্য, সেখানে একটা অতিথিশালা, কিংবা বাজার হাট কিছুই মিলিল না। দুইজনেই ক্ষুধায় ও পরিশ্রমে কাতর হইয়া পড়িলেন। রোজালিন্দ এ পর্য্যন্ত নানা-প্রকার কথাবার্ত্তায় ভগিনীকে প্রফুল্ল করিতে-ছিলেন, কিন্তু এখন নিজেই ক্ষুধায় একান্ত কাতর হইয়া বলিলেন, "বোন্, ক্ষুধায় এত আকুল হইয়াছি যে, পুরুষের পরিচ্ছদ আর আমার সাজে না। আমার মনে হইতেছে যে, পুরুষের বেশ দূর করিয়া ফেলিয়া দিয়া একবার স্ত্রীলোকের মত একটু কাঁদিয়া বাঁচি।

সিলিয়া। আমিও আর এক পা চলিতে পারিতেছি না।

তখন রোজালিন্দ আবার ভাবিলেন, "সে কি, আমি যে পুরুষ সাজিয়াছি! এ অবস্থায় পুরুষ যাহা করে, আমারও তাহাই করা উচিত।" প্রকাশ্যে সিলিয়াকে বলিলেন, "ভগিনি, এত কাতর হইও না, আর অধিক দূর নাই। এই ত কাননের শেষ সীমায় আসিয়াছি। এখনই সকল দুঃখ অবসান হইবে,—ভাবনা কি?"

কিন্তু ক্ষুধা ও তৃষ্ণা এ প্রবোধবাণী বুঝিতে চাহিল না। পুরুষের সাজে এবং কৃত্রিম সাহসে কতক্ষণ সে ব্যাকুলতা নিবারিত হইবে? রাজকুমারীদ্বয় আর্ডেন-কাননে উপস্থিত হইয়া-ছেন বটে, কিন্তু সে কানন কতদূর বিস্তৃত, তাহার কোন্ সীমায় নির্ব্বাসিত রাজা বাস করেন, তাহা কে জানে? ক্ষুধায় দুইজনে এত ব্যাকুল হইয়াছিলেন যে, তাঁহারা ভাবিলেন, সেই কাননের ভিতর অনশনে বুঝি দুইজনকেই প্রাণ হারাইতে হইবে! কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ যখন তাঁহারা ক্ষুধায় একান্ত কাতর এবং আহা-রের কোন সম্ভাবনা নাই জানিয়া একান্ত নিরাশ-প্রাণে ভূমির উপর বসিয়া আছেন, সেই সময় একজন মেষপালক সেইখানে উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া রোজালিন্দ অতি কষ্টে বলিলেন, "মেষপালক, অর্থে কিংবা ভালবাসায় যদি কেহ আমাদিগকে কিছু খাদ্য-সামগ্রী এবং একটু বিশ্রামের স্থান দেয়, তবে দয়া করিয়া সেই খানে আমাদিগকে লইয়া চল। এই দেখ, আমার এই বালিকা ভগিনীটী ক্ষুধায় ও পথশ্রমে একেবারে নিতান্তই অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে।"

---

(৭)

মেষ-পালক বলিল, "আমি একজনের ভৃত্য মাত্র। আমার প্রভুর বাড়ী-ঘর শীঘ্রই বিক্রয় হইতেছে। তোমাদিগকে সেখানে লইয়া যাইলে ভাল করিয়া তোমাদিগকে খাইতে দিতে পারিব না। তথাপি যাহা কিছু আছে, সঙ্গে আনিলে দিতে পারি।"

রোজালিন্দ ও সিলিয়াকে আমরা এখন গ্যানিমেড্ ও এ্যালিয়েনা বলিয়া উল্লেখ করিব। গ্যানিমেড্ ও এ্যালিয়েনা মেষপালকের সহিত তাহার প্রভুর গৃহে চলিলেন। সেখানে পান-ভোজন করিয়া পথশ্রান্তি দূর হইলে, তাঁহারা সেই মেষ-পালকের প্রভুর বাটী ও মেষপাল ক্রয় করিয়া লইলেন এবং সেই ভৃত্যকেই আপনা-দের ভৃত্যরূপে নিযুক্ত করিলেন।

এইরূপে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কুটীর ও প্রচুর আহার সামগ্রীর উপযোগী দ্রব্য সেইখানেই

তাঁহারা পাইলেন এবং যে পর্য্যন্ত না নির্ব্বাসিত রাজার কোন সন্ধান পাওয়া যায়, সে পর্য্যন্ত সেইখানে থাকিতে সঙ্কল্প করিলেন।

কিছু দিনের বিশ্রামের পর রাজপুত্রীদ্বয়ের পথ-শ্রমের সকল শ্রান্তি দূর হইল। তাঁহারা এ অবস্থায় বেশ সন্তুষ্ট থাকিলেন। আপনারা সত্য সত্যই যেন দুইটী কৃষক বালক-বালিকা, এইরূপ মনে করিয়া আনন্দে দিন কাটাইতে লাগিলেন। কিন্তু নাম-পরিবর্ত্তন করিলেও এবং বেশ-পরিবর্ত্তন করিয়া পুরুষ সাজিলেও, গ্যানিমেড্ যে রাজকুমারী রোজালিন্দ, সে কথা তিনি ভুলিতেন না এবং সার রোলাণ্ডের কনিষ্ঠ পুত্র অর্‌ল্যাণ্ডো যে তাঁহার প্রণয়-ভাজন, সে কথাও তিনি ভুলিয়া যান নাই। অনেক সময়ে সেই কথা বার বার মনে পড়িত। অর্‌ল্যাণ্ডো রাজধানীতে কত দূরে আছেন, রোজালিন্দও আজ কত দূরে!—রাজধানী হইতে যে পথ পর্য্যটন করিয়া রোজালিন্দ এত দূরে আসিয়াছেন, আবার ততটা পথ না ফিরিলে, ততটা ক্লেশ অনায়াসে সহ্য করিতে না পারিলে, অর্‌ল্যাণ্ডোকে ত দেখা যাইবে না। রোজালিন্দ তাহাই ভাবিতেন।

কিন্তু অর্‌ল্যাণ্ডোও যে, সেই কাননে আসিয়াছিলেন, তাহা শীঘ্র প্রকাশ পাইল। সে কথা বলিতেছি।

---

(৮)

সার রোলাণ্ড মৃত্যুকালে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র অলিভারের উপর কনিষ্ঠ পুত্র অর্‌ল্যাণ্ডোর সকল ভার দিয়া যান এবং অলিভারকে বিশেষ রূপে বলিয়া যান, যেন তাহার শিক্ষার কোন ত্রুটী না হয় এবং যাহাতে আপনাদের বংশ-গৌরব ও কুলমর্য্যাদা রক্ষা করিয়া সে জীবন অতিবাহিত করিতে পারে, সে বিষয়ে যেন অলিভার কোন ত্রুটী না করে।

পিতার মৃত্যুর পর অলিভার সে কথা রক্ষা করিল না। হিংস্রক, এ পর্য্যন্ত কোন শিক্ষকের উপর অর্‌ল্যাণ্ডোর শিক্ষাভার অর্পণ করে নাই। কখনও কোন বিদ্যালয়ে পাঠায় নাই। বাটীতে সামান্যভাবে তাহাকে রাখিয়া দিয়াছিল। কিন্তু অর্‌ল্যাণ্ডো হৃদয়ের গুণে এত শান্তস্বভাব ও শিষ্ট-প্রকৃতি ছিলেন যে, পিতার অনুরূপ বলিয়া লোক-সমাজে তাঁহার যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। আর অলিভার, কনিষ্ঠের দেহের সৌন্দর্য্য এবং অন্তরের মাধুর্য্য দেখিয়া এত দূর হিংসা করিত যে, তাহাকে হত্যা পর্য্যন্ত করিতে সঙ্কল্প করিয়াছিল। এইজন্যই বহু হত্যাকারী সেই মল্লযোদ্ধার সহিত পরামর্শ করিয়া তাহাকে মল্লযুদ্ধের জন্য উৎসাহিত করিয়াছিল। ভ্রাতার এইরূপ ব্যবহার এবং সর্ব্ব বিষয়ে তাহার প্রতি অনাস্থা ও উপেক্ষার ভাব দর্শন করিয়া অর্‌ল্যাণ্ডো নিয়তই মৃত্যুকামনা করিত এবং জীবন ধারণ বিড়ম্বনা জানিয়া সেইরূপ মল্লের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। কিন্তু যখন শুনা গেল যে, এই যুদ্ধে অর্‌ল্যাণ্ডো জয় লাভ করিয়াছেন, এবং তাহাতে অর্‌ল্যাণ্ডোর প্রশংসা বাড়িয়াছে, তখন অলিভারের হিংসার আর অবধি রহিল না। পাপিষ্ঠ মনে মনে ঠিক করিল যে, রাত্রিকালে অর্‌ল্যাণ্ডো ঘুমাইলে, তাঁহার গৃহে অগ্নি দিয়া তাঁহাকে পোড়াইয়া মারিবে। কিন্তু সে উদ্দেশ্যও ব্যর্থ হইল।

আদম নামে তাহাদের পিতার আমল হইতে এক অতি পুরাতন বিশ্বস্ত ভৃত্য ছিল। সেই বৃদ্ধ, অলিভার অপেক্ষা অর্‌ল্যাণ্ডোকে অধিক ভাল বাসিত। এই বালকের মুখে বৃদ্ধ তাহার মৃত প্রভুর প্রতিকৃতি দেখিতে পাইত। যখন অর্‌ল্যাণ্ডো যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া গৃহে ফিরিতেছিলেন, আদম একেবারে কাঁদিয়া আকুল হইয়া বলিতে লাগিল; "আমার প্রভু, আমার একান্ত স্নেহের আস্পদ, তোমাকে

দেখিয়াই আমার সেই মৃত প্রভুকে মনে পড়ে। কেন তুমি এমন বিপদে গিয়াছিলে? লোক-মুখে তোমার প্রশংসা ধরিতেছে না,—কেন তুমি এত সুন্দর হইয়াছিলে? কেন এত গুণ লইয়া তুমি জন্মিয়াছিলে? হায়, তোমার প্রশংসাই তোমার সর্ব্বনাশ করিতেছে!"

অর্‌ল্যাণ্ডো বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইয়াছে? তুমি কি বলিতেছ, বুঝিতে পারিতেছি না।"

বৃদ্ধ তখন একে একে সকল বলিল। বলিল "লোক-মুখে তোমার প্রশংসা শুনিয়া তোমার গুণধর ভাই তোমাকে পোড়াইয়া মারিবার সঙ্কল্প করিয়াছে। আমি বুঝিতেছি, পলায়ন ভিন্ন তোমার প্রাণরক্ষার আর উপায় নাই। এখানে থাকিলে কোন-না-কোন দিন এইরূপেই প্রাণ হারাইতে হইবে!"

অর্‌ল্যাণ্ডো। তুমি ত জান, আমার কিছুই নাই! আমি যেমন আত্মীয়-স্বজন-হীন, তেমনি অর্থহীন, সঙ্গতিহীন, উপায়হীন।

আদম। তাহা আমি জানি। তাহার উপায়ও ঠিক করিয়াছি। দেখ, এ অবধি আমার যাহা কিছু সংস্থান হইয়াছে, তাহা আমি সঙ্গে আনিয়াছি। মনে করিয়াছিলাম, যখন খাটিয়া খাইবার আর শক্তি থাকিবে না, তখন যৌবনের সঞ্চিত এই অর্থে দিন চালাইতে পারিব। বৎস, আমার যাহা কিছু সংস্থান ছিল, তোমায় দিতেছি। যিনি প্রভাত হইলে পশুপক্ষীর আহার যোগাইয়া থাকেন, আমার বৃদ্ধ বয়সে, তিনি আমাকেও দেখিবেন! আর এক কথা, আমি আজীবন তোমারই ভৃত্য থাকিব। বৃদ্ধ হইলেও এখনও এ শরীরে কিছু বল আছে।

অর্‌ল্যাণ্ডো ভৃত্যের এই আত্ম-বিসর্জ্জন দেখিয়া বিস্ময়ে ও আনন্দে অভিভূত হইলেন। কৃতজ্ঞতাভরে আনন্দগদ্গদস্বরে তিনি বলিলেন, "বৃদ্ধ, তোমাতে আমি প্রাচীন কালের সেই অকৃত্রিম মহত্ত্ব ও দেবভাব দেখিতেছি। তুমি এ যুগের লোক নহ। তোমারই সঙ্গে আমি স্থানান্তরে যাইব এবং তোমার এই ক্লেশসঞ্চিত বহুদিনের অর্থ সম্পূর্ণ শেষ না করিয়া আমি বরং অন্য উপায়ে আমাদের জীবন-ধারণের উপায় স্থির করিব।"

এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া আদম-সমভিব্যাহারে অর্‌ল্যাণ্ডো গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। কোথায় যাইবেন, তাহার স্থিরতা ছিল না; কিন্তু ঘুরিতে ঘুরিতে অবশেষে সেই আর্ডেন-কাননে উপস্থিত হইলেন।

সেই কথাটী বলিতেছিলাম।

---

(৯)

এই আর্ডেন-কাননে আসিয়া রোজালিন্দ ও সিলিয়া যেরূপ ক্ষুধায় ক্লিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন, অর্‌ল্যাণ্ডো ও তাঁহার ভৃত্য আদমকেও সেইরূপ ক্ষুৎপিপাসায় ক্লিষ্ট হইয়া পড়িতে হইল। আহার কোথাও মিলিল না। অনেকক্ষণ ধরিয়া লোকালয় অন্বেষণ করিতে করিতে আদম এমনই কাতর হইয়া পড়িল যে, আর এক পদ নড়িবারও সামর্থ্য রহিল না। সে, সেই ভূমিতে শয়ন করিয়া তাহার প্রভুর নিকট বিদায়-প্রার্থনা করিল। তাহার মনে হইল, বুঝি এইখানেই তাহার জীবনশেষ হইবে।

অর্‌ল্যাণ্ডো তাহার এই অবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া তাহাকে বাহুমধ্যে আবদ্ধ করিয়া এক শীতল বৃক্ষচ্ছায়ায় উপবেশন করাইলেন এবং বলিলেন, "আদম, ততক্ষণ এইখানে বিশ্রাম কর, আমি শীঘ্রই ফিরিতেছি। মরিবার কথা মুখে আনিও না।"

সেই বৃক্ষচ্ছায়ায় আদমকে রাখিয়া অর্‌ল্যাণ্ডো আহার-অন্বেষণে বাহির হইলেন এবং ঘটনাক্রমে আর্ডেন-কাননের যে অংশে সেই

নির্ব্বাসিত ডিউক অবস্থান করিতেন, সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই সময় রাজা এবং তাঁহার পারিষদবর্গ শ্যামল-তৃণাচ্ছাদিত ভূমির উপর বসিয়া আহারের উদ্যোগ করিতেছিলেন। মাথার উপর ঘনপত্রবিশিষ্ট তরুরাজি, নিম্নে তাহার প্রশান্ত ছায়া।

অর্‌ল্যাণ্ডো ক্ষুধায় অধৈর্য্য হইয়াছিলেন। তাঁহার হিতাহিতজ্ঞান লোপ পাইয়াছিল। মনে হইয়াছিল, চাহিলে হয়ত ইহারা কিছু দিবে না,—তাই বলপূর্ব্বক খাদ্য গ্রহণ করিবার জন্য তরবারি নিষ্কাষিত করিয়া কহিলেন, "থাম, আহার করিও না। তোমাদের এই সমস্ত খাদ্য আমার চাই।" সহসা একজন আগন্তুকের এই ব্যবহার দেখিয়া রাজা জিজ্ঞাসিলেন, "যুবক, জঠরজ্বালা কি তোমায় এমনই উন্মত্ত করিয়া তুলিয়াছে যে, তোমাতে আর এতটুকু ভদ্রতা বা শিষ্টাচার রাখে নাই?"

অর্‌ল্যাণ্ডো। ওঃ! আমি ক্ষুধায় মরিয়া যাই।

রাজা। তবে এস, একত্রে আহার করি।

তখন অর্‌ল্যাণ্ডো প্রকৃতিস্থ হইলেন। কিছু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "আমি মনে করিয়াছিলাম, এই অরণ্যে সকলেই বন্যপশুর ন্যায়,—চাহিলে হয়ত পাইব না, সেই জন্যই বলপ্রকাশ করিতেছিলাম। নিজগুণে আমায় ক্ষমা করুন। আপনারা কে, তাহা জানি না। দেখিতেছি, এই বনে, এই শীতল বৃক্ষচ্ছায়ায় বসিয়া, অতি নির্ব্বিঘ্নে দিন কাটাইতেছেন;—যদি কখন আপনাদের সৌভাগ্যের দিন গিয়া থাকে; যদি কখন দেব-মন্দিরে মঙ্গল শঙ্খধ্বনি শুনিয়া থাকেন; যদি কখন কোন মহৎ লোকের আতিথ্যসৎকার গ্রহণ করিয়া থাকেন; যদি কখন কাহারও জন্য এক বিন্দু অশ্রু মুছিয়া থাকেন এবং কাহারও দুঃখ দেখিয়া হৃদয়ে বেদনা অনুভব করিয়া থাকেন, কিংবা আপনাদের নিজের দুঃখে যদি অন্যে কখন দুঃখিত হইয়া থাকেন, তবে আমার কাতর-প্রার্থনা এই যে, আমার এই দুঃখের সময় যেন আপনাদের দয়ার সঞ্চার হয়।"

রাজা। সত্য বটে, আমরাও এক দিন সুখের দিন দেখিয়াছি; এখন যদিও এই অরণ্যই আমাদের বাসস্থান হইয়াছে, তথাপি একদিন আমরাও নগরে ছিলাম; দেবমন্দিরের মঙ্গল শঙ্খধ্বনি শুনিয়াছি; মহতের আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছি; পরদুঃখ কাতর হইয়া চক্ষের জল ফেলিয়াছি;—এ সকলই সত্য। আমরা তোমাকে অনুরোধ করিতেছি, তুমি আমাদের সঙ্গে বসিয়া আহার কর।

অর্‌ল্যাণ্ডো। আমার সঙ্গে এক জন বৃদ্ধ আছে। নিঃস্বার্থ স্নেহে এই অরণ্যে সে আমার অনুসরণ করিয়াছে। ক্ষুৎপিপাসায় সে মৃতপ্রায় হইয়া দূরে পড়িয়া আছে। মহাশয়, ক্ষমা করুন,—তাহাকে না খাওয়াইয়া আমি বিন্দুমাত্রও জলগ্রহণ করিব না।

রাজা। তুমি এখনই তাহাকে এখানে লইয়া আইস। তোমরা যতক্ষণ না আসিবে, ততক্ষণ আমরা কেহই আহারে প্রবৃত্ত হইব না।

তখন অর্‌ল্যাণ্ডো,—হরিণী যেমন আপন শাবকটীকে খাওয়াইবার জন্য ব্যাকুল-প্রাণে ছুটিয়া যায়, সেই বৃদ্ধকে আনিবার জন্য তিনিও সেইরূপ ব্যাকুলভরে প্রস্থান করিলেন এবং আদমকে লইয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। রাজা তাহা দেখিয়া কহিলেন "বৃদ্ধকে তোমার বাহু মধ্য হইতে নামাও এবং তোমরা দুই জনেই আহার করিতে ব'স।"

বৃদ্ধের কথা কহিবার আর সামর্থ্য ছিল না। পান ও ভোজনের পর যেন তাহার প্রাণ ফিরিয়া আসিল।

তারপর পরস্পরের পরিচয়াদি জিজ্ঞাসা চলিল। রাজা, অর্‌ল্যাণ্ডোকে আপনার বন্ধুপুত্র বলিয়া জানিলেন এবং অর্‌ল্যাণ্ডোও রাজার পরিচয় পাইলেন। তখন আদম-সমভিব্যাহারে অর্‌ল্যাণ্ডো সেই কাননে রাজার আশ্রয়ে রহিলেন।

---

(১০)

রোজালিন্দ এবং সিলিয়া নাম এখন কিছুক্ষণের জন্য আমাদিগকে ভুলিতে হইবে। রোজালিন্দ কৃষক-কুমারের বেশে থাকিতেন; তাঁহার নাম—গ্যানিমেড এবং সিলিয়া কৃষক-কুমারীর বেশে—এ্যালিয়ানা।

গ্যানিমেড এবং এ্যালিয়ানা আর্ডেন-কাননে ইতস্ততঃ বেড়াইতে বেড়াইতে দেখিতেন, কোন বৃক্ষের শাখায় কেহ যেন "রোজালিন্দ" নাম লিখিয়া রাখিয়াছে। কোথাও বা বৃহৎ তরুগাত্রে রোজালিন্দকে উদ্দেশ করিয়া কে এক "প্রণয়গাথা" ক্ষোদিত করিয়া দিয়াছে। দুই জনে এ রহস্যের কিছুই বুঝিলেন না; পরস্পরে মুখ-চাওয়াচাওয়ি করিলেন। কিছু বিস্মিত ও কৌতূহলাক্রান্ত হইলেন।

একদিন ঘটনাক্রমে তাঁহারা অর্‌ল্যাণ্ডোকে দেখিতে পাইলেন। রোজালিন্দ ইহাও দেখিলেন যে, সেই মল্লযুদ্ধদিনে তিনি যে হার অর্‌লাণ্ডোকে উপহার দিয়াছিলেন, তাহা আজিও অর্‌ল্যাণ্ডোর কণ্ঠে শোভা পাইতেছে। তখন আর কিছুই বুঝিতে বাকী রহিল না। অর্‌ল্যাণ্ডো রোজালিন্দকে চিনিতে পারিলেন না। সেই কৃষক-কুমারের বেশে যে রোজালিন্দ এই কাননে বাস করিতেছিল, ইহা কে বুঝিতে পারে? কিন্তু অর্‌ল্যাণ্ডোর হৃদয়ে সে সৌন্দর্য্য ও লাবণ্যের প্রতিমা দিবারাত্রি বিরাজ করিত। তাই একান্ত আগ্রহে, হৃদয়ের পূর্ণোচ্ছ্বাসে, বৃক্ষের ত্বকে ত্বকে প্রিয়তমার পবিত্র নাম ক্ষোদিত করিয়া, বৃক্ষের শাখায় শাখায় প্রেমগাথা ঝুলাইয়া দিয়া, কখন কিছু তৃপ্তি পাইতেন;

কখন বুঝিতে পারিতেন না যে, যাহার কল্পনা-মাত্রে এত সুখ ও এত আনন্দ, সেই স্নেহময়ী রোজালিন্দ কৃষক-কুমারের বেশে তাঁহারই পাশে পাশে ফিরিতেছেন!

মাঝে মাঝে এইরূপ দেখা-সাক্ষাৎ হইত এবং দেখা-সাক্ষাৎ হইতেই পরস্পরের মধ্যে আলাপ-পরিচয় হইল, পরস্পরের মধ্যে একটু প্রণয়ও হইল। গ্যানিমেডের মুখখানি বড় সুন্দর, কথাগুলি বড় মধুর। গ্যানিমেডের কথা শুনিতে শুনিতে অর্‌ল্যাণ্ডোর মনে পড়ে, যেন তিনি রোজালিন্দের কণ্ঠস্বর শুনিতেছেন; তাঁহার মুখখানি দেখিতে দেখিতে মনে হয়, এ যেন রোজালিন্দের সেই স্নেহমাখা মুখ! কিন্তু অবয়বে ও কণ্ঠস্বরে এই সাদৃশ্যটুকু থাকিলেও অর্‌ল্যাণ্ডো দেখিলেন, গ্যানিমেড্ কিছু চঞ্চল এবং কিছু বহুভাষী,—তাঁহার রোজালিন্দ ত এমন ছিল না।

ইহার ভিতর একটু কথা আছে। বাল্যকালের সীমা অতিক্রম করিয়া যখন কেহ যৌবনের প্রথম সোপানে পদার্পণ করে, প্রায়ই দেখা যায়, সে অবস্থায় যুবক কিছু প্রগল্‌ভ হইয়া থাকে। গ্যানিমেড্‌ও নাকি আজ সেইরূপ যুবক সাজিয়াছেন, তাই সাধ করিয়া এই প্রগল্‌ভতা অভ্যাস করিয়াছিলেন এবং অভ্যাসের গুণে রোজালিন্দ এমন একটু বাচালতা শিখিয়াছিলেন যে, ভালমন্দে মিশিয়া সেটুকু মন্দ না শুনাইয়া অনেক সময় বড় মধুর লাগিত। সকল বুঝিয়াও রোজালিন্দ একদিন অর্‌ল্যাণ্ডোকে বলিলেন, "দেখ, অরল্যাণ্ডো, আমরা এতদিন এই বনে আছি,—কোন সন্ধান রাখি না,—কিন্তু বোধ হয়, কোন এক নূতন প্রেমিক এই কাননে আসিয়াছে। দেখ, ছোট ছোট গাছগুলিতে "রোজালিন্দ" নাম ক্ষোদিত করিয়া চারা গাছগুলি একেবারে নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। আবার রোজালিন্দের

সৌন্দর্য্য বর্ণনা করিয়া কতই কবিতা লিখিয়া গাছের ডালে ডালে ঝুলাইয়া রাখিয়াছে! না জানি, এ রোজালিন্দ, কে? যদি এই প্রেমিককে কখন দেখিতে পাই, তাহা হইলে তাহার এই প্রণয়-ব্যাধি ভাল করিয়া দিই।

অর্ল্যাণ্ডো স্বীকার করিলেন, তিনিই সেই প্রেমিক এবং তিনিই রোজালিন্দের জন্য উন্মত্তপ্রায়। তাই তিনি সাগ্রহে কহিলেন, "কি করিলে আমার এ প্রণয়-ব্যাধির উপশম হইতে পারে?"

গ্যানিমেড। তুমি প্রতিদিন আমাদের বাড়ীতে এসো। আমি তোমার রোজালিন্দ হইব। তুমি আমাকে তোমার রোজালিন্দ মনে করিবে এবং তাহার সহিত যেরূপ আলাপ করিতে, আমার সহিতও সেইরূপ করিবে। আমিও আরাধ্যা প্রেমিকার ন্যায় কখন হাসি ও আনন্দে তোমায় মাতাইয়া তুলিব, কখন বা ভ্রূকুটী-ভঙ্গীতে তোমার আশাভরা-হৃদয়ে নিরাশার তরঙ্গ তুলিয়া দিব। কখন বা আমার নিকট তুমি বসিয়া থাকিবে,—একটুকু কথা শুনিবার জন্য কত আগ্রহপ্রকাশ করিবে, আমি বুঝিয়াও অবজ্ঞা করিয়া একটা মিথ্যা কার্য্যে ব্যস্ত থাকিব। আবার তুমি কাছে না আসিলে কখন অভিমান করিব এবং আসিলে কখন বা বিরক্তি দেখাইব, কখন বা কাঁদিয়া-কাটিয়া তুমি অস্থির হইবে, হাসিমুখে হয় ত তোমায় ক্ষমা করিব, কখন বা একান্ত অভিমানে অশ্রুজলে বুক ভাসাইয়া তোমায় বুঝাইব, 'এ জগতের সকল যন্ত্রণা আমি মর্ম্মে মর্ম্মে বহন করিতেছি; সংসারের কোন সুখ আমার ভাগ্যে মিলিল না!' এইরূপ যুবতীর প্রেম-বৈচিত্র্যের নূতন ভঙ্গী দেখিয়া তুমি আপনার প্রেমে আপনি লজ্জিত হইবে, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে তোমার প্রণয়-ব্যাধিরও উপশম হইবে।"

গ্যানিমেডের এই প্রণয়-ব্যাধির চিকিৎসা অর্ল্যাণ্ডোর সমীচীন বলিয়া বোধ হইল না। তথাপি এ এক নূতন আমোদ ভাবিয়া তিনি গ্যানিমেডের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

———

(১১)

রোজালিন্দের পরামর্শমত অর্ল্যাণ্ডো প্রতিদিন সেখানে আসিতেন। অবশ্য, তিনি কখন বুঝিতে পারেন নাই যে, গ্যানিমেডই তাঁহার রোজালিন্দ। কিন্তু তথাপি তাঁহাকে রোজালিন্দ ভাবিয়া হৃদয়ের সকল ভাব প্রকাশ করিয়া তিনি অনেক সময় আনন্দ পাইতেন। আর বলা বাহুল্য যে, গ্যানিমেডও যথেষ্ট আনন্দ পাইতেন। কারণ তিনি জানিতেন, অর্ল্যাণ্ডো যাহা কিছু বলিতেন, তাহা তাঁহার হৃদয়েরই কথা এবং সকলই রোজালিন্দকে উদ্দেশ করিয়া!

এই ভাবেই দিন কাটিতে লাগিল। এ্যালিয়েনা ভগিনীকে এইরূপে সুখী হইতে দেখিয়া এক দিনও মনে করিয়া দেন নাই যে, নির্ব্বাসিত রাজার সহিত সাক্ষাৎ করা আবশ্যক। তিনি কোথায় আছেন, তাহা অর্ল্যাণ্ডোর নিকট তাঁহারা শুনিয়াছিলেন, একদিন পিতার সহিত রোজালিন্দের সাক্ষাৎও হইয়াছিল! কিন্তু যুবকের বেশে স্বীয় কন্যাকে রাজা চিনিতে পারেন নাই। কিছু কথাবার্ত্তার পর তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন মাত্র। চতুরা রোজালিন্দ উত্তর করিয়াছিলেন, "আপনি যে বংশসম্ভূত, আমিও সেই বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি।"

রাজা হাস্য সংবরণ করিতে পারেন নাই। কেননা, তিনি বুঝিতে পারেন নাই যে, এই ছদ্মবেশী কৃষক কুমারই তাঁহার প্রাণাধিকা তনয়া। রোজালিন্দও পিতাকে সন্তুষ্ট থাকিতে দেখিয়া আর বেশী কিছু বলিলেন না, কিছুদিন পরে আপনার প্রকৃত পরিচয় দিবেন, এইরূপ স্থির করিলেন।

———

(১২)

একদিন প্রাতে যখন অর্ল্যাণ্ডো গ্যানিমেডের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছিলেন, দেখিলেন, পথে এক ব্যক্তি নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িয়া আছে এবং একটা বৃহৎ সর্প তাহার কণ্ঠবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। অর্ল্যাণ্ডোকে আসিতে দেখিয়া সেই সর্প বনের মধ্যে লুকাইল। অর্ল্যাণ্ডো নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিলেন, একটা সিংহী মৃত্তিকার উপর থাবা পাতিয়া বসিয়া বিড়ালের ন্যায় তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সেই নিদ্রিত ব্যক্তির জাগরণ প্রতীক্ষা করিতেছে। মৃত বা নিদ্রিত ব্যক্তির উপর সিংহ কখন আক্রমণ করে না। অর্ল্যাণ্ডো যেন দৈবপ্রেরিত হইয়াই ঐ নিদ্রিত ব্যক্তিকে সর্প এবং সিংহীর হস্ত হইতে রক্ষা করিতে আসিয়াছেন। কিন্তু যখন অর্ল্যাণ্ডো দেখিলেন, সে নিদ্রিত ব্যক্তি অপর কেহই নহে, তাঁহার আপন ভ্রাতা অলিভার,—যে গুণধর ভাই তাহাকে আগুনে পোড়াইয়া মারিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল,—তখন অর্ল্যাণ্ডোর একবার মনে হইয়াছিল, "এই ক্ষুধার্ত্ত সিংহীর মুখে ইহাকে ফেলিয়া রাখিয়া চলিয়া যাই।" কিন্তু পরক্ষণেই অকৃত্রিম ভ্রাতৃস্নেহ এবং স্বভাবিক মধুর ধর্ম্মবুদ্ধি হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল। তিনি অবিলম্বে কোষ হইতে অসি নিষ্কাষিত করিয়া সিংহীকে আক্রমণ ও সংহার করিলেন। কিন্তু মহাবিক্রমশালী জন্তুর নখর ও দন্তাঘাতে অর্ল্যাণ্ডো

সিংহী সংহার।

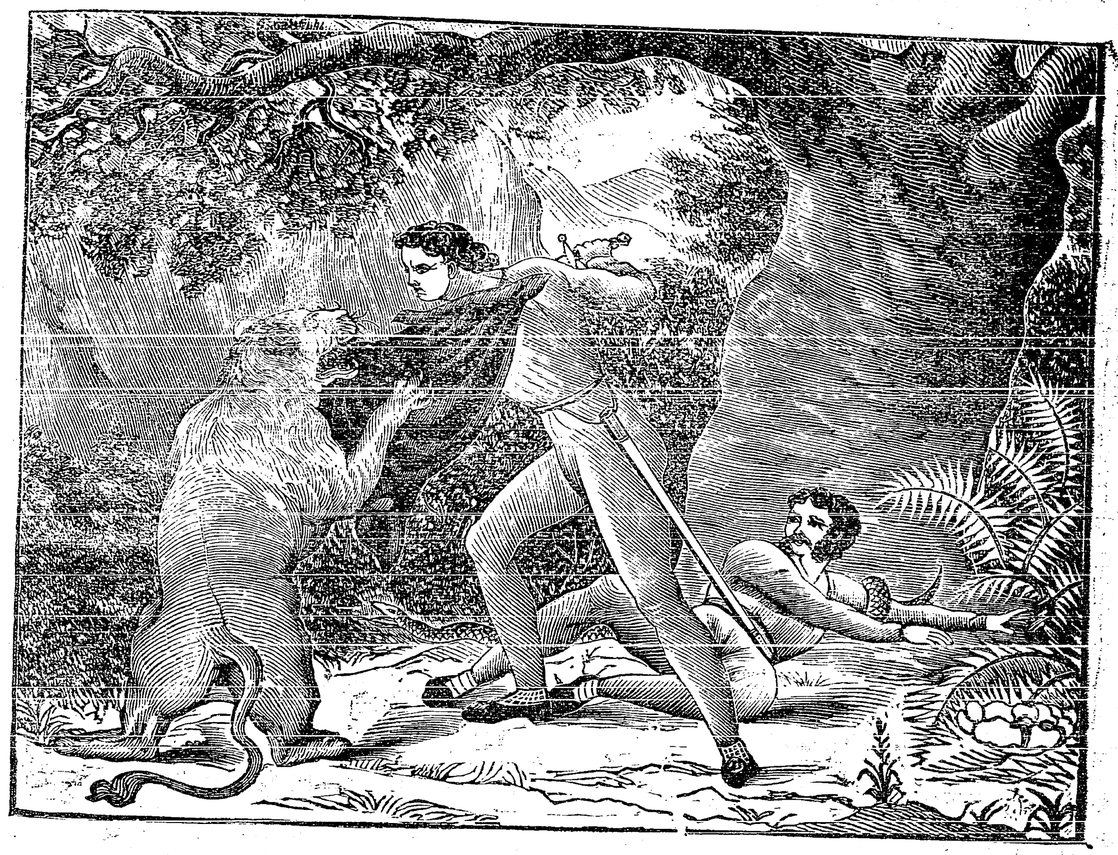

ল্যাণ্ডো ক্ষত বিক্ষত হইলেন। অর্‌ল্যাণ্ডো যখন সিংহীকে আক্রমণ করিতেছিলেন, সেই সময়ে অলিভারের নিদ্রাভঙ্গ হইল। অলিভার দেখিলেন, যে ভায়ের প্রতি তিনি আজীবন নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছেন এবং যাহার প্রাণ বিনাশ করিবার জন্যই সম্প্রতি তিনি এই আর্ডেন-কাননে উপস্থিত হইয়াছেন, সেই ভাই, আজ সিংহীর গ্রাস হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিল। কি আশ্চর্য্য! আপনার প্রাণের জন্য তাহার মমতা নাই! অলিভার অনুতাপে ও লজ্জায় একান্ত কাতর হইলেন। অর্‌ল্যাণ্ডো তাঁহাকে অনুতপ্ত দেখিয়া তাঁহার সকল অপরাধ ক্ষমা করিলেন এবং সেই হইতে সৌহার্দ্দ ও স্নেহে বদ্ধ হইয়া পরস্পরের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইলেন।

সিংহীর আঘাতে অর্‌ল্যাণ্ডের শরীর হইতে বহুপরিমাণে শোণিত নির্গত হওয়ায় তিনি অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। গ্যানিমেডের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাওয়া আর হইল না, তখন অলিভারকে সকল কথা বুঝাইয়া দিয়া তিনি বলিলেন, "তুমি গ্যানিমেড্‌কে আমার এই অবস্থার কথা জানাইও।"

অলিভার ভ্রাতার কথামত সেই কুটীরে আসিয়া গ্যানিমেড্‌ এবং এ্যালিয়েনার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং অর্‌ল্যাণ্ডোর সম্বন্ধে সকল কথা বলা হইলে তিনি আত্মপরিচয় প্রদান পূর্ব্বক অনুতপ্ত-হৃদয়ে বলিলেন, "আমি অর্‌ল্যাণ্ডোর পাপিষ্ঠ ভ্রাতা অলিভার। আমিই অর্‌ল্যাণ্ডোকে শত প্রকার অত্যাচারে কষ্ট দিয়াছি! অধিক কি, তাহাকে প্রাণে মারিবার জন্যই এতদূর পর্য্যন্ত আসিয়াছিলাম, কিন্তু সেজন্য আমি যে কতদূর অনুতপ্ত, তাহা ঈশ্বর জানেন। ভগবানের কৃপায় এক্ষণে আমাদের মধ্যে প্রীতি সংস্থাপিত হইয়াছে।"

যে ভাবে অলিভার আপনার নিষ্ঠুর ব্যবহারের কথা ব্যক্ত করিলেন এবং তাঁহার অনুতাপের মধ্যে যে অকৃত্রিম স্নেহ ও নৈসর্গিক ভালবাসা প্রকাশ পাইল, তাহাতে এ্যালিয়েনা অলিভারকে মনে মনে ভালবাসিলেন এবং অলিভারও আপনার দুঃখে এই কুমারীকে দুঃখিত হইতে দেখিয়া তাঁহাকে ভাল বাসিলেন। প্রেম যখন এইরূপ চুপি চুপি দুইজনের হৃদয়ে আসিয়া আপনার আধিপত্য বিস্তার করিতেছিল, তখন গ্যানিমেড অর্‌ল্যাণ্ডোর দুর্দ্দশার কথা ভাবিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। গ্যানিমেডের পক্ষে সেটা কিছু অস্বাভাবিক হয় নাই। কেবল এ্যালিয়েনাই তাহা বুঝিত। এ্যালিয়েনার যত্নে গ্যানিমেডের মূর্চ্ছাভঙ্গ হইল।

মূর্চ্ছা হইতে উঠিয়া চতুরা রোজালিন্দ অলিভারকে বলিলেন, "আপনি দেখিলেন, আপনার ভ্রাতার বিপদের কথা শুনিয়া আমি কেমন মূর্চ্ছিত হইয়াছিলাম! আপনার ভ্রাতাকে অতি অবশ্য অবশ্য এ কথা বলিবেন। রোজালিন্দও এ কথা শুনিলে ঠিক এইরূপ করিত।"

কিন্তু অলিভার দেখিলেন, এ মূর্চ্ছা কৃত্রিম নহে। সে মুখচ্ছবি এখনও ম্লান; সে সুন্দর গণ্ডস্থল এখনও পাণ্ডুবর্ণ।—তিনি চতুরতার সহিত বলিলেন, "যখন তুমি এমন সুন্দর অনুকরণ করিতে পার, তখন পুরুষেরই অনুকরণ করিও।"

চতুরা রোজালিন্দও উত্তর করিলেন, "আমিও তাহাই করি। নহিলে সর্ব্বাংশে আমাকে ঠিক স্ত্রীলোকের মত দেখিতে পাইতেন।"

অলিভারের বিদ্যাবুদ্ধি আর খাটিল না।

---

(১৩)

সেই কুটীর হইতে ফিরিতে অলিভারের অবশ্যই কিছু বিলম্ব হইয়াছিল। যথাসময়ে অর্‌ল্যাণ্ডোর নিকট আসিয়া তিনি সকল কথাই

বলিলেন। তাঁহার বিপদের কথা শুনিয়া গ্যানিমেড কেমন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহা সবিশেষ বলিলেন, তাহার পর এ্যালিয়েনার প্রতি তাঁহার যে ভালবাসা জন্মিয়াছে এবং সে কুমারীও যে,তাহাতে অমত প্রকাশ করেন নাই, তাহাও বলিলেন। এ্যালিয়েনার কথা বলিতে বলিতে অলিভার হৃদয় উন্মুক্ত করিয়া বলিতে লাগিলেন, "আমি মনে করিয়াছি, এ্যালিয়েনাকে লইয়া এই স্থানে মেষ-পালকের ন্যায় অবস্থান করিব; আর ভাই, তুমি গৃহে গিয়া সকল বিষয়-বৈভব লইয়া সুখী হও।"

অর্‌ল্যাণ্ডো শেষ কথায় আপত্তি করিয়া বলিলেন, "যদি যথার্থই তুমি তাহাকে ভালবাসিয়া থাক, তবে এ বিবাহে আমার সম্পূর্ণ অভিমত আছে। কল্যই তোমরা বিবাহ কর। আমি, রাজা ও তাঁহার অমাত্যবর্গকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিব। তুমি যাও, এ্যালিয়েনাকে তোমার অভিলাষ জানাইয়া তাঁহাকে বিবাহে স্বীকার করাও। তিনি কুটীরে একাকিনী আছেন;—ঐ দেখ না, তাঁহার ভ্রাতা এই দিকেই আসিতেছেন।

বস্তুতঃ সেই সময় গ্যানিমেড অর্‌ল্যাণ্ডোকে দেখিবার জন্য আসিতেছিলেন। অলিভার সুযোগ বুঝিয়া এ্যালিয়েনার নিকট প্রস্থান করিলেন। গ্যানিমেড্‌ ম্লানমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন, "অর্‌ল্যাণ্ডো, তুমি এখন কেমন আছ?"

অর্‌ল্যাণ্ডো বলিলেন, "সিংহীর আক্রমণ তত সাংঘাতিক হয় নাই, ভয়েরও কোন কারণ নাই!"

শুনিয়া গ্যানিমেড্‌ কিছু আশ্বস্ত হইলেন। তার পর, উভয়ে অলিভার ও এ্যালিয়েনার ভালবাসা ও বিবাহের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া সেই বিষয়ের আলোচনা করিতে লাগিলেন। ক্ষণপরে অর্‌ল্যাণ্ডো আপনার অন্তর-বেদনা প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "হায়, আমার ভাগ্যে এমন দিন কি ঘটিবে যে, রোজালিন্দকে পাইয়া আমিও এক দিন সুখী হইতে পারিব?"

অর্‌ল্যাণ্ডোর আন্তরিক অভিলাষ বুঝিয়া গ্যানিমেড বলিলেন, "তুমি মুখে যাহা বলিতেছ, তাহা যদি তোমার যথার্থ অন্তরের কথা হয়, তাহা হইলে আমি কল্যই তোমার বাসনা পূর্ণ করিতে পারি। আমি এই কানন হইতেই রোজালিন্দকে সশরীরে বাহির করিতে পারি এবং যাগতে তিনি তোমাকে বিবাহ করিতে পারেন, সে ভারও গ্রহণ করিতে পারি।"

গ্যানিমেড্‌ নিজে রোজালিন্দ, সুতরাং রোজালিন্দকে সে স্থানে উপস্থিত করায় আশ্চর্য্য কি আছে? কিন্তু অর্‌ল্যাণ্ডো কহিলেন, "ইহা নিতান্ত বিস্ময়কর! রোজালিন্দ এখানে কোথা হইতে আসিবেন?"

কিন্তু গ্যানিমেড্‌ বলিলেন যে, তিনি কিছু ঐন্দ্রজালিক বিদ্যা জানেন; তাহারই প্রভাবে এই অসম্ভব ব্যাপার সংঘটন করিতে পারিবেন!

প্রণয়-বিমুগ্ধ অর্‌ল্যাণ্ডো অবিশ্বাসের সহিত বিশ্বাস মিশাইয়া, নিতান্ত আশায় আগ্রহভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন;—"কিন্তু গ্যানিমেড্‌, তুমি যাহা বলিতেছ, ইহা কি নিশ্চয়ই সত্যে পরিণত করিতে পারিবে? তুমি প্রলাপ বকিতেছ না ত?"

গ্যানিমেড্‌। আমি সত্যই বলিতেছি। যদি তুমি তাঁহাকে যথার্থই ভালবাস, তবে কল্যই তাঁহাকে নিশ্চয় পাইবে। অতএব তুমি বরের যোগ্য বেশ ভূষায় কল্য রাজ-সন্নিধানে উপস্থিত থাকিও এবং রাজা ও তাঁহার বন্ধুবর্গকে নিমন্ত্রণ করিও।

---

(১৪)

যথাসময়ে অর্‌ল্যাণ্ডো ও অলিভার এবং গ্যানিমেড ও এ্যালিয়েনা সেই নির্ব্বাসিত

রাজার নিকট উপস্থিত হইলেন। রাজা এবং তাঁহার অমাত্যবর্গ তাঁহাদের সকল কথা শুনিলেন। নির্ব্বাসিত রাজা এতদিন পরে যে তাঁহার কন্যারত্নকে দেখিতে পাইবেন, ইহা তাঁহার একান্ত আনন্দের কথা সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহাতে তাঁহার বিশ্বাস জন্মিল না। একটী পাত্রী, দুইটী বর;—তাঁহারা বুঝিলেন, গ্যানিমেড্ প্রণয়-মুগ্ধ অর্ল্যাণ্ডোর সহিত কি এক চাতুরী খেলিতেছে। কিন্তু গ্যানিমেড্ যখন দৃঢ়তার সহিত রাজাকে বলিলেন যে, এ সকলই সত্য, তখন রাজা কিছু বিস্ময়ের সহিত অর্ল্যাণ্ডোকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "গ্যানিমেড্ যাহা বলিতেছেন, তাহা কি সত্য? আমি ত কিছু বুঝিতে পারিতেছি না। রোজালিন্দ কেমন করিয়া এখানে উপস্থিত হইবে!"

অর্ল্যাণ্ডো কি উত্তর করিবেন, ভাবিয়া পাইলেন না।

তখন গ্যানিমেড্ রাজাকে পুনরায় বলিলেন, "আপনার কন্যাকে যদি এখানে উপস্থিত করিতে পারি, তাহা হইলে অর্ল্যাণ্ডের সহিত তাহার বিবাহ দিতে নিশ্চয়ই সম্মত হইবেন?"

রাজা। নিশ্চয়ই। যদি সেই সঙ্গে আমার আরও কিছু দিতে হয়, তাহাও দিতে প্রস্তুত আছি।

গ্যানিমেড্ অর্ল্যাণ্ডোকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কথা কি? রোজালিন্দকে আনিয়া দিতে পারিলে তাহাকে বিবাহ করিতে নিশ্চিত সম্মত আছ?"

অর্ল্যাণ্ডো। যদি সমগ্র পৃথিবীর অধীশ্বর হই, তাহা হইলেও রোজালিন্দ ভিন্ন আমি আর কাহাকেও বিবাহ করিব না!

সকলেই অতি বিস্ময় ও কৌতূহলের সহিত এই বিষয়ের আলোচনায় রত হইলেন।

---

(১৫)

তখন গ্যানিমেড্ ও এ্যালিয়েনা সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন। গ্যানিমেড্ পুরুষের পরিচ্ছদ দূরে ফেলিয়া আপনার সেই কমনীয় মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। এ্যালিয়েনাও কৃষক-কুমারীর বেশ পরিত্যাগ করিয়া সুন্দর সাজে সজ্জিত হইয়া পুনর্ব্বার সেই সিলিয়া হইলেন। মধুর সাজে সজ্জিত হইয়া রোজালিন্দ ও সিলিয়া —দুই ভগিনীতে রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। যাঁহারা ভাবিতেছিলেন, "না জানি এ বিবাহ কি-এক কৌতুকে পর্য্যবসিত হইবে," তাঁহারা সেরূপ ভাবিবার আর অবসর পাইলেন না। রাজকুমারীদ্বয়কে তথায় উপস্থিত হইতে দেখিয়া সকলের বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না। রোজালিন্দ পিতার চরণে প্রণত হইয়া তাঁহার আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিলেন। তখন ইন্দ্রজালের কথা কাহারও আর মনে উঠিল না। কারণ, রোজালিন্দ সকলের সমক্ষে, পিতৃব্য-কর্ত্তৃক নির্ব্বাসনবৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বর্ণন করিলেন।

রাজা কন্যাকে বিবাহের সম্মতি দিয়া আপনার অঙ্গীকার পূর্ণ করিলেন। যথাসময়ে অর্ল্যাণ্ডো ও রোজালিন্দ এবং অলিভার ও সিলিয়া পরস্পরের পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইয়া স্ব স্ব মনোরথ পূর্ণ করিলেন। সেই অরণ্যের মধ্যেই সেই শুভ কার্য্য যদিও সমারোহের সহিত সম্পন্ন হয় নাই, তথাপি এমন আনন্দ উল্লাস, অতি অল্পই দেখা যায়। যখন সেই শীতল তরুচ্ছায়ায় বসিয়া নবদম্পতি-যুগলের সহিত সমবেত ভদ্রমণ্ডলী বন্যফল ও মৃগমাংস অত্যন্ত আনন্দের সহিত ভোজন করিতেছিলেন, তখন এই আনন্দের অসম্পূর্ণতা কিছু থাকিবে না বলিয়াই যেন, সহসা এক দূত সেই সময় সেখানে উপস্থিত হইয়া নির্ব্বাসিত রাজাকে নিবেদন করিল, "মহারাজ! আপনার ভ্রাতা

ধর্ম্মের মহিমা।

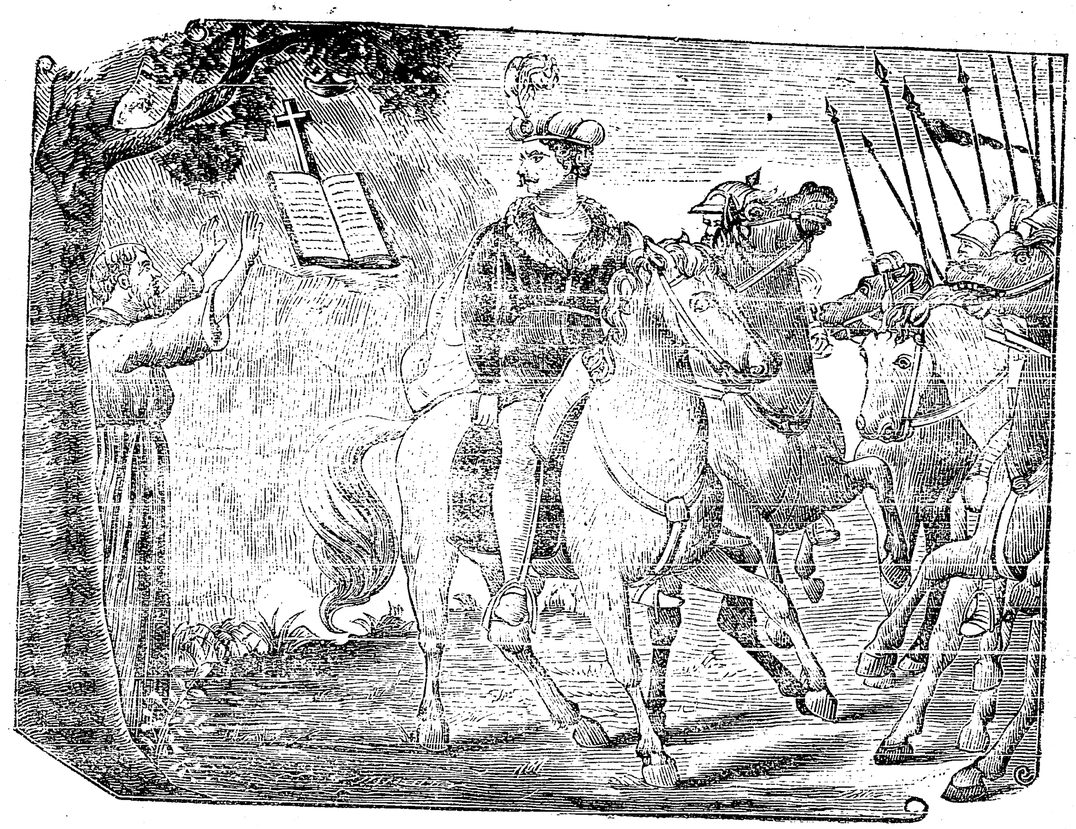

আপনার অপহৃত রাজ্য আপনাকেই প্রত্যর্পণ করিয়াছেন!"

সহসা ফ্রেডারিকের এরূপ পরিবর্ত্তন কিরূপে হইল, এখন সেই কথা বলিয়াই আমরা আখ্যায়িকা শেষ করিব।

রাজ-ভ্রাতা ফ্রেডারিক যখন শুনিলেন যে, নির্ব্বাসিত রোজালিন্দের সহিত তাঁহার কন্যা সিলিয়াও পলায়ন করিয়াছে এবং ভাবিয়া দেখিলেন, এক এক করিয়া দিন দিন শত শত লোক আর্ডেন-কাননে উপস্থিত হইতেছে, তখন আর তাঁহার ক্রোধের সীমা রহিল না। তিনি সেই সকল লোককে এবং নির্ব্বাসিত রাজাকে প্রাণে মারিবার জন্য যথাসময়ে একদল সৈন্যের সহিত আর্ডেন-কাননে যাত্রা করিলেন। কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছায় একটী অভাবনীয় ঘটনায় এত দিনে তাঁহার সকল দুর্ম্মতি দূর হইল।

সৈন্য-সামন্ত লইয়া অশ্বারোহ ফ্রেডারিক যখন কানন-বহির্ভাগে উপস্থিত হইয়াছেন, তখন কোথা হইতে অকস্মাৎ এক বৃদ্ধ তপস্বী উপস্থিত হইলেন। ধর্ম্মের কি বিচিত্র মহিমা! সেই সাধু তপস্বীর দুই চারি কথায় ফ্রেডারিকের ভাবান্তর হইল।

তখন তিনি নিজ হিংস্র-বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া বিশেষ অনুতপ্ত হইয়া ধর্ম্ম-চিন্তায় আজীবন কালযাপন করিতে মনঃস্থ করিলেন। তৎক্ষণাৎ এক দূতকে অগ্রজের নিকট প্রেরণ করিয়া আপনার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন এবং রাজ-সমভিব্যাহারী অন্যান্য অমাত্যগণের বিষয়াদি ফিরাইয়া দিবেন, কহিয়া পাঠাইলেন।

এই শুভসংবাদ, সেই পরিণয়-উৎসব-কালে বিশেষ আনন্দদায়ক হইল। আর সিলিয়া,— যদিও তিনি রাজ্যের উত্তরাধিকারিণী হইতে

বঞ্চিত হইলেন, তথাপি তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত যে অপহৃত রাজ্য পুনর্ব্বার ফিরিয়া পাইলেন এবং ভাগনী রোজালিন্দ যে বিশেষ সুখী হইলেন, তাহাতে তাঁহার আর আনন্দের সীমা রহিল না। এমনই তাঁহার অকপট স্নেহ ও ভালবাসা যে, একদিনের জন্যও রোজালিন্দের প্রতি তাঁহার কোনরূপ দ্বেষ বা ঘৃণা হয় নাই।

নির্ব্বাসিত রাজা রাজ্যে ফিরিয়া আসিয়া যাহার যাহা প্রাপ্য, সকলকে তাহা দিয়া আপনার কর্ত্তব্য পালন করিলেন এবং সকলেই সম্যক্ প্রকারে সুখী হইলেন। দয়াশীল রাজার নিকটে যে যাহা চাহিল, যাহার যে পুরস্কার, সেই তাহা পাইল।

কেমন, ইহাই কি তোমার ইচ্ছার অনুরূপ নহে?

শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত।

ভক্তির জয়। *

(সমালোচনা)

নদীতে কখন বান্ আসিতে দেখিয়াছ? নদীহৃদয় পরিপূর্ণ করিয়া, অগাধ জলরাশি যখন নদীর দুইটী পার্শ্ব ভাসাইয়া লইয়া যায়,—কি দৃশ্য বল দেখি! অগাধ জলরাশি তখন উচ্চ নীচ দেখে না, পাহাড় পর্ব্বত মানে না, অপ্রতিহত-প্রভাবে আপনার বলে আপনি চলিয়া যায়। ভক্তিপ্রবণ হৃদয়েরও এই অবস্থা। সেখানে আর নূতন করিয়া বান্ আসে না। হৃদয় পরিপূর্ণ করিয়া, ভক্তি চারি দিকের বাধা বিঘ্ন, পাপ প্রলোভন না মানিয়া, আপনার মহালক্ষ্য পথে চলিয়া যায়। ভক্তির লক্ষ্যপথ—চিদ্ঘন সচ্চিদানন্দ বৈকুণ্ঠধাম।

বাবু কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিশুদ্ধ অন্তরে যে মহাপুরুষের জীবনী লিখিয়াছেন, তাঁহার সম্বন্ধেও ঐ কথা খাটে। তাঁহার হৃদয়ে আর নূতন করিয়া বান্ আসে নাই। হৃদয়ে সেই বান্ লইয়াই তিনি জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই, ভক্তির কথা ভক্তিপ্রাণ হিন্দুর হৃদয়ে আজিও উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিত আছে। যে ভক্তিতে মাতোয়ারা হইয়া মহাপুরুষের হৃদয় এমনই মহাশক্তি ধারণ করে,—যাহাতে জগতের সুখ দুঃখ, জীবনের মহাসংগ্রাম সকলই উপেক্ষিত হয়, কেবল অন্তরে ভক্তের আরাধ্য দেবতা অন্তর আলোকিত করিয়া শুভ্রজ্যোতিতে সদা প্রকাশিত থাকেন, যে প্রশান্ত মূর্ত্তি ধ্যান করিতে করিতে ভক্ত আত্মহারা,—সে ভক্তি চির অপরাজিতা, নিত্য মহাবলশালিনী, তাহার ধারণা ও কল্পনা অতি উচ্চ। সংসারের শোকে তাপে এবং সকল প্রকার দুঃখ ও বিপদের মধ্যে মুহূর্ত্তের জন্যও সে কথা ভাবিলে কৃতার্থ ও ধন্য হইতে হয়।—

"(এ যে) বল্‌তে নারি, বুঝ্‌তে পারি
ভক্তি-তত্ত্ব-কথা।
মায়ের দুধে স্বাদ্ পেয়েছি
(যা) মর্ম্মে মর্ম্মে গাঁথা॥"

প্রকৃত কথাই তাই। এমন কতকগুলি জিনিস আছে, যাহা আমি নিজে বুঝিতে পারি, কিন্তু অপরকে সম্যক্ প্রকারে বুঝাইবার সামর্থ্য আমার নাই। ভক্তিসম্বন্ধে একথা আরও বিশেষরূপে খাটে। এখানে দু'য়েই গোল। পুরা মাত্রায় ইহা আমি নিজেই বুঝিতে পারি না, তা অন্যকে বুঝাইব কিরূপে? এখানে বুঝিতে না পারার অর্থ,—পুথিগত বিদ্যার অভাব নহে,—নিজ জীবনে অনুশীলনের অভাব। প্রকৃত ভগবদ্ভক্ত ভিন্ন ভক্তির সঞ্জীবনী সুধা-পানে আর কে অধিকারী হইবে?

বাবু কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় এক জন বিশিষ্ট সাহিত্যরথী ও চিন্তাশীল দার্শনিক বলিয়া বিদ্বজ্জন সমাজে পরিচিত; কিন্তু সাধনার পথে তিনি যে কতদূর অগ্রসর হইয়াছেন, তাহা তাঁহার এই নূতন পুস্তক 'ভক্তির জয়' অথবা 'হরিদাসের জীবন-যজ্ঞে' সম্যক্ প্রকটিত। কি অপূর্ব্ব গ্রন্থই তিনি লিখিয়াছেন! ইহা পাঠে অনেক মোহান্ধ জীবের চক্ষের ঠুলি খুলিবে, অনেক পাষণ্ড নাস্তিকের প্রাণেও প্রেমের হিল্লোল বহিবে। পুস্তক খানি সম্পূর্ণ নূতন প্রণালীতে লিখিত। একাধারে উপন্যাস, কাব্য, ইতিহাস ও ধর্ম্মতত্ত্বের আভাষ এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। ভাষাও অতি পরিপাটী। বইখানি একবার পড়িতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া উঠিতে ইচ্ছা হয় না। ইহাতে লেখকের আন্তরিকতা ও প্রাণের টান এতটা অধিক পরিমাণে প্রকাশ পাইয়াছে যে, সাধারণতঃ আজিকার কোন লেখকের কোন গ্রন্থে তাহা পাওয়া যায় না। ঘোষজ মহাশয়ের জয় হউক!

"ভক্তির জয়" কথাটা কেবল বড় বড় ছাপার আখরে শোভা পায় নাই, লেখক কাজেও "ভক্তির জয়" দেখাইয়াছেন; 'হরিদাসের জীবন-যজ্ঞে' তাহার পূর্ণ পরিচয়। গ্রন্থের নামকরণ সার্থক হইয়াছে।

মহাত্মা হরিদাস পূর্ব্বে যবন ছিলেন; কিন্তু হরিনামের মাহাত্ম্যে শেষে তিনি ভগবদ্ভক্ত বৈষ্ণবের অগ্রণী হন। কালীপ্রসন্ন বাবু বহু চেষ্টা, বহু পরিশ্রম ও বহু সাধনায় সেই মহাপুরুষের জীবনী ও ভাববৈচিত্র্য অনুশীলন করিয়া বাঙ্গালী পাঠককে এক অমূল্য গ্রন্থ উপহার দিয়াছেন। প্রকৃত যাহা হৃদয়ের ইতিহাস ঘোষজ মহাশয় তাহা অনেক যত্নে ও অসাধারণ উদ্ভাবনী শক্তিতে সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ইহা তাঁহার কম প্রশংসার কথা নহে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই গ্রন্থের লিখন-ভঙ্গিমা সম্পূর্ণ নূতন। যাঁহারা মাতৃভাষাকে প্রীতিচক্ষে দেখেন, তাঁহারা ত এ গ্রন্থ পড়িবেনই; কিন্তু যাঁহারা নিতান্ত বিরক্তির সহিত "বাঙ্গালায় আর কি বই আছে যে পড়িব" বলিয়া ইংরেজী কাব্য-দর্শনের আশ্রয় লন, তাঁহাদের প্রতি আমাদের অনুরোধ শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়ের এই অভিনব গ্রন্থখানি একবার পাঠ করুন;—চক্ষু কর্ণের বিবাদ আর থাকিবে না।

শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের কিছু পূর্ব্বে মহাত্মা হরিদাসের জীবন-যজ্ঞের আরম্ভ হয়। সে জীবন-যজ্ঞ—ভক্তির পরীক্ষা; শেষ ভক্তিরই জয় হয়।

যে কালীপ্রসন্ন বাবু বহুকাল পূর্ব্বে একদিন "ভালবাসা" নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন,—"ভালবাসা এক মহা যজ্ঞ; স্বার্থ ইহার আহুতি, দক্ষিণা ইহার মান" এবং যাঁহার হৃদয়নিহিত ভগবৎ-প্রেম এতদিন দর্শনে ও কাব্যে প্রচ্ছন্ন-ভাবে ছিল, হরিদাসের 'জীবন যজ্ঞে' তাহা পূর্ণরূপে প্রকটিত হইয়াছে। আমাদের আশা আছে, বঙ্গসন্তান এ অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া মোহিত হইবেন।

'হরিদাসের জীবন-যজ্ঞের' এক স্থানের একটু মাত্র পরিচয় এখানে দিলাম, পাঠক দেখিবেন, ভক্তিপ্রেমের লীলাবৈচিত্র্যে গ্রন্থখানি কিরূপ মনোহর হইয়াছে।

দীন-হীন কাঙাল হরিদাস হরিনামে দেশ মাতাইয়া তুলিয়াছেন,—আবালবৃদ্ধ-বনিতা সকলেরই প্রীতির পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করিতেছেন,—স্বর্গের এ আলোক এক সয়তানের চক্ষে ভাল লাগিল না।—সে সয়তান, গোড়াই কাজী। গোড়াই গিয়া বঙ্গের তদানীন্তন দণ্ডমুণ্ডের

---

* "ভক্তির জয় অথবা হরিদাসের জীবন-যজ্ঞ"। শ্রীকালীপ্রসন্ন ঘোষ প্রণীত। ঢাকা-আরমাণিটোলা বান্ধব কুটীর হইতে শ্রীহরকুমার বসু কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১।০ এক টাকা চারি আনা মাত্র।

কর্ত্তা হুসেনশাহার নিকট হরিদাসের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিল। সে অভিযোগের মর্ম্ম এই, 'হরিদাস যবন হইয়া হিন্দুর হরিকে ডাকে।' কাজেই তখনই দুর্দ্দান্ত পাইকগণ হরিদাসকে ধরিয়া বাঁধিয়া আনিল; যথা-দিনে দরবার বসিল। 'মুলুকের অধিপতি' হরিদাসকে শুনাইয়া বক্তৃতা দিলেন, "তুমি না বুঝিয়া এবং না জানিয়া যে সকল পাতক করিয়াছ, যদি তাহা হইতে পরিত্রাণ চাও, তাহা হইলে এখনই পুনরায় কলমা পড়। নহিলে তোমার আর উদ্ধারের পথ নাই।"

"হরিদাস এতক্ষণ চিত্রিত মূর্ত্তির ন্যায় নীরব ও নিস্পন্দ উপবিষ্ট ছিলেন। যখন যবনাধিপতির উপদেশ-বাক্য পরিসমাপ্ত হইল, তখন তিনি যেন একটুকু, আত্মবিস্মৃত ভাবে 'অহো বিষ্ণুমায়া' এই বলিয়া একবার উচ্চৈঃস্বরে হাসিলেন। * * * তার কিছুক্ষণ পরে যবনাধিপতিকে সম্বোধন করিয়া বিনয়মধুর-গভীর স্বরে, ধীরে ধীরে বলিলেন,—

"বাবা! আপনি রাজ্যের অধীশ্বর, আপনি দয়া করিয়া আমার কথায় প্রণিধান করুন। আপনি যাঁহাকে ঈশ্বরজ্ঞানে ভজনা করেন, আমিও তাঁহাকেই পূর্ণানন্দময় অদ্বিতীয় ঈশ্বর বলিয়া আরাধনা করি। কোরানেও তাঁহার কথা, পুরাণেও তাঁহারই তত্ত্ব; এবং তাঁহারই 'নাম মাত্র ভেদ' লইয়া হিন্দু ও যবনের সর্ব্ব প্রকার প্রভেদ। কিন্তু, তাঁহাকে যে-কেন যে নামে ডাকুক না, তিনি সকলেরই সমান আরাধ্য,—সকলেরই ঈশ্বর। আমি তাঁহারই নাম কীর্ত্তন করিয়া অপরাধী হইলাম কিসে?"

ভক্তের প্রাণের কথা হীরার ধার অপেক্ষা তীক্ষ্ণ। হরিদাসের এই যুক্তিপূর্ণ কথাগুলি যবনাধিপতির বুকে বিঁধিল; কিন্তু পাপিষ্ঠ গোড়াইকাজীর উত্তেজনায় তিনি পুনরায় ভীষণ-মূর্ত্তি ধারণ করিলেন, গোড়াইয়ের বাক্য অনুমোদন করিয়া আদেশ দিলেন যে, "বাইশ বাজার" বেড়িয়া পাইকগণ হরিদাসকে বেত্রাঘাত করিবে

* * * "হরিদাস যবনাধিপতির নিষ্ঠুর মুখে তাঁহার শেষ সিদ্ধান্তের ইঙ্গিত পাইয়া ক্ষণকাল ধ্যানস্থবৎ রহিলেন। তাঁহার জীবনের চরম পরীক্ষা অথবা জীবন যজ্ঞের চরম অধ্যায় কাছে আসিয়া পৌঁছিয়াছে ইহা তিনি তখন বুঝিতে পারিলেন। সেই বিশাল রাজসভায় শত শত যবন কর্ম্মচারী তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। বহিঃস্থ দর্শকদিগের অসংখ্য চক্ষুও তাঁহার দিকে নিপতিত। তিনি চক্ষু তুলিয়া একবার তাহাদিগের সকলকেই দেখিলেন। সশস্ত্র দণ্ডপুরুষের চারিদিকে ভয়ঙ্কর বেশে, ভয়ঙ্কর ভঙ্গীতে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। তাহাদিগের প্রতিও তিনি একবার দৃষ্টিপাত করিলেন। কিন্তু বোধ হয়, এই বিপত্তির সময়ে তাঁহার দৃষ্টি পৃথিবীর ধূলিরাশি অতিক্রম করিয়া একটুকু ঊর্দ্ধে উঠিল। বোধ হয়, সে ঊর্দ্ধতন অলক্ষিত জগতে একখানি অপূর্ব্বসুন্দর, স্নিগ্ধমধুর, ভুবনমোহন, অভয় মূর্ত্তি সে সময়ে তাঁহার মানসনেত্রে প্রতিবিম্বিত হইল। তিনি সেইদিকে তাঁহার চক্ষু দুটী রাখিয়া এবং সভার সমস্ত ব্যক্তিরই হৃদয়ে বিস্ময় জন্মাইয়া বলিয়া উঠিলেন,—"ঈশ্বর যাহা করিবেন, তাহাই হইবে; তাঁহার বিচার ভিন্ন মনুষ্যের বিচারে কাহারও কিছু হইবার নহে।"

উদ্ধৃত অংশের মধ্যে হরিদাসের উক্তিটুকু পাঠক একটু মনোযোগের সহিত পড়িবেন। দেখিবেন, ভগবদ্ভক্তির কি অলৌকিক প্রভাব! যে হরিদাস অতি বিনীত, দীনহীন, কাঙালের কাঙাল বলিয়া বর্ণিত, অবস্থাভেদে, সেই প্রাতঃস্মরণীয় ভক্তের কি বীরজনোচিত বিশ্বাস ও আত্ম-নির্ভর!—"ঈশ্বর যাহা করিবেন, তাহাই হইবে, তাঁহার বিচার ভিন্ন মনুষ্যের বিচারে কাহারও কিছু হইবার নহে।"

পুণ্যভূমি—ভারভূমিতে, ধ্রুব-প্রহ্লাদ-শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মভূমিতে এইরূপ আদর্শ ভক্তবীরই সম্ভবে। "হরিদাস জ্ঞানী হইয়াও জ্ঞানহীন শিশুর ন্যায়, সকলের মুখাপেক্ষী রহিতে ভালবাসিতেন এবং গুরুস্থানীয় যোগী হইয়াও সকলের দিকে শিষ্যের ভাবে চাহিয়া থাকিতেন। আজি সেই কুসুমকোমল শিশুর প্রাণে সহসা একটা মহাশক্তি সঞ্চারিত হইল—শিশিরসিক্ত কোমল কুসুম সহসা বজ্রাগ্নি উদ্গিরণ করিতে লাগিল। যিনি কখনও উচ্চকণ্ঠে কথাটী কহিতে জানিতেন না, তিনি বীরের কণ্ঠে, বীর-রসের প্রত্যক্ষ অবতারের ন্যায় বলিয়া উঠিলেন,—

"খণ্ড খণ্ড যদি হই,—যায় দেহ-প্রাণ,
তবু আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম।"

"হরিদাসের এ কথাগুলি কালের পাষাণ-ফলকে চিরকালের জন্য দৃঢ় মুদ্রিত হইয়া রহিল,—পৃথিবীর যেখানে যে কোন মনুষ্য ভক্তির সহিত ভগবানের নাম লইতেছিল, কথা কয়টী সেইখানেই তাহার হৃদয়ে গিয়া প্রতিধ্বনিত হইল;—

"খণ্ড খণ্ড যদি হই,—যায় দেহ-প্রাণ,
তবু আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম।"

এরূপ মহাভক্ত ও বিশ্বপ্রেমিকের অলৌকিক জীবনী ও বিচিত্র-চরিত্র আমরা আর নূতন করিয়া কি সমালোচনা করিব? বস্তুতঃ, এ মহাপুরুষের জীবন-লীলা অনুভব করিবার, বুঝাইবার নহে।

* * * কাজীর নির্ম্মম-কঠিন হস্তেই মহাত্মা হরিদাসের জীবন-যজ্ঞের পূর্ণাহুতি হয়। কিন্তু ভক্তির কি বিচিত্র লীলা,—"যে সময়ে তিনি সর্ব্বাঙ্গে ক্ষত-বিক্ষত এবং রুধিরধারায় পরিপ্লুত রহিয়াও, প্রাণান্তক পাপিষ্ঠদিগের পরিত্রাণের জন্য, ভগবানের কাছে কাতরপ্রাণে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাঁহার জীবনের যজ্ঞ সেই সময়ে পূর্ণাহুতিতে সফল হইয়া যজ্ঞেশ্বরে পঁহুছিয়াছিল। সেই যজ্ঞানল-সন্দীপিত সুধাস্নাত প্রাণ, নবদ্বীপে যাইয়া, নয়নাভিরাম গৌরচন্দ্রের ঢলঢল প্রেমানন্দে শীতল হইল,—প্রবহমাণা নদী সাগর-সঙ্গমের অনির্ব্বচনীয় সুখে বিলয় পাইল।"

ভক্তিপ্রেমের রহস্যই এই, ইহ-সংসারে ইহাকে অশেষ প্রকার পরীক্ষার 'পোড়' খাইতে হয়। সোণাকে যেমন বার বার আগুনে পোড় খাইয়া আপনার বিশুদ্ধতা প্রমাণ করিতে হয়, ভক্তিপ্রবণ-হৃদয়কেও সেইরূপ জগৎসমক্ষে বার বার পরীক্ষা দিতে হয়। বুঝি, ইহাই বিধির বিধান। শেষ, ভেরীনাদে জগতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে সেই 'ভক্তির জয়ই' বিঘোষিত হইয়া থাকে। পৃথিবীর ইতিহাস আবহমান কাল হইতে ইহার সাক্ষ্য দিয়া আসিতেছে। প্রেমভক্তির প্রত্যক্ষ অবতার, মহাত্মা হরিদাসকেও কঠিন সংসারে অনেক বার পরীক্ষা দিতে হইয়াছিল এবং বলা বাহুল্য, ভক্তির মহিমাগুণে শেষে তিনি সর্ব্ববিধ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বিশ্ববাসীকে প্রেমডোরে বাঁধিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। অধিক কি, সাক্ষাৎ নরকদ্বার এক বারাঙ্গনাও দুর্ব্বুদ্ধিবশে, আর এক দুর্ব্বুদ্ধি ব্যক্তির প্ররোচনায় তাঁহাকে মজাইতে আসিয়া আপনি মজিয়া যায়। সাধু-সঙ্গে, কলি-কলুষ-নাশক হরিনাম-গুণে সেই অতিবড় পতিতারও উদ্ধার হয়।

শুভক্ষণে প্রকৃতির প্রিয়পুত্র, বঙ্গের কৃতী লেখক, মনস্বী শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় এই পুণ্যশ্লোক মহা-পুরুষের জীবনী লিখিয়া আপনি ধন্য হইয়াছেন এবং আমাদিগকেও ধন্য করিয়াছেন। গ্রন্থের পত্রে পত্রে, ছত্রে ছত্রে মণিমাণিক্য জ্বলিতেছে। বড় দুঃখ রহিল,—আমাদের স্থানাভাব,—নচেৎ ইহার অনেক অংশ উদ্ধৃত করিয়া পাঠককে অধিকতর সুখী করিতে পারিতাম।

এই "ভক্তির জয়ে" শিখিবার জিনিস অনেক আছে; লেখক, বিশিষ্ট দক্ষতার সহিত ইহাতে একাধারে তিনটী অতি গুরুতর বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন।—প্রথম, বৌদ্ধভাবতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ-প্রবর্ত্তিত ভক্তি-ধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা; দ্বিতীয়, যবনাধিকৃত ভারতে ভক্তির পুনরুত্থান;—তৃতীয়, যবনের জীবনযজ্ঞে যোগমগ্ন ঋষি-জীবনের বিকাশ ও তদুপলক্ষে পুনরায় ভক্তির জয়। মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি, তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। এরূপ বহু গবেষণা ও ভাবুকতাপূর্ণ ভক্তিগ্রন্থ বঙ্গসাহিত্যে এই নূতন। তাই আবার বলি, সাহিত্য বান্ধব কালীপ্রসন্নের জয় হউক!

লেখককে আমরা একটী বিষয়ে অনুরোধ করি।—তিনি যেরূপ ভক্ত, ভাবুক, মনস্বী ও কৃতী পুরুষ তাহাতে হরিদাসের এই 'জীবন-যজ্ঞের' পর, শ্রীচৈতন্যদেবের লীলাবিষয়ক একখানি সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর গ্রন্থ প্রণয়ন করুন। সুরে সুর মিলিবে, ভাল। তিনিই যে, এ গুরুতর কার্য্যের যোগ্য-ব্যক্তি, ইহা আমাদের ধ্রুববিশ্বাস জন্মিয়াছে।

মহাত্মা হরিদাসের শেষ জীবনের ইতিহাস এই;—"তিনি তাঁহার চরম সময় নীলাচলে—শ্রীধাম জগন্নাথক্ষেত্রে অতিবাহিত করেন সেখানে অদ্যাপি তাঁহার সমাধি আছে। দেশ দেশান্তরের হৃদয়বান্ ভক্তেরা সে সমাধিকে অদ্যাপি অশ্রুধারায় ধৌত করাইয়া থাকেন। হরিগুণমুগ্ধ মহাভক্তের সেই সমাধি-স্থান, তাঁহাদিগের অমল চক্ষে,—ভক্তির সমুজ্জ্বল বিজয় স্তম্ভ।"

"হরিদাস নবদ্বীপেও অনেক কার্য্য করিয়াছেন; কিন্তু সে সকল কার্য্য তাঁহার নিজের কার্য্য নহে। তিনি সেখানে পুতুলের মত নাচিয়াছেন, পাগলের মত গাহিয়াছেন এবং শত সহস্র হৃদয়ের সহিত সম্মিলিতভাবে ভক্তির জয়ধ্বনি করিয়া জীবনে কৃতার্থ হইয়াছেন।" তিনিও কৃতার্থ হইয়াছেন, তাঁহার জীবনী-লেখকও কৃতার্থ হইয়াছেন, আর আমরাও তাঁহার জীবনীর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়া কৃতার্থ হইলাম। এখন এস ভক্ত, এস বৈষ্ণব! আমরাও একবার প্রাণ খুলিয়া, মনের সাধে, ভক্তি-প্রাণ লেখকের সহিত "হরি হরি" বলি!

পূজার গল্প।

শরতের এই জ্যোৎস্না রাত্রি বড় সুন্দর। বাতায়নগুলি খুলিয়া দাও, আমি এই জ্যোৎস্না দেখিতে বড় ভালবাসি। তোমাদের এই মাধবী-জড়িত উন্নত তরু দেখিয়া আমার মনে এক অতীত কাহিনী জাগিয়া উঠে। এই শরৎকাল, এমনই জ্যোৎস্নারাত্রি, এমনই মাধবীজড়িত উন্নত তরু, এমনই অস্পষ্ট ছায়া,—আজিকার এই মধুর রাত্রে সেই সব মনে পড়িতেছে। তোমরা পূজার দিনে গল্প শুনিতে চাহিতেছ, গল্প আর বড় মনে নাই। যে কাহিনী আমার হৃদয়ে জাগিতেছে তাহাই বলিতে পারি।

কাহিনী ক্ষুদ্র। উপন্যাসের কথা কিছুই নাই। যাঁহার নিকট শুনিয়াছিলাম, এ পর্য্যন্ত অনেক সন্ধান করিয়াও তাঁহার পরিচয় পাই নাই। মালাবার পাহাড়ের উপর বসিয়া তিনি এই কাহিনী বলিয়াছিলেন। আমার মনে পড়ে, কাহিনী বলিতে বলিতে তাঁহার চক্ষু জলে ভরিয়া যাইত, এক একটী কথা বলিতে বলিতে বাষ্পরুদ্ধ-কণ্ঠে সহসা তিনি নীরব হইয়া ভূমি পানে চাহিয়া থাকিতেন। নিম্নে ভারত-মহা-

সাগর ভীষণ তরঙ্গ-ভঙ্গে মালাবারের চরণপ্রান্তে আছাড়িয়া পড়িত, তরঙ্গে তরঙ্গে ফেনরাশি উঠিত। অনেক সময় দেখিয়াছি, যে প্রবল সিন্ধুর উচ্ছ্বাস তাঁহার বুকের ভিতর উথলিয়া উঠিত, নয়নপ্রান্ত পূর্ণ করিয়া মহাবেগে তাহা প্রবাহিত হইয়া ভারত-মহাসাগরের প্রবল তরঙ্গে মিশিত। হয়ত তোমরা বুঝিবে না, মানুষ এতও কাঁদিতে পারে! হয়ত বুঝিবে না, একজনের চক্ষুজলে এক দিন এক নদী প্রবাহিতা হইয়াছিল! বধূমতী নামে সে নদী ভারতের মহাকাব্যে বর্ণিত হইয়াছে। কান্না ভাল, দুর্ব্বলতা বলিয়া ইহা উপেক্ষা করিও না। জীবনের বড় গুরুভার কান্নায় প্রশমিত হয়। যে কাঁদিতে পারে, বুঝিও, সাধ করিয়া মর্ম্মব্যথা সে বুকে বহন করিতে পারিবে! বুঝিও, তাহার বুকের আগুন নিবিয়া আসিয়াছে, কিন্তু আগুনে যে প্রতিমা দগ্ধ করিয়াছে তাহার আকৃতি সে হৃদয়ে আরও মধুর হইয়াছে!

বঙ্গোপসাগরের ধারে একটা প্রকাণ্ড ভীষণ অরণ্য ছিল। ব্যাঘ্র প্রভৃতি ভীষণ জন্তু ব্যতীত কোন মনুষ্য সেখানে থাকিত, এমন বোধ হইত না। তবে ব্যাঘ্র অপেক্ষা অতি ভীষণ একদল দস্যু সেখানে বাস করিত সেই নিবিড় অরণ্যের মাঝে, যেখানে অত্যুন্নত তরুশ্রেণীর ঘন সন্নিবেশ, তৃণ গুল্ম চারিদিক্ এমনই আচ্ছাদিত যে, ভিতর দেখিবার এতটুকুও সুবিধা ছিল না, সেই অরণ্যের মাঝে এক অতি প্রাচীন, ভগ্নপ্রায় অট্টালিকা ছিল। চারিদিকে ভগ্নস্তূপ পড়িয়া আছে, দস্যুগণ তাহারই উপর বসিয়া আনন্দ-উৎসবাদি সম্পন্ন করিত।

একদিন,—সেও এমনি শরৎকাল, এমনই জ্যোৎস্না-রাত্রি, দস্যুগণের এক আনন্দ-উৎসব চলিতেছিল। সেই দুর্ভেদ্য অরণ্যানীর মধ্য ভাগে, সেই ভগ্ন অট্টালিকার সম্মুখে যে বিস্তৃত প্রাঙ্গণ, সুশীতল শরতের জ্যোৎস্না-রাত্রিতে সে স্থান বড় সুন্দর দেখিতে হইয়াছিল! একটীও প্রদীপের আলো-রেখা কোথাও ছিল না, শুভ্র স্নিগ্ধ চন্দ্রকিরণে সে স্থান উজ্জ্বল। সেই ভীষণ-আকৃতি দস্যুগণের ভীষণ আনন্দ-কোলাহলে সে কানন প্রতিধ্বনিত হইতেছিল; তাহাদের কোলাহলে প্রাণভয়ে ব্যাঘ্র ও মৃগ একই পথে পাশাপাশি ছুটিতে লাগিল, বনের পক্ষীগুলা কুলায় ছাড়িয়া ইতস্ততঃ উড়িতে লাগিল, একটা বিকট আনন্দ-কোলাহলে বিরাট্ উচ্ছৃঙ্খলের দৃশ্য প্রকটিত হইল! তবু সেই বিকট দৃশ্যের মাঝে মধুর রাত্রির সে মধুর জ্যোৎস্নাটুকু বড় সুন্দর দেখাইতেছিল!

দস্যুর দলপতি প্রাঙ্গণের মাঝে আসিয়া দাঁড়াইল। ইঙ্গিত করিয়া সকলকে নিঃস্তব্ধ হইতে বলিল। আর সকল দস্যু অমনি এক সময়ে সহসা নিঃস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল। প্রাঙ্গণের মাঝে এক বেদিকার উপর একখানি প্রতিমা কে সাজাইয়া রাখিয়াছিল। প্রতিমার সর্ব্বাঙ্গ শুভ্র বস্ত্রে আবৃত ছিল। দস্যুদলপতি ধীরে ধীরে বেদিকার উপর উঠিল, প্রতিমার সর্ব্বাঙ্গ-আবৃত বস্ত্রাঞ্চল স্পর্শ করিয়া একবার আকাশ পানে চাহিল। দেখিল, অনন্ত সুনীল আকাশে শরতের চাঁদ হাসিতেছে, সেই হাসিতে, ভীষণ অরণ্যেও যেন একটু মধুর লাবণ্য ফুটিয়া উঠিয়াছে, যেন সেই ভীষণ আকৃতি, তাহার অনুচরগণের সে ভীষণ-তারও একটু মাধুর্য্য বিকশিত হইয়াছে, আর আপনার অন্তরে চাহিয়া দেখিল, যেন অন্তর আলোকে ফুটিয়া উঠিয়াছে! দস্যুর হৃদয়ে আলো! তা তোমরা বিশ্বাস না কর, দস্যু আজ যে প্রতিমাস্পর্শ করিয়াছিল, আমার বোধ হয়, সেই প্রতিমাতেই কি ছিল!—প্রতিমাতে কি ছিল, তাহা আর কেহ কিছু বুঝিল না,

কেহ বুঝিতে চাহিলও না, বুঝিবার আবশ্যকও বোধ করিল না।

দস্যু-দলপতি ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল,—"বন্ধুগণ! তোমরা সকলে শ্রবণ কর। আমি জন্মের মত তোমাদের নিকট বিদায় গ্রহণ করিতেছি। আমার পরিচয় ইতিপূর্ব্বেই তোমরা কেহ কেহ শুনিয়াছ। আমি দস্যুর গৃহে জন্ম গ্রহণ করি নাই এবং দস্যুর হৃদয় লইয়াও এ সংসারে আসি নাই। কিন্তু সে সকল পূর্ব্ব-কথা তুলিব না, কেননা, তাহাতে কোন ফল নাই। আমি দশ বৎসর তোমাদের সহ বাসে ছিলাম, দশ বৎসর তোমরা আমাকে দেখিয়াছ, আমি দুর্ব্বলকে রক্ষা করিয়াছি, প্রবলকে বিনাশ করিয়া, দুর্ব্বলের হিতসাধন করিয়াছি। আমার জীবনের কোন লক্ষ্য ছিল না, কি ভাবে আমি তোমাদের দলে আসিয়া পড়িয়াছিলাম, তাহা মনে আনিতে পারি না।"

সেই জ্যোৎস্নালোকে, সকলে দেখিয়া বিস্মিত হইল, দলপতির চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়াছে। তাহারা এ দশ বৎসর সে চক্ষে এক বিন্দু অশ্রু দেখে নাই।

দলপতি বলিতে লাগিল,—"ভাই সকল, আমি তোমাদিগকে অন্তরের সহিত ভালবাসি। যতদিন বাঁচিব, তোমাদের কথা মনে রাখিব। এই দশ বৎসর অনেক নিষ্ঠুরের কার্য্যও করিয়াছি, একদিনও সে জন্য কিছু ভাবি নাই। অনেক দিন অনেক করুণ-দৃশ্য চক্ষে পড়িয়াছে, গ্রাহ্য করি নাই। এই অরণ্যের প্রান্তভাগে কা'ল এক দেবীপ্রতিমা দেখিতে পাইয়াছিলাম। একবার মাত্র সে প্রতিমা দেখিয়াই আমার মনে হইল, যেন আমার অন্তরের উপর কি একটা আবরণ পড়িয়াছিল, তাহা তৎক্ষণাৎ অপসারিত হইল; যেন আমি আপনাকে কোথায় হারাইয়াছিলাম, সহসা কুড়াইয়া পাইলাম! আমার সকল কথা স্মৃতিমাঝে জাগিয়া উঠিল, কি জানি সহসা প্রাণ বড় ব্যাকুল হইল! এ ভীষণ দস্যু-হৃদয় সহসা যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল। সে প্রতিমা দেখিতে দেখিতে—পাষাণ ফাটিয়া যেমন উৎস ছুটিতে থাকে,—আমার এ কঠিন হৃদয় ফাটিয়াও তেমনি নয়নে অশ্রু বহিল। আমি কখন ভুলি নাই, এই প্রতিমা আমি গৃহে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলাম, পূজা সাঙ্গ না হইতেই কেন যে এ প্রতিমা বিসর্জ্জন করিয়াছিলাম, বলিতে পারি না। কা'ল এ গভীর অরণ্য মাঝে কেমন করিয়া পাইলাম, জানি না! কিন্তু এ মলিন-মূর্ত্তি, এ শ্রান্ত দেহ দেখিয়া বোধ হয় কিছুদিন ধরিয়া এ মূর্ত্তি আমারই অনুসরণ করিয়াছে। আমি দেখা পাইয়া আমাদের এই আনন্দ-কাননে আনিয়াছি, তোমরা প্রতিমা দেখিতে উৎসুক হইয়াছ, তাই আজি এ প্রতিমা তোমাদের সম্মুখে আনিয়াছি। আমার এ চির আনন্দ-বিদায়-দিনে তোমাদের আনন্দ দেখিব বলিয়া, আজি এই আনন্দ-উৎসব আহ্বান করিয়াছি। তোমরা তবে প্রতিমা দেখ।"

তখন দলপতি ধীরে ধীরে প্রতিমার আবরণ উন্মোচন করিল! সকলের চক্ষু মিলিয়া যেন দুইটা বড় বড় অতি বিশাল চক্ষু হইল। সেই চক্ষুতে তাহারা অবাক্ হইয়া দেখিতে লাগিল! প্রতিমার সর্ব্বাঙ্গ পরিপূর্ণ,—যেন শ্রাবণের গঙ্গা কূলে কূলে জল, রূপ আর ধরিতেছে না, যেন সেই শুভ্র জ্যোৎস্নাটুকুও সে রূপ-জ্যোতিতে পরিম্লান হইল! প্রশান্ত আঁখিযুগল আপন চরণ প্রতি বিন্যস্ত, প্রতিমা নিশ্চল, নিঃস্পন্দ, নীরব! দস্যুদল সেই শুভ্র চন্দ্রালোকে, সেই শুভ্র-কৌমুদীবিধৌত বেদিকার উপর, সেই জ্যোৎস্না-নিন্দিত দেবী-প্রতিমা দেখিয়া, কেহ সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিল, কেহ বিস্ময়-বিহ্বল-নেত্রে অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল, আর দস্যুদলপতি সে মূর্ত্তি দেখিয়া নির্ব্বাপিত হইয়া রহিলেন।

দস্যুদলে কেহ কোন রহস্য বুঝিল কি না জানি না, কিন্তু দলপতি ভিন্ন অন্য একজন বুঝিয়াছিল। প্রতিমা দেখিয়া সকলে মুগ্ধ হইল, দলপতির বিদায়ের কথা কাহারও মনে নাই। তারপর যখন দলপতি আবার সেই আবরণ কুড়াইয়া প্রতিমা ঢাকিয়া ফেলিল, সকলের বোধ হইল, যেন সহসা কে তাহাদিগের চক্ষের সম্মুখ হইতে পরিপূর্ণ পূর্ণিমার চাঁদ কাড়িয়া লইল! শরতের সেই শুভ্র জ্যোৎস্না তেমনি সেই প্রাঙ্গণের উপর পড়িয়াছিল। কিন্তু সে শোভা আর কেহ দেখিল না। কেহ না দেখিলেও তাহা সুন্দর! প্রতিমা অপেক্ষাও কি সুন্দর?

হৃদয়ের উপর সৌন্দর্য্যের প্রভাবটা বড় সামান্য নহে। সৌন্দর্য্যের চরণে নর-হৃদয় চির-দিনই অবনত।

পরদিন প্রভাতে দস্যুদল দেখিল, দলপতি নাই।

আমি সকল কথা পরিষ্কাররূপে শুনি নাই, পরিষ্কার করিয়াও সকল কথা বুঝাইতে পারি না। কাহিনীর মধ্যে কোন ঘটনা-বৈচিত্র্য নাই, দস্যুর হৃদয় যদি দস্যুর ন্যায়ই থাকিত, কিছু হাত না পাওয়াও যাইত। কিন্তু সেই বনবিহারিণী মূর্ত্তিমতী দেবী-প্রতিমাতে কি অসাধারণ শক্তি নিহিত ছিল, কে বুঝিবে! সেই প্রশান্ত আঁখিযুগলের স্থির স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে, সেই সুকুমার পরিপূর্ণ অঙ্গ-সৌষ্ঠবে, সেই ধন্বন্তরি-ভাণ্ড-নিঃসৃত সুমিষ্ট বচনসুধাতে যে কি অমৃত এবং কি মাধুরী নিহিত ছিল,—তাহার সংস্পর্শে দশ বৎসরের দস্যুহৃদয় আর এক দিকে স্রোত ফিরাইল!

মালাবার পাহাড়ের কিছুদূরে একখানি ক্ষুদ্র কুটীর ছিল। দস্যুদলপতি সেই দেবী-প্রতিমাকে লইয়া, সেই কুটীরে বাস করিতে-ছিলেন! আজি এই সন্ধ্যার আকাশে ঐ উজ্জ্বল নক্ষত্রটা যেমন এই পৃথিবী পানে চাহিয়া

জ্বলিতেছে, সেই প্রতিমাখানিও তেমনি দিবা-নিশি স্বামীর মুখপানে চাহিয়া থাকিত; সে নীরব দৃষ্টিতে যে ভাষা প্রকাশিত হইত, আকুল প্রাণের ব্যাকুলতা ব্যক্ত হইত, তাহা অন্যে হয় ত বুঝিতে পারিত না, কিন্তু চির-অপরাধী স্বামী তাহা সমস্তই বুঝিতে পারিতেন!

বহুমূল্য রত্ন হারাইয়া যে বড় ব্যথা পাইয়াছে, কালে সে রত্ন মিলিলে তাহার আর আনন্দের সীমা থাকে না। এই দম্পতিও দশ বৎসরের পর পুনর্মিলিত হইয়া সেইরূপ অসীম আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন।

বঙ্গোপসাগরের মৃদুগম্ভীর গর্জ্জন যাহার কর্ণে, অমৃত ঢালিয়া দিত, নিবিড় অরণ্যের ভীষণতা যাহার চক্ষে অসীম সুন্দর বলিয়া অনুভূত হইত, দস্যুবৃত্তি যাহার চিত্তপ্রফুল্লতা সম্পাদন করিত এবং ভীষণ দস্যুদিগের সাহচর্য্য যাহার ভাল লাগিত, আজি সহধর্ম্মিণীর প্রেমালিঙ্গনের মধ্যে বদ্ধ হইয়া সে দেখিল, সেই দশ বৎসরের জীবন যেন একটা মহাশূন্য!

উভয়ের হৃদয় উভয়ের অজ্ঞাত ছিল না। একজন আপনাকে চির-অপরাধী জানিয়া প্রাণান্তপণে ভালবাসিয়া আপনার অপরাধের ক্ষমা ভিক্ষা করিত, আর একজন ক্ষুদ্র বুকটুকুর ভিতর যে অসীম প্রেম জাগাইয়া রাখিয়াছিল, লাজময়ী ক্ষুদ্র বালিকা,—বালিকা বলিয়া দশ বৎসর পূর্ব্বে যাহা সে সাধ করিয়াও তাহার দেবতার চরণে উপহার দিতে পারে নাই, আজি সে নির্ম্মল বিশুদ্ধ প্রেমের সুদৃঢ় নিগড়ে তাহার নিত্য আরাধ্য দেবতাকে হৃদয়ে বাঁধিয়া রাখিতেছে! দুইদিকেই প্রেমের উচ্ছ্বাস, দুইদিকেই প্রেমের আকর্ষণ,—সে কি মহামিলন!

প্রেমই এই বিশ্বের মেরুদণ্ড। হৃদয় যে হৃদয়ান্তরে মিশিতে একান্ত ব্যাকুল, তাহার মূলে প্রেম। দশ বৎসরের দস্যুতায় যাহার

জীবনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট অংশটুকু অতিবাহিত হইয়াছে, আজ সহসা যেন তাহার হৃদয়ে এ পারিজাত ফুটিয়াছে!—সৌরভে ও শোভায় পৃথিবী হাস্যময়ী, হৃদয়ও উজ্জ্বল!

দস্যুতায় উপার্জ্জিত অর্থ সমস্তই সেই গভীর অরণ্যের সেই সহচরগণের মধ্যে বিতরিত হইয়াছিল। নূতন আশ্রমে ফিরিয়া আসিয়া, নূতন গৃহ বাঁধিয়া, নূতন জীবন ধারণ-পূর্ব্বক সেই ব্যক্তি অনেক দিন অতিবাহিত করিলেন। সেই ক্ষুদ্র কুটীরের মধ্য হইতে নিত্য এক অপরিসীম স্নেহধারা প্রবাহিত হইত, দীন দুঃখী আশ্রয় পাইত, চির-অনাথ সে স্নেহ পাইয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইত।

দুই বৎসরের মধ্যে একটী নবকুমার আসিয়া সেই কুটীর উজ্জ্বল করিল। প্রেমের আলোকে সে কুটীর ত উজ্জ্বল ছিল, নব-শিশুর অস্ফুট হাসিতে উজ্জ্বলে মধুর মিশিল!

জীবন এত মধুময়, সংসার এত সুখের, সৃষ্টি এত করুণাময়ী! হায়! দশ বৎসর সেই নিবিড় অরণ্যে বাস, সেই বঙ্গোপসাগরের গম্ভীর গর্জ্জন শুনিতে শুনিতে দশ বৎসর সেই দস্যুদলের সাহচর্য্য, সেই নিষ্ঠুর অত্যাচারে প্রাণিহত্যা—তিনি আর ভাবিতে পারিতেন না, ভাবিতে ভাবিতে তিনি বালকের ন্যায় কাঁদিতেন, কাঁদিয়া কাঁদিয়া অনুতাপ-দগ্ধ প্রাণ জুড়াইতেন। তখন প্রেমময়ী ভার্য্যা বস্ত্রাঞ্চলে সে চক্ষু মুছিয়া দিয়া, নব-শিশু ক্রোড়ে লইয়া সম্মুখে দাঁড়াইত,—সে মূর্ত্তি-মধুরিমা দেখিতে দেখিতে উত্তপ্ত হৃদয় জুড়াইত, কে যেন দগ্ধবুকে শান্তিজল ঢালিয়া দিত!

যেদিন বঙ্গোপসাগরের ধারে সেই নিবিড় অরণ্যের মাঝে, সেই পরিস্ফুট চন্দ্রালোকে, জ্যোৎস্না-বিধৌত বেদিকার উপর একখানি সজীব প্রতিমা দেখিয়া দস্যুদল ভক্তিভরে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়াছিল, সেইদিন এক জন দস্যু বিশেষভাবে সেই প্রতিমাপানে চাহিয়াছিল। তাহার উদ্দেশ্য কি, কে বুঝিবে?—সে ব্যক্তি চাহিয়া চাহিয়া কড় কষ্টে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিল। বোধ হয়, সে ইতি-পূর্ব্বে এ রমণীকে দেখিয়াছিল। বোধ হয়, কোন কালে সে, এ রমণীর প্রণয়লাভে যত্নবান্ ছিল। বোধ হয়, কখন তাহার আশা মিটে নাই।

যেদিন প্রভাতে দস্যুদল দেখিল, তাহাদের দলপতি তাহাদিগের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, তাহারা সেই প্রাঙ্গণে সমবেত হইয়া আর একজনকে দলপতি করিতে দাঁড়াইল। অতি অল্পদিন যে ব্যক্তি তাহাদের দলে মিশিয়াছিল, সে দলপতির কার্য্যে প্রধান সহায়, দস্যুকার্য্যে সুদক্ষ, সমবেত দস্যুমণ্ডলী তাহাকেই সে পদে প্রতিষ্ঠিত করিতে ইচ্ছুক হইল। কিন্তু সমস্ত অরণ্য খুঁজিয়াও তাহাকে পাওয়া গেল না। কেহ কিছু বুঝিতে পারিল না।

সেইদিন সে ব্যক্তিও দলপতির সহিত সে অরণ্য পরিত্যাগ করিয়াছিল এবং অন্তরে অন্তরে কি একটা উত্তপ্ত বাসনা-বহ্নি চাপিয়া রাখিয়া সে দলপতির অনুগ্রহ-লাভে যত্নবান্ হইয়াছিল। দশ বৎসরের দস্যুতায় যাহার হৃদয় পাষাণ অপেক্ষাও কঠিন করিয়া তুলিয়াছিল, আজি যে শুভক্ষণে সে পাষাণ ফাটিয়া করুণার উৎস ছুটিয়াছে, দলপতির সে নব-জীবনের নবপ্রেমলাভে কেহ বঞ্চিত হইল না। এই ব্যক্তিও তাঁহার স্নেহে, তাঁহারই প্রতিবাসী-স্বরূপ হইয়া, মালাবার পাহাড়ের পদপ্রান্তে এক অট্টালিকায় বাস করিতে লাগিল।

রাশীকৃত তূলার মধ্যে কণামাত্র অগ্নি রাখিয়া দাও, কিছুকাল পরেই তূলার রাশি পুড়িতে পুড়িতে অগ্নিকে প্রত্যক্ষ করাইবে। এই ব্যক্তি অন্তরের অন্তরে যে পাপ-বাসনা

লুকাইয়া রাখিয়াছিল, দিনে দিনে তাহা তাহাকে দগ্ধ করিতে লাগিল।

বন্ধুর ক্ষুদ্র কুটীরে অপরিসীম স্নেহে তাহার যথেষ্ট অভ্যর্থনা ছিল। বন্ধুপত্নীও তাহার সমাদর করিতে কখন একটুও ত্রুটী করিতেন না। মহাপাপ সয়তান সে প্রেমমুখ দেখিয়া ইহ-সংসার ভুলিয়া যাইত। সেই পুণ্য-জ্যোতিতে উদ্ভাসিত মুখমণ্ডল দেখিতে দেখিতে তাহার মাথা ঘুরিত, মনে হইত, তাহার চক্ষে বুঝি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পর্য্যন্ত ঘুরিতেছে! যেমন উজ্জ্বল আলোকের মাঝে ক্ষুদ্র মসীবিন্দু অতি কুৎসিত ও অতি পরিষ্কাররূপে আপনার মসীবর্ণ প্রকাশ করে, এই পুণ্যের সংস্পর্শে আসিয়া মহাপাপও হৃদয়ের কালি বড় উজ্জ্বল-রূপে দেখিতে পাইত! সাহস করিয়া মুখের পানে চাহিতে পারিত না, সে পুণ্যহাসির সহিত সাহস করিয়া হাসিতে পারিত না, প্রাণের ভিতর ভীতিসঞ্চার হইত। তবু সে পঙ্কিল-বাসনা তাহাকে দগ্ধ করিতে লাগিল।

ভাবিতে ভাবিতে সয়তান উন্মত্তপ্রায় হইল। জগতের শোভা, জগতের আভা, হৃদয়ের আলো—সয়তানের চক্ষে আগুন জ্বালিয়া দেয়! সে বুঝিল, তাহার বাসনা মিটিবে না। যে মূর্ত্তি নয়নে প্রকাশিত হইলে, নয়ন অবনত হইয়া, হৃদয় পর্য্যন্ত অবনত করে,—তাহাকে পাপে প্রলোভিত করা কি একান্ত সহজ? তবু সে হৃদয়কে বুঝান যায় না! তখন সে এ শান্তিকুটীরে বিষম বজ্র নিক্ষেপ করিয়া, এ শোভা-সৌন্দর্য্য শ্রীহীন ও একেবারে বিনষ্ট করিতে যত্নবান্ হইল! পাপেই যাহার আনন্দ, পাপের সার্থকতা, নিরর্থকতা সে দেখিতে চাহে না!

আবার বন্ধুত্বের সে নির্ম্মল প্রেম মনে জাগিল। সঙ্কল্প সাধন বুঝি হইল না! অমনি ঈর্ষ্যা জ্বলিয়া উঠিল, জগতের বৈষম্য তাহার চক্ষে প্রকাশিত হইল। সে কেন এ পঙ্কিল-বাসনা লইয়া এখানে আসিল? কেন তাহার ভাগ্যে এমন সুখ মিলিল না? আবার প্রতিজ্ঞা করিল, এ শোভা শ্রীহীনা করিবে।

হৃদয়টা খুব কঠিন করিয়া বাঁধিল। আবার সেই মুখমণ্ডল দেখিল! হায়, এত শোভা কেন হইল?

সে পূর্ণ-পবিত্রতাময় মুখমণ্ডলে সে পুণ্য-হাসি দেখিয়া সয়তান বুঝিল না যে, এ হাসি তাহার প্রতি নহে, এ প্রেম-উদ্বেলিত বক্ষঃস্থল তাহাকে দেখিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে নাই,—দূরে শিশু ক্রীড়া করিতে করিতে জননীকে দেখিয়া মধুর হাসি হাসিয়া হাত তুলিয়া তাহাকে ডাকিতেছে। পূর্ণচন্দ্রের সেই মধুর আহ্বানে জননীর হৃদয়-সমুদ্র উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে। বাহু প্রসারণ করিয়া, হে মহাপাপ সয়তান! সে পুণ্যমূর্ত্তি তোমায় আলিঙ্গন করিতে যায় নাই, সন্তান কোলে লইতে জননীর ব্যাকুলতা ঐ ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে!

সয়তান বাহু প্রসারণ করিয়া সে মূর্ত্তি হৃদয়ে ধারণ করিতে চাহিল!

যে ভাবিয়াছিল, জীবন বড় মধুময়, সংসার সুখের, সৃষ্টি করুণাময়ী, তাহার চর্ম্মচক্ষে এই মহাপাপ ছবি পড়িল না। সে ইহাও দেখিতে পাইল না যে, তাহার প্রেমময়ী ভার্য্যার এই প্রেমমূর্ত্তি সহসা কি ভীষণ-মূর্ত্তিতে পরিণত হইল!

সয়তান শিহরিল!

স্বামী গৃহে ফিরিয়া আসিলে, স্ত্রী সকল কথা স্বামীকে জানাইলেন। খুব পরিষ্কার, একখানি আরসিতে একটুখানি হাই দিলে যেমন একটা মলিন ছায়া পড়ে, স্বামীর হৃদয়েও সহসা তেমনি একটা ছায়া পড়িল। তিনি কিছুই বলিলেন না।

সেই দিন রাত্রে,—সেও এমনি শরতের জ্যোৎস্না-রাত্রি,—সেই দিন রাত্রে শিশুকে কোলে লইয়া, রমণী এক বাতায়ন পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ছিলেন। শিশু মায়ের কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া অস্ফুট মধুর-ভাষায় হৃদয়ের কত ভাব ব্যক্ত করিতেছে, জননী হাসিমুখে তাহার মুখচুম্বন করিতেছেন। আর তাহার পিতা অন্য গৃহে থাকিয়, দূর হইতে অনিমিষ দৃষ্টিতে তাহাদিগকে দেখিতেছিলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার হৃদয় আনন্দে উদ্বেলিত হইয়া উঠিতেছিল। সহসা তিনি শয্যাত্যাগ করিয়া সেই বাতায়ন-পার্শ্বে দাঁড়াইলেন এবং পূর্ণ আবেগে শিশুর হাসিমুখ শত চুম্বনে ঢাকিয়া দিলেন। তিনি দেখিলেন, সংসারে ইহার অপেক্ষা সুখের সামগ্রী আর নাই। এমন মায়াবন্ধনও বুঝি জগতে আর কিছুই নাই! দশ বৎসরের সে ঘৃণিত জীবন যে, এত সুখের অধিকারী হইবে, স্বপ্নেও সে কথা মনে আসে নাই। হৃদয় তখন পরিপূর্ণ, উচ্ছ্বাস হৃদয় ছাপাইয়া পড়িতেছে, তেমনি পূর্ণ আবেগে প্রেম-প্রতিমা প্রিয়তমা ভার্য্যাকে আলিঙ্গন করিয়া, শিশুকে পুনঃপুনঃ চুম্বন করিতে লাগিলেন। সে আনন্দের ভাষা নাই, স্বামী স্ত্রী উভয়ের চক্ষে জল! কাহার মনে কি কথা জাগিতেছিল কেহ তাহা ব্যক্ত করিতে পারিল না, কেবল উভয়ের অধরে অধর মিলিয়া নীরব ভাষায় পরস্পরের প্রাণে প্রাণে কি অনন্ত সুখের কাহিনী ব্যক্ত হইল।

তখন শরতের সুনীল আকাশে চন্দ্র হাসিতেছিল। জ্যোৎস্না ধারায় পৃথিবী স্নাত হইতেছিল। সহসা সেই বাতায়নের নিম্নে এক মনুষ্য মূর্ত্তি দেখা গেল। বাহিরে কতকগুলি তরুলতার ঘন-সন্নিবেশে ক্ষুদ্র একটু বনের মত দেখিতে হইয়াছিল। স্বামী স্ত্রী উভয়ে সবিস্ময়ে দেখিলেন, সেই বনের মধ্যে যে মাধবী-জড়িত উন্নত এক বন্যবৃক্ষ দাঁড়াইয়াছিল, কোন মনুষ্য যেন তাহার তলদেশে দাঁড়াইয়া আছে। চন্দ্রালোকে বাতায়ন-সমীপে তাহার ছায়া পড়িয়াছে।

উভয়ে বুঝিলেন, এ ব্যক্তি অন্য কেহ নহে, সেই মহাপাপ! তাঁহাদের অনুমান মিথ্যা নহে। বিবিধ উপায় অবলম্বন করিয়াও এই পুণ্য-প্রতিমা যখন হস্তগত করিবার আর আশা রহিল না, তখন হতভাগ্য এই সিদ্ধান্ত করিয়াছিল কি, তাহার বন্ধুকে হত্যা করিয়া এই স্বর্গ-প্রতিমা অধিকার করিবে! মুহূর্ত্তের মধ্যে নিবিড় মেঘ উঠিয়া, নির্ম্মল আকাশ যেমন ছাইয়া ফেলে, মুহূর্ত্তের মধ্যে তাঁহার হৃদয়ে ভীষণ আগুন জলিয়া উঠিল!

সেই বঙ্গোপসাগরের ধারে, সেই অরণ্যে দশ বৎসর অতিবাহিত করিয়া যাহা কিছু অর্থ সঞ্চিত হইয়াছিল, সে সকলি দস্যুগণের মধ্যে বিতরিত হইয়াছিল। কেবল অতি সুন্দর এক ধনুর্ব্বাণ অতি যত্নে এই গৃহে রক্ষিত হইয়াছিল। সেই ধনুর্ব্বাণ দস্যুজীবনের দশ বৎসরের সাক্ষী স্বরূপ বিদ্যমান ছিল। আজি তাহার প্রয়োজন হইল।

তখন সেই ধনুর্ব্বাণ লইয়া অতি শীঘ্র গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। কিন্তু গৃহের চারিদিক্ খুঁজিয়া কোথাও আর সে মনুষ্যমূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন না। দেখিতে না পাইয়াও ক্ষান্ত হইলেন না, রাজপথে আসিয়া চারিদিক্ দেখিতে লাগিলেন।

এ দিকে, সেই সময় যখন রোরুদ্যমান শিশুর কান্না থামাইতে তাহার জননী তাহাকে সান্ত্বনা করিতেছিলেন, কে এক ব্যক্তি আসিয়া সেই গৃহের দ্বারদেশে দাঁড়াইল। সহসা চমকিত হইয়া, শিশুমাতা দেখিলেন, আগন্তুকের সর্ব্ব শরীর আবৃত রহিয়াছে, তিনি চিনিতে পারিলেন না। ভয়ে তাঁহার সর্ব্ব শরীর কাঁপিতে লাগিল। আগন্তুক শরীর হইতে আবরণ

উন্মোচন করিয়া, হাসিমুখে শিশু-মাতার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। উভয়ে উভয়কে চিনিলেন, ভয় বা কোন উদ্বেগ রহিল না।

আগন্তুক বলিলেন,—"এখানে নহে, এখনই ফিরিয়া আসিবে, আমি সহসা তাহাকে দেখা দিব না। তুমি তোমার শিশুকে লইয়া ঐ বনটার ভিতর এস।"

শিশুকে বক্ষে লইয়া তাহার জননী সেই বনের ভিতর আসিয়া দাঁড়াইল।

যদি পার, তোমরা ঐ চন্দ্রের আলোক নিবাইয়া দাও! ঐ মাধবীজড়িত উন্নত তরু এ চন্দ্রালোকে যেন আমার সমক্ষে প্রকাশিত না হয়! আমি কেমন করিয়া সেই শেষ কথা বলিব, তাহাই ভাবিতেছি।

সেই ক্ষুদ্র বনটার ভিতর যে একটা বন্য-বৃক্ষ ছিল, তাহা খুব উন্নত, তাহার শাখা প্রশাখায় মাধবী আপনার শাখা প্রশাখা জড়াইয়া জড়াইয়া সে স্থানটুকু একটু আঁধারে ঢাকিয়াছিল। তেমন যে শরতের জ্যোৎস্না, তাহা সেখানে বড় পৌঁছিতে পারে নাই। সেই শুভ্র জ্যোৎস্না-রাত্রিতে, চন্দ্রকরোজ্জ্বল সেই মাধবী-জড়িত উন্নত পাদপমূলে, সেই অস্পষ্ট ছায়ায় দাঁড়াইয়া যে কথাবার্ত্তা চলিতেছিল,—কিন্তু সে কথা বলিবার আগে আর একটা কথা বলি।

সয়তানরূপী সেই মহাপাপ প্রাণভয়ে পলায়ন করিয়াছিল বটে, কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে সে ধরা পড়িল। তখন আপনার সকল অপরাধ স্বীকার করিয়া, সে বলিল,—"আমাকে মারিতে হয়, মার; তুমি নিজে না মারিলেও আমি আপনি মরিব। কিন্তু তোমার স্ত্রী যে অসতী, তাহার প্রমাণ দেখাইব। ঐ দেখ, ঐ বনের মধ্যে কাহারা দাঁড়াইয়া আছে? ঐ শুন, তোমার শিশু বুকের মধ্যে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতেছে কি না!"

সয়তানের পাপ অভীষ্ট সিদ্ধ হইল। কাল-সর্প এইরূপ দংশন করিয়া সহসা কোথায় সরিয়া পড়িল।

সত্য কি মিথ্যা, এ চিন্তার এতটুকুও তরঙ্গ উঠিল না। সেই মর্ম্মচ্ছেদী কথা শুনিয়া সহসা যেন দশ বৎসরের দস্যু-জীবন ফিরিয়া আসিল। বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন হইল,—"এ বনের মধ্যে তোমরা কে?"

কেহ উত্তর দিল না, কিন্তু শুনা গেল, রমণী চলিয়া আসিতে চাহিতেছে। তখন আবার তেমনি বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে উচ্চারিত হইল,—"তোমাকে আর ফিরিয়া আসিতে হইবে না,—ঐ খানেই থাক।"

বিলম্ব সহিল না,—সুতীক্ষ্ণ বাণ তৎক্ষণাৎ ধনুশ্চ্যুত হইয়া সেই ক্ষুদ্র বনের ভিতর প্রবেশ করিল। চক্ষের পলক ফেলিতে না ফেলিতে রমণী ভূমিসাৎ হইলেন। পার্শ্বস্থিত ব্যক্তি "পাষণ্ড! কি করিলি" বলিয়া চীৎকার করিয়া মূর্চ্ছিত হইল। সে মূর্চ্ছা আর ভাঙ্গিল না।

তখন সেই স্ত্রীপুত্রহন্তা মহাপাতকী সেই বনের মধ্যে বৃক্ষান্তরালে আসিয়া দাঁড়াইল। জ্যোৎস্নালোকে দেখিল, সুতীক্ষ্ণ বাণ কোমল-শিশুর কোমল পৃষ্ঠ ভেদ করিয়া শিশুমাতার বক্ষে বিদ্ধ হইয়াছে!!!

তখন মহাপাতকী সেই স্থানে বসিল। মূর্চ্ছিত ব্যক্তিকে চিনিতে পারিল। সতী কাতর কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন,—"স্বামিন্, আমি চলিলাম, আজিও আমার পূজা সম্পূর্ণ হয় নাই। যে লোকে যাইতেছি, সেই খান হইতেই তোমার পূজা করিব। এই বনের মধ্যে যাঁহার সহিত কথা কহিতেছিলাম, দেখ, বোধ হয়, এই মূর্চ্ছাতেই তাঁহারও মৃত্যু হইয়াছে। উহাঁকে দেখিলে চিনিতে পারিবে, আমার পিতা! কা'ল এই দেশে আসিয়াছিলেন, দশ বৎসর বনে বনে ঘুরিয়া তুমি কি হইয়াছিলে, তাই,

তোমার উপর রাগ করিয়া তোমাকে দেখিতে চাহেন নাই। আমি অনেক বুঝাইয়াই তাঁহাকে আনিয়াছিলাম। আজ তিনি তোমার সহিত দেখা করিতেন। আমি চলিলাম, কিন্তু এই শিশুটীকে যদি তোমার চরণে রাখিয়া যাইতে পারিতাম, আমার মত ভাগ্যবতী কে হইত! মায়ের এ স্নেহ-বুক হইতে বাছাকে টানিয়া লইও না, এখনও মা বলিয়া ডাকিবার জন্য সে আমার পানে চাহিয়া আছে! তবে যাই, আমার জন্য শোক করিও না।"

তার পর আর কি বলিব?

মালাবার পাহাড়ের উপর বসিয়া যিনি এই কাহিনী বলিতে বলিতে আকুল ক্রন্দনে বুক ভাসাইয়াছিলেন, সেই ভীষণ রজনীতে তাঁহার চক্ষে এক বিন্দু অশ্রু নির্গত হয় নাই! মৃত স্ত্রী পুত্রের মৃতদেহ বক্ষে ধারণ করিয়া, একদৃষ্টে স্ত্রীর মুখপানে চাহিয়া রহিলেন, চক্ষে আর পলক পড়িতেছে না, চক্ষু ফাটিয়া শোণিত বহিতেছে!

সে রজনীও প্রভাত হইল। রবি-কিরণ সে গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিল, কিন্তু সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য ও পবিত্রতার আধার একখানি প্রেমমুখ সে গৃহের কোথাও দেখিতে পাইল না! প্রভাতের ছোট ছোট পক্ষীগুলি বাতায়নে বসিয়া কাহাকে ডাকিতে লাগিল, বাতায়ন আলো করিয়া যে বসিয়া থাকিত, পক্ষীর সুধাকণ্ঠের সহিত যে অস্ফুট কথায় অস্ফুট কণ্ঠ মিলাইত,—আকুলপ্রাণ পক্ষীর দল সে শিশুটীকে কোথাও আর দেখিল না। ভিখারী ভিক্ষা পাইল না। সুখপূর্ণ সে গৃহমাঝে তাহারা দেখিল, মূর্ত্তিমান্ শোক বিরাজ করিতেছে।

মালাবার হইতে কিছু দূরে সেই যে কুটীর ছিল, এখন তাহার চিহ্নমাত্রও বিদ্যমান নাই। সে স্থানটুকুতে জঙ্গলে ভরিয়া গিয়াছে, কুটীর ভূমিসাৎ হইয়া লুপ্ত চিহ্নে পরিণত হইয়াছে! কিন্তু সেই মাধবীজড়িত উন্নত তরু আজিও বিদ্যমান আছে! সেই তরুমূলে দাঁড়াইয়া অনেক অনুসন্ধান করিয়াও কোন চিহ্ন পাই নাই! কিন্তু বিস্ময়ের কথা এই, বাণবিদ্ধা হইয়া যে স্থানটুকুতে সতী প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, সে স্থানটুকু আজিও তেমনি পরিষ্কার আছে, তাহার উপর একটীও তৃণ জন্মিতে দেখি নাই। কিন্তু সে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদচিহ্নগুলি মুছিয়া গিয়াছে!

আমার এ কাহিনীর এই খানেই সমাপ্তি। এই পূজার আনন্দদিনে এ দুঃখ-কাহিনী না শুনাই ভাল ছিল। কিন্তু শরতের শুভ্র জ্যোৎস্নাময়ী রজনী, আর চন্দ্রকরোজ্জ্বল মাধবীবেষ্টিত এই উন্নত তরু এবং তরুতলে এই অস্পষ্ট ছায়া,—ইহা দেখিলেই সে কাহিনী আমার মনে পড়ে। পূজার দিনে তোমরা আনন্দ কর, কিন্তু এ আনন্দের দিনে যদি পার, তবে এস, সেই স্ত্রী-পুত্রহন্তা মহাদুঃখীর জন্য একটু কাঁদি। যে শাস্তি ভগবান্ তাহাকে দিয়াছেন, যদি তাহাতে তাহার মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়, তথাপি এস কাঁদি। "দেবতারা মেঘ কণ্টক-ক্ষেত্র দেখিয়া বৃষ্টি সংবরণ করে না।"

শ্রীবিপিনবিহারী রক্ষিত।

নূতন কথা।

মাননীয় সম্ভ্রান্ত একজন কায়স্থ সম্প্রতি আমার লেখার কিছু দোষ গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি মনে করিয়াছেন যে, নয়নচাঁদের গল্পে আমি হিন্দুধর্ম্মের প্রতি পরিহাস করিয়াছি। এরূপ দোষ ধরিলে হাসির গল্প একেবারেই লিখিতে পারা যায় না। তা ছাড়া, সে গল্পে আমি আপনাকে একেবারে ভুলিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। নয়নচাঁদের কথা, নয়নচাঁদের ভাব সম্পূর্ণভাবে আনিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। ক্রমাগত আপনার কোলে ঝোল টানিয়া গুলিখোর যাহা করিতে পারে কি বলিতে পারে, তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। তাহার ভিতর যদি টি, এন, মুখার্জ্জির গাম্ভীর্য্য আনিতে যাইতাম, তাহা হইলে আমার গল্পের দশা কি হইত? "গিন্নী! একবার বাহির হইয়া দেখ দেখি, বাপধোন! ব্যাপার খানা কি?" যে নয়নচাঁদের মুখ দিয়া এ কথা বাহির হইয়াছে, তাহার মুখ দিয়াই অপর সব কথা বাহির হইয়াছে। তার আবার দোষগুণের বিচার কি? কিন্তু দোষ সে জন্য ধরা হয় নাই। দোষ ধরা হইয়াছে এইজন্য যে, আমি বিলাত গিয়াছি। বিলাত যাইলেই যে, আর্য্যধর্ম্মের নিন্দা করিতে হয়, এ কথা আমি স্বীকার করি না। বিলাতযাত্রার পক্ষে যাহা কিছু গোলমাল, তাহা যে কুসংস্কার-জনিত তাহাই আমার বিশ্বাস। প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে আমার একটী আত্মীয় ব্রহ্মদেশে গিয়াছিলেন। সেজন্য গ্রামের লোকে এতই উৎপীড়ন করিয়াছিল যে, তাঁহাকে দেশত্যাগী হইতে হইয়াছিল। এক্ষণে সে রেঙ্গুন, মোলমিন, শিঙ্গাপুরে যাইলে কি হয়? তাহার পর এই যে শত শত হিন্দু প্রতি বৎসর ডেমেরা, ট্রিনিডাড, মরিশস হইতে ফিরিয়া আসিতেছে, তাহাদের কে কি বলিতে সমর্থ হইয়াছে। উদয়পুর, বরদা, নরসিংহগড় প্রভৃতি রাজ্যের রাজাদিগের কে কি করিতে পারিয়াছে? ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে যে সমুদয় পণ্টন ও তাহার সহিত যে সমুদয় বাঙ্গালি ব্রাহ্মণ মিসর ও মণ্টায় গিয়াছিলেন, তাঁহাদের কে কি করিতে পারিয়াছেন? প্রকৃত কথা এই, সমুদ্র যাত্রায় এখন লোকের আপত্তি নাই, "বিলাত" নামেই যত দোষ।

এই হইল লোকাচারের কথা। শাস্ত্র বিষয়েও দুই মত। শূলপাণি, রঘুনন্দন, যাহা বলিয়াছেন তাহা সর্ব্ববাদি সম্মত নয়। মহাত্মা রাধাকান্ত দেবের সময় পণ্ডিতগণ শূলপাণির মত সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করেন নাই। অদ্বিতীয় পণ্ডিত বাচস্পতি মহাশয় এ মত একেবারেই অগ্রাহ্য করিয়া গিয়াছেন। সম্প্রতি রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরও এই ভাবে ব্যবস্থা সংগ্রহ করিয়াছেন। আমি বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিলে, জয়পুরে আমার ভ্রাতা শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় দেশদেশান্তর হইতে পণ্ডিত একত্র করিয়াছিলেন। এই বিষয় লইয়া সেই পণ্ডিত-মণ্ডলী কয়দিন ধরিয়া বিচার করেন। তাঁহাদের ব্যবস্থা অনুসারে পুনর্ব্বার যজ্ঞোপবীত গ্রহণ ও বেদপাঠ প্রভৃতি ক্রিয়া দ্বারা আমাকে সংস্কৃত হইতে হইয়াছিল। সে সভায় সমগ্র ভারতবর্ষের মহা-মহা পণ্ডিতগণ উপস্থিত ছিলেন। বিলাত যাইলে যে অখাদ্য খাইতে হইবেই হইবে ও তাহার পর ফিরিয়া আসিয়া যে আর্য্যধর্ম্মের নিন্দা করিতে হইবেই হইবে, যাঁহাদের এরূপ বিশ্বাস, ভ্রান্তিবশতঃ তাঁহাদের মনে নানারূপ চিন্তার উদয় হইতে পারে। আমি যে এত কথা বলিলাম, সে কেবল ভ্রান্তি দূর করিবার নিমিত্ত। নিজে আমি পৃথিবীতে কাহাকেও ভয় করি না। ভৃগু কর্ত্তৃক আঘাতিত হইয়া, তবুও যে শক্তির নিমিত্ত নারায়ণ ভৃগুর সম্মান করিয়াছিলেন, আজ, পাঠক! এই সমস্ত পৃথিবীর ভিতর, গৃহস্থের মধ্যে, একা আমাতে সেই মহাবল বিদ্যমান। ইহা ধ্রুবের কোমল ভক্তি নয়, ইহা ঘোর-গর্ব্বিত মহাশক্তি।

* * * *

সমস্ত দিন অপর কার্য্যে ব্যস্ত থাকিয়া রাত্রিকালে এই যে জন্মভূমির জন্য পরিশ্রম করিতেছি, সে কেবল দেশের উপকারের জন্য,

অণুমাত্র নিজের জন্য নয়। ১৮৭৫ সালে সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত হণ্টার সাহেব আমাকে প্রথম বিলাত লইয়া যাইবার জন্য একান্ত ইচ্ছা প্রকাশ করেন। "জাতি যাইবে" একারণে আমি সম্মত হইলাম না। ১৮৮২ সালে বিলাত যাইবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট আমাকে পুনর্ব্বার বিশেষরূপে অনুরোধ করেন। সেবারও সম্মত হইলাম না। ১৮৮৫ সালের ১৬ই নবেম্বর রাত্রিকালে বোম্বাই নগরে সমুদ্র কুলে মহালক্ষ্মী দেবীর মন্দিরে একখানি পাথরের উপর শুইয়া নিদ্রা যাইতে চেষ্টা করিতেছিলাম। ঘোর নিশীথকাল, গভীর অন্ধকার, ঘন ঘন সমুদ্র তরঙ্গের আঘাতে পৃথিবী আলোড়িত হইতেছিল। স্বদেশের হিতের নিমিত্ত তখন বিলাত-যাত্রা স্থির হইল। কি করিয়া স্থির হইল, সে কথার আবশ্যক নাই। বিদ্যালয়ে আমি লেখা-পড়া কিছুমাত্র শিখি নাই, কিন্তু তখন হইতে নানা বিদ্যা আমার প্রত্যক্ষ হইল, বিশ্ব-জগতের নানা রহস্য আমার নয়নগোচর হইল। বিলাতে যাইলে মহারাণী প্রভৃতি আমার যথোচিত সম্মান করিয়াছিলেন। যাঁহাদের কৃপা-কটাক্ষে লোকে রাজা মহারাজা হইতে পারে, তাঁহারা সমকক্ষভাবে আমার সমাদর করিয়াছিলেন। কিন্তু বিলাত যাইয়া যাহাতে স্বার্থ সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র আমি কোনও বিষয়ে লাভবান না হই, যাহাতে অণুমাত্র স্বার্থ-চিন্তা আমার হৃদয়ে স্থান না পায়, এ বিষয়ে আমাকে বিশেষরূপে সতর্ক হইতে হইয়াছিল। যদি উচ্চপদ অথবা উচ্চ উপাধি লইয়া আসিতাম, তাহা হইলে, পাঠক! আজ তোমাদিগকে আমি শিক্ষা দিতে পারিতাম না। জন সাধারণকে লোকে যে ভাবে বিচার করিয়া থাকেন, আমার প্রতি যিনি সেই ভাব আরোপিত করিতে যাইবেন, তিনি ঘোরতর ভ্রমে পতিত হইবেন।

* * *

যাঁহারা আমার নিকট শিক্ষা লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, আমি তাঁহাদিগকে বলিতেছি যে, এক্ষণে এই পৃথিবীর উপর আমাদিগকে কিছু খরতর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে হইবে। সামান্য পদ-দলিত মৃত্তিকা হইতে কোটি কোটি যোজন অন্তর নক্ষত্র-মণ্ডলীর উপর এই খরতর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে হইবে। প্রচ্ছন্নভাবে হউক কি প্রকাশ্যভাবে হউক, এই প্রকৃতি-রাজ্যে, এই বিশ্ব-জগতে, মুহুর্মুহুঃ নানা ক্রিয়া সম্পাদিত হইতেছে। বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে, একান্তমনে এই সব ক্রিয়া অবলোকন করিয়া, কার্য্যকারণ অনুশীলন করিয়া, জীবের হিতের নিমিত্ত প্রকৃতির আসুরিক বলসমূহকে পদানত করিতে হইবে।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানশাস্ত্রের প্রভাবে এক্ষণে কার্য্যকারণ অনুসন্ধান করিবার বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। অতি সামান্য সামান্য বিষয় হইতে উচ্চ হইতে উচ্চতর বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে হইবে। আমার একান্ত ইচ্ছা যে, এক একটী বিষয়ে এদেশে এমন এক একটী পণ্ডিত আবির্ভাব হউন, যেন পৃথিবীতে তাঁহার মত আর দ্বিতীয় লোক না থাকে। কি দুরাশা আমার? বর্ত্তমানের অবস্থা দেখিয়া বড়ই নিরাশ হইতে হয়। এই দেখ, আমাদের দেশে কিরূপ উদ্ভিদ আছে, তাহা কে জানে? সাহেবেরা। আমাদের মাটির ভিতর কিরূপ ধাতু আছে, তাহা কে জানে? সাহেবেরা। আমাদের বনে কিরূপ জীবজন্তু আছে, তাহা কে জানে? সাহেবেরা। আমাদের জলে কিরূপ মৎস্যাদি আছে, তাহা কে জানে? সাহেবেরা। অধিক আর বলিবার আবশ্যক নাই। এই সব প্রশ্নের উত্তর যে দিন হইবে—"বাঙ্গালিরা", সেইদিন আমার মনস্কামনা সিদ্ধ হইবে।

প্রতিদিন কত কি আমাদের নয়নগোচর হয়, অথচ আমরা চক্ষু মেলিয়া দেখি না। এই

একটী সামান্য বিষয়ের কথা বলিতেছি। এক ক্ষেত্রে, এক রকম মাটিতে, একপ্রকার আঁবের বীজ পুতিয়া নানাপ্রকার ফল পাই কেন? আমি সাধের একটী বাগান করিব। এক স্থানে পরিসর ভূমি লইলাম। বাছিয়া বাছিয়া ভাল ভাল আঁবের আঁটি তাহাতে পুতিলাম। আট বৎসর আশাপন্ন হইয়া অতি যত্নে সেই গাছগুলিকে প্রতিপালন করিলাম। কিন্তু হায়! যখন ফল ফলিল, তখন দেখিলাম যে, কোনওটী গাছের ফল খাইতে সুস্বাদু, আবার তাহার ঠিক পাশের গাছটীর ফল জোঁদা টক। গাছটী কাটিয়া ফেলিতে হইল। আমার আট বৎসরের পরিশ্রম মাটি হইয়া গেল, আমার আটবৎসরের প্রতীক্ষায় নিরাশ হইলাম। মাটির দোষে এইরূপ হয় সকলের এই ধারণা। কিন্তু পনর হাত দূরে, সেই ক্ষেত্রে, এমন কি মাটির পার্থক্য আছে যে, সে স্থানের গাছটীর ফল সুস্বাদু হইল? যাহা হউক, এ বিষয়ের আজ পর্য্যন্ত কোনও মীমাংসা হয় নাই। কেহ ভালরূপে অনুসন্ধানও করেন নাই। যদি মাটির দোষেই হয়, তাহা হইলে আজকাল আর অন্ধকারে ঢিল মারিবার কিছুমাত্র আবশ্যক নাই। বর্ত্তমান কালের রসায়ণ-শাস্ত্রের সহায়তায় মাটি উত্তমরূপে পরীক্ষা করিতে পারা যায়। কোন্ মাটিতে কি দ্রব্য আছে, তাহা অতি সূক্ষ্মভাবে বলিয়া দিতে পারা যায়। পরে কোন্ মাটিতে কিরূপ ফল হয়, তাহার শত শত দৃষ্টান্ত একত্র করিয়া কার্য্য-কারণের কথাটী মীমাংসা করিয়া লইতে হয়। এইরূপ নিয়মাবলী একবার আবিষ্কার হইয়া যাইলে আর আমাদের পরিশ্রম বিফল হয় না। কিন্তু এরূপ সব আবিষ্কার একদিনের কি একজনের কার্য্য নয়। শত শত লোক চারিদিকে বিচক্ষণতার সহিত নিরীক্ষণ করিলে তবে ফল ফলিতে পারে।

আঁবের বিষয় বলিতে আর একটী কথার উল্লেখ করি। আমাদের এখানে বোম্বাই গাছে ভাল ফল হয় না। তিন চারি বৎসর পরে হয় তো একবার ফলিল, তা না হইলে দেখিতে পাই সব শেওড়া গাছের মত দাঁড়াইয়া আছেন। যাঁহাদের আঁব বাগান আছে, আঁব তাঁহাদের বড় একটী আশার সামগ্রী। বাগানটী রহিল, অথচ আঁব হইল না, এরূপ নিরাশ হইলে ছেলে-পিলের জন্য বিশেষতঃ বড়ই মনঃকষ্ট হয়। বড় বড় গাছ হইল, অথচ আঁব হয় না, ইহার কারণ কি? আমি বিলাতে দেখিয়াছি সেব বা আপেলের গাছের ডাল লোকে খুব কাটিয়া দেয়, চারিদিকে ভাসা-ভাসা শীকড়ও সব কাটিয়া দেয়। গাছগুলি মুড়া হয় বটে, কিন্তু তাহার হাড়ে হাড়ে ফল ধরে। অনেক গাছের স্বধর্ম্ম এই যে, তাহারা সহজে ফল ফলাইতে চায় না। যে বলটী প্রয়োগ করিয়া ফুল ফল করিতে হইবে, এই সব সন্ন্যাসী গাছেরা সেই বলটী প্রয়োগ করিয়া নিজের শরীরের পরিবৃদ্ধি-সাধন করে। নিজের ডাল-পালা বৃদ্ধি করে। মানুষে সে নিমিত্ত তাহাদের ডালপালা কাটিয়া দিয়া তাহাদিগকে তেজ-হীন করিয়া বলপূর্ব্বক ফলবান করে। গাছের ভাসা-ভাসা শীকড়ে যে রস সংগৃহীত হয়, তাহাতে ডাল-পালা বৃদ্ধি পায়, তাহাতে ফল হয় না। সে নিমিত্ত মানুষে অনেক গুলি এই ভাসা-ভাসা শীকড় কাটিয়া দেয়। নিরুপায় হইয়া তখন গাছদিগকে ফলবান হইতে হয়। আঁবের কি সেরূপ কোনও উপায় করিবার যো নাই? যদি এরূপ কোনও একটী উপায় আবিষ্কার করিতে পারা যায়, তাহা হইলে লোকের বড়ই উপকার হয়। কলিকাতার নিকট পল্লি-গ্রামে অনেক ভদ্র-সন্তান আঁব, কাঁঠাল, নারিকেল, বাঁশ বেচিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন।

অনেক সময়ে তাঁহাদের বৎসরের আশা ভরসা একেবারে মাটি হইয়া যায়। প্রথম ত তাঁহাদের উপকার হয়। তাহার পর অধিক ফল জন্মিলে ফল শস্তা হয়। গরীব দুঃখী সকলেই এই অমৃত সমান সুস্বাদু ফল খাইতে পায়।'

এ স্থানে আর একটী কথা রহস্য-চ্ছলে জিজ্ঞাসা করিতে পারা যায়। ঘাস ও বাঁশ এক জাতীয় উদ্ভিদ। গম, ধান্য প্রভৃতি এক প্রকার ঘাস ব্যতীত আর কিছুই নয়। নীরবে দাঁড়াইয়া বাঁশ মহাশয় দেখিলেন যে, বোকা ধান্য প্রভৃতি ঘাসেরা প্রতি বৎসর ফলোৎপাদন করিয়া মরিয়া যায়। বাঁশ ভাবিলেন, "বটে! তবে যে বলে ফল ফলে, আমি দেহ পুষ্টির দিকে সেই বলটী প্রয়োগ করিব, ফলের দিকে তাহা বৃথা নষ্ট করিব না।" বংশানুক্রমে বাঁশ সেই ভাবে যত্ন করিতে লাগিলেন। কাল কালান্তরের যত্ন সহকারে বাঁশ কি ঘাস হইতে এত পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছেন? মশাটী হইতে ক্রমে হাতিটী হইয়াছেন? কেবল ঘোরতর অনাবৃষ্টির বৎসরে বাঁশ আর থাকিতে পারেন না। রৌদ্রের উত্তাপে তাঁহাকে ফলিতে হয়। তখন তিনি ঠিক ধান্যের মত ফল উৎপাদন করিয়া কাল-গ্রাসে পতিত হন্! অনাবৃষ্টি হেতু দুর্ভিক্ষের সময় বন্য প্রদেশের লোক সেই বাঁশের চাউল খাইয়া জীবিত থাকে।

সচরাচর গাছ পালা কিন্তু আম ও বাঁশের মত স্বার্থপর নয়। সন্ন্যাস ধর্ম্মে তাহাদের রুচি নাই। পাঁচটী বাচ্ছা কাচ্ছা লইয়া সংসারী হয়, এই তাহাদের বাসনা। কত না কৌশল করিয়া তাহারা আপনাদিগের বংশ বিস্তার করিতে প্রয়াস পায়! কেহ বা ফলগুলি উজ্জ্বল বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত করে। যে পক্ষী পাখালি তাহাদিগের রূপে মোহিত হইয়া, মুখে করিয়া দেশ দেশান্তরে লইয়া ফেলিবে। কারণ ঠিক তলায় পড়িলে, ছায়ায় সূর্য্যকিরণ অভাবে তাহাদের স্বাস্থ্যের বিঘ্ন হইবে। কেহ বা সুস্বাদু শস্যে বা সুমিষ্ট রসে বীজ গুলিকে আবৃত করিয়া রাখে। ইহার উদ্দেশ্যও তাহাই। যে পক্ষী ও জীবজন্তুগণ মুখে করিয়া দূর দূরান্তরে লইয়া ফেলিবে। কেহ বা বীজের গায়ে পক্ষ নির্ম্মাণ করে। যে, এই পক্ষের সহায়তায় বায়ু ভরে উড়িয়া বীজগুলি দূরে গিয়া পড়িবে। পাঠক! একবার শিমুলেরদিকে দৃষ্টি করিয়া দেখ, বংশ বিস্তারের নিমিত্ত শিমুল কিরূপ বুদ্ধি বাহির করিয়াছে!

শুনিলাম, কবিরাজ যশোদানন্দন সরকার মহাশয় আমার নানারূপ ভ্রম দর্শাইয়া দৈনিকে এক পত্র লিখিয়াছেন। যা, একটু আধটুকু অবসর পাই, তাহা এইরূপ লিখিতে পড়িতে অতিবাহিত হইয়া যায়। আফিসের কাজে নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়াও বন্ধু-বান্ধবের অনুরোধে, আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া অনেক সময়ে এইরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হয়। তাহার উপর লোকের পত্রের উত্তর প্রত্যুত্তর দিতে হইলে আর আমার প্রাণ বাঁচে না। তবে যে, আমি ভ্রমে পতিত হইলে কেহ আমার ভ্রম সংশোধন করিবেন না, এ কথা আমি বলি না। আমি কেবল এই কথা বলি যে, অযথা আমার দোষ দর্শাইলেও সে ভ্রম খণ্ডন করিবার আমার অবসর নাই। কবিরাজ মহাশয়ের নিকট আমার একটী নিবেদন আছে। দৈনিকে তিনি লিখিয়াছেন যে, মুর্গা ও মূর্ব্বা এক গাছ। আমার নিবেদন এই যে, তাঁহার ঔষধে তিনি যেন ভারতীয় মূর্ব্বার পরিবর্ত্তে আমেরিকা হইতে আনীত মুর্গা না ব্যবহার করেন। বিলাতী উদ্ভিদশাস্ত্রে মূর্ব্বার নাম Sanseviera zeylanica, ইহা এ দেশের। মুর্গার নাম Agave americana, ইহা বিদেশের। দুইটী পৃথক্ বস্তু।

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়।

হিন্দু ও বৌদ্ধ।

(৩)

যখন গর্ভমধ্যে অনুপলিপ্ত ভগবান্ বোধিসত্ত্ব ভূতলে অবতীর্ণ হইলেন, তখন দেবরাজ ইন্দ্র এবং সুরশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা এবং অন্যান্য ব্রহ্ম-লোক-বাসী দেবগণ, বুদ্ধদেবকে দিব্য কৌষিক বস্ত্রে আচ্ছাদিত করিয়া গ্রহণ করিলেন। অনন্তর পৃথিবী ভেদ করিয়া এক মহাপদ্ম প্রাদুর্ভূত হইল। নন্দ এবং উপনন্দ নামক নাগরাজদ্বয় গগনতলে থাকিয়া শীত উষ্ণ জলধারা দ্বারা তাঁহাকে স্নান করাইলেন। ইন্দ্র, ব্রহ্মা, লোকপালগণ এবং অপর শত সহস্র দেবগণও তাঁহাকে বিবিধ গন্ধজলে স্নান করাইলেন। আকাশে দুই চামর এবং রত্নময় ছত্র প্রাদুর্ভূত হইল। তখন বোধিসত্ত্ব সেই মহাপদ্মে আসীন হইয়া চতুর্দ্দিকে অবলোকন করিতে লাগিলেন। সেই দিব্য-দর্শনে জগতের অবস্থা তৎক্ষণাৎ সুবিভাত হইল।

এদিকে কোটি অপ্সরা লুম্বিনীবনে পুষ্প, ধূপ, গন্ধাদি দ্বারা মায়াদেবীকে অর্চ্চনা করত বহুতর স্তব-স্তুতি করিতে লাগিলেন। রাজা যখন পুত্রজন্ম-মহোৎসবে নিমগ্ন, তখন নগরপালগণ আসিয়া তাঁহাকে সংবাদ দিল,— "রাজন্! শাক্যবংশে পঞ্চবিংশতি সহস্র কুমার উৎপন্ন হইয়াছে, অষ্টশত দাসী-পুত্র এবং দশ সহস্র অশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে।" রাজা এইরূপ অনেক প্রাণীর উৎপত্তি-সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন। গয়াধামের অশ্বত্থ-বৃক্ষও এই সময়ে উৎপন্ন। কত সুলক্ষণ, কত সুনিমিত্ত এবং কত আনন্দ-পরম্পরা যে তখন একত্র সমবেত হইল, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

রাজা অকাতরে ধনদান, অন্নদান করিতে লাগিলেন। কেবল শুদ্ধোদনরাজ্য নয়, সমগ্র পৃথিবীই তখন জ্ঞাত অজ্ঞাত কারণে মহোৎসবে মহানন্দে নিমগ্ন হইল।

রাজা, পুত্রজন্মের সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বপ্রকার অভীষ্ট-সিদ্ধি লাভ করিলেন বলিয়া পুত্রের নাম রাখিলেন,— সর্ব্বার্থ-সিদ্ধ।

লুম্বিনীবনে ব্রহ্মাদি দেবগণ, ঋষিগণ ও অপ্সরোগণের গুপ্ত ও ব্যক্তভাবে সতত সমাগম হইতে লাগিল। সকলেরই মুখে 'জয়' শব্দ, আনন্দ-ধ্বনি। কিন্তু জরামরণ-দুঃখ-সংবেদন-পরায়ণ বোধিসত্ত্বের অবতারানন্দ-ভোগ সপ্তাহ-মাত্র হইতেছে, এমন সময়ে বোধিসত্ত্ব-জননী মায়াদেবী স্বর্গলাভ করিলেন। মায়াদেবীর আয়ুষ্কাল সেই সাংসারিক মহানন্দতরঙ্গ প্রতিহত করিয়া, সাধারণের অলক্ষ্য বোধিসত্ত্বের গভীরতম উদ্দেশ্য সঙ্কেতে প্রকাশ করিয়া শেষ-পরিচ্ছেদ প্রাপ্ত হইল। কিন্তু সঙ্কেত তখন সফল হইল না, আনন্দের পূর্ণ বিলাসক্ষেত্রে বিষাদের গাঢ়ান্ধকার লোকে তখন বুঝিয়াও বুঝিল না, সংসারের অসারতা সর্ব্বত্র সুব্যক্ত থাকিয়াও ত প্রতিভাত হয় না। সর্ব্বার্থসিদ্ধের অদ্ভুত লীলারসে, বিষাদচ্ছায়া তিরোহিত হইল, আনন্দ-উৎসব-প্রবাহ ছুটিতে লাগিল। সর্ব্বার্থসিদ্ধ মহাসমারোহে লুম্বিনীবন হইতে কপিলবস্তু নগরে প্রেরিত হইলেন। দেবতা, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, কুমারী, বীর, রথ, পদাতি, দলে দলে সর্ব্বার্থসিদ্ধের অনুবর্ত্তী হইলেন। মায়া দেবীর লুম্বিনীবন-প্রবেশ সময়ে যে প্রকার সমারোহ হইয়াছিল, তদপেক্ষা লক্ষ-কোটি-গুণ সমারোহে সর্ব্বার্থসিদ্ধের লুম্বিনীবন-নির্গমন-পর্ব্ব সমাহিত হইল। পঞ্চশত প্রধান শাক্যগণ কপিলবস্তু নগরে বোধিসত্ত্বের অবস্থানার্থ প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাঁহাদের আগ্রহ দেখিয়া রাজা সর্ব্বার্থ-

সিদ্ধকে একে একে সেই সব প্রাসাদে রাখিয়া চারি মাস পরে স্বীয়-ভবনে লইয়া আসিলেন। বহু নির্ব্বাচনান্তে, সর্ব্বার্থসিদ্ধের মাতৃষসা মহাপ্রজাবতী গৌতমী তাঁহার প্রতিপালনভার প্রাপ্ত হইলেন। দ্বাত্রিংশৎ ধাত্রী নিযুক্ত হইল।

ভগবান্ শুক্লপক্ষে শশিকলার ন্যায় দিনে দিনে পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন।

"কিংনু খল্বয়ং রাজা ভবিষ্যতি চক্রবর্ত্তী,
আহোস্বিদভিনিষ্ক্রমিষ্যতি প্রব্রজ্যায়ৈ।"

এই কথা লইয়াই রাজা সর্ব্বদা পর্য্যালোচনা করিতেন।

মুনি, ঋষি, গন্ধর্ব্বগণ রাজা শুদ্ধোদনের গৃহে সর্ব্বদাই গমনাগমন করিতে লাগিলেন। যেখানে ভগবান্ অবতীর্ণ, সেস্থান যে স্বর্গ অপেক্ষা মহনীয়।

বুদ্ধদেবের শরীরে দ্বাত্রিংশৎ মহাপুরুষ-লক্ষণ এবং অশীতিপ্রকার সুচিহ্ন বর্ত্তমান ছিল। আর, "শ্রীবৎস-স্বস্তিক-নন্দ্যাবর্ত্ত-বর্দ্ধমানসংস্থানকেশশ্চ সর্ব্বার্থসিদ্ধঃ কুমারঃ।" এই অশীতি প্রকার সুচিহ্নের মধ্যে শ্রীবৎস-চিহ্নও তাঁহার ছিল (১)। লক্ষণজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা সর্ব্বার্থসিদ্ধকে দেখিলেই বুঝিতেন এবং বলিতেন,—ইনি লোকোপকারের জন্য অবতীর্ণ। সংসারে থাকিলে মহারাজ চক্রবর্ত্তী হইবেন, আর সন্ন্যাসী হইলে পরম তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হইবেন।

"তেন চ সময়েন হিমবতঃ পর্ব্বতরাজস্য পার্শ্বে অসিতো নাম মহর্ষিঃ প্রতিবসতি স্ম। স দিব্যেন চক্ষুষা সর্ব্বং জম্বুদ্বীপমনুবিলোকয়ন্নদ্রাক্ষীৎ কপিলাহ্বয়ে মহাপুরে রাজ্ঞঃ শুদ্ধোদনস্য গৃহে কুমারং জাতং সর্ব্বলোকমহিতমিত্যাদি।"

ললিতবিস্তর ৭ম অঃ।

হিমালয় পর্ব্বত-পার্শ্ববাসী অসিত নামে এক মহর্ষি দিব্য চক্ষু দ্বারা সমগ্র জম্বুদ্বীপ অবলোকন করত দেখিলেন, কপিল বস্তুনগরে রাজা শুদ্ধোদনের গৃহে সর্ব্বলোকপূজিত ভগবান্, পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

অসিত ভাগিনেয়-সমভিব্যাহারে তথায় ভগবদ্দর্শন করিয়া বলিলেন,—

"নার্হত্যগারমধ্যবসিতুমবশ্যমভিনিষ্ক্রমিষ্যতি প্রব্রজ্যায়ৈ।"

ইনি কখনই গৃহে থাকিবেন না, নিশ্চয়ই সন্ন্যাসী হইবেন।

ঋষি অনেক কথা বলিলেন। আয়ুষ্কাল পূর্ণপ্রায়, বৌদ্ধধর্ম্ম-শ্রবণ তাঁহার ভাগ্যে ঘটিবে না বলিয়া ঋষি অনেক দুঃখ প্রকাশ করিলেন। অনেক স্তব-স্তুতি করিলেন, তাহাতে রাজা শুদ্ধোদনের ক্ষণিক ভগবদ্ভাব স্ফূর্ত্তি হইল, তখন বলিতে লাগিলেন,—

"বন্দিতস্ত্বং সুরৈঃ সেন্দ্রৈ-
র্ঋষিভিশ্চাপি পূজিতঃ।
বৈদ্যো * সর্ব্বস্য লোকস্য
বন্দেঽহমপি ত্বাংবিভো।"(২)

ঋষি বিভূতি-বলে আকাশমার্গে স্বীয় আশ্রমে চলিয়া গেলেন।

'অথ খল্বসিতো মহর্ষিস্তত এবর্দ্ধ্যা বিহায়সা প্রাক্রমৎ। ল, বি, ৭ম অঃ। (৩)

সাক্ষাৎ মহেশ্বরও বহুদেব-পরিবৃত হইয়া, শুদ্ধোদন গৃহে অলক্ষ্যে প্রবেশ ও বুদ্ধদেবের পাদ-বন্দনাদি পরিচর্য্যা করিয়া স্বস্থানে গমন করিলেন। কপিলবস্তু নগরে পুষ্পবৃষ্টি ও দেবগণের গমনাগমন এইরূপ হইতে লাগিল।

"বর্ষিত্য দিব্যকুসুমাং কপিলাহ্বায়েঽস্মিন।
কৃত্বা প্রদক্ষিণ স্তবিত্ব চ গৌরবেণ।
বুদ্ধঃ সুবুদ্ধ ইতি বাক্যমুদীরয়ন্তঃ
প্রক্রামন্তে সুরগণা গগনে সলীলাঃ॥"

* "বৈদ্যঃ সর্ব্বস্য" এই পাঠ শুদ্ধ। কিন্তু মূলে 'বৈদ্যোসর্ব্বস্য আছে।

কিছুকাল পরে, রাজা আদেশ করিলেন,—"মঙ্গলবাদ্য ধ্বনিত হউক, অমঙ্গলসূচক বিকৃত পুরুষেরা স্থানান্তরিত হউক, পুরদ্বার, রাজপথ এবং দেবগৃহ সুসজ্জিত হউক, বেদপাঠী ব্রাহ্মণেরা আনীত হউন; কন্যারথ সজ্জিত হউক এবং হে গৌতমি! কুমারকে অলঙ্কৃত কর। অদ্য কুমারকে দেব-মন্দিরে লইয়া যাইতে হইবে।" রাজাদেশ প্রতিপালিত হইতে লাগিল।

কুমার অলঙ্কৃত হইবার সময়ে মাতৃষসাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মা! আমাকে কোথায় লইয়া যাইবে।"

মাতৃষসা গৌতমী বলিলেন,—"বাবা! দেবালয়ে।" তখন ভগবান্ ঈষৎ হাস্য করিয়া মাতৃষসার জ্ঞানলাভার্থ বলিলেন,—

"জাতস্য মহ্য ইয় কম্পিত ত্রিসহস্রঃ
শক্রশ্চ ব্রহ্মা সুরাশ্চ মহোরগাশ্চ।
চন্দ্রশ্চ সূর্য্যশ্চ তথ বৈশ্রবণঃ কুমারঃ
মূর্দ্ধো ক্রমেষু নিপতিত্য নমস্যয়ন্তে।
কৃতমোহথ দেব মম উত্তরিয়ো বিশিষ্টো
যস্মিন্ মম প্রণয়সে ত্বমিহাস্য অম্ব।
দেবাতিদেব অহ উত্তম সর্ব্বদেবৈঃ
দেবো ন মেঽস্তি সদৃশঃ কুত উত্তরী বা॥
লোকানুবর্ত্তনপ্রতীত ইতি অম্ব যাস্যে।—"

ললিতবিস্তর ৮ম অঃ।

অর্থাৎ আমি অবতীর্ণ হইবামাত্র ত্রিসহস্র লোক-ধাতুসমন্বিতা এই পৃথিবী কম্পিত হইয়াছিলেন। ইন্দ্র, ব্রহ্মা, চন্দ্র, সূর্য্য, কুবের, কার্ত্তিকেয় প্রভৃতি দেবগণ এবং নাগগণ, আমার পদতলে পতিত হইয়া প্রণাম করেন। আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দেবতা আর কে আছেন, যাঁহার উদ্দেশে আমাকে মা প্রণাম করাইবে? আমি দেবাতিদেব, আমি সর্ব্বদেবোত্তম, আমার সদৃশ দেবতাই আর নাই, উত্তম দেবতা কিরূপে থাকিবেন। যাহা হউক, আমি এখন লোকানুবর্ত্তী, সুতরাং দেবালয়ে যাইব।

সর্ব্বার্থসিদ্ধ মহা সমারোহে দেবালয়ে নীত হইলেন। তিনি দেবালয়ে প্রবিষ্ট হইবামাত্র, দেবপ্রতিমা সকল স্ব-স্বরূপে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন, স্তব করিলেন।

"দেবপ্রতিমাঃ (তদ্যথা—শিবস্কন্দ-নারায়ণ কুবের-চন্দ্র সূর্য্য-বৈশ্রবণ শক্র-ব্রহ্ম-লোক-পাল-প্রভৃতয়ঃ প্রতিমাঃ) সর্ব্বাঃ স্বেভ্যঃ স্বেভ্যঃ স্থানেভ্যো ব্যুত্থায় ক্রমতলয়োর্নিপতন্তি স্ম।" ইত্যাদি। ল, বি, ৮ম অঃ।

দর্শকমণ্ডলী বিস্ময়াপন্ন হইয়া রহিল। (৪)

(বক্তব্য)

(১) শ্রীবৎস-চিহ্ন নারায়ণের ছিল, শ্রীবৎস-লক্ষ্মা, শ্রীবৎসধারী প্রভৃতি শব্দ নারায়ণেরই বাচক। বৌদ্ধশাস্ত্রে দেখিতেছি, বুদ্ধদেবে সেই শ্রীবৎস। পুরাণ-কথিত-বহুদেব-সংবাদ প্রকাশক বৌদ্ধগ্রন্থে এখানেও সঙ্কেতে বুদ্ধদেবের নারায়ণত্ব কীর্ত্তিত হইয়াছে।

(২) বসুদেবেরও এইরূপ ভাব সময়ে সময়ে হইত। বসুদেব-কৃত শ্রীকৃষ্ণ-স্তব ভাগবতে আছে।

(৩) বৌদ্ধশাস্ত্র হইতেও জানা যাইতেছে, বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রকাশের পূর্ব্বেও এদেশে যোগ-শাস্ত্রের বিশেষ আলোচনা ছিল।

ত্রিকালজ্ঞতা, আকাশপথে বিচরণ প্রভৃতি কার্য্য যোগের ফল। বৌদ্ধগ্রন্থে স্পষ্টই লিখিত রহিয়াছে, অসিত মহর্ষি দিব্য-জ্ঞানসম্পন্ন এবং বিভূতিযুক্ত অথচ তখন বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হয় নাই।

(৪) প্রতিষ্ঠা করিলে যে মৃত্তিকা-পাষাণাদি-মূর্ত্তিতেও দেবত্ব হয়, এ ধারণা বৌদ্ধদিগেরও ছিল, এ কথা বলা যাইতে পারে। ভগবদ্গীতাতে আছে,—

"ন ত্বৎসমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যঃ।"

অর্জ্জুন বাসুদেবকে বলিয়াছেন,—"তোমার সমান কেহই নাই, শ্রেষ্ঠ থাকিবেন কিরূপে?" বুদ্ধোক্তিতেও তাহাই পাওয়া যাইতেছে। আর বুদ্ধদেব স্বয়ং ইন্দ্র, ব্রহ্মা ইত্যাদি দেবগণের নাম কীর্ত্তন করিয়া বলিয়াছেন,—ইহাঁরা আমাকে প্রণাম করেন, আমি দেবাতিদেব। ইঁহারা প্রণাম করেন বলিয়া উল্লিখিত, তাঁহাদের মধ্যে নারায়ণের নাম নাই। সুতরাং এই অংশ দ্বারাও বুদ্ধদেবের নারায়ণত্ব জ্ঞাপিত হইয়াছে। কিন্তু, পরে যখন বোধিসত্ত্ব দেবমন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, তখন নারায়ণ-প্রতিমাও তাঁহাকে প্রণাম করিলেন, এইরূপ লিখিত আছে। বুদ্ধদেব নারায়ণের মহাবতার; সুতরাং নারায়ণের তাঁহাকে প্রণাম করা বিচিত্র নহে। পরশুরামও নারায়ণ, রামও নারায়ণ; কিন্তু তাঁহাদের উভয়ের যুদ্ধ, পরশুরামের পরাজয় অসম্বদ্ধ নহে। শিব এবং বিষ্ণুতে বাস্তব ভেদ নাই, কিন্তু বিষ্ণুও শিবপূজা করেন, শিবও বিষ্ণুপূজা করেন, পরস্পরের যুদ্ধও হইয়াছে। এ সব যেমন লীলা, নারায়ণ এক মূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হইয়া, স্বীয় মূর্ত্ত্যন্তরের প্রণাম গ্রহণ করিলেন, ইহাও সেইপ্রকার লীলা। এ কথা না বলিলে, এই বৌদ্ধগ্রন্থেই বিরোধ উপস্থিত হয়। এই ললিতবিস্তর পঞ্চদশ অধ্যায়েই স্পষ্ট লিখিত আছে।

"বজ্রদৃঢ় অভেদ্যো নারায়ণো আত্মভাবো
* * * * সোহকম্পিয়ো সর্ব্বসত্ত্বোত্তমঃ।"

সর্ব্বার্থসিদ্ধ বজ্রদৃঢ় অভেদ্য আত্মারাম অকম্পিত সর্ব্বসত্ত্বশ্রেষ্ঠ নারায়ণ।

রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র টীকায় লিখিয়াছেন—"নারায়ণো আত্মভাবো" নারায়ণতুল্যাত্মভাবঃ অর্থাৎ তিনি নারায়ণ-সদৃশ। এই কষ্ট-কল্পিত অর্থকে প্রমাণ জ্ঞান করিলেও বুদ্ধদেবকে নারায়ণ বলিতে হয়; কেননা, বুদ্ধদেব স্বয়ং বলিয়াছেন,—"আমার সদৃশ কেহ নাই, আবার এখানে যদি বলা যায়, 'বুদ্ধ নারায়ণের সদৃশ', তাহা হইলে এই দুই উক্তি নিশ্চয়ই অসঙ্গত হয়,—যদি বুদ্ধদেব বৌদ্ধমতে নারায়ণাবতার বলিয়া স্বীকৃত না হন। কেননা, বুদ্ধকে নারায়ণ সদৃশ বলিতে হইলে, নারায়ণও বুদ্ধ-সদৃশ ইহা স্বীকার করিতেই হয়। কিন্তু বুদ্ধ যে বলিয়াছেন, তাঁহার সদৃশ কেহ নাই। বুদ্ধ নারায়ণ হইলে, আপনার সদৃশ আপনি হইতে পারেন, "রাম রাবণয়োর্যুদ্ধং রাবণয়োরিব"। এইরূপ সাদৃশ্য-বোধক প্রয়োগ বাঙ্গালা-সঙ্গীতেও আছে। অতএব বৌদ্ধগ্রন্থ হইতে স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে,—

"স নারায়ণো"

ভাগবত দেখ, অগ্নিপুরাণ দেখ, দশাবতার-কথাযুক্ত যে কোন শাস্ত্র, সর্ব্বত্রই দেখিবে,—

"স নারায়ণঃ"

পরম বৈষ্ণব জয়দেব লিখিয়াছেন,—

"কেশব ধৃতবুদ্ধ-শরীর জয় জগদীশ হরে।"

যাঁহারা সর্ব্ব দেবদেবী মানিতেন, যাঁহারা নারায়ণকে সর্ব্বদেব-শ্রেষ্ঠ বলিয়া বুদ্ধরূপে পূজা করেন, যাঁহারা জাতিভেদ মানিতে বাধ্য, সেই প্রাচীন বৌদ্ধগণের মতানুবর্ত্তিগণ কালক্রমে হীন হইলেও—মূলের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, দৃঢ়তা সহকারে বলিতে পারি—হিন্দু হইতে ভিন্ন নহেন, অনন্ত-শাখাসম্পন্ন হিন্দু-সম্প্রদায়ের একটী প্রকাণ্ড অপরিজ্ঞাত শাখা ভিন্ন আর কিছুই নহেন। তবে এই বৌদ্ধ-ধার্ম্মিকগণের যে হানি উপস্থিত হইয়াছে, তাহা শাস্ত্রজ্ঞতার অভাবনিবন্ধন। হিন্দুধর্ম্মের প্রতি যে বিদ্বেষ আসিয়াছে, তাহা মূলচ্ছেদী পাণ্ডিত্যের প্রতিপত্তি প্রভৃতি অবনতিকর কারণকূটের অবশ্যম্ভাবী ফল ভিন্ন আর কিছুই নহে।

মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, উপেক্ষা যাঁহাদের শাস্ত্রে ধর্ম্মালোক-মুখ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, সেই সম্প্রদায়েরই ধর্ম্মপোষক "ধর্ম্মপাল"—শত্রুতা, নির্দ্দয়তা, বিষাদ এবং আসক্তির নিগড়বন্ধনে যে কারণে আবদ্ধ, বুদ্ধদেবের প্রিয় জাতিভেদ যে কারণে বৌদ্ধসমাজ হইতে তাড়িত হইয়াছে, আর্য্যাচার স্থলে ম্লেচ্ছাচার অভিষিক্ত হইয়াছে, সে সব কারণও প্রাচীন অবনতিমূলের কার্য্যপরম্পরা। সে সব আলোচনা সময়ে করিবার প্রবৃত্তি থাকিল।

শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন।

আকবর-চরিত্রে কলঙ্ক।

ইতিহাস-পাঠক মাত্রেই মোগল-কুলতিলক মহামতি আকবর বাদসাহের খ্যাতি, প্রতিপত্তি ও অমিত-তেজস্বিতার সম্যক্ নিদর্শন পরিজ্ঞাত আছেন। যাঁহার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে রাজপুত-কেশরী প্রতাপসিংহ-প্রমুখ বীরবৃন্দও হীনপ্রভ, যাঁহার উদার রাজনীতিতে সুবিশাল ভারত-সাম্রাজ্যের বিভিন্ন সম্প্রদায়—বিভিন্ন জাতিও একতা-সূত্রে—স্নেহবন্ধনে—ভ্রাতৃভাবে আবদ্ধ, যাঁহার "শরচ্চন্দ্রমরীচিবৎ" সুধাধবল যশঃ-প্রভায় দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত, যাঁহার গুণগ্রাহিতা ও সমদর্শিতায় হিন্দু, যবন ও খৃষ্টান সকলেই মুগ্ধ, সেই "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" আকবর বাদসাহের উদারতা, তেজস্বিতা ও মহত্ত্বের গুণকাহিনী বর্ণনে যে ইতিহাস-লেখক মাত্রেই একবাক্য হইবেন, তাহার আর বিচিত্র কি?

কিন্তু, অহো! বিধি-বিড়ম্বনা!! যে প্রাকৃতিক গূঢ় রহস্যে চন্দ্রে কলঙ্ক, গোলাপে কণ্টক, সেই গূঢ়-রহস্য-বলে ঈদৃশ মহান্ চরিত্রও কলঙ্কশূন্য ছিল না। সুমধুর অমায়িকতার মধ্যেও কালকূট সদৃশ ঈর্ষ্যাবৃত্তি প্রচ্ছন্নবেশে ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় অবস্থিত ছিল।

সত্য বটে, সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ মানব এই নশ্বর মর-জগতে অতি বিরল। মানব-চরিত্র মাত্রেই মৎস্যের সহিত কণ্টকের ন্যায়, গুণ-দোষে সংশ্লিষ্ট। তবে গুণিগণ দোষভাগের পয়োভাগ ত্যাগ করিয়া হংসের ন্যায় গুণরূপ ক্ষীরাংশই গ্রহণ করিয়া থাকেন, বিশেষতঃ পরলোকগত মহাত্মার দোষ-সমালোচনা সুনীতি-বিরুদ্ধ। ইতিহাস-লেখকগণ বোধ হয় এই সুনীতির বশবর্ত্তী হইয়া এই সম্রাট্-চরিত্র বর্ণনে কেবল গুণ-ভাগেরই উল্লেখ করিয়া স্বকীয় গুণগ্রাহিতা ও মহানুভাবতার পরিচয় দিয়াছেন। অপরের গুপ্তচ্ছিদ্র অন্বেষণ বা কীর্ত্তন যে দোষাবহ, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

কিন্তু প্রতিযোগিতা ভিন্ন বস্তুর উৎকর্ষাপকর্ষ স্পষ্ট অনুভূত হয় না। দুঃখের পার্শ্বে সুখ, মিলনের পার্শ্বে বিচ্ছেদ, শত্রুতার পার্শ্বে মিত্রতা, অমানিশার পার্শ্বে অমলধবল পৌর্ণমাসী এবং দারিদ্র্যের পার্শ্বে ঐশ্বর্য্যকে স্থাপন না করিলে একের উৎকর্ষ ও অন্যের অপকর্ষ কখনই সহজে উপলব্ধি হয় না। প্রকৃত চরিত্র-সমালোচনায় গুণ-দোষের উল্লেখ ও উভয়ের উৎকর্ষাপকর্ষ সম্যক্ উদ্ভাসিত না করিলে, প্রকৃত ছবি অঙ্কিত না করিলে সমালোচনা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়, চরিত্র-চিত্রে দোষ পড়ে এবং সে চরিত্র পাঠে প্রকৃতির গূঢ় রহস্যও সাধারণের হৃদয়ঙ্গম হয় না; তাই বলি, প্রকৃত চরিত্র অঙ্কনে উভয়দিক্ স্পষ্ট করিয়া অঙ্কিত করাই চিত্রকরের কর্ত্তব্য।

মানব-চরিত্রের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্মানুসারে মহামতি আকবর সাহের চরিত্রও দোষশূন্য ছিল না; তাঁহার সেই দেবোপম উদার চিত্ত মধ্যেও পরহিংসা পরস্ত্রী-কাতরতার তীক্ষ্ণ বিষধর লুক্কায়িত ছিল; ধীর, স্থির, গম্ভীর সেই সংযত হৃদয়ও পাশববৃত্তির বশীভূত হইয়াছিল; তাঁহার সেই পবিত্র হস্তও কত শত নির্দ্দোষ নরশোণিতে রঞ্জিত হইয়াছিল।

এই রাজনীতি-বেত্তা সাম ও দণ্ড এই উভয় নীতিতে এই সুবিস্তৃত ভারত-সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র শান্তি বিরাজিত করিয়া মোগলগৌরব-রবিকে মধ্যাহ্ন-গগনে স্থাপিত করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতামহ-প্রবর্ত্তিত রীত্যনুসারে হিন্দু রাজপুত রাজগণের সহিত বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হইয়া তাঁহাদের সাহায্যেই এই বিশাল সাম্রাজ্যের একছত্রী রাজা হইয়া শান্তির সুবিমল সুধা উপভোগ করিতে পারিয়াছিলেন। রাজপুতগণের সাহায্যই তাঁহার ঈদৃশ উন্নতির একমাত্র কারণ। যদি রাজপুতগণ তদীয় বশে না থাকিতেন, তাহা হইলে বীর-প্রসবিনী রাজপুতানার বিপুল বিক্রমে দিল্লীর সুবর্ণসিংহাসন "টলটলায়মান" হইত।

বৈবাহিক সূত্রে যে সকল রাজপুত-বীরকেশরীর সহিত এই মোগল-সম্রাটের নৈকট্য ঘটে, তাঁহাদের মধ্যে অম্বর-রাজ মানসিংহই প্রধান। এই মানসিংহই মহামতি আকবরের দক্ষিণ-হস্ত। এই মানসিংহের সাহায্যেই তিনি পৃথিবীর মানদণ্ড-সদৃশ হিমাচল হইতে সাগরবারি-বিধৌত দক্ষিণোপকূল পর্য্যন্ত বিশাল ভারতরাজ্যে জয়-পতাকা উড্ডীন করিতে পারিয়াছিলেন। এই মানসিংহই সম্পদে, বিপদে, রণে, গৃহে, জলে, স্থলে সর্ব্বদাই ছায়ার ন্যায় তাঁহার অনুগমন করিতেন। যশোহরের দুর্দ্দান্ত রাজা প্রতাপাদিত্যের পাশব অত্যাচারে যখন বঙ্গদেশ উপপ্লুত, তখন কে স্বদেশ ছাড়িয়া এই দূরবর্ত্তী বঙ্গদেশের ভীষণ সঙ্কটে শান্তি-স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন? যখন সুদূর হিমানীমণ্ডিত সুলেমান পর্ব্বতের অপর-পার্শ্ববর্ত্তী আফ্‌গান-প্রদেশ নিদারুণ বিপ্লবে উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছিল, তখন কে প্রাণের মায়া, পরিজনের মায়া বিসর্জ্জন দিয়া সেই হিন্দুর নিষিদ্ধ দেশে গমন করিয়া বিদ্রোহ শান্তি করিয়াছিলেন? ভয়ঙ্কর, চিরস্মরণীয় হল্‌দীঘাটের যুদ্ধের অভ্রভেদী ভীষণনিনাদে যখন দিল্লীশ্বরের রাজমুকুট খসিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছিল, তখন কে যুবরাজ সেলিমের সহিত এই দুরন্ত আহবে ঝাঁপ দিতে পারিয়াছিলেন?—এই মানসিংহ!

আকবর সাহ যে এই পরম-হিতৈষী অম্বর-রাজের প্রতি আদৌ সদ্ব্যবহার প্রদর্শন করেন নাই, তাহা নহে; কিন্তু তিনি শেষ-রক্ষা করিতে পারেন নাই। শেষ পর্য্যন্ত সম্মান ও গৌরব রক্ষা করিতে পারিলে প্রকৃত মহত্ত্বের কার্য্য হইত এবং তদীয় মহান্ চরিত্রে কলঙ্কের ঘোর কালিমা পতিত হইত না।

এই ঘোর কালিমার কথা সাধারণ ইতিহাসে প্রকাশ নাই, তাঁহার এই কলঙ্ক-রেখা ইতিহাস-লেখকের লেখনী হইতে প্রসূত হয় নাই। অম্বর-রাজের উন্নতি দর্শনে মহামতি আকবর পরহিংসা-বৃত্তির বশীভূত হইয়া পূর্ব্বকৃত উপকারের প্রত্যুপকার স্বরূপ মানসিংহকে বিষ-পান করাইয়া শমনসদনে প্রেরণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন, কিন্তু "ধর্ম্মো রক্ষতি ধার্ম্মিকম্"; দুরাত্মা সম্রাট যে বিষ-মিশ্রিত খাদ্যবস্তু মানসিংহকে দিবার জন্য প্রস্তুত রাখিয়াছিলেন, ভ্রম বশতঃ তাহা স্বয়ং উদরস্থ করিয়া ইহলোক হইতে অপসৃত হইলেন; ধর্ম্মের জয় হইল!

হায়! মানুষ স্বার্থে অন্ধ হইয়া কি না করিতে পারে? মহানুভাব আকবর-হৃদয়ে যে দৌর্ব্বল্য বিদ্যমান ছিল, তাহা কে জানিত? কে জানিত, প্রস্ফুটিত কুসুমের অভ্যন্তরে ঈদৃশ কালসর্প লুক্কায়িত?

অম্বর-রাজ ব্যতীত অন্যান্য রাজপুত নৃপতিগণও তাঁহার যথেষ্ট সাহায্য করিতেন, কিন্তু সম্রাট "নওরোজ" বা খুশ্‌রোজ নামক মহিলা-মেলার ফাঁদ পাতিয়া হিতৈষী রাজপুতগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা (!) দেখাইয়া গিয়াছেন

তাহা সাধারণ ইতিহাসে উল্লেখ নাই। এই মহিলা-মেলায় তিনি কত শত হিন্দু-রমণীর সাররত্ন সতীত্বধন হরণ করিয়া রাজপুতকুলে কলঙ্ক-কালিমা ঢালিয়া দিয়াছেন! এই রমণী-মেলার প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধারণে অবিদিত। এই রমণীমেলার নিদারুণ অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া, জাতিকুল-বিনাশের আশঙ্কায় মর্ম্মাহত হইয়া একদা মহাত্মা পৃথ্বীসিংহ রাজপুত-সামন্তগণকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার ইংরাজী অনুবাদ টড্‌সাহেব-কৃত রাজস্থান হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল,—

—"The hopes of the Hindoo reston the Hindoo; yet the Rana forsakes them. But for Pratap, all would be placed on the same buel by Akbar; for our chiefs have last their valour and our females their honour. Akbar is the broker in the market of our race: all has he purchased but the son of Oodoh; he is beyond his price. What true Rajput would part with horor for nine days (Noroza), yet how many have bartared it away? Will Chitore come to this market when all have disposed of the chief article of the Khettri?"

(vide P. 364. Chapter XI.)

পৃথ্বীরাজ আর এক স্থলেও এই রমণীমেলার অত্যাচারের প্রতি তীব্রকটাক্ষ করিয়া বলিয়াছিলেন,—

"She returned to her abode tramping to the tinkling sound of the ornaments of gold and gems on her person, but where, my brother, is the Mous tache on thy lip?"

(P. 364, History of Rajstan by Mr. Tod.)

পাপানুষ্ঠান কখনও গোপন থাকে না। কি জানি, কোন্ অলক্ষ্য-হস্ত সেই সংবাদ জনসাধারণের কর্ণে তুলিয়া দেয়। সম্রাটের এই পাশব অনুষ্ঠান শীঘ্রই ঘোষিত হইয়া তাঁহার কীর্ত্তির ধ্বজা উড়াইয়া দিল। তিনি অলোক-সামান্যা রূপবতী পৃথ্বীরাজ-পত্নীর নিকট একবার এই রমণী-মেলায় যে শিক্ষা পাইয়াছিলেন, তাহা তিনি জন্মেও বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। ইহার বিষদ বিবরণ রাজস্থানের ১১শ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

চিতোর আক্রমণে তদীয় নরহত্যার ভীষণ কাহিনী ৭৪॥০ আকার ধারণ করিয়া লিপি সকলে এখনও মহাপাতকের ভয় দেখাইতেছে! অস্মদ্দেশীয় পত্র-পৃষ্ঠে যে ৭৪॥০ অঙ্ক, তাহা সেই সম্রাট কর্ত্তৃক অগণ্য দ্বিজের উপবীত দাহের নিদর্শন!

ধর্ম্ম বিষয়ে তাঁহার কুটিলতা ছিল, তিনি "ঐশ্বরিক বিশ্বাস" নামক এক প্রকার ধর্ম্মমত স্থাপন করিয়াছিলেন। কথিত আছে, তদীয় সম্প্রদায়-ভুক্ত ব্যক্তিগণ সাক্ষাৎ জগদীশ্বর জ্ঞানে তাঁহাকে প্রণাম করিত। এইরূপ ধর্ম্ম-কুটিলতায় মুসলমানেরাও তাঁহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। স্বধর্ম্ম-নিরত হওয়া মানবের একটী মহৎ গুণ। কথা আছে,—"স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ," কিন্তু এই মহাত্মা বাদসাহের ধর্ম্মমত ঘোর তমঃসমাচ্ছন্ন।

যেমন তুষার-ধবলিত শুভ্রবসনে সামান্য মসিচিহ্নও সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয়; নয়নানন্দ-দায়িনী সুন্দরীর যৎসামান্য অঙ্গহীনতা যেমন ক্ষোভের কারণ হয়; সুরতানমিলিত ঐকতান বাদ্যে যেমন ঈষৎ সুর-বিকার অসহ্য বিরাগের কারণ হইয়া উঠে; সেইরূপ মহান্ চরিত্রে অত্যল্প কলঙ্করেখাই যেন গুণরাশিকে নিষ্প্রভ করিয়া তোলে,—যেন নিদারুণ ক্ষোভের কারণ হইয়া উঠে, যেন বোধ হয়, এক ভাণ্ড দুগ্ধে এক ফোঁটা গোমূত্র পড়িয়া সমস্ত নষ্ট করিয়া ফেলিল!

কালচক্রের আবর্ত্তনে কত দিন, কত মাস, কত বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে, সেই আকবর, সেই মানসিংহ, সেই রমণীমেলা কালস্রোতে ভাসিয়া অপার অনন্ত কালসাগরে লীন হইয়া গিয়াছে, কিন্তু হায়, আজিও মহাত্মা আকবর-চরিত্রের এই সকল কলঙ্ক সুদূর অতীতের স্মৃতি জাগাইয়া সেই মোগল-কুলতিলকের অপযশ ঘোষণা করিতেছে! তবে ভীমও রণে ভঙ্গ দিয়াছিলেন, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরেরও নরকদর্শন হইয়াছিল, আর মুনিগণেরও মতিভ্রম ঘটে, এবিষয়ে সন্দেহ নাই।

শ্রীবিনোদলাল চট্টোপাধ্যায়।

দুর্গোৎসব।

দুর্গোৎসব—দুঃখময় বঙ্গীয় বর্ষের 'মধুরেণ সমাপয়েৎ'। আমিই বলিয়াছি দুর্গোৎসবে বর্ষের আরম্ভ; আবার আমিই বলিতেছি 'সমাপয়েৎ,' কেন এরূপ মত-পরিবর্ত্তন।—শুনিবে?—মন মানে না বলিয়া। যতদিন আশা থাকে, লোকে কত কল্পনা করে, কত 'হয়'কে 'নয়' করে, 'নয়'কে 'হয়' করে,—আশা—মায়াবিনী। যখন কিন্তু আশা আর থাকে না, তখন মানুষের চক্ষু ফুটে; মানুষ সত্য বিষয় সব দেখিতে পায়, প্রতারিত হয় না, 'হয়'কে 'নয়' করে না, 'নয়'কে 'হয়' করে না। সাংখ্যদর্শনে আছে, "নিরাশঃ সুখী," কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি,—আশা মায়াবিনী, আশা মোহকরী, আশা রাক্ষসী,—তবু আশাকে ভালবাসি, তবু আশা সুখদায়িনী; নৈরাশ্যে শুধুই দুঃখ, শুধুই বিষাদ। তবে বোধ হয়, আমাদের অনুভূয়মান নৈরাশ্য আর দর্শনের নৈরাশ্য এক নহে। যাক সে কথা।

হায় সে আশা, সেই সুখের আশা, সেই প্রতারিণী আশা আমাদিগকে ত্যাগ করিয়াছে। তাই আজ বুঝিতেছি, দুর্গোৎসব আমাদের 'মধুরেণ সমাপয়েৎ'। দুর্গোৎসব আমাদের অপূর্ণ কুৎসিত আহারান্তে গোঁফে লাগাইবার এক ফোঁটা দুগ্ধ। যখন আশা ছিল, তখন ভাবিতাম, দুর্গোৎসব বর্ষের আরম্ভ, দুর্গোৎসব বঙ্গীয়-বৎসর-রূপ আস্তিক গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ, বাঙ্গালী-বর্ষ-পত্রের 'শ্রীদুর্গাশরণম্'; তাই ভাবিতাম, সর্ব্ব-মঙ্গলার শুভাগমনে বর্ষের মঙ্গল আরম্ভ হইল, দুর্দ্দৈব দূর হইল, দুঃখের অবসান হইল। আশা এখনও অন্তরের অতি নিভৃত কোণে 'অনধিকার প্রবেশ' করিয়া সেই ভাবই বুঝাইতে চেষ্টা করে, কিন্তু মন আর মানে না; মন, সার বুঝিয়াছে—দুর্গোৎসব বাঙ্গালী-বৎসর-স্বরূপ স্নেহ-হীন নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপের শেষ উজ্জ্বলতা, অর্থাৎ 'মধুরেণ সমাপয়েৎ।'

সে এক দিন গিয়াছে, যখন আশ্বিনে বৎসরারম্ভ হইত, আরম্ভে দুর্গোৎসব ছিল—মঙ্গলাচরণ। তখন মঙ্গলেরও অভাব ছিল না, দুঃখ-দুর্দ্দিনেরও আধিপত্য ছিল না। এখন বৎসর অন্যবিধ। এখন পূজায় বৎসরের শেষ। এখন বীণার মধুর ঝঙ্কারে সুষুপ্তি আর বায়সের শ্রবণ-বেধী কোলাহলে জাগরণ।

এখন বুঝিয়াছি, তাই আর অমঙ্গলের কথা তুলিব না, সর্ব্বমঙ্গলাকে বিরক্ত করিব না। শেষের মধুর-রসে নিষ্করস প্রক্ষেপ করিয়া 'মধুরেণ সমাপয়েৎ'এ ব্যাঘাত করিব না। মা! বর্ষায় জল নাই, শরতে পুষ্প নাই, হেমন্তে শস্য নাই, বসন্তে শোভা নাই, নিদাঘে ফল নাই, সে কথা তুলিব না মা! দেহে রোগ, মনে শোক অন্যায় অশান্তি—বাঙ্গালীর এই দুর্দ্দশার কথা তুলিব না মা! মা! বর্ষভোগ্য কদর্য্য আহারের শেষ লক্ষ্য দুগ্ধবিন্দু—তোমার উৎসব মা! তাহাতে গোমূত্র প্রক্ষেপ করিয়া হানি করিতে চাহি না মা!

মা! এখনও নৈরাশ্যের মধ্যেও কণিকামাত্র আশা এই আছে যে, বর্ষদীপ স্নেহহীন, অন্ধকার-নিবারণে অক্ষম হইলেও একবারে নির্ব্বাণ হয় নাই। শেষের তিন দিন উৎসবে বুঝিতে পারি মা!—দীপ মিটিমিটি—অতি ধীরে—গাঢ় তিমিরের সঙ্গে মিশিয়া মিশিয়া জ্বলিতেছিল, তাই শেষে একবার উজ্জ্বল হইয়া উঠে, মা! সব গিয়াছে, বর্ষদীপের এই শেষ উজ্জ্বলতা যেন অপসৃত না হয়। আরম্ভে মঙ্গল যখন করিবে, মা সর্ব্বমঙ্গলে! তখন আরম্ভ হইতেই মঙ্গলের অমৃতবৃষ্টি হইবে মা! তাহার জন্য প্রার্থনা করি না। সে প্রার্থনা করিতে অধিকার বা আশাও আমাদের নাই। তবে এই চাহি মা, বর্ষশেষে কতিপয় উজ্জ্বল আনন্দ-রেখা, কয়েক দিনে তোমার শ্রীপাদপদ্ম-দর্শন-পূজন-বন্দন যেন বিলুপ্ত না হয়।

মা! বোধনে মতদ্বৈধ, তিথি-গণনায় মতভেদ—একি খেলা মা বিদ্যারূপিণি! বঙ্গের বিষাদ-বর্ষের শেষ যবনিকার আনন্দ-সঙ্গীত বুঝি আর ভাল লাগে না! মা আনন্দময়ি! তা ত হবে না।

মা! ভাগ্য চাহি না, ধন চাহি না, পুত্র চাহি না, শত্রুবধও চাহি না মা! চাহি কেবল তোমার ঐ কোকনদ-বিনিন্দী চরণ-কমলের অর্চ্চনা! চাহি মা! তোমার ঐ আনন্দময়ী, শক্তিময়ী, তেজোময়ী, জ্ঞানময়ী, ইচ্ছাময়ী মহামূর্ত্তির বার্ষিক স্ফূর্ত্তি।

মা! শারদীয়া পূজা না করিলে পাপসঞ্চয় হয়, একথা ভুলাইয়াছ মা ভ্রান্তিময়ি! কিন্তু আর অধিক নিগ্রহ করিও না করুণাময়ি! কত কঠোরতা করিবে মা!

মা! এস, এস; সিংহবাহিনি! আমরা আশাপথ চাহিয়া বসিয়া আছি মা! এস, এস, সিদ্ধিশক্তিদায়িনি! ঋদ্ধিবুদ্ধি-প্রসবিনি! মহিষমর্দ্দিনি! এস, এস; তোমার উৎসব-দুগ্ধ-বিন্দু-আশায় বসিয়া আছি মা! তিক্ত আস্বাদনে বিকৃতমুখে বসিয়া আছি মা! শেষের মধুর-রস, মধুর রসের বিন্দুমাত্র আশায় বসিয়া আছি মা, এস এস।

মধুর-রস আস্বাদনে শক্তি নাই, তবু বসিয়া আছি মা!

মা! কৈ তোর দুগ্ধবিন্দু? কৈ তোর উৎসব? কৈ তোর নবম্যাদিকল্প? কৈ তোর প্রতিপদাদি-কল্প? কবে তোর ষষ্ঠ্যাদি-কল্প? কিছু দেখি না যে মা! কৈ তোর সপ্তম্যাদি-কল্প,—ঐ বুঝি—সপ্তম্যাদি-কল্পে বুঝি মা! বোধন নাই, না থাক্, তবু করিব মা! তোর অর্চ্চনায় আচার ত্যাগ করিব না মা! অষ্টম্যাদিকল্প, কেবল মহাষ্টমী-কল্প এবং কেবল মহানবমীকল্পও ত তোর ঐ রহিয়াছে, কিন্তু তাহাতে মন উঠিতেছে না; চাহি তোর ঐ সপ্তম্যাদি তিন দিন উৎসবের মধুর-রস মা! পূজার পূর্ব্বদিনে আমন্ত্রণ-অধিবাস যত জানি না জানি, করি, না করি, আমায় মধুর-রসবিন্দু দিতেই হইবে।

মা! মঙ্গল চাহি না, সুখ চাহি না; বর্ষান্তের উজ্জ্বল পূর্ণচ্ছেদ—'মধুরেণ সমাপয়েৎ' লক্ষ্য করিয়া বসিয়া আছি মা! অন্নপূর্ণে! এস, এস, মধুর-রস পরিবেশন কর।

মা! আমি বালক, কিছু বুঝি না, আমারও মধুর রস চাহি, আমি স্ত্রীলোক, সব বুঝিয়াও বুঝি না, না বুঝিয়াও সব বুঝি, আমি সকলই অথচ আমি কিছুই না, আমাকেও মধুর-রস দিতে হইবে।

মা! আমি সাত্ত্বিক নহি, মৎস্য-মাংসে নিমগ্ন, ভোগবিলাসে একাগ্রচিত্ত, কিন্তু তোমার বলিদানে আমি পশুক্লেশ-নিবারিণী-সভার আশ্রয় গ্রহণ করি, নিষ্ঠুর বলিদানের বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিয়া দেশ ফাটাই, তবু সর্ব্বময়ি! আমার আহার-শেষের মধু-রস কণিকামাত্রও দিতে হইবে। মা! আমি তামসিক, আমি পূজা

দেখি না, তোমার মণ্ডপে দৃষ্টিপাত করি না, আমি সুরা-বারাঙ্গনায় প্রমত্ত হইয়া দিনযামিনী যাপন করি, তবু আমাকে আহার-শেষের মধুর-রসঅণুমাত্রও দিতে হইবে। মা! আমি কিম্ভূত; পূজা করি না, আমি পূজা দেখি না, প্রসাদ পাই না; আমি শয়নাগারের নিভৃত পর্য্যঙ্কে শয়ন করিয়া বা মুক্ত-বাতায়নের স্নিগ্ধ সমীরণ সেবন করিয়া দিন যাপন করি, তবু আমাকে মধুর-রস পরমাণুমাত্রও দিতে হইবে।

মা! আমি ভাবহীন, আমি বঙ্গদেশ ত্যাগ করিয়া, পূজার বাদ্যধ্বনির অধিকারের অন্তরালে থাকিয়া কালকর্ত্তন করি, তবু আমাকে অতি অল্পও মধুর-রস দিতে হইবে। আর আমি সর্ব্বাপেক্ষা অধম, আমার মধুর-রস গ্রহণে শক্তি নাই, তাই আমার পক্ষেরই কথা, —তোমার উৎসব—অপূর্ণ কুৎসিত আহারান্তে গোঁফে লাগাইবার এক ফোঁটা দুগ্ধ—তবু তাহা আমি চাহি, আমার রসনায় রস না হইলেও দর্শনীয় মধুর-রস অল্প পরিমাণেও আমাকে মা! দিতে হইবে; ঐ শুন মা অন্নপূর্ণে! এত কোলাহল, এত ব্যক্ত অব্যক্ত কলরব, এত লোকের মধুর-রস-পিপাসা, পরিবেশন কর মা আনন্দময়ি! আমার 'মধুরেণ সমাপয়েৎ' সার্থক হউক।

শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন।

সমালোচনা।

যুগান্তর। (সামাজিক উপন্যাস) শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রণীত। কলিকাতা, ব্রাহ্মমিশন প্রেস। মূল্য ১৷০ এক টাকা চারি আনা।

বড় দুঃখিত হইয়া বলিতেছি, লেখকের প্রতিভা অধোগামিনী হইয়াছে। বইখানি পড়িয়া আমরা তৃপ্তিলাভ করিতে পারি নাই।—অন্ততঃ, "পুষ্পমালা"র কবি ও "মেজবউ"-রচয়িতার নিকট আমরা অনেক উচ্চ আশা করিয়াছিলাম। গল্পের সামঞ্জস্য নাই;—লেখক এক হিন্দু ও এক ব্রাহ্ম-পরিবারকে এক সূতায় গাঁথিতে গিয়া মূলে ভুল করিয়া ফেলিয়াছেন। দুইখানা বইয়ের দুই অংশ একসঙ্গে খাপ্ খাওয়াইতে গেলে এইরূপই হইয়া থাকে।

গ্রন্থে চরিত্র-অঙ্কনের চেষ্টা অপেক্ষা গল্প-গাছার অংশই অধিক। তাও সে গল্প-গাছার প্রণালী ঠিক হয় নাই। অনেক অপ্রাসঙ্গিক ও বাজে কথায় তাহার মধুরতা নষ্ট হইয়াছে।—বই খানা অযথা অনেক বড় হইয়াছে।

চরিত্রের পূর্ণ পরিস্ফুটন করিতে হইলে গল্প অপেক্ষা নাটকীয় ভাবের আশ্রয় অধিক পরিমাণে লইতে হয়। কিন্তু 'যুগান্তরের' লেখক সে দিক দিয়াও যান নাই। প্রায় সর্ব্বত্রই, তিনি নিজেই বক্তা; সুতরাং গ্রন্থস্থ পাত্র পাত্রীর মুখের দুই একটী কথা তিনি ফেনাইয়া ও ফাঁপাইয়া লম্বা লম্বা বক্তৃতা করিয়াছেন;—কার্য্যক্ষেত্রে আনিয়া তাহাদিগের জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত আদৌ দেখাইয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। লেখক যদি নিজেই অনর্গল বলিয়া গেলেন,—সবটা যদি বর্ণনাতেই পর্য্যবসিত হইল, তবে আখ্যায়িকার অন্তর্ভুক্ত চরিত্রগুলির কার্য্য হইল কি? তাহারা কি প্রাণহীন পুতুলের মত পাঠকের সম্মুখে দাঁড়াইবে না?

অথচ লেখক এক অংশে যে, অসাধারণ ক্ষমতাশালী ও অন্তর্দর্শী লোক, তাহার পরিচয়ও এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। ছোট ছোট বিষয় ও মানবজীবনের খুটীনাটী তিনি এমন সুন্দররূপে দেখিতে জানেন যে, সাধারণ লেখক তাহা অনেক চেষ্টায়ও আয়ত্ত করিতে পারে না। তর্কভূষণের বাড়ীর ছেলে মেয়েদের সেই "আমাদের ইন্দু, বিন্দুর মত আর কাহাদের হ'তে হয় না" ভাবটী অতি স্বাভাবিক ও সূক্ষ্ম-দৃষ্টির পরিচায়ক। আর "হাঁসের দলের" সেই "তাওক"-রূপী অদ্ভুত জীবটীর মুন্‌সিয়ানাটুকু অতি পরিপাটী। কিন্তু যে জিনিসটী গ্রন্থের মূল মেরুদণ্ড, লেখক সেই অংশটীই, নিজে অভিনেতৃরূপে না দেখাইয়া, বক্তৃতাচ্ছলে বলিয়া গিয়াছেন। নচেৎ, তাঁহার তর্কভূষণের চরিত্রটী এত উজ্জ্বল ও আদর্শস্থানীয় হইত যে, পশ্চাৎবর্ত্তী লেখকগণ সকলেই তাঁহার নিকট অল্পাধিক পরিমাণে ঋণী হইতেন। এইরূপ, তাঁহার বিজয়া, কৃষ্ণকামিনী, নবীন গোবিন্দ, পঞ্চু প্রভৃতি সকল চরিত্রই অস্ফুট ও ম্লান। অধিকন্তু, মাতঙ্গিনী-চরিত্র-বর্ণনায় লেখকের সুরুচি ও সুনীতিতে আঘাত পড়িয়াছে। তবে, ইতিহাস অংশে, স্থান বিশেষে, এই গ্রন্থ ব্রাহ্মসমাজের উপকারে আসিতে পারিবে।

হীরক-চূর্ণ নাটক। ষ্টার থিয়েটারের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু প্রণীত। কলিকাতা, ২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরীতে প্রাপ্তব্য। মূল্য ।৵০ আনা।

বসুজ মহাশয় একজন উৎকৃষ্ট নক্সাকার। ইহাঁর সামাজিক নক্সা আঁকিবার শক্তি অসাধারণ। "বিবাহ-বিবাট" ও "বাবু"তে তাহার পূর্ণ পরিচয়। 'হীরক-চূর্ণ নাটকে' তিনি সেই দুর্ভাগ্য বরদা-রাজ ওইকুমারের শেষ চিত্র আঁকিয়াছেন। যে ছবি ভাবিলেই আকুল হইতে হয়, বসুজ মহাশয়ের মত উৎকৃষ্ট নক্সাকারের হাতে সেই ছবি পড়িয়া 'উজ্জ্বলে মধুর' মিশিয়াছে। এ ছবি দেখিয়া আমরা কাঁদিয়াছি;—শতমুখে লেখকের মুন্‌সিয়ানার প্রশংসা করিয়াছি। সকলকেই এক একবার এ ছবি দেখিতে অনুরোধ করি। এ সজীব ছবি কি একবার প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে স্থান পাইতে পারে না?

সামুদ্রিক-শিক্ষা শ্রীযুক্ত রমণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। কলিকাতা, ১৯নং মথুর সেনের গার্ডেন লেনে গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্তব্য। মূল্য ২৲ টাকা।

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বহু পরিশ্রম, বহু অনুশীলন ও বহু অর্থব্যয়ে এই জ্যোতিষ-গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। তিনি দীর্ঘকাল যাবৎ গুরুর নিকট এই শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ইংরেজীমতে ইহার প্রচার করিয়াছেন। ইহাতে জ্ঞাতব্য বিষয় অনেক আছে। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহার সাফল্য কামনা করি।

মৌ-মুখরা The Silent Preacher. কবিরাজ শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ প্রণীত। কলিকাতা, ৬০ নং সিমলা ষ্ট্রীটে গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্তব্য। মূল্য ৵০ আনা।

বিদ্যাবিনোদ মহাশয় আজিকার দিনের একজন উদয়মান কবিরাজ। তাঁহার বিদ্যাবত্তা, রোগনির্ণয়-ক্ষমতা ও চিকিৎসা-প্রণালীর পরিচয়, লোকে ক্রমেই পাইতেছে। এরূপ মহানুভব ব্যক্তির সাহিত্যানুরাগ বড়ই প্রশংসনীয়। তাঁহার এই "মৌনমুখরা" তাঁহার মধুর প্রকৃতি ও ঈশ্বরভক্তির উজ্জ্বল প্রতিবিম্ব। ইহার এক একটী তত্ত্ব অতি গভীর চিন্তাশীলতার পরিচায়ক। আজিকার দিনের বাক্যবীরগণের এই গ্রন্থখানি পড়া উচিত। প্রকৃতির প্রিয়-সন্তান শ্রীরামচন্দ্রের সাধু উদ্দেশ্য সফল হউক!

শকুন্তলা শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। কলিকাতা, আদি ব্রাহ্মসমাজে প্রাপ্তব্য। মূল্য ছয় আনা।

ছোট ছোট ছেলেদের জন্য শকুন্তলার এই গল্পভাগ, লেখক অতি দক্ষতার সহিত সঙ্কলন করিয়াছেন। ভাষাটী অতি মিষ্ট ও সরল। একটু নমুনা দেতেছি;—

"এক নিবিড় অরণ্য ছিল। তাতে ছিল

বড় বড় বট, সারি সারি তাল তমাল, পাহাড় পর্ব্বত; আর ছিল—ছোট নদী মালিনী।"

দোষের মধ্যে, বইখানির ছবি গুলি ভাল হয় নাই।

নিরপেক্ষ-ধর্ম্ম-তত্ত্ব। "নিরপেক্ষ-ধর্ম্ম-সঞ্চারিণী-সভার" সম্পাদক ও সত্বাধিকারী আচার্য্য সান্দ্রানন্দ প্রণীত। কলিকাতা, ২৭ নং গ্রে ষ্ট্রীটে গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্তব্য। মূল্য ।৵০ ছয় আনা, ডাকমাশুল ১০ আনা।

খৃষ্টানধর্ম্মের সহিত হিন্দুধর্ম্মের তুলনা করিয়া, লেখক বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা ও সার্ব্বভৌমিকতা দেখাইয়াছেন। হিন্দুস্তান মাত্রকেই আমরা এই গ্রন্থ পড়িতে অনুরোধ করি। ইহাতে শিখিবার ও জানিবার অনেক কথা আছে।

দাসী। দাসাশ্রমের মাসিক-পত্রিকা। সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এম,এ। কার্য্যালয়—কলিকাতা, ২০৮।২ নং কর্ণ-ওয়ালিস্ ষ্ট্রীট। বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা।

'দাসী' আজি চারি বৎসরকাল নিয়মমত চলিতেছে। ইহার লেখা, বিষয়-নির্ব্বাচন, উদ্দেশ্য—সকলই ভাল। সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবের কথা এই যে, ইহার লভ্যাংশ দাসাশ্রমে ব্যয়িত হয়। দাসাশ্রমের উদ্দেশ্য অতি মহৎ। এ দেশের অনাথ ও আতুরদিগের ইহা একমাত্র আশ্রয়স্থল। সুতরাং ইহার উদ্যোগীবর্গ, সকলেরই সাধুবাদের পাত্র। 'দাসী'র কিছু অধিক গ্রাহক হয়, ইহা আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি।

মণি নাপ্তিনি। সামাজিক নক্সা। শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস দে প্রণীত। কলিকাতা, ৬নং বিডন ষ্ট্রীট, মিনার্ভা থিয়েটারে প্রাপ্তব্য। মূল্য ৵০আনা। দে মহাশয় মাসে মাসে এক একখানি নক্সা সম্পূর্ণ প্রকাশ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। ৺কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুকুমের' আদর্শে নক্সার ভাষা গঠিত হইয়াছে। কিন্তু 'কর্‌তে' 'যেতে' 'শুতে' প্রভৃতি কথাগুলা শুনিতে যেমন সহজ, পড়িতে তেমন সহজ নয়; পড়িতে কিছু কষ্ট ও বিরক্ত বোধ হয়। দে মহাশয় সহজ ভাষায় নক্সা লিখুন, ভাল কথা। কিন্তু ঐ 'কর্‌তে' 'যেতে' 'শুতে'র স্থানে 'করিতে' 'যাইতে' 'শুইতে' লিখিলেই ভাল হয়। ভাষার এই পরিপুষ্টির দিনে এখন আর সেই পুরাতন সুর ভাল লাগে না। আর আলোচ্য বিষয়ের রুচিটার দিকে একটু খর-দৃষ্টি রাখা আবশ্যক মনে করি। রঙ্গ-রসের অবতারণায় দে মহাশয়ের যে ক্ষমতা আছে, মুক্তকণ্ঠে তাহা বলিতেছি।

মালা। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণগোপাল চক্রবর্ত্তি প্রণীত। মূল্য ।৵০ আনা।

'মালা' একখানি ক্ষুদ্র কবিতা গ্রন্থ। লেখক নূতন ব্রতধারী। অভ্যাস রাখিলে কালে একজন সুকবি হইতে পারিবেন।

বালক-পাঠ। শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত। কলিকাতা ২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটে, বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরিতে প্রাপ্তব্য। মূল্য ৵১০ মাত্র।

বালকপাঠ বালকদিগের জন্যই লিখিত। সর্ব্বাংশেই যে ইহা বালকদিগের উপযোগী হইয়াছে, তাহা অম্লানবদনে বদনে বলিতে পারি। ইহার ভাব, ভাষা, বিষয়-নির্ব্বাচন, —সকলই মনোজ্ঞ। ছবি গুলিও সুন্দর। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের উদ্দেশ্য সফল হয়, ইহ আমাদের আন্তরিক কামনা।

চাঁদরাণী। ইহার সমালোচনা গত বারেই হইয়া গিয়াছে। এখন গ্রন্থকার বলিতেছেন,—"দুই খণ্ড গ্রন্থের মূল্য ৲ নয়—১৷৷০ টাকাই বটে।—মুদ্রাঙ্কনেই ঐরূপ ভুল রহিয়া গিয়াছে।" ভাল কথা।

জন্মভূমি।

৫ম ভাগ। } কার্ত্তিক ১৩০২। { ১১শ সংখ্যা।

প্রেমের পরীক্ষা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

অমরনাথ বসুর বিবাহের কথা হইতেছিল। গ্রামবাসী প্রকাশচন্দ্র তাঁহার প্রধান সুহৃদ্। দুই জনের মধ্যে এমন বন্ধুত্ব ছিল যে, অনেকে মনে করিত, দুই জনের এক হৃদয়, এক প্রাণ, কেবল দেহ ভিন্ন; উভয়ের প্রতি উভয়ের প্রগাঢ় বিশ্বাস, একের জন্য অপরে প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে পারিত।

এই বন্ধুত্বের মধ্যে একটুকু স্বার্থ-মলিনতা ছিল না। শৈশব হইতে নির্ম্মল প্রেম উভয়ের হৃদয়কে একত্র এমন করিয়া প্রস্তুত করিয়াছিল যে, এ জগতে উভয়ে যেন উভয়ের জন্যই জন্ম-গ্রহণ করিয়াছে, এমনই তাহারা বুঝিত। হর্ষ ও বিষাদ সে দুইটী হৃদয়ে এমন তুল্যরূপে একই তরঙ্গ তুলিতে পারিত যে, কেহ কখন উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য দেখিতে পাইত না।

কিন্তু তবু কিছু পার্থক্য ছিল। অমরনাথ কিছু বেশী হৃদয়প্রধান এবং প্রকাশচন্দ্র জ্ঞান-প্রধান; এক জনের হৃদয়ে একান্ত ভাবের উচ্ছ্বাস, অতি অল্পমাত্র কারণে হৃদয় উদ্বেলিত ও তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিত; আর এক জন কিছু গম্ভীর, কিন্তু সে গাম্ভীর্য্য, মাধুর্য্যমিশ্রিত ছিল। দুই জনে বড় ভাব, বড় ভালবাসা। দুই জনেই রূপবান্, চরিত্রবান্, বিদ্বান্, দুই জনেই সমবয়স্ক। এমন দুইটী হৃদয়ের মিলন এ সংসারে বড়ই অল্প দেখা যায়।

সংসারে বুঝি নিরবচ্ছিন্ন সুখ থাকিতে পারিবে না। তাই এই দুইটী হৃদয়ের এমন অপূর্ব্ব মিলনও বুঝি ঘটনার ভীষণ আবর্ত্তে পড়িয়া——কিন্তু সে কথা বলিবার আগে যাহা বলিতেছিলাম, তাহাই বলি। দিবা-অবসানে সন্ধ্যা আসিবেই, তবে প্রভাতের এ শুভ্র সুস্নিগ্ধ আলোকের মাঝে রাত্রির অন্ধকার আনিয়া লাভ কি?

অমরনাথের বিবাহের কথা হইতেছিল। দুই বন্ধুতে কর্ণগড়ের এক ভগ্নস্তূপের উপর বসিয়া নানাপ্রকার পরামর্শ করিতেছিল। কলনাদিনী কল্লোলিনী কর্ণগড়ের ভগ্নস্তূপের তিন দিক্ বেষ্টন করিয়া, অবিরাম ছুটিয়াছে। পদপ্রান্তে সেই স্বচ্ছসলিলা স্ফীতবক্ষা গঙ্গা,—গঙ্গার সেই সুদূর বিস্তৃতজলরাশির উপর শুভ্র চন্দ্রকিরণ,—ঊর্দ্ধে অনন্ত নীলাকাশ, আকাশে শত শত তারা জ্বলিতেছে, জ্যোৎস্নাধারায় চারি দিক্ স্নাত হইতেছে! সেই জ্যোৎস্নালোকে কর্ণগড়ের সেই প্রকাণ্ড ভগ্নস্তূপ অতি ভীষণ না

দেখাইলেও সে স্থলের নীরবতা অতি ভীষণ বোধ হইতেছিল। আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন দিবসেও কোন লোক অতি প্রয়োজন হইলে ক্বচিৎ সেখানে যাইত। কিন্তু সে স্থান এই দুই যুবকের বড় কবিত্বপূর্ণ ছিল।

ভাগলপুর হইতে কিছু পশ্চিমে চম্পা-নগর অবস্থিত। কর্ণগড় ঐ চম্পানগরের মধ্যে এক সময় অতি প্রকাণ্ড গড় ছিল। শুনা যায়, অতি প্রাচীনকালে মহাবীর কর্ণের ঐ গড় ছিল, তাই আজিও তাহা কর্ণগড় নামে প্রসিদ্ধ আছে। এখন সে গড় ভূমিসাৎ হইয়াছে, কতক গঙ্গাগর্ভে ডুবিয়া গিয়াছে, কিন্তু সে ভগ্নস্তূপের মধ্যে মধ্যে এখনও এমন সকল চিহ্ন বিদ্যমান আছে, যাহা তাহার বহু প্রাচীনত্ব ও অসাধারণত্বের পরিচয়স্থল হইয়া সকলকে বিস্মিত করিতেছে।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। সেই কর্ণগড়ের এক ভগ্নস্তূপের উপর বসিয়া দুই বন্ধুতে বিবাহ-সম্বন্ধে এইরূপ কথাবার্ত্তা চলিতেছিল।

অমরনাথ। বিবাহ ত করিব, কিন্তু সত্য বলিতে কি, বিবাহে আমি সুখী হইব কি না, সময়ে সময়ে তাহাই সন্দেহ হয়। আমার মনে হয়, বিশুদ্ধ প্রেম—যাহা সুখে দুঃখে অবিচলিত, অবিকৃত, অপরাজিত, এ সংসারে তাহা মিলে না।

প্রকাশচন্দ্র। এখন সে কথা থাক্। কিছুদিন পরে, অবগুণ্ঠনে আবৃত একটী ক্ষুদ্র বালিকার চরণে দাসখৎ লিখিয়া দিয়া যখন তোমাকে প্রেমে বন্দী দেখিব, তখন এ কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করিব। তখন দেখিব, ক্ষুদ্র বালিকার ক্ষুদ্র বুকটুকুতে যে প্রেম, তাহা তোমার বিশাল কাব্যজীবন ডুবাইয়া রাখিতে পারে কি না? তখন কি আর বাল্য-বন্ধু কাহারও কথা ভাবিবার অবসর থাকিবে? না, আজিকার এ কথা মনে থাকিবে?

অমরনাথ। তুমি যথার্থ বলিয়াছ, বিবাহের পর হৃদয়ের এতটা অনুরাগ, এত স্নেহ-মমতা বোধ হয় সব আর তোমায় দিতে পারিব না। ক্ষুদ্র এক বালিকা আসিয়া এই হৃদয়টা অধিকার করিয়া রাখিবে। এ রহস্য আমি বুঝিতে পারিব না। জীবনের এই দ্বাবিংশ বৎসর বয়সে এতটা অধ্যয়ন করিয়াও বালিকা-হৃদয়ের রহস্য আজিও বুঝি নাই! বুঝি সে হৃদয় সীমাহীন অপার মহাসাগর! ক্ষুদ্র দেহটুকুর ভিতর এক অসীম অনন্ত হৃদয়-সমুদ্র, "সসীমে অসীম"—এমন আর কিছুই নাই। আজীবন সন্তরণেও এ সমুদ্র পার হওয়া যায় না!

প্রকাশচন্দ্র উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল। বলিল,—"এখনও ত সাগরে ঝাঁপ দাও নাই, কূলে দাঁড়াইয়া এত আতঙ্ক কেন? ভয় নাই, বালিকা দস্যু নহে, একদিনেই কিছু তোমার সমস্ত কাড়িয়া লইবে না।"

অমরনাথ। তুমি হাসিতে পার; কিন্তু বিবাহ করিয়া পাছে তোমার প্রতি আমার স্নেহের কিছু হ্রাস হয়, আমি নিয়তই তাহা ভাবি। বরং বিবাহ না করিয়া, আজীবন এই ভাবে কাটাইতে পারি, কিন্তু তোমাকে ভুলিতে পারিব না।

প্রকাশ। বিবাহ হইলেই আমাকে বা ভুলিবে কেন?

অমরনাথ। তাহা আমি জানি না। পুস্তক পড়িয়াছি, মনুষ্যের হৃদয় পড়িয়া উঠিতে পারি নাই, সংসারের অনেক রহস্য আজিও জ্ঞানের অতিদূরে লুকাইয়া আছে। স্ত্রীকে কিরূপ ভালবাসিতে হয়, তাহা জানি না। এ হৃদয়ে তাহার কতটা আধিপত্য, কতটা দৌরাত্ম্য সহিতে হইবে, তাহাও জানি না। কিন্তু সে প্রেমের উন্মাদনার মধ্যে ডুবিয়া যদি তোমায় ভুলিয়া যাই,—তুমি আপনা হইতে আমার সম্মুখে আসিয়া আমায় আবার আপনার বলিয়া

তোমার অকৃত্রিম স্নেহবক্ষে স্থান দিও। কি জানি, যদি কখনও তোমার প্রতি আমার কর্ত্তব্যের কোন ত্রুটি হয়, তবে নিজগুণে তাহা ক্ষমা করিও। আর বলিব কি——

অমরনাথের চক্ষে অশ্রু দেখা দিল! সেই জ্যোৎস্নালোকে অশ্রুপূর্ণ সেই আঁখিযুগল যে কাহিনী ব্যক্ত করিয়াছিল, প্রকাশ! ইহ-জীবনে তাহা তুমি ভুলিও না।

অশ্রুপূর্ণ লোচনে অমরনাথ বলিল,—"ভাই প্রকাশ! আর বলিব কি, কখন যেন তোমার স্নেহে বঞ্চিত না হই!"

তখন মাথার উপর চন্দ্র হাসিতেছিল। জ্যোৎস্না-বিধৌত ভগ্নস্তূপ কর্ণগড়ের পাদদেশে গঙ্গা অতি ধীরে বহিতেছিল। দুই জনে পরস্পরে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতেছিল, কেহ কাহাকে ভুলিবে না, কেহ কাহাকে স্নেহে বঞ্চিত করিবে না।

কিন্তু সে দুই জনের মাথার উপর কে এক জন অলক্ষ্যে বড় নিষ্ঠুর হাসি হাসিতেছিল। তাহার হাসিতে মুহূর্ত্তের জন্য নির্ম্মল চন্দ্রকিরণ পরিম্লান হইল, মুহূর্ত্তের জন্য জগৎ বায়ুশূন্য হইল। সে কে জানি না; যেই হউক, তাহার মনে যাহা থাকে, সে তাহাই করে। তাহারই ইঙ্গিতে আমাদের নন্দন-কানন মরুভূমিতে পরিণত হয়!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

অমরনাথের বিবাহের দিন ধার্য্য হইল। তাঁহার আপনার জন অন্য কেহ ছিল না; প্রকাশচন্দ্র ও দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়গণ উপস্থিত হইয়া শুভদিনে শুভকার্য্য সম্পন্ন করিলেন।

পাত্রী কিছু বয়ঃস্থা হইয়াছিল। যৌবন তাহার হৃদয় টুকুর ভিতর প্রবেশ করিয়া অতি ধীরে ধীরে নিদ্রিত প্রণয়-দেবতাকে জাগাইয়া তুলিতেছিল। কিশোরীর রূপ—রবিকরপ্রোদ্ভিন্ন প্রভাতকমলের ন্যায় বিকশিত হইয়া উছলিয়া পড়িতেছিল। সে দেহ যেমন সুকুমার, সে হৃদয়ও তেমনি সুকুমার। অমরনাথ মন্ত্রমুগ্ধের মত সে সৌন্দর্য্যের ধ্যানে বিভোর হইলেন।

অল্পদিনের মধ্যে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে চিনিলেন। দুই জনের প্রতি দুই জনের প্রগাঢ় প্রেম জন্মিল। নির্ম্মলা তাহার স্বামীর মূর্ত্তিতে বিশ্ব সংসার পরিপূর্ণ দেখিত। স্বামীর এত আদর, এত প্রেম, এত সোহাগ বালিকার হৃদয়ে অপার আনন্দ ঢালিয়া দিত। সে মুখ ফুটিয়া কিছুই বলিতে পারিত না, কিন্তু সে হৃদয় যদি দেখাইবার হইত, সে দেখাইতে পারিত যে, অমরনাথ তাহার সর্ব্বস্ব। নির্ম্মলার সে পতি-সেবা, সে ঐকান্তিক ভক্তি, সে সকল দেখিয়া অমরনাথ বুঝিতেন,—নির্ম্মলার রূপ বাহিরে ভিতরে সমান; সে রূপের আলোকে তাঁহার গৃহ আলো, হৃদয় আলো, জগৎ-সংসার আলো। আর মনে হইত, তাঁহার প্রেমের প্রবাহ নির্ম্মলার সে অপার অতলস্পর্শ অনন্ত-মেয় হৃদয়-সমুদ্রে মিশিয়া দিগন্তে প্রসারিত হইয়াছে! প্রেমের সর্ব্বব্যাপিনী মহাশক্তির চরণে অমরনাথ অবনত হইলেন!

চারি বৎসর এইরূপে কাটিল। বাল্যসহচর প্রকাশচন্দ্র আজিও তেমনি তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তী আছেন। প্রকাশচন্দ্র প্রায়ই অমরনাথের বাড়ীতে আসিতেন, না আসিলে অমরনাথ ছাড়িতেন না। কিন্তু কিছুদিন পরে প্রকাশচন্দ্র আর বড় শীঘ্র শীঘ্র আসা বন্ধ করিলেন। তিনি ভাবিতেন,—"অমরনাথের বিবাহ হইয়াছে, বাড়ীতে অন্য অভিভাবক কেহ নাই, যখন-তখন যাওয়া আমার উচিত হয় না। যদিও কাহারও মনে কিছু না থাক্, তথাপি অমরনাথের সম্মান রক্ষা করা আমার উচিত।

কাহারও মনে কোন কথা না উঠে, তাহা দেখিতে হইবে। এ সংসারে এমন লোকের সংখ্যা কিছু অল্প নহে, যাহারা বিনা স্বার্থেও পরের কথা বিকৃত-ভাবে লইয়া নানা গোল-যোগ উপস্থিত করিতে ভালবাসে। আমার এই যাতায়াতের মধ্যে নিজের চরিত্রের সহিত অমরনাথের নিষ্কলঙ্ক খ্যাতিও জড়িত রহিয়াছে, দুষ্টলোকের পাপ-মনে কখন্ কোন্ কথা জাগে, কে বলিতে পারে?" তাই প্রকাশচন্দ্র অল্পে অল্পে অমরনাথের বাড়ী যাওয়া বন্ধ করিলেন।

কিন্তু অমরনাথ সে কথা বুঝিতেন না। তিনি বলিতেন,—"তুমি না আসিবে কেন? এ সংসারে তুমিই আমার সহায়, তোমার বুদ্ধিই আমার বল ও ভরসা।"

প্রকাশচন্দ্র যাইতে স্বীকার করিতেন, কিন্তু যাইতেন না। অমরনাথের এ প্রকার স্বাধীন-ভাবের মূলে বন্ধুর প্রতি প্রবল-স্নেহ ও প্রগাঢ় বিশ্বাস বর্ত্তমান ছিল। কিন্তু তাহা হইলেও হিন্দু-সমাজ মহিলাগণকে এইরূপে পর-পুরুষের সাক্ষাতে উপস্থিত করিতে একান্ত নারাজ; ইহার মূলে যে সত্য নিহিত আছে, তাহা সকলে না বুঝিয়া, অনুদার বলিয়া হিন্দু-সমাজকে ঘৃণা করে। অমরনাথও তাহাদেরই একজন। আমরা অমরনাথের ধর্ম্ম-বিশ্বাস কি লৌকিক আচার-ব্যবহার হিন্দুর মত দেখিতে পাই না, অথচ তিনি যে কোন সম্প্রদায়-বিশে-ষের মতে চলিতেন, তাহাও নহে।

প্রকাশচন্দ্রকে মধ্যে মধ্যে অমরনাথের বাড়ীতে যাইতেই হইত এবং অমরনাথের অনুরোধে নির্ম্মলা প্রকাশচন্দ্রের সম্মুখে বাহির হইতেন এবং কিছুদিন পরে কথাবার্ত্তাও কহিতেন।

বিবাহের প্রায় চারি বৎসর পরে, একদিন অমরনাথ প্রকাশচন্দ্রকে বলিতেছিলেন,—"ভাই, জগদীশ্বর সকল প্রকারে আমাকে সুখী করিয়াছেন, সত্য; আমার এই বিপুল ঐশ্বর্য্য, এই সম্মান ও খ্যাতি, তোমার ন্যায় অকৃত্রিম বন্ধুরত্ন, সাক্ষাৎ লক্ষ্মী-স্বরূপিণী এই সহধর্ম্মিণী, সকলই আমি মনোমত পাইয়াছি। কিন্তু আজ কয়দিন হইতে একটী চিন্তা মনে জাগিয়াছে। তাহাতে বড় কাতর আছি। কেন যে এমন চিন্তা মনে উঠিল, তাহা জানি না এবং ইহা যে নিতান্ত অস্বাভাবিক, অন্যায় ও গর্হিত, তাহা বুঝিয়াও এ চিন্তা দূর করিতে পারিতেছি না। তোমাকে ছাড়া এ কথা আর কাহাকে বলিব? তুমি ভিন্ন ইহার প্রতিকার আর কে করিবে?"

প্রকাশ। তুমি আমাকে সকল কথা বলিতে পার, আমি প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও তোমাকে সন্তুষ্ট করিব।

অমর। তোমার কাছে বলিতে কি, তোমার কাছে লুকাইবার কথা আমার কিছুই নাই। আমি জানি, আমার স্ত্রী অতি সচ্চরিত্রা ও পতিব্রতা। কিন্তু যাহা আমি জানি, তাহা যথার্থ কি না, তাহাই জানিতে চাহি। তাহার প্রতি আমার কোন সন্দেহ নাই, এ কথা সত্য বলিতেছি। কিন্তু ভাই, প্রলোভনে না পড়িলে কে কেমন, তাহা কেমন করিয়া বুঝা যাইবে? কোন্ ব্যক্তি না স্বর্ণকে অগ্নি-পরীক্ষা করিয়া লয়? আমিও তাই দেখিতে চাহি, আমার নির্ম্মলা প্রলোভনের মধ্যে পড়িয়াও আপনার নৈর্ম্মল্য বজায় রাখিতে পারিয়াছে। যে কখন প্রলোভনের মধ্যে পড়ে নাই, তাহার পক্ষে সতী ও প্রতিব্রতা হওয়া নিতান্ত কঠিন কথা নহে। যদি আমার নির্ম্মলা এইরূপ কোন অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে,—এবং পারিবেও আমার বিশ্বাস,—তবেই জানিব, আমার তুল্য ভাগ্যবান্ কেহ নাই। কিন্তু যদি নির্ম্মলা পরাজিতা হয়? বোধ হয়, বুক বিদীর্ণ হইয়া যাইবে, যদি বাঁচিয়া থাকি, জগৎ অন্ধকার হইবে! কিন্তু যাহাই হউক, এ ইচ্ছা হইতে আমি নিবৃত্ত হইতে পারিতেছি না। প্রকাশ! শুন ভাই, মুখ ফিরাইও না, আমি অন্যের হস্তে এ ভীষণ পরীক্ষা-ভার ন্যস্ত করিতে পারিব না; তুমিই আমার এ কার্য্যের সহায় হও। কি জানি, যদি আমার আশার বিপরীত হয়, তবে তুমি প্রাণের বন্ধু প্রকাশ, তোমা হইতে আর অধিক কিছু অনিষ্ট হইবার আশঙ্কা নাই। আমি নির্ম্মলার এ প্রেমের পরীক্ষা চাহি, নহিলে সুস্থিরে বাঁচিব না, তুমি ইহার উপায় কর।

প্রকাশচন্দ্র সকল কথা শুনিলেন। অনেক-ক্ষণ নীরব থাকিয়া, অমরনাথের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন; চাহিয়া চাহিয়া শেষে বলিলেন,—"অমরনাথ! এ তোমার কি উপ-হাস! স্ত্রীর কথা লইয়া এরূপ উপহাস, আমার সাক্ষাতেও তোমার উচিত নহে। তুমি যে যথার্থ এ কথা বলিতেছ, তাহা কিছুতেই বিশ্বাস করিব না, বরং বিশ্বাস করিব, তুমি সে অমর-নাথ নহ। আর যদি যথার্থই এ কথা বলিয়া থাক, তবে শুন অমরনাথ! তোমার মত হতভাগ্য মূর্খ এ পৃথিবীতে আর কেহ নাই! এ পর্য্যন্ত জগতে এমন কথা কেহ শুনিয়াছে কিনা জানি না। তোমার বিদ্যা-বুদ্ধি সহসা কি তোমাকে পরিত্যাগ করিয়াছে? স্ত্রীর প্রেমের পরীক্ষা!—যাহাতে তাহার সতীত্ব, তাহার চরিত্র, তাহার নারী-জীবনের সর্ব্বস্ব এবং তোমার জীবন পর্য্যন্ত নির্ভর করিতেছে, তাহা লইয়াই তোমার এই কৌতুক! তুমি মূর্খ, না উন্মত্ত?"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

তবু বুঝান দায়! অমরনাথ সে কথা বুঝিতে চাহিলেন না। প্রকাশচন্দ্র ধীরভাবে যথার্থ বন্ধুর ন্যায় উপদেশ দিতে লাগিলেন,—"শুন অমরনাথ, তোমার এইরূপ প্রস্তাবে আমার বোধ হইতেছে যে, তোমার মতিবিপ-র্য্যয় ঘটিয়াছে, নহিলে তুমি বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্ হইয়া এরূপ কহিবে কেন? ইহার মধ্যে কি বিপদ্ রহিয়াছে, তাহা তুমি কি বুঝিতে পরিতেছ না? তুমি কি বুঝিতেছ না, ইহাতে আপনার সর্ব্বনাশ সাধন হইতে পারে? তর্ক বা যুক্তি দ্বারা তোমায় বুঝান দায়, কেননা, তুমি প্রকৃতিস্থ আছ বলিয়া বোধ হয় না। তুমি আমাকে তোমার স্ত্রীর প্রেমের পরীক্ষায় নিযুক্ত করিতে চাও! অর্থাৎ প্রলোভনের জাল বিস্তার করিয়া লুকাইয়া দেখি, স্বভাব-সুন্দরী, বিশুদ্ধ-হৃদয়া, সে সোণার বিহঙ্গ ধরা পড়ে কি না!—সে দুর্ভেদ্য অজেয় দুর্গ প্রলোভনে প্রতারিত হইয়া বশীভূত হয় কি না!—সে স্বর্গের দেবী নরকের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হয় কি না! তোমাকে উন্মত্ত বলিব না কেন?

"কতবার তোমায় বলিতে শুনিয়াছি, তোমার স্ত্রী রূপপ্রভায় যেমন প্রদীপ্ত, প্রেম, ভক্তি, ভালবাসা, দয়া, দান ও প্রীতিতেও তাঁহার হৃদয় তেমনই প্রদীপ্ত! পরীক্ষায় ইহার অধিক তাঁহাকে আর কি জানিবে? এখন তোমার হৃদয়ে তাঁহার যে উচ্চাসন রহিয়াছে, ইহার পর আর কি দিবে? কি দিতে পারিবে? আর যদি বুঝিয়া দেখ, তাঁহার প্রেম বা ভালবাসা কৃত্রিম, পরীক্ষায় ফেলিয়া লাভ কি? সেই-রূপই তাঁহার সহিত ব্যবহার করিতে পার। যে অমূল্য কোহিনুরের জগৎপ্রসিদ্ধ খ্যাতি, কোন্ মূর্খ তাহা কঠিন প্রস্তরে ফেলিয়া তাহার বিশুদ্ধির প্রমাণ দেখিতে চাহে? প্রমাণ পাইলেও কি তাহার গুণগরিমা অধিক বাড়িবে? কিন্তু বিপরীত হইলে কি মর্ম্মভেদী মনস্তাপ না সহিতে হইবে? ইহা বুঝিয়াও যদি পুনর্ব্বার উহাতে জিদ প্রকাশ কর ত তোমায় নিতান্ত মূর্খ ভিন্ন আর কি বলিব?

"ভাবিয়া দেখ, এ সংসারে সতী স্ত্রীর অপেক্ষা

বহুমূল্য রত্ন আর কিছুই নাই। তুমি সে রত্নের অধিকারী হইয়া নিজ-হস্তে তাহা বিনষ্ট করিবে? আমার এইরূপ বিশ্বাস যে, স্ত্রী-জাতি স্বভাবতঃ কিছু দুর্ব্বলা; কোন বিপদ্-কণ্টক তাহার পথে না ফেলিয়া, তাহাদিগের পথ পরিষ্কার রাখিয়া দেওয়াই আমাদের উচিত। কি জানি, কোন্ বিপদের মাঝে পড়িয়া সে আপনার পথ হারাইয়া আপনার সর্ব্বনাশ সাধন করে, এইজন্য বিপদের পথে তাহাকে ফেলিয়া আসিতে নাই। সৌন্দর্য্য, পবিত্রতা ও পুণ্যের মূর্ত্তি তাহার সম্মুখে ধরিয়া রাখিতে হয়, তাহা হইলে বিধাতা নারী-হৃদয়ে যে স্বর্গীয় রত্ন দিয়াছেন, তাহার পূর্ণ বিকাশ হইয়া থাকে, এবং যে ভাগ্যবলে সে রত্নের অধিকারী হইয়া থাকে, ভাবিয়া দেখ, সে কি ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর! স্বচ্ছ-দর্পণের ন্যায় রমণীর খ্যাতি ও যশ অতি সাবধানে রাখিতে হয়, এতটুকু নিশ্বাসস্পর্শে তাহা মলিন হইতে পারে!

"আরও ভাবিয়া দেখ, এই সঙ্গে আমাকেও কি বিপদের মাঝে ফেলিতেছ। যখন তোমারই কথামত তোমার স্ত্রীর সম্মুখে আমি প্রলোভনের জাল বিস্তার করিব, তিনি আমাকে কি ভাবিবেন! তিনি ভাবিবেন, হয় ত আমি তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিতে পারি, এমন কিছু আভাস তিনি আমাকে দিয়াছেন, এই ভাবনাতে তাঁহার কি আত্মগ্লানি উপস্থিত হইবে! তাঁহার নিন্দায়, তোমারও নিন্দা, তাঁহার অখ্যাতিতে তোমারও অখ্যাতি। এখনও ভাবিয়া দেখ অমরনাথ! কি নির্ম্মল কুসুম উষ্ণোদকে ফেলিতে চাহিতেছ? কি অমূল্য রত্ন শূকরের ন্যায় স্বেচ্ছায় হারাইতেছ? আর যদি একান্তই এ সঙ্কল্প পরিত্যাগ না কর, তুমি আর কাহারও দ্বারা এ কার্য্য সাধন কর, আমা হইতে হইবে না। ইহাতে যদি তোমার স্নেহে বঞ্চিত হইতে হয়, তাহাতেও স্বীকৃত আছি।"

রাগে, দুঃখে, অভিমানে প্রকাশ নীরব হইলেন। কিছুক্ষণের জন্য অমরনাথ কিছু বলিতে পারিলেন না।

তখন বিশালবক্ষা গঙ্গা অবাতবিক্ষুব্ধ হইয়া স্থিরভাবে অতি-ধীরে প্রবাহিত হইতেছিল; বিশাল গঙ্গাবক্ষে বিশাল আকাশের যে বিশাল ছায়া পড়িয়াছিল, তাহাও মেঘ-শূন্য পরিষ্কার নীল। অমরনাথ গঙ্গাতটে বসিয়া এই সুন্দর ছবি দেখিতেছিলেন, প্রকাশচন্দ্র নীরব হইলে, কিছুই বলিলেন না। সহসা একটুকু ঘন কাল মেঘ উঠিল, আকাশের নীল ছায়ার উপর একটা ঘন কাল-দাগ পড়িল, একটুকু বাতাস বহিল, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ উঠিয়া গঙ্গার স্থির বক্ষ আন্দোলিত করিল। তারপর, বাতাসের জোর বাড়িল, তরঙ্গের পর তরঙ্গ উঠিয়া, গঙ্গা আলোড়িত করিতে লাগিল, সুনীল আকাশের চারি দিকে মেঘ ছড়াইয়া পড়িল,—সহসা প্রকৃতির শান্তমূর্ত্তি ভীষণ হইল। অমরনাথ সে দুর্য্যোগের সময়ও বসিয়া ভাবিতেছেন,—"নির্ম্মলার প্রেমও কি এমনই সহসা পরিবর্ত্তিত হইতে পারে না? সুখে-দুঃখে, আপদে-বিপদে, পার্শ্ব-প্রলোভনের মধ্যে পড়িয়াও কি সে প্রেম অবিচলিত, অবিকৃত, পরিশুদ্ধ থাকিবে? তাহাই ত দেখিতে চাই। পাপে ও প্রলোভনে যে আত্মহারা হইল না, তাহার প্রেম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। আমি সেই প্রেমের পরীক্ষা চাই।"

তখন অমরনাথ উত্তর করিলেন,—"ভাই প্রকাশ! তুমি যাহা বলিলে, সে সকলই সত্য! আমি যাহা করিতে বসিয়াছি, তাহার ভাল মন্দ সকলই ভাবিয়াছি, কিন্তু বুঝিয়াও আমার মনকে বুঝাইতে পারিতেছি না। আমার এ মূর্খতা বিষম রোগ বলিয়া মনে কর; তুমি ইহার প্রতীকার না করিলে আমি বাঁচিব না। তুমি একবার আমার কথা রাখ, আমি সন্তুষ্ট হইব।"

প্রকাশচন্দ্র ভাবিয়া দেখিলেন, এ সংসারে শত প্রকার মূর্খতা আছে, ইহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই! কিন্তু বুঝাইলে আর কি হইবে? সহসা বা কেন এমন দুর্ম্মতি হইল, তাহা তিনিও বুঝিলেন না। রোগ এমন গুরুতর যে, যদি তিনি ইহাতে স্বীকার না করেন, চাই কি ইহার জন্য অমরনাথ অন্য কাহাকেও নিযুক্ত করিতে পারেন! তখন অগত্যা তিনি স্বীকার করিলেন। কিন্তু মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন,—"পরীক্ষা আমা হইতে হইবে না, বলিব, নির্ম্মলার হৃদয় প্রলোভনে অবিচলিত, শত প্রকার আক্রমণেও অজেয়।"

অমরনাথ প্রকাশচন্দ্রের উপর পরীক্ষা-ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। যখন যে সুযোগের আবশ্যক, তাহা তিনি তৎক্ষণাৎ সমাধা করিয়া দিবেন ইহাও বলিলেন।

তখন প্রবল ঝটিকা উঠিয়াছিল, অধিক কিছু কথা হইল না। উভয়ে স্ব স্ব গৃহে ফিরিলেন।

মূর্খ অমরনাথ! যে রত্নভাণ্ডার আজ পরহস্তে সমর্পণ করিলে, আর কি তাহা ফিরিয়া পাইবে? যে দুর্গ মধ্যে থাকিয়া, সংসারের শত উত্তাপ হইতে সন্তপ্ত হৃদয় জুড়াইতে পারিতে, আর কি সে দুর্গ মধ্যে ফিরিয়া আসিতে পারিবে? বিদ্যা, বুদ্ধি, ঐশ্বর্য্য অতল জলে ফেলিয়া দাও, তুমি শূকর, রত্নের আদর জানিবে কেন?

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পরদিন প্রাতে অমরনাথের বাটীতে প্রকাশচন্দ্রের নিমন্ত্রণ হইল। আহারাদির পর সকলে বিশ্রাম করিতেছেন, অমরনাথ সেই সময় স্ত্রীকে ডাকিয়া বলিলেন,—"আমার বিশেষ প্রয়োজন পড়িয়াছে, কোথাও যাইতে হইবে। খুব শীঘ্রই ফিরিব। ততক্ষণ প্রকাশ এখানে থাকিবে।"

নির্ম্মলা এইরূপ সহসা প্রয়োজনের কারণ বুঝিল না। কিন্তু তথাপি বলিল,—"না, এখন গিয়া কাজ নাই, বেলা পড়ুক, বৈকালে যাইও।"

প্রকাশচন্দ্র, অমরনাথের সঙ্গে যাইতে চাহিলেন। অমরনাথ কাহারও কোন কথা না শুনিয়া চলিয়া গেলেন। প্রকাশচন্দ্র তখন ইহার অর্থ বুঝিলেন। তিনি কিছু না বলিয়া একখানি পুস্তক লইয়া নীরবে পাঠ করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িলেন। নির্ম্মলাও আপনার গৃহে বসিয়া গৃহ-কার্য্যে মনোযোগ দিলেন। কাহারও সহিত কোন কথা হইল না।

কিছু বিলম্বে অমরনাথ গৃহে ফিরিয়া দেখিলেন, প্রকাশচন্দ্র ঘুমাইতেছে! অমরনাথ ভাবিলেন,—"আমি ত অনেক বিলম্বে আসিয়াছি, হয় ত কথাবার্ত্তা হইয়া গিয়া থাকিবে, তাই এখন ঘুমাইতেছে। ভাল ডাকিয়া দেখি।" একটুকু বিলম্ব সহিল না, প্রকাশের বুঝি নিদ্রা আর ভাঙ্গিবে না।

প্রকাশ উঠিলে, অমরনাথের প্রশ্ন আরম্ভ হইল,—"কি, কেমন দেখিলে? কোন কথা কহিয়াছিলে কি না?"

প্রকাশ। অন্যান্য কথা অনেক হইয়াছে। এখন কি বেশী বলিতে পারি? আজ তাঁহার রূপের প্রশংসা করিয়াছি, কাল তাঁহার গুণের কথা বলিব, অন্যদিন আমার জীবনের দুই চারিটা দুঃখের কাহিনী বলিব—তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিবেন, দু'ফোঁটা চখের জল ও ফেলিবেন,—এই রকম করিয়াই না মানুষকে আয়ত্ত করিতে হয়? সয়তানও এমনই বেশ ধারণ করিয়া, জগতে পাপের বীজ রোপণ করিয়াছে!"

অমরনাথ বড় সন্তুষ্ট হইলেন। মাঝে মাঝে তিনি এইরূপ অবসর দিতেন, আর প্রকাশচন্দ্র

হয় ঘুমাইয়া, না হয় পুস্তক পড়িয়া, সে অবসর টুকু অতিবাহিত করিতেন এবং অমরনাথের প্রশ্নে উত্তর দিতেন,—"আর পরীক্ষা করিব কি ছাই? দু'চার কথা বলিয়া এমনই তোমার স্ত্রীর চক্ষুঃশূল হইয়াছি যে, তিনি আর সম্মুখে আসিতে চাহেন না" অমরনাথ বলিলেন,—"এখনও হয় নাই, এই সহস্র মুদ্রা তোমায় দিতেছি, তুমি নানা সুবর্ণ অলঙ্কার তাহাকে উপহার দিয়া দেখ, সে প্রত্যাখ্যান করে কি না! এই আমার শেষ-পরীক্ষা! আর তোমাকে কষ্ট দিব না। এই পরীক্ষায় নির্ম্মলা জয়ী হইলে, সকল কথা প্রকাশ করিয়া তাহার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিব এবং তুমি যে নিষ্পাপ, তাহা তাহাকে বুঝাইয়া দিব।"

অমরনাথ মনে করিয়াছিলেন, স্ত্রীজাতি অর্থ ও অলঙ্কার সহসা প্রত্যাখান করিতে পারিবে না। কিন্তু আজ আমি লুকাইয়া শুনিব, কিরূপ কথাবার্ত্তা চলে।"

এই বলিয়া অমরনাথ পার্শ্বস্থিত একটা গৃহে লুকাইয়া রহিলেন।

কিন্তু অন্যান্য দিনের মত আজও কোন কথাবার্ত্তা নাই। প্রকাশচন্দ্র পুস্তক পাঠ করিয়া, এক ঘণ্টা অতিবাহিত করিলেন, নির্ম্মলাও গৃহ-কার্য্যে ব্যাপৃতা রহিলেন।

অমরনাথ বাহিরে আসিয়া প্রকাশচন্দ্রকে ডাকিলেন এবং যেন কিছুই জানেন না, এই ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আজিকার খবর কি?"

প্রকাশ। আজিকার কথা আর জিজ্ঞাসা করিও না। কথাপ্রসঙ্গে উপহারের কথা তুলিতে না তুলিতে তিনি এমন তিরস্কার করিয়াছেন যে, আর কিছুই বলিতে পারি নাই।

অমরনাথ। প্রকাশ! এই তোমার বন্ধুত্ব? আমাকে প্রতারণ? আমি আজ দ্বারের পার্শ্বে লুকাইয়া থাকিয়া দেখিয়াছি, তোমরা কেহ কাহারও সম্মুখীন হও নাই, কিংবা বাক্যালাপ পর্য্যন্ত কর নাই। আমার স্থির বিশ্বাস হইতেছে, এ পর্য্যন্ত কোন প্রকারে তুমি পরীক্ষা কর নাই। ছিঃ! আমার সহিত এইরূপ মিথ্যা ব্যবহার কি তোমার উচিত? বোধ হয়, অন্য কাহাকেও নিযুক্ত করাই আমার উচিত ছিল।

তখন প্রকাশচন্দ্র কিছু লজ্জিত হইয়া বলিলেন,—'সত্যই এ পর্য্যন্ত তোমার স্ত্রীর সহিত কথা কহা দূরে থাকু, তাঁহার নিকটে পর্য্যন্ত যাই নাই। কিন্তু এবার তুমি নিশ্চিন্ত হও, এবার আর তোমার সহিত মিথ্যা কহিব না, সত্যই পরীক্ষাভার গ্রহণ করিলাম।"

অমরনাথ বিশেষ কার্য্যের ভাণ করিয়া কিছুদিনের জন্য দেশান্তরে যাইতে প্রস্তাব করিলেন। নির্ম্মলা অনেক কাঁদাকাটি, অনেক ওজর-আপত্তি করিল, কিন্তু অমরনাথ শুনিলেন না; তাঁহার নাকি প্রয়োজন বড় গুরুতর। নির্ম্মলা একা গৃহে থাকিবেন কেমন করিয়া? পিতৃগৃহে যাইতে চাহিলেন। অমরনাথ আপত্তি করিয়া বলিলেন,—"আমি যত সত্বর পারি, ফিরিব; তুমি গৃহে থাকিও, প্রকাশ তোমাদিগকে দেখিবে, তাহাকেই এখানে রাখিয়া গেলাম।"

যাও মূর্খ অমরনাথ! পার ত আর ফিরিও না। ঝড়ে হউক, তুফানে হউক, যেমন করিয়া হউক, যেন পথেই তোমার মৃত্যু হয়! গৃহে ফিরিয়া আসিয়া আর কি দেখিবে? যে সুবর্ণমন্দিরে প্রেমের দেবতা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলে, দেখিবে, দেবতা অন্তর্দ্ধান করিয়াছে, শূন্য মন্দির পড়িয়া আছে। দেখিবে, যে অমূল্য রত্নে তোমার গৃহ কুবেরের ভাণ্ডারকেও লজ্জা দিয়াছিল, তাহা অপহৃত হইয়াছে! দেখিবে, যে প্রেম-প্রস্রবণে তোমার হৃদয় বিকশিত, সে প্রেম-উৎস শুকাইয়া গিয়াছে! ইহাই দেখিবার জন্য আসিবে? মরিবার জন্যই কি গৃহে ফিরিবে?

আর তুমি প্রকাশচন্দ্র! তোমার ও মাধুর্য্য-মিশ্রিত গাম্ভীর্য্যের মধ্যে যে পবিত্রতাটুকু এখনও অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছ, তাহারই বলে কি তোমার এতই সাহস? যে রূপের শিখা চক্ষের সম্মুখে দিন-রাত্রি জ্বলিতে থাকিবে, তুমি পতঙ্গ মাত্র, তাহা হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে পারিবে? যাহাকে প্রলোভনের মাঝে ফেলিতে চলিয়াছ, তাহার প্রলোভন হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে পারিবে? যদি সে সাহস থাকে, তবে এ কার্য্যে ব্রতী হও! নহিলে কৃতঘ্নতার মহাপাপে আপনাকে ডুবাইয়া, বন্ধুত্বের পবিত্র নামে কলঙ্ক আরোপ করিও না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

অমরনাথ কিছুদিনের জন্য দেশপর্য্যটনে বাহির হইলেন। প্রকাশচন্দ্র তাঁহার বাটীতে অভিভাবক স্বরূপ হইয়া রহিলেন। তিন চারি দিবস অতিবাহিত হইল, কাহারও মনে কিছু নাই, আকাশ মেঘশূন্য, পরিষ্কার নীল; গঙ্গা অবাতবিক্ষোভিত, তরঙ্গ-ভ্রুকুটী বিহীন।

নির্ম্মলার এক পরিচারিকা ছিল, তাহার নাম পার্ব্বতী। পার্ব্বতী বয়সে নির্ম্মলার অনুরূপ, যৌবনে তাহার আকৃতিতে কিছু সৌকুমার্য্য প্রকাশিত হইয়াছিল। নির্ম্মলা একান্ত সখীভাবে তাহাকে আদর ও যত্ন করিত। কিন্তু পার্ব্বতীর স্বভাব-চরিত্র বড় মন্দ ছিল।

প্রকাশচন্দ্র যখন বাড়ীতে থাকিতেন, নির্ম্মলা পার্ব্বতীকে সঙ্গে সঙ্গে রাখিত, কখন কাছ-ছাড়া করিত না, আহারের সময় অগ্রে পার্ব্বতীকে আহার করাইয়া সর্ব্বদা নিজের পার্শ্বে রাখিত। কিন্তু তবু সকল সময় পার্ব্বতীকে পাওয়া যাইত না, তাহার নিজের প্রয়োজনেও সময়ে সময়ে তাহাকে ঘুরিতে হইত।

নির্ম্মলার হৃদয় নির্ম্মল, চিত্ত প্রফুল্ল এবং দেহ অপূর্ব্ব রূপরাশিতে প্রদীপ্ত। চিত্তের নৈর্ম্মল্য হইতে যে স্বর্গীয় প্রশান্ত রূপ জন্মিয়া থাকে, তাহাতে সে সৌন্দর্য্য প্রতিমার মধুর-কান্তি আরও শত গুণে বাড়িয়াছিল। প্রকাশচন্দ্র আসিয়া যখন কোন কথা কহিতেন, নির্ম্মলা সুবিশাল স্নিগ্ধ আঁখি ভূমি পানে নত করিয়া, অতি ধীরে দুই চারিটা কথা কহিতেন, সে কথার ভঙ্গীতে, কথার প্রত্যেক বর্ণে এত মাধুর্য্য বিকীর্ণ হইত যে, যে শুনিত সে মুগ্ধ হইত। প্রকাশচন্দ্রের মনে হইত, নির্ম্মলার কণ্ঠ যেন মধুর বাদ্যযন্ত্রের সুরে সুর-বাঁধা! এ মধুর কণ্ঠ শুনিলে কান জুড়াইয়া যায়, হৃদয়ে অমৃত-স্পর্শের ন্যায় অপূর্ব্ব স্পর্শ অনুভূত হয়! আর সে হাসি? সে মধুর অধরে মধুর হাসি যে দেখিয়াছে, সে ভুলিতে পারে না। সে ফুল্ল রক্তিম অধরে সে শুভ্র-হাসি দেখিয়া মনে হয় বান্ধুলির উপর কে যেন শেতপদ্ম বসাইয়া দিয়াছে! গঠনের সে সৌকুমার্য্য, প্রত্যেক অঙ্গ-বিক্ষেপের সে সৌকুমার্য্য, বচনরাশির সে সৌকুমার্য্য, হাস্যপ্রদীপ্ত অপূর্ব্ব মুখমণ্ডলের সে সৌকুমার্য্য,—রূপের উপাসক হইয়া যে দেখিয়াছে, তাহার হৃদয়ে সে মূর্ত্তি-মধুরিমার ছায়া-পাত হইয়াছে, সে আর কখন তাহা ভুলিতে পারিবে না। প্রকাশচন্দ্র সেই রূপের প্রতিমা দেখিতেন। দেখিতে দেখিতে বিস্ময় বিমুগ্ধ হইয়া, নিভৃতে বসিয়া সেই রূপের চিন্তা করিতেন। চিন্তামাত্র কিন্তু প্রকাশ বুঝিতেন যে, সেই চিন্তাই তাঁহার হৃদয়ে এমন উন্মত্ততা আনিয়া দিবে, যাহার বেগ সংবরণ করা দেবতারও অসাধ্য হইয়া পড়িবে! তবু কি

বুঝান যায়? নির্ম্মলার রূপ, নির্ম্মলার হৃদয়, নির্ম্মলার স্থৈর্য্য, ভাবিতে ভাবিতে প্রকাশের হৃদয় নির্ম্মলার রূপে ভরিয়া গেল!

কিছুই বিস্ময়ের কথা নাই। হৃদয়ের এ ভাব একান্ত স্বাভাবিক। সৌন্দর্য্যের প্রভাব কে কবে উপেক্ষা করিতে পারিয়াছে? জিহ্বা হয় ত মূক হইয়া বসিয়া আছে, কিন্তু অন্তরের অন্তরে যে ভাষা ফুটিতেছে, সে ভাষায় কেবল সে রূপের ধ্যান ও উপাসনা উচ্চারিত হইতেছে! চিন্তার জন্য এতটুকু অবসর দিতে নাই, তাহা হইলে, হয় ত হৃদয়ের এ দাবানল জ্বলিয়া উঠিতে পায় না! অনঙ্গেন্দ্রিয় হইয়া মনকে এমন একই ভাবে যে ডুবাইয়াছে, তাহার চিত্ত ভরিয়া সে জ্বলন্ত রূপের শিখা যে জ্বলিয়া উঠিবে, তাহা বিচিত্র কি?

তবু প্রকাশচন্দ্রের ভাবা উচিত ছিল, নির্ম্মলা অনূঢ়া বালিকা নহে, নির্ম্মলার চিন্তা তাঁহার ধ্যানপ্রাপ্য হওয়া উচিত নহে। তার উপর অকৃত্রিম সুহৃদ্ অমরনাথের কথা ভাবা উচিত ছিল, অমরনাথের কি প্রবল বিশ্বাস, বন্ধুর উপর কতখানি নির্ভর, সে কথা ভাবিলে নির্ম্মলার ভাবনা মনে স্থান দেওয়া উচিত ছিল না।

সে সকলই সত্য। কিন্তু উচিত বুঝিয়াও অনেক কাজ আমরা করি না, করিতে পারিও না। মনকে সেদিকে পরিচালনা করা যেন একান্তই দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। আর তা-ছাড়া, প্রকাশচন্দ্র এখনও কোন পাপচিন্তা মনে স্থান দেন নাই, রূপের ধ্যান যে চিত্তরঞ্জিনীবৃত্তির একটা স্বাভাবিক ধর্ম্ম, তাঁহার মনে এখন পর্য্যন্ত তাহাই বিদ্যমান। তবে এ কথা অবশ্যই বলা উচিত যে, ইহার পরিণাম ভাবিয়া প্রকাশচন্দ্রের মনে এ চিন্তার অবসর না দেওয়াই উচিত ছিল।

প্রকাশচন্দ্র শেষে বুঝিতে পারিলেন, ব্যাপার বড় সামান্য নহে, এ বেগবান্ হৃদয়কে বিশ্বাস নাই। অমরনাথকে মনে পড়িল, বাল্যের সেই সাহচর্য্য, সেই স্নেহ, সেই ভালবাসা, কর্ণগড়ের ভগ্নস্তূপের উপর বসিয়া জ্যোৎস্না-প্রদীপ্ত সেই মধুর রাত্রে সেই পরস্পরের প্রতিজ্ঞা!—আ ছিঃ ছিঃ! এই কি তাহার পরিণাম? অমরনাথের সে অগাধ বিশ্বাস, বন্ধুর প্রতি সে অকৃত্রিম ভালবাসা,—এই কি তাহার প্রতিশোধ? প্রকাশচন্দ্র শিহরিলেন। তিনি আপনার অবস্থা বুঝিলেন, নিজের হৃদয় দেখিলেন। দেখিলেন, হৃদয়ে একটা কাল ছায়া পড়িয়াছে, কি একটা পঙ্কিল বাসনা-বহ্নির একটী ক্ষুদ্র কণা জ্বলিয়াছে! তিনি মরমে মরিয়া গেলেন। ভাবিলেন, পলাইয়া যাই! আমার মুখে হয় ত এ পাপ-হৃদয়ের ছায়া পড়িয়াছে, এ মুখ আর দেখাইব না। অরণ্যে অরণ্যে ঘুরিয়া এ দেহপাত করি!"

আবার নির্ম্মলার সে নির্ম্মল-মুখমণ্ডল মনে জাগিল। রমণীমুখ-পদ্ম বিধাতা কি এতই সুন্দর করিয়া গড়িয়াছেন? তৃষাতুর আঁখি-যুগল চির-জীবন কি অতৃপ্তই রহিয়া যাইবে? কেন এ মোহ? আর একবার—একবার দেখিবমাত্র, কেবল চোখের দেখা,—তারপর জন্মের মত বিদায় হইব! প্রকাশচন্দ্র এইরূপ ভাবিতে লাগিলেন।

কিন্তু হায়! ইহাও কম বাতুলতা নহে! আর একবার—একবারমাত্র দেখিবার লালসা কেন? আর একবার দেখিলেই কি পিপাসা মিটিবে? অনলে আহুতি কেন?—এ কথা কে বুঝিবে? পতঙ্গ অনলে পুড়িতে চলিল!

তখন সন্ধ্যাকাল। সন্ধ্যার আকাশে একটা খুব উজ্জ্বল নক্ষত্র ফুটিয়াছিল। সেই নক্ষত্র পানে চাহিয়া নির্ম্মলা যুক্তকরে মনে মনে কাহাকে কি জানাইতেছিল, সন্ধ্যার ম্লান

ছায়াটুকু সে সৌন্দর্য্য-প্রদীপ্ত মুখমণ্ডলের উপর পড়িয়া, একটু মধুর বিষাদ-রেখায় তাহা রঞ্জিত করিয়াছিল। প্রকাশচন্দ্র নীরবে নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেও নির্ম্মলা দেখিতে পাইল না। প্রকাশ অনিমিষলোচনে সে মুখপানে চাহিয়া চাহিয়া আত্মহারা হইলেন।

আর একবার দেখিলেই না সাধপূর্ণ হইবে?

নির্ম্মলা যখন চাহিয়া দেখিলেন,—দেখিলেন প্রকাশচন্দ্র তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। অমনি সসম্ভ্রমে মাথায় কাপড় টানিয়া দিয়া, মুখখানি ভূমি পানে নত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি কি কিছু বলিতে আসিয়াছেন?"

প্রকাশ কিছুই বলিতে পারিলেন না, নিতান্ত অপ্রস্তুতের মত দাঁড়াইয়া রহিলেন।

সে ভাবের অর্থ কিছুই বুঝা গেল না। নির্ম্মলা কিছু বিস্মিত হইয়া দেখিলেন, প্রকাশচন্দ্রের দৃষ্টি নিতান্ত অপরাধীর ন্যায়, মুখখানাতেও সেই ভাবের ছায়া পড়িয়াছে! কৈ, এমন করিয়া ত প্রকাশচন্দ্র কখন চাহেন নাই, সে প্রতিভা-সমুজ্জ্বল মুখমণ্ডলে এমন মলিন-ছায়া ত কখন পড়ে নাই!

নির্ম্মলা সহসা সব বুঝিয়া ফেলিলেন। স্ত্রীজাতির পক্ষে এ ভাব বুঝিতে বড় বেশী সময় লাগে না। তখন মনে হইল, আজ দুই দিন হইতে প্রকাশ প্রায়ই বিনা-প্রয়োজনে নিকটে আসিয়া থাকেন, চক্ষু দুইটী চারি দিক্ ঘুরিয়া ফিরিয়া যেন নির্জ্জন-স্থান খুঁজিবার অবসর দেখিত, মুখখানা কি বলিব-বলিব করিয়া যেন বলিতে পারিত না। এ সকল কেন? প্রকাশচন্দ্রের মনে কি কোন কু-অভিসন্ধি আছে? তাহাও কি সম্ভব? নির্ম্মলার যেন বড় আতঙ্ক হইল। এ অসহায় অবস্থায় কি হইতে কি হয়, তাহা কে জানে? বড় একটা ভাবনা ও আতঙ্ক সহসা সে বুকের মাঝে চাপিয়া বসিল। নির্ম্মলা কিছু বিরক্তির সহিত চলিয়া যাইতে চাহিলেন, কিন্তু উন্মত্ত প্রকাশচন্দ্র পথ রুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইল, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া নতজানু হইয়া বসিয়া বদ্ধাঞ্জলি করিল। তারপর—তারপর কি বলি-বলি করিয়া কিছুই বলিতে পারিল না, সাহস করিয়াও আর মুখ পানে চাহিতে পারিল না।

নির্ম্মলা দর্পণস্থ ছায়ার ন্যায়, প্রকাশচন্দ্রের অন্তরের অন্তর পর্য্যন্ত দেখিতে পাইলেন, সব বুঝিলেন। বুঝিলেন, এখন ভয়ের সময় নহে, সাহসের প্রয়োজন। হিংস্র জন্তু অতি ভীষণ ব্যাঘ্র ভল্লুক অপেক্ষা এ মনুষ্যকে অধিক ভয় করিতে হইবে বটে, কিন্তু সাহসে বুক বাঁধিতে হইবে। তখন অসহায়ের সহায়, দুর্ব্বলের বল, অনাথের নাথ দয়াময়ের নাম স্মরণ করিয়া, সতীর সাহস বাড়িল, সে অতি কোমল আকৃতিতে সহসা কি কাঠিন্য-ভীষণ এক মূর্ত্তি প্রকটিত হইল, নয়নে যেন ধক্ ধক্ করিয়া অগ্নি জ্বলিল, সীমন্তে সিন্দূরবিন্দু যেন অনলশিখা উদ্গার করিতে লাগিল। সয়তান শিহরিল। মুহূর্ত্তমধ্যে সে ত্বরিতপদে প্রস্থান করিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

নির্ম্মলা পার্ব্বতীকে কিছুই জানাইলেন না। সেও কিছু জানিল না। কিন্তু এ অবস্থায় থাকা আর উচিত নহে, বিবেচনা করিয়া স্বামীকে পত্র লিখিলেন।

"তুমি শীঘ্র আসিবে বলিয়া গিয়াছ, কিন্তু অনেক দিন হইল, আজিও ত ফিরিলে না। যদি আরও বিলম্ব হইবার সম্ভাবনা থাকে, আমাকে লইয়া যাও, কিংবা অনুমতি করিলে আমি পিত্রালয়ে যাই।

"দুর্গ অসহায় অবস্থায় রাখিয়া দুর্গস্বামীর দূরে থাকা উচিত নহে। পদে পদে অজ্ঞাত শত্রু কর্ত্তৃক বিজিত হইবার সম্ভাবনাই অধিক।

"সংসারের খ্যাতি ও যশ লোকের মুখে। মনুষ্য মনুষ্যের অন্তরে প্রবেশ করিতে পারে না, তাহার বাহির, বাহিরের কার্য্যাবলী ও আত্মীয়-স্বজনের সাহচর্য্য হইতেই তাহার নিন্দা ও সুখ্যাতির রচনা হইয়া থাকে। তাহাদের অতি সামান্য কথা হইতে যেমন প্রশংসা, তেমনি নিন্দারও উৎপত্তি হইয়া থাকে।

"তুমি যাহার অধীনে 'তোমার বলিবার' সকল রাখিয়া গিয়াছ, তাঁহা হইতে তোমার অনিষ্ট ঘটিতে পারে, ইহাই আমার আশঙ্কা। দাসী ইহার অধিক বলিতে চাহে না। তুমি বুদ্ধিমান্, তোমাকে বেশী বলিতে বা কেন হইবে?"

যথাসময়ে অমরনাথের নিকট এ পত্র পৌঁছিল। তিনি বুঝিতে পারিলেন, এবার তাঁহার বন্ধু যথার্থই তাঁহার কথা রাখিয়াছেন। পরীক্ষা আরম্ভ হইয়াছে। তিনি নির্ম্মলার পত্রের কোন উত্তর দিলেন না, বরং আনন্দে নিশ্চিন্ত হইয়া রহিলেন।

প্রকাশচন্দ্র নিবৃত্ত হইতে পারিলেন না। তাঁহার হৃদয়ে যে তরঙ্গ-তুফান উঠিয়াছিল, দেবতার সামর্থ্য পাইলেও সে উদ্বেলিত উন্মত্ত হৃদয়কে শান্ত করা দুঃসাধ্য হইত। তিনি সুবিধা ও অবসর বুঝিয়া একদিন নির্ম্মলার সহিত দেখা করিলেন এবং আপনার হৃদয় গোপন করিয়া বলিলেন,—"তুমি সেদিন কেন আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়াছিলে, আমি বুঝিতে পারি নাই। আমি অনেক ভাবিয়াও বুঝিতে পারি নাই, আমার অপরাধ কি? তুমি আমার বন্ধু-পত্নী, আমার সম্মান ও স্নেহের পাত্রী তুমি। কখন কি তোমার প্রতি আমার সম্মানের কোন ত্রুটী হইয়াছে?"

নির্ম্মলা কোন উত্তর করিলেন না। নীরবে শুনিতে লাগিলেন। প্রকাশ বলিতে লাগিল,—"যদি আমার অজ্ঞাতসারে আমি কোন অপরাধ করিয়া থাকি, সেজন্য আমি প্রায়শ্চিত্ত করিব। আমি আজীবন রূপের ভিখারী, রূপের ধ্যান আমার জীবনের ব্রত। তোমাতে যে অসীম রূপের অপূর্ব্ব বিকাশ দেখিয়া থাকি, আমি তাহাতেই আত্মহারা হইয়াছি, আমার বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তোমার রূপের মাঝে নিমজ্জিত হইয়াছে। তাই রাত্রি-দিন ঐ চিরহাস্যময়ী মূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে রূপোন্মাদ হইয়াছি। আমার অপরাধ কি? পতঙ্গ অনলে ঝাঁপ দেয়—মরিবার জন্য, আমিও এই রূপের শিখায় মরিবার জন্য আসিয়াছি। তুমি কে, আমি কে, তাহা জানি। কিন্তু যদি বুক দেখাইবার হইত, দেখাইতাম, কি তুমুল সংগ্রামে ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছি!"

নির্ম্মলা বিরক্তির সহিত বলিলেন,—"আমি এক্ষণে একা আছি, পার্ব্বতীও এখানে নাই, আপনার এখানে থাকা উচিত হইতেছে না। আপনি যাহা বলিলেন, এ সকল কি আমাকে আপনি বলিতে পারেন? আমার স্বামী না আপনাকে আপনার প্রাণ সমান ভালবাসেন? তিনি না আপনাকে একান্ত বিশ্বাস করেন? এই কি তাহার পরিশোধ?"

প্রকাশ। তুমি ও কথা আর বলিও না। আমি মরিতে বসিয়াছি, মরিব। একবার শুনিয়া যাই, আমার এ হৃদয়াঞ্জলি, আমার আরাধ্য দেবতার চরণে স্থান পাইবে কি না?

নির্ম্মলা। আমার স্বামী এক্ষণে উপস্থিত থাকিলে এ কথা বলিতে আপনি সাহস করিতেন না। আমাকে অসহায় পাইয়া এইরূপ বলিতেছেন। কিন্তু জানিবেন, ধর্ম্মই আমার সহায়, ধর্ম্মই আমাকে রক্ষা করিবেন।

প্রকাশ। আমার ধর্ম্ম নাই। ধর্ম্মকে আমি রক্ষা করি নাই, ধর্ম্মও আমাকে রক্ষা করিবে না। পশুর আবার ধর্ম্ম কি?

নির্ম্মলা! আপনি কি করিতে চাহেন?

প্রকাশ। কি করিব—বলিতে পারি না। আমি উন্মত্ত। কেন এ রূপের রাশি আমার চক্ষের সমক্ষে প্রকাশিত হইয়াছিল? কেন তুমি তোমার ঐ অতুল্য রূপ, ঐ লাবণ্যমণ্ডিত হাস্যপ্রদীপ্ত অপূর্ব্ব মুখমণ্ডল আমাকে দেখাইয়াছিলে? কেন তুমি তোমার ঐ বীণা-নিন্দিত কণ্ঠস্বরে, অপ্সরাগীতিবৎ সুধাবচনে আমায় সম্ভাষণ করিয়াছিলে? তাহা না হইলে ত এ আগুন জ্বলিত না, হৃদয়ে এ তুফান উঠিত না, বন্ধুত্বের পবিত্র নামে এ মহাপাপের অনুষ্ঠান হইত না! যাহা হইবার হইয়াছে, আমি মরিতে বসিয়াছি—একবার বল—আমি দীন, দীনের এ পূজা কি দেবতার অগ্রাহ্য হইবে?

প্রকাশচন্দ্র সহসা নির্ম্মলার চরণ স্পর্শ করিলেন। নির্ম্মলা শিহরিয়া উঠিলেন, বলিলেন—"জানিলাম, আপনার মত মহাপাপী আর নাই। আপনি কোন্ সাহসে আমাকে স্পর্শ করিলেন? আপনার স্পর্শে আমি কলঙ্কিত হইয়াছি।"

প্রকাশ। আর না, এই যানেই আমার পরীক্ষার সমাপ্তি।

নির্ম্মলা চাহিয়া রহিলেন। প্রকাশচন্দ্র বলিতে লাগিলেন,—"তবে শুন; মূর্খ অমরনাথ এই সর্ব্বনাশের মূল। তোমার প্রেমের পরীক্ষা-গ্রহণই তাহার উদ্দেশ্য। প্রলোভনের মধ্যে পড়িয়াও তোমার প্রেম অবিকৃত ও বিশুদ্ধ থাকে কিনা, তাহাই সে দেখিতে চাহে। সেই জন্যই এই অনুষ্ঠান। আমিও মূর্খ, নহিলে এ অনুষ্ঠানে কি ব্রতী হই? কিন্তু তোমার কাছে লুকাইব না, আমি যথার্থ মহাপাপী, আমার চিত্ত অবশ, আমি কি করিতে বসিয়াছি, তাহা জানি এবং শীঘ্রই ইহার প্রায়শ্চিত্ত করিব। জানিলাম, তুমি মহা-মহিমময়ী, তোমার প্রতাপ অসীম, তোমার গৌরবে—সতীর মাহাত্ম্যে জগৎ পুণ্যতীর্থ। যাও সতি! সতীত্বের গৌরবে সংসার পুণ্যময় কর, যে চিতা আমি আপনার বুকে সাজাইয়াছি, তাহাতেই আমি দগ্ধ হইব, যদি ও-করুণ-নয়ন হইতে দুই বিন্দু অশ্রুপাত হয়, তবে সে চিতা ভস্ম নির্ব্বাপিত হইবে!"

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

নির্ম্মলার চক্ষে অশ্রু বহিল। তাঁহার স্বামী তাঁহার প্রেমের পরীক্ষার জন্য এই চাতুর্য্য অবলম্বন করিয়াছিলেন! সহসা সে কথা বিশ্বাস করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না। এত প্রেম, এত ভালবাসা,—ইহাতেও সন্দেহ? যে স্বামী ভিন্ন আর কিছুই জানে না, স্বামি-চিন্তা ভিন্ন অন্য চিন্তা যাহার নাই, তাহার প্রেমের উপর বিশ্বাস নাই? নির্ম্মলা সেই কথা ভাবিতে ভাবিতে অভিমানে ও দুঃখে মরমে মরিয়া গেলেন। তার পর কিনা সেই প্রেমের পরীক্ষার জন্য এই জঘন্য, অতি নীচ উপায় অবলম্বন!—আ ছিঃ ছিঃ! নির্ম্মলার স্বামীর কি এই উচিত হইয়াছে? ভাবিতে ভাবিতে সে প্রেম-প্রবণ হৃদয়ে দারুণ অভিমান ও দুঃখের আগুন জ্বলিয়া উঠিল, সেই আগুনে হৃদয় দ্রবীভূত হইয়া নয়নে প্রকাশিত হইল। নির্ম্মলা আকুল প্রাণে কাঁদিতে লাগিলেন।

পার্ব্বতী আসিয়া সকল শুনিল। সে ইতিপূর্ব্বে কিছু কিছু বুঝিয়াছিল। দুষ্টা রমণী প্রতিবাসীর গৃহে গৃহে এই কাহিনী অতিরঞ্জিত করিয়া বর্ণনা করিয়াছিল, লোক নিন্দায় চারি দিক্ পূর্ণ হইল। নির্ম্মলা সে সকল শুনিলেন। অশ্রুপূর্ণ-নয়নে, করজোড়ে দেবতাকে ডাকিয়া বলিতে লাগিলেন,—"হে ধর্ম্ম! তুমি সাক্ষী, আমি নিরপরাধিনী! স্বামী ভিন্ন আমি কিছুই জানি না, স্বামিচিন্তা ভিন্ন অন্য চিন্তা আমার

মনে স্থান পায় নাই। যদি একদিনের জন্যও আমার চিত্ত অবশ হইয়া থাকে, তবে হে দেবতা! এখনই আমার মস্তকে বজ্রপাত কর! যেন জন্ম-জন্মান্তরেও আমি সুখী না হই, যেন নরকেও আমার স্থান না হয়!"

পার্ব্বতী। তা মা! কাঁদিয়া কি করিবে? কাঁদিলেই কি লোক-নিন্দা হইতে নিষ্কৃতি পাইবে? তা এ সকলের মূলে বাবুর দোষ, তিনি এমন না করিলে ত এত হইত না।

নির্ম্মলা। না পার্ব্বতি! দোষ তাঁহার নহে। তুমি তাঁহার নিন্দা করিও না। আমার অদৃষ্টে এইরূপ ছিল। তাঁহার এত গুণ, নিশ্চয়ই আমার অদৃষ্টদোষে আমি এই মনস্তাপ পাইলাম। হায়! কেন আমি ইহা পূর্ব্বে বুঝিলাম না? কেন আমি আপনা খাইয়া তাঁহাকে খাইতে দিলাম?—তুমি একবার যদি বলিতে, "আমি তোমার প্রেমের পরীক্ষা চাই"—আমিই তোমাকে এ পরীক্ষা দিতাম! কেন তুমি ভীষণ দারিদ্র্যের মধ্যে ফেলিয়া দেখিলে না? কেন তুমি অতি দুর্ব্যবহার করিয়া দেখিলে না? কেন তুমি সঙ্গে করিয়া হিংস্র-জন্তু-পূর্ণ অরণ্যে লইয়া গেলে না? ব্যাঘ্রের মুখে ফেলিয়া দিয়া, পুনর্ব্বার উদ্ধার করিয়া দেখিলে না কেন? আমার শত সাধ, শত আশায় ছাই দিয়া কেন দেখিলে না? হায় প্রভু! আমি যে তোমা ভিন্ন আর কিছুই জানি নাই, আমার এ ক্ষুদ্র বুকে যত প্রেম, সে সবই ত তোমায় দিয়াছি, তাহাতেও কি তোমার মন উঠিল না? একবার আসিয়া দেখিয়া যাও, আমার দুরদৃষ্টে বিধাতা কি দুঃখ লিখিয়াছেন!

পার্ব্বতী। কিসের দুঃখ মা? তুমি কাঁদিও না। বাবু আসিলেই সব চুপ-চাপ হইয়া যাইবে।

নির্ম্মলা। পার্ব্বতি! আমার এ যে কি দুঃখ, তাহা তুই বুঝিবি না। পৃথিবীতে আমার যদি কিছু চিন্তা থাকে, ত সে স্বামীর চিন্তা; যদি কিছু সুখ থাকে ত সে স্বামী; পতি ভিন্ন স্ত্রীলোকের আর আছে কি? পতি-দেবতার চরণে এ দেহ-মন বিকাইয়াই আমি নারী-জীবন সার্থক করিয়াছি, সে দেবতা আমায় চরণে ঠেলিলেন না; কিন্তু আমার কুগ্রহের ফলে আমি আমার সে স্বর্গ হইতে স্থানভ্রষ্ট হইলাম!

পার্ব্বতী। কি জানি মা! কখন স্বামী জানি নাই, স্বামীর মর্ম্মও বুঝি নাই।

নির্ম্মলা। কি কলঙ্কের কথা! চারি দিকেই লোক-নিন্দা! হে নাথ! তুমি একবার এস, এ কলঙ্ক হইতে আমায় উদ্ধার কর। তুমি চরণে স্থান না দিলে এ কলঙ্ক হইতে আমার উদ্ধার নাই।—পার্ব্বতি! যখন তিনি আসিয়া এই সকল শুনিবেন, কি মনে করিবেন? আমার কথায় কি বিশ্বাস করিবেন না?

পার্ব্বতী। কি জানি মা! পুরুষের মন বুঝিবার যো নাই। গ্রামশুদ্ধ লোক যেরূপ হাসি-তামাসা করিতেছে, তাহাতে তিনি কি আর মুখ দেখাইতে পারিবেন? তবে তিনি তোমায় ভালবাসেন, লোকের কথায় কি আর তোমায় ছাড়িবেন?

নির্ম্মলা। তুমি কি বলিতে চাও; আমার জন্য তিনি লোকের কাছে মুখ দেখাইতে পারিবেন না, তবু আমি তাঁহাকে ছাড়িব না? তা হইবে না। পার্ব্বতি! সতীত্বের বাড়া ধর্ম্ম নাই। যে নারীর সতীত্ব নাই, সে শূকরীরও অধমা। সতীত্বের গৌরবেই নারীর গৌরব। যে তাহাতে কলঙ্ক কিনিল, তাহার আর রহিল কি? ধর্ম্ম জানেন, আমি সতী কি অসতী। কিন্তু পার্ব্বতি! যখন এ কলঙ্ক রটিয়াছে, আমার সতী নাম ডুবিয়াছে, আমি এ কলঙ্কে আর আমার স্বামীকে স্পর্শ করিব না।

পার্ব্বতী। এত আমরা জানি না মা!

পাপ পুণ্যি ও সব ভদ্রস্বরের, আমরা তার কি বুঝিব? যদি বাবুকে আর না চাও, তবে কোথায় যাইবে?

নির্ম্মলা। আর যাব কোথায়? স্বামীই গতি, স্বামীই আশ্রয়। সে আশ্রয় ছাড়িয়া কোথায় যাইব?

নির্ম্মলা কাঁদিতে লাগিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—"শোন্ পার্ব্বতি! আমার বুক ফাটিয়া যাইতেছে। আর বুঝি আমি বাঁচিব না। আমার দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে। যদি তিনি আসিয়া লোকের কথায় বিশ্বাস করেন?"

পার্ব্বতী। সেটী হইবে না। আমি এমন মেয়ে আর কোথাও দেখি নাই, বাপ্‌রে স্বামী ব'লে এত ভক্তি, এত ভালবাসা আর কোথাও দেখি নাই। তোমার কথায় বিশ্বাস না করিয়া লোকের কথায় বিশ্বাস করিবে? বাবু আমার এমন পাষণ্ড নহেন।

নির্ম্মলা। পার্ব্বতি! তিনি বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, আমি এ মুখ আর তাঁহাকে দেখাইব না। আমায় তিনি অবিশ্বাস করিয়াছেন, আমার প্রেমের পরীক্ষার জন্যই তিনি এই কলঙ্ক কিনিয়াছেন। আমি বাঁচিয়া থাকিলে, তিনি আরও কলঙ্কী হইবেন, বাহিরে তিনি মুখ দেখাইতে পারিবেন না। আমি জানি, তিনি মহৎ; তাঁহার হৃদয়ে অসাধারণ গুণ। আমায় তিনি চরণে ঠেলিবেন না, তাহা জানি, তবু তাঁহার মঙ্গলের জন্য আমার মরা ভাল।

পার্ব্বতী। ও কি কথা মা! ছিঃ ও কথা বলিতে নাই। আত্ম-হত্যা মহাপাপ!

নির্ম্মলা। তা জানি মা! তবু এ জীবন অপেক্ষা মৃত্যু ভাল। চির-জীবন লোকের উপহাসের পাত্রী থাকা কি ভাল? যদি আমার কন্যা হয়, অসতীর কন্যা বলিয়া তাহার বিবাহ হইবে না। বল্ মা! তাহাই দেখিতে কি বাঁচিব? যদি কখন পুত্র হয়, সকলে তাহার মাতার নিন্দা করিবে, বাছা লজ্জায় মরিয়া যাইবে,—বল্ মা! তাহাই দেখিবার জন্য কি বাঁচিব?

পার্ব্বতী। তার চেয়ে মরা ভাল।

নির্ম্মলা। আরও দেখ, যাহার জন্য সংসার, যাহার আদরে আদরিণী, যাহার জন্যই সব, যদি তাহারই কলঙ্ক রটিল, বল্ মা! আমার জীবন লইয়া কি করিব? আমি মরিলে আমার সঙ্গে কলঙ্ক-আঁধার চলিয়া যাইবে।

পার্ব্বতীর বুকটা কেমন করিয়া উঠিল। যৌবনের নদীতে ভাটা ধরিয়াছে, তবু এখনও তাহার নেশা টুটে নাই। আজ নির্ম্মলার এই কথা গুলার মধ্যে কি ছিল কে জানে, কিন্তু তাহার বুকে বিঁধিল! সেও যেন তাহার জীবনে বড় কলঙ্কের ছায়া দেখিল! নির্ম্মলা সতী, কলঙ্ক তাহার লোক-রচনা মাত্র; কিন্তু পার্ব্বতী অসতী।

সে হৃদয়ের অবস্থা বুঝাইয়া কাজ নাই। বিস্ময়ের কথা কিছুই নাই, একই পথে চির-প্রবহমাণা স্রোতস্বতী একদিনেই তাহার গতি অন্যত্র ফিরাইতে পারে। পার্ব্বতী আপনার অবস্থা ভাবিয়া সহসা বলিয়া উঠিল,—"এর চেয়ে মৃত্যু ভাল।"

উভয়েই স্ত্রীজাতি, উভয়ের সিদ্ধান্ত এইরূপ এক হইল।

নির্ম্মলার চক্ষের জল থামে না। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন,—"মরিব পার্ব্বতি! কিন্তু একটীবার তাঁহাকে দেখিয়া যাইতে সাধ হয়, একবার তাঁহার কাছে শুনিয়া যাইতে সাধ হয়, আমার প্রেমের পরীক্ষায় তিনি সন্তুষ্ট হইয়াছেন কি না। আর একটা কথা শুনিব। লোক নিন্দা যেরূপ উঠিয়াছে, তিনি তাহাতে অবিশ্বাস করিয়া, হাসিমুখে আবার আমায় সম্ভাষণ করিবেন,—তাহাই শুনিতে ইচ্ছা করে।

মনে স্থান পায় নাই। যদি একদিনের জন্যও আমার চিত্ত অবশ হইয়া থাকে, তবে হে দেবতা! এখনই আমার মস্তকে বজ্রপাত কর! যেন জন্ম-জন্মান্তরেও আমি সুখী না হই, যেন নরকেও আমার স্থান না হয়!"

পার্ব্বতী। তা মা! কাঁদিয়া কি করিবে? কাঁদিলেই কি লোক-নিন্দা হইতে নিষ্কৃতি পাইবে? তা এ সকলের মূলে বাবুর দোষ, তিনি এমন না করিলে ত এত হইত না।

নির্ম্মলা। না পার্ব্বতি! দোষ তাঁহার নহে। তুমি তাঁহার নিন্দা করিও না। আমার অদৃষ্টে এইরূপ ছিল। তাঁহার এত গুণ, নিশ্চয়ই আমার অদৃষ্টদোষে আমি এই মনস্তাপ পাইলাম। হায়! কেন আমি ইহা পূর্ব্বে বুঝিলাম না? কেন আমি আপনা খাইয়া তাঁহাকে খাইতে দিলাম?—তুমি একবার যদি বলিতে, "আমি তোমার প্রেমের পরীক্ষা চাই"—আমিই তোমাকে এ পরীক্ষা দিতাম! কেন তুমি ভীষণ দারিদ্র্যের মধ্যে ফেলিয়া দেখিলে না? কেন তুমি অতি দুর্ব্যবহার করিয়া দেখিলে না? কেন তুমি সঙ্গে করিয়া হিংস্র-জন্তু-পূর্ণ অরণ্যে লইয়া গেলে না? ব্যাঘ্রের মুখে ফেলিয়া দিয়া, পুনর্ব্বার উদ্ধার করিয়া দেখিলে না কেন? আমার শত সাধ, শত আশায় ছাই দিয়া কেন দেখিলে না? হায় প্রভু! আমি যে তোমা ভিন্ন আর কিছুই জানি নাই, আমার এ ক্ষুদ্র বুকে যত প্রেম, সে সবই ত তোমায় দিয়াছি, তাহাতেও কি তোমার মন উঠিল না? একবার আসিয়া দেখিয়া যাও, আমার দুরদৃষ্টে বিধাতা কি দুঃখ লিখিয়াছেন!

পার্ব্বতী। কিসের দুঃখ মা? তুমি কাঁদিও না। বাবু আসিলেই সব চুপ-চাপ হইয়া যাইবে।

নির্ম্মলা। পার্ব্বতি! আমার এ যে কি দুঃখ, তাহা তুই বুঝিবি না। পৃথিবীতে আমার যদি কিছু চিন্তা থাকে, ত সে স্বামীর চিন্তা; যদি কিছু সুখ থাকে ত সে স্বামী; পতি ভিন্ন স্ত্রীলোকের আর আছে কি? পতি-দেবতার চরণে এ দেহ-মন বিকাইয়াই আমি নারী-জীবন সার্থক করিয়াছি, সে দেবতা আমায় চরণে ঠেলিলেন না; কিন্তু আমার কুগ্রহের ফলে আমি আমার সে স্বর্গ হইতে স্থানভ্রষ্ট হইলাম!

পার্ব্বতী। কি জানি মা! কখন স্বামী জানি নাই, স্বামীর মর্ম্মও বুঝি নাই।

নির্ম্মলা। কি কলঙ্কের কথা! চারি দিকেই লোক-নিন্দা! হে নাথ! তুমি একবার এস, এ কলঙ্ক হইতে আমায় উদ্ধার কর। তুমি চরণে স্থান না দিলে এ কলঙ্ক হইতে আমার উদ্ধার নাই।—পার্ব্বতি! যখন তিনি আসিয়া এই সকল শুনিবেন, কি মনে করিবেন? আমার কথায় কি বিশ্বাস করিবেন না?

পার্ব্বতী। কি জানি মা! পুরুষের মন বুঝিবার যো নাই। গ্রামশুদ্ধ লোক যেরূপ হাসি-তামাসা করিতেছে, তাহাতে তিনি কি আর মুখ দেখাইতে পারিবেন? তবে তিনি তোমায় ভালবাসেন, লোকের কথায় কি আর তোমায় ছাড়িবেন?

নির্ম্মলা। তুমি কি বলিতে চাও; আমার জন্য তিনি লোকের কাছে মুখ দেখাইতে পারিবেন না, তবু আমি তাঁহাকে ছাড়িব না? তা হইবে না। পার্ব্বতি! সতীত্বের বাড়া ধর্ম্ম নাই। যে নারীর সতীত্ব নাই, সে শূকরীরও অধমা। সতীত্বের গৌরবেই নারীর গৌরব। যে তাহাতে কলঙ্ক কিনিল, তাহার আর রহিল কি? ধর্ম্ম জানেন, আমি সতী কি অসতী। কিন্তু পার্ব্বতি! যখন এ কলঙ্ক রটিয়াছে, আমার সতী নাম ডুবিয়াছে, আমি এ কলঙ্কে আর আমার স্বামীকে স্পর্শ করিব না।

পার্ব্বতী। এত আমরা জানি না মা! পাপ পুণ্যি ও সব ভদ্রঘরের, আমরা তার কি বুঝিব? যদি বাবুকে আর না চাও, তবে কোথায় যাইবে?

নির্ম্মলা। আর যাব কোথায়? স্বামীই গতি, স্বামীই আশ্রয়। সে আশ্রয় ছাড়িয়া কোথায় যাইব?

নির্ম্মলা কাঁদিতে লাগিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—"শোন্ পার্ব্বতি! আমার বুক ফাটিয়া যাইতেছে। আর বুঝি আমি বাঁচিব না। আমার দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে। যদি তিনি আসিয়া লোকের কথায় বিশ্বাস করেন?"

পার্ব্বতী। সেটী হইবে না। আমি এমন মেয়ে আর কোথাও দেখি নাই, বাপ্‌রে স্বামী ব'লে এত ভক্তি, এত ভালবাসা আর কোথাও দেখি নাই। তোমার কথায় বিশ্বাস না করিয়া লোকের কথায় বিশ্বাস করিবে? বাবু আমার এমন পাষণ্ড নহেন।

নির্ম্মলা। পার্ব্বতি! তিনি বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, আমি এ মুখ আর তাঁহাকে দেখাইব না। আমায় তিনি অবিশ্বাস করিয়াছেন, আমার প্রেমের পরীক্ষার জন্যই তিনি এই কলঙ্ক কিনিয়াছেন। আমি বাঁচিয়া থাকিলে, তিনি আরও কলঙ্কী হইবেন, বাহিরে তিনি মুখ দেখাইতে পারিবেন না। আমি জানি, তিনি মহৎ; তাঁহার হৃদয়ে অসাধারণ গুণ। আমায় তিনি চরণে ঠেলিবেন না, তাহা জানি, তবু তাঁহার মঙ্গলের জন্য আমার মরা ভাল।

পার্ব্বতী। ও কি কথা মা! ছিঃ ও কথা বলিতে নাই। আত্ম-হত্যা মহাপাপ!

নির্ম্মলা। তা জানি মা! তবু এ জীবন অপেক্ষা মৃত্যু ভাল। চির-জীবন লোকের উপহাসের পাত্রী থাকা কি ভাল? যদি আমার কন্যা হয়, অসতীর কন্যা বলিয়া তাহার বিবাহ হইবে না। বল্ মা! তাহাই দেখিতে কি বাঁচিব? যদি কখন পুত্র হয়, সকলে তাহার মাতার নিন্দা করিবে, বাছা লজ্জায় মরিয়া যাইবে,—বল্ মা! তাহাই দেখিবার জন্য কি বাঁচিব?

পার্ব্বতী। তার চেয়ে মরা ভাল।

নির্ম্মলা। আরও দেখ্, যাহার জন্য সংসার, যাহার আদরে আদরিণী, যাহার জন্যই সব, যদি তাহারই কলঙ্ক রটিল, বল্ মা! আমার জীবন লইয়া কি করিব? আমি মরিলে আমার সঙ্গে কলঙ্ক-আঁধার চলিয়া যাইবে।

পার্ব্বতীর বুকটা কেমন করিয়া উঠিল! যৌবনের মদাস্তে ভাটা ধরিয়াছে, তবু এখনও তাহার নেশা টুটে নাই। আজ নির্ম্মলার এই কথা গুলার মধ্যে কি ছিল কে জানে, কিন্তু তাহার বুকে বিঁধিল! সেও যেন তাহার জীবনে বড় কলঙ্কের ছায়া দেখিল! নির্ম্মলা সতী, কলঙ্ক তাহার লোক-রচনা মাত্র; কিন্তু পার্ব্বতী অসতী।

সে হৃদয়ের অবস্থা বুঝাইয়া কাজ নাই। বিস্ময়ের কথা কিছুই নাই, একই পথে চির-প্রবহমাণা স্রোতস্বতী একদিনেই তাহার গতি অন্যত্র ফিরাইতে পারে। পার্ব্বতী আপনার অবস্থা ভাবিয়া সহসা বলিয়া উঠিল,—"এর চেয়ে মৃত্যু ভাল।"

উভয়েই স্ত্রীজাতি, উভয়ের সিদ্ধান্ত এইরূপ এক হইল।

নির্ম্মলার চক্ষের জল থামে না। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন,—"মরিব পার্ব্বতি! কিন্তু একটীবার তাঁহাকে দেখিয়া যাইতে সাধ হয়, একবার তাঁহার কাছে শুনিয়া যাইতে সাধ হয়, আমার প্রেমের পরীক্ষায় তিনি সন্তুষ্ট হইয়াছেন কি না। আর একটা কথা শুনিব। লোক নিন্দা যেরূপ উঠিয়াছে, তিনি তাহাতে অবিশ্বাস করিয়া, হাসিমুখে আবার আমায় সম্ভাষণ করিবেন,—তাহাই শুনিতে ইচ্ছা করে।

উপস্থিত করিতে পারেন, তবে তাহা দেখিয়া আমরা হর্ষিতই হই আর বিমর্ষই হই, সকলেই বোধ হয়, সেই আলেখ্যের আদর করিয়া থাকেন। হাজিপুর সেই আলেখ্য-বিশেষ। ইহাতে হিন্দু, মুসলমান ও ইংরেজ রাজত্বের আভাস যেন বর্ণাকারে প্রতিবিম্বিত হইয়া আছে, প্রাচীন ও আধুনিক কালের বিসদৃশ অবস্থা গুলি যেন অস্ফুটভাবে ভাবুকের মনোমধ্যে প্রকাশিত করিয়া দিতেছে। সুতরাং মোকদ্দমার ডিক্রি-ডিস্‌মিস্, বিদ্যার্থীর বিদ্যাভ্যাস, মদ্যপের মত্ততা, এই সকল দেখিয়া ভ্রমণকারীর সুখোদয় না হইলেও জামী-মশ্‌জিদের স্থপতিবিদ্যা, নেপালি-মন্দিরের কারুকার্য্য, প্রাচীন দুর্গের ভগ্নাবশেষ, পাঁচপাহাড়ী রঙ্গমহল সংসৃষ্ট ঘটনাবলী ইত্যাদির দর্শন ও আলোচনা দ্বারা তৃপ্তিলাভ হইতে পারে।

হাজিপুর এখন মুজঃফরপুর জিলার অন্তর্গত হইয়াছে, কিন্তু পূর্ব্বে উক্ত নামে কোন জিলা ছিল না; তখন জিলার নাম তীরহুত ছিল। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি হইতে তীরহুত জিলা দ্বিভাগে বিভক্ত করিয়া মুজঃফরপুর, হাজিপুর ও সীতামঢ়ী এই তিন মহকুমা দ্বারা মুজঃফরপুর জিলা এবং দারভাঙ্গা, মধুবনী ও তাজপুর এই তিন মহকুমা দ্বারা দারভাঙ্গা জিলা গঠিত হইয়াছে। ইংরেজ-রাজত্বে হাজিপুর তীরহুত-জিলা-ভুক্ত হইলেও মুসলমানের শাসনকালে তাহা ছিল না। আকবর বাদশাহের সময় হইতেই সুবে-বিহার গঙ্গার দক্ষিণে বিহার, মুঙ্গের, রোহতস্ ও শাহাবাদ এই চারি সরকারে এবং গঙ্গার উত্তরে তীরহুত, হাজিপুর, শারণ ও চম্পারণ এই চারি সরকারে বিভক্ত ছিল। এক্ষণে হাজিপুর সব্‌ডিভিজনের এলাকার ক্ষেত্রফল ৬৬২ বর্গ মাইল হইলেও তৎকালের সরকার-হাজিপুরের পরিমাণ-ফল ২,৭৮২ বর্গ মাইল হইবে। প্রখ্যাতনামা রাজস্বসচিব রাজা তোড়লমল্ল এই হাজিপুরে অবস্থিতি করিয়াই বাঙ্গালা ও বিহার প্রদেশের জরিপ সম্পর্কীয় সমস্ত কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিয়াছিলেন। * খৃঃ ১৫৮২ অব্দে রাজা তোড়লমল্ল নর্ম্মদা নদীর উত্তরবর্ত্তী সমগ্র হিন্দুস্থানের "আসল-জমা-তুমারি-রখবা" নামক যে রাজস্বের বন্দোবস্ত করেন, সেই বন্দোবস্ত অবলম্বন করিয়া সুবে-বিহারে আরও তিনবার বন্দোবস্ত হয়। ঔরঙ্গজেব-আলমগীর-বাদশাহের রাজত্বকালে খৃঃ ১৬৮৫ অব্দে একবার; আহম্মদশাহের দিল্লীর সিংহাসনে অধিরোহণানন্তর আলীবর্দ্দি-খাঁর সুবাদারি সময়ে মহারাজ জানকীরাম সোম সুবে-বিহারের নায়েব-নাজীম হইয়া খৃঃ ১৭৫০ অব্দে একবার; এবং সর্ব্বশেষ খৃঃ ১৭৬৫ অব্দে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানী আলী-গৌহর-শাহ-আলম-বাদশাহের সনন্দপত্র অনুসারে সুবে-বাঙ্গালার দেওয়ানি প্রাপ্ত হইয়া মহম্মদ-রেজা-খাঁ দ্বারা একবার রাজস্বের বন্দোবস্ত করেন। সরকার-হাজিপুরের জমাবন্দি ১৫৮২ অব্দে ৬,৮৩,২৭৬ টাকা, ১৬৮৫ অব্দে ১০,২৯,৩০৯ টাকা, ১৭৫০ অব্দে ৮,২৮,১০০ টাকা এবং ১৭৬৫ অব্দে ৫,৪২,২৪০ টাকা নির্দ্দিষ্ট হয়। এই সরকার একাদশ পরগণায় বিভক্ত ছিল। বাদশাহের আমলে প্রধান রাজকর্ম্মচারীদিগের বেতন জায়গীর ভূমি দ্বারা প্রদত্ত হইত। এইরূপ জায়গীর বাদে যে ভূমির রাজস্ব রাজকোষে জমা হইত, তাহা খালশা নামে উক্ত হইত। খৃঃ ১৭৫০ অব্দের বন্দোবস্ত পর্য্যন্ত সরকার-হাজিপুর সম্পূর্ণ খালশার অধীন ছিল। তৎপর ১৭৬৫ খৃঃ অব্দের বন্দোবস্তের সময় ইহার অন্তর্গত নয়পুর পরগণা ধর্ম্মনারায়ণের জমিদারি ও মহেন্দ্রনারায়ণ কানুনগুর জায়গীর ভুক্ত করা হয়। নয়পুর পরগণার

* "জামাও-অৎ-তোয়ারিখ হিন্দুস্থান" নামক গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

মালগুজারি ২,৮৫,৮৬০ টাকা নির্দ্দিষ্ট ছিল; তন্মধ্যে কানুনগু মহেন্দ্রনারায়ণ জায়গীর স্বরূপ ২,৪৪,৩৬১ টাকা এবং জমিদার-ধর্ম্মনারায়ণ মস্করৎ প্রভৃতি বাবদ ৪১,৪৯৯ টাকা মালগুজারির তালুক প্রাপ্ত হন। ১৭৬৫ খৃঃ অব্দের জমাবন্দি ৫,৪২,২৪০ টাকার সহিত জায়গীর ও মস্করৎ বাবদ প্রদত্ত নয়পুর পরগণার মালগুজারি ২,৮৫,৮৬০ টাকা যোগ করিলে দেখা যায় যে, রেজাখাঁর বন্দোবস্ত দ্বারা জমার ন্যূনাধিক্য কিছুই হয় নাই। জানকীরাম ও রেজাখাঁর বন্দোবস্তের জমাবন্দি নিম্নে প্রদত্ত হইল;—

	১৭৫১অব্দের বন্দোবস্ত	১৭৬৫অব্দে রেজা খাঁর বন্দোবস্ত
(১) পরগণা হাভেলি হাজিপুর,—হরধন সিংহ প্রভৃতি ব্রাহ্মণের জমিদারি ...	১৫,০০০,	১,০৪,৪৬০,
(২) পরগণা সরেশা *—		
ব্রাহ্মণ সরিৎ সিংহের জমিদারি	২,২৬,০২২,	৫০,১৪৬,
(৩) পরগণা বিশারা,—		
রজপুত নাগর সিংহের জমিদারি	২,০০,০০০,	২,৮৩,৬০৭
(৪,৫) পরগণা রতি † ও গরহত,—ব্রাহ্মণ প্রভাস সিংহ প্রভৃতির জমিদারি ...	৭৭,৬৫২,	৩৪,০২৭,
(৬—১০) পরগণা মুলকী, বালাগাছ, ভুগারি, আমাদপুর ও আকবরপুর-রাণী,—ব্রাহ্মণ হরলাল প্রভৃতির জমিদারি	১,৮২,৭৭০,	৭০,০০০,
(১১) পরগণা নয়পুর,—ধর্ম্মনারায়ণের জমিদারি ও মহেন্দ্রনারায়ণের জায়গীর ...	৪৬,৬৫৬,	———
মোট	৮,২৮,১০১,	৫,২৪,২৪০,

* সরেশা পরগণা সম্প্রতি দারভাঙ্গা জিলার অন্তঃপাতী তাজপুর মহকুমার মধ্যগত। বহুদিন হইতেই এই স্থানের উৎপন্ন তামাক অতি উৎকৃষ্ট বলিয়া প্রসিদ্ধ।

† অধুনা এই পরগণা মধ্যস্থিত বখরা নামক গণ্ডগ্রামে রায় গুদর সহায়, রায়-কার্ত্তিকসহায় ও রায়-দুর্গাসহায় নামে প্রসিদ্ধ জমিদারদিগের বাস। ইহাঁরা সুবে-বিহারের সদর-কানুনগুর বংশধর।

সরকার-হাজিপুরের পরগণাগুলির অধিকাংশই মুঙ্গের এবং মুজঃফরপুর জিলা ও তাজপুর প্রভৃতি মহকুমার এলাকা মধ্যে নিবেশিত হওয়াতে বর্ত্তমান সময়ে উহার আয়তন অপেক্ষাকৃত অধিক ক্ষুদ্র হইয়াছে।

হাজিপুর ইদানীং মহকুমায় পরিণত হইয়াছে; মুসলমান-রাজত্বকালে ইহা একটী সরকার (জিলা) ছিল; কিন্তু হিন্দু-রাজত্বকালে ইহা বিশালাপুরী বা বিশালছত্র নামে সমৃদ্ধিশালী রাজ্য ছিল। বাল্মীকির রামায়ণপাঠে জানা যায় যে, রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ মহর্ষি বিশ্বামিত্রের যজ্ঞসমাপনান্তে সিদ্ধাশ্রম হইতে যাত্রা করিয়া বর্ত্তমান পাটনানগরীর সমীপস্থ কোনও স্থানে গঙ্গাপার হইয়াই বিশালপুরীতে উপস্থিত হন। তথায় তাঁহারা বিশালারাজ সুমতির * সাদর অভ্যর্থনায় পরম পরিতুষ্ট হইয় সেই রাত্রি যাপন করেন এবং তৎপরদিন রাজর্ষি-জনক-সীর-

* বিশালারাজ সুমতির পূর্ব্বপুরুষের বিবরণ রামায়ণে এইরূপ প্রদত্ত হইয়াছে,—

"দিতিং যত্র তপঃসিদ্ধামেষং পরিচচার সঃ।
ইক্ষ্বাকোস্তু নরব্যাঘ্র পুত্রঃ পরমধার্ম্মিকঃ॥ ১১
অলম্বুষায়ামুৎপন্নো বিশাল ইতি বিশ্রুতঃ।
তেন চালীদিহ স্থানে বিশালেতি পুরী কৃতা॥ ১২
বিশালস্য সুতো রাম হেমচন্দ্রো মহাবলঃ।
সুচন্দ্র ইতি বিখ্যাতো হেমচন্দ্রাদনন্তরম্॥ ১৩
সুচন্দ্রতনয়ো রাম ধূম্রাশ্ব ইতি বিশ্রুতঃ।
ধূম্রাশ্বতনয়শ্চাপি সৃঞ্জয়ঃ সমপদ্যত॥ ১৪
সৃঞ্জয়স্য সুতঃ শ্রীমান্ সহদেবঃ প্রতাপবান্।
কুশাশ্বঃ সহদেবস্য পুত্রঃ পরমধার্ম্মিকঃ॥ ১৫
কুশাশ্বস্য মহাতেজাঃ সোমদত্তঃ প্রতাপবান্।
সোমদত্তস্য পুত্রস্তু কাকুৎস্থ ইতি বিশ্রুতঃ॥ ১৬
তস্য পুত্রো মহাতেজাঃ সম্প্রত্যেষ পুরীমিমাম্।
অবসৎ পরমপ্রখ্যঃ সুমতির্নাম দুর্জ্জয়ঃ॥ ১৭
ইক্ষ্বাকোস্তু প্রসাদেন সর্ব্বে বৈশালিকা নৃপাঃ।
দীর্ঘায়ুষো মহাত্মানো বীর্য্যবন্তঃ সুধার্ম্মিকাঃ॥ ১৯
——বালকাণ্ড, ৪৭ সর্গ।

ধ্বজের যজ্ঞসন্দর্শনার্থ মিথিলায় যাইয়া উপস্থিত হন *।

বাল্মীকি-রামায়ণে লেখা আছে,—

"গতা ভগবতী রাত্রিঃ শ্রোতব্যং পরমদ্ভুতম্।
তরাম সরিতাং শ্রেষ্ঠাং পুণ্যাং ত্রিপথগাং নদীম্
নৌরেষা হি সুখাস্তীর্ণা ঋষীণাং পুণ্যকর্ম্মণাম্।
ভগবন্তমিহ প্রাপ্তং জ্ঞাত্বা ত্বরিতমাগতা॥
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা রাঘবস্য মহাত্মনঃ।
সন্তারং কারয়ামাস সর্ষিসঙ্ঘস্য কৌশিকঃ॥
উত্তরং তীরমাসাদ্য সংপূজ্যর্ষিগণং ততঃ।
গঙ্গাকূলে নিবিষ্টাস্তে বিশালাং দদৃশুঃ পুরীম্॥

বালকাণ্ড, ৪৫ সর্গ।

পুনশ্চ,—

"ইহাদ্য রজনীমেকাং সুখং স্বপ্স্যামহে বয়ম্।
স্বঃ প্রভাতে নরশ্রেষ্ঠ জনকং দ্রষ্টুমর্হসি॥

বালকাণ্ড, ৪৭ সর্গ।

হাজিপুর নগরের পশ্চিম প্রান্তে কোনও মন্দিরে রামচন্দ্রজীর বিগ্রহ স্থাপিত আছে। তত্রত্য সাধারণের এইরূপ ধারণা যে, বিশালছত্রে আগমন করিয়া শ্রীরামচন্দ্র (ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও মহর্ষি বিশ্বামিত্র সহ) উক্ত মন্দির যে স্থলে নির্ম্মিত হইয়াছে, সেই স্থলেই পর্ণকুটীর রচনা করিয়া রাত্রিযাপন করেন। এই বিশালাপুরী রাজ্যই মুসলমানদিগের সরকার-হাজিপুর। হাজিপুর সহরের প্রায় ১৮ মাইল উত্তর পশ্চিমে বৃত্তি পরগণার মধ্যে বাণিয়া-বশাড় নামে এক গ্রাম আছে। উক্ত গ্রামেই বিশালারাজের রাজধানী ছিল। সরকার হাজিপুরের অন্তর্গত বিশারা নামে একটী পরগণাও আছে। তত্রত্য উচ্চারণগত পার্থক্য হেতু বিশালা শব্দই যে বিশারা শব্দে পরিণত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ হইতে পারে না। এরূপ প্রবাদ শুনা যায় যে, বিশালারাজই হাজিপুরের দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। হণ্টার সাহেব লিখিয়াছেন, দুর্গ হাজি-ইলায়সের নির্ম্মিত। বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণে তীরহুতের সীমানির্দ্দেশ স্থলে উক্ত হইয়াছে যে,—"গঙ্গাপ্রবাহমারভ্য যাবদ্ধৈমবতং বনম্"—অর্থাৎ গঙ্গা-প্রবাহ হইতে আরম্ভ করিয়া হৈমবতবন পর্য্যন্ত তীরহুত উত্তর ও দক্ষিণে বিস্তৃত। সুতরাং বিশালছত্র তীরহুতের অন্তর্গত হইতেছে। সিংহলদেশীয় ধর্ম্মগ্রন্থ মহাপরি-নির্ব্বাণসূত্রে লিখিত আছে যে, ভগবান্ বুদ্ধদেব রাজগৃহ হইতে নালান্দায় (বড়গাঁওতে) যাত্রাকালে পথিমধ্যে পাটলিগ্রাম (বর্ত্তমান পাটনায়) কিছুদিন অবস্থিতি করেন। ইহাতে দেখা যাইতেছে, বুদ্ধদেবের সময়েও বিশালার নাম জাগ্রৎ ছিল। *

"রামাশ্বমেধ" নামক উপপুরাণে লিখিত আছে যে, দশরথ-তনয় রামচন্দ্র লঙ্কাধিপতি রাবণকে বধ করিয়া অযোধ্যায় প্রত্যাগমনের সময় হাজিপুরে আগমন করেন এবং তত্রত্য ব্রাহ্মণদিগের অনুরোধে আত্মশুদ্ধির নিমিত্ত যজ্ঞানুষ্ঠান করেন। প্রবাদ যে, বাণিয়া-বশাড় নামক গ্রামে যজ্ঞচতুর নির্ম্মিত হয় এবং উক্ত গ্রামে যে "ভীমসিংহের লাঠী"

* মিথিলার রাজধানী জনকপুর হাজিপুর হইতে প্রায় একশত মাইল উত্তরে।

* পুরুষোত্তমদেববিরচিত ত্রিকাণ্ডশেষাভিধানকোষে লিখিত আছে,—

"বারাণসী তীর্থরাজৌ বিশালোজ্জয়িনী সমে।
চম্পা তু মালিনী পুষ্পাপুরং পাটলিপুত্রকম্॥"

"বিশালোজ্জয়িনী সমে" এই বাক্য দ্বারা বুঝা যায়, বিশালা উজ্জয়িনীরই নামান্তর। রাজকমল বিদ্যালঙ্কার-প্রণীত প্রকৃতিবাদ অভিধানে এবং গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন সঙ্কলিত শব্দসার অভিধানে 'বিশালা' অর্থে উজ্জয়িনী নগরীই লিখিত হইয়াছে। কিন্তু বিদ্যালঙ্কার মহাশয় 'বিশালী' শব্দের অর্থ "গঙ্গা ও গণ্ডকীনদীর সঙ্গম স্থলের নিকটবর্ত্তী পুরীবিশেষ" লিখিয়াছেন। বিশালা ও বিশালী শব্দের যে প্রভেদই কেন বিদ্যালঙ্কার মহাশয় করুন না, মহর্ষি বাল্মীকি গঙ্গা ও গণ্ডকীর সঙ্গমস্থানের নিকটবর্ত্তী পুরীবিশেষকেই যে বিশালাপুরী নামে অভিহিত করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

অদ্যাপি বিদ্যমান আছে, উহাই সেই যজ্ঞ-যূপ। তীরহুত জিলায় এতাদৃশ আরও দুইটী "ভীমসিংহের লাঠী" বা "লৌর" আছে। উহার একটী মতিহারী নগরের ১২ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে গোবিন্দগঞ্জ থানার অধীন জমেরোয়া গ্রামে এবং অপরটী বেত্তিয়ার ১৪ মাইল উত্তর-পশ্চিমে লৌরিয়া-লক্ষ্মণপুর গ্রামে অবস্থিত। শেষোক্ত "ভীমসিংহের লাঠী"তে নিম্নলিখিত প্রস্তরলিপি দৃষ্ট হয়,—"মুহীউদ্দীন-মহম্মদ-ঔরঙ্গজেব-বাদশাহ-আলমগীর-খাজী, সন ১০৭১।" উহার উপরিস্থ সিংহমূর্ত্তির মুখ কিছু ভগ্ন হইয়াছে এবং স্তম্ভমধ্যে কামানের গোলার দাগ আছে। তত্রত্য লোকেরা বলে, মুসলমানেরা উহা ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিয়াছিল। স্বর্গীয় ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র বলেন যে, এই "ভীমসিংহের লাঠী"গুলি খৃষ্টের জন্মের তিন শত বৎসর পূর্ব্বে অশোককর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল; গাজীপুরে ও এলাহাবাদে এরূপ "লাঠী" আরও দৃষ্ট হয়। প্রথমোক্ত "ভীমসিংহের লাঠী" হইতে দ্বিতীয়টী প্রায় ৪৮ মাইল উত্তর-পশ্চিমে এবং দ্বিতীয়টী হইতে তৃতীয়টী প্রায় ৩৬ মাইল উত্তর-পশ্চিমে সমসূত্রে অবস্থিত। বণিয়া-বশাড় গ্রামস্থ "ভীমসিংহের লাঠীর" প্রস্তরের স্তম্ভটী ২৪ ফুট উচ্চ হইবে। উহার উপরে প্রস্তরনির্ম্মিত যে একটী সিংহমূর্ত্তি স্থাপিত আছে, তাহার উচ্চতা ৬ ফুট হইবে। মৃত্তিকার অনেক নীচে উহার ভিত্তি প্রোথিত আছে।

খৃঃ ১৩১৬ অব্দের ১৯শে ডিসেম্বর তারিখে (৬ই শওয়াল ৭১৬ হিজরি সালে) আলা-উদ্দীন-খিজলী-বাদশাহ পরলোকগত হইলে মলিক-হাজি-ইলায়স্-সামসুদ্দীন-ভাঙ্গড় আলী-মোবারিককে বধ করিয়া লক্ষ্ণৌতি হইতে বাঙ্গালা পর্য্যন্ত দেশ অধিকার করেন। ৭৫৪ হিজরি সালে (১৩৫৩ খৃঃ অব্দে) বাদশাহ-ফীরোজ-শাহ-তুগলক হাজি-ইলায়সের রাজধানী পাণ্ডুয়া নগর অবরোধ করেন। হাজি-ইলায়স্ একডালার দুর্গে আশ্রয় লন। হাজি বাদশাহকে প্রতি বৎসর নিয়মিত উপহার প্রদান করিবেন এরূপ সর্ত্তে সন্ধি স্থাপিত হইলে বাদশাহ দিল্লীতে চলিয়া গেলেন। এই ঘটনার পর হাজি-ইলায়স্ পাণ্ডুয়া পরিত্যাগ করিয়া হাজিপুরে রাজধানী স্থাপন করিলেন। এই হাজি-ইলায়স্ হইতেই হাজিপুরের নামকরণ হইয়াছে। ৭৫৭ হিজরি সালে বাদশাহ হাজি ইলায়সকে স্বাধীন রাজা বলিয়া স্বীকার করেন। ৭৬০ হিজরি সালে (১৩৫৮ খৃঃ অব্দে) হাজি-ইলায়স্ কালগ্রাসে পতিত হন। তাঁহার মৃত্যুর তিন দিবস পরে আমীরগণ তদীয় পুত্র সেকেন্দরকে রাজ-তক্তে বসাইলেন। সেকন্দর-শাহ কিছুদিন পরে, হাজিপুর হইতে পাণ্ডুয়া নগরীতে রাজধানী লইয়া গেলেন। তৎপরে হাজি-ইলায়সের বংশীয় সুলতান-গয়াসুদ্দীন (১৩৫৮—১৩৬৭ খৃঃ অব্দ), সৈফ উদ্দীন-সুলতান-আমাশতন (১৩৬৭—১৩৮৩ খৃঃ অব্দ), সামস্উদ্দীন-সানি (১৩৮৩—১৩৮৫ খৃঃ অব্দ), ইহাঁদের সকলেরই পাণ্ডুয়ায় রাজধানী ছিল। ১৩৮৫ খৃঃ অব্দে (হিজরি ৭৮৭ সালে) সামস-উদ্দীন-সানির মৃত্যু হইলে তদীয় উজীর-আজম (প্রধান মন্ত্রী) রাজা গণেশ (মুসলমানেরা ইহাঁরে রাজা কংস লিখিয়াছেন) রাজতক্তে উপবেশন করেন। কিছুদিন পরেই হাজি-ইলায়সের বংশীয় নাসির-শাহ, বরবেক-শাহ, ইউসুফ-শাহ ও ফতে-শাহের ১৪২৩ কি ২৭ খৃঃ অব্দ হইতে ১৪৯০ কি ৯১ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্বের পর রাজলক্ষ্মী চিরকালের জন্য এই বংশীয়দিগকে পরিত্যাগ করেন।

মহম্মদ-মুস্তাফার বংশীয় সুলতান-আলা-উদ্দীন-হুশেনশাহ-শরীফমক্কার পুত্র নসরৎশাহ (ওরফে নসীব-শাহ) ১৫২১ খৃঃ অব্দে হাজিপুর

জয় করিয়া জামাতা মখ্‌দুম্-আলমকে উহার শাসন ভার অর্পণ করেন। মখদুম্-আলম হাজিপুরেই অবস্থিতি করিতেন। ৯৪০ হিজরি সালে (১৫৩৩—৩৪ খৃঃ অব্দে) নসীবশাহের মৃত্যু হইলে তদীয় পুত্র ফিরোজশাহ বাঙ্গালার রাজতক্তে বসিলেন। ইহার তিন মাস পরেই ফিরোজ খুল্লতাত মামুদশাহ কর্ত্তৃক নিহত হন। মামুদশাহ রাজতক্তে উপবেশন করেন। এই সময়ে শূর বংশীয় হসন খাঁর পুত্র শের খাঁ (ইহাঁর উপনাম ফরীদ খাঁ, পরে ইনি শেরশাহ নামে বিখ্যাত হন) বিহারের রাজপ্রতিনিধি ছিলেন। মখ্‌দুম্-আলম, শেরখাঁর সঙ্গে যোগ করিয়া, ফিরোজশাহের হত্যাকারীর যথোচিত শাস্তি-প্রদানার্থ দণ্ডায়মান হইলেন। এই সূত্র অবলম্বন করিয়াই কালে শের খাঁর ভাগ্যলক্ষ্মী সুপ্রসন্ন হইয়াছিল, তিনি অচিরেই হিন্দুস্থানের সম্রাট্-পদলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। যাহা হউক, মামুদশাহ নসীরুদ্দীন-মুহম্মদ-হুমায়ুং-বাদশাহের সাহায্যপ্রার্থী হইলেন, কিন্তু কোন সাহায্য না পাইয়া ৯৪৪ হিজরি সালে (১৫৩৭—৩৮ খৃঃ অব্দে) নৌকাযোগে হাজিপুরে উপস্থিত হইয়া উক্ত সহর অধিকার করিলেন। জেতৃ-পাঠানেরা অনেক নির্দ্দোষ নগরবাসীকেও হত্যা করিল এবং সকলেরই যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া লইল। ইতিমধ্যে শের খাঁ আসিয়া মামুদকে হাজিপুর হইতে তাড়াইয়া দিলেন। মামুদ পলাইয়া হুমায়ুং-বাদশাহের আশ্রয় লইলেন। ৯৪৫ হিজরি সালে (১৫৩৮—৩৯ খৃঃ অব্দে) বাদসাহ চুনার-দুর্গ অধিকার করিয়া মামুদের সাহায্যার্থ বিহারে আগমন করিলেন। মামুদ স্বরাজ্যে ফিরিয়া আসিয়া শুনিলেন যে, শের খাঁর পক্ষীয় লোকেরা তাঁহার দুই পুত্রকে হত্যা করিয়াছে। তিনি এই পুত্রশোকে কতিপয় দিবসের মধ্যে কলেবর পরিত্যাগ করিলেন।

এই মুসলমান নরপতিদিগের রাজত্বকালে হাজিপুর সহরের আয়তন বর্ত্তমান আয়তন অপেক্ষা অনেক বৃহৎ ছিল। তৎকালে হাজিপুর ২০ মাইল পূর্ব্ব-দক্ষিণস্থিত মোহনার পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। হাজি-ইলিয়াসের অথবা নসীব-শাহের বংশধরদিগের পতনের সঙ্গে সঙ্গেই যে হাজিপুরের প্রাধান্য লোপ পাইয়াছিল, তাহা নহে। অবুল-ফতেহ-জলালউদ্দীন-মুহম্মদ-আকবর বাদশাহের সাম্রাজ্য কালে হাজিপুর দুর্দ্ধর্ষ পাঠান সেনানীদিগের অধিকৃত ও আশ্রয়স্থান হইয়াছিল। এই নগরীকে কেন্দ্র করিয়া সার্ব্বভৌমত্ব-লোলুপ আকবর বাদশাহের সহিত স্বাতন্ত্র্য-প্রয়াসী পাঠ নদিগের যে অধিককালব্যাপী ভয়ঙ্কর কলহ উপস্থিত হইয়াছিল, সেই ভীষণ সমরে পাঠানকুল ধ্বংস হইলেই হাজিপুরের অবনতি আরব্ধ হয়।

কররাণী নামক পাঠান-বংশীয়েরা শেরশাহ ও তৎপুত্র সলীমশাহের রাজত্বকালে ভোজপুরে ও খাবাশপুর-তাণ্ডার নিকটে জায়গীর প্রাপ্ত হইয়া ক্রমে পরাক্রান্ত হইয়া উঠেন। সোলেমান-কররাণীর জ্যেষ্ঠভ্রাতা তাজখাঁ-কররাণী সম্রাট্ সলীমশাহের রাজ্যকালে ১৫৭৩ খৃষ্টাব্দে সম্বল প্রদেশের শাসন-কর্ত্তা ছিলেন। তিনি রাজভক্তি-প্রদর্শনার্থ ৯৮১ হিজরী সালে সম্রাট্ মহম্মদ-আদীলের দরবারে উপস্থিত হইয়া সম্রাট্ ও তদীয় উজীর হিমুর প্রতি এত বিরক্ত হইয়াছিলেন যে, তজ্জন্য অচিরেই কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া জোজপুরে চলিয়া যান। সলীমশাহ সোলেমান-কররাণীকে বিহারের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন। উক্ত সম্রাটের মৃত্যুর পর সোলেমান স্বতন্ত্রতা অবলম্বনপূর্ব্বক বিহার শাসন করিতে লাগিলেন। স্বাধীনভাবে রাজ্যশাসনে প্রবৃত্ত হইয়াও সোলেমান সলীমসাহের পুত্র বাহাদুর-সাহ এবং বাহাদুরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা জালাল-উদ্দীনের সহিত সদ্ভাব-রক্ষণে সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন।

১৫৬৩ কি ৬৪ খৃঃ অব্দে (৯৭১ হিজরি সালে) জালাল-উদ্দীনের পুত্রকে নিহত করিয়া গায়শ-উদ্দীন তদীয় রাজ্য অধিকার করিলে পর, সোলেমান আপন জ্যেষ্ঠভ্রাতা তাজখাঁ-কররাণীকে বাঙ্গালা বিজয় করিবার নিমিত্ত প্রেরণ করিলেন। তাজখাঁ অনায়াসেই বাঙ্গালা জয় করিতে সমর্থ হইলেন। সোলেমান তাজখাঁকে বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিলেন। ইহার এক বৎসর পরেই ৯৭২ হিজরী সালে (১৫৬৪-৬৫ খৃঃ অব্দে) তাজখাঁর মৃত্যু হয়। ভ্রাতার মৃত্যুর পর সোলেমান স্বয়ংই বাঙ্গালায় গমন করিলেন। তখন গৌড়নগর বাঙ্গালার রাজধানী ছিল। গৌড়ের রাজারা দীর্ঘজীবী হয় না, এরূপ সংস্কার বশতঃ সোলেমান তাণ্ডা (তাঁড়া) নগরে স্বকীয় রাজধানী করিলেন। তিনি সম্রাট্-আকবরশাহকে মধ্যে মধ্যে উপহার প্রদান করিয়া সন্তুষ্ট রাখিয়াছিলেন, আকবরও বিদ্রোহীর সংখ্যাবৃদ্ধির অনিচ্ছা বশতঃ তদীয় স্বতন্ত্রতা-ধ্বংসের কোন চেষ্টা করেন নাই। সোলেমান স্বাধীন রাজা হইলেও কখনও রাজছত্র ব্যবহার করেন নাই। ৯৮১ হিজরী সালে (১৫৭৩ খৃঃ অব্দে) তাণ্ডা নগরে সোলেমানের দেহাত্যয় হইলে তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র বায়জিদ খাঁ রাজতক্তে উপবেশন করিলেন। তিনি অল্পদিনের মধ্যেই আপনার ভগিনীপতি হাঁসু ও অপরাপর আমীরদিগের অপ্রীতিভাজন হইয়া, হাঁসুর চক্রান্তে নিহত হইলেন। হাঁসু এক সপ্তাহ কাল গৌড়ের রাজতক্তে উপবেশন করিলে, সোলেমানের ভক্ত সেনাপতি আমীর-উল্-উমর-লোদি দক্ষিণদেশ হইতে আগমন পূর্ব্বক হাঁসুকে বধ করিয়া সোলেমানের কনিষ্ঠপুত্র দাউদ খাঁকে রাজ্য প্রদান করিলেন। দাউদ গৌড়রাজ্যের অধিপতি হইয়া দিল্লীতে বাদশাহের নিকট স্বকীয় রাজত্ব-লাভের সংবাদ প্রেরণ ও রাজভক্তি-জ্ঞাপনের নিয়ম প্রতিপালন করিলেন না। আকবরশাহ দাউদের রাজ্যাভিষেক সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া খানখানান মুনিমখাঁকে গৌড়রাজ্য অধিকার করিতে আদেশ করিলেন। খানখানান বহুসৈন্য সমভিব্যাহারে বিহারে উপস্থিত হইয়া দাউদের নিকট হইতে দুই লক্ষ টাকা এবং অনেক বহুমূল্য দ্রব্য বাদশাহের উপহার স্বরূপ আদায় করিয়া চলিয়া গেলেন। দাউদ সে সময়ে হাজিপুরে ছিলেন। তিনি উড়িষ্যার শাসন-কর্ত্তা কতলুখাঁর পরামর্শে ও শ্রীহরিগুহের উত্তেজনায় শঠতাক্রমে আমীর-উল-উমরা-লোদিকে আপনার আয়ত্তে আনিয়া বধ করিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে আমীরলোদি দাউদকে উপদেশ স্বরূপে বলিলেন,—"মোগলেরা যৎসামান্য দুই লক্ষ টাকা পাইয়া আপনাকে কখনও ছাড়িয়া দিবেন না। তাঁহাদের কাল্পনিক সন্ধিপত্রে বিশ্বাস স্থাপন না করিয়া পূর্ব্বেই আপনি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকুন এবং সর্ব্বাগ্রেই অলক্ষিতভাবে খানখানানকে আক্রমণ করুন।" দাউদ মনে করিলেন যে, আমীর-লোদি শত্রুতা-উদ্ধারের নিমিত্তই তাঁহাকে মৃত্যু-কালে কুপরামর্শ দিয়া গিয়াছেন; সুতরাং তিনি মুনিম-খাঁর স্তোক-বাক্যের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া রহিলেন। আমীর-লোদিকে নিহত করিয়া দাউদখাঁ নিজের পদেই কুঠারাঘাত করিয়াছিলেন। মুনিমখাঁ আমীর-লোদির মৃত্যু-সংবাদ শুনিয়া অমনি সসৈন্যে পাটনা ও হাজিপুর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ইহা শুনিয়া দাউদ আমীর-লোদির প্রদত্ত উপদেশের সারবত্তা বুঝিতে সমর্থ হইলেন। দাউদ আর কালবিলম্ব না করিয়া হাজিপুর হইতে পাটনায় যাইয়া তত্রত্য দুর্গদ্বার বদ্ধ করিয়া বাদশাহি ফৌজের প্রতীক্ষায় রহিলেন। তিনি তথায় যাইয়া এত মদ্যপানরত ও ইন্দ্রিয়াসক্ত হইয়া-

ছিলেন যে, অবিলম্বেই অনেক লোক বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। এদিকে বাদশাহ সহাবদ্দীন-আহম্মদ-খাঁকে আগ্রাদুর্গের সর্ব্বাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়া মিরজা ইউসুফ-খাঁকে সেনাপতিত্বে বরণানন্তর স্থলপথে বিহারে প্রেরণ করিলেন এবং আপনিও জ্যেষ্ঠ পুত্রকে সঙ্গে লইয়া জলপথে বিহারাভিমুখে যাত্রা করিলেন। আকবর জৌশা নামক স্থানে পৌঁছিয়াই শুনিতে পাইলেন যে, ইশ খাঁ-কে নিয়াজী নামক জনৈক পাঠান আমীর পাটনা-দুর্গ হইতে সসৈন্যে বহির্গত হইয়া দুর্গাবরোধকারীদিগের সহিত সম্মুখ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে লস্কর খাঁর কোনও ক্রীতদাসের হস্তে নিহত হইয়াছেন। এই ইশাখাঁ সুজায়ৎ নামে পরিচিত ছিলেন। ইশা খাঁর মৃত্যুর পর বাদশাহ হাজিপুর-দুর্গ হস্তগত করিবার জন্য তথায় উপস্থিত হইয়া পাঁচ-পাহাড়ি নামক রঙ্গমহলের ধারে শিবির স্থাপন করিলেন। এই সময়ে সুবে-বিহারে তিনজন অতি পরাক্রমশালী জমিদার ছিলেন। হাজিপুরের রাজা গজপতি, * গিধৌরের রাজা পূর্ণমল্ল সিংহ এবং খরকপুরের রাজা সংগ্রামসহায়। বাদশাহ খান-ই-আলমকে রাজা গজপতির সাহায্যে হাজিপুরের দুর্গ অবরুদ্ধ করিতে আজ্ঞা প্রদান করিলেন। ইহাঁরা তদনুসারে বহুসংখ্য সৈন্যসহ স্থল ও জলপথে দুর্গ অবরোধ করিলেন। আকবরশাহ গণ্ডকী নদীর তীরে কোন উচ্চস্থানে উঠিয়া যুদ্ধ দেখিতে লাগিলেন। হাজিপুরের কেল্লাদার ফতেখাঁ-বারহা নিহত † হইলে দুর্গ সম্রাটপক্ষীয় সৈনিকদিগের হস্তগত হইল। এই সংগ্রামে যে সকল সৈন্য ও পাঠান-সেনানী নিহত হইয়াছিল, দাউদকে ভয়-প্রদর্শনার্থ আকবরশাহ তাহাদের মস্তকগুলি নৌকা বোঝাই করিয়া দাউদের নিকট পাটনায় প্রেরণ করিলেন। দুর্গজয়ের পরদিন বাদশাহ পাঁচপাহাড়ি রঙ্গমহলের উপরে উঠিয়া পাটনার দিকে লক্ষ্য করিয়া, তত্রত্য দুর্গ পরিদর্শন করিলেন। হাজিপুরের দুর্গ বাদশাহের হস্তগত হইয়াছে শুনিয়া দাউদ গৌড়াভিমুখে পলায়ন করিলেন। দাউদের সর্ব্বাধ্যক্ষ মুখ্যপাত্র বিক্রমাদিত্য-উপাধিক শ্রীহরি গুহ * নৌকা

* অল-বদাওনি-কৃত "মুন্তখব উৎ-তোয়ারিখ" নামক গ্রন্থে রাজা শ্রীকচিতি বলিয়া উল্লেখ আছে, কিন্তু 'তবকাত-ই-আকবরী' নামক গ্রন্থে রাজা গজপতি নামের উল্লেখ দেখা যায়। 'ফিরিস্তা' নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, রাজা গর্জোতি বাঙ্গালা ও বিহারের অধ্যাহিত শিরগড়ে অবস্থিতি করিতেন।

† "ফেরিস্তা" নামক গ্রন্থে লিখিত আছে যে, হাজিপুরের কেল্লাদার ফতেখাঁ পরাজিত হইয়া পলাইয়া যান। ইহার পর ফতেখাঁর কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

* মুসলমান পুরাবৃত্তবিদেরা শ্রীহরিকে কেহ "শ্রীধর" এবং কেহবা "সরহোর-হিন্দী-বাঙ্গালী" এরূপ নামস্মরণ করিয়াছেন। খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রামচন্দ্র গুহ নামক জনৈক বঙ্গজ কায়স্থ চন্দ্রদ্বীপ সমাজ হইতে বিষয়-কর্ম্মের চেষ্টায় বাহির হইয়া পাটসহল পরগণায় বিবাহ করিয়া অবস্থিতি করেন। কিছু দিন পরে তিনি গৌড়াধিপতি সোলেমানের কানুনগুর দপ্তরে মুহুরির কর্ম্মে নিযুক্ত হন। তাঁহার তিন পুত্র, ভবানন্দ, গুণানন্দ ও শিবানন্দ। শিবানন্দ অচিরেই গৌড়াধিপের কানুনগু দপ্তরের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলেন। ভবানন্দের পুত্র শ্রীহরি এবং গুণানন্দের পুত্র জানকীবল্লভ নবাব-তনয় দাউদের সমবয়স্ক ও সহাধ্যায়ী ছিলেন। দাউদ রাজত্বক্তে বসিয়াই জ্যেষ্ঠ শ্রীহরিকে মহারাজ-বিক্রমাদিত্য উপাধি দিয়া সর্ব্বাধ্যক্ষ-মুখ্যপাত্র আর কনিষ্ঠ জানকীবল্লভকে রাজা বসন্তরায় উপাধি দিয়া ভূমিসংক্রান্ত সমুদায় কর্ম্মের অধ্যক্ষ করিলেন। দাউদের পতনের সময় ইহাঁরা নিভৃত স্থান অনুসন্ধান করিতে করিতে দক্ষিণ অঞ্চলে সমুদ্রের নিকট এক স্থান মনোনীত করিলেন। ঐ স্থান পূর্ব্বে চাঁদখাঁ-মসনদির অধিকৃত ছিল। চাঁদখাঁর উত্তরাধিকারী কেহ না থাকাতে উহা দুর্গম জঙ্গলাবৃত হইয়াছিল। শ্রীহরি ও জানকীবল্লভ বাদাবন আবাদ করিয়া তথায় যশোহর নগর পত্তন ও ভদ্রাসন নির্ম্মাণ করিলেন। শ্রীহরির পুত্রই বিখ্যাত মহারাজ প্রতাপাদিত্য। ইহাঁর বংশ লোপ হইয়াছে। বসন্ত রায়ের বহু সন্তানের মধ্যে এক্ষণে কেবল নারায়ণ ও চাঁদের বংশীয়েরাই বর্ত্তমান আছেন। ইহাঁরা চব্বিশ পরগণা ও খুলনা জিলার অন্তঃপাতী টাকি, মুরনগর, শ্রীপুর প্রভৃতি গ্রামে বাস করিতেছেন। রাজা বসন্তরায় যশোহরে বঙ্গজ কায়স্থদিগের যে সমাজ স্থাপন করেন, তাহা অদ্যাপি রাজা বসন্তরায়ের সমাজ, যশোহর সমাজ বা টাকি সমাজ নামে প্রসিদ্ধ।

বোঝাই করিয়া সমস্ত ধন লইয়া দাউদের পশ্চাৎ গমন করিলেন। রকনুদ্দৌলা উপাধিক গুজরখাঁ-কররাণীও এত ব্যাকুলতার সহিত সসৈন্যে পলায়মান হইয়াছিলেন যে, সৈন্যদিগের অনেকে ভয়বিহ্বল-চিত্তে লম্ফ দ্বারা নদীস্রোতে নিমজ্জিত হইয়াছিল, অনেকে দুর্গপ্রাচীর হইতে লম্ফ দ্বারা ভূমিতে পতিত হইয়া তাহাদের মৃতদেহে পরিখা পূর্ণ করিয়াছিল, অনেকে বা সঙ্কীর্ণ পথে গমন করিবার সময় হস্তীর পদতলে পতিত হইয়া নিহত হইয়াছিল। পলাতকেরা পুনঃপুনঃ নদীর তীরে উপস্থিত হইলে, গুজরখাঁ সেতু নির্ম্মাণ করিয়া নদী পার হইলেন। তাঁহার সৈন্যেরা বিশৃঙ্খলভাবে এত লোক একবারে সেতুর উপর দিয়া যাইতে লাগিল যে, উহা একেবারে ভাঙ্গিয়া গেল, বহুতর সৈন্য ও অনেক পাঠান-সেনানী নদীস্রোতে পতিত হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। দাউদের পলায়নবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, আকবরশাহ পাটনার দুর্গ অধিকার করিলেন। দাউদ পলায়ন করিয়াও বাদশাহের বিপক্ষতাচরণে ক্ষান্ত রহিলেন না। কটক, ধোড়াঘাট, তাণ্ডা, বঙ্গৌড়া প্রভৃতি বহুতর স্থানে মোগল-পাঠানের অনেক যুদ্ধের পর ৯৮৩ হিজরি সালে (১৫৭৫ খৃঃ অব্দে) আকবরের সহিত দাউদের সন্ধিস্থাপনের প্রস্তাব হইল। মুনিমখাঁ ও দাউদ উভয়েই সে সময়ে কটকে ছিলেন। উভয় পক্ষে অনেক বাগ্‌বিতণ্ডার পর দাউদ মুনিমখাঁর শিবিরে যাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে সম্মত হইলেন। দাউদ পটমণ্ডপে উপস্থিত হইলে মুনিমখাঁ তাঁহাকে সাদর-সম্ভাষণে আসনে উপবেশিত করিয়া যথোচিত ভদ্র-ব্যবহারে আপ্যায়িত করিলেন। দাউদ অসি বহির্নিঃসারণপূর্ব্বক খানখানানকে বলিলেন,—"এই তরবারি আপনার ন্যায় ব্যক্তিরও পীড়াদায়ক হইয়াছে দেখিয়া আমি যুদ্ধ-বাসনা পরিত্যাগ করিয়াছি।" ইহা বলিয়া দাউদ তরবারি মুনিমখাঁর হস্তে দিলেন। খানখানান উহা গ্রহণপূর্ব্বক জনৈক রক্ষিবর্গের হস্তে প্রদান করিয়া সন্ধিপত্র লিপিবদ্ধ করিলেন এবং হীরক-খচিত সারসনযুক্ত অপর একখান তরবারি আনয়ন করিয়া স্বহস্তে দাউদের কটিদেশে বন্ধন করিয়া বলিলেন,—'আপনি রাজভক্তি-প্রদর্শনে সম্মত হইয়াছেন, সুতরাং সম্রাটের পক্ষ হইতে এই তরবারি গ্রহণ করুন। সম্রাট্ আপনাকে বাঙ্গালা প্রদেশের সুবেদার স্বীকার করিবেন।" উভয় পক্ষে এইরূপে সন্ধিস্থাপন হইলে ঐ সালেই বাদশাহ দাউদের নামে সুবেদারির সনন্দপত্র ও খেলাত প্রেরণ করিলেন।

দাউদের সহিত সন্ধিস্থাপনের পরেই মুনিম্ খাঁ তাণ্ডা নগরে প্রত্যাগমন করিয়া গৌড়ে পুনরায় রাজধানী করিলেন। তখন বর্ষাকাল। সহসা মারীভয় উপস্থিত হইল। সহস্র সহস্র লোক মরিতে লাগিল। অশীতিপর বৃদ্ধ খানখানান মুনিম খাঁ কালগ্রাসে পতিত হইলেন। এইরূপে সে বৎসর প্রাচীন রাজধানী গৌড় বিজন প্রদেশে পরিণত হইল। মুনিম্ খাঁর মৃত্যুর পর হুশেনকুলি খাঁ খানজহান সুবেবাঙ্গালার সুবেদার নিযুক্ত হইয়া লাহোর হইতে ধীরে ধীরে বিহার অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিলেন, ইতিমধ্যে বাদশাহ শুনিতে পাইলেন যে, মুনিম্ খাঁর মৃত্যুতে উৎসাহিত হইয়া দাউদ পুনরায় বিদ্রোহী হইয়াছেন, সম্রাট্-পক্ষীয় আমীরেরা যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়া তাণ্ডা ও গৌড় পরিত্যাগ পূর্ব্বক হাজিপুর ও পাটনায়

যাইয়া আশ্রয় লইয়াছে। এই সংবাদ পাইয়াই আকবরশাহ খানজহানকে সত্বর বিহার-গমনের আদেশ করিলেন। খান্-জহান গড়ীতে উপস্থিত হইলেই পাঠানদিগের সহিত তাহার এক যুদ্ধ হয়। তাহাতে দাউদের পক্ষীয় দেড় সহস্র লোক হত ও কারারুদ্ধ হইয়াছিল। খানজহান আরও অগ্রসর হইয়া খলগাঁও (কোলগাঁও) নামক স্থানে যাইয়া মুজঃফর খাঁর এবং বিহার ও হাজিপুরের সৈন্যের প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে হাজিপুর ও পাটনার এলাকাস্থিত অতি পরাক্রমশালী জমিদার রাজা গজপতি বিদ্রোহা-বলম্বন পূর্ব্বক আরানগরে ফরহৎ খাঁ ও তৎপুত্র মীরক-রদাইকে যুদ্ধে বধ করিয়া সমস্ত পথ আগুলিয়া রহিলেন। এদিকে মুজঃফর খাঁর প্রেরিত পাঁচ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য এবং সৈয়দ আবদুল্লা খাঁ সসৈন্যে খলগাঁওয়ে আসিয়া খান্‌জহানের সহিত মিলিত হইলে, তিনি অগৌণে দাউদকে আক্রমণের সঙ্কল্প করি-লেন। দাউদও খুল্লতাত জুনেদ-কররাণী এবং অপরাপর মহাবীর্য্যশালী পাঠান-সেনানীর সপক্ষতায় গর্ব্বিত হইয়া দুর্গাবরোধ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক যুদ্ধবাসনায় সমতলক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। উভয় পক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল। প্রথম আক্রমণেই কামানের গোলা লাগিয়া জুনেদের বক্ষঃস্থল ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গেল। উভয়-পক্ষীয় সৈন্য ক্রমে ক্রমে যতই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, পাঠান-দিগের পরাজয়-সম্ভাবনা ততই অধিক হইতে চলিল। ইতিমধ্যে দৈববিপাক বশতঃ দাউ-দের অশ্ব কোনও জলার পঙ্কে আবদ্ধ হইয়া পড়িল। হাসনবেগ নামক এক ব্যক্তি তাহা দেখিতে পাইয়া অমনি দাউদকে ধৃত করিল। দাউদখাঁ বন্দি অবস্থায় খান্‌জহানের সমক্ষে নীত হইলেন। তিনি দাউদের মস্তক ছেদন করিয়া বাদশাহের নিকট পাঠাইয়া দিলেন।* ৯৮৪ হিজরিসালে (১৫৭৬ খৃঃ অব্দে) দাউদ-খাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে এতদ্দেশে পাঠান-রাজ-ত্বেরও একরূপ অবসান হইল।

৯৮৫ হিজরি সালে মশুমখাঁ † নামক একজন উদ্ধত যুবক তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা মিরজা-হকীমের উপর বিরক্ত হইয়া বাদশাহের নিকট উপস্থিত হন। বাদশাহ তাঁহাকে পাঁচশত সেনার মন্‌সবদার করিয়া বিহারে প্রেরণ করি-লেন। "যে কালাপাহাড়ের ডঙ্কার নিনাদে হিন্দুর দেব-দেবীর হস্তপদ স্খলিত হইয়া ক্রোশান্তে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িত" মশুমখাঁ বিহারে আসিয়া সেই দুর্দ্ধর্ষ পাঠান-সেনানী কালা-পাহাড়কে ‡ রণে পরাস্ত করিলেন। ইহাতে বাদশাহ তাঁহার উপর অধিকতর সন্তুষ্ট হইয়া একহাজারি মন্‌সবদার ও বহুমূল্য খেলাত প্রদান করিলেন। ইহার পরে বাদশাহ মল্লা-তায়েবকে বিহার ও হাজিপুরের দিবানি কর্ম্মে এবং রায়-পুরুষোত্তম নামক জনৈক ব্রাহ্মণকে ("খিরাদ আফ্‌জা" নামক গ্রন্থের টীকা রচনার পুরস্কার স্বরূপ) বক্সীর কর্ম্মে নিযুক্ত করি-লেন। মল্লা তায়েব ও রায়-পুরুষোত্তমের কার্য্যে অসন্তুষ্ট হইয়া মশুমখাঁ অচিরেই রাজদ্রোহিতা অবলম্বন করিলেন। ৯৮৭ হিজরি সালে (১৫৭৯ খৃঃ অব্দে) খান্‌জহান পরলোকগত হইলে আকবরশাহ দিবান-মুজঃফরখাঁকে সুবেদার, রজাবীখাঁকে বক্সী, হকীম-অবুলফৎহকে শদর, রায়-পত্রদাসকে দিবান এবং মীর-অধমকে সহকারি-দিবান নিযুক্ত করিয়া সুবে-বাঙ্গালায় প্রেরণ করিলেন।

৯৮৭ হিজরী সালে (১৫৭৯ খৃঃ অব্দে) জৌনপুরের শাসনকর্ত্তা মশুমখাঁ-ফরজুদী * বাদশাহের দরবারে আগমন করিলে, বাদশাহ তাঁহাকে জৌনপুরে ফিরিয়া যাইতে বলিলেন। এই সময়ে বাদশাহ মোল্লা-মহম্মদ-ইয়জ্‌দীকে জৌনপুরের "কাজিল-কুজত" কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া পাঠান। আকবরশাহ অনেক মহত্তরান্, পীরাণ প্রভৃতি ধর্ম্মার্থে প্রদত্ত বিস্কর ভূমি বাজেয়াপ্ত করিয়া মোল্লাদিগের অসন্তোষ-ভাজন হইয়াছিলেন। মোল্লা-ইয়জ্‌দী জৌন-পুরে উপস্থিত হইয়া, সকলেরই ধর্ম্মরক্ষার্থ আকবরের দ্রোহিতা অবলম্বন করা উচিত, এই মর্ম্মে, এক ফতোয়া (ব্যবস্থাপত্র) জারি করিলেন। কাজীর ফতোয়া দৃষ্টে মহম্মদ-মশুম-খাঁ কাবুলী, মহম্মদ-মশুমখাঁ-ফরজুদী, সীর-মুইজুলমুলক, নয়াবৎখাঁ আরব-বাহাদুর প্রভৃতি অনেকে বাদশাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করি-লেন। ইহাঁরা কতিপয় যুদ্ধও করিয়াছিলেন। পরে আকবর কাহাকে স্থানান্তরিত, কাহাকে বা নিহত করিয়া কৌশলে বিদ্রোহ দমন করিলেন।

৯৮৭ হিজরী সালে (১৫৭৯ খৃঃ অব্দে) মুজঃফরখাঁ সুবেদারি-কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াই অনেক আমীরের জায়গীর বাজেয়াপ্ত করি-লেন বাবাখাঁ-কাকশাল ও খালিদীখাঁ নামক দুই জন প্রধান আমীর অনেক চেষ্টা করিয়াও তাঁহাদের জায়গীর পুনঃপ্রাপ্ত হইতে পারিলেন না। অতঃপর মুজঃফরখাঁ খালিদীখাঁরে কয়েদ করিয়া তাঁহাকে শারীরিক শাস্তিপ্রদানের ব্যবস্থা করিলেন। মিরজা-মহম্মদ হকীমের ভৃত্য রোশনবেগ নামক এক ব্যক্তি কাবুল হইতে বাঙ্গালায় আসিয়াছিল। তাহারে শাস্তি প্রদানের নিমিত্ত আকবরশাহ সুবেদারকে লিখিয়া পাঠাইলেন। তদনুসারে মুজঃফরখাঁ রোশনবেগকে ধৃত করিয়া প্রাণদণ্ডের আদেশ করিলেন। বাবাখাঁ রোশনবেগের জীবন-রক্ষার্থ সুবেদারকে অনুরোধ করিতে যাইয়া তিরস্কৃত হইলেন। সৈন্যেরা এই সকল কাণ্ড দেখিয়া কখন কাহার প্রাণ নষ্ট হয়, এরূপ আশঙ্কায় সুবেদারের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়া উঠিল। মুজঃফরখাঁ কাকশালদিগকে দমন করিবার জন্য হকীম আবুলফৎ ও পত্রদাসকে আদেশ করিলেন। হকীম-আবুলফৎ মদ্যপানে যত-দূর পারগ ছিলেন, যুদ্ধ বিষয়ে ততদূর ছিলেন না; পত্রদাসেরও অসিচালনাপেক্ষা লেখনী-চালনায় অধিক যোগ্যতা ছিল; সুতরাং তাঁহা-দের দ্বারা বিদ্রোহ দমনের উদ্যম ব্যর্থ হইল। মুজঃফরখাঁ কাকশালদিগের জায়গীর প্রত্যর্পণ করিয়া বিবাদ-মীমাংসার প্রস্তাব করিলেন। তাঁহারা সুবেদারকে বলিয়া পাঠাইলেন,—"আপনার প্রস্তাবে আমরা সম্মত আছি, কিন্তু আপনি অঙ্গীকারানুযায়ী কার্য্য করিবেন কিনা, ইহা আমরা বুঝিতে পারি নাই। যাহা হউক, রবাজী খাঁ এবং পত্রদাসকে জামিন-স্বরূপ আমা-দের হস্তে সমর্পণ করিবেন, আপনার কথা মত কার্য্য হইলেই তাহারা আপনার কাছে ফিরিয়া যাইবে।" মুজঃফর খাঁ উল্লিখিত দুই ব্যক্তিকে এবং মীর-আবু ইশাক্‌কে কাকশালদিগের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। কাকশালেরা তাঁহাদিগকে গিরিফতার করিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিদ্রোহি-তাচরণ করিতে লাগিলেন। বিদ্রোহী আমীরেরা মশুমখাঁ-জৌনপুরীকে আক্রমণ করিবার জন্য ফৌজসহ জোশা নদী পার হইলেন। ইতিমধ্যে আরব-বাহাদুর অকস্মাৎ রায়-পুরুষোত্তমকে আক্রমণ পূর্ব্বক বধ করিয়া বাবাখাঁর সহিত

* "ফেরিস্তা" নামক গ্রন্থে লিখিত আছে যে, তেলিয়াগড়ী ও তাণ্ডার মধ্যস্থিত দাউদপুর নামক স্থানে এই যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধ সাধারণতঃ আগমহলের (রাজ-মহলের) যুদ্ধ বলিয়া প্রসিদ্ধ।

† এই মশুম খাঁ অনেক স্থলে মশুমখাঁ-কাবুলী নামে উক্ত হইয়াছেন।

‡ অলবদৌনি ইহাকে কলাপাহাড় লিখিয়াছেন।

* এই মশুমখাঁ সর্ব্বত্রই "মশুমখাঁ-জৌনপুরী" অথবা "মশুমখাঁ-ফরজুদী" নামে উক্ত হইয়াছেন। "মশুমখাঁ-কাবুলী" আর এক ব্যক্তির নাম।

মিলিত হইবার জন্য গড়ী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহার গতিরোধ করিবার * জন্য দিবানই-কুল খোজা-শামসুদ্দীন-মহম্মদ-খবাকী † গড়ীতে প্রেরিত হইলেন।

মশুমখাঁ-কাবুলী কাকশালদিগের সহিত মিলিত হইয়া গঙ্গানদী পার হইয়াছেন শুনিয়া মুজঃফরখাঁ তাণ্ডার দুর্গে আশ্রয় লইলেন। সে সময়ে তাণ্ডার দুর্গে চারিটী পুরাতন প্রাচীর ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। উজীরখাঁ-জমীলবেগ, জানমহম্মদ খাঁ-বিহবুদী প্রভৃতি কতিপয় আমীর এ পর্য্যন্ত রাজভক্ত থাকিলেও এখন তাঁহারা বিদ্রোহীর দলে মিশিয়া হকীম-অবুলফৎ, খোজা-শামসুদ্দীন প্রভৃতি সম্রাট্-পক্ষীয় কতিপয় আমীরকে কয়েদ করিলেন। প্রথমোক্ত আমীরদ্বয় ও রায় পত্রদাস কারাগার হইতে পলাইয়া স্থানীয় জমিদারদিগের সাহায্যে হাজিপুরে উপস্থিত হইলেন ও কাকশালগণ মুজঃফরখাঁকে আশ্বাস বাক্যে বিশ্বাস জন্মাইয়া কারারুদ্ধ করিলেন। মুজঃফর খাঁ ঐ নৃশংস ব্যক্তিদিগের প্রদত্ত দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করিতে করিতে কিয়দ্দিনের মধ্যেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন সম্রাট মিরজা-শরফউদ্দীন-হুসেনকে কাশ্মীর শাসনকর্ত্তা কাসিম-আলিখাঁ-বকালের কারাগার হইতে আনিয়া বাঙ্গালার কারাগারে আবদ্ধ রাখিয়াছিলেন। বিদ্রোহীরা তাঁহারে কারামুক্ত করিয়া আপনাদের প্রধান সেনাপতিত্বে বরণ করিলেন। মুজঃফরখাঁর সম্পত্তি হস্তগত হওয়াতে বিদ্রোহীদের এক্ষণে আর অর্থের অপ্রতুল রহিল না।

আকবরশাহ এই সকল সংবাদ শুনিয়া রাজা তোড়লমল্ল, শাদিক-মহম্মদখাঁ, তরসুন-মহম্মদখাঁ প্রভৃতি প্রধান প্রধান আমীরদিগকে বিদ্রোহ দমন জন্য ফতেপুর হইতে বিহারে প্রেরণ করিলেন। এতদ্ব্যতীত রোহতাসের শাসনকর্ত্তা সুহিব-আলীখাঁ, জৌনপুরের শাসন-কর্ত্তা মহম্মদ-মশুমখাঁ ফরজুদী প্রভৃতি জায়-গীরদারদিগকে রাজা তোড়লমল্লের যথাসাধ্য সাহায্য করিতে আদেশ করিলেন। পথিমধ্যেই তোড়লমল্ল শুনিতে পাইলেন যে, শাহম্ খাঁ-জলের সৈয়দখাঁ বদক্সীকে যুদ্ধে নিহত করিয়া-ছেন। এদিকে তিন সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া মহম্মদ-মশুম-জৌনপুরী তোড়লমল্লের সহিত যোগ দিলেন। কিন্তু তোড়লমল্ল মশুম-খাঁর রাজভক্তির উপর আস্থা স্থাপন করিতে না পারিয়া কিয়ৎকালের জন্য যুদ্ধে ক্ষান্ত দিয়া মুঙ্গেরের দুর্গে অবস্থিতি করিলেন। বহু-সঙ্খ্যক পাঠান সেনানীর মিলিত সৈন্যের সহিত তোড়লমল্লের কতিপয় অসন্তুষ্ট ওমরার সাহায্যে যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হওয়া সৎপরামর্শের কার্য্যই হইয়াছিল।

ইতিমধ্যে বাবাখাঁ-কাকশাল সাঙ্ঘাতিক পীড়াগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন। বিদ্রোহীদিগের জনৈক অধিনেতা মজনুন্-খাঁ-কাকশালের পুত্র জব্বারী বাদসাহের প্রিয়পাত্র ছিলেন। এই কারণে রুগ্ন বাবাখাঁ বিদ্রোহিতাচরণ পরি-ত্যাগের অভিলাষী হইলেন। মশুম-খাঁ-কাবুলী কোনও কারণ বশতঃ বিহারে চলিয়া গেলেন। আরব বাহাদুরও রাজকোষ হস্তগত করিবার লোভে পাটনা যাত্রা করিলেন। পাহাড়-খাঁ-খশিখাইল (সৈয়দ আরিফ্) আরব-বাহাদুরের আগমনবার্ত্তা শুনিয়া পাটনা দুর্গে আশ্রয় লইলেন। এদিকে রাজা তোড়লমল্ল পাহাড়খাঁর সাহায্যার্থ মশুমখাঁ-জৌনপুরীকে সসৈন্যে প্রেরণ করিলেন। আরব-বাহাদুর

* দিবান-ই-কুল।—দ্বাদশ সুবেতে দ্বাদশ জন দিবান নিযুক্ত হইত। ইহাঁরা সকলেই দিবান-ই-কুলের অধীনস্থ ছিলেন। দিবান-ই-কুল, উজীর-ই-কুল, উজীর-ই-মুমলক্, উজীর, এই গুলি একই পদের নামান্তর মাত্র।

† খবাক খোরাশান প্রদেশস্থ একটী জিলা ও শহর। খবাক-বাসীকে খবাকী বলে।

প্রতিপক্ষের বলবৃদ্ধি হইতে দেখিয়া, রাজা গজপতির জমিদারিতে চলিয়া গেলেন।

রাজা তোড়লমল্ল যখন দেখিতে পাইলেন যে, যে সকল বিদ্রোহীরা তাঁহাকে আক্রমণ করিবার জন্য মুঙ্গেরে মিলিত হইয়াছিল, তাহারা অনেকেই ক্রমে ক্রমে স্থানান্তরে চলিয়া গিয়াছে, তখন তিনি উপযুক্ত সময় বুঝিয়া দুর্গ হইতে বহির্গত হইলেন এবং শাদিকখাঁ ও অপরাপর আমীরসহ মশুমখাঁ-কাবুলীকে দমন করিবার জন্য বিহার যাত্রা করিলেন। মশুমখাঁ-কাবুলী এক দিন রাত্রে হঠাৎ আসিয়া শাদিকখাঁকে আক্রমণ করি-লেন। তরমাবেগ ও উলুমখাঁ শিবির-রক্ষার্থ জাগ্রৎ ছিলেন। তাঁহারা মশুমখাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী হইলে ঘোরতর যুদ্ধ বাধিল। উলুমখাঁ নিহত হইলেন, কিন্তু তরমাবেগ রণভঙ্গ না দিয়া প্রাণপণে যুঝিতে লাগিলেন। অবশেষে তরমাবেগই জয়ী হইলেন। মশুমখাঁ পরাজিত হইয়া ফকীরের বেশে বিহারের নানাস্থানে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন; অতঃপর উড়ি-ষ্যায় যাইয়া তত্রত্য জমিদার ইশাখাঁর আশ্রয়ে বাস করিতে লাগিলেন। এই যুদ্ধের পর গড়ী পর্য্যন্ত সমস্ত বিহার পুনরায় সম্রাটের অধিকৃত হইল।

মুজঃফরখাঁর বধবার্ত্তা শুনিয়া আকবর ৯৮৮ হিজরী সালে (১৫৮০ খৃঃ অব্দে) খান-ই-আজম্ ও শাহরাজ-খাঁরে বিহারে প্রেরণ করিলেন। খান-ই-আজম্ সুবেদার নিযুক্ত হইলেন। সম্রাট্ ইহাঁদিগকে বলিয়াছিলেন, আপনারা রাজা গজপতির জমিদারির মধ্যস্থিত জঙ্গলগুলি তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়া আরব-বাহাদুরকে বাহির করিবেন। ইতিপূর্ব্বে বর্ষা-গমে আমীরগণ সমভিব্যহারে রাজা তোড়ল-মল্ল হাজিপুরে আগমন করিয়া শিবির সংস্থাপন করিয়াছিলেন।

জৌনপুরে মশুমখাঁ এবং প্রয়াগে নিয়াবৎখাঁ এই সময়ে বিদ্রোহী হন। নিয়াবৎখাঁ বিদ্রোহী হইয়া বাদশাহের পক্ষীয় প্রয়াগের শাসনকর্ত্তা ইলিয়াস্খাঁ নামক জনৈক পাঠানের প্রাণবধ করেন। সম্রাট্ তাঁহাকে শাসন করিবার জন্য সৈন্য প্রেরণ করিলেন। নিয়াবৎ প্রয়াগ পরি-ত্যাগপূর্ব্বক পাটনাজিলার অন্তর্গত গসৎ নামক গ্রামে চলিয়া আসিলেন। এদিকে সম্রাট-পক্ষীয় হাজিপুরস্থিত আমীরেরা গঙ্গা পার হইয়া নিয়াবৎখাঁকে আক্রমণ করিলেন। নিয়া-বৎ অল্পসঙ্খ্যক সৈন্য লইয়া সম্রাট্-পক্ষীয় বহু আমীর ও অসংখ্য সৈন্যের সঙ্গে ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরেই তাঁহাকে রণভঙ্গ দিতে হইল। তিনি অযোধ্যায় পলাইয়া যাইয়া মশুমখাঁ-ফরজুদীর সহিত মিলিত হইলেন। শাহরাজখাঁ জঙ্গল ঝুড়িয়া আরব-বাহাদুরকে বাহির করিলেন। উভয়ে ভয়ানক যুদ্ধ হইল। যুদ্ধে আরব-বাহাদুরই পরাস্ত হইয়া হটিয়া গেলেন। তিনিও অযোধ্যায় যাইয়া মশুমখাঁ-ফরজুদীর সঙ্গে যোগ দিলেন। শাহরাজখাঁ সহজে ছাড়িবার লোক ছিলেন না। আরব-বাহাদুরের অনুসন্ধান করিতে করিতে তিনিও অযোধ্যায় যাইয়া উপস্থিত হইলেন। মশুমখাঁ-ফরজুদী অবিলম্বেই শাহারাজখাঁকে আক্রমণ করিলেন। শাহারাজখাঁ যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়া জৌনপুরে হঠিয়া আসিলেন। তরসুন-মহম্মদখাঁ নামক শাহ-রাজের পক্ষীয় জনৈক সৈন্যাধ্যক্ষ অলক্ষিত-ভাবে নিকটবর্ত্তী কোনও জঙ্গলে সসৈন্যে লুকা-ইয়া ছিলেন। মশুমখাঁকে রণজয়োৎসব অধিক-ক্ষণ ভোগ করিতে হইল না। তরসুনখাঁ সুযোগ-ক্রমে মশুমখাঁকে অতর্কিতভাবে আক্রমণ করিয়া সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিলেন। মশুমখাঁ পলায়ন করিয়া শাবালিক পর্ব্বতে চলিয়া গেলেন। তাঁহার মাতা, ভগিনী, স্ত্রী, পুত্র ও যথা সর্ব্বস্ব

তরসুনখাঁর হস্তগত হইল। ৯৮৮ হিজরি সালে (১৫৮১ খৃঃ অব্দে) এই যুদ্ধ ঘটে।

এইরূপে বিহারের বিদ্রোহ দমন পূর্ব্বক আজমখাঁ ও অনেক আমীর ৯৯০ হিজরী শালে (১৫৮২ খৃঃ অব্দে) হাজিপুর পরিত্যাগ করিয়া সম্রাটের নিকট চলিয়া গেলেন। এই সুযোগ পাইয়া খবীশা নামক মশুমখাঁ-কাবুলীর জনৈক ভৃত্য তরখান-দিবানা ও শরখ-বদকৃশীর যোগে পুনরায় বিদ্রোহী হইলেন। সম্রাটের পক্ষে মহম্মদ-শাদিকখাঁ ও মুহির-আলীখাঁ ইহাঁদের প্রতিদ্বন্দ্বী হইলেন। বিদ্রোহীরা যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পলাইয়া গেল, কিন্তু খবীশার এই যুদ্ধেই প্রাণান্ত হইল। রণজয়ী হইয়া শাদিকখাঁও সম্রাটের নিকট চলিয়া গেলেন। বিহার-প্রদেশস্থ পাঠানদিগের রণোদ্যম সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস না হওয়া পর্য্যন্ত তথায় বহুসঙ্খ্যক সৈন্য এবং উপযুক্ত সৈন্যাধ্যক্ষ রক্ষণের আবশ্যকতা উপলব্ধি করিয়া সম্রাট আজমখাঁ ও শাদিকখাঁকে পুনরায় বিহারে পাঠাইয়া দিলেন। তিনি শাহকুলিখাঁ-মহরম, সেখ-ইব্রাহিম-চিশটি প্রভৃতি কতিপয় আমীরকেও কাবুল-যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া বিহারে চলিয়া যাইতে আদেশ করিলেন। মশুমখাঁ-কাবুলী আরব-বাহাদুর প্রভৃতি কতিপয় মহাযোদ্ধারা অনুক্ষণই সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিলেন। তাঁহাদের শঙ্কা উৎপাদনের জন্য অধিক কাল বিহারে সৈন্যরক্ষণ ব্যয়সাধ্য ও অসুবিধাজনক মনে করিয়া, আকবর, সমস্ত বিহার-প্রদেশ জায়গীরদারদিগকে বিভাগ করিয়া দেওয়ার সঙ্কল্প করিলেন। সর্ব্বাগ্রেই মহম্মদ-হুশেন, আশরফখাঁর পুত্র মীর-আবুল-মুজঃফর, মীর-হাশিম, মীর-শালিহ-দই, সৈয়দ-আবু-ইশাক প্রভৃতি কতিপয় আমীরকে ঐরূপ জায়গীর প্রদান করিলেন।

৯৯৪ হিজরি শালে (১৫৮৭ খৃঃ অব্দে) আকবরশাহ লাহোরে গমন করেন। তথায় আরব-বাহাদুরের ছিন্ন-মুণ্ড তাঁহার সমীপে উপস্থিত করা হইল। আরব-বাহাদুরের মৃত্যু সম্বন্ধে দ্বিবিধ জনরব শুনা গিয়াছিল। কেহ কেহ বলে যে, বহরেচ নামক স্থানে তিনি হকীম-আবদুলফতের অনুচরদিগের সহিত কলহ করিয়া নিহত হন; কিন্তু অনেকেই বলে যে, তিনি রোগাক্রান্ত হইয়া কলেবর পরিত্যাগ করেন, কোন ব্যক্তি মৃতদেহ হইতে মস্তক ছেদন করিয়া সম্রাটের নিকট উপস্থিত করে। আকবর আরব-বাহাদুরের মস্তক লাহোর-দুর্গের উচ্চ চূড়ার উপরিভাগে রক্ষা করিলেন। আরব-বাহাদুরের মৃত্যুর পরই বিহার-প্রদেশে সম্যক্‌রূপে শান্তি স্থাপিত হইল।

ইহার কিছুদিন পরে আরব-বাহাদুরের সোদর শলেমখাঁ রাজ্যচ্যুতি বশতঃ নানা দুর্দ্দশায় পতিত হইয়া ১০০০ হিজরী সালে জীবিকা-নির্ব্বাহার্থ সাহায্য প্রার্থনা করিয়া আকবর-শাহের নিকট এক দরখাস্ত প্রেরণ করেন। উক্ত দরখাস্তের নকল অদ্যাপি হাজিপুরস্থ সেখ-মুরাদ-আলির কাছে আছে। উহা পাঠ করিয়া পাঠানবংশের নিম্নলিখিত বংশাবলী পাওয়া যায়।

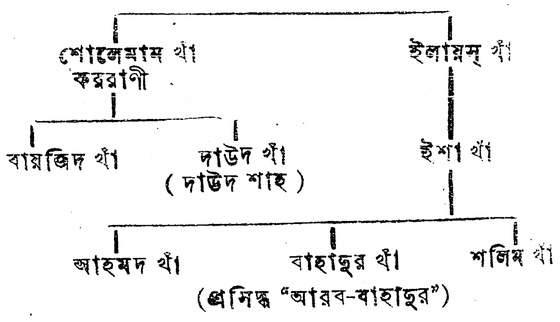

(প্রসিদ্ধ "আরব-বাহাদুর")

এই পাঠানবংশের কেহই এখন হাজিপুরে নাই। সুতরাং আকবরশাহ শলিমখাঁর কোন সাহায্য করিয়াছিলেন কি না, তাহা জানিবার উপায় নাই।

সুবে-বাঙ্গালার সুবেদার মীরজাফরখাঁর পক্ষাবলম্বী হইয়া কাপ্তেন-নক্সা শাহ-আলমের

সহিত যুদ্ধ করিতে বিহারে আগমন করিলে, পূর্ণিয়ার নায়েব-নাজিম খাদিমহুয়েনখাঁ * শাহ আলমের সাহায্যার্থ ৫।৬ হাজার বন্দুকচি লইয়া হাজিপুরে আইসেন। কাপ্তেন-নক্স শাহ-আলমকে দানাপুরের সমীপস্থ ফুলবাড়ী নামক স্থানে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া খাদিমহুশেন খাঁর সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য হাজিপুরে আগমন করেন। কাপ্তেন নক্স হাজিপুর অভিমুখে আসিতেছেন শুনিয়া, খাদিমহুশেন নেপালে চলিয়া যান। অতঃপর তাঁহার আর কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

ইংরেজ-রাজত্বের প্রারম্ভে সুবে-বাঙ্গালায় দস্যুতার অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। উহা প্রকৃতই দস্যুতা, না, ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানির অধীনতা-স্বীকারে অনিচ্ছা-জনিত যুদ্ধোদ্যম, সে বিষয়ে মতভেদ দৃষ্ট হয়। যাহাই হউক, দস্যুদিগের উপদ্রব বাঙ্গালায় যত অধিক হইয়াছিল, বিহারে তত অধিক হয় নাই। বারাণসী-বিভাগের তৃতীয় জজ জেম্‌স্-ষ্টুয়ার্ট সাহেব ১৮০৮ খৃঃ অব্দে যে রিপোর্ট প্রদান করেন, তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন—"একটী দৃষ্টান্ত আমার স্মরণ হইতেছে। কতিপয় বৎসর গত হইল, উহা তীরহুত জিলায় ঘটে। এক দল ডাকাইত পাটনার নিকটস্থ বৃহৎ জনপদ হাজিপুরে আসিয়া অবাধে রাজত্ব করিতে থাকে। ঐ নগরী ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছারী হইতে অধিক দূরে অবস্থিত ছিল না। উহাদের ধৃষ্টতা এত অধিক হইয়াছিল এবং নগরবাসীরাও উহাদের এত অধিক আনুগত্য স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিল যে, দস্যুদলপতি তাঁহার পরিবারস্থ কাহারও বিবাহ উপলক্ষে দরবারে আসীন হইলে সম্ভ্রান্ত লোকেরাও সকলে তাঁহাকে নজর দিয়াছিলেন"। *

অতঃপর হাজিপুরের এলাকায় আর উল্লেখযোগ্য কোন গোলযোগ ঘটে নাই। ১৮৫৭ খৃঃ অব্দের জুন মাসে বিদ্রোহী সিপাহীরা দিল্লী অধিকার করিয়াছে, এই সংবাদ পঁহুছিলে দিল্লীয় বাদশাহের বংশীয় ওয়ারিস আলী নামক এক জন পুলিসের জমাদার পাটনার কোন কোন মুসলমানকে বিদ্রোহিতাবলম্বনের জন্য উত্তেজিত করিয়াছিল। ওয়ারিশ-আলী ধৃত হইয়া ফাঁসীকাষ্ঠে লম্বিত হয়। সিপাহী-বিদ্রোহ অন্যান্য স্থানেই আবদ্ধ থাকে, হাজিপুর কিংবা তন্নিকটস্থ কোন স্থানে উহার কোন লক্ষণ দৃষ্ট হয় নাই।

হাজিপুরের জমিদারদিগের মধ্যে গোলাম-হাইদারখাঁর বংশ, তাজখাঁ-বাঁজখাঁর বংশ এবং শাহ গুজরাট ও ভিখার বংশই প্রসিদ্ধ। ইহাঁদের জমিদারি-প্রাপ্তির বিবরণ নিম্নে লিখিত হইল।

ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানির রাজত্বের প্রারম্ভে গোলাম-হাইদরখাঁ বিশারা পরগণার মধ্যগত তপা-ভটশালার আমীল ছিলেন। পানাপুর-নরিয়ারের জমিদার পহল-সাহি উক্ত আমিলকে হত্যা করেন। এই অপরাধে কোম্পানি-

* সুবে-বাঙ্গালার সুবেদার সিরাজউদ্দৌলার সহিত মধাবগঞ্জের দেড় মাইল দূরবর্ত্তী বালদিয়া-বাড়ী গ্রামে যে যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতে সৈয়দ-আহমদ-শৌলৎজঙ্গের পুত্র শৌকৎজঙ্গের মৃত্যু হইলে পর পূর্ণিয়ার নায়েব নিজামৎ-উল্লে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথাক্রমে অধিষ্ঠিত হন;—

১ রায়-নেকরাজ খাঁ, ২ হাজির-আলিখাঁ, ৩ কাদির-(কাদিম?) হুশেন খাঁ, ৪ আল্লাকুলি খাঁ, ৫ সের-আলীখাঁ, ৬ সিপাহীদার জঙ্গ, ৭ রাজা গুচেত রায়, ৮ রাজিউদ্দীন মহম্মদ-খাঁ এবং ৯ মহম্মদ আলীখাঁ।

এই শেষোক্ত ব্যক্তির পরেই ১৭৭০ খৃঃ অব্দে নায়েব নাজিমের পরিবর্ত্তে ডুকারেল সাহেব পূর্ণিয়ার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হইয়া আসেন। অতঃপর আর কেহ নায়েব নাজিম নিযুক্ত হন নাই।

† "জমাওৎ-অৎ-তোয়ারিখ-হিন্দুস্থান" নামক গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

* ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানির নির্ব্বাচিত সিলেক্ট কমিটির পঞ্চম রিপোর্ট দ্রষ্টব্য।

বাহাদুর পহলসাহির জমিদারি বাজেয়াপ্ত করিয়া তাঁহাকে কয়েদ করেন এবং তাঁহার জমিদারি গোলাম-হাইদর খাঁর পুত্র মহম্মদ-ইউসুফ-আলি-খাঁরে প্রদান করেন। ইউসুফ-আলিখাঁর পুত্র আলি-নবাবখাঁ অদ্যাপি উক্ত জমিদারি ভোগ করিতেছেন।

তাজখাঁ ও বাজখাঁ নামে দুই ব্যক্তি পাটনার নবাব সের-আলিখাঁর উজীর ও সিপাহসিলার (প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ) ছিলেন। ইহাঁদের মশজিদ, পুকুর ও কবর অদ্যাপি হাজিপুরে বিদ্যমান আছে। ইহাঁদের বংশধরেরা এখনও হাজিপুরের জমিদার বলিয়া প্রসিদ্ধ।

হাজিপুর সহরের দুই মাইল পূর্ব্বদিকে মৌজা জরুহাতে অনেক প্রাচীন অট্টালিকা ও ভগ্ন অট্টালিকার চিহ্ন দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে মামু ভঞ্জার দরগাই সর্ব্বপ্রধান। দরগার প্রাচীরের গায় পারসীক, উর্দ্দু, ইংরেজি, হিন্দি প্রভৃতি নানা ভাষাতেই কয়লা বা চা-খড়ির লেখা দেখা যায়। প্রবাদ এরূপ যে, যে ব্যক্তি যাহা কাম্য করিয়া এখানে লিখিয়া যাইবে, তাহার সেই কাম্যই সফল হইবে।

সুলতান মহম্মদ গজনভির প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ (সিপাহসিলার) মন্সুরসালার গাজির পণ্টনে সৈয়দ্-আহম্মদ (মামু) এবং সৈয়দ মাহমুদ (ভঞ্জা) এই দুই ব্যক্তি সরদার ছিলেন। এই মামুভঞ্জা কোনও যুদ্ধে হাজিপুরে নিহত হন।

এরূপ প্রবাদ যে, তাঁহাদের মৃত দেহ বহু বৎসর পরে তীরহুতের রাজা শিবসিংহ অবিকৃত অবস্থায় প্রাপ্ত হইয়া এবং দৈববাণী দ্বারা মামুভঞ্জার পরিচয় পাইয়া বর্ত্তমান দরগা নির্ম্মাণ করেন। তৎপর আপনার সৈনিক-কর্ম্মচারী সেখ গুজরাট ও সেখ ভিখা নামক দুই সহোদরকে উহার তত্ত্বাবধানের জন্য নিযুক্ত করেন।* এই সেখদ্বয় দরগার তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত থাকিয়া শাহ খেতাব পরিচিত হন। বাদশাহ এই দরগার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রায় দুই হাজার টাকার উপস্বত্বের তালুক দান করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন ১৭৯৩ খৃঃ অব্দের দাবামি বন্দোবস্তের (দশশালা বন্দোবস্তের) সময় সরকার বাহাদুরও ১৮ বিঘা লাখিরাজ ভূমি দান করেন। এই সকল সম্পত্তি এক্ষণ শাহভিখার বংশধরেরা ভোগ করিতেছেন। নিম্নে শাহভিখার বংশাবলী প্রদত্ত হইল;—

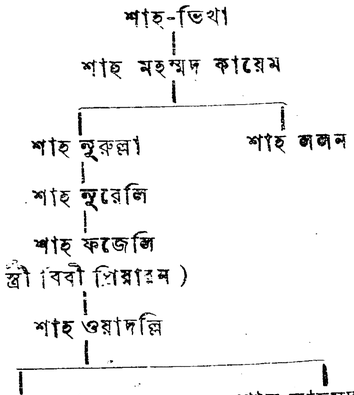

এই বংশাবলী দ্বারা দেখা যায় (এক শত বৎসরে তিন পুরুষ ধরিলে) শাহভিখা ২৫০ বৎসরের পূর্ব্বের লোক ছিলেন; কিন্তু শিবসিংহ প্রায় ৪৫০ বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। শাহভিখার সময়েই যখন বর্ত্তমান দরগা নির্ম্মিত হইয়াছে, তখন শিবসিংহের মৃত্যুর ন্যূনাধিক ২০০ বৎসর পরে উহা নির্ম্মিত হইয়াছে, ইহা সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে। দরগার এবধারে ভূমিতে পতিত এক খণ্ড

* সুলতান-মহম্মদ-গজনভি ৪০১ হিজরী সালে (খৃঃ ১০২৮ অব্দের ৩রা এপ্রেল) পরলোকগত হন। তীরহুত-রাজ শিবসিংহের রাজত্বকাল খৃঃ ১৪৪৫ হইতে ১৪৪৮ অব্দ। তবেই দেখা যাইতেছে, প্রবাদ অনুসারে মামুভঞ্জার শব ন্যূনাধিক ৪০০ বৎসর অবিকৃতাবস্থায় মৃত্তিকাভ্যন্তরে ছিল।

প্রস্তরে আরবি-ভাষায় তোগড়া হরফে প্রথমতঃ কোরাণের অয়েদ লিখিয়া পরে লেখা আছে,—

"বাণি মস্‌জেদ্-তুল-আলি-হাজি-খিলজ্
"নবাব সয়েস্তাখানি কোৎবে মহম্মদ্
"মকিম্ ইব্‌নে সৈয়দ্ আবদুল্ রসুল্।
"১০৭১ হিজরী।" *

ইহাতে দেখা যাইতেছে, ১০৭১ হিজরী সালে (১৬৬০-৬১ খৃঃ অব্দে) নবাব সায়েস্তা-খাঁর সময়ে ঐ মশজিদ প্রস্তুত হইয়াছিল, ইহাই সম্ভব। বোধ হয় যে, মামু-ভঞ্জার দরগাও সেই সময়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল। জরুহাতে শাহ-ললন এক করবাল্লা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। ৭।৮ মাইল দূরবর্ত্তী লোকেরাও মহরমের সময় তাজিয়া লইয়া ঐ করবাল্লায় আইসে। মামুভঞ্জার দরগার নিকটে "বায়ান্ন হাজারি চবুত্রা" আছে। উহা সোলেমান্-খাঁ-করয়াণীর সৈন্যাধ্যক্ষ তাজ-বাহাদুর কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল।

যে দুর্গে মোগল-পাঠানের এত লড়াই হইয়াছিল, সেই দুর্গের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়াছে। উহার অন্তর্গত ৩৬০ বিঘা জমির কতক স্থল এক্ষণ কর্ষিত ভূমি এবং কতক স্থলে ডাক-বাঙ্গালা, সরাই, নেপালী-মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। নেপালের সার-জঙ্গ বাহাদুরের অবস্থিতির জন্যই এই সরাই নির্ম্মিত হইয়াছিল। কুলানন্দ-ঝা নামে জনৈক নেপালের 'সুবা' নির্ব্বাসিত হইলে, তিনি হাজিপুরে আসিয়া এই নেপালি-মন্দির নির্ম্মাণ করেন। মন্দিরটী দেখিতে অতি সুন্দর, উহার পুতুলগুলির গঠনে বিশেষ কারুকার্য্য আছে, কিন্তু উহা আধুনিক রুচি অনুসারে বড় অশ্লীলতাপূর্ণ। শুধু পুতুলগুলির গড়ন দেখিতে দেখিতে তন্ময় হইলেই ঐ স্থানে চাহিয়া দেখা যায়, নচেৎ যাঁহারা আধুনিক রুচির দায়ে ধরা পড়িয়াছেন, তাঁহারা কোন ক্রমেই ঐ দিকে তাকাইতে পারেন না। এই প্রবন্ধ-লেখক জগন্নাথের মন্দির স্বচক্ষে দর্শন করেন নাই, কিন্তু তাঁহার বোধ হয় রুচি সম্বন্ধে উক্ত মন্দিরস্থ পুতুলগুলির সঙ্গে এই নেপালি মন্দিরের পুতুলগুলির তুলনা হইতে পারে।

জামী-মসজিদ কৃষ্ণবর্ণের প্রস্তর-নির্ম্মিত ও সোনপুরঘাটের নিকটে দুর্গের সীমার মধ্যে অবস্থিত। উহা দীর্ঘে ৬০ গজ ও পরিসর ১১ গজ হইবে। স্থপতিগণ এমনি কৌশলে উহা নির্ম্মাণ করিয়াছেন যে, বর্ত্তমান শতাব্দীর এতদ্বিষয়ক উন্নতির অভিমান তাহার নিকট পরাস্ত হয়। হণ্টার সাহেব লিখিয়াছেন যে, হাজি-ইলায়স হাজিপুর নগর পত্তনের সময়ে ৫৬ শত বৎসর পূর্ব্বে মশজিদটীও নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে উহা মকসুদখাঁ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল।

প্রতিবৎসর কার্ত্তিক মাসের শুক্লপক্ষে সোনপুরে এক মেলা হয়। সরকার-হাজিপুরের রাজধানী যখন হাজিপুরে ছিল, সে সময়ে হাজিপুরেই এই মেলা হইত, কিন্তু হাজিপুরের ধার গণ্ডকী নদীর স্রোতে বড় ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিলে, সারণ জিলার অন্তঃপাতী সোনপুরে মেলা উঠাইয়া লওয়া হইয়াছে। সোনরায় নামক জনৈক ক্ষত্রী এই গ্রাম স্থাপন করেন বলিয়া, উহার নাম সোনপুর হইয়াছে। ইহার ন্যায় প্রাচীন মেলা ভারতবর্ষের কুত্রাপি নাই। এরূপ প্রবাদ, এই সোনপুরে কোনও হস্তী জল পান করিতে যাইয়া কুম্ভীরকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে ভগবান্

* পুরাবৃত্ত পাঠে জানা যায় যে, আমীর উল-ওমরা মহাবৎ-সয়েস্তা খাঁ খৃঃ ১৬৬৩-৬৪ অব্দে (হিজরী ১০৭৩ সালে) সুবে-বাঙ্গালায় সুবেদার নিযুক্ত হন। তৎপূর্ব্বে মহম্মদ-সৈয়দ-মীরজুমলা-মহাবৎ-খাঁ-জিমর্থা-খানখানান সিপাহসিলর সুবে-বাঙ্গালার সুবেদার ছিলেন। সুতরাং ১০৭১ হিজরি সালে মীর জুমলা সুবেদার ছিলেন। সেই সময়ে সয়েস্তাখাঁ স্বতন্ত্ররূপে বিহারের সুবেদার নিযুক্ত হন কি না, পুরাবৃত্তে তাহা পাওয়া যায় না।

বিষ্ণু উক্ত হস্তীকে উদ্ধার করেন এবং রামচন্দ্র যখন জনক-দুহিতার পাণিগ্রহণ করিতে জনক-পুরে গমন করেন, সেই সময়ে তিনি উক্ত স্থানে এক মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে হরি-হরনাথ মহাদেবের বিগ্রহ স্থাপন করিয়া যান। এই সব প্রবাদ অনুসারে সোনপুর তীর্থরূপে পরিণত হইয়া প্রতি বৎসর কার্ত্তিক পূর্ণিমায় স্নান উপলক্ষে তথায় বহুতর যাত্রীর সমাগম হইতে লাগিল এবং কালে "হরি-হর-ছত্র মেলা" নামক প্রসিদ্ধ মেলা স্থাপিত হইল।

হাজিপুরের "নেঙড়া আম" অতি প্রসিদ্ধ ফল। আকবরের রাজত্বকালে নেঙড়ার আমের অস্তিত্ব ছিল না। সে সময়ে হাজিপুরের সূর্য্য-গড়র আম এবং কাঁঠাল সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত হইত। নেঙড়া আমের গাছটী পরগণা হাজিপুরের মধ্যগত সৈয়দপুর-গণেশ মৌজায় অবস্থিত। আম গাছটী টেড়া, এজন্য উহার আমের নাম "নেঙড়া" (হিন্দি লঙ্গড়া) হইয়াছে। কেবল একটী মাত্র গাছে আদত নেঙড়া আম জন্মে। উহার আম বিক্রয় হয় না। তবে, উহার কলম, কলমের কলম ইত্যাদিতে যে আম হয়, তাহাই কলিকাতার বাজারে "নেঙড়া-আম" বলিয়া বিক্রীত হয়।

সৈয়দপুরগণেশ মৌজা পাটনার দেওয়ান-মহল্লা নিবাসী মহারাজ মহীপতিসিংহ বাহাদুরের জমিদারির অন্তর্গত। মহীপতি সিংহ প্রখ্যাতনামা রাজা সীতাবরায়ের বৃদ্ধ প্রপৌত্র *। শাহ-জহানপুর নগরে রাজা সীতাবরায়ের আদিম বাস ছিল। তিনিই বিহার অঞ্চলে আঙ্গুর ও খরবুজার চাষ প্রবর্ত্তিত করেন।

শ্রীরসিকলাল ঘোষ।

* মাননীয় ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী সম্রাট্ শাহ আলম হইতে ১৭৬৫ খৃঃ অব্দের ১২ই আগষ্ট তারিখে বাঙ্গালা বিহার ও উড়িষ্যার দিবানি প্রাপ্ত হইয়া ১৭৬৭ খৃঃ অব্দে মহারাজ সীতাবরায়কে সুবে-বিহারের নায়েব দিবান নিযুক্ত করেন। তাঁহার পুত্র মহারাজ সিংহ। ১৮২২ খৃঃ অব্দে কলিকাতায় কল্যাণসিংহের মৃত্যু হইলে তদীয় পৌত্র ধুপসিংহ জমিদারি প্রাপ্ত হন। রাজা ভূমসিংহ বাহাদুরকে গবর্ণমেণ্ট বার্ষিক ২৪০০০ টাকা পেন্‌শন প্রদানের অনুমতি করেন। তিনি ১৮২৯ খৃঃ অব্দে কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া পাটনায় যাইয়া বাস করেন। ১৮৭৪ খৃঃ অব্দের ১৭ই জানুয়ারি তারিখে ভুপসিংহের মৃত্যু হইলে, তদীয় পুত্র মহারাজ মহীপতি সিংহ বাহাদুর তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন।

তু কাহে বাজাও ত বাঁশী ?

১

রে কে নিবিড়-গহন-বনবাসী !
তু কাহে বাজাও ত বাঁশী ?
বিজনে যামিনী মাঝে
একেলা কৌন কাজে
কৌন মন্ত্র পড়ি ফুকল মুরলী মোহন আওয়াজে,
সুধা মধুর সুর
পূরল তিন পুর—বে ;
দূর দূর বিয়াকুল মুখরল চির মক দিশি।
তু কাহে বাজাও ত বাঁশী ?

২

ছুটল উছল রবদল মন্ত্রিত মুরলী তানে,
ঘন রাগিণী(১) নাগিনী জনু ছাওল বিমানে,
গগনে উগারল
মধুর হলাহল রে—
মধুর মুরছল সুধাংশু নিঙ্গাড়ন নিশি !
তু কাহে বাজাও ত বাঁশী ?

৩

নিবার্ নিবার্ রে তোর বেণু সুরধার,
ত্রিভুবন ভৈ গেল বিপুল বিকার,
সকল পরাণ শ্রবণ পথ গেল,
সকল ভুবন আরে শ্রবণ ভেল, *
আপনা বিসঁরল জড় জীবরাশি।
তু কাহে বাজাও ত বাঁশী ?

৪

উলটল কাল্‌কো কুটিল রীত সুরে সুথির পাবনা,
উলটল কলঙ্কী শশধর অধিক ঝরে জোছনা,
উলটল নেত্রপত্র পাদপদল ধ্যান-গীত-মগনা,
উলটল কলকল সুতরল বিমল যমুনা,
উলট আওত জীরণ যোষিতকে নব যোবনা,
উলট চলে যুবতীজন সবকে জীবন-স্বপনা,
উলটল ভূমণ্ডল
সব সুর টলটল রে,
বিশ্ব বিষাদে হরষল রোদনে হাঁসি।
তু কাহে বাজাও ত বাঁশী ?

৫

তু কাঁহা পড়লিরে এ মোহন গীৎ ?
তু কাঁহা পাওলিরে এ অপার প্রীৎ ?
তু কাঁহা শিখলিরে এ প্রেম-রাগ-ছন্দ ?
তু কাঁহা হরলিরে মনোহর সুর-ফন্দ ?
কে রচলরে ললিত এ রঙ্গজাল্ ?
কে শিখাওলরে প্রমাদ পদমাল্ ?
যো তু বৈঠে হরিচরণ বন্দ
দেওত প্রফুল্ল প্রেম-ফাঁশি।
রে নিবিড়-গহন-বনবাসী !
তু কাহে বাজাও ত বাঁশী ?

৬

তু কা মাঙ্গতরে ত্রিভুবনমণ্ডল মাঝ ?
তু মাঙ্গত কা বিধিহর-সম্পদ সুরকে রাজ ?
সকল সম্পদ দেওব তোয় বন্দ কর বেণু,
সকল সুরদল চুমবে তোহার পদরেণু,
হরিপদ দেওব তোয় হরিচরণকো পাশ,
বাঁধরে বাঁধরে তোর বাউরা বাঁশুরী-বিলাস।
হাম সব ব্রজ-কামিনী
নিখিল প্রেম-রাগ-রাজরাণী
মহা শকতিশালিনী রে
তোকে দেওব সকল
* বর পদ কামফল যৌনে তু আশী ;
আর না বাজাও বাঁশী।
রে নিবিড়-গহন-বনবাসী !

৭

তু কাহে হেয়াবিরে ইন্দর্ অমরপুর মাঝা ?
হাম সব রাখব তোয় করি হৃদি পুর রাজা।
ও তু বংশী না বাজা।
তু কাহে হেয়বিরে বিরিঞ্চি, কমলাসন ?
তোকে দেওব ব্রজ-রমণী মরম সরসাসন,
ও তু ছোড়রে বংশীবাদন।
কৌন দুখে তু হোয়বি হররে
পিয়বি খর গরল ভার ?
করব আশুতোষ তোয় মদনান্তক,
দেওব অধরসুধাধার,
রে তু মুরলীসুর সংহার।
কৌন দুখে হোই মাধব
চরণে ধরবি বজর চিনা ?
করব হরি, চরণে রাখব
প্রেম-তরঙ্গিণী লীনা,
রে হামে দে তোহার বীণা।
তু ভ্রমত বনে বনে
রাখব তোয় যৌবনে রে ;
পাওবি দুন ফল ষণ্ড রস পরম পিয়াসী,
রে নিবিড়-গহন-বনবাসী !
তু কাহে বাজাও ত বাঁশী ?

শ্রীবাঁট।

(১) রাগিণী,—কোপিনী ; রাগের স্ত্রী।

* সমস্ত ভুবনটী শ্রবণেন্দ্রিয় হইল।

* বরপদ,—শ্রেষ্ঠ বা উচ্চ আসন। কোন অন্য অর্থে স্বামিপদ। বর,—অভীষ্ট। পদ,—আসন, স্থান, গীত। কামফল,—ইহাও বরপদের ন্যায় বিবিধার্থে বুঝিতে হইবে।

মনশ্চৈতন্যবাদখণ্ডন।

হিন্দুদর্শনে একাদশ ইন্দ্রিয়ের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ এই পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়; বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয়; এবং মন উভয়েন্দ্রিয় বা অন্তরিন্দ্রিয়। স্থূলতঃ চক্ষুঃ-কর্ণাদি পাঁচটী বাহ্যেন্দ্রিয় এবং মনোনামক অন্তরিন্দ্রিয় স্বীকার করিলেই চলিতে পারে। ইহার মধ্যে বিশেষ এই যে, বাহ্যেন্দ্রিয় সমুদয় মনের সহকারিতা ব্যতীত দর্শনাদি জ্ঞান উৎপন্ন করিতে পারে না, কিন্তু মন স্বয়ংই স্মরণাদি জ্ঞান জন্মাইতে পারে। এই ষড়িন্দ্রিয় ব্যতীত প্রতি শরীরে এক এক জীবাত্মার অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়া থাকে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে প্রদর্শিত হইবে যে, আত্মার অস্তিত্ব মানিয়া না লইলে কেবল বাহ্যেন্দ্রিয় বা মন দর্শন, স্পর্শন, স্মরণাদি ব্যাপার নিষ্পন্ন করিতে পারে না। মনোতিরিক্ত জীবাত্মার অস্তিত্ব প্রমাণ করাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

দর্শন, স্পর্শনাদি দ্বারা একার্থের প্রতিপাদন আত্মার কার্য্য। কোন ব্যক্তি চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সাহায্যে কোন বস্তু দর্শন করিয়া ত্বগিন্দ্রিয়ের সাহায্যে উহা স্পর্শ করিতেছেন এবং দৃষ্ট ও স্পৃষ্ট বস্তু একই বস্তু বলিয়া জানিতেছেন। আমি চক্ষুরিন্দ্রিয় দ্বারা ঘট দেখিলাম, ত্বগিন্দ্রিয় দ্বারা উহাই স্পর্শ করিলাম এবং দৃষ্ট ও স্পৃষ্ট ঘট একই পদার্থ বলিয়া জানিলাম। যে বস্তু দর্শন করিয়াছি, সেই বস্তুই স্পর্শ করিতেছি, এরূপ প্রত্যভিজ্ঞা দ্রষ্টা ও স্পষ্টা একই ব্যক্তি ব্যতীত হইতে পারে না। চক্ষুরিন্দ্রিয়ের বিষয়—রূপ, ত্বগিন্দ্রিয়ের বিষয়—স্পর্শ। চক্ষু কোন বস্তুর স্পর্শ অনুভব করিতে পারে না এবং ত্বগিন্দ্রিয়ও কোন বস্তুর রূপ অনুভব করিতে পারে না। যে আমি বস্তুর রূপ অনুভব করিয়াছি, সেই আমিই স্পর্শ অনুভব করিতেছি, এরূপ প্রত্যভিজ্ঞা চক্ষু বা ত্বগিন্দ্রিয়ের হইতে পারে না, সুতরাং চক্ষু ও ত্বগিন্দ্রিয় ব্যতিরিক্ত এক কর্ত্তা আছেন, যিনি চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সাহায্যে রূপ দর্শন করিয়াছিলেন, ত্বগিন্দ্রিয়ের সাহায্যে তিনিই স্পর্শ অনুভব করিতেছেন এবং দৃষ্ট ও স্পৃষ্ট বস্তু একই বলিয়া জানিতেছেন। দর্শন-স্পর্শনাদির সেই এক কর্ত্তাই আত্মা।

কেহ কেহ বলেন,—"সেই কর্ত্তা—মন; মনই আত্মা, মন ব্যতীত আত্মা নামক কোন পদার্থ নাই; মনই চক্ষুরিন্দ্রিয় দ্বারা রূপের দর্শন করেন, ত্বগিন্দ্রিয় দ্বারা স্পর্শের অনুভব করেন, নাসিকা দ্বারা আঘ্রাণ করিয়া থাকেন, মনই সমস্ত জ্ঞানের আশ্রয়, মন চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সাহায্যে যাহা দর্শন করিলেন, ত্বগিন্দ্রিয়ের সাহায্যে তাহাই স্পর্শ করিলেন এবং দৃষ্ট ও স্পৃষ্ট বস্তু একই বলিয়া জানিলেন; বুদ্ধি, সুখ, দুঃখাদি যে সমস্ত গুণ আত্মার আরোপিত হইয়া থাকে, উহা বাস্তবিক পক্ষে মনেরই গুণ।" এরূপ প্রতিবাদীকে প্রত্যুত্তর করা যাইতে পারে যে, তিনি যাহাকে মন বলিতেছেন, উহা প্রকৃত প্রস্তাবে আত্মারই নামান্তর মাত্র; কেননা, তাঁহাকে মনোব্যতীত এক অতিরিক্ত অন্তরিন্দ্রিয় স্বীকার করিতে হইবে। চক্ষুরিন্দ্রিয় দ্বারা রূপের জ্ঞান হয়, কর্ণেন্দ্রিয় দ্বারা শব্দের জ্ঞান হয়, নাসিকা দ্বারা গন্ধের জ্ঞান হয়, জিহ্বা দ্বারা রসের জ্ঞান হয়, ত্বগিন্দ্রিয় দ্বারা স্পর্শের জ্ঞান হয়, সুখ-দুঃখাদির জ্ঞান কোন্ ইন্দ্রিয় দ্বারা উৎপন্ন হয়? সুখ-দুঃখাদি চক্ষু দ্বারা দেখা যায় না, কর্ণ দ্বারা শ্রবণ করা যায় না, অপর ত্রিবিধ ইন্দ্রিয় দ্বারাও সুখ-দুঃখাদির জ্ঞান জন্মে না। অতএব সুখ-দুঃখাদির অনুভবের নিমিত্ত এক অন্তরিন্দ্রিয় স্বীকার করিতে হইবে। সেই অন্তরিন্দ্রিয়ই মন এবং ঐ মনের সাহায্যে যিনি সুখ-দুঃখ অনুভব করেন, সেই কর্ত্তার নাম জীবাত্মা। অতএব জীবাত্মা ও মন উভয়েরই অস্তিত্ব অঙ্গীকার করিতে হইল। যদি বল মন স্বয়ংই সুখ-দুঃখাদি অনুভব করিয়া থাকেন, সুখ-দুঃখাদি অনুভবের নিমিত্ত ইন্দ্রিয়বিশেষের প্রয়োজন হয় না, একথাও নিতান্ত অযৌক্তিক!

"সুখসাক্ষাৎকারঃ সকরণকঃ জন্য-সাক্ষাৎকারত্বাৎ চাক্ষুষবৎ।"

জন্য-সাক্ষাৎকার মাত্রেই ইন্দ্রিয়ের সহকারিতা আছে। সুখ সাক্ষাৎকার জন্য-সাক্ষাৎকার, সুতরাং সুখ-সাক্ষাৎকারে ইন্দ্রিয়ের সহকারিতা আছে। দৃষ্টান্ত।—যেমন দর্শন-সাক্ষাৎকারে চক্ষুর সহকারিতা আছে।

অনিত্য জ্ঞান মাত্রেরই উৎপত্তিতে ইন্দ্রিয়ের সহকারিতা প্রয়োজন হয়। সংসারে দর্শন-শ্রবণাদি যে সকল জ্ঞান উৎপন্ন হইতেছে, উহারা সকলেই অনিত্য। সুতরাং দর্শন-শ্রবণাদি জ্ঞানের উৎপত্তিতে ইন্দ্রিয়-বিশেষের সহকারিতা অবশ্যই অঙ্গীকার করিতে হইবে। যদি এই জ্ঞানসমূহ নিত্য হইত, তাহা হইলে ঐ সকল জ্ঞানের উৎপত্তি ও বিনাশ হইত না; কাজে কাজেই ইন্দ্রিয়বিশেষের সদ্ভাব বা অভাবের প্রয়োজন হইত না। উল্লিখিত অনুমান দ্বারা সুখ-দুঃখাদি-সাক্ষাৎকারের নিমিত্ত এক অন্তরিন্দ্রিয়ের অস্তিত্ব অঙ্গীকার করিতে হইবে। কর্ত্তা ঐ অন্তরিন্দ্রিয়ের সাহায্যে সুখ-দুঃখাদি অনুভব করিয়া থাকেন। আমরা ঐ কর্ত্তাকে আত্মা ও অন্তরিন্দ্রিয়কে মন বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলাম। প্রতিবাদী ঐ আত্মাকে মন এবং অন্তরিন্দ্রিয়কে অপর কোন নামে অভিহিত করিতেছে। ফলতঃ উত্তর পক্ষকেই পাঁচটী বহিরিন্দ্রিয়, একটী অন্তরিন্দ্রিয় ও এক স্বতন্ত্র কর্ত্তার অস্তিত্ব মানিতে হইল। আমরা ঐ কর্ত্তাকে আত্মা ও ঐ অন্তরিন্দ্রিয়কে মন বলিয়া অভিহিত করিয়াছি; প্রতিবাদী ঐ কর্ত্তার সংজ্ঞা করিলেন—মন ও ঐ অন্তরিন্দ্রিয়কে অপর কোন নামে অভিহিত করিবেন। ইহা দ্বারা প্রতীতি হইতেছে, আমরা যাহা স্বীকার করি, প্রতিবাদী সে সমস্তই স্বীকার করেন, প্রকৃত বিষয়ে কোন বিবাদ নাই, কেবল ঐ পদার্থগুলির নামকরণে পার্থক্য হইতেছে।

যদি বল, "বিষয়-সাক্ষাৎকারে ইন্দ্রিয়ের সহকারিতা প্রয়োজন হয়, একথা অগ্রাহ্য। দর্শন-সাক্ষাৎকারে চক্ষুর সহকারিতা প্রয়োজন হয়, ইহা কে বলিল? সুতরাং যে অনুমান দ্বারা সুখদুঃখাদির সাক্ষাৎকারের নিমিত্ত এক অন্তরিন্দ্রিয়ের অস্তিত্ব প্রমাণিত হইয়াছে, উহা ভ্রান্তি-মূলক"; তাহা হইলে আমাদের বক্তব্য এই—বিষয়-সাক্ষাৎকারে ইন্দ্রিয়ের সহকারিতা প্রয়োজন না হইলে অন্ধ ব্যক্তিও রূপ দর্শন করিতে পারিতেন, বধিরও শব্দ শুনিতে পারিতেন, অথচ ইহা নির্ব্বিবাদে বলা যাইতে পারে, অন্ধ ব্যক্তি রূপ দর্শন করিতে পারেন না ও বধির শব্দ শুনিতে পান না। সুতরাং এক একটী বিষয়ের সাক্ষাৎকারের নিমিত্ত এক একটী ইন্দ্রিয়ের অস্তিত্ব অঙ্গীকার করিতে হইবে। সুখ-দুঃখাদি-সাক্ষাৎকারের নিমিত্ত যে ইন্দ্রিয়ের প্রয়োজন হয়, সেই ইন্দ্রিয়ের নাম কি এবং যিনি সুখ-দুঃখ অনুভব করেন, সেই কর্ত্তারই বা নাম কি? ইহার উত্তরে মন ও আত্মার অস্তিত্ব প্রতিপন্ন হইবে।

যদি বল, "সুখদুঃখাদি-সাক্ষাৎকারের নিমিত্ত এক অন্তরিন্দ্রিয়ের (মনের) অস্তিত্ব অগত্যা স্বীকার করা গেল, সেই ইন্দ্রিয়ই কর্ত্তা, করণাতিরিক্ত কর্ত্তা স্বীকার করি না"; একথা বলিতে পার না, কেননা, করণ মাত্রই কর্ত্তার সহকারিতা ব্যতীত ক্রিয়া নিষ্পাদনে সমর্থ নহে।

"ইন্দ্রিয়ং কর্ত্তৃপ্রযোজ্যং করণত্বাৎ বাস্যাদিবৎ।" করণ (সাধন) মাত্রই কর্ত্তৃপ্রযোজ্য।

ইন্দ্রিয় করণ (সাধন), সুতরাং ইন্দ্রিয় কর্ত্তৃ-প্রযোজ্য। দৃষ্টান্ত —যেমন কুঠার—কর্ত্তৃ-প্রযোজ্য।

যেমন কুঠারাদি অস্ত্র অত্যন্ত তীক্ষ্ণ হইলেও কোন কর্ত্তা কর্ত্তৃক প্রযুক্ত না হইলে স্বয়ং বৃক্ষাদি ছেদন করিতে পারে না, সেইরূপ মনও জীবাত্মা-কর্ত্তৃক বিষয়ে ব্যাপৃত না হইলে স্বয়ং কোন জ্ঞান উৎপাদন করিতে পারে না। উল্লিখিত অনুমান দ্বারা অন্তরিন্দ্রিয়ের এক প্রযোক্তার অনুমান করিতে হইবে। অন্তরিন্দ্রিয়ের (মনের) সেই প্রযোক্তাই আত্মা।

উপরি-লিখিত যুক্তিসমূহ দ্বারা প্রতিপন্ন হইল,—কেবল কর্ত্তা বিষয়-সাক্ষাৎকার করিতে পারে না এবং কেবল করণ দ্বারাও বিষয়-সাক্ষাৎকার হয় না, কর্ত্তা ও করণ উভয়ই চাই; সেই কর্ত্তা—আত্মা ও করণ—চক্ষুরাদি মনঃ-পর্য্যন্ত ষড়িন্দ্রিয়।

যদি বল, "মন একাধারে কর্ত্তা ও করণ উভয়ই অর্থাৎ মনই কর্ত্তা, মনই করণ; মন মনের সাহায্যে অর্থাৎ স্বয়ংই জ্ঞান, সুখ-দুঃখাদি অনুভব করিয়া থাকেন"; তাহা হইলে উত্তর এই যে, কর্ত্তৃত্ব ও করণত্বের পরস্পর বিরোধহেতু একই পদার্থ যুগপৎ কর্ত্তা ও করণ উভয়ই হইতে পারে না যদি বল, "হইতে পারে," তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য এই—সেই কর্ত্তৃ-করণ মন (মন,—যিনি একাধারে কর্ত্তা ও করণ উভয়ই, তিনি) অণু, মহৎ (প্রকৃষ্ট-পরিমাণ-বিশিষ্ট) বা পরম-মহৎ (বিশ্বব্যাপক)? যদি মন মহৎ বা পরম-মহৎ হইত, তাহা হইলে যুগপৎ দর্শন-শ্রবণাদি জ্ঞান উৎপন্ন হইত; কেননা, যখন মন চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সহিত মিলিত হইয়া দর্শন-জ্ঞানোৎপাদনে ব্যাপৃত ছিল, সেই সময়ে কর্ণেন্দ্রিয়ের সহিত মিলিত হইয়া শ্রবণ-জ্ঞানোৎপাদনেও ব্যাপৃত থাকিতে পারিত। কিন্তু সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, যুগপৎ দর্শন-শ্রবণাদি জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। অতএব মন মহৎ বা পরম-মহৎ নহে।

যদি বল, "কর্ত্তৃ-করণ মন অণু," তাহা হইলে মনের গুণ জ্ঞান-সুখাদিও অণু হইবে; কেননা গুণীর অপেক্ষা গুণ স্থূলতর হইতে পারে না, ঘটের অপেক্ষা উহার আকৃতি বড় হইতে পারে না; কোন দ্রব্যের অপেক্ষা সেই দ্রব্যের গুণ অধিকতর-দেশব্যাপী হইতে পারে না। অতএব জ্ঞান অণু। * অণুবস্তুর প্রত্যক্ষ হয় না, সুতরাং জ্ঞান-সুখাদির প্রত্যক্ষ অসম্ভব। অর্থাৎ জ্ঞান-সুখাদি চক্ষুষাদি মানসপর্য্যন্ত কোন প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত হইবে না, অথচ জ্ঞান-সুখাদির মানস প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। নতুবা কেহই জ্ঞান-সুখাদির অনুভব করিতে পারিতেন না। সুতরাং যে মনকে তুমি একাধারে কর্ত্তা ও করণ উভয়ই বলিয়া স্বীকার করিয়াছ, সেই মন অণু; মহৎ বা পরম-মহৎ কিছুই নহে। যে বস্তু অণুও নহে, পরম মহৎও নহে, পরম-মহৎও নহে, এমন বস্তুই হইতে পারে না; অতএব মন একাধারে কর্ত্তা ও করণ এ কথা বলা অসঙ্গত।

মন একাধারে কর্ত্তা ও করণ উভয়ই হইতে পারে না অর্থাৎ মন আত্মা নহে এ প্রতিজ্ঞা নিম্নলিখিত তর্ক-শাস্ত্রোচিত ভাষায় বিশ্লেষণ করা যাইতে পারে।

কর্ত্তা করণের সাহায্যে বিষয়ের প্রত্যক্ষ করেন,—মন মনের সাহায্যে জ্ঞান-সুখাদির প্রত্যক্ষ করেন। কেননা, মনই কর্ত্তা, মনই করণ।

এই মন মহৎ, পরমমহৎ বা অণু ইহার অন্যতম হইবে। কিন্তু কোন প্রকারেই মন একাধারে কর্ত্তা ও করণ উভয়ই হইতে পারে না।

* প্রবন্ধ—সং; কিন্তু কতিপয় স্থলে কিছু আপত্তি আছে। [জ, ন।

১। 'অণু-মন অণু-মনের সাহায্যে অণুজ্ঞান-সুখাদির প্রত্যক্ষ করেন' এ প্রতিজ্ঞা ভ্রমপূর্ণ; কেননা, অণু বস্তুর প্রত্যক্ষ হয় না, সুতরাং জ্ঞান-সুখাদির প্রত্যক্ষ হইত না।

২। 'মহৎ-মন মহৎ-মনের সাহায্যে মহৎ-জ্ঞান-সুখাদির প্রত্যক্ষ করেন' এ প্রতিজ্ঞা ভ্রমাত্মিকা; কেননা, যে বস্তুর সাহায্যে প্রত্যক্ষ জন্মে, সেই বস্তু মহৎ বা প্রকৃষ্ট-পরিমাণ-বিশিষ্ট হইলে এককালে চক্ষুঃ-কর্ণাদিতে ব্যাপৃত থাকিয়া যুগপৎ দর্শন-শ্রবণাদি উৎপন্ন করিত।

৩। 'মহৎ-মন অণু-মনের সাহায্যে মহৎ-জ্ঞান-সুখাদির প্রত্যক্ষ করেন' এ প্রতিজ্ঞায় কোন দোষ নাই; কেন না অণুমনের সাহায্যে জ্ঞান-সুখাদির প্রত্যক্ষ হইতেছে বলিয়া যুগপৎ দর্শন-শ্রবণাদি উৎপন্ন হইতেছে না এবং যে জ্ঞান-সুখাদির প্রত্যক্ষ হইতেছে, তাহা মহৎ; সুতরাং তাহার প্রত্যক্ষেও কোন বাধা নাই।

এই মহৎ-মনই আত্মা ও অণু-মনই মন, সুতরাং আত্মা মনের সাহায্যে জ্ঞান-সুখাদির প্রত্যক্ষ করেন, ইহাই সিদ্ধান্ত। যদি বল, "আত্মা পরম-মহান্, সুতরাং তাঁহার যুগপৎ জ্ঞান-সুখাদি উৎপন্ন হউক"; তাহা হইতে পারে না; কেননা, যে মনের সাহায্যে তিনি জ্ঞান-সুখাদির প্রত্যক্ষ করিতেছেন, সে মন অণু। যদিও আত্মার যুগপৎ দর্শন-শ্রবণাদি করিবার ক্ষমতা ছিল, তথাপি যে মনের সাহায্যে দর্শনাদি করিতেছেন, সেই মন অণু বলিয়া যুগপৎ দর্শন শ্রবণাদি করিতে পারিতেছেন না।

অপিচ যদি অণু-মনই আত্মা হইত, তাহা হইলে এককালে সমস্ত অঙ্গের চৈতন্য থাকিতে পারিত না। অণু-মন যেকালে হস্তে থাকে সেকালে পদে থাকিতে পারে না। যেকালে মস্তকে থাকে, সেকালে হস্তে থাকিতে পারে না। এককালে কোন অঙ্গ চেতন ও কোন অঙ্গ অচেতন হইয়া পড়ে এবং এককালে দুই তিন অঙ্গের সুখ ও বেদনাদি অনুভব করা যাইতে পারে না। কিন্তু সকলেই এককালে দুই তিন অঙ্গের বেদনা অনুভব করিয়া থাকেন, সুতরাং অণু-মনই আত্মা নহে। আর আত্মা অণু হইলে এককালে বাম ও দক্ষিণ চরণ দ্বারা গমন অসম্ভব হইয়া পড়ে। কেননা, এক চরণ চেতন ও অন্য চরণ অচেতন থাকে। অথচ এককালে চরণাদির পরিচালন হইয়া থাকে, সুতরাং অণু-মন আত্মা নহে। আর আত্মা অণু স্বীকার করিলে তত্ত্বজ্ঞানীরা যে এককালে নানা শরীর কল্পনা করিয়া সুখ-দুঃখাদির কর্ম্ম-ফল ভোগ করিয়া থাকেন, ইহাও অসম্ভব হইয়া পড়ে; কেননা, অণু-বস্তু এককালে বহুশরীরে থাকিতে পারে না। কিন্তু আত্মা বিভু স্বীকার করিলে দোষ হয় না। যদি বল, "আত্মা যে বিভু, ইহার প্রমাণ কি?" ইহার প্রমাণ এই যে, যে বস্তু নিত্য ও অমূর্ত্ত তাহা বিভু। আত্মা নিত্য অর্থাৎ এখন আছে,—পরক্ষণে থাকিবেন না, এরূপ কালিক পরিচ্ছেদ আত্মায় বিদ্যমান নাই, এবং আত্মা অমূর্ত্ত, অর্থাৎ আত্মা বিশ হস্ত দীর্ঘে, দশ হস্ত প্রস্থে এরূপ কোন দৈশিক পরিচ্ছেদ আত্মায় নাই, সুতরাং আত্মা বিভু বা বিশ্ব-ব্যাপক।

"অণীয়াংসমণোরপি" "অণু হইতেও অণুতর" এই শ্রুতির অনুশাসন গ্রহণপূর্ব্বক কেহ কেহ বলেন,—আত্মা অণু। কিন্তু ইহা নিতান্ত অযুক্ত; কেননা, আত্মা বিভু না হইলে মন অণু হইতে পারিত না এবং আত্মা ও মন এতদুভয়ের সংযোগ বশতঃই জ্ঞানাদি ক্রিয়া উৎপন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং উদ্ধৃত শ্রুতিতে মনঃসংযুক্ত আত্মার বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে এবং মনের অণুত্ব বশতঃ উক্ত শ্রুতি-বিরোধও হইতে পারে না। ঐ শ্রুতির প্রথম পদে বিন্যস্ত

"মহতোঽপি মহীয়াংসম্" "মহৎ হইতেও মহত্তর" এই অনুশাসন প্রকৃত আত্মা বিষয়ক এবং "অণু হইতেও অণুতর" এই অনুশাসন মনোবিষয়ক। সুতরাং "মহতোঽপি মহীয়াংসমণীয়াংসমণোরপি" এই সমগ্র শ্রুতি মনঃসংযুক্ত আত্মা বিষয়ক, অতএব শ্রুতি আত্মার বিভুত্বের বিরোধি-কথা বলিতেছেন না। শ্রুতি বলেন,—

"অশরীরং শরীরেষনবস্থেষবস্থিতম্।
মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি॥"

অশরীরী আত্মা অনিত্য শরীরে অবস্থিত আছেন। এই মহান্ ও বিশ্বব্যাপক আত্মাকে জানিয়া ধীর ব্যক্তি শোক করেন না।

শ্রীসতীশচন্দ্র আচার্য্য বিদ্যাভূষণ।

আসাম-চিন্তা।

(প্রাকৃতিক দৃশ্য)

স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যের কেন্দ্রস্থান—আসাম। কাশ্মীর "ভূ স্বর্গ" বলিয়া কথিত। কাশ্মীরে কখন যাই নাই;—তথাকার শোভা-সৌন্দর্য্যের বিষয় বিশেষ বিদিত নহি; কিন্তু আসামে গিয়াছিলাম, তথাকার কতক কতক বিষয় বলিতে পারি। "কতক-কতক"—কেননা, আসাম একটুখানি দেশ নহে। বারটী জেলায় বিভক্ত শ্রীহট্ট-কাছাড়-সমন্বিত আসামের সর্ব্বত্র পরিদর্শন করা সহজ নহে। তবু ইহার যেটুকু দেখিয়াছি, তাহাতেই বলিতে ইচ্ছা হয় যে, এরূপ সুন্দর-প্রকৃতি ধরাতলে বুঝি অন্যত্র নাই। এমন মনোহর প্রাকৃতিক দৃশ্য (Lands-cape Sceneries),—প্রাকৃতিক-সৌন্দর্য্যের একত্র সমাবেশ ভারতের আর কুত্রাপি পরিদৃষ্ট হয় কিনা সন্দেহ।

কবিতাময় দেশ। কবিতা ইহার সর্ব্বত্র। কবিতা—ইহার ভীম-কল্লোল, প্রবল-বেগশালী, দিগন্ত-প্রসারী ব্রহ্মপুত্রে; কবিতা—ইহার বর্ষা-বারি-বিধৌত শ্যামল বৃক্ষপত্রে; কবিতা—ইহার ঝিঁঝিরিণী-পুলকিত বিহঙ্গম-নিনাদিত শ্বাপদ-রব-শঙ্কিত শ্যামল-কানন-পরিবৃত গিরিগাত্রে। কবিতা—ইহার পক্ষীকূজনে; কবিতা—ইহার আরণ্য জীবগর্জ্জনে; কবিতা—ইহার নরনারী-গণের আননে। কবিতা ইহার কোথায় নাই? "সুষ্যি-মামার দেশ!" স্বপ্নময় রাজ্য! এমন স্বপ্ন-সুখ-শান্তিপূর্ণ রাজ্যে বাস করিতে পাইলে কে আর অন্যত্র যাইতে চায়? মানব শুভ ভাব-কল্পনার দাস। বেশী দূর যাইবার আবশ্যক নাই, একবার ঐ "ভুবনেশ্বরীর" তুঙ্গ গিরি-শৃঙ্গে আরোহণ করিয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টি চালাও দেখি! ঐ দেখ, কলকল-নাদে অচল-চরণ-তল ধৌত করিয়া প্রাচীন লৌহিত্য * বৃহদ-জগরগতিতে আঁকা-বাঁকা ভাবে এক সীমান্ত হইতে বাহির হইয়া কতদূরে সেই অপর সীমান্তে গিয়া মিলিতেছে! সম্মুখেই ঐ জলরাশির বক্ষ ভেদ করিয়া ফুলফল-ভারাবনত তরুলতা-পরিবৃত প্রফুল্ল ক্ষুদ্র "উমানন্দ-শৈল" সমুত্থিত। সলিলোত্থিত ক্ষুদ্র শৈল। কিন্তু ভাব কল্পনায় মহান্, অসীম, অনন্ত। ঐ ক্ষুদ্র গিরিশিরে চরাচর-বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী মহাকাল মহাভৈরব সমাসীন। সান্ত অনন্তে মিলিত। ক্ষুদ্র মহত্ত্বে পরিণত। ভক্তি-বিভোর ব্রহ্মপুত্র চরণতলে চারিদিকে বেড়িয়া বেড়িয়া স্তুতিপাঠ করিতেছে। পুলকে প্রাণ উথলিয়া উঠে। কিন্তু আরও দেখ,—চারিদিক ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখ,—এমন বিচিত্র-চিত্র কখন নয়নগোচর করিয়াছ কি? ইতস্ততোবিক্ষিপ্ত-শৈল-সঙ্কুল উপত্যকাধিত্যকা-সমাকীর্ণ প্রান্তর বহুদূরে দিগন্তের সহিত মিশিয়া গিয়াছে। যেন

* ব্রহ্মপুত্রের নামান্তর "লৌহিত্য"।

হরিৎ-নীল দুকূলে দেহাবৃত করিয়া প্রকৃতি বিরাট মহাপুরুষের ধ্যানে নিমগ্ন। অযত্ন-বিন্যস্ত তটিনীর হার অঙ্গে আঁকিয়া-বাঁকিয়া শোভা পাইতেছে। নব-নীরদ-শ্যামদ্যুতি ভূটিয়া-শৈলশ্রেণী স্তম্ভিতভাবে এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান। তাহারও পশ্চাতে (বহুদূরে) দিগন্ত ভেদ করিয়া অভ্রভেদী হিমাচলশৃঙ্গ রৌদ্রপ্রদীপ্ত তুষার-গৌর মুখখানি বাড়াইয়া একদৃষ্টে চাহিয়া আছে! এমন সুরঞ্জিত চিত্র,—এমন জীবন্ত ছবি আর কখন দেখিয়াছ কি?—এমন কাব্য-কাননে আর কখন ভ্রমিয়াছ কি? কি 'ভেড়া-বনার' কথা শুনিয়া রাখিয়াছ?—কি-এক মহা-মন্ত্রে হৃদয় মন আত্মহারা হইয়া পড়ে;—যেন অসীমের সহিত মিশিয়া যায়। চৌম্বকাকৃষ্ট মন তাহা হইতে আর আপনাকে ছাড়াইতে পারে না, তা আর ফিরিয়া আসিবে কি?

আর ইহার প্রধান প্রধান স্থানগুলির যেখানেই যাও, সেইখানেই স্মৃতি পৌরাণিক কালের মধ্যে আনিয়া উপস্থিত করে। পুরাণ কবি কল্পনা হউক বা না হউক, সে তর্কে আমার প্রয়োজন নাই;—কিন্তু ইহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি যে, পুরাণ-বর্ণিত স্থান সকল দেখিতে দেখিতে চিত্ত এক কবিতাময় ভাবে বিভোর হইয়া উঠে। আসামের প্রবেশ-দ্বার "ধুবড়ীতে" আসিয়া উপস্থিত হইলেই "মনসার ভাসান" মনে আসে। "আসাম ভ্রমণ" প্রণেতা উদাসীন সত্যশ্রবা (পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন?) মহাশয়ের মতের অভিপ্রায় এই যে, এখানে নেতা-ধুবীর (নেতা-ধোপানীর) ঘাট থাকায়, সেই "ধুবী-বুড়ী" শব্দের সঙ্কোচেই এই স্থানের নাম "ধুবুড়ী" বা "ধুবড়ী" হইয়াছে। কথাটা অসম্ভব না হইতে পারে। অদ্যাপি ব্রহ্মপুত্র তেমনি করিয়া সেই নেতাধুবীর ঘাটের সুবিন্যস্ত সোপানাবলীর উপলখণ্ড সকল ধৌত করিয়া প্রবাহিত হইতেছে এবং কলকল রবে অব্যক্ত-ভাষায় বেহুলা-লক্ষীন্দরের প্রণয়-বিজয়-গীতি দর্শক-মানবের নিকট ব্যক্ত করিতেছে।

"গৌহাটীকে" পৌরাণিককালে "প্রাগ্-জ্যোতিষপুর" বলিত। এতদঞ্চলই নরকাসুর ও তৎপুত্র মহাভারতীয় ভগদত্তের রাজ্য। কথিত আছে,—এই নরক-রাজা অত্যন্ত রিপুপরবশ ছিলেন এবং ষোড়শ-সহস্র যুবতীকে হরণ করিয়া আনিয়া, উমানন্দ-পর্ব্বতের নিকটে ব্রহ্মপুত্রের গর্ভে যে 'উপল-বিষম' স্থানকে "উর্ব্বশী" বা "কর্ম্ম-নাশা" বলে,—সেইখানে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন। পশ্চাৎ শ্রীকৃষ্ণ নরকাসুরকে বধ করিয়া তাহাদিগের উদ্ধার-সাধন করেন। আমি গৌহাটীর এই 'উমা-নন্দ' শৈল ও তৎসম্মুখবর্ত্তী নীলাচলস্থ 'ভুবনেশ্বরী' শৃঙ্গের শোভার কথাই ইতিপূর্ব্বে বলিতেছিলাম। এই নীলাচলের মধ্য-শৃঙ্গেই প্রসিদ্ধ "কামাখ্যাদেবীর" মন্দির। কামাখ্যাপর্ব্বতে উঠিবার চারিদিকে চারিটী শিলাময় সুপ্রশস্ত সুন্দর সোপান। এই সোপানাদি সম্বন্ধেও একটী গল্প প্রচলিত আছে। এক সময়ে নরক-রাজা কামাখ্যাদেবীকে বিবাহ করিবার বলবতী ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, তিনি বলেন যে, এক রাত্রি মধ্যে তাঁহার পর্ব্বতে উঠিবার চারিদিকে চারিটী সোপান মন্দির, সরোবর প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া দিতে পারিলে তিনি তাহার মনোরথ সফল করিবেন। নরক রাজা ইহাতে পরম পরিতুষ্ট হইয়া, 'বিশ্বকর্ম্মাকে' ডাকিয়া, তৎসমুদায় নির্ম্মাণের আজ্ঞা দিলেন। শেষ-নিশায় কার্য্য সমাপ্তপ্রায় হইয়াছে দেখিয়া, দেবী প্রমাদ গণিয়া, কুক্কুটকে ডাকিতে আদেশ করিলেন। তখন সেই কুক্কুটরবে স্বীয় প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই প্রভাত হইয়াছে ভাবিয়া, নরকভূপ ক্ষোভে ও রোষে কুক্কুটের শিরশ্ছেদ করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। যে স্থানে কুক্কুট নিহত হয়, সেই স্থানটীকে আজি পর্য্যন্ত

তথাকার লোকে "কুকুরা কটা-চকি" বলিয়া থাকে। কামাখ্যাপর্ব্বতের উপর ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান সকল ভ্রমণ করিতে করিতে উক্তরূপ পৌরাণিক কাহিনী সকল স্মৃতিপথে উদিত হয় এবং মনে হয় যেন আমরা মহাভারতীয় কোলাহলের মধ্যে ডুবিয়া যাইতেছি।

গোয়ালন্দ হইতে বাষ্পীয় জলযানে দ্বিতীয় দিবসে ধুবড়ী, তৃতীয় দিনে গৌহাটী এবং চতুর্থ দিবসে "তেজপুরে" পৌঁছান যায়। এ কয়টী গ্রামই ব্রহ্মপুত্রের উপকূলে স্থিত। তেজপুরও একটী পৌরাণিক জনপদ। ইহার প্রাচীন নাম 'শোণিতপুর'। এই স্থানে সুপ্রসিদ্ধ বলি-রাজ-বংশজাত বাণ-রাজার রাজধানী ছিল। ইহার নিকটে "অগ্নিগড়" নামে একটী আগ্নেয়-পর্ব্বত আছে। প্রবাদ যে, উহাই বাণ-রাজার নির্ম্মিত অগ্নি-গড়ের সীমা। এই অগ্নিগড় মধ্যে বাণকন্যা ঊষার অবস্থান-কালে কামদেব-কুমার অনিরুদ্ধ তাঁহাকে হরণ করিয়াছিলেন। আজিও এখানকার লোকে তেজপুরকে "ঊষানগরী" বলিয়া থাকে। ইহার যেখানে আজকাল দেওয়ানী, ফৌজদারী, কালেক্টারী প্রভৃতি কাছারী সকল স্থাপিত হইয়াছে, সেইখানে কয়েকটী পুরাতন অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ ছিল। কিন্তু হায়!—

"উপহাসি সর্ব্বে মানব-গর্ব্বে
কাল প্রবল চিরকালে ও।
গৃহ-গড় পুঞ্জে কতিপয় তুঞ্জে
রাখিল করি বিকলাকৃতি ও॥"

আজিও উক্ত স্থানের কোথাও একটু ভগ্নস্তম্ভ, কোথাও বা একটু ভগ্ন-কার্ণিস, কোথাও বা একটী ভগ্ন পদ্ম কিংবা অন্য কোন ফুল এবং কোথাও বা একটু ভগ্ন রেলিং শ্মশানক্ষেত্রে পতিত অস্থি-কঙ্কালের ন্যায়, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। এক স্থানে কেবল একটী তোরণের স্তম্ভ ও তৎসংলগ্ন লতাকার একটু রেলিং অতীতকালের সাক্ষীস্বরূপ অক্ষত দণ্ডায়মান আছে। স্তম্ভতলে বৌদ্ধমূর্ত্তি ও রেলিং মধ্যে কয়েকটী জন্তুর আকৃতি অঙ্কিত। এই সকলের সুন্দর কারুকার্য্যে মন মুগ্ধ হয়। ইহাদের দেখিতে দেখিতে আমাদের বলি, বাণ, ঊষা, অনিরুদ্ধ প্রভৃতির পৌরাণিক কাহিনী সকল—

"স্মরণে আসি মরম পরশে কথা
ভূত সে ভারত-গাথা ও।" *

আসামের আর একটী পৌরাণিক স্থান—"বশিষ্ঠাশ্রম"। এখানে সূর্য্যবংশীয়-রঘু-কুলগুরু বশিষ্ঠদেব যোগারাধনা করিতেন বলিয়া ইহার নাম "বশিষ্ঠাশ্রম"। এই বিজন পার্ব্বত্যকানন ব্রহ্মপুত্র-তীরবর্ত্তী নহে। ইহা গৌহাটী হইতে আনুমানিক ২।৩ ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত। এটীর ন্যায় পরম মনোরম স্থান সমগ্র আসামে আর দ্বিতীয় আছে কিনা সন্দেহ। অবিরাম বিহঙ্গমকুলের শ্রুতিমধুর কলরব,—তাহার সহিত প্রস্রবণের ভীমগম্ভীর জলপ্রপাত-শব্দ;—তীব্রে মধুরে কি সুন্দর সম্মিলন! প্রস্ফুটিত নাগেশ্বরী চাঁপার সৌরভে অরণ্য আমোদিত। আর এই পুষ্পবৃক্ষের ঘন-সন্নিবেশে কাননতল দিবসেও প্রায়ান্ধকার। পাছে স্বকীয় বংশগুরু যোগিবরের ধ্যানভঙ্গ হয় এই আশঙ্কায় দিনকর তথায় কর-বিস্তার করিতে যেন ভীত—সঙ্কুচিত। মরি মরি! এ যেন যথার্থই ভূতলে কৈলাস—

"সর্ব্বর্ত্তুকুসুমাকীর্ণে সর্ব্বর্ত্তুফলশোভিতে।
শৈত্য-সৌরভ্য-মান্দ্যাঢ্যমরুদ্ভিরুপবীজিতে।
স্থিরচ্ছায়দ্রুমাকীর্ণে বিহঙ্গমনিনাদিতে!"

আবার এদিকে এই যে, গিরি-নির্ঝর-সমুৎপন্ন ত্রিধারা—শান্তা, কান্তা ও ললিতা,—এ কি ভোগবতী, ভাগীরথী মন্দাকিনী?—না, জাহ্নবী, যমুনা, সরস্বতী? তপোবন এইরূপ শান্তরসাস্পদ স্থানই বটে। প্রবেশমাত্রই চিত্তের চমক ভাঙ্গিয়া যায়;—প্রাণের উদারতা বাড়িয়া সে অনন্তের দিকে প্রধাবিত হয়। পুলকপ্রফুল্ল প্রাণ তখন সীমাবদ্ধ সংসার-পিঞ্জর ভাঙ্গিয়া অসীমে উড়িতে থাকে। উড়িতে উড়িতে কখন বোধ হয়, সে যেন মোহকর পরমানন্দদায়ক কোন স্বপ্নময় রাজ্যে বিচরণ করিতেছে,—কখন মনে করে, সে যেন কবিতাময় নন্দনকাননে ভ্রমিয়া বেড়াইতেছে, সেখানে সৌরভে দিক্ আমোদিত করিয়া থরে থরে মন্দার ও নাগকেশর

"কুসুম উঠিছে ফুটিয়া
মলয় ছুটিছে সুরভি লুটিয়া রে;
সেথা তটিনী ছুটে, জোছনা ফুটে,
প্রমোদে কানন ভোর!"

আসামের যেখানেই যাও, সেইখানেই প্রকৃতি-দেবী মানবের মন-শিশুকে লইয়া এইরূপে নাচায় ও খেলায়। তাহাকে "ভেড়া বানাইয়া" নিজের ক্রোড়ে লুকাইয়া রাখে। তথা হইতে—সেই পরম আরামের ক্রোড় হইতে তাহার মাথা তুলিয়া উঠিবার সামর্থ্য পর্য্যন্ত থাকে না। আসামে প্রকৃতির এমনি প্রবল-প্রতাপ!—প্রকৃতির এখানে পূর্ণবিকাশ;—স্বভাব এখানে সজীব বিদ্যমান।

শ্রীহরিচরণ রায়।

---

* আমরা এতদ্দেশবাসী হিন্দু। এই সকল ভগ্নাবশেষ দেখিয়া আমাদের মনে ত নানাপ্রকার শান্ত ও করুণভাবের উদয় হইবেই। বিদেশিনী বিবি ওয়ার্ড এই সকল দর্শন করিয়া কি লিখিয়াছেন, পাঠক একবার পাঠ করুন,—

"Goahati, Tezpur, and many places in upper Assam, are strewn with the debris of former grandeur; lofty granite pillars, stone blocks and slabs, elaborately carved with scrolls and figurs in relief, are found half-buried or scattered about in great numbers. King's massive brick palaces and theatres are hidden in jungle; golden ornaments and dishes are exhumed from ancient tombs; all these relics tell a sad story of the depletion and devastation of the past."—

Mrs. Word's "Glimpse of Assam" Page 18.

নিরাশার স্মৃতি।

১

(প্রয়োগ)

কেন স্মৃতি জেগে উঠ, থাকিয়া থাকিয়া,
স্বপন ভাঙ্গিতে কিহে চাও!—
নয়ন মুদ্রিত আছে;— কাজ কি জাগিয়া?
কেন আর ঘুমন্তে কাঁদাও?
জীবনের পথশ্রান্ত নিদ্রিত-পরাণে
কাজ কি ঢালিয়া পুনঃ প্রাণ?
সংসার-দুঃখের-ঘোরে ঘুমন্ত দেখিয়া,
হয়েছে রে সে দীপ নির্ব্বাণ॥

২

(উচ্ছাস)

ওরে,
অশ্রুজল আছে হেথা, ফেলিতে বাসনা নাই,—
হৃদয়েতে বাষ্প হয়ে থাক;
আগুন জ্বলেছে বড়, নিবাইয়া কাজ নাই;
স্মৃতি মোর সব পুড়ে যাক!
জোছনা শীতল বড়,— দেখে কিন্তু দহে প্রাণ
এ আগুন হয় না নির্ব্বাণ;—
জুড়াতে বাসনা নাই, কাজ কি জলুক সুখে
এ বিকার জীবনের টান॥
সমুদ্রে তরঙ্গ উঠে, তীরে যবে ভেঙ্গে যায়
নূতন হয় না পুনঃ আর,
শরদে জোছনা ফুটে বরষে নিবিয়া যায়
লীলা এই আছে বিধাতার।

৩

(শাখা)

কিন্তু,
গভীর হৃদয় মাঝে একটী তরঙ্গকণা ;—
চির উদ্বেলিত তাহে, এ অনন্ত প্রাণ ;
নীলাম্বু-সাগর-স্নিগ্ধ এ হৃদি কৌমুদী-খেলা
কভু তো রে হয় না নির্ব্বাণ ॥

৪

(আরম্ভ)

তবে,
"বসন্তের বিকসিত- মাধবী-সৌগন্ধ মাখা,"
স্মৃতি বলে, "দেখ একবার"
"বীণার ক্বণিত হতে মধুর সে আধভাষা
শুন ওরে সে সুখঝঙ্কার।
অলস নয়ন-পথে সে কম মোহিনী ছায়া
নিরখি শীতল কর প্রাণ"
ঘুমন্ত প্রাণের মাঝে অস্ফুট তড়িত বহে
অমনি মরমে দেয় টান।
অবশ পরাণ মোর অমনি কাঁদিয়া উঠে
জ্ঞান-হারা শূন্য পানে চাই ;
স্মৃতিময় সমীরণ হৃদয় অবশ করে,
ভাবি কোথা উড়িয়া পলাই।
জোছনার রশ্মি ধরি উঠি তবে শূন্যপথে
দেখিতে সে চাঁদ কোথা মোর,
হৃদয় আগুন দিয়ে, সাগর শুষিয়া লই
দেখি যদি রাখে রত্নচোর।
অথবা ফুলের দলে যাই তবে খুঁজিবারে
যদি থাকে হয়ে ফুলরাণী ;
মেঘের আড়ালে কিবা, লুকায়ে চলিয়া গেছে
হইবারে স্থির সৌদামিনী ॥

(বিরাম

অমনি বাধন পড়ে, স্মৃতি বলে, 'কোথা যাও'
'দেখনা রে বন্ধন তোমার'!
সে কম মূরতি তবে হৃদিপটে দেয় এঁকে
দেখি কিবা মাধুরি তাহার!
পুনঃ স্মৃতি এসে বলে, "দেখ,—দ্বার উদ্ঘাটন
কি তোমার মনের মতন"—
স্বপ্নময় দেখি সব জ্ঞান-হারা হ'য়ে রই ;
পাইনাকো মুছাই নয়ন।
কোমল মধুর ধ্বনি অমনি রে থামে তায়,
পুনঃ আমি হারাই চেতন ;
বিভোর স্বপন-বশে পরাণ নুড়িয়ে পড়ে,—
দুঃখময় সে সুখ-স্বপন।
অলস হইয়া পড়ে মনের বিকার যত,
স্বপ্ন যত হয় সব চুর,
নিদয়ে বিভোল করি অজ্ঞান ধরয়ে তান
থেমে যায় হৃদয়ের সুর।
স্মৃতিবলে—'কেন আর—গিয়াছে অঙ্কুর'॥

শ্রীনৃত্যগোপাল ভট্টাচার্য্য।

ভারতবর্ষে রেসম-বাণিজ্য।

(১)

ভারতবর্ষ অতি প্রাচীন কাল হইতে রেসম-ব্যবসায়ের জন্য প্রসিদ্ধ। কথিত আছে যে, পুরাকালে রোমকেরা এদেশ হইতে রেসম-সূত্র সকল লইয়া গিয়া স্বদেশে স্বর্ণের সহিত সম-ওজনে বিক্রয় করিতেন। কিন্তু এক্ষণে আর সে দিন নাই। এক্ষণ এক রোম হইতেই প্রতি বৎসর প্রায় ১,৭১,৭৫০ মণ রেশম পৃথিবীর অন্যান্য দেশে রপ্তানী হয়। বর্ত্তমান সময়ে দেখা যাইতেছে যে, ইংলণ্ডের সহিতই রেসম-বাণিজ্য সম্বন্ধে ভারতবর্ষের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। কিন্তু সেই ইংলণ্ডই হউরোপীয় অন্যান্য দেশের সহিত প্রতিযোগিতায় ক্রমশঃ হঠিয়া যাইতেছে। ইংলণ্ডে রেসম-শিল্প সম্বন্ধে শ্রমজীবীদিগের

মধ্যে যেরূপ স্বর্ম্মঘট চলিতেছে, অন্য কোন শিল্প সম্বন্ধে এরূপ নহে। বিলাতে লিষ্টার কোম্পানীই এক্ষণে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রেসম-শিল্পী, কিন্তু তাঁহারাও সপ্তাহে কেবল চারি দিন মাত্র কারখানা চালাইতে সক্ষম। ইংলণ্ডের শ্রম-জীবীরা মাসিক ৬০৲ টাকা বেতনেও সন্তুষ্ট নহে, কিন্তু ইতালী ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের শ্রমজীবি-দিগের পক্ষে ৩০৲ টাকা বেতনই যথেষ্ট। অথচ রেশম-শিল্পের নৈপুণ্য সম্বন্ধে এই দুই দেশই ইংলণ্ডের সমকক্ষ। কয়েক বৎসর একা লিষ্টার কোম্পানীই আমেরিকায় প্রতি বৎসর ৫০ লক্ষ টাকার মখমল রপ্তানী করিতেন, এক্ষণে উহা কমিয়া ৬ লক্ষ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। এতদ্দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, যেমন ইংলণ্ডের রেসম-বাণিজ্য ক্রমশঃ হ্রাস হইতেছে, সেই সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষেরও রেসম-বাণিজ্য ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে।

পূর্ব্বে এতদ্দেশের অতি ধনাঢ্য ব্যক্তি হইতে সামান্য পর্ণকুটীরবাসী কৃষক পর্য্যন্তও কোন না কোন প্রকারে এই ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিতেন। নিম্ন কৃষকেরা কেবল রেসম-কীট-পালন দ্বারাই বেশ দশ টাকা লাভ করিত এবং উচ্চ-শ্রেণীস্থ ধনাঢ্যেরা রেসম-সূত্র প্রস্তুত ও তাহা হইতে বস্ত্রবয়ন প্রভৃতি ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিয়া প্রচুর লাভবান্ হইতেন। এক্ষণে কোনও রেশমপ্রধান পল্লীতে গমন করিয়া কৃষকদিগের দুরবস্থার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেই তাহারা সমস্বরে উত্তর দিবে যে, রেসম-বাণি-জ্যের অবনতিই তাহাদের এই দুরবস্থার প্রধান কারণ। পূর্ব্বকালে অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি প্রভৃতি দৈব উৎপাত দ্বারা দেশে অজন্মা হইলেও কৃষকেরা তাহাতে বড় একটা কাতর হইত না, এক রেসম ব্যবসায়ের গুণেই বেশ সুখ-স্বচ্ছন্দে সংসার চালাইত। মির্জ্জাপুরের সর্ব্বপ্রধান তন্তুবায় জয়কৃষ্ণ, মৃত্যুঞ্জয় প্রভৃতি এবং বালু-চরের দুবরাজ ইহাঁদের পূর্ব্ব অবস্থার সহিত বর্ত্তমান অবস্থার তুলনা করিলে যার-পর নাই দুঃখিত হইতে হয়। এই রেসম-বাণিজ্যের অবনতির কারণ স্থির করিতে পারিলেই ইহার উন্নতির উপায়ও হইতে পারে। নিম্নরূপ কারণ পরম্পরায় এহেন সোনার ব্যবসায় ক্রমশঃ লোপ পাইতেছে।

(১) ইংরেজ-রাজত্বে ব্যবসায়ের উপর গবর্ণ-মেণ্টের হস্তক্ষেপ করিবার নিয়ম নাই এবং গবর্ণমেণ্টও এতৎ সম্বন্ধে কৃষকদিগকে কোনও রূপ সাহায্য করেন না। কিন্তু ফ্রান্স, ইতালী প্রভৃতি দেশের গবর্ণমেণ্ট সাক্ষাৎ সম্বন্ধে রেসম-প্রস্তুতকারী ব্যক্তিগণকে সাহায্য করিয়া থাকেন। ১৮৯২ খৃঃ অব্দে ফরাসী-রাজ্যে এমন এক আইন হয় যে, প্রত্যেক রেসমপ্রস্তুতকারী প্রতি সের রেসম প্রস্তুতের জন্য ।৵০ ছয় আনা করিয়া পারিতোষিক প্রাপ্ত হইবে। এতদ্দ্বারা উক্ত বৎসরই ফরাসী গবর্ণমেণ্টকে ২০ লক্ষ টাকা দান করিতে হয়। এই উৎসাহ দানের ফলস্বরূপ সে বৎসর পূর্ব্ববৎসরাপেক্ষা প্রায় ৯৮০০০ পাউণ্ড রেসম অধিক উৎপন্ন হয়। এইরূপ গবর্ণমেণ্টের ক্রমশই উৎসাহ দ্বারা ফরাসী রাজ্য রেসম-বাণিজ্যে উন্নতি লাভ করিতেছে। আমরা যে গবর্ণমেণ্টের নিকট এরূপ সাহায্য পাইব, সে আশা অতি বিরল। এরূপ স্থলে আমাদের সাধারণের অন্তর্বাণি-জ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিলেই কথঞ্চিৎ উন্নতি হইতে পারে।

(২) ফ্রান্স ও ইতালী দেশের বিদ্যালয়সমূহে রেসম-ব্যবসা সম্বন্ধে রীতিমত শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। রীতিমত শিক্ষা ও উদ্যোগ ব্যতীত কখনই কোন কার্য্যের উন্নতি হইতে পারে না। এতদ্দেশের বিদ্যালয়সমূহে রেশম-ব্যবসায় সম্বন্ধে শিক্ষার কোনও বন্দোবস্ত না থাকাই রেসম-বাণিজ্যের অবনতির প্রধান

কারণ। অধুনা বঙ্গভাষায় রেসম-বিদ্যা বিষয়ক ২।১ খানি ভাল গ্রন্থও প্রকাশিত হইয়াছে। শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর যদি ২।১ খানি রেসম বিষয়ক গ্রন্থ ছাত্রবৃত্তি ও নরম্যাল স্কুলের বালকগণের পাঠ্য-তালিকাভুক্ত করিয়া দেন, তবে তাঁহা দ্বারাও রেসম-ব্যবসায়ের অনেক উন্নতি হইতে পারে।

(৩) এতদ্দেশের বানকী-রেসম বিলাত, ফ্রান্স, চীন ইতালী প্রভৃতি দেশের রেসম অপেক্ষা সেরকরা ৬।৭ টাকা কম মূল্যে বেচিলেও ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় না। অথচ রেসম-সূত্রের নিকৃষ্টতাও প্রতীয়মান হয় না। এত সুবিধা সত্ত্বেও যে এদেশের বানকী-রেসম আদরের সহিত বিক্রয় হয় না, তাহার প্রধান কারণ, এদেশীয় বানকী-রেসম ফিরান-করা নহে। সুতরাং উহার মধ্যে অনেক কাটা-কুটা থাকে। বিজ্ঞানবলে ইউরোপের প্রায় সকল কার্য্যই আজ-কাল কলের দ্বারা সম্পাদিত হয়। এদেশীয় বানকী-রেসম স্থানে স্থানে ছিন্ন প্রযুক্ত উহা কলে ব্যবহৃত হয় না। সুতরাং মজুরের দুর্মূল্যতা প্রযুক্ত ইউরোপে উহার আদর হইতে পারে না। যদি এদেশের বানকী-রেসম ফিরান করিয়া ও সুতা পাকাইয়া বিলাত ও অন্যান্য দেশে রপ্তানী করা যায়, তবে উহা বড়ই আদরে বিক্রয় হইবে এবং এতদ্দ্বারা রেসমবাণিজ্যও উন্নতির পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইবে। বিলাতের এক রেসম-ব্যবসায়ী কোম্পানী এদেশীয় ফিরান-করা রেসম পাইবার জন্য অতিশয় আগ্রহ-সহকারে আমাকে লিখেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, আমি এ পর্য্যন্তও তাহাতে সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই।

(৪) কোম্পানীর আমলে ভারতবর্ষ হইতেই প্রায় সমস্ত রেসম বিলাতে রপ্তানী হইত, কিন্তু সুয়েজ খাল কাটাতে চীন ও জাপান ভারতবর্ষের সহিত প্রতিযোগিতা করিবার সুবিধা পাইল এবং ইউরোপে ফ্রান্স ও ইতালীর সহিত ইংলণ্ডের প্রতিযোগিতা চলিতে লাগিল; এইরূপ প্রতিযোগিতা দ্বারাই ভারতবর্ষ চীন ও জাপানের নিকট এবং ইংলণ্ড ফ্রান্স ও ইতালীর নিকট পরাস্ত হইল।

(৫) রেসম-ব্যবসায়ের উন্নতির আর একটী প্রধান অন্তরায় রেসম-কীটের ব্যাধি। ব্যসনী (Rearer) ৮০।৯০ টাকার তুত পাতা খাওয়াইয়া পোকাগুলি পালন করিল, ২।১ দিন মধ্যেই তাহারা পাকিয়া ৩০০,৩৫০ টাকার রেসম প্রস্তুত করিবে; কিন্তু হঠাৎ পোকাগুলি মরিয়া গিয়া পালনকারীকে সমূহ ক্ষতিগ্রস্ত করিল। সেও এইরূপ ২।১ বার ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পরে ব্যবসায়টী একবারে ছাড়িয়া দিল। বলা বাহুল্য যে, এইরূপেই রেসম-ব্যবসায় ক্রমশঃ লোপ পাইতেছে।

শ্রীকালিদাস ঘোষ।

ফরাস্ যুবক।

(১)

মান্দ্রাজ—চিড়িঙ্গাপটিতে একটী ক্ষুদ্র মুসলমান-পরিবার বাস করিত। পরিবারের মধ্যে, মোতিয়া-নাম্নী একটী দশম-বর্ষীয়া বালিকা আর তাঁহার এক দূর-সম্পর্কীয়া বৃদ্ধা নানী বা দিদি-মা। গোলপাতার ছাউনি দেওয়া একখানি সামান্য নাতিবৃহৎ গৃহে উহারা বাস করিত। ঘরের অর্দ্ধেকাংশ যুড়িয়া, চেরা-বাঁশের নির্ম্মিত একটী মাচা। মাচায় দুইজনে শয়ন করিত; অপরার্দ্ধে রান্না-বাড়ার কাজ হইত।

বুড়ী চরকায় সুতা কাটিত। সেই সুতা বেচিয়া যে কিঞ্চিৎ অর্থাগম হইত, তাহাতে

কষ্টে-শ্রেষ্টে দুই জনের জীবিকা নির্ব্বাহ হইত। বুড়ী যতক্ষণ চরকা কাটিত, মোতিয়া তাহার কাছে বসিয়া, নাটাইয়ে কাটা-সুতা জড়াইত; আর নিত্য দুইবেলা রসুই করিত, বাসন-কোসন পরিষ্কার করিত। বুড়ী ভুলক্রমে একদিনও উননের মুখে আগুন দিত না।

বৃদ্ধার মেজাজ বড়ই রুক্ষ ছিল। এ রুক্ষতার সঙ্গে বার্দ্ধক্যের কোনই সম্পর্ক ছিল না। বিশেষ কোন কারণ উপস্থিত না হইলে, অপর কেহ তাহার সেই রূঢ় আচরণের ভাগী হইত না। কিন্তু, মোতিয়াকে প্রতিদিনই তাহার মুখনাড়, লাথী-চড় সহ্য করিতে হইত। দোষের প্রকৃত কোন কারণ না থাকিলেও, একটা ছুতানাতা ধরিয়া, তাহাকে এইরূপে নির্যাতন করা, বৃদ্ধার নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম ছিল। বৃদ্ধা কোন কোন দিন সকাল-বেলা সুতা বিক্রয় করিতে বাহির হইয়া, সন্ধ্যার পর ফিরিয়া আসিত। বালিকা রাধিয়া-বাড়িয়া, দিদিমার ভাত হাঁড়িতে রাখিয়া, নিজে আহার করিয়া শুইয়া পড়িত। সেদিন বুড়ী মোতিয়াকে মারিতে ধরিতে পাইত না বলিয়া, 'সেদিনটা বৃথায় গেল' মনে করিত। তবে, ঘুম হইতে জাগাইয়া যে গায়ের ঝাল ঝাড়িত না, মোতিয়ার প্রতি এইটুকু অনুগ্রহ প্রদর্শনই বৃদ্ধা বেশী মনে করিত। এরূপ দুর্ব্ব্যবহারের এক বিশেষ কারণ ছিল। মোতিয়া ভূমিষ্ঠ হওয়ার অব্যবহিত পরেই তাঁহার জননীর এবং এক বৎসরের মধ্যেই পিতার কাল হয়। মোতিয়ার পিতা মৃত্যুকালে, তাহার যে কিঞ্চিৎ সঞ্চিত অর্থ ছিল, তাহাই দিয়া মোতিয়াকে বৃদ্ধার হস্তে সমর্পণ করিয়া গিয়াছিল। জন্মিবার অল্পদিনের মধ্যে পিতৃ-মাতৃ-বিয়োগ নাকি অতিশয় অশুভজনক। তাই মোতিয়াকে অতি অলক্ষণা, এমন কি, ডাকিনী বলিয়া বুড়ীর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। সেই কুসংস্কারযুক্ত অমূলক বিশ্বাসের বশবর্ত্তিনী হইয়াই, বৃদ্ধা মোতিয়ার প্রতি 'এজমালী স্বত্বের' ন্যায় যথেচ্ছ ব্যবহার করিত। এতদিন মোতিয়াকে যে বাড়ীর বাহির করিয়া দেয় নাই, সে কেবল মৃতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা ও অসম্মান-প্রদর্শন-জনিত অধর্ম্মের প্রতি ঘৃণার একটু পরিচয় দিবার জন্য!

---

(২)

মোতিয়া, দিদিমার এই অন্যায় ও অমানুষিক নিষ্ঠুরাচরণের বিরুদ্ধে একদিনও একটী কথাও বলিত না। তাহার সেই ক্ষুদ্র হৃদয়-টুকুর ভিতরে দিদিমার রোষাগ্নির সমস্ত দাহিকা-শক্তিটা নীরবে লুকাইয়া রাখিত, কাহাকেও জানিতে দিত না। যখন সেই ক্ষুদ্র হৃদয়ের পরিসরটুকু ছাপাইয়া উঠিবার উপক্রম হইত, তখনও মনুষ্য-জগতের অন্তরালে, দুই বিন্দু অশ্রুজলে তাহার ব্যাপকতা ও দুর্দ্দমনীয়তা খর্ব্ব করিতে চেষ্টা পাইত। প্রবলঝটিকা-সংক্ষুব্ধ সাগরের উত্তাল ভীষণ অবিশ্রান্ত তরঙ্গাভিঘাত—অশ্রান্ত অক্ষুব্ধভাবে ধারণক্ষম হিমাদ্রির শক্তি ও সহিষ্ণুতা পর্য্যাপ্ত পরিমাণে সেই কোমল বালিকার হৃদয়ে ছিল।

পাঁচ জনের মিলনে মোতিয়া চালাক-চতুরা হইবে, তদ্দরুণ তাহার উপর আপনার বহুকষ্টে স্থাপিত একাধিপত্য ক্রমে শিথিল হইতে পারে, এইজন্য অপর কাহারও বাড়ীতে কিংবা অপর কোনও বালক-বালিকার সঙ্গে মিশিতে তাহার বিশেষ বারণ ছিল। আর বৃদ্ধা নিজেও সঙ্গে করিয়া, কখন বাড়ীর বাহিরে তাহাকে লইয়া যাইত না। মোতিয়া, কালান্তক যম অপেক্ষাও দিদিমাকে অধিকতর ভয় করিত। সুতরাং তাহাদের সেই নাতি-বৃহৎ গৃহখানি ও তৎসংলগ্ন দশহস্ত পরিমিত প্রাঙ্গণখানির সীমা

অতিক্রম করিয়া, এক-পা বাড়াইতে তাহার সাহস হইত না এবং তাহার জ্ঞান ও কল্পনা-শক্তি উহারই চতুষ্পার্শ্বস্থ দৃশ্যমান পদার্থে ঘুরিয়া-ফিরিয়া চরিতার্থতা লাভ করিত ;—উহার বাহিরে পঁহুছিতে ফাঁক পাইত না। ক্রমে এই একঘেয়ে সঙ্কীর্ণ জীবন-পথ মোতিয়ার এতদূর অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল যে বিশাল আলোকদীপ্ত, বিবিধ-কার্য্যে-ব্যস্ত অসংখ্য মানব-কণ্ঠোত্থিত কোলাহলপূর্ণ জগৎ-সংসারটা অপেক্ষা, তাহার সেই গৃহ-প্রাচীর-বেষ্টিত অন্ধকারপূর্ণ ক্ষুদ্র সংসারটী অধিকতর পছন্দ হইত। কেবল দিদিমার অত্যধিক হৃদয়হীনতায় এক এক সময় মনে করিত যে, একদৌড়ে এই গৃহ-সীমা পার হইতে পারিলে, দিদিমা তাহার আর কিছুই করিতে পারিবে না। মনে এইরূপ কতবার ভাবিয়াছে কিন্তু সাহসে কুলায় নাই বলিয়াই কার্য্যে পরিণত করিতে পারে নাই। এইভাবে মোতিয়ার জীবনের আরও দুইটী বৎসর কাটিয়া গেল।

---

(৩)

শ্রাবণ মাস। সন্ধ্যার প্রাক্কাল। মুষল-ধারায় বৃষ্টি হইতেছিল। বৃদ্ধা সূতা বিক্রয় করিতে গিয়াছিল। মোতিয়া ঘরের কবাট অর্দ্ধ-বন্ধ করিয়া, উনন ধরাইতে চেষ্টা পাইতে-ছিল ; কিন্তু বায়ুর সঙ্গে বৃষ্টির প্রবল ঝাপ্‌টা আসিয়া, বালিকার চেষ্টায় মধ্যে মধ্যে ব্যাঘাত জন্মাইতেছিল। খানিকক্ষণের ব্যর্থ চেষ্টার পর, বালিকা বিরত হইয়া রন্ধনে ক্ষান্ত হইল। বৃষ্টির আতিশয্য মন্দীভূত হইয়া আসিতেছিল। মোতিয়া অর্দ্ধ-মুক্ত কবাট খানি সম্পূর্ণ মুক্ত করিয়া দিয়া,সম্মুখস্থ গ্যাসপোষ্টে দৃষ্টি ন্যস্ত করিয়া অনন্যমনে কি চিন্তা করিতেছিল। অল্পক্ষণ পরে, একখানি ছোট মই স্কন্ধে আর একটী ছোট লণ্ঠন হস্তে প্রায় দ্বাবিংশ বয়স্ক একটী মুসলমান ফরাস্ যুবক গ্যাস জ্বালাইতে তথায় উপস্থিত হইল। লণ্ঠনের মুখ খুলিতেই প্রবল বাতাসে বাতিটী নিভিয়া গেল। ফরাস্ অনন্যোপায় হইয়া মোতিয়াদের গৃহ-দ্বারে আসিয়া, বাতি ধরাইবার জন্য আগুন চাহিল। মোতিয়া অনেক ফুঁ দিয়া উননস্থিত নির্ব্বাপিত-প্রায় আগুন জ্বালাইয়া, তাহার বাতি ধরাইয়া দিল। বালিকার মধুর করুণা ও স্নেহ-বিভাসিত বদনমণ্ডলের উপর বিষাদের একখানি অতি সূক্ষ্ম আবরণ সন্তর্পণে ফেলা দেখিয়া, যুবকের হৃদয়ে উহার প্রতি কেমন এক সকরুণ সম-বেদনার উদ্রেক করিয়া দিল। ফরাস্ কার্য্যের ব্যস্ততা প্রযুক্ত অধিকক্ষণ বিলম্ব করিতে পারিল না ; সেদিনকার মত গ্যাস জ্বালাইয়া চলিয়া গেল।

সন্ধ্যার অব্যবহিত পরেই বৃদ্ধা গৃহে প্রত্যা-বর্ত্তন করিল। আহারাদি প্রস্তুত হয় নাই দেখিয়া, তাহার রোষাগ্নি দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠিল। সেই রোষাগ্নিতে ক্ষুদ্র-বালিকা মোতিয়ার জীবনটা ভাজাপোড়া হইলে, তাহার প্রশমন হইল। প্রহারে রাত্রে মোতিয়ার জ্বর হইল।

মোতিয়াকে অসুস্থ দেখিয়াই হউক, কিংবা অন্য কোন কারণেই হউক, বৃদ্ধা অতি প্রত্যূষেই কোথায় চলিয়া গিয়াছিল। মোতিয়া জ্বরের প্রবল প্রকোপে অজ্ঞানাবস্থায় অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত শয্যায় পড়িয়া ছিল। যখন জাগিল, তখন সন্ধ্যা আগতপ্রায়। আজ তাহার গৃহ-প্রাঙ্গণে নিবদ্ধ-দৃষ্টি বাহিরে কাহাকে দেখিবার জন্য সংপ্রসারিত হইল, তৎসঙ্গে মনও একটু চঞ্চল হইল।

ফরাস্-যুবক পূর্ব্ববৎ-ঠিক সেই সময়ে গ্যাস জ্বালাইতে আসিল। আসিয়া, সর্ব্বাগ্রে মোতিয়ার সঙ্গে দেখা করিল। মোতিয়া বিছানায় উঠিয়া বসিতে চেষ্টা করিল ; কিন্তু অত্যন্ত দৌর্ব্বল্য প্রযুক্ত কৃতকার্য্য হইতে

পারিল না। ফরাস-যুবক বুঝিল, বালিকা পীড়িতা। নিকটে গিয়া সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিল,—"তোমার অসুখ ক'রেছে? তোমার বুড়ী দিদিমা কোথায়?"

মোতিয়া কথা কহিতে পারিল না ; তাহার নয়ন হইতে ফোঁটা-কতক তপ্ত অশ্রু গণ্ডস্থল বহিয়া উপাধান সিক্ত করিতেছিল। মোতিয়া ভাবিতেছিল, মানুষের এমন মিষ্ট-মধুর কথা হয়? দিদিমার কর্কশ-রূঢ় বাক্য ভিন্ন, কাহারও মুখে এমন সস্নেহ মধুর সম্ভাষণ শুনিয়াছে, তাহার মনে পড়িল না। তাই ফরাস্-যুবকের সাদর জিজ্ঞাসায় বালিকার কোমল হৃদয় আরও দ্রবীভূত হইয়া গেল ; অন্তরের লুক্কায়িত আবেগরাশি সেখানে স্থান না পাইয়া, অশ্রু-রূপে প্রকটিত হইল। ফরাস্-যুবক আবার জিজ্ঞাসিল,—"আজ কি পথ্য ক'রেছ?"

মোতিয়া, এবারেও উত্তর করিতে পারিল না কেবল তাহার বিশাল নয়নদ্বয় যুবকের প্রতি স্থাপিত করিয়া একবার মাত্র ঈষৎ মস্তক সঞ্চালন করিল। যুবক বুঝিল, বালিকা কিছুই খায় নাই। তারপর সে দুই খানি পাঁউরুটি আনিয়া বালিকার হাতে দিল এবং কাল আবার আসিবে বলিয়া চলিয়া গেল। বালিকা রুটি খাইয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

মোতিয়ার অসুখের পরদিবস হইতেই বৃদ্ধা আর বড় বাড়ী আসিত না; কোথায় থাকিত, কি করিত, মোতিয়ার জানিবার কোনই উপায় ছিল না। তাহাদের গৃহ আর বহির্দ্দেশ এই দুয়ের মাঝখানে তাহার দিদিমা যেন প্রাচীররূপে দণ্ডায়মানা ছিল। মোতিয়া যখনই ঘরের বাহিরে যাইতে ইচ্ছা করিত, অমনই দিদিমার সেই রোষকষায়িত লোচন, ওষ্ঠদ্বয়ের ঘনঘন আকুঞ্চন ও বিস্ফুরণ এবং মুখাবয়বের অস্বাভাবিক বিকৃতি ও খিচুনি তাহার মনে পড়িত, আর বাহিরে যাওয়া হইত না। তথাপি সেই ভয়ঙ্করী রাক্ষসী-মূর্ত্তি দিদিমার উপর্য্যুপরি অদর্শনে তাহার চিত্ত বড় ব্যাকুল হইয়াছিল।

বুড়ী মনে করিয়াছিল, মোতিয়া এ যাত্রা আর রক্ষা পাইবে না, নিশ্চয়ই মরিবে। কিন্তু, ভগবানের রাজ্যে মানুষের ইচ্ছামত কার্য্য কবে হইয়াছে? মোতিয়া ধীরে ধীরে আরোগ্য লাভ করিল। বুড়ী সমাচার পাইয়া পুনঃ মোতিয়ার কাছে আসিল,—কিন্তু অতিশয় ক্ষুণ্ণ-মনে।

---

(৪)

ফরাস্-যুবকের নাম—রমজান্। সংসারে তাহার কেহই ছিল না। ফরাসের কার্য্যে সে মাহিনা পাইত আট টাকা ; তদ্দ্বারা কায়ক্লেশে খাওয়া-পরার ব্যয়-সঙ্কুলন হইত। রমজান্ প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা গ্যাস জ্বালাইতে আসিয়া মোতিয়াকে দেখিয়া যাইত। তাহাকে কিছু খাদ্য-দ্রব্য, না হয়, কিছু পয়সা দিয়া আবার চলিয়া যাইত।

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে মোতিয়ার মনের বহি-র্ম্মুখীন চঞ্চল ভাব গুলি অন্তর্ম্মুখীন ও ঘনীভূত হইয়াছিল, নয়নের চঞ্চল দৃষ্টি সংযত ও প্রশান্ত ভাব ধারণ করিয়াছিল। তাহার নীরব জীবনে কি-এক চিন্তা-প্রবাহ ছুটিয়াছিল ; হৃদয়ে কি-এক অননুভূতপূর্ব্ব সুখ-তৃষ্ণা জাগিয়া উঠিয়া-ছিল ; কিসে যেন তার শূন্য অংশ টুকু ভরপুর করিয়া রাখিয়াছিল। বিশাল ব্রহ্মাণ্ড-মন্দিরে যখন সান্ধ্য-আরতির শঙ্খ-ঘণ্টা বাজিয়া উঠিত, তখন মোতিয়া গৃহ-দ্বারে বসিয়া সতৃষ্ণ নয়নে একটা গ্যাসপোষ্টের দিকে চাহিয়া, প্রতি মুহূর্ত্তে কাহার আগমন প্রতীক্ষা করিত। এই বিপুল বিশ্বসংসারের মধ্যে সে কেবল একখানি মুখ দেখিবার নিমিত্ত লালায়িতা। সেই একখানি মুখ দেখিতে পাইলেই, সে আর যেন কিছুই

চায় না। গ্যাস পোষ্টের সঙ্গে তাহার জীবনের যেন কি-একটা গূঢ় সম্বন্ধ দাঁড়াইয়াছিল, যাহা সে পরিষ্কাররূপে বুঝিয়া উঠিতে পারিত না।

রমজান্ রোজই আসিত; উভয়ে দেখাও হইত; কিন্তু কোনই বাক্যালাপ হইত না। রমজান্ যাহা দিত, মোতিয়া হাত পাতিয়া লইত; একটী কথাও কহিত না। কথা কহার আবশ্যক হইলে, শুদ্ধ মস্তক নাড়িত। দিনশেষে ক্ষণকালের নিমিত্ত দু'জনার সেই সলজ্জ দৃষ্টি-বিনিময়ে উভয়ের প্রাণের কত আশা ও আকাঙ্ক্ষা, কত আকুলতা ও বেদনাই না অভিব্যক্ত করিত! নীরবে উভয়ের দুইটী বিভিন্নমুখীন জীবনপ্রবাহ এককেন্দ্রাভিমুখীন হইতেছিল!

একদিন বিকাল বেলা রমজান্ মোতিয়াদের বাড়ী আসিল। বুড়ী তখন স্থানান্তরে ছিল। রমজান্ মোতিয়াকে বলিল,—"মোতিয়া! আমি আজ হইতে আর ফরাসের কাজ করিব না। এক সাহেব দয়া করিয়া আমায় তাঁহার জাহাজে একটী ভাল চাকরী দিয়াছেন। কাল সকালে আমি এস্থান ছাড়িয়া চলিয়া যাইব। এক বৎসর পরে ফিরিয়া আসিব। ফিরিয়া আসিয়া তোমার সঙ্গে আবার দেখা করিব। তুমি তখন আমায় চিনিতে পারিবে ত?" রমজান ইহার অতিরিক্ত আর কিছুই বলিতে পারিল না। মোতিয়াকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে, তাহার অন্তরে একটা কেমন বেদনা অনুভূত হইতেছিল; হৃদয়ে কি-এক বিপুল শূন্য বোধ করিতেছিল; কিন্তু কেন যে এমনতর হইতেছিল, তার সুস্পষ্ট কারণ নির্ণয় করিতে পারিতেছিল না। উভয়ের প্রথম সাক্ষাৎ হওয়ার পর সুদীর্ঘ দুইটী বৎসর অতীত হইয়াছিল। মোতিয়া আজ সর্ব্বপ্রথম কথা কহিল। ভাঙ্গাভাঙ্গা সুরে জিজ্ঞাসিল,—"এক বৎসর পরে আসিবে ত?" আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। বালিকার ক্ষুদ্র হৃদয়খানির ভিতরে কি-এক বিষম বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল; স্থির থাকিতে পারিল না, কাঁদিয়া ফেলিল। "এক বৎসর পরে আসিবে ত" এই কয়েকটী কথায় বালিকার অন্তর্নিহিত, অতি যত্নে লুক্কায়িত অব্যক্ত প্রণয়ের কত আবেগ-আকাঙ্ক্ষা ও গভীর কাতর প্রার্থনাই সূচিত হইয়াছিল! যুবক হৃদয়ের স্বতঃ উচ্ছ্বসিত আবেগভরে বালিকার কর ধারণপূর্ব্বক বলিল,—"নিশ্চিতই আসিব।" তারপর, দু'জনে একবার মাত্র দৃষ্টি-বিনিময় হইল, তাহাতে উভয়ে উভয়ের অন্তর দেখিয়া লইল। সংসার-পথে চোখে-চোখে এই সামান্য পরিচয় জীবন-ব্যাপী সুখ ও মিলনেরই পূর্ব্বাভাস।

রমজান্ নির্দ্ধারিত দিবসে নূতন চাকরীতে জাহাজে দেশান্তরে চলিয়া গেল। মোতিয়া নিত্য সন্ধ্যাকালে পূর্ব্ববৎ তৃষিত নয়নে সেই গ্যাস-পোষ্টের দিকে চাহিয়া থাকিত। চাহিয়া চাহিয়া দৃষ্টিক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসিত; হৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়িত! সে যেন সেই গ্যাস-পোষ্টের সঙ্গে তাহার ক্ষুদ্র জীবনের সমস্ত আশা ও ভালবাসা, সুখ ও সাধ জড়াইয়া রাখিয়াছিল! সে তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়খানি সেই গ্যাস-পোষ্ট-সংলগ্ন মই-উপরিস্থিত রমজানে পরিপূর্ণ করিয়া, তন্ময়ত্বে ডুবাইয়া রাখিত, বাহিরের অন্য কোন পদার্থে তাহার মন ও দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিত না।

---

(৫)

দেখিতে দেখিতে রমজানের প্রত্যাবর্ত্তনের অঙ্গীকৃত এক বৎসরের আট মাস কাটিয়া গেল। মানুষই সময়ের মুখ চাহিয়া জীবন-মরণ জ্ঞান করে; কিন্তু সময় মানুষের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করে না! বৃদ্ধা, একদিন সূতা বিক্রয় করিতে যাইয়া, লোকপরম্পরায় অবগত হইল যে, "রমজান নামক যে ফরাস্-যুবক পূর্ব্বে তাহাদের গলিতে গ্যাস জ্বালাইত, সে জাহাজ-ডুবি হইয়া মারা পড়িয়াছে। বৃদ্ধা কথা-প্রসঙ্গে উক্ত সংবাদ মোতিয়াকে দিল। মোতিয়া শুনিয়া, নীরবে কাষ্ঠ-পুত্তলিকাবৎ একদৃষ্টে তাহার সকল আশা-ভরসা, সুখ ও ভালবাসার উৎপত্তি-স্থল—গ্যাস-পোষ্টের দিকে চাহিয়া আপনা-আপনি প্রশ্ন করিতেছিল,—"সত্যই কি, রমজান নাই? তবে ও গ্যাস জ্বলে কেন?" আপনার জীবনে এ প্রশ্নের সদুত্তর খুঁজিয়া পাইল না! সেইদিন রাত্রে তাহার ভয়ানক জ্বর হইল। সপ্তম দিবসে সন্ধ্যাবেলা মোতিয়ার ক্ষুদ্র প্রাণ ইহ-জগতের সেই গৃহ-প্রাঙ্গণের নির্দ্দিষ্ট সীমাটুকু অতিক্রম করিয়া, কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল।

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

আচার-প্রবন্ধ। *

"আচারাল্লভতে হ্যায়ুরাচারাদীপ্সিতাঃ প্রজাঃ।
আচারাদ্ধনলক্ষয্যমাচারো হন্ত্যলক্ষণম্॥"

এই মনুবচনের অনুবর্ত্তী হইয়া স্বর্গীয় ভূদেব বাবু আচর-প্রবন্ধ-নামক নবীন দর্শন শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। আচার-প্রবন্ধ চারি ভাগে বিভক্ত;—(১) উপক্রমণিকাধ্যায়, (২) নিত্যাচার-প্রকরণ, (৩) নৈমিত্তিকাচার-প্রকরণ, (৪) পরিশিষ্ট বা ব্রত-পূজাদির তালিকা। এতন্মধ্যে উপক্রমণিকাধ্যায় পাঁচটী অবান্তর অধ্যায়, পরিচ্ছেদ বা প্রবন্ধে, নিত্যাচার প্রকরণ পাঁচ অধ্যায়ে এবং নৈমিত্তিকাচার প্রকরণ সাত অধ্যায়ে বিভক্ত। পরিশিষ্ট মধ্যে অধ্যায় বা বিচ্ছেদ নাই। এই অপূর্ব্ব গ্রন্থের বিচার এবং উপদেশ জন্মভূমির পাঠকবর্গ অবগত হউন এই কামনায় তাহার মূল-সূত্র সঙ্কলন করিয়া দিলাম।

> ধর্ম্মোঽস্য মূলান্যসবঃ প্রকাণ্ডো
> বিত্তানি শাখাশ্ছদনানি কামাঃ।
> যশাংসি পুষ্পাণি ফলঞ্চ পুণ্য-
> মসৌ সদাচার-তরুর্ম্মহীয়ান্॥

রজোগুণ এবং তমোগুণ অর্থাৎ চাঞ্চল্যাদি এবং আলস্যাদি পরিহারপূর্ব্বক ইন্দ্রিয়বৃত্তিগণের স্বাভাবিক্য খণ্ডন করিয়া তাহাদিগকে শাস্ত্রোদ্ভাসিত করিবার জন্য যে অভ্যাস, তাহার নাম শাস্ত্রাচার বা সদাচার।

"ধর্ম্মোঽস্য মূলানি"

সদাচারের মূল ধর্ম্ম। ধর্ম্ম অর্থে শাস্ত্রীয় বিধির প্রতিপালন। এখনকার কালে বিধি-প্রতিপালনের ব্যাঘাতক পাঁচটী বস্তু দৃষ্ট হয়। (১) বিধি বিষয়ক অজ্ঞতা, (২) বিধির প্রতি শ্রদ্ধাহীনতা, (৩) বিজাতীয় অনুকরণের আতিশয্য, (৪) স্বেচ্ছাচারিতার প্রাবল্য, (৫) স্বাভাবিক আলস্য।

আপাত দর্শনে আমাদের মধ্যে এই পাঁচটী দোষই বাড়িয়া যাইতেছে বলিয়া বোধ হয়। (১) ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা বৃত্তিবিহীন হইয়া অন্নচিন্তায় বিব্রত হইয়াছেন। তাঁহারা শাস্ত্রের অধ্যয়ন-অধ্যাপন পূর্ব্বের ন্যায় মনঃসংযোগ সহকারে নির্ব্বাহ করিতে পারেন না। সুতরাং শাস্ত্রীয় বিধির সম্বন্ধে তাঁহাদের নিজের এবং জনসাধারণের অজ্ঞতা জন্মিয়া যাইতেছে। (২) বিজাতীয় শিক্ষার প্রভাব বৃদ্ধি হওয়াতে শাস্ত্রীয় বিধির প্রতি শ্রদ্ধা-হীনতা জন্মিতেছে। এখন শৈশবাবধি যে ইংরাজী বিদ্যার শিক্ষা হয়, তাহাতে শাস্ত্রীয় বিধির কিছু মাত্র উল্লেখ থাকে না; প্রত্যুত সাক্ষাৎ বা পরম্পরা সম্বন্ধে দেশীয়

---

* ৺ ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রণীত। হুগলি বুধোদয় যন্ত্রে শ্রীকালীনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত, মূল্য ॥০ আনা মাত্র।

শাস্ত্র-জ্ঞাতের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশই থাকে। সুতরাং শিক্ষার কাল হইতেই লোকের মনে শাস্ত্রাচারের প্রতি অবিশ্বাস জন্মিয়া যায়। (৩) এতদ্দেশে শাস্ত্রাচার-বিহীন বিজাতীয় জনগণের ভূতি দর্শনেও শাস্ত্রাচারের প্রয়োজনীয়তা বোধটী ন্যূন হইয়া পড়ে এবং ঐ বিভবসম্পন্ন বিজাতীয়েরা কিরূপে এবং কেমন সকল বিষয়ে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার বিচার না করিয়া মোহবশতঃ দেশীয় জনগণ আপনাদের শাস্ত্রবিরোধী ব্যবহারের অনুকরণে প্রবৃত্ত হয়েন।

শাস্ত্রাচার লোপের উল্লিখিত তিনটী হেতুই আগন্তুক। ওগুলি পূর্ব্বে অল্পবলশালী ছিল, এখন প্রবল হইয়াছে; উহাদিগের অপনয়ন অতি কঠিন হইলেও একান্ত অসাধ্য বলিয়া মনে করা যায় না। (১) যদি শাস্ত্রীয় বিধি সকল জানিবার জন্য তেমন অভিলাষ হয়, তবে তাহা জানা যাইতে পারে। এখনও দেশে অনেকটা শাস্ত্র জ্ঞান আছে, এখনও দেশের মধ্যে অনেক লোকে শাস্ত্রীয় বিধির পালন করিয়া চলিতে চেষ্টা করেন এবং পালন করিয়া থাকেন। (২) বিজাতীয় শিক্ষার দোষও ছাত্রবর্গের কৈশোরে এবং যৌবনেই অতি প্রবল হয়। বয়োঽধিক এবং চিন্তাশীলদিগের মধ্যে ঐ দোষ অনেক ন্যূন হইয়া থাকে এবং যে বিজাতীয় শিক্ষার দোষে শাস্ত্রাচারের প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মে, সেই বিজাতীয় শিক্ষার বিশেষ প্রগাঢ়তা জন্মিলেও ঐ দোষ অনেকটা কাটিয়া যাইতে পারে। যেমন মলিন বস্তু দ্বারা বলবৎ ঘর্ষণে তৈজসাদির পূর্ব্বমলিনতা বিদূরিত হয়, তেমনি যে বিজাতীয় শিক্ষা আচার-মালিন্য জন্মায়, তাহারই সম্যক্ অনুশীলনে ঐ মালিন্য অপনীত হইবার সম্ভাবনা। ইউরোপীয় বিজ্ঞান-বিদ্যার বিশেষ অনুশীলনের দ্বারা স্বদেশীয় শাস্ত্রাচারের সারবত্তা বহু পরিমাণে যুক্তিমুখেও সুপরিস্ফুট হইয়া উঠে। পূর্ব্বে ইংরাজী পড়িয়া দেশীয় যুবকেরা যেরূপ দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্যের ন্যায় কথা কহিতেন এবং ব্যবহার করিতেন, এখনকার ইংরাজী-শিক্ষিতেরা প্রায় কেহই তেমন উন্মাদ-গ্রস্ত হয়েন না। (৩) যে ইংরাজ জাতি এক্ষণে ভারতবর্ষে প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রাবল্যের প্রকৃত হেতু কি, তাহা ভাল করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিলেই দৃষ্ট হয় যে, ঐ প্রাধান্যের হেতু অনাচার বা অত্যাচার নহে, উহার হেতু তাঁহাদের স্বদেশের ও স্বধর্ম্মের উপযোগী আচার রক্ষা নিবন্ধন শরীর এবং মনের দৃঢ়তা এবং পটুতা এবং পরস্পর ঐকান্তিক সমানুভূতি। আমাদেরও শাস্ত্রোক্ত আচারগুলির উদ্দেশ্য বিচার করিলে সুস্পষ্টরূপেই অনুভূত হয় যে, শস্ত্রাচার দ্বারা শরীরের সারবত্তা, তেজস্বিতা এবং পটুতা জন্মে এবং মনের উদারতা এবং সাত্ত্বিকতা সংবর্দ্ধিত হয়। সুতরাং শাস্ত্রোক্ত আচার রক্ষা দ্বারাই এতদ্দেশীয় জনগণ ইংরাজদিগের অপেক্ষাও উচ্চতর গুণের অধিকারী হইতে পারেন। লোকের মন যে, ক্রমে ক্রমে এই তথ্যের প্রতি আকৃষ্ট হইতেছে এবং ইংরাজের অযথারূপ অনুকরণ যে, এদেশে অনিষ্টকর এবং নীচপ্রকৃতিকতার লক্ষণ বলিয়াই অনুভব করিতেছে, তাহার সন্দেহ নাই। এখন ইংরাজীতে কথা কহিবার সাধ, পেণ্টেলুন্ হাট পরিবার সাধ, টেবিলে বসিয়া খানা খাইবার সাধ, অনেকটা কমিয়া গিয়াছে। ঐ সকল সাধ যেমন হিন্দুকালেজের প্রথম ছাত্র-দলের মধ্যে ছিল, বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ, এম, এ, প্রভৃতি উপাধিপ্রাপ্ত ব্যক্তিদিগেরও মধ্যে তেমন নাই। বিলাত-ফেরতদিগের মধ্যে ঐ সকল সাধ এবং বিবি লইয়া বাহিরে বেড়াইবার নূতন সাধটী সম্প্রতি বাড়িয়াছে, কিন্তু ধর্ম্মসংস্কারের সাধটা নাই বলিলেই হয়—বোধ হয়, উহাঁদেরও সংখ্যা আর কিছু বাড়িলে ওরূপ সকল সাধই মিটিয়া যাইবে।

অতএব শাস্ত্রাচার-লোপের যে তিনটী আগন্তুক কারণ এখন প্রবল হইয়াছে, স্বতঃই সে তিনটী কারণের প্রাবল্য উপশমিত হইতে পারে।

কিন্তু মনুষ্যহৃদয়ের যে সাহজিক দুইটী দোষের নিবারণার্থ শাস্ত্রাচারের সৃষ্টি, শুদ্ধ কাল সহকারে অথবা অন্য কোন উপায়ে সে দোষ নিবারিত হইবার নহে। সে দুইটীর নিবারণ এক মাত্র শাস্ত্রাচারের অবলম্বনেই সিদ্ধ হইতে পারে।

মনুষ্যে পশু-ধর্ম্ম এবং জড়-ধর্ম্ম দুইই আছে। পশু-ধর্ম্ম হইতে স্বেচ্ছাচার জন্মে। যখন যাহা করিতে ইচ্ছা হইল, তখনই তাহা করিতে প্রবৃত্তি হওয়া, তাহার ফলাফল বিচার না করা, পশুর ধর্ম্ম। ঐ পশু-ভাবের ন্যূনতা সাধন আমাদিগের শাস্ত্রের একটী মুখ্য উদ্দেশ্য। শাস্ত্রের অভিপ্রায় মানুষ আপন উদ্দেশ্যের স্থিরতা, মনোযোগের ঐকান্তিকতা, চিত্তের প্রশস্ততা এবং শরীরের পটুতা সংবর্দ্ধন সহকারে সকল কাজ করেন। খাবার সামগ্রী দেখিলেই খাইলাম, শয়নের ইচ্ছা হইলেই শুইলাম, ক্রোধাদির প্রবৃত্তি হইলেই তদনুযায়ী কার্য্য করিলাম, এইরূপ যথেচ্ছব্যবহার আর্য্য-শাস্ত্রের বিগর্হিত। এগুলির নিবারণ শাস্ত্রাচারের সুপালন ভিন্ন আর কোন প্রকারেই সুন্দররূপে সিদ্ধ হয় না। শাস্ত্রাচারের পালনেই সত্ত্বগুণের সংবর্দ্ধন হইয়া ঐ সকল রজোগুণ-সম্ভূত দোষের পরিহার হইতে পারে।

মনুষ্যে যে জড়ধর্ম্ম আছে তাহার অতি সুস্পষ্ট লক্ষণ তাঁহার আলস্য। শাস্ত্রাচার আলস্য নাশ করে। শাস্ত্র কর্ত্তৃক সমস্ত জীবিত কালের উপযোগী বিশেষ বিশেষ কার্য্যের নির্দ্দেশ হওয়াতে জড়তাপ্রাপ্তির অবসর থাকে না। আবার শাস্ত্র বিনির্দ্দিষ্ট কাজগুলি এরূপ যে, তাহাদের যথোচিত সাধনে সাধারণতঃ শরীরের বলবত্তা এবং তেজস্বিতার বৃদ্ধি হয়। শাস্ত্র একবারও আমাদিগকে একান্ত আল্‌গা হইয়া পড়িতে দেন না। যথোচিত কালে এবং যথাযোগ্য অবস্থায় আমাদিগকে আহার, বিহার, নিদ্রাদি সেবন করিতে বিধি প্রদান করেন। কিন্তু লোভ, সুখেচ্ছা, অথবা আলস্যের বশীভূত হইয়া কিছুই করিতে দেন না।

শাস্ত্রাচারের এই জড়তা-নাশক গুণটীর প্রতি তাদৃশ লক্ষ্য না করিয়া ইহার স্বেচ্ছাচার নিবারণের প্রতি সমধিক দৃষ্টি করা হয়; সেই জন্য দুইটী আপত্তির উত্থাপন হইয়া থাকে—

কেহ বলেন, শাস্ত্রাচার সমস্ত প্রবৃত্তির পথ একেবারেই রুদ্ধ করিয়া দেন। মনুষ্যের জীবনে কিছু মাত্র তেজস্বিতা থাকিতে দেন না। মনুষ্যকে নির্জ্জীববৎ করিয়া ফেলেন।

শাস্ত্রাচারের সম্বন্ধে এইরূপ একটী ভ্রম কখন কখন হইয়া থাকে। তাহার একটী কারণ শাস্ত্রাচারের জড়তা-নাশক এবং তেজস্বিতা সাধক-গুণের প্রতি লক্ষ্য না করা। অপর কারণ শাস্ত্রাচারের মধ্যে গৃহস্থ-কর্ত্তব্য এবং বানপ্রস্থাদির কর্ত্তব্যে যে পার্থক্য আছে, তাহার অনুধাবন না করা। গৃহস্থাশ্রমীর পক্ষে শরীরের পীড়ন বা ক্ষয় করা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ। পূর্ব্বকার লোকেরা অধিক পরিমাণে শাস্ত্রাচার পালন করিতেন। তাঁহাদের আহার অধিক, বল অধিক এবং আয়ুষ্মত্তা অধিক ছিল—তাঁহাদের ইন্দ্রিয়গণ এখনকার শাস্ত্রাচারবিহীন অলসদিগের ইন্দ্রিয়গণের ন্যায় বলহীন এবং অকর্ম্মণ্য হইত না।

অপর কেহ কেহ বলেন যে, শাস্ত্রীয় বিধি সকল আমাদিগকে অশেষ বন্ধনে সম্বদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে। উহা একেবারেই আমাদিগের স্বাধীনতা বিলুপ্ত করিয়াছে; কিন্তু শাস্ত্রাচার

স্বাধীনতা নষ্ট করে না। উহার দ্বারা জড়তার হ্রাস হওয়াতে প্রকৃত স্বাধীনতার বৃদ্ধিই হয়। একটী সামান্য দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। এই শীতকালে যখন প্রাতে নিদ্রাভঙ্গ হয়, অনেকেই শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিতে পারেন না, রৌদ্র প্রখর হইলে তবে উঠেন, হয় ত বিছানায় বসিয়াই তামাক এবং চা খান। সমস্ত দিন তাঁহাদের শরীরে একপ্রকার জড়তা থাকিয়া যায়। কিন্তু যাঁহারা শাস্ত্রের বিধি পালন পূর্ব্বক নিদ্রা-ভঙ্গ হইলেই ঈশ্বর স্মরণ করিয়া শয্যা ত্যাগ করেন এবং প্রাতঃকৃত্য সম্পন্ন করত স্নান করিয়া আইসেন, তাঁহাদের শীত-ভীতি থাকে না, জড়তা থাকে না, সজীবতা এবং কার্য্যক্ষমতা উদ্রিক্ত হয় এবং সমস্ত দিন স্বচ্ছন্দে যায়। ঐ দুই প্রকার লোকের মধ্যে কাহারা স্বাধীন—শীতভীতেরা, না প্রাতঃস্নায়ীরা ?

বিশেষ ভাবিয়া দেখিলে পৃথিবীর কোথাও সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেখিতে পাওয়া যায় না। মনুষ্যও হয় সামান্য প্রবৃত্তির, না হয় বিধি ব্যবস্থার বশ হইয়া থাকে। এ দুয়ের মধ্যে অবিচারিত প্রবৃত্তির বশ হওয়া অপেক্ষা, বিচারিত বিধির বশ হওয়াই শ্রেয়ঃ।

"অসবঃ প্রকাণ্ডঃ"

সদাচাররূপ মহাবৃক্ষের প্রকাণ্ড বা গুঁড়ি আয়ুঃ। অর্থাৎ সদাচার সেবনে মনুষ্যের আয়ুঃ দৃঢ় এবং দীর্ঘ হয়। আয়ুষ্মত্তার প্রধানতম লক্ষণ দ্বাদশটী বলিয়া নির্ণীত হইতে পারে। (১) পূর্ব্বপুরুষদিগের, বিশেষতঃ পিতা মাতার আয়ুষ্মত্তা, (২) অবিকলাঙ্গদেহ লইয়া জন্ম-গ্রহণ, (৩) দুর্ঘটনার অভাব, (৪) স্বাস্থ্যকর আবাস, (৫) স্বাস্থ্যকর আহার, (৬) উপযোগী আবরণ, (৭) পরিচ্ছন্নতা, (৮) মিতাহার, (৯) মিতাচার, (১০) নিয়মানুগামিতা, (১১) দ্বন্দ্বসহিষ্ণুতা, (১২) মনের শান্তি।

এই দ্বাদশটীর মধ্যে প্রথমের তিনটী কোন মনুষ্যেরই নিজের আয়ত্ত হয় না। (১) জন্ম-গ্রহণ জীবের স্বেচ্ছাধীন ব্যাপার নহে। যে পূর্ব্বপুরুষদিগের আয়ু দীর্ঘ, তাহাদের দ্বারা উৎপাদিত হইব, কোন সন্তান এরূপে পিতা মাতার নির্ব্বাচন করিয়া জন্মিতে পারে না। (২) আমি দোষশূন্য শরীর লইয়া জন্মিব, বিকলাঙ্গ হইয়া জন্মিব না, ইহাও সন্তানের স্বেচ্ছার বিষয়ীভূত হয় না। (৩) আমার জীবিত-কালের মধ্যে, বিশেষতঃ শৈশবে, কোন দুর্ঘটনা উপস্থিত হইয়া আমাকে উদ্বিগ্ন করিবে না কিংবা বিকলাঙ্গ করিবে না, অথবা প্রাণে নষ্ট করিবে না, তাহা সমুদায় জানিয়া, বুঝিয়া, প্রতিবিহিত করিয়া চলা স্বতঃই মনুষ্যের সাধ্যাতীত। বস্তুতঃ জীবনের রক্ষা বলাধান এবং বিস্তৃতির উল্লিখিত তিনটী হেতুকে প্রাক্তন হেতু বলিয়া ধরা যাইতে পারে। ঐ গুলি পুরুষকারের সর্ব্বতোভাবেই অনায়ত্ত।

কিন্তু ব্যক্তি-বিশেষের অনায়ত্ত হইলেও ধারাবাহিক পুরুষ-পরম্পরার তেমন অনায়ত্ত বলিয়া বোধ হয় না। সকল পিতা মাতাই আপনাপন শরীর সুস্থ, সবল এবং স্থায়ী করিবার নিমিত্ত কতকটা উপায় অবলম্বন করিতে পারেন এবং তাঁহাদিগের অবলম্বিত সদুপায় সমস্ত পরবর্ত্তী পুরুষদিগের দ্বারা পরিগৃহীত হইয়া চলিলেই বংশে আয়ুষ্মত্তার সংবর্দ্ধন হইতে পারে। সেইরূপ চেষ্টার দ্বারাও বংশের মধ্যে বিকলাঙ্গতাজননের নিবারণ হইতে পারে; আর পূর্ব্বপুরুষদিগের এবং সমাজের মধ্যে জ্ঞানের বাহুল্য এবং সহানুভূতির আধিক্য থাকিলেও দুর্ঘটনাদি দোষের অনেক পরিহার হইতে পারে। অজ্ঞ এবং নির্ব্বোধ এবং বর্ব্বর লোকদিগের মধ্যে দুর্ঘটনার আধিক্যে যত মনুষ্য ও মনুষ্য-শিশুর অকালমৃত্যু হয়, বিদ্যাবান্,

বুদ্ধিমান এবং সুসভ্য জনগণের মধ্যে তেমন হয় না।

আয়ুষ্মত্তার প্রথম তিনটী হেতুর পরবর্ত্তী দ্বিতীয় হেতুত্রয়ও শৈশবে কোন ব্যক্তির নিজের আয়ত্ত হইতে পারে না। স্বাস্থ্যকর আবাস, আহার এবং আবরণ শিশু স্বয়ং বুঝিয়া অথবা চেষ্টা করিয়া আপনার নিমিত্ত সংগ্রহ করিতে পারে না। অথচ যদি শৈশব হইতে ঐ সকল বিষয়ে ত্রুটি জন্মে, তবে শরীরের দৌর্ব্বল্য, অপটুতা এবং রোগিতার সূত্রপাত হয়। পিতা মাতা ছেলেকে যেমন ঘরে রাখেন, যেরূপ আহার এবং বস্ত্র দেন এবং দেশের ভাব যেরূপ পবিত্র বা দূষিত থাকে, বাল্যাবস্থাতে শরীরের ভাব তাহার অনুযায়ী হয়। যদি বাল্যের অভিভাবকেরা স্বাস্থ্যরক্ষার উপায় সম্বন্ধে অভিজ্ঞ এবং সে সকল উপায় অবলম্বনে সক্ষম হয়েন, আর যদি সামাজিক শাসনের প্রভাবে দেশ পবিত্র এবং সংক্রামক-রোগ-পরিশূন্য হয়, তাহা হইলে শিশু নীরোগ থাকিয়া বর্দ্ধমান হয়, নচেৎ অকালে কালগ্রাসে পতিত অথবা রুগ্ন-দেহ হইয়া কিছুকাল বাঁচিয়া থাকে। অতএব এই তিনটী কারণনিবন্ধন মনুষ্যের আয়ুষ্মত্তা পুরুষ পরম্পরার এবং পুরুষ সমষ্টির অর্থাৎ সমাজের আয়ত্তাধীন।

আয়ুষ্মত্তার অপর ছয়টী হেতুর বল মানুষের বয়ঃপ্রাপ্তির সহিত বিশেষরূপে কার্য্যকারী হয়। ঐ গুলিতে প্রাক্তন অথবা পরকীয় শক্তির প্রাদুর্ভাব অপেক্ষাকৃত ন্যূন এবং পুরুষকারের শক্তিই বিশিষ্টরূপে পরিস্ফুট। পরিচ্ছন্ন থাকা, মিতাহার এবং মিতাচার হওয়া, সকল কার্য্যে নিয়মানুগামী হইয়া চলা, আপনাকে ক্রমে ক্রমে দ্বন্দ্ব-সহিষ্ণু করিয়া তোলা, এবং মনকে উদ্বেগশূন্য, শান্তিময় করিয়া রাখা, এই কাজগুলি মানুষ নিজের জন্য নিজেই অনেকটা করিতে পারে।

কিন্তু ঐ সকল কার্য্যে পুরুষকারের প্রাধান্য আছে বলিয়া যে, উহারা একমাত্র পুরুষকারেরই অধীন, প্রাক্তন বা পরকীয় শক্তির একান্ত অনধীন, তাহা নহে। প্রথমতঃ ঐ সকল বিষয়ে যথাকালে জ্ঞান প্রাপ্তির প্রয়োজন, তাহা অন্যের স্থানে পাইতে হয় এবং দ্বিতীয়তঃ প্রাপ্ত জ্ঞানের অপ্রমাদ, স্মরণ এবং প্রয়োগ কতক প্রাক্তন-শক্তিমত্তার এবং কতক অপরের দৃষ্টান্ত দর্শন সাপেক্ষ।

অতএব আয়ুষ্মত্তার যে বারটী বিভিন্ন হেতুর নির্দ্দেশ করা যায়, তাহা ত্রিবিধ; প্রাক্তন, সামাজিক এবং পৌরুষ। ঐ ত্রিবিধ শক্তি এরূপে পরস্পরে অনুস্যূত, যে প্রথমটী ছাড়িয়া দ্বিতীয়ের গতি নাই এবং ঐ দুইটীকে ত্যাগ করিয়া তৃতীয়েরও গতি হইতে পারে না।

আমাদিগের শাস্ত্রোপদিষ্ট আচার-পদ্ধতি ঐ ত্রিবিধ শক্তির অনুকূলরূপে ব্যবস্থিত, অর্থাৎ ইহা সর্ব্বদিক্‌দর্শী। এইজন্য যাঁহারা শুদ্ধ ইউরোপীয় শাস্ত্রাদির একমাত্র পুরুষকার-মূলক বিচার-প্রণালী হৃদ্গত করিয়াছেন এবং সেই প্রণালীর সহিত মিলাইয়া দেশীয় শাস্ত্র-পদ্ধতির গুণাগুণ বিচার করিতে প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহাদের চক্ষে আচার-কাণ্ডের অনেক কথাই অপ্রাসঙ্গিক অথবা উপধর্ম্ম-মূলক বলিয়া ভ্রম জন্মে। তাঁহারা শাস্ত্রবিহিত আচার অমান্য করিয়া নানা প্রকারে দোষভাগী হয়েন। অনেকেই স্বল্পায়ু হইয়া পড়েন।

কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কথঞ্চন।

তোমার কর্ম্মেতেই অধিকার; ফলে কোন অধিকার নাই।

উল্লিখিত ভগবদ্‌বাক্যের এবং শাস্ত্রবিধি মাত্রের প্রয়োগ আধ্যাত্মিক বিষয়েই করা হয়। কিন্তু সকল প্রকার কার্য্যের প্রতিই ঐ বিধি খাটে। আয়ুষ্মত্তাসম্পাদক যে সকল বিধি শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, সে গুলিও ফলাকাঙ্ক্ষা

ব্যতিরেকে কেবল বিধি প্রতিপালনের জন্য সুপালিত হওয়া আবশ্যক। ফল খুঁজিতে গেলেই রজোগুণ পরিস্ফুট হয় এবং ফলগুলিকে বিকৃত করিয়া দেয় অথবা আদবেই ফলিতে দেয় না। কোন ব্যক্তি তাঁহার পুত্রকে কয়েকটী ফুলের চারা দিয়া বলিয়াছিলেন, এই গাছগুলি যত্ন করিয়া উহাদিগের গোড়ায় জল দিবে; উহাদিগের শিকড় মাটিতে বসিলেই দিব্য ফুল ফুটিবে। ছেলেটী পিতার আদেশ পালন করিল। কিন্তু প্রত্যহ গাছগুলিকে উপড়াইয়া দেখিতে লাগিল, গাছগুলির শিকড় বসিয়াছে কি না। ফুলের চারাগুলি অবশ্যই মরিয়া গেল। বস্তুতঃ বিধিবোধিত হইয়াই কার্য্য করিতে হয়; ঐ বালকের ন্যায় ফলান্বেষী হইতে নাই।

"কিন্তু যদি কোন ফলান্বেষণই না করিব, তবে যে বিধি প্রতিপালনে আদিষ্ট হইতেছি, তাহাই যে প্রকৃত বিধি তাহা কেমন করিয়া জানিব?" আজিকালি শাস্ত্রাচার সম্বন্ধে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা হইতেছে। কোন শিশু তাহার পিতৃক্রোড়ে উঠিয়া আকাশের প্রতি দৃষ্টি করত চন্দ্র দর্শন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিল,—"বাবা! ও কি?" পিতা বলিলেন,—"উহার নাম চাঁদ।" সরলমনা শিশু আর কিছু জিজ্ঞাসা করিল না। নিশ্চয়-বিরোধিকা সংশয়াত্মিকতা তাহার সরল হৃদয়ে স্থান পায় নাই। সে চাঁদ শব্দটীর পুনঃ-পুনঃ আবৃত্তি করিয়া শিখিতে লাগিল। কিন্তু যদি জিজ্ঞাসা করিত, "উহাকে কেন চাঁদ বলে?" তবে পিতা তাহার প্রবোধার্থে আর কি বলিতে পারিতেন?—হয়ত ইহাই বলিতেন যে, "উহাকে সকলেই চাঁদ বলে।" এই বলিয়া আর দুই এক জনের মুখ হইতেও 'চাঁদ' শব্দটী শিশুকে শুনাইতেন। এস্থলেও ঐ পথ অবলম্বন করা যাইতে পারে। দেশীয় চিকিৎসা-শাস্ত্র হইতে, ইউরোপীয় বিজ্ঞান হইতে, এবং ভিন্ন ভিন্ন দেশের আচার হইতে প্রদর্শিত হইতে পারে যে, শাস্ত্রোক্ত আচারের উপকারিতা ঐ সকলের দ্বারাও সমর্থিত হইয়া আছে।

কিন্তু দেশীয় চিকিৎসাশাস্ত্র হউক, আর বিদেশীয় বিজ্ঞানই হউক, আর অপরদেশীয় লোকের আচারই হউক, কেহই আমাদিগের স্মৃত্যুক্ত আচারবিধি গুলির ন্যায় সর্ব্বদিকদর্শী এবং সর্ব্বতোভাবে আমাদিগের উপযোগী হইতে পারে না। চিকিৎসাশাস্ত্র এবং বাহ্য বিজ্ঞান একদেশদর্শী। অন্যদেশীয় আচার স্থলবিশেষেই আমাদের উপযোগী হইতে পারে। কিন্তু উহারা কেহই শাস্ত্রোক্ত বিধির প্রমাণরূপে গণ্য হইতে পারে না। তদ্ভিন্ন, আচারের সকল গুণবত্তার মূল যে "অভ্যাস," তাহাতে আর্য্য-শাস্ত্র ভিন্ন অপর কাহার দ্বারা আমাদিগের সুশিক্ষালাভ হইতে পারে না। অভ্যাস দ্বারা মনুষ্যের দ্বন্দ্ব-সহিষ্ণুতা শক্তির যে কতদূর উন্নতি হইতে পারে, তাহা যোগ-শাস্ত্রকারই অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন। অপর কেহ তাহা এ পর্য্যন্ত পারেন নাই। শরীরের আভ্যন্তরীণ ব্যায়াম শিক্ষায় একমাত্র যোগ-শাস্ত্রেরই অধিকার!

"বিত্তানি শাখাশ্ছদনানি কামাঃ।"

সদাচার বৃক্ষের শাখা ধন, কামনা সমস্ত উহার পত্র। সদাচার ধনবত্তার অনুকূল। ধনবত্তা তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া বিচার্য্য। (১) ধনের অর্জ্জন, (২) ধনের সংরক্ষণ, (৩) ধনের সংবর্দ্ধণ। (১) শরীর, সুস্থ পটু এবং কার্য্যক্ষম; বুদ্ধি, বিষয়-বোধে ক্ষিপ্র এবং অমোঘ; চিত্ত, স্থির এবং উৎসাহ-সম্পন্ন এবং স্বভাব বিশ্বাস-প্রদ এবং লোকানুরাগের আকর্ষক হইলে ধনোপার্জ্জন কঠিন হয় না। সদাচার দ্বারা শরীরের, ধীশক্তির, চিত্তের এবং স্বভাবের ঐ সকল গুণ জন্মে। এই জন্য সদাচারের

অভ্যাসে ধনোপার্জ্জন সহজ হয়। (২) ধনের সংরক্ষণ—ভোগেচ্ছার সংযমে, বিলাসিতার দমনে, বাহ্যাড়ম্বরের সঙ্কোচনে এবং সমাজে ন্যায়ানুগামিতার পালনে সুসিদ্ধ হইতে পারে। এই গুলিও সদাচার রক্ষা হইতে সমুদ্ভূত হয়। (৩) ধনের সংবর্দ্ধন—মিতব্যয়িতা, পরিণাম-দর্শিতা এবং সমাজের সুস্থাবস্থা সাপেক্ষ। এ গুলিও সদাচারের দ্বারা সংবর্দ্ধিত এবং সুরক্ষিত হয়। ধনবৃদ্ধির প্রসিদ্ধ উপায় যে বাণিজ্যাদি ব্যবসায়, তাহাতে কৃতিত্বলাভ, সত্যনিষ্ঠা, সুবুদ্ধি এবং দূরদর্শন হইতে হয়। সদাচার ঐ তিনটীরই অনুকূল।

ধনবত্তার সহিত ধর্ম্মবত্তার যে একটু বিরোধ আছে, তাহা যেন ধনবত্তার সর্ব্বাঙ্গব্যাপী বলিয়াই কাহার কাহার ভ্রম জন্মে। যিশুখৃষ্ট বলিয়াছিলেন যে, "উষ্ট্রও যেমন সূচীর ছিদ্রে প্রবেশ করিতে পারে না, তেমনি ধনশালী ব্যক্তিও স্বর্গদ্বারে প্রবিষ্ট হইতে পারে না। সরল-স্বভাব যিশু একদেশদর্শী হইয়া ঐরূপ বলিয়াছেন। ঐ কথাটী সংসারের প্রতি একান্ত বৈরাগ্য-প্রণোদিত। কথাটী প্রকৃত নয়। সেই জন্য তাঁহার মতানুগামী ভক্তিমান্ কাথলিক যাজকবর্গ আশ্রমভেদের তথ্য না বুঝিয়াও একেবারে গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী হইয়া উঠিলেন এবং গৃহস্থেরা প্রায় কেহই কার্য্যতঃ ঐ মন্ত্র-নিহিত প্রকৃত তথ্য গ্রহণ করিতে পারিলেন না, একান্ত ধনলোলুপ হইয়া রহিলেন। সর্ব্বদিক্-দর্শী আর্য্যশাস্ত্র ওরূপ মোটা কথা বলেন নাই। তিনি ধনকে সাত্ত্বিক, রাজস এবং তামস এই তিন প্রকারে বিভক্ত করিয়া পরম সাত্ত্বিক যে 'দেয়' নামক ধন, তাহার এই লক্ষণ বলেন,—

অপরাবাধমক্লেশং প্রযত্নেমার্জ্জিতং ধনম্।
স্বল্পং বা বহুলং বাপি দেয়মিত্যভিধীয়তে॥

অন্যের বাধা না জন্মাইয়া, স্বয়ং অধিক ক্লেশ না পাইয়া, নিজ পরিশ্রমের দ্বারা যে অল্প বা অধিক ধন উপার্জ্জিত হয়, তাহার নাম দেয়—অর্থাৎ সেই ধনের দানই বিশুদ্ধ দান হয়।

উল্লিখিতরূপে উপার্জ্জিত ধন পুণ্যকর্ম্মের সহকারী; সুতরাং সে ধনে ধনী ব্যক্তির পক্ষে স্বর্গদ্বার অপাবৃত হইয়াই থাকে, রুদ্ধ থাকে না। শাস্ত্রে রাজস ধনের লক্ষণ আছে, যথা—

কুসীদকৃষিবাণিজ্য শুল্কগাদ্যানুবৃত্তিভিঃ।
কৃতোপকারাদাপ্তঞ্চ রাজসং সমুদাহৃতম্॥

সুদ লইয়া, কৃষি করিয়া, বাণিজ্য করিয়া, শুল্ক লইয়া, সংগীতাদি ব্যবসায় দ্বারা, আর উপকৃত ব্যক্তির স্থানে গ্রহণ করিয়া, যে ধন লব্ধ হয়, তাহা রাজস ধন।

এই রাজস ধনের উপার্জ্জন সামান্যতঃ ব্রাহ্মণের প্রতি নিষেধ; তবে আপৎকালে ব্রাহ্মণেরাও ঐ সকল উপায় অবলম্বন করিতে পারেন। তামস ধনের শাস্ত্রোক্ত লক্ষণ এই—

পার্শ্বিকদ্যূতচৌর্য্যার্ত্তি প্রতিরূপকসাহসৈঃ।
ব্যাজেনোপার্জ্জিতং বস্তু তৎ কৃষ্ণং সমুদাহৃতম্॥

পদের মাহাত্ম্যে, দ্যূতের বলে, চৌর্য্য দ্বারা, পরপীড়ন করিয়া, লোককে ভাঁড়াইয়া, সাহস কর্ম্মের দ্বারা এবং অন্যকে ঠকাইয়া, যে ধন লুব্ধ হয়, তাহার নাম কৃষ্ণ বা তামস ধন।

এই ধনের উপার্জ্জন শাস্ত্রে নিষিদ্ধ। যদি খৃষ্টের মতানুগামী ইউরোপীয়েরা ধনের এই ত্রিবিধ ভেদ শিখিতেন, তাহা হইলে, বোধ হয়, কমিশন প্রভৃতি নানা নামে ঘুস খাওয়া, ঘোড়দৌড় প্রভৃতিতে বাজি রাখিয়া রোজগার, বিজাতীয়ের দেশ লুণ্ঠন করা, বাণিজ্যদ্রব্যে কৃত্রিমতা করা, পরস্বাপহরণ, পরপীড়ন পৃথিবীতে অনেক কম হইত। তাঁহারা শুনিলেন, ধন মাত্রই তুষ্ট। তাঁহারা ও কথা রক্ষা করিয়া চলিতে পারিলেন না, কোন জাতিই পারে না; সুতরাং ধনোপার্জ্জনের জন্য যে বিশুদ্ধ পথ খুঁজিয়া লইতে হয়, তাহা জানিলেন না; সাত্ত্বিক, রাজস, তামস অভেদে ধনোপার্জ্জনের

জন্য পৃথিবীময় উদ্বেগ জন্মাইয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

শাস্ত্রাচার আমাদিগকে স্বরূপ করিতে দিবেন না। এখন আপৎকাল আসিয়া পড়িয়াছে, অতএব সাত্ত্বিক এবং রাজস এই দুই প্রকার ধন লাভের জন্যই আমরা চেষ্টা করিতে পারি। কিন্তু তামস-ধন আমাদিগের অস্পৃশ্য এবং অগ্রাহ্যই থাকিবে।

স্থূলতঃ ধনের প্রয়োজন তিন প্রকার। (১) আপনার এবং স্বজনের ভরণপোষণ, (২) ভোগাভিলাষের তৃপ্তিসাধন, (৩) দানের দ্বারা অপরের দুঃখমোচন। এই তিনটী প্রয়োজনের মধ্যে কোনটীই অসীম নয়। প্রত্যুত সকলগুলির সীমাই সঙ্কীর্ণ।

আমাদের শাস্ত্রাচার ধন-প্রয়োজনের এই সসীমত্ব উপলব্ধ করিয়াই বিনির্দ্দিষ্ট হইয়া আছে। কারণ ধনের প্রয়োজন সঙ্কীর্ণ সীমায় সম্বদ্ধ হইলেও লোকের ধন-তৃষ্ণাটী অতি অসীম; শাস্ত্র সাত্ত্বিক ধনোপার্জ্জনের উপায় বলিয়া দিয়া অর্জ্জন স্পৃহাটীকে মন্দীভূত করিবার নিমিত্ত যত্ন করেন। তিনি গৃহস্থকে ধন উপার্জ্জন করিতে এবং ধনসঞ্চয় করিতে বিধি প্রদান করিয়া পরিশেষে বলেন—

সন্তোষং পরমাস্থায় সুখার্থী সংযতো ভবেৎ।
সন্তোষমূলং হি সুখং দুঃখমূলং বিপর্য্যয়ঃ॥

সুখার্থী পুরুষ সন্তোষকে পরম অবলম্বন করিয়া সংযতচিত্ত হইবেন; সন্তোষই সুখের মূল, তদ্বিপরীত দুঃখের মূল। অতএব সুখের জন্য ধন নয়, কারণ ভোগমাত্রেই সুখ হয় না।

ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥

কামের উপভোগে কদাচিৎ কামনার শান্তি হয় না; অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দান করিলে অগ্নির বৃদ্ধিই হয়। অর্থাৎ কামের উপভোগে ভোগ-কামনা মাত্রই বাড়ে, ভোগের শক্তি বৃদ্ধি হয় না; সুতরাং কামনার বৃদ্ধিতে দুঃখেরই বৃদ্ধি হয়।

বস্তুতঃ শাস্ত্রকারেরা কামনাকে দমন করিতে উপদেশ দিয়াই ভোগের পথ মুক্ত রাখিয়াছেন, এবং ভারতবাসী আপনার সর্ব্বদিক্‌দর্শী শাস্ত্রের উপদেশানুযায়ী হইয়া ছিলেন বলিয়াই তাঁহার জীবন কখন কামনারূপ পত্রের আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত হইয়া পুষ্প এবং ফল-পরিশূন্য হয় নাই।

"যশাংসি পুষ্পাণি।"

সদাচার বৃক্ষের পুষ্প যশ। অর্থাৎ সদাচার-সম্পন্ন ব্যক্তি লোকের নিকট যশোভাগী হইয়া থাকেন। এই কথাটী স্বতঃসিদ্ধ বাক্যের ন্যায় সহজেই বোধগম্য। সদাচার-সম্পন্ন-ব্যক্তি অবশ্যই জনসাধারণের নিকট প্রশংসা ভাজন হইবেন; কারণ, যে আচার ব্যবহার পালন করিয়া চলিবার নিমিত্ত সকলেই আদিষ্ট, যিনি তাহা পালন করেন, তিনি সুখ্যাতি না পাইবেন কেন? বিদ্যালয়ের যে বালকটী ভাল করিয়া পড়া শুনা করে, সে পারিতোষিক পায়। সদাচারপরায়ণ হইলে লোকের নিকটে যে যশোলাভ হয়, তাহা ঐ পারিতোষিকেরই সদৃশ। ইউরোপীয়েরাও বলেন যে, যাহা সাধারণের অভিমত, তাহার অনুযায়ী হইয়া চলিলেই সুখ্যাতি এবং না চলিলেই নিন্দা হয়। এই জন্য ইউরোপীয়দিগের মধ্যে যদিও শাস্ত্রাচার নাই, তথাপি যে সময়ে যে আচার প্রবর্ত্তিত থাকে, তাঁহারা ঘুণাক্ষরেও তাহার অন্যথাচরণ করিতে পারেন না।

সমাজের প্রতি নম্রতাই আমাদিগের মনের স্থায়ীভাব হওয়া বিধেয়। আমরা অপরের নিকট জন্মাবধি মরণ পর্য্যন্ত অপরিশোধ্যরূপে ঋণী হইয়া থাকি। আমরা যাহা কেন করি না, আর যতই কেন করি না, সর্ব্বস্থলেই ঈশ্বরের কুল ঈশ্বরকে দিয়া ঈশ্বরের পূজা করি মাত্র। অর্থাৎ সমাজ আমাদিগকে যাহা কিছু দিয়াছেন, আমরা তাহা লইয়াই নাড়া চাড়া করি এবং তাহাই পরস্পরকে দিয়া পরস্পরের উপকার সাধন করি। উহাতে নিজের গৌরবের, শ্লাঘার, বা স্বামিভাব ধারণের কোন কারণই থাকে না—প্রত্যুত অন্যের উপকার করার সুখ এবং সামর্থ্য প্রাপ্ত হওয়াতে সমাজের নিকট পূর্ব্ব ঋণ আরও বর্দ্ধিত হইয়া উঠে। এই ঋণভারে নম্র হইয়া থাকাই মনুষ্যের অবস্থার উপযোগী। পিতার সমীপে পুত্রের যে নম্রতা, সকল লোকেরই সমাজের নিকট সেই নম্রতা ন্যায়সঙ্গত। নম্রভাবেই সমাজের নিকট অপরিশোধ্য ঋণের স্বীকার করা হয়, এবং সেই স্বীকার নিবন্ধন ঋণদায় হইতে নিষ্কৃতি এবং যশই সেই নিষ্কৃতির প্রমাণ পত্র।

আমাদিগের শাস্ত্রোক্ত সদাচার উল্লিখিতরূপ নম্রভাবের পোষক এবং তাহার অভ্যাসজনক। শাস্ত্রে গৃহি-ব্যক্তির অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্মগুলিকে ঋণের পরিশোধের জন্য অথবা কৃত পাপের ক্ষালনের জন্য অনুষ্ঠেয়, ইহাই বলিয়াছেন। ঋণের পরিশোধ করায় অথবা কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করায় শ্লাঘার উদ্রেক হইতে পারে না, কেবল মনের উদ্বেগ শান্তি হইতে পারে। আর বিধির প্রতিপালন করাই ধর্ম্মাচরণ, শাস্ত্র এই কথাও ভূয়োভূয়ঃ বলাতে বশ্যভাবের শিক্ষা এবং অভ্যাস হয়। এই সকল কারণে শাস্ত্রাচার বা সদাচার নম্রতার সাধক। যাহা নম্রতার সাধক, তাহা অবশ্যই যশেরও প্রাপক হয়।

পরন্তু আচারবান্ অনেকানেক ব্যক্তিকে সমধিক অহঙ্কারী এবং দাম্ভিক হইতে দেখা যায়। ঐ সকল লোকে শাস্ত্রোক্ত অর্থবাদাদির প্রতি সমধিক লক্ষ্য করিয়া আপনাদের অনুষ্ঠিত কর্ম্মগুলি যে কেবল ঋণের পরিশোধক অথবা কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত মাত্র, তাহা ভাবেন না। ফলের লোভ অধিক বলিয়াই ইহাঁদের আচার রজোদোষে দুষ্ট হইয়া পড়ে।

ইংরাজী শিক্ষিতদিগের মধ্যে শাস্ত্রাচার অপরিজ্ঞাত এবং অনভ্যস্ত; এই জন্য তাঁহাদিগের মনোমধ্যে বশ্য ভাবের ন্যূনতা এবং তাঁহাদের ব্যবহারে নম্রতার ত্রুটি জন্মিয়া যাইতেছে। তজ্জন্য তাঁহাদিগের যে গুণগুলি আছে, সেগুলিও লোকের চক্ষে সুস্পষ্টরূপে সমুদিত হয় না এবং তাঁহারা সুখ্যাতিভাজন হইতে পারেন না। আমার বোধ হয় যে, ইংরাজী হইতে উহাঁরা যে "নৈতিক সাহসের" নামটী শুনিয়াছেন, তাহাতে অনেকটা অনিষ্টের উৎপত্তি হইয়াছে। উহাঁরা বীরপ্রকৃতিক ইংরাজের শিষ্য। সুতরাং বীরস্বভাবসুলভ সাহস-ধর্ম্মটীর বড়ই পক্ষপাতী। এইজন্য সাহসের প্রমাণ দিবার নিমিত্ত দেশ-প্রচলিত আচার ব্যবহারের অপালন পূর্ব্বক দেশাচারকে তাচ্ছিল্য এবং আত্মসমাজকে অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন।

কিন্তু একটু নিবিষ্টমনে দেখিলেই বুঝা যায় যে, এখনকার দিনে দেশীয় শাস্ত্রাচারের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করায় কিছুমাত্র সাহসিকতার প্রমাণ হয় না। সাহস অর্থে নির্ভীকতা। ভয়ের পাত্র কে? যাহার ইষ্টানিষ্ট করিবার শক্তি আছে, সেই ভয়ের পাত্র। এখন আমাদের সমাজ কাহারও তেমন কোন ইষ্টানিষ্ট করিতে পারেন না। এখন ইষ্টানিষ্টের শক্তি অধিকাংশই ইংরাজের হস্তগত হইয়াছে। অতএব সমাজ আর তেমন ভয়ের পাত্র নাই, ইংরাজই এখন ভয়ের পাত্র হইয়াছেন। সুতরাং সমাজকে অপমানিত করায় পুত্রবৎসল পিতাকে অপমানিত করার ন্যায় পাপেরই প্রমাণ হয়, উহা সাহসের প্রমাণ হইতে পারে না। এখন ইংরাজের অনুকরণে

সাহস নাই—উহাতে প্রবলের তোষামোদ হয় মাত্র। মুসলমানের আমলে, দেশের যে সকল হিন্দুসন্তান মুসলমান হইয়া গিয়াছিল, তুরস্ক সুলতানের অধীনে চাকুরী করিতে গিয়া যে সকল ইউরোপীয় লোকে খৃষ্টধর্ম্ম পরিত্যাগ-পূর্ব্বক মহম্মদীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করে এবং চীন-সাম্রাজ্যের সৈনিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া যে মার্কিন এবং ইউরোপীয় পুরুষেরা আপনাদের নাম এবং পরিচ্ছদ চিনীয় লোকের অনুরূপ করিয়া লয়, তাহাদেরও যেমন "নৈতিক সাহস" প্রদর্শিত হয় না, তেমনি ইংরাজ-রাজের অধিকার-কালে যে ভারতবাসী দেশাচার পরিহার করিয়া ইংরাজী আচার গ্রহণ করে, তাহারও নির্ভীকতা প্রমাণিত হয় না। নৈতিক সাহসিকতার লক্ষণ ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত—

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ॥

নিজের ধর্ম্ম যদি বিগুণও হয়, তথাপি সুন্দররূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম হইতে বহু মঙ্গল-জনক। স্বধর্ম্মে মৃত্যুও শ্রেয়ঃ, পরধর্ম্ম ভয়ের হেতুভূত। এস্থলে ধর্ম্ম শব্দের অর্থ যে আচার, তাহা প্রকরণ দ্বারা সিদ্ধ। তাহা বিশেষ করিয়া বলিবার অপেক্ষা নাই। কিন্তু ইহার একটী কথা বড়ই গুরুতর। মৃত্যুর অপেক্ষাও অধিকতর ভয়ের বস্তু কি? জীবের সকল ভয়ের একমাত্র মূল মৃত্যুভয়। কিন্তু এস্থলে সেই মৃত্যুকেও শ্রেয়ঃ বলা হইয়াছে এবং তাহা অপেক্ষাও একটা বেশী ভয়ের বস্তু আছে বলা হইয়াছে। সেটী পাপের ভয় ভিন্ন আর কিছুই নহে। শাস্ত্র, মৃত্যু অপেক্ষাও পাপকে অধিক ভয় করিতে বলিলেন। এমন নৈতিক সাহস কি আর কোথাও শিক্ষিত হইয়াছে? নবীন ইংরাজী-শিক্ষিতেরা দেখুন যে, তাঁহাদিগের দেশের পূর্ব্ব শিক্ষাদাতৃগণের অপেক্ষা কেহই অধিকতর নির্ভীক হইতে পারেন না। তাঁহাদিগের বর্ত্তমান অনুকরণেচ্ছা নৈতিক সাহসিকতার লক্ষণ নয়, অজ্ঞতা এবং "নৈতিক ভীরুতার"ই পরিচায়ক মাত্র।

"ফলঞ্চ পুণ্যম্।"

সদাচার বৃক্ষের ফল পুণ্য। অর্থাৎ সদাচার-পরায়ণ ব্যক্তি পুণ্যবান্ হয়েন। পুণ্য অর্থে পবিত্রতা—মল-শূন্যতা— নিষ্পাপতা—চিত্তশুদ্ধি রজস্তমোবর্জ্জিত বিশুদ্ধ সাত্ত্বিকতা—আসুর ভাবের নিরসন হইয়া দেবভাবের অধিষ্ঠান—স্বভাবজাত পাশব প্রবৃত্তির দমন হইয়া জ্ঞানলাভের পথপ্রাপ্তি। ঐ পথের প্রাপ্তি হইলেই পুণ্য হইল।

এখন দেখিতে হইবে যে, ঐ পথপ্রাপ্তির বিঘ্ন কি কি? সহজেই বুঝা যায় যে, জ্ঞান-লাভের পথ পাইবার পক্ষে চারিটী বিঘ্ন আছে। (১) শরীরের অপটুতা, (২) বুদ্ধির জড়তা, (৩) মনের চাঞ্চল্য, (৪) রিপুর প্রাবল্য। শাস্ত্রাচার পালনে ঐ চারিটী দোষেরই নিবারণ হয়।

(১) শাস্ত্রাচারের অনেকানেক নিয়ম শরীরের পটুতা সাধনের উদ্দেশ্যে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। এই জন্য সদাচারের অনেক নিয়মই ব্যায়াম চর্চ্চার নিয়ম হইতে অভিন্ন। তবে শুদ্ধ ব্যায়ামচর্চ্চা করিতেছি এবং শরীরের বল বাড়াইতেছি,এরূপ উদ্দেশ্যটী অদূরদর্শীর চক্ষে সমুদিত থাকিলে ক্ষণবিধ্বংসি-শরীরের প্রতি অতি-যত্ন সম্ভূত হইয়া দোষ জন্মিবার সম্ভাবনা। এই জন্য ব্যায়ামচর্চ্চ্যাকেও শাস্ত্রাচাররূপে পরিণত এবং ধর্ম্মভাবে বিধৌত এবং বিশোধিত করা হইয়াছে।

(২) বুদ্ধির জড়তা নিবারণের শাস্ত্রোক্ত উপায় দ্বিবিধ। এক মানসিক, অপর শারীরিক। মানসিক উপায়, স্মৃতি অথবা মানসিক সকল শক্তির সংবর্দ্ধনে, চিত্তের একাগ্রতা সম্পাদনে, স্বাধ্যায়াদির নিয়মিত আলোচনে, এবং শাস্ত্রচিন্তার সম্যক্ পরিচালনে সম্পাদিত হয়। ধী-শক্তির জড়তা-নিবারণের শারীরিক উপায়, ভক্ষ্যাভক্ষ্যের বিচারে সুনির্ব্বাহিত হয়।

এই বিষয়ও আমাদিগের শাস্ত্র অনন্য-সাধারণ। আর কোন জাতির শাস্ত্রে ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচার এরূপ প্রত্যভিজ্ঞা-মূলক বলিয়া বোধ হয় না। অমুক অমুক দ্রব্য খাইলে বুদ্ধি মোটা হয়, এ কথা বলিয়া সেই সেই দ্রব্যের ভক্ষণ নিষেধ, আর কোন জাতির শাস্ত্রে নাই। ইউরোপীয় বিজ্ঞানের রাসায়নিক বিশ্লেষণ এখনও অতদূর পর্য্যন্ত যাইতে পারে নাই।

(৩) মনের চাঞ্চল্য নিবারণের উপায়ও দ্বিবিধ। ধ্যান, ধারণা এবং সমাধির অভ্যাসে মনের চাঞ্চল্য অপগত হয়। আর প্রাণায়াম, ব্রতানুষ্ঠান এবং বৈধ ভক্ষ্যের গ্রহণ এবং অবৈধ ভক্ষ্যের পরিহারও মনের চাঞ্চল্য নিবারণ করিবার অতি উৎকৃষ্ট উপায়। যে যে দ্রব্যের ভক্ষণে মনের চাঞ্চল্য বৃদ্ধি হয়, শাস্ত্রে সেগুলির ভক্ষণ নিষিদ্ধ।

(৪) রিপুর দমন, কামনার জয় এবং ইন্দ্রিয়ের সংযম দ্বারা সুসিদ্ধ হয়। কাম জয়ের এবং ইন্দ্রিয় সংযমের বিধি উপদেশ এবং অনুষ্ঠানসূত্র আর্য্যশাস্ত্রের সর্ব্বাঙ্গব্যাপক ভক্ষ্যাভক্ষ্যের বিচারেও রিপুদমনের প্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি আছে। কেমন সকল দ্রব্যের ভোজনে কোন্ কোন্ রিপুর বিশেষ প্রাদুর্ভাব হয়, তাহার বিচারপূর্ব্বকই সাধকদিগের পক্ষে ভক্ষ্যাভক্ষ্য নির্দ্দেশ হইয়া থাকে। যাঁহারা ইউরোপীয় রাসায়নিক বিশ্লেষণকেই দ্রব্যের গুণাগুণ বিচারের একমাত্র উপায় বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা বুঝিতেই পারেন না যে, পূর্ব্বকালে কিরূপে দ্রব্যগুণের পরীক্ষা হইয়াছিল। বস্তুতঃ রাসায়নিক বিশ্লেষণটী অপেক্ষাকৃত স্থূল ব্যাপার। শাস্ত্রের প্রতি দৃঢ়বিশ্বাস সহকারে তাহার বিধি নিষেধ বাক্য সকল রক্ষা করিয়া যাইতে পারিলেই পুণ্যরূপ মহৎফলের লাভ হয়। কি সুন্দর তথ্য! যে ধর্ম্মরূপ বীজ হইতে শাস্ত্রাচারের উৎপত্তি, সেই ধর্ম্মই পুণ্য-নামে শাস্ত্রাচারের শুভময় ফল। অর্থাৎ প্রাকৃত বৃক্ষেও যেমন, এই সদাচার রূপ মহাবৃক্ষেও সেইরূপ—যাহা মূলে তাহাই ফলে।

নিত্যাচার প্রকরণে প্রাতঃকৃত্য, পূর্ব্বাহ্নকৃত্য, মধ্যাহ্নকৃত্য, অপরাহ্ণ, সায়াহ্ন ও রাত্রিকৃত্য এবং প্রকরণের উপসংহার আছে। গর্ভাধানাদি দশসংস্কার ও পূজা-পর্ব্বাদির কথা অপর দুই ভাগে আছে। এ সকল আচারই উল্লিখিত বাক্যাবলীরূপ সূত্রসমূহের ভাষ্যভূত।

শ্রীমদ্দত্ত-উদ্ধারণ-ঠাকুর।

(১)

গৌহাটী-নগরীস্থ সুধীবর শ্রীযুক্ত বাবু যজ্ঞাভিরাম বড়ুয়া মহাশয় 'পত্রী দ্বারা' নিম্নোক্ত কয়েকটী বিষয় আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন এবং জন্মভূমি মাসিক-পত্রিকায় ইহার উত্তর প্রকাশ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। তাঁহার প্রশ্ন এই;—

"মহাভাগবত শ্রেষ্ঠ, দত্ত-উদ্ধারণ।
সর্ব্বভাবে সেবে, নিত্যানন্দের চরণ॥"
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

(১) ইনি কে? কোন্ বংশ, তার প্রমাণ কি?
(২) শ্রীগৌরাঙ্গ, ঈশ্বরাংশ, কি ভক্ত, কি পূর্ণ, তাহার প্রমাণ।

(৩) শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীনিত্যানন্দ, একবস্তু কি ভিন্ন ভিন্ন ?

(৪) শ্রীনিত্যানন্দ, অবধূত হইয়া পশ্চাৎ গৃহী হইবার কারণ কি ?

(৫) তিনি কি শূদ্রের পক্ক অন্ন গ্রহণ করিতেন ?

(৬) 'সর্ব্বভাবে সেবা' ইহার অর্থ কি ?

(৭) সপ্তগ্রাম এবং অম্বুয়া-মূলক কোথায় ?

প্রথম প্রশ্নের উত্তর।

যথা, ভক্তিশাস্ত্র বৃহৎ গণোদ্দেশ-দীপিকায় ;—

"শ্রীদামা চ সুদামা চ সুবলশ্চ মহাবলঃ।
সুবাহুর্ভদ্রসেনশ্চ স্তোককৃষ্ণসুরামকৌ।,
লবঙ্গশ্চ মহাবাহুর্গন্ধর্ব্ব-ধীরবাহুকৌ ॥"

শ্রীকৃষ্ণাবতারে ব্রজভূমে এই যে, দ্বাদশ গোপাল শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় সখা ছিলেন, তন্মধ্যে "সুবাহুর্যো ব্রজে গোপো দত্ত-উদ্ধারণাখ্যকঃ" অর্থাৎ শ্রীগৌরাঙ্গাবতারে তিনিই উদ্ধারণ দত্ত নামে বিখ্যাত।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অবতার হইবার কিছু পূর্ব্বে এবং শ্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পর, ১৪০৩ শকে এই মহাত্মা,

"প্রত্যুম্নগরাদ্‌ষাম্ভে সরস্বত্যাস্তথোত্তরে।
তদ্দক্ষিণপ্রয়াগস্ত গঙ্গাতো যমুনা গতা।
ত্রিবেণীতি সমাখ্যাতা ধর্ম্মকামার্থদায়িনী ॥"

মহাভারত।

অর্থাৎ গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতীর মুক্তবেণীর স্থান পুণ্যতীর্থ ত্রিবেণী।

তীরবর্ত্তী সপ্তগ্রামাখ্যনগরে "সুবর্ণ বণিক্ কুলে" জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহার পিতার নাম শ্রীকরদত্ত, মাতার নাম ভদ্রাবতী এবং পুত্রের নাম শ্রীনিবাস। উপাধি—দত্ত ও শাণ্ডিল্য গোত্র। তত্র প্রমাণম্—

তাঁহার একসঙ্গী শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর প্রিয়-পরিকর এবং কীর্ত্তনীয় সম্প্রদায়-প্রধান-গায়ক এবং কবি শ্রীমুকুন্দ-ঠাকুর (যিনি পূর্ব্ব-যুগে শ্রীকৃষ্ণের "গন্ধর্ব্ব" নামে সখা ছিলেন) তিনি নিত্য গাথায় লিখিয়াছেন ;—

"শ্রীকর-নন্দন, দত্ত-উদ্ধারণ,
ভদ্রাবতী-গর্ভজাত।
ত্রিবেণীতে বাস, নিতাইর দাস,
শ্রীগৌরাঙ্গের পদাশ্রিত ॥
শাণ্ডিল্যপ্রবর, শ্রেষ্ঠ শান্ত ধীর,
সুবর্ণ-বণিক্-খ্যাতি।
রাধাকৃষ্ণপদ, ধ্যায়, নিরন্তর,
বৈশ্যকুলেতে উৎপত্তি * ॥
বিষয় বাণিজ্য, সাংসারিক কার্য্য,
মলপ্রায় ত্যজ্য করি।
পুত্র শ্রীনিবাসে, রাখিয়া আবাসে,
হইলা বিবেকচারী ॥
নীলাচলপুরে, প্রভু দেখিবারে,
সদাধৃতি উড়ি ধায়।
আশাঝুলি ল'য়ে, ভিখারী হইয়া,
প্রসাদ যাচিয়া খায় ॥
প্রভু-ভক্তগণ, পাই নিজজন,
রাখিল যতন করি।
এ দাস মুকুন্দ, পরম আনন্দ,
দত্তের দৈন্যতা হেরি ॥

(পদসমুদ্র ৩০৪১)

ইনি, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শাখা। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু সাঙ্গোপাঙ্গ সহিত যে সময়ে শ্রীনবদ্বীপ-ধামে প্রকট হইয়াছিলেন, সে-সময়টী অতি চমৎকার। তৎসময়ে বঙ্গদেশ দেবদুর্লভ স্থান বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়াছিল।

শাস্ত্রে, শ্রীহরি-সাধনের যেরূপ উপায় নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা অতীব কঠোর এবং বহুকাল-সাধ্য ; কিন্তু কলিকালে জীবের পরমায়ু অতি অল্প পরিমিত, অথচ এই অল্প-

এ সম্বন্ধে যাহা বক্তব্য তাহা প্রবন্ধ শেষে বলিব।
জ, স।

কালের মধ্যে মানবজীবনের কর্ত্তব্য সকল সমাধান করিতে হইবে। এই নিমিত্তই সেই সর্ব্বদেবাত্মক শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীনবদ্বীপ ধামে উদিত হইয়া একমাত্র মধুর হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন প্রচার করিয়াছিলেন।

আর্য্যগণ যজ্ঞ, তপস্যা, শম, দম, দান ইত্যাদি দ্বারা যে পরম রসাস্বাদন করিতে সক্ষম হন নাই, কর্ম্মকাণ্ডে প্রবৃত্ত হইয়া বৃথা বোধ করিয়াছিলেন, মোক্ষানুসন্ধান বিফল হইয়াছিল, প্রণব-গায়ত্রী দ্বারা উপাস্যের সন্তোষ-সাধনে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল এবং সংসারের উন্নতি-সাধনধর্ম্মে ঈশ্বরের প্রীতি-উৎপাদন-সমালোচনায় তাঁহাদের বিশুদ্ধ হৃদয় শুষ্ক হইয়াছিল, ভগবান্ শ্রীশচীনন্দন শ্রীগৌরাঙ্গ এবং শ্রীপদ্মাবতীনন্দন শ্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রভু, ভারতে যে নাম সম্যক্ প্রকারে কখন স্ফুরিত হয় নাই, সেই হরিনাম—পরমার্থ-তত্ত্বের অমূল্যরত্ন—অকাতরে, অবলীলাক্রমে সর্ব্বজীবে সমান ভাবে বিতরণ করিয়াছিলেন। পাত্রাপাত্র ভেদ করেন নাই।

ব্রজধামের রসাস্বাদনে, কীর্ত্তনের সারতত্ত্বে এবং সমস্ত রসাশ্রিত প্রেমাকৃষ্ট হরিনামে পরমার্থ-তত্ত্বের সহজ পন্থা উদ্ঘাটন করিয়া সমস্ত বঙ্গদেশকে পরমেশ্বরের প্রীতিস্রোতে ভাসাইয়া স্বর্গসম পরমানন্দ-ধাম করিয়া তুলিয়াছিলেন।

যে বৈষ্ণবধর্ম্ম আদিকালে সরস্বতীতীরে অঙ্কুরিত হইয়াছিল, মধ্যকালে বদরিকাশ্রমে পল্লবিত হইয়াছিল এবং তৎপরবর্ত্তী কালে, নৈমিষারণ্যে মুকুলিত হইয়াছিল, তাহা এই শেষকালে অর্থাৎ কলিকালে শ্রীনবদ্বীপ-ধামে ফলবান্ ছায়াবিশিষ্ট প্রবল বৃক্ষে পরিণত হইয়া একমাত্র ধর্ম্মাশ্রয়ের স্থল হয়।

কি কঠোর-তপস্যাকারী যোগিগণ, কি সরল-বিশ্বাসী সাংসারিকগণ,—এই হরিনামে সকলেরই সমান অধিকার। এ নাম লইতে ব্যক্তি বা জাতি-বিচার নাই। সাধনের এমন সহজ এবং অনায়াস-লভ্য উপায়ও আর দ্বিতীয় নাই।

কেবল সরল-বিশ্বাসী হইয়া যে ব্যক্তি একান্তমনে এই নাম-সঙ্কীর্ত্তন রূপ মহাব্রতের অনুষ্ঠান করে, সেই ব্যক্তি দয়াল নামের গুণে আয়াস-সাধ্য কঠোর-তপস্যা-জনিত বিলাসানন্দ উপভোগের অধিকারী হইতে পারেন।

এই কারণেই তৎসময়ে শ্রীদত্ত-উদ্ধারণ-ঠাকুর দার, পুত্র, বন্ধু, বান্ধব এবং বিপুল ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া অতি দীনহীন কাঙ্গালবেশে শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রভুর সেবক ভাব অবলম্বন দ্বারা চিরজীবন তাঁহাদের পদ-যুগলের সেবাতেই আপনার নশ্বর-জীবনের সার্থক বলিয়া শ্রীশ্রীপুরুষোত্তম-ধামে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু এবং তদীয় ভক্তগণের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। ভক্ত দিক্-দর্শিনীতে বিদিত আছে ;—

তিনি, ৪৮ বৎসর বয়ঃক্রমে বৈরাগ্যধর্ম্ম করিয়া ৬ বৎসর নীলাচলে এবং ৬ বৎসর শ্রীবৃন্দাবন ধামে বাস করিয়া ৬০ বৎসর বয়ঃক্রমে অর্থাৎ ১৪৬৩ শকের মার্গশীর্ষ মাসে কৃষ্ণ-ত্রয়োদশী দিবসে স্বকামপূর্ণতা এবং সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া নশ্বর-দেহ ঈশ্বরে সমর্পণ করত জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছিলেন। সেইদিন আমাদের শোকের দিন বলিয়া প্রতি বৎসর ঐ তিথিতে তদুদ্দেশে পিতৃকৃত্য এবং মহোৎসব করিতে হয়।

শ্রীবৃন্দাবনের বংশীবটের নিকট এ পর্য্যন্ত তাঁহার সমাধি বর্ত্তমান আছে। তাঁহার কৃত কোন গ্রন্থ কি পদ পদাবলী নাই। পরন্তু তিনি অধ্যয়নের নিমিত্ত বহুবিধ গ্রন্থ ও নানা শাস্ত্র সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এখনও তাহার কিছু কিছু আছে। তিনি ভক্তগণের সঙ্গ

লাভ করিয়া সর্ব্বদা শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ আর হরিনাম সংখ্যা করিতেন। শাস্ত্রাপেক্ষা শ্রীহরি নামেই তাঁহার গাঢ়ভক্তি ও তদ্গত-চিত্ততা ছিল। এই মহাপুরুষের আদিপুরুষের নাম, "শ্রীভবেশ দত্ত"। তিনি উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল অযোধ্যাপ্রদেশে বাস করিতেন।

ঐ ভবেশ দত্ত মহাশয় ৯৭৫ শকে অযোধ্যা প্রদেশ হইতে বাণিজ্য হেতু রাজা আদিশূরের সময়ে বঙ্গদেশে আসিয়া ব্রহ্মপুত্র নদের তীরবর্ত্তী "সুবর্ণগ্রামে" বাস ও তত্রস্থ বৈশ্যকুল-সম্ভূত শ্রীকাঞ্জিলাল ধরের ভগিনী শ্রীমতী ভগবতীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বে সনক আঢ্য মহাশয় ঐ আদিশূরের সময় ব্রহ্মপুত্র তট বহু বাণিজ্যের স্থল বলিয়া অযোধ্যা হইতে—

"দে দত্তশ্চন্দ্র আঢ্যশ্চ শীলঃ সিংহো ধরস্তথা।
বড়ালঃ পাল নাথশ্চ মল্লকো নন্দী বর্দ্ধনঃ।
দালো লাহা তথা সেনঃ ষোড়শখ্যাতিরুত্তমা॥

এই ১৬ ঘর প্রধান ও তাহাদের অনুগত অপর ৩০ ঘর অপ্রধান বৈশ্য সমভিব্যহারে ব্রহ্মপুত্র-তটে বসতি করিয়াছিলেন। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে পবিত্র সলিলা সরযূ-প্রবাহিতা প্রদেশবাসী এই জাতিদিগকে "বয়েশ বণিয়া" কেহ কেহ "কনক-ক্ষত্রী" বলিয়া সম্বোধন করিতেন। বয়েশ শব্দটী বৈশ্যশব্দের অপভ্রংশ। এই জাতির বাণিজ্যপ্রভাবে যখন সেই নগরী উন্নতির চরম অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল, তখন কুবেরতুল্য ধনবান্ বৈশ্য কুশলচন্দ্র আঢ্যের সনক, সনাতন ও সনৎকুমার নামে তিন পুত্র হয়। যথা,—

"জাতাস্ত্রয়ো যে কুশলস্য পুত্রা
বাণিজ্যকারী সনকশ্চ হেম্নঃ।
আসীন্মণেস্তেষু, সনাতনো বৈ
গন্ধাদিসত্ত্বস্য সনৎকুমারঃ॥"

(কুলজীকা)

অর্থাৎ কুশলের ঐ পুত্রত্রয়ের মধ্যে সনক কনক-ব্যবসায়ী, সনাতন মণি-ব্যবসায়ী ও সনৎকুমার গন্ধাদিব্যবসায়ী ছিলেন। কনক-ব্যবসায় প্রযুক্ত, সনক কনক-ক্ষেত্রী বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহা দ্বারা অনেকের এরূপ ভ্রম হইতে পারে যে, কনক-ব্যবসায়ী ক্ষত্রিয়। কিন্তু ক্ষত্রিয় শব্দ এস্থলে জাতিবাচক নহে। তজ্জন্য কুলাচার্য্যগণ এইরূপ মীমাংসা করিয়াছেন, যথা ;—

"পূর্ব্বস্মিন্ কালে এতেষাং সুবর্ণবণিজামাদি-পুরুষঃ বরেণ্যঃ সর্ব্বগুণাকরঃ সনকনামা কনক-ক্ষেত্রী এক আসীৎ। কনকস্য ক্ষেত্রং বিদ্যতে যস্য স তথা। কৃষকস্য ক্ষেত্রকর্ষণাদিনা ক্ষেত্রি-সংজ্ঞা, তথা হিরণ্যরূপব্যবহারেণ কনকক্ষেত্রীতি সংজ্ঞা।"

বণিক্ শব্দে বৈশ্য ; তা অভিধানেও প্রমাণ আছে। যথা অমরে,—

"বৈদেহকঃ সার্থবাহো নৈগমো বণিজো বণিক্॥"

রাজানির্ঘণ্টে—

"বৈশ্যস্তু ব্যবহর্ত্তা বিট্ বার্ত্তিকো পণিতো বণিক্।"

সামবেদে—

"বিশো বিশো বো অতিথিং বাজয়ন্তপুরুপ্রিয়াম্।"

ব্যবসা সম্বন্ধে পৌরাণিক এবং বেদবেত্তা মুনিগণ বলেন,—

প্রথমতঃ মনুবচনম্—

"পশূনাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেব চ।
বণিক্পথং কুসীদঞ্চ বৈশ্যস্য কৃষিমেব চ॥" ৯

"মণিমুক্তাপ্রবালানাং লৌহানাং তান্তবস্য চ।
গন্ধানাঞ্চ রসানাঞ্চ বিদ্যাদর্ঘবলাবলম্॥"৩২৯

"সশাস্ত্রভৃত্যক্ষত্রস্য বণিক্পশুকৃষির্বিশঃ।
আজীবনার্থধর্ম্মস্তদানমধ্যয়নং যজিঃ॥"১০।৭৯

আরও প্রমাণ আছে, তাহা পরে বলিব।

শ্রীহারাধন দত্ত।

জন্মভূমি।

৫ম ভাগ। } অগ্রহায়ণ ১৩০২। { ২য় সংখ্যা।

মান্দু।

বিন্ধ্য ও সাতপুরা এই উভয় পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্য দিয়া নির্ম্মলসলিলা নর্ম্মদা নদী মালোয়া প্রদেশের সুবিস্তীর্ণ উর্ব্বর ভূখণ্ড ও শ্যামল-শস্যে ভূষিত করিয়া ললিত তরল গতিতে প্রবাহিত হইতেছে। উভয় পার্শ্বে বিন্ধ্য ও সাতপুরা পর্ব্বতের সমুন্নত শৃঙ্গ বিরাট্ পুরুষের ন্যায় দণ্ডায়মান, সানুদেশে অগণ্য বৃক্ষশ্রেণী-ছায়া-শীতল শান্তিময় নিভৃত-নিকুঞ্জ নির্ম্মাণ করিয়াছে ; বৃক্ষশাখায় বিহঙ্গের মধুর কূজন, বায়ুহিল্লোলিত পত্রের শরশর কম্পন নর্ম্মদার 'চিরকলতানের' সহিত সম্মিলিত হইয়া এক মোহন-শব্দ সমন্বয় উৎপন্ন করিতেছে। মুগ্ধহৃদয় কবি হইতে সংসার-বিরাগী যোগী এখানে আসিলে সকলেরই হৃদয় আনন্দে আপ্লুত হইয়া যায়।

যে অংশে পর্ব্বত নাই তাহার দৃশ্যও অতি বিচিত্র। বঙ্কিম-নদী আলস্যমন্থর গমনে ক্রমনিম্ন উভয় তটের প্রান্তভাগ ধৌত করিয়া অগ্রসর হইতেছে, তটদেশে বহুদূর বিস্তৃত শস্যক্ষেত্র, কোথাও বনভূমি সহসা অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে এবং তাহার পরিবর্ত্তে সুদৃশ্য লোকালয়, সমুন্নত, হর্ম্ম্যরাজী, সুগঠিত-মন্দির ও বিবিধ দ্রব্যপূর্ণ আপণশ্রেণী পরম-শোভান্বিত চিত্রপটের ন্যায় নয়ন সমক্ষে বিচিত্র হইয়া উঠিতেছে। আবার কোথাও দক্ষিণে বিন্ধ্য এবং বামে সাতপুরা পর্ব্বত হইতে শাখা নদী-সমূহ বহির্গত হইয়া নর্ম্মদার সহিত মিশিতেছে ; কতকাল হইতে ইহারা এইরূপে প্রবাহিত হইতেছে, অতীত কালের কত গৌরব, কত কীর্ত্তি, কত জয় পরাজয়ের দৃশ্য এই নদীতীরে উদ্ঘাটিত হইয়াছিল কে বলিবে ?

এই নর্ম্মদাতীরে এক খণ্ড সমতল ভূভাগের উপর মান্দুনগর সংস্থাপিত। মান্দু মালোয়া প্রদেশের অলঙ্কার স্বরূপ। অনেকের অনুমান, নর্ম্মদা, এককালে যখন বঙ্গোপসাগরের অংশ ছিল, তখন মান্দু একটি দ্বীপমাত্র ছিল।

ধার হইতে মান্দু প্রায় দশ ক্রোশ দূরে অবস্থিত, এই পথ ঠিক সমতল নহে, কিঞ্চিৎ উচ্চ নীচ। এই পথের যে অংশ মান্দুতে আসিয়া সম্মিলিত হইয়াছে, তাহা একটি অধিত্যকার অন্তর্নিহিত। এই অধিত্যকা মালোয়ার সমতল ক্ষেত্র এবং অদূরস্থিত পর্ব্বত বেষ্টনীর মধ্যে অবস্থিত। এই স্থানের পথ অতি দুর্গম এবং চড়াই অতি উচ্চ, কিন্তু অধিক দূর বিস্তৃত

নহে; রাজ পথ—মান্দু-দুর্গ প্রাচীরের অভ্যন্তরে আসিয়া পড়িয়াছে। পথের উত্তর পার্শ্বে প্রাচীন মসজীদ্, জীর্ণ সমাধিস্তম্ভ, শুষ্ক প্রায় শৈবালাচ্ছন্ন বহু পুরাতন সরোবর এবং দীর্ঘিকা প্রচুর পরিমাণে বর্ত্তমান রহিয়াছে। ইহার দুই মাইল পর্য্যন্ত ঘন বনের অন্তরালে অবস্থিত। একদা যে স্থানে সুন্দর পণ্যবীথী, পান্থনিবাস এবং নগরতোরণ সমূহ শোভিত ছিল, আজ তাহা গভীর অরণ্যে সমাচ্ছন্ন। একটি দীর্ঘিকা অর্দ্ধ মাইল দীর্ঘ এবং এক চতুর্থাংশ মাইল প্রস্থ।

মান্দুর পার্ব্বত্য দুর্গ অতি বিস্তীর্ণ, ইহার, পরিধি প্রায় বত্রিশ মাইল। এই দুর্গ প্রাচীর বেষ্টিত, পর্ব্বতের উপর দিয়া যে যে অংশ গিয়াছে তাহাও প্রাচীর সংলগ্ন; পূর্ব্বকালে এই দুর্গ অত্যন্ত দৃঢ় ছিল, ইহার চতুর্দ্দিকে তোরণ শ্রেণী বর্ত্তমান, তন্মধ্যে কতকগুলি 'দেউড়ী' অত্যন্ত উচ্চ। দুর্গের অভ্যন্তরে একটি সরোবর আছে, তাহার জল অতি গভীর এবং নির্ম্মল। দুর্গের মধ্যে পানীয় জল এবং খাদ্য দ্রব্যের প্রাচুর্য্য বশতঃ শত্রুসৈন্য বহুকাল অবরোধেও ইহা হস্তগত করিতে পারিত না। ইহার অধিবাসিবর্গকে শত্রুর প্রবল আক্রমণ হইতে আপনার সুরক্ষিত বক্ষান্তরালে সযত্নে রক্ষা করিত; প্রতিপক্ষের প্রতিহত ক্রোধবহ্নি দুর্গবাহিরে পড়িয়া থাকিত। কিন্তু বর্ত্তমান কালের পর্ব্বত বক্ষবিদারী কামানের অব্যর্থ সন্ধান হইতে এই দুর্গ আত্মরক্ষা করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ, ইহার বিধ্বস্ত প্রায় বিপুল দেহ একটী পরিত্যক্ত নগরীর ন্যায় পতিত রহিয়াছে। দুর্গের অভ্যন্তরে ভ্রমণ করা এক প্রকার অসম্ভব, তাহা অরণ্য শ্রেণীতে পরিপূর্ণ, তথাপি ইহার মধ্যে স্থানে স্থানে সংকীর্ণ পথ বর্ত্তমান আছে। যদি কোন কৌতূহলোদ্দীপ্ত পথিক এই পথে পর্য্যটন করিতে সাহসী হয়, তাহা হইলে চতুঃপার্শ্বস্থ স্নিগ্ধ প্রকৃতিক শোভা, কমনীয় বনচ্ছায়া এবং বিচিত্র কান্তারের নব নব দৃশ্য তাহার হৃদয়কে সম্পূর্ণ রূপে মুগ্ধ করিয়া ফেলে।

মান্দুর জলবায়ু অতি স্বাস্থ্যকর; অপরিমিত শীত এবং উষ্ণতা এখানে উভয়েরই অভাব লক্ষিত হয়। শীতকালে অগ্নি সেবন এবং গ্রীষ্মকালে তালবৃন্তের সহায়তা গ্রহণ সম্পূর্ণ অনাবশ্যক।

প্রাচীন এবং মধ্য ঐতিহাসিক যুগে মান্দু অত্যন্ত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। ভারতে বৌদ্ধ ধর্ম্মের অভ্যুদয়ের অনতিকাল পরে এই নির্জ্জন প্রদেশে জৈনগণ আপনাদিগের আশ্রয় স্থাপন করেন; এই সময়ে এখানে তাঁহাদের কয়েকটি সুবৃহৎ সুন্দর মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। এখানকার এক একটি জৈন মন্দির বিস্ময়কর সুন্দর। একদিকে যেমন তাহার অসাধারণ শিল্পচাতুর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইতে হয়, অন্যদিকে ইহার উদার গম্ভীর ভাব, পবিত্র এবং শান্ত শোভা দর্শকের চিত্ত পরিতৃপ্ত করে; এমন ভাস্কর কৌশল ভারতের অতি অল্প দেশেই লক্ষিত হইয়া থাকে। হায়, সে কোন যুগের কথা, যখন এই সকল বিপুল গৌরবাধার মন্দির সমূহ নির্ম্মিত হইয়াছিল, এই সকল মন্দিরে প্রাচীন ভারতবাসীর শুধু শিল্প নৈপুণ্য মাত্রই যে প্রকাশিত তাহা নহে ইহাতে একটি স্বাধীন জাতির রুচি, তাহাদের ঔদ্যম, উৎসাহ এবং একাগ্রতার সুস্পষ্ট পরিচয় স্থল, আজিকার এই দেশ কি সেই ভারতবর্ষ? আমাদের হৃদয় যতই নিস্তেজ, বাহু যতই নিরুদ্যম হইতেছে, আমাদের কণ্ঠস্বর ততই উচ্চ হইতেছে!

এই সকল মন্দিরে বহু সংখ্যক স্তম্ভ বর্ত্তমান আছে, স্তম্ভগুলি মৃত্তিকা হইতে ছাদ পর্য্যন্ত উচ্চ, ইহার নিম্নতম ভাগ হইতে উর্দ্ধতম অংশ পর্য্যন্ত সুন্দররূপে ক্ষোদিত এবং সকল গুলি

সমান স্থূল এবং অভিন্ন আকারবিশিষ্ট। এই সকল মন্দিরের গম্বুজের শোভা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক রমণীয়, এসম্বন্ধে অধিক কিছু না বলিয়া একজন ইংরাজ পরিব্রাজকের মত উদ্ধৃত করিলে আশা করি পাঠকগণ ইহার সৌন্দর্য্য কিয়ৎ পরিমাণে উপলব্ধ করিতে পারিবেন; তিনি লিখিয়াছেন;—

"It is worth nothing that the Archœalogical Survayor of the Punjab circe of the defunct Archœslogical Survey obtained a portion of one of these domes from the ruins of Hansi. He conveyed it to the Lahore Museum where it came under the observation of Bhai Ram Singh, the Punjabi gentelman who made the Indian room for Her Majesty. He utilised the ideas that Stone gave him, and reproduced them in the roof of that room."

অতএব ইহার সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে পুনরুক্তি বাহুল্য মাত্র।

মুসলমান শাসনের অন্তর্ভুক্ত হইবার পূর্ব্বে মান্দুতে তিনটি জৈন মন্দির ছিল। ৬২৪ হিজরী সালে সামসুদ্দীন আলতামাস্ সর্ব্বপ্রথমে মান্দু অধিকার করেন, কিন্তু তখন পর্য্যন্ত ইহা মালোয়া প্রদেশস্থ হিন্দু শাসন কর্ত্তাদিগের করায়ত্ত ছিল। দিল্লীশ্বর দীর্ঘকাল ইহা স্বকীয় শাসনাধীনে রাখিতে পারেন নাই, আলতামসের পর রুকনউদ্দীন দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন, এই যথেচ্ছাচারী, দুরাচার নরপতির শাসনকালে দিল্লীর প্রধানরাজকর্ম্মচারিবর্গ বিবিধ প্রকারে বিড়ম্বিত হওয়াতে তাঁহার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিয়া তাঁহাকে পদচ্যুত কারারুদ্ধ করেন, বিভিন্ন প্রদেশের শাসন কর্ত্তৃগণও সুবিধা বুঝিয়া দিল্লীর অধীনতা পাশ ছিন্ন করেন; বিশেষত রাজস্থানের পর্ব্বতস্বাধীন রাজপুত জাতিকে দীর্ঘকাল অধীনতা জালে আবদ্ধ করা পাঠান নৃপতিগণের সাধ্যায়ত্ত ছিল না।

এই জন্যই মান্দু অধিকার করিয়া দিল্লীর পাঠান নরপতি আপনাকে সৌভাগ্যবান জ্ঞান করিয়াছিলেন। কিন্তু ভারতের পাঠান রাজগণ রাজধানী দিল্লীনগরী হইতে এতদূরে আপনাদিগের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখা সহজ মনে করেন নাই; মান্দু অতি অল্পদিনের মধ্যেই স্বাধীন হইয়াছিল। সম্রাট ফেরোজ সাহের রাজত্ব কালে দিগ্বিজয়ী আলাউদ্দীন দাক্ষিণাত্য জয় করিয়াছিলেন, কিন্তু মান্দু সেই বিজিত প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। দেবগিরি বা দৌলতাবাদ উক্ত সম্রাটের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। দেবগিরির পথ মান্দু নগরের পূর্ব্বে অবস্থিত। দেবগিরিতে পাঠান সম্রাট যখন আপনার সমগ্র গৌরব বিস্তার করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন, তৎকালে মান্দুর প্রতি যে তিনি কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় না। এমন কি এই সময়ের ইতিহাসের মধ্যে মান্দুর উল্লেখ পর্য্যন্ত নাই; কেবল মহম্মদ তোগলকের দেবগিরি যাত্রার উপলক্ষে একবার মাত্র মান্দুর উল্লেখ দেখা যায়।

দেব-গিরির মনোরম দৃশ্যে মুগ্ধ হইয়া মহম্মদ তোগলক সেই স্থানে রাজধানী সংস্থাপন পূর্ব্বক দেশের ধনী ও দরিদ্র বৃহৎ এবং ক্ষুদ্র সকলকে সেখানে উপস্থিত হইবার জন্য বাধ্য করিলে প্রজাবৃন্দ মান্দু ও ধারের পথ বাহিয়া দেবগিরি যাত্রা করিল; অনাহারে, অনিদ্রায়, রাজকর্ম্মচারি-বর্গের সহস্র প্রকার অত্যাচারে সহস্র সহস্র লোক পথপ্রান্তে প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল। তাহাদের নির্য্যাতন, সেই অসহনীয় অত্যাচার বর্ণনা করা যায় না; মুসলমান ভিন্ন তখন ইতিহাস-লেখক ছিল না, তাহারা সকলেই অল্পাধিক পরিমাণে স্বার্থপর

এবং সম্রাটের অনুগ্রহভিখারী ছিল, সুতরাং দুর্ব্বুদ্ধি বাদসাহের অন্যায় আদেশে কত লোক কি ভীষণ কষ্ট পাইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল, তাহার সঠিক সংবাদ পাওয়া যায় না। এই মহম্মদ সা তোগলকের অবিবেচনা ও দুরাকাঙ্ক্ষতায় পাঠান সাম্রাজ্যের অধঃপতন হইল, বিদ্রোহিগণ মস্তক উত্তোলন করিল এবং সাম্রাজ্যের ভিত্তিভূমি জীর্ণ ও বিদীর্ণ হইয়া গেল। ১৩৫১ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ তোগলকের মৃত্যু হইবার অল্পকাল পূর্ব্বে ১৩৪৭ খৃষ্টাব্দে গুলবারগায় প্রবল বাহমনি রাজ্য সংস্থাপিত হইল; ১৩৩৮ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালা স্বাধীন হইল এবং চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগে তোগলক-রাজাদিগের ক্ষমতা এরূপ হীন হইয়া পড়িল যে, দিল্লীর চতুর্দ্দিকে কয়েক মাইলমাত্র স্থান তাঁহাদের অধিকার ভুক্ত রহিল। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভকালে দিলবর ঘোরি "মালোয়ার রাজা" উপাধি গ্রহণপূর্ব্বক দেশ-শাসন করিতে লাগিলেন।

দিলবর খাঁর ইতিহাস বিলক্ষণ কৌতুকোদ্দীপক। মালোয়ার শাসনকর্ত্তা-মাত্র ছিলেন, সেই সময়ে দিল্লীর সম্রাট মহম্মদ-সা বিদ্রোহিগণের অত্যাচারে বিব্রত হইয়া প্রাণভয়ে গুজরাটে পলায়ন করেন, কিন্তু সেখানে তিনি যথাযোগ্য আতিথ্য লাভ করিতে পারেন নাই, সুতরাং তিনি মালোয়াতে দিলবর খাঁর আশ্রয় গ্রহণ করেন। দিলবর তাঁহাকে সসম্মানে গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহার প্রতি যথোচিত যত্ন করিতে লাগিলেন, তাঁহার বাসস্থান ধার-নগরে সম্রাটের আবাস নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। সম্রাট এই বিশ্বস্ত অনুচরের গৃহে যথাক্রমে তিন বৎসরকাল বাস করেন, একদিনের জন্যও তাঁহাকে কোন অভাব অনুভব করিতে হয় নাই। এই সময়ে দিলবর খাঁর পুত্র হুসেন খাঁ মান্দুনগরের দুর্গ পুনঃসংস্কারে মনোযোগ প্রদান করেন এবং ইহার 'সয়দাবাদ মান্দু' এই আখ্যা-প্রদান করেন। এই যুবকের যত্নে মান্দু অত্যন্ত সমৃদ্ধি-সম্পন্ন হইয়া উঠিল। দিলবর খাঁ চারি বৎসর মাত্র রাজ্যভোগ করিয়া কালগ্রাসে পতিত হন। মান্দুর একটী সদর দেউড়ীতে এখনও তাঁহার নাম খোদিত আছে। মৃত্যুর এক বৎসর পূর্ব্বে তিনি এই দেউড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

এই সময় হইতেই মান্দু মালোয়ার রাজধানী। অতীতের এই সুরক্ষিত সমৃদ্ধ নগরের ইতিহাস বিস্তৃত নহে, কিন্তু অত্যন্ত বিচিত্র। ইহাতে এখন যে সমস্ত বিধ্বস্ত হর্ম্ম্যরাজীর ধ্বংসাবশেষ বর্ত্তমান দেখা যায়, তাহার কথা বলিতে হইলে এই ইতিহাসের, ইহার রাজন্যবর্গের কথঞ্চিৎ বিবরণ প্রকাশ করা আবশ্যক। দিলবর খাঁর মৃত্যু হইলে তৎপুত্র হোসেন খাঁ পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করেন। হোসেন খাঁ ত্রিশ বৎসর কাল মলোয়ার শাসনদণ্ড পরিচালিত করিয়াছিলেন। গুজরাটের সুলতানের সহিত তাঁহার প্রায় সর্ব্বদাই বিরোধ চলিত। কালক্রমে হোসেন খাঁর মৃত্যু হইলে তাঁহার মৃতদেহের উপর যে সামাধিস্তম্ভ স্থাপিত হইয়াছিল, তাহাই মান্দুর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রাসাদ। মার্ব্বেল প্রস্তর নির্ম্মিত এই সুবৃহৎহর্ম্ম্যের অভ্যন্তর ৫৫ বর্গফিট এবং ইহার উচ্চতা প্রায় ৭৫ ফিট। এই সুপ্রশস্ত সমুচ্চ সৌধের শিরোদেশে একটী বৃহৎ গম্বুজ আছে। গম্বুজটীর নির্ম্মাণ-কৌশল যথেষ্ট বিশেষত্বপূর্ণ। তাহার অভ্যন্তর-ভাগ মার্ব্বেল প্রস্তর নির্ম্মিত, এই সমস্ত প্রস্তর এরূপ সুকৌশলে কীর্ত্তিত হইয়া একত্র গ্রথিত হইয়াছিল যে, এখন পর্য্যন্তও ইহার একখানি প্রস্তরও একইঞ্চি পরিমাণে স্থানচ্যুত হয় নাই; গম্বুজের অভ্যন্তর ভাগের ত এই অবস্থা, বহির্ভাগ ইষ্টক দ্বারা আবৃত, তাহার উপর মার্ব্বেল-প্রস্তর বিন্যস্ত; এই মার্ব্বেল গুলি কালের

সহিত যুদ্ধ করিয়া, এখন নিতান্ত ভগ্নদশা প্রাপ্ত হইয়াছে, আর তাহার সে পূর্ব্বাবস্থা নাই। সমস্ত মালোয়াই শত শত সৌধের ধ্বংসাবশেষে পূর্ণ, সে সমস্ত দেখিলে অতীতের কথা—সেই বিলাসিতা, সেই অজস্র অর্থব্যয়, অনন্ত সুখ-সম্ভোগের আশায় অল্পপ্রাণ মানবের বিপুল আয়োজন এবং অবশেষে যে তাহার শোচনীয় নিষ্ফলতা—শুধু সেই সকলই মনে পড়ে।

পৃথিবীতে কিছুই চিরস্থায়ী নহে, তাই এতদিন পরে এখনও মালোয়া তাহার অতীত গৌরব স্মৃতি, কীর্ত্তি চিহ্ন বক্ষেধারণ করিয়া নিস্তব্ধ অরণ্যানীর মধ্যে আপনার নশ্বরতার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। চতুর্দ্দিক নির্জ্জন এবং মধ্যাহ্নের সূর্য্যালোক অত্যন্ত প্রখর। আবার বর্ষাকালে এই প্রদেশ নিরন্তর মেঘে সমাচ্ছন্ন থাকে এবং সমস্ত বর্ষা ব্যাপিয়া ঝর্ঝর বৃষ্টিধারা পতিত হয়। বর্ষার এই প্রকার প্রাচুর্য্যের জন্য এখানে লতাপল্লব এবং নগেজ বৃক্ষের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। অনেক সময় পরিত্যক্ত ভগ্নপ্রায় প্রাসাদের উপর বৃক্ষাদির বীজ পড়িয়া অঙ্কুর উদ্গত হয়, এবং কিছুদিনের মধ্যেই তাহা সতেজ-বৃক্ষে পরিণত হইয়া তাহার সুকঠিন, অসংখ্য শিকড়জালে সেই দৃঢ় অট্টালিকা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলে। মান্দুর এই প্রাচীন সৌধ সাদরে সংরক্ষিত হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। যদি অল্পদিনের মধ্যে ইহার জীর্ণ-সংস্কার হয়, তাহা হইলে হোসেন খাঁর সমাধি সৌধ এখন বহু শত বৎসর ধরিয়া উন্নত মস্তকে প্রাচীন প্রাচ্য স্থাপত্যের মহিমা ঘোষণা করিতে পারে। যে সময়ে এই সমাধি সৌধ নির্ম্মাণ হইয়াছিল, শুনিতে পাওয়া যায় তৎকালে এমন সুদৃশ্য, ভাস্কর নৈপুণ্য সম্পন্ন হর্ম্ম্য ভারতবর্ষে আর একটীও নির্ম্মিত হয় নাই। দিল্লীর গৌরব সে সময়ে প্রায় অস্তমিত হইয়াছিল, অন্যান্য স্বাধীন নরপতিগণও পরস্পর যদিও বিলম্বাদে কালাতিপাত করিতেছিলেন, কিন্তু মালোয়া লক্ষ্মীর অক্ষয় ভাণ্ডার হইয়া পূর্ণ গৌরবে বিরাজ করিতেছিল। বর্ত্তমানকালে মান্দু একজন হিন্দুরাজার অধীন, কিন্তু ইহার আর্থিক অবস্থা এরূপ সচ্ছল নহে যে, অজস্র অর্থব্যয় করিয়া, তিনি সেই প্রাচীন শিল্প গৌরবকে ধ্বংসের পথ হইতে রক্ষা করেন। ভারত গবর্ণমেণ্ট যে এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবেন এমন ভরসা নাই। পুরুষোত্তমে, উত্তর ভারতে, ভারতের শত শত তীর্থে কত যুগান্তরের মন্দির, শিল্প-নৈপুণ্যের আদর্শস্বরূপ কত হর্ম্ম্য, স্তম্ভ, সেতু দিনে দিনে ধ্বংসের মুখে অগ্রসর হইতেছে!

মান্দুর গৌরব-স্বরূপ এই প্রকাণ্ড হর্ম্ম্যের পশ্চিমে তোরণ-শ্রেণী বর্ত্তমান। এই তোরণের স্তম্ভগুলি মার্ব্বেল-প্রস্তর নির্ম্মিত। অনেকে অনুমান করেন, ইহা কোন জৈন-মন্দিরের মার্ব্বেল, কিন্তু ইহা কোথা হইতে আনীত, তাহা ঠিক করা কঠিন। কাহারও কাহারও বিশ্বাস ইহা জয়পুরস্থ হিন্দু স্থপতিদিগের দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল। এ কথা সত্য হইলে ইহা স্থানান্তরিত করিতে অল্প পরিশ্রম কিংবা অর্থব্যয় হয় নাই।

হোসেন-সাহের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র মহম্মদ-সাহ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া প্রায় দেড় বৎসরকাল রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। তিনি বিষ প্রয়োগে নিহত হইলে মহম্মদ সা খিলিজি সিংহাসন গ্রহণ-পূর্ব্বক ৩৪ বৎসর কাল রাজত্ব করেন; হোসেন-সা মান্দুর জুম্মা মস্‌জিদ্ নির্ম্মাণ আরম্ভ করিয়াছিলেন। মহম্মদ সা তাহা শেষ করেন। এই মস্‌জিদে দেখিবার এবং শিখিবার জিনিস যথেষ্ট আছে। এই মস্‌জিদের দেউড়ী সংলগ্ন একটী কক্ষ আছে তাহা ৫০ বর্গফিট প্রশস্ত। তাহার উপরে একটী প্রকাণ্ড গম্বুজ, তাহার পর মস্‌জিদ্, মসজিদের

চারিদিকে অতি বিস্তৃত বারান্দা, এই বারান্দা হইতে অতি সুন্দর স্তম্ভশ্রেণী ছাদ পর্য্যন্ত উন্নত রহিয়াছে। এই বৃহৎ মসজিদে ক্ষুদ্র বৃহৎ অসংখ্য খিলান, প্রত্যেক খিলানের ব্যবধানে কত সুন্দর সুন্দর চিত্র ক্ষোদিত আছে, তাহার সংখ্যা নাই। ইহা দেখিলে প্রাচীন হিন্দু জাতির স্থাপত্য নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। বুঝিতে পারা যায়, সে কালে হিন্দু কি ছিল, আর একালে তাহার কি শোচনীয় অধঃপতন হইয়াছে!

এই মসজিদের উভয় পার্শ্বে রমণীদিগের উপাসনার স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল। এই উভয় অংশের চিত্র-নৈপুণ্য এবং গঠন প্রাণালীও অতি সুন্দর। মসজিদের পূর্ব্বদিকের বারান্দা ভূমিসাৎ হইয়া গিয়াছে। উত্তর ও দক্ষিণের বারান্দাও কতক কতক ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, এই সমস্ত জীর্ণ সংস্কার করা অল্প অর্থের কার্য্য নহে। কিন্তু ইহার বিশাল আয়তন সমুন্নত সিংহদ্বার এবং সুদৃশ্য তোরণশ্রেণী ও চিত্র নৈপুণ্য ভারতের অতীত ঐশ্বর্য্যের নিদর্শন স্বরূপ অবশ্য সংস্কারযোগ্য।

এই জুম্মা মসজিদের দুই মাইল দূরে আর একটি সুন্দর মসজিদ আছে। এই মসজিদও মামুদের রাজত্বকালে নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহার সমস্ত উপকরণ সামগ্রীই জৈন মন্দির হইতে সংগৃহীত। কিন্তু ইহাতে দেব-দেবীর যে সমস্ত প্রতিমা ছিল, ধর্ম্মান্ধ মুসলমানগণ তাহা সম্পূর্ণরূপে চূর্ণ করিয়া তাহার সৌন্দর্য্য বিনষ্ট করিয়াছিল, এই মসজিদটীও নিতান্ত ভগ্নাবস্থায় পড়িয়া আছে, কিন্তু ইহার ভগ্নাবশেষের মধ্য হইতে প্রাচীন জৈনমন্দিরের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। এই ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া প্রত্নতত্ত্ববিদগণ অনেক লুপ্ত সত্য আবিষ্কার করিতে পারেন।

এই মসজিদ ও সমাধিগৃহ ভিন্ন চারিদিকে অনেকগুলি প্রাসাদ, স্নানশালা, কীর্ত্তিস্তম্ভ, মস্কো প্রভৃতির ধ্বংসাবশেষ বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহা মালোয়ার সুলতানের ঐশ্বর্য্য, গৌরব এবং বিলাসিতার ইতিহাসের সহিত বিজড়িত। এমন কি ইহা হইতে সুলতানের সহিত গুজরাটের অধিপতি এবং বাহমনী রাজগণের যুদ্ধের ইতিহাস পর্য্যন্ত কিয়ৎ পরিমাণে সংগ্রহ করিতে পারা যায়।

মান্দুতে যে সকল মুসলমান রাজা রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে একজনের পঞ্চদশ সহস্র বেগম ছিল। এই প্রকার ইন্দ্রিয় পরায়ণতা ও বিলাসিতায় যে রাজ্যের উচ্ছেদ সাধন হইবে তাহার আর আশ্চর্য্য কি? দিল্লীর অধীনতা পাশ হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর বাদসাহ হুমায়ুন ইহা পুনর্ব্বার দিল্লীর অধিকার ভুক্ত করেন। মান্দুর তদানীন্তন সুলতান, রণপণ্ডিত এবং সাহসী ছিলেন না, তিনি দুর্গদ্বার রুদ্ধ করিয়া তাহার মধ্যে বাস করিতে লাগিলেন। একদিন রাত্রিতে হুমায়ুনের কয়েক জন সৈন্য প্রহরীদিগের অলক্ষ্যে সিঁড়ির সাহায্যে দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দুর্গদ্বার উন্মুক্ত করিয়াছিল, হুমায়ুনের সৈন্যগণ সুযোগ পাইয়া পিপীলিকা শ্রেণীর ন্যায় দুর্গে প্রবেশপূর্ব্বক তাহা অধিকার করিয়া লইল। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই মালোয়া হুমায়ুনের হস্তচ্যুত হইল; ইহার কিছুকাল পরে আকবরসাহ এই রাজ্য পুনর্ব্বার অধিকার করেন। দাক্ষিণাত্যজয়ের সময় আকবর মান্দু নগরে বিশ্রাম করিয়া দক্ষিণাপথে অগ্রসর হন, এবং বিজয়ী বেগে প্রত্যাগমন করিবার সময় সেই গৃহেই দ্বিতীয়বার বিশ্রাম করিয়াছিলেন। এখনও পথপ্রদর্শকগণ দর্শকদিগকে আকবরের এই বিশ্রামগৃহ প্রদর্শন করিয়া থাকে। এই স্থান মান্দুর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর ও সুশীতল। ইহা একটি উপত্যকার উপর সংস্থাপিত, এই গৃহের সম্মুখে একটি ক্ষুদ্র

জলাশয় অসংস্কৃত অবস্থায় পতিত আছে। এই স্থানের নাম নীলকণ্ঠ; জাহাঙ্গীরের রাজত্ব কালে এই স্থানটি সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল; ভগ্নপ্রায় বিশ্রাম ভবনের উপর কতকগুলি হরফ খোদা আছে, কোন্ সালের কোন্ তারিখে আকবর এখানে পদার্পণ করিয়াছিলেন ইহা হইতে তাহা জানিতে পারা যায়।

সার টমাস রো ইংলণ্ডেশ্বরের দূতরূপে এখানেই মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের সহিত সাক্ষাৎ করেন। জাহাঙ্গীর সাহের দৈনন্দিনকার্য্য বিবরণ লিখিবার একখানি পুস্তক ছিল, সার টমাসও রীতিমত রোজনামচা লিখিতেন। এই উভয় পুস্তকই মুদ্রিত হইয়াছিল, পুস্তক দুখানি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। জাহাঙ্গীরের রোজ নামচায় তাঁহার আজমীর প্রবাসের কাহিনী সন্নিবিষ্ট আছে, আজমীর হইতে তাঁহার মান্দু যাত্রার বিবরণও ইহাহইতে জানিতে পারা যায়। মান্দু নগরে যাত্রা করিবার পূর্ব্বে তিনি পূর্ত্ত বিভাগের সচিবকে মান্দুর রাজপ্রাসাদ, মসজিদ ও তাঁহার সহকারিবর্গের বাসোপযোগী করিয়া মার্জ্জিত করিবার জন্য প্রেরণ করেন, আজমীরে সার টমাস জাহাঙ্গীরের সাক্ষাৎ লাভ করেন, এবং এখানেই দিল্লীশ্বরের ব্যবহারের জন্য ইংলণ্ডেশ্বর কর্ত্তৃক প্রেরিত অশ্বযান খানি তাঁহাকে উপহার প্রদত্ত হয়। এই গাড়ী খানিতে প্রচুর শিল্পচাতুর্য্য ছিল, জাহাঙ্গীরের কর্ম্মচারী বর্গের মধ্যে উপযুক্ত সূত্রধরের অভাব ছিল না। সম্রাটের নিদেশ অনুসারে তাহারা এই গাড়ীর অনুকরণে আরো অনেকগুলি গাড়ী প্রস্তুত করিয়াছিল, এবং সে গুলির অভ্যন্তর ভাগ মণি মুক্তা ও বহুমূল্য বস্ত্রে সজ্জিত করা হইয়াছিল। জাহাঙ্গীর আজমীর হইতে দাক্ষিণাত্যে যাত্রা করিবার সময় ইংলণ্ডেশ্বরের প্রেরিত গাড়ীখানি মহারাজ্ঞী নূরজাহানের ব্যবহারের জন্য দান করিয়াছিলেন; এই গাড়ী ইংরেজ কোচয়ানে পরিচালিত করিয়াছিল। জাহাঙ্গীর যে গাড়ীতে ছিলেন, তাহার কোচোয়ানকেও ইংরাজী কেতায় সাজান হইয়াছিল, সার টমাস রো জাহাঙ্গীরের সঙ্গেই ছিলেন। সার টমাস জাহাঙ্গীরের বিশেষ প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন।

সম্রাট জাহাঙ্গীর দুর্গদ্বার হইতে গজারোহণে নগরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। পূর্ত্ত বিভাগের সচিব বিশেষ দক্ষতার সহিত প্রাসাদ সমূহ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং সুসজ্জিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, এই কার্য্যের জন্য সম্রাটের তিন লক্ষেরও অধিক টাকা ব্যয় হইয়াছিল। আকবর সাহ পঞ্চাশৎ বৎসর দিল্লীর সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। এই সময়ে মান্দু নগর অরণ্যে পরিণত হইয়াছিল। জাহাঙ্গীরের সময়ে এই অরণ্য পরিষ্কৃত হয়। সার টমাস এখানে আসিয়া একটি অতি সুন্দর বাসগৃহ পাইয়াছিলেন, জাহাঙ্গীর মান্দুতে সর্ব্বসমেত নয় মাস কাল বাস করিয়াছিলেন। এস্থান তাঁহার অত্যন্ত প্রীতিকর হইয়াছিল। এই পার্ব্বত্য নগরীর সন্নিকটে যথেষ্ট শিকারের সুবিধা ছিল। সম্রাট জাহাঙ্গীর অত্যন্ত সুরাসক্ত ছিলেন, এই পর্ব্বতান্তরালবর্ত্তী স্নিগ্ধ বৃক্ষস্থান শীতল নগরীর সুন্দর নিভৃত প্রাসাদ, সুরম্য প্রমোদ কানন, লতামণ্ডপপূর্ণ সুশীতল সরোবরতীর তাঁহার সঙ্গী দিগের প্রমোদ উপভোগের পক্ষে সম্পূর্ণ উপযুক্ত ছিল। সম্রাট জাহাঙ্গীর মদ্যের বিশেষ অনুরক্ত থাকিলেও তাম্রকূটকে তিনি বিষতুল্য ঘৃণা করিতেন। মান্দুতে আসিয়া সম্রাট তাম্রকূট সেবনের নিষেধবিধি প্রচারিত করেন। এখানে মহারাজ্ঞী নূরজাহান স্বহস্তে ব্যাঘ্র শিকার করেন। এই উপলক্ষে একটি কবিতার উল্লেখ দেখা যায়, তাহার অর্থ এই;—

"নূরজাহান স্ত্রীলোক হইলেও ব্যাঘ্রঘাতিনী রমণী।"

জাহাঙ্গীরের রোজনামচায় মান্দুর বর্ণনা অতি মনোহর। মান্দুতে বসিয়া তাহা সম্যক প্রকারে অনুভব করা যায়। মান্দুর রমণীয় জলবায়ু, আম্র, কদলী প্রভৃতি অপর্য্যাপ্ত সুস্বাদু ফলও প্রকৃতির মনোমুগ্ধকর সৌন্দর্য্য। সহজেই এই প্রাচীন রাজধানী মানব হৃদয়কে মুগ্ধ ও তৎপ্রতি পক্ষপাতী করিয়া তুলে। মান্দু এখন ধ্বংসাবশেষে পরিপূর্ণ, কিন্তু ইহার সমৃদ্ধিকালে এই নগর যে সম্পূর্ণ দর্শনোপযোগী ছিল, তাহার সন্দেহ নাই। ইহাতে অসংখ্য সমাধিস্তম্ভ ছিল এবং সেই সকল স্তম্ভের পশ্চিমদিকে এক একটি মস্‌জিদে মুসলমানেরা কোরাণ আবৃত্তি ও মৃত ব্যক্তির আত্মার সদ্‌গতির জন্য প্রার্থনা করিত। মান্দুর উন্নতির দিনে ইহার অধিবাসীর সংখ্যা কত ছিল, তাহা ঠিক বলা কঠিন।

মান্দুতে মালোয়ার সুলতানের টাকশাল ছিল। এখানে যে টাকা মুদ্রিত হইত, তাহার উপর 'সদিয়াবাদ' অর্থাৎ "সুখ নিকেতন" এই কথা মুদ্রিত হইত। হুমায়ুন এই নগর জয় করিয়া এখানে মুদ্রা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, সেই মুদ্রার উপর মান্দু শব্দই খোদিত হইত, ইহার অন্য কোন নাম প্রযুক্ত হইত না। এই নগরে বাসকালে জাহাঙ্গীরও স্বর্ণ মুদ্রা মুদ্রিত করেন, তাহাতে নিম্নলিখিত ভাবের শ্লোক সন্নিবদ্ধ ছিল;—

"যে সম্রাট জাহাঙ্গীর চন্দ্র ও সূর্য্যের ন্যায় সর্ব্বত্র বিমলরশ্মি বিকীর্ণ করেন, তাঁহারই নামে মান্দুতে নির্ম্মিত মুদ্রা।"

সূর্য্য যখন অস্ত যায়, তাহার লোহিত আভা সমুচ্চ বৃক্ষশিখরে গলিত স্বর্ণের ন্যায় সুন্দর শোভা ধারণ করে। সুদূর পূর্ব্বে অনন্ত নীলিমার গাঢ় আবরণ ভেদ করিয়া সন্ধ্যার ধূসর অন্ধকার ধীরে ধীরে নিঃশব্দে ধরাতলে অবতরণ পূর্ব্বক এই সুবৃহৎ অরণ্যানীকে দৃঢ় আলিঙ্গন পাশে বদ্ধ করে। শান্ত সন্ধ্যা, নির্জ্জন আরণ্য প্রদেশ; শুধু বিবিধ বিহঙ্গমের বিচিত্র কাকলী অর্থহীন রহস্যভাবের ন্যায় কর্ণে ধ্বনিত হয় এবং এই যুগান্তরের প্রাচীন কীর্ত্তির ধ্বংস রাশির মধ্যে দাঁড়াইয়া পৃথিবী নিতান্ত অসার ও মৃত্যুর কৌতুক প্রহসন বলিয়া মনে হয়। কেবল চরাচার ধ্বনিত করিয়া কবির একটি সত্য উক্তি গম্ভীর দেববাণীর ন্যায় কর্ণে আসিয়া বাজেঃ—

"Sad solitude sits silently supreme,
And at her feet relics of ages past,
All useless now; but when our
thoughts we cast
On what they were, we useful
may them deem;
For kings lived here in riglt
majestic state,
And luxury held sway throughout
the land,
And learning and religion
took their stand,
And love and beauty with their
charms did wait,
Palaces rose, and men with
men did vie;
Stout walls were built, solders
kept watch and word,
And strove by doughty deeds
to win reward;
And thousand for the land they
lived would die.
The halls are silent now,
the walls forlorn,
But tombs are left and they are
of glory shorn." (1)

শ্রীজলধর সেন।

(1) Pioneer.

শ্রীমদ্দত্ত-উদ্ধারণ-ঠাকুর।

(২)

গতবারে একটি মাত্র প্রমাণ প্রয়োগ করিয়াছি, এবার আরও ৭টী প্রমাণ দিতেছি;—

পরাশরোক্তম্—

(১) "লৌহকর্ম্ম তথা রত্নং গবাঞ্চ প্রতিপালনম্।
বাণিজ্যং কৃষিকর্ম্মাণি বৈশ্যবৃত্তিরুদাহৃতা॥"৬০

হারীত বলেন—

(২) "গোরক্ষাকৃষিবাণিজ্যানুকুর্য্যাদ্বৈশ্যোযথাবিধি।

গারুড়োক্তম্,—

(৩) "দানমধ্যয়নং যজ্ঞোধর্ম্মঃ ক্ষত্রিয়বৈশ্যয়োঃ॥"

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—

(৪) "কৃষিগোরক্ষবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম্মস্বভাবজম্॥"

শ্রীমদ্ভাগবতে—

(৫) "কৃষিবাণিজ্য-গোরক্ষা কুসীদং তুর্য্যমুচ্যতে।"

যাজ্ঞবল্ক্যম্—

(৬) "ইজ্যাধ্যয়নদানানি বৈশ্যস্য ক্ষত্রিয়স্য চ।
প্রতিগ্রহোঽধিকো বিপ্রে যাজনাধ্যাপনে তথা প্রধানং ক্ষত্রিয়ে কর্ম্ম প্রজানাং পরিপালনম্। কুসীদং কৃষিবাণিজ্যং পাশুপাল্যং বিশঃ স্মৃতম্॥"

(৭) "বৈশ্যস্তু কৃতসংস্কারঃ কৃত্বা দারপরিগ্রহম্।
বার্ত্তায়াংনিত্যযুক্তঃস্যাৎ পশূনাঞ্চৈববরক্ষণে॥"

এই সমস্ত প্রমাণানুসারে বৈশ্য অর্থাৎ বণিক্‌গণ মণি-মাণিক্যাদি ব্যবসা করিয়া থাকেন, এখনও করিতেছেন। সঙ্কর-জাতির সহিত ইহাঁদের কোন সম্বন্ধ নাই। বৈশ্যধর্ম্মপালনেই ইহাঁরা অনুরক্ত এবং সদাচারী। ইহাঁদের ধর্ম্ম—দান, যজ্ঞ, ব্রত এবং পুত্রাদি-জননে দশবিধ সংস্কার ও উপবীত-ধারণাদি।

ঈশ্বরের নানা অবতারের পর ভারতে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলন সময়ে বঙ্গদেশ মগধরাজ্য হইতে পৃথক্ হইয়া স্বতন্ত্র রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বঙ্গদেশে রাজা আদিশূর স্বধর্ম্মানুরক্ত অর্থাৎ বৈদিকাচারী ছিলেন। সেই সময়ে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবল তরঙ্গ সমস্ত ভারত বিপ্লাবিত করিয়া তৎকালে কথঞ্চিৎ স্তিমিত-তেজ হইলে, সনক জন্মভূমি অর্থাৎ অযোধ্যার মায়া একবারে বিসর্জ্জন দিয়া বৈদিক-ধর্ম্মনিষ্ঠ বৌদ্ধ-বিদ্বেষী বঙ্গাধিপতি মহারাজ আদিশূরের শরণাপন্ন হইয়া কথিত ব্রহ্মপুত্র-তটে বসতি করিয়াছিলেন। তাহার কারণ—

তখন চীন, আরাকান এবং ব্রহ্মদেশের লোক জলযানে বাণিজ্যার্থে স্বদেশীয় দ্রব্যাদি-বিনিময়ের নিমিত্ত ঐ স্থানে আসিতেন এবং ধনিকগণও বাণিজ্য আশায় পোতারোহণে শুক্তি, মতি এবং বরাটিকা* (কড়ী) সংগ্রহের নিমিত্ত সমুদ্রযাত্রা করিতেন। তন্নিমিত্ত সিংহলরাজ আপনার দেশ-ভাষায় পোতারোহী বণিকদিগকে "পোতদার" বলিয়া (১) উপাধি দান করেন। (২) দ্বিতীয়তঃ আদিশূর রাজানুগ্রহে সনক স্বদেশে ব্রহ্মপুত্র-তটে বাস করিয়া দূরদেশী বাণিজ্যকারীদের সহিত বহুল পরিমাণে স্বর্ণ ও রজত ব্যবসা দ্বারা অল্পকালের মধ্যে সেই স্থানকে আশাতীত উত্তম অবস্থাপন্ন এবং অতি সমৃদ্ধিশালী নগরীতে পরিণত করিয়াছিলেন।

রাজা আদিশূর তদবলোকনে এবং অন্যান্য কারণে সনকের প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া সনকের সম্মান বর্দ্ধনার্থে "সুবর্ণ বণিক" এই উপাধিযুক্ত তাম্রফলকে একটী শ্লোক রচনা করিয়া সনককে উপহার দিয়াছিলেন। আর সনক-প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মতটবর্ত্তী অভিনব নগরীর "সুবর্ণগ্রাম" বলিয়া নামকরণ করিয়াছিলেন। আদিশূর-রাজপ্রদত্ত সেই তাম্রফলকে এই কবিতাটী লেখা আছে, যথা;—

* এখনকার অপেক্ষা পূর্ব্বে দ্রব্যাদি-ক্রয়-বিক্রয়ে সমুদ্রোৎপন্ন কড়ীর আদান-প্রদান অধিক ছিল।

"স্বর্ণবাণিজ্যকারিত্বাদ্ দত্তাস্থিতবিশাং ময়া।
সুবর্ণবণিগিত্যাখ্যা দত্তা সম্মান-বৃদ্ধয়ে॥"

এ সম্বন্ধে প্রাচীন কুলজিকায় যে সকল পয়ার ও প্রবন্ধ লেখা আছে, বাহুল্য-ভয়ে এস্থলে তাহা ত্যাগ করিয়া কেবল এই মাত্র লিখিতেছি,—পূর্ব্বে পোতদার কি সুবর্ণবণিক্ বলিয়া কোন জাতি নির্দ্দিষ্ট ছিল না। বৈশ্য-জাতি বলিয়াই গণ্য হইত। ঐ সকল উপাধি কেবল রাজপ্রদত্ত। এক্ষণে ঐ উপাধি জাতি-মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। অনুমানিক ৯৪৫ খৃষ্টাব্দ অর্থাৎ আদিশূরের সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত ঐ উপাধিই চলিতেছে। বস্তুতঃ এতদ্দ্বারা বৈশ্যত্বের কোন হানি হয় না।

এই জাতি লইয়া আদিশূরের পরে যে ঘটনা হয়, প্রসঙ্গোপলক্ষে তাহারও কথা কিছু বলিতে হইতেছে।

ঘটক-কারিকায় লিখিত আছে,—

"আদিশূরের বংশধ্বংস সেনবংশ তাজা।
বিশ্বকৃসেনের ক্ষেত্রজ পুত্র বল্লাল সেন রাজা॥"

অনেকের বিশ্বাস যে, বল্লাল সেন রাজা আদিশূরের দৌহিত্র; কিন্তু সে প্রবাদ সত্য নহে। আদিশূরের বংশ লোপ হইয়াছিল। রাজা অশোকের পর ১০৬৬ খৃষ্টাব্দে বল্লাল সেন বঙ্গসিংহাসনে আরূঢ় হইয়া ৩৫ বৎসর কাল রাজ্য ভোগ করিয়াছিলেন। সেই রাজার শাসন সময়ে বঙ্গদেশে সমাজ-সংক্রান্ত যে মহা-বিপ্লব ঘটিয়াছিল, তাহার বেগবান্ স্রোত এখন পর্য্যন্তও সতেজে একাদিক্রমে বঙ্গদেশকে প্রতিনিয়তই প্লাবিত করিতেছে। ১০৬৬ খৃষ্টাব্দ হইতে আজ পর্য্যন্ত বোধ হয়, বঙ্গের এমন একটীও দিন গত হয় নাই, যেদিন বঙ্গবাসী কেহ না কেহ সেই দোর্দ্দণ্ড মহা-রাজকে স্মরণ করিয়া নিদারুণ শোক-সন্তপ্ত-হৃদয়ে অন্ততঃ একবারও ললাটে করাঘাত না করে। বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ ললনা, কৌলীন্য-প্রথা সংস্থাপনের বিষময় ফলজনিত নিদারুণ যন্ত্রণায় নয়ন-বারি নিক্ষেপ করে না, এমন দিনই নাই।

বল্লালের গুপ্ত চরিত্র অতিশয় কদর্য্য ছিল। আনন্দ ভট্ট কর্ত্তৃক রচিত বল্লাল-চরিত নামক প্রাচীন গ্রন্থে লিখিত আছে,—

"তিনি পদ্মিনীর লক্ষণ-বিশিষ্টা এক ডোম-কন্যার সহিত প্রসক্তি করিয়া তাহার সহ একত্রে আহার বিহার করিতেন এই অকার্য্যে যখন চতুর্দ্দিকে মহা কোলাহল ও জনশ্রুতির সহস্র রসনায় ঐ অপবাদ তাঁহার পুত্র লক্ষ্মণ সেনের কর্ণগোচর হয়, তখন তিনি দুঃখিত হইয়া পিতাকে উপদেশ দেওয়া শাস্ত্র বিরুদ্ধ বিবেচনায় এই জঘন্য ব্যবহার সম্বন্ধে পিতাকে সঙ্কেত-পত্র লেখেন;—

'শৈত্যং নাম গুণস্তবৈব সহজঃ স্বাভাবিকী স্বচ্ছতা কিং ব্রূমঃ শুচিতাং ভবন্তি শুচয়ঃ স্পর্শেন যস্যাপরে। কিঞ্চান্যৎ কথয়ামি তে স্তুতিপদং যজ্জীবিনাং জীবনং ত্বঙ্কেন্নীচপথেন গচ্ছসি পয়ঃ কস্ত্বাং নিষেদ্ধুং ক্ষমঃ॥"

হে জল! তোমার শৈত্য আর স্বচ্ছতা গুণ সহজ ও স্বাভাবিক, তোমাকে স্পর্শ করিয়াই যখন লোকে পবিত্র হয়, তখন তোমার পাবনতার বিষয়ে কি স্তুতিবাদ করিব? তুমি লোকের জীবন, তুমি যদি স্বয়ং নীচগামী হও, তোমাকে কে নিবারণ করিতে পরে!

কামাহত বল্লাল সেই পত্রের এইরূপ উত্তর লেখেন;—

"তাপো নাপগতস্তৃষা নবিরশা ধৌতানধূলীতনোর্ন স্বচ্ছন্দমকারি কন্দকবলং কা নাম কেলীকথা। দূরন্মুক্তকরেণ হন্ত করিণা স্পৃষ্টা ন বা পদ্মিনী প্রারব্ধো মধুপৈরকারণমহো ঝঙ্কার কোলাহলঃ॥"

তাপও অপগত হয় নাই, তৃষ্ণা যায় নাই, শরীরের ধূলিও ধৌত হয় নাই এবং কন্দও স্বচ্ছন্দে কবলিত হয় নাই, ক্রীড়ার কথা দূরে থাকুক, হস্তী কর প্রসারিত করিয়া পদ্মিনীকে স্পর্শ করিতে না করিতে ভ্রমরেরা অকারণ ঝঙ্কার ও কোলাহল করিয়া উঠিল।

নির্লজ্জ পিতার এই পত্র পাইয়া লক্ষ্মণসেন পুনর্ব্বার লেখেন;—

"পরীবাদস্তথ্যো ভবতি বিতথো বাপি মহতাং তথাপ্যুচ্চৈর্ধাম্নাং হরতি মহিমানং জনরবঃ। তুলোত্তীর্ণস্যাপি প্রকটনিহতাশেষতমসো রবে-স্তাদৃক্ তেজো নহি ভবতি কন্যাং গতবতঃ॥"

অপবাদ সত্যই হউক আর মিথ্যাই হউক, উহার জনরবই মহৎ ব্যক্তির মহিমা বিনষ্ট করে। যেমন অশেষ অন্ধকারনাশক যে সূর্য্য, তিনিও আশ্বিন মাসে কন্যাগমন (কন্যা—রাশি ও দুহিতা) করায় প্রায়শ্চিত্তের স্বরূপ তুলা (তুলা—রাশি ও পরীক্ষাদণ্ড; কার্ত্তিক মাসে সূর্য্য তুলারাশিতে থাকেন) উত্তীর্ণ হইলেও (অগ্রহায়ণাদি মাসে) তাঁহার সে তেজ থাকে না।

নির্লজ্জ পিতা এই পত্র পাইয়া আবার লেখেন;—

"সুধাংশোর্জাতেরং কথমপি কলঙ্কস্য কণিকা বিধত্তে দোষোঽয়ং নচ গুণনিষেধস্তস্য কিমপি। স কিং নাত্রেঃ পুত্রো ন কিমু হরচূড়ার্চ্চনমণি র্নবা হন্তি ধ্বান্তং জগদুপরি কিংবা ন বসতি॥"

সুধাকরের কলঙ্কাপবাদ তাঁহার নিজদোষ-জনিত নহে। সে দোষ বিধাতারই। কিন্তু সে কলঙ্কে চন্দ্রের কোন ক্ষতি হয় নাই। তিনি কি সেই অত্রিমুনির সন্তান নন? মহাদেব কি তাঁহাকে মস্তকে ধারণ করেন না? এবং তিনি কি অন্ধকার নাশ করেন না বা জগতের উপরিভাগে বাস করেন না?

সৎপুত্র লক্ষ্মণসেন কদর্য্যচরিত পিতার এইরূপ উত্তর দ্বারা তাঁহার চরিত্র সংশোধনে অকৃতকার্য্য হইয়া নিরতিশয় মনস্তাপে ধর্ম্ম-লোপভয়ে পিতাকে পরিত্যাগ ও স্বদলভুক্ত বৈদ্যগণ সহিত অভিমানে যজ্ঞোপবীত ত্যাগ করিয়াছিলেন। সেই হইতে বৈদ্যদিগের দুইটী থাক হয়। সেকালে বণিক্‌গণ লক্ষ্মণের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

এইরূপে পিতা-পুত্রের মনোমালিন্যের কারণ হওয়াতে শেষে রাজা উক্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত-রূপ গোমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। কিন্তু কলিতে গোমেধযজ্ঞ নিষেধ, একারণ অধ্যাপক-গণ স্বর্ণগোদানের ব্যবস্থা করেন। রাজা তদনু-সারে সমাজভুক্ত ও সমাজ গঠন করিবার নিমিত্ত বর্ণচতুষ্টয়কে আহারাদির নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। পরন্তু, সুবর্ণগ্রামের সুবর্ণ-বণিক্‌গণ রাজার সে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন নাই। রাজা সেই কারণে এবং অন্যান্য কারণে ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া সভাস্থলে প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিয়াছিলেন;—

প্রতিজ্ঞানীতে—"যদি হিরণ্যবণিজো নীচ-জাতীয়ানাং মধ্যে ন গণয়িষ্যামি, বল্লভানন্দ-প্রভৃতীনাঞ্চ ন দাস্যামি, তদা গো-ব্রাহ্মণ-যোষিদ্‌ঘাতেন যানি পাপানি ভবন্তি, তানি মে ভবিষ্যন্তীতি। অন্যস্য রাজ্ঞঃ শতপুত্র বিনাশে ভীমসেনেন যাদৃশী প্রতিজ্ঞা কৃতা, স্বর্ণবণিজাং বিষয়ে প্রতিজ্ঞা মে তাদৃশী জ্ঞাতব্যা॥"

পরিশেষে কূটবুদ্ধি রাজা ঐ প্রতিজ্ঞা কার্য্যে পরিণত করিবার ইচ্ছায় ছলনা দ্বারা এবং রাজক্ষমতাবলে, দানোপযুক্ত ক্ষুদ্রাকৃতি সহস্র ধেনুর মধ্যে স্বর্ণকারের দ্বারা একটী ধেনুর উদর অলক্তজল-পূর্ণ করান।

"হড় গড় পল সাঁই।
ইহার নীচে বামুন নাই॥"

এই যে কথা ঘটক-কারিকায় লেখা আছে, রাজা সেই ব্রাহ্মণের মধ্যে পল-উপাধিধারী "বিজয় নাম" জনৈক লোভী ব্রাহ্মণকে বশে আনিয়া তদ্দ্বারা ঐ ধেনু পরীক্ষাজন্য "নৃপঞ্জয় পাইন" নামক জনৈক বণিকের দোকানে পাঠাইয়া দেন।

বণিক্‌রাজ কৌশল অনবগতে লৌহ-শলাকা অর্থাৎ ছেনী আঘাতে ঐ ধেনু পরীক্ষা করিবার কালে ছিদ্র হইতে অলঙ্গজল বাহির হয়; ব্রাহ্মণ তদ্দৃষ্টে চীৎকার করত রাজসভায় উপনীত হইয়া গোহত্যাকারী বলিয়া বণিকের নামে অভিযোগ উপস্থিত করেন। রাজা ঐ সূত্রে ভৌতিক বিচারে সুবর্ণগ্রামনিবাসী সুবর্ণবণিক্‌দিগের উপর মিছা কলঙ্কারোপণে প্রকাশ্য সভায় আজ্ঞা প্রচার করিয়া বলিয়াছিলেন;—

"অদ্যাবধি ক্রিয়াহীনানাং বণিজাং যজ্ঞোপবীতধারণং ব্যর্থম্। এতেষাং ক্রিয়াভাবাৎ শূদ্রত্বম্। অদ্যোহদ্যপর্য্যন্তম্ এতে বণিজঃ শূদ্রাঃ, এতেষাং শূদ্রাৎ ক্রিয়াদ্বিকং ভবিষ্যতি। বিশেষতস্তু স্বর্ণবণিজঃ সর্ব্বগোস্তেয়াগোহত্যাকারিণশ্চ, তদেতে অদ্য পর্য্যন্তং পতিতাঃ শিষ্টৈরগ্রাহ্যাঃ। এতৈঃ সহ যে ভোজন-বিহরণৈকাসনাক্রমণ-যজন-পংক্তিভোজনাদিকং করিষ্যন্তি, তেঽপি পতিতা ভবিষ্যন্তি। অতস্তদ্‌যাজকানাং ব্রাহ্মণানাঞ্চ অদ্য প্রভৃতি পাতিত্যম্॥"

বল্লাল কর্ত্তৃক এই আজ্ঞা প্রচারের পর রাজনিযুক্ত দুর্ব্বৃত্তগণ সজোরে সুবর্ণবণিক্‌দিগের উপবীত চ্যুতি এবং অন্যান্য অত্যাচার জহুকারে কৌলীন্য-মর্য্যাদা-প্রাপ্ত সম্প্রদায়িগণ বণিক্‌বর্গকে "অপাংক্তেয়" অর্থাৎ একঘরিয়া করিয়াছিলেন।

ইংরেজী ১১০০ খৃষ্টাব্দের কিছু পূর্ব্বে বণিক্‌দিগের প্রতি এই অত্যাচার-ঘটনা ঘটিয়াছিল। স্বয়ং রাজা প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া অত্যাচার করিলে কে রক্ষা করে?

বৈশ্য-কুলজিকায় আছে;—

"বল্লালের অত্যাচারে, বণিক্ সমস্ত।
নানা স্থানে সকলে, যাইতে হৈল ব্যস্ত॥
কেহ গেল দক্ষিণে, কেহ গেল রাঢ়দেশে।
কেহ বা কর্জ্জনায় বাস, করিলেন শেষে॥
কেহ বা মিথিলা গেলা, বিদ্যাধ্যয়নে।
কেহ বা গুজরাটে গেলা, বাণিজ্য কারণে॥
কেহ বা উত্তরে গেলা, কেহ রৈল বঙ্গে।
পরস্পর নাহি দেখা, স্বজনের সঙ্গে॥
সোণার সুবর্ণগ্রাম, শ্রীহীন হইল।
দুই চারি ঘরমাত্র, স্বস্থানে রহিল॥
* * * ইত্যাদি।

বল্লালের অত্যাচারে দত্ত উদ্ধারণ মহাশয়ের ঊর্দ্ধতন দশম পুরুষ ভবেশ দত্ত মহাশয় বঙ্গদেশ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক নাবালক-পুত্র শ্রীকৃষ্ণ দত্ত সমভিব্যাহারে বিহার প্রদেশে গিয়া তত্রস্থ জনক-রাজ-বংশীয়ের আশ্রিত হইয়াছিলেন।

জনক-আঢ্যবংশীয় বল্লভানন্দ, শ্রীপুরুষোত্তমে গিয়া তত্রস্থ কেশরী-বংশীয় রাজার শরণাপন্ন হন এবং শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে একটী মহামূল্য মাণিক্য দান করেন। অদ্যাপি সেই মাণিক্য শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব ললাটে ধারণ করিতেছেন। উহা আঢ্য-মাণিক নামে প্রসিদ্ধ।

ভবেশ দত্ত মহাশয়ের পুত্র শ্রীকৃষ্ণ দত্ত মিথিলা-দেশে ষট্‌শাস্ত্র দর্শনে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত হইয়াছিলেন। তিনি একদা কাশীধামে দণ্ডীসভায় বিচারে জয়লাভ করিয়া "পুরুষোত্তম শর্ম্মা" নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বল্লালের মৃত্যুর পর লক্ষ্মণসেন বঙ্গের সিংহাসনে আরূঢ় হইয়াছিলেন। বাহুবলে মিথিলাদেশ তাঁহার সাম্রাজ্যভুক্ত হয়।

ধর্ম্মচর্চ্চা সম্বন্ধে রাজা লক্ষ্মণের বিশেষ অনুরাগ ছিল, তিনি বাঙ্গালা ভাষায় শ্রীহরি বিষয়ক পদ্য-গীত রচনা করিতেন। তাঁহার কৃত কয়েকটী পদ শ্রীপদসমুদ্রে আছে। তিনি বিবিধ শাস্ত্রবেত্তা কবিকুলকেশরী পণ্ডিতবর্গকে অমাত্যস্বরূপ সভায় রাখিয়া রাজকার্য্য পরিচালনা এবং কাব্য অনুশীলন করিতেন।

কবি উমাপতি ধর এবং গোবর্দ্ধন আচার্য্য

ও তাঁহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী শ্রীগীতগোবিন্দ-কাব্য-রচয়িতা কেন্দবিল্বনিবাসী শ্রীজয়দেব গোস্বামী লক্ষ্মণ-রাজের সভাসদ্ ছিলেন। মহারাজ লক্ষ্মণ শ্রীজয়দেব-কৃত মহাকাব্যে বিমোহিত হইয়া তাঁহাকে অর্থাৎ শ্রীজয়দেব গোস্বামীকে কবিরাজ উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। গোবর্দ্ধন 'আর্য্যা সপ্তশতী' নামে কাব্য প্রকাশ করেন।

শ্রীজয়দেব-কৃত সংস্কৃত গীতগোবিন্দ কেবল বঙ্গদেশ বলিয়া নয়, সমস্ত ভারতে দেদীপ্যমান রহিয়াছে এবং সর্ব্বত্রই আদৃত এবং সংস্কৃত সাহিত্য-সংসারে এক অদ্ভুত পদার্থ। ভারতীয় কাব্যসমূহের মধ্যে ইহার তুলনা নাই। শ্রীজয়দেব গোস্বামী এই কাব্যের মঙ্গলাচরণের চতুর্থ শ্লোকে—

"বাচঃ পল্লবয়ত্যুমাপতিধরঃ সন্দর্ভশুদ্ধিং গিরাং
জানীতে জয়দেব এব শরণঃ শ্লাঘ্যো দুরূহদ্রুতে॥
ইত্যাদি

এই যে, উমাপতি ধর মহাত্মার নাম কীর্ত্তন করিয়াছেন, ইনিই সুবর্ণগ্রাম-বাসী বৈশ্য-কুলোদ্ভব পূর্ব্বোক্ত কাঞ্জিলাল ধর মহাশয়ের পুত্র এবং উদ্ধারণ দত্ত মহাশয়ের আদিপুরুষ শ্রীভবেশ দত্ত মহাশয়ের শ্যালকপুত্র। ইনি, মহারাজ লক্ষ্মণসেনের অমাত্যস্বরূপ রাজসভায় উপস্থিত থাকিয়া কবিতা রচনায় বাক্য পল্লবিত করিতেন। শরণ, কঠিন এবং দ্রুত রচনায় প্রশংসনীয় এবং তাম্রশাসন রচনায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন।

মহারাজ লক্ষ্মণসেনের সময়ে যে সকল তাম্রফলকাদি মুদ্রা আছে, তাহাতে উমাপতি ধর মহাশয়ের নাম দৃষ্ট হয়। লক্ষ্মণসেনের সময়ে এক অব্দ প্রচলিত ছিল, মিথিলার পণ্ডিতগণ ঐ অব্দ অনুসারে গণনা করিয়া থাকেন। উহা লক্ষ্মণাব্দ বলিয়া প্রসিদ্ধ।

ভবেশ দত্ত মহাশয়ের পুত্র শ্রীকৃষ্ণ দত্ত সামান্য লোক ছিলেন না। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, তিনি দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত ছিলেন। তিনি অসামান্য পাণ্ডিত্যবলে মহারাজ লক্ষ্মণের সভায় কথায় কথায় শ্রীগীতগোবিন্দের সমুদায় অংশ প্রথমতঃ শ্রীকৃষ্ণ পক্ষে দ্বিতীয়তঃ শ্রীশিব পক্ষে ব্যাখ্যা করিয়া "গঙ্গা" নামে এক অদ্ভুত টীকা করেন। কবি উমাপতি ধর এবং শ্রীকৃষ্ণ দত্তের জীবনী, সম্বন্ধে সে কালের ভাষা-কুলজিকায় এই মত লিখিত আছে;—

(১) কাঞ্জিলাল ধর নাম, বণিক্-প্রধান।
কবি উমাপতি ধর, তাঁহার সন্তান॥
নূতন নূতন শ্লোক, রচনা করিয়া।
বিচারার্থে রাজসভায়, দেন পাঠাইয়া॥
আশ্চর্য্য কবিত্ব-শক্তি, দেখিয়া রাজন।
অমাত্য-পদেতে তারে, করেন বরণ॥
* * * ইত্যাদি।

(২) কাঞ্জিলালের ভগ্নী, নাম ভগবতী।
ভবেশ দত্তের পত্নী, গুণবতী সতী॥
দেশত্যাগ করি করে, মিথিলায় বাস।
তত্ত্ব না পাইয়া ধর, বড়ই উদাস
উমাপতি পুত্র সহ, করিয়া মন্ত্রণা।
ভগ্নী স্থানে যাইবারে, হইল উন্মনাঃ॥

(৩) মিথিলা যাইতে ধর, সুলজ্জিত হৈল।
তা শুনি লক্ষ্মণরাজ, নিষেধ করিল॥
এখন যেওনা ধর, দুর্গমের পথে।
পশ্চাৎ যাইবে তুমি, আমাদের সাথে॥
এখন মিথিলা-দেশ, মোর অধিকার।
দূত পাঠাইয়া তত্ত্ব, করহ তাহার॥

(৪) রাজা পাঠাইল দূত, ভবেশ উদ্দেশে।
পত্র লয়ে দূত গেল, মিথিলার দেশে॥
ভবেশের বাসস্থান, করিয়া নির্ণয়।
দূত গিয়া উপনীত, তাহার আলয়॥
পাইয়া নৃপতি-আজ্ঞা, ভবেশ হর্ষিত।
নিজ পুত্র কৃষ্ণ দত্তে, পাঠান ত্বরিত।

(৫) মাতুল-গৃহেতে কৃষ্ণ, উপনীত হ'য়া।
রাজার সহিত ভেট, করিলেন গিয়া॥

বুধমণ্ডলীতে তিনি, আসন পাইলা।
শ্রীগীতগোবিন্দ অর্থ, করিবারে দিলা॥
অত্যাশ্চর্য্য কাব্য দেখি, হর্ষযুক্ত হ'য়া।
দুই পক্ষে ব্যাখ্যা করে, অর্থ লাগাইয়া॥
প্রথমতঃ কৃষ্ণপক্ষে, অর্থ সংস্থাপিলা।
শেষে শিবপক্ষে, অর্থ বুঝাইয়া দিলা।
তা দেখি পণ্ডিতগণ, হইলা মোহিত
গঙ্গা নামে টীকা বলি, হইল আখ্যাত॥

এই পণ্ডিতপ্রধান শ্রীকৃষ্ণ দত্ত মহাশয় শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের ঊর্দ্ধতন নবম পুরুষ। ইহাঁর কৃত শ্রীগীতগোবিন্দের গঙ্গা নামক টীকায় বিশেষ ব্যক্ত আছে এবং গীতগোবিন্দের বাঙ্গলানুবাদক পূজ্যপাদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিভূষণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় নিজ কৃত অনুবাদের মুখবন্ধে "গঙ্গা নামে টীকা" স্থলে সংক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণ দত্তের ব্যাখ্যায় মহারাজ লক্ষ্মণ সেন অত্যন্ত প্রীত হইয়া ইহাঁকে "সুবর্ণগ্রামে" বাসোপযুক্ত একখণ্ড ভূমি দান করিয়াছিলেন। ইনি, লক্ষ্মণ রাজের আগ্রহাতিশয়ে, মিথিলার বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক বৃদ্ধ মাতা, পিতা এবং ভাই-ভগিনী পরিবারাদির সহিত সুবর্ণ গ্রামে বাস করিয়াছিলেন। ইনি সর্ব্বতোভাবে বৈশ্য-ধর্ম্ম পালন এবং যজ্ঞোপবীত ধারণ করিতেন। পশ্চাৎ ইহাঁর বংশধরগণ বাণিজ্য আশায় শ্রীগঙ্গার উপকূল বাণিজ্যপ্রধান স্থান সপ্তগ্রামে বাস করেন।

ঈশ্বরানুগ্রহে কোন কালে এবংশের অবনতি নাই। শ্রীশ্রীলক্ষ্মী ও সরস্বতী দেবীর আনুকূল্যে বংশপরম্পরায় ধনবান্, পুত্রবান্ এবং বিদ্যাবান। মূল হইতে আজ ২১ একবিংশতি পুরুষ অধিগত হইল, ক্রমশঃ শাখা-প্রশাখায় বংশ বিস্তার হইয়া বংশীয়গণ কর্ম্মসূত্রে বঙ্গের স্থানে স্থানে বাস ও জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন। অভীষ্ট-দেব পতিতপাবন শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রভুর অভীষ্টদ শ্রীচরণ ধ্যান ও শরণ ব্যতীত এবংশের অন্য গতি নাই।

শ্রীচৈতন্যভাগবতে ব্যক্ত আছে;—
"যতেক বণিক্‌গণ, উদ্ধারণ হৈতে।
পবিত্র হইল দ্বিধা, নাহিক তাহাতে॥
বণিক তারিতে, নিত্যানন্দ অবতার।
বণিকে যে দিলা প্রেম, ভক্তি অধিকার॥
"উদ্ধারণ দত্ত মহা বণিক, উদ্ধার।
নিত্যানন্দ সেবায়, যাহার অধিকার॥"
* * * ইত্যাদি।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর।

"গৌরাঙ্গো ভগবদ্ভক্তো নচ পূর্ণো নচাংশকঃ॥"

অনেক বিটলে এই কৃত্রিম অর্দ্ধশ্লোক দ্বারা শ্রীগৌরাঙ্গের পূর্ণত্ব বা অংশত্ব স্বীকার করেন না। কিন্তু সেটী তাঁহাদিগের বুঝিবার ভ্রম। বস্তুতঃ শ্লোকটী অসঙ্গত ও অশাস্ত্রীয় হইলেও আমরা তাঁহাদের কথিত ঐ অর্দ্ধ শ্লোকটী স্বীকার করি। কিন্তু অর্থটী স্বীকার করি না। কারণ, উহার প্রকৃত অর্থ তাঁহাদের কথিত মত না হইয়া এই অর্থ হইবে, যথা;—

"গৌরাঙ্গো ভগবদ্ভক্তো ন, অংশকো ন,
অর্থাৎ স পূর্ণঃ॥

কারণ, বেদ, পুরাণাদিতে পূর্ণ বলিয়াই যথেষ্ট প্রমাণ আছে। যথা, পদ্মপুরাণে শ্রীমথুরানাথ-বচনম্—

(১) কলেঃ প্রথমসন্ধ্যায়াং গৌরাঙ্গোঽহং মহীতলে
ভাগীরথীতটে রাম, ভবিষ্যামি শচীসুতঃ॥

শ্রীনারদীয়ে শ্রীদ্বারকানাথবচনম্—

(২) অহমেব কলৌ বিপ্র নিত্যং প্রচ্ছন্নবিগ্রহঃ।
ভগবদ্ভক্তরূপেণ, লোকানুপদেক্ষ্যামি সর্ব্বথা॥

শ্রীগারুড়ে শ্রীগোলোকনাথবচনম্—

(৩) কলিনা দহ্যমানানাং পরিত্রায় তনূভৃতাম্
জন্ম প্রথমসন্ধ্যায়াং করিষ্যামি দ্বিজাতিষু॥"

বামনে শ্রীগোকুলনাথবচনম্—
(৪) অহং পূর্ণো ভবিষ্যামি যুগসন্ধৌ বিশেষতঃ।
মায়াপারে নবদ্বীপে বারমেকং শচীসুতঃ॥

বায়বে—
(৫) দিবিজা ভুবি জায়ধ্বং জায়ধ্বং ভক্তরূপিণঃ।
কলৌ সংকীর্ত্তনারম্ভে, ভবিষ্যামি শচীসুতঃ॥

নৃসিংহে—
(৬) সত্যে দৈত্যকুলাদিনাশসময়েস্ফূর্জ্জন্নখঃকেশরী
ত্রেতায়াংদশকন্ধরং পরিভবন্ রামাভিনামাকৃতিঃ।
গোপালং পরিপালয়ন্ব্রজপুরেভারং হরন্ দ্বাপরে
গৌরাঙ্গঃপ্রিয়কীর্ত্তনঃকলিযুগে চৈতন্যনামাহরি;॥

পুনঃ গরুড়ে—
(৭) যদ্‌গোপীভুজকুম্ভসম্ভ্রমভরারম্ভেণ সংবর্দ্ধিতং
যদ্বা গোপকুমারদারকলয়া, রঙ্গেণভঙ্গীকৃতঃ।
যদ্‌বৃন্দাবনকাননে প্রবিলসৎ শ্রীদামদামাদিভি,
স্তৎপ্রেম প্রকটং চকারভগবাংশ্চৈতন্যরূপঃপ্রভূঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে—
(৮) কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষা কৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র পার্ষদম্
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥

শ্রীমহাভারতে শান্তিপর্ব্বে সহস্র নামে—
(৯) সন্ন্যাসকৃৎসমঃশান্তো নিষ্ঠংশান্তিপরায়ণঃ ৭৫
সুবর্ণবর্ণোহেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী॥ ৯২

* * * * *

এই পদদ্বয়ে শ্রীমৎ বেদান্তাচার্য্য বলদেব বিদ্যাভূষণ লিখিয়াছেন;—
"সুবর্ণস্যেব বর্ণো রূপমস্যেতি সুবর্ণবর্ণঃ।"
অন্যত্র—
"হেমবৎ স্পৃহণীয়ানি বর্ণা বর্ণাধিষ্ঠানাঙ্গানি যস্য স হেমাঙ্গঃ। বরাণি সৌন্দর্য্যবন্ত্যঙ্গানি অস্যেতি বরাঙ্গঃ। চন্দনে ভক্তচিত্তাহ্লাদকে অঙ্গদে অস্যেতি চন্দনাঙ্গদী।
সুবর্ণবর্ণাদিচতুষ্টয়ং কেচিৎ কৃষ্ণচৈতন্যতায়াং যোজয়ন্তি॥ ৯২

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যতাং দ্যোতয় ন্নাহষড়ভিঃ।
"সন্ন্যাসং পরিব্রজ্যাং করোতীতিসন্ন্যাসকৃৎ।"
"শাম্যত্যুপরমতি কৃষ্ণস্য বিষয়াদিতি (শান্ত)"
"নিতিনিষ্ঠাস্যাংহরিকীর্ত্তনপ্রধানা ভক্তিযজ্ঞা ইতি শাম্যন্ত্যনয়া ভক্তিবিরোধিনঃ কেবলাদ্বৈত-প্রমুখা ইতি শান্তিঃ। মহাভাবন্তানাং ভাব-ভেদানাং পরমমযনমিতি পরায়ণম্। ৭৫

সামবেদে—
ওঁ যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুকন্‌বর্ণঃ কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্। তদা বিদ্বান্ পুণ্য পাপে বিধুয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্য মুপৈতি॥
অথর্ব্ব তৃতীয়কাণ্ডে।

ব্রহ্ম ভাগানন্তর—
ইহো "অহংকৃত" সন্ন্যাস ইব ভবিষ্যামি।
স্বগুণো নির্ব্বেদো নিষ্কাম ভু গির্ব্বাণ স্তীরঙ্গোই লোক নন্দয়াঃ। কলৌ চতুঃসহস্রাব্দোপরিপঞ্চ-সহস্রাভ্যন্তরে গৌরবর্ণো দীর্ঘাঙ্গঃ সর্ব্বলক্ষণ-যুক্ত ঈশ্বর প্রার্থিতো নিজ রসাস্বাদো ভক্ত-রূপোহ মিশ্রাখ্যে বিদিতয়ো গোহস্যাং। পুরুষ বোধস্যাং সপ্তমে গৌরবর্ণ, বিষ্ণুরিত্যনেন শশক্ত্যা। চৈকমেত্য প্রাপ্তে প্রাতপ্ত প্রাত্তের-বর্ত্তীর্য্য সহ স্বৈঃ স্বমনুশিক্ষয়তি॥*

তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের বিলাসমূর্ত্তি, শ্রীবলরাম নিত্যানন্দ। যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে;—
(১) "দুই ভাই একতনু, সমান প্রকাশ।"
(২) "সৈছে বলদেব, পরব্যোম নারায়ণ॥"
অর্থাৎ পরব্যোমি স্থিতো মহাসঙ্কর্ষণঃ।
(৩) "অভিন্ন চৈতন্য সে, ঠাকুর অবধৌত॥"
শ্রীবৈং সং।

ইত্যাদি প্রমাণে একই আত্মা।

স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ শ্রীচৈতন্যরূপে প্রকট, শ্রীবলরামও তদ্রূপ শ্রীনিত্যানন্দরূপে "১৩৯৫ শকে রাঢ়দেশে একচকানগরে দ্বিজকুলশ্রেষ্ঠ শ্রীহারাই পণ্ডিতের গৃহে প্রকট হইয়াছিলেন।"

* অত্র "যথা আদর্শ, তথা মুদ্রিত। অন্যত্র কর্ত্তিত। ব্যাখ্যাকর্ত্তা।

ইনি, ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে অবধূত-বেশে শ্রীবৃন্দাবন, শ্রীমথুরা, শ্রীদ্বারাবতী, কাশী, কাঞ্চি, অবন্তিকা প্রভৃতি মহা মহা তীর্থ পর্য্যটনের পর শ্রীধাম নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইয়াছিলেন।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া শ্রীলীলাচলে গমন করেন, ইনিও সেই সঙ্গে লীলাচলে গমন করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রভুর সাংসারিক হইবার কারণ;—

ঈশ্বরের লীলা স্বতন্ত্র, তাহার লীলা কে বুঝিতে পারে? একদিন, শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রভুকে বলেন,—ভাই! তোমার মুনিধর্ম্ম অবলম্বন করা কর্ত্তব্য নহে। আপন উদ্যম পরিহার কর। সত্বরে গৌড়ে গমন করিয়া সংসারধর্ম্মে প্রবৃত্ত হও এবং সর্ব্বত্রে হরিনাম প্রচার কর, কেহ যেন, পাষণ্ডী না থাকে। তাহা হইলেই লীলা পূর্ণ হয়।

দুই প্রভুতে যখন এই কথা হয়, তখন সেই ক্ষেত্রে শ্রীগদাধরদাস ঠাকুর উপস্থিত ছিলেন; তিনি সেই কথা নিজকৃত পদে লিখিয়াছেন;—

বিরলে নিতাই পেয়ে, হাতে ধরি বসাইয়া,
মধুর ভাবে কহে ধীরে ধীরে।
জীবেরে সদয় হ'য়ে, হরিনাম লওয়াও গিয়া,
যাও নিতাই সুরধুনী-তীরে॥
প্রভু কহে নিত্যানন্দ, সব জীব হৈল অন্ধ,
কেহ ত না পাইল হরিনাম।
কৃত পাপী দুরাচার, নিন্দুক পাষণ্ডী আর,
কৃপা ক'রে লওয়াইবে নাম॥
এক নিবেদন তোরে, নয়নে দেখিবে যারে,
নামে কেহ যেন বঞ্চিত না হয়।
শমন বলিয়া ভয়, জীবে যেন নাহি হয়,
মুখে যেন হরিনাম লয়॥
কুমতি তার্কিক গণ, অধম পড়ুয়াগণ,
জন্মে জন্মে ভকতি বিমুখ।
কৃষ্ণ-প্রেম দান করি, বালক পুরুষ নারী,
খণ্ডাইয় সকলের দুঃখ॥
জীবে দয়া প্রকাশিয়া, সংসারধর্ম্ম আচরিয়া,
পূর্ণ কর সকলের আশ।
চৈতন্য আদেশ পেয়ে, চলে নিতাই বিদায় হয়ে,
সঙ্গে চলু গঙ্গাধর দাস॥

পদসমুদ্র ২০৬১।

এই প্রসঙ্গ * শ্রীচৈতন্য ভাগবতে বিস্তার করিয়া লিখিয়াছেন;—

(১) এক দিন শ্রীগৌর সুন্দর নরহরি।
নিভৃতে বসিলা, নিত্যানন্দ সঙ্গে করি॥
প্রভু বলে শুন, নিত্যানন্দ মহামতি
সত্বরে চলহ তুমি, নবদ্বীপ প্রতি॥
প্রতিজ্ঞা করিনু মুঞি, আপনার মুখে।
মূর্খ নীচ দরিদ্র, ভালাব প্রেম সুখে॥

(২) তুমিহ থাকিলে যদি, মুনি ধর্ম্ম করি।
আপন উদ্যম ভাব, সব পরিহরি॥
তবে মূর্খ নীচ যত, পতিত সংসার।
বল দেখি আর কেবা, করিবে উদ্ধার॥
এতেক তোমার বাক্য, সত্য যদি চাও।
তবে গৌড় দেশে তুমি, অবিলম্বে যাও॥

* * * *

(৩) আজ্ঞা পাই নিত্যানন্দ চন্দ্র সেইক্ষণ।
চলিলেন গৌড় দেশে, লয়ে নিজগণ॥

ইত্যাদি।

(৪) উদ্ধারণ দত্ত, ভাগ্যবন্তের মন্দিরে।
রহিলেন তাহা প্রভু, ত্রিবেণীর তীরে॥
কায়মনবাক্যে, নিত্যানন্দের চরণ।
ভজিলেন অকৈতবে, দত্ত উদ্ধারণ॥
নত্যানন্দ স্বরূপের, সেবা অধিকার।
পাইলেন উদ্ধারণ, কিবা ভাগ্য তার॥

* * * *

* শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর।

ইতিবৃত্তে কথিত আছে;—

সপ্তম গ্রাম বাসী বালকগণ, বৈশ্য ধর্ম্মাচরণের দ্বারা বৈদিক বিধি অনুসারে উপবীত ধারণ করিতেন। একদিন, শ্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রভু পরিহাস সহকারে উদ্ধারণকে বলেন, উদ্ধারণ স্কন্দ পুরাণাদি দেখিয়াছ? উদ্ধারণ বলিলেন, না প্রভু! তখন প্রভু বলিলেন, তুমিও মূর্খ, তোমার স্বজাতীয়ও মূর্খ এবং অধম। কারণ স্কন্দ পুরাণে আছে;—

হরি নামাক্ষরং ভুক্তং ভালে গোপী মৃদাঙ্কিতম্।
তুলসীমালিকোরস্কং নস্পৃশেয়ুর্যমোদ্ ভটাঃ॥

* * * *

ইহা নিশ্চয় যে, শুদ্ধ উপবীত ধারণে কিছুই ফল হয় না। কণ্ঠে তুলসী কাষ্ঠের মালা না থাকিলে এবং তিলক ধারণ না করিলে দেহ অপবিত্র অর্থাৎ শ্মশানতুল্য। দেখ দেখি, আমি অবধূত উপবীত ত্যাগী, তথাপি আমাকে সকলে চিনে। তাই বলি, চেনা বামুনের পৈতায় কি কাজ! উদ্ধারণ! প্রভুর এই ইঙ্গিতে স্বজাতি বর্গের সহিত সেই দিন হইতে মালা তিলক ধারণ করেন। ফলতঃ তিনি কুল ধর্ম্ম উপবীত ত্যাগ করেন নাই। প্রভু সুবর্ণবণিকদিগের এই ব্যবহার ও হরিনামে গাঢ় অনুরাগ দেখিয়া—

"সপ্তগ্রামে সব, বণিকের ঘরে ঘরে।
আপনি নিতাই চাঁদ, কীর্ত্তন বিহারে॥
বণিক সকল, নিত্যানন্দের চরণ।
সর্ব্ব ভাবে সেবিলেন, লইয়া শরণ॥
বণিক সবার কৃষ্ণ, ভজন দেখিতে।
মনে চমৎকার পায়, সকল জগতে॥"

শ্রীচৈতন্য ভাগ।

প্রভুর পূর্ব্ব কথার পোষকার্থে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন;—

"নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর, মহিমা অপার।
বণিক অধম মূর্খ, যে করিলেন পার॥"

প্রকৃত পক্ষে গ্রন্থকারের ঐ উক্তি তুচ্ছার্থ নহে। মহাজনে ঐরূপ দীনতাই স্বীকার করিয়া থাকেন। যথা;—

"পুরীষের কীট হইতে মুঞি লঘিষ্ঠ।
নীচ জাতি নীচ সঙ্গী, করি নীচ কাজ॥"

এইরূপ দৈন্য প্রকাশে কবিরাজ গোস্বামী কি শ্রীমৎ সনাতন ও রূপ গোস্বামী কখনই নীচ হন নাই, সকলেই শীর্ষস্থানীয় হইয়াছিলেন। প্রভুর ঐরূপ ইঙ্গিত বাক্য কেবল জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর পক্ষে শিক্ষা উপদেশ। যথা,

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।"

ইত্যাদি।

শ্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রভু বণিকবর্গকে এইরূপ উপদেশ প্রদান দ্বারা ভ্রম ঘুচাইয়া বণিকদিগকে কৃতকৃতার্থ করিয়া সপ্তগ্রামে কিছু দিন অবস্থিতি করণানন্তর পশ্চাৎ সুবিদিত হইলেন;— পূর্ব্ব পত্নী লক্ষ্মীরূপা রেবতী দেবীর অংশ অম্বিকা নগরের সন্নিকট শালিগ্রামে শ্রীসূর্য্য দাস পণ্ডিতের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া বসুধা নাম প্রকাশ করিয়াছেন। তন্নিবন্ধন, দার পরিগ্রহ ইচ্ছায়, যথা শ্রীচৈতন্য ভাগবতের পরিশিষ্টে,—

(১) একদিন নিত্যানন্দ, প্রভাতে উঠিয়া।
অম্বিকা নগরে যান, এক ভৃত্য লইয়া॥
জাতিতে বণিক নাম, উদ্ধারণ দত্ত।
প্রভু পারিষদ্ হন, পরম মহত্ত্ব॥
সূর্য্য দাস পণ্ডিতের, দ্বারেতে রহিয়া।
অন্তঃপুরে দত্তেরে, দিলেন পাঠাইয়া॥

(২) তিহোঁ গিয়া কহিল, প্রভুর সমাচার।
শুনিয়া পণ্ডিত আসি, কৈল নমস্কার॥
প্রভু কহে তোমার কাছে, আইলাম আমি।
বিবাহ করিব মোরে, কন্যা দেহ তুমি॥
পণ্ডিত কহেন প্রভু, ইহা কৈছে হয়।
বর্ণ যুক্ত গৃহাচারী, আছে জাতি ভয়॥
যদ্যপি সন্ন্যাসী রূপে, তুমি নারায়ণ।
তথাপিও বর্ণ ত্যাগী, আমি যে ব্রাহ্মণ॥

এত শুনি নিত্যানন্দ চলিলা ফিরিয়া।
লোক সব নিরীক্ষয়ে, চমৎকার হ'য়ে॥
(৩) হেন কালে গৃহ মধ্যে, ক্রন্দন উঠিল।
আচম্বিতে বসুধার, কি হল কি হল॥
ধেয়ে সবে প্রবেশিল, গৃহের ভিতরে।
ধরি শুয়াইল আনি, মণ্ডব দুয়ারে॥
সর্ব্বাঙ্গ শীতল মুখে, অবারণ ঘাম।
আচম্বিতে অঙ্গ কম্প, নয়ন উত্তান॥
চিকিৎসকগণ দেখি, মরণ নির্দ্ধার।
কদাচিৎ প্রাণ রহে, ব্যাধি অপস্মার॥

* * * *

(৪) এত শুনি সূর্য্যদাস কাঁদিতে লাগিল।
তারে সম্বোধিয়া, গৌরীদাস কিছু কৈল॥
বুঝি সবে ঠেকিলাম, অবধূত স্থানে।
ফিরায়ে আনহ তারে, করিয়া যতনে॥
বাঁচাইতে পারে যদি, কন্যা দিব তারে।
এই প্রতিশ্রুত বাক্য, কহিনু তোমারে॥

* * * *

(৫) "প্রভু বসি গঙ্গাতীরে, বট বৃক্ষ মূলে।"
স্বগণ সহিত গৌরীদাস, পায়ে পড়ে॥
ভক্তাধীন ভগবান, ভক্ত বাধ্য হ'য়ে।
সূর্য্যদাস ঘরে পুনঃ আইল ফিরিয়া॥
(৬) প্রভুরে দেখিয়া সবে, গাত্রোত্থান কৈল।
যেখানে ছিলেন বসু, তথা ল'য়ে গেল॥
নবম দশার শেষ, তনুতে প্রকাশ।
ঐ সময়ে শ্রীঅঙ্গের লাগিল বাতাস॥
অঙ্গ গন্ধ গিয়া, নাসারন্ধ্রে প্রবেশিল।
মৃত সঞ্জীবনী স্পর্শে, চেতন হইল॥
তনুর বসন সে, বদনে ঢাকি দিল।
একি? একি? বলি, নিজ গৃহে প্রবেশিল॥

* * * *

(৭) লীলা শক্তি নিত্যানন্দ, আবেশ করিলা।
প্রাঙ্গণে প্রাচীন মূর্ত্তি, ষড়ভুজ হৈলা॥
ঊর্দ্ধে ধনুবান মধ্যে শ্রীহল মুষল।
নম্র দুই হস্তে ধরে, দণ্ড কমুণ্ডল॥
মস্তকে কিরীটি শোভে, শ্রবণে কুণ্ডল।
সর্ব্ব-অঙ্গে মণিভূষা, করে ঝল মল॥
দেখিয়া সকল লোক, পড়িল লুটিয়া।
পণ্ডিত করেন স্তুতি, কর যোড় হ'য়ে॥
ব্রাহ্মণ সকল দেখি, হইল চমৎকার।
দেখিতে দেখিতে, অবধূতের আকার॥

* * * *

(৮) পণ্ডিত কুলীন আর, কুলাচার্য্য যত।
সবার হইল পরামর্শ, একমত॥
বেদ সংস্কারে পুনঃ দিব উপবীত।
পূর্ব্বাশ্রমের গোত্রগাঁই যেবা আছে নীত॥
প্রভু পাশে এইকথা, করিল প্রচার।
অট্ট অট্ট হাসি প্রভু করিলা স্বীকার॥

অনন্তর, সকলের মতে বিশেষতঃ সূর্য্যদাসের ভ্রাতা গৌরীদাসের প্রতিজ্ঞানুসারে শুভদিনে শুভক্ষণে প্রভুর যজ্ঞোপবীত এবং বসুধার সহিত বিবিধ ঘটায় বিধিপূর্ব্বক বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হয়। সূর্য্যদাস যৌতুকস্বরূপ কনিষ্ঠ কন্যা শ্রীজাহ্নবী দেবীকে দান করেন। প্রভুর উপবীত এবং বিবাহ দিবার প্রধান নেতা শ্রীদত্ত-উদ্ধারণ।

বিবাহের পরদিন অম্বিকা নগর ও তৎ-চতুষ্পার্শ পল্লীর যাবতীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, এবং কুলাচার্য্য প্রভৃতি সমবেত হইয়া হাস্য পরিহাস পূর্ব্বক প্রভুকে জিজ্ঞাসা করেন;—

(৯) শ্রীপাদের নিতি নিতি ভিক্ষা আয়োজন।
স্বপাক করহ কিম্বা, আছয়ে ব্রাহ্মণ॥
প্রভু কহে কখন বা, আমি পাক করি।
না পারিলে উদ্ধারণ, রাখয়ে উতারি॥
(১০) তাঁরা কহে এ বৈষ্ণব হয়, কোন জাতি।
পূর্ব্বাশ্রমে কিবা নাম, কোথায় বসতি॥
(১১) প্রভু কহে ত্রিবেণীতে, বসতি ইহাঁর।
সুবর্ণ বণিক দেখি করিনু স্বীকার॥
বৈশ্যকুলেতে জন্ম, হয় সদাচারী।
এজন্য উহার অন্ন, ঘৃণা নাহি করি॥

ইত্যাদি শ্রীচৈতন্য ভাগবতের পরিশিষ্ট।

পঞ্চম প্রশ্নের উত্তর।

যদিও ঈশ্বরের রুচি স্বতন্ত্র, তথাপি প্রকাশ্যে সে কথা বলা অসঙ্গত। তবে, পুরাণ এবং গ্রন্থে আছে বলিয়াই কিছু বলিতে হইতেছে;—

স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন, যথা,—

শ্রীচৈতন্য ভাগবতে;—

"গৃহ্নীয়াৎ যবনী পাণিং বিশেদ্বাশৌণ্ডিকালয়ং।
তথাপি ব্রাহ্মণো বন্দ্যঃ নিত্যানন্দ পদাম্বুজা॥"

হরিভক্তি বিলোসে, পদ্ম পুরাণোক্ত বচনম্—

"হরিনাম পরোযস্তু, বিষ্ণুপূজা পরায়ণঃ।
কৃষ্ণ মন্ত্রং যো গৃহ্লাতি বিষ্ণুং জানাতি বৈষ্ণব॥

যোগবাশিষ্ঠে;—

"আচার পরম ধর্ম্ম সর্ব্বধা মিতি নিশ্চয়॥"
"আচারাৎ কালেতে ধর্ম্ম, মাচারং ফলতে ধনং"
ইত্যাদি।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে;—

"ঈশ্বরের কৃপায় জাতিকুল নাহি মানে।
বিদুরের ঘরে কৃষ্ণ, করয়ে ভোজনে॥"
"যথা নমেহভক্তশ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃপ্রিয়ঃ"

শ্রীচৈতন্য ভাগবতে—

"যে সে দ্রব্য সেবকের, সর্ব্বভাবে খায়।
নৈবেদ্যাদি বিবিধ, অপেক্ষা নাহি চায়॥"

ভক্তমালে—

"কিবা বিপ্র কিবা ক্ষত্র, কিবা বৈশ্য শূদ্র।
ভক্তি করি যেবা দেয়, তাহা প্রভুর খাদ্য॥"

সারাবলী—

"আপনে আচরো ধর্ম্ম, অন্যের শিখান।
ভক্তি করি যেবা দেন, তাহা প্রভু খান॥"

প্রভু ভক্তির ভগবান, বিষ্ণুপরায়ণ যে কেহ ভক্ত, ভক্তি এবং শ্রদ্ধাপূর্ব্বক বিশিষ্ট আচারের সহিত যে কিছু দ্রব্য ভগবানে অর্পণ করেন, ভগবান প্রীতি সহকারে তাহা ভোজন করিয়া থাকেন।

করুণাবতার শ্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রভু সুবর্ণ-বণিক জাতিকে ভক্তিমান এবং ধর্ম্মনিষ্ঠ ও সদাচারী দেখিয়াই উদ্ধারণের পক্ক অন্ন গ্রহণ করিতেন। যেহেতু উদ্ধারণ শূদ্র নহে, তৃতীয় বর্ণের অন্তর্গত॥

"সন্ন্যাসীদিগের ভোজনের নাম ভিক্ষা।"

ষষ্ঠ প্রশ্নের উত্তর।

বৈষ্ণবাভিধানে—

সর্ব্বভাবে সেবা। (১) আরাধনা (২) পরিচর্য্যা (৩) শুশ্রূষা (৪) আশ্রয় (৫) উপদেশ (৬) পূজা (৭) সুপকার (৮) ভিক্ষা অর্থাৎ আহার ভোজন (৯) সঙ্কীর্ত্তন (১০) প্রত্যাশা (১১) অনুবৃত্তি (১২) পাক, এই দ্বাদশ প্রকার। দত্ত উদ্ধারণ শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রভুর তুষ্টির নিমিত্ত এই সকল সেবার অধিকার পাইয়াছিলেন। যথা;

"ভক্তি যোগ পরিপন্থামিত্যাদি॥

সপ্তম প্রশ্নের উত্তর।

সপ্তগ্রাম অম্বুয়া মূলকের অন্তর্গত। যথা শ্রীচৈতন্য ভাগবতে;—

"এইমত সপ্তগ্রাম, আমরা মুল্লুকে।
বিহারেন নিত্যানন্দ, পরম কৌতুকে॥"
"সেই সপ্তগ্রামে আছে, সপ্তঋষি স্থান।
জগতে বিদিত সে, ত্রিবেণী ঘাট গ্রাম॥"

ইতিবৃত্তে কথিত আছে;—

কান্যকুব্জের প্রিয়বন্ত নামক রাজার সপ্ত মহর্ষি সন্তান (১) অগ্নিত্র, (২) রমণক, (৩) ভপিস্তত (৪) স্বরবান (৫) বরাট, (৬) সবন, (৭) দ্যুতি মন্ত্র, সপ্তগ্রামে তপস্যা করিয়া শ্রীগোবিন্দ চরণারবিন্দ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মহাভারতে আছে;—

"প্রত্যুমন নগরাৎ যাম্যা ইত্যাদি শ্লোকে
স্মার্ত্তধৃত মলমাদ তত্ত্ব বচনে।"

মহাভারতোক্তম দক্ষিণ প্রয়াগ সপ্তগ্রাম্যখ্য নগরাৎ যাম্যা ত্রিবেণী নামে প্রসিদ্ধা।

প্রবাদ আছে, পূর্ব্বোক্ত ঋষিগণের অভিসম্পাতে সপ্তগ্রামে আদৌ তৃণকুশ জন্মে না। পূর্ব্বে "এসিয়া, ইউরোপের মধ্যবর্ত্তী কস্পিয়ান" নামক অতিবৃহৎ হ্রদের তটস্থিত "আমুল নামক নগরী হইতে "সাইদ কাকরুদ্দিন নামে" জনৈক পাঠান সপ্তগ্রামে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। বোধ হয় আমুল শব্দের অপভ্রংশে অম্বুরা মুলক মুল্লুক বলিয়া নাম করণ হইয়া ছিল। এক্ষণে উহা হুগলী জেলার অন্তর্গত।

ফকিরুদ্দিনের পুত্র জামালদ্দিন ঐ স্থানে মসজীদ্ প্রভৃতি যাহা প্রস্তুত করেন, তাহার ভগ্নাবশেষ এপর্য্যন্ত বর্ত্তমান আছে। ফকিরুদ্দিন, যামালদ্দিন ও তদীয় মাতৃস্বসা এই তিনের কবর স্থানে খোদিত তিনখানি প্রস্তরলিপি এখনও ঐ স্থানে দৃষ্ট হয়।

পরিশেষে দিল্লীর বাদসাহের প্রতিনিধি গৌড়ের নবাব হুসেণ সাহা সপ্তগ্রামে "গড়" এবং অট্টালিকাদি যাহা প্রস্তুত করিয়াছিলেন, এ পর্য্যন্ত তাহার ভিত্তিচিহ্ন আছে। পূর্ব্বে শ্রীমৎ রূপ সনাতন, কিছুদিন, ঐ স্থানে পারস্য বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। দাস শ্রীরঘুনাথ গোস্বামীর পিতা কায়স্থ কুলোদ্ভব বদান্যবর শ্রীগোবর্দ্ধন দাস ও জ্যেষ্ঠতাত শ্রীহিরণ্য দাস, সপ্তগ্রামে নবাবের নিকট পত্তনি লইয়া ছিলেন।

উদ্ধারণ দত্ত মহাশয়ের যে স্থানে বাস ছিল, সেই স্থানে একটী বিস্তৃত বহুকালের মাধবীলতা বৃক্ষ আছে। ঐ লতাবিশিষ্ট বৃক্ষ কোন বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া নাই। ঐ লতা বৃক্ষ শাখা প্রশাখা বিস্তার পূর্ব্বক বটবৃক্ষের ন্যায় দণ্ডায়মান আছে। তাহার গুঁড়ি প্রায় চতুর্হস্ত।

প্রবাদ আছে, শ্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রভু দত্তঠাকুরের বাটীতে অন্ন ভোজন করিয়া "ভাতের কাটি" ঐ স্থানে প্রোথিত করিয়া ছিলেন, তাহাই ঐ বৃক্ষরূপে পরিণত হইয়াছে। ঐ মাধবী লতার স্থূল বৈষ্ণবদিগের দ্বাদশ পাঠের মধ্যে একটী পাঠ। ঐ পাঠে সাধু বৈষ্ণবের সমাগম ও প্রতিদিন হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন হয়। এখন সপ্তগ্রামে কিছুই নাই। হুগলী বালীগ্রামে স্বর্গীয় জগমোহন দত্ত মহাশয়ের শ্রীবিষ্ণু মন্দিরে পূর্ব্বকালের ভাস্করনির্ম্মিত মহাত্মা দত্ত ঠাকুরের দারুময় স্বরূপ প্রতিমূর্ত্তি এ পর্য্যন্ত বিরাজমান আছেন। প্রতিদিন তাঁহার পূজা হয়। মূর্ত্তিটী অতি চমৎকার। স্থূলাকার, দেখিতে অতি মনোহর। ঠিক ব্রজের রাখাল ভাব। বিভিন্নতার মধ্যে সম্মুখ, অঙ্গে হরিনামাঙ্কিত ছাপ এবং কণ্ঠে ও হস্তে হরিনামের মালা আছে।

আর একটা কথা;—"বিষস্য বিষমৌষধং" যেমন বিষে বিষ নষ্ট হয়, সেইরূপ এক রাজার আদেশ অন্য রাজাকর্ত্তৃক খণ্ডিত হইয়া থাকে। শুনিতে পাই, বর্ত্তমান ইংরাজাধিকারে গত সেন্সেসে অর্থাৎ লোক গণনার কালে সুবর্ণবণিকগণ বৈশ্য জাতি বলিয়াই আপনাদিগের পরিচয় দিয়াছেন। যাহাই হউক, সুবর্ণবণিক মহোদয়গণ বৈষ্ণব ধর্ম্মটী বজায় রাখিয়া অন্নপ্রাশনাদি দশবিধ সংস্কার পথটী যদি সর্ব্বতোভাবে পালন করেন, বড়ই সুখের হয়। *

শ্রীহারাধন দত্ত।

* লোক ব্যবহার দেখিয়া জাতি প্রভৃতি নিরূপণ করিতে হয়,—বিচারে জাতি নির্ণয় হয় না। তাই মৈয়ারিকে বিচার করিয়া মহাপাপীরও স্বর্গবাস ক্ষণ প্রতিপন্ন করিতে পারেন। আর সুবর্ণবণিক জাতির বৈশ্যত্ব সম্বন্ধে যে বিচার করা হইয়াছে, তাহা আপত্তি সহও নহে। যাহা হউক, প্রবন্ধ প্রকাশে প্রবন্ধ-লেখক আত্মলাভ করুন, তাঁহার আনন্দে অপরে আনন্দিত হউন, রাজস বৃত্তিকে সত্ত্ববৃত্তির নিকট নত করিতে শিক্ষা করিলে সকল সুখই পাওয়া যায়। জ, গ।

কিং লিয়র।

লিয়র, ব্রিটন দেশের অধিপতি ছিলেন। তাঁহার তিন কন্যা ছিল। প্রথমা গনারিল, মধ্যমা রিগান্ এবং কনিষ্ঠা কর্ডিলিয়া। আলবানির ডিউকের সহিত তাঁহার প্রথমা কন্যা, এবং কর্ণওয়ালের ডিউকের সহিত তাঁহার মধ্যমা কন্যার পরিণয় হয়; কর্ডিলিয়ার এ পর্য্যন্ত বিবাহ হয় নাই, কিন্তু তাঁহাকে বিবাহ করিবার জন্য ফ্রান্সের অধিপতি ও বারগাণ্ডির ডিউক উভয়েই সাধ্যপ্রণ যত্ন করিতেছিলেন; এজন্য তাঁহারা উভয়ে প্রায়ই লিয়রের রাজধানীতে যাতায়াত ও অবস্থান করিতেন।

এসময় লিয়র বার্দ্ধক্য বয়সে উপনীত হইয়াছিলেন। দেহ জরাজীর্ণ, মনের তেজ ও উৎসাহ নির্ব্বাপিত, বুদ্ধি এককালে ভ্রষ্ট, প্রতিমুহূর্ত্তেই মৃত্যুর চিন্তা হৃদয়ে জাগিতেছে;—এ অবস্থায় তাঁহার হস্তে রাজ্যভার থাকা একান্ত ক্লেশকর। তিনি মনে করিলেন, "দিন ত ফুরাইয়া আসিয়াছে, এখন একটু মৃত্যু চিন্তায় ব্যস্ত থাকি। এ রাজ্য-ভার প্রবীণের হস্ত হইতে নবীনের হস্তে যাওয়াই ভাল।"

এইরূপ সংকল্প করিয়া তিন কন্যা, দুই জামাতা, ও কতিপয় অমাত্যবর্গ লইয়া, লিয়র রাজ্য পরিচালন সম্বন্ধে বিবেচনা করিতে লাগিলেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি তাঁহার রাজ্যের একখানি মানচিত্র প্রস্তুত করাইয়াছিলেন; সেই মানচিত্রে তিন কন্যার জন্য রাজ্যের তিন অংশ পৃথক্ পৃথক্ চিহ্নিত হইয়াছিল। সেই মানচিত্র লইয়া, তিনি দুই জামাতাকে বলিলেন, "আমি আমার এ রাজ্য যাহাকে যে পরিমাণে দিব, তাহাই এখন স্থির করিব; ভবিষ্যতে কাহারও সহিত কাহারও কোনরূপ মনোমালিন্য বা বিবাদ উপস্থিত না হয়, তাহা করাই কর্ত্তব্য। কিন্তু সর্ব্বপ্রথমে আমার কন্যাগণকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করিব। (কন্যাগণের প্রতি) তোমরা আমাকে কে কিরূপ ভালবাস ও ভক্তি কর, তাহা আমি শুনিতে ইচ্ছা করি। কে সর্ব্বাপেক্ষা আমাকে অধিক ভালবাস? জানিও, এই ভালবাসার তারতম্য অনুসারে, এই বিষয়-বিভবও অর্পিত হইবে। গনারিল! প্রথমে তুমিই বল, আমাকে কেমন ভালবাস?"

গনারিল। বাবা, আমি তোমাকে কিরূপ ভালবাসি ও ভক্তি করি, তাহা বাক্যে কি বলিব? ভাষায় তাহা প্রকাশ করিতে পারি না। তুমি আমার নয়নপুত্তলি অপেক্ষাও প্রিয়! এ জীবনের সুখ, স্বাধীনতা, সকল অপেক্ষাও তুমি আমার প্রিয়। তোমায় কত ভালবাসি, তাহা বলিতে হইলে নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া যাইবে, ভাষা মূক হইয়া আসিবে,—পিতঃ! হৃদয় ত প্রকাশ করিয়া উঠিতে পরিব না।

তখন কর্ডিলিয়া ভাবিতেছিল,—"হায়! আমি কি বলিব? কিছুই না, কিছুই না! মনে মনে কেবল ভালবাসিব, কিছুই বলিতে পারিব না!"

গনারিলের শ্রুতিমধুর বাক্যে লিয়র আপ্যায়িত হইলেন। হৃদয়ের দিক্ দিয়া বিচার করিবার ক্ষমতা লিয়রের ছিল না। তোষামোদজনকমিষ্টকথায় তিনি তুষ্ট হইলেন; তাই কন্যার এ কৃত্রিম ভালবাসার কুহকে ভক্তি বা প্রীতির রহস্য তিনি বুঝিতে পারিলেন না। সে দেবতা যে হৃদয়-মন্দিরে অধিষ্ঠান করিয়াছে, সেখানে এমন বাক্যের আড়ম্বর থাকিতে পারে না। প্রেমশূন্য হৃদয়ে, গনারিল কেবল আপাতমধুর বাক্যে তাহার পিতাকে মুগ্ধ করিল এবং সেই বাক্যে প্রতারিত হইয়া লিয়র গনারিলকে আন্তরিক আশীর্ব্বাদ ও শুভ ইচ্ছার সহিত আপন রাজ্যের একতৃতীয়াংশ অর্পণ করিলেন।

তারপর, লিয়র তাঁহার দ্বিতীয়া কন্যা রিগা-

নকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, "রিগান! তুমি আমায় কেমন ভালবাস?"

রিগান। পিতঃ! আমি আর কি বলিব? আমার ভগিনী ও আমি স্বতন্ত্র নহি, তিনিও তোমাকে যেমন ভালবাসেন, আমার ভালবাসাও সেইরূপ। বাবা, তোমায় ভালবাসিয়া যে সুখ ও আনন্দ পাই, পৃথিবীর শত সহস্র আনন্দের মধ্যেও সে সুখ ও আনন্দ পাই না!

কর্ডিলিয়া মনে মনে ভাবিতেছিল,—"হায়! কর্ডিলিয়া, এইবার তুমি! তুমি কি বলিবে? কিছুই না। আমার ভালবাসা হৃদয়ে, জিহ্বায় তাহার আসন নাই!"

রিগান ও গনারিল, দুই ভগিনীর প্রকৃতি একইরূপ। সুতরাং রিগানও আপাতমধুর বাক্যে তাহার পিতাকে মুগ্ধ করিয়া, রাজ্যের অন্যতম একতৃতীয়াংশ লাভ করিল।

তখন লিয়র কনিষ্ঠা কন্যার প্রতি চাহিয়া বলিলেন, "আমার হৃদয়ের আনন্দদায়িনী—তুমি কর্ডিলিয়া! মা, তোমাকে লাভ করিবার জন্য একদিকে ফ্রান্সের অধিপতি, অন্যদিকে বারগাণ্ডির ডিউক, উভয়েই লালায়িত। বল মা, আমায় কি তুমি ভালবাস? দেখি মা, তোমার ভালবাসাই বা কেমন!

কর্ডিলিয়া। বাবা, কি বলিব? কিছুই না।

লিয়র। কিছুই না?

কর্ডিলিয়া। কিছুই না!

লিয়র। আবার বল;—'কিছুই না' হইতে পারে না!

কর্ডিলিয়া। কি বলিব? আমি যে আমার হৃদয়কে ব্যক্ত করিতে জানি না! তুমি পিতা, আমি কন্যা; কন্যার ভালবাসার যে পর্য্যন্ত সীমা, আমি তোমাকে সেই পরিমাণে ভালবাসি;—অধিকও নহে, অল্পও নহে!

লিয়র। কর্ডিলিয়া! কি বলিতেছ? ভাবিয়া বল, নহিলে তোমার অনিষ্ট হইতে পারে!

কর্ডিলিয়া। তুমি পিতা, আমার জন্মদাতা;—আশৈশব তোমারই স্নেহে বর্দ্ধিত হইয়াছি; আমার কর্ত্তব্য, তোমার প্রতি চিরদিনই আমার ভক্তি থাকে। বাবা, আমারও তাহাই আছে এবং থাকিবেও। তবে আমার ভগিনীরা যেরূপ বলিলেন, সেরূপ আমি বলিতে পারি না। যদি তাঁহারা তোমাকেই তাঁহাদের সম্পূর্ণ ভালবাসা দিয়া থাকেন, তবে তাঁহারা বিবাহ করিয়াছেন কেন? আমি জানি, যদি কখন আমার বিবাহ হয়, তবে যিনি আমার স্বামী হইবেন,—আমার সুখ ও দুঃখ, চিন্তা ও ভাবনার তিনি ভাগী হইবেন, আমার হৃদয়েরও অর্দ্ধেক তিনি লইবেন,—আমার ভালবাসার উপর তাঁহারও দাবী আছে। কিন্তু সম্পূর্ণ হৃদয় দিয়া যদি তোমায় ভালবাসি, তাহা হইলে আমার ভগিনীদিগের মতন ত আমি কখনই বিবাহিতা হইতে পারিব না!

লিয়র। বটে! যাহা বলিতেছ, এ সকল তবে অন্তরের সহিত বলিতেছ?

কর্ডিলিয়া। বাবা, আমি অন্তরের সহিতই বলিতেছি!

লিয়র। উঃ! এত শিশু হইয়াও এমন নিষ্ঠুর!

কর্ডিলিয়া। বাবা, শিশু হইলেও আমি যথার্থ বলিয়াছি!

লিয়র। তাই হোক।—আমিও শপথ করিতেছি, আর তুমি আমার কেহ নও! আর আমি তোমাকে কন্যা বলিয়া পরিচয় দিব না! কেবল যে এই বিষয় বিভব হইতে তোমাকে বঞ্চিত করিলাম, তাহা নহে,—আমার অন্তরেও তোমার জন্য আর এতটুকুও স্থান রহিল না!

কর্ডিলিয়ার সে ক্ষুদ্র বুকটুকু পূর্ণ করিয়া যে পুণ্যপবিত্রতাময় প্রেম জাগিতেছিল,—তাহার সে নির্ম্মল মুখমণ্ডলে যে সারল্যের ছবিখানি প্রতিবিম্বিত হইতেছিল, কাণ্ডজ্ঞানহীন

বৃদ্ধ লিয়রের চক্ষে সে সকলই উপেক্ষিত হইল। গুছাইয়া বলিতে না-জানার দরুণ কর্ডিলিয়ার এই কথা গুলির মধ্যে যে কিছু দোষ ছিল না, এমন নহে; অন্য সময় যদি মৃদু মধুর ভষায় এই কথা গুলি ব্যক্ত হইত, তাহাতে হয়ত কিছু সুফল ফলিতে পারিত। তাহার ভগিনীদিগের মুখে যে কথা ব্যক্ত হইয়াছিল, কর্ডিলিয়ার হৃদয়ে সেই ভক্তি ও ভালবাসা বিরাজ করিতেছিল! যাহাই হউক, তাহার দুই ভগিনীর, লাভের প্রত্যাশায় এইরূপ মিথ্যা ভালবাসার প্রতারণা দেখিয়া কর্ডিলিয়ার অত্যন্ত কষ্ট বোধ হইতেছিল, আর তাই সে দেখিয়া-শুনিয়া মনে মনে সঙ্কল্প করিয়াছিল, "ভালবাসিব ত মনে মনেই বাসিব, ব্যক্ত করিব না।" এরূপ ব্যবহারে পিতা লিয়র একান্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছেন বুঝিয়াও কর্ডিলিয়া তাহার কোন প্রতিকার করিল না,—তাহার প্রকৃতিদত্ত অত্যধিক নম্রতায়, সে মৌন হইয়া রহিল।

লিয়র যৌবন কাল অবধিই উগ্র প্রকৃতি। এক্ষণে জীবনের শেষ সীমায় পঁহুছিয়া এক প্রকার বুদ্ধিশূন্য হইয়াছেন, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সরলা কর্ডিলিয়ার স্বাভাবিক সরল হৃদয়ের এই অকৃত্রিম ভালবাসা তিনি বুঝিতে পারিলেন না, বরং এই সরল বাক্যের মধ্যেও তিনি অহঙ্কারের পরিচয় পাইলেন। সুতরাং তাঁহার ক্রোধ বাড়িল, নানা প্রকার অভিশাপ দিয়াও অত্যন্ত ভর্ৎসনা করিয়া, তিনি কর্ডিলিয়ার প্রাপ্য অংশ তুল্যভাগে তাঁহার অন্য দুই কন্যাকে অর্পণ করিলেন।

তখন দুই জামাতার হস্তে রাজ্য-ভার প্রভৃতি সকলই অর্পণ করিয়া, তিনি কেবল নামমাত্র রাজা রহিলেন। কি ভাবিয়া সেই রাজ-উপাধিটা সহসা তাহাদিগকে দিলেন না।

নিজের জন্য লিয়র আর কিছুই রাখিলেন না, কেবল একশত জন অতি বিশ্বস্ত ও অনুগত অনুচর সঙ্গে রাখিলেন, এবং দুই কন্যার সহিত এইরূপ নিয়ম করিলেন যে, তাঁহার সেই একশত পারিষদের সহিত তিনি মাসান্তে পর্য্যায়-ক্রমে উভয়ের গৃহে সেবা পাইবেন।

সরলা কর্ডিলিয়া সত্য সত্যই উপেক্ষিতা হইল!

---

(২)

বৃদ্ধ লিয়রের এই অন্যায় ক্রোধ, এবং ক্রোধের এইরূপ পরিণাম দেখিয়া, পারিষদবর্গ সকলে বিস্মিত ও দুঃখিত হইলেন। কর্ডিলিয়াকে যে নিরপরাধে সকল প্রকারে বঞ্চিত হইতে হইল, তাহাতে সকলে ব্যথিত হইলেন। ক্রোধোন্মত্ত লিয়রের বিরুদ্ধে কেহ যে কোন কথা বলে, সে সাহস কাহারও ছিল না।

কিন্তু একজনের হৃদয় তাহাতে বিচলিত হইল। আর্ল-অব্-কেণ্ট্ নামক লিয়রের এক জন বিশিষ্ট মন্ত্রী যথার্থ সাহসী ও উদার-হৃদয় ব্যক্তি। কেণ্ট্ তাঁহার প্রভু লিয়রকে এইরূপ অবিচার করিতে দেখিয়া, কর্ডিলিয়ার পক্ষ সমর্থনপূর্ব্বক কিছু বলিতে চাহিলেন। কিন্তু লিয়র অতি ভীষণ ক্রোধ দেখাইয়া তাঁহাকে নিরস্ত হইতে বলিলেন। কেণ্ট্ নিরস্ত হইলেন না। তিনি বলিতে লাগিলেন, "প্রভু! মহারাজ! আপনাকে আমি রাজযোগ্য সম্মান করিয়াছি, পিতার ন্যায় ভক্তি করিয়াছি, ভৃত্যের ন্যায় আপনার আজ্ঞাপালন করিয়াছি—"

লিয়র বাধা দিয়া বলিলেন, "সাবধান হও, এখনই তোমার প্রাণবিনাশ করিব!"

কেণ্ট। প্রভু! এ জীবন আপনার সেবায় উৎসর্গ করিয়াছি, আর আমি জীবনের মমতা রাখি না। জীবনের ভয় দেখাইয়া আপনি আমায় কর্ত্তব্য হইতে বিচলিত করিতে পারিবেন না। আমি এ পর্য্যন্ত আপনার মন্ত্রিত্বে থাকিয়া, সৎপরামর্শে আপনাকে লইয়া

আসিয়াছি, এখনও আপনার প্রতি আমার সে কর্ত্তব্য রহিয়াছে। বৃথা তোষামোদে আপনি প্রতারিত হইয়া, যথার্থ সত্য ও সরলতাকে ত্যাগ করিতেছেন;—আপনার দাস আমি,—তাই আপনাকে এ অহিত কার্য্যে বাধা দিতে চাই! আপনার এ বিচার,—এ ঘোর অন্যায় বিচার পুনর্ব্বার ভাবিয়া দেখুন! নিশ্চয়ই জানিবেন, এই সরল কর্ডিলিয়াই যথার্থ অন্তরের সহিত আপনাকে ভালবাসেন!

লিয়র। কেণ্ট, এখনও নিরস্ত হও;—নহিলে তোমার জীবনসংশয়!

কেণ্ট। প্রভুকে নিরাপদে রাখিতে এ দাস জীবন তুচ্ছজ্ঞান করে! এক্ষণে আমার প্রভু উন্মত্ত, তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে সৎ পরামর্শ দিব, ইহাই এখন আমার কর্ত্তব্য ও ধর্ম্ম!

লিয়র। তুমি আমার সম্মুখ হইতে দূর হও!

উন্মত্ত লিয়র তরবারি লইয়া কেণ্টের প্রাণনাশে উদ্যত হইলেন। সকলে তাঁহাকে নিবৃত্ত করিল।

কেণ্ট। মারিতে চাহেন, মারুন; আপনি এক্ষণে উন্মত্ত!—উন্মত্ত ব্যক্তি অনেক সময় প্রাণঘাতী ব্যক্তিকেও ভাল বাসিয়া বৈদ্যের প্রাণসংহার করে! আপনি এখনও আপনার রাজ্যদান সম্বন্ধে বিবেচনা করুন, নহিলে এ জিহ্বায় যতক্ষণ সামর্থ্য থাকিবে, বলিব, আপনি অন্যায় করিলেন!

লিয়র তথাপি শুনিলেন না। তিনি এই অতি বিশ্বস্ত ও একান্ত প্রভুভক্ত অমাত্যের এই সকল হিতকর বাক্য আদৌ গ্রাহ্য করিলেন না। বরং ভাবিলেন, ইহাতে তাহার যথেষ্ট ঔদ্ধত্য প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি একান্ত ক্রোধের বশীভূত হইয়া, কেণ্টকে নির্ব্বাসন আজ্ঞা দিলেন এবং বলিলেন, "ইহার জন্য তোমাকে পাঁচ দিন মাত্র সময় দিলাম; কিন্তু তারপর যদি তোমায় এ দেশে দেখি, জানিও, সেই মুহূর্ত্তেই তোমার প্রাণদণ্ড হইবে! আমি যেরূপ বিচার করিয়াছি, তাহাই হইবে।—তুমি দূর হও!

কেণ্ট। আপনার আজ্ঞা আমার শিরোধার্য্য। আমি এখনই চলিলাম,—এখানে অবস্থান করাই দণ্ডভোগ! কর্ডিলিয়া! সরলতার মূর্ত্তিমতী প্রতিমা তুমি! দেবতা তোমায় পুরস্কার দিবেন! আর তোমার অন্তরে ভালবাসার যে চিহ্ন প্রকাশ পাইয়াছে, কার্য্যে যেন তাহা প্রকাশ পায়;—দুর্ভাগ্য কেণ্ট তোমাদের সকলের নিকট বিদায় লইতেছে।

(৩)

কেণ্ট প্রস্থান করিলে, লিয়র তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা কর্ডিলিয়ার অন্যতম বিবাহার্থী ডিউক-অব-বারগাণ্ডিকে প্রথমে আহ্বান করিলেন। তিনি বারগাণ্ডিকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, "আমার কন্যাকে আপনিও বিবাহ করিতে ইচ্ছুক আছেন, কিন্তু যৌতুকস্বরূপ এ বিবাহে আমি কিছুই দিতেছি না।—আপনি ইহাতে সম্মত আছেন?"

বারগাণ্ডি। আপনি আপনার রাজ্যের যে অংশটুকু তাঁহাকে দিবেন, তাহাতেই আমি সন্তুষ্ট হইতে পারি!

লিয়র। আমি তাহাকে কিছুই দিব না, ইহা স্থিরনিশ্চয়! যখন সে আমার জীবন অপেক্ষাও প্রিয় ছিল, তখন তাহাকে কিছু দিতাম; কিন্তু এক্ষণে সে আমার ঘৃণার পাত্রী হইয়াছে;—নিষ্ঠুর অভিশাপই তাহার যৌতুক, আত্মীয় স্বজনের স্নেহ হইতে সে বঞ্চিত, সে আমার দারুণ ঘৃণার সামগ্রী—তাহাকে বিবাহ করিতে চাহেন?

বারগাণ্ডি। মহারাজ, আমাকে ক্ষমা করুন, আমি এ বিবাহে সম্মত হইতে পারি না।

লিয়র। তবে আপনি বিদায়গ্রহণ করুন।

তারপর ফ্রান্সের অধিপতিকে আহ্বান পূর্ব্বক, তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "আপনাকে আর কি বলিব, আপনার এ বিবাহ করিয়া কাজ নাই। যাহাকে আমি ঘৃণা করি, সে কিছুতেই আপনার প্রণয়পাত্রী হইতে পারে না!"

ফ্রান্স-রাজ। ইহা অতি বিস্ময়ের কথা! যে, এপর্য্যন্ত আপনার বিশেষ আনন্দদায়িনী ও স্নেহের পাত্রী ছিল, যাহার প্রশংসায় আপনি নিরতিশয় আনন্দ অনুভব করিতেন, আপনার চক্ষে যে, রূপে ও গুণে অতুলনীয়া, সে, ইতিমধ্যে আপনার চরণে এমন কি অপরাধ করিল, যে, আপনার স্নেহে চিরদিনের মত বঞ্চিত হইল! তবে নিশ্চয়ই তাহার অতি গুরুতর অপরাধ হইয়াছে,—নহিলে এমন হইবে কেন! কিন্তু একথাও বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না!

এইবার কর্ডিলিয়া পিতাকে সম্বোধন করিয়া করুণকণ্ঠে বলিল, "বাবা, আমার অপরাধ কিসে পুনরায় বিবেচনা করিয়া দেখুন! আমি মহাপাপের কার্য্য কিছুই করি নাই যে, চিরদিনের মত আপনার স্নেহে বঞ্চিত হইব। আমি হৃদয়কে প্রতারণা করিয়া, জিহ্বায় সুধা-বচন আনিতে পারি নাই;—চক্ষে দীন কাতরতার দৃষ্টি দেখাইতে পারি নাই,—ইহাই আমার অপরাধ! বাবা, আমার ভালবাসা ও ভক্তি—অন্তরে, জিহ্বায় তাহার স্থান নাই!

লিয়র। হায়, তুই জন্মগ্রহণ না করিলেই ছিল ভাল!

ফ্রান্সের অধিপতি, তখন ব্যাপারখানা কি, সমস্ত বুঝিলেন। তিনি ভাবিয়া দেখিলেন,—"ইহা কিছুই বিচিত্র নহে। ও হৃদয়ের ভিতর যে অমূল্য রত্ন নিহিত আছে, বাহিরে তাহার প্রকাশ নাই, তাই সরলার এ নিগ্রহ।"

তিনি তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী বারগাণ্ডিকে বলিলেন, "আপনি তবে সত্যই এ কুমারীকে বিবাহ করিতে চাহেন না? যদি না হয়, তবে আর কেহ ইহাঁকে গ্রহণ করিতে পারে। ইনি নিজেই অমূল্য রত্ন, অন্য যৌতুকে প্রয়োজন কি?"

বারগাণ্ডি পুনরায় লিয়রকে বলিলেন, "মহারাজ আপনি আপনার এই কন্যাকে অতি অল্পমাত্র সম্পত্তি দিন, আমি বিবাহ করিয়া লইয়া যাই।"

লিয়র। কিছুই না! আমি শপথ করিয়াছি,—আমার সত্যরক্ষা করিব।

বারগাণ্ডি। আমি বিশেষ দুঃখিত হইলাম যে, কর্ডিলিয়া! তুমি তোমার পিতার ঘৃণার পাত্রী হইয়া, ঈপ্সিত ধনে বঞ্চিত হইলে।

কর্ডিলিয়া। আপনার মঙ্গল হউক। আপনাকে আর কি বলিব, বিবাহে যাহার ধনসঞ্চয়ের বাসনা, আমি তাহার ভার্য্যা হইতে অপমান বোধ করি!

ফ্রান্স-রাজ। সুন্দরি! তুমি দীনা ইহায়াও ঐশ্বর্য্যবতী, আত্মীয়-স্বজন-কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইলেও আমার একান্ত আকাঙ্ক্ষার ধন, লোকের ঘৃণিত হইলেও আমার প্রেমের দেবতা তুমি;—তোমার হৃদয়ের গুণে আমি তোমাকে গ্রহণ করিতেছি! অন্যে যাহা ফেলিয়া দিয়া গেল, আমিই আদরে তাহা কুড়াইয়া লইলাম! মহারাজ লিয়র! এক্ষণে আপনার সম্মতির প্রতীক্ষা করিতেছি।—চল রাণি! এখানে যাহা পাইলে না, অন্যত্র তদপেক্ষাও উৎকৃষ্ট যাহা, তাহাই তোমাকে দিব। আজ হইতে তুমি ফ্রান্সের মহারাণী হইলে! প্রিয়তমে, তোমার পিতার নিকট বিদায় গ্রহণ কর।

লিয়র। আমি সম্মতি দিলাম। উহাকে কন্যা বলিতে আমার প্রবৃত্তি নাই, আর আমি উহার মুখ দেখিতে চাহি না। আমার ঘৃণা, অশ্রদ্ধা ও অভিসম্পাতের সহিত উহাকে আপনি এখনই লইয়া যান!

ফ্রান্স-রাজ। কর্ডিলিয়া! তোমার ভগিনী-দিগের নিকট বিদায় গ্রহণ কর।

কর্ডিলিয়ার চক্ষে জলধারা বহিতেছিল। সেই অশ্রুপূর্ণ আঁখিতে কর্ডিলিয়া ভগিনীদ্বয়ের হস্তধারণ করিয়া বলিলেন, "বাবার কত আনন্দের সামগ্রী তোমরা, আজ তোমাদের দুঃখিনী ভগিনী কর্ডিলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তোমাদিগের নিকট বিদায় চাহিতেছে! তোমরা কত দয়াবতী, তাহা আমার জানা আছে, তবু তোমরা ভগিনী, তোমাদের দোষ আমি ধরিতে পারি না। আর কি বলিব, বাবাকে দেখিও, তাঁহাকে যত্ন করিতে ত্রুটি করিও না! হায়! যদি আমি ভাগ্যদোষে তাঁহার দয়ায় বঞ্চিত না হইতাম, তিনি অন্যত্র থাকিতে পারিতেন!

রিগান। যাও, যাও, তোমায় আর আমাদিগকে উপদেশ দিতে হইবে না!

গনারিল। তুমি কেমন করিয়া তোমার স্বামীর মন রাখিবে, তাহাই দেখ গে! তোমার স্বামীর বড় ভাগ্য যে, তোমাকে পাইয়াছেন!

ফ্রান্স-রাজ। এস কর্ডিলিয়া, এখান হইতে প্রস্থান করি।

কর্ডিলিয়ার হৃদয়ে তখনও পর্য্যন্ত তাহার পিতার কথা জাগিতেছিল। তাহার ভগিনীরা অতি নীচাশয়। দয়া-ধর্ম্ম কিছুই তাহাদের নাই;—তাহারা কি রাজাকে এই বৃদ্ধ বয়সে সেবা-শুশ্রূষা করিবে? ইহা ভাবিয়া কর্ডিলিয়া একান্ত কষ্ট পাইতেছিলেন। কিন্তু কোন উপায় নাই জানিয়া, তিনি দুঃখপূর্ণ হৃদয়ে, কাঁদিতে কাঁদিতে প্রস্থান করিলেন।

হায়, সে প্রতি অশ্রু-বিন্দুর মূল্য কত!

---

(৪)

যাহার স্নেহ ও ভালবাসা কৃত্রিম, যাহার ভক্তি কেবলমাত্র রসনাগত;—না বুঝিয়া যাহাকে ভালবাস, হৃদয় দিয়া তাহার সেবা কর, অতি অল্পদিনে সে তোমার ভ্রম বুঝাইয়া দিবে! বুঝাইয়া দিবে যে, তুমি অতি নির্ব্বোধ, তোমার প্রেম অপাত্রে ন্যস্ত হইয়াছে। কিন্তু যাহার হৃদয় তোমার জন্য যথার্থ তৃষিত ও একান্ত কাতর; যে বাস্তবিক তোমার মুখপানে চাহিয়া চাহিয়া বাঁচিয়া আছে; যাহার বুকের ভিতর তোমারই ছবি আঁকা আছে,—শত অত্যাচারে তাহাকে উৎপীড়িত কর, সহস্র প্রকারে তাহার প্রতি অসদ্ব্যবহার কর, সে তবুও তোমায় ছাড়িবে না, ছায়ার মত তোমার অনুসরণ করিবে! হয়ত তুমি তাহাকে চিনিয়াও চিনিবে না, সে তবু তোমা বৈ আর জানিবে না! প্রেমের ধর্ম্মই এই।

বৃদ্ধ লিয়রের জীবনে এই দুইটীর দৃষ্টান্ত অতি পরিষ্কাররূপে পাওয়া যায়। তাঁহার দুই কন্যার কপট স্নেহ ও ভক্তি অতি অল্পদিনে তিনি বুঝিতে পারিলেন। আর সেই বিশ্বস্ত, প্রভুভক্ত, ধর্ম্মপরায়ণ কেণ্ট, যাঁহাকে ক্রোধোন্মত্ত লিয়র নির্ব্বাসন আজ্ঞা দিয়াছেন, সেই নির্ব্বাসিত কেণ্ট বুঝিয়াছেন,—এই কন্যাদ্বয়ের হস্তে লিয়রের কষ্টের আর অবধি থাকিবে না। তাই শুদ্ধ অকৃত্রিম প্রভুভক্তিবশতঃ তিনি ছদ্মবেশে লিয়রের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইলেন। যিনি ঐশ্বর্য্যে দীন নহেন, নানা প্রকার উচ্চ-গুণগ্রামে যিনি ভূষিত, যাঁহার প্রতাপ নিতান্ত সামান্য নহে, সেই কেণ্ট্ আজ ছদ্মবেশে সামান্য পরিচারক হইয়া, প্রভুর সেবায় নিযুক্ত হইলেন। লিয়র তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না। তিনিও আপনার নাম গোপন করিয়া কায়াস্ নামে আপনার পরিচয় দিলেন, এবং লিয়রও হৃষ্টচিত্তে তাঁহাকে আপনার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত করিলেন।

তখন লিয়র তাঁহার সেই একশত পারিষদকে লইয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা গনারিলের ভবনে অবস্থান করিতেছিলেন। একমাস সেখানে থাকিবার কথা, তারপর লিয়র তাঁহার মধ্যমা কন্যা রিগানের ভবনে যাইবেন। পর্য্যায়ক্রমে এইরূপে নিয়ম সংস্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু একমাস গত না হইতেই, লিয়র তাঁহার কন্যার দুর্ব্ব্যবহার বুঝিতে পারিলেন।

পাপীয়সী, তাহার পিতার সর্ব্বস্ব লইয়াও তদ্বিনিময়ে পিতাকে একটুকু সাদরসম্ভাষণ পর্য্যন্ত করিত না। লিয়র বুঝিলেন, যেরূপ অঙ্গীকার ছিল, কার্য্যে তাহার কিছুই নাই। গনারিল মনে করিত, "পিতার এই বৃদ্ধ বয়স, একশত পারিষদ ইহাঁর সঙ্গে থাকিবার আবশ্যক কি? ইহারা খাইতে যেমন পটু, আমার দাসদাসীদিগের সহিত সর্ব্বদা কলহ করিতেও তেমনি অগ্রসর,—এ জঞ্জাল না রাখিলেই কি নহে? আমি এ সকল ভালবাসি না। এ অনর্থক ব্যয় কেন? বৃদ্ধ বয়সে এত হুকুম ও চাল-চলন আমি দেখিতে পারি না।"

আসল কথা, গনারিল পিতাকে দেখিতে পারিত না। অতি অল্পদিনের ব্যবহারে তাহা প্রকাশ পাইল। লিয়রের শত পারিষদ ভদ্রবংশজাত, শিক্ষিত, উন্নত চরিত্র; তাঁহারা গনারিলের দাসদাসীদিগের সহিত বিবাদ করিবেন, এ স্বভাব তাঁহাদিগের নহে। আসল কথা, কোন রকমে তাহাদিগকে বিদায় করিতে পারিলেই গনারিল বাঁচে। পিতার সহিত সে ভাল করিয়া কথা কহিত না। যদি কখন দেখা হইত, মুখভার করিয়া চলিয়া যাইত। প্রথম প্রথম লিয়র কিছু বুঝিতেন না। তিনি তাহাকে দেখিবার জন্য ডাকিয়া পাঠাইলে, গনারিল লোকদ্বারা বলিয়া পাঠাইত—হয় পীড়া হইয়াছে, নয় কার্য্যে ব্যস্ত আছে।

কেবল ইহাই নহে;—গনারিল দাসদাসীদিগকে পর্য্যন্ত শিখাইয়া দিত যে, পিতার কোন কথা না শুনে, পিতার অনুচরবর্গের সহিত মিছামিছি বিবাদ করে, এবং পিতার মুখের উপর অপমান পর্য্যন্তও করে! লিয়র এ সকল বুঝিয়াও বুঝিতেন না, স্বকৃত দোষ ভাবিয়া চক্ষু মুদিয়া উড়াইয়া দিতেন।

কিন্তু বড় বাড়াবাড়ি হইল। গনারিলের লোকজন লিয়রকে আর মান্য ত করেই না, তাঁহার সকল আদেশ পর্য্যন্তও গ্রাহ্য করে না। ইহা ছাড়া, তাহারা বিনা কারণে তাঁহার লোকজনের সহিত কিছু বেশী রকম বিবাদে প্রবৃত্ত হইতে লাগিল। গনারিলের সহিত যদি কখন লিয়রের সাক্ষাৎ হইত, গনারিল যে অত্যন্ত বিরক্ত, তাহাও বুঝা যাইত। একদিন গনারিলের এক ভৃত্যকে ডাকিয়া লিয়র জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার কন্যা এখন কোথায়?"

ভৃত্য সে কথার প্রকৃত উত্তর না দিয়া প্রস্থান করিল। লিয়র অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া তাঁহার নিজের এক পারিষদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি, এ লোকটা কি বলিয়া গেল?"

পারিষদ। বলিল যে, আপনার কন্যার অসুখ হইয়াছে।

লিয়র। কিন্তু আমি যখন লোকটাকে ডাকিলাম, সে আমার কাছে না আসিয়া চলিয়া গেল কেন?

পারিষদ। আমি ডাকিয়াছিলাম, সে বিরক্তির সহিত উত্তর করিল যে, আসিবে না।

লিয়র। সে আসিবে না!

পরিষদ। মহারাজ, আমরা আর কি বলিব,—কিন্তু বেশ বুঝিতেছি, এখানে আপনার যথাযোগ্য সম্মান নাই। আপনার জামাতাও যেমন, আপনার কন্যাও তেমনি,—কেহ আর আপনাকে সম্মানের চক্ষে দেখে না।

লিয়র। কি, তুমি এইরূপ বিবেচনা কর?

পারিষদ। যদি আমি ভুল বুঝিয়া থাকি, আমাকে ক্ষমা করুন। কিন্তু যখন দেখি, আপনার সম্মানের বিশেষ ত্রুটী হইতেছে, তখন এ দাস নীরবে থাকিতে পারে না।

লিয়র। দেখ, তুমি ভুল বুঝ নাই, আমারও এক একবার ঐ রকম ধারণা হয়। কিন্তু আমি বুঝিতাম, হয়ত উহারা উহাদের কর্ত্তব্য সাধন করিতেছে, আমি আপনার চিত্তের লঘুতা বশতঃ উহাদিগের কার্য্য দেখিতে যাইয়া এইরূপে আপনাকে অপমানিত দেখিতে পাই। কিন্তু আরও দুই দিন দেখি, ব্যাপারখানা কি? আমার সে রসিক ভাঁড় এখন কোথায়?

তখন রাজাদিগের হাস্য তামাসার জন্য একজন করিয়া সুদক্ষ রসিক-রাজ রাজসভায় থাকিত, সচরাচর তাহারা ভাঁড় নামেই প্রসিদ্ধ। রাজা লিয়রেরও এই শ্রেণীর একজন ভাঁড় ছিল।

পারিষদ। মহারাজের কনিষ্ঠা কন্যা কর্ডিলিয়া যে পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছেন, ভাঁড়ও সেই দিন হইতেই কেমন বিষণ্ণ ও ম্রিয়মাণ হইয়া আছে।

লিয়র। সে কথা আর তুলিও না,—ভাঁড়কে ডাকিয়া দাও।

সেই সময় গনারিলের সেই ভৃত্য পুনর্ব্বার লিয়রের সম্মুখে আসিল। লিয়র জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাকে আমি ডাকিয়াছিলাম, আস নাই কেন? আমাকে কি তুমি চিন না,—আমি কে?

ভৃত্য। আপনি আমার কর্ত্রীর পিতা।

লিয়র। "আমার কর্ত্রীর পিতা!"—হতভাগ্য, দুরাচার, পাষণ্ড, নরাধম!

ভৃত্য। মহাশয়! আমি এ সকলের কিছুই নহি।

লিয়র। বটে?—এমনই করিয়া তুই আমার পানে চাহিয়া দেখিবি? (প্রহার)

ভৃত্য। আমি প্রহারের কাজ কিছুই করি নাই, আপনি আমাকে প্রহার করিতে পারেন না।

তখন ছদ্মবেশী কেণ্ট্ তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি ভৃত্যের এ ব্যবহার সহ্য করিতে না পারিয়া তাহাকে বিলক্ষণরূপ "উত্তম-মধ্যম" দিয়া বিদায় করিয়া দিলেন।

কায়াসের এই কার্য্যে লিয়র বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন। এইরূপ, যখন যে প্রয়োজন হইত, প্রভুর প্রতি আপনার স্নেহ ও ভক্তি প্রদর্শন করাইয়া কায়াস্ তাঁহার বিশেষ প্রিয়পাত্র হইতেন।

তারপর লিয়রের সেই ভাঁড় আসিয়া উপস্থিত হইল। লিয়র, তাঁহার সমস্ত বিষয়-বিভব এবং রাজ্য পরহস্তে বিতরণ করিলেও, আন্তরিক স্নেহবশতঃ এই ভাঁড় তাঁহাকে পরিত্যাগ করে নাই। সে মাঝে মাঝে আসিয়া কৌতুক বাক্যে লিয়রকে আপ্যায়িত করিত। এবং রাজা আপনার পরিণাম না ভাবিয়া যে, কন্যাগণকে সমুদায় বিতরণ করিয়াছেন, তাহাই লক্ষ্য করিয়া সময়ে সময়ে সে রসিকতার সহিত বেশ দু'কথা শুনাইয়া দিত। ভাঁড়ের অপরাধ লওয়া রাজাদিগের রীতি ছিল না। সেই ভাঁড় সময়ে সময়ে গনারিলের মুখের উপরেও বেশ দু'কথা শুনাইয়া দিত।

আজি লিয়র কন্যার এইরূপ ব্যবহারে সাতিশয় মনকষ্ট পাইয়া ভাঁড়কে ডাকিতে পাঠাইলেন, ভাঁড়ও আসিয়া উপস্থিত হইল।

---

(৫)

ভাঁড় আসিয়াই রাজাকে সম্বোধন পূর্ব্বক তাঁহার বর্ত্তমান অবস্থার কথা তুলিল। সে, রসিকতার সহিত দুই চারিটা বড়ই তীব্র শ্লেষ বাক্য প্রয়োগ করিল। লিয়র কখন বিরক্ত হইলেন, কখন বা তাহাকে ভয় দেখাইলেন। সে বলিল, "মহারাজ, একটা কথা নিবেদন করি। একটা বচন আছে যে, "তুমি যত দেখাও, তোমার ভিতরে যেন তাহার বেশী থাকে; তুমি যত বল, যেন তাহার বেশী তোমার জানা থাকে; যত ঋণ দাও, যেন তাহার বেশী তোমার 'পাওনা' থাকে,—ইত্যাদি ইত্যাদি।"

লিয়র। দূর নির্ব্বোধ! এ কথার সার মর্ম্ম কি? এ ত কিছুই নহে।

ভাঁড়। এই 'কিছুই নহে' হইতে কি, কিছু পাইতে পারেন না?

লিয়র। 'কিছু না' হইতে কিছুই না হয়।

ভাঁড় (কায়াস্‌কে সম্বোধনপূর্ব্বক) তুমিই এ কথা রাজাকে বুঝাইয়া দাও। তাঁহার বিষয়-বিভব হইতেও এইরূপ 'কিছুই না' আসিয়া থাকে।—ভাঁড়ের কথায় রাজা বিশ্বাস করিবেন না।

লিয়র। ভাঁড়ের কথাগুলা কি তীব্র!

ভাঁড়। যে মিষ্ট কথা বলে, আর যে তীব্র বলে, সে দু'য়ের পার্থক্য জানেন?

লিয়র। না, তুমিই শিখাইয়া দাও।

ভাঁড়। যে আপনাকে পরামর্শ দিয়াছিল যে, আপনার সকল ঐশ্বর্য্য বিতরিত হউক, তাহাকে আমার পার্শ্বে দাঁড় করাইয়া দিন, কিংবা আপনিই তাহার স্থানে দাঁড়ান, তাহা হইলে দুই জনকেই দেখিতে পাইবেন।—এই আমি এক জন, আর সেই এক জন।

লিয়র। কি, আমাকেই নির্ব্বোধ, মূর্খ বলিলি?

ভাঁড়। আর কি বলিব? আপনার আর-সকল উপাধি ত গিয়াছে!

কায়াস। মহারাজ, এই ব্যক্তি কেবল ভাঁড় নহে।

ভাঁড়। হাঁ, আমি সঙ্গীত করিতে শিখিয়াছি!

লিয়র। সঙ্গীত? সে আবার কবে শিখিলি?

ভাঁড়। কেন মহারাজ, যেদিন আপনার কন্যাগণকে আপনার মাতৃপদে অভিষিক্ত করিয়াছেন? যে দিন তাহাদের হাতে আপনার শাসন-দণ্ড দিয়াছেন,—তাহারা অপার আনন্দে কাঁদিয়া ফেলিল, আর আমি মনের দুঃখে গাহিতে লাগিলাম! আপনার সেই কন্যাগণের অধীনে থাকিয়া বাল-লীলা দেখিয়াই আমার দুঃখ, আর সেই দুঃখেই আমার সঙ্গীত!—মহারাজ! একজন শিক্ষক নিযুক্ত করিতে পারেন কি? তাহা হইলে তাহার নিকট, মিথ্যা কেমন করিয়া কহিতে হয়, তাহা শিক্ষা করি!

লিয়র। মিথ্যা কহিলেই প্রহার খাইবে।

ভাঁড়। এ মন্দ নহে। আপনার আর আপনার কন্যাগণের প্রকৃতিটী দেখিতেছি বেশ! সত্য কথা বলিলেই আপনার জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম কন্যাটী বেজার হইয়া প্রহার করিতে আসেন, আর মিথ্যা বলিলেই আপনি প্রহারের ভয় দেখান! আবার চুপ করিয়াও থাকিবার যো নাই। আমি এই ভাঁড় না হইয়া আর যা ইচ্ছা তাই হইতে পারি, কিন্তু তা বলিয়া আপনার মত হইতে চাহি না।—আপনি অতি নির্ব্বোধ!

যখন এইরূপ কথাবার্ত্তা চলিতেছিল, গনারিল সেখানে উপস্থিত হইল। গনারিলের মুখখানা নিতান্ত বিরক্তিপূর্ণ, এখনও ভ্রূকুটী-চিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে।

লিয়র। কে, গনারিল? তোমার মুখের আকৃতি এরূপ কেন?

ভাঁড়। এমন দিন ছিল, যখন লিয়র এ ভ্রূকুটীপূর্ণ মুখ দেখিয়াও কিছু গ্রাহ্য করিতেন না। এখন লিয়র যেন একটা "০" শূন্য মাত্র! দেখুন মহারাজ, এখন আপনার চেয়ে আমি ভাল! আমি নির্ব্বোধ ভাঁড়, কিন্তু আপনি কিছুই নন!—(গনারিলেরপ্রতি) এই আমি চুপ করিলাম, আপনি অমন মুখভঙ্গি করিবেন না।

গনারিল। (পিতার প্রতি) আমি আর কি বলিব, এই নির্ব্বোধ ভাঁড়, ইহাকে ত আঁটিয়া উঠিবার যো নাই;—ইহার উপর আপনার এই লোকজন, ইহারা কেবলই কলহ বিবাদ, চীৎকার প্রহার—এই লইয়াই আছে। ইহাতে যে কি বিরক্ত হইয়াছি, বলিতে পারি না। আমি এ সকল আর সহ্য করিতে পারি না। এ লোকজনদের এখানে রাখিবার প্রয়ো-

জন নাই। আপনি যদি এ সম্বন্ধে কোন বিবেচনা না করেন, আমি ইহার উচিত উপায় অবলম্বন করিব।

ভাঁড়। বিস্ময়ের কথা কি? পক্ষিণী নিজে না খাইয়া, চঞ্চুপুটে খাবার আনিয়া শাবকদিগকে খাওয়ায়; সেই কিন্তু শাবকেরাই আবার বড় হইয়া সেই পক্ষিণীর মস্তকেই চঞ্চু প্রহার করে!

হঠাৎ লিয়রের ভাবান্তর হইল। তিনি বলিয়া উঠিলেন, "তুমি কি আমার কন্যা গনারিল? আমিই কি লিয়র? কে আমাকে চিনিতে পারে? লিয়র কি এমনই করিয়া বেড়ায়? এমনই কথা কহে? লিয়রের চক্ষু কৈ? লিয়র নিদ্রিত না জাগ্রত? হায়, কে বলিবে, আমি কে? আমি লিয়রের ছায়া মাত্র! আমার কন্যা ছিল? মিথ্যা কথা।—তোমার নাম কি রমণি?

গনারিল। দেখুন, এ সকল আর এখন ভাল লাগে না। আমি স্পষ্টই বলিতেছি, আপনি একটা উপায় ঠাওরান। এই যে একশত পারিষদ লইয়া আছেন, ইহাদের প্রয়োজন কি? লোকগুলা নিতান্ত দুরাচার, অসচ্চরিত্র, কলহপরায়ণ;—আহারেও এক একজন এক একটা রাক্ষস! এ প্রাসাদ যেন একটা পাপের আলয় করিয়া তুলিয়াছে;—একটুকুও শান্তিতে থাকিবার যো নাই। এই লোকজন কমাইয়া দিন,—দুই চারিজন মাত্র রাখিয়া বাকী সব বিদায় করিয়া দিন!

গনারিলের এইরূপ উক্তিতে লিয়র ক্রোধে ও দুঃখে বিচলিত হইলেন। এমন অকৃতজ্ঞতা! রাজ্য, ধন, মান, ঐশ্বর্য্য, সকলই যাহাকে অর্পিত হইল, প্রতিদানে তাহার এই ব্যবহার? তিনি বলিয়া উঠিলেন,—"না,—আর না! অনেক দিন হইতে দেখিতেছি, তোর ব্যবহার বড় ভয়ানক! আমি এখনই চলিলাম! আমার আর এক কন্যা আছে, তাহার নিকট চলিলাম! অকৃতজ্ঞতা!—সন্তানের অকৃতজ্ঞতা! মহা খল, পিশাচ ও ভীষণ সামুদ্রিক জন্তু অপেক্ষাও ইহা অতি ভীষণ! মিথ্যাবাদিনি! আমার এই পারিষদবর্গ সকলেই ভদ্রসন্তান, সচ্চরিত্র ও শিক্ষিত।—ওহোহো! কর্ডিলিয়া! কর্ডিলিয়া! মা আমার! তোমার সামান্য অপরাধ কি ভীষণ দেখিয়াছিলাম!"

শিরে করাঘাত করিয়া লিয়র চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"ও লিয়র! লিয়র! আজ তোর এই দশা! মস্তক বিদীর্ণ হোক্, আমার নির্ব্বুদ্ধিতা ও মূর্খতার অবসান হোক্!"

লিয়র অশ্ব প্রস্তুত করিতে বলিয়া তাঁহার লোকজনদিগকে প্রস্থান করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে বলিলেন। তখন গনারিলের স্বামী ডিউক-অব্-আলবানি সেখানে উপস্থিত হইলেন। তিনি এই সকল শুনিয়া লিয়রকে বলিলেন, "মহাশয়, আমাকে ক্ষমা করিবেন, আমি এ বিষয়ের কিছুই জানি না।"

লিয়র। তাহা হইতে পারে।—গনারিল, আমি চলিলাম, কিন্তু আমি এই অভিশাপ দিতেছি যে, তোর যেন কখন সন্তান না হয়! হে দেবতা! এই রাক্ষসীর সকল ক্ষমতা কাড়িয়া লও, কখন যেন ইহার গর্ভে সন্তান না হয়! যদি কখন ইহার সন্তান হয়, তবে সে যেন জীবনাবধি এই পাপীয়সীকে যন্ত্রণা দেয়! যেন চক্ষের জলে ভাসিতে ভাসিতে এ রাক্ষসীর আয়ুঃশেষ হয়! মায়ের দুঃখ-যন্ত্রণা দেখিয়া সেই সন্তান যেন সকলই হাসিয়া উড়াইয়া দেয়! এতটুকুও কষ্ট যেন সে অনুভব না করে! তখন পাপীয়সী বুঝিবে, করাল বিষধরের দংশন অপেক্ষাও এইরূপ অকৃতজ্ঞ সন্তান কি যন্ত্রণার!

লিয়রের চক্ষু ফাটিয়া শোণিতাশ্রু বহিতে লাগিল। বৃদ্ধ সেই শোণিতাশ্রু মুছিতে মুছিতে বলিলেন, "উঃ! এতদূর! আমার লজ্জা হইতেছে যে, আমার কন্যা আমার এই বৃদ্ধবয়সে আমার উপর এতদূর ক্ষমতা চালাইল!—আমাকে মর্ম্মপীড়িত করিয়া চক্ষে বারিধারা বহাইল!

মর্ম্মপীড়িত লিয়র।



লিয়র লোকজন লইয়া প্রস্থান করিলেন।

তখন গনারিল ও তাহার স্বামীতে লিয়রসম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। গনারিল স্বামীকে পিতার বিরুদ্ধে বেশ দুই কথা বুঝাইয়া দিল। তাহার স্বামীও তাহাই বুঝিলেন, অধিকন্তু তাহার পতিভক্তির প্রশংসা করিয়া নিরস্ত হইলেন।

---

(৬)

এইবার লিয়রের মধ্যমা কন্যার কথা বলিব। মধ্যমা কন্যা রিগান ও তাহার স্বামী ডিউক-অব্-কর্ণওয়াল লিয়রের ধনসম্পত্তি পাইয়া মহাসুখে দিন কাটাইতে ছিলেন। লিয়র প্রত্যাশা করিয়া ছিলেন, গনারিল তাঁহার প্রতি যেরূপ অসদ্ব্যবহার করিয়াছে, রিগান তাহা শুনিয়া না জানি কতই কষ্ট অনুভব করিবে, অধিকন্তু সে কত সমাদরেই বৃদ্ধ পিতাকে সম্ভাষণ করিবে! এই বিশ্বাসে তিনি তাঁহার বিশ্বস্ত ভৃত্য কায়াস্‌কে—ছদ্মবেশী কেণ্টকে অগ্রে পাঠাইলেন। বলিয়া দিলেন, "তুমি কোথাও বিলম্ব না করিয়া, অগ্রেই রিগানের ভবনে পঁহুছিবে। আমরা সকলে যাইতেছি, এই কথাই তাহাকে জ্ঞাপন করিবে।"

কেণ্ট প্রস্থান করিলেন।

লিয়র। রিগান আমাকে যত্ন করিবে;—সে এতদূর নিষ্ঠুর হইবে না!

ভাঁড়। খুবই যত্ন করিবে! মহারাজ, আপনি বলিতে পারেন, শম্বুকের গৃহটী তাহাদের পৃষ্ঠের উপর থাকে কেন?

লিয়র। কেন থাকে?

ভাঁড়। এই জন্য যে, সে তাহার মাথা রাখিবার স্থানটুকু ছাড়ে না। সে তাহার কন্যাগণকে সমস্ত দিয়া যে, তাহার মাথাটী অনাবৃত রাখিবে, এমন সে চাহে না!

লিয়র। উঃ! এমন যে সদাশয় পিতা, তাহার প্রতি এই ব্যবহার! কি অকৃতজ্ঞতা!

ভাঁড়। দেখুন, আপনি যদি আমার ভাঁড় হইতেন, আমি আপনাকে এত শীঘ্র বুড়া হইতে দেখিয়া, নিশ্চয়ই আপনাকে প্রহার করিতাম!

লিয়র। সে কি!

ভাঁড়। আপনি বুড়াই হইয়াছেন, আপনার বুদ্ধি শুদ্ধি কিছুই হয় নাই! বুদ্ধিমান হইবার আগে আপনার বুড়া হওয়া উচিত হয় নাই!

লিয়র। উঃ! আর না, আর না! হে দেবতা! আমায় রক্ষা কর, রক্ষা কর! আমি যেন উন্মত্ত না হই!

যে সময় লিয়র তাঁহার দ্বিতীয় কন্যা রিগানের নিকট কেণ্টকে পাঠাইয়াছিলেন, সে সময় পাপীয়সী গনারিল পিতার বিরুদ্ধে নানারূপ অনুযোগ করিয়া রিগানের নিকট তাহার অনুচর পাঠাইয়াছিল।

পথে কেণ্ট, গনারিল-প্রেরিত সেই অনুচরকে দেখিয়া মনে করিলেন, "এ ব্যক্তি অবশ্যই কোন দুরভিসন্ধি লইয়া আসিয়াছে।"

পূর্ব্বে গনারিলের ভবনে এই ব্যক্তির সহিত কেণ্টের বিবাদ হইয়াছিল; তাহাতে কেণ্ট কিছু মনক্ষুণ্ণ ছিলেন। এক্ষণে অবসর বুঝিয়া তিনি তাহার সহিত কলহ বাধাইলেন। সে ব্যক্তি বিশেষরূপে নিগৃহীত হইয়া রিগানের নিকট অভিযোগ করিল। রিগান কেণ্টকে কারারুদ্ধ করিলেন।

গনারিল এই লোকের নিকট বলিয়া পাঠাইয়াছিল যে, রিগান যেন পিতাকে স্থান না দেয়। এবং নিজেও পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া সাক্ষাতে সকল কথা বিবৃত করিবে, ইহাও বলিয়া দিয়াছিল।

রিগানও ইহাই সঙ্গত বুঝিয়া পিতার অভ্যর্থনা করা দূরে থাক,—তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেও নারাজ হইল।

---

(৭)

লিয়র, রিগানের ভবনে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তাঁহার প্রিয় ভৃত্য কায়াস্ (কেণ্ট) কারারুদ্ধ হইয়া আছে। এই ব্যাপার দেখিয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন, রিগানের নিকট তিনি যে আদরের প্রত্যাশা করিয়া আসিয়াছেন, তাহা কতদূর ফলবতী হইবে! তিনি কেণ্টকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তোমার এই দশা করিল?"

কেণ্ট। আপনার কন্যা ও জামাতা।

লিয়র। কখনই নয়!

কেণ্ট। আজ্ঞা হাঁ, তাঁহারাই।

লিয়র। আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি, তাঁহারা নহেন!

কেণ্ট। আমিও শপথ করিয়া বলিতেছি, তাঁহারাই আমার এ দশা করিয়াছে!

লিয়র। আমার বিশ্বাস, তাহাদের এতদূর সাহস হইবে না। কিন্তু, কি কারণে এইরূপ হইল, তাহা জানিতে চাই।

কেণ্ট। আমি এখানে আসিতেছি, আপনার কন্যা গনারিলের নিকট হইতে তাঁহার এক ভৃত্যও এখানে আসিতেছিল সে, আপনার বিরুদ্ধে কি চিটীপত্র আনিতেছিল। পথে কথায় কথায় সে আমাকে যথেষ্ট অবজ্ঞা করিল; লোকটার উপর আমার বড় রাগ হইল। কাজেই দুই চারি ঘা বসাইয়া দিলাম। সেই অপরাধে এই শাস্তি।

লিয়র। লঘুপাপে গুরুদণ্ড! উঃ! আর বলিও না। আমার বুকের ভিতর কি একটা যন্ত্রণা হইতেছে! সমস্ত হৃদয়টা যেন আলোড়িত হইতেছে! আমার কন্যা এখন কোথায়?

কেণ্ট। তিনি বাড়ীর মধ্যেই আছেন।

লিয়র কন্যার নিকট আপনার আগমন-বার্ত্তা প্রেরণ করিলেন। কিন্তু উত্তর আসিল, তিনি রাত্রিকালে স্বামীর সহিত ভ্রমণ করিয়া আসাতে পথশ্রান্তা আছেন,—এক্ষণে সাক্ষাৎ হইতে পারে না।

এই সংবাদে লিয়র বড়ই কষ্ট পাইলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন, "কি জন্য আমার সহিত দেখা করিবেন না? কি হইয়াছে? পীড়া হইয়াছে?—পথ হাঁটিয়া শ্রান্তি হইয়াছে?—ইহা শুনিতে চাহি না।"

আবার সংবাদ গেল, আবার সেইরূপ অবজ্ঞাজনক উত্তর আসিল। ক্রোধে, দুঃখে, অভিমানে এবার লিয়র মর্ম্মপীড়িত হইলেন। কন্যার উদ্দেশে নানা প্রকার ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন, "তাহাদের যাহাই হউক, আমার এ ভৃত্যকে মুক্ত করিয়া দিক। এখনই তাহাদিগকে আসিতে বল। যদি না আসে, আমি তাহাদের গৃহদ্বারে গিয়া এমনই শব্দ করিব যে, তাহাদের নিদ্রা, মৃত্যু না হইলে নিশ্চয়ই ভাঙ্গিবে!"

আবার সংবাদ গেল। তখন লিয়র আপনার অবস্থা স্মরণ করিয়া উন্মত্তের ন্যায় চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন, "হৃদয়, আশ্বস্ত হও! ও-হো-হো! এ উদ্বেলিত হৃদয়ভার আর বহন করিতে পারি না!"

এবার কি ভাবিয়া রিগান ও তাহার স্বামী সেখানে উপস্থিত হইল।

রিগান। পিতঃ! আপনাকে দেখিয়া আমি পরম আহ্লাদিত হইলাম।

পাঠক অবশ্যই বুঝিয়া থাকিবেন, লিয়র এখন প্রকৃতিস্থ নহেন;—মনে যখন যে ভাবের উদয় হইতেছে, মুক্তপ্রাণে তাহাই প্রকাশ করিতেছেন। তিনি বলিলেন, "তাহা নিশ্চয়ই। যদি তাহা না হইত, তবে কবর হইতে তোমার মাতাকে তুলিয়া দুশ্চরিত্রা বলিয়া তাহার সহিত বিবাহবন্ধন ছেদ করিতাম! রিগান, তোমার ভগিনী সাপিনীর ন্যায়, এই দেখ, আমার বুকে দংশন করিয়া কি জ্বালাময়ী যন্ত্রণা দিয়াছে! ওঃ! সে কথা আমি আর বলিতে পারি না!"

রিগান। পিতঃ! ক্ষান্ত হউন। আপনার বুঝিবার ভুল হইয়াছে। আপনাকে কোনরূপে উত্যক্ত করা তাঁহার অভিপ্রায় নহে। আপনার দুর্ব্বিনীত অনুচরগণকে দূর করাই তাঁহার উদ্দেশ্য।

লিয়র। আমার অভিশাপে সে জ্বলিয়া মরুক!

রিগান। দেখুন, আপনি বৃদ্ধ হইয়াছেন। এখন অন্যে আপনাকে শাসন করিবে। সেই শাসন মানিয়া আপনার চলা উচিত। সেই জন্য আমি অনুরোধ করিতেছি, আপনি ফিরিয়া যান এবং আপনি যে অন্যায় করিয়াছেন, তাহা তাঁহাকে বুঝাইয়া বলুন।

লিয়র। অর্থাৎ "আমায় ক্ষমা কর" এই কথা বলিয়া তাহার কাছে দাঁড়াই!

রিগান। কিন্তু তাঁহার নিকট ফিরিয়া যাওয়াই আপনার শ্রেয়ঃ হইতেছে। আপনি তাঁহাকে যেরূপ অভিসম্পাত ও ভর্ৎসনা করিতেছেন, তাহাতে আমার প্রতিও ত ঐরূপ করিতে পারেন!

লিয়র। না রিগান, তাহা মনে করও না, তোমাকে কিছু বলিব না। তবে সেখানে আর আমি কিছুতেই যাইতেছি না! যথার্থই

সে আমার চক্ষুঃশূল হইয়াছে। যথার্থই বিষধর সর্পের ন্যায় সে আমায় দংশন করিয়াছে! পৃথিবীর সকল দুঃখ ও কষ্ট, সকল জ্বালা ও যন্ত্রণা তাহাকে ঘিরিয়া রাখে, ইহাই আমি কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি! তোমায় কিছু বলিব না। তোমার ও কোমল প্রকৃতি আমার এ শোকে সান্ত্বনা দিবে। তাহার চক্ষু অতি ভীষণ,—যেন বুকে আগুন জ্বালিয়া দেয়, কিন্তু তোমার চক্ষু স্নেহ ও করুণামাখা। তুমি অবশ্যই আমার অনুচরবর্গকে কমাইতে বলিবে না; এ চরমদশায় কোনরূপে আমায় মনস্তাপ দিবে না। তোমার লোকজন এ বৃদ্ধকে শত অপমানে জর্জ্জরিত করিবে না। তোমার কর্ত্তব্য তুমি জান। আমিও জানি, তোমার কর্ত্তব্য তুমি পালন করিবে।

কিন্তু রিগানের কর্ণে সে কথা স্থান পাইল না; দূত আসিয়া সংবাদ দিল, গনারিল সেখানে উপস্থিত হইয়াছেন। গনারিল ইতিপূর্ব্বে পরিচারকের নিকট রিগানকে যে পত্র পাঠাইয়াছিলেন, তাহাতে তাহার আসিবার কথাও ছিল।

গনারিলকে তথায় উপস্থিত হইতে দেখিয়া উন্মত্ত লিয়র অন্তর্দগ্ধ হইতে লাগিলেন। তাঁহার বুঝিতে বাকী রহিল না যে, এই পাপীয়সীই রিগানের মন ভাঙ্গিবার চেষ্টায় ফিরিতেছে। তিনি চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "পাপীয়সি, বৃদ্ধের এই শ্বেত শ্মশ্রু দেখিয়া, তোর একটু ভয় হইল না? পুনর্ব্বার তোর ঐ কালামুখ দেখাইতে লজ্জা হইল না? রিগান, তুমিও কি এই পিশাচীর হস্তধারণ করিবে?"

গনারিল। এত রাগের কারণ কি? আমি করিয়াছি কি? বুড়া, বুড়ার মত থাকিবে;—তাহার আবার এত রাগারাগি কেন?

রিগান। পিতঃ! মিথ্যা কলহে প্রয়োজন কি? এক মাস এখনও পূর্ণ হয় নাই, ভগিনীর সহিত আপনি ফিরিয়া যান;—অন্ততঃ অর্দ্ধেক লোকজন কমাইয়া দিন; তারপর এক মাস অতীত হইলে আমার এখানে আসিবেন।

লিয়র। কি, গনারিলের সহিত ফিরিয়া যাইব? পঞ্চাশ জন লোক কমাইয়া দিব? কেন, তাহার অপেক্ষা ত অরণ্য ভাল! বাঘ, ভালুক,—তাহাদিগের সাহচর্য্য ত তাহার অপেক্ষা সহস্র গুণে ভাল! না, গনারিলের সহিত ফিরিয়া যাইব না'—তাহা হইবে না। বরং সেই দাম্ভিক ফ্রান্স অধিপতি, বিনা যৌতুকে যে, সেই কন্যাটাকে লইয়াছে, বরং তাহার কাছে যাইব,—ভিক্ষাস্বরূপ তাহার সিংহাসন-তলে দাঁড়াইয়া কিছু যাচ্ঞা করিব! গনারিলের সহিত ফিরিতে হইবে?—বরং এই ভৃত্যের ভৃত্য হইয়া থাকি না কেন?

গনারিল। সে আপনার ইচ্ছা।

লিয়র। আমি কর-যোড়ে মিনতি করিতেছি, আমায় উন্মত্ত করিও না! তোমায় আমার আর কখন সাক্ষাৎ হইবে না! চিরদিনের জন্য বিদায় চাহিতেছি। তুমি আমার কন্যা, আমারই রক্ত মাংস সব;—কিংবা আমার এই দূষিত রক্তে তুমি কোন মহাব্যাধি!—কিন্তু আর আমি তোমায় কোন ভর্ৎসনা করিব না। তোমার শাস্তি আপনা হইতে হইবে। আমি নীরবে সহ্য করিব। তুমি যাও।—আমি আমার দলবল লইয়া রিগানের নিকটেই থাকিব।

কিন্তু ধূর্ত্তা রিগান স্পষ্ট ভাষেই বলিল, "তাহা হইবে না। পঞ্চাশ জন লোকেরই বা আবশ্যক কি? যখন আমার গৃহে থাকিবেন, আমার দাসদাসীতেই আপনার সেবা করিবে। আর যখন ভগিনীর আলয়ে থাকিবেন, তখন ভগিনীর পরিচারকেরাই আপনার সেবায় নিযুক্ত থাকিবে।"

তারপর কি ভাবিয়া বলিল, "ভাল, আমার এখানে যখন আসিবেন, তখন পঁচিশ জন লোক লইয়াই আসিবেন।"

লিয়র। রিগান, রিগান, তুমি এ কথা বলিলে! পঁচিশ জন লোক লইয়া তোমার এখানে আসিতে হইবে! গনারিল, বরং তোমার সহিত যাইব,—তুমি পঞ্চাশ জনকে আশ্রয় দিতে চাহিয়াছ!

গনারিল। আপনি বিশেষরূপ ভাবিয়া দেখুন, এই লোক জনের প্রয়োজন কি? এক জনকেও রাখিবার দরকার দেখি না।

লিয়র। আর কিছু বলিও না! আর কিছু শুনিব না! মহাদুঃখী লিয়র! হায়, ভিক্ষুকের ন্যায় লিয়রের জীবন! এখন কেবল সহিষ্ণুতা চাই। পিশাচীদের এই দারুণ দংশনে যেন পাগল হইয়া না যাই,—হে দেবতা! মুক্তপ্রাণে এই প্রার্থনা করি! এই বৃদ্ধ, মহাদুঃখী আমি,—বয়সের ন্যায় দুঃখের পর দুঃখ আসিয়া আমায় আক্রমণ করিতেছে। পিশাচী রমণীর অস্ত্রাঘাতে এই বৃদ্ধের দেহে যেন শোণিত না বহে। আর তোমরা,—হে সয়তান-সঙ্গিনি! ভীষণ প্রতিহিংসার আগুনে তোমাদিগকে দগ্ধ করিব কি না, তাহা এখন জানি না! কিন্তু যাহাই হউক, জগৎ তাহাতে শিক্ষালাভ করিবে। ভীতি-বিস্ফারিত-নেত্রে জগৎ তাহার প্রতি চাহিয়া থাকিবে। কাঁদিব না! কাঁদিবার কারণ আছে, কিন্তু কাঁদিব না! কাঁদিবার আগে এই দেহটা শত সহস্র ভাগে খণ্ড খণ্ড হইয়া যাইবে।—উঃ! উন্মত্ততা! হায়, বুঝি আমি পাগল হইলাম!

উন্মত্ত লিয়র সে নরকপুরী হইতে বহির্গত হইলেন।

তখন অতি ভীষণ ঝড় উঠিয়াছিল। আকাশ অন্ধকার। সমস্ত জগৎ অন্ধকারে আবৃত। বজ্রের গম্ভীর শব্দে চারিদিক প্রতিধ্বনিত হইতেছিল।

বাহ্য জগতে এই তুমুল ঝড়; লিয়রের অন্তরে ইহা অপেক্ষাও অতি ভীষণ ঝড়!

কেহ ডাকিল না, কেহ থাকিতে বলিল না!—বাহিরের তুমুল দৃশ্য, লিয়রের অন্তরের মহা প্রলয় দেখিবার জন্যই যেন লিয়রকে অহ্বান করিল! তখন সেই বাহিরের ঝড় ও ভিতরের ঝড় উভয়ে মিলিয়া মহাপ্রলয় উপস্থিত করিল। উন্মত্ত লিয়র উদ্‌ভ্রান্তচিত্তে সেই মহাপ্রলয় অহ্বানের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

সেই ভীষণ দুর্য্যোগে, সেই গভীর অন্ধকার রাত্রিতে লিয়র ঝড় ও বৃষ্টির সহিত সংগ্রাম করিবার জন্যই যেন রিগানের ভবন হইতে বাহির হইলেন! সে ভীষণ অন্ধকারে, সে প্রবল ঝড় বৃষ্টিতে তাঁহার ভ্রূক্ষেপ নাই। প্রান্তরের ন্যায় তৃণশূন্য ভূমি, সেই ভীষণ রাত্রিতে অতি ভীষণ প্রতীয়মান হইতেছিল। কিন্তু কন্যাগণের পৈশাচিক ব্যবহারে,—যে মনস্তাপে উন্মত্ত লিয়রের মর্ম্মদাহ হইতেছিল, লিয়র বুঝিয়াছিলেন, এই ভীষণ দুর্য্যোগ রজনী তদপেক্ষা ভীষণ হইবে না!

অনেক দূর অতিক্রম করিয়া লিয়র অবশেষে এমন এক স্থানে উপস্থিত হইলেন, যেখানে ঝড় ও বৃষ্টি হইতে আপনাকে কিছুতেই নিরাপদ করা যায় না। প্রবল বাতাস, অবিশ্রান্ত বারিধারা, সেই বৃদ্ধের মস্তকের উপর দিয়া বহিয়া চলিল। লিয়র আশ্চর্য্য সহিষ্ণুতার সহিত সকলই উপেক্ষা করিলেন। মেঘের সে ভয়ানক গর্জ্জন, মুহুর্মুহু বিদ্যুতের সেই ভয়াবহ দ্যুতি তাঁহাকে ভীত করিতে পারিল না। তাঁহার মনে জাগিতেছিল,—সয়তানী পিশাচী কন্যাগণের সেই নির্ম্মম অকৃতজ্ঞ ব্যবহার! তাহার তুলনায় কি ছার বাহিরের এ মহা ঝড়,—ঝড়ের সহিত জীবনের এ মহা সংগ্রাম!

এই অবস্থায় পড়িয়া উন্মত্ত লিয়র আবেগ-

ভরে কহিতে লাগিলেন, "হে বাতাস, আরও প্রবলবেগে বহিতে থাক,—সমুদ্র গর্জ্জিয়া উঠুক, —পাপের ধরা তন্মধ্যে ডুবিয়া যাক্! জগতের বুকে মানবের অস্তিত্ব যেন বিলুপ্ত হয়! হে ঝড়, হে বৃষ্টি, আরও বহিতে থাক,—মনের সাধে তোমাদের পূর্ণ ক্ষমতা প্রকাশ কর! তোমরা আমার কেহ নও,—আমার কন্যাও নও,—তোমাদিগকে আমি অকৃতজ্ঞ বলিব না! জীবনের অন্তিম সোপানে দাঁড়াইয়া,—বৃদ্ধ জীর্ণ ঘৃণিত দূরীকৃত হতভাগ্য এই আমি,—যাও, মাথার উপর দিয়া প্রবলবেগে বহিয়া যাও! না, আর কিছু না, আর কিছুই না,—নীরবে সকলই সহ্য করিব!"

এই অবস্থায়ও, লিয়রের সহিত তাঁহার সেই ভাঁড়, সেইরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইতেছিল। সেও লিয়রের অনুসরণ করিয়াছিল। এইরূপ দুর্দ্দশায় পড়িয়াও সে, তাহার সেই স্বাভাবিক রসিকতা ছাড়িল না। লিয়রের অরুন্তুদ ক্রন্দনে সে বলিল, "মহারাজ, একে এই ভয়ঙ্কর রাত্রি, তার উপর এই দুর্য্যোগ, খামকা কেন কষ্ট পাই? চলুন, আপনার কন্যাগণের নিকট আশ্রয়ভিক্ষা করি।—আর বিলাপে প্রয়োজন কি?"

লিয়র এ সময় ভয়ঙ্কর উন্মত্ত,—কোন উত্তর করিলেন না।

এদিকে, পরম প্রভুভক্ত কেণ্ট, সেই অবস্থায়ও লিয়রকে খুঁজিতে বাহির হইয়াছিলেন। খুঁজিতে খুঁজিতে তিনি প্রভুর উদ্দেশ পাইলেন। বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, "প্রভু! মহারাজ! আপনি এখানে! যে নিশাচর জন্তু রজনীর অন্ধকার ভালবাসে, এই রাত্রি তাহার পক্ষেও ভয়াবহ! এই তুমুল ঝড়ে, আরণ্য জন্তুগণও তাহাদিগের গহ্বরে লুকাইয়াছে! ওঃ! মনুষ্যে এ কষ্ট সহিতে পারে না!"

লিয়র তখনও পর্য্যন্ত সেই ঝড় ও বৃষ্টিকে সম্বোধন করিয়া প্রাণের আবেগে উন্মত্ততা ব্যক্ত করিতেছিলেন। তিনি বলিলেন, "কষ্ট কি! যাহার বুকের ভিতর মহাপ্রলয়, এই ঝড় বৃষ্টি তাহার কাছে কি! মন যখন চিন্তাহীন হইয়া থাকে, দেহ তখন অতি অল্প ক্লেশেও ব্যথা অনুভব করে। আমার মনে এখন যে দুঃখ, যে চিন্তায় এখন আমি তন্ময়প্রায়, এই ঝড় বৃষ্টির সহস্র গুণ অধিক কোন বিপদেও এখন আমি বিচলিত হইব না! আর সব গিয়াছে, হৃদয়ে কেবল একই কথা জাগিতেছে! এই হাত, মুখে আহার তুলিয়া দিতেছে,—মুখ, দন্তাঘাতে হাত ক্ষতবিক্ষত করিয়া দিল,—ভাব দেখি, ইহার বাড়া আর কি দুঃখ আছে!"

কেণ্ট্ কত বুঝাইলেন, লিয়র তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না। নিকটে একটা অতি সামান্য পর্ণকুটীর ছিল, শেষে কেণ্ট্ তন্মধ্যে আশ্রয় লইবার জন্য প্রভুকে বারবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন;—"মহারাজ, আপনি ইহার মধ্যে আসুন।"

লিয়র। না, আমায় একাকী থাকিতে দাও।

কেণ্ট্। ইহার মধ্যে আসিয়া অগ্রে আপনাকে রক্ষা করুন!

লিয়র। তুমি কি আমার বুক ভাঙ্গিয়া দিতে চাও?

কেণ্ট্। প্রভু, বরং আমারই বুকটা সহস্র খণ্ডে ভাঙ্গিয়া ফেলিব,—আপনি এই কুটীরে আসুন!

লিয়র। ও-হো-হো! কি ভয়ানক! এই ভীষণ রাত্রি! গনারিল্, রিগান্, পিশাচী তোরা,—বৃদ্ধ লিয়রের আজ কি দশা করিয়াছিস্, দেখ! না, থাক্, আর সে কথায় কাজ নাই। ঐ কথা মনে পড়িলেই বুকটা কেমন করিয়া উঠে! মনে হয়, যেন আমি পাগল হইয়াছি!

উদ্‌ভ্রান্ত লিয়র।



কেণ্ট্। মহারাজ, ভিতরে আসুন।

লিয়রের অনুচর সেই ভাঁড় সর্ব্বাগ্রে সেই কুটীরে প্রবেশ করিল। কিন্তু সহসা ভীত হইয়া বাহিরে আসিল। সে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "মহারাজ, সাবধান, সাবধান, এখানে আসিবেন না,—একটা ভূত!!"

ভূতের অনুসন্ধানে জানা গেল, ভূত একটা পাগল! সে হতভাগ্য বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে সেখানে আশ্রয় লইয়াছে। লিয়র সেই পাগলের প্রতি চাহিয়া চাহিয়া, তাহার দুর্দ্দশা দেখিয়া বলিতে লাগিলেন, "নিশ্চয়ই এ ব্যক্তি ইহার কন্যাগণকে সর্ব্বস্ব দিয়া এমন পথের-কাঙাল হইয়াছে! (পাগলের প্রতি) তুমি কি কিছুই রাখিতে পার নাই?—আমারই মত সর্ব্বস্ব খোওয়াইয়াছে?

ভাঁড়। সব খোওয়ায় নাই, মহারাজ! ঐ যে কোমরে এক টুক্‌রা কম্বল জড়ানো আছে!—ও, ওটুকুও রাখিয়াছে!

লিয়র। আমার কন্যাগণের ন্যায় তোমারও কন্যাগণের মস্তকে বজ্রপাত হউক!

কেণ্ট্। মহারাজ, ইহার ত কন্যা নাই!

লিয়র। নিশ্চয়ই আছে! অকৃতজ্ঞ, পিশাচী কন্যা ব্যতীত, পিতার এমন দুর্দ্দশা আর কে করিতে পারে?

পাগল। কি মজা! কি মজা!

ভাঁড়। মজার রাত্রি বটে!—আমাদের সকলকেই দেখিতেছি, পাগল বানাইয়া দেয়! কি গ্রহ!

ঝড় ও বৃষ্টি তখনও তুমুলবেগে বহিতেছিল। কেণ্টের বুঝিতে বাকী রহিল না যে, লিয়র উন্মাদ রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন। এমন সদাশয় পিতাকে এইরূপ দুর্দ্দশায় আনিয়া সয়তানী কন্যাদ্বয় কি ভীষণ মহাপাপ করিয়াছে, তাহা ভাবিয়া তিনি ব্যথিত হইলেন। প্রভুর জন্য কেণ্টের হৃদয়ে বড়ই দুঃখ বাজিল, তিনি অনেক ভাবিতে লাগিলেন। তখন উন্মত্ত

লিয়র ঘোর উন্মত্ততায় সম্পূর্ণ জ্ঞানশূন্য হইয়া আপনার বসন পর্য্যন্ত ছিন্ন করিতে লাগিলেন!

কেণ্ট, প্রভুর দুর্দ্দশায় ব্যথিত হইয়া, যাহাতে তিনি প্রকৃতিস্থ হইতে পারেন, সেই উপায় অবলম্বন করিলেন। পরদিন প্রাতে কোন প্রকারে বুঝাইয়া লিয়রকে ডোভার দুর্গে আনয়ন করিলেন। কেণ্টের সেই স্থানে যথেষ্ট ক্ষমতা ছিল। তাঁহার অনুচরেরা তাঁহার আদেশমত লিয়রের সেবা-শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইল। তিনি লিয়রকে যথাযোগ্য সম্মানের সহিত রাখিয়া দিয়া ডোভার হইতে প্রস্থান করিলেন।

---

(৯)

কেণ্ট্ ফ্রান্সদেশে যাত্রা করিলেন।

লিয়রের কনিষ্ঠা কন্যা কর্ডিলিয়া এখন ফ্রান্স-দেশের মহারাণী। কেণ্ট্ ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তিনি কর্ডিলিয়ার সাক্ষাতে তাঁহার পিতার দারুণ দুর্দ্দশার কথা একে একে সমস্তই বর্ণনা করিলেন। গনারিল্ ও রিগানের সেই পৈশাচিক ব্যবহারের কথাও আনুপূর্ব্বিক বলিলেন। সে কথার প্রতি অক্ষরে, প্রভুভক্ত কেণ্টের স্নেহপ্রবণ হৃদয় পরিবক্ত হইতেছিল। সে দুঃখের কথা বর্ণনা করিতে করিতে মর্ম্মস্থল হইতে শোণিত বহিয়া অশ্রুরূপে নয়নে প্রকটিত হইতেছিল! সে ডাকিনী রাজকন্যাদ্বয়ের পৈশাচিক ব্যবহারের উল্লেখ করিতে করিতে তাঁহার দেহ কম্পিত হইতেছিল। সরলা কর্ডিলিয়া, চিরভক্ত, স্নেহার্দ্র-হৃদয় ও একান্ত সুহৃৎ কেণ্টের সেই মূর্ত্তি ও তাঁহার মুখের সেই কথা শুনিয়া সকলই বিশ্বাস করিলেন। তাঁহার হৃদয় অতিশয় ব্যথিত হইল। তিনি যেন চক্ষের সমক্ষে, বৃদ্ধ পিতার সেই চরম দুর্দ্দশা প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন। তাঁহার বোধ হইল, যেন ভীষণ অন্ধকার রাত্রিতে অতি ভীষণ ঝড় উঠিয়াছে, ঝড়ের সহিত প্রবল বারি-বর্ষণ হইতেছে, মুহুর্মুহু বজ্রপাতে চারিদিক কম্পিত হইতেছে, অনাবৃত দেহে ও অনাবৃত মস্তকে তাঁহার পিতা—মহারাজ লিয়র অতি দীন হীন কাঙ্গালের অধম হইয়া সেই অনাবৃত প্রান্তরে উন্মত্তবেশে ছুটিতেছেন! আর ডাকিনী ভগিনীদ্বয় উচ্চ হাস্য করিতে করিতে পিতৃদত্ত বিলাসিতাপূর্ণ প্রাসাদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া মহোল্লাসে ব্যস্ত রহিয়াছে! স্নেহের প্রতিমা কর্ডিলিয়া বৃদ্ধ পিতার সেই দুর্দ্দশা ভাবিয়া আকুল-ক্রন্দনে বুক ভাসাইতে লাগিলেন। তারপর সেই অশ্রুপূর্ণ লোচনে, করযোড়ে তাঁহার স্বামীর নিকট গিয়া বিস্তারিত বিবরণ জ্ঞাপন করিয়া প্রার্থনা করিলেন, "প্রভু, আমায় অনুমতি দাও, আমি সৈন্য-সাহায্যে ইহার প্রতিকার করি! পিতার এ দুর্গতি আমি আর শুনিতে পারিব না। পিতার রাজ্য পিতাকে দিয়া, তাঁহার সিংহাসনে তাঁহাকে বসাইয়া, ডাকিনী ভগিনীদ্বয়কে যথোচিত শাস্তি দিব;—তুমি আমায় এই অনুমতি দাও।"

ফ্রান্স-অধিপতি পত্নীর প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন!—কর্ডিলিয়া সৈন্য সামন্ত লইয়া ডোভার দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, লিয়র সেই দুর্গেই ছিলেন। কেণ্ট সেই দুর্গে তাঁহাকে রাখিয়া গিয়াছিলেন। অনেক লোক জন তাঁহার সেবায় নিযুক্ত হইয়াছিল। কিন্তু একদিন সহসা সকলকে ফাঁকি দিয়া লিয়র কোথায় পলাইয়াছিলেন। কর্ডিলিয়া চারিদিকে আপন অনুচর-গণকে পাঠাইলেন। একদিন তাহারা এক দুর্গমস্থানে তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিল,—লিয়র তখন আরও উন্মত্ত। অনুচরগণ দেখিল, কখন তৃণে তৃণে রাজমুকুট গাঁথিয়া লিয়র মাথায় পরিতেছেন! লতাতন্তু সংগ্রহ করিয়া তাহাতে রাজবেশ নির্ম্মাণপূর্ব্বক অঙ্গে পরিতেছেন!

আর মনের আনন্দে আপনার মনে উচ্চৈঃস্বরে গীত গাহিয়া বেড়াইতেছেন! তাহারা লিয়রকে কোনও মতে দুর্গে আনিল। পিতার সেই শোচনীয় অবস্থার কথা শুনিয়া কর্ডিলিয়ার চক্ষে অবিশ্রান্ত জলধারা বহিতে লাগিল। সুদক্ষ চিকিৎসক আনাইয়া কর্ডিলিয়া পিতাকে দেখাইতে লাগিলেন;—বড় সাধ, পিতার সহিত দেখা করিয়া তাঁহার চরণ সেবা করেন, কিন্তু চিকিৎসক নিষেধ করিল। বলিল, "এখন দেখা করিলে হিতে বিপরীত ঘটিতে পারে।" কাজেই কর্ডিলিয়া আপাততঃ পিতার সহিত দেখা করিলেন না, চিকিৎসকদিগকে বলিয়া দিলেন, "তোমরা আমার পিতাকে ভাল করিয়া দাও; তোমাদিগকে প্রচুর অর্থ পুরস্কার দিব।"

চিকিৎসকগণ তাঁহাকে আশা দিলেন, বলিলেন, "রীতিমত বিশ্রাম এবং নিদ্রা—এই রোগ উপশমের প্রধান উপায়। যে পর্য্যন্ত না ইহাঁকে কিছু আরোগ্য করিতে পারিতেছি, আপনি ইহাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিবেন না।"

তাহাই হইল। তারপর, যখন চিকিৎসা-গুণে লিয়র স্বাভাবিক অবস্থা পাইতে লাগিলেন, অল্পে অল্পে তাঁহার স্মৃতিপথে পূর্ব্বকাহিনী জাগিতে লাগিল। যখন লিয়র ও কর্ডিলিয়ার পরস্পরের সাক্ষাৎ হইল,—সে কি অপূর্ব্ব দৃশ্য! কর্ডিলিয়া চক্ষের জলে বুক ভাসাই-তেছেন, আর স্নেহপ্রবণ হৃদয়ে বার বার পিতাকে সাদর সম্ভাষণ করিতেছেন,—লিয়র সহসা কিছু বুঝিতে পারিলেন না। সকলই তাঁহার স্বপ্নবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল। তাঁহার বোধ হইল, কর্ডিলিয়া বুঝি কোন দেবী,—তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া তাঁহায় দুঃখে কাঁদিতেছেন! সে দেবীর সে মধুর আকৃতি, সে পবিত্র মুখমণ্ডল, কর্ডিলিয়ারই অনুরূপ!—একি তবে কর্ডিলিয়া? "কর্ডিলিয়া, কর্ডিলিয়া" বলিয়া ডাকিতে লিয়রের সাধ হইতেছে, কিন্তু ভয়, পাছে আর কেহ উপহাস করে। কর্ডিলিয়া পিতার চরণে প্রণতা,—লিয়র চিনিয়াও চিনিতে পারিতেছেন না!

তিনি ক্রমশঃ বুঝিলেন, এই রমণী স্বর্গের দেবী নহেন,—মরুভূমে ওয়েসিসের ন্যায় কঠিন ধরাবুকে মূর্ত্তিমতী দেবী-প্রতিমা,—তাঁহার সেই পরিত্যক্তা ও উপেক্ষিতা কন্যা কর্ডিলিয়া! লিয়র আপনার পূর্ব্বঅপরাধ স্মরণ করিয়া ক্ষমাপ্রার্থনা করিবার জন্য দাঁড়াইলেন। কর্ডিলিয়া পিতার চরণে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "পিতঃ! আমি যে আপনার স্নেহের তনয়া,—সেই কর্ডিলিয়া! আমি আপনার চরণে প্রণাম করিতেছি! নিষ্ঠুর ভগিনীগণের শত অপরাধ, আপনাকে ভক্তিসম্ভাষণ করিয়া, সকলই আমি ভুলাইয়া দিতেছি। আহা, তাহারা কি নিষ্ঠুর! আপনার এই জীর্ণ দেহ, এই বৃদ্ধ বয়স, ইহা তাহারা কিছুই দেখিল না! সেই ভীষণ দুর্য্যোগেও বাটীর বাহির করিয়া দিতে পারিয়াছিল! তখন যদি শত্রুর কুকুর আসিয়াও দংশন করে, তবুও লোকে সেই কুকুরকে আশ্রয় দেয়!"

তারপর, ধীরে ধীরে যখন সকল কথা লিয়রের মনে পড়িতে লাগিল, তাঁহার স্মরণ হইল, তিনি অন্য দুই কন্যাকে সর্ব্বস্ব দিয়া এই নিরপরাধা সরলাকে সকল প্রকারে বঞ্চিত করিয়াছেন! অনুতাপে দগ্ধ হইয়া তিনি বলিলেন, "তাহাদিগকে সর্ব্বস্ব দিয়াছি, তথাপি তাহাদিগের এই ব্যবহার,—আর কর্ডিলিয়া, তোমায় ত আমি কিছুই দিই নাই,—তুমি এমন সদয় ব্যবহার করিতেছ কেন? তুমি তাদের অপেক্ষাও কঠিন দণ্ড দিতে পার!

কর্ডিলিয়া। না বাবা, অমন কথা বলি-বেন না!

লিয়র। আমি কোথায়?—ফ্রান্সে?

কর্ডিলিয়া। না বাবা, আপনি আপনারই রাজ্যে।

লিয়র। আমায় মিথ্যা বলিও না।

কর্ডিলিয়া। মিথ্যা বলি নাই,—আমি সসৈন্যে ডোভারে আসিয়াছি,—আপনার রাজ্য আপনাকেই দিয়া যাইব।

স্নেহময়ী কন্যার অপার স্নেহে ও সুদক্ষ চিকিৎসকগণের চিকিৎসাগুণে লিয়র অল্পে অল্পে আরোগ্যলাভ করিতে লাগিলেন। তাঁহার চিত্তবিকার দূরীভূত হইতে লাগিল।

---

(১০)

এদিকে কর্ডিলিয়া-আনীত সেই ফ্রান্স-সৈন্যের সহিত গনারিল ও রিগানের সৈন্য-দলের সংগ্রাম বাধিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ, তাহাতে কর্ডিলিয়ার সৈন্যদলই পরাজিত হইল। শেষে, বিজেতা শত্রুদিগের হস্তে লিয়রের সহিত কর্ডিলিয়া বন্দিনী হইলেন। গনারিল ও রিগানের সৈন্য-পক্ষের অধিনায়ক ছিল, ডিউক অব গ্লষ্টর। তাহার কথা পরে বলিব।

শত্রুহস্তে পড়িয়া কর্ডিলিয়া পিতাকে বলিলেন, "আমি ত এখন বন্দিনী। ভাল করিতে আসিয়া মন্দ করিলাম। এখন আমি কি একবার ভগিনীদিগকে দেখিব না?"

লিয়র। না, না, না! চল মা, দুই জনে কারারুদ্ধ হই! পিঞ্জরে বিহঙ্গের ন্যায় দুইজনে সেখানে গান করিব। তুমি আমার আশীর্ব্বাদ চাহিবে, আর আমি নতজানু হইয়া তোমার নিকট ক্ষমা চাহিব! প্রার্থনা করিব, গান গাহিব, কত গল্প করিব। রাজার কথা, রাজ্যের সংবাদ, যুদ্ধের খবর, লোকে কত কথাই বলিবে, তাহাই শুনিব।—কে হারিল, কে জিতিল, বন্দী থাকিয়াও তাহা জানিব।—জগতে প্রতিনিয়ত কি রহস্যের ব্যাপার চলিতেছে,—জগতে না মিশিয়াও তাহাই দেখিব!

যথাসময়ে উভয়ে কারারুদ্ধ হইলেন।

এখন সেই দুই পাপিষ্ঠা ভগিনীর কথা কিছু বলিব। পিশাচী গনারিল ও রিগান পিতার প্রতি যে ব্যবহার করিয়াছে, তাহা হইতে বুঝা যায় যে, প্রকৃতিগত কি একটা মহাপাপ লইয়া তাহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। স্বামীকে লইয়া যে তাহারা সুখে জীবনাতিবাহিত করিবে, তাহারও সম্ভাবনা ছিল না। এতদিনে, তাহাও কার্য্যে পরিণত হইল। দুই ভগিনী অল্প দিনে পরস্পরের স্বামীর প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিতে লাগিল। এবং আশ্চর্য্য এই যে, উভয়ে একই ব্যক্তির উপর অবৈধ-প্রণয় সংস্থাপিত করিল। সে ব্যক্তি এক মহাপাপী;—তাহার পিতার যথার্থ উত্তরাধিকারীকে সর্ব্বস্ব হইতে বঞ্চিত করিয়া আপনি সকল বিষয়বিভবের অধিকার লইয়া ডিউক অব্ গ্লষ্টর উপাধি গ্রহণ করিল। যোগ্য ব্যক্তির সহিত যোগ্য ব্যক্তিরই প্রেমের বিনিময় হইয়া থাকে। এদিকে অল্পদিনে ডিউক অব্ কর্ণওয়াল মরিয়া গেলে,—পাপিষ্ঠা রিগান নিষ্কণ্টকে আপন অন্তরের পাপ-বাসনা চরিতার্থ করিল; অর্থাৎ ঐ নীচাশয় ব্যক্তির উপপত্নী হইল। ইহাতে সেই জ্যেষ্ঠা ভগিনী পাপীয়সী গনারিল হিংসায় জর্জ্জরিত হইয়া আপনার পথ পরিষ্কার করিবার জন্য ভগিনী রিগানকে বিষ প্রয়োগে ইহসংসার হইতে সরাইয়া দিল। গনারিলের স্বামী, দুশ্চরিত্রা স্ত্রীর এইরূপ আচরণ অবগত হইয়া তাহাকে কারারুদ্ধ করিলেন। পাপীয়সী গনারিল মনস্কামনা পূর্ণ হইবার পথে পুনরায় বাধা পড়িল দেখিয়া আত্মহত্যা করিল।

এইরূপেই প্রকৃতির প্রতিবিধান বা বিধাতার অপূর্ব্ব বিধান প্রকটিত হইল।

লোক সাধারণ সয়তানীর এইরূপ পরিণাম দেখিয়া মহা আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। কিন্তু তাহাদের সেই আনন্দের সহিত একটা

লিয়রের পরিণাম।



বড় বিষাদের ঘন মেঘ আসিয়া মিশিল। হাসির উৎস সহসা কোথায় অন্তর্হিত হইল!

গনারিল, ডিউক অব্ গ্লষ্টরের প্রতি যে অবৈধ প্রণয় সংস্থাপিত করিয়াছিল, তাহার ফলে উভয়ের পরামর্শমত পাপিষ্ঠ গ্লষ্টর কর্ডিলিয়াকে কারাগারে হত্যা করিবার জন্য গোপনে আদেশ দিয়াছিল। হায়, যথা সময়ে পাপিষ্ঠের পাপ-আজ্ঞা সম্পন্ন হইল।—স্বর্গের পারিজাত অকালে শুকাইল!!

লোকসাধারণ বিধাতার বিচারের এই রহস্য বুঝিতে না পারিয়া মনে করিল, বুঝি সরলতা ও পুণ্য স্বভাব, সর্ব্বদা সর্ব্বকালে এ জগতে অক্ষুণ্ণ থাকিয়া চিরজয়ী হইতে পারে না! কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা যে কি, তাহা মূঢ় মানুষ কি বুঝিবে?

দুর্ভাগ্য লিয়র মৃত কন্যার সেই স্নেহময়ী মূর্ত্তি বুকে করিয়া নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিলেন! চাহিয়া চাহিয়া আত্মহারা হইলেন! কর্ডিলিয়া যে মরিয়াছে, ইহা বুঝি তাঁহার বিশ্বাস হইল না! লিয়র আবার ঘোরতর উন্মত্ত হইলেন। সেই উন্মত্তাবস্থায় সেই স্নেহের পুত্তলিকে ক্রোড়ে টানিয়া বলিতে লাগিলেন,—"ওহো! কি ভয়ানক! ডাক্ তোরা,—চীৎকার কর্! পাষাণে গঠিত তোদের এ দেহ;—দেখ্, যদি তোদের ন্যায় জিহ্বা আমার থাকিত, চীৎকারে আমি স্বর্গ পর্য্যন্ত বিদীর্ণ করিতাম! সে গিয়াছে!—ওঃ! জন্মের মত আমার কর্ডিলিয়া গিয়াছে! হায়, আমি জানি, সে গিয়াছে!! এক খণ্ড স্বচ্ছ দর্পণ আনিয়া দে,—আমি একবার দেখি, আমার এ সোণার প্রতিমার নিশ্বাসের একটু দাগ তাহাতে ধরে কিনা! ওহো! এ ত মরে নাই!"

সমবেত দর্শকমণ্ডলী বিস্ময়বিস্ফারিত-নেত্রে সেই অতি শোচনীয়—অতি মর্ম্মান্তিক করুণ দৃশ্য দেখিতে ছিল। সে দৃশ্যে কাহারও চক্ষে এক বিন্দু অশ্রু বহিতে ছিল না। চিত্রার্পিত স্থিরনেত্রে অবাক্ হইয়া সকলে তাহা দেখিতে ছিল। হায়, সে দৃশ্য ক্রন্দনের অতীত!

স্নেহের ধন, নয়নপুত্তলি, বৃদ্ধের একমাত্র

অবলম্বন যে, চিরদিনের জন্য এ জগৎ ছাড়িয়া যাইতেছে, এ কথা অতি কষ্টেও লিয়র বিশ্বাস করিতে পারিতেছেন না। উদ্‌ভ্রান্ত লিয়রের চক্ষে ভ্রম হইতে লাগিল,—এই বুঝি কর্ডিলিয়ার ওষ্ঠখানি একটু কাঁপিল; এই বুঝি সে তাহার বসনাগ্রভাগ একটু টানিল;—কিন্তু হায়, সে সকলই নিদারুণ ভ্রম! লিয়র আবার চীৎকার করিয়া উঠিলেন,—"কর্ডিলিয়া! কর্ডিলিয়া! মা আমার! একবার উঠ! কি বলিতেছ মা, ভাল করিয়া বল! আ-হা-হা, কণ্ঠস্বর কি মধুর! এমন মেয়ে কি জগতে আছে? মা আমার! তোমায় যে ফাঁসে ঝুলাইয়াছে, আমিও তাহাকে মারিয়াছি!"

বস্তুতঃ, বিচারে পাপিষ্ঠ গ্লষ্টরের প্রাণদণ্ড হইয়াছিল।

এইবার সেই পরম প্রভুভক্ত, চিরবিশ্বাসী কেণ্ট আত্মপ্রকাশ জন্য, ছদ্মবেশ ত্যাগ করিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। লিয়র কিছুক্ষণ ফ্যাল ফ্যাল করিয়া কেণ্টের পানে চাহিয়া রহিলেন। চাহিয়া চাহিয়া বলিলেন, "তুমি কি কেণ্ট?

কেণ্ট কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক নতজানু হইয়া বলিলেন, "আমি আপনার সেবক,—সেই চির ভৃত্য আর্ল অব্ কেণ্ট। আমি ছদ্মবেশে কায়াস্-নামে অভিহিত হইয়া প্রভুর সেবায় জীবন কৃতার্থ করিয়াছি!"

কিন্তু বিষম চিত্তবিকারে লিয়র সে কথা পরিষ্কাররূপে বুঝিতে বা ধারণা করিতে পারিলেন না। নিদারুণ শোক, তাঁহার হৃদয়মূল উৎপাটিত করিল। ধীরে ধীরে দেহভার ভূমিতে অবনত হইয়া পড়িল। উপস্থিত দর্শকবৃন্দ অতি কাতর-নয়নে দেখিল, দারুণ শোক, দুঃখ ও মনস্তাপে লিয়রের মহা দুঃখপূর্ণ জীবনের অবসান হইয়াছে!

শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত।

সমর্পণ।

দেবি!
আসিয়াছি পূজিবার আশে।—
আন্দোলিত বিক্ষোভিত প্রাণ মোর উচ্ছ্বসিত,
শান্ত হ'বে তোমার পরশে।
হের এ নয়নে ভরা, পবিত্র জাহ্নবীধারা,
ধৌত যাহে হৃদয়-শ্মশান;
এস এ হৃদয়' পরে, এ আসন তব তরে,
এস, চির প্রফুল্ল-বয়ান!
রাজরাজেশ্বরী-বেশে, এস দেবি! মৃদু হেসে,
বুকে রাখ রাঙ্গা ও চরণ,
ক্ষুধা তৃষ্ণা দূরে রাখি, ভোর হ'য়ে ব'সে থাকি,
ধ্যান-মগ্ন,—না চাহি চেতন!
যদি বা তোমার ধ্যানে, যদি বা তোমার গানে,
শত জন্ম পলকে পলায়,
যদি বা প্রলয়ে ধরা, চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা,
চিরতরে শূন্যেতে মিলায়;—
আমি না সে ডর মানি, অক্ষয় অমর আমি,
লভিয়াছি অমৃত-আস্বাদ;
ও মধুর বীণাতানে, যে সুর বাজিবে প্রাণে,
শান্ত হবে পরাণ উন্মাদ!

দেবি! পুরাতে হইবে আশ।—
ও চরণ-পরশনে, প্রেমমূর্ত্তি-দরশনে,
জুড়াইব হৃদয়-হুতাশ!
সিন্ধুর উচ্ছ্বাস বুকে, ভরা মনের সুখে,
চাহি আজ পূজিতে চরণ;
একান্ত কঠিন রণ, পরাজয় আজীবন,
বেঁচে আছি—এ যে গো মরণ!
আশার উল্লাসে তাই, তোমাতে মিশাতে চাই,
অতি ক্ষুদ্র যা' আছে আমার;
অনন্ত সমুদ্রবুকে, ক্ষুদ্র নদ মহাসুখে,
সমর্পিবে সর্ব্বস্ব তাহার!

মজি ও মধুর গানে, চাহিয়া চরণ পানে,
ভুলে থাকি নিখিল সংসার;
ও প্রতিমা বুকে ধরি, ঐ রূপ-ধ্যানে ভরি,
পান করি অমিয় অপার!
নিমেষ-নিহত আঁখি, নিয়ত চাহিয়া থাকি,
আত্ম-হারা, তোমা নিরখিয়া!
লহ গো চরণতলে, ধৌত হৃদি আঁখি জলে,
শান্ত হো'ক্ উদ্বেলিত হিয়া!

শ্রীবিপিনবিহারী রক্ষিত।

অকবর ও জহাঙ্গীরের হিন্দুপত্নী(১)

মোগল সম্রাট্‌গণের মধ্যে অকবরই (২) প্রথমে হিন্দু রমণীকে পত্নীত্বে গ্রহণ করেন। তাই বলিয়া তাঁহার যে যবনী প্রণয়িনী ছিল না, এমন নহে। তদীয় নন্দন সেলিম (জহাঙ্গীর) পিতৃ-দৃষ্টান্তে হিন্দু ও যবনী কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। পিতা-পুত্রের এই কীর্ত্তি কথায়, কাহারই কোন সন্দেহ নাই। যেহেতু উহা ঐতিহাসিক তত্ত্ব। তবে তাঁহাদের উভয়েরই হিন্দু প্রেয়সীর নাম লইয়া গোলযোগ হইতেছে!

১। অকবর-নামা পুস্তকে এ বিষয়ে বিস্তর গোলযোগ।

২। কেহ কেহ বলেন, অকবরের হিন্দু প্রিয়তমার নাম যোধবাই। টড্ সাহেব প্রভৃতি এই মতাবলম্বী।(৩)

৩। যোধবাই, জহাঙ্গীরের মহিষী। ব্লক্‌মান্ সাহেব প্রথমে এই মত-প্রচারক ছিলেন না। শেষে কিন্তু এই মত অবলম্বন করিয়াছিলেন।

৪। অন্যমতেও জহাঙ্গীরের প্রিয়তমার নাম যোধবাই। বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের এই মত ছিল। তিনি স্বরচিত "রাজসিংহে" ইহার নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন।

৫। অনেকের আবার ধারণা—যোধবাই প্রকৃত নাম নয়। যোধপুরীয় কামিনীর উহা সাধারণ সংজ্ঞা। ব্লক্‌মান্ সাহেব, সঙ্কেতে এই মত-বিষয়ে ইঙ্গিত করিয়া যান। বিভারিজ সাহেব ঐ মতকে সিদ্ধান্তে পরিণত করিয়াছেন। তাঁহার মতে যোধবাই কোন নির্দ্দিষ্ট নারীর নাম নয়। যোধপুরীয় কামিনী-মাত্রেই ঐ সংজ্ঞার অধিকারিণী।

৬। কাহার কাহার মতে উভয়েরই নাম যোধবাই। শ্রীমান্ হরিসাধন মুখোপাধ্যায় এই মতপ্রচারক। (৪)

প্রথমেই নাম লইয়া বিশৃঙ্খলা। তৎপরে অপর গোলযোগেরও অসদ্ভাব নাই। উক্ত রাজ্ঞীদের পিতামাতার নাম প্রভৃতি বংশ-পরিচয় লইয়াও বিস্তর গোলযোগ ঘটিয়াছে।

প্রথমেই অকবরের সকল পত্নীর প্রসঙ্গ আলোচনা করিতেছি। শেষে জহাঙ্গীরের পত্নীগণের বিষয় বিবৃত হইবে।

(১) ঐতিহাসিক প্রবন্ধের অনুশীলনে উদারতা ও কর্ত্তব্য জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া, এ দেশে সুদুর্লভ। হিন্দু ও হেয়ার স্কুলের ভূতপূর্ব্ব প্রধান শিক্ষক মাননীয় শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণচন্দ্র রায় মহাশয়, স্বপ্রণীত "ভারতবর্ষের ইচ্ছিহাসে" সম্প্রতি যে সকল নূতন বিষয় সংযোজিত করিতেছেন, তাহাতে তিনি "জন্মভূমির" 'ঐতিহাসিক বিশৃঙ্খলা' 'হুয়েন্‌সাঙ্' প্রভৃতি প্রবন্ধকে উপেক্ষা করেন নাই,—ইহা তাঁহার মত বিজ্ঞ ব্যক্তির উপযুক্তই হইয়াছে।

(২) রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রজ ডি, এল্ মহোদয়, বাবু ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী এম,এ মহাশয়কে ইতিহাস-বিষয়ে যে পত্র লেখেন, তদনুসারে এই প্রস্তাবে মুসলমান সম্রাটের নামের বর্ণ যোজনা লিখিত হইল। সং-সম্পাদিত "অনুশীলন ও পুরোহিত" পত্রিকার ২য় ভাগ, ৪র্থ সংখ্যায় "ঐতিহাসিক পরিভাষা ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

(৩) অকবর আর এক হিন্দু কামিনীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই রমণী, যশলমীরের রাজকুমারী।

(৪) ভারতী, ১৩০১ সাল, পৌষ, ৫২৫।৫২৬ পৃষ্ঠা।

(ক) অকবর একটী হিন্দু রমণীর পাণি-গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ কথা। তাঁহার চতুর্থী ভার্য্যার বৃত্তান্ত যখন অনুশীলন করিব, সে বিষয়ের তত্ত্বকথা তখনই পাঠকেরা জ্ঞাত হইবেন।

(খ) ঐতিহাসিকের অনুসন্ধিৎসাগুণে ইহার উপর সূক্ষ্ম সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। অকবর রাঠৌরবংশীয় মারওয়ার রাজ্যান্তর্গত জয়পুররাজ বিহারী মল্লের জামাতা হইয়াছিলেন।

(গ) বিহারী মল্লের যে কন্যা, অকবরের মহিষী হন, সেই কামিনীর কি নাম, ইহাই এইবার বিবেচ্য।

১। এ সম্বন্ধে প্রথমে টড্ সাহেব, রাজস্থানে লেখেন। অম্বররাজ বিহারী মল্লের কন্যা, অকবর-রাজ্ঞী, এই কথা না লিখিয়া তিনি যোধবাইয়ের বিষয় লিখিয়াছেন;—

"On the union of the imperial house with that of Jodpoor, by the marriage of Jod Bai to Akbar the Emperor not restored all the possession.(5)

টডের অনুবাদক আমার কনিষ্ঠ সোদর-কল্প শ্রীমান্ বাবু যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেন—

"আজমীর জয় করিয়া অকবর যখন প্রতাপ-সিংহের বিরুদ্ধে প্রবল যুদ্ধোদ্যম করিয়াছিলেন, সেই সময় মারবার মালদেব সাতিশয় ভীত হইয়া আপন জ্যেষ্ঠ পুত্র উদয়সিংহকে বিবিধ উপঢৌকনের সহিত অকবর-সমীপে প্রেরণ করিলেন। (হিজিরা ৯৭৭, খৃষ্টাব্দ ১৫৬৯)"। এই উদয়সিংহ "মোটা রাজা" নামে অভিহিত হইতেন। "কথিত আছে রাজপুত হইয়া তিনিই সর্ব্বপ্রথমে মোগলের হস্তে আপন দুহিতাকে অর্পণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই কন্যার নাম যোধবাই। ইহার পরিবর্ত্তে তিনি চারিটী বিশাল জনপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। (৬) "যোধবাইয়ের গর্ভে ধর্ম্মপ্রিয় শাজিহান জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন। যোধবাইয়ের সমাধি-মন্দির আগরার নিকটে সেকান্দ্রাবাদ নামক স্থানে সংগঠিত। (৭)

উপরোক্ত লিপি হইতে সহজেই প্রতিপন্ন হয় যে, "মোটারাজা" জহাঙ্গীরকে কন্যা দান করেন। নচেৎ শাজিহানের উৎপত্তির কথা বিবৃত হইবে কেন?

"মোগল সম্রাটের প্রসাদ-লাভের জন্য উদয়সিংহ কোন অনুষ্ঠানেই কুণ্ঠিত হয়েন নাই। এমন কি তিনি জাতীয় গৌরবে জলাঞ্জলি দিয়া নিজ ভগিনী যোধবাইকে অকবরের করে সমর্পণ করিয়াছিলেন। ইহাতে অকবর তৎপ্রতি সন্তুষ্ট হইয়া একমাত্র আজমীর ভিন্ন মারবারের মোগল-অধিকৃত আর সমস্ত জনপদ, নগর ও পল্লীই তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করেন।" (৮)

অতএব রাজস্থান পাঠে আমরা অবগত হই যে, মারবার-রাজ উদয়সিংহ অকবর-করে নিজ-ভগিনী "যোধবাইকে" অর্পণ করেন এবং তিনিই জহাঙ্গীরকে নিজ কন্যা "যোধবাইকেও" দান করেন। দুই জনেরই-নাম যোধবাই!

২। তৎপরে ব্লকমান্ সাহেব, আইন-ই-অকবরিতে প্রথমাবাধি চারি রাজ্ঞীর নাম লিখিয়া বলেন; অকবর-মহিষীর (জহাঙ্গীরের জননীর) নাম যোধবাই। যথা—

5. "Jodh Bai, or Princess of Jodhpur, the mother of Jahangir. Her name is not mentioned by any Muhamedan historian. As Akbar's mother had the tittle of Mayaram Makhani, so was Jodh Bai called Mayasam uzzamani. She died in the month of Rajub 1032 A H. (TUZUK. p 361) The TUZUK expresses a hope 'that God will recieve her in His mercy; for Jahangir's mother, though a Hindu, could not well, 'be sent to hell." (9)

এ পর্য্যন্ত এতৎসম্পর্কে আর কোন গোল-যোগই উঠে নাই। অনন্তর উক্ত ব্লকমান্ সাহেবই আইন-ই-অকবরির পরিশিষ্টে ৬১৯ পৃষ্ঠায় সিদ্ধান্ত করিয়া দেন,—যোধবাই, অকবর-প্রিয়তমা নহেন; কিন্তু জহাঙ্গীরের প্রিয়তমা। যোধবায়ের পিতা যোধপুরের মোটারাজা। ঐ স্থলে তিনি ইহাও বলিয়া গিয়াছেন যে, জহাঙ্গীরের গর্ভধারিণী যে, রাজা বিহারী মল্লের নন্দিনী ও রাজা ভগবান্ দাসের ভগিনী, ইহাতে অল্পই সন্দেহ করিবার বিষয় আছে। ব্লকমান্ সাহেব, এখানে বন্ধনীর মধ্যে রাজা বিহারী মল্লের সেই আত্মজার নাম "ময়রাম উজ্জামনি" বলিয়া ঘোষণা করেন। ঐরূপ প্রচার করায় তাঁহার অন্তরে কোন দ্বিধাই উপস্থিত হয় নাই। তাঁহার সেই উক্তি এই,—

"I stated on page 309, that Jahangir's mother was called Jodh Bai. This is wrong. Jodh Bai was the wife of Jahangir and daughter of Mot'h Raja of Jodhapur. There is little doubt that Jahangir's mother (the Maryam uzzamani) is the daughter of Raja Bihari Mall and sister to Raja Bhagawan Das." (10)

"তুজুক" পুস্তকের এক স্থানে এই "মরায়াম" বিষয়ে এই লেখা আছে—

'পরমাত্মা মরায়ামকে কৃপা করিবেন, ইহা আমরা আশা করিতে পারি।'

এই লিপিভঙ্গী নিরীক্ষণ করিয়া কেহ কেহ মনে করেন, "মরায়াম" হিন্দু ছিলেন বলিয়াই, বোধ করি, উদার-হৃদয় "তুজুক" প্রণেতার হৃদয়ে দয়ার উদ্রেক হইয়া থাকিবে। তজ্জন্যই তিনি ঐরূপ প্রার্থনা করিয়া থাকিবেন। এ অনুমান, অনেকটা সঙ্গত বোধ হয়। কেননা, অন্যান্য রাজ্ঞীদের প্রসঙ্গে এবংবিধ উক্তির অসদ্ভাব। ঐ মতের প্রতিপক্ষেরা কিন্তু এমনও সন্দেহ করিতে পারেন যে, "মরায়াম্" প্রকৃত প্রস্তাবে মুসলমানী। হয় তো তাঁহার কোন দোষ ছিল। তদর্থই তুজুক-রচয়িতা তাঁহার সপক্ষে ঈশ্বরের করুণাকণা কামনা করিয়া গিয়াছেন। এ মতটী তাদৃশ সুসঙ্গত বিবেচিত হয় না।

৩। ইহার পর ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে বিভারিজ সাহেব, আসিয়াটিক সোসাইটীর জর্ণলে (১১) জহাঙ্গীরের মাতার নামাদি সম্বন্ধে এক ক্ষুদ্র প্রস্তাব মুদ্রিত করেন। তাহার মর্ম্ম এই,—

জহাঙ্গীরের মাতার নাম কি ও তিনি কোন্ পরিবারে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, এতদ্বিষয়ে সংশয় থাকা বড়ই দোষাবহ। ১৫৬৯ খৃষ্টাব্দে ৩১শে আগষ্টে ফতেপুর সিক্রীতে সলিম চিষ্টীর ভবনে সলিম (জহাঙ্গীর) ভূমিষ্ঠ হন। জহাঙ্গীরের জন্মাব্দ, জন্মমাস, জন্মস্থান এত তন্ন তন্ন করিয়া উক্ত হইয়াছে, কিন্তু তদীয় মাতার নাম ঘুণাক্ষরেও উল্লিখিত হয় নাই! মুসলমান ঐতিহাসিক-বৃন্দের লেখনী এখানে একটীও রেখাপাত করে নাই! জহাঙ্গীর, নিজ-জীবনের ঘটনা, নিজেই এক পুস্তকে নিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাহাতেও উহার সুব্যক্ত কোন প্রসঙ্গই লিখিত বা উক্ত হয় নাই। সুতরাং

(5) Annals of Rajstan, Marwar, 1—27. (1893)

(৬) শ্রীমান্ যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুবাদিত ও বরাটের প্রকাশিত "রাজস্থান" (২৮২ পৃষ্ঠা)।

(৭) উক্ত রাজস্থানের ২৮২ পৃষ্ঠার টীকা দেখ।

(৮) বরাটের রাজস্থানে মারবার ৪র্থ অধ্যায়, ৫৪ পৃষ্ঠা।

(9) Blochman's Ain-i-Akbar, p 309.

(10) Ain-i-Akbar, p 619.

(11) Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol L VI. part I, No 3, 1887

বৈদেশিক ঐতিহাসিকগণ প্রবাদ ও অনুমানের দোহাই দিয়া যথামতি কিছু কিছু বলিয়াছেন। অনেকেরই আনুমানিক সিদ্ধান্ত এই যে, রমণী হিন্দুকুলসম্ভবা ছিলেন, সেই কারণেই তিনি যবন-ইতিহাস-বেত্তাদের সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারেন নাই; প্রত্যুত, বিষ-নয়নে নিপতিত হইয়া তাঁহাদের বিরাগপাত্রী হওয়াতেই তাঁহার নাম জানিবার পক্ষে এত ব্যাঘাত উপস্থিত। জহাঙ্গীরের জননীর নাম অনুল্লিখিত হইবার কারণ স্থলে বিভারিজ্ সাহেবের অভিপ্রায় এই যে, যদি হিন্দুধর্ম্মের জন্য মুসলমান ইতিবৃত্ত-লেখকেরা বিরূপ হইয়া থাকেন, তবে ইহাই বলিতে হয় যে, তাঁহারা গোঁড়ামির নিমিত্ত ঐরূপ করেন নাই। জহাঙ্গীরের খাঁটি মোগল-ত্ব-খ্যাতি-বিলোপের আশঙ্কাতেও তাঁহাদের ওরূপ মতি-গতি হয় নাই। হিন্দু নাম জ্ঞাত হইতেই তাঁহাদের অসুবিধা ঘটিয়াছিল—বিভারিজ্ সাহেবের মত এই। তিনি আরও বলিয়াছেন, জহাঙ্গীর, নিজের হিন্দুজাতীয় পত্নীগণ ও তাঁহাদের গর্ভজাত সুতগণের উল্লেখ করিতেছেন। যবনীরা হিন্দুর প্রণয়িনী হন, ইহাতে জহাঙ্গীরের মনে বিভীষিকার আবির্ভাব হইত; কিন্তু উহার বিপরীত ব্যবহারে তাঁহাকে দোষী করা যাইতে পারে না। (১২)

সাহেব বলেন, বদৌনীর ন্যায় গোঁড়া মুসলমান ব্যতিরেকে অকবর ও জহাঙ্গীরের প্রজা-দের যবনের সঙ্গে বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হইতে বিশেষ আপত্তি ছিল কিনা সন্দেহ। (১৩)

সার উইলিয়মম্ শ্লীমানের মত এই,—

"I have heard many Mahomedans say, that they could trace the decline of their empire in Hindoostan to the loss of the Rajpoot blood in the veins of their princes." (14)

অর্থাৎ, অনেক মুসলমানের মতে হিন্দু-যবনের শোণিত-সংযোগ স্থগিত হওয়াই, মোগল-সাম্রাজ্য-পতনের মূল।

জহাঙ্গীর-মাতা আদৌ হিন্দু হইলেও, আজীবন হিন্দু থাকিতে পারেন নাই। যদি তাহাই হইবে, তবে তিনি সম্রাট অকবরের শুদ্ধান্তে অবস্থান-কালে যবন-পুরোহিতের হস্তে ন্যস্ত হইবেন কেন? তাঁহার লোকান্তে তাঁহাকে হিন্দু-প্রথানুসারে দাহ না করিয়া কি কারণে সমাধি দিয়া, সেই সমাধির উপর মসজিদ্ প্রস্তুত হইল? ব্লকমান্ সাহেবের মতে তাঁহার যদি "মরায়াম উজ্জামনি" (১৫) উপাধি হইয়া

(১২) না হয় মানিলাম—সাহেবের যুক্তি সারবতী। ভাল, জিজ্ঞাসা করি,—বলি জহাঙ্গীর স্বয়ং কেন না কিছু বলিয়া গেলেন! তাঁহার মাতা যে হিন্দু ছিলেন, তাহাও কেন অন্ততঃ তিনি বলেন নাই! তবে ইহা সত্য যে, সম্রাটের পরিণীতা ভার্য্যারা অনুষ্ঠান-বিষয়ে হিন্দু থাকিবেন, ইহা মুসলমানদের আপত্তিজনক বলিয়া বিবেচিত হইত। ইহাই কি ওরূপ ঘটনার কারণ?

(১৩) আপত্তি না থাকিলে প্রথাটা রহিত হইল কেন?

(14) W. H. Sleeman's Rambles, Vol II, p 66.

(১৫) মরায়াম উজ্জামনি (Maryam uzzamini) শব্দের ইংরাজিতে অনুবাদ হইয়াছে "The Virgin Mary of the age" অর্থাৎ 'স্বসমকালিক নিষ্কলঙ্ক মেরী'। মোগলেরা কি কারণে খৃষ্টানের পবিত্রতার আধার য়িহুদী রমণী মেরীকে আদর্শনারী বলিয়া গ্রহণ করিবেন, বুঝিলাম না। অনুবাদ বোধ হয় ঠিক হয় নাই। (১৬)

(১৬) কেইন্ সাহেব "মরায়াম" শব্দের অর্থ অন্যরূপ বলিয়াছেন,—

"This tomb is generally known as that of the Begun Mariam, the Portuguese Christian wife of Akbar, who was buried here."—Cain's Picturesque India, p 225, (1890.)

থাকে, তবে তো তাহাতে তাঁহার হিন্দুত্বের দাওয়া আরও কমিয়া গিয়াছিল। মুসলমান ঐতিহাসিকেরা সম্রাট্দ্বয়ের হিন্দুজাতীয় পত্নীদের নাম নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই। তাহার কারণ আমাদের বিবেচনায় অজ্ঞতা, কিম্বা কুসংস্কার নয়। ইহার হেতু এই বোধ হয় যে, "যোধবাই" নামে যে হিন্দু রাজ্ঞীর উল্লেখ রহিয়াছে, সেই "যোধবাই" প্রকৃত প্রস্তাবে নাম নয়। "বাই" সম্ভ্রান্ত রাজপুত রমণীর সাধারণ উপাধি মাত্র। যোধবাই শব্দের অর্থে—যোধপুর রাজপরিবারের নারী। ব্লকমানের মতে বিহারী মল্লের কন্যা (ভগবান্ দাসের ভগিনী) অকবরের প্রিয়তমা। আর যোধবাই, জহাঙ্গীরের মহিষী।

বিভারিজ্ সাহেব এ স্থলে বলেন,—মোটারাজের ভগিনী (যোধবাই) অকবরের মহিষী। মোটারাজের কন্যা (যোধবাই) জহাঙ্গীরের মহিষী। দুই জনের নামই "যোধবাই" অর্থাৎ যোধপুরীয় রাজকুমারী।

(ক) টডের মতে জহাঙ্গীর-জননীর অর্থাৎ অকবর-মহিষীর নাম যোধবাই। সাধারণের সংস্কার আছে, অকবর-মহিষীর নাম যোধবাই। অনেকের ইচ্ছা, সেই সংস্কার উড়াইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য নয়।

(খ) শ্লীমান সাহেব আগরার সান্নিধ্যে জহাঙ্গীর-জননী যোধবাইয়ের সমাধি দেখিয়াছেন (১৭) ফতেপুর সিক্রীতে যে ক্ষুদ্র গৃহে জহাঙ্গীরের জন্ম হয়, তাহাও তিনি দেখিয়াছেন (১৮)।

এ পর্য্যন্ত অকবরের ৮ আটটী বনিতার অস্তিত্ব পাওয়া যাইতেছে। যথা,—১। সুলতান রাখিয়া।—ইনি মির্জ হিন্দালের কন্যা। তাঁহার পুত্র কন্যা হয় নাই। তিনি অকবরের পৌত্র (জহাঙ্গীর-পুত্র,) সাহজাহাকে প্রতিপালন করেন। বর্দ্ধমানের শাসনকর্ত্তা শের আফগানকে বধ করিয়া তৎপত্নী নুরজিহান্কে দিল্লীতে আনিয়া, ইহাঁরই তত্ত্বাবধানে রাখা হইয়াছিল। ১০৩৫ হিজিরায় ৭ই জুমাদে (১ম) ৮৪ চুরাশি বৎসর বয়সে ইহাঁর পরলোক প্রাপ্তি ঘটে (১৯)। ইনিই অক-

(17) "Near the artillery practice ground, we passed the tomb of Jodha Baee, the wife of the Emperor Akbar and the mother of Jehangeer. She was of Rajpoot caste, daughter of the Hindoo chief of Joudhupur, a very beutiful and it is said a very amiable woman."—Rambles and Recollections of an Indian official, by W. H. Sleeman, Vol II, p 65.

(18) "He (Akbar) went accordingly and was assured by the old man, then ninety-six years of age, that the Empress Jodha Baee, the daughter of a Hindu prince would be delivered of a son, who would live to a good old age. He was then pregnant, and remained in the vicinity of the old man's hermitage till her confinement, which took place 31st August, 1569. The infant was called after the hermit, Mirza Saleem; and became in time Emperor of Hindoostan, under the name of Jehangir."—Rambles and Rellections of an Indian official by W. H. Sleeman, Vol II. p 68.

"He (the man who guards the tomb of Saeik Saleem) showed us the little roof of stone tiles, close to the original little dingy mosque of the old hermit, where the Empress gave birth to Jehangeer, and told us that she was a very sensible woman, whose counsels had great weight with the Emperor."—Ibid, p 71.

(১৯) তুজুক, ৪০১ পৃষ্ঠা।

বরের প্রথমা প্রিয়তমা। এই প্রবন্ধের সর্ব্বত্র সৌকর্য্যার্থে বংশ-তালিকা দিতেছি,—

মির্জ্জা হিন্দাল
|
সুলতান রাখিয়া + অকবর
|
০

২। আবদুল্লা খাঁ মোগলের তনয়া, অকবরের দ্বিতীয়া জায়া। ৯৬৪ হিজিরায় এই পরিণয় সঙ্ঘটিত হইয়াছিল। এই বনিতার নাম অজ্ঞাত।

আবদুল খাঁ মোগল
|
কন্যা + অকবর

৩। সুলতান সলিমা বেগম।—ইনি সম্রাট বাবরের দৌহিত্রী। কেননা, ইনি বাবর-তনয়া গুলরখ (২০) বেগমের গর্ভে মির্জ্জা সুরউদ্দিন মহম্মদের ঔরসে সঞ্জাত। হুমায়ুন, বয়রাম্ খাঁর সঙ্গে ইহাঁর উদ্বাহ-ক্রিয়া নিষ্পাদন করিয়াছিলেন। এই ঘটনা অকবরের রাজত্ব-প্রাপ্তির প্রারম্ভেই ঘটিয়াছিল। এই বয়রাম্, প্রথমে হুমায়ুনের ও পরে অকবরের সেনাধ্যক্ষ ছিলেন। প্রথম পতির লোকান্তর-গমনের পর তিনি অকবরের করে সমর্পিত হন। ৯৬৮ হিজিরায় সেই পরিণয় সমাহিত হয়। সলিমা বেগমের কবিত্ব ছিল। কাব্য-রাজ্যে তাঁহার অপর নাম ছিল। সেই নাম—'মুখফি'। "মুখফি" প্রকৃত প্রস্তাবে নাম নয়। উহার অর্থ 'গুপ্ত' (২১)। ১০২১ হিজিরায় ১০ই জিকোয়াদায় তাঁহার দেহাত্যয় ঘটে। সলিমা, অকবরের পিস্‌তুতো ভগিনী এবং ভার্য্যা।

বাবর
|
হুমায়ুন — গুলরখ বেগম + মির্জ্জা সুরউদ্দিন মহম্মদ
|
অকবর + সুলতান সলিমা বেগম (প্রথম স্বামী বয়রাম)
|
০

৪। বিহারী মল্লের কন্যা এবং ভগবান্ দাস ও পাহাড় খাঁর ভগ্নী, অকবরের চতুর্থী পত্নী। ৯৬৮ হিজিরায় শুনভরে এই বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছিল। তদ্গর্ভে ৯৯৭ হিজিরায় সেলিমের (জহাঙ্গীরের) উদ্ভব হইয়াছিল। তাঁহার প্রথম নাম অদ্যাপি নিবিড়ান্ধকারময়। বিবাহের পর তাঁহার নাম হইয়াছিল—মরায়াম উজ্জামনি। অকবরের জননী হমিদা (বানু বেগম (২২) যেমন 'মরায়াম মাখানি' সংজ্ঞায় প্রখ্যাত হইতেন, তদীয়া এই হিন্দুজাতীয়া পুত্রবধূও সেইরূপ উপনামের আধিকারিণী হন। ১০৩২ হিজিরায় রজবের কোন অনির্দ্দিষ্ট দিন, তাঁহার মহানিদ্রার সময় (২৩)। তুজুকের এক স্থানে তাঁহার নিমিত্ত ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা আছে। তাহার মর্ম্ম এই—'পরমাত্মা এই রমণীকে অনুকম্পা-বিতরণে কার্পণ্য প্রকাশ করিবেন না। জহাঙ্গীর-জননী হিন্দু রমণী হইলেও, নিরয়গামিনী হইবেন না।'

বিহারী মল্ল
|
ভগবান্ দাস, পাহাড় খাঁ, ময়ারাম উজ্জামনি + অকবর
|
সেলিম (জহাঙ্গীর)

(২০) (Gulruk ?) নামে রুকুয়ান্ সাহেবের সন্দেহ জন্মিয়াছে কি কারণে বলিতে পারি না। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের আসিয়াটিক সোসাইটীর জর্নালের ১৩৬ পৃষ্ঠায় গুলরখের বৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছে।

(২১) আওরঙ্গজেবের এক কন্যারও ঐ নাম ছিল। তাঁহারও প্রকৃত নাম ছিল। সে নামটী—জেবনিসা। তিনিই জ্যেষ্ঠা কন্যা। ১০৮৪ হিজিরায় তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ১২৮৪ হিজিরায় লক্ষ্ণৌ সহরে তাঁহার তিরোধান হয়।

(২২) রমেশচন্দ্র বাবু এরূপ লিখিয়াছেন। আর হরিসাধন বাবু, হুমায়ুনের চরিত অবলম্বনে হামিদা বানু বেগম এক নাম করিয়াছেন।

(২৩) তুজুক, ৩৬১ পৃষ্ঠা

৫। আবদুল ওয়াসীর পত্নীকে অকবর ৯৭০ হিজিরায় পত্নীত্বে গ্রহণ করেন (২৪)।

৬। বিবি দৌলৎ শাদ।—ইনি অকবরের ষষ্ঠী ভার্য্যা। ইহাঁরই গর্ভে সুখ্‌রুন্নিসা বেগম ও আরাম বানু বেগমের উৎপত্তি হয়। তিনি দুই সুতার জননী হইয়াছিলেন (২৫)। গ্রন্থমোক্তের সহিত ইব্রাহিমের পুত্র মির্জ্জা সারুখের ১০০১ হিজিরায় বিবাহ হয়।

ইব্রাহিম — অকবর + বিবি দৌলৎ শাদ
|
মির্জা সারুখ্ + সুখ্‌রুন্নিসা বেগম, আরাম বানু বেগম

৭। খান্দেসের মীরান্ মুবারক শার তনয়া অকবরের সপ্তমী মহিষী।

মীরান্ মুবারক্ শা (খান্দেস্)
|
কন্যা + অকবর

৮। যশল্‌মীর-রাজ-দুহিতা, অকবরের অষ্টমী বনিতা। তাঁহার নাম প্রকাশিত নাই।

যশল্‌মীর-রাজ
|
কন্যা + অকবর

কেবল বিহারী মল্লের কন্যার নাম বর্ণিত হয় নাই, এমন নয়। অধিকন্তু দেখা যায়, দ্বিতীয়, পঞ্চম, সপ্তম ও অষ্টম সহধর্ম্মিণীদেরও নাম অবিদিত। আর, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও অষ্টম প্রণয়িনীগণের পিতৃনামও যে আবার অপরিজ্ঞাত! অতএব তিনটী যবনা পত্নীর ও একটী হিন্দুজাতীয় পত্নীর আখ্যা,—সর্ব্বসাকল্যে ৮ আটটীর মধ্যে ৪ চারিটীর মাত্র নাম জ্ঞাত। সুতরাং অর্দ্ধেক জ্ঞাত ও অর্দ্ধেক অজ্ঞাত। এতদ্ভিন্ন আরও বক্তব্য আছে। চতুর্থ ও ষষ্ঠ ভার্য্যা বাদে এই সকল অঙ্গনাদের কে, কোন্ পুত্র বা কন্যার জননী, তাহারও জ্ঞানগোচর হওয়ার সম্ভাবনা নাই। জহাঙ্গীর, স্বজীবনীতে পাহাড় খাঁর বৃত্তান্ত নিবদ্ধ করিয়াছেন। এই পাহাড় খাঁ মানসিংহের পিতৃব্য। সুতরাং তিনি যে ভগবান্ দাসের ভ্রাতা ও বিহারী মল্লের পুত্র, ইহাতে কোন দ্বিধা থাকিতেছে না। পাহাড় খাঁর এক ভগিনীর বিষয়ে তিনি লেখেন,—

পাহাড় খাঁর একটী ভগিনী আমাদের অন্তঃপুরিকা। লোকাতীত সৌন্দর্য্য সত্ত্বেও তাহার অদৃষ্ট ভাল ছিল না। প্রায়ই জগতে উপযুক্তকে উপযুক্ত স্থানে দেখা যায় না। (২৬)

এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্‌ও বলিয়াছেন, মানসিংহের ভগিনী, জহাঙ্গীরের প্রিয়তমা প্রণয়িনী। তিনিই খস্‌রুর জননী।

"Some circumstances in their disputes at this time so affected Khusru's mother (the sister of Raja Man Sing) that she swallowed poison." (27)

"Raja Man Sing was maternal uncle to Khusru, was morcover married to the daughters of Aziz, the Khamis Azim the first of Akbar's General," (28)

বিহারী মল্ল।
|
ভগবান্ দাস, পাহাড় খাঁ, কন্যা (মরায়াম উজ্জামনী) + অকবর
|
মানসিঙ্, — কন্যা + জহাঙ্গীর
|
জগৎসিঙ্, সুলতান বেগম (বা) সুলতানউন্নিসা বেগম
|
কন্যা + জহাঙ্গীর — খস্‌রু

(২৪) বদৌনি, ২য় অধ্যায়, ৬১ পৃষ্ঠা।
(২৫) তুজুক, ৫১ পৃষ্ঠা।

(26) Major Preee's Translation of Jehangir's Autobiography.
(27) Elphinstone, Vol II, p 308.
Ibid, Vol II, p 311.

বিভারিজ সাহেব, মোটারাজা উদয় সিংহের ভগিনীকে অকবরের মহিষী পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এদিকে জহাঙ্গীরের জীবনবৃত্তান্তে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, পাহাড় খাঁর ভগিনী অকবর সাহের অন্তঃপুরিকা। যিনি পাহাড় খাঁর ভগিনী, তিনি ভগবান দাসেরও ভগিনী; সুতরাং বিহারী মল্লের কন্যা যে অকবরের মহিষী, তৎপক্ষে সংশয় নাই। কারণ উহাদের এইরূপই পরস্পর সম্পর্ক।

বিভারিজ সাহেব ঐ বর্ণনা পাঠে এই মতামত দেন—এই কামিনী, কেমন করিয়া জহাঙ্গীর জননী হইতে পারেন? ইহাতে তাঁহার সংশয়ের কারণ নির্দ্দেশ-স্থলে তিনি ইহাও বলেন যে, নিজ জননীর কেহ বিরূপ বর্ণনা করিতে পারেন না। টীকায় তিনি বলেন, তুজুক গ্রন্থেও ইহার কোন নির্দ্দেশ নাই। পাঠক জানিয়া রাখিলে ভাল করিবেন যে, প্রাইস্ সাহেবের অবলম্বিত মূল পারসীগ্রন্থ (জহাঙ্গীরের আত্ম-জীবনী) ব্লকমান্ সাহেব দেখেন নাই। তিনি অনূদিত গ্রন্থের উপর নির্ভর করিয়াই এত কথা বলিতেছেন। (২৯)

প্রাইস্ সাহেবের পুস্তক দেখিয়া অবগত হওয়া যায়, জহাঙ্গীর, বিহারী মল্লের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন (৩০)।

বিভারিজ বলেন, বিহারী মল্লের কন্যা জহাঙ্গীরের ভার্য্যা নহেন। তিনি অনুমান করেন, বিহারী মল্লের পৌত্রীকে তিনি বিবাহ করিয়া থাকিবেন। মূল পার্সীগ্রন্থে বোধ হয় তাহা আছে, ইহাও তিনি মতামতে প্রকাশ করিয়াছেন।

ইলিয়টের ইতিহাসে (৩১) এই প্রকার লিখিত রহিয়াছে,—জহাঙ্গীরের আদেশে "সের আফগান" হত হইলে পর নুর জিহান বর্দ্ধমান হইতে আগরায় আনীত হন ও জহাঙ্গীরের মাতার কর্ত্তৃত্বাধীনে থাকেন। (৩২) এই উক্তির উপর নির্ভর করিলে এই সিদ্ধান্তে গিয়া উপনীত হওয়া যায় যে, সলিমা সুলতান বেগম, কিংবা সুলতান রাখিয়া বেগমের রক্ষণাবেক্ষণে নুরজিহান ছিলেন। এই রমণী বৈরাম খাঁর বিধবা পত্নী। সলিমা হুমায়ুনের ভাগিনেয়ী। তাহার জননীর নাম

(২৯) আমি প্রস্তাব করি, এই বিষয়ের জন্য মূল পার্সীগ্রন্থ আলোড়িত করা হউক। এস্থলে ইহাও বলিয়া রাখি. ইনিই সম্ভবতঃ জহাঙ্গীরের জননী। ইনি স্বামীর স্নেহ, ভালবাসা, সোহাগে আশানুরূপ সৌভাগ্যশালিনী হন নাই বলিয়াই পুত্রের এত বিলাপ। অন্যথা জননীর নাম তিনি না লেখেন কেন?

(30) Major Price's Book (Translation of Jahangir's Autobiography), p 19.

(৩১) মূলে আছে, "Walidah Sababi; Kkes (ওয়ালিডা সাবাবি; খেস্) ইহার অর্থ ধরিয়া ইলিয়ট কহিয়াছেন,—

"The king who was greatly distressed at the murder of Kutub-ud din entrusted her (Nurmahal afterwards Nurjehan) to the keeying of his own royal mother."—Elliot's History of India, Vol. VI, p. 404.

উহার ঐ অর্থই প্রকৃত কিনা, তৎপক্ষে সন্দেহ করিতে হয়। ঐ অর্থে কেবল মাতা স্থির হইলেও "সলিমা বেগম"ই যে তাঁহার প্রকৃত জননী হন, এমন বুঝায় না। ঐ শব্দে তদপেক্ষা কিছু অধিক বুঝাইয়া থাকে। জহাঙ্গীর সলিমার এক কন্যার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া তাঁহাকে নিজের ভগিনী বলিয়াছেন। ঐতিহাসিক মহম্মদ খাঁর উহা জালিয়াৎ কথা বটে, কিন্তু তথাপি বলিতে হইবে, মূল না দেখিলে বলা যায় না, এইটী সহোদরা কি বৈমাত্রেয় ভগিনী।

ব্লক ম্যানের মতে (৩৩) কন্যার নাম শাহাজাবাদ খনম্। তিনি জহাঙ্গীরের তিন মাস পরে জাত হইলে সলিমাকে জহাঙ্গীরের জননী বলা যায়।

(32) Blockman p. 308.

(৩৩) অকবরনামা, ২য় খণ্ড, ৬৫ পৃষ্ঠা।

গুলবর্গ বেগম। তিনি হুমায়নের ভগিনী (৩৪)। সলিমার পিতার নাম মির্জ্জানূরদ্দিন মহম্মদ। হুমায়ূনের অভিপ্রায়ানুসারে অকবর, বৈরাম খাঁর সঙ্গে তাঁহাকে পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ করেন। বৈরামের হত্যার পর তিনি অকবরের অঙ্ক-লক্ষ্মী হন। ১০২১ হিজিরাব্দে (১৬১১ খৃষ্টাব্দে) সলিমার প্রাণবায়ু বহির্গত হয়। কাফি খাঁ তাঁহাকে খাদিভি উজ্জামনি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি, তদ্রচিত দুই পঙ্ক্তি কবিতা উদ্ধৃত করিয়া সলিমার প্রসঙ্গ শেষ করিয়াছেন। এই কবিতা (৩৫) তত প্রাঞ্জল নাই হউক, ইহাতে জানা গেল, তিনি কত গুণবতী ছিলেন! এমন গুণবতীর উদরে জন্মিলে জহাঙ্গীরের আরও ভাল হওয়া উচিত ছিল। এখানেও মতটী নির্ব্বিরোধ নয়।

(ক) মহম্মদ খাঁ ও খাফতি খাঁর ইখবাল নামার মতে সলিমা সুলতান, নুরজিহানের রক্ষিত্রী।

(খ) ব্লকমান্ ও মহম্মদ হাদির (৩৬) মতানুসারে সুলতান রাখিয়া বেগমের অধীনে নুরজিহানকে থাকিতে হইয়াছিল।

(৩৪) এলফিন্‌ষ্টোনও প্রায় এই মতাবলম্বী। তিনি কাফি খাঁ ও তদনুবাদকের উপর নির্ভর করিয়াছিলেন। যথা—

"He (Jehangir) at length placed her (Nurjehan) among the attendants on his mother."—History of India, Vol. II. (1st Ed) p. 354.

তদমতে সুতরাং নুরজিহান, জহাঙ্গীরের মাতার অন্যতমা সহচরী। তবে তিনি নিজ-জননী কি না ইত্যাদি কথা সাহেব সুস্পষ্ট ব্যক্ত না করিয়া নীরব ভাব ধারণ করিয়াছেন।

(35) Khafi Khan, I. p. 253, 276.

(36) "After he (Kutub-ud-din Khan) had met with his reward and proceeded to the desert of annihilation, by the orders of the king, the officers in Bengal sent the daughter of Mirza Ghiya's. Beg, surnamed I'timadud daula, to his majesty, who in the deepest affliction at the death of Kutubu d din Khan placed her (Nur Mahal) on the establishment Kukiya Sultana, one of his fathar's wives, on which she continued for a long time without any employment."—Elliot'o History, Vol. VI, p. 398.

(37) Madar nasbati-i Khud of Jehangir." 1st part, p 267.

এস্থলে এই একটী বিষয় বুঝিয়া দেখিতে হইবে যে, মহম্মদ হাদি, মহম্মদ খাঁর পুস্তক হইতে ঘটনা সংগ্রহ করিয়াছেন। বিব্‌লোথিকা ইণ্ডিকার কথায় আস্থা স্থাপন করিলে বলিতে হয়, মহম্মদ হাদি ও ইলিয়ট সাহেব "রখা" স্থলে "রাখিয়া" ভ্রান্তিবিজড়িত হইয়া পড়িয়াছেন। প্রথমোক্ত শব্দের অর্থ 'ক্রীতদাস'।

যখনকার কথা হইতেছে, তখন "রাখিয়া" জীবিত ছিলেন। সম্ভবতঃ অকবরের অপরাপর ভার্য্যারা তৎকালে মৃত হন নাই। ঘটনাটী যখন এইরূপ দেখা যাইতেছে, অতএব মনে মনে স্বতঃই এই প্রশ্ন আসিয়া সমুদিত হয় যে, তবে সলিমা বেগমের প্রসঙ্গ কেন উত্থাপিত হইতেছে?

খাফি খাঁ (৩৭) কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত আকারে অর্থাৎ "Madar nasbati i Khud of Jehangir" সলিমার বিষয় বলিয়াছেন।

সে যাহা হউক, সলিমায় ও জহাঙ্গীরে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। কেন না, জহাঙ্গীর যৎকালে পিতার সহিত বিরোধে লিপ্ত, তখন তিনি জহাঙ্গীরের নিকট স্বয়ং গিয়াছিলেন ও তাঁহাকে রাজধানীতে আনয়ন করিয়াছিলেন। আর এক কথা। তিনি জহাঙ্গীরের পুত্র যুবরাজ খসরুকে শৈশব

হইতে লালন পালন করেন। ইহাতেও স্বনিষ্ঠতার মাত্রা বৃদ্ধি করিয়াছিল। এই স্বনিষ্ঠতার কারণ নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইয়া এল্‌ফিন্‌ষ্টোন কহিয়াছেন, জহাঙ্গীরের নিজ জননীর পরলোক-গমনের পর তিনি তাঁহাকে পোষ্য-রূপে গ্রহণ করেন।

অকবরের ৮ আট সহধর্ম্মিণী, আর তদাত্মজ জহাঙ্গীরের ১০ দশ পত্নী। তন্মধ্যে ৬ ছয়টী হিন্দু-রমণী। এস্থলে তালিকা প্রদত্ত হইল। বংশতালিকা দিবার তাৎপর্য্য এই যে, তাহাতে বুঝাইবার পক্ষে সাহায্য করিবে।

১। ভগবান্ দাসের তনয়া (মানসিংহের ভগিনী) জহাঙ্গীরের পরিণীতা ভার্য্যা, ৯৯৩ হিজিরায় ঐ উদ্বাহ সম্পন্ন হয়। বিবাহের এক বৎসর পরে (৯৯৪ হিজিরায়) "সুলতান উন্নিসা বেগম নামে এক কন্যা জাত হয় (৩৮) পর বৎসর এক কুমার জন্মে। এই কুমারই, জহাঙ্গীরের প্রথম কুমার। তাঁহার নাম খস্‌রু। ১০১১ হিজিরায় অহিফেন সেবনে এই রাজ্ঞী, সন্তানগণের অবাধ্যতার জন্য আত্মহত্যা করেন।

২। মানসিংহের পৌত্রী (জগৎসিংহের পুত্রী) জহাঙ্গীরের একতমা প্রিয়তমা। কোন্ সালে বিবাহ হয়, তাহা জানা নাই। পূর্ব্ব-প্রকাশিত তালিকা দেখুন।

৩। বিকানিয়ার রাজবংশীয় রায় সিংহের সুতাও জহাঙ্গীরের অপরা মহিষী। বদৌনির গ্রন্থে তাহার নির্দ্দেশ আছে। (৩৯) জানিবার উপায় নাই।

বিকানিয়ার রাজ্যাধিপতির বংশ তালিকা এই,—

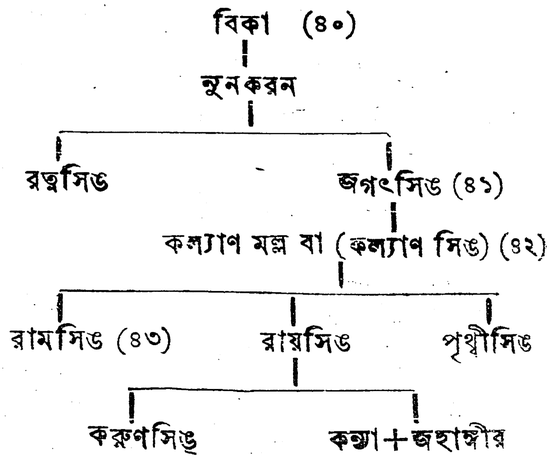

৪। উদয়সিংহের দুহিতাও জহাঙ্গীর কর্ত্তৃক বিবাহিতা। সম্রাট্ জহাঙ্গীর যে বৎসর মানসিংহের ভগিনীর পাণিগ্রহণ করেন, তাহার বৎসরেক পরে (৯৯৪ হিজিরায়) এই পরিণয় সংঘটিত হয়। তিনি "জগৎ গোসাঞিনী" নামে খ্যাত (৪৪)। সাহজঁহা, এই অঙ্গনার উদরে উৎপন্ন হন। ১০২৮ হিজিরায় তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হয়। বিবাহের পর ৩৪ চৌত্রিশ বৎসর তিনি জীবিত ছিলেন। তালিকা দেখুন,—

(৩৮) খাফি খাঁ ইহাঁকে "সুলতান বেগম" বলিয়াছেন। এই নামে 'উন্নিসা' শব্দ পরিত্যক্ত। বোধ হয়, সংক্ষিপ্ত নাইম, খাফি খাঁর অভিপ্রেত ছিল।

(৩৯) "তুজুকই জাহাঙ্গীর" পুস্তকে তৎপ্রসঙ্গ নাই।

(৪০) ইনি এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। ১৫৪৫ সংবতে ইহা প্রতিষ্ঠিত।

(৪১) কল্যাণ সিঙ, শিবজী ও অশ্বপাল এই তিন সন্তান।

(৪২) ইনি অকবরের সভাসদ্।

(৪৩) এখানকার তালিকাটী টড সাহেবের মতানুসারে সংগৃহীত হইল। মুসলমান ঐতিহাসিকদিগের মতে রায়সিঙ জ্যেষ্ঠ, রামসিঙ মধ্যম, পৃথ্বীসিঙ কনিষ্ঠ। পৃথ্বীসিঙের সম্বন্ধে হিন্দু-যবনেতিহাসে কোন গোল নাই। হিন্দুর বংশাবলী হিন্দুর মতেই গ্রহণীয়। টড সাহেব, রাজপুতগণকে জিজ্ঞাসা করিয়া যাহা পাইয়াছেন, তাহাই প্রামাণিক। এ বিষয়ে "ভারতীতে" শ্রীমান্ হরিসাধন ভায়া কোন নিষ্পত্তির চেষ্টা করেন নাই কেন বলা কঠিন।

(৪৪) তুজুক্ দেখ।

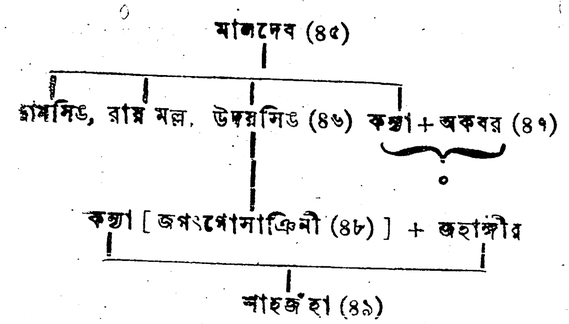

৫। রাঠোর-বংশীয় রাজা কেশুদাসও জহাঙ্গীরের শ্বশুর। কেশুদাস, এক জন সামন্ত ভূপতি ছিলেন। যে অব্দে এই উদ্বাহ সমাধা হইয়াছিল, তাহার নির্ণয় হইতেছে না। সেই উদ্বাহে এক কন্যা জন্মে। তাহার নাম "বাহারবানু বেগম।"

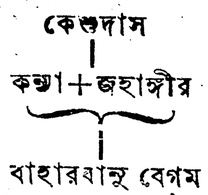

৬। আলিয়ারের এক কন্যার জহাঙ্গীর পাণিপীড়ন করেন। আলিয়ার ছোট তিব্বতের অধিপতি। এই ছোট তিব্বত কোথায়, রাণীর নাম কি, এবং কোন্ সালেই বা বিবাহ হইয়াছিল, ইত্যাদি জানা যায় না। ইহাঁর কোন পুত্রাদি জন্মিয়াছিল কি না, তাহাও অজ্ঞাত।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই প্রস্তাবে কোন কামিনীরই নাম জ্ঞাত হওয়া গেল না। কেবল বদৌনি, উদয়সিঙের কন্যার "জগৎ-গোসাঞিনী" উপনামের প্রসঙ্গমাত্র করিয়াছেন। (৫০)

বোধ-সৌকর্য্যার্থে তালিকা দ্বারা জহাঙ্গীরের প্রণয়িনীদের বর্ণনা করা গেল।

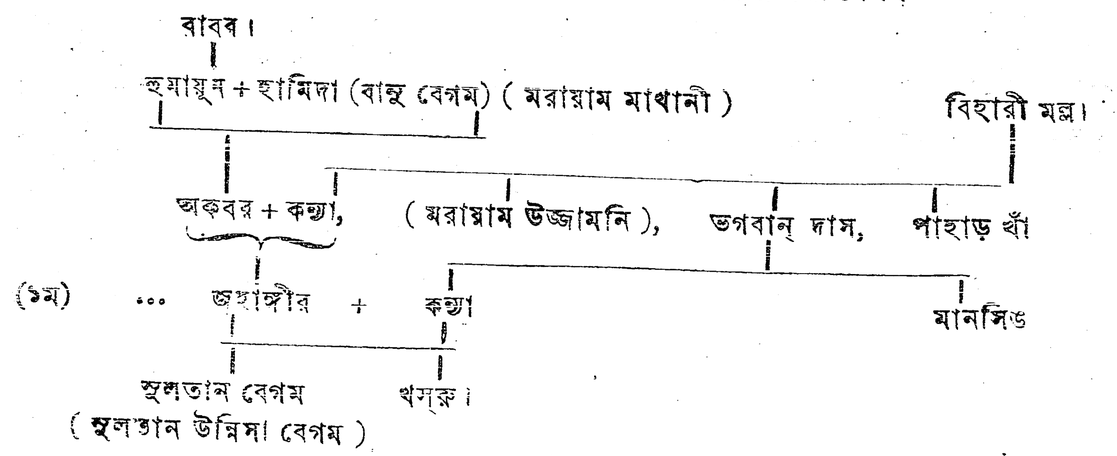

(৪৫) মালদেবের ১১ এগার পুত্র। উদয়সিঙ তাঁহার (মোটারাজা) তৃতীয় তনয়।

(৪৬) ইনি অকবরের সমকালিক লোক। মোটারাজা খ্যাতিতে ইনি প্রসিদ্ধ। এই উপাধি দ্বারা ইঁহার সংগ্রাম সিংহের সুত হইতে পৃথক্ হইলেন।

(৪৭) তালিকায় এই অংশটুকু হরিসাধন বাবুর কল্পিত। তাঁহার মতে এই কন্যার নাম যোধবাই।

(৪৮) তুজুকে ইহাঁর নাম "জগৎ গোসাঞিনী।" হরিসাধন বাবু ইহাঁরই নাম 'যোধবাই' অনুমান করিয়াছেন।

(৪৯) এখানকার তালিকা, টডের পুস্তক হইতে গৃহীত। যবনেতিহাসিকের মতে রায়মল্ল জ্যেষ্ঠ।

(৫০) এতদ্ভিন্ন জহাঙ্গীরের আর ৪ চারিটী যবনী রাণী ছিলেন। যথা—

(১) খাজা হোসেনের কন্যা। তদ্গর্ভে পারভিজ জাত

(২) জাহান্দারের জননী আর এক পত্নী। নাম অজ্ঞাত।

(৩) নাহরিয়ারের মাতা অপরা মহিষী। নাম অজ্ঞাত।

(৪) খিয়াস্ বেগের কন্যা। প্রথম নাম মেহের উন্নিসা। নামান্তর নুরমহল। শেষে নাম হয়, নুরজিহান অর্থ— জগজ্জ্যোতিঃ। শাহজঁহার পত্নীরও নাম নুরমহল। তাঁহারই জন্য "তাজ" নির্ম্মিত হয়।

বিহারী মল্ল
ভগবান্ দাস
মানসিঙ
জগৎসিঙ
(২য়) ... জহাঙ্গীর + কন্যা

বায়সিঙ
(৩য়) ... জহাঙ্গীর + কন্যা

উদয়সিঙ
(৪র্থ) ... জহাঙ্গীর + কন্যা
খরম বা সাহজঁহা

কেশুদাস
(৫ম) ... জহাঙ্গীর + কন্যা
বাহার বানু বেগম

আলিয়ার (ছোট তিব্বতেশ্বর)
(৬ষ্ঠ) জহাঙ্গীর + কন্যা

খাজা হোসেন
(৭ম) ... জহাঙ্গীর + কন্যা
পারভিজ

অজ্ঞাতনামা
(৮ম) ... জহাঙ্গীর + কন্যা
জহান্দার

অজ্ঞাতনামা
(৯ম ... জহাঙ্গীর + কন্যা
সাহারয়ার

ঘিয়াসবেগ
(১০ম) ... জহাঙ্গীর + নুরজেহান

এই ক্ষেত্রে দুইটী কথা বলিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

(ক) প্রবাদ আছে, মোগল সম্রাটের কথা উপেক্ষা করিতে অপারগ রাজগণ, কুলটাঅমণী-দিগকে আপন আপন কন্যা বা ভগিনী বলিয়া সম্রাটের সহিত বিবাহ দিতেন। সম্রাট্‌গণ তাঁহাদিগকে রাজকুমারী বলিয়া ভাবিতেন। এ কথার প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই—জনশ্রুতিই ইহার মূল।

(খ) কোন রাজপুতই যবনীকে পত্নীত্বে গ্রহণ করেন নাই। পাঠকেরা তাহা লক্ষ্য রাখিবেন। মুসলমানের সঙ্গে কন্যার বিবাহ হইত বটে; কিন্তু সে কন্যা তো তদবধিই বংশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইল।

বহুল আয়াসে ও অশেষ যত্নে আমরা যাহা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহাই এখানে লিখিত হইল। যদি কোন উপযুক্ত ব্যক্তি ইহার উপর অধিক ঘটনার সমাবেশ করিতে পারেন, তাহা পরমানন্দের বিষয় হইবে। যদি কেহই ইহাতে হস্ত প্রসারণ না করেন,—আর যদি আবশ্যক হয়, তবে আমাদিগকেই পুনরায় কিছু না কিছু আলোচনা করিতে হইবে।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি।

অমিতাভ।*

এতদিনের পর বাঙ্গালায় প্রকৃত একখানি ঐতিহাসিক কাব্য প্রকাশ হইল!

গ্রন্থের মুখবন্ধেই আছে,—

"যাঁহার অমিত আভায় সার্দ্ধ দুই সহস্র বৎসর কাল-বক্ষ উদ্ভাসিত হইয়া রহিয়াছে, এবং এখনও ইউরোপ আমেরিকা পর্য্যন্ত যাঁহার আলোক বিকীর্ণ হইয়া পড়িতেছে, সেই বুদ্ধদেব শাক্যসিংহকে আমি নমস্কার করি, তাঁহারই অন্যতর নাম অমিতাভ।"

সুতরাং 'অমিতাভ' জিনিসটা কি, পাঠক বুঝিয়া লউন। সেই "অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ"-প্রচারক, 'নির্ব্বাণ'-ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক, শ্রীবুদ্ধদেবের লীলা-মাহাত্ম্য বর্ণন করাই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। সুতরাং এখানি ধর্ম্মমূলক ঐতিহাসিক কাব্য। কবি নবীনচন্দ্রের রসময়ী, শক্তিময়ী, উচ্ছ্বাস-ময়ী, আবেগময়ী, অমৃতময়ী লেখনীর পরি-চয় বাঙ্গালী পাঠকের নিকট সুপরিচিত। 'পলাশীর যুদ্ধে' যাঁহার স্বদেশভক্তি, 'রৈবতকে' যাঁহার স্বধর্ম্ম-প্রীতি, এবং 'কুরুক্ষেত্রে' যাঁহার কবি-শক্তির পূর্ণ বিকাশ, প্রকৃতির সেই প্রিয়-পুত্র শ্রীনবীনচন্দ্রের নূতন পরিচয় আর আমরা কি দিব? তিনি নামে 'নবীন' হইয়াও কাব্যে পরম প্রবীণ, অথবা প্রবীণ হইয়াও 'নিত্য নবীন'। রাজকার্য্যের গুরু শ্রমের মধ্যেও তিনি যে, মধ্যে মধ্যে আমাদিগকে এক এক খানি অমূল্য ও অভিনব গ্রন্থ উপহার দিয়া আসিতেছেন, ইহাতে আমরা তাঁহাকে বড় ভাল বাসি। ভগবান তাঁহাকে চিরজীবী করুন।

এই 'অমিতাভের' কিছু পরিচয় আমাদের 'জন্মভূমির' পাঠক, ইতিপূর্ব্বেই পাইয়াছেন। জন্মভূমির সেই 'বুদ্ধদেব'ই এখন সম্পূর্ণ হইয়া "অমিতাভ" নামে অভিহিত হইয়াছে। কাব্য-মোদী পাঠক, এখন এই অমৃতময় 'অমিতাভের' পূর্ণ পরিচয় গ্রহণ করুন।

কবি নিজেই স্বীকার করিতেছেন,—

'এ কাব্যখানির প্রণয়ন সম্বন্ধে আমি পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থ-কারদের কাছে বিশেষরূপে ঋণী"।

সুতরাং এডুইন্ আর্‌নল্ডের "Light of Asia" প্রভৃতির কথা উল্লেখ করিয়া, তুলনায় সমালোচনা করা সঙ্গতও নহে, কিংবা সমী-চীনও নহে।

কবি গ্রন্থের মুখবন্ধে বুদ্ধকে নারায়ণের অবতার প্রমাণ করিতে যথাসাধ্য যত্ন পাইয়া-ছেন। কিন্তু কাব্যে তাঁহাকে মানব ভাবেই দেখিয়াছেন। এই মানবভাবে দেখাসত্ত্বেও, সমস্ত কাব্যখানি পড়িলে, মনোমধ্যে একটি দয়ার অবতার, মহামহিমময়, দেব-মূর্ত্তি জাগিয়া উঠে। তখন প্রাণ যেন কিছুক্ষণের জন্য এ দুঃখময় ছার মাটীর সংসার পরিত্যাগ করিয়া, কোন অভিনব বাঞ্ছিত পথে বিচরণ করিতে থাকে।

ঐতিহাসিক কাব্য হইলেও, নবীনচন্দ্রের অপূর্ব্ব কবিত্ব-শক্তি 'অমিতাভের' পত্রে পত্রে, ছত্রে ছত্রে, দেখিতে পাই। বিশেষ, 'অমি-তাভের' ভাষাটী বড় সুন্দর ও সুখপাঠ্য হইয়াছে।

নবীনচন্দ্রের লেখার কেমন একটু অপূর্ব্বত্ব আছে, যাহা বাঙ্গালার আর কোন কবির লেখায় দেখিতে পাই না। নবীনচন্দ্রের মত্ততা বা অন্তর্লীনতা এত অধিক যে, তাঁহার কাব্য পড়িতে পড়িতে অনেক সময় তন্ময় হইতে হয়। কবির পক্ষে এ গুণটী বড়-কম গুণ নয়। 'বড় কম' কি?—আমাদের বিবেচনায় এই গুণটীই কবির সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ গুণ। বস্তুতঃ, নবীন-চন্দ্র কিছু "রাখিয়া-ঢাকিয়া" বলিতে জানেন

* শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন প্রণীত। কলিকাতা, ২৩ নং স্কট্‌স লেন, ভারতমিহির যন্ত্রে, সান্যাল এণ্ড কোম্পানী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা চারি আনা।

না। সরল শিশুর ন্যায়, তিনি মুক্ত-প্রাণে প্রাণের কথা মর্ম্মস্পর্শিনী ভাষায় বলিয়া যান। এই জন্য তাঁহার লেখাও খুব আন্তরিকতাপূর্ণ হইয়া থাকে। নবীনচন্দ্রের লেখার ধাতই এই। এই ধাত দেখিয়া নবীনচন্দ্রকে সহজেই চেনা যায়।

এখন, 'অমিতাভ' হইতে দুই এক স্থান উদ্ধৃত করিয়া আমরা দেখাইব, কি গুণে কবি নবীনচন্দ্র সাধারণের এত প্রিয়পাত্র।

'বোধিতরু মূলে' শ্রীবুদ্ধদেব সপ্ত দিবারাত্রি ধ্যাননিমজ্জিত থাকিয়া নির্ব্বাণ-সুখ উপলব্ধি করিলেন। তার পর আর কয়েক সপ্তাহ পরে তিনি সম্পূর্ণ সিদ্ধমনোরথ হইয়া 'তারায়ণ তরু-তলে' বসিয়া ভাবিতেছেন;—

"এরূপ নির্জ্জনবাস যোগ্য কি আমার ?
পাইয়াছি যেই ধর্ম্ম দুর্ব্বোধ গম্ভীর,
কে বুঝিবে এই ধর্ম্ম, করিবে গ্রহণ ?
আমার নির্ব্বাণধর্ম্ম,—ভূধর নিঝর,
শ্রুতি-স্মৃতি-বিপরীত,—এই আর্য্যভূমে
শ্রুতিতে প্লাবিত, কামাকর্ম্মে প্রলোভিত
কে শুনিবে, কে বুঝিবে, করিবে গ্রহণ ?
না বুঝে অবজ্ঞা লোক করিবে নিশ্চয়।
শ্রুতিজাত কামনার স্রোতে ধরতর
ভাসিছে ভারতভূমি ; করিয়া কামনা
স্বর্গভোগ, সুখভোগ, রাজ্য, ধন, যশঃ,
করে যাগ যজ্ঞ নর ; তারা কি কখন
করিবে চেষ্টায়—যজ্ঞ কামনা-নিরোধ ?
বুঝিবে কি কামনার নির্ব্বাণই সুখ ?
অসম্ভব, অসম্ভব ! নিশ্চয় আমার
উচিত নির্জ্জন বাস। নির্ব্বাণের সুখে
করিব নির্জ্জনে এই দেহের নির্ব্বাণ।"

কিন্তু অগণিত নরনারীর কাতর-ক্রন্দনে তাঁহার চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইল। তিনি তাঁহার নবধর্ম্ম-সুধা সকলকে পান করাইতে লাগিলেন। তাহার পর যখন পৃথিবীতে তাঁহার কার্য্য শেষ হইল,—তিনি জীবনের সেই অন্তিম সোপানে দাঁড়াইয়া কয়জন বিশিষ্ট শিষ্যকে তাঁহার দুরূহ ধর্ম্মতত্ত্ব পরিষ্কাররূপে বুঝাইয়া দিয়া মহানির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইলেন। তখন কবির সে অপূর্ব্ব বীণার ঝঙ্কার শুনিলে মোহিত হইতে হয় ;—

"নীরব পূর্ণিমা-নিশি ; নিষ্পন্দ নীরব
ঊর্দ্ধে পূর্ণচন্দ্র, নিম্নে সুপ্ত ধরাতল।
ফুরাইল শেষ কথা ; ধীরে বুদ্ধদেব
হইলা নীরব, ধীরে মুদিলা নয়ন।
ভিক্ষুগণ এককণ্ঠে ভক্তি উচ্ছ্বসিত
গাইল, সে মহাবন করিয়া ধ্বনিত—
"বুদ্ধং মে শরণম্।
ধর্ম্মং মে শরণম্।
শঙ্ঘং মে শরণম্।"
মহাকথা মহাকণ্ঠ, শান্ত সুগভীর
মৈশ নীরবতা সহ মিশাইল ধীরে।
মিশাইল ধীরে পুণ্য জ্যোৎস্নার সহ
নির্ম্মল উজ্জ্বলতর পূর্ণ জ্ঞানালোক ;—
সমাধিস্থ বুদ্ধদেব লভিলা নির্ব্বাণ,
মহাতরুতলে মহামূর্ত্তি নির্ব্বাণের
সমাধিস্থ, উদ্ভাসিত মহামহিমায়
পূর্ণিমার নিশীথের ফুল্ল চন্দ্রকরে,
হইল স্থাপিত যেন মহা যোগাসনে।

* * *

শিষ্যগণ এক কণ্ঠে ধ্বনিল—"নির্ব্বাণ"
ধ্বনিল "নির্ব্বাণ" স্থির স্তব্ধ শালবন।
নির্ব্বাণ ঘোষিলা শশী, মৌন নীরবতা
জানিল অনন্ত বিশ্ব—"নির্ব্বাণ।" নির্ব্বাণ

* * *

অস্ত গেলা পূর্ণচন্দ্র নিভাত-পরাণ ;
অস্ত গেলা আলোকিয়া অশীতি বৎসর
পূর্ণচন্দ্র অমিতাভ ধর্ম্মজগতের।

* * *

অনন্ত স্বর্গের কাব্য সেই দেব-লীলা
ভারতের অঙ্কে অঙ্কে হ'য়ে প্রতিষ্ঠিত,
মানবের মহাতীর্থ, জগত-বিস্ময়!"

স্থানাভাবে আমরা অতি অল্পমাত্রই উদ্ধৃত করিলাম,—কিন্তু গ্রন্থের প্রায় সর্ব্বত্রই এইরূপ করুণ-রসাত্মক উক্তি ও সর্ব্বভেদিনী বর্ণনার প্রতিকৃতি বিদ্যমান। এইটীই নবীনচন্দ্রের লেখার নিজস্ব ধাত। এমন উন্মুক্ত প্রাণ, আর কয়জন করিতে পারেন ? নিখুঁত করুণরস উদ্দীপনায় নবীনচন্দ্র বঙ্গে অদ্বিতীয়, এবং এ অংশে তিনি বঙ্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি। তাঁহার হৃদয়ের ক্রমোন্নতি ও প্রতিভার গতি ভাবিবার বিষয়।

বড় মিঠা-গলায়, শান্ত-স্নিগ্ধ-করুণ সুরে কবি 'অমিতাভের' উপসংহার করিয়াছেন ;—

"যাও দেব ! লীলা শেষ। এসেছিলে তুমি
একবার যমুনার তীরে পুণ্যবতী,—
দেখিয়াছি সেই লীলা কোমল কঠোর !
আসিলে আবার তুমি কপিল নগরে
শৈলপতি হিমাদ্রির পুণ্য পাদমূলে,—
দেখিলাম এই লীলা আত্ম বিসর্জ্জন,—
রাজপুত্র মহাযোগী ! আসিলে আবার
সরল মানবশিশু জর্দ্দানের তীরে,—
দেখিয়াছি সেই লীলা আত্ম-বলিদান !
আরবের মরুভূমে, অমৃত নির্ঝর
আবার আসিলে তুমি,—নাহি ভাগ্য মম
দেখিব সে লীলা তব। আসিয়া আবার
পতিতপাবনী-তীরে পতিতপাবন
পাষাণ করিলে দ্রব প্রেম-অশ্রুজলে,—
ভাসি প্রেম-অশ্রুজলে, বড় সাধ মনে,
দেখিবে কাঙ্গাল কবি সে লীলা করুণ,
প্রেমময় ! এই আশা করিও পূরণ।"

আশা পূর্ণ হইবে বৈ কি ! আমরাও কবির এই আশ্বাসবাক্যে 'শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা' দেখিবার জন্য উৎসুক রহিলাম।

বোধন ব্যবস্থাপত্র।

এ বর্ষে ৺দেবীবোধনের গোলযোগ বিদ্যুত্। বোধন মিটিয়া গিয়াছে, গোলযোগ কিন্তু মিটে নাই ! গোলযোগ কখন যে মিটিবে, সে আশাও নাই। তবে যিনি যে মতের সমর্থক, তাঁহার সেই মত প্রকাশে আগ্রহাতিশয় দেখা যায়। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতবর্গ পূজনীয়, যথাসাধ্য তাঁহাদের আগ্রহ পূরণ কল্যাণের হেতু। মঙ্গলকর কার্য্য জন্মভূমির অবশ্য অনুষ্ঠেয়। নিম্নলিখিত ব্যবস্থা প্রকাশ সেই অনুষ্ঠানের অন্যতম নিদর্শন।

"বর্ত্তমান বর্ষে দেবীর বোধন ব্যবস্থা বিষয়ে বঙ্গদেশে মতদ্বৈধ উপস্থিত হওয়াতে কার্য্য কেহ পূর্ব্বদিন, কেহ বা পরদিন করিছেন, ইদানীং শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও যুক্তি দ্বারা সুধীগণ নিকট জ্ঞাত করাইতেছি যে, পূর্ব্বদিন সায়ং বোধন ব্যবস্থাই যুক্তি যুক্ত হইয়াছে।

স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য ষষ্ঠীবোধন বিষয়ক উপক্রমে লিখিয়াছেন,—"নবমীবোধনাসামর্থ্যে সায়ং ষষ্ঠ্যাং বোধনম্।" এস্থলীয় সায়ংপদ রাত্রি-দণ্ডের বোধক ; কোন শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারাই সায়ংপদ দিবাদণ্ডের বোধক হইতে পারে না। সায়ং শব্দে যে, রাত্রিমুখ (অর্থাৎ আদ্য ভাগ) বুঝায়, তাহা পরের লিপিতে প্রকাশ করা হইতেছে। এই সায়ংশব্দ বাচ্য রাত্রি-পূর্ব্বভাগের, সন্ধ্যা-কালাবচ্ছেদে ষষ্ঠীলাভ আবশ্যক বলিয়া ঋষিবচনেও প্রকাশ আছে ; যথা—"ষষ্ঠ্যাং বিল্বতরৌ বোধং সায়ং সন্ধ্যাসু কারয়েৎ"। এই বচনের মীমাংসা প্রসঙ্গে সন্ধ্যাশব্দের অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন যে, অর্দ্ধ অস্তময় হইতে তারকা প্রকাশ না হওয়া পর্য্যন্ত কালই সন্ধ্যা-পদবাচ্য। এই ভিন্ন উপাসনার কাল যে স্বতন্ত্র দণ্ডদ্বয় আছে, ইহা যুক্তি-যুক্ত নহে।

ইহা ব্যতীত সূর্য্যস্তবাদি মধ্যেও "দ্বে সন্ধ্যেঽস্তময়োদয়ে" এস্থলেও সন্ধ্যা শব্দের অর্থে ঐরূপ কালই প্রতিপন্ন হইতেছে। অপর বোধন বিষয়ক সুধীভূত বচনের স্মার্ত্ত ব্যাখ্যায় যেদিনে সায়ং ষষ্ঠী-লাভ, সেই দিনেই বিধি লিখিয়াছেন, উভয় দিনে সায়ং ষষ্ঠীলাভে পরদিন পূর্ব্বাহ্নেই বিধি লিখিয়াছেন। কিন্তু এই তিন বিষয়ের মীমাংসা প্রসঙ্গেও সন্ধ্যা-নিমিত্তক কালের উল্লেখ করেন নাই ; কেবল সায়ং ষষ্ঠীর লাভালাভেই বলিয়াছেন। স্মার্ত্তের এই লিপি অনুসারেই সন্ধ্যাপদ যে সায়ং পদের বিশেষণ, ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে। সুতরাং এস্থলে সন্ধ্যাপদ কালবাচক, ইহাই যুক্তিযুক্ত। অর্দ্ধাস্ত-ময় হইতে অথবা পরদিন-বাদীর অভিপ্রায় মতে উপাসনার নিমিত্তক দিবা-শেষদণ্ড হইতে রাত্রির প্রথম দণ্ড পর্য্যন্ত কাল সন্ধ্যাপদের বাচ্য হইলেও সায়ং পদের সহিত অভেদান্বয় করিলে রাত্রি-প্রথম দণ্ড ভিন্ন বুঝায় না।

বস্তুতঃ, সন্ধ্যারূপ কালের অভিন্ন যে সায়ং,

তদ্ব্যাপি যে ষষ্ঠী, তাহাই বোধনের উপযোগী, ইহাই ঋষিবচনের নির্দ্দোষ সরলার্থ; এবং শাস্ত্রীয় অর্থেও রাত্রির প্রথম দণ্ড মাত্র বুঝিতে হইবে। ইহাতে সন্ধ্যাবিষয় রাত্রিদণ্ডে সায়ংসন্ধ্যা কার্য্যা এবং "সায়ং ন কুর্ব্বীত" ঋষিবচনের এই স্থলে, সায়ং নিমিত্তক সন্ধ্যা ইহাই বোধগম্য হয়। সেই জন্য সামান্যশাস্ত্রপ্রাপ্ত মুহূর্ত্তাত্মক কাল ত্যাগ করিয়া প্রত্যেক দণ্ডই সন্ধ্যার নিমিত্ত কাল সর্ব্ববাদি-সিদ্ধ হওয়ায় বোধন বিষয় ঋষিবচন ও স্মার্ত্তের লিপী অনুসারে রাত্রির প্রথম দণ্ড মাত্র বোধনের নিমিত্ত বলিতে এরূপ শিরোবেদনা হওয়ার কারণ কি? সায়ং শব্দের অভিধানে "সায়ং সায়ে প্রগে প্রাতঃ"। এই স্থলে সায়ে নিশামুখে, রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় এইরূপ অর্থ করিয়াছেন এবং উপবাস বিষয় সায়মাদ্যান্তয়ো রহ্নঃ ইত্যাদি বচনেও রাত্রির প্রথম ভাগ, ইহাই বুঝাইতেছে। ইহাতে কোন রূপেই দিবাদণ্ড বুঝায় নাই। তবে যদি পরদিনবাদীর পক্ষে অনন্যগতি বলিয়া সন্ধ্যাশব্দার্থ যে উপাসনা নিমিত্তক কাল, লক্ষণা দ্বারা নিয়া তাহার একদেশ উপাসনারূপ ক্রিয়ায় সায়ং পদার্থের অন্বয় করা হয়, তবে ঋষিবাক্যে লক্ষণা, একদেশান্বয় এবং পদার্থ গৌরব এই সকল দোষ পরদিন-বাদীর নিতে হয়। এরূপ অভিপ্রায় হইলে সায় সন্ধ্যানিমিত্তকে ইহাই ঋষির বলা সভ্ব ছিল। অপর স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যের লিখিত মীমাংসায় উভয় দিনে ষষ্ঠ্যলাভ এস্থলে সায়ং সন্ধ্যানিমিত্তক কালে এইরূপ লেখাই যুক্ত। অতএব ঋষিবাক্যে লক্ষণা ইত্যাদি দোষ এবং সর্ব্ববাদি-বিরুদ্ধ আধুনিক স্মার্ত্তের লিপিতে লক্ষণা এইরূপ বহুতর দোষ স্বীকার করিলেও রাত্রিদণ্ড ভিন্ন দিবাদণ্ড কিছুতেই বুঝায় না। কারণ সায়ংনিমিত্তক সন্ধ্যার নিমিত্ত কাল বলিলেও পুনরায় রাত্রিদণ্ডই বুঝায়। এ অবস্থায় পরদিন মত প্রচার করা নিরাবশ্যক তবে যদি প্রামাণ্য-সন্দেহ ও স্থিরতর-লিপি রহিত কোন সংগ্রহ কি টিপ্পনীর লিপি অনুসারে সায়ং মুহূর্ত্তাত্মক ষষ্ঠ্যলাভ দৃষ্টি করিয়া ঋষিবচন ও স্মার্ত্ত পুস্তক অনাদর হইয়া থাকে তাহাতেও এবর্ষে সায়ং বোধন কোন বাধা নাই। কারণ "সন্ধ্যাসু" এস্থলে আদিপদে তুল্যার্থ বহুবচন দ্বারা সন্ধ্যাদিকালাবচ্ছিন্ন সায়ংব্যাপিনী ষষ্ঠী এই অর্থ নিয়া সামান্য শাস্ত্রপ্রাপ্ত যে মুহূর্ত্তাত্মক কাল, তাহারও এবর্ষে কোনরূপে বাধা হয় নাই। বরং যে বর্ষে পরদিনে রাত্রির প্রথম দণ্ড মাত্র ষষ্ঠী প্রাপ্ত হয় সেই বর্ষে সায়ং বোধনের বাধাই এই সকল লিপির অভিপ্রায়। অতএব এইরূপ সকল লিপি এবং উপপত্তি সত্ত্বে ঋষিবচন ও স্মার্ত্ত পুস্তকের অনাদর পূর্ব্বক মত প্রকাশ করা অনুচিত।

যদি কেহ আমার এই যুক্তি ও শাস্ত্রীয় প্রমাণসঙ্গত উল্লিখিত বাক্যের বিরুদ্ধ প্রতিবাদ করিতে ইচ্ছুক হন, তবে অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে জানাইলে আমি তাহার সদুত্তর দিতে প্রস্তুত আছি। অলমিতি বিস্তরেণ।

ন্যায়রত্নোপাধিক
শ্রীদুর্গাচরণ দেবশর্ম্মণঃ।
সাং গাড়ুড়িয়া, জেলা বরিশাল।

সমালোচনা।

প্রমোদলহরী অথবা বিবাহ-রহস্য। বঙ্গসাহিত্যের অন্যতম নেতা, মনস্বী শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়ের এই অপূর্ব্ব গ্রন্থখানি পড়িয়া যে প্রগাঢ় আনন্দ অনুভব করিয়াছি, বারান্তরে, স্বতন্ত্র প্রবন্ধাকারে, তাহার সবিশেষ পরিচয় দিব।